ষোড়শ বর্ষ

পৌষ

সপ্তম সংখ্যা

১৩৬৭

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

আচার্য্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)

প্রায় ৮০ বছরের ঐতিহ্য নবকলেবরে হরপ্রসাদের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বাঙলা ও ইংরাজী রচনাবলী বিশ্লেষণ করে এক দীর্ঘ-গ্রন্থ ছাপা হয়েছে কিন্তু এ যুগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাঁর কথা ভাল করে বোধহয় হয়নি : তাঁর শালা বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্তগ্রামবাসী ও বন্ধু, তাই হরপ্রসাদ বঙ্কিমের ঘরে বসে পড়েছেন ও তাঁর প্রথম রচনা "ভারতীর নারী" বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়। পাণ্ডিত্যে ছিলেন প্রবীণ অথচ গদ্য রচনায় তিনি আধুনিকতার অগ্রদূত ; তার সাক্ষ্য আজও দেয় তাঁর অনবদ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বেনের মেয়ে' ও 'কাঞ্চন মালা', যেগুলি পড়ে আমার গুরু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'শশাঙ্ক' ও 'ধর্মপাল' প্রভৃতি লিখে গেছেন। সংস্কৃত কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার মন্থন করে হরপ্রসাদ কত মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। সর্বোপরি, বাঙালীদের কাছে তিনি অমর হয়ে থাকবেন কারণ প্রবীণ বয়সে নেপাল যাত্রা করে, "দরবার" লাইব্রেরী থেকে "হাজার বছরের বাংলা" পুঁথি 'বৌদ্ধ-গান' ও 'দোহা-কোষা'দি উদ্ধার ও প্রকাশ করে গেছেন। সেই বই অবলম্বন করে বন্ধুবর ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিরাট Thesis লিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে D. Litt. উপাধি-ভূষিত হন। তাঁর সঙ্গেই আমরা নৈহাটিতে বঙ্কিম-শিষ্ট হরপ্রসাদের স্মৃতিসভায় যোগ দিয়েছিলাম। তাঁদের যুগে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সাহিত্যবোধ ও সাধনার নিবিড় যোগ ছিল তাই মৃণালিনীতে "মথুরা বাসিনী" গান যিনি রচনা করেছেন সেই বঙ্কিমই 'কৃষ্ণ চরিত্র' লিখে গেছেন। বাংলা ভাষায় "মেঘদূত" তার ও কালিদাসাদির অমর রচনা বিষয়ে হরপ্রসাদ যে সম্পদ আমাদের দিয়ে গেছেন সেজন্য আমরা চির কৃতজ্ঞ। আমাদের 'বৃহত্তর ভারত পরিষদের' সভাপতিরূপে বহুকাল তিনি আমাদের গবেষণায় পথনির্দেশ ও প্রেরণা দিয়েছেন সেকথাও স্মরণ করি। যে হরপ্রসাদ এসিয়াটিক সোসাইটির প্রধানকর্মী ও পরে সভাপতি হবেন তাকে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রই আমন্ত্রণ করেন সংস্কৃত পুঁথির ক্যাটালগের কাজে ; তার ফলে বহু খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে তা দেশ বিদেশে বাঙালী পণ্ডিতদের নাম উজ্জ্বল করেছে। রাজেন্দ্রলাল (১৮২৪-৯১) বিখ্যাত ইংরেজীনবীশ হয়েও বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশ করে গেছেন ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা 'জীবন-স্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন তরুণ বয়সে 'বাল্মিকী প্রতিভা' রচনা করে বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেন তখনই হরপ্রসাদ 'বাল্মিকীর জয়' গদ্যকাব্য লিখে সবাইকে চমৎকৃত করেন, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর Neo Romantic Movement in Bengali Literature প্রবন্ধে হরপ্রসাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। 'মুসাফির' পত্রিকায় সেই সব সার্থক অথচ বিস্মৃতপ্রায় বাংলা রচনার কথা কিছু লিখেছি। "রবীন্দ্র যুগ" প্রসঙ্গেও এসব কথা মনে করাতে চেষ্টা করব। রাজেন্দ্রলালের বাড়ী গুঁড়ো সেখানে আজ Gooroodas College গড়ে উঠেছে —এঁদের সঙ্গে হরপ্রসাদের বাড়ীতে—রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা—কত যুগের মানুষ যাওয়া আসা করেছি ও তার কারণও ছিল। সে কলকাতা দ্রুত বদলে যাচ্ছে তাই গল্প-ভারতীর কাছ এ সব গল্প (ও ছবি) সংগ্রহ করে ছাপা। আমাদের একান্ত পূজনীয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষই বোধ হয় একজন এখনো সৌভাগ্যক্রমে আছেন; তিনি অনেক কিছু বলেন, এখন লিখে যাবেন এ আশা রাখি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য হরপ্রসাদ অনেক কাজ করেছেন সে বিষয়ে তাঁরাও, আশা করি, একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। সেকালে সাহিত্য পরিষদ ছাত্রদের একজন অধ্যক্ষ নিয়োগ করবেন; সে পদে নির্বাচিত হয়েছিলাম বলে অনেক কথা শুনেছি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ, অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনীষীদের কাছে; তাঁদের জীবনী রচনারও সময় হয়েছে। অক্রুর দত্তের বাড়ীতে আমার মাতামহ কুলে প্রতিষ্ঠিত বৌবাজারে "সাবিত্রী লাইব্রেরী"র বার্ষিক সভায় হরপ্রসাদ সাময়িক বঙ্গ-সাহিত্য বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ পড়েন, এসব কথা তাঁর কাছে শুনে ও সে লেখা পড়ে, হরপ্রসাদকে প্রণাম করে ধন্য হয়েছি।

দিল্লীতে ন্যাশনল্ মিউজিয়াম্

কলকাতায় শতাব্দী কাল ধরে প্রদর্শনী হয়ে আসছে; তাই এক্সিবিশন্ (exhibition) কথাটা প্রায় বাংলা হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী-শ্রেষ্ঠ ইংরেজ তার মূল্য বুঝত, তাই পড়ের মাঠে দেশীবিদেশী শিল্পের (art and industries) প্রদর্শনী দেখার ব্যবস্থা করেছিল। বিক্রির পর উদ্বৃত্ত ভাল অনেক জিনিস রাখবার প্রথম ব্যবস্থা হল Indian Museum বিশাল যাদুঘর (হিন্দী আজব ঘর) যখন গড়া হয়েছিল। ১৮৮০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত Industrial and Applied Arts গ্যালারী চৌরঙ্গী ভবনে সাজান ছিল। তার মধ্যে যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের নবাব ও বেগমদের পোষাক আষাক স্থান পেল, তেমনি স্বাধীন বর্মার শেষ রাজা বিদ্রোহী Thibaw সিংহাসন তাঁর নির্বাসনের সঙ্গে (প্রথম প্রতিবাদ করে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস) চৌরঙ্গীভবনে উঠল। বর্মার বিতাড়িত রাজার বিরাট সিংহাসন দেখেছি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে লর্ড Curzon যখন বিদায় নেন তখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও Indian Museum কলকাতার মহামণি। তাই, ইংরেজের কাগজ Statesmanও সে দিন প্রতিবাদ করেছে—অন্য সরকারী বিভাগ দিল্লীতে গেলেও যেন যাদুঘর কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত করা না হয়। ভারতের তথা এশিয়ার মধ্যে আদি ও শ্রেষ্ঠ যাদুঘর ও চিত্রশালা (Academy of Fine Arts এইখানেই বড় হয়েছে।) আমাদের চৌরঙ্গীতে। তার সন্নিকটে আরো একশত বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করছে Asiatic Society (১ পার্ক ষ্ট্রীট) যার প্রতিষ্ঠা করেন Warren Hastings ও Sir william Jones ১৭৮৪ সালে। তাই ১৮৮৪তে তাঁর শতবার্ষিকী হয়েছিল বাংলার গৌরব ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২৪-৯১) সভাপতিত্বে। সেই উপলক্ষে তিনি ও তুতত্ত্বজ্ঞ

(geologist) প্রথমনাথ বসু মিলে যে আরেক-খণ্ড ছাপেন সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি পড়লে সবাই বলবেন, শিল্পে সংস্কৃতে ও বিজ্ঞানে কত বড় কাজ এ চৌরঙ্গীর উপর হয়ে গেছে। সম্পাদক James Prinsep (১৭৯৯-১৮৪০) অশোক লিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করে অমর হন ও যে বৈজ্ঞানিক পত্রিকা নিজ দায়িত্বে তিনি প্রকাশ করেন সেই Journal ১৮৩২ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তারও আগে পার্ক ষ্ট্রীটে Asiatic Museum তাঁরা খোলেন কিন্তু স্থানাভাবের জন্য নূতন Indian Museum ভবনে অমূল্য প্রত্ন-তত্ত্ব সম্পদ ও প্রাচীন মুদ্রাদি Indian Museum এ সাময়িকভাবে রক্ষণের জন্য (১৮৬৬-৭০) পাঠান। তারপর মাদ্রাজ ও বোম্বাই, লাহোর পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানে শতাধিক যাদুঘর গড়ে উঠতে থাকে। প্রাচীন রাজপুত ও মুঘল চিত্রাদি চৌরঙ্গীতে এত জমেছে যে এখনও ক্যাটালগ্ হয়নি। সেসব কথা মিউজিয়ামে বক্তৃতা উপলক্ষে আমি বলেছিলাম। তিব্বত গেছে চীনের কবলে, অথচ অধুনা দুষ্প্রাপ্য বহু তিব্বতী তাঙ্কা বা বৌদ্ধ মঠের তিব্বতী চিত্রাদি এই চৌরঙ্গীতেই আছে এবং তাঙ্গুর ও কাঙ্গুর (Tangur-kangur) পুঁথিগুলি এই কলকাতায় বসে আমাদের পড়ার সুযোগ আছে।

তাই যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে বৃহত্তর যাদুঘর করেছেন তাতে আমরা সুখী। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পরে জানাব। কিন্তু কোনও অজুহাতেই কলকাতার যাদুঘরকে ছোট করতে দেব না। মাদ্রাজ মিউজিয়মের কাজ ছেড়ে এসে মনীষী E. B. Havell এই চৌরঙ্গী ভবনের কোণেই ভারতীয় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভারতীয় শিল্পে নব-যুগের সূত্রপাত করেন (১৮৯৯-১৯০৩) আর অশোক লিপি, ভারহুত থেকে সুরু করে গ্রীক শক-কুষাণ ও গুপ্ত ও পাল যুগের অমূল্য ভাস্কর্য্য ও প্রাচীন মুদ্রা এই চৌরঙ্গী যাদুঘরেই আছে। সে সব কথা প্রত্নবিভাগের বাঙ্গালী কর্তা (Director) Sri A Ghosh ভাল করেই জানেন। তাঁর সঙ্গে এবার Moscow Orientalists Congress এতে যোগ দিয়ে এ সব বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং তিনিও কেন্দ্রীয় যাদুঘরের সঙ্গে চৌরঙ্গী ভবনগুলির যোগ রাখবেন। তাঁরই সম্পাদিত গ্রন্থ Archeological Survey Centenary উদ্‌যাপিত হবে ১৯৬১ সালে। তাই দিল্লী মিউজিয়াম ৫৫ লক্ষ টাকার গড়া হল। আরো অনেক অর্থ ও গবেষণার বিনিময়ে দিল্লীতে—শুধু ভারতের নয়—সারা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ মিউজিয়াম করতে হবে। আমার Art and Archeology Abroad (১৯৩১) সম্বর্ধনা ও রবীন্দ্রশতাব্দী উপলক্ষে সদ্য প্রকাশিত Discovery of Asia এবং Greater India গ্রন্থে এ সব বিষয়ে গবিষণার তথ্যমূলক আলোচনা করেছি। লোদী পাঠান ও তুর্কী মুঘল দিল্লীর বুকে যদি এশিয়া (Asian Collection) ও প্রাচ্য শিল্প ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা গড়ে উঠুক এই আমাদের প্রার্থনা!

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কথা প্রসঙ্গে

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পাকিস্তানকে স্থানদান

দেশ বিভাগের পর হইতে কেবল কাশ্মীর লইয়াই নহে, সীমান্তবর্তী কতকগুলি স্থান লইয়াও পাকিস্তানের সহিত ভারত রাষ্ট্রের অধিকারগত বিরোধ গঠিত হইতেছিল। মিষ্টার ফিরোজ খাঁ নূন যখন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী তখন তিনি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার সহিত ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর যে আলোচনা হয় তাহার ফলে পণ্ডিত জওহরলাল পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ী জিলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নের কতকাংশ পাকিস্তানকে দিবেন—প্রতিশ্রুতি দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু দাবী করেন, বেরুবাড়ী ভারতের এবং র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ও বাগে ট্রাইবুনাল কাহারও মতে তাহা পাকিস্তান দাবী করিতে পারেন না। সরকার বহু অর্থ ব্যয়ে বেরুবাড়ীতে বহু পাকিস্তানত্যাগী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন-ব্যবস্থাও করিতে থাকেন। কেবল তাহাই নহে, দেখা যায়, ভারতীয় সংবিধানে প্রধান মন্ত্রীকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে তিনি বেরুবাড়ী হস্তান্তর করিতে পারেন না। ভারতের সুপ্রিম কোর্টও এই মত প্রকাশ করেন। কাজেই প্রতিশ্রুতি প্রদান আইন সঙ্গত নহে প্রতিপন্ন হয়। সে অবস্থায় হয় প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয়, নচেৎ সংবিধান পরিবর্ত্তিত করিয়া উহা পাকিস্তানকে দিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী শেষোক্ত পথই গ্রহণ করিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া বলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার আইন পরিষদে সংবিধান পরিবর্ত্তিত করাইয়াছেন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মতকে লোকমত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতদিন বেরুবাড়ী সমর্পণের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়া শেষে মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—প্রধানমন্ত্রী যখন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তখন তাহা পালন করিতেই হইবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব স্বয়ং দিল্লীতে যাইয়া পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচিত কংগ্রেসপন্থী বিধান পরিষদ সদস্যদিগকে সংবিধান পরিবর্ত্তনের আইন সমর্থন করিতে নির্দ্দেশ দেন এবং তাঁহারা অবিচলিতভাবে সেই হুকুম তামিল করিয়াছেন। কেবল—ব্যাপারটি প্রথমেই বেআইনী বলিয়া ভারত সরকারের আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন—অবশ্য কংগ্রেসপন্থী মন্ত্রী হইলেও ভোটদানে বিরত থাকেন।

বহু বাঙ্গালী আবার উদ্বাস্তু হইলেন। কারণ, সরকার বেরুবাড়ীতে যাঁহাদিগকে পুনর্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যাচারের ভয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে লইয়া পুনরায় গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইবে কিনা তাহা বলা যায় না। কেন হিন্দুরা পাকিস্তান ত্যাগ করেন, সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বলিয়াছেন—হিন্দুদিগের সম্বন্ধে পাকিস্তান—

"Has followed a consistent policy of squeezing the minorities from Pakistan and in carrying out that policy all kinds of means have been adopted. Ejecting Hindus from their homes by requisitioning their houses, ill treatment, application of Islamic

concepts of life to non-believers in Islam,—murder and arson, looting and destruction of properties, forcible conversion and abduction of women."

যে রাষ্ট্র হিন্দুদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু হিন্দুকে সেই রাষ্ট্রে নিক্ষিপ্ত করিলেন। পশ্চিমবঙ্গের গণমত পদদলিত হইল, পাকিস্তান সরকার সাড়ম্বর হইল কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পালিত হউক। যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা গোপন করা হইয়াছে, সমগ্র ব্যাপারটি যে গোপনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভুল স্বীকার করিয়া পদত্যাগ করিলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইতেন না। কিন্তু মনুষ্যত্বের হিসাবে ও দেশপ্রীতির ভাবে তিনি দায়ী হইবেন কিনা, সে বিষয়ের আলোচনা এখন নিষ্ফল—সুতরাং অনর্থক। তবে ইতিহাস এই ঘটনা ভারতের পক্ষে লজ্জাজনক বলিয়াই লিপিবদ্ধ করিবে।

ভাষা-বিচার

অল্পদিনের ব্যবধানে দুইটি নির্দ্ধারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক (জুনিয়ার, হাই, হায়ার সেকণ্ডারী) বিদ্যালিক্ষালয়ের জন্য কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা স্থির করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য ডক্টর সত্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন—সেই সমিতি বহু আলোচনার পরে স্থির করিয়াছেন, নিম্নলিখিত ভাষাত্রয় ছাত্রকে শিক্ষা করিতে হইবে—

মাতৃভাষা বাঙ্গলা, সংস্কৃত ভাষা, ইংরেজী ভাষা।

মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ছাত্রের জন্মগত অধিকার এবং শিক্ষার জন্য তাহার সুবিধাও অনেক। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডক্টর দুর্গা শুভীত চক্রবর্ত্তী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার্থীদিগকে বলিয়াছিলেন—

"দেশীয় ভাষা তোমাদিগের মাতৃভাষা। তাহা লিখিতে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম অল্প করিতে হয়। আর মাতৃভাষায় পঠিত বিষয় সহজে বোধগম্য হয়।" মাতৃভাষার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য।

তাহার পরে—সংস্কৃত। যিনি বাঙ্গালা ভাষাকে - বাঙ্গালা সাহিত্যকে ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সর্ব্বাভরণভূষিতা করিয়াছিলেন। সেই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালার আরও উন্নতি সাধনের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা প্রয়োজন।

ইংরেজী বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা নহে—কিন্তু উহা আন্তর্জ্জাতিক ভাষা। ইংরেজীর মাধ্যমেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন জাতিতে ঐক্যসাধন সম্ভব হইয়াছে—পরস্পরের ভাব বিনিময় হইয়াছে।

বর্ত্তমানে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার আয়োজন হইয়াছে। কিন্তু হিন্দী ভাষা—এখনও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই—তাহার দৈন্য দূর হইয়া সমৃদ্ধি যৌবনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই এবং কখনও তাহা পারিবে কিনা, তাহা বলা যায় না।

এইজন্য ইংরেজী ভাষা প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষা বাঙ্গালী মনীষার বিকাশে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। সেইজন্য বাঙ্গালী ছাত্র যত অল্প বয়সে সম্ভব ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিবে।

ভারতীয় সংবিধানে লিখিত আছে—১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজী ভারতের সরকারী ভাষা থাকিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী বহু পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা হিন্দী ভাষাভাষী নহেন, তাঁহারা যতদিন ইচ্ছা করিবেন, ততদিন ইংরেজী ভারতরাষ্ট্রে অন্যতম সরকারী ভাষা থাকিবে।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা দশ বৎসর চলিবার পরে—

(১) দিল্লীর বৈজ্ঞানিক ও ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে উপদেষ্টা বোর্ড বলিতেছেন—এখন ইংরেজী বর্জ্জনের কথা বিবেচিতও হইতে পারে না।

(২) ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি ডক্টর পেটেল বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে ইংরাজী শিক্ষার অবহেলা করা বিপজ্জনক হইবে।

(৩) মাদ্রাজ সাহিত্য একাডেমীতে বক্তৃতা প্রদানকালে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজী শিক্ষা সমর্থন করিয়াছেন। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ভাষাবিদ, তিনি রাজনীতিক জীবনে প্রবেশের কালে হিন্দীর পক্ষপাতী ছিলেন। আজ যে তিনি বলিতেছেন, যখন পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ ইংরেজী শিক্ষা করিতেছে তখন ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ ত্যাগ করা ভারতের পক্ষে নবযুগের জ্ঞানমন্দিরের চাবি ইংরেজী ত্যাগ করা অকল্যাণকর হইবে—তাহাতে জাতীয় আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা আশা করি তিনি বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার ফলে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

আশা করা যায়, ইংরেজী শিক্ষাকে তাহার অবশ্য প্রাপ্য সম্মানে রক্ষিত করিয়া ভারতের অকল্যাণ সাধনের চেষ্টা ত্যক্ত হইবে।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান—

বেঙ্গল চেম্বর এসোসিয়েশন নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে—"পশ্চিমবঙ্গ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিষদ" গঠিত হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সর্ব্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানে সহায়তা করা—ইহার উদ্দেশ্য। এই পরিষদ গত ১৭ই ও ১৮ই ডিসেম্বর দুই দিন বঙ্গীয় অর্থনীতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা—দেশ বিভাগের ফলে—বৈশিষ্ট্য বহন করিলেও পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিম বঙ্গকে প্রার্থিত অর্থ দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব প্রার্থিত অর্থের অধিকাংশ অন্য রাজ্য হইতে সংগ্রহ করিবেন বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে রাজ্যের নাগরিকদিগকে যে করভারে পীড়িত হইতে হইবে তাহা বহন করিবার সামর্থ তাহাদিগের আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

প্রতিষ্ঠান যে বাঙ্গালার স্বার্থ ও বাঙ্গালীর স্বার্থ অভিন্ন বিবেচনা করেন না, তাহা উদ্যোক্তার বিবৃতিতেই প্রকাশ। বোধহয়, ইহার কারণ এই যে পশ্চিমবঙ্গের ধন আর তাহার সন্তানদিগের পুষ্টিসাধনে প্রযুক্ত হয় না, পরন্তু পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালীদিগের পোষণ বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যের কারণ হইয়াছে।

সম্মেলনে সভাপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, উদ্বোধক শ্রীঅশোক সেন প্রভৃতি নানা সমস্যার উল্লেখ করেন। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির দিক আলোচিত হয়। যাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালীর নিয়োগ অগ্রাধিকার লাভ করে তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু চাকুরীর প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে বেকার সমস্যার সমাধানে কতদূর সহায়তা হইবে, বলা যায় না। প্রচলিত প্রবাদ বাক্য—

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস :
তাহার অর্দ্ধেক চাষ",

—রাজ সেবায় তাহারও অর্দ্ধেক পাওয়া যায়। রাজ্যে এত লোকের স্থান হইতে পারে? বাঙ্গালার শিল্প পূর্ব্বে বহুলাংশে ইংরেজদিগের হস্তগত ছিল, কিন্তু অষ্টাদশী পূর্ব্বেও—পাট, কাঠ, চিনি,

চাউল, লৌহ ও লবণ এ সকল ব্যবসা বাঙালীর হস্তগত ছিল এবং বাঙালী ও বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের "বেনিয়ান" ছিলেন। যে আটটি শিল্পের কথা বলা হইয়াছে সে সকল হইতেও আজ বাঙালী বিতাড়িত। ফলে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙালী ব্যবসায় বিমুখ হইয়া পড়ে এবং ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী হইতে কেরাণীগিরি পর্য্যন্ত তাহাকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। আবার বাঙালী যখন ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে জমিদারী (চিরস্থায়ী ভূমি রাজস্ব) ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় যে টাকা ব্যবসায়ে প্রযুক্ত হইতেছিল, তাহা জমিদারীতে প্রযুক্ত হয় এবং জমিদারী সম্ভ্রমের কারণ হইয়া উঠে। এখন যখন অবস্থা পরিবর্ত্তিত তখন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবলম্বিত নীতিই বাঙালীর পক্ষে শিল্পে ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার অন্তরায় হইতেছে, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন করিয়া জমি লইয়াছেন। অথচ সরকার মূল্য হিসাব ভুল করিয়াছেন বলিয়া মূল্য দানে বিরত থাকিতেছেন—তাহাতে অবথা বিলম্ব হইতেছে। ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধিত হইতেছে এবং মূলধনের অভাবে মধ্যবিত্তগণ শিল্প-ব্যবসা করিতেছেন না। যে স্থান তাঁহাদিগের অধিকার করিবার কথা, সে স্থান অবাঙ্গালীরা অনায়াসে অধিকার করিয়া বাঙালীকে ভিক্ষুক করিয়া তুলিয়াছে। সরকারের এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ সম্মেলনে হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একদিকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, আর একদিকে জমিদারী হইতে পূর্ব্ববৎ আয়ও করিতে পারিতেছেন না। জমিদারী প্রথা বিলোপের পরে মূল্য হিসাবে দেয় প্রায় ৬০ কোটি টাকার মধ্যে দেয় বৎসরে দুই কোটির অধিক দেওয়া হয় নাই। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, পূর্ব্ববৎসর সরকার ভূমিরাজস্ব দশ কোটি টাকার স্থানে মাত্র পাঁচ কোটি টাকা আদায় করিতে পারিয়াছেন। ইহা কি আশোপযোগীর পরিচায়ক নহে?

আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবহন, সমুদ্রে মৎস্য আহরণ প্রভৃতি যাবদ বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিরস্ত না হইয়া এবং কলিকাতার দুঃস্থ সরবরাহের জন্য মফঃস্বলকে বঞ্চিত করিয়া শেষে বৃহত্তর কলিকাতা রচনার বিরাট ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা প্রস্তাব করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান না হইয়া অবনতিই ঘটিতেছে এবং এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব অল্প নহে।

বঙ্গভাষা সম্মেলন ও আন্দামান

এবার আন্দামানে বঙ্গভাষা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। উদ্যোগীদিগের উদ্যম প্রশংসনীয়। যাঁহারা এই উপলক্ষে আন্দামানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মত—আন্দামানে বাঙ্গালীদিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইলে তাহাতে অবহেলিত আন্দামানের যেমন দ্রুত উন্নতি হইবে, বাঙ্গালীর তেমনি বৃহত্তর বঙ্গে স্থানাভাব ঘুচিবে। কিন্তু সে জন্য প্রয়োজন—

(১) আন্দামানকে পশ্চিমবঙ্গের অংশ করিবার ব্যবস্থা করা।

(২) বর্ত্তমানে যে স্থানে একখানি মাত্র জাহাজ কলিকাতা আন্দামান গতায়াত করে, সেই স্থানে অন্ততঃ সপ্তাহে একখানি জাহাজ গতায়াতের ব্যবস্থা করা;

(৩) আন্দামানে বাংলা শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করা ও বাঙালীকে শিল্প ব্যবসা প্রতিষ্ঠার সুযোগ ও সাহায্য দান করা।

দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থার যে লজ্জাজনক বিলম্ব ও অপব্যয় হইয়াছে, তাহা হইতে যে ভারত সরকার অবশ্য শিক্ষালাভ করেন নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আবার দণ্ডকারণ্যে যেরূপ প্রাদেশিক ঈর্ষা আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাতে বাঙ্গালীরা তথায় বসতির বন্দ রচনার সুযোগ পাইবেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সে জন্যও আন্দামানে পুনর্ব্বাসন সুবিধা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ভারতীয়তার স্থানে প্রাদেশিকতা শিরোধার্য করার ফলে ভারতে দুইটি প্রদেশের ইতিহাস রক্তে সিক্ত ও অশ্রুতে কলঙ্কিত হইয়াছে—পঞ্জাবে ও বাঙ্গালায়। পঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যা "করাল কৃপাণ মুখে" সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে তাহা হয় নাই। সেই জন্য বাঙ্গালীর অবস্থা অধিক শোচনীয়। ভারত সরকার অর্থব্যয় করিলেও পুনর্ব্বাসন কার্যে তৎপরতা দেখাইতে শেখেন নাই—অথচ তাঁহারাই ধর্ম্মানুসারে অধিবাসী বিনিময় অসম্ভব বলিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভক্তরা দেশ বিভাগে তাঁহার মতের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন—

(১) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দেশ বিভাগ—তাহা পাপ

(২) জিন্নার "হিন্দুমুসলমান" দুই জাতি এই মত—উদ্ভট।

দেশের স্বায়ত্ত শাসন ও আপনাদিগের ক্ষমতালাভের আগ্রহে দেশ বিভাগ-সমর্থকগণ একদিকে যেমন ভারতভাগ আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আর একদিকে তেমনই দেশ বিভাগের ফলে অনিবার্য হিন্দুদিগের পাকিস্তান ত্যাগ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এমনকি যে সকল মুসলমান স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করিয়া যাইয়া পাকিস্তানের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিজস্বার্থে বা পাকিস্তান কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে স্থানাভাবে উদ্বাস্তু সমস্যা শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হয়।

পুনর্ব্বাসনের নামে বা পুনর্ব্বাসনের জন্য বাঙ্গালীদিগকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতের নানা প্রদেশে —অবাঞ্ছিত হইলেও প্রেরণ করা হইয়াছে। দশ বৎসরেও পুনর্ব্বাসন হয় নাই—এখনও বহু আশ্রয় শিবিরে মানুষকে অমানুষ হইতে হইতেছে।

এই অবস্থায় যদি আন্দামানের মত কোন স্থান পশ্চিমবঙ্গের অংশ ঘোষণা করিয়া সেই স্থানে বাঙ্গালী পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে করা হয়, তবে যে সকল পক্ষেরই সুবিধা হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

আন্দামানে অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কি কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে? যদি তাহা না হয়, তবে ক্ষোভেরও সন্দেহের কারণ ঘটিতে পারিবে—কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে আরও ক্ষুদ্রায়তন করিয়া দুর্ব্বল করিতে যেমন আগ্রহশীল তাহাকে সূচ্যগ্র ভূমি দিতে তেমনই অনিচ্ছুক ও কৃতসঙ্কল্প।

বিহারের যে অংশ ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন সমিতি পশ্চিমবঙ্গকে প্রদান মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহারও একাংশ যে খনিক টাটার কর্ম্মচারীর কথায় বিহারকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ স্বজনের নিকটেও কি ব্যবহার পাইতে পারে।

বাঙ্গালীকে আজ স্বাবলম্বী হইয়া প্রকৃত দেশ প্রেমের সাধনা করিতে হইবে—নহিলে তাহার ভাগ্যাকাশ আরও ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন হইবে।

সুখ

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

সাত

কেবল কলকাতার উপর নয়, সারা দেশের উপর নেমে এলো জার্মান পুরাণের কালরাত্রি—Walpurgis Night. সাত শ' বছরের বাসি মড়ারা কবর থেকে বা শ্মশান থেকে উঠে এলো। উঠে এসে লড়াই যেখানে থেমেছিল সেইখান থেকে আবার শুরু করে দিল। কবেকার কোন যুদ্ধের পুনরভিনয়। বোধ হয় প্রথম পাণিপথের যুদ্ধের। কুতুবের সঙ্গে কুতুবের রণ।

রাত যেন আর পোহাতেই চায় না। যেন বারো ঘণ্টার রাত নয়। বারো মাসের রাত। কালরাত্রি ভোর হলো। মামলো আর ব্রহ্মদৈত্য কবরে আর শ্মশানে ফিরে গেল। অবাক হয়ে দেখি দেশ ভেঙে গেছে। প্রদেশ ভেঙে গেছে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই চুড়িওয়ালার মতো আমিও তাড়া বুকের মধ্য হতে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠে দুই হাতে চোখ চেপে ধরে বলে উঠলুম, "মারে, এ মুই কী দেখলাম! আর আগে মুই মলাম না ক্যান?"

কিন্তু থাক সে কথা। বলব আমি যথাক্রমে। যখনকার কথা তখন।

"মহৎ কলিকাতা হত্যাকাণ্ডে"র সময় আমার অন্তর্জীবনে একটা সঙ্কট চলছে। তাই নিয়ে আমি অন্যমনস্ক। শিল্পী ব্যতীত আর কেউ বুঝবে না, আর কাউকে বোঝানো যাবে না সঙ্কট কিসের আর কেনই বা সঙ্কট। ওই যে শিমূলগাছটা দেখছ ওটা আছে। ওর অস্তিত্বের জন্যে ওকে জবাবদিহি করতে হয় না ব্যাখ্যা করে বলতে হয় না কী ওর তাৎপর্য। ওটা যে বট নয়, শিমূল এটাও স্বতঃসিদ্ধ। যার চোখ আছে সে-ই চিনতে পারে ওটা শিমূল। ঘটা করে চেনাতে হয় না। তেমনি কুতুব মিনার বা তাজমহল বা পুরীর মন্দির দেখে প্রশ্ন ওঠে না, কেন এটা আছে। কী এর মানে। কোন্‌খানে এর বৈশিষ্ট্য। অত কথার উত্তর দিতে হয় না। এক কথায় বলতে পারা যায় "আছে।"

শিল্পধর্ম নিছক অস্তিত্বের দ্বারা আপনাকে আপনি প্রচার করে। তার প্রকাশটাই তার প্রচার। অথচ যত প্রচার আমাদের ছবির বেলা। প্রচার না করলে তো গেলে। দর্শক বা ক্রেতাদের বোঝাতে বোঝাতে আমরা চক্ষু হয়ে যাই যে এটিও একটি অস্তিত্ব। এটি আছে বলেই আছে। আছে যখন তখন একটা যাথার্থ্য আছে বইকি। কী ওর মানে সেটা তো কেউ কুতুব মিনারকে বা তাজমহলকে সুধায় না। চেনাও কঠিন নয় কোন্‌টা তাজমহল আর কোন্‌টা মোতি মসজিদ। তা হলে আমাকে অত কথায় বোঝাতে হয় কেন? দর্শক ও ক্রেতাদের উপর আমি রাগ করেছি। রাগ করে ছবি আঁকা ছেড়ে দেব কি না ভেবেছি। যখনকার কথা বলছি তখন অন্যমনস্ক হয়ে চিন্তা করছি কেমন করে ছবি আঁকলে কেউ আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে না। চাইবে ছবির কাছে। ছবিই বলবে কেন সে আছে, কী তার মানে। হাঁ, ছবি সত্যি সত্যি বলবে। বলবে ছবির ভাষায়। সে ভাষা যারা জানে না তারাও বুঝবে যে কিছু একটা বলা হচ্ছে অজানা ভাষায়। ভাষাটা একবার রপ্ত করে নিলে ছবিটা আর দুর্বোধ্য নয়। বরং একান্ত সহজবোধ্য। সেইজন্য যারা ছবির তারা আর ছবির অন্যান্য উপাসক। অবশ্য।

এইসব ভাবনা নিয়ে আমি অন্যমনস্ক। এমন সময় ঘটে গেল "মহৎ কলিকাতা হত্যাকাণ্ড"। সভ্য সমাজে বাস করে যথেষ্ট খুন জখম করে যাও, সাজা হবে না। বরং বীর বলে বন্দনা পাবে। যুদ্ধে তবু প্রাণ নিতে গেলে প্রাণ দিতে হয়। এক্ষেত্রে প্রাণ দেবার বালাই নেই। আততায়ীরা প্রত্যেকেই জীবিত। পুলিশের সঙ্গে, পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে তলে তলে যোগ আছে। প্রাণ দেবে সশস্ত্র বলবান আততায়ী নয়, নিরস্ত্র নিরীহ পথচারী। ভিমওয়ালা, মুচি, ধাঙড়। একবেলা বাইরে না বেরোলে যাদের পেট চলে না। সমগ্র সমাজকে কাঁধে করে চলেছে যারা। সভ্যতার বোঝা যাদের পিঠে চেপেছে। হায়! হায়! মরবে কি না এরাই!

মরতেই হবে। না মরে উপায় আছে? সংখ্যা মিলবে কী করে? রাত্রে হিসাব করা হয় আজ কলকাতা শহরে ক'জন হিন্দু আর ক'জন মুসলমান নিকাশ চলো। হিসাবে হিন্দু কম ও মুসলমান বেশী হলে পরের দিন হিন্দু বেশী ও মুসলমান কম মারা চাই। বাঁদরের পিঠেভাগের মতো দুই পাল্লা সমান রাখতে প্রাণান্ত। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা অজানা লোক হঠাৎ কোন্‌খান থেকে বেরিয়ে এসে ধাঁ করে আর একটি অজানা লোকের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কেন? আগে থেকে শত্রুতা আছে? না, শত্রুতা নেই। তবে কিসের জন্যে এ আক্রমণ? অর্থের জন্যে? না, তাও নয়। হিসাব মেলাতে হবে। হিন্দুর বদলে হিন্দু। মুসলমানের বদলে মুসলমান। চোখের বদলে চোখ। দাঁতের বদলে দাঁত। আজ যদি সাতটি হিন্দু কম পড়ে কাল তাকে মারতেই হবে, নাই বা থাকল তার কোন দোষ। তেমনি কাল যদি পাঁচটি মুসলমান কম পড়ে তবে পরশু যেমন করে হোক পূরণ করতেই হবে, নয়তো মান থাকে না, মারণের খেলায় হার হয়।

কাজটা যে গর্হিত সকলেই তা জানে। তবু বিবেককে এই বলে বুঝ দেয় যে, ওকে না মারলে ও-ই হয়তো একদিন মারত। কিন্তু ও যে গরিব ফেরিওয়ালা! রেখে দিন, মশায়, গরিব ফেরিওয়ালা। সাপ, সাপ, সাক্ষাৎ কালসাপ। সাপের শেষ রাখতে নেই। সাপের সঙ্গে বাস করা যায় না। সুযোগ পেলেই কাটবে। এ পাড়াকে আমরা সাপের কামড় থেকে বাঁচাতে চাই। তাই একঘার থেকে সাপের বংশ সাফ করে আনছি। বাধা যদি দেন তো আপনাকেও—। আমি পিটটান দিই।

মেসোমশায় দিন কতক পরে প্রকৃতিস্থ হন। কথা বেশী বলেন না। মৌন থাকেন। কী যেন ধ্যান করছেন। একদিন আমাকে পাশে বসিয়ে বলেন, "প্রেমের বড় অভাব।"

আমি তাঁকে বলতে দিই। বাক্যক্ষেপ করিনে।

"আমি যেন দেউলে হয়ে গেছি। ভালোবাসতে চাই। ভালোবাসতে পারছিনে। কোনো মতে ঘৃণাকে ঠেকিয়ে রাখছি। ক্রোধকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিনে। আকণ্ঠির মতো আমিও আলের বাঁধ বাঁধছি। কিছুতেই আল বাঁধতে না পেরে শুয়ে পড়ে শরীর দিয়ে ছিদ্র নিরোধ করছি। জলের তোড়ে ভেসে যাইনি এখনো। প্রাণপণে স্থির থাকছি।" বলতে বলতে তিনি থেমে ওঠেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে বটে।

তাঁর অন্তরে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল। দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। ঘৃণাসুরের সঙ্গে, ক্রোধাসুরের সঙ্গে প্রেমদেবতার দ্বন্দ্ব, কল্যাণ দেবতার দ্বন্দ্ব। বাইরে যেমন হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধে নিরীহ শিকার কম পড়ছিল, অন্তরে তেমনি প্রেম কম পড়ছিল, কল্যাণ কম পড়ছিল। বাইরে কম পড়লে পুষিয়ে দেবার উপায় ছিল। অন্তরে কিন্তু তেমন নয়। প্রেমের বড় অভাব। প্রেম পারছে না অপ্রেমের সঙ্গে পাল্লা সমান রাখতে। প্রেম হেরে যাচ্ছে।

অন্তর অন্বেষণ করে দেখি আমিও তেমনি ছেঁউলে হয়ে গেছি। আমি কাপুরুষ। নিরীহ শিকারকে বাঁচাতে যাইনে, পাছে শিকারীদের কোপে পড়ে প্রাণ হারাই। মরব কী করে? আমার হাতে যে অসমাপ্ত কাজ। আধখানা ছবি শেষ করবে কে?

মেসোমশায়কে বলি, "আজকের দিনে প্রেমের মতো বিপজ্জনক আর কী আছে? রাস্তায় বেরোতে হয় আমাকে। চোখ বুজে পথ চলতে পারিনে। যা চোখে পড়ে তা আমার পৌরুষকে লজ্জা দেয়। মনুষ্যত্বকে লজ্জা দেয়। প্রেম আমাকে ঠেলা দিয়ে বলে, লোকটাকে বাঁচাও। ওকে বাঁচানো মানে আপন মনুষ্যত্বকে বাঁচানো, পৌরুষকে বাঁচানো। আমি কি তার কথা শুনি! আমি বলি, ওটা পুলিশের কাজ। রাষ্ট্রের কাজ। আমার কাজ ছবি আঁকা।"

বেশ বুঝি যে আমার মনুষ্যত্বে টান পড়ছে, পৌরুষে টান পড়ছে। প্রেমের কথা যদি না শুনি তবে প্রেমেরও অভাব হয়। মেসোমশায়ের মতো আমারও দশা। আমিও ভালোবাসতে চাই। কিন্তু ভালো-বাসতে পারছিনে। কিন্তু অন্য অর্থে। আমার অন্তরের দৈন্য অপ্রেমের সঙ্গে প্রেমের নয়, অক্ষমতার সঙ্গে প্রেমের। কাপুরুষতার সঙ্গে প্রেমের।

এসব সমস্যা সমস্যাই নয় আমার প্রতিবেশী ডক্টর পাকড়াশির কাছে। এই বিদ্বান একদিন আমাকে প্রশ্ন করেন, "ওহে আর্টিস্ট, তুমি তো পড়াশুনাও করেছ শুনেছি। বলতে পারো ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত?"

আহা, কে না জানে যে চল্লিশ কোটি! আমার উত্তর শুনে ভদ্রলোক বললেন, "বেশ। এখন হিন্দুর সংখ্যা কত?"

একটু বিরক্ত হয়ে বলি, "ত্রিশ কোটি।" তা শুনে তিনি খাবার পাত্র নন। জানতে চান মুসলমানের সংখ্যা কত। বলি, "দশ কোটি।"

"তা হলে," ভদ্রলোক অমনি, "এবার বল দেখি দশ কোটি হিন্দু যদি মরে বাকী থাকে কত। আর দশ কোটি মুসলমান যদি মরে কত বাকী থাকে।"

আমি তো চিন্তিত! মাথা চুলকাই। ভদ্রলোক তা দেখে এক গাল হেসে বলেন, "আরে! অত ভাববার কি আছে। ও তো সোজা অঙ্ক। এ-পক্ষে দশ কোটি যদি মরে ষষ্ঠীর কোলে আরোও বিশ কোটি বেঁচে থাকে। আর ও-পক্ষে দশ কোটি যদি মরে একটিও বেঁচে থাকে না। হিন্দুস্থান পাক হয়ে যায়। অবশ্য জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। উপায় নাই। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।"

হাঁ। তিনি একজন পণ্ডিত। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিই যে আরম্ভটা যখন বাংলাদেশে হয়েছে তখন বাঙালীর সংখ্যাই প্রাসঙ্গিক। এ-পক্ষে তিন কোটি আর ও-পক্ষে তিন কোটি যদি মরে তা হলে বাঙালী হিন্দু বলতে একজনও বেঁচে থাকে না, অথচ বাঙালী মুসলমান বলতে বেঁচে থাকে আধ কোটি। তখন তামাম বাংলাদেশটাই পাকিস্তান।

এবারে তিনিই চিন্তিত। আমিও অনেক দুঃখে হাসি। "কেন? এ তো সোজা অঙ্ক। আর ওরাও তো কম পণ্ডিত নয়। অর্ধেক কেন, ছেরো আনা ছাড়তেও রাজী।"

এইসব মাথা খারাপের দল একদিন গায়ের চামড়া বাঁচাবার জন্যে আধখানা দেশ ত্যাগ করবে তা কি তখন আমি কল্পনা করতে পেরেছি। দিল আমাকে এমন এক বিস্ময়ের ধাক্কা যা আমি এখনও

কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এরা মরবেও না, বাঁচবেও না, আধ-মরা আর আধ-বাঁচা হয়ে ত্রিশঙ্কুর মতো ইতিহাসের সূত্রে ঝুলে থাকবে।

মাসিমা ঠাউরেছিলেন এ গোলমাল দু'দিন পরেই থেমে যাবে। মাথার উপর ইংরেজ থাকতে ভাবনা কী! অন্যান্য বারের মতো আমাদের সমঝিয়ে দেবে যে ওরা ভিন্ন আর গতি নেই। সাপুড়ে যেমন সাপকে ডালা থেকে বার করে নাচায়, তারপর আবার ডালায় ভরে তেমনি দাঙ্গাবাজদের খেলতে দিয়ে শ্রীঘরে পুরবে। ইংরেজের উপর যদিও তাঁর ভীষণ রাগ—ইতিমধ্যে তিনি নেতাজীর ভক্ত হয়েছেন—তবু তাঁর অন্তিম ভরসা ওই ইংরেজই। আমাকে বলেন, "ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। তুমি দেখবে, দেখবিশ্ব, একদিন এক চড়ে ঠাণ্ডা করে দেবে। ওরা কি সত্যি যাচ্ছে!"

কে যে ওস্তাদ সে বিষয়ে মতভেদ ছিল। মাসিমার মতে ইংরেজ। আমার সর্বত্যাগী বন্ধু উৎপলের মতে গান্ধীজী। সে বলে, "দেখিস তোরা, দেখিস। আর সবাই যখন ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দেবেন মহাত্মাজী তখন হাল হাতে নেবেন। মিরাকলের দিন যায়নি রে। মিরাকলের দিন আসছে। আজ যাদের দেখা যাচ্ছে খুনোখুনি করতে সেদিন তাদের দেখা যাবে কোলাকুলি করতে।"

অবশ্য বেঁচে থাকলে। উৎপল শুনলে মর্মাহত হবে, তাই মুখ ফুটে বলিনে। আমার নিজের মতে ওস্তাদ যদি কাউকে বলতে হয় তবে জিন্নাকে। বিরোধটা গোড়ায় ছিল জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের। কিন্তু কায়দে আজম আজ এমন বেকায়দায় ফেলেছেন যে জাতীয়তাবাদীদেরও গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে সাম্প্রদায়িক রা। ঠিক যেমনটি ওস্তাদজী চেয়েছেন। কথায় না হোক কাজে তো প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে হিন্দুরা এক নেশন, আর মুসলমানেরা আর এক নেশন। কিংবা নেশন কোনো পক্ষই নয়, দুই পক্ষই সম্প্রদায়। শুধু ইংরেজের সঙ্গে লড়বার সময় ভারতীয়। সে লড়াই তো এখন চুকে গেছে। দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন জবাহরলাল। বড়লাটের যুবরাজ।

একদিন মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন রাজেক হোসেন চৌধুরী। পার্ক সার্কাসে তাঁর প্রতিবেশী। জানতুম না যে একদা তিনি মেসোমশায়ের সহপাঠী ছিলেন। আর ছিলেন স্বদেশীযুগের সহকর্মী। বয়সে কিছু বড়, তাই মেসোমশায় তাঁকে ডাকতেন "রাজেকদা" বলে। রাজেকদা থেকে রাজেনদা। এই নামটাই পরে চল হয়ে যায়। রাজেক হোসেনরা হুগলী জেলার খানদানী বংশ। আচারে ব্যবহারে হাল হিন্দু। তাঁদের বাড়ীতে গোমাংস ঢুকত না। তাঁদের আলাদা একটা অতিথিশালা ছিল হিন্দুদের জন্য। সেখানে বামুন রাঁধত। মেসোমশায়ও সেখানে অতিথি হয়েছেন স্বদেশীযুগে।

বঙ্গভঙ্গের জন্যে রাজেক হোসেনও বিপদ বরণ করেছিলেন। আন্দোলনটা ক্রমেই হিন্দু হয়ে উঠছে দেখে পশ্চাতে সরে যান। বলেন, স্বদেশী মানে কি স্বধর্ম! তাই যদি হয় তবে মুসলমানেরও তো স্বধর্ম আছে। সে কেমন করে অংশ নেবে? তাকে তা হলে স্বতন্ত্র ভাবে লড়তে হয়। ইংরেজের সঙ্গে। কী করে তা সে পারবে যদি বেশীর ভাগ স্বধর্মী উদাসীন হয় কিংবা ইংরেজের পক্ষে দাঁড়ায়? রাজেক হোসেন মনের দুঃখে নির্বাসনে যান। স্বয়ংকৃত নির্বাসন। অনেক দিন পরে আবার তাঁকে নামতে দেখা গেল অসহযোগ তথা খেলাফৎ আন্দোলনে। স্বদেশের সঙ্গে স্বধর্মকে একসূত্রে গেঁথে তিনি তাঁর দেশপ্রেম তথা ধর্মনিষ্ঠা চরিতার্থ করেন। জেলে যান। জেল থেকে ফিরে একটু একটু করে আবার সরে যান পিছনে।

লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগ দেননি। জিজ্ঞাসা করলে বলেছেন,

একসঙ্গে লড়তে হলে একসূত্রে গাঁথতে হয়। তেমন সূত্র কই? লড়তে যে আমার অনিচ্ছা তা নয়। কিন্তু একসঙ্গে লড়া অসম্ভব। যদি কোনোদিন লড়ি তো আলাদা লড়ব। ইংরেজ আমারও শত্রু। আর লড়তে আমিও জানি।

এর বছর সাতেক পরে দেখা গেল তাঁদের দেউড়ির দু'দিকে দণ্ডায়মান দুই সিংহের মূর্তি অপসারিত হয়েছে। ব্রিটিশ সিংহের অপসারণ নয় তো? না। রাজেন হোসেন বলেন, ওটা পৌত্তলিকতা। মুসলমান অতিথিরা আপত্তি করেন। তাঁর চৌধুরী পদবীটিও তিনি বিসর্জন দেন। চৌধুরী সাহেব বলে সম্বোধন করলে তিনি সসঙ্কোচে বলেন, না, না, এই কৃষক আন্দোলনের দিনে ওদের চক্ষুশূল হতে চাইনে। তাঁর সমন্বয়শীল মন এমন একটি সূত্র খুঁজে বার করল যা মোল্লা এবং চাষী মুসলমান উভয়ের গ্রহণযোগ্য। মুসলমানকে তিনি বিভক্ত হতে দেবেন না। জমিদারিও রক্ষা করবেন। কিন্তু অলক্ষে তিনি হিন্দুদের থেকে দূরে সরে গেলেন। ইংরেজের উপর তাঁর রাগ যা ছিল তা জল হয়ে গেল বাংলার মসনদে মুসলমানকে বসাতে দেখে। কিন্তু তখনো তিনি বাঙালী। হাড়ে হাড়ে বাঙালী। জিন্নাকে বলেন, "জিন্" আর পাকিস্তানের নাম দেন "গোরস্থান"। না, হিন্দুর সঙ্গে তিনি লড়বেন না। ভারতবর্ষ ভেঙে খান খান করবেন না।

রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তিনি পার্ক সার্কাসে এসে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মনটা পড়ে থাকে দেশের বাড়ীতে। সেইখানেই ছিলেন তিনি যখন মেসোমশায়রা বিপন্ন হন। নইলে বিপদের দিন ছুটে আসতেন। পাড়ার লোকের তরফ থেকে মাফ চেয়ে বললেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে। আর সে রকম হবে না। অমল, আমি তোকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আমার সঙ্গে ফিরে চল। তুই ফিরে না গেলে অন্যেরা ফিরবে না। তুই ফিরে গেলে অন্যেরা তোর পথাঙ্ক অনুসরণ করবে। তাতেও যদি ফল না হয় আমরা দুই বন্ধু শান্তি মিছিল নিয়ে বেরোব। আমাদের সঙ্গে আর কেউ না আসুক, তুই আর আমি। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে তুই একলা চল রে!' মনে আছে তো রবি ঠাকুরের স্বদেশী গান! সে উদ্দীপনা কি ভোলবার? তা হলে চল সেই উদ্দীপনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। রবিবাবু বেঁচে থাকলেও তাই করতেন। তিনি চলে গিয়ে আমাদের অনাথ করে দিয়ে গেছেন। তিনি থাকলে কি এ রকম ঘটত? চল আমরা এককণ্ঠে গেয়ে গেয়ে বেড়াই, "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান!" তবে মাঝে মাঝে ভগবান কথাটিকে বদলে দিয়ে বলতে হবে হে রহমান!"

কথাগুলি ভালো। মানুষটি ভালো। মেসোমশায়ও ধারার জন্যে ছটফট করছিলেন। কিন্তু মাসিমার আত্মীয়রা তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে আবার বাধবে। যঃ পলায়তি স জীবতি। দেশ ভাগ হোক বা না হোক শহর ভাগ হয়ে যাচ্ছে। লোকে পা দিয়ে ভোট দিয়ে জানাচ্ছে কোন্‌টা কী স্থান। পা কী স্থান চায় এই প্রশ্নে যে গণভোট নেওয়া হচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে পার্ক সার্কাস হবে পাকিস্তান।

"তা হলে বাড়ীটা?" মাসিমা আর্তনাদ করেন।

"বাড়ীটা থাকবে! তবে তার দখলকার কে হবে সেটা গোদার মানুষ।" বলেন তাঁর বড় দাদা গুপীবাবু।

"না।" এ কখনো আইন হতে পারে না। হাইকোর্ট মাথার উপর থাকতে, গভর্ণর মাথার উপর থাকতে আমার বাড়ী থেকে আমি বেদখল হতে পারিনে।" মাসীমা বলেন।

"ও পাড়ায় মুসলমানদেরও তো বেদখল করা হচ্ছে। করছি আমরাই।" গুপীবাবু খোশ মেজাজে বলেন। "ওটা খোদার এলাকা নয়। মা কালীর এলাকা।"

রাজেক হোসেনের প্রস্তাবে মেসোমশায়ের উৎসাহ লক্ষ্য করে মাসীমা গম্ভীর হয়ে যান। ভেবে চিন্তে বলেন, "কথা হচ্ছে কে আমাদের রক্ষা করবে। পুলিশ যে করবে না তা আমি জানি।"

রাজেক হোসেন তা শুনে বলেন, "আমি গ্যারাটি দিচ্ছি।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।" মাসিমা বলেন, "কিন্তু দেশটা আমার, এর মুক্তির জন্যে আমিও যৎকিঞ্চিৎ করেছি, এর কোনোখানেই আমি বিদেশী নই, অনধিকারী নই। কেন তবে আমি আপনার গ্যারাটি নেব? বাড়ী বড় না মর্যাদা বড়?"

ভদ্রলোক অত্যন্ত অপ্রতিভ হলেন। মেসোমশায় বলেন, "রাজেনদা, কিছু মনে কোরো না। আমরা হলুম ঘরপোড়া গোরু। একবার পুড়েছি কি না, তাই ভয় পাই। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার সঙ্গে শান্তির জন্যে বেরোব। কিন্তু এখন নয়।"

ভদ্রলোক বিদায় নিলে মাসিমা বলেন, "ইচ্ছা তো করে নিজের বাড়ীতে গিয়ে আনন্দে থাকতে। কিন্তু যার ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আর বাইরে গুণ্ডার দল তার প্রাণে আনন্দ কোথায়? ওহে দেবপ্রিয়, তোমাদের ওদিকে একটা ফ্ল্যাট খালি থাকে তো নিই। নীলির এখানে আর ভালো লাগছে না।"

তা ছাড়া নীলিদের পাড়াটাও যে খুব নিরাপদ তা নয়। কাছেই মুসলমানের বসতি। আমি বলি, "আমি খোঁজ করে জানাব।"

বাড়ি লোক দুই পক্ষেই আছেন। শহরের অবস্থা তবু খারাপের দিকেই। তাই বেড়ালছানার মতো এই পরিবারের গৃহিণী তাঁর একমাত্র কন্যাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাতে সরাতে চলেছেন। একবারও জানতে চাইছেন না মালার কী মত। আমার কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে।

সেই যে এলাহাবাদে ওর চোখে রহস্যময় ছাতি দেখেছিলুম, প্রেমে পড়ার লক্ষণ, তার পর থেকে আমি ওর সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারিনি। আমারি দুর্বলতা। ও যে কী করে, কী ভাবে তা আমার কাছে এক অজানা রাজ্য। তবে ইদানীং সেই ছাতি নিস্তেজ হয়ে এসেছিল। তাকে কেমন যেন ভাবাকুল দেখায়।

"মালা," আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, "আমাদের পাড়ায় যদি ফ্ল্যাট খুঁজে পাই আর সে ফ্ল্যাট মাসিমার পছন্দ হয় তা হলে কি তুমি খুশি হবে, না পার্ক সার্কাসের জন্যে জেবে জেবে মন খারাপ করবে?"

সে আমার দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন কী একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছি। তার পর বলে, "কোথায় থাকব, কী খাব, কী পরব এসব তো আমার ভাবনা নয়। আমার একমাত্র ভাবনা মুক্তা বরার জন্য আর সোনার শুকপাখী কে আনবে। কবে আনবে। বেশ যে গেল। সেখানে যদি কেউ আনতে পারত তা হলে কি হিরোশিমায় পরমাণু বোমা পড়ত? এবারেও সেই রকম কিছু না হয়।"

পাগল আর কাকে বলে! আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাগলামির লক্ষণ অনুসন্ধান করি। সত্যি, মেয়েদের সময়ে বিয়ে দেওয়া উচিত। না দিলে নানান উপসর্গ দেখা দেয়।

"এই সেই রূপকথার রাজা।" মালা বলে আমাকে হতচকিত করে। "এরই কথা শুনেছি, এরই স্বপ্ন দেখেছি। আমার জন্মান্তরের স্মৃতিতেও এরই ছবি আঁকা। রক্তের নদী হাড়ের পাহাড়। সব

মিলে যাচ্ছে। তা হলে মায়াপাহাড়ই বা না মিলবে কেন? মিলবে, মিলবে। খুঁজতে বেরোলে মায়াপাহাড়ও মিলবে। মিলবে মুক্তা করার জল। সোনার শুকপাখী। আহা, বেচারিরা! পথের ধারে পড়ে পাথর হয়ে গেছে! তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে দাঁড়াতে হবে। তারা যখন ঘরে ফিরে যাবে তাদের মা বোনেরা সুধোবে, কী এনেছ দেখি? তখন তারা বলবে, এই যে এনেছি সোনার শুক। তখন আর কী! তখন সবাই মিলে মনের সুখে বাস করবে।"

মালা বলে যায় কিসের ঘোরে। সে যেন জেগে থেকেও ঘুমিয়ে। সে যেন জাগরণের প্রতি নিদ্রিত, বাস্তবের প্রতি অচেতন। মায়াবাদীরা যেমন বলেন, এই জগৎটা একটা মায়া, একটা স্বপ্ন। এদিকে আমি ভাবছি তার নিরাপত্তার জন্যে বাসার সন্ধানে বেরোব। আর ওদিকে সে কিনা ভাবছে বিপদ মাথায় করে মায়াপাহাড়ের সন্ধানে পা বাড়াবে। এই তার সময় বটে!

মালার ওই সাঙ্কেতিক ভাষা একমাত্র আমিই বুঝি। তার মাও বোঝেন না। কিংবা বোঝেন হয়তো। নইলে সেই দুদিনেও তাকে পাত্রস্থ করার জন্যে অস্থির হতেন না। একদিন আমাকে বলেন, "মানুষের জীবন এমনিতেই অনিশ্চিত। এখন তো আরো। আমাদের যদি হঠাৎ কিছু হয় তা হলে অন্তত এইটুকুন আশ্বাস থাকবে যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেছি। আমি আর অপেক্ষা করতে চাইনে, দেবব্রত।"

"তা হলে পাত্র পাওয়া গেছে, মাসিমা! খুব—খুব সুখবর।" আমি বলি সকপটে।

"পাকাপাকি হয়নি। কথাটা গোপন রাখতেই হবে। তবে তুমি হলে আমাদের আপনার লোক। তোমার কাছে ভাঙতে পারি।" তিনি অকপটে বলেন।

কুমুদিনী বসু মাসিমার এক সই আছেন। সেই বাল্যকালে ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছেন। তাঁর আছে এক গুণবান ছেলে। সোমনাথ বিলেতে সাত বছর কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছে। কিন্তু থাকবার জন্যে নয়। ব্রিস্টলের কাছে সে প্যানেল কিনে ডাক্তারি করছে। এরই মধ্যে বাড়া করেছে। এখন তার অভাব বলতে আর কিছু না। একটি বৌ। ছেলেটি মাতৃগতপ্রাণ। মা যাকে পছন্দ করবেন তাকেই সে বিয়ে করবে। বিয়ে করে বিলেত নিয়ে যাবে।

মালার সইমা মালাকেই পছন্দ করেছেন। সোমনাথেরও মালাকে মনে ধরেছে। মাসিমা কিন্তু মনঃস্থির করতে পারছেন না। তাঁর একমাত্র সন্তান যাবে সাত সমুদ্র পারে। তাও এক আধ বছরের জন্যে নয়। কে জানে কত কাল সোমনাথ ও-দেশে প্র্যাকটিস করবে! মেয়েকে অমন করে দেশান্তরী করতে মায়ের মন সায় দিচ্ছে না। মেসোমশাইকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "মালা যদি সুখী হয় আমরা কি অসুখী হতে পারি!"

মালাকে বলতে সে "হাঁ"-ও বলে না। "না"-ও বলে না। একেবারে নির্বাক। তার মানে সে ভাবতে চায়। ভাবতে সময় লাগবারই কথা। বাপ মাকে ছেড়ে দেশ ছেড়ে সাত হাজার মাইল দূরে গিয়ে ঘর বাঁধা। অত কাল থাকা। রাজী হওয়া কি সোজা কথা! অপর পক্ষে অমন একটি সুপাত্র না চাইতেই হাতের মুঠোয় এসে হাজির। হাতছাড়া করতে কোন্ মেয়ে রাজী হবে। ভাবুক। মালা ভাবুক। মাসিমাও ভেবে দেখুন। তবে সোমনাথ এই নভেম্বরেই রওনা হচ্ছে। ওদিকে তার পেসেন্টরা ইম্‌পেসেন্ট। ডাক্তারের কি ছুটি নেবার জো আছে? অঘ্রাণের প্রথম লগ্নেই সে যাকে হয় একজনকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। মালার জন্যে বসে থাকবে না।

বাস্তবিক এমন একটি দাঁও পেলে আমিও ছাড়তুম বলে মনে হয় না। নিখরচায় বিলেত বাস!

আহা, সোমনাথটা যদি সোমলতা হতো, লেডী ডাক্তার হতো, তা হলে আমি আজকেই প্রার্থনা জানিয়ে রাখতুম! যদিও তাকে চোখে দেখিনি।

জাহাজের নামগুলো আমার মুখস্থ। সমুদ্র যাত্রার কল্পনায় আমি চঞ্চল হয়ে উঠি। "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

কিন্তু মালার ভাবনা মাসিমা যা মনে করেছেন তা নয়। আমি তাঁর কন্যাকে তাঁর চেয়েও ভালো চিনি। রূপকথার রাজপুত্র কবে আসবে তারই জন্যে সে অপেক্ষা করবে। আর কারো গলায় মালা দেবে না। না, বিয়ের জন্যে সে ভাবিত নয়। তার ভাবনা মুক্তা বরার জলের জন্যে। সোনার শুকপাখীর জন্যে। অরুণ বরুণ তো নেই। কে যাবে ওসব আনতে? অগত্যা কিরণমালাকেই যেতে হয়।

তা বলে এই তার সময়! আমি আঁতকে উঠি। রোজ বাড়ী থেকে যখন বেরোই অক্ষত শরীরে ফিরব যে তেমন নিশ্চয়তা নিয়ে বেরোতে পারিনে। ফিরি যখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। অন্তত একটা দিন তো বেঁচে থাকা গেল। এই যেখানকার অবস্থা সেখানে নারীর স্থান কি অন্তঃপুরে নয়? বাইরে পা বাড়ালে কি রক্ষা আছে। কে কখন লুট করে নিয়ে লুকিয়ে রাখবে। পুলিশ তো খুঁজতে যাবে না। উদ্ধার করবে কে? কত রকম গল্প যে শুনি। কোন একটা গলিতে নাকি অনেকগুলি হিন্দুর মেয়েকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। গুণ্ডারা রাতভর তাদের উপর অত্যাচার করে। উঃ! রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

না। মালাকে মায়াপাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করতে দেওয়া যায় না। ভূগোলে তেমন কোনো উল্লেখ নেই। মানচিত্রে তার চিহ্ন নেই। কী একটা আজগুবি কল্পনা। তার জন্যে একটি নিষ্পাপ মেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবে! আমি থাকতে! যদি আমার কিছুমাত্র হাত থাকে! সেইজন্যেই আমি আমার পাড়ায় মাসিমার কথামতো বাসা খুঁজি। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও যাই।

"আপনাদের অসুবিধে হবে, মাসিমা। সব ভালো, কিন্তু বাথরুমটা বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদী।' আমি জুড়ে দিই, "তা হলেও আমি সুপারিশ করি। নির্ভয়ে বাস করবেন। আর ক্রমশ স্বরাজের জন্যে প্রস্তুত হবেন। ইংরেজ চলে গেলে দেখবেন রেলগাড়ীর বাথরুমও স্বাধীনতাবাদী করা হবে। গভর্নমেণ্ট হাউসের বাথরুমও।"

মাসিমার মুখ শুকিয়ে যায়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। তিনি বলেন, "আচ্ছা, মিস্ত্রি ডাকিয়ে যথাবিহিত করিয়ে নেব।"

বাসা পাওয়া গেছে শুনে মেসোমশায় বলেন মাসিমাকে, "রেঙ্গুন থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে পার্ক সার্কাস। পার্ক সার্কস থেকে ভবানীপুর। আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী!" তাঁর কণ্ঠস্বরে কাতরতা।

মাসিমা আমার সামনে লজ্জা পান। শরমে সিন্দুর হয়ে বলেন, "তা বলে রেঙ্গুনের মতো দূরে নয়। তুমি আমাকে নিয়ে গেছলে যেখানে।"

মেসোমশায় কিছুক্ষণ নীরব থেকে আমার দিকে তাকান। বলেন, "দেবপ্রিয়, তোমার মাসিমাকে বোঝাই কেমন করে যে, রেঙ্গুন আমার পক্ষে দূর নয়। বরং ভবানীপুরই আমার সুদূর। রেঙ্গুনে ছিল আমার জীবনের কাজ, আমার যৌবনের কাজ। ভবানীপুরে আমার কাজ নেই। নিছক টিকে থাকাটা তো একটা কাজ নয়।"

"তা বলে তুমি এই রাইট ষ্ট্রীটেই পড়ে থাকবে নাকি? বন্ধুবান্ধবের অতিথি হয়ে চিরকাল থাকবে? তা কি হয়!" মাসিমা অনুযোগ করেন।

"না। এখানে পড়ে থাকব কেন? ওই তো রাজেনদা রয়েছে ওখানে। ও যদি থাকতে পারে আমি কেন পারব না? ওদার কাছে পরাজয় মেনে নেওয়া কি পুরুষত্ব? একটা বন্দুকও তো আছে বাড়ীতে। একেবারে নিরস্ত্র তো নই।" মেসোমশায় খাড়া হয়ে বসলেন।

"হয়েছে, হয়েছে তোমার বীরপনা!" মাসিমা স্নেহের সঙ্গে বলেন, "এখনো কি বুঝতে পারনি যে ওরা যাকে বলছ সে-ই রাজা? রাজেন হোসেন হলেন রাজার জাত। তাঁর ভাবনা কিসের?" তার পর সংশোধন করে বলেন, "হাঁ, তাঁকেও একটু ভাবতে হয় বইকি, যদি কালীঘাটে থাকতে যান। নরবলি ইংরেজরা বন্ধ করে দিয়েছিল। শুনছি দু' এক জায়গায় ইংরেজ থাকতেই—"

মেসোমশায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন। মনে হলো আবার অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন। "গেল! গেল। সর্বস্ব গেল! এর পরে কে আমাদের সভ্যজাতি বলে স্বীকার করবে! ইংরেজ তো বুক ফুলিয়ে বেড়াবেই। সে-ই শ্রেষ্ঠ। সে নরবলি বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের সে গায়ের জোরে হারিয়ে দিক আর না দিক, ন্যায়ের জোরে হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা জয়ের যোগ্য নই। স্বাধীনতার যুদ্ধে জয় আমাদের হবে না।"

মালা সেখানে ছিল না। ছুটে এসে জানতে চায় কী ব্যাপার। মাসিমা লজ্জিত হয়েছিলেন। উঠে যান। আমি গোপন করি।

মেসোমশায় পাগলের মতো বলতে থাকেন, "ইংরেজকে হারাতে হলে তার চেয়েও মহৎ হতে হয়, উদার হ'তে হয়। সে যেদিন স্বীকার করবে যে আমরাই বড় সেইদিন আমাদের জয়। কিন্তু এর পরে আর সে কথা উঠতেই পারে না। আমরা হেরে গেছি।"

মালা তার বাপের ভার নেয়। এই মানুষকে ফেলে সে কোন মায়াপাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করবে! ওদিকে মাসিমারও ভবানীপুর যাত্রা স্থগিত রইল।

টোগো আমার মুখে বিবরণ শুনে দুঃখিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বলে, "ভালোই হলো আমার ইচ্ছা নয় যে ওঁরা চলে যান। ওঁরা আছেন বলে আমিও তো কতকটা সাহস পাচ্ছি। আর নীলিমাও তো দিনের বেলা নিঃসঙ্গ বোধ করছে না। আমি বলি, তোমার ওই ভবানীপুরের বাসায় গিয়ে কাজ নেই। ওটা তুমি বাতিল কর।"

বাসাটা বেহাত হলো। আমার মনের কোণে যে লুকোনো সাধ ছিল মালা আমার প্রতিবেশিনী হবে সে সাধ অপূর্ণ রইল। আমারি দুর্ভাগ্য!

মেসোমশায় অবশ্য আবার প্রকৃতিস্থ হলেন। কিন্তু আঘাতের চিহ্ন থেকে গেল তার মুখভাবে। হোরার আঘাতই কি একমাত্র আঘাত, না গভীরতর আঘাত। দেশের উপর বিশ্বাস টলেছে, দেশের নিয়তির উপরে, এইখানেই তো ট্রাজেডী। মানুষ যদি অধঃপাতে যায়, সেইসব কদাচার যদি ফিরে আসে, আবার যদি নরবলি ও সতীদাহ চলে, আবার সেই তান্ত্রিক অত্যাচার, তবে স্বাধীন হয়েই বা কোন্ কীর্তি স্থাপন করব আমরা!

"আমার ভারতবর্ষকে আমি হারিয়ে ফেলছি," মেসোমশায় বলেন বিষাদস্বরে। "বেদনার জগদ্দল পাথর চেপে আছে বুকের উপর। কেন এমন হলো? হিন্দু মুসলমান কি ভাই ভাই নয়? ভাই যদি না হবে

তো তৃতীয় পক্ষকে কেন এতদিন ঠেকে দিয়ে এসেছি যে, সে আমাদের বিভক্ত করতে চায়? আমরা যদি এক পাড়ায় থাকতে না পারি তবে এক শহরে থাকব কী করে? যদি এক শহরে থাকতে ভয় পাই তবে এক দেশে থাকব কী করে? তা হলে তো দেশ এক হতে পারে না। দুই কলকাতার মতো দুই বাংলা, দুই ভারত। তাদের ভারতকে যদি তারা পাকিস্তান নাম দেয় আমরা বলবার কে?"

মেসোমশায় জেদ ধরলেন যে পার্ক সার্কাসে তিনি একাই ফিরে যাবেন ভারতবর্ষের উপর বিশ্বাস প্রমাণ করতে। বাসিমা তাঁকে একটা ঘরে বন্ধ করে রটিয়ে দিলেন যে তাঁর মাথা খারাপ। মালা তা সত্য ভেবে মন খারাপ করে।

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ শোনা যায়, "ইতিহাস, তুমি বড় নিষ্ঠুর। তুমি বড়ই নিষ্ঠুর। তুমি আমাদের ইচ্ছাপূরণের নিমিত্ত নও। আমরাই তোমার ইচ্ছাপূরণের নিমিত্ত। তা হলে আমাদের কর্তৃত্ব কোথায়? স্বাধীন ইচ্ছা কি কথার কথা? আমার যদি হাত না থাকে তো আমি আছি কেন? আমি আছি কেন?

আমি আছি কেন? আমিও প্রশ্ন করি। আছি ছবি আঁকতে। এ যদি সত্যতা না হয়ে অসত্যতা হয়ে থাকে তবু এর ছবি আঁকতে হবে। কিন্তু পারিনে। এ যে বড় নিষ্ঠুর!

আট

প্রকৃতির রাজ্যে আকস্মিক বলে কিছু আছে কি? ঝড় বল, বন্যা বল, ভূমিকম্প বল, দাবানল বল, কিছুই আকস্মিক নয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তার প্রস্তুতি চলে। আমরা কেউ তার খবর রাখিনে, তাই বিপর্যয় ঘটলেই বলি আকস্মিক।

তেমনি ইতিহাসের জগতেও। দশকের পর দশক, শতকের পর শতক, তার প্রস্তুতি চলেছে। কারো দৃষ্টি অত দূর যায়নি। সেই ঘটে গেল নোয়াখালীর হাঙ্গামা অমনি আমরা তার আকস্মিকতায় অভিভূত হলুম। আরো অনেকের মতো আমারও হলো বুদ্ধিভ্রংশ। আমি আমার ইংরেজ বন্ধুদের যাকে দেখি তাকে বলি, "সৈন্য পাঠাও! আজকেই! এই মুহূর্তে সৈন্য পাঠাতে হবে। নইলে জনগণ ক্ষমা করবে না। আইন যে যার নিজের হাতে নেবে।"

সৈন্য পাঠালে মুসলিম লীগ ক্ষমা করত না। শেষ পর্যন্ত গেল কিছু সৈন্য, কিন্তু বিস্তর গড়িমসির পর। ততদিনে বিহারের জনতা ক্ষেপে গিয়ে গিয়ে পাল্টা হাঙ্গামা বাধিয়েছে। সে আরো বীভৎস। আমার অশুভ বাঞ্ছা যে অমন করে ফলে যাবে তা কি আমি জানতুম! মর্মে আঘাত পেলুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুশিও হলুম। দেখলে তো। সৈন্য না পাঠানোর কী পরিণাম।

তখন ভেবে দেখিনি, ভাববার সময় ছিল না, সৈন্য পাঠানোর কী পরিণাম। গান্ধীজীর কল্যাণময় প্রয়াস গোড়ার দিকে যেমন কাজ দিচ্ছিল সৈন্য গিয়ে পড়ার পর আর তেমন দিল না। লোকে ধরে নিল যে গান্ধী আছেন বলেই সৈন্য আছে। হিন্দুরা বলতে লাগল, গান্ধীজীর থাকা চাই, তিনি থাকলে সৈন্যও থাকবে। মুসলমানরা বলতে লাগল, গান্ধীজী চলে যান, তিনি চলে গেলে সৈন্যও চলে যাবে। হিংসা অহিংসা দুই এক সঙ্গে কাজ করলে অহিংসার ক্রিয়া ব্যাহত হয়। গান্ধীজীর গতি রুদ্ধ হলো। ভক্তরাই বলতে আরম্ভ করলেন, অহিংসা ব্যর্থ হয়েছে। অতএব অন্য উপায় দেখা যাক। দেশ ভাগ না করা ছাড়া উপায় নেই।

থাক, এসব পরের কথা। আগে ক হলো বলি। নোয়াখালীর বৃত্তান্ত শুনেই গান্ধীজী সেখানে রওনা হন। তিনি করবেন অথবা মরবেন। অলক্ত আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে করবার কী আর আছে? নিশ্চিত মরণের মুখে যাত্রা। কে জানে কোন্ দিন খবর আসে ওঁর হয়ে গেছে। তখন সারা ভারত জুড়ে বইবে রক্তের নদী। জমে উঠবে হাড়ের পাহাড়। মালার রূপকথা সত্য হবে! কী সর্বনাশ!

মালার মনেও সেই আশঙ্কা। শুধু আশঙ্কা নয়, অস্থিরতা। সে বলে, সেও যেতে চায় নোয়াখালী। তা শুনে তার মা তাকে নজরবন্দী করেন। তার বাবাকে বলা হয় না। পাছে তিনি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যান।

এমন সময় মনোরমা কওল বলে এলাহাবাদের সেই মেয়েটির আবির্ভাব। ইতিমধ্যে তার বিয়ে হয়ে গেছে। মনোরমা কওল এখন মনোরমা হাকসার। স্বামীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সেও যাচ্ছে নোয়াখালী। সুখে সংসার করার সময় নয় এটা। ভারতের নারীত্বের প্রতি নোয়াখালী একটা চ্যালেঞ্জ! এ চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করেছে। দ্রৌপদীর মতো সে কেশ বাঁধবে না। যতদিন না নোয়াখালীর অন্যায়ের প্রতিকার হয়।

মালাকে এবার ঠেকায় কে? আবার তার অঙ্গে শালোয়ার কামিজ ওঠে। অনুমতি না নিয়ে সে তৈরী হতে থাকে। মালা যেতে উদ্যত দেখে মাসিমা মনে মনে বিরূপ। অথচ মুখ ফুটে বারণও করতে পারেন না। মনোরমাও তো তাঁরই মেয়ের মতো আর একটি মায়ের মেয়ে। তাঁর আর একটি মেয়ে। কতদূর থেকে ছুটে সে এসেছে, কতদূর সে ছুটে যাচ্ছে ভারতনারীর সম্মান রক্ষা করতে। সে যদি যায় তবে মালারও যাওয়া উচিত। অথচ বিবাহযোগ্যা কুমারীর পক্ষে নোয়াখালীযাত্রা যেমন ভয়াবহ তেমনি ভয়ংকর। তা ছাড়া সোমনাথ ছেলেটি তো তার জন্যে সবুর করবে না।

তিনি যেসোমশায়ের শরণাপন্ন হন। বলেন, "মানি দেশের প্রতি কর্তব্য আছে। তা বলে এক মাত্র সন্তানের অমঙ্গল ডেকে আনতে পারিনে। এখন তুমি যদি ওকে একটু বোঝাও।"

উল্টো ফল হয়। যেসোমশায় বলেন, "আমিও যাব।"

"সে কী! তুমি কী করতে যাবে!" মাসিমা যেন আকাশ থেকে পড়েন।

"গান্ধী কী করতে যাচ্ছেন? এই সাতাত্তর বৎসর বয়সে! আমি তো অত বুড়ো হইনি। আমিও যাব।" যেসোমশায় অনড়।

"গান্ধী কী করতে যাচ্ছেন? মাসিমা ভাবনায় পড়েন। "গান্ধী হলেন দেশের নেতা। দেশকে অহিংস নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। এখন যদি না দিতে পারেন তবে অহিংসাও গেল। কাজ কী তা হলে ওঁর বেঁচে থেকে? সেইজন্যেই ওঁর পণ—করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে। ওঁর কাছে এটা জীবন মরণ সমস্যা। সমাধান ওঁকে করতেই হবে। নইলে ওঁর জীবন বৃথা।"

"আমারও।" সংক্ষেপে বলেন যেসোমশায়। তার পর বিস্তর করেন। ভদ্রস্থ ভাবে। "এতদিন আমি চিন্তাশূন্য ছিলুম। আমরা কি নিমিত্ত মাত্র? ইতিহাসই কর্তা? ইতিহাসের উপর আমাদের হাত থাকে না। গান্ধী উত্তর দিচ্ছেন—তা নয়। আমরাই চালক। মরণ পণ করে আমরাই ইতিহাসের রথ চালাব, চাকা ঘোরাব। মরে গিয়েও ঠেলা দিয়ে যাব। ইতিহাস সৃষ্টি করব। নিমিত্তমাত্র হয়ে বাঁচতে কে চায়।"

যেসোমশায়ের পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না নোয়াখালী গিয়ে তিনি কীভাবে চাকা

যোয়াবেন। কিছু একটা যে করা উচিত তা তো আমরা সকলেই বুঝতে পারছিলুম, কিন্তু কি সেটা? কার দায়িত্ব সেটা? কার করণীয় সেটা? এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। এই যেমন আমার মতে সৈন্য পাঠানো। ইংরেজদের দায়িত্ব। বড়লাটের করণীয়। গান্ধীজীর মত কিন্তু বিপরীত।

মেসোমশায় কি সহজে নিরস্ত হন? ডাক্তারকে দিয়ে চেকআপ করাতে হলো। হাই ব্লাড প্রেসার। কিন্তু মালাকে তিনি নিবৃত্ত করেন না। বলেন, "মনোরমা যখন যাচ্ছে তখন মালাও ইচ্ছা করলে যেতে পারে। যদি করবার কিছু না থাকে ফিরে আসতে পারে। এই সঙ্কটে আমাদের প্রত্যেকের বিবেকের স্বাধীনতা আছে। মালারও। তার বিবেক যদি তাতে স্থির থাকতে না দেয় তবে তাকে বিপদের মুখে যেতে দেওয়াই নিরাপদ।"

বাসিষা কি মেনে নিতে পারেন? আমার উপর ভার যেন মনোরমাকে বোঝাতে। কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি মনোরমা বুঝলে মালাও বুঝবে।

মনোরমা হলো সাক্ষাৎ আগুন। শুনেছি সেই আগষ্ট আন্দোলনের সময় আগুন নিয়ে খেলেছে। কিন্তু আগুনে হাত পোড়ায়নি। সমানে পড়াশুনাও চালিয়েছে। ওস্তাদ মেয়ে।

"মিসেস হাকসার," একটু ভয়ে ভয়ে বলি, "আপনি যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী। নিশ্চয় এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে নোয়াখালীতে যা ঘটেছে তা দ্বিতীয় এক আগষ্ট আন্দোলনের ঢের। এর পিছনেও মাথা আছে। যা ঘটেছে তা আগে মানুষের মাথায় এসেছে। এটা হলো এক ভাতের খেলা। তাস খেলা। এ খেলায় ও-পক্ষের হাতে একখানা তাস বেশী আছে। নোয়াখালীতে সেটা ওরা খেলেছে। আমাদের হাতে সে তাস নেই। থাকলেও আমরা ঘৃণা করতুম খেলতে। এই হলো সমস্যা। এর সমাধান যদি আপনার জানা থাকে তবে নোয়াখালী অবশ্যই যাবেন। নয়তো গিয়ে শয়তানদের কবলে পড়বেন। তখন—" আমি আরো ভয়ে ভয়ে বলি, "অক্ষত থাকতে পারবেন কি?"

"কী!" মনোরমা আগুনের মতো লাল হয়ে যায়। মারতে আসে না এই ভাগ্যি। "আপনার মনটা অতি মূঢ়, নীচ আর কদর্য। কোন্ মুখে আপনি ও কথা উচ্চারণ করতে পারলেন! ছি ছি। বেশ তো, এতই যখন আপনার সন্দেহ, তখন চলুন না আপনিও আমাদের সঙ্গে। আমাদের পাহারা দিতে। রক্ষা করতে। কেমন? সাহস আছে?"

আমি চমকে উঠি। বলে কী! আমি যাব ওই মগের মুলুকে! খালি হাতে। অন্তরে প্রেম থাকলে গান্ধীজীর মতো অকুতোভয়ে আততায়ীর সম্মুখে দাঁড়াতুম। প্রেমই আমার অস্ত্র। তা তো নয়। অকথ্য ক্রোধে আমি ধন্ত হচ্ছি। আর "সৈন্য" "সৈন্য" বলে চেঁচাচ্ছি।

সে যা একখানা সীন সৃষ্টি করে। আমারি উপর যত ঘৃণা আর অবজ্ঞা আর রাগ আর জ্বালা। যেন আমিই নোয়াখালীর নারীধর্ষক বাঘ। আমাকেই আসামীর মতো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। বলতে হয়, "যাচ্ছি, মাফ কীজিয়ে।"

সে কি থামতে চায়। বলে যায়, "আমরা মেয়েরা কী করতে নোয়াখালী যাচ্ছি? আমরা কি জানিনে কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছি? রাষ্ট্র যেখানে নারীর শত্রু। স্বামীর কাছে আমার কোলের ছেলেকে রেখে এসেছি আমি, কারো কথায় কান দিইনি। সে কি সামান্য কারণে? না, ভাইজী। একটি নারীর অপমানে সব নারীর অপমান। আমারও অপমান। আর এ তো একটিমাত্র নারী নয়, শত শত নারী। এদের আকুল ডাক যদি আমি না শুনি আমার আকুল ডাক কে শুনবে, যদি আমার কপালেও

সে রকম কিছু ঘটে। না, না। বলা যায় না। ইংরেজের রাজত্ব শেষ হয়ে আসছে, তাই যেখানে যত উচ্চাভিলাষী আছে মাথা তুলছে। নারীও তাদের কাছে রাজ্যজয়ের প্রতীক।"

আমিও সেই কথা বলি। এ সাধারণ নারীহরণ নয়। এ হলো যুদ্ধজয়।

"তা হলে," মনোরমা যোগ করে, "আমাদের কাজ হবে অনুতোভয়ে এগিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকটি অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করতে হবে। উদ্ধার করে ঘরে ফিরিয়ে দিতে হবে। ঘরের লোক হয়তো বলবে, যার সতীত্ব গেছে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে কী হবে? অশুচি পাত্রকি রান্নার কাজে লাগে? ওদের বোঝাতে হবে, ধর্ষিতাদেরও বোঝাতে হবে যে, দেহ কোনো অবস্থাতেই অশুচি হতে পারে না, যেমন আগুন কোনো অবস্থাতেই অশুচি হয় না। আত্মার বেলা যা সত্য দেহের বেলাও তাই। হিন্দু সমাজের দোষ হচ্ছে সতী অসতী দুই তার চোখে অশুচ, যদি সতীর গায়ে রাক্ষসের ছোঁয়া লাগে। গান্ধীজী আবার প্রতিরোধ করতে গিয়ে মরণের বিধান দিচ্ছেন। মরে গেলে অবশ্য সমাজের সুবিধা হয়। আমি কিন্তু সমাজকে অসুবিধায় ফেলতে চাই। তাকে তার ভ্রান্ত সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। নইলে বারো মাস তয়ে তয়ে বাস করতে হবে। কে কখন গায়ে হাত দেয়!"

আমি বুঝতে পারি যে এটাও একটা জীবন মরণ সমস্যা। মেয়েদের কাছে। তাই মনোরমার কথা মেনে নিই। মালাকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা, তবু মাসিমার তুষ্টির জন্যে সরাসরি তার কাছে যাই। বলি, "মনোরমা যাচ্ছে, যাক। তুমি নাই বা গেলে, মালা। তোমার বাবার হাই ব্লাড প্রেসার। তোমার জন্যে ভেবে ভেবে তোমার মাও অসুখ না বাধিয়ে বসেন। এমনিতেই তো বাড়ীর কথা ভেবে ভেবে অসুখী।"

মালা চিবুকে হাত রেখে চিন্তাকুলভাবে বলে, "তাঁদের জন্যেই তো এতদিন কোথাও বেরোইনি। জীবনে আমার নিজেরও তো একটা কাজ থাকতে পারে, যার জন্যে আমার জন্ম। অরুণ বরুণ তো যাবে না, আমিও যদি না যাই মুক্তা বরার জল কে আনবে? দিন দিন আরো জরুরি হয়ে উঠেছে। মনোরমা না গেলেও আমি যেতুম। ওর যাওয়া নোয়াখালী পর্যন্ত। আমার যাওয়া নোয়াখালী ছাড়িয়ে। কে জানে কোন্ অচিন ঠিকানায়। নোয়াখালী আমার পথে পড়ে।"

আমার অন্তরে মোচড় লাগে। আবেগে কণ্ঠরোধ হয়। নইলে আমিও হয়তো উচ্ছ্বাসের ঠেলায় বলে বসতুম, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব, মালা। যতদূর তুমি যাবে।"

না। আমার কাজ নয় মায়াপাহাড়ের অভিমুখে যাওয়া। মায়াপাহাড়ের অস্তিত্বই আমি মানিনে। আমি অতিবাস্তববাদী। অবাস্তববাদী নই। আর যা নিয়ে আমি আছি তা কম জরুরী নয়। তুলি দিয়ে আমি সৌন্দর্য জয় করে আনছি সব মানুষের জন্যে। কোন্ রাজ্য থেকে জয় করে আনছি সে আমিই শুধু জানি। সেখানে আর কারো প্রবেশ নেই। আমিও একজন রাজপুত্র। আমার তুলি আমার অসি। কেউ যদি মনে করে এটা অকাজ তবে আমি বলব, আজকের সব কাজ যখন বাসি হয়ে যাবে তখন আমার ছবিগুলি তাজা থাকবে। অন্তত এই বিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে আছি।

মালা বলে করুণ সুরে, "বাবাকে যা দেখবেন, মাকে বাবা। আমি যদি বিয়ে করে বিলেত যেতুম তা হলেও তো তাঁদের ছাড়তে হতো, তাঁরা আমাকে ছেড়ে থাকতেন। ভেবে ভেবে মন খারাপ করা বা শরীর খারাপ করা যে ভালো নয় এ কথা তাঁদের বোঝানোর জন্যে আপনারা রইলেন। আমি যেখানেই যাই না কেন চিঠি লিখব। বিপদে যদি পড়ি খবরটা কেউ না কেউ দেবে। কেনই বা পড়ব? সবাইকে যে বাঁচাতে যাচ্ছে কেউ কি তাকে মারতে পারে? না, কেউ আমার পর নয়।"

232567

আমি হাল ছেড়ে দিই। মাসিমাকে বলি, "ওরা থাকেই।"

তার পরে আর কী? একদিন মনোরমা আর মালা শেয়ালদা ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে বসে। আমরা যারা তাদের তুলে দিতে গেছলুম রুমাল নাড়ি আর কলার গুঁড়োর জ্বালায় চোখ মুছি। মাসিমা যাননি। মেসোমশায় যাননি। তাঁরা কাতর।

মেসোমশায়কে যাই সহানুভূতি জানাতে। তিনি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, "জানো হয়তো, প্রাচীনকাল থেকে একটা প্রবিবাক্যের প্রচলন আছে। মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন। মিথিলায় যখন আগুন লাগে আর জনক রাজার প্রাসাদে আগুন ধরে তখন আত্মস্থ হয়ে তিনি উচ্চারণ করেন, আমার কিছু পুড়ছে না। অর্থাৎ আমার সত্যিকার সম্পদ তো বাইরে নয় যে পুড়বে। হায়! ও কথা আমি বলতে পারছি কই! আমার ঘরে আগুন ধরেছে। আমার যা পুড়ছে তা অকিঞ্চিৎকর নয়।"

আমার বুঝতে বাকী ছিল না যে মেসোমশায়ের নোয়াখালী যেতে চাওয়ার মূলে ছিল মালাকে সাহায্য করার জন্যে তার কাছে কাছে থাকার অভিপ্রায়। বাবা তাকে যেওয়া যেত না, দিলে অন্যায় হতো। সেও যেত, তিনিও যেতেন। তা তো হবার নয়। তিনি কেবল মেয়ের কথাই ভাবছেন আর মন খারাপ করছেন। নোয়াখালী ভীষণ ঠাঁই। কী যে আবার ঘটে কে জানে! তিনি থাকলে তবু যা হয় একটা কিনারা করতেন।

আমি বলি, "মেসোমশায় মিথিলায় কবে কী ঘটেছিল জানিনে, কিন্তু বাংলাদেশে আজ আমাদের চোখের সুমুখে যা ঘটে যাচ্ছে তা হাজার বছরে একবার ঘটে। হিন্দুদের মেজাজ দেখে মনে হচ্ছে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে সাতশ' বছরের যবন সংস্পর্শ একদিনেই মুছে ফেলবে। আর মুসলমানদের যা মেজাজ তারা আধখানা হিন্দুস্থানে কেটে নিয়ে সেখান থেকে হিন্দুকে নিশ্চিহ্ন করবে। এই দাবানলের মাঝখানেই বসে আছি আমরা। কলকাতা কিছু কম ভীষণ নয়। এখানে থাকলেও মালা একদিন অস্থির হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ত। আপনি কি তার সঙ্গে পথে পথে ঘুরতেন? আপনার পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। আপনি আপনার কাজে মন দিতে চেষ্টা করুন। যেমন আমি করছি।"

মেসোমশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। "আমার কাজ! সে আমি ত্রিবেণীর জলে বিসর্জন দিয়ে এসেছি, দেবপ্রিয়। সংসারে সকলের কাজ আছে। আমারি কাজ নেই। কোনো মতে সময় কাটানোই আমার কাজ। সময় মানে তো আয়ু ক্ষয় করতে হবে যতদিন আছি। জানো তো, প্রকৃতি কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অব্যবহার পছন্দ করে না। ল্যাজ কাজে লাগাইনি বলে আমাদের ল্যাজ খসে গেছে। তেমনি আয়ুর সদ্ব্যবহার না করলে আয়ুও কমে যাবে।"

আমি হেসে বলি, "ল্যাজ খসে গেছে বলে আমার আফসোস নেই, মেসোমশায়। তবে প্রাণটা খসে গেলে সত্যি প্রাণে লাগবে।"

মেসোমশায়ের জীবনের মূল্য এখন ঘরগৃহস্থালির প্রয়োজনে এসে ঠেকেছে। এই নিয়ে তিনি অন্তরে অন্তরে অসুখী। তার উপর মালার মায়াপাহাড় অভিমুখে যাত্রা। মালা না গেলেই ভাল করত।

মাসিমার আশা ছিল মালা নিজের ভুল বুঝতে পেরে দিন কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসবে। তখন তার বিয়ে দিয়ে তাকে তিনি বিলেতে পাঠিয়ে দেবেন। সোমনাথও রাজী ছিল আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে। কিন্তু তার মা কুমুদিনী দেবী মালার উপর বিরক্ত। অন্য জায়গায় মেয়ে দেখা সমানে চলছিল।

[ক্রমশঃ

গার্ডার ব্রীজ তাম্‌লা

শ্রীপ্রফুল্ল গুপ্ত

তামলা ব্রীজ। কিং সাহেবের ডিজাইন করা গার্ডার ব্রীজ তাম্‌লা। আলোটা সেদিক থেকেই এসে পড়ছিল। রোদার শেডের টিনের চালে। হয়তো এখুনি ঘুরে যাবে আলোটা। যেমন যায়। আস্তে আস্তে কয়েক ডিগ্রী কোণ করে ঘুরতে থাকবে। শেষে বেল গাছের বাঁধানো বেদীতে এসে পড়বে আছাড় খাওয়া কয়েক টুকরো আলোর সংকেত। আর তার পর শাঁ করে সরে গেলে থাকবে অন্ধকার। আর থাকবে মনোতোষ!

ভোর হয়নি তখনো। আকাশের গায়ে মেঘের ছোঁয়া। টিপটিপে বৃষ্টিও পড়ছে গাছের পাতায় টিনের চালে। বৃষ্টি হচ্ছে অবিরাম শ্রান্তিহীন আজ ক'দিন। অর্জুন গাছে জোনাকীরা নেই। দূর থেকে গড়িয়ে আসছে একটা ঘুরন্ত শব্দ। আলোটা যখনই পড়েছে টিনের ছাদে, বুঝেছে মনোতোষ শব্দটাও আসছে। শব্দ আসবে আর যাবে। যেমন যায়।

গাড়টা উপুড় করে রেখে সামনের দাওয়ায় বসলো মনোতোষ। সারারাত বৃষ্টি পড়েছে টালির ছাদে। টালি চুঁইয়ে ঘরেও পড়েছে কয়েক ফোঁটা। দাওয়াটা ভেসে গেছে। তা থাক্।

শাঁ—শাঁ—এক জোড়া আলো পার হোয়ে গেল। ছপ্, ছপ্, শব্দ তুলছে লাল লরীর চাকা রাস্তার শরীরে। জি, টি, রোডের ঘীথল দেহে আওয়াজের বুঝি আর বিরাম নেই।

আর বিরাম নেই চিন্তার আজ রাতের এই বৃষ্টির কারণে। ভাবনা মনোতোষের। কোথায় কোথায় দরকার রেন্ কাটে'র। যা' প্রয়োজন মত সরিয়ে দিতে পারে রাস্তার ধারে জমে থাকা একপোঁটলা ঘুষিত জল নয়ান জুলির পাকমাটিতে।

একটু পরে এসে পড়বে রাস্তার মজুর। 'গ্যাং কুলি'। আর খানিক পরে বেরোবে মনোতোষ। পুরোণ। সেই পুরোণ সাইকেল নিয়ে। বার ইঞ্চি লম্বা চটের থলি ঝুলিয়ে। তেলের ছোপ লাগা টুপিটা চাপিয়ে।

বৃদ্ধ জি, টি, রোড মনোতোষের জীবনে তখন শিশু। মনোতোষ যখন আসে মোহনপুর 'রেষ্ট শেডে' সরকারী চাকরী নিয়ে, তখন। তখন জি, টি, রোডের গায়ের রঙ ছিল লালচে। বর্দ্ধমান জেলার গোপালপুর থেকে আসে মনোতোষ মোহনপুরে। সে আজ অনেক কালের কথা। তারপর রোড সরকার মনোতোষের জীবনে কত ওলট-পালট হয়ে গেল তার হিসাব আর কেউ না রাখুক, সে রাখে। চোখের সামনে দেখতে দেখতে বড় হল গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড। বালক পিতার মতো পালন করে এল তাকে। হয় তো এর আগেও কেউ ছিল। ছিল হয়তো। সে হিসাব নেই।

শের শাহের আমলে তৈরী এই গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড কত মেহনতি মানুষের বেহিসেবী স্মৃতির দোর খুলে দেয়। কত বিলুপ্ত কান্নার চাপ রেশ হয়তো শোনা গেছে আগেও। সন্ধ্যার উড়ন্ত চিক্‌নাই হয় তো দেখা গেছে কোন ঘুড়-কড়ার ওড়্‌না থেকে। মেহেরউন্নিসার দুপ্ত শকটের চাকার দাগের হিসাব হয় তো

আজ আর নেই। তবুও হিসাব যেটুকু আছে মনোতোষের তাতে জঙ্গলের কাঠ চোলাই করা গো-গাড়ী ক'খানা নিশ্চয় পড়ে। সেই শিশু রাস্তার শরীরে লালচে রঙকে আরো লালচে করে আরো কতগুলি গো-শকট সারি বন্দি হয়ে চলে যেত দিনের বেলায় সে হিসাব আজও মুখে মুখে তার।

তামলা নদীর জল বাড়লো শেষ পর্যন্ত। মনোতোষের এই ছাব্বিশ বছরের চাকরী জীবনে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। এমন অনেক আশ্চর্য ঘটনা অবশ্য ঘটেছে তার জীবনে আগেও। ষোল বছর আগে। যখন সে ছিল 'মেট্' বাবু। সিঙ্গাপুল পুলের কাছের এক পর্ণকুটিরে কাটাতে হয়েছিল তাকে কয়েকটি রাত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নদীর জল বাড়ছে। আর পুলের পিলারগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার কি আনুষ্ঠিক প্রয়াস। বালি ভর্তি বস্তা, বোলডার, কত কী যে সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্তূপাকার করতে হয়েছিল নদীর জলে, মনে আছে তার। শেষে একটা থামকে চিরকালের মতো দুর্বল ক'রে হারেই ফ্লাড লেবেল'এর চিহ্ন রেখে শান্ত হল সে বারের বান।

ষোল বছর আগে। যখন সে ছিল মেট্ বাবু। শিবপুরের ঘোষ পাড়ায় বিয়ে হয়েছিল তার। বর্ষার ঘনঘটায় বিয়ে হল। আর আশ্বিনের এক আশ্চর্য-রাত ছোটনাগপুরের জলের সংগে গড়িয়ে এসে ভেঙে দিলো সিঙ্গাপুলের খুটিঃচুণের থাম। তারপরেই চলে এলো মনোতোষ গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোডের মোহনপুর সেডে। আর সংগে এল পদ্মা।

পদ্মাবতী। শিবপুরের কন্যা পদ্মাবতী। কেন্দুবিল্ব গ্রাম হয়তো দূর নয় ওখান থেকে। শীত গোবিন্দ হয়তো ঘুর তোলে না তার কণ্ঠে। তবু পদ্মাবতীর চারুল আঁখী মনোতোষ তার অল্প কথায় অল্প সোহাগে মূর্ত হয়ে ওঠে বৈকি।

সেদিন ছিল এক আশ্চর্য রাত। জোছনায় ভরে আছে পশ্চিমের শুকনো ডাঙা কী যেন এক আপশোষে। ডাহুকীর ডাকে বোধহয় চমকে উঠেছে অর্জুন গাছের মগডাল। সেজেটি গাঁয়ে মাতাল হয়েছে বাউরী চাঁদের দুরন্ত রোশনায়।

খাটিয়ায় শুয়েছিল পদ্মাবতী। খোলা আকাশের তলায়। দাওয়ায় বসে নবীগোপাল পড়ছিল মনোতোষের কাছে। ঝড়ের মতো ছুটে এল গোপাল গোঁসাই। কেঁদে বললে: সব গেল গো কাকা! সব গেল।

—কেন রে! কী হয়েছে……চমকে ওঠে সকলে।

—পালিয়ে গেছে আমায় ছেড়ে—গো…ডুকরে কেঁদে ওঠে গোপাল গোঁসাই।

মোহনপুর গ্রামের মেট্ গোপাল গোঁসাই। ক'দিন ধরেই স্ত্রীর অসুখের খবর পেয়েছিল বটে মনোতোষ। কিন্তু…

তাম্লা নদীর ধারে রাত শেষ হল। সড়কের ভেঁকুল গাছের একটা ডালেই সব মিটে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। সে চিহ্ন আজ বিলুপ্ত।

তাম্লা নদীর ডাঙায় অশথ গাছে ঠেসান দিয়ে সাইকেলটা রাখে মনোতোষ। গোঁসাই বৌয়ের দাহের চিহ্ন মুছে গেছে তাম্লার বাড়ন্ত জলে। এ জলের শেষ কোথায় কে জানে।

উনিশ মাইলে কাদা রোডএর মুখটাতেই কয়েকটা রেনকাটের দরকার। আট নম্বর গ্যাঙ কে কাজে লাগিয়েছে সেখানে। গাইবিরা ছুঁচলো মুখে সরু সরু কয়েকটা ড্রেন্। সুর্ সুর্ করে গড়িয়ে যাবে জল ফ্ল্যাঙএর ওপর দিয়ে।

বর্ষার ঠিক আগে যাস বলিয়েছে মনোতোষ রাস্তার পাশে। বর্ষা এল। সবুজের অফুরন্ততায় রমণীয় হয়ে উঠলো রাস্তার দুদিকের পাড়। শাড়ীর পাড়ের মতোই মসৃণ। মখমলের মত নরম। কাটতে মায়া লাগে যেন। কিন্তু…

পীচের ছাদের গেবিয়ান্‌গুলি ফাঁক হয়ে পড়েছে কয়েকটা। আঠারো মাইলের দশ নম্বর সাঁকোটা আর টিকবে না এ বর্ষায়। পাঁচিলটা তো গেছেই একেবারে। গুল গুমে গুমে এপ্রোন্ নষ্ট হয়ে গেছে অনেক আগে।

—এই ব্যাটা, কী খোচ্ছে রে—

—বাবু—

—নেমে আয় বলছি। ছাল তুলে নেবো! হারামজাদা। তাই বলি গাছের পাতা কোথায় যায়? নেমে আয়—

লোকটা নেমে আসে।

—পুলিশে দেবো। হারামজাদা। তোর ছাগল খাবে বলে রাস্তায় গাছ পুঁতবো। বছর বছর গাছ বাচ্ছে কমে…

লোকটা বেগতিক দেখে পাতা ফেলেই কেটে পড়লো। রাগে গা জ্বলতে থাকে মনোতোষের। চালা হুকুম দিয়েছে কুলিদের। গাছের পাতা গাছেই থাকতে হবে। না হলে জরিমানা করতে হবে। গাছটাকে স্যাড়া করে দিয়েছে একেবারে।

সাইকেলে উঠে পড়ে মনোতোষ। টুক্ টুক্ করে গড়িয়ে চলে তার পুরোনো গাড়ীর চাকা। ঘার বেলটা এখন আওয়াজ তোলে না। ব্রেক কষলে যা সহজে থামতে চায় না।

শব্দ করে মোটর সাইকেলটা ছুটে এল রানীগঞ্জ থেকে। স্থূল শরীরটা নিয়ে নামলো ওভারসিয়ার।

—তাহলে পুলিশে খবরটা দেওয়াই উচিত ছিলো তখনই।

—খবরটা আপনাকে তাই পাঠিয়েছি। বললে মনোতোষ শান্তভাবে।

—কিন্তু, কি আশ্চর্য…থাক্‌গে। কটা গাদা? চোদ্দটা? আচ্ছা—

মোটর সাইকেলে ষ্টার্টের শব্দ হল। ওভারসিয়ার চলে গেল ত্রিশ মাইল বেগে। মনোতোষ চললো সাইকেল নিয়ে অন্যদের দিকে।

ঘুপসুরিয়ার রাস্তার ধারের পাথর গাদায় হাত পড়েছে কোন নামহীন আত্মার। একুশ মাইলের চৌদ্দটা গাদা কোথায় যে অন্তর্হিত হলো কে জানে? হিন্দুস্থানী চা-অলা বলতে পারে না কিছু। নালিয়াবাদের হোটেলওলা বলতে না কিছু। অথচ লরীর ভিড় জমে এই চটিতে। দিনে আর রাতে।

পর পর চোদ্দটা পাথর গাদা। রাস্তার পাড় থেকে উধাও হয়েছে পরশু রাতে। কাল সকালে স্বাভাবিক পরিক্রমায় বেরিয়ে হঠাৎ নজর পড়ে মনোতোষের। চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। ফ্রেজারগুলা ব্যাক্, ঘি এণ্ড সি আর কনস্ট্রয়ের ক্রমাগত পরিক্রমণে যে বিরাট খাদটা তৈরী হয়েছে এবছরে হয়তো সারানো গেল না শেষ পর্যন্ত। রগ দুটো টন্ টন্ করে ওঠে মনোতোষের। এত লোভ মানুষের!

শুধু বোকে সে কথা পদ্মাবতী। তাই বলে না কিছুই। আগে আগে বলেছে সে দু'চার কথা। এ সবের বিহিত না করলে কোনদিন দেখবে আমাকেই তুলে নিয়ে গেছে ওরা।

—তুমি তোমার বোঝা নিয়েই থাক। আমার বুকে আর কাজ নেই। বুকে বুকে আমার হাড় মাস কালি হ'য়ে গেল বলে?

রাস্তার শরীরে অসংখ্য ক্ষতের চিহ্ন এ-কদিনে যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কালভার্ট-এর এস্টিমেটটা পাঠাতে হবে আজ কালের মধ্যে।

ঠিকাদারের লোক লেগেছে আজ কদিন হল। সারা বছরের টুকিটাকি সারানোই কাজ। প্রয়োজন মতো মাটি ফেলা, কিছুটা রঙ না করলে চলবে কেন? কত ঠিকাদার এসেছে গেছে। কিন্তু এ যেন আজব কোম্পানী। রঙ-দিয়ে চিকন-চাকন করে দিতে পারলেই যেন বেঁচে যায়।

তা পারে না মনোতোষ। জীবনের বহুল অংশ যাকে নিয়ে কেটে গেছে, তার অনাদরের কথা ভাবাই চলে না। যে রাস্তার কাজ নিয়ে—পদ্মাবতীর সংগে এত মন কষাকষি তার যৌবনে, আজ এই যৌবনোত্তর বয়সে যৌবনের হাতে তাকে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরাম পেতে পারে না মনোতোষ।

সেদিন ফিরতে একটু রাত হয়েছিল। কাজের শেষে ফিরিঙ্গীতে গিয়েছিল মনোতোষ বড় ছেলেটারও অনেকদিন খবর পায়নি। ছেলেটি বড় আর আসে না মোহনপুরে। হাজার হোক তোদের মা তো এখনো আছেরে। কাজ তো সবাই করে। তা বলে বাড়ীতে আসবো না কেমন কথা।

পদ্মাবতী বলে অনেক কথা। সে সবের যে কি অর্থ বোঝে না মনোতোষ। তার নাকি জীবনটা গেছে। এবার মোহনের বিয়ে থা দিলে সে নাকি বৌ নিয়ে সুখও শান্তি পেতে পারে। আশ্চর্য! কোন অশান্তি ভোগ করেছে পদ্মাবতী তার জানা নেই। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছে। মাসের পর মাস মাইনের টাকা হাতে তুলে দিয়েছে। আর কি?

—না আর কিছু না। তোমার আর কি? জীবনটা তো রাস্তা নিয়েই কাটালে।.....

অবাক চোখে চায় মনোতোষ পদ্মাবতীর দিকে।

সেই কথাই বলছিল আজ পদ্মাবতী বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

—মোহনের একটা বিয়ে থা দাও।

মোহনের বিয়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহ নয় মনোতোষ। তবে ঠিক—যেমনটি চায়, ঠিক তেমনটি যেন জুটছে না আর কি। তাই।

অনেক দিন অনেক রাত উত্তর দিয়েছে মনোতোষ পদ্মাবতীর একথায়। কিন্তু আজ অবসন্ন শরীরে আর জেগে জেগে গল্প করার মন নেই যেন। পাশ ফিরে শুধু একটু হুঁ বলেই পূর্বজন্মে টানলে।

ব্যাঙ, ডাকছে পীচের ড্রামের গাদা থেকে। হয়তো ধরেছে কোন সাপে। খ'য়ে গোখরো কিংবা হেলে হবে। আর কিছুদিন পরে আর ডাকবে না কেউ এখানে।

হেমন্তের স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় ঘাওয়ায় এসে বসেছে মনোতোষ। মেনারোলে মোটার কোম্পানীর ধন চাকার ট্রাক উর্দ্ধনিশ্বাসে ছুটে গেল অণ্ডালের দিকে। গাড়ীগুলির এত তীব্রগতিতে তৃপ্তি পায় সে। অথচ এমনও দিন গেছে, যেদিন ভাবাও চলত না এই শিশু রাস্তা বড় হয়ে এত বড় হয়ে তার সইবে কোনদিন।

শিশু রাস্তা তখন ছিল লাল, সে দেখেছে। সে দেখেছে কেমন করে তার লালচে শরীরে বয়সের কালো দাড়া পড়লো। কেমন করে আবার সেই আট ছুটি কীর্ণাঙ্গী:চল্লিশের এক পুষ্পল নারীর রূপ গ্রহণ করলো।

কতদিন এমনই ভাবে বসে থেকেছে ওরা হাওড়ায়। সে আর পদ্মাবতী। একটার পর একটা লাইন করে গো-গাড়ীগুলি গেছে ক্যাচর-ক্যাচ্ শব্দ তুলে। কেউবা দাঁড়িয়েছে খানিক বিশ্রামের খাতিরে। কুয়োর জল তুলে খেয়েছে খানিক, বিলিয়েছে সহযাত্রীদের মধ্যে। বসেছে কেউ কেউ বা হাওড়ায়। গল্প করেছে হয় তো বা কোনদিন সুখ দুঃখের। তারপরে···

তারপর। সে গো-গাড়ী তখনো ছিলো। রাস্তার রঙ কালো পাথরে ঢাকা পড়লো। হাওড়াই গাড়ী ছুটলো। আসানসোল থেকে বর্দ্ধমান। প্রথম প্রথম লিখে রাখত মনোতোষ পাঁজীর পাতায়। তারপরে।

সে গো-গাড়ী আজও চলে। হয়তো চালকরা আজ আর নেই। রাস্তার ওপর কালো পরীর মোটা হল। ছুটলো জি, এম, সি। চাহনা ওজ। ওয়েপন্ কেরিয়ার। কাদভার্ট ভাঙলো। আবার ভাঙলো। ছুটলো আবার কন্ভয়। নিমপা থেকে পানাগড়। পানাগড় থেকে অণ্ডাল। গতির আর শেষ নেই। অফুরন্ত প্রাণের আবেগে ছুটে চলেছে সমস্ত দুনিয়া।

পানাগড় থেকে অণ্ডাল। এই যে আকাশের ব্যাপ্তি—যে নীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে পদ্মাবতী মেউলে হয়ে যেতো, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু বিস্ময় ছাড়া আর কিছু মনে আসে না পদ্মাবতীর। শুধু বিস্ময়, একটা আতঙ্ক। যদি কোন শিক্ষানবিশের ভুলের মাশুল তাকেই দিতে হয়। ভাবে পদ্মাবতী। পদ্মাবতী ভাবে, আর তারই আকাশে ঘোরে ঘুরে বাঁধা 'ডাকোটা' কিংবা 'লাইকাউন্ট' বো—বো শব্দে।

একুশ মাইলে যেটুকু পাথর আজও অর্থলোভীর চোখ দৃষ্টি থেকে বেঁচে আছে—সেগুলি এ মুহূর্তে খবর করার সরকারী নির্দেশ এসে গেছে। তাই পৌঁছে গেছে ষ্টীম রোলার ওখানে। এবার কিন্ডের রান্ওয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রোলারটা। অদূরেই বয়লার ধোঁয়া ছাড়ছে শীতের বাতাসে। কঠিন কালো পীচ গলিত লাভার মতো টগবগ করে ফুটছে বয়লারের পেটে। যেন আলকেমির বিরাট এক কলঙ্কন্। পুরাতনকে শোধন করে নিচ্ছে নতুনের আগুনে।

পোরিং ক্যান্এর গরম পীচ্ রাস্তাকে স্পর্শ করার আগে এসে হাজির হয়েছে মনোতোষ। টেম্পারেচার যে-কথা বলে তা যদি শোনার মতো হয়—আপত্তি নেই মনোতোষের। চকচকে তেল পড়বে রাস্তায়। মেসিন ঘুরবে। পিচ্ মাখানো পাথরকুচি পড়বে রাস্তার দেহে। সরসমনে পিবে যেবে পুলদেহী রোলার। ক্যাম্বার পাটায় মিল খাবে। লিখে রাখবে পাথরের হিসাব। হিসাব মেবে ছাড়বে। স্পিরিট লেবেলে দেখে নেবে রাস্তার ক্রাউন্ ঠিক হলো কি না।

গোপাল গোঁসাই এসে গেছে এতক্ষণে। মেজেটি গাঁয়ে গিয়েছিল কি যেন একটা কাজে। সাইকেলে উঠে পড়ে মনোতোষ। সেই পুরোণ সাইকেলে। যে সাইকেলের বেল্ এখন কোন আওয়াজ তোলে না। ব্রেক টিপলে সহজে থামতে যা চায় না।

কিং সাহেবের ডিজাইন্ করা তাম্লা নদীর গার্ডার ব্রীজ। বছরের রঙ পড়ছে তার ইস্পাতের দেহে চওড়া বীম্ আর রেলিংয়ে। রঙ পড়ছে রেড্ লেডের। ঝোলানো তারায় কাজ করছে মিস্ত্রী। ডাউন্ রিমের মেম্বারগুলির কাজ শেষ হয়েছে। খানিক পেইন্টি আর ব্ল্যাক-জাপানে নতুন হয়ে যাচ্ছে ও-পাশের ওই ওয়াল। 'কশান্' বোর্ডের সিঁদুরে রঙ চোখে ধাক্কা মেরে।

সেদিন ছিল রবিবার। শীতের সকাল। সকালের দিকে ধোঁয়াটে কুয়াশায় এ-পাশ থেকে

ওপাশ কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ছাব্বিশ বছরের চাকরী জীবনে সকালে যায় হয়নি মনোতোষ এমন দিন খুব কম আছে। আজও বেরিয়েছে সে—অভ্যাসে নয়। রবিবার ছুটির দিন। রাস্তার কুলিদের আজ বিশ্রামের তারিখ। কিন্তু বিশ্রাম নেয় না ঠিকাদারের কুলী। তাই।

সকালেই চলে এসেছে সে তামলা ব্রীজে। বিশীর্ণ জলরেখায় মন্থরাক্রান্ত স্রোত। আঁচড়ার মতো একটা বঁড়শি লাগানো লগি নিয়ে পাকাল মাছ ধরছে স্থানীয় কোন জেলে। পলুই দিয়ে ধরছে এক দল মেয়েন আপ্‌ীবের এক কাঁধরে।

—কী গো ঠাকুর—নেবে নাকি? বলে এক মেয়েন।

—না রে! রবিবার যে রে আজ।

—তবে ঘরে রইলি না কেনে? হেসে ওঠে আর সকলে। মুচকি হাসে অনেকে।

মাথার ওপরে পুলের ডেকিংটা একটু দুলে উঠলো। পেট্রল কোম্পানীর কোন ডিজেল কেরিয়ার হয়তো দ্রুত চলে গেল আসানসোলে। বেলা বাড়ছে। উঠে পড়ে মনোতোষ পুলের তলা থেকে। গাছে ঠেকানো সাইকেলটা রাস্তায় এনে দিয়েছে কোন মজুর।

মাথার ওপরে ঝক্‌ঝকে সূর্য। পুলের মুখে দাঁড়িয়ে মনোতোষ। সাইকেলে চড়তে যাবে সে। এমনই সময় তীব্র একটা হর্ণ তাকে পাঁচিলের ধারে নিয়ে এল। ওয়েপন্ কেরিয়ারটা ঢুকতে যাবে পুলের ভেতর, পশ্চিম থেকে দ্রুত আসা জি, এম, ট্রাকের হেড লাইটটা অকস্মাৎ জ্বলে ওঠায় ধাঁচ করে ব্রেক্ কষে কেরিয়ারটা। মন্থর হয়ে আসা দশ চাকার জি, এম, সি ট্রাকের গতি বাড়ে। এমার্জেন্সী-এর সামনে দাঁড়িয়ে-পড়া কেরিয়ার আর উইংওয়ালের মাঝে যে ফাঁকটুকু, তারই মাঝে ঢুকিয়ে দেয় ট্রাকটা দাবসী ড্রাইভার ক্রত। একটু কাটিয়ে, একটু বাঁয়ে চেপে সামান্য এদিক সেদিক ক'রে বেরোতে যাবে তার জেনারেল মোটর কোম্পানীর দশ চাকার গাড়ীটা—সাপের মতো শরীরটা প্যাচও খেয়েছিল ঠিক; কিন্তু টাল সামলাতে পারে না দাবসী ড্রাইভার সুরোয়ুখো দশ চাকাওলা ক্যামোফ্লাজ করা ঘাসের রঙের গাড়ীর টান। সোজা উঠে আসে পাঁচিলে। পাহাড় থেকে ঝরস নামার মতো হড়্ হড়্ ক'রে পড়ে যায় রান্‌ওভার হ'য়ে যাওয়া খোবড়ানো সাইকেলটা নিয়ে মনোতোষ রায়।

কালো কালো রাতে হেডলাইট জ্বালিয়ে আস্তে আস্তে তামলা ব্রীজ যদি পার হওয়া যায়, কাকজ্যোৎস্নায় হড্ খোলা গাড়ী নিয়ে টিম্‌টিমে সাইড্ লাইটে পুলটা ধীর গতিতে পেরিয়ে আসা যায়, দেখা যাবে আপ্‌ীবে নলখাগড়ার ঝোপের পাশে শঙ্খশুভ্র একটুকরো গাঁথুনির ঝক্‌ঝকে ইঙ্গিত। মনে হবে, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের বাৎসরিক রিপেয়ারের উপরি হিসেবে 'সেনেটফ্'টা হয়তো বছর বছর চুণকাম হয়ে যায়। কে করে, কে জানে।

নারী—সেকালে একালে

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মেয়েদের স্বভাব প্রকৃতি আদর্শ নিয়ে যুগযুগান্তর ধরে মানুষের অর্থাৎ পুরুষদের কল্পনা জল্পনার আর শেষ নেই।

প্রায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মত ব্যাপার। যেন পুরুষ হৃদের পুকুল নারীসাগরের জল মাপতে গিয়ে তার মনের অতলে ডুবে গলে গেলেন।

কিন্তু কৌতুক পরিহাসের কথা ছেড়ে দিয়ে বলা যায় জল্পনাটা চিরদিনই এক তরফাই চলছে এবং এখনো কৌতূহল, আলোচনা মতামত দেওয়ার শেষ নেই সেই তরফ থেকেই।

এখন একথা থাক। এখন নারীর স্বভাব নিয়ে তার কথা বলতে আহ্বান এসেছে নারীর কাছেই তার একাল সেকাল তার মতি ও প্রবণতা নিয়ে।

একটী কথা মনে পড়ল সেইটা সবাইয়ের আগে বলি, পূজনীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের একটী লেখায় এক জায়গায় পড়েছিলাম (গ্রন্থাবলীতে) মহাভারতের আলোচনায় "দেখা যাইতেছে যজ্ঞ চরিত্র বিশেষ বদলায় নাই……।"

তারপর বলছি আর একটি 'বুলি' বা কথা। প্রথম কবে পড়েছি কার লেখায়—কথাটার কে আবিষ্কর্তা কিছুই মনে নেই এতদিন পরে। সেই কথাটা হচ্ছে 'ম্যানলি উওম্যান'।

প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই কথাটী আমাদের মাসিক সাহিত্যের পাতায় আবির্ভূত হয়েছিল। বিদেশী লেখকদের নানা মতামত নিয়ে এবং এদেশেও অনেকেই দুচার কথা আলোচনাও করেছিলেন এই বিষয়ে। এবং সাধারণ পুরুষ সমাজ যেন চমকে উঠেছিলেন এই পুরুষালী ভাবের মেয়ের আবির্ভাবের কল্পনায়। তাঁরা কি ভেবেছিলেন কোন দিক দিয়ে ভেবেছিলেন স্পষ্ট জানা যায় নি। কিন্তু সে সময়ের আমাদের সাহিত্যের বাবে একটা সরস ছাপ পড়েছিল যেন। 'ম্যানলি' নারী কেমন নারী? মনে পড়তে লাগল যেন 'মন্ত্র নারী'র সঙ্গে কথাটার সাদৃশ্য রয়েছে।

আর ঘরের কোণে বসে আমরা তখনকার একেলে মেয়েরাও তখনকার নারীর অতি আধুনিকতার মন্ত্রনারী রূপে ভবিষ্যৎ পরিণতির এই অদ্ভুত কল্পনাতে যেন তীত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম।

সে পরিণাম কি ভাবের হতে পারে তা ঐ বাক্যের আবিষ্কারক স্পষ্ট করে বলে যেননি। এবং কারুর জানা ছিল না (এখনো জানা নেই)। কিন্তু 'পুরুষমানুষের মত মেয়ে'—তার আকার প্রকার চালচলন হাবভাবের ধরণ যে কেমন হবে সে এক মহা কৌতূহল কল্পনার বস্তু ছিল আমাদের কাছেও।

তার কোমল দৃপ্ত মুখ, তার কমনীয় দেহ, তার তীক্ষ্ণ সঙ্কোচময় লজ্জা, তার অপ্রতিভ হাসি, কথা এগুলো কি ভাবে কি মূর্তিতে বদলে দিয়ে 'ম্যানলি উমোম্যান' আবির্ভূত হবে (যেন স্থির নিশ্চিন্তা ছিল হবেই) মেয়েদের মনে এক গোপন শঙ্কার বিষয় ছিল।

যদিও আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশের' (গল্প) 'জয়কালী-ঠাকুরাণীর' মত দুর্দ্ধর্ষ 'ম্যানলি' ব্যক্তিত্ব দম্ভে মুণ্ডিত কেশা, দীর্ঘ নাসা, উগ্র তেজস্বিনী নারীর অভাব ছিল না (কোনো

কালেই নেই) কিন্তু ওঁদের তো কেউ কখনো 'পুরুষ নারী' বা 'ম্যানলি' নারী কিংবা পুরুষালী মেয়ে বলেনি। বক্তব্যের বলেছে খাওয়ার বহুলাল উগ্রচণ্ডা। কাজেই এই বিশেষায়িত নতুন বিশেষণটি তখনকার নরনারী অনেকেরই একটু ভীত চিন্তিত করে তুলেছিল।

তার আগে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মনে হয়। মেয়েরা পুরুষের অধীন বহু কাজ করেছেন, করতে আরম্ভ করেছেন বাধ্য হয়েছেন করতে। সেতো কমবেশী সব দেশেই বিপাকে পড়লে মেয়েরা সামর্থ অনুযায়ী করেই থাকেন। খোট বওয়া, মজুরী করা, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীতে। সেকালে তাঁর ললিত কোমল দেহ যষ্টি কঠিন হয়ে উঠলেও 'ম্যানলি' হয় না। নানা ঝঞ্ঝাটে মুখের কোমলতা কমে যায়, তাই বলে কেউ কখনো তাদের পুরুষালী মেয়ে বলেনা, বলেনি। তবু কিন্তু শুনে শুনে আমরাও ভেবেছি এবং অন্য অনেকেও হয় তো ভেবেছেন কিন্তু এই অনৈসর্গিক পরিবর্তন হবে। সত্য সত্যই হবে কিনা।

কিন্তু সেকাল একালের দ্বন্দ্ব তো চিরকালই আছে। তাই সেই সুযোগের সূত্র ধরে কেউ কেউ বললেন, এই সব এক্কেলে শিক্ষা, স্বাতন্ত্র্য, পড়াশোনা, খেলাধূলা, বাহিরমুখো মন এই সবই নারীকে 'পুরুষোচিত নারী' বানিয়ে ছেড়ে ক্রমশ। অর্থাৎ হয়ত নারীশরীরে পুরুষোচিত কাঠিন্য দেখা দেবে। নারী-মনে পুরুষালী ধরণের ভাবধারা সঞ্চারিত হবে। এবং না জানি আরো কি বৈলক্ষণ্য নিয়ে কি অপূর্ব আকার প্রকারে সেই নারীর আবির্ভাব হবে! এবং এই অদ্ভুত বাসনা ভাবের কল্পনা কৌতূকময় কৌতূহলও কম ছিল না মানুষের।

তবু মনে মনে কেউ কেউ ভাবে পুরাণের চিত্রাঙ্গদার রাজপুত্রোচিত শিক্ষাদীক্ষার কথা। বীর নারী সুভদ্রা কৃষ্ণীর কথা। একালের রাজস্থানের কর্মদেবী দুর্গাবতীদের কথা—চাঁদ সুলতানা, রিজিয়া বেগমের কাহিনী। ভাবি, তাঁরা 'ম্যানলি' ছিলেন কি? কেউ কি তা' বলেছিল তাঁদের?

দেখতে দেখতে তারপর তিন চার দশক কেটে গেছে। এবং সাধারণ মানুষ সমসাময়িক সব বুলির মতই সেই 'ম্যানলি নারীর' আগমনীর কথাও ভুলেই গেছে বোধহয়। এবং সকলেই নির্দ্বিধাবাদে মেয়েলী ধরণের খালি পা সেকেলে আলতা সিঁদুর কঙ্কন কস্তাপেড়ে শাড়ীপরা বা আধুনিক 'ফ্রোটে সিঁদুর' নখে রং, সুক্ষ্ম পাড় শাড়ী, প্রায় শুধু হাত (নিরলঙ্কার), উঁচু গোড়ালী জুতা পায় নারীদের নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছেন চিরকালের মতই। প্রেমে বিরহে মিলনে সংসার যাত্রায় গুতঃপ্রোতঃ ভাবেই।

এবং আজকে সহসা নিজেদের মুখে নিজেদের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল সেই 'ম্যানলি উওম্যান' কথাটা কোথায় গেল? এবং সত্যই কি এদেশে ওদেশের জানা জগতে তারা একজনও আবির্ভূত হয়েছিল কোনোদিন?

অথবা কিছুই হয়নি—সেই বাকাটার আবিষ্কারক ও পৃথিবীর যাবতীয় নরনারী সেকথা একেবারেই ভুলে গেছেন?

মানুষ তার সুখদুঃখ সত্যতা বর্বরতা স্বার্থপরতা মহানুভবতা ভালমন্দ মিশোনো মন স্বভাব গুণ নিয়ে চিরকালের মতই ৩০।৭০।৮০ বছরের জীবন যাত্রা নিয়ে একই ভাবে চলেছে।

সেকালে যাদের রাক্ষস বলা হত সেই রাক্ষস বা রাবণ আছে মানুষের আকারেই। দুঃশাসনরাও আছে আমাদের কাছাকাছিই—কোনো বিপর্যয় বিপ্লব ঘটলেই তাদের বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। আবার যাঁদের দেবতা মহামানব বলা হ'ত তাঁদেরও সবকালের মত এ যুগেও দেখা যায়।

নারী চরিত্রেও তার ধর্ম কর্ম আশা আনন্দ স্নেহ মোহ একই ভাবে আছে।

সীতা সতী সাবিত্রী দময়ন্তী কৌশল্যার মত নারীরা আছেন, রাজরাণী না হলেও ঘরে ঘরেই তাঁদের পাওয়া যায়। কৈকেয়ীর মত সম্মানস্বার্থের মোহে স্নেহান্ধ জননীরও অভাব হবে না, রাজা থাক বা না থাক।

স্বর্গের অপ্সরারাও আছেন। নামে 'তারকা' আকারে। তাঁদের রূপগুণমুগ্ধ ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের মত মানুষেরও অভাব নেই। প্রাসাদে কুটীরে যেখানে খুঁজবেন। তপস্যা-ভ্রষ্ট মুনি ঋষিদেরও পাওয়া যাবে।

আদর্শ নারী মহীয়সী নারী যাঁদের নাম আমরা পুরাণে ইতিহাসে দেখেছি তেমন নারী এযুগেও আছেন আগেই বলেছি। ধর্মের জগতে কর্মের জগতে পারিবারিক জগতে তাঁদের ছোট বড় কর্মক্ষেত্রের ধরিত্রীটুকু বাসুকীর মতই মাথায় করে নিয়ে কাজ করে চলেছেন নীরবে সংগোপনে।

দেখতে পেয়েছি ত্যাগধর্মের জগতে বিষ্ণুপ্রিয়া সারদা দেবীকে যশোধারার মত! দেখেছি ধার্মিকা জ্ঞানশীলা কর্তব্যপরায়ণা রাণী ভবানী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎসুন্দরী, মহারাণী অহল্যাবাঈকে। দেখেছি রাজরাণী ভগবৎ প্রেমে সর্বত্যাগিনী মীরাবাঈকে।

চরিত্র মহিমায় দেখেছি বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবীকে। ভক্তিমতী রাণী রাসমণিকে দেখেছি।

আত্মপ্রচারহীন নীরব কর্মজগতে দেখেছি স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী দাসকে (৺দেবেন্দ্র দাসের স্ত্রী)। লেডী বসু বা অবলা বসুকে। ৺সরলা রায়কে, মিসেস পি কে রায়, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা গেছে সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে।

বিপ্লবী নারীরূপে দেখা গেছে মাতঙ্গিনী হাজরা, ইন্দুমতী সিংহ, প্রীতি ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, শান্তি দাস, সুনীতিদের।

সাহিত্য ও কাব্যের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে স্বর্ণ কুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীকে। মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায়কে এবং একালের সেকালের আরো লেখিকাদের দেখা যাচ্ছে চারিধারেই কিন্তু 'নামাবলী' রচনায় আর কাজ নেই।

ত্রিবেদী মহাশয়ের "মনুষ্য চরিত্রের বিশেষ বদল হয় নাই" কথাটাই যে সত্য এই কথাই মনে হচ্ছে। এবং আমাদের মনে হয় উপরে বলা পৌরাণিক নারী পরবর্তীকালের নারী—ধার্মিকা নারী, বীর নারী, কর্মী নারী এবং অপরা নারী ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে যে যেখানে-ই থাকুন—তাঁরা সকলেই একান্তভাবে ঘরোয়া ও ঘরমুখী মনের নারী। (অপরা নারীরও মনের অতলে লুকোনো থাকে এক ঘরের নীড়ের মোহময় আকাঙ্ক্ষা যেখানে প্রিয়জন থাকবে।) সকলেরই সাধারণতঃ অন্তরে জেগে থাকে তাঁদের স্বামী-সন্তান এবং তাদের নিয়ে ছোট বড় নীড়টুকুর কথাই। গভীর মমতা স্নেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগে ভরা সে নীড়।

আদি জননী অদিতি, আদি নারী ইভ যীশু মাতা মেরীর মতই, জননীর মমতা পরা তাঁদের বুকে। তেজস্বিনী সাবিত্রী, অভিমানিনী সতী, চিরদুঃখিনী সীতা, পতিপ্রাণা উর্মিলা, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সারদা দেবীর মতই প্রেমের আদর্শে নিষ্ঠায় ভরা তাঁদের হৃদয়। এককথায় সাধারণ অসাধারণ ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত নিরক্ষর সব নারীর মনই মূলতঃ এক সুরে বাঁধা। তারতম্য বা ব্যতিক্রম থাকতে পারে কোথাও কোথাও কিন্তু সেটা ব্যক্তিচরিত্র।

এখন আধুনিক আর সেকেলে ধরণের নারীর কথা বলি। এই চল্লিশ কোটী মানুষের দেশে শিক্ষায় আধুনিকতায় আমরা বাজারে একটি পরিবারও পাব না যারা আধুনিক ধরণের জীবনধারা নিয়েছে।

কজন বা তাদের মধ্যে আধুনিক ? আমাদের দেশে দেশবিভাগের পর পাঁচ লক্ষ গ্রাম আছে। গ্রামের নারী এখনো সেকেলে ধরণে বা চিরকালের ভাবেই জীবন যাপন করেন যাঁদের মাথায় ঘোমটা, সিঁথিতে সিঁদুর, পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা, কাঁখে সন্তান।

সহরে যেকটি শিক্ষিত স্বচ্ছল অবস্থার পরিবার আছেন তাঁদের বেশভূষা আচার ব্যবহারে একটু বিদেশী ছাপ দেখা হয়ত দিয়েছে—কিন্তু সাধারণ কোটী কোটী মেয়ে এখনো নতুন সভ্যতার ধরণ আর্থিক চাপ মনের সংস্কার অথবা অতি আধুনিক শিক্ষার অভাবে যে জন্যই হোক নিতে পারেন নি।

ছোট ছোট বা বড় ছোট ভাগে ভাগে খণ্ড খণ্ড যে জীবন যাত্রা আমরা মধ্যবিত্ত সমাজে দেখি তাতে এখনো মেয়েরা রান্নাঘরে সেকেলে ধরণের উনানেই রান্না বাড়া করেন দেখা যায়। পিঁড়ি বা আসন পেতে থালা-বাটী সাজিয়ে খেতে দেন স্বজনদের। স্নানাহ্নিক না করে রান্নাঘরে ঢোকেন না। জল খান না। এঁটোকাঁটার আমিষনিরামিষের বাছবিচার মেনে চলেন। রান্নাখাওয়ার ধরণ চিরাচরিত প্রথামত ডাল-চচ্চড়ি ভাজা অম্ল একটু মাছ। নয়ত বিশেষ দিনে ঘণ্ট শুক্ত বড়ি বড়া এই তাঁদের রান্নার 'মেন্যু' বা তালিকা। সমস্ত সমাজ জুড়ে স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের এই একই ধারায় রান্নাখাওয়া ও অন্য কাজ।

ঘরদুয়ার আজকাল দিনের ছোট ছোট ফ্ল্যাট বাড়ীতে খুব কম গৃহিণী সাজাতে গোছাতে পারেন। তাদের প্রয়োজন মত থাকার বসার পড়ার জায়গাই হয়ত মেলে না।

এই আমাদের সেকেলে ঘরে 'হিটার' নেই, 'রিফ্রিজেরার' নেই, বাসন মাজার জন্য মেশিন নেই, 'ভিম' নেই। আধুনিক ধরণের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রয়োজনের কোনো উপকরণই তাঁদের নেই।

একটী সেমিজ বা সায়া জামা শাড়ী তাঁদের আবরণ। এবং চারগাছা চুড়ী হার আর 'লোহা' শাঁখাই তাঁদের আভরণ। লেখাপড়া যাঁরা জানেন তাঁরা পেলে বই-টই পড়েন। হয়ত স্থানীয় লাইব্রেরীর মেম্বারও হন। কিন্তু সাধারণতঃ পড়াশোনায় অভ্যাস খুব কম বাড়ীতেই থাকে। এঁদের অবসর বিনোদন সিনেমা দেখাই বেশী, তাও কমবয়সের মেয়েদেরই। বেড়ানো বা দেখা সাক্ষাৎ অথবা সভাসমিতিতে যাওয়াও এঁদের খুব কমই ঘটে ওঠে।

সখের মধ্যে অনেকের খুব সেলাই বোনার এবং গানের সখ আছে। এই হ'ল আমাদের সেকেলে ধরণের মধ্যবিত্ত জীবন যাত্রা। সাধারণতঃ শান্ত কর্মিষ্ঠা ভদ্র মধুর প্রকৃতির এঁরা। মিষ্টহাসিনী মিষ্টভাষিনীও বলতে পারি। স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত সমাজটীকে এঁরাই বাসুকীর মত পরম সহন ধৈর্য্যে মাথায় করে রাখেন সুখদুঃখে দুর্যোগের দিনে, উৎসবের দিনেও। যে কোনো উৎসব বাড়ী বা লোকের বাড়ীতে "বিচিত্রবেশিনী" নারী—নারীর মধ্যেও ঐ একই ভাব দেখা যাবে। কবির ভাষায় একই নারী বিচিত্র বেশে থেকে থেকে উঁকি দিয়ে যান। এবং বর্ষ কর্ম নর্ম জগতে তাঁরা কোনদিনই 'ম্যান্‌লি' প্রতিভার দীপ্ত হয়ে বিরাট মহামানবী আকারেও আজ অবধি আসেননি। সাহিত্য জগতেও চিরকালের মতই অ-প্রতিভ হয়েই একপাশে দাঁড়িয়ে থাকেন—নিজেদের স্বল্প ও ক্ষুদ্র সৃষ্টিগুলি নিয়ে।

একথায় দ্বিবেদী মহাশয়ের মন্তব্যই সত্য—'মনুষ্য চরিত্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই…।' সুতরাং আমরা মেয়েরাও যা ছিলাম তাই আছি। যেখানে ছিলাম সেই পৃথিবীতরা স্বল্পসংসারের ছোট ছোট নীড়গুলিতে নিজেদের সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি কাজের প্রচেষ্টা নিয়ে একরকমই আছি। এবং চারদিকে চেয়েও দেখছি অনাদি কাল থেকেই একভাবেই দিন কাটছে। এবং একাল আর সেকালে ব্যবধান প্রত্যেকটী মানুষের যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যকাল মাত্র।

এমনও ঘটে' থাকে

চিন্ময় রায়

এক

সারাদিন এ-গাঁ ও-গাঁ ঘুরে ভিক্ষার ঝুলিটি কাঁধে নিয়ে লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে সনাতন যখন ঘরে ফেরে তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে।

চন্দনা বাপের প্রতীক্ষায় বেড়ার পাশে দাঁড়িয়েছিল, বাপকে আসতে দেখে ছুটে গিয়ে তার কাঁধ থেকে ঝুলিটি নামিয়ে নিয়ে বলল, "এত দেরী হো'ল কেন বাবা?"

বেড়ার পাশ দিয়ে এগিয়ে এসে দাওয়ার ওপর বসে' পড়ে সনাতন। লাঠিটা সেওয়ালে রেখে শুধু বলে, "এক ঘটি জল দে মা, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।"

চন্দনা তাড়াতাড়ি জল এনে দেয়। এক নিঃশ্বাসে চক্ চক্ করে সব জলটা খেয়ে ফেলে সনাতন। তারপর চন্দনাকে কাছে টেনে নিয়ে বিষণ্ণকণ্ঠে বলে, "ঝুলিটা দেখেই বুঝেছিস্ ত মা, আজ সারাদিন ঘুরে যা পেয়েছি তাতে দুজনার পেটচলা ভার। আজ শরীরটাও বেশ ভাল নেই। তাই ভাবছি—"

"কি ভাবছ বাবা?"—আকুলকণ্ঠে বলে ওঠে চন্দনা।

"ভাবছি, এ ভাবে আর কতদিন চলবে!"

"যা হবার তাই হবে, বাবা, ভগবান সব দেখতে পাচ্ছেন, তিনি কৃপা করলে আমাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না।"

একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করে সনাতন বলে, "আর ভাবছি মা, তুই যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস্।"

অভিমানে ও দুঃখে চন্দনার চোখে জল এল। সত্যিই ত! সে যদি ছেলে হোত, তা হলে এই সত্তর বছর বয়সে বাপের অনেক কাজে লাগ্‌ত।

চন্দনা ছলছলচোখে চুপ করে বসে রইল। সনাতন এবার চন্দনার হাতখানি নিজের শীর্ণ হাতের মধ্যে চেপে ধরে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলল, "রাগ করিস নি মা, তুই যে আমার ছেলের চেয়েও বেশী। তোকে নিয়েই যে সংসারে এখনও টিকে আছি!"

চন্দনা এবার চোখের জল আঁচলে মুছে সনাতনের হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়।

দুই

চন্দনাদের কুঁড়ে ঘর থেকে খানিকটা দূরে রায়বাবুদের বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ী।

হঠাৎ গ্রামে সোরগোল পড়ে গেল, কলকাতা থেকে বড় বড় গায়ক গায়িকা আসছেন রায়বাবুদের বাড়ীর জলসায়। প্রকাণ্ড উঠানে পাল টাঙিয়ে, ঝাড়ের আলো জ্বালিয়ে, ফরাস পাতা আসরে মখমলের

তাকিয়া সাজিয়ে রীতিমত জলসার আয়োজন হোল। তারপর সারারাত ধরে সে কি গান! এমনি ধারা সাতদিন ধরে রায়বাবুদের জলসা চল্‌ল। গ্রাম সরগরম।

এই সাতদিন চন্দনার চোখে ঘুম ছিল না। সব রকম গানের মধ্যে তার ভাল লাগ্‌ল কীর্ত্তন। কলকাতা থেকে যেসব কীর্ত্তনিয়া এসেছিলেন তাঁদের গানের সুর চন্দনার মন আকুল করে তুলল। প্রাণের সব আকুতি যেন রূপ পায় কীর্ত্তনে!

জলসা শেষ হোল বটে, কিন্তু চন্দনার মনের জলসা শেষ হোল না। সে আপন মনে কীর্ত্তনের সুর সাধতে লাগল। কুঁড়ে ঘরের এককোণে মেলায় কেনা রাধাকৃষ্ণের মাটির পুতুলকে নানা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তার সামনে বসে চন্দনা সারাদিন জলসায়-শোনা কীর্ত্তন গাইতে লাগ্‌ল। অবশ্য সনাতন এসব কিছুই জান্‌ত না।

একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেল চন্দনা সনাতনের কাছে।

সন্ধ্যার কিছু আগেই সনাতন বাড়ী ফিরল। ফিরেই দেখে চন্দনা আপনমনে বসে কীর্ত্তন গাইছে। মেয়ের গলার সুর শুনে সনাতন চমকে উঠ্‌ল। এমন অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর চন্দনা কোথায় পেল? এ ত গান নয়, এ যেন সত্যই দেবতার আশীর্ব্বাদ!

সনাতন ধীরে ধীরে চন্দনার পেছনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল, অবাক হয়ে গানটি শুনল, জিজ্ঞাসা করল, "মা কোত্থেকে শিখলি?"

চন্দনা বাবাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে থমকে দাঁড়াল, কম্পিত কণ্ঠে বলল, "আমি আর কোত্থেকে শিখব, রায় বাড়ীতে শুনে শুনে শিখেছি।"

"ভগবান এবার মুখ তুলে চেয়েছেন! কাল থেকে তুইও আমার সঙ্গে ভিক্ষায় যাবি মা। তোর গান শুনলে লোকে নিশ্চয় মোহিত হবে। আর আমাদের দুঃখ থাকবে না।"

চন্দনা বলল, "বেশ ত বাবা, তুমি একলা ভিক্ষা করতে যাও, এতে যে আমারও কত ভয় করে।"

পরদিন থেকে চন্দনা সনাতনের সঙ্গে ভিক্ষায় যায় হোল। সনাতন ঠিকই বলেছিল, চন্দনার গান শুনে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। সকলে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে চন্দনার গান শুনতে লাগ্‌ল। সনাতনের অবস্থা অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে গেল। চূড়া করে চুলবাঁধা ডুরে পরা সুন্দরী কিশোরী মেয়েটীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তনের কথা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল।

তিন

সে পুরানো কুঁড়ে ঘর এখন আর তাদের নেই। নূতন একখানি ছোট বাড়ী হয়েছে। চারপাশের গাঁয়ে চন্দনার গানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। ক্রমে ক্রমে গ্রাম ছেড়ে কাছাকাছি সহরেও চন্দনার নাম ছড়িয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে সহর থেকেও গান শোনাবার ডাক আসতে লাগল চন্দনার।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন অসুখে পড়ল সনাতন। সে অসুখ ক্রমে বেড়েই চলল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাকে বাঁচাতে পারল না চন্দনা।

যেদিন সনাতন মারা গেল সেদিন মরবার আগে চন্দনাকে কাছে টেনে নিয়ে সনাতন বলল, "আমি ত চল্লাম মা, আমার একটি শেষ কথা মনে রাখিস্, চিরদিন সৎপথে থাকিস্, ভগবানকে বিশ্বাস করিস আর প্রলোভনকে দূরে রাখিস্।"

আর কোন কথা বলতে পারল না সনাতন। মৃত বাপের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে হাহাকার করে উঠল চয়না।

চার

সনাতনের মৃত্যুর খবর পেয়ে চয়নার এক দূর সম্পর্কের কাকা এসে চয়নার ভার গ্রহণ করল। চয়না বুড়ো কাকাকে ঠিক তার বাপের মতই আদর যত্ন করতে লাগল।

বেশ ভালভাবেই দিন চলতে লাগল চয়নার। তখন তার গানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পয়সাও উপার্জন হচ্ছে মন্দ নয়।

এই সময়ে কলকাতা সহরে নাট্যশিল্পের নবযুগ এল। নানাভাবে নাট্যকলার উন্নতি হতে আরম্ভ হোল। সংস্কৃতি প্রচারের নামে অনেক অ্যামেচার পার্টিও মেয়েদের নিয়ে চারদিকে অভিনয় সুরু করে দিলে। ভাল গান গাইতে পারে এমন মেয়ের চাহিদা তখন খুব বেশী। নানা প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের কর্ণ-কর্তারা মেয়ে সংগ্রহের জন্যে তখন চারদিকে ছুটোছুটি করছে। শেষে তারা চয়নার সন্ধান পেল।

কাকার অনুমতি নিয়ে চয়না কলকাতায় এল। প্রথমে ফার্ষ্ট এম্পায়ার থিয়েটারে এক অ্যামেচার পার্টির অভিনয়ে সে শকুন্তলা সাজল। কি চমৎকার সে অভিনয়! লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। শকুন্তলার অভিনয়ে চয়না একটা সোনার মেডেল পেল এক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। তারপর চয়না নানা জায়গায় নানা সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে প্রধান গায়িকা ও অভিনেত্রী হয়ে উঠল। তার গান শোনবার জন্যে ও তাকে একবার চোখে দেখবার জন্যে লোকে পাগল। সকলের মুখে শুধু একটি কথা—"চয়না দেবী"।

এবার কলকাতার বালীগঞ্জ অঞ্চলে একটি সুন্দর ছোট বাড়ী ভাড়া করল চয়না। বেশ থেকে তার কাকাকেও নিয়ে এল। এখন চয়নার বয়স বছর পঁচিশ। নামজাদা অনেক ওস্তাদের কাছে সে গান শিখছে।

অ্যামেচার থিয়েটার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছেড়ে এখন চয়না সাধারণ থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। প্রেক্ষাগৃহ প্রতিদিন তার প্রশংসায় মুখর। একখানা ছোট মোটরও কিনেছে চয়না।

একদিন অভিনয় শেষে চয়না যখন নিজের মোটরে বাড়ী ফিরবার উদ্যোগ করছে, হঠাৎ রতিপতি বাবু এসে তার সামনে দাঁড়াল। রতিপতিবাবুই থিয়েটারের মালিক।

"কি চান আপনি?" ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি এনে মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করল চয়না।

"দেখুন, আমি এখন একবার যাব বালীগঞ্জের ষ্টেশন রোডে। আমার এক বন্ধুর খুব অসুখ। এইমাত্র খবর পেয়েছি। আমার নিজের মোটর একটু বিগড়েছে। যদি দয়া করে আমাকে বালীগঞ্জের ষ্টেশন রোডে পৌঁছে দেন।"

"বেশ ত, আসুন না আমার মোটরে"—বেশ হাসিমুখেই বলল চয়না।

ঘুমন্ত নগরীর নিস্তব্ধ রাস্তার অন্ধকারের বুকচিরে হু হু করে ছুটে চলল চয়নার মোটর। হঠাৎ রতিপতিবাবু গদগদ কণ্ঠে বললেন, "আচ্ছা, চয়না পাখী কি কোনদিন খাঁচায় বাঁধা পড়বে না?"

"কেন বলুন ত?"—ভ্রূ কুঁচকে চোখের কোণে কৌতুকভরা চাহনি এনে হাসিমুখেই প্রশ্ন করে চয়না।

"তবে কথাটা খুলেই বলি চয়না দেবি। আমার স্ত্রী মারা গেছে এই পুরো একবছর। সেই থেকে আমার হৃদয়-খাঁচাটা খাঁ-খাঁ করছে। পাখী ত অনেক আছে, কিন্তু মনের মত পাখী এতদিন পাইনি।"

"এবার পেয়েছেন বুঝি?"—খিল খিল করে হেসে ওঠে চয়না।

"হাঁ, পেয়েছি, পেয়েছি,—সে পাখী তুমি চয়না দেবী। তাই হৃদয় খাঁচার দরজা খুলে তোমায় মনের কথা জানাচ্ছি।"

"এ কথাগুলো ষ্টেজে দাঁড়িয়ে ফুটলাইটের সামনে বললে কত মানাতো বলুন ত? এখন এখানে ত ঠিক খাপ খাচ্ছে না"—মুচকি হেসে বলল চয়না।

রতিপতিবাবু আবেগোচ্ছল কণ্ঠে বলতে লাগলেন,—"আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি চয়না দেবি, আমার এ ভালবাসা যে কত গভীর আমি তা কথায় প্রকাশ করে বলতে পারি না। তুমি একদিকে, আর জগৎসংসার একদিকে। তুমি আমার দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন। তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা। তুমি আমার—"

হঠাৎ হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে চয়না, বলে, "কি চমৎকার বলছেন বলুন ত! প্রম্‌ট করবার দরকারই হয় না।"

"আমাকে ঠাট্টা করছ চয়না?"

"না ঠাট্টা নয়। তবে জেনে রাখুন রতিপতিবাবু, ঠাট্টা ছাড়া আপনিই যেন আর কিছু ভাববেন না।"

রতিপতিবাবু হঠাৎ চয়নার ডানহাতখানি চেপে ধরে কি কথা বলতে গেলেন। চয়না ধীরে, ধীরে হাতখানি সরিয়ে নিয়ে বলল, "এই যে বালীগঞ্জ ষ্টেশন রোড এসে পড়েছে। ড্রাইভার মোটর থামাও।"

পাঁচ

তারপরদিন থেকে চয়না থিয়েটার ছেড়ে দিলে। চারদিক থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে লাগল, চয়না দেবীর কি হোল? কেন তিনি সকলকে এমন ভাবে বঞ্চিত করলেন? এর উত্তর চয়না দেবীর কাছ থেকেই অবশেষে পাওয়া গেল, তিনি শুধু জানালেন, থিয়েটার তাঁর আর ভাল লাগে না।

এবার ছায়াচিত্র জগৎ থেকে তাঁর ডাক এল। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খবর পেলেন, বাংলার সুবিখ্যাত ফিল্‌ম্ কোং 'মহাজাতি চিত্র প্রতিষ্ঠান' থেকে লোক এসেছে তাঁর সঙ্গে কনট্রাক্ট করতে।

বৈঠকখানা ঘরে সোফার উপর তিনজন ভদ্রলোক উপবিষ্ট ছিলেন, চয়নাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তাঁরা তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে নমস্কার জানালেন।

"ব্যাপার কি?"—হাসিমুখে প্রশ্ন করলে চয়না।

"আপনাকে আমাদের আগামী প্রোডাকসন্ "প্রেমের কামান" ছবিতে হিরোইনের পার্ট নিতেই হবে"—জানালেন বুশসার্ট ও ফুলপ্যাণ্ট-পরা এক তরুণ।

সঙ্গে সঙ্গে গিলেকরা পাঞ্জাবীপরা এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বলে উঠলেন,—"উ হোবেই হবে, জরুর হোবে। চয়না দেবী আপনা হাতে প্রেমের কামান জরুর ছোড়বে। গণেশজী কি কৃপাসে রূপীয়া জরুর রূপীয়া খিঁচ্‌বে। হিঃ-হিঃ-হিঃ।"

আর একজন ভদ্রলোক, প্রৌঢ় বললেই হয়, বলে উঠলেন,—"শুধু আপনার সঙ্গে মাত্র একটা কনট্রাক্ট্ নয়, আমাদের পর পর যে ক'খানা হিট্ পিক্‌চার হবার ঠিক আছে তাতে, অর্থাৎ "যৌবন পিয়াসা", "চুপি চুপি প্রেম" ও "ঘরে থাকা ফুল"-এ আপনাকেও হিরোইন হতে হবে।

চয়না বলল, "বেশ ত, কনট্রাক্ট করে ফেলুন।"

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "হাঁ, কনট্রাক্ট্ হোবে পয়লা তদ্বীরে বিশ হাজার। মোসরা কী বাত পিছে হোবে। আজ রাত্তমে কনট্রাক্ট্ হোবে। হামরা বেলগেছিয়া বাগানবাড়ীমে সবকুছ্ ঠিক আছে। আপনি জরুর যাবেন চয়না দেবী। হামি মোটর লিয়ে আসব সামকো আট বাজে। পয়লা মিলবে দশহাজার, পিছে মুটিং সুরু হোনে পর মিলবে দশ হাজার। সিধা বাত, কুছ ভি গোলমাল নেহি। ব্ল্যাক্ নেহি কুছ, সাদা লেন দেন। হিঃ-হিঃ-হিঃ।"

চয়না একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে, "রাত্রে কনট্রাক্ট্ হবে কেন? আর বাগানবাড়ীতেই বা যাব কেন?"

হিঃ-হিঃ-হিঃ-করে একটু হেসে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি বলেন, "ওহনা রূপীয়া মিলবে আপনার, আর রাতভোর থোড়া আমোদ-আহ্লাদ মৌজ হোবে না? এইসা তো দস্তুর হামাদের কোম্পানীকা। রূপীয়া ভি মিলনা, মৌজ ভি মিলনা। হিঃ-হিঃ-হিঃ"।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে চয়নার। থিয়েটার সিনেমা সব জায়গাতেই কি একই রকম প্রলোভন। মৃত্যুর আগে তার বাবা তাকে যে কথা বলে গিয়েছেন, সেই কথাগুলি মনে পড়ল তার,—চিরদিন সৎপথে থাকিস, ভগবানকে বিশ্বাস করিস আর প্রলোভনকে দূরে রাখিস।

চয়নার চোখ ছলছল করে উঠল এবার। তারপর হঠাৎ কঠিন হয় সে। একটু রুক্ষস্বরেই বলে' ওঠে, "আমাকে কি ভেবেছেন বলুন ত আপনারা? যান, বেরিয়ে যান এক্ষুনি এখান থেকে, যান, যান বলছি—"

তিনজনেই চমকে ওঠে। তারপর কোন কথা না বলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ছয়

বৃন্দাবনের পথে চলেছে চয়না, সঙ্গে তার বৃদ্ধ কাকা।

সব ছেড়ে দিয়ে এসেছে চয়না। সারা বাংলা যখন বলছে চয়নার কথা, চয়না তখন বলছে রাধাকৃষ্ণের কথা,—গানে, সুরে, ছন্দে।

যমুনার নীল জলকল্লোলে সে শোনে কোন্ বাঁশীর সুর, তমালবীথির পত্রমর্ম্মরে শোনে কার পায়ের ধ্বনি। যমুনার ঘাটে পাষাণে পাষাণে বাজে জলতরঙ্গ,—চয়না ভাবে, বুঝি ব্রজাঙ্গনারা গাগরীভরণে এল। গোধূলি-আকাশের সোনা-বরণ মেঘ দেখে ভাবে, বুঝি ঐ উড়ছে শ্যামের পীত-উত্তরী! সন্ধ্যা-পবনে ভেসে আসে বনফুলের গন্ধ, চয়না ভাবে, ও বুঝি শ্যামের অঙ্গের সুরভি। বৃন্দাবনের পথধূলি সারা অঙ্গে মাখে চয়না। ভাবে, এই পথেই তো একদিন শ্যামের পায়ের চিহ্ন পড়েছিল! জ্যোৎস্না-রাত্রে চুপ করে বসে' কান পেতে থাকে চয়না, শ্যামকুঞ্জে কি অভিসারে চলেছে ব্রজবালারা নূপুর বাজিয়ে! সারা দেহমন দিয়ে চয়না পেতে চায় শ্যামসুন্দরকে। বৃন্দাবন,—বৃন্দাবন,—তার দিনের আলো, রাতের আঁধার সব ভরে আছে এই বৃন্দাবন!

বৃন্দাবনের লোকেরা অবাক হয়ে দেখে তাকে, শোনে তার গান।

চয়নার মন মাঝে মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কোন্ অতীতের বুকে স্মৃতির পর্দা সরিয়ে সে শোনে তাদের সেই ফেলে-আসা গ্রামের যাদববাবুদের জলসায় কীর্ত্তনের সুর—

"তুমি এস হে—
আমার সব যৌবন সারা যৌবন সফল করিতে এস হে।"

———

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পুনরাবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

নয়

আজ আর সমুদ্র স্নানের সময় ছিল না। মধ্যাহ্নের সূর্য উঠেছে মাথার উপরে, পায়ের নীচে সমুদ্র-বেলার বালি উত্তাপে জ্বলছে। তবু সেখানে মানুষ আছে, কী করে আছে তা জানিনে। আজকের স্নান আমি কলের জলেই সেরে নিলুম।

খাবার টেবিলে রামানন্দবাবু বললেন : কাণ্ডটা দেখুন।

কিসের কাণ্ড ?

তাও বলতে হবে ?

ধমক খেয়ে আমি চুপ করে গেলুম।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বললেন : একটা পয়সাও হতভাগা কম নিলে না, অথচ দেখবার জিনিষ তো আর্ধেকই রয়ে গেল।

বুঝতে পারলুম তিনি রিক্সা-ওয়ালার কথা বলছেন। বললুম : যেতে দিন।

যেতে দিন মানে ? আপনার না হয় দু'পয়সার আধলানি আছে—

মনে পড়েছে। বাড়ি ফেরার পথে নিজের পরিচয় আমি দিয়েছি বৈ কি।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক থেমে গেলেন, বাকিটা শেষ করবার আর সাহস পেলেন না। এ শুধু ওঁর কেন, এ অনেকেরই ধারণা। অফিসের কেরানীর দুটো উপরি পয়সা আছে, নেই আর কোন বড় মানুষের, যারা দুহাতে নেয়। তাদের নেওয়াকে উপরি বলে না, বলে প্রাপ্য, ওটা দিতে হয়। তাদের কাজের কেউ সমালোচনা করে না। সরকারের দুর্নীতি দমনের খড়্গ ঝুলছে গরীব কর্মচারীর মাথার উপরে।

অনেকক্ষণ পরে ভদ্রলোক কথা কইলেন, বললেন : আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না।

কেন জানিনা, আমার একটা উত্তর দেবার লোভ হল। বললুম : আমি শুনেছিলুম, মাষ্টারদের দুপয়সা উপরি আছে। ছেলে পড়িয়ে আর পরীক্ষার খাতা দেখে নয়, নম্বর বাড়িয়ে আর প্রশ্নপত্র বিক্রি করে।

রামানন্দবাবু যেন মারতে উঠলেন, বললেন : কী বললেন ?

এ কথা বলা, একেবারে হুঙ্কার। খাওয়া দাওয়া সেরে যাঁরা ঘরে ঢুকেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'একজন ছিটকে বেরিয়ে এলেন। উত্তর না দিয়ে আমি নিঃশব্দে খেতে লাগলুম।

কিন্তু ভদ্রলোক ছেড়ে দেবার পাত্র নন, বললেন : কথা কইছেন না যে ?

ম্যানেজারও বেরিয়ে এসেছিলেন। উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন : কী হল ?

আবার কী হল। আজই আমার অন্য ঘরের ব্যবস্থা করুন।

খেতে খেতেই আমি বললুম : যদি খুশী হন, তাহলে অন্য হোটেলে উঠে যাই।

আড়াল থেকে ঘতা হেসে উঠল খিল খিল করে।

ঘতার হাসি শুনে রামানন্দবাবু বোধ হয় লজ্জা পেলেন। আর কোন কথা কইলেন না।

খাওয়া শেষ করে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমি বাইরে বারান্দায় বসলুম খবরের কাগজ নিয়ে। মনে হল, আমি ভুল করেছি। কোন মন্তব্য করা আমার উচিত হয়নি। যেটা যা তাই থাকবে, আমার কথায় বদলাবে না, বদলাবে না আমার মত লোকের চেষ্টায়। পৃথিবীর সকল দেশেরই আজ এক অবস্থা। যারা প্রতিবাদ করছে, তাদের হাতে ক্ষমতা নেই। যাদের আছে, তারাই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। হয়তো এ আমার ভুল ধারণা, অভিজ্ঞতার গণ্ডি বড় সংকীর্ণ বলেই এ ভুল হয়তো ধরা পড়ছে না।

নিগমবাবু কখন আমার পাশে এসে বসেছিলেন দেখতে পাইনি। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : প্রফেসর সাহেব কেন চটে উঠেছিলেন?

বললুম : এমনি।

আমার ওপরেও এমনি চটেছিলেন।

কখন?

কাল সন্ধ্যেবেলায়।

কেন চটলেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন : ভুল করে মাষ্টারবাবু বলেছিলাম।

বুড়োর হাসি দেখে আমিও হাসলুম।

ভদ্রলোক বললেন : আপনার তো আত্মীয় হন?

তা কেন হবেন!

আমার উত্তরটা বোধহয় তাঁর বিশ্বাস হল না। তাই সন্দেহ করে বললুম : আপনার সঙ্গে কি আমার আত্মীয়তা আছে?

না তো।

ওঁর সঙ্গে আমার এই রকম সম্বন্ধ।

আমরা ভেবেছিলাম—

কথাটা ভদ্রলোক শেষ করলেন না। শেষ করবার দরকার নেই। তাঁর সন্দেহের কথাটা তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এবারে বললেন : ভদ্রলোকের মাথাটা কি কিছু খারাপ?

মাথা কেন খারাপ হবে!

যে সব কথা বলছিলেন, তা শুনে আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল।

নিগমবাবুর কথায় মনে হল তিনি সস্ত্রীক এসেছেন। তাইতেই বারে বারে আমরা ও আমাদের বলছেন। বিলেস নিগম অসূর্যম্পশ্যা কিনা জানিনে, তাঁকে আমরা এখনও দেখিনি। বললুম : বেশি পড়াশুনা করলে বোধহয় কথাবার্তা একটু বেয়াড়া হয়, এসব পণ্ডিতের লক্ষণ।

নিগমবাবু মেনে নিয়ে বললেন : তা ঠিক, এই আমাদের বিজনেসেই দেখুননা লেখাপড়া শেখা বাঙালীবাবুরা কেল হয়ে যাচ্ছে, আমরা মূর্খরা বেশ চালিয়ে যাচ্ছি।

উত্তরে একটা শক্ত কথা মুখে এসেছিল, এ যুগের ব্যবসা ত প্রতারণা ও অসাধুতার ব্যবসা। যাদের ভেজাল মেশাই, তারা মানুষকে বঞ্চিত করে স্বাস্থ্যগঠনে, আর ওষুধে ভেজাল মিশিয়ে মানুষ খুন করে অবিচলিত চিত্তে। পেটে খানিকটা বিদ্যা থাকলে এই বিবেকটা বিসর্জন দেওয়া একটু কঠিন হয়। নিজেকে আমি সংবরণ করে নিলুম, কোন উত্তর দিলুম না।

একটা কথা ভেবে আমার দুশ্চিন্তা হল। আমি খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়েছি। অন্যের কথায় আমি তো কখনও উত্তেজিত হইনি। আজ কেন হচ্ছি! এ তো সুস্থ মনের লক্ষণ নয়!

নিগমবাবু কিছু সন্দেহ করবার সুযোগ পাননি, বললেন: বিজনেসে বাঙালী যে নেই, তা নয়। যারা আছে, তারা প্রায় আমাদেরই মতো।

বললুম: কিছুদিন থাকবেন বোধহয় এখানে?

ইচ্ছা তো ছিল—

বাধা কিসের?

বাধা কিছু নেই।

তবে?

ভদ্রলোক কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললেন: থাকলেই হল।

বললুম: জায়গাটা ভাল লাগছে না বুঝি?

ভদ্রলোক এবারে সত্যি কথা বললেন: কলকাতা থেকে এসে এখানে বেশিদিন ভাল লাগে না। এই সমুদ্র আর এই শব্দ—

আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে ভাল করে তাকালুম। গোলগাল কর্সা চেহারা, বয়েস হবে ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। একটু ক্লান্ত, একটু যেন বিমিয়ে পড়েছেন। শরীরের চেয়ে মনটা যেন বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

আমি উত্তর দিলুম না দেখে বললেন: ভেবেছি, এবারে গোপালপুর অন সী যাব। অনেকদিন আগে দেখেছি, হয়তো ভাল লাগবে।

কেন কেন গেলেন না, তাও ভদ্রলোক বললেন: সেখানে মন্দির নেই, বাড়ি থেকে আপত্তি হল। তারপর লোকজনও কম।

সমুদ্রের উপর গোপালপুর আমি দেখিনি। উড়িষ্যার একটা চমৎকার স্বাস্থ্য নিবাস বলে নাম আছে। আর কী আছে জানিনে। লোকজন কম শুনে মনে হল, পালিয়ে থাকবার জন্য সে বোধহয় পুরীর চেয়ে ভাল জায়গা। এই ভাবে এখানে জড়িয়ে পড়বার আগে আমার তো পালিয়ে যাওয়া উচিত। বললুম: থাকবার জায়গা নিশ্চয়ই ভাল আছে?

তা আছে। তখন তো সবই সস্তা গণ্ডা ছিল। এখনকার খবর ঠিক বলতে পারিনে।

গোপালপুর নাম আমি রেলের টাইম টেবিলে পাইনি। সেই কথা শুনে নিগমবাবু বললেন: গোপালপুরে কোন স্টেশন নেই। বারহামপুরে নেমে আট মাইল পথ বাসে যেতে হয়। একেবারে সমুদ্রের ওপর একটি ছোট শহর। ভালমন্দ কয়েকটা হোটেল আছে। সঙ্গে সঙ্গী থাকলে নির্জনতাটা উপভোগ করা যায়।

তিনি কেমন সঙ্গী নিয়ে গিয়েছিলেন, সে কথা আর জানতে চাইলুম না।

নিগমবাবু বললেন : বেড়াবার আর একটা ভাল জায়গা আছে। সে হল চিল্কা।

চিল্কার নামে আমার আর এক দিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাচ্ছি। গভীর রাত, একটা ছোট অন্ধকার স্টেশনে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। খানিকটা দূরে গাড়ির ভিতরে ও বাহিরে প্রবল উত্তেজনায় হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। কোনরকমে ঘাড় বেঁকিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বার করে দেখলুম, একদল ছোকরা নামল এই স্টেশনে। স্টেশনের নাম রম্ভা।

সহযাত্রী শ্রীনিবাসলু আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে বললেন : ছেলেরা চিল্কায় পিকনিক করবে বলে এসেছে। পিকনিক করবারই জায়গা বটে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। বললেন : এইবারে দেখুন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। দক্ষিণের দিগন্ত যেন হারিয়ে গেছে। অসংখ্য তারার আবছা আলোয় মনে হল, বাঁদিকের আকাশ এসে রেললাইনকে ছুঁয়ে আছে। আকাশে আর জলে যেন পার্থক্য নেই, আকাশের তারার আর জলের ছায়ায়। পার্থক্য বুঝি আমরাই গড়েছি। মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, ভাষায় ও বর্ণে। এর গতি তো খুঁজে পাইনে, কতটা ডিঙোলে এর পার পাওয়া যায়। সঙ্কীর্ণতার শেষ আছে তো।

স্থানে স্থানে অন্ধকার জড়ো হয়ে আছে, মনে হচ্ছে ওগুলো পাহাড়। শ্রীনিবাসলু বললেন : পাহাড় জলের নিচে, আমরা শুধু মাথাগুলোই দেখতে পাচ্ছি। নৌকায় বেড়াবার সময় খুব সাবধানে ওসব এড়িয়ে চলতে হয়। মাঝিদের ব্যাপারেও থাকতে হয় হুঁশিয়ার। সুবিধে পেলে মাথায় বাড়ি দিতে এরা দ্বিধা করে না।

চোখ বুঁজে আমি অন্য ছবি দেখলুম। সেই ছেলের দল ছোট ছোট নৌকোয় হালকা জলের উপর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কেউ বা মাঝিদের কাছে থার নিয়ে ছোট ছিপ ফেলে বসেছে চুপটি করে। মাছ উঠলে সেই মাছ ভেজে খিচুড়ির সঙ্গে খাবে পাথরের উপরে বসে। চারিদিকে জল আর জল। মনে হবে মাথার উপরের আকাশ নেমে এসেছে পায়ের তলায়, কিংবা পায়ের নিচের জল ছেয়ে ফেলেছে উপরের আকাশ।

নিগমবাবু আমাকে জাগিয়ে দিলেন, বললেন : ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

চমকে উঠে বললুম : না তো।

ভাত জিনিষটাই ঐ রকম। খেলেই নেশা হয়।

তারপরেই বললেন : আপনারা দিনে ভাত আর রাতে রুটি না খেয়ে দিনে রুটি আর রাতে ভাত খাননা কেন বুঝিনা। দিনে রুটি খেলে আলস্য আসে না। আর রাতে ভাত খেলে ঘুমটা ভাল আসে।

আপনি বুঝি তাই করেন ?

না। ভাতে জল থাকে বলে বারে বারে আমাকে উঠতে হয়।

চিল্কার কথা আমি তখনও ভুলিনি। বললুম : চিল্কায় আপনি নিশ্চয়ই পিকনিক করেছেন ?

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, বৃদ্ধের দৃষ্টি হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল, বললেন : করেছি বৈকি।

তারপর ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : সে তো যৌবনের গল্প।

আর কিছু বললেন না।

আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, তাঁর দৃষ্টি কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন, কিন্তু সমুদ্র তাঁকে আর আকর্ষণ করছে না। তিনি কি তাঁর যৌবনের দিনে ফিরে আসবার চেষ্টা করছেন! আস্তে আস্তে আমি বললুম: সে গল্প বোধহয় একটু একটু আপনার মনে পড়ছে?

সে সব কথা কি ভোলা যায়?

যায়না।

আচ্ছন্ন ভাবে বৃদ্ধ বললেন: গোপালপুরের সমুদ্র দেখে সময় আর কাটে না। বালির উপর হেঁটে হেঁটে আর সমুদ্রের জলে স্নান করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একই জিনিষ নিয়ে কত মাতামাতি কত দাপাদাপি করা যায়! বয়েসটা যে কাঁচা!

এই আমরা কারা, বৃদ্ধ সে কথা বললেন না। আমিও কোন প্রশ্ন করে তাঁকে বাধা দিলুম না।

একদিন জিনিষপত্র বেঁধে বাসে এসে বসলুম। তারপর ট্রেনে। কিন্তু মন চাইলনা কলকাতায় ফিরতে। কলকাতায় সে স্বাধীনতা কই, সেই মুক্তি, সেই প্রাণ! বালুগা স্টেশনে আমরা নেমে পড়লুম।

আপনি চিল্কা দেখেছেন।

ট্রেন থেকে দেখা দেখা নয়। বললুম: না।

চিল্কা এখান থেকে বেশি দূর নয়, পুরী জেলার দক্ষিণ প্রান্তে। আজ ভোর বেলায় একদল যুবক মোটরে করে বেড়াতে গেলেন। এই হোটেল থেকেই গেলেন।

মনে হল, বৃদ্ধ বুঝি সেই থেকে চিল্কার কথাই ভাবছেন, তাঁর যৌবনের কথা। তা না হলে আজ এমন করে চিল্কার গল্প কেন শোনাবেন। বললেন: একদিকে পূর্বঘাট পাহাড়—নীল বনময়। অন্যদিকে সমুদ্র, কিন্তু সমুদ্রের মতো নয়। মাথাকাটা ছোট ছোট পাহাড় আর বালির দ্বীপ দিয়ে অকূল সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন। একটি বিস্তৃত হ্রদের মতো মনে হবে।

মনে পড়ল, ভূগোলে এই রকম হ্রদের নাম পড়েছি লেগুন। কিন্তু নিশ্চয়বাবুকে বাধা দেবার দুঃসাহস হল না।

ভদ্রলোক বললেন: বেশি চওড়া নয়, হয়তো মাইল দশেক। কিন্তু লম্বায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের কম হবে না। আমরা এসব হিসেব নিকেশ করতে যাইনি, গিয়েছিলুম জীবনটাকে যথেচ্ছ উপভোগ করতে। করেছিলাম।

বৃদ্ধের মুখের দিকে আমি আর একবার চেয়ে দেখলুম। গোলগাল চেহারা, ফর্সা মুখ। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। একটু ক্লান্ত, একটু যেন বিমিয়ে পড়েছেন। শরীরের চেয়ে মনটাই তাঁর বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

কাল সকালবেলার কথাও আমার মনে পড়ল। স্নানে যাবার সময় আমি তাঁকে বাইনাকুলার হাতে বসে থাকতে দেখেছিলুম। ঐ যন্ত্রটি চোখে লাগিয়ে তিনি অতের স্নান দেখছিলেন। বোধ হয় নিজের অতীতটাকেই দেখছিলেন। তাঁর যৌবনের মাতামাতি দাপাদাপির দৃশ্য। আমার মতো অপরিচিতের কাছে সে গল্প তিনি নিশ্চয়ই বলবেন না। জিজ্ঞাসা করাও সৌজন্য বিরুদ্ধ হবে। তাই নিঃশব্দে তাঁর পরের কথার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বৃদ্ধ বললেন: চিল্কার জল খুব গভীর নয়, তাই অগণিত নৌকো সারাদিন ছুটোছুটি করে। নৌকাগুলোর গড়ন দেখে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম। তলাটা ত্রিভুজের মতো নয়, একেবারে

সমতল। প্রথমটায় উল্টে যাবার ভয় করত। কিন্তু কী করে উল্টোবে! সমুদ্রের তরঙ্গ আসে না উত্তাল হয়ে, একটার পর একটা ঢেউ দুরন্ত আক্রোশে নৌকোর ওপর ভেঙে পড়ে না। জলের উপর একটু যে চঞ্চলতা, সে তো অগণিত মাছ ও নানা রঙের পাখির খেলায়।

দক্ষিণের দরজার দিকে চেয়ে ভদ্রলোক সহসা থেমে গেলেন। আমিও সেদিকে চাইলুম। কিন্তু দেখতে কিছুই পেলুম না।

ভদ্রলোক বললেন: অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছি। এবারে একটু আরাম করি।

আমার মনে হল, আরাম করার বাসনাটা তাঁর নিজের নয়, এটি অন্তরালে থেকে অন্য কেউ তাঁর উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। বললুম: নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

খানিকটা আমস্ত হয়ে বুক ফিটিয়ে গেলেন।

কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে আমারও ভাল লাগছিল না। এ হোটেলে আরাম চৌকি নেই। যাত্র হয়ে সবাইকে বিছানায় আরাম করতে হয়। কিন্তু ঘরে যেতেও আমার মন চাইল না। রামানন্দ বাবু হয়তো আজকের ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখছেন। সেখানে গেলেই গোলমাল বাধবে। কাজেই এখানে বসে থাকা সঙ্গত। একটু পরে বেলা পড়বে, তখন সমুদ্রের ধারে বালির উপরে গিয়ে বসা যাবে।

নিজের ঠিক পিছনে ফিসফিস করে কথা শুনতে পাচ্ছিলুম। বারান্দায় নয়, পিছনের ঘরে। দুজন মানুষ কথা কইছে। আমি উৎকর্ণ হতেই তারা থেমে গেল। ওরা কি আমায় দেখতে পাচ্ছে? কিন্তু আমাকে দেখবে কেন?

অনেক দূরে দু'তিনজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলুম, মাথায় বড় বড় ঝাঁকা নিয়ে সমুদ্রের তীর থেকে শহরের দিকে যাচ্ছে। আরও দূরে বালির উপর ছড়িয়ে বসে অনেকগুলি পুরুষ কী কাজ করছে। মাথার উপর রোদ বোধহয় তীব্র নয়, তীব্র নয় নিচের বালিও। তা না হলে এমন নিশ্চিন্ত মনে কী করে কাজ করবে। আমার ইচ্ছে হল তাদের কাজ দেখতে যাই। কাঠের চেয়ারের চেয়ে আকাশের রোদ বুঝি বেশি আরামের হবে।

বেরুবার আগে ঘরের ভিতরে একবার দেখতে গেলুম। কী আশ্চর্য। গভীর ঘুমে রামানন্দ বাবু একেবারে অচেতন। তাঁর নাক ডাকছে। কিন্তু সমুদ্রের গর্জনের জন্যে বাহির থেকে সেই নাকের ডাক আর শোনা যাচ্ছিল না।

টেবিলের উপরটা একবার দেখে নিলুম। তাঁর কাগজপত্র সব খোলা ছড়ানো আছে। হাওয়ায় সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আজ প্রচুর লিখবেন বলেছিলেন। যা দেখেছেন, আর যা শুনেছেন, তা নিশ্চয়ই লিখে ফেলবেন। যাবার আগে আমাকে একাধিকবার এই সংকল্পের কথা শুনিয়েছেন। ইচ্ছে হল, ঘড়াকে ডেকে এনে এই দৃশ্য দেখাই।

ছি ছি ঘড়ার কথা কেন মনে এল। ঘড়া তো স্বামি নয় যে দুজনে মিলে কিছু উপভোগ করার ইচ্ছে জাগবে। ক্ষিপ্র পায়ে আমি বেরিয়ে এলুম। তরতর করে নেমে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে। কিন্তু মনে হল পিছনের ঘরে সেই দুজন ভদ্রলোক ফিসফিস করে কথা কইছিল। আর—

ঘড়ার কথা আমি কিছুতেই ভাববনা।

[ক্রমশ:

এই তো দুনিয়া

সূচিশিল্প এখন জগতের সবদেশেই মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। ফলে তৈরী সূচিশিল্পের চেয়ে হাতের সূচিশিল্পেরই দাম অনেক বেশী। পাশ্চাত্ত্য দেশের কথা ছাড়ুন, কিন্তু এসব্রয়ডারিতে কোরিয়া এতটা উৎকর্ষ লাভ করেছে যে সারা বিশ্ব তা দেখে চমৎকৃত হয়ে গেছে। "Pine Trees and Cranes" নামক এমব্রয়ডারিতে এমন সূক্ষ্ম ও ভাবদ্যোতক সূচিশিল্প আছে যা প্রশংসা করা যে কোন পাশ্চাত্ত্য দেশের পক্ষেও বিশেষ গৌরবজনক। কোরিয়ার "Raft Flowing Down the Stream" এমব্রয়ডারি বিশ্ববিখ্যাত। কোরিয়ার বিখ্যাত সূচিশিল্পী Kim Ok Shil এখন জগতের সর্বদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কোরিয়া

• • • •

পূর্বে সব দেশেই সুগৃহিণী হওয়াই নারীর একান্ত কাম্য ছিল। কিন্তু তারপরে যুগপরিবর্তনে নারীরা অনেকটা স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে পড়ে। গৃহ-বন্ধনের চেয়ে মুক্ত আবহাওয়াই তাদের আকৃষ্ট করত বেশী। পারিবারিক আনন্দের চেয়ে বাহিরের আনন্দেই তারা ডুবে থাকতে চাইতেন বেশী। কিন্তু আজকাল চাকা ঘুরছে। এখন মেয়েরা বিবাহিত জীবনকেই তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র বলে মেনে নিয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েও মেয়েরা এখন নূতন কথা ভাবতে শিখেছে—"The family unit is a closer and a happier one than it was in the days when women had no other life but the home."

ব্রিটেন

• • • •

মেয়েদের কিরূপ পোষাক পরিচ্ছদ পরা উচিত ও তা'তে তাদের শালীনতা কতদূর বজায় রাখা যায়, এ নিয়ে আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে খুব আন্দোলন হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বেও পাশ্চাত্ত্য দেশের মেয়েরা পোষাক সম্বন্ধে একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিল। কিন্তু এখন তারা ভাবতে শিখেছে—"That clothes are the way you present yourself to the world. They affect the way the world feels and thinks about you ; and unconsciously they affect the way you think and feel about you."

উওম্যান্স্ ওন্ ফোম

• • • •

আদিম যুগের মানব সভ্যতার অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে গোবি মরুভূমিতে। দুস্তর বালুকাময় গোবি মরুভূমির নীচে এমন অনেক বিলুপ্ত জীবজন্তুর কঙ্কাল পাষাণ গৃহাদি ও নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র পাওয়া গেছে, যা' দেখে মানবসভ্যতা যে কত প্রাচীন তা' অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। গত কয়েক বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে গোবি মরুভূমিতে যে একদাকালে আদিমযুগের মানবসভ্যতা বর্তমান ছিল, তা' এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে—"As a result of explorations carried out during the last few years in the regions of the Central Gobi, Sukhe Bator and Eastern Gobi provinces, very interesting finds have been discovered."

মঙ্গোলিয়া টুডে

• • • •

ভিয়েটনামে উচ্চ শিক্ষা যে কতটা প্রসার লাভ করেছে, সেই দেশের সাম্প্রতিক এক বিবরণী থেকে তা' ভালভাবেই জানতে পারা যায়। শুধু রাজধানীতেই ৯১টি কলেজ আছে ও সেই সব কলেজে ইংলণ্ডের কলেজের মতই ছাত্রদের অধ্যয়ন ও থাকবার ব্যবস্থা আছে। মোট ১,২৫০০০ ছাত্র এই কলেজগুলিতে পড়াশুনা করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আলোচনার দিকেই ছাত্রদের ঝোঁক বেশী। সে দেশে গভর্ণমেণ্টের অভিমত—"First of all, modern scientific knowledge must be spread more and more widely among the people, so that the whole nation may take an interest and take part effectively in the advancement of science."

ভিয়েটনাম

• • • •

বর্ত্তমানে চীনদেশের নারী-কর্মীদের জন্য গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রাশিয়ার আদর্শে পানাগার, বিশ্রামাগার, ক্যান্টিন্, প্রমোদাগার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে সেদেশের woman power-কে কাজে লাগাচ্ছেন। গৃহিণী সংসারের সকল দায়িত্ব এড়িয়ে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে চলে যায় ও গভর্ণমেণ্ট তাদের পারিবারিক দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে থাকেন,—"All the house-wives are going out to work. Their household chores are taken over by community dining-rooms, nurseries and neighbourhood service centres."

চায়না পিক্টোরিয়াল

• • • •

রাশিয়া এখন অসীম শূন্যে সুদূরতম নেপচুন, প্লুটো প্রভৃতি গ্রহে যাবার তোড়জোড় করছে। চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহ ত হাতের কাছে, ওর জন্যে অত মাথা ঘামাবার কি আর আছে। এরপরে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রের দিকে অভিযানও সুরু হবে। এ সম্বন্ধে জগতের বৈজ্ঞানিকগণ একটু সন্দেহ প্রকাশ করলেও রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Vladimir Siforov বলেন "Radio-electronics, automatics and remote control enable science to explore deep into space. The space-ship will undoubtedly encounter conditions that we on earth cannot anticipate."

সোভিয়েট ইউনিয়ন

• • • •

বিয়ের আগে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আংটি বদলের যে প্রথা পাশ্চাত্য দেশে এবং আজকাল আমাদের দেশেও সচল হয়ে উঠেছে, তার ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজতে গিয়ে পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেছেন যে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেও মানবসভ্যতার সেই আদিম যুগে এই আংটি-বদলের প্রথা প্রচলিত ছিল। মিশর দেশেও বিয়ের আগে বাগ্‌দান উপলক্ষ্যে আংটি বদল করা হোত—(The ring was used in the earliest civilisation in the valley of the Nile)। গ্রীক্ সভ্যতার স্বর্ণযুগেও এই প্রথা খুব সচল হয়ে উঠেছিল (In the Greek civilisation the wedding ring took on an added significance)। একটা অতি প্রাচীন প্রথা কিভাবে অতি-আধুনিক সভ্যতার যুগেও প্রচলিত হয়ে আছে, এটা ভাববার বিষয় বৈকি।

ট্রেন্ড

• • • •

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী Barbara Goalenএর কন্যা Sarah লণ্ডনের Lo Spiedo Restaurantএ পাচিকার কাজ নিয়েছেন। লণ্ডনের Piccadilly অঞ্চলে এই রেঁস্তোরা, সুতরাং প্রায় সারারাত ধরেই আমোদের হল্লা এ অঞ্চলে চলে। তবে তরুণীটি পাচিকার মত বেশ পরতে নারাজ। তিনি যানানসই পোষাকই পরেছেন (Her outfit suited both her figure and her age)। অবশ্য এ মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়ে রেঁস্তোরাঁর বরাত খুলবে এটা ঠিক।

উওম্যানস্ ডে

• • • •

অনেকেই এ কথা জানেন ও ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবেও এ কথা সুপ্রতিষ্ঠিত যে জর্জ স্টিফেনসন্ ষ্টীম্ ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এখন নতুন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। ফরাসী দেশে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে Nicolas Joseph Cugnot নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে ষ্টীম্ ইঞ্জিন্ আবিষ্কার করেন। কিন্তু এতে দেশের ক্ষতি হবে বিবেচনা করে শাসকবৃন্দ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে যে সব তর্ক উঠেছিল সেগুলি,—"The smoke will kill the bride, cows will refuse to give milk, coach-owners, canal-men, hotel keepers will oppose." ইত্যাদি। এর পরে William Murdork ষ্টীম্ ইঞ্জিন্ আবিষ্কার করেন। গাড়ী চালাতেই ধর্ম্মযাজকদের প্ররোচনায় দলে দলে লোক "এটা একটা শয়তান" এই ধারণা নিয়ে তার গাড়ী ভেঙে দেয়। (Immediately the church doors were flung open and the people were upon him before he could stop the engine. The church people thought that it was the Devil himself.) ইভিয়ান্ রেলওয়েম্

• • • •

সোভিয়েট রাশিয়ায় মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার (brain operation) এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বৎসরে ২৯০০০ মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারে অত্যন্ত সুফল পাওয়া গিয়েছে। যে কোন মস্তিষ্কঘটিত অসুখে মাথার খুলি খুলে ফেলে ডাক্তারেরা নির্ব্বিচারে ও নির্ভয়ে brain matterএ সামান্য অদলবদল করে প্রায় সকল রোগই সারিয়ে দিচ্ছেন। এ বিষয়ে ডাঃ বোরিস্ বেগোরকের নাম বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে। মস্তিষ্কের Cinema X-Ray বা ছায়াছবি দ্বারাই রোগের অবস্থা ধরা পড়ে (The X-Ray apparatus will be turned on and a large series of photographs will disclose the brain's illness.) সোভিয়েট ইউনিয়ন

• • • •

চন্দ্রলোকে যদি যাতায়াত আরম্ভ হয় তখন সেখানে স্ত্রীলোকদের কেন যাওয়া উচিত নয়, এই নিয়ে খুব আন্দোলন চলছে। ডাক্তারেরা নারীদেহ সম্পর্কিত ব্যাপারে নানা অভিমত ব্যক্ত করে বৈজ্ঞানিকগণকে সাবধান করে দিয়েছেন, (A warning note to interplanetary scientists about women passengers—"Keep women off the moon") এ বিষয়ে নানাদেশে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রকেটক্ষেপণকারী দেশসমূহের প্রতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নারীদেহতত্ত্ববিদ্গণ প্রায় সকলেই একবাক্যে অনুরোধ জানিয়েছেন—"Don't let them send a woman into space."

ডেলি মিরর

• • • •

প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে আমেরিকার সাম্প্রতিক ভোটের ব্যাপারে দেখাবে টেলিভিশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাতে প্রত্যেক ভোটার ঘরে বসে নিজের কানে পদপ্রার্থীর আবেদন নিবেদন শুনতে পেয়েছেন। (The exceptionally wide use of television in this presidential campaign may serve to change some voter's concepts of the candidates) পরের মুখে ঝাল না খেয়ে, মিথ্যার কাহিনী সত্য বলে না মেনে কি ভাবে উপযুক্ত পদপ্রার্থীকে প্রেসিডেন্টের আসন দেওয়া যায় এ হোল প্রত্যেক মার্কিন নাগরিকের চিন্তার বিষয়, দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী নিক্সন ও কেনেডি টেলিভিশনে মুখোমুখি তর্কবিতর্ক করেছেন। এতে ভোটারদের নিজস্ব অভিমত গঠনের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। লাইফ

বিশ্ব-সাহিত্য

হমেন্

ও

বিয়ের কেক্-এর টুক্‌রো টাক্‌রা

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পোলীয় হতে অনূদিত)

অনুবাদক : ডঃ হিরণ্ময় ঘোষাল

হমেন্

সূর্য্য অস্ত যাবার সময়ে আকাশটা লালে লাল হয়ে উঠেছে। আলোর ছটাগুলো যেন হাওয়ায় দুলে নাড়ীর মত ধপ্ ধপ্ করে। বাতাসের বলকে বলকে এখনই বেশ একটু হেমন্তের কষায় পূর্বাভাসের সন্ধান পাওয়া যায়; দূরের ফসল কাটা মাঠ, ধুলো, ঝেড়ে ফেলা খড়-নুড়ো আর আসন্ন বাদলের সোঁদা গন্ধ।

তোলুশ্ খানিকক্ষণ আস্তে আস্তে কাটিমে টনহুতো জড়ালো। ঘুড়িটা অবাধ্যভাবে ঘুরপাক খেতে খেতে ওপর থেকে নেমে এলো। জমির কাছাকাছি এসে নেসপাতি গাছটার গোড়ায় আটকে পড়বার মতলবে ছিলো, কিন্তু ছেলেটা ভরসা করে এক টান মেরে গাছগুলোর মাথখান দিয়ে মাটিতে এনে ফেললো।

ডোবাগুলো থেকে সোঁৎসোঁতে ঠাণ্ডা মিশ্রী একটা হেপ্‌সানি উঠছে। গা সির্ সির্ করে। হঠাৎ আকাশটা যেন ঘপ্ করে নিবে গেলো।

তোলুশ্ ঘুড়িটা বগলে চেপে ধরে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবে এমন সময়ে তার নাকে এলো ধোঁয়া আর টাটকা রুটী সেঁকার গন্ধ।

—মাচু'! কোথায় তুই? আধো অন্ধকার দরজা লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে ডাকলো।

কেউ জবাব দেয় না, সুতরাং ভিতর কামরার সিঁড়ির দিকে চল্‌লো। নানা আকারের সেলেট—পাখর বসানো, ঘুপটি দরজালানটা ধরে মেটে তেলের মিটমিটে আলোটা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলো।

মার্চা বেঞ্চির ওপর শুয়ে বিমোচ্ছে। পুঁটুলীর গলায় বাঁধা নেকড়ার কালির মত তার মাথায় বাঁধা রুমালটা খরগোসের কানের মত দুদিকে খাড়া হয়ে উঠেছে। চুলকায় করা হেওয়ালে তার অদ্ভুত ছায়া। রুটি সেকা চুলাটার খাঁচে খুব চাপতে পারে নি। সেঁকা রুটিগুলো পাশেই একটা বেঞ্চির উপর একটা সরু মসিনা সুতোর চাদরে ঢাকা। ভারী সুন্দর গন্ধ ভুর ভুর করছে। জিভে জল আসে। চুলাটায় ছোট

ছোট লোহার দরজাটুকো আধো খোলা। ভেতরে বিলম্ব বেরালের চোখের মত কয়েকটা আলোর শিখা অলসভাবে জ্বলছে।

তোলুশ্ পা টিপে টিপে কাছে সরে এলো; বেকিটার কাছে উবু হয়ে বসে ইঁদুরের মত দাঁত দিয়ে এক টুকরো রুটি কেটে নিতে চেষ্টা করলো, কাঠ কয়লা আর ক্ষুধা জাগানো গন্ধে ভরা শুকনো বাঁশ কলির পাতা দিয়ে ঢেকে সেঁকা। রুটির ওপর থেকে খড়ের বিহুনীটা সরাতেই সমস্ত চাদরটা যেন জেগে ওঠে; বেকিটা থেকে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে হিস্‌হিস্ করে স্প্রিঙের মত ছিটকে পড়লো কতকগুলো সাপ।

ছেলেটা আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে।

—ঠাকুর রক্ষে কর!—মার্চা বুকের উপর ক্রুশ্‌চিহ্ন আঁকে।—কে, রে? ও:, তুই! ভয় কিসের? ও গুলো পোষা। ভেলেসাপ—রুটির ওপর শুয়ে একটু গাওলো সেঁকে নিতে এসেছিলো। এখন থেকেই ভিত-কামরায় শীত কাটাবার জন্ত আসতে শুরু করেছে। দেখনা, কেমন পোষা নেটি পেটি জন্তু ওগুলো—এক হাত দিয়ে ছেলেটাকে কাছে টেনে এনে আর এক হাত দিয়ে খপ্ করে একটা সাপকে ধরে ফেলে ওর গালে ঠেকিয়ে বললো—এগুলো কামড়ায় না। দে গায়ে হাত বুলিয়ে দে, ভয় করিস নে।

—ফোঁস্ ফোঁস্ করছে যে।

—তোকে চেনে না বলে ওরকম করছে। ওটা ছোবল নয়, জিভ, এই দেখ্—সাপটার হুরতনের মত মাথাটা নিজের গালে বুলিয়ে বলে—আমায় চুমো খাচ্ছে। তোর মনে নেই, শীতে একদিন খড়ের তলা থেকে রেনেতা সেউগুলো বের করে নেবার সময়ে তোকে একটা সাপ দেখিয়েছিলুম, কাঠ হয়ে ঘুমুচ্ছে—নিরীহ জীব এগুলো, একেবারে হাতের কাছে এসে ধরা দেয়—কখনো কখনো রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়লে ওরা আমার খাটের ওপর এসে ওঠে।

তোলুশ্ ভয়ে ভয়ে সাপের পিঠটা হাত দিয়ে একটু ছোয়।

—ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা, বিচ্ছিরি।

—প্রথমটা এ রকম লাগে, তারপর তোর গা থেকে যখন খানিকটা ওম্ নিয়ে নেবে তখন বুঝতেই পারবি নি যে তোর কাছে শুয়ে আছে। নে ধর্।

তোলুশ্ সাপটাকে হাতে নিলো। ওটা তার হাতের চারপাশে জড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। গায়ে হাত বুলোতে দিলো, তারপর আস্তে আস্তে শান্তভাবে হাঁটু বেয়ে পাথরের মেঝেয় নেমে পড়ে চুলাটার তলার গর্তের ভেতর ঢুকে পড়লো।

—মার্চা, আমায় একটু রুটি দেনা।

—গন্ধ পেয়েছিস্ বুঝি? দাঁড়া, আগুনের তলায় সেকা রুটীগুলো প্রায় হয়ে এসেছে। একমুঠো খড় টেনে নিয়ে জ্বালিয়ে চুলাটার ভেতর দিককার রুটিগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। ছোটো চেপটা একটা শিভেরুটি আঙুল দিয়ে টিপে বললো:

—হ্যাঁ, এইটে ছোটো কিনা, হয়েচে যা···প্রাক্সেধার কাচে। গিয়ে বল, যেন বেশ খানিকটে মাখন আর নুন মাখিয়ে দেয়। তা না হলে এগুলোর ঠিক সোয়াদ পাওয়া যায় না।

গরম রুটিটা হাত বদলাতে বদলাতে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে চললো তোলুশ্। রান্নাঘরে মেঝের

তলায় কুকুরগুলো শুয়ে দুধ বোঝার সময়ের অপেক্ষা করছে। প্রাক্সেদা কাঠের হালানটার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যেন বহু মেহনৎ করে-ওঠা চাঁদটার দিকে তাকিয়ে আছে।

—দেখ্ দেখ্, আকাশে কি হচ্ছে—ছেলেটার কাঁধে হাত দিয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো—কী একটা অমঙ্গল ঘটবে, আকাশটা তা স্পষ্ট অক্ষরে জানিয়ে দিচ্ছে!

প্রকাণ্ড চালের মত চাঁদটার ওপর শুধু এক টুক্‌রো মেঘ। নীচে কাঁচের মত বাঁকানো দুদিক তার পর তলোয়ারের ফলার মত সোজা হয়ে ওপর দিকে উঠে গিয়ে যেন চারি পাশের বিরাট শূন্যকে শাসাচ্ছে। তার ধারটায় একটু আঁধারে ভাব, যেন রক্ত জমাট হয়ে আছে। মেঘের তলাটা ক্রমে হালকা হয়ে এসে রূপোর মত ঝক্‌ঝক্ করতে লাগলো। তার পর সমস্ত ছবিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো।

—আমাদের কোনো একটা অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে। হে ঠাকুর রক্ষে কর—প্রাক্সেদা বলে কাতরভাবে। গ্রামের বসতির মেয়েগুলো ঠিক সেই সময়ে রান্নাঘরে ঢুকলো হুড়মুড় করে। খিল্‌খিল্ করে হাসতে হাসতে তারা দুধের বাল্‌তি আর মিষ্টি মাঠার পাত্রগুলো দুম্‌দুম্ করে মেঝের উপর বসিয়ে দিলো। কুকুরগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। তারা আড়ামোড়া ভেঙে বেরিয়ে এসে লেজ নেড়ে অভিবাদন জানায়। চুলাটার লোহার পাতের তলায় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ঘোর-মেজাজী আগুন, গৃহস্থের বন্ধুর মত। বুড়ী ঝি জল-শুদ্ধ মাখনের মাটির ভাঁড়টা নাবিয়ে এনে তোলুসের রুটির উপর পুরু করে মাখিয়ে দিলো।

তোলুস টুকে টুকে কামড় দেয়। মাঝে মাঝে গলন্ত মাখনের একটু চেটে নিয়ে ধারে কাছের লবণ নুনের দু'একটা টুকরো চিবিয়ে চিবিয়ে সবটার স্বাদ একত্র মেশাতে চেষ্টা করে। এক একবার তাকায় চাঁদটার দিকে। ওদের ঐ জমিদার বাড়ীর মাথার ওপর ঝুলছে চাঁদটা যেন ক্রমেই কেঁপে ফুলে উঠে আস্তে আস্তে কাছে সরে আসে। রোমের টুপী মাথায় ইহুদীদের পুরুতের মত কতকটা তার মুখভঙ্গী। একেবারে কাছে এসে পড়লো বুঝি—

—তোকে ভয় করবো না আরো কী?—তোলুস্ ঘুঁষি পাকিয়ে শাসিয়ে রান্না ঘরের ভেতর দিকটায় সরে যায়।

চাঁদ কিন্তু চৌকাঠটা পর্য্যন্ত আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে আরো বেহায়া, বেপরোয়াভাবে এ ঘরে আসে। পৃথিবীর ওপর যেন নীল গোধূলির বীজ ছড়িয়ে দেয়, রূপালী ধূলোয় হাওয়া ঘোলাটে হয়ে ওঠে, আর তোবাগুলো ঝক্‌ঝক করে যেন পারায় ঢালা। এলো পূর্ণিমার রাত, কাক—জ্যোৎস্নায় নীতের আমেজ লাগা।

তোলুসের চোখে ঘুম আসে না। নিশ্চয় অনেক রাত হয়ে গেছে। জানলাগুলোয় পর্দা টানা থাকলেও বাইরের আলোর রূপরূপানি চোখে পড়ে। পর্দার সরু এক ফালতি ফাঁকের ভেতর দিয়ে চোখ টিপে ঘুমন্তদের জাগিয়ে দিতে চেষ্টা করে। বুড়ো পাদ্রে অঘোরে ঘুমোচ্ছে; তার পাদুটো গুটানো, আর একটা হাত লম্বা করে মেলা। ভুঁয়ার শুভ্র বালিশগুলোর ওপর গালে চড়ায় ভর করে শুয়ে আছে। আধো-খোলা দরজার ওদিক থেকে পাশা কুমারী ভেরোনার মৃদু গম্ভীর নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া যায়। কুকুরগুলো গুঁটিশুঁটি হয়ে শুয়ে স্বপ্নে শিকার করছে। সমস্ত বাড়ীটা যেন কিসের মায়ায় আচ্ছন্ন।

শুধু আসবাবগুলো অসম্ভব রকমে খটাখট্ আওয়াজ লাগিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে গা-ছমছম্ করা খস্‌খসানি যেন চুপিচুপি বলা কী একটা নিগূঢ়, রহস্যময় সঙ্কেত মন্ত্র। তোলুস একটু পাশ ফিরলেই

সব থেমে যায়। তখন ঘরের নিস্তব্ধতা আরো অসহনীয় হয়ে ওঠে, মনে হয় যেন সমস্ত ঘরটা কান পেতে শুনছে, সে ঘুমিয়ে পড়লো কি না।

তোলুশ পাশ ফিরে শুয়ে গভীর টানা টানা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমের ভান করে; চোখদুটো একটু খুলে রেখে খুব সতর্কে তাকিয়ে থাকে। চাঁদের আলো আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলেছে; বিছানার ধারে এসে ক্রমে তার মুখের ওপর এসে পড়ে। তার চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, তারপর আস্তে আস্তে মেয়ের হাতের ভাঁটা—আলোর মত নিবে যায়।

খাবার ঘরে আলমারী-ঘড়ীটা ঘণ্টা বাজানো শুরু করলো। তোলুশ গুণে চলে। প্রত্যেকটা ঘণ্টা আগেকারটার চেয়ে জোরে যেন গির্জা ঘড়ির মত বেজে চলে। শেষের গুলোর কাঁপা কাঁপুনিও যেন দেওয়ালে দেওয়ালে মিলিয়ে গেলো। বারোটা। মাঝরাত।

হঠাৎ সমস্ত আসবাবগুলো নড়ে উঠলো। নীচু পায়া-ওয়ালা ভারী আলমারীটা একটা পাক খেয়ে জোরটার দিকে এগিয়ে যেতেই সেটা নিঃশব্দে খুলে গেলো। আসবাবগুলো একে একে বেরিয়ে যেতে শুরু করলো। তোলুশের কিন্তু একটুও ভয় করে না। এমন কি ঘরটায় যখন পড়ে রইলো ছুটো খাট আর ঘুমের ঘোরে রমাশার হাত-রাখা ছোট মেজটা তখন তার ভারী হাসি পেলো: মেজটা অসহিষ্ণুভাবে ছটফট করছে। রমাশার অবশ হাতটা সরে যেতেই সেটা ছাগলের মত লাফাতে লাফাতে পায়াগুলো দিয়ে খটখট শব্দ করতে করতে বারান্দা দিয়ে দৌড়লো।

—কী ব্যাপারটা চলেছে ওদিকে—তোলুশ, চুপিচুপি বলে—ওরা পালাচ্ছে কোথায়?

খালি পায়ে মেঝের নেমে পড়তেই ঠাণ্ডায় তার গাটা সিরসির্ করে উঠলো। বিছানাটার গা চাপড়ে বালিশটাকে চুপিচুপি বললো:

—থাক্ এখানে, আমি ঘুমোচ্ছি না!

বলে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে গেলো। সেখানে শুধু একটা ঝেদারা পড়ে আছে। তার ওপর কম্বেটেরিয়ারগুলো ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্তদের নাক ডাকানি আর প্রশ্বাসের ঘনঘন শিসে যেন অন্ধকারের সর্বাঙ্গে শিরা সৃষ্টি করেছে। উঠোনে বেরবার দরজাটা হাট করে খোলা। চাঁদের আলোয় যেন খড়ি গোলা।

হাত দিয়ে দেয়াল ধরে নীচে নেমে গেলো। খুব সতর্কে বাইরে তাকালো। চারিদিক ফাঁকা ভোঁভাঁ করছে। কিন্তু বাগানের ফুটফের মত ছায়াবীথির ভেতর দিয়ে তার নজরে পড়লো, বড় রাস্তায় কিসের যেন একটু চাকলা।

একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে সে ফটকের কাছে এসে পড়লো। গ্রামের দিক থেকে আসছে নিঃশব্দে মিছিল: সবার আগে দীর্ঘ ছায়া ফেলে চলেছে গির্জার সবজের প্রতিকৃতির পতাকা আর নানা শোকপন্থী সম্প্রদায়ের নিশান। তারপর বড়, ছোট আলমারীগুলো, দেরজারের জিনিষগুলো বাজাতে বাজাতে; কদম চালে চলেছে লম্বা বেঞ্চিগুলো। ঘোড়াদের জল খাওয়াবার কাঠের ভাগাড়িগুলো চলেছে গড়াতে গড়াতে। সদ্য জেগে ওঠা একটা বাচ্চা কুকুর ওদের লক্ষ্য করে ঘেউঘেউ করে ডাকতে লাগলো। রোঁয়া খাড়া করে লাফ দিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে পলায়মান একটা ছোট মেজকে রুখতে চেষ্টা করলো, কিন্তু একটা মোটা, রাঙা-পড়া পিপে গড়িয়ে এসে হঠাৎ

কাৎ হতে তার মাথায় পায়ের মত ভারী জল ঢেলে দিলো। কুকুরটা শুধু একবার কেঁউ করে উঠে ঠাণ্ডা আর ভয়ে থরথর্ করে কাঁপতে লাগলো।

নিঃশব্দে মিছিল বড় রাস্তার মোড়ে প্রকাণ্ড কাঠের স্তূপটার কাছে এসে থামতেই হঠাৎ করে ধ্যানের ঘণ্টাটা ধাতব হাহাকার ধ্বনি করে উঠলো। তোলুস উপলব্ধি করলো, তার বুকটায় যেন হাতুড়ী পিটোচ্ছে ভয়ে তার সমস্ত গাটা শুকিয়ে খরখর্ করছে। আসবাবের দরজাগুলো কাঁচ্-কোঁচ করছে, দেরাজগুলো পড়ছে হুড়াড় করে, হাঁড়ি-কড়ার ঢাকনাগুলো বক্‌বক্ করে—ঐ সমস্ত নির্জীব জিনিষপত্রগুলো থেকে উঠলো এক বিরাট, কাতর, সমস্বর প্রার্থনা।

"মৃত্যুর অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা করো প্রভু!"

"আগুনের লেলিহান্ জিহ্বা থেকে উদ্ধার করো, হে করুণাময়!"

কুকুরটার লম্বা ছায়া পড়েছে; তার সর্বাঙ্গে কুসংস্কারী হাতের বোলানো নেকড়া-কালি, কামিজের কালি হাওয়ায় পৎপৎ করে। কিন্তু করুণার অধীকারের হুংকার মাত্র উচ্চারিত হলো না। সেই নীরবতা হলো মতদান।

তোলুসের গলায়, চোখে কান্না ঝাপিয়ে উঠলো। তার বুকটা হাহাকার করে। কিন্তু ধ্বংসের মতকে নাকচ করতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো। ঘুমন্তদের গলার ঘড়ঘড়ানি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

—ওরা এখনো কিছু জানে না—কাতরস্বরে বলে নিজের মনে—কী যে হবে, ওরা কল্পনাও করতে পারবে না!

বোনের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখের দিকে তাকালো। ঠোঁটে মৃদু হাসি, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাকে জাগাতে সাহস হয় না।

পেছনে খরখরানি আর খটখট শব্দগুলো শুনতে পেলো। আসবাবগুলো ফিরে আসছে। তাড়াতাড়ি খাটে উঠে পড়ে ঘুমোবার ভান করে। তারপর কখন যে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে তা টের পায় না।

সকালে যখন প্রাক্তেরা রান্নাঘরের দোরটা খুলে দিলো, আর মার্তা বৈঠকখানার ঝাঁট দিতে গেলো, তখন তোলুস তাদের বললো, রাতের সেই দৃশ্যের কথা।

—ও হুমেন্—বুড়ী ঝি বলে চিন্তিতভাবে—ওরকম হতচ্ছাড়া অলুক্ষণে মিছিল খুব কম লোকে দেখেছে। খুন লেগে যাবে।

—কী যে আবোল তাবোল বকিস্, মাচুঁ! বাচ্চাটার মাথায় ঐসব ঢোকাস, আর রাতে ভূত-পেরেতে ওর গলা টিপে ধরে—প্রাক্তেরা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, যেন ওসব ছাইভস্মে বিশ্বাস করা তার রীতি নয়—রাতে কাঁচা রুটি গিলেছে, তাই পেট কেঁপে ঐসব স্বপ্ন দেখেছে···

—হ্যাঁ, অবিশ্যি তাও হতে পারে—বুড়ি ঝি আগ্রহ ভরে একমত হয়। তারপর ধামাগুড়ি দিয়ে বড় মেজটার তলায় ঝাঁট দিতে দিতে বলে—তবে বল দিকিন্, এই কাটকাটরাগুলোর অত ঘুলো এলো কোত্থেকে? এই কালই তো সব ঝাড়াপুড়ো করিচি। দেখে তো মনে হয় বাছাধনরা রাতে বড় রাস্তায় খুব খানিকটা টহল দিয়ে এসেচে।

বিয়ের কেক্-এর টুকরো টাকরা

বিশ্বাস এবার ওদের করতেই হলো। একদিন রাত্রে আকাশ থেকে থেকে অমঙ্গলের বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো আর দিগ্‌বলয় কাঁপিয়ে হানা দেয় অশুভ বজ্রধ্বনি। ঘূর্ণিঝড় ক্রমেই এগিয়ে আসছে। তাতা * মার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলো। মাঝে মাঝে ওপর দিকে তাকায়। যেন দিদা এখনো বেঁচে। দরকার হলে এখনো তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে পারা যায়। শেষ পর্যন্ত গাড়োয়ান মিঙ্গলায়কে ডাকা হলো। চলে যাবার সময় ঠিক করা হয়ে গেছে।

ছেলেমেয়ে দুটোকে বারবার তাড়া দেওয়া হচ্ছে। তারা যে কোথায় বসবে কি দাঁড়াবে, ঠিক করতে পারে না। তাদের সঙ্গে ঘুরছে কুকুরগুলো। ওরা বেশ বুঝতে পেরেছে, কী একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। তোলুনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন জানাতে চায় : "আমাদের ফেলে চলে যাবে না তো তোমরা!"

মা সংযতভাবে আলমারী থেকে কাপড়-চোপড় বের করে চের দিয়ে রাখছে—"এগুলো মাতার জন্যে, ওগুলো প্রজেবার আর ঐগুলো আন্তাবলের মেয়েগুলোর।" সামান্য কিছু তোরঙ্গে পোরা হলো।

হুআপা মাকে সাহায্য করছে। পুরানো একটা ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে মা একটা বড় মখমলের বাক্স বের করলো। হাঁটু গেড়ে দু'হাত দিয়ে তুলে নিয়ে বাক্সটাকে কানের কাছে নেড়ে কী ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলো।

—ওর মধ্যে কী আছে মামুমা?

—দেখ্‌না, নিজেই খুলে……

মেয়েটি খুব সাবধানে ঢাকনাটা খুলে ফেললো। ভেতরে কাগজের মরি আর করোকাটা কাগজের ঝিনুকগুলোর মধ্যে (যাতে সাধারণতঃ চকোলেট্ রাখা হয়।) খড়খড় করছে কেক্-এর গুঁড়ো, বরফ-চিনির টুকরো আর একটা শুকিয়ে পাথর হয়ে যাওয়া ফলের হালুয়া।

—এগুলো কেন তুলে রেখেছিলে, মা?

—ওটা চকোলেটের বাক্স। বিয়ের দিনে পেয়েছিলাম। পুরোনো আমলের একটা কথা আছে, ঐ বাক্সর বিয়ের নেমন্তন্নের পর কেক্-এর টুকরো-টাকরা তুলে রাখতে হয়। পরে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হলে বাক্সটা স্বামীর বালিশের তলায় গুঁজে দিলে বিয়ের দিনের অতিথিদের দেওয়া সব শুভ-ইচ্ছা ফলতে শুরু করে, রাগ পড়ে আসে, কপালের ওপর অভিমানের রেখাগুলো মুছে যায়। আবার হয় মিল।

—প্রায়ই তোমার ওটাকে বালিশের তলায় রাখতে হতো?—আলমারীর ভেতরে বসে তোলুন শুধায়। তাঁবুর ক্যাপ্‌টা দরজার মত করে ফ্রকগুলো তুলে ধরে।

—একবারও না—স্নেহের হাসি হেসে মা বলে।—জানলার কাছে গিয়ে, নিবন্ত মেমন্তন্নের পোড়া-মাটি রঙের বাগানটার ওপর খুলে দিয়ে জানলার ওপর বাক্সটা উপুড় করে ঝেড়ে খালি করে দিলো।

—যা তোরা, ডানা পৎপৎ লেজ-ঝোলা! ঐ টুকরো-টাকরার মধ্যে—যা কিছু আশীর্বাদ—যা কিছু শুভ ইচ্ছা আছে, তা যেন তোদের বিপদ-আপদ কাটিয়ে বাঁচিয়ে রাখে ……তারপর ছেলেমেয়ে দুটোর দিকে ফিরে মা বলে—যতক্ষণ সবাই এক সঙ্গে সুস্থ শরীরে থাকতে পারবো আমরা, তার চেয়ে বড় সুখ চাই না আমার, তা সে তাগা আমাদের যেখানেই নিয়ে গিয়ে ফেলুক না কেন।

ছেলেরা মাকে জড়িয়ে গালে গাল চেপে ধরে কান পেতে শুনতে লাগলো পাখিদের ঠোঁটগুলো আলসের ওপর বিদায়ের টিকারা জমি করে চলেছে।

---

* পিতা

সিমলায় প্রবাসী বাঙ্গালী

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সিমলা পাঞ্জাবের সর্ব্ববৃহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাহাড়ে শহর অর্থাৎ হিল্ ষ্টেশন ; ভারতে (অনেকের মতে এশিয়াতে) সব চেয়ে বড় হিল্ ষ্টেশন্। লোকসংখ্যা ও আয়তনে অত বড় পাহাড়ে শহর অন্ততঃ ভারতে নেই।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী ভাবে সিমলা তদানীন্তন ইংরাজ সরকারের হাতে আসে ও লর্ড আমহার্ষ্ট সরকারী ভাবে তখনকার রাজধানী কোলকাতা থেকে সদলবলে সিমলাতে আসেন। বাঙ্গালীর আবির্ভাবও সেই সময় থেকে সিমলাতে শুরু হয়। সিমলার বিখ্যাত কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাও ঐসময়ে হয়।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও লাটের কার্যকরী সমিতির (Executive Council) সদস্যদের মধ্যে বাঙ্গালী বরা, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, কৃতী স্যার বি. এন মিত্র প্রমুখ বহু বঙ্গীয় সাহায্যে ও অবাঙ্গালীর দানে কালীবাড়ীর উত্তরোত্তর উন্নতি হোতে থাকে। ভারতের ভাগ্য বহুবার সিমলাতে নির্দ্ধারিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালের সিমলা কনফারেন্স এর সাক্ষ্য দেবে। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান এখানে দুটী :—(১) কালীবাড়ী, (২) সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনী। দ্বিতীয়টির স্থাপনা ১৯২৩ সনে। এই সময়ে সিমলায় seasonal বাঙ্গালী আসা যাওয়া করতেন যখন কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলি গরমে ও শরৎকালে (অক্টোবর মাসে) দিল্লী থেকে সিমলাতে আসত। ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে বহু অফিস এখানে স্থায়ীভাবে আছে ও সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড-এর ২।৩টী অফিস দিল্লী ও চিত্তরঞ্জন থেকে উঠে এসেছে। এ ছাড়া পাঞ্জাব সরকারের এখনও কিছু দপ্তর এখানে আছে। হিমাচল সরকারের সব দপ্তর এখানে। সিমলা হিমাচলের রাজধানী হলেও সিমলার আসন অবস্থান পাঞ্জাবে। আন্দাজ শ'চারেক বাঙ্গালী বর্ত্তমানে সিমলায় আছেন। বঙ্গীয় সম্মিলনীর পাঠাগার আছে ও বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীপনা বজায় রাখবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে বঙ্গীয় সম্মিলনী। এই সম্মিলনী পূজাপার্ব্বণ আর অন্যান্য অনুষ্ঠান যেমন, ১লা বৈশাখ, রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী, ১৫ই আগষ্ট ইত্যাদি উপলক্ষে বাংলা নাটক-নাটিকা মঞ্চস্থ করে বাঙ্গালীর কৃষ্টিকে এখানে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে থাকে। বলা বাহুল্য যে এই নাট্যানুষ্ঠান বাদে বাঙ্গালার নাট্যজগতের সাথে স্থানীয় বাঙ্গালীদের সংযোগ রক্ষার অন্য কোন উপায় নেই। মাঝে মাঝে বাঙ্গালা চলচ্চিত্র আসে কিন্তু সংখ্যাতে খুবই কম। সেটাও আসে স্থানীয় সিনেমা হলের মালিকদের মর্জি ও রুচি অনুযায়ী।

বর্ত্তমানে এখানে সব রকমের বাঙ্গালী চাকুরে আছে। কেরানী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, সামরিক অফিসার, কিন্তু, এখনও পর্যন্ত দুঃখের বিষয়, official মর্য্যাদা ও বেতনের অঙ্ক দেখে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গড়ে ওঠেনি—যেমন হয়েছে নয়া দিল্লীতে।

এখানে বারো মাস শীত। বছরে তিন মাস সিমলা প্রায় তুষারে আবৃত থাকে, কাজেই ২।১ মাস বাদে সারা বছরেই বিজাতীয় পোষাকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় ও তার চলন আছে। স্কুল ও কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রীরাও সালোয়ার কামিজ পরিধান করে থাকে। রাস্তায় পোষাক দেখে বা অফিস যাবার সময় বাঙ্গালী বা অবাঙ্গালীর পোষাক দেখে কে কি চাকুরি করে অনুমান করা শক্ত।

বাঙ্গালী পরিচালিত বিদ্যালয় আগে ছিল। বর্ত্তমানে হিন্দীর মাধ্যমে পড়াশোনা করা ছাড়া উপায় নেই। গোটা দুই কলেজ এবং ছেলেমেয়েদের জন্য সর্ব্বসাকুল্যে ৮।১০টী High school ও Higher Secondary আছে। মেয়েদের একটা B.T. College ও আছে। স্থানীয় Art school ও আছে ও বর্ত্তমানে B.T. College ও Art schoolএর অধ্যক্ষ বাঙ্গালী।

তিন চারজন বাঙালী এখানে বাড়ী ঘর করে স্থায়ী বাসিন্দা হোয়ে গেছেন। তবে ১৮।২০ বছর আছেন এ রকম বাঙালীর সংখ্যাও আন্দাজ ৪৫।৫০ জন হবে।

বাঙালী মহিলাদের পশমের কাজের খুব চল আছে ও নিতানতুন সোয়েটার পরিধানও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা অল্পবিস্তর আছে তবে শেখবার বা শেখাবার সুযোগ খুবই অল্প। বছরের দিকে সাজগোজ করে মলে রোডে ঘোরা থাকে অনেকে 'হাসিং' অথবা হাঁটা করে 'Malpractice' বলেন—তারও চলন আছে। ধর্মত অবাঙালীরা বিশেষত পাঞ্জাবীরা একই রাস্তাতে অন্তমাইলে আট বার চক্কর দিয়ে থাকেন। সিজনে (অর্থাৎ গরমের দু'মাস যে জুন ও অক্টোবর মাসেতে ফ্যাসন প্যারেড দেখা যায়। ভারতবর্ষ যে দরিদ্র দেশ তা সিমলার মালে বেড়ালে বোঝা শক্ত।

কথায় বলে যেখানে বাঙালী সেখানে কালীবাড়ী ও সেখানেই নাকি দলাদলি। সিমলা কালীবাড়ী বিখ্যাত। দৈনন্দিন পূজা বাদে এখানে সস্তায় বাঙালীদের (অবাঙালীদেরও) আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। দলাদলি সামান্য থাকলেও বর্তমানে মধ্যে নয় এবং একটু না থাকলে বোধ হয় জীবন বড় বেশি শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কালীবাড়ী জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বজাতির শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হোয়েছে কালীবাড়ীর হল সিমলাতে সবচেয়ে বড় ও চাইলে ভাড়া পাওয়া যায়। এখানে সব রকমের "ফাংশন" বা অনুষ্ঠান হোয়েছে বা হোয়ে থাকে।

সিমলার দুর্গাপূজা সত্যই দর্শনীয়। একটা পূজা হয় এবং অবাঙালীরা অর্থ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনী নাটকাদি মঞ্চস্থ করে থাকেন। পূজার বৈশিষ্ট্য এই যে বাঙালীতে অবাঙালীতে কোন ভেদাভেদ থাকে না। নবমীর দিন সমস্ত বাঙালী প্রীতিভোজে যোগদান করেন। পুরুষ ও মহিলা দলে দলে আসেন। পূজার সময়ে ভ্রমণেচ্ছু বাঙালীও প্রচুর আসেন। দশমীর দিন সন্ধ্যাতে প্রতিমা বিসর্জনের পরে শান্তিজল নিয়ে শুরু হয় এক অনুষ্ঠান যখন বিষাদ ও মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে প'চারেক লোক কোলাকুলি করে—সারা বছরের তিক্ততা তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল তলে। মিষ্টি খাওয়া ও খাওয়ানও অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ হয়।

বঙ্গীয় সম্মিলনী বছরে এইবার Indoor ও outdoor sports-এর আয়োজন করে ও ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। এছাড়া নেতাজীর জন্মদিবস, ১লা বৈশাখ, ২৫শে বৈশাখ, সরস্বতী পূজো, ১৫ই আগস্ট উপলক্ষ্যে উৎসবাদি হয়ে থাকে। দুর্গাপূজাতে অনেকগুলো অভিনয়ের আয়োজন হয়ে থাকে।

শীতকালে মাস তিনেক (নভেম্বর থেকে জানুয়ারী) স্থানীয় বাঙালীদের কার্যকলাপ খুব কমে যায়। তবে কিছু বাঙালী আইস্ হোকি ক্লাবে যোগ দেন। তুষারপাতের পরে বহু লোক বেড়াতে বেরোন। অনেকে শীতের সময় ছুটিতে বাড়ী চলে যান। বাঙালীদের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি আছে যা সমতল ভারতে চোখে পড়ে না। বাঙলা সিনেমার সময়েও অল্পবিস্তর রিইউনিয়ন হয় কাজেই বাঙলা ছবি সহরে যখন আসে তখন আনন্দের সাড়া পড়ে যায়।

সিমলাতে যানবাহন নেই বল্লেই চলে—একমাত্র চারজনে টানা রিক্সা বাদে। সবাই এখানে পদযাত্রা করে থাকেন। এই কারণে দৈনিক হাজার ফুট চড়াইভাঙা বা ৭।৮ মাইল হাঁটা নিত্যকর্ম বলা যেতে পারে। ছুটিছাটাতে আশেপাশে পিকনিক করাও বাঙালীদের একটা বিলাস বা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রকৃতির রূপ এখানে রুদ্র বলে বাঙালীরা খুবই কর্মঠ এবং স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বহুলাংশে আমিষভোজী। সিমলার বাঙালীরা অতিথি-বৎসল ও বন্ধু-বৎসল। পরস্পরের আপদে বিপদে না ডাকতেই এখানে সাড়া দেওয়া বা কোলকাতা সহরে দুর্লভ ও আশ্চর্য ব্যাপার বলে পরিগণিত হবে। বাঙালী পরিবারে এখানে whole time ভৃত্য বা চাকর রাখার রেওয়াজ নেই। সম্ভবতঃ সেইজন্য সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো।

এমনি ভাবে সিমলাতে বাঙালীর জীবন কেটে যাচ্ছে। ইংরেজ আমলের Glamour না থাকলেও বাঙালী এখনও এখানে সসম্মানে বজায় রেখেছে।

আমাদের ছুটি এবার পাঁচের
আমাদের শান্তিনিকেতন
সেখানে শুধু কাউকে ডাকব
একটি নিরালা সকাল।

সেখানে শুধু সিরাজদি. তাকে
ফাগুনহাওয়ায় শিমুল শিরীষ ঝরে,
ছায়া সেখানে ঘুমে ঢলে
আর. কিংশুকডালী।

সেখানে আমাদের কাজের ছেলে
কাজের ছুতো কাছে ঘেঁষবে,
সেখানে কাজের ঘড়ি দিয়ে
বিভূতে দীপ জ্বালি
সারা বছরের ক্লান্তি দিয়ে
তাকে ফাগুনে ডাকি॥

২৫ বৈশাখ
১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব

শ্রীকালিদাস নাগ

বীরভূম জেলার আর এক নাম হবে কবি-ভূম। লক্ষ্মণ সেন যুগের অমর কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ রচনা করে নিখিল ভারতীয় মর্যাদা পান; উড়িষ্যা থেকে কেরল দেশ পর্য্যন্ত যেখানে গিয়েছি, স্থানীয় ভাষায় গীতগোবিন্দ গান করছে শুনেছি। তারপর বীরভূমেই দেখা দিয়েছেন দ্বিজ, দীন বা বড়ু চণ্ডীদাস নামে হয়ত তিনজন কবি যাঁদের পদাবলী বৈষ্ণবমাত্রের আদরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালে বিলাত যাত্রার পূর্বে এঁদের রচনা পড়েছেন ও 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' প্রবন্ধ লিখেছেন। তার আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কবি-পুত্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বেড়িয়ে গেছেন ও ছাতিম (সপ্তপর্ণী) গাছের তলায় বসে ব্রহ্ম-সাধনে গভীর শান্তি পেয়েছেন; তার পরিচয় রয়ে গেছে অধুনা বিশ্ব-বিদিত "শান্তিনিকেতন" (Abode of Peace) নামে ও বিশ্ব-ভারতী প্রকাশিত সব গ্রন্থে ছাতিম পাতার নক্সায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শুধু নাম নয়, প্রথম অতিথি-শালা স্থাপন ও তিনদিন অতিথি পরিচর্য্যার ব্যবস্থাও করে গেছেন, তাঁর রচিত Trust deed পড়ে আমরা সে সব জানতে পাই। ব্রহ্মোপাসনার মন্দিরও তিনি স্থাপনা করেন, সেখানে প্রতি বৎসর দেবেন্দ্র দীক্ষাদিন ৭ই পৌষ পালিত হয় এবং এখনো বিশ্বভারতীর সমাবর্তন ঐ দিনেই হয়।

১৯১০ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে I. A পাশ করে বিবেকানন্দের কলেজে (Scottish Church) B. A পড়া শুরু করি; তখন অগ্রজদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক-নটশিশির ভাদুড়ী ও ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি চাটুজ্যে; আরও ছিলেন ৺দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র অরুণ সেন ও তাঁর বন্ধু সুধীরঞ্জন দাস (বর্ত্তমান উপাচার্য্য); এদের দুজন গুরুদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যরূপে শান্তিনিকেতনের ও সেকালের কথা অনেক শোনাতেন। তাঁদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম (১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত) দর্শন করার সৌভাগ্য প্রথম হল, ২৪শে বৈশাখ ১৩১৮ (মে ১৯১১) সালে, যখন শুধু আশ্রমবাসীরাই নয় সারা বাঙলা দেশ মিলে কবি-গুরুর ৫০ বর্ষ-পূর্ত্তি উৎসব করেছিল।

তার আগে বন্ধুর দল আমাকে টেনে নিয়ে যান City College তেতালার হল ঘরে। পুরণো সিঁড়ির ভিড় ঠেলে উপরে ওঠা এক সমস্যা, কারণ সবাই উৎসুক রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শুনতে। ২৭ সেপ্টেম্বর রাজর্ষি রামমোহন রায়ের তিরোধান তিথি উপলক্ষে কবি তাঁর নিজস্ব প্রাণদীপ্ত ভাষায় বলে গেলেন তার অনুলেখন রাখা হয়নি কিন্তু আমাদের মনে প্রাণে গাঁথা হয়ে গেল তাঁর ভাষণ। লেখার দক্ষতা ও সামর্থ্য সেকালে কারো ছিল না তাই ভাষণ দিয়ে কবি নিজেই তার মর্ম্মার্থ লিখে পাঠাতেন ও প্রধানত প্রবাসী পত্রিকায় আমরা

পড়তাম। পিতার আদেশে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকরূপে কিছুদিন কাজ করেন ও দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (১৮৪৩ সালে সুরু) ভারও রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন। পরবর্তীযুগে তাঁর তরুণ জীবনে রামমোহনের প্রভাব কত বড় তাঁর কথায় জানাচ্ছি :—

"আমরা ভারতবর্ষের মন্দিরে সনাতন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিব। পৃথিবীর চারিদিক হইতে ধর্মার্থিরা ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন লালসায় দলে দলে আগমন করিবে তখনই রাজা রামমোহনের জয়! তিনি যে সত্যের পতাকা ধরিয়া ভারতভূমিতে দাঁড়াইয়াছিলেন—সেই পুরাতন সত্যের জয়। তখন রামমোহনের জয়ে, ঋষিদের জয়ে, সত্যের জয়ে, ব্রহ্মের জয়ে—আমাদের ভারত-বর্ষেরই জয়।" এই কথাই ১৯০৯ সেপ্টেম্বর মাসে নূতন করে শোনালেন; আবার সেই বছর ডিসেম্বর মাসে খৃষ্টিয় Overtoun Hall ভবনে লিখিত প্রবন্ধ "তপোবন" পাঠ করেন; সেই প্রাচীন যুগ থেকে এক সত্যেরই সন্ধান করেছে ভারত, তার ব্যাখান দিয়ে কবি আমাদের মুগ্ধ করেন। ১৩১৭, অগ্রাণ মাস থেকে কবি ছাত্র-ছাত্রীদের যে ভাষণ দিতেন নিজেই সেটি লিখে ১৭ খণ্ডে "শান্তিনিকেতন" প্রকাশ করেন; সেই সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাঁর গদ্য রচনা পড়ে ধন্য হয়েছি। আবার মাঘোৎসবের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ সভায় (৬ই মাঘ) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবে ও মহর্ষি ভবনের ঠাকুর-দালান ও বিশাল-প্রাঙ্গণে কবির অপূর্ব্ব ভাষণ 'বিশ্ববোধ', 'আত্মবোধ' প্রভৃতি ১১ মাঘ উৎসবের সাক্ষ্য দিয়েছে। সেই বিশ্বজনীন ভাবধারা হয়ত পুনঃ প্রবাহিত হবে কবির জন্মস্থান (এখন মহর্ষি ভবন) থেকেই সেটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে "রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়"—এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শুভেচ্ছা হয়ত সার্থক হবে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের দ্বিতীয় শতকে।

৮০ বছরের মধ্যে জীবনের শেষ ৪০ বছর (১৯০১-৪১) রবীন্দ্রনাথ এই শান্তিনিকেতনেই প্রধানত কাটিয়েছেন; রবি-হাউস মার্গ-সঙ্গীত ছেড়ে অজস্র সহজ গান লিখেছেন

গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে

পল্লীর স্নিগ্ধ কোল ছেড়ে কবি আমাদের দেখালেন বোলপুরের পাকুল-বন, উদাস করা সূর্য্যাস্ত, ঘন-সবুজ শাল-বীথিকা। আদিবাসী সাঁওতাল গ্রাম ও তাদের চিত্রিত কুটির যেন ছবির মতন তাঁর গল্পে পদ্যে গানে নাট্যে চিরন্তন রূপ পেয়েছে। এই শিল্প বিপ্লবের যুগে ইংরেজ মনীষী E. B. Havell হাত মিলিয়েছেন আমাদের প্রথম স্বদেশী যুগের শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং তিনি এঁকেছেন "ভারত মাতার" প্রাচীর চিত্র ও তার ব্যাখ্যা করেছেন বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতা (কাবুলীওয়ালা গল্পের অনুবাদিকা) Modern Review এবং প্রবাসীতে এসব চিত্র পরিচয় পড়ে আমরা মুগ্ধ হই। কবি-বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ থেকে "গোরা" উপন্যাস ছেপেছেন; আবার ১৩১৬ থেকে কবি প্রবাসীতে, সংকলন বিভাগে, তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের লিখতে শেখাতেন; অনেক তাদের কাচা লেখায় পাকা হাতের ছাপ আছে। কবি যত দেশী বিলাতি পত্রিকা পেতেন তা থেকে বেছে সংকলনে ছাপাতেন; রবীন্দ্র রচনার সন্ধানীরা এদিকে খুঁজলে অনেক তথ্য পাবেন। লেখক রবীন্দ্রনাথের লিপিচাতুর্য্য কত রকম তা বুঝবেন, ১৮৯১ এর 'সাধনা' পত্রিকা থেকে ১৯১৪-১৫ 'সবুজপত্র' পর্য্যন্ত ২৪ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ বাংলা পত্রিকা ও গদ্য সাহিত্যে যুগান্তর এনে দিয়েছেন সেকথাও অনেকে ভুলতে বসেছে।

বাংলার সঙ্গে হিন্দীর চর্চাও এ সময় সুরু হল মরমী পণ্ডিত ক্ষিতীমোহন সেনের আবির্ভাবে। তাঁর 'ভক্তবাণী' কথকতার ধারা ও কবীর এবং দাদু প্রভৃতির সংকলন শুধু বাংলায় নয়—হিন্দী সাহিত্যাকাশে নূতন রশ্মিপাত করেছিল। আবার রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী অনুবাদেরপর কবীরকে ইংরেজী অনুবাদ করে, যাথা দিয়ে তিনি দারা পাশ্চাত্য জগতে নূতন সাড়া তুলেছিলেন (১৯১২-১৪)। ক্ষিতিমোহন তাঁর কাশীচন্দ্রপাঠীর সতীর্থ পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্যকে শান্তিনিকেতনে আনেন আর এই দুই মনীষী শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর শিক্ষা ও জীবনধারায় কত প্রভাব রেখে গেছেন একালের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীরা হয়ত বোঝে না। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনা মুসলমান আমলেও কেমন অব্যাহত ছিল সেটি ক্ষিতিমোহন তাঁর বিচিত্র রচনায় বিশেষ 'চিন্ময়বঙ্গ' গ্রন্থে উপহার দিয়ে গেছেন। তেমনি বৈদিক যুগের মূর্তিমান পণ্ডিত বিধুশেখর, রবীন্দ্রনাথের তাগিদে পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র ও মহাযান-পন্থী তিব্বত চীনের ভাষা শিক্ষা করে বোলপুরের আশ্রমে বসে যে সব কাজ করে গেছেন ভারতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় তার সূচনা করেছেন বহুকাল পরে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে এই দুই মহামনীষীদের কাজ দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছি তেমনি পাঠভবন ও শিক্ষভবনের শিক্ষকদের ঐকান্তিকতা ও রবীন্দ্রভক্তি আমাদের মাতিয়েছিল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সহজে বাংলায় বুঝিয়েছেন প্রধান অধ্যাপক জগদানন্দ রায় এবং ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাস পড়াতেন মাষ্টারমশাই নেপালচন্দ্র রায়। ওঁদের স্নেহভাজন দেশ-সেবক কালীমোহন ঘোষ আজীবন খেটে গেছেন গুরুদেবের শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠায়; এঁদের পৃথক জীবনী সংগ্রহ করে ছাপালে আজকার বিরাট বিশ্বভারতীর ইতিহাস সংকলনে সাহায্য হবে। এঁদের টানেও সর্ব্বোপরি মনীষী রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে, দেশ বিদেশের কত মানুষ শান্তিনিকেতনের আতিথ্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন তাঁদের নাম ধাম ও চিত্রাদি সংগ্রহ করে রবীন্দ্র-ভবনে রাখা উচিত। পুরাতন Visitor's book ও খাতাপত্র অনেক হারিয়েছে; তবু একনিষ্ঠ জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় যত দিন থেকে এখানে বসেছেন তিনি অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আদিকালের ছাত্র তথা শিক্ষক—যথা সন্তোষ মজুমদার, সতীশ রায় ও অজিত চক্রবর্তী অকালে দেহত্যাগ করেন, তাঁদের দানও স্মরণীয়। রবীন্দ্র শতাব্দী উৎসবে (১৯৬১) এঁদের মত বহু নীরব কর্মীদের কথা মনে পড়ছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাই বোনদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) ও স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) দের ও বহু দিন দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল; বিশেষত এঁদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ "বড়দাদা" (যিনি গান্ধীজী ও Andrewsএরও বড়দাদা) শান্তিনিকেতন আশ্রমে বহুকাল কাটিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) তাঁর স্মৃতি অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন; এক দিকে শিশুর মত সরল, কাঠবিড়ালী ও পাখীদের খাইয়ে আনন্দে বিভোর, অন্যদিকে বঙ্কিম যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবি ও শেষ বয়সে দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ কাণ্ট (Kant) থেকে রুশিল ও সমস্ত দর্শনের তুলনামূলক বিচার ধারা এবং বাংলা short-hand 'রেখাক্ষর' বর্ণমালার প্রবর্তক এই বড় দাদা —ছিলেন যেন দুই শতাব্দীর যোগসেতু।

এই সব ভাইবোনদের একত্র দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, ১২০৯ সালে ৬ মাঘ, জোড়াসাঁকো-ভবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে। ১৯০৬ সালে স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ দেখে গিয়েছেন—তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবি শুধু বাংলার নয় সারা ভারত গগনের রবি ও গদ্যে পদ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক, এবং মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের প্রাণস্বরূপও "স্বদেশী সমাজ" (১৯০৮) তথা জাতীয় পরিকল্পনার (planning) জনক ও

বরেণ্য দেশনেতা। পারিবারিক শোক ও দাহনে যেন বিশুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি সোনা; সারা দেশকে তিনি মাতিয়েছেন তাঁর গানে: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে রচিত গান শ্রাদ্ধবাসরে তিনি গাইলেন, "কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো

সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আসো"

গানের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁরই প্রেরণায় কবি সুরকার ও নাট্যকার হয়ে ওঠেন তাঁকে এই শতাব্দী উৎসবে স্মরণ করি। উপাসনার শেষে বড়দাদার ব্রহ্মসঙ্গীত "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি! প্রণমি চরণে তব" উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন রবীন্দ্রনাথ ও নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৫৪) যাকে তাঁর সকল গানের ভাণ্ডারী বলে গেছেন কবি। সবাইকে রেখে পরে সজ্ঞান করেছি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৬) ও পিতামহ দ্বারকানাথ (১৭৯৪-১৮৪৬) যুগের অপূর্ব্ব কাহিনী। পূর্ব্ব দিগন্তে রবীন্দ্রনাথ উদিত হয়েছেন ও, বিরাট বিশ্ব-পরিক্রমার মধ্যে হয়ত পশ্চিমে অস্ত যাবেন এ আশঙ্কাও ছিল, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য তাঁর চির মহাতীর্থেই হল "নির্ব্বাণ" (শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর শেষ অর্ঘ্য স্মরণীয়)।

পৈতৃক অর্শরোগে ভুগে কবি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েন যে বিলাত গিয়ে চিকিৎসা করাবেন তাই Mayo হাসপাতালের প্রধান সার্জ্জন ডাক্তার বিহেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গেই কবি ভাসবেন সব ঠিক। কিন্তু আবার অসুখ বাড়ল ও ডাক্তার মৈত্র চলে গেলেন (১৯ মার্চ ১৯১২) এবং একটু সামলে নিয়ে কবি তাঁর পুত্র ও পুত্র-বধূর সঙ্গে বোম্বাই থেকে তৃতীয় বার বিলাত যাত্রা করলেন (১২ মে ১৯১২)। বিলাতে operation: এর ফল হয়েছিল কিন্তু ১৯৪১ সালের অস্ত্র চিকিৎসা শোচনীয় ব্যর্থতা আনে; তবু মাঝে ত্রিশ বছর (১৯১১-৪১) দেশে ও পরিবারে, নানা বিচ্ছেদ, সঙ্কট ও উৎকণ্ঠার মধ্যেও সতেজে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট সৃষ্টি করে গেছেন বিচিত্র ক্ষেত্রে। দেশে বিদেশে তার সন্ধান সুরু হয়েছে এই জন্ম শতাব্দী উৎসব উপলক্ষ্যে।

এখন আমরা ফিরে তাকাই ১৯১১-১২ সালে; বুঝতে চেষ্টা করি বাংলার রবি ক্রমশঃ কেমন করে ভারতের তথা জগতের রবি তিনি হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেবার বিলাতে মিলিত হন তাঁর প্রথম বন্ধু ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (যুগান্তর ৪ ডিসেম্বর দ্রষ্টব্য), নববিধান আচার্য্য প্রমথলাল সেন, ডাঃ বিজেন মৈত্র ও তাঁর দাদা অধ্যাপক সুরেন মৈত্র (ইনি শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে বিজ্ঞান শিখিয়েছেন এবং এঁরই শিশু সন্তান বন্ধু "বিশ্ব-পরিচয়" লেখায় কবিকে সাহায্য করেন)। ১৯১০ সালে শরৎকালে দেশে ফেরার আগে আমার দুই বন্ধুও কবির বিলাতে তোলা ফটোতে দেখা দেন: হাস্যরসিক শিল্পী সুকুমার রায় (আমাদের 'তাতাদা' ও সত্যজিৎ রায়ের পিতা) এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।

১৯১২ সালে ছড়িয়ে পড়ার আগে আমরা সবাই কবিগুরুকে ঘিরে দুইটি স্মরণীয় উৎসব করেছি। ২৫শে বৈশাখ ১৩১৮ শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসব (৮ মে ১৯১১) এবং কলকাতা টাউন হলে ২৮শে জানুয়ারী ১৯১২তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিমন্ত্রণে দেশজোড়া কবি সম্বর্দ্ধনা। সেই উপলক্ষ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন—

"জগৎ কবি সভায় মোরা তোমায় করি গর্ব্ব
বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব্ব"

"তত্ত্ববোধিনী" সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের উপযুক্ত পৌত্র সত্যেন দত্ত ও তাঁর বন্ধু সুসাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কত বার নিয়ে গেছেন শান্তিনিকেতনে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের আজ স্মরণ

করি, যেমন করি প্রশান্ত চন্দ্রের সুযোগ্য নেতৃত্ব; তিনি ছেলে মেয়ে কত জনের যাদীত্ব নিয়ে এই জন্মোৎসবে আমাদের নিয়ে গেছেন তাবলে বিস্ময় জাগে। কারণ সেই পল্লীগ্রামে কোন খবর না দিয়ে কত বার হঠাৎ আমরা হাজির হয়েছি—কবির সঙ্কীর্ণ ভাণ্ডারে হুলুস্থুল করেছি, হয়ত চলেছে, তাঁর "সন্ধ্যার পরীক্ষা" কিন্তু বাণীর বরপুত্র ঘিয়হাস্তে সবাইকে তুষ্ট করেছেন—কি খেলাম কোথায় শুলাম সব ভুলে গেছি! কিন্তু ভুলিনি তাঁর বদান্যতা আর আশ্রমবাসী শিক্ষক ও ছাত্রদের অক্লান্ত সেবা যা সত্যি অমূল্য। শুনেছি কবির মাসিক বাজেট ছিল ৫০০৲ টাকা মাত্র এবং ক্ষিতিমোহনও বিধুশেখরাদির মাস মাহিনা ছিল ৪০-৭৫ মধ্যে (Servant of India societyতে wrangler Prof Paranjpe ও ৭৫, টাকা মাত্র নিতেন)। হয়ত সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ সাহেব কর্তাদের official grace নিতেন না এবং দেশবাসীর দানেও আশ্রমে তখন ঘরিত হত না। অথচ দারুণ অর্থ সংকটের মধ্যে কবি নীরবে সমাধান করে গেছেন কঠিন যাদীত্ব ও অনেক "সত্যতার সঙ্কট"।

১৩১২-১৩১৮ (অর্থাৎ ১৯০৫-১১) রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া' রচনা শেষ করে 'গীতাঞ্জলি' রচনা যখন এক নূতন শক্তির সন্ধান পেলেন ও দেশবাসীদের দিলেন। আমরা তরুণ তরুণীদের দল—তৃতীয় শ্রেণী (royal class বলতাম) ট্রেনে চেপে হাওড়া থেকে বর্ধমান (সীতা ভোগের দেশ!) উত্তরে দুপুর রৌদ্রে বোলপুর পৌঁছাতাম—রবীন্দ্র সঙ্গীতই সে আনন্দ-যাত্রার সাথী। বন্ধু প্রশান্ত ও তার ভগ্নীরা যেমন আমাদের খাইয়ে তাজা রাখতেন, তেমনি তার অনুজ প্রদ্যুম্ন (মুন্না) তাল বাঁশী বাজিয়ে বলে, ট্রেনে গান শোনাবার ব্যবস্থা ছিল, সে গানের ঝর্ণাধারা প্রাণকে স্নিগ্ধ করত; মনেও পড়ত না যে বীরভূমের কাঁকুরে মাটি আমাদের পাওলো কামড়াচ্ছে আর মাথা ফাটাচ্ছে বৈশাখের রোদ্দুর। আশ্রম কুটিরে উঠেই ছাত্রদের স্নিগ্ধসেবায় মন ভরে উঠত; মাথা পরমের দাওয়াই (কবিরাজ ক্ষিতিমোহনের আবিষ্কার) কুয়োর ঠাণ্ডা জল ঢেলে আমাদের স্নান করত ছাত্ররা আবার তাদের গুরুগোপ ইত্যাদি নিয়ে আমাদের যোগাত গুরুদেবের আশ্রমে আতিথ্যের মান কত উঁচু। তিনি তখন নিজ ছাত্রদের আবাসে এসে তাদের সঙ্গে জলখাবার খেতেন—গল্প বলতেন, গান শেখাতেন আমরাও তার ভাগ পেতাম—সে কত বড় সৌভাগ্য। তার কিছু আভাষ দিয়েছি "সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ" লিখে; প্রত্যেক গীতাঞ্জলির গান সুর ও রচনার তারিখ মনে রেখে বুঝতে চেষ্টা করতাম কেমন করে বীরভূমে বাঙালী কবি বিশ্বকবি হয়ে উঠেছেন। তাই ১৯১৮ ২৮শে বৈশাখ উৎসবে শুধু বাঙালী নরনারী নয় অবাঙালী পুরুষ চাঁদ নাহার ও খৃষ্টান মিশনারী Rev. Milburn—রবীন্দ্রনাথ সম্বর্ধনায় যোগদান করেন। আম্রকুঞ্জে মঙ্গলকলস আলপনা ও ক্ষিতিমোহন বিধুশেখর রচিত বৈদিক পদ্ধতি আর দীনেন্দ্র শিষ্যদের সমবেত সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি সত্যি গুরুদেবের কৃপায় যেন বৈদিক যুগের তপোবনেই এসেছি। সেই আর্ষ-সভ্যতারআধি-পর্বের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক শান্তির বাণী, যে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন তাঁকে দেশ ও বিদেশের মানুষ ভালবেসে সম্বর্ধনা করবে সে ছিল আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। আমাদের প্রতিপক্ষ রবীন্দ্র-বিরোধী কেউ কেউ ছিলেন তা জানতাম; কিন্তু তাদের ক্ষীণ প্রতিবাদ ডুবিয়ে ১৯১২ (জানুয়ারী ২৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ Town Hall-এর বিরাট সভায় কবি-সম্বর্ধনা সার্থক করেন (প্রবাসী দ্রষ্টব্য)। তখন পরিষদের সভাপতি ছিলেন পদাবলী-সম্পাদক স্যর সারদাচরণ মিত্র ও সম্পাদক অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—"কবিবর! শঙ্কর তোমাকে অমৃতক করুন" এই ত্রিবেদী মশায়ের বাণী এখনো আমাদের কানে বাজে (ত্রিবেদী—রবীন্দ্র পত্রধারা কিছু "বঙ্গবাণী"তে ছাপা হয়ে বাকী অংশ হয়েছে।) কবির অগ্রজপ্রতিম ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্বরচিত কবিতা সভায় পড়েন ও

কবি-বন্ধু নাটোরাজ জগদীন্দ্রনাথ কবিতরঙ্গের নেতা হয়ে আমাদের কৃতার্থ করেন। দেশের কত গুণী জ্ঞানী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এই ১৯১১।১২ সালে আমরা শান্তিনিকেতনে ও টাউনহলে দেখেছি ভেবে গর্ব অনুভব করি। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান যাই হোক, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কৃপায় বাঙলা যে সর্বাগ্রে সেটি প্রমাণ হল ও আমরা 'ভারত-তীর্থ' আবৃত্তি করে "বৃহত্তর ভারতের" স্বপ্ন দেখা সুরু করলাম, সে সব কথা ক্রমশ প্রকাশ্য।

শেষে মনে করিয়ে দিই যে প্রাক্তন ছাত্রদের শিরোমণি বন্ধু সুধীরঞ্জন দাশ এই বছর ৭ পৌষে বিশ্বভারতীর সম্যবর্তন সভায় রবীন্দ্র শতাব্দী উৎসবের উদ্বোধন করলেন। তিনিও 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ, বেয়ে ছায়াধীশের সর্বোচ্চ পদে উঠেছেন এবং তিনিও তক্তাপোষের আসবাব, মোটা চালের ভাত দাল খেয়ে শান্তিনিকেতনে মানুষ হয়েছেন। ভাল গান করতেন বলে গুরুদেব তাঁর নবরচিত "রাজা" নাটকের প্রথমাভিনয় (নারীশিল্পীর অভাবে) রানী সুদর্শনার ভূমিকায় অভিনয় করতে সুধীরঞ্জনকে নামান। তাঁর পরে অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী সুদর্শনারূপে দেখা দেন ; আর আঁধার ঘরের রাজা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—বেশীর ভাগ পর্দার আড়ালে কিন্তু জনতার দৃষ্টে আলখাল্লা পরে 'দাদাঠাকুর' রবি-বাউল দিব্যকণ্ঠে ছাত্রদের সঙ্গে গানের পর গান গেয়ে চলেছেন :

'আজি দখিন দুয়ার খোলা
এস হে এস হে,
আমার বসন্ত এসো'

'আজি কমল মুকুল দল খুলিল'

'বসন্তে কি শুধু কেবল
ফোটা ফুলের খেলারে
দেখিস নাকি শুকন পাতা
ঝরা ফুলের খেলা রে ?'

ছোট প্রবন্ধে সেই সব সুরের তাৎপর্য বোঝান যায় না। 'গীতাঞ্জলি' ও 'রাজা'র রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা করেন, সে সব কথা পরে হবে।

৭ পৌষ ১৩৬৭

একবার বন্ধুরা আব্রাহাম লিঙ্কনের কাছে অভিযোগ তুললেন : আপনি শত্রুদের সঙ্গে বড্ড বেশী ভালো ব্যবহার করেন, ওতে তারাও পেয়ে বসে।

: আসলে শত্রুদের নিপাত করা উচিত, বন্ধুরা পুনরায় পরামর্শ দিল : কথায় বলে যে শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই।

: আমি তো তাই করি, বললেন লিঙ্কন অতি উদার হাসি হেসে : আমি শত্রুকে শেষ করে ফেলি. তাদের ভেতর থেকে মিত্র জেগে ওঠে।

একখানি ঘর—একটি দাওয়া

উপন্যাস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন, ভগবান সাক্ষী রেখে বলুন—নিজের হকের জিনিস পায়ের ছাড়তে। বলুন—বলুন—

উত্তেজনায় নবীনের চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল। মুঠো-বাঁধা ডান হাতখানা সজোরে তক্তাপোষে ঠুকে দিয়ে নিঃশ্বাস টানতে লাগল ঘন ঘন।

চমকে উঠলেন গ্রাম-পঞ্চায়েতের দল। হারাধন মণ্ডল, চিনিবাস সরকার, কালীপদ নন্দী, আশু মিত্র আর প্রেসিডেন্ট অবন্তী সান্যাল। এই পাঁচজনকে নিয়ে সালিশী সভা বসেছিল। এঁরা প্রবীণ গ্রামবৃদ্ধ, বুদ্ধি বিবেচনায় বয়সে চরিত্রগুণে গ্রামের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

অবন্তী সান্যাল স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বছর দুই হল অবসর নিয়েছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রের পদবী ওঁকে ত্যাগ করেনি। এখনও উনি এ অঞ্চলের জনসাধারণের মাষ্টারমশাই বা মাষ্টার-বাবু। সংসারে প্রায় নির্লিপ্তভাবে বাস করেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। পূজা-আহ্নিক জপ দেবার্চনা ইত্যাদি নিয়ে থাকেন। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন নিয়মিত, আহার স্বপাকে হবিষ্যান্ন। ছেলেদের সংসার থেকে একটু পৃথকভাবে বাইরের ঘরে শুটিয়ে এনেছেন ওঁর বানপ্রস্থের আশ্রমটিকে। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলকারই শ্রদ্ধাভাজন অবন্তী সান্যাল।

কালীপদ নন্দী একদাকালে আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উকিল নন, মোক্তার নন, অথচ আইনের কতকগুলি ধারা ওঁর নখদর্পণে। বিশেষ করে জমি-জমা সম্বন্ধে মামলা মোকর্দ্দমা তদ্বির-তদারক করবার আগে ওঁর কাছে একবার আসতেই হবে। লিখিত দলিল বা দানপত্রের মোক্ষটি ধরতে উনি হলেন অদ্বিতীয়; কি করলে সে ত্রুটি শুধরে নেওয়া যায় সে বিষয়েও ওয়াকিবহাল। তবে লোকটির মেজাজ ভাল নয়। সব বিষয়ে খুঁত খুঁত করেন। খিঁচিয়ে ওঠেন কথায় কথায়। এই কারণে সংসারে কারও সঙ্গে বনে না। দোতলার সবচেয়ে ভাল ঘরখানি দখল করেছেন। আহারের ব্যবস্থা পরিপাটি। পান থেকে চুন খসলেই মেজাজ চড়ে যায়। পুত্রকন্যা পাড়া-প্রতিবেশী কেউ সন্তুষ্ট নয় ওঁর ব্যবহারে। কিন্তু ওঁর পরামর্শের মূল্য আছে বলে গ্রামের সালিশীতে উনি অপরিহার্য।

চিনিবাস সরকার কাটা কাপড়ের দোকানের মালিক। ওঁর নির্বিরোধী নিরীহ স্বভাবের গুণে আশ-পাশের লোকেরা ওঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ওঁ খরিদ্দার না হয়েও দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময়

অবিনয়ে বলে, ভাল আছেন সরকার মহাশয়? উনিও সংসারের একটি কোণে বাসা বেঁধে পরম ধীরতায় দিন গণনা করছেন। পুত্র সন্তান নাই—দুই কন্যা পালা করে সংসার দেখে। জামাইদের একজন বসে দোকানে, অন্যজন জমি জমার তদারক করে। মেয়েদের মধ্যে সদ্ভাব নাই। দুই বোন একত্র হলেই কোন্দল-কোলাহলে বাড়ীতে তিষ্ঠানো দায়। বাপের বিষয় সম্পত্তির ভাগ নিয়ে ওদের মন কষাকষি। ওদের ঝগড়া বাধলে চিনিবাস বাড়ী থেকে বার হয়ে যান। আপন মনে বলেন, হরি হে—পার কর, আর কেন? সংসারের সোহাগ তো হাড়ে হাড়ে বুঝলাম—এখন খেয়ার নৌকোয় উঠতে পারলেই নিশ্চিন্দি।

আশু মিত্র ছিলেন সরকারী চাকরে। থাকতেন শহরে, সম্প্রতি কয়েক বছর হ'ল অবসর নিয়ে দেশের বাড়ীতে বাস করছেন। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। তাও স্ত্রী বেশীর ভাগ সময় দেশে থাকেন না। ছেলেদের কর্মক্ষেত্রে এক একটি সংসারে চক্র দিয়ে ফেরেন। যখন ছেলেরা ছুটিতে বা কোন কাজ-কর্মে দেশে আসে—তখন স্থান সঙ্কুলান হয় না বাড়ীতে। আশু মিত্র তাঁর দোতলার সবচেয়ে ভাল ঘরখানি ছেড়ে একতলার সবচেয়ে সঙ্কীর্ণ আলোবাতাসহীন ঘরখানিতে আশ্রয় নেন। সে ব্যবস্থা গৃহিনীই করেন। সেই ছোট্ট ঘরখানিতে নড়বড়ে তক্তাপোষের উপর বিছানা পাততে পাততে বলেন, যে ক'টা দিন ওরা দেশে থাকে এইখানেই শোও। এ আর কষ্ট কি। বুড়ো বয়সে খাওয়া শোওয়ার বাছবিচার করতে গেলে চলে না। সংসার এখন ওদেরই। ভোগজাত করুক ওরা। আমরা আর ক'দিন!

অপরিসর ছোট্ট ঘরখানি যেন বুকে পিঠে চেপে ধরে। তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে মশারীটা ফেলে যেন আশু বাঁচে। চোখ বুজে কল্পনা করতে থাকেন—কর্ম-জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলিকে—সংসার যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের বিবেশটিকে। কল্পনার জাল বুনতে বুনতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

হারাধন মণ্ডলের খাতির আছে গ্রামে। একটি সম্প্রদায়ের প্রধান উনি। কিন্তু ছেলের সংসারে মান-খাতিরের বালাই নাই। যেমন ঘজ্জাল পুত্রবধূ—তেমনি দুরন্ত নাতি-নাতিনীরা। ছেলেও বউয়ের বশীভূত। তাগ্যিস কিছু টাকা আছে হাতে—জমিজমাগুলিও নিজের নামে রয়েছে। না থাকলে সংসার থেকে কোন্ কা'লে উৎখাত হয়ে যেতেন। সকলের কাছেই আক্ষেপ করেন, নিজের সংসারে চোর হয়ে বাস করছি। হায়রে কলিকাল! গ্রাম-পঞ্চায়েতের উনিও একজন বিশিষ্ট সভ্য।

এদের পাঁচ জনকে নিয়ে বসেছিল বিচার সভা। নবীন আর তার ছেলে কানু দুই বিবদমান পক্ষ। ওদের নালিশটা কিন্তু জমিজমা সংক্রান্ত নয়, ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারও নয়। একটু বিচিত্র ধরণের ঘটনা। ওরা স্বইচ্ছায় সালিশ ডাকিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে চায় নি। অনিবার্য্য ঘটনার বশেই বিষয়টি পঞ্চায়েৎ বিচার-ভুক্ত হয়েছে। দু' পক্ষই দুদিন ধরে দু' বেলার বৈঠকে আপন আপন বক্তব্য শুনিয়েছে—যুক্তিতর্ক দিয়ে আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে চেয়েছে। শেষদিনে—পঞ্চায়েৎ যেদিন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রায় দেবে—তার আগের মুহূর্ত্তে নিজের বক্তব্য শেষ করে নবীন নাটকীয়ভাবে তার আপত্তি ঘোষণা করলে। অর্থাৎ কিছুতেই সে পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না। যে সিদ্ধান্ত মানুষের স্বতাধর্ম্ম বিরুদ্ধ—তা কিছুতেই মানবে না নবীন।

পঞ্চায়েৎকে সিদ্ধান্তের অবকাশ না দিয়ে নবীন সাক্ষী মানলে ওঁদেরই। উচ্চ কণ্ঠে বললে, আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন, ভগবান সাক্ষী রেখে বলুন, নিজের হকের জিনিস পায়ের ছাড়তে? বলুন—বলুন—

নবীনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল পঞ্চায়েৎ-সভায়, ছড়িয়ে পড়ল বিচারক মণ্ডলীর শিরায় শোণিতে অস্থিমজ্জার মর্ম্মদেশে। কেঁপে উঠলেন সকলে। সংসারেন্দ্রিয় সাংসারিক সুখদুঃখে প্রায় উদাসীন স্থিতধী পুরুষ অবধূত সান্যাল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলেন। নবীন বলে কি? ওকি পাগল হয়ে গেল? নতুবা মানবীয়-বৃত্তির মর্ম্মমূল ধরে এমন সুজোরে নাড়া দিতে সুরু করেছে কেন? সে কোন্

অন্ধকার যুগের কথা—যখন পশু আর মানুষ খাদ্য পানীয় আশ্রয়ের প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে হনন করে জীবনসংগ্রাম সুরু করেছিল। সে যুগ আজ অন্ধকার গুহায় সমাহিত। জ্ঞান বুদ্ধি সভ্যতা সংস্কৃতির কল্যাণ-দীপ জ্বালিয়ে মানুষ আজ যে পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে—তার কোথাও কি এমন অপরিচ্ছন্ন অপরিপুষ্ট বর্ব্বর চিত্তার অবকাশ আছে? আজ পশু আর মানুষ পাশাপাশি বাস করছে না। পশুর স্বভাববৃত্তি নিয়ে চলবার উপায় নাই সমাজে। সেখানে আজ শুভ্র-জ্যোতি আত্ম-চৈতন্যের শিখায় স্নেহমালিন্য পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবে কমবেশী সব মানুষই আজ গৌরবান্বিত। সেই লক্ষ লক্ষ বছরের অন্ধকার আজ বিস্মৃতির পারে; লক্ষ কোটি যোজন পথ এগিয়ে এসেছে মানুষ। এখন কি আর পিছনে ফিরে চাওয়া যায়? চাইলেও সেই কবেকার অন্ধকার গুহা দৃষ্টিগোচর হবে কেন? সে হল তমসার সৃষ্টি—পশু ও মানব মনের আদিম বৃত্তির সূত্রে গ্রথিত বস্তু। সে বৃত্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—মিথ্যা হয়ে গেছে। অথচ অশিক্ষিত নবীনের যুগে এই অভিযোগে পঞ্চায়েৎ পরিচালকরা কেঁপে উঠলেন। কয়েক মিনিট কাল নির্ব্বাক নিস্পন্দ বসে রইলেন—পরস্পরের পানে চেয়ে অধোবদন হলেন। এই আদিম বৃত্তি প্রকাশের লজ্জাটা যেন একা নবীনের নয়—সকলেরই। কম বেশী সকলেই এই অপরাধের দায়িত্ব-ভার বহন করছেন।

বিচারের রায় দেবার আগে ওঁরা ভাবতে থাকুন এই অবকাশে কাহিনীর আদিকাণ্ডে পৌঁছবার চেষ্টা করব আমরা।

* * *

ঘটনাটা ঘটেছিল ভোর বেলায়। বাতাসকে আশ্রয় করে দাবানল যেমন মুহূর্ত্তে ছড়িয়ে পড়ে অরণ্যে, তেমনি সূর্য্য উঠবার আগেই সারা গাঁ উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে উঠল। এমন ঘটনা কালেভদ্রেও ঘটে না—এমন অবিশ্বাস্য কাহিনীও জীবনে বেশীবার শোনা যায় না। যে শোনে—বিস্ময়ে হতবাক হয় প্রথমটা, বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বলে, ওমা, তাই নাকি আবার হয়? পাপ ছেলের সমক্ষ আমরা তো জানি তামার পাত্রে গঙ্গাজল। তা আজকাল সবই তো হচ্ছে! ঘি মাখনে বনস্পতি, সরষের শেয়ালকাঁটার বীজ, চিনিতে বালি, চালে কাকর, আটা ময়দায় চৌকুলবীচি—ভেজালের রাজত্ব। উঃ—কি কালই পড়লো!

মাজা-ভাঙা বুড়ী বৃন্দাবনের মাসী সেই কাক-কোকিল-ডাকা ভোরে লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে আপন মনেই বকতে বকতে চলেছিল।

বলি ব্যাপার কি মাসী? গায়ে নামাবলী, হাতে কমণ্ডলু, কাঁধে কাপড় আর গামছা—প্রাতঃস্নানার্থী তিনু চক্রবর্ত্তী এগিয়ে এলেন বুড়ীর সামনে।

বুড়ী মুখ থুবড়িয়ে লাঠির উপর একখানা হাত রেখে একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, তিনু না? আর বাবা—কি কালই পড়লো! এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে দু'চোখ বুজতে পারলে বাঁচি! শোননি—উনুর পাড়ার ভুবনে তেলির বাটা নবনে তেলির কীর্ত্তি কথা? ও মাগো, শুনে তো হাত পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যায়! কুই তিন কেলে বুড়ো—আজ বাদে কাল চিতের গিয়ে উঠবি—তোর কিনা এই রীত! দুধের ছেলেটাকে কিনা···ছি-ছি-ছি!

কি হয়েছে মাসী? কের শুধোল তিনু।

বুড়ী কাঁকাল দুলিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, কি হয়েছে! বলি গা শুদ্ধু চি-চি আর তুমি শোননি? এমনও মহাপাতকী—ওই নরকে মিন্‌সে!

তিনু ঈষৎ অধৈর্য্য কণ্ঠে বলল, বলি হয়েছে কি?

হয়েছে আমার মাথা! এ গাঁয়ে আর বাস করতে ইচ্ছে নেই। মনে ধিক্কার হয়েছে তিনু। কবে থেকে বলছি বেন্দাকে—ওরে, আর কেন, এইবার আমাকে বিশ্বনাথের ছিচরণে ফেলে আয়। যে কটা দিন বাঁচি বাবার নাম করে পাপ ক্ষ্যায় হোক—এ পাপ গাঁয়ে আর নয়। ছি-ছি-ছি!

মাসী লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে এগিয়ে গেল। অগত্যা তিনুও প্রাতঃস্নানের কামনাকে দমন করে ওর পিছু নিল।

শুধু তিনু চক্রবর্ত্তী নয়—সারা গাঁ খানিই এখন চলেছে উত্তরপাড়ার দিকে। বর্ষা কালের নদীতে অকস্মাৎ চল নেমেছে যেন। যেমন টান, তেমনি শব্দ। সারা পথ কল-কল রবে ভরে উঠেছে। এমন ঘটনা গ্রামে কোনকালে ঘটেনি। তিনকেলে বুড়ী বৃন্দাবনের মাসী তো তার স্মৃতির কূলহীন সমুদ্র হাতড়ে একটিও জিনিস খুঁজে পাচ্ছে না—তা নাকি এই ঘটনার পাশাপাশিও রাখা যায়।

পাড়া গাঁ। এমন ঘটনা কালে ভদ্রে ঘটে—যা কিছুদিনের জন্য মনের খোরাক যুগিয়ে থাকে। সেবার হারাধন যখন তীর্থ সেরে ব'ড়ী এলো—যারা সঙ্গে গিয়েছিল সবাই ফিরল, ফিরল না সুবলের বউ আর নন্দ ঘোষ। ওদের দু'জনকে জড়িয়ে গ্রামে যে রসালো কাহিনী তৈরী হয়েছিল—অনেক ব্রতলোভী মন তা থেকে রসদ সংগ্রহ করেছিল। আবার সংসারের অত্যাচার সইতে না পেরে নন্দীদের মেয়েটা সেদিন পুকুরে ডুবলো, কি অনন্তর সঙ্গে হিমন্তর লাঠালাঠি, মাথা ফাটাফাটি হয়ে বিষয় সম্পত্তির চুলচেরা ভাগ হয়ে গেল, কিংবা দুদিনের বিধবা পিসি আশ হেঁসেলে মাছ চুরি করে খেতে গিয়ে ধরা পড়ল, কিংবা···এমন বহু ঘটনাই গ্রামের নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল ফেলার কাজ করেছে। জল কাঁপতে কাঁপতে ছোট ঢেউ তুলেছে—আবার সে ঢেউ বড় হয়ে হয়ে কিনারায় গিয়েছে মিলিয়ে। যেমন প্রতিদিনের গ্রাম শান্ত নিথর, যেমন মানুষের জীবন একঘেয়ে ক্লান্তিকর—যেমন গ্রীষ্মের আকাশ বর্ষার আকাশ তাপে বর্ষণে অত্যন্ত দুঃসহ—তেমনি এখানকার প্রতিটি দিন আর প্রতিটি রাত্রি বৈচিত্র্যহীন। একটানা অলস নিঃশ্বাস। আজ নবীন তেলি এমন একটি পরম উপভোগ্য উত্তেজক ঘটনা তৈরী করেছে যার চেহারা আর স্বাদই আলাদা।

সারা গ্রাম জড়ো হয়েছে গ্রামের প্রান্তে উত্তরপাড়ার রাংচিতার বেড়াঘেরা ছোট একখানি বাড়ীর সামনে। সেখানে যত কৌতূহল—তত কলরব: ডাক্তার ডাক, থানায় খবর যাও, বাঁধ ব্যাটাকে—বেশ করে লাগাও দু'ঘা, উঃ এমন খুনে পড়সী নিয়ে বাস—এতো সসর্প গৃহে বাস।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? একজন গলা বাড়িয়ে জিগগেস করল।

জানা নাকি? খেঁকিয়ে উঠলো আর একজন। দেখতে পাচ্ছ না? ওই দেখ—দাওয়ায় পড়ে রয়েছে লাশ, মাথা দু'ফাঁক—রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, দেহটা খেঁতলানো, অনেকক্ষণই সাবাড় হয়ে গেছে।

বেটপকায় পড়েছিল বুঝি?

হুঁ—তাই বটে! শুনোও না ওই খুনে বুড়োকে? আসুক আগে দারোগা, বাঁধুক পিছমোড়া করে—পুরুক জেলে, বিচার হোক কোর্টে—হাকিম সাহেবের সামনে, তখন যদি ফাঁসির হুকুম না হয় তো···

কিন্তু ব্যাপারটা কি?

সে অনেক কাণ্ড। গম্ভীরমুখে বললেন অবন্তী সান্যাল। সে ইতিহাস শোনাবার সময় এখন নয়—চুপ করে দেখ কি হয়।

• • •

অবশ্য কৌতূহল চেপে তা বলে মানুষ তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কখন পুলিসের লোক আসবে—কেরা ফুসুমবাজী দারোগার করে আসল ঘটনাটা বার করে নেবে, কবে বসবে আদালত, কোন্ দুপে বা'র হবে ফাঁসির কিংবা বে-কসুর খালাসের—কিংবা পাঁচ-দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম—সেই অনন্তকাল ধরে ক্ষণআয়ু মানুষেরা তো নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। এ ছাড়া মানবিক দিকও একটা রয়েছে। দাওয়ায় পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত দেহটা—ঘরে খিল দিয়েছে অর্দ্ধোন্মাদ বাপ—কিছু না হোক অসাড় দেহটাকে শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে দোষ কি। ডাক্তার ডাকিয়ে কিছু প্রতিকার তো করা যায়। ছেলেটা জীবিত কি মৃত এটাও অন্ততঃ জানা উচিত। ঘরের খিল খুলে বুড়োটাকে বা'র করে কি ঘটনা জেনে নিয়ে যা হয় একটু কিছুও তো করা যায়।

সোজা উপায়টাই বা'র করে ওরা ঘরাঘরি যা মারতে লাগলো দুয়োরে। ভিতরে মানুষের সাড়াশব্দ নেই। এত গোলমালে ঘরের মধ্যে কেউ ঘুমোচ্ছে না নিশ্চয়।

ঘরের খিড়কীর দরজা নাই যে পালিয়ে যাবে সেদিক দিয়ে। এখন তো বাড়ীর চারদিকে লোক গিজ্ গিজ্ করছে—চালের পরশ দিয়ে পালাবার পথও বন্ধ। তবে? লোকটা ঘরের মধ্যে আত্মহত্যা করল না তো!

আত্মহত্যা—না হাতী, ওসব শুনে লোককে লোভা ঠাওরাও! হুঙ্কার দিয়ে উঠল মধু নাপিত। কেউ একটা লোহার শিক আনতো—কি ছোট হাত-করাত। দুয়োর না খুললে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।

আর একজন বলল, ব্যাটার বাড়ীতেও যেমন লোক নেই—বাপ আর ব্যাটা—তেমনি ঘরও একখানা আর কালিমত এই দাওয়া! ভাগ্যিস ছেলেটার বিয়ে হয়নি—আর নবনের বউ মরেছে—না হলে কোন্ চুলোয় বাপ ব্যাটা মাথা গুঁজে থাকত!

অবন্তী সান্যাল এগিয়ে এসে বললেন, সেইটিই তো বড় সমস্যা—ঘটনার মূলেও ওই জিনিস। এ রীতিমত ক্রয়েডিয় তত্ত্ব।

ওঁকে ঘিরে ধরল জন কয়েক ছোকরা। কি ব্যাপার স্যার! এর মধ্যে ফ্রয়েডকে টানছেন কেন?

টানি সাধে! এর মধ্যে অনেক বৃত্তান্ত। বললেন অবন্তী সান্যাল। খুব বেশী ঘুরে তো থাকি না—ওদের হালচাল কিছু কিছু জানি বইকি।

বলুন না—শুনি—

থাম এখন। জল আনো এক ঘটি—পাখার জোগাড় দেখ। ছেলেটা যদি অজ্ঞান হয়ে থাকে—ওকে বাঁচাবার চেষ্টা কর আগে—তারপর গল্প শুনো।

গল্প শোনার আগ্রহে মুহূর্ত মধ্যে এক ঘড়া জল আর খান তিনেক পাখা এসে পড়ল। কিন্তু কেউ সাহস করে কালু তেলির অচেতন দেহটার নিকটবর্তী হ'ল না।

সান্যাল হেসে উঠলেন, বুঝেছি বাবা, গল্প শুনতে ইচ্ছে বোল আনা, দেওয়া ধরতে সাহস হচ্ছে না? ভাবছ পুলিশ দারোগা এসে আমাদের জড়িয়ে ফেলবে—যদি অচেতন দেহটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি! আচ্ছা আমাকেই এগিয়ে দাও ঘড়াটা। পাখাটাও—

এইবার জনকয়েক এগিয়ে এলো।

মাথায় জলের ঝাপটা দিয়ে জোরে জোরে পাখার হাওয়া করতে লাগলেন সান্যাল মশায়।

একটি ছেলে ওঁর হাত থেকে পাখাটা নিয়ে বলল, আমি বাতাস করছি স্যার—আপনি বসুন—

না—না, গল্প এখন নয়—আগে লোকটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে।

কালুর শিথিল হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে নাড়ী টিপতে টিপতে বললেন সান্যাল মশায়, আগের কাজ আগে—তারপর গল্প।

• • •

ইতিমধ্যে করিৎকর্মার দল একটা হাত করাত যোগাড় করে এনেছে—তাই দিয়ে খুলেছে ঘরের খিল। তারপর প্রায় অন্ধকার ঘরে ঢুকে এক কোণে জড়োসড়ো নবীন তেলিকে দেখতে পেয়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেছে একসঙ্গে, এই যে খুনে বুড়োটা লুকিয়ে রয়েছে এইদিকে।

নবীন তখন রীতিমত কাঁপছে। দু'হাত জোড় ক'রে ভয়ে ক্যাকাসে মুখখানায় রাজ্যের মিনতি ঢেলে বলছে, দোহাই বাবারা, আমায় মেরো না। সত্যি বলছি, আমি ইচ্ছে করে এমন কাজ করিনি। মাইরি বলছি—

তবে রে—হৈ হৈ করে জন দুই যোয়ান ছেলে ওর চুলের মুঠি চেপে ধরল।

দোহাই বাবা, মেরো না—দোহাই বাবা। সামনের ছেলেটির পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো নবীন।

ছেলেটিকে অক্কা পাইয়ে দিয়ে আবার কান্না! তার আবার সাফাই! চুল শুদ্ধ মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিতেই নবীন চীৎকার করে উঠল।

অবন্তী সান্যাল ছুটে এলেন। চুলের মুঠি ছাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আইন বড় খারাপ জিনিস—আগুনের সমান, নিজের হাতে নিলেই—হাত পুড়বে। যাঁরা আইনের রক্ষক তাঁরা আসুন—তাঁদের ভার নিতে দাও। ছেলেকে খুন করলে যদি বাপের ফাঁসি হয়—আইন কি তোমাদেরও রেহাই দেবে—বুড়োর ভালমন্দ কিছু ঘটলে? অপেক্ষা কর বাবা।

কিন্তু বলুক বুড়োটা—কেন ও এমন কাজ করল?

বলবে বইকি—বলতেই হবে ওকে। না হলে পুলিশ ছাড়বে না, আমরাও খুসি হব না। নিশ্চয় বলবে। এসো নবীন, তুমি বাইরে এসো। অভয় দিলেন সান্যাল।

না মাষ্টারবাবু—বাইরে যাব না, এ পোড়ামুখ লোকটাকে দেখাব না। দু' হাতে মুখচোখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল নবীন।

কাঁদছ কেন, রাগ না চণ্ডাল! রাগের বশে কত কুকর্ম কুকর্ম করে মানুষ। সান্যাল সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

নাগো মাষ্টারবাবু—রাগ নয়। আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হলো—আমার ভ্রম হ'য়েছিলো। ভেবেছিলাম—আবার মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল নবীন।

আচ্ছা এখন থাক। এখনই তোমাকে কিছু বলতে বলছি না। আগে ছেলেটার জ্ঞান হোক—

অ্যাঁ, জ্ঞান হবে? ওকি বাঁচবে? দোহাই মাষ্টারবাবু, বলুন—বলুন ওকি বাঁচবে? উত্তেজনায় নবীনের কণ্ঠরোধ হল। ও হাঁপাতে লাগল।

সান্যাল বললেন, বোধ হয় বাঁচবে।

আঃ—আঃ—ভগবান, তাই যেন হয়—তাই যেন হয়। হে ভগবান—হে ভগবান। হঠাৎ মেঝেতে মাথা ঠুকতে লাগল নবীন।

সান্যাল ধরলেন ওকে। ছি নবীন, ছেলেমানুষি করো না!

না, না, মাষ্টারবাবু—আমি মুখ্যু—আমি অজ্ঞান, আমি মহাপাতকী—না হলে এমন কাজ করি! শোনেন মাষ্টারবাবু।

থাম—ওসব পরে শুনবো। তোমার ছেলেকে আগে ভাল করে তুলি—পরে শুনব তোমার কথা।

এমন সময় বাইরে থেকে একটি ছেলে ডাক দিল, মাষ্টারমশায়, এদিকে আসুন একবার। কালুর জ্ঞান হয়েছে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে—

অ্যাঁ—কেলো বেঁচে আছে! তীরবেগে উঠে

অবন্তী সান্যাল ওকে ধরে বসিয়ে দিলেন। বললেন, এখন তোমার ওখানে যাওয়া চলবে না নবীন। তোমাদের মন কষাকষির ব্যাপার। এটা দু'পক্ষই ভুলে যাবে—তারপর দেখা সাক্ষাৎ। বিশেষ করে কালুর ওই দুর্ব্বল শরীরে ধাক্কা সামলাতে পারবে না। একটু অপেক্ষা কর।

এবার বাইরে থেকে ঘরের শিকলটা এরাই তুলে দিলে। বাইরে থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শুধু শোনা গেল। কিন্তু নবীনের কান্না শোনবার জন্য কেউ তখন কান পেতে নেই। ভিড়টা জমেছে কালুর চার ধারেই।

* * *

শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা থানা পর্য্যন্ত পৌছল না। পৌছল না অবন্তী সান্যালেরই সুব্যবস্থায়। উনি বুঝিয়ে দিলেন, কালু যখন সুস্থ হয়ে উঠেছে—তখন এটাকে ঘোরালো আর বিশ্রী রকম পল্লবিত করে পৃথিবীময় রাষ্ট্র করার কি প্রয়োজন! এতে গ্রামেরই অপযশ। তবে উত্তেজিত জনতাকে তুষ্ট করার ব্যবস্থা করলেন তিনি। এটা না করলে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়বে। এতে সমাজের অমঙ্গল। অবশ্য আজকালকার দিনে সমাজ শাসন মানে না কেউ, কিন্তু অনিয়মের কৈফিয়ৎ প্রতিটি মানুষকেই দিতে হয়। তার নিজের কাছে—প্রতিবেশীর কাছে অন্যায়ের জবাবদিহি করতেই হয়। যুক্তিতে ফাঁক থাকুক, নির্ভেজাল না হোক, প্রশ্নোত্তরের মালা গেঁথে নির্দ্দোষীতা প্রমাণের চেষ্টা করতেই হয়। নিজেকে সমর্থন করার এই চেষ্টা সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে না করে উপায় নাই। সে তার ধর্ম্ম। স্বভাব ধর্ম্ম।

কালু কিছু সুস্থ হতেই গ্রামের মাতব্বর গণ্য কয়েকজনকে নিয়ে বিচার-সভা বসল। সান্যাল বললেন, শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা সভা করেছি না—আসলে কেন এটা ঘটল জানা উচিত। নবীনকে শাসন করার অধিকার আমাদের নেই, কিন্তু ও যখন পাঁচজনের কাছে নিজের নির্দ্দোষীতার প্রমাণ দিতে চাইছে; আমরা 'না' করি

বিচার কি সকলের সামনে হবে ?

না, তা হতে পারে না। একদিনেও এটা হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা এমন পাঁচজন লোককে বেছে নাও যাঁরা দু'পক্ষের কথা শুনে ন্যায় অন্যায় ঠিক করবেন। তারপর সকলকে জানানো হবে – কি কর্ত্তব্য।

বেশ তাই হোক।

অবন্তী সান্যালকে প্রধান করে—পক্ষান্তরে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হলেন পাঁচজন। এঁদের বৈঠক বসল সান্যালের বৈঠকখানায়। বেলা তখন দশটা।

* * *

ঘটনার গোড়াকার সূত্র ধরে অবন্তী সান্যাল আলোচনা করছিলেন :

নবীন যে কথাটা বলেছে—দোষ তার একার নয়—দোষ তিন পুরুষের—দোষ এই বাড়ীটার—তা মিথ্যে নয়। ওদের তিন পুরুষের খবর জানি না—কিন্তু নবীনের বাবাকে জানতাম। তখন ষাট পেরিয়েছে ভুবন। মাথার চুল সব শোণের নুড়ি—লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে পথ চলে, কথা বলতে বলতে থুক্ থুক্ কাশে, দু'কসে পানের রসের গড়ানি—সর্ব্বদাই পান চিবুচ্ছে। দেখা হলেই সান্যাল প্রণাম—দেবতা ব্রাহ্মণে অগাধ ভক্তি। বলে, এই জন্মে কিছুই হলো না প্রভু, দুয়ের বা'র ঘরে রইলাম! নারায়ণের পায়ের ধুলো নিয়ে যদি পরকালে কিছু হয়। অর্থাৎ পরের জন্মে যদি অবস্থা ফেরে। পরকাল বলতে ওরা পরের জন্মই বোঝে কিনা।

যদি জিজ্ঞাসা করতাম, কেমন আছ ভুবন ? বলতো, আপনাদের চিরচরণের আশীর্ব্বাদে দিন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু শরীরগতিক সুবিধে নয়। বেঁচে থাকার বড় কষ্ট প্রভু। এখন চোখ বুজলেই বাঁচি।

কেন, নবীন তো আজকাল উপার্জ্জন করে ভাল।

আপনিও যেমন প্রভু—কোনগতিকে টানে টোনে সংসার চলে। বলি ঘর তো আর উঠোতে পারলাম না, ও-ও পারবে না। আমার না হয় এক ছেলে—কোন রকমে কুলিয়ে যাচ্ছে। ছেলের বিয়ে দিয়ে সংসার বজায় করেছি। নিজে দাওয়ার এক কোণে পড়ে থাকি—পেটে চাড্ডি চাড্ডি খেই আর হরিনাম করি। বার্ধক্যে বড় কষ্ট প্রভু। জলের ছাট আসে—চালা দিয়ে জল টোপায়—চোপর রাত দু'ই'টু এক করে বসে থাকি।

তা ঘরে গেলেই পার।

ছি-ছি—কি যে বলেন প্রভু! সোমত্ত ছেলে, সোমত্ত বউ—ওনাদের সঙ্গে এক ঘরে, ছি-ছি!

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইত ভুবন। বলত, ওনারা ঘরে না থাকলেও ঘরে ঢুকিনে প্রভু। এক একবার ইচ্ছে হয় দেখে আসি—রঙের মেলায় কেনা রাধাকেষ্টর পটখানা ঝেড়েমুছে রেখেছে কিনা, পোলার কাকাতুয়াটা তেমনি টাঙানো আছে কিনা উত্তুর দিকের দেয়ালে। কড়ির আলনায় নবীনের মায়ের হাতে-তোলা কাঁথাখানা তেমনি পাট করা আছে কিনা। তা আবার ভাবি, দূর হোক-গা, ঘর যখন ছেড়েছি—তখন অত মায়ার জড়াই কেন? এই তো দিব্যি দাওয়ায় বসছি—দাঁড়াচ্ছি—জিরোচ্ছি—ঘুমোচ্ছি—বেশ আছি। এইখান থেকে আর একবার বাইরে যাব—উই উঠোনে। সেই শেষের দিনে। একটা ছেঁড়া মাদুর এক কোণে জড়ো করে রেখেছি প্রভু, ওদের বলেও রেখেছি—তেমন তেমন বুঝলে দেহটা টেনে উঠোনের তুলসী তুলায় ছেঁড়া মাদুর পেতে তার উপর রাখবি আর কানে শোনাবি তারকব্রহ্ম নাম।

তা নিজের ব্যবস্থামত বুড়ো একদিন অমনি করেই চলে গেল। নবীনের ছেলে কালু তখন তিন বছরের। ভারি দুরন্ত ছেলে। সর্ব্বদাই দৌড়ঝাঁপ করে—এটা ভাঙে—ওটা টান মেরে ফেলে দেয়। সংসারে ক্ষতি··· অপচো লেগেই আছে। নবীনের বউ গজ গজ করে, তোমার আদরে আদরে ছেলেটা ব্যাদড়া হয়ে উঠছে। এই বেলা শাসন কর।

তা কে শোনে কার কথা! নবীন এক একদিন আমার কাছে এসে নালিশ করতো, মাষ্টারবাবু, বাপী বলে কিনা শাসন কর! —আরে শাসন করব কাকে! আমারও তো ওই শিবরাত্তিরের সলতে একমাত্র ধন, ওর গায়ে হাত তুলতে পারি! ···যদি বলতাম, গায়ে হাত নাই

লে—ধমকধামক করবে। জিনিষ পত্র নষ্ট রে—

হেসে বলত নবীন, আপনিও যেমন, ভারি তো ের জিনিস—তার আবার ক্ষেতি অপচো। কোথায় ড়িটা ভাঙ্গল, শিকেটা ছিঁড়ল, তেলটুকু নুনটুকু ছড়ালো লটা নষ্ট করল—মাগীর সব তাতেই টিক্‌টিক্!

ছেলে বড় হলো, ইস্কুলে দিলে নবীন। আমার ল, দেখবেন মাষ্টারবাবু—যেন বাবুদের মত শ্চরে য়ে একটা ভাল কাজ পায়—তেমনি করে শিক্ষে দিন। নিবার শনিবার বাড়ী আসবে—কলকাতা থেকে আনবে কপি, কমলালেবু, জাংড়া আম। চুল ছাঁটবে বুদের মতন—চায়ুই সার্ট গায়ে দেবে—জুতো পায়ে য়ে চলবে মসমসিয়ে—ভোণ্টুকেয়ার ভাব—যেন তুমিই কে—আর আমিই বা কে!

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

কালীপদ নন্দী বলল, আহা—কি বিগ্‌গজ পণ্ডিতই হয়েছে কেলো! সারা গাঁখানিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক করছে। গাছের ফল পাকুড়—পুকুরের মাছ—

বাধা দিয়ে হারাধন বলল, আর ঘরের বউকি—

অবস্তী সান্যাল তাড়াতাড়ি বললেন, ও আলোচনা ক—বয়সকালে ওসব একটু আধটু হয়ই। অবশ্য পের শাসন থাকলে এতটা বাড়তো না।

হারাধন বলল, তা বয়সকালে ছেলের বিয়ে না দিলে পোত তো করবেই। আবদামড়া ছেলে সামলানো ঠিন মাষ্টার মশায়। তা এইবার নবীনকেও সামলাতে ছে ঠ্যালা! গোড়ায় আলগা দিয়ে আগায় বাঁধা দিতে লে এমনি হয়ই। এই যে খুনোখুনি রক্তগঙ্গা হলো -ও সেই স্ত্রীঘটিত ব্যাপার নিয়ে।

চিনিবাস কৌতূহলী হয়ে উঠল, কি রকম—কি রকম?

বৈঠকের গতি অন্যদিকে ফিরছে দেখে অবন্তী ন্যাল তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। বললেন, এখন ওঠা ক—বেলা চড়লো। স্নান-আহ্নিক আহারাদি সেরে ফেলে আসবেন আপনারা। আলোচনা হবে।

• •

বৈকালে কথার সূত্রটা কালীপদ নন্দী ধরিয়ে দিলে, সান্যাল, কথাটা ওবেলা খোলসা হয়নি কিন্তু,—ওটা যে স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার—

সে কথা সান্যাল জানতেন—গ্রামসুদ্ধ সকলেই কিছু কিছু জানত। খুব বেশী দিনের কথা নয়—পেলবারই হবে—বাউরি পাড়া দিয়ে গঞ্জের বাজারে যাচ্ছিলেন সান্যাল মহাশয়, সুরেন বাউরি তার চালাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আভূমি নত হয়ে বলল, পাতঃপেন্নাম ঠাকুর-মশায়।

ভাল তো সুরেন? কাজ কর্ম্ম বেশ চলছে?

সুরেন বাউরি বলল, আপনাদের আশীর্ব্বাদে শরীল-গতিক এক রকম—কাজ কম্মো ভারি মন্দা। বেশ ভুঁয়ে গাছ বলতে তো সব সাবাড়—কী বুদ্ধই নেগেলো ঠাকুর-মশায়। এখন সব্বাই কয়লার গুঁড়ো খাচ্ছে—কাঠের গাড়ী চক্ষ চক্ষে দেখবার যো নেই। কাঠ নেই—তবলদারির অবস্থাও কাহিল।

বলা বাহুল্য—জাতে বাউরি হলেও তবলদারি ওর নেশা।

সান্যাল বললেন, তা বটে। তবে অন্য কাজও তো করতে পারিস! ধর জন-খাটা—জমি পাট করা—

না করলে কোনগতিকে টেঁকে আছি কেমনে ঠাকুর মশায়! হাতজোড় করে সুরেন বলল, আমার অন্ত সমিস্তে। আমরা সব্বাই মিলে আপনার ছিচরণে গিয়ে পড়বো বলা পরামন্ত করছি—তা দেবতার দর্শন হলো। একটা বিহিত না করলে তো এ গেরামে কি-বউ নিয়ে বাস করা মুস্কিল ঠাকুর মশায়!

কি ব্যাপার? ওই স্ত্রীলোক-ঘটিত। নবীনের দুরন্ত ছেলেটা নাকি বাউরি পাড়াতে উৎপাত সুরু করেছে। ছেলেবয়সের উৎপাত নাকি আলাদা—সে তাড়াতুড়ি দিয়ে—চড় চাপড়টা মেরে কোনরকমে ঠেকানো যায়, কিন্তু যৌবনকালের অত্যাচার—

হাতজোড় করে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল সুরেন, আপনিই বিবেচনা করেন ঠাকুরমশায়, আমরা কাজের লোক, চইপর দিন বাড়ী আগলে—কি বউ আগলে বসে থাকতে পারি!

নবীনকে কথাটা বলতেই অভ্যাসমত প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল প্রথমে—পরে খানিক ভেবে জবাব দিয়েছিল, তা আমি এর বিহিত কি করতে পারি মাষ্টারবাবু?

কাজে কর্মে ভিড়িয়ে দাও ছেলেকে—বদখেয়ালী যাক।

নবীন বলেছিল, সে আর কার অসাধ—মাষ্টারবাবু। যখন তখন অষ্টপহর পাখী পড়ানো করছি—ওরে, বড়-বাজার যা—জিনিস-পত্তর কেমন করে সস্তা করতে হয় শেখ, নিজের জাত-ব্যবসা ধর। কোন্ আড়তের সরষে ভাল - দামে কম, পড়তায় তেলে, এক মণে কতটুকু তেল বার হয়—খোল বা কতখানি—এসব শিখে নে এই বেলা—তা চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী! আমি কি করি বলেন তো মাষ্টারবাবু?

ডান হাতের ব্যাপার বন্ধ করে দাও—টিট হয়ে যাবে।

নবীন নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, হায় হায় গো, সে মাগী বেঁচে থাকলে হতো মাষ্টারবাবু। তিনি সগ্‌গে গেছে—আমারেও ডুইবে গেছে। ঘরে মাত্তর দু'জনা মানুষ—একখানা থালায় ভাত বেড়ে নিয়ে একা একা গলা দিয়ে নামবে কেন মাষ্টারবাবু! সংসারে আমার কেই বা আছে!

বলেছিলেন সান্যাল মশাই,তবে বিয়ে দাও ছেলের—সংসার টিকুক—আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই যথার্থ কথা বলেছেন মাষ্টারবাবু—আমারও সাধ ছেলের বউ দেখি। একটু থেমে মাথা চুলকে বলেছিল, বিয়ে তো দেব—ঘর কোথায়? ওই তো সবে ধন নীলমণি একখানা চালা—রোজগার পাতি করে তুলুক আর একখানা চালা—

হেসে ফেলেছিলেন সান্যাল মশাই। বলেছিলেন, হাইত রে নবীন—তোদের সমস্যা মেটানো বড় কঠিন দেখছি! আগে চালা উঠবে, না আগে রোজগার-পাতি? কেন—তোদের কি শোবার জায়গা নেই আর?

সবই তো জানেন মাষ্টারবাবু, আছে ওই দাওয়া-টুকু। একখানা পায়রাতাড়া নড়বড়ে উকুনেখা পাতা, একটা ছেঁড়া কাঁথা—ক'খানা বোরা (চটের থলি) আর একটা তেলচিটে বালিশ। ওই বেটি মাথায় দিয়ে খানির ওপরে ঘুমুই গো। তা চালার এই দিকটা—এই দাওয়া—এখান দিয়ে জল পড়ে, পুবে ছাঁট হলে সব ভিজে একাকার। বাবা নিমুনিয়ায় দেহ রাখলো—ওই ভিজে ভিজেই।

কালুর মা যখন বেঁচে ছিল—কালু কোথায় শুতো? শুধিয়েছিলেন সান্যাল মশায়।

কোথায় আবার! ওর কি চাল চুলোর ঠিক আছে মাষ্টারমশায়। চইপর রাত তো টো টো করে ঘোরে। সন্ধে বেলা দেখি খানিগাছের পাটায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে মড়ার মত। উচ্ছন্নে গেল তো অমনি করেই মাষ্টারবাবু।

তা খানিঘরেও তো শুতে পারে।

খানিঘর? ওই নামেই খানিঘর—কখানা বাঁশ খাড়া করে নোনাআতা—খেজুর-ডাল চাইপে চাইপে কোন রকমে ভবে-পার-গোছের চালা। শুতে গন্ধ থাকে মাষ্টারবাবু।

যাই হোক—ওর বিয়েটা দিয়ে ফেল—না হলে বিপদে পড়বে। গলাটা নামিয়ে বলেছিলেন, বাউরি পাড়া ক্ষেপলে ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না।

তা'লে কি হবে মাষ্টারবাবু?

সান্যালের পরামর্শে মেয়ে দেখতে লাগল নবীন। উঠেপড়েই লাগল। কেননা তারও আগে একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

* *

বর্ষাকাল। শ্রাবণের এক শনিবারে বর্ষা নামল। সে কি বর্ষণ! বেলা যত পড়ে আসে—বৃষ্টির বেগ বেড়ে চলে তত। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ যেন ভেঙে পড়ল। আকাশটা ভেঙে খান খান করে যত জল ছিল মেঘলোকে সব বুঝি কাঁপিয়ে পড়লো পৃথিবীতে। জলে জলাকার পৃথিবী। সেই রব রব বৃষ্টির মাঝেই ঘটল সেই ঘটনা। বৃষ্টির কলরোল ছাপিয়ে উঠলো মানুষের কোলাহল। হৈ হৈ হট্টগোল। কোথাও কি জলে পড়ল

ঘর ?—ঘর চাপা পড়লো কি মানুষ ? শব্দটাই শুধু কানে আসে—কোলাহলের ভাষাটা স্পষ্ট হয় না। কিছুতেই স্পষ্ট হয় না। দাওয়ায় বসে নবীন ভাবছে—ব্যাপারটা কি ?

অবশেষে স্পষ্ট হল। উঠোনের এক হাঁটু জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে অনেকগুলি মানুষ আসছে এই দিকে, নবীনের ঘরের দিকে। হাতে লণ্ঠন—কারও হাতে বা ছাতা। কেউ করছে তর্জন-গর্জন—কাকে মারখানে নিয়ে এগিয়ে আসছে দাওয়ার দিকে।

কে—কে ? দাওয়া ভরে গেল লোকে। ওদের ছাতা দিয়ে জল গড়াচ্ছে—গা বেয়ে জল গড়াচ্ছে—ভিজে জবজবে সর্বাঙ্গ—তবু অন্তরের তাপ একটুও শীতল হয়নি।

ওরই মধ্যে মোড়ল-গোছের একজন চীৎকার করে উঠল, আজ এর হেস্ত-নেস্ত করে যাব আমরা। গাঁ খানা কি বিবাধন যে তোমার লটবর ছেলে দিনে রেতে বাঁশী বাইতে কুল বইতে বেড়াবে ? এই উপরন্তু বৃষ্টি—এর মধ্যেও—

কঠিন চোখে কানুর পানে চেয়ে তাকিয়েছিল নবীন, সব মিথ্যে ? এতগুলো মানুষের কথা মিথ্যে ?

মাথা নামিয়ে কাঠের মত নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল কানু।

বল তাদোটা—এমন কাজ কেন করতে গেলি ? তোর কি লজ্জা সরম কিছু নেই ? বল হারামজাদা—

শোন নবীন, ওসব ধমক-ধামক ঢের হয়েছে, মানুষ মাদ পড়েনি, কিন্তু তাড়ির নেশায় যে একবার পেয়েছে তার কি দুধ ভাল লাগে ! ওসব শাসন আমরা ঢের দেখেছি—ঢের শুনেছি। যদি ভাল চাও তো—সামনে মাসের মাস—এর মধ্যেই বিয়েটা দিয়ে দাও। না দাও দি—

ওরা ঘনকে উঠল।

শাসনের প্রয়োজন ছিল না। নবীন হাত জোড় করে বলেছিল, আপনারা শান্ত হোন—এক মাসের মধ্যে যদি বিয়ে যদি না দিতে পারি—

কথাটা আন্তরিক ভাবেই বলেছিল নবীন। দিন দশেকের মধ্যেই একটি মেয়ে দেখে এলো। ক্রোশ দুই দূরে বাবুগঞ্জ। সেখানকার নামী দোকানদার ত্রৈলোক্য-চরণ গড়াই'এর মেয়ে।

একটু থেমে সকলকার পানে চাইলেন সান্যালমশাই। বললেন, এর আগে আরও অনেক কথা আছে—সেগুলি বিশদ-ভাবে বলা যাক।

বাবুগঞ্জের ত্রৈলোক্য গড়াই, এ অঞ্চলে কে না চেনে মানুষটিকে ! উনিশশো তেতাল্লিশ সালের আগে অবশ্য কেউ চিনত না—যেমন আর পাঁচটা মানুষ বেঁচে থাকে, তেমনিই ছিল। একটিমাত্র ঘানিতে ছোটকু সরষের তেল বার করে তারই উপস্বত্বে কায়ক্লেশে চলত সংসার। একটি মাত্র মেয়ে, সাতটি ছেলে, নিজে, বউ আর বউ'এর দূর সম্পর্কের এক পিসি। এতগুলি পোষ্য নিয়ে সংসার চালানো, বিশেষ এই দুর্মূল্যের বাজারে, চাট্টিখানি কথা নয়। তবে ত্রৈলোক্যের পরিবারটি ছিল পরিশ্রমী। নিজে তেল বেচে যা সামান্য পুঁজি করেছিল ত্রৈলোক্য তা বন্ধকী সোনাদানা রেখে সুদি কারবারে কিছু বাড়িয়েছিল। আবার সুযোগমত কলাইটা, আলুটা, কিছু আনাজপাতি পাট—এসব কেনা-বেচা বাঁধাই রেখে টাকার অঙ্কটা ফাঁপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে এ যাবৎ। ত্রৈলোক্যের বউ-ও তাঁতিদের কাছ থেকে সুতো চেয়ে এনে লাটাইয়ে ভরে কিছু উপার্জন করত। বুড়ি পিসি চরকায় সুতো কেটে পৈতে তৈরী করত। ব্রাহ্মণ মহলে সে উপবীতের চাহিদা ছিল। তা ছাড়া পিসির কিছু লুকানো টাকা ছিল—যার বলে আত্মীয়ের আশ্রয়ে এসেও মাথা উঁচু করে চলাফেরা করত।

কেউ কিছু বললে সহাস্যে জবাব দিত, আমি কি জামাই'এর ঘাড়ে চেপে রয়েছি—না কুটুমের অন্ন গিলছি ? ছিঃ-ছিঃ, ভগমান এমন প্রিবিত্তি যেন না দেন। নিজে চরকা কাটি—পইতে বেচি, সুতো পাড়ি করি—তাই থেকেই পরনের কানি ও পেটের দু' মুটো জোটে। তা ছাড়া—আমার যা রাগরতি রইল তা ওদেরই। তবের অনাথ করবার জন্যে এখেনে আসিনি। ছিঃ—যেমার কথা।

ত্রৈলোক্যর স্ত্রী সব সময়ে বুড়ির উঁচু কথা সহ্য করতে পারত না—প্রতিবাদ করত। তার ফলে গোলমাল বেড়ে উঠতো।

ত্রৈলোক্য স্ত্রীকে ধমক দিত, আঃ—চুপ কর দিকি। বুড়ো মানুষ বলছে বলুক না—সব তাতেই কোরন কাটিস্ কেনে?

স্ত্রী বলত, অসৈরণ সইতে পারি নে বলেই বলতে হয়। বলি কি এমন সোনাদানা তালুক-মুলুক সঙ্গে করে এনেছে—তাই অত ফরফরানি!

চুপ—চুপ। বলি মানুষটা তো বসে খায় না! ত্রৈলোক্য ফিস্ ফিস্ করে বলত, তা ছাড়া—কিছু আছেই রেখে। নইলে অত কটকটানি!

ওই আশাতেই থাক।

থাকলায়। আশায় মানুষ বাঁচে জানিস?

জানি—বুড়ি যদ্দিন বেঁচে থাকবে সে শুধে যাবি—বুঝলে?

বলি বুড়ি তো চেরকাল থাকবে না।

ওসব তিনকুল-খেকো মানুষ মরে নাকি! ওরা হল যমের অরুচি।

ওরে যমেরও অরুচি সারাতে নিম ছেঁচকির প্রয়োজন হয়—তখন ওই বুড়ি-বুড়িদের ডাক পড়ে। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসত ত্রৈলোক্য।

তাই গোন গা দিন। বউ'এর মুখ তার হয়ে উঠত।

* *

দিন গুনতে হলোনা—তেতাল্লিশে বাংলা জুড়ে নামল দুর্ভিক্ষের ছায়া। সে ছায়া দিনে দিনে ঘন হয়ে উঠতে লাগল। চালের দাম দিনকের দিন চড় চড় করে বেড়ে গেল। হাহাকার উঠল প্রতি গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়।

সবাই প্রমাদ গুনলে—কিন্তু ত্রৈলোক্যর মুখে একটিও দুশ্চিন্তার রেখা পড়ল না। নির্ভাজ নিটোল মুখে সংসারের কাজে অটল হয়ে রইল সে।

এতবড় সংসারের ভার যার মাথায়—এহেন দুঃসময়ে সে কেমন করে নির্বিকার থাকতে পারে?

নবীন বলেছিল, এর কারণ ছিল মাষ্টারবাবু। ওই পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ—যার জন্যে গাঁ-কে গাঁ উজোড় হয়ে গেল—তাই দাঁড় ক'রিয়ে দিলো গড়ুইকে। ওই বছরেই গড়ুই হলো মহাজন।—এখন ওর দশখানা খামিতে—হড় হড় করে-তেল বা'র হচ্ছে মাষ্টার বাবু—কলের চাকা যেমন তেল পেলে সড়গড়িয়ে চলে—তেমনি চলছে ওর সোম্সার. সে ওই মন্বন্তরের আগে পরেই মাষ্টারবাবু।

কেমন করে তা সম্ভব হলো?

ত্রৈলোক্যর মুখে শোনা কথা মাষ্টারবাবু—এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়। ওই যে জিনিস পত্তরের দাম—বিশেষ করে চালের বাজার—আগুন হয়ে উঠতে লাগল—তাই দেখে ত্রৈলোক্য একদিন বুড়িকে বলল, পিসিমা—আজ যদি কিছু টাকা হাতে পেতাম তা'লে দু'দো-মুঠো ধরে সোনা-মুঠো করে দিতাম। আজও পাঁচশো খানিক টাকা আমার আছে, আর পাঁচশো খানিক পেলে—

বুড়ি বলল—তাতে লাভ কি থাকবে বাবা?

টাকায় টাকা লাভ। এখন ষোল টাকায় যদি চাল এক মণ পাই—মাস খানিক বাদে তা তিরিশ বাত্রিশে বিক্রী হবে।

সত্যি! সত্যি! পিসির চোখ দু'টো কোটরের মধ্যে জ্বলে উঠলো।

এই তামা তুলসী আর গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলছি, রাত্তির কাল—চুনের ঘর—আমি যদি মিথ্যে বলি—

বুড়ি বলল, তোমাকে জানি বাবা—তাঁবায় পাত্তরে গঙ্গাজল—খাঁটি নোক। তা আমিই না হয় দেব পাচশো।

ব্যস্—ওই হাজারের লেনদেনে—তিন মাসে দশটি হাজার কামিয়ে নিলো ত্রৈলোক্য। তখন তার হাত দেখে কে। এমন অঘেষ্ট—পিসিও দেহ রাখল ওই সময়ে—পুরোপুরি সবটাই অর্শাল গড়ুইকে। গড়ুই এখন মস্তবড় মহাজন। গঞ্জে ওর কত নাম ডাক। এখন ধান, চাল, ডাল, তিসি, তুষি, পাট, কলাই সরষে, হলুদ সবেরই মহাজন। আর তুই'এর পর তুই কিনছে—বলতে গেলে সারা গঞ্জটার মালিকই উনি।

তা এতবড় যে মহাজন—সে কেন ওর একটি মাত্র

মেয়েকে তোমার মত গৃহস্থের ঘরে দিচ্ছে? বিশেষ করে তোমার ছেলের এমন দুর্নাম!

তার কারণ আছে মাষ্টারবাবু। আর একটু ঘন হয়ে বসে গলার স্বর খাদে নামিয়ে আনল নবীন। দুই পাই কি অমনি বাঁটে হাত দিলেই দুধ দেয়—তার প্রয়োজন ছ'দিন-সাতদিন। ত্রৈলোক্যও ওই গোত্তরের। যখন বললাম, গড়ুই-দাদা—দশ দশ সরষের দামটা এ-মাসে আর দিতে পারব না—ওটা তিন কেপে শোধ করে নিও, তখন সে কি তিড়িং বিড়িং লাফানি। তারপর সেই খুলোপড়া দেওয়া—অমনি খাটির মানুষ। বলে—তা এ আর বেশী কথা কি, তুমি হলে গিয়ে সম্বন্ধে জেঠাত—খুল্লতাত। তোমার সুবিধে দেখব বই কি তাই। তা দিও—যখন তোমার সুবিধে হবে—দিও? তোমায় কি অবিশ্বাস করি—তবে পাঁচ শালায় আমায় জেরবার করে ফেলেছে। দিদি দেব করে—ষোটা টাকা সাপ করে—খালি ফুস্‌ং তাগাং দিচ্ছে—তাইত……

সান্যাল বললেন, কারণটা কি জিজ্ঞাসা করলাম না। নবীন আপনিই তা বললে। তবে সেটা পাঁচ কান না করাই ভাল। ব্যবসার কথা—গোপন কথা তো। শুধু এইটুকু শুনে রাখ, এই পিসি খরচের মত যা আসলে রেখেছিল—তা অনেক। ত্রৈলোক্য আশাও করতে পারেনি—তিন-কুল-খেকো একটা অনাথা বুড়ি—এত টাকা কি করে জমিয়েছে! ওই পিসির শ্বশুর কুলের সম্পর্ক ছিল নবীনের সঙ্গে। আইন মতে সে-ও সম্পত্তির হকদার। কিন্তু স্বাবর সম্পত্তি হলে আইন-কানুনের আওতায় ফেলা যেমন সোজা—নগদ টাকা গহনার তো সে সুবিধা নাই—সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। প্রমাণ করা কঠিন হলেও—বেগ দেওয়া যেত যদি আদালতের শরণাগত হত নবীন। আরও একটা প্রমাণ ছিল নবীনের হাতে। একখানা হাত চিঠি। সেই হাত চিঠির মাঝখানের পাতায় ছিল একটা হিসাব—প্রায় চার হাজার টাকার লেন-দেনের হিসাব। ওই টাকাটা বুড়ির কাছ থেকে ধার নিয়েছিল ত্রৈলোক্য। জমার ঘরে উশুল দিয়েছিল। ওর টিপ-ছাপ—ইসাদীর সই—সন তারিখ—স্ট্যাম্প—পাকা বন্দোবস্ত করেই টাকা নিয়েছিল বুড়ি। সেই হাত চিঠিটা কেমন করে যে নবীনের কাছে এসেছিল—সেও এক কাহিনী। যাইহোক, কাহিনীটা পরে বললেও চলবে—আপাতত নবীন খুসি হয়ে চলে গেল। কিন্তু লোভের যেমন তৃপ্তি নাই—তৃপ্তিরও তেমনি সীমা-পরিসীমা নাই। সামান্য খুসিকে যতখানি বাড়িয়ে নেওয়া যায়—তারই চেষ্টা সারাজীবন ধরে চালায় মানুষ।

নবীনও একটু একটু করে ধারির বহর বাড়িয়ে চলল। ত্রৈলোক্য একদিন বিরক্ত হয়ে বলল, এ তোমার কেমন প্রবৃত্তি হে ভাগাত! যার ছেলে যত চায়—তার ছেলে তত পালায়। অর্থাৎ তার লালসা তত বাড়ে।

নবীন বলল, অন্যায়টা কি বললাম—গড়ুই দাদা। পিসি তোমার একলার ছিল না—আমিও ওনার দেওর-পো ছিলাম কিনা সম্পর্কে……

সম্পর্ক যাই হোক—ওনার ভাত-কাপড়ের ভারটা তো নাওনি?

নাইবা নিলাম—কিছু সম্পত্তি তো আশা করতে পারি।

সম্পত্তি! চোখ কপালে তুলে ত্রৈলোক্য বলল, বলকি ভাগাৎ—! বুড়ি-কি তালুক মুলুক রেখে গেছে যে—

তালুক-মুলুক নয় দাদা—নগদ চাড্ডিখানি তো ছিল তেনার। সেই এখির জোরেই তো তাঁরা কোমর খাড়া করে চলত বুড়ি। তার জোরেই তো দেঁড়িয়ে আছ দাদা!

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ত্রৈলোক্য। বলে কি নবীন!

নবীন হেসে বলেছিল, ঝগড়া বিবাদ করতে আসিনি দাদা, সে প্রিবিত্তি নেই। আমি যে ধাতের মনিষ্যি সে তো বিশ বছর ধরে দেখছ। টাকা কড়ি নেই বটে, কোন ব্যাটা বিটির ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি—এ অপবশ আমার অতি বড় শত্তুরেও দিতে পারবে না। তবে আত্ম-কুটুমের কাছ থেকে আশা কে না করে! বুড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একটু ছিল—অশৌচ পালন করলাম—সে-ও তো দেখলে পাঁচজন—

ত্রৈলোক্য বলল, কিন্তু উনি তো তোমার আপন

জোটি ছিল না। তুমি ওনার কোন্ চোদ্দ পুরুষের নাই-পাড়া—তাতো শুনিনি কোন কালে। ত্রৈলোক্য রীতিমত গরম হয়ে উঠেছিল।

শোনবা বাবা—শোনবা এবার। তুটুম গরিব হলে—তার মূল্য কি! তুষ্যি উঠলে কি আকাশে তারা দেখা যায়? তুমি নিয়ে এয়েলে ওনারে তোমার শ্বশুর-বাড়ির সুখাসে। শুধিয়েলে কি কোন্ সুবাদ কার সঙ্গে? মরুগগা এসব কথা। জমি জমার কথা ছাড়ান দাও—নগদ টাকা যা ছিল ওনার ঘর বলে চালের বেলাকে মা লক্ষ্মীকে ঘরে তুলেছ,—তার ভাগীদার আমিও তো কিছু।

বটে—নগদ টাকা! কত লাখ পকাশ হে—

খুব বেশী নয় গো—হাজার কতক হবে। হাতচিঠিতায় শোনলাম চার হাজারের লেনদেন রয়েছে—

হাতচিঠি! চমকে উঠলো ত্রৈলোক্য। কে তোমাকে বলেছে—

কেউ বলেনি দাদা—ওটা আমার জিম্মেতেই রয়েছে আপাতক। ওই বুড়ি যেদিন সগ্‌গলাভ করে—উইদিন ওনাকে বার করতে গিয়ে বালিশের ওয়াড়ের মধ্যিখানে পেয়েলাম।

বালিশ!

হাঁগো—যে বালিশডা মড়ার চালিতে তুলে দিয়েলে তারই মধ্যিখানে ছিল। বালিশডা ফেলে দিতে গিয়ে শ্মশান ঘাটে ওটা হাতে ঠেকেলো। বলি নালমত এ খতখানা আবার কি! তক্ষুনি মনে হল, বুড়ি তো অনাথ ভিকিরি ছিল না—টাকার লেনদেন করে বেশ তু'পয়সা করেছিল। এডাতে হয়তো তারই হিসেব·· যেমন মনে হওয়া—অমনি ওডারে পেটকোঁচড়ে চালান দিয়েলাম দাদা। তা কামডা মন্দ করেলাম কি!

ত্রৈলোক্যের মুখে কথা সরলো না—বেশ খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল নবীনের দিকে। পরে মুখখানা গম্ভীর করে বলল, তা কি চাও তুমি? টাকা?

নবীন বলল, না—না, টাকা চাইলেই দিচ্ছে কেডা? তোমার সঙ্গে ওই তুচ্ছ দ্রব্যের জন্যে মন কষাকষি করব আমি! রামঃ বল—তেমন ছোটনোক নই আমি।

আরও গম্ভীর হয়ে ত্রৈলোক্য বলল, তা'লে কি চাও?

বলব—বলব—আর দু'টো দিন সবুর কর—বলব।

সে কথা কিছুদিন পরেই জানিয়েছিল নবীন। কিন্তু তার মধ্যে যে কাহিনীটুকু জমা হয়েছিল—সেটুকু খোলসা না করলে—ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে না। এই সময়ে সেটা বলে নেওয়া যাক।

• • •

সাঙ্গালের মুখে শোনা কথা তুলে দিচ্ছি।

আগেই বলেছি ত্রৈলোক্যের সাত ছেলে—এক মেয়ে। সাত ভাই চম্পার—এক বোন পারুল সে নয়। কিন্তু ছেলে বেলার ছড়াটা পাড়ার কেউ কেউ সুর করে আওড়াতো:

সাত ভাই চম্পা জাগো রে।

কেন বোন পারুল ডাক রে?

আর বোনটি চটে উঠতো। বলত গলা ছেড়ে—মর—মর তোরা—ঘরের দক্ষিণ তুয়োরে যা।

সাত ভাইএর এক বোন—বাপ মায়ের আদরের সন্তান। সুতরাং প্রতাপ তার দুর্জ্জয়। জেদী, অভিমানী, কলহনিপুণা, স্পষ্টভাষিণী। নাম কামিনীবালা। কামিনী-ফুলের মত স্পর্শভীরু নয়, কামিনী-গাছের মত কোমলাঙ্গীও নয়। কামিনী ডালের মতই শক্ত—আঘাত করার প্রবণতা ওর মজ্জায় মজ্জায়। বাড়ীর আদরে বেড়ে উঠে—প্রতিবেশীদের ঘরে ওর উৎপাত-চিহ্ন রেখে আসত নিত্যদিন। সবাই বলত—কি ঘন্তি মেয়ে! যার ঘরে যাবে—তার একখানি ঘর ভেঙে করবে সাতখানি। শাশুড়ী শ্বশুর থাকলে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়বে। আ ননদদের করবে কিটে ছাড়া, আর স্বামীকে বানাবে ভেড়া। কামরূপ কামিখ্যের ডাকিনীরা যেমন মন্ত্র পড়ে পুরুষকে ভেড়া বানায়, তেমনি।

কিন্তু কামিনীবালা কামিনী-ডালের মত শক্ত হলে কি হবে—আসলে মেয়েই তো। কোন-না-কোন সময়ে ওর ডাল ভরে কুঁড়ির রাশি দেখা দেবে। সে কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটবে। যত অল্প সময়ের জন্যই হোক—ফুল একদিন ফুটবেই। আর ফুল ফুটলেই·····

তার কিছু আগে কালুর আনাগোনা ছিল এ বাড়িতে। মাত্র ক্রোশ দুই'এর ব্যবধানে দু'টি গ্রাম। মাঝে বরাবর গঞ্জের হাট। ঠিক মাঝ বরাবর নয়—বাবুগঞ্জ থেকে আধ মাইল। বেশ খানিকটা কাছেই। সেই হাটেই এ তল্লাটের যত গ্রাম আছে তার থেকে মাল পত্তর জড়ো হয়। জোর কেনাবেচার ধুম লাগে সোম, বুধ আর শনিবারের দিন। মাল গরু হয়ে বেশির ভাগ চালান যায় জলপথে নৌকায়, স্থলপথে গরুর গাড়ীতে যায় তার অর্দ্ধেক, বাকিটা মানুষের মাথায় কাঁধে হাতে। সকাল থেকে সন্ধ্যেবেলা পর্য্যন্ত কেনাবেচার ধুম। এই হাটে ত্রৈলোক্যরা আসে—নবীনরাও আসে। ত্রৈলোক্যের তিন ছেলে—যারা কেনাবেচার যোগ্য হয়েছে—আসে। আসে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কালু। নবীনরা আসে মাল নিয়ে—জীবিকা অর্জ্জনের তাগিদে, কালুরা আসে হাটের দিনে যে প্রমোদ বৈচিত্র্য পসরা সাজায়—তারই লোভে।

সে আয়োজন গ্রামের ছেলেবুড়োদের পক্ষে সামলান নয়। লটারিতে লক্ষের লাভ, কালো পরদা-ঢাকা টিনের বাক্সের কাঁচের চোঙে চোখ রেখে দিল্লী আগ্রা শহর দেখা, ঢুমঢুম্‌ বাজনার তালে তালে বাঁদর আর ভালুকের রঙ্গ-কৌতুক উপভোগ করা, কিংবা বেঞ্চের বেঞ্চিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, এমন আনন্দ হাটে না এলে পাওয়া যায় ? আরও আনন্দ আছে—যা কালুর মত জোয়ান বয়সের ছেলেদের জন্য। ওরা পানের দোকানে—পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে—সস্তার সিগারেট ঠোঁটে চেপে বেঁ বেঁ টানে ধোঁয়া ছেড়ে কাশতে কাশতে সে আনন্দ উপভোগ করে। কিংবা কাঁসারীদের সোডা ওয়াটার গলায় ঢেলে চোখের জল করিয়ে চক চক করে খেলে। কোন তরুণী কন্যাকে দেখে কৃষ্ণ-যাত্রার বিরহ-গান গেয়ে ওঠে আর হো হো করে হাসে।

ওই হাটে কালুর যাতায়াত কিশোর বয়স থেকে। তখন হাটের জনতা ওর মুগ্ধ দৃষ্টিতে কৌতূহল ঘনিয়ে তুলত। রসের চেয়ে রঙের দিকটাতেই ছিল আকর্ষণ। সেই সময়ে দুপুর বেলায়—বিশেষ করে গ্রীষ্মকালের দুপুরে কামিনীবালার দুই দাদার সঙ্গে ওদের বাড়াতে গিয়ে ফিরিয়ে নিত খানিক। কোনদিন বা মধ্যাহ্নের আহারটাও সারত ওইখানে। প্রথম প্রথম তারি লজ্জা করত—খেতে চাইত না কিছুতেই।

কামিনীর বড়দাদা অক্রূর বলত, নে—লজ্জা রাখ কেলো—এই চাল্‌ডেখানিক মুড়ি এ নাকি খাওয়া যায় না !

মেজদাদা রাধু (রাসবিহারী) বলত, ওরা শহুরে মানুষ যে, আশ ছেলের মুড়ি মুখে রোচে না !

লজ্জায় বেশী করে মুখে পড়ত মাথা। কালু একগাল মুড়ি মুখে পুরে বলত, খাং।

খেতের খানিকে আরও মুঠো চারেক মুড়ি ফেলে দিয়ে কামিনীও হেসে উঠত খিল খিল করে।

সে হাসিতে কালুর চোখমুখ আরও গরম হয়ে উঠতো। মেয়েছেলের হাসি—বিশেষ করে ওই অতটুকু পুঁচকে মেয়ের হাসি—কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। বাড়ীতে হলে হয়তো রাগের মাথায় একটি চড়ই কষিয়ে দিত গালে ; এখানে সে নিরুপায়। রাগ সামলাবার জন্য তাড়াতাড়ি আরও কয়েক খামচা মুড়ি গালে পুরে দিত—আর সঙ্গে সঙ্গে সে কি কাশি !

মেজদা রাধু বলত, জল মুখে দাও গো—গলায় মুড়ি আটকেছে।

কামিনীবালা বলত, মুড়ি আটকাবে কেনে—কেউ নাম করছে। বলে আবার হাসত।

এইবার চটে উঠে কালু বলত, নাম করছে। কে নাম করবে ?

কামিনীবালা চোখমুখ ঘুরিয়ে বলত, তার আমি কি জানি ! তোমার আপনজন কে কখনে আছে তুমিই জান।

কালু বলত, আমার মা নেই—জান ?

কামিনী বলত, শোন কথা—মা না থাকলে বুঝি নাম করবার কেউ থাকে না। ভাব-ভালবাসার কত লোকই তো থাকে মানুষের।

অতটুকু মেয়ে—কি পাকা গিন্নীর মত কথা।

কালু কিন্তু ক্ষুণ্ণ হত না, কৌতুক বোধ করত। বলত খুব আপনার জন না হলে—তা বলবে কেন ?

এই দেখ—ফলে না! আচ্ছা—আজ সন্ধেবেলা না হয় দেখো ফলে কি ফলে না।

রাশু বলত, কি করে ফলবে?

কেনে—ঘাড় বাঁকিয়ে কামিনীবালা বলত, ধর উনি সেই সময় দাওয়ায় বসে আছে—আমি পিদীম জেলে ওনার নাম করলাম—ফলবে না?

রাশু বলত, ফলবে না। তুই ওনার ভাল নামটি জানিস?

যেডা জানি সেইডেই বলব। তাতেই ফলবে।

বলত দেখি? বলে রাশু চেয়ে থাকত ওর পানে!

অমন ডাকাবুকো মেয়ে এই চাউনিতেই কেমন নেতিয়ে পড়ত। মুখ ফিরিয়ে নিতো তাড়াতাড়ি। মুড়ির বাসিটা দুম করে দাওয়ায় নামিয়ে রেখে ছুটে পালিয়ে যেত। যাবার সময় বলতে যেতো, দাদা যেন কি! নাম ধরে ডাক বললেই নাম ধরা যায়? লজ্জা করে না বুঝি!

কালুর মনের মধ্যে সে যেন বিঁধিয়ে দিয়ে যেতো শেষের কথাটা। লজ্জা করে না বুঝি! কেন—কেন এ কথাটা বলল—কামিনীবালা!

অতঃপর কামিনীবালাকে মন্দ লাগল না। একটু একটু করে খসল অপরিচয়ের অন্ধকার—একটু একটু করে এগিয়ে এলো ওরা পরস্পরের দিকে।

একদিন কামিনীবালা বলল, যা, ওনারেও চাড্ডি ভাত দে—দেখছিস নে মুখখানা শুইকে গিয়েছে।

কালু বলল, না, না, আমার খিদে পায়নি।

কামিনীবালা বলল, সে মুখ দেখলেই বোঝা যায়। যা, দাদাদের সঙ্গে ওনারও ভাত বাড় এক কাঁসি।

সত্যিই খিদে পেয়েছিল কালুর। সেই কোন্ ভোরে আগের দিন দুপুরবেলার-রান্না-করা ভাতে জল দিয়ে রেখেছিল নবীন। রাত্তিরে খেয়েছে সেই জল দেওয়া ভাত, ভোরবেলাতেও খেয়েছে খানিকটা। ভরপেট হয়নি। শুধু নুন আর ভাত। আর এক গলা তেল দিয়ে পান্তাটাকে মুখরোচক করে নিয়েছে। মনে হয়েছে আরও দু'গ্রাস পেলে ভাল হয়। কিন্তু বাপবেটায় আধা-আধি ভাগ করে নেওয়ার আর একবার চাওয়ার অবকাশ হয়নি। খিদে সত্যিই পেয়েছিল। তা ছাড়া এক বয়সের ছেলে কেউ সামনে খেতে বসলে—খাওয়ার ইচ্ছা হয়ই। যে বলে হয় না—সে মিথ্যে কথা বলে। এই কিশোর বয়সে কি খাওয়ার সময় অসময় আছে? না, অল্পপর তেজস্কান প্রখর হয়ে আত্মমর্যাদার বন্ধন-সচেতনগুলো খোঁচা দিতে থাকে? ওসব অন্য বয়সের ব্যাপার।

কালু আর প্রতিবাদ করল না—রাশুর পাশে গিয়ে বসল।

গরম গরম আউশ চালের ভাত। লাল কাটা-কাটা খসখসে ভাত। তার সঙ্গে ডাল আর আলু ভাতে, আরও একটা ভাঁটা কুমড়ো দিয়ে তরকারি। শেষ পরে আমড়ার টক। কে জানে অমৃত এর চেয়েও মিষ্টি কিনা? বড়ই ভাতের গ্রাস মুখে তোলে কালু—চচ্চড়ির বাঁধটা তত্তই ভেঙে ভেসে যায়। অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে একটি উদ্গার তুলল কালু। পরিতৃপ্তির উদ্গার।

কামিনীবালা হেসে উঠল। বলল, তবে যে বলছিলে, খিদে নেই?

কালু লজ্জায় মাথা নামাল না—হাসতে হাসতে জবাব দিল, ছিলই না তো খিদে। ভাতের কাঁসি সামনে দিলে খিদে পায় আপ্‌সে। যে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।

সবাই হেসে উঠল—কালুও হাসতে লাগল।

কামিনীবালা বলল, আজ কিন্তু বাজারে যেতে পাবা না তোমরা—আমাদের সঙ্গে খেলতে হবে।

রাশু বলল, খেলা! কি খেলা জানিস তুই?

ইস্ জানিনে বই কি। তাস খেলব—পেটাপিটি খেলা। সইএর কাছ থেকে এক জোড়া তাস এনিছি এই দেখ।

বলে সুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে গেল। তেমনি সুড়ুৎ করে বেড়িয়ে এলো তাস হাতে করে। এই দেখ।

এক জোড়া ময়লা চিরকুট তাস। কালো রঙে একাকার ছবিগুলো প্রায় মুছে গেছে। ফোঁটাও উঠে গেছে অনেকগুলির। তা হোক, খেলাটা তো নূতনতর সঙ্গীরা নূতন,—এমন ভাবে গোল হয়ে আপন মনের মধ

বসাও এই প্রথম। খেলার কিছুই জানে না কালু। রাণ্ডও ভাল জানে না, কামিনীবালাও নয়। তবু ওদের সব ক'জনের আনাড়ীপনায় খেলাটা বেশ জমে উঠল। বেশ খানিকক্ষণ হাসি পিটে কাটল। তারপর সবাই উস্‌খুস্ করতে লাগল। খেলা আর জমছে না।

এবার প্রস্তাব করল কামিনীবালা, তাস খেলা থাকুক চল কামরাঙা পেড়ে খাইগা।

বাড়ীর পিছনে খানিকটা জঙ্গল মত ছিল। আগাছার জঙ্গল। তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কুল, পেয়ারা, জাম, আমড়া আর কামরাঙার গাছ কয়েকটা। ওটা কুল ও জামের সময় নয়, পেয়ারা গাছটা প্রায় ফল শূন্য হয়েছে, শুধু আমড়া আর কামরাঙাতে ভরে রয়েছে প্রতিটি শাখা। প্রথমটা পল্লবপ্রচ্ছন্ন শাখায় ফলগুলি নজরে পড়ে না। গোয়ালে প্রভৃতি লতারাও দুরন্তভাবে ঝাঁপিয়ে উঠেছে গাছের মাথায়! দিয়ে একটি ছাতির আকার নিয়েছে গাছগুলি। দূর থেকে কিছুই নজরে পড়ে না, কাছে এলে জাগে বিস্ময়! উঃ—কত ফল ফলেছে! কি থলো থলো, কেমন সবুজ, হলদে আর গোলকাটা!

কামিনীবালা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, দাদা—দেখ দেখ—মাস্তর কাল আসিনি—ইরি মধ্যে কত পেকেছে!

গাছ-কোমর বেঁধে তর তর করে কামরাঙার গাছে উঠে গেল কামিনীবালা। তারপর ওরাও গাছে উঠল—রাণ্ড আর কালু। ওরা যত না ফল ছেঁড়ে তত চীৎকার করে, ডাল দুলিয়ে দোল খায়, এধার-ওধার ছুড়ে ছুড়ে ফেলে আধ-খাওয়া ফলগুলি। ওদের চীৎকার-উল্লাসে সারা গাঁয়ের ছেলে মেয়েরা এসে জুটল সেই বোপের মধ্যে। তারপর সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত চলল ওদের হৈ-হুল্লোড় কোলাহল কলরব।

ব্যস—প্রথম দিনেই যা লজ্জা সঙ্কোচ, কিন্তু-কিন্তু ভাব। এক দিনের হৈ-হুল্লোড়ে ছিঁড়ে গেল পরদাটা—ওসব কোথায় উড়ে গেল।

হাটের দিন ছাড়াও কালু আসতে লাগল দু'ক্রোশ পথ ভেঙে বাবুগঞ্জে। বাড়ীর কানাচে, মাঠে, বনঝোপে, কখনো বা বাঁওড়ের ধারে আড্ডা জমতে লাগল।

আত্মীয়তা-বন্ধন ছিল না। শিশির ক্ষীণ সুতোর সম্বন্ধটায় বেশ করে পাক দিয়ে নিলে এরা। সুতোটি আর অগোচরা রইল না।

এমনি করে কয়েকটা বছর কাটল।

একদিন ত্রৈলোক্যের বউ বলল, ছেলেডা বেশ—দিব্যি গোপাল-গোপাল ভাব।

ত্রৈলোক্য বলল, কালো পাথরের গোপাল।

বউ বলল, হোক না কালো। কালো জগৎ আলো।

ত্রৈলোক্য হাসল। বলল, তা সমাচারডা কি?

বউ বলল, যেন জান না।

ত্রৈলোক্য হেসে বলল, জানি, কিন্তু ছেলেডা যতই চেহারাবাজ হোক—সে গুড়ে বালি।

কেনে? শুধোল বউ।

ওই চেহারাই আছে—ওধিকে গাঁড়ে যা ভবানী।

কেনে—চালচুলো নেই?

তা আছে—কিন্তু বললাম না—গাঁড়ে যা ভবানী। একখানা মাস্তর খানি—কষ্টেসিষ্টে বাপবেটার সোম্‌সার চলে।

যা নেই বুঝি? আহা! এত শুনেও বউএর মন সমবেদনাতুর হয়ে উঠল। বলল, আমাদের ওই একটা মেয়ে, কিছু জমিজিরেৎ দিয়ে মেয়েকে গেরামেই ঘর-বসত করাও না কেনে?

ধুস্—তা কি হয়!

কেনে হয় না? বউ জিদ ধরল।

হয় না এই পর্য্যন্ত। কেনে—কি বিত্তান্ত অত নিকেশ দিতে পারব না।

বউ আর কথা কাটাকাটি করলো না। চুপ করে গেল। আশাটা মন থেকে পুরোপুরি মুছে গেল না।

* * *

কথাটা কালুর কানেও গেল। রাণ্ডই বলল পরের দিন, জানিস কালু—কাল মায়ের সঙ্গে বাবার খুব কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। মা রাগ করে বৈকেলে ভাত পর্য্যন্ত খায়নি।

কেনে রে?

এই তোকে নিয়েই কথা উঠলো। মা যত বলে, হ্যাঁ—বাবা ততই গদা চড়ায়, না।

'হাঁ' 'না'-এর দ্বন্দ্ব কি উপলক্ষ্যে বুঝতে পারল না কালু— হাঁ করে চেয়ে রইল রাঙর মুখের পানে।

কি বোকা তুই—বুঝতে পারছিস নে? রাঙ হেসে উঠলো। ওরে মায়ের ইচ্ছে তোকে জামাই করে—

ধ্যাৎ! ঝমক দিয়ে উঠল কালু।

মাইরি মাইরি—মা কালীর দিব্যি যদি মিথ্যে বলি। এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি। রাঙ কালুর কাঁধে হাত রাখলো!

কালু যেন সহসা পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। এ আবার কি কথা! এমন কথা কোনদিনই তো ভাবতে পারেনি। তাই নাকি হয়? ত্রৈলোক্য গড়াই—এ দিগড়ের নামী লোক। ধানচালের বাঁধি কারবার, দশখানা বাড়ি ঘরে ঘুরছে—সে তার একমাত্র কন্যাকে দেবে ছন্নছাড়া গরিব ছেলের হাতে! যাদের বাড়ির উঠোনের সঙ্গে বনের কোন তফাৎ নেই; একখানি মাত্র চালা ঘর আর একটি মাত্র দাওয়া নিয়ে বাড়িটা টিমটিম করছে। বাড়তি লোকজন এলে মাথার আকাশ ভেঙে পড়ে—শোয়াবে কোথায়, খেতে দেবে কি? একদিন ধানি না ঘুরলে—চক্ষু অন্ধকার। পরের দিন আধপেটা খাওয়ার ব্যবস্থা। তাদের ঘরে আসবে ওই কন্যে? অমন রূপবতী, অত আদরের কন্যে!

প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে কালু বলল, ধ্যাৎ—ঠাট্টা-টিটকিরি ভাল লাগে না। চ—আজ ছিপ নিয়ে বিলে বসি গা। গোটাকতক কেনুই ঘুঁড়ে নেই ততক্ষণ।

মাছ ধরাতে আপত্তি নেই রাঙর। কিন্তু তার আগে কালুকে ও বিশ্বাস করাতে চায়। কথাটা।

অবশেষে কালু বলল, আচ্ছা—আচ্ছা সে তো উত্তম কথা। এই বেলা বড় বড় মাছের মুড়ো খাওয়াবার ব্যবস্থা কর গা।

* *

হেসে উড়িয়ে দিলেও—মন থেকে যায় হয়ে গেল না কথাটা। মনকে যেন পেয়ে বসলো, আহা—কামিনী-বালা শুনেছে নাকি কথাটা? শুনে কি বলল? ঘাড় ঘুরিয়ে বলল বুঝি, আ মরণ! তাই নাকি হয়!

কালুও জানে তা হয় না। অমন সুন্দর মেয়ে—অমন গড়নপেটন মোটা সোটা—শিশির-পাওয়া লাউ ডগাটির মত লতেজ—চৈত্রের ঝমকা হাওয়ার মত জামাল। সামনের দাঁতটা যা উঁচু—কিন্তু শক্ত চোয়ালে আটকানো সেই দাঁতের ধার তো কম নয়। ওর কথা শুনলেই মনে হয়—হুকুম করতেই ও পৃথিবীতে এসেছে। ও মেয়ে কাঁদতে জানে না—নরম সুরে কথা বলতে জানে না—নরম পায়ে হাঁটতে শেখেনি। ওরা জাতই আলাদা। এ কথা শুনলেই ফোঁস করে উঠবে। বলবে—

কি বলবে—তাও মনে মনে কল্পনা করতে লাগল কালু। সেদিন রাত্রিতে ভাল করে খেলে না—ভাল করে ঘুমুতে পারলে না। খালি ভাবতে লাগল, ধুর—তা কখনো হয়?

নবীন বলল, তোর শরীলডা কি ভাল নেই কালু?

কেনে?

কাল আত্তিরে ছট্‌ফট্ করিছিস—নিঃশেষ ফেলিছিস, মাঝে মাঝে চেঁইচে উঠিছিস। ধুর—তা কখনো হয়? ধুর—

কালু বলল, মাথাটা বড্ডা ধরেলো—তাই ঘুম হয়নি।

নবীন বলল, আজ বেশী করে আমানি খা দিনি, শরীলডা ঠাণ্ডা হবে। বাদুরঙে যাবি নে আজ?

না।

এক সপ্তাহ ওমুখো হ'ল না কালু। রাঙ এলো দেখা করতে।

কিরে মিতে—একেবারে যে ডুমুরের ফুল? সমাচার কি?

শরীল ভাল নেই।

তা হো হবারই কথা। ও দিকেও কম ধিয়ার।

কালু মাথা তুলতেই হেসে উঠলো রাঙ। তেনার কথাই রইলো, বাবার কথা। মা বললো, ওই বাচ্ছা মেয়ে ওর বিয়ের কথা এখন থো কর। মিছিমিছি মন খারাপ।

কালু আর থাকতে পারল না। বলে উঠল, তোর বুন কিছু বললো না?

হুঁ—। মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে উঠলো রাঙ। আমায় বলল, দাদা—বাঁচলাম। তুই ডেকে আন ওনারে—অনেক দিন তাস খেলিনি, আজ খেলব। হ—।

কালু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। মাথা নেড়ে বলল, না। আমার কাজ আছে।

কাজ! তোর আবার কাজ কি—যাই যাই কাঁসি বাজাই।

যা—যা—মেলা ক্যাচ ক্যাচ করিস নে। কেঁদে উঠলো কালু।

রাঙ অবাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। কালুর এমন মূর্তি কখনও দেখেনি ও। বলল, মিতে, মন-মেজাজ তোর ভাল নেই। কাল আসব।

না—কাল আসবি নে। অদ্ভুত কণ্ঠে বলল কালু।

আরে এত আগ কেনে? খেলতে গেলে বুঝি তোর তালুক-মুলুক বরে যাবে! আচ্ছা—আচ্ছা—পরশু কি তরশু আসব।

না—না—আর আসবা না। উচ্চ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো কালু।

কেনে রে? অবাক হয়ে তাকাল রাঙ।

কেনে আবার—আমার কাজ কম্ম নেই বুঝি? খালি কম্ম নাশায় থাকলেই পেট ভরবে?

ঠিক ঠিক বলেছিস মিতে। বাবাও তাই বলে,—

তাস বাবা পাশা,

তিন কম্ম নাশা।

ও তিনতেই মানুষকে ডুবিয়ে দ্যায়। এহকাল পরকাল দুইই ঝরঝরে! তা হোক আসিস মিতে—তরশুই আসব আমি।

রাঙ চলে গেল। কালুর চোখটা তখন কর কর করছে, সব ঘাট সব কিছুই ঝাপসা ঝাপসা ঠেকছে।

খেত্তেরি! বলে দুহাতে চোখ কচলাতে গিয়ে—হাতের আঙুলগুলো ভিজে উঠলো।

আপনমনে বলে উঠলো কালু, বাঃ রে, আমি কাঁদছিলাম! বাঃ রে!

সজোরে চোখ কচলে হেসে উঠলো কালু।

* *

হাঁ—সম্বন্ধটা ভেঙেই গেল এক রকম। রাঙ আর আসেনি। বাবুপক্ষ থেকে কেউই আসেনি। আসবে না কেউ জানতো কালু। জানতো—এ সম্বন্ধ হবার নয়। মহাজনে আর খাতকে একটিই সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। ও যদি দাওয়ার উপরে বসে থাকে—এ দাঁড়াবে উঠোনে। ও উঠোনে এসে দাঁড়ালে—এ বসবে মাটিতে—অর্থাৎ পায়ের তলায়। সম্বন্ধ ওই একটিই। এখানে সমান সম্মানের জায়গাটা—আকাশ থেকে আঁকশি দিয়ে নক্ষত্র পেড়ে নেওয়ার মতো। এ হয় না। এটি নিশ্চিত জানতো কালু। অথচ আশ্চর্য—যখন সত্যিসত্যিই ঘটলো ব্যাপারটা কালু প্রথমে একটা ধাক্কা খেলে।

মা মারা গিয়েছে। সংসারে এমন আর কেউ ছিল না—ওর মনের বেদনা বুঝে সান্ত্বনা দেবে। মেয়ের ঘুমিতে একটুও পলিমাটি পড়ে নাই—শুধু চরের বালির রাশি জমেছে। ধু-ধু করছে মাঠ,—এখানে ফসল ফলে কখনো?

সারা দিনমান ধরে মাঠে জঙ্গলে ঘুরল কালু। আপনমনে কত কি ভাবল। চোখে বার বার ঝাপসা দেখতে লাগল। যতবার হাত দিয়ে চোখ রগড়ায় ততবারই হাতের আঙুলগুলো ভিজে ওঠে। না—এমন করে পারা যায় না। এর চেয়ে এক জায়গায় বসে খানিকটা চোখের জল বার করে দেওয়া ভাল। বুকটা তবু হালকা হবে।

ঘুরতে ঘুরতে মাঠের মাঝখানে জামগাছ তলায় একটা মাটির ঢিপির উপর বসল কালু। কতক্ষণ এমনি ভাবে বসেছিল কে জানে—গুপীনাথের ডাকে ওর হুঁস হ'ল।

গুপীনাথ অর্থাৎ গুপে ওর আবাল্য সহচর। এক গ্রামেই বাড়ী। অবস্থা ওদের সচ্ছল। ওর বাপের ছিল মুদিখানার দোকান—গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে চালু দোকান। চাল ডাল মসলাপাতি থেকে নাবান গন্ধ-

তেল আয়না চিরুনী চুলের ফিতে ঠাকুরের পট মাথ অন্নপ্রাশনের থালা গেলাস আর সোনার টোপর সব কিছুই পাওয়া যায় দোকানে। দোকানটা ভালভাবে চালাতে পারলে একটি সংসারের ভাবনা-চিন্তার দায় নিশ্চিন্ত। গুপীনাথের বাবা অলবিকারী প্রায়ই বলত ছেলেকে, তাই বলি—আমি থাকতে থাকতে এস্টেটপত্তর সব বুঝে সুঝে নে, তোদের দু'ভায়ের ভাবনা কি! তা যেমন গুপে—তেমনি পটলা। পড়াশুনো করলে না—খালি টো-টো কোম্পানী! আখেরে পস্তাতে হবে এই বলে দিলাম।

গুপীনাথ ওরফে গুপে বলে, ও বুড়োর কথা বাদ দে—খানিগাছে ছুড়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্তি! হুঃ তুইও যেমন—এখন দু'টো দিন ফুর্তি করে নিইতো তারপর ওতো আছেই।

কানু হেসে বলতো, বুড়ো কিন্তু তোর ভালর জন্যেই বলে।

আর নিজের ভাল চায় না বুঝি? ওরে জানিসনে ওকে—হাড় কেপ্পন—কঞ্জুসের ধাড়ী। তাইতো মা বলে, ভালমন্দ কিছু খেয়ে নাও এইবেলা, চোখ বুজলে সব অন্ধকার। ভাল করে খাবে না, পরবে না, সিনেমা দেখবে না, ঠাকুরদেবতার পুজো দেবে না—খালি টাকা আর টাকা। হাভাতে টাকার নিকুচি করেছে!

দোকানের দিকে ঘেঁষত না গুপীনাথ।

সেই গুপে এসে গা ঠেলে ডাকল, কিরে কেলো—অমন কাঠ মেরে বসে আছিস যে? আরে—আরে—একি? কাঁদছিস?

না। চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল কানু।

গুপীনাথ বলল, চ—এক জায়গায় নিয়ে যাই। একটু গান বাজনা শুনে আসি, মনটা ভাল থাকবে।

না। ওর হাত ছাড়িয়ে কানু হন হন করে চলে গেল।

গুপী অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। পরে মুচকি হেসে বলল, মেয়েমুখো পুরুষ আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি না। ব্যাটাছেলে আবার কাঁদে শুধু শুধু? আচ্ছা—আচ্ছা—আমিও দেখে নেব—তোকে হাসাতে পারি কিনা—গান শোনাতে পারি কিনা—

গুপী তার কথা রেখেছিল—সে আর এক কাহিনী। সে কাহিনীর আভাস আপনারা পেয়েছেন—কানুর স্বভাব-চরিত্র যে বদলে গিয়েছিল এই ঘটনার পর থেকে সে সবও আপনারা জানেন। তা যদি না হবে—তো এমন ঘটনাই বা ঘটবে কেন? সান্যাল বক্তব্য শেষ করে সকলের পানে চাইলেন।

চিনিবাস বললেন, রাত অনেক হল, আজ থাক—মাষ্টারমশাই—কাল পঞ্চায়েৎ বসাবেন। ভেবেছিলাম ব্যাপারটি সোজা, এখন দেখছি এরমধ্যে অনেক কাণ্ড।

সান্যাল বললেন, কাণ্ড তো বটেই—আবার যা হলো—তাও উল্টো। ছেলের হাতে বাবা যদি খুন হতো—হয় বুঝি একটা থাকতো, এ যে উল্টো বুঝলি রাম?

মানে?

মানে আর একটু শুনলেই বুঝবেন—কেন বলছি। আচ্ছা, আজ থাক—কাল সকালেই বৈঠক বসবে।

সেদিনকার মত বৈঠক শেষ হল।

• •

পরের দিন সকাল বেলায় বসলো বৈঠক। সান্যাল ঘটনাটিকে গুছিয়ে বলছিলেন: এ হলো আরও বছর দুই তিন পরের কথা। তখন পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘা পর্যন্ত। পাড়াগাঁ ছেড়ে দলে দলে মানুষ ছুটেছে শহরে। পাড়াগাঁয়ে কোথাও চাল পাওয়া যাচ্ছে না—পয়সা দিয়েও মিলছে না অন্ন। একদিন—দু'দিন—এক সপ্তাহ—বড় জোর এক মাস—

কলাই সিদ্ধ—কচু-ঘেঁচু শাক পাতা সিদ্ধ—বেশনের বড়া—বড়জোর খুদ সিদ্ধ—এই করেই চলছে। তাও দু'বেলা জুটছে না। এমনি করে কাঁহাতক চলে। গ্রাম খালি হয়ে গেল। শহরে নাকি সব অন্ন জড়ো হয়েছে। ব্যাপারটা হয়েছে—ঠিক অন্নদামঙ্গলের মত। বইয়ে লেখা পুরানো কথা—দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য-কথা—ওসব কথক ঠাকুরের মুখে শুনতে ভাল লাগে, কিংবা মুললিত ছন্দে পড়ে যেতেও আনন্দ। হয়তো এককালে ঘটেছিল—

এখন কল্পনা করে নিতে হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—যা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস আনন্দমঠের সৃষ্টি—তাও এ যুগে কে প্রত্যক্ষ করেছে? সে সব গত যুগের ঘটনা। ইতিহাস। অন্নদামঙ্গলে আছে—দেবী অন্নপূর্ণা আপন মহিমা প্রচার করবার জন্য সারা পৃথিবীর অন্ন হরণ করে বারাণসীধামে জমা করেছিলেন। অন্নাভাবে ক্লিষ্ট শিব পৃথিবী ঘুরে এসেছিলেন—সেই পুণ্যধামে; দু'হাত একত্র করে অঞ্জলি মেলে ধরেছিলেন দেবী অন্নপূর্ণার সামনে—ভিক্ষাং দেহি। ভিক্ষা দিয়েছিলেন দেবী। তৃপ্ত হয়েছিলেন শিব—পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল বিশ্বজগৎ। এ যুগের বারাণসী—বাংলা দেশের বারাণসীধাম হলো কলকাতা শহর। এখানে অন্নপূর্ণার প্রসাদপুষ্ট বহু জীব বাস করে—তাদের দুয়োরে গিয়ে দাঁড়াতে—জীবন রক্ষা হবে না কি?

কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে আসতে লাগল শহরে। এক একটি পরিবার—বাপ মা ভাই বোন স্বামী পুত্র বউ মাসী পিসি—আত্মীয়গোষ্ঠী মিলে এক একটি সংসার। শুধু সংসার নয়—গ্রামকে গ্রাম চলে এল শহরে। শহর মরে না। অন্নপূর্ণার রাজত্ব—শিবভূমি। না খেয়ে ওখানে মানুষ মরে না। কড়ি ফেললেই তেল। অন্ন, পরিচ্ছদ, আশ্রয়। শহরে জীবন ধারণ সুলভে না হোক, জীবন ধারণের উপকরণগুলি সহজলভ্য। যাই হোক—এসব কথা থাক। পঞ্চাশের দৃশ্য—যাঁরা পঞ্চাশেতে বসেছেন—সবাই দেখেছেন। সে দিনের স্মৃতি কেউ ভোলেন নি। এই মন্বন্তরের আর একটা দিকও সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। সেটা হ'ল কালো দিক। জনসাধারণের দৃষ্টিসীমার বাইরে ছিল বলেই সেটা কালো। কিন্তু বিশিষ্ট কয়েকজনের ভাগ্যে সেদিকেই হয়েছিল সূর্যোদয়। তাদের সৌভাগ্যের কমল ফুটেছিল সেই আলোয়। আগেই বলেছি—ত্রৈলোক্য পড়াই ছিল ওই বিশিষ্ট মানুষের দলে। নিজের চেষ্টায়—পিসির সাহায্যে দৈবের কৃপাতে ও মহাজন হয়ে উঠল। ওর নাম ছড়িয়ে পড়ল এ তল্লাটে।

নবীন ছুটে এলো ত্রৈলোক্যের কাছে। পিসির শ্বশুর-কুল-সম্পর্কিত কীণ সুত্রোপাধিতে ইতিমধ্যে যারা ঘিরে ধুরধার করবার চেষ্টা করেছিল, চেষ্টা সফল হয়নি। পিসির মুরুব্বীতে সে সুযোগ আর একবার এনে দিল দৈব। দৈব ছাড়া কি! পিসির মুরুব্বী হলে দু'ক্রোশ দূরের দূরতম আত্মীয়কে খবর পাঠাবার ধার স্বীকার করত কি ত্রৈলোক্য? দৈববশে সেদিন ছিল হাট বার। নবীন হাটে এসে শুনল কথাটা। নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ত্রৈলোক্যের বাড়ীতে এলো—স্নানাহার পর্যন্ত হইল। তারপর দাঁতে নিমপাতা কেটে—খাঁড় গুড় আর জল খেয়ে আগুন পুইয়ে বাড়ী ফিরল। বাড়ী ফিরে—পেট-কোঁচড় থেকে বার করল লাল খলাটের হাতচিঠি খানা। পিসশাশুড়ী আর জাইকি-জামাইএর লেনদেনের ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। প্রথমটা ঈর্ষায় কালো হয়ে উঠল মুখখানা। অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল নবীন! তার পর কুয়াশা কেটে সূর্য্যের রশ্মিপাত হলো। দিনকতক পরে বাবুগঞ্জে—ত্রৈলোক্যের বাড়ীতে এসে হাজির হলো নবীন।

তার পরের ঘটনা আগেই শুনেছেন আপনারা। এই বার আসল জায়গায় আসছি।

জ্যেঠির সম্পত্তির দাবি জানাল নবীন। বিষয় সম্পত্তি ছিল না, ছিল নগদ কড়ি। তা নবীন নগদ কড়িতেও দাবি জানাল না।

তখন ত্রৈলোক্য বললে, তা হলে কি চাও?

নবীন হেসে বলল, বলব, বলব, আর দু'টো দিন সবুর কর।

বেশ কিছু দিন সবুর করার পর নবীন একদিন এসে বলল, নিরিবিলিতে আসেন গড়াইমশাই—একটা সলা পরামর্শ আছে।

কিসের সলা পরামর্শ?

সেই যে সেদিন বলেলাম ওই পিসির হাতচিঠির কথাডা সেইটি আজ খোলসা হয়ে যাক। আসেন।

নিরিবিলিতে এসে খুব বেশী ভূমিকা করল না নবীন। বলল, আপনার পিসশাশুড়ী—আমারও সম্পর্কে জ্যেঠি, ওনারই জন্যে সুবাদ রয়েছে। তা ওটা সব্বা সব্ব লিক-লিক করছে। ওইতে আর একটুসখানি পাক জান দিনি। মানেডা বুঝলেন না—? আপনার সঙ্গে একটা

সম্বন্ধ—এই ধরেন—যদি বিয়াই পাতান যায়—সেডা কি দেখতে শুনতে খারাপ লাগবে ?

ত্রৈলোক্য তো অবাক! চালচুলোহীন নবীনের এ কেমনতর প্রস্তাব? নবীনের কন্যা সন্তান নাই—আছে একটি ছেলে। ছেলেটি এতদিন আপন জনের মতই এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করেছে। গড়াই-গিন্নীর মনও নরম হয়েছিল। আর মেয়েছেলের যা স্বভাব—ঝট করে একটা সম্বন্ধ পাতাতে চেয়েছিল। কিন্তু ত্রৈলোক্য শক্ত হওয়াতে সে বাসনার ইতি সেইদিনই হয়ে গেছে। তারপর অনেক কথা কানে এসেছে কালুর সম্বন্ধে। একে চরিত্র-হীন, তার ওপর বয়ে-যাওয়া—মানে বয়াটে ছেলে—একথা তো ভাবতেই পারে না ত্রৈলোক্য। ও যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, বল কি।

নবীন হেসে বলল, যদি সাধে! মামলার মত শত্রুর হিং-ভুবনে আছে? তার চেয়ে যেনা পাওনাটা গায়ে গায়ে শোধ হওয়া কি উত্তম নয়? মেয়েকে তো খালি হাতে বার করতে পারবা না। বলে হো হো করে হেসে উঠল নবীন।

ত্রৈলোক্য হাসল না, অনেকক্ষণ কাঠ মেরে বসে রইল। ব্যাপিটা হালকা করবে কি করে এই চিন্তা করল বহুক্ষণ ধরে। কিছুতেই কূল কিনারা মিলল না। লাল মলাটের হাত চিঠিখানা রক্তমাখা লাঠির মত মাথার উপরে ধরেছে নবীন। মাঝে মাঝে ঘা বসিয়ে—আরও আহত করবে। আঘাতে আঘাতে ধরাশায়ী করবে ওর সুনাম আর সৌভাগ্যকে! উঃ, কি ভুলই হয়েছিল সেদিন! বুদ্ধির ছেড়া কাঁথা আর ময়লা ছুটো তুলো-ওঠা বালিশটা না খুঁজে কি ভুলই করেছিল ত্রৈলোক্য!

নবীন ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলল, তামুক নেই? কাউকে এক কল্কি তামুক সেজে আনতে বল না বিয়াই? গলাটা শুইকে কাঠ মেরে গেছে—বুদ্ধির গোড়ায় এট্টু ধুঁয়ো দেই।

ছেলেদের কাউকে ডাকলে না ত্রৈলোক্য—নিজেই কল্কে নিয়ে তামাক সাজতে বসল।

তা'লে বিয়াই—কথাডা পাকাপাকি করে ক্যালাও।

ত্রৈলোক্য বলল, কাল বলব। ওনার সঙ্গে একটা শলা পরামর্শ করি।

নিশ্চয়—নিশ্চয়। ওনারাই তো আসল।···তা'লে আজ উঠি বিয়াই। পেন্নাম।

বার বার বেয়াই সম্বোধনে ত্রৈলোক্যের সর্বাঙ্গ জ্বালা করছিল।···কিন্তু ত্রৈলোক্য নিরুপায় বিরস কণ্ঠে বলল, পেন্নাম।

গৃহিণীর অবস্থা ছিল সেই যে কথায় বলে না—সে তো ভাত খাবি? না হাত ধোব কোথায়—সেই গোছের। মেয়েও খুসি হয়ে এঘর ওঘর ছুটোছুটি করতে লাগল। তাদের মনের ভাব কেমন করে জানলাম? সব শুনেছি ত্রৈলোক্যের মুখে, পরের দিন সন্ধ্যা বেলায় ও আমার কাছে এসেছিল। আশপাশ সবই খুলে বলেছিল। বলেছিল, আমার ঘরে শত্রুর—বাইরে শত্রুর—কি করি বলেন তো মাষ্টার মশায়। প্রাণডা কিছুতেই চাইছে না ওই বকাটে ছোক্কাডার হাতে মেয়েডারে দেই।

বললাম, ছেলে আসলে খারাপ নয়—সঙ্গদোষে এমনটা হয়েছে। শুনেছি—তোমার মেয়ের সঙ্গে ওর ভাব ভালবাসা হয়েছিল। বিয়েটা দিয়ে যদি নিজের চোখের ওপর রাখতে পার ভালই হবে। কিছু টাকা দিয়ে ব্যবসাতে ছুড়ে দিও—সব শুধরে যাবে।

তাই করব ঠাকুর মশায়—যথার্থ বলেছেন আপনি। অন্তর্যামিনী আপনি—আমার পরাণের কথাডা টেনে বার করেছেন। বিয়ে দিয়ে মেয়ে আর ওঘরে পাঠাব না—আমাদের গেরামে বসত করাব জামাইরে।

প্রণাম করে চলে গেল ত্রৈলোক্য।

এ পর্যন্ত তো বেশ সোজাসুজি চলেছে ব্যাপারটা—তবে এমন ঝট পাকালো কেন? আশু মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

সান্যাল বললেন, সেই 'কেন'-টুকু জানবার জন্যই আমাদের বৈঠক। কাল সেটা পরিষ্কার হবে আশা করি। আজ আর একটু জানিয়ে রাখি—অঘটন যা ঘটছে তা দৈবের খেলা বলেই মানি আমরা—শয়তানের

চক্রান্তও বলতে পারি। ব্রহ্মা যখন মানুষকে সৃষ্টি করলেন তখন সৃষ্টির মধ্যে আবিলতা কিছু ছিল না। মানুষের মন ছিল অত্যন্ত সরল। খৃষ্টানদের শাস্ত্র বলে—সাপের বেশে শয়তান এসে সরল মনে ছায়া ফেলেছিল। সে ছায়া দিনে দিনে বেড়েই গেছে হাজারটা শিকড় নামিয়ে মনকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে দুমড়ে মুচড়ে যা করিয়েছে তার ওর জানা খুব শক্ত। এদিকে ব্রহ্মা নানান্ জীব সৃষ্টি করলেন—তাদের দিলেন প্রবৃত্তি। জন্মগত প্রবৃত্তি। মানুষ সৃষ্টি করলেন—তাকে এই সবের উপর দিলেন মন। মনের সাহায্যে মানুষ উঠতে পারবে প্রবৃত্তির উপরে। সব মানুষই উঠবে উপরে তা কেমন করে হয়? তাহলে ওই অন্ধ প্রবৃত্তির বশে চলবেই—একটু রকমফের হ'ল নাকি। অতএব সৃষ্টি করলেন দুই কন্যাকে। মানুষের মনের মানদণ্ডে যেটিকে স্থাপন করে ভেবেছিলেন সৃষ্টিকার্য্য সুসম্পূর্ণ হল অর্থাৎ বুঁদ্ধি তাকে আরও একটু চক্রপাণিনী করে দুই মেয়ের হাতে দিলেন সুতোর দু'টি প্রান্ত। ওই মেয়ে দুটির নাম হ'ল সুমতি আর কুমতি। ওরা মনকে স্থির ধ্রুব করে বুদ্ধির মন্থন-রজ্জু দিয়ে নিয়ত মন্থন করছে। উঠছে অমৃত—উঠছে হলাহল। এক্ষেত্রেও নবীনের মনে সুরু হয়েছিল মন্থন-ক্রিয়া। সুমতি কুমতির টানাটানি। কেমন করে সেটা ওর মুখে শোনা যাবে। আজ বৈকালেই ওকে ডাকিয়ে আনাব।

আপনি কিছু জানেন বোধ করি?

সামান্য জানি। ছেলের বিয়ে ঠিক করে নবীন এসেছিল আমার কাছে। বলেছিল, তা মাষ্টার বাবু, যেনা-পাওনাটা ভালই হবে। ঘরিস্তি যেনার কথাটা আমার নয়—পাওনার কথাটাই ভাবছি। ভাবতে ভাবতে মাথা ঘুরে উঠেছে মাষ্টার বাবু। সবে ধন নীলমণি ওই একখানা মাত্তর ঘর—ওসব দ্রব্য সামগ্রি ধরবে কোথায়? হাত-পা নাড়বার জায়গাটুকুন থাকবে না। আমিই বা থাকব কমনে?

তা হলে এক কাজ কর না নবীন—জিনিসপত্র কম করে নাও। বলেছিলাম।

হেসে জবাব দিয়েছিল, তাই কখনো হয় মাষ্টার বাবু। দুনিয়ার যত পাস্তরের বাবা—সবাই তা'হলে কামড় কষাতে মাষ্টার বাবু। ল্যাহ্য পাওনা, সম্মানের পাওনা, যেখানে যোক—খুতেই হবে। সবাই খোয়—আমিও খোব। কিন্তু ভাবছি ওরাই বা শোবে কোথায়—আমিই বা শোব কমনে! বার বার একই কথা বলতে লাগল নবীন। চিন্তাটা যেন ভূতের মত ওকে পেয়ে বসল। সে চিন্তার পরিণতি কি হল সন্ধ্যা বেলায় শুনবেন নবীনের মুখে।

সেইদিন সন্ধ্যায় বৈঠক বসল আবার।

দু'হাত জোড় করে পাঁচজনের সামনে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে সোৎসাহ নয়নে বলল নবীন, দোহাই ধর্ম্ম! আপনার পা ছুঁয়ে বলছি মাষ্টারবাবু আমার মনে একটুও কুমতলব ছিল না। একবারও ভাবিনি নতুন বউ আর জিনিসপত্তর নিয়ে কালু যখন ফিরবে—ওঘরে আমার জায়গা হবে না। জন্মের মত ছাড়তে হবে ওঘর। সেই রাত্তিরে বরং ভালই লাগছিল ভাবতে যে, নতুন বউ আমাকে কত যত্ন আত্তি করবে, থালায় করে পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে ভাত বেড়ে দেবে, কাছে বসে পাখার বাতাস করবে। বলবে, বড্ড রোগা হয়ে গেছেন—দুধটুকু খেয়ে নিন। মাছ একটুও পাতে রাখতে পারবেন না। খাওয়ার পর মুখ ধোয়ার জন্যে গাড়ুটা, খড়কে কাঠিটা দেবে এগিয়ে, গামছাখানা তুলে দেবে হাতে। রিকিবিতে দু'খিলি পান রেখে—কল্কে নিয়ে বসবে তামাক সাজতে। তারপর বলবে পা টিপে দেই।...সারা রাত্তির এইসব ভেবেছি—স্বপন দেখেছি। সকাল বেলায় দাও ঘরামীর সঙ্গে দেখা। আর সেই দেখাই আমার কাল হ'লো মাষ্টার বাবু।

একটু থেমে বলল নবীন, দাশু বলল, তেলি কর্ত্তা কাল দরগাতলায় বসে আপনার কথাই বলাবলি হচ্ছিল। ছেলের সাদি দিচ্ছেন,—তা বেশ বেশ। এবার বর্ষার আগে চালাটা ছাইয়ে স্থান ভাল করে। আর ছোট্ট মত একখানা দোচালা তুলে স্থান। ঘরদার বেড়া হলেই বিয়ি হবে'খন। বলি ছাওয়ালকে ঘরডা ছেড়ে দিয়ে সেই দাওয়াতেই আস্তানা গাড়তে হবে তো। মাইরি

বলছি মাষ্টার বাবু কথাটা যেমন শোনা—মনের মধ্যে কে যেন একখানা চাবুক কষিয়ে দিলো সপাং করে। দেহে চাবুক পড়লেও বুঝি তেমন যন্ত্রণা হতো না। মাথাটা ঝোঁ ঝোঁ করে ঘুরতে লাগল। দু'হাতে রগ টিপে ধরে খুঁটি হেলান দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দাদুই অবিশ্যি চেতন করালে। চোখ মেলে দেখি দাওয়ার শুয়ে আছি চোখ-মুখ মাথা ভিজে সপ্‌সপে। খুব জলের ঝাপ্‌টা লাগিয়েছে কিনা। তারপর ঝোঁ ঝোঁ করে ঘুরতে লাগল দাওয়া, ঘরখানা কোথাও খুঁজে পেলাম না। যত চেষ্টা করি, ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করি ঘরখানা কোন্‌দিকে—অবাক কাণ্ড, ঘর কোথাও নেই। মনে ভয় হ'লো। তবে কি আমার ঘর বড়ে উড়ে গেল? ঘরের মধ্যেকার এক রাশ জিনিস—কাঠের সিন্দুক, কড়ির আলনা, বাসনপত্র, বড় পিলসুজটা, ছবি দু'খানা, চৌকিটা, চালের জালাটা, হাঁড়ী-কলসী ধামা-পেতে-কুলোয় ভরা জিনিসপত্র সব লোপাট। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠলো, ভারী হয়ে উঠলো যেন বিশ মণ। চোখ কান নাক দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে—গা হাত পায়ে ব্যথা-ব্যথা ভাব। বেশ বুঝলাম জ্বর হয়েছে। ডাকলাম, কালু, কালুরে, একটু জল দে।

কোথায় কালু! সে তার নিত্যদিনের আড্ডায় গেছে। ফিরবে রাত বাড়লে, চাকনা খুলে খাবার খাবে, শুয়ে পড়বে দাওয়ায়। আবার ভোর বেলায় উঠে বার হয়ে যাবে। ফিরবে ঠিক দুপুরে ঠিক সময়টিতে। একলা রাঁধি-বাড়ি, খদ্দের সামলাই, ঘানি চালাই, হাটবাজারে যাই—যোয়ান ছেলের দ্বারা সিকি কড়ার উব্‌গার নেই! রাগ হল মনে মনে। হাড়ের ছেলে তোর জন্যে যথা সর্ব্বস্ব দিচ্ছি—জীবন ক্ষয় করছি—তুই ফিরেও তাকাস নে। আবার তোরই ঘর বন্যায় রাখতে হবে! তোকে ঘর ছেড়ে দিয়ে দাওয়ায় আস্তানা নেব। শীতের হিম—বর্ষার জল—গরম কালের তাপ সব যাবে দেহের ওপর দিয়ে। জলে ভিজে বাবার মত নিমুনিয়া হবে—তারপর অক্কা পাব। তোর মুখে মেরোরে দেব প্রাণডা!

দুপুরে কালু এলো। শুধোল না, বাবা, এমন করে পড়ে আছ কেন? কি হয়েছে? বলল, ভাত কই? রান্না করনি? বাস দুম্ দুম্ করে পা ফেলে বাইরে চলে গেল। চলে গেল তো গেলই। জল বেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কোন গতিকে গইড়ে গইড়ে কলসীটার নাগাল পেয়েছি। গেলাস কোথায়? কলসীটা কাত করে জল খেতে লাগলাম। মুখে পড়ল অল্প—বেডা ভিজে গেল—বেবে ভাসল। সেই মাঁতার-পাথার জলে রইলাম পড়ে। সারাদিন আর আধেক রাত। রাত্তিরে এলো ছেলে, বললে, রান্না হয়নি? তখন জ্বরটা কমেছে, মাথা তুলতে পারছি। বললাম, রাঁধবে কে—আমার জ্বর। সবটা শুনলো না বার হয়ে গেল। সারারাত এপাশ ওপাশ, আর এই চিন্তা। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। ভাবলাম, কেন ছাড়ব ঘর? কার জন্যে ছাড়ব! ও আমার কে? অমন ছেলে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। সত্যি বলছি মাষ্টার বাবু—ওই কথাটাই বুক ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল—ও আমার কে? ও আমার কে?

বলতে বলতে নবীন হাউ হাউকরে কেঁদে উঠল।

সান্ত্বনা প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলেন না। ভাবলেন স্নেহপ্রবণ পিতার প্রচ্ছন্ন অভিমান চোখের জলে এমনি করেই ধুয়ে মুছে যাক। বুকটা হাল্কা হোক—সুস্থ হোক নবীন।

• • •

ঘটনার প্রবাহ বা চোখের অন্তরালে অবিচ্ছিন্নভাবে বয়ে যাচ্ছে তা সাধা চোখে চিনে নেওয়া কঠিনই। তার ছিন্নসূত্রগুলি একত্র না করলে মানুষকে ঠিকমত বিচার করা যায় না।

বিচার সভা আজকের মত শেষ হয়েছে—সভা বসবে আগামী কাল সকালে। কাল সকালে কালুকে ডেকে তার কথা শুনতে হবে। তারপর ঠিক করতে হবে কি করা উচিত। একটা খবর কানে এসেছিল···কিছুদিন আগে। অবিশ্যি সেটাকে মনে স্থান দেন নি। নবীনের শেষ কথাগুলি শুনে মনে হচ্ছে, এই পরিণতির মূলে সেই সূত্রটিই বুঝি নিহিত ছিল। ছেলের অবহেলা

আর প্রচণ্ড অভিমান বুঝি নবীনের সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিয়েছিল। যাকখানের সূত্রটুকু ওই ঘটনার মধ্যেই ছিল। যা বাহ্যতঃ মনে হয়েছিল অলীক, যুক্তি পরম্পরায় তা যেন অনিবার্য্য পরিণতি না এসে উপায় ছিল না। মানুষের ঘর বাঁধার আশা—নিজেকে ঘিরে নানা কল্পনা, স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা ভালবাসা সমস্তই তো ফুল ফোটানোর ব্যাপার। কখনও বর্ণ সৌন্দর্য্যে—কখনও সৌরভে—কখনও বা সব মিলিয়ে বিচিত্র পরিমণ্ডল রচনায় পূর্ণ করে জীবনকে। নবীনের মত লোকদের বেশীর ভাগ লোকেরই এমন দার্শনিকতা থাকে না। সহজাত প্রবৃত্তির বশে ঘরকে ঘিরে স্নেহ শ্রদ্ধা ভালবাসার মৃদু অল্প বিস্তর দোলা ওদের খেতে হয়ই। নবীনও সেই প্রবৃত্তির বশে ছেলের অবহেলার উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে নিজেকে নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল সংসারে। এমনি করেই হয়তো বা বাঁচতে চেয়েছিল।

হারাধন, কালীপদ, চিনিবাস, আশু মিত্র এঁদের কাছে নিজের সিদ্ধান্তের কথা খুলে বললেন সান্যাল। ওঁরা স্বীকার করলেন, এমনটি হয়েই, ওটা স্বাভাবিক। কেন না 'ডাক পুরুষে'র কথায় আছে—আত্ম রেখে ধর্ম। অর্থাৎ পৃথিবীতে নিজের মূল্য সবচেয়ে বেশী। স্ত্রী নয়, পুত্র নয় বন্ধু বান্ধব, পরিচিত আত্মীয় কেউ নয়, আপনার চেয়ে বেশী কেউ নয়। আমিটাই সব বস্তুর মূলে বিদ্যার মূলে, অবিদ্যার মূলে, সংসারের মূলে, সন্ন্যাসের মূলে। সবই আমিময়।

পরের দিন বৈঠকে কালুর স্বীকারোক্তিতে সেটি প্রমাণিত হলো। নিজের অপরাধ স্বীকার করেনি কালু, তাই নালিশটাই জানালে। ও অকপটে বলল সব কথা। নিজের চরিত্রের কথা, দুর্নীতির কথা।

বলল, তা কি করব বলেন আপনারা। বাবা আমায় কি শিক্ষে দিয়েছেন! একটু বড় হলে শুধে দিয়েছেন ধাওয়ায়। রোদের তাত, জলের ছাট, শীতের হিম খুব দেহেও লাগে কি না? ঘরের মধ্যে ওনাদের হাসি মস্করা ঝগড়া সোহাগ দুলকাস সবই কানে আসে, পরীলটা আগুন হয়ে ওঠে। যৌবন তো জীবের ধর্ম—এতটুকু শান্তি পাইনে যে। তার উপর বিয়েটা ভেঙে মন-মরা হয়ে আছি। শুনে একদিন বলল তুই যেমন আছাড়ুক, তাদা তক্তপোষে পড়ে পড়ে হাপু শুনিস।

অধোবদনে খানিক চুপ করে থেকে বলল, বাবা তখন কেন ব্যবসা শেখায় নি আমায়? কেন বিশ্বাস করে টাকা পয়সা দেয়নি হাতে? নষ্ট হতোই না হয় কিছু টাকা—আমার তো চেতন হতো। শুণের হয়নি? আজ বাপের কারবার শুধেই তো চালাচ্ছে, অথচ জানেন তো ওর কাহিনী।

চিনিবাস বাধা দিয়ে বলল, তা তুমি তোমার বাপকে দেখনি কেন? ওর অসুখের সময়—

ধপ্ করে জলে উঠল কালুর চোখ। বলল, শুনবেন ওর কীর্ত্তি-কাহিনী, যে কন্যেকে ছেলের বউ করবে বলে পছন্দ করে এলো তাকেই—

পুনরায় অধোবদন হল কালু। যাঁরা বৈঠকে ছিলেন শিউরে উঠলেন। আধবুড়ো নবীনের পক্ষে একি সম্ভব?

কালু হাত জোড় করে বলল, আপনারা যথাধর্ম্ম বিচার করুন। পুত্রবধূ—কিনা কন্যা তার ওপর দিষ্টি ফেলা মহাপাপ কি না।

আশু মিত্র বললেন, তুমি কেমন করে জানলে—তোমার বাপের মনের কথা? কনের বাপ তো এনিয়ে নালিশ করে নি—পড়সীরাও কেউ তো জানে না।

জানবে কি করে কথাটা যে জানাবার মত নয়। কুলের কলঙ্ক কেউ কি ঢাক পিটে জানায়? তবে শুনুন আসল বৃত্তান্ত। মাষ্টার মশায় সব জানেন—আপনারা শুনুন।

নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসল কানু। বলল, ওই বাবুগঞ্জ, দু'কোশের মধ্যে গাঁ এপাড়া ওপাড়া বললেই হয়। ওনাদের গ্রামের মানুষ আমাদের হাঁড়ীর খবর জানে, আমরাও ওনাদের জানি। রথ, দোল, দুর্গোৎসব, চড়ক, পঞ্চ মেলার তো অভাব নেই এগ্রামে ওগ্রামে, ধান চাল খুচরো তরিতরকারি নিয়ে এহাট ওহাট সদ্দাই করে। সেই সূত্রে আলাপ পরিচয় চেনাজানা। বাবুগঞ্জের ত্রৈলোক্য গড়াইকে বাবা জানে, আমিও

জানি। দুপুরে হাট সেরে কতদিন ওনাদের বাড়ীতে মুড়ি মুড়কি জলখাবার খেয়ে এসেছি। তেনারই কন্যে কামিনীবালা—যার সঙ্গে বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। মেয়ের বয়েস হয়েছে—রং ফরসা, কিন্তু দাঁত উঁচু বলে কেউ পছন্দ করছিল না। বাবার পছন্দ হ'ল। কথা দিয়ে এলো বোশেখেই শুভকাজ হবে ওনারা দিন গুনছে সেই ইস্তক—তাগাদা দিচ্ছে আশীর্বাদ সেরে ফেলতে। এনার, মানে বাবার, খালি টালবাহনা আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, তরশু। মনে যত দুঃ পাইছে ততই দিন পেছুচ্ছে। যেদিন আশীর্বাদ হবে তার আগের দিন শাঁকরা বাড়ী থেকে একজোড়া কানের দুল নিয়ে এলো। বাক্সে পুরলো, কাকপক্ষী জানালো না। তার পরদিন একলাই চললো কনে আশীর্বাদ করতে। পাঁচজন ভদ্দর ভারিক্কি মানুষ শুভ কাজের সময় উপস্থিত থাকবে তো, তা কাকপক্ষী বলল না। শুধু পুরুত ঠাকুরকে সঙ্গে নিল। বলেন তো এ কেমন ধারা শুভকাজ?

কালুর কথা শুনে কালীপদ নন্দী হেসে উঠলেন। বললেন, বাঃ রে কালাচাঁদ, তুমি দেখি সামাজিক নিয়ম কানুনে বেশ পাকাপোক্ত! তোমার বাবাই শুধু তোমার বুদ্ধি দেখতে পায় না!

ইচ্ছে করেই দেখে না। দেখলে লোকসান যে! শোনেন তারপর। কুমতলব ছিল বলেই কাকপক্ষী সঙ্গে নেয় নি। একলাই গিয়েছিল ওনাদের বাড়ী। একলাই আশীর্বাদ সারতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘন্টের কল বাতাসে নড়ে। তাই কন্যে কামিনীবালা বেঁকে বসল।

সেকি—কনে নিজে—

হাঁ চিনিবাস দাদা, আমার স্বকর্ণে শোনা, কনের মুখ থেকে শোনা।

কনের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?

আজ্ঞে। মাথা নামিয়ে লজ্জিত হাসে জবাব দিল কালু। পরিচয় সেই ছেলেবেলা থেকে। কনের ভাই রাঙার সঙ্গে ওনাদের বাড়ী গিয়েছি কতবার। কত মারামারি গালাগালি ভাব আড়ি···সেসব কথা থাক, আসল কথাটা ভেঙে বলি। বাবার মতলব ছিল কাজটা চুপি চুপি সারবে। কিছু টাকা কবলে রাজী করিয়েছিল নৈলোক্য গড়াইকে। আর কি ঘন্টর পড়েছিল ভগমান জানে! গড়াই মশায় অতশত কি জানে যা সাতখানা করে লাগিয়েছিল আমার নামে বলেছিল তাই হবে। তুমি একাই এসো, একাই আশীর্বাদ করো। তারপর চার হাত এক হয়ে গেলে··কিন্তু কনে কামিনীবালা যে আড়ি পেতে সব শুনেছিল সে তো ওনারা জানত না। জানলে—

একটু থেমে কালু বলল, ওনাদের বাড়ীর পেছুনে একটু পড়ো জমি আছে—তাতে তাঁট, কালকাসুন্দে, নোনা আতা, কামরাঙা, জাম, আমড়া, ধলা আঁকড়া, গোধাপে লতা আর পিটুলি গাছের ঝোপ। ওই ঝোপে কতদিন ফল পেড়ে খেয়েছি, ঘাপ ঘাপ খেলা করেছি আমরা। আমি, কামিনীবালা, ওর ভাই রাঙা, জাম, ওনের পাড়ার ছেলেমেয়ে ক্যাবলা, কেষ্ট, নিতাই, রক্কেকালি, মোক্ষদা। সেই ঝোপে ঠিক দুকুর বেলা বোশেখের রোদে টা টা করছে পৃথিবী চারদিক নিশুতি, কটিকজল পাখীটা শুধু এক একবার ডাকছে দুমুর পাতার আড়ালে বসে—সেই দুকুরে কামিনীবালার কাছে সব শুনলাম। ও অবিশ্যি ওর ভাই রাঙাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল আমি যেন আসি। এসে যা শুনলাম, উঃ বাবা তো নয়—

দু'হাতে মুখ ঢাকল কালু।

সবাই দম বন্ধ করে বসেছিল। তারপর কি বলবে কালু?

কালু বলল, বাবা আমার নাম করে মেয়ে দেখে সেই মেয়েকে নিজে বিয়ে করবে ঠিক করেছে। কামিনীবালা পাশের ঘর থেকে ওনাদের প্রত্যেকটি কথা শুনেছে কাঁদতে কাঁদতে সব বলল আমায়। বলল না এইজন্যে বুড়ো আশীর্বাদ করতে এলে আমি যাইনি। পেট কামড়াচ্ছে বলে পড়ে রইলাম। বাবা ডাকতে এলে উঠলাম না। মা কাঁদতে লাগল তবুও উঠলাম না। আরও সব খুড়ী জেঠী পাড়ার বামুন দিদি কাকেত পিসি কত অনুরোধ করল। আমি কাঠ মেরে পড়ে রইলাম

বললাম, সোজা হয়ে উঠতেই পারছি নে, আদরে বসব কেমন করে! বুড়ো চলে গেল, যেদিন খবর পাঠাবে, আশীর্ব্বাদ করে যাব। এখন তুমি ভরসা, যা ভাল বোঝ কর। ওই বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হলে সেই রাত্তিরেই গলায় দড়ি দিয়ে মরব। মরব, মরব, মরব এই তিন সত্যি করছি। হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল কামিনী-বালা। কলির মত শক্ত মেয়ে কামিনীবালা কাঁদতে লাগলো। বলুন আপনারা এই অধর্ম্মের কথা শুনলে কার মাথায় না খুন চাপে, কোন ছেলে বাপকে দেবতা বলে পুজো করতে পারে?

একটু থেমে বলল কালু, গাঁয়ে গিয়ে মাষ্টার মশায়কে সব বললাম। বললাম, অমন বাবাকে খুন করলে পাপ হয় না। সেদিন মাষ্টার মশায় কত করে আমাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। বললেন, ঘরে যা কালু, আমি নবীনকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ও যাতে এমন কাজ না করে তাই করব।

আমি বললাম, আপনও বলবেন মাষ্টার মশায়, এ কাজ যদি করে তবে ওনারই একদিন কি আমারই একদিন! বাপ বলে রেয়াৎ করব না, খুন করে ফাঁসি যেতে হয়—সেও ঢি আচ্ছা।

বলতে বলতে কালু উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এবেলা আমার বাড়ীতেই আহারাদি করবি। তোর বাবাকেও ডাকাবো ওবেলা। তার কথাও শুনতে হবে। তাকে বুঝিয়ে বলবো যাতে এমনধারা অন্যায় কাজ না করে। তারপর আমরা পাঁচজন মিলে পরামর্শ করে যাতে ভাল হয় সেই ব্যবস্থা করবো। কেমন? এখন একটু ঘুরে আয় বাবা।

সবাইকে প্রণাম করে কালু বেরিয়ে গেল।

সান্যাল বললেন, আর মিনিট দশেক বসুন আপনারা সেদিনকার কথাটা সেরে নিই। সেদিন কালু চলে যেতেই ভাবলাম, আর দেরী নয়। দেরী করলে—রাগ না চণ্ডাল—বিশেষ করে ভালবাসার বস্তু যেখানে তো রয়েছে ছেলেটার চোখে, হয়তো খুন অবধিই হয়ে যাবে—এইবেলা সাবধান করে দেয়া ভাল। এই ভেবে গেলাম নবীনের বাড়ী। তখন সন্ধ্যে হয় হয়! নবীন প্রদীপ জেলে দুয়োরের সামনে উঁচু করে দোলাচ্ছে। তার আগে ঝনকাটে গঙ্গাজল ছিটিয়েছে—জলের দাগ দেখলাম। একটি ধূপ জেলে দিয়েছে ঘরে। অগুরু চন্দনের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বা'র হচ্ছে। আমি উঠোন থেকে দেখছি, ও আমায় দেখতে পায়নি! ও ঘরের মধ্যে গেল, আমি দাওয়ায় উঠলাম। ঘরের মধ্যে গিয়ে পিদীম উঁচু করে ধরল মা কালীর পটের সামনে—কেষ্ট রাধার পটের সামনে। তারপর পিলসুজের উপর প্রদীপ রেখে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে। সেই সময়ে দেখলাম ঘরের ভিতরটা প্রদীপের আবছা আলোয় দেখলাম। কমলামী জিনিসপত্র; সংখ্যায় কম চলেও পরিপাটি করে সাজানো গোছানো। যেমন মেয়েরা—যেখানে যেটি মানায় ঝেড়ে পুঁছে তকতকে করে রাখে, তেমনিই রয়েছে। অথচ পাঁচ বছর হ'ল ঘরে গৃহিনী বলতে কেউ নেই। বুঝলাম—কালুর কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। জিনিসগুলো নিজেই ঝাড়পোঁচ করে নিজেই গুছিয়ে রাখে। বই যেমন ঘরে গুছিয়ে রাখতো তেমনি করেই রেখেছে নবীন। নতুন বউ আনবে বলেই তা ছেলের কিংবা নিজের যার বউ হোক—তারই জন্য এত ঘর—এত আয়োজন!

আমাকে দেখে চমকে উঠল নবীন। রীতিমত অপ্রস্তুত হল। লজ্জিত হাতে মাথা চুলকোতে লাগল। বলল, আপনি মাষ্টারবাবু!

বললাম, কথা আছে—দাওয়ায় এসে বস।

দাওয়ায় পাতা তক্তাপোষটা জরাজীর্ণ-মড়বড়ে, বসতেই কাঁচ-কোঁচ শব্দ হ'ল। উত্তরদিকের পায়াটা হেলে পড়লই বা। নবীন বলল, বসুন, পড়বে না। পিছনের দু'টো পায়া নেই—ইঁট ঠেকনো দেয়া আছে।

বসে বললাম সব কথা। বললাম, উপযুক্ত ছেলে, তার বিয়ে দিয়ে ঘর সংসার বজায় রাখাই কি ঠিক নয়?

নবীন বলল, তা যা তা বুঝি। এও বুঝেছি, ওর বিয়ে দিয়ে ঘর সংসার বজায় থাকবে না মাষ্টারবাবু। আজ বিয়ে দেব—কাল আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে

বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেবে। দেবেই দেবে মাষ্টারবাবু। যদি বাবা সত্যপীর এসে বলে—দেবেনা—সে কথা প্রেতায় করব না। ও গুয়োরটাকে আপনি জানেন না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, এতে কেউ সয়ই হবে না মাষ্টারবাবু। পিতৃ-পুরুষের কোপ পড়ব, ভিটে মাটি উচ্ছন্নে যাবে।

আর ছেলে যদি অঘটন কিছু ঘটায়? বললাম।

সেতো ঘটাবেই। ও হারামজাদাকে বিশ্বাস নেই। বলতে বলতে নবীনের চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। ডান হাতটা মুঠো বেঁধে তক্তাপোষের উপর চাপড় মারলে একটা। কাঁচ কোঁচ শব্দ হল—নড়ে উঠলো তক্তাপোষ।

বুঝলাম, নবীন বেশ উত্তেজিত হয়েছে। বললাম, মাথা গরম করো না, ঝগড়া করো না—বেশ করে ভেবে দেখ। এ-বয়সে সংসারের ঝঞ্ঝাট থেকে যত সরে থাকবে ততই শান্তি। ওই জন্যেই শাস্ত্রকাররা বলেছেন—

নবীন উত্তেজিত হয়ে বলল, শাস্তর জানি নে, কিন্তু যারা সংসার গড়লো নিজের হাতে—তাদের কি হকের জিনিস নয় সেটা? ছেলে বলে তো লাটসাহেব হয়নি, এটা যগের মুলুকও নয়—খুন করব বললেই খুন করবে। আমি থোড়াই কেয়ার করি!

খুঁষি পাকিয়ে তক্তাপোষে চাপড় মারবার আগেই ওর হাতখানা ধরে ফেললাম। বললাম, ক্রোধ চণ্ডাল, বেশ করে মাথা ঠাণ্ডা করে—

মাথায় আগুন জ্বলছে ঠাণ্ডা হতে বলেন মাষ্টারবাবু! এমনধারা অন্যায় সহ্য করা যায়? আপনার ছেলে আপনাকে যদি গলা ধরে বাড়ী থেকে দূর করে দেয়—সহ্য করবেন? যদি বলে—খুন করবো, তু-পয়সা করবেন না? বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল নবীন। ওর দু'চোখ তখন জ্বলছিল। ঘরের মধ্যে প্রদীপটা জ্বলছিল তখনও। নিবু-নিবু অবস্থা। হয় তেল ফুরিয়েছে—নয় সলতের টান ধরেছে। বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—ঘরের মধ্যে সবকিছুই অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। নবীন সেদিকে চেয়ে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে সলতেটা উসকে দিলে। প্রজ্বলন্ত শিখার আলোয় আবার রহস্যময় হয়ে উঠল ঘর। প্রতিটি জিনিষ সুবিন্যস্ত পরিপাটি করে সাজানো। নূতনকে বরণ করে নেবার জন্য প্রতিটি বস্তু নিয়ে সমস্ত ঘরখানিই যেন পরিচ্ছন্ন আয়োজনে ত্রুটিহীন হয়ে উঠেছে।

বাইরে এলো নবীন। বলল, আপনার কথা রাখতে পারব না মাষ্টারবাবু—তা আমার অদিষ্টে যাই থাক। ছেলের পালানিতে বসলে আমার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হবে।

হাত জোড় করে বলল, পারব না মাষ্টারবাবু।

বললাম, যাই কর—ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়োনা। ও চণ্ডাল যদি কাঁধে চাপে—

নবীন বলল, সাধুর যেমন প্রয়োজন তোমণ্ডলে—চণ্ডালেরও প্রয়োজন তেমনি। সব সময়ে মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে না মাষ্টারবাবু। কুইনিন তেতো—তা বলে ম্যালেরিয়ার রুগীর পক্ষে কি বিষ? আপনি আসুন গিয়ে, ও বোঝাপড়া আমরা বাপ ব্যাটাতেই করব।

তারপর সাতদিনও যায়নি, এই ঘটনা।

কথাটা শেষ করে বললেন সান্যাল, অথচ আশ্চর্য্য যোড়ান ছেলেটাই তখন হ'লো যুদ্ধের হাতে। আমি ভেবেছিলাম উল্টোটি হবে।

এখন কি করা উচিত! পাঁচজনে কাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন? কারপক্ষে রায় দেবেন? ধারাবন শুধোল।

আশু মিত্র বললেন, আইন নবীনের পক্ষে। ও বর্ত্তমানে বিষয় সম্পত্তি কারও নয়—সবকিছুর মালিক ও নিজে।

সান্যাল বললেন, তবে আশাকরি এইবার ওর চেতনা হয়েছে। ছেলের জন্য যে রকম কান্নাকাটি করছিল—মনে হয়—ছেলেটাকে জব্দ করে নিজেও কম কষ্ট ভোগ করছে না। উত্তেজে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে। এখন বললে অবশ্যই বুঝবে।

চিনিবাস বলল, নবীনকে ডেকে না পাঠিয়ে আমরাই আজ বিকেলে ওর কাছে যাই চলুন। কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম। মন, না মতি। এখন কালুর বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেলে তবু একটা সংসার বজায় থাকবে গ্রামে।

সন্ধ্যা হয় হয়। দলটি নবীনের বাড়ীর উঠোনে পৌছল। সান্যাল ছিলেন সকলের আগে। দাওয়ার পইঠায় উঠবার মুখে তিনি দেখলেন—সেদিনকার মতই সন্ধ্যাপ্রদীপ দুলিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো নবীন। দলটি নিঃশব্দে উঠে এলো দাওয়ায়।

দাওয়ার একপাশে শব্দহীন সেই নড়বড়ে তক্তাপোষটা রয়েছে, কালু নেই। কালুকে বুঝি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেছে নবীন?

সান্যালের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, চাইলেন ঘরের মধ্যে। অন্য সকলে তাঁর দৃষ্টিকে অনুসরণ করল।

সান্যাল দেখলেন, সাতদিন আগেকার সন্ধ্যাবন্দনার পুনরাবৃত্তি। সেই কালী ও কৃষ্ণরাধার পটের সামনে আলোর আরতি; ধূপের মিষ্টি গন্ধে আর পাতলা ধোঁয়ায় চাষরে ঢাকা ঘরে দেবলোকের আভাস। পরিচ্ছন্ন ঘর, পরিপাটি করে সাজানো প্রতিটি জিনিস। পিলসুজের মাথায় প্রদীপ রেখে অবনত শির নবীনের বিলম্বিত প্রণাম নিবেদন। হাঁ একটু নজর করে দেখলে ঘরের ভিতরের সাইপোষে পাতা বিছানাটাও নজরে পড়ে। সুপরিচ্ছন্ন শয্যা করলা একখানা চাষরে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে কে যেন শুয়ে আছে তার উপরে। কে, কালু বুঝি।

নবীনের প্রণাম শেষ হতেই সান্যাল বললেন, কালু কেমন আছে নবীন? ঘুমুচ্ছে বুঝি?

ও আপনারা এসেছেন? আসুন আসুন। বাইরে বেরিয়ে এলো নবীন। বসতে জো হোক। আজে পাশাতে চওড়া ইঁট ঠেকনো দেয়া আছে মজবুত তক্তপোষ ভাববে না। বসুন সমুদাই মেলে বসুন।

তক্তপোষে বসে সান্যাল বললেন, কালু ভাল আছে জেনে খুসি হয়েছি। ঘুমুচ্ছে—ঘুমুক। ও সুস্থ হয়ে উঠলে বিয়েটা যত শীগ্‌গির হয় দিয়ে ফেল নবীন।

নবীন হাত জোড় করে বলল, আজ্ঞে বিয়ের দিন তো ঠিকই আছে আটাশে বৈশেখ। ওই দিনই শুভকর্ম হবে।

ওইখানেই হচ্ছে তো? হারাধন শুধোল।

না চাচা কাকা—অন্তত ঠিক করে ফেললাম। বড্ড তাড়াতাড়ি হ'ল—তা কি করা যাব বলেন।

আশু মিত্র বললেন, বেশ—বেশ. আনন্দের কথা। বিয়ে যেখানেই হোক শেষ পর্য্যন্ত যে তোমাদের মিল হয়েছে এ তারি আনন্দের কথা।

মিল? কার সঙ্গে মিল? অত্যন্ত অবাক হল নবীন। ওর মুখের ভাব স্পষ্ট দেখা না গেলেও গলার স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল নবীন, বুঝেছি—ফেলোর কথা বলছেন। বলে হো হো করে হেসে উঠল। ওর সঙ্গে এই জীবনে মিল হবে না মাষ্টার বাবু। ও আমার কুলুত্তর ওর যা খুসি তাই করুকগা। করুক ছাড়ুক আমার কি।

মনে হ'ল গলার স্বরটা ধরে আসছে। কিন্তু সেটা ভুল। একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার করে আবেগ বিধা-হীন স্বরে বলল নবীন, ভাবছেন ঘরে শুয়ে আছে? শুয়োটা সেই পাতুরই বটে, আজ সারাদিন এমুখো হয়নি। শুনছি ত্রৈলোক্য গড়ই-এর গোয়ালে গিয়ে ঢুকেছে। তা ঢুকোর থাকগা, আমার সম্পত্তির এক ছিলকেও ওকে দেব না। দেব না, দেব না, দেব না। আমিও যে পাড়ার কেষ্ট দাসের ভাগ্নির সঙ্গে বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেললাম আজ। ওই আটাশেই দিন হবে। আমার সম্পত্তি কি লুটের জিনিস? আমিই বা ঘর ছাড়ব কেন? ঘর ছাড়লেই এই দাওয়া, তাদা তক্তপোষ। তারপর ওই উঠোন, ছেঁড়া মাদুর। আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন, ভগবান সাক্ষী রেখে বলুন, নিজের হকের জিনিস পারেন ছাড়তে? বলুন—বলুন……

চমকে উঠলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের দল। হারাধন মণ্ডল, চিনিবাস সরকার, কালীপদ নন্দী, আশু মিত্র আর প্রেসিডেন্ট অবন্তী সান্যাল। তথ্যতাজ্ঞানহীন নবীনের প্রতিটি কথা আদিম অভিযোগের দাবীতে ক্রমশঃ যেন কঠিন হয়ে উঠেছে; মার্জিত রুচি, ভদ্র, শিক্ষিত, জ্ঞানবৃদ্ধ পঞ্চায়েৎ সভ্যদের রূঢ়ভাবেই আঘাত করেছে। ওঁরা মাথা নীচু করে ভাবছেন, কাকে প্রশ্ন করছে নবীন। আমাকে? না—আমাদের সকলকে?

নবাগতদের প্রতি প্রবীণ পরিচালকের এই ছোট উপদেশ। মহিলাদের ক্ষেত্রে অভিনয় শিক্ষা কঠিন তো বটেই, আরো কঠিন জীবনে অভিনেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, কারণ সাধারণতঃ একটি নাটকে যদি আটজন পুরুষ ভূমিকায় অভিনয় থাকে তো স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় থাকে হয়ত মাত্র তিনজনের। তাই পুরুষ অভিনেতাদের তুলনায় নারী অভিনেত্রীদের সাফল্য লাভ করা অনেক কঠিন।

মঞ্চ নিয়ন্ত্রণ, চলচ্চিত্র, রেডিও ও টেলিভিশন সম্পর্কে আকাডেমীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

একাডেমীর অন্যতম জনকার্নাওভ বলেছেন—অভিনয়ের অন্যান্য মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের প্রভূত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের ছাত্ররা কেবল রঙ্গমঞ্চেই অভিনয় করতে চায়।

বিশ্বের প্রগতিশীল দেশগুলিতে অঙ্গ অভিনয়কলা অনুশীলনের কঠোর চেষ্টা চলেছে। ভারতবর্ষেও এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ভাবী অভিনেতাদের কি তৈরী করা যায় না? তাহলে কি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার আশা আর একটু বলবতী হয় না?

প্রাজ্ঞচিত্তের প্রতিবাদ

পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের ধর্মঘটকারীদের দলে যোগ দিয়েছেন ৮৮ বৎসরের বৃদ্ধ বিশ্বখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল। লণ্ডনের এই নিদারুণ শীতেও অবস্থান ধর্মঘট করার মত শক্তি তাঁর আছে। এমন কি অনেক তরুণ যুবকদের চেয়ে তিনি বেশী সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

পারমাণবিক অস্ত্রসহ রকেট নিক্ষেপকারী মার্কিন সাবমেরিণটি ইংলণ্ডে পৌঁছানোর সময় সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ থেকে এই অসহযোগিতামূলক বিক্ষোভপ্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। লর্ড রাসেলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা উৎকণ্ঠিত হলেও রাসেলের নিজের কিন্তু কোন চিন্তা নেই। বার্ট্রাণ্ড রাসেল এজন্য গ্রেপ্তার হতে—এমন কি আদালতে দণ্ডাদেশের জন্যও প্রস্তুত আছেন। রাসেল আশা করেন যে প্রায় দু হাজার লোক এই অবস্থান ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করবে। এই প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কারণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সহজ। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা নিষিদ্ধ না হলে দু বছরের মধ্যে ব্রিটেনে একজনও জীবিত থাকবে না বলে তিনি আশঙ্কা করেন। সুতরাং রাসেল মনে করেন অন্ততঃ দু'হাজার লোক ব্রিটেনে নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা বাকী লোকের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে চান না।

ষ্টিফেন স্পেণ্ডার ও যুদ্ধোত্তর ইংরাজী কথাসাহিত্য

খ্যাতনামা ইংরেজ কবি 'এনকাউণ্টার' পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক ষ্টিফেন স্পেণ্ডার সম্প্রতি কলকাতায় কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন। সাহিত্যরসিকবৃন্দ তাঁকে ঘিরে ভীড় জমালেন—অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর দিনগুলো কেটে গেল—বক্তৃতা, আলোচনা, অজস্র প্রশ্নের উত্তরদানে—এ সমস্তই হল এবং যুদ্ধোত্তর ইংরাজী কথা সাহিত্য সম্পর্কে নূতন ধরণের আলোকপাত করলেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় ইংলণ্ডের মনোজী সমাজবিন্যাসে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সাহিত্য হল সমাজদর্পণ। প্রশ্ন উঠছে—এ যুগের ইংরাজী কথা সাহিত্যে কি সেই পরিবর্তিত সমাজের প্রতিফলন ঘটছে?

ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের মতে এ যুগের ইংরাজী কথা সাহিত্যে যুগমানসের প্রতিফলন ঘটেনি। পূর্ব-সূরীদের রচনার তুলনায় আজকের সাহিত্য দিগ্‌ভ্রান্ত। যে সমস্ত মৌল মানবিক বোধ এবং প্রত্যয়গুলি নিয়ে এই শতকের প্রথম দিকে সাহিত্যসৃষ্টি সুরু হয়েছিল সেগুলো এখন মহত্তী বিনষ্টির দিকে,

যুদ্ধোত্তর যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ এমনই অসমাধেয় হয়ে উঠেছে যে দ্রষ্টার দৃষ্টিতে এক ক্ষয়িষ্ণু নৈরাজ্যময় যুগেরই সূত্রপাত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ইংলণ্ডেও "রাগী ছোকরার দল" বা "এংগ্রিইয়ংম্যান" গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এঁদের সৃষ্টির মধ্যে এ যুগের ক্ষয়িষ্ণু রূপটিই ফুটে উঠেছে। প্রচলিত মূল্যবোধে এদের অনাস্থা সুপরিস্ফুট। সাহিত্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার মানও নেমে যাচ্ছে। অর্থনীতির 'গ্রেসামস্ লা' আজ সাহিত্য নীতিতে সত্য হয়ে উঠেছে, অন্তঃসারশূন্য সাহিত্য সারবান সাহিত্যের স্থান গ্রহণ করছে। স্পেণ্ডারের মতে এ যুগের ইংরাজী সাহিত্য স্রষ্টারা এক নূতন শ্রেণীর মানুষ, এঁদের মধ্যে নানা বৈপরীত্য এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এঁরা নিজেদের একীভূত করতে না পারায় এঁদের সাহিত্য হয়ে পড়েছে জটিল, দুর্বোধ্য। এরা নিজেদের শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত মনে করেন কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এঁরা মধ্যবিত্ত।

এই নব্যসাহিত্যিক গোষ্ঠী কি শেষ পর্যন্ত ইংরাজী কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন স্মরণীয় অবদান রেখে যেতে পারবে? ষ্টিফেন স্পেণ্ডার বলছেন—এখনও পর্যন্ত তা দেখা যায় নি। কয়েকজন লেখক রাতারাতি খ্যাতি ও সফলতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন। প্রাপ্যমূল্যের অধিক কিছু পেলে প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার-এর লেখক জন ওসবোর্ন একটি মাত্র নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাম্প্রতিককালে তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত। অন্যান্য সাহিত্যিকবৃন্দ যেমন অ্যামিস, মার্ডোক, এণ্ডারসন, উইলসন, হলরয়েড, হপকিন্স এঁরা যতটা সুদক্ষ সুকৌশলী লেখক ঠিক ততটা ভাবার্থে উদ্বুদ্ধ কথাশিল্পী নন। স্থায়ী শিল্পবস্তু সৃষ্টির চেয়ে এঁদের প্রবণতা চাকচক্যকর কিছু একটা রচনা করতে। সমসাময়িক পাঠকমহলে প্রশংসা ও সহমর্মিতা লাভ করলেই স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় না। তবে স্পেণ্ডার আশা করেন একদিন এই অ্যাংরি ইয়ংম্যানের দল আত্মস্থ হবে, স্থায়ী সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে।

কলকাতায় সোভিয়েট পুস্তক প্রদর্শনী

১লা ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটী ইন্‌স্টিটিউট হলে সোভিয়েট দূতাবাস ও ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতি সমিতির মিলিত উদ্যোগে এক সোভিয়েট পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ সুবোধ মিত্র। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ভারত সোভিয়েট সংস্কৃতি সমিতির সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গল্প-ভারতী সম্পাদক ডক্টর কালিদাস নাগ, প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুই হাজার বই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। মস্কোতে প্রকাশিত ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু গ্রন্থাবলী এবং ভারতে প্রকাশিত সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তকাবলী এই উপলক্ষে প্রদর্শিত হয়।

সোভিয়েট বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য এই ধরণের প্রদর্শনীর উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

স্যাটারডে রিভিউ সম্পাদক—নরম্যান কাজিনসের ভারত ভ্রমণ

সুপরিচিত মার্কিন সাহিত্য পত্রিকা 'স্যাটারডে রিভিউ'র সম্পাদক মিঃ নরম্যান কাজিনস যুক্তরাষ্ট্রে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন সম্পর্কে আলোচনার জন্য বর্তমান সপ্তাহে ভারতে আসছেন। মিঃ কাজিনস

অমৃত কথা ও কাহিনী

যীশুখৃষ্টের কথা—

—"স্বর্গরাজ্য এক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনীয়। যিনি আপনক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন করলেন। তিনি নিদ্রা গেলে পর তাঁর শত্রু এসে ঐ গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বপন করে গেল। পরে দেখা গেল, যে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ফল দিল তখন সেই সঙ্গে শ্যামা ঘাসও প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফলে গৃহস্বামীর ভৃত্যেরা এসে তাঁকে অভিযোগ করলে, আপনি নিজের ক্ষেতে ভাল বীজ তো বোনেন নাই। তাহলে শ্যামাঘাস কি করে এসে পড়ল? গৃহস্বামী তখন তাঁদের বললেন, নিশ্চয়ই কোন শত্রুর এ কাজ। ভৃত্যেরা বললে, তবে আপনি বললে আমরা শ্যামাঘাসগুলি তুলে ফেলে দিই। গৃহস্বামী বললেন, না, না, শ্যামাঘাস তুলতে গিয়ে গমও তুলে ফেলবে। শস্য ছেদনের সময় পর্যন্ত সব থাক। একসঙ্গে বাড়তে দাও। পরে ছেদনের সময় আমি বলব যে শ্যামাঘাস যোরা সমেত বেঁধে রেখে দাও আর গমগুলি কেড়ে গোলায় রাখ।"

• •

"তোমরা বীজ প্রাপকের দৃষ্টান্ত শোন। যখন কেউ সেই রাজ্যের বাক্য শুনে না বুঝে সেই পাপাত্মা এসে তার হৃদয়ে যা বপন করা হয়েছিল, তা হরণ করে নেয়। এ সেই, যে পার্শ্বে উপ্ত। আর যে পাষাণময় ভূমিতে উপ্ত, এ সেই যে সেই বাক্য শুনে অমনি আনন্দ মনে গ্রহণ করে, কিন্তু তার অন্তরে মূল নাই, সে অল্পকালমাত্র স্থির থাকে; পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ বা তাড়না ঘটলে সে অমনি বাধা পায়। আর যে কাঁটা বনের মধ্যে উপ্ত, এ সেই, যে সেই বাক্য শুনে, আর সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া সেই বাক্য চেপে রাখে তাতে সে ফলহীন হয়। আর যে উত্তম ভূমিতে উপ্ত এ সেই, যে সেই বাক্য শুনে তা বোঝে, সে বাস্তবিক ফলবান হয় এবং কারও শতগুণ কারও ষাটগুণ ও কারও ত্রিশ গুণ ফল দেয়।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

—"গীতা পড়লে কি হবে? দশবার 'গীতা' 'গীতা' বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' বলতে বলতে ত্যাগী হয়ে যায়। সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে সে গীতার মর্ম্ম বুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বলতে পারলে হলো। গীতার এই শিক্ষা—হে জীব সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক, সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।"

• •

—"একটি মেয়ের স্বামী এসেছে, অল্প অল্প সমবয়স্ক ছোকরাদের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসেছে। এদিকে এই মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না—ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, ঐটি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বললে—না। আর একজনকে দেখিয়ে বললে—ঐটি কি তোর বর? সে আবার বললে—না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে—ঐটি কি তোর বর? তখন সে হাঁও বললে না, নাও বললে না; কেবল একটু কিক্ করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্করা বুঝলে যে এটি তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ।"

ভারত বনাম পাকিস্তানের

ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ

ভারতের অধিনায়ক নবী কন্ট্রাক্টর।

পাকিস্তানের অভিনায়ক ফজল মামুদ।

খেলাধূলা

ক্রীড়ামোদী

ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে

বর্তমান ক্রিকেট মরশুমে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান এসেছে ভারত সফরে। ইতিপূর্বে ১৯৫২ সালে কৃতী খেলোয়াড় কারদারের নেতৃত্বে পাকিস্তান দল ভারত সফর করে গেছে এবং ১৯৫৪ সালে স্বনামধন্য ভারতীয় খেলোয়াড় ভিজু মানকডের নেতৃত্বে ভারতীয় দল পাকিস্তান সফর করে এসেছে। ১৯৫২ সালের টেষ্ট সিরিজে ভারত ২-১ ম্যাচে জয়লাভ করে 'রাবার' পায়। ১৯৫৪ সালে পাঁচটি টেষ্ট-ম্যাচই অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়। গত রোম অলিম্পিকে ভারত তার হকির সম্মান পাকিস্তানের কাছে হারাবার ফলে এবার ক্রিকেট খেলায় সকলের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বেশী লক্ষ্য করা যায়। খেলা আরম্ভের পূর্বমুহূর্তে কমল মামুদ (পাকিস্তান দলের ক্রিকেট অধিনায়ক) ঘোষণা করেন যে এবার তাঁরা Bright Cricket খেলবেন। এই ঘোষণায় অনেকেই মনে করেন যে এবার ক্রিকেট খেলা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কমল মামুদ তাঁর কথা না রাখতে পারায় ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত তিনটি খেলাই আকর্ষণহীন হয়েছে। বাকী আছে এখন মাদ্রাজ ও দিল্লীর টেষ্ট ম্যাচ খেলা। কমল মামুদ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারলে মনে হয় এই খেলাও আকর্ষণীয় হবে না। তবে ক্রিকেট হোল সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার খেলা। সেইজন্যে নিশ্চয় করে ফলাফলের কথা কিছু বলা সম্ভব নয়। কলকাতার টেষ্ট ম্যাচ সম্পর্কে প্রথমেই টিকিটের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। টিকিট যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান সন্দেহ নেই কিন্তু টিকিট বিক্রীর সুব্যবস্থা না থাকার ফলে অনেক প্রকৃত ক্রীড়ারসিক ও ক্রীড়ামোদীই খেলা দেখবার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও খেলা দেখার সুযোগ পাননি।

কলকাতায় 'টসে' এবারও পাকিস্তানের অধিনায়ক কমল মামুদ জয়লাভ করেন এবং নিজের দলকে ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম দিনের শেষে পাকিস্তান দল ৬ উইকেটের বিনিময়ে ২০১ রান করেন। ভারতের মিডিয়াম ফাষ্ট বোলার সুরেন্দ্রনাথের বল খুব কার্যকরী হওয়ায় পাকিস্তান দল খুব সুবিধা করতে পারেন নি।

আশা করা গিয়েছিল যে দ্বিতীয় দিন ভারতীয় অধিনায়ক নরী কনট্রাকটর পাকিস্তানকে ২৫০ রাণের মধ্যে আউট করে দিতে পারবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হোল না পাকিস্তান দল ৩০১ রাণ করে সকলে আউট হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন অধিনায়ক কনট্রাকটর ঠিকমত বোলার পরিবর্তন করতে না পারায় পাকিস্তানের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। পরিশ্রান্ত বোলার সুরেন্দ্রনাথ ও দেশাইকে দ্বিতীয় দিন বেশী বোলিং করাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা গেল না। ভারতের পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ ৯৩ রাণে ৪টি বোরদে ২১ রাণে ৩টি ও দেশাই ১১৮ রাণে ২টি উইকেট পান। বোরদের অবশ্য এবার টেষ্ট ম্যাচ খেলার কথা ছিল না শেষ মুহূর্তে দিলখা সিং অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি খেলায় যোগ দেন। তাঁর বোলিংএ

সকলেই খুশী হন। পাকিস্তানের বার্কি ও নৈয়ব আমেদের খেলা বেশ ভালো লাগে। খনামখ্যাত হানিফ মহম্মদ -সুনামে অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুস্তাক মহম্মদের খেলা দেখে তাঁর ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল বলে মনে হল। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দল ২ উইকেটে ৮৩ রাণ করেন। অধিনায়ক কনট্রাকটর নিজের দোষেই আউট হন। অল্পকোর্ড বু আব্বাস আলি বেগ বেশ সুন্দর খেলছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোর অভাবে তাঁকে আউট হতে হয়। তৃতীয় দিন খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পলিউমরিগর ও জয়সীমা আউট হয়ে যান। বোরদে ও বিজয় মঞ্জরেকার দৃঢ়তা সহকারে খেলছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মঞ্জরেকরও আউট হয়ে যান। ঐ সময় মাঠে বৃষ্টি নামে এবং নাদকারণী ব্যাট করতে এসেই আউট হয়ে যান—তারপর আসেন বোম্বাই টেষ্ট খ্যাত রামকান্ত দেশাই। শেষ পর্যন্ত আলোর অভাবে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের রাণসংখ্যা সেই সময় ৯ উইকেটে ১৪৭। পাকিস্তানের মামুদ হোসেন, ফজল মামুদ ও ইনতিকাব আলম দুটি করে উইকেট দখল করেন। মামুদ হোসেনের বল অধিকাংশই ছিল উইকেটের বাহিরে যা খেলতে গিয়ে আমাদের ব্যাটসম্যানরা অথথা উইকেট নষ্ট করেন। ফজল মামুদের বোলিংএ আর সে পূর্বনৈপুণ্য নেই; এখন তার বল মোটেই মারাত্মক নয়। ইনতিকাব আলম বেশ ভালই বল করেন। চতুর্থ দিন ভারতীয় দল মোট ১৮০ রাণ করে আউট হয়ে যান। ভারতের প্রথম ইনিংসে ফজল মামুদ ৪টি, মামুদ হোসেন ২টি, আলম ২টি ও হাসিব আসান ১টি উইকেট দখলের কৃতিত্ব দেখান। পাকিস্তানী বোলারদের অতটা সম্মান না দেখিয়ে খেললে ভারতীয় খেলোয়াড়রা আরও ভালো রাণ করতে পারতেন। যাই হোক পঞ্চম দিন মধ্যাহ্ন ভোজের কয়েক মিনিট আগে ফজল মামুদ ইনিংস ঘোষণা করে ভারতকে ব্যাট করার সুযোগ দেন অর্থাৎ ১৮৪ মিনিটে ২৬৮ রাণ করলে ভারত জয়লাভ করতে পারবে এইরকম অবস্থা দাঁড়ায়। অনেকেই মনে করেন সকালে একঘণ্টা ব্যাট করার পর ফজল মামুদ ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে খেলার জয় পরাজয়ের মীমাংসার সম্ভাবনা ছিল। ফজল মামুদের ইনিংস ঘোষণার পর ভারতীয় দল খেলতে নামে এবং চা পানের পূর্বেই ৪টি উইকেট হারায় (কনট্রাকটর, জয়সীমা, উমরীগর ও বেগ) মাত্র ৬৪ রাণে। অনেকেই ভয় পান যে ভারত বুঝি শেষ পর্যন্ত হেরে যাবে কিন্তু বোরদে ও মঞ্জরেকারের দৃঢ়তায় খেলার শেষে ভারত মোট ৪ উইকেটে ১২৭ রাণ করে এবং অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ হয়। ২য় ইনিংসে আলম ও আসান পাকিস্তানের পক্ষে বল করেন। তবে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা নিজেদের দোষেই পুনরায় উইকেট হারান। যার ফলে আব্বাস আলী বেগ ও নাদ্‌কারণীকে পরবর্তী মাদ্রাজ টেষ্টে বাদ দেওয়া হয়েছে।

মাদ্রাজ টেষ্টে যে ভাবেই দল গঠন করা হোক না কেন উভয় দলের খেলার যে ভাব তা পরিবর্তন না হলে মীমাংসার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য প্রকৃতি দেবী অনেক কিছুই করে দিতে পারেন। কোলকাতা টেষ্ট অধিনায়ক হিসাবে কনট্রাক্টর মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি। অধিনায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে হলে কনট্রাক্টরকে ভবিষ্যতে হতে হবে আরও কৌশলী ও সাহসী।

পুস্তক সমালোচনা

রমেশ রচনাবলী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ; ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। বার না' টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র সমসাময়িক হলেও দু'জনের ঘরোয়া পরিবেশ এবং মানসগঠন একরূপ ছিল না। বঙ্কিমের সকল কাজের কেন্দ্রভূমি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কার প্রেরণা, রমেশচন্দ্র সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছিলেন, অনেকটা ব্যক্তিগত কারণে। দেশপ্রীতির বীজ তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল; কর্মক্ষেত্রে নানা পরিবেশে সেই বীজ ক্রমে আবার পেল প্রাণ। বঙ্কিমের সংস্কার বুদ্ধি ছিল দার্শনিক ও শিল্পীর, রমেশচন্দ্রের সংস্কার কর্মের মূলে ছিল ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টি। তাঁর সকল রচনার মূলেও এই দৃষ্টির তাত্ত্বিক প্রকাশ।

অথচ রমেশচন্দ্র সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বঙ্কিমেরই নির্দেশে। এবং ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে দেশীয় জীবনেও মানসে নব জাগরণের যে বিচিত্র ভাবাবর্ত যে জটিলতা ও উন্মাদনার জোয়ার এসেছিল, তার স্রোতে তিনিও আকণ্ঠ অবগাহন করেছিলেন। তার ফলে যে বিপুল সাহিত্যকৃতি তিনি সৃষ্টি করে গেছেন, তার মূল্য ও সার্থকতা অপরিসীম। কারণ তিনি প্রতিধ্বনিময় প্রতিশ্রুতি ছিলেন না, নতুন ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সৃজন করে গেছেন। স্বকীয় ব্যক্তিত্বে ও বৈশিষ্ট্যে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

বর্তমান যখন প্রায় নিঃস্ব, মানুষ তখন আশা ও আশ্রয়ের সন্ধানে স্মরণ করে অতীতের গৌরবকে। একশো বছর আগে, নতুন করে ঘর বাঁধার সময় বাঙালীও তাই করেছিল। কিন্তু তার স্মরণিকা সেদিন যতোটা আবেগ-সচল ছিল, ততোটা বস্তু-অনুসারী ছিল না। বঙ্কিমের মধ্যে তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠার যে প্রতিভা প্রকাশ, রমেশচন্দ্রে তা আরও বিকশিতরূপ। তাই বৈদিক সাহিত্য ও শাস্ত্রাদির অনুবাদেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, সে সম্পর্কে মৌলিক আলোচনাও উপস্থাপিত করেছিলেন এবং দেশজ শিল্প, বাণিজ্য, রাজস্ব, ভূমিব্যবস্থা অর্থনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে স্বীয় এষণাকে পরিচালিত করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসেও অনুচ্ছ্বসিত আবেগ—তবু পাণ্ডিত্যে তারা ভারাক্রান্ত নয়, রসবোধে উজ্জ্বল, কবিত্বে ও মমতায় মেদুর।

রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' এবং 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' বঙ্কিমের ধারাবাহী কিন্তু বন্ধ্যা অনুসরণ নয়। বঙ্কিম যেখানে রোমান্সের দিকেই ঝুঁকেছে, রমেশচন্দ্র সেখানে ইতিহাসের নিষ্ঠাবান পটেই শিল্পের তুলি বুলিয়েছেন। এদিক থেকে গ্রন্থ দুটি, বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। তাঁর সামাজিক উপন্যাসেও ইতিহাস প্রবণতা গাঢ়তর, তবু সমকালীন জীবনের স্পন্দন সেখানে অনুপস্থিত নয়। 'সংসার'এ উত্তর-বর্ধমানের কৃষক-সমাজের ঘরোয়া ছবি ধরা পড়েছে এবং 'সমাজ'-এ বিধবাবিবাহের প্রশ্ন তোলা হয়েছে। রমেশচন্দ্র শুধু সমস্যার ভালোমন্দের দিক্ দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, তার সমাধানের সুস্পষ্ট পন্থা নির্দেশও করেছেন এবং এখানেও তিনি তথ্য ও যুক্তিনির্ভর বলেই প্রগতিশীল মনোভাবের অধিকারী। বঙ্কিমকে যদি বলি অভিজাত নাগরিক সমাজের স্রষ্টা শিল্পী, তবে রমেশচন্দ্র পল্লী ও নিরক্ষিত সমাজের রূপকার! গুরুর প্রজ্ঞাবাদ তাঁর কাব্যজীবন স্নাত ও লালিত হলেও তিনি স্বতন্ত্র। তাঁর রচনা ধ্রুব সাহিত্য।

কিন্তু আমাদের স্মরণশক্তি ক্ষীণ, জানবার আগ্রহ আরও স্বল্পায়ু। তাই ফেলে আসা সবুজ দিন-গুলির সব ক'টী পাতার খবর রাখি না, মাত্র কয়েকজনকে মনে রাখি। রমেশচন্দ্র অবশ্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত ও অবহেলিত নন; তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আমরা সাগ্রহেই পড়ি। কিন্তু একমাত্র গবেষণার প্রয়োজন ছাড়া শুধু জিজ্ঞাসা বা রসতৃষ্ণা নিয়ে তাঁর মূল রচনার গণ্ডিতে আমাদের মন পা ফেলে না। তাঁর গ্রন্থগুলি বহুল পরিমানে প্রচার তাই সর্বদা কাম্য। একাজ সুরু করেছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। কিন্তু শুধু বহুলতাই নয়, সুলভে প্রাপ্তব্যও হওয়া দরকার। যারা কম মূল্যে এবং একত্রে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির রসাস্বাদন করতে চান, তাদের জন্যে 'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশ করেছেন—'রমেশ গ্রন্থাবলী'। বঙ্কিমের রচনাও এঁরা একই উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছিলেন। সংসদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আশা করি রমেশচন্দ্রের আলোচনা—নিবন্ধগুলিকেও তাঁরা জনসমক্ষে হাজির করবেন সমান সুলভতায় ও সুদৃশ্য রমনীয়তায়।

—গুরুদাস ভট্টাচার্য

একজন আর কয়েকজন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আধুনিক কবিতা নিয়ে তর্ক তুললেন উপেন্দ্রনাথ, 'আচ্ছা, কবিতাকে নিয়ে আটপৌরে সাজে তাকে যদি নিছক গদ্যের পর্যায়ে ফেলো তাহলে কবিতা বলে স্বতন্ত্র কথাটির দরকার কী?'

উত্তরে বললাম, 'দাদা, কবিতার দেহ ঘিরে আমরা সাজ পাল্টাচ্ছি। কিন্তু তার মন এবং আত্মা রসাশ্রিতই আছে। সুতরাং 'কবিতাচৈব নিত্য রসদায়িনী' মেহ-মনে মাত্রা পড়লো, এ শুধু অহেতুক অভিযোগ।'

'রসকেই যদি মানো তবে, তবে মিল দেওয়া মিষ্টি কবিতায় তোমাদের আপত্তি কিসের?'

উপেন্দ্রনাথের এ কথার প্রত্যুত্তরে বলি, 'আপত্তি জ্ঞানে। আপত্তি গঠনে। মিল এর অক্ষর ছাতকাতে গিয়ে ভাব যেখানে হোঁচট খায় এ যুগের ছবি আঁকতে গিয়ে রঙের বাক্স যেখানে নিতান্তই বর্ণ নীল দেখা যায়, সেখানেই আমাদের আপত্তি। যার বহুকথিত কথায় মন ভরতে চায় না, তাই আমরা খুঁজি নতুন উপমা, নতুন ছন্দ, নতুন বাক্য-বিন্যাস, নতুন রঙ।

'আচ্ছা পড়ো দু'একটি তোমাদের আধুনিক কবিতা।'

এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটে চলেছে। নৈশ নিস্তব্ধতার মাঝে বাইরের আকাশে কবিতার আমেজ। দু'একটি কবিতা পড়তেই উপেন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন, 'দুর্বোধ্য।'

'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'সে ভাষা মানুষের বদ্ধমনকে উন্মুক্ত করতে পারে না।'

'ধূলি ছাড়ি' একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন।
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভার-হীন।'

উপেন্দ্রনাথ আরো বললেন, 'তারচেয়ে কতো সহজে মনকে কবিতার রসে ভরিয়ে তোলার উপকরণ দেখো আমাদের যুগের কবির মধ্যে'—

'আলোক বাষের আভাস সেথায় আছে
মর্তের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা
কাঞ্চন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা।'

উপেন্দ্রনাথের কথায় হেসে বললাম, 'এ কবিতার কবি শুধু আপনাদের যুগের নন, তিনি সর্বযুগের, সর্বকালের।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'শোনো আধুনিক কবিতা সম্পর্কে একটা মজার গল্প বলি। একজন কবিকে তারি ঠকিয়েছিলাম।'

গল্প শোনবার জন্যে কবিতার বই গুটিয়ে উৎসুক হয়ে নড়ে চড়ে বসলাম। উপেন্দ্রনাথ সুরু করলেন, 'আমি তখন বিচিত্রার সম্পাদক। একজন আধুনিক কবির কবিতা ছাপিনি বলে তিনি আমার অফিস চড়াও হয়ে এলেন। বললেন, আপনি সেকেলে, একেলে কবিতা বোঝবার মতন intellect আপনার নেই।

কবিকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে একদিন ডেকে পাঠালাম। তিনি এলে একটি কবিতা শোনালাম। বললাম, কেমন লাগলো?

তিনি বললেন, চমৎকার। কী সুন্দর উপমা, আর কী রকম বাক্য সংযোজনা। আরো বললেন, এ কবিতা যদি বিচিত্রায় প্রকাশ করেন, তাহলে আমার কবিতা আপনার পছন্দ হলো না কেন?

রহস্যকে ব্যক্ত করে বললাম, এটি আসলে আধুনিক কয়েকজন নাম করা কবির কয়েকটি কবিতার কিছু কিছু পঙক্তি যোজনা করেছি আমি।

কবি আমতা-আমতা করে উঠে পড়লেন।'

উপেন্দ্রনাথের কথা শুনে আমি বললাম, 'গল্পটি, উপভোগ্য, কিন্তু আধুনিক কবিতা সম্পর্কে এই কী আপনার মত?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'না নিশ্চয়ই নয়। তবে শুধু দেহ নয়, মন; মন না থাকলে তা সাহিত্যই নয়। অর্থাৎ বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্, রস হচ্ছে মনের মাধুরী।'

পূর্ণিয়া থেকেই উপেন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্যিক-জীবনের উন্মেষ।

বড় ভাই লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার নামকরা উকীল। ওকালতি বংশগত ঐতিহ্য গাঙ্গুলি পরিবারের। আর তার সঙ্গে সাহিত্যানুরাগও। লালমোহন বাবুর স্ত্রী মৃদুমতী দেবী কিশোর উপেন্দ্রনাথের আবাল্য বন্ধু। বৌদি বলতে অজ্ঞান উপেন্দ্রনাথ। আর বৌদিরো উপীনগত প্রাণ।

মৃদুমতীদেবী উপেন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে কিছু বড়; কিন্তু তাতে ভক্ত হতে আটকায় না।

উপীন লেখাপড়ায় ভালো। পরীক্ষার আগেই বলে রাখেন, পাসের খবর। শুধু কেঁদে-কেটে পাস করা নয়। রীতিমত ভালো রেজাল্ট করে পাস করা। উপীন গানে ভালো। এমন গান আর কে গাইতে পারে? আর সব চাইতে ভালো উপীন, কবিতা লেখায়।

মৃদুমতীদেবী প্রকাশ্যেই বলেন, রবীন্দ্রনাথের পরে উপীনের মতো সার্থক কবি বাঙলাদেশে আর কেউ নেই।

ষোল বছরের পরিপূর্ণ কিশোর উপেন্দ্রনাথ। ন'দশ বছর বয়েস থেকেই কবিতা লেখা সুরু হয়েছে। প্রথমে প্রকৃতি। প্রকৃতি থেকে জীবন। আর সেই সঙ্গেই প্রকৃতি প্রভাবান্বিত জীবন-দর্শন।

'জলের নীচে মাটি আছে
　　মাটির নীচে জল,
দুঃখ-সুখের জলে-স্থলে
　　জীবন ঘরাজল।'

কিংবা:

'শুধু চারিধারে নীল জলরাশ
ছলছলি করে ছলনার ভাষ;

বলে, 'চল্ চল্, সাগরেতে চল্,
তীরের তরণী রেখা নাই।'
সুদূরের দিকে হেরি অনিমিষে
কিনারার রেখা নাহি পাই।'

মৃদুমতীদেবীর গর্বের আর সীমা নেই। সত্যিই যে ছেলের তাঁর ভালো জাতের কবি, এ-কথা সকলের কাছে প্রকাশ করে বেড়ান সগর্বে।

তখনকার দিনের কবি মানসিকতা কল্পনাশ্রয়ী। বস্তু থাকতো উপলক্ষ মাত্র—একটা ক্ষীণ সূত্র। কল্পনার রঙই ছিল মনের আকাশের পটভূমি। মেঘের পর মেঘ জমে। কত রঙের আসা আর যাওয়া। তারা সব সঞ্চরণশীল অযুগ্মক মেঘদল। কোন কিশোরীর আয়তা হরিণ-নয়ন মনকে যায় ছুঁয়ে।

যৌবন-উন্মেষ কবির দৃষ্টি-ভঙ্গি বদলায়। কিসের প্রেরণায় তখন তিনি কবিতা রচনা করেন? প্রকৃতি-প্রেম থেকে এবার কাব্যে তাঁর আরেক অনুভূতি। হৃদয়ের অনুরাগে-রঞ্জিত সুচারু-বদন, আয়ত-লোচনা হরিণী। বন-হরিণী নয়, মন-হরিণী, মনোহারিণীই বটে। কবিতা লেখেন উপেন্দ্রনাথ।

'প্রথম যখন প্রত্যূষে আজি পশিলাম তব কক্ষে
হেরিলাম তুমি শায়িত শয়নে সুখ-নিমীলিত চক্ষে।
বদনে তোমার অঙ্কিত চারু সুখ-স্বপনের চিহ্ন
কোনখানে তার নাহি অবকাশ কোনখানে নয় ছিন্ন।
কনক আঁচল খসিয়া পড়েছে মৃদু-কম্পিত বক্ষে।
প্রথম যখন প্রত্যূষে আজি পশিলাম তব কক্ষে।
আমার নয়ন রয়েছে এখনো তোমার স্বপনে মুগ্ধ,
পাতা ঢাকা ফুলে অলির মতন হয়ে আমি লুব্ধ।'

মৃদুমতীদেবী তারিফ করেন, 'চমৎকার কবিতা! খাসা কবিতা! তোমার মত এত অল্প বয়সে এমন কবিতা ক'জন লিখতে পারে?'

সার্থকতার আনন্দে কবির অন্তর স্ফীত।

রোমান্সের এই স্বপন-মুগ্ধতাকে অবলম্বন করে যৌবনকালে বহু কবিতা লিখেছেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিণত কালের উপন্যাসে তাঁর যে রোমান্স-প্রিয়তা তার মূলে রয়েছে মৃদুমতী অভিনন্দিত কবি-মানসিকতা।

প্রথম যৌবনে সুখ-নিমিলিত কবির চক্ষে যে সব কিশোরীর আয়ত হরিণ-লোচন ধরা পড়েছে তাদের প্রসঙ্গ উঠলে পরিণত উপেন্দ্রনাথ কিশোর-প্রেমের রঞ্জিত অনুরাগের চিহ্ন মুখমণ্ডলে ফুটিয়ে তুলে বলেন, 'এমনি অনেক কবিতাই লিখেছিলাম, কারুর বন-হরিণীর চোখ, কারুর সুচারু বদন, কারুর কাজল বরণী তনুশোভা—আমার কবি মনকে কবিতা লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল। সে সব কবিতা ভুলে গেছি, এই একটি কবিতাই মনে আছে।'

কৌতুক করে আমি প্রশ্ন করি, 'কিন্তু দাদা, এখনকার দিনে যে সব ফ্রক পরা মেয়েদের প্রতি আমাদের মনে একান্ত বাৎসল্য ভাব হয়, আপনাদের কালে-রাজত্বে সেই সব মেয়েরা 'এমন পাকা-পোক্ত নায়িকা হতো কেমন করে?'

উপেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলেন, 'দেখ ভাই, মনের মধ্যে প্রেমের লীলা-খেলা এটা বয়েসের ধর্ম। এখনকার দিনে সমাজ পরিবর্তনে মনের কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে। এখন বাল্য বা কিশোর-বিবাহপ্রথা আর নেই। আমাদের কালে বৌদিরা পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। কারণ, তের বছরের মেয়েরা আসতেন সদ্য-পরিণীতা বৌদি হয়ে। তাঁরাই রোমান্সের সৃষ্টি করতেন। তাদের সখিরা ছিল আমাদের কাব্যের নায়িকা।'

রোমান্সের কাজল-চোখে দেখা তখনকার কবিদের ছিল এক স্বতন্ত্র পৃথিবী। সে পৃথিবীতে আলো আছে, ছায়া আছে, মেঘ আছে, রৌদ্র আছে, রক্তের বীণাও কখনো কখনো বা বাজে।

কিন্তু আজকের দিনে জীবনের ক্ষুধা, জনতার কলরোল, হাহাকার তখনকার দিনের কবিদের মনকে চেতনা জাগাতো না। তারা ফুলের মধু খেতেই ভালোবাসতো। কবির স্বপ্নে ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক আর ভালোবাসার রঙ্।

আজকের জাগরণে নিরন্ন-ভক্ত রাজপথের পোড়া পীচের গন্ধ। কারখানার ক্রেণের শব্দ, আর দেহগত মানসিক বিকার।

কাব্য তখন পেলব অবগুণ্ঠনবতী নবোঢ়া বধূ সরমিত চোখের চাওয়া, কুমারী মেয়ের আঁচল-খসা একটা মধুরভঙ্গী, একটি বিলোল কটাক্ষ। কবিতা একটি মুহূর্ত, একটি স্বতন্ত্র মুড।

কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথের যুগ—উপেন্দ্রনাথের কবি-মানসিকতা। এ-কালের বস্তু-সর্বস্ব, ভাব-কঠিন, উপমা-হেঁয়ালি কণ্টকিত কবিতা তাঁকে স্পর্শ করে না।

আধুনিক কালের কবিতা নিয়ে অনেক তর্ক করেন তিনি। অবশ্য বিষ্ণুনাগের মত কড়া সমালোচনা নয়। বিষ্ণুনাগের কাছে কবিতা কবিতা নৈব।

তাই শেলী, কীটস, ব্রাউনিং এবং রবীন্দ্রযুগ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনা শক্ত ব্যাপার। তিনি বলেন, 'তোমাদের চোখে ছানি পড়েছে। আকাশের চাঁদ তাই তোমাদের বুভুক্ষিত চোখে পোড়া রুটি। মনের অন্নের প্রকোপে তোমাদের কবিতা বিকারের ডেলিরিয়াম।'

উপেন্দ্রনাথ এতখানি একদেশদর্শী নন। কবিতার সমস্যর বাদীদের তিনি অভ্যর্থনা জানান সাগ্রহে। সংরক্ষণশীল মনের অগ্রদারতা সে-ক্ষেত্রে তাঁর নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্তির, প্রেমেন্দ্র মিত্তির থেকে নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক, শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রভৃতি এ-কালের আরো কয়েকজন কবি তাঁর বৈঠকী-আসরে বাসর জমায়।

মনের খেয়ালে এখনো উপেন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করেন। ছোট ছোট টুকরো টুকরো কবিতা। কোন বাতায়ন-বর্তিনী আলো যেন চোখের ইশারা জানায়, মেঘের ছায়া ছায়া রঙ্, এখনো যেন হাতছানি দেয়।

'বাতায়ন' কাব্যকে একদিন সমুপস্থিত করা হল বৈঠকী কবি-বাসরে। মেঘদূতের ভাববিলাসে উপেন্দ্রকাব্য বাতায়ন। কয়েকটি মধুর রোমান্টিক কবিতা।

চায়ের ধূমায়িত পেয়ালায় আত্ম-নিমগ্ন ছিলেন বিষ্ণুনাগ। হঠাৎ চেহারায় অকস্মাৎ তাঁর কাহ্নী-হাওয়ার আমেজ লাগল। বললেন, 'কবিতায় তোমার হাত ছিল উপেন।'

এ-কথা একদিন রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, 'ওহে উপেন, দুটি কারণে তুমি আমাকে বিস্মিত করেছ।'

গুরুদেবের এ-কথায় সত্যিই বিস্মিত উপেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'প্রথম বিস্ময়ের কারণ তুমি কবিতা লেখ। আর বিস্ময়ের দ্বিতীয় কারণ, শুধু কবিতা লেখা নয়, তুমি ভালো কবিতা লেখ।'

বৌদ্ধ মৃদুমতীর কথা মরণে জাগে উপেন্দ্রনাথের। বাংলার অবগুণ্ঠনবতী এক বৌদ্ধির স্নেহ-প্রশংসার উচ্ছ্বাস তা হলে শুধু নিছক স্নেহের প্রীতি নয়।

কিন্তু তবুও উপেন্দ্রনাথ রাজকবি না হয়ে রাজপথের ঔপন্যাসিক হলেন কেন! মৃদুমতীর মতো প্রেরণাধাত্রীর বিয়োগ-বেদনাই কী তার কারণ?

উপেন্দ্রনাথ বলেন, 'না। বিচিত্রায় আমার খেয়ালিয়া পড়েছ তো?'

বললাম, 'হ্যাঁ। ছোট ছোট কবিতায় কয়েকটি মনের অনুভূতিকে কয়েকটি পর্যায়ে প্রকাশ করেছিলেন।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'খেয়ালিয়া'র শেষ কবিতার কয়েকটি পংক্তি শোন—

যে গান গাহিতাম তোমারে পরশিতে,
সে গান গাহিলাম সবারে হরষিতে।
খ্যাতির দীপশিখা
রচিল মরীচিকা,
কমল শুকাইল মানস-সরসীতে॥'

প্রশ্ন করলাম, 'শুধু খেয়াল খাতার একটি পৃষ্ঠাকে ভরাতেই কবি উপেন্দ্রনাথের আবাল্য কবিতার পরিসমাপ্তি?'

বিকুনাগ বললেন, 'না। জীবনের ও হচ্ছে একটা ফেজ। শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য-গোষ্ঠীরা প্রথম কবিতা নিয়েই সাহিত্যিক জীবন সুরু করেন। তারপর গল্প-উপন্যাস। সুরেন গাঙ্গুলী, উপেন গাঙ্গুলীও শরৎচন্দ্রের মতন প্রথম বাস্তিকী-প্রতিভার রত হয়েছিলেন।

আমার মন কিন্তু এ-কথায় সায় দেয় না।

সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী প্যাবলো পিকাসোর একটি ছবি অবিশ্বাস্য মূল্যে ইংলণ্ডে বিক্রী হয়েছে। যারা কদাচিৎ তাঁর ছবিকে মূল্যবান মনে করেছে তারাও এ যুগে তাঁর শিল্পের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন।

এক যুগে যা অবহেলা আর ঔদাসীন্য ভরে প্রত্যাখ্যাত, আর এক যুগে তাই মানুষ মাথার মণি করে রেখেছে।

শিল্পের ইতিহাসে—অনেক শিল্পীর জীবনেতিহাসে এই এক পরম বেদনা দায়ক ঘটনা।

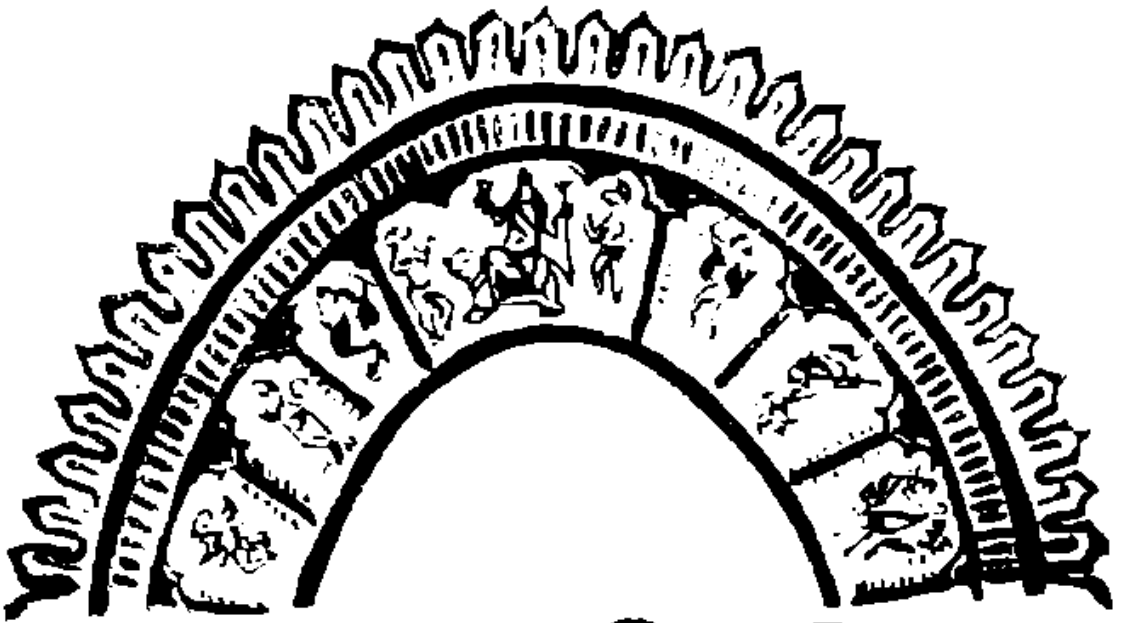

" বাংলার চিত্রশিল্প "

এ্যাসকো সাবানে কাচাই সহজ

ASCO BAR

ASCO

বার ও ট্যাবলেট

এক টুকরো এ্যাসকো সাবানে
কম সময়ে অনেক বেশী
কাপড়চোপড় পরিষ্কার হয়
প্রচুর ফেনা হয়
জামাকাপড় টেকেও বেশী।

এসিয়াটিক সোপ কোঃ — কলিকাতা

ছবির আদিগঙ্গা এই বাংলা

শ্রীকালিদাস নাগ

ষোড়শ বর্ষীয়া গল্প-ভারতী চোখ মেলেছে বাংলার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের দেখতে ; তাই মনে করাতে চাই কত বড় ঐতিহ্য তার পিছনে আছে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি "কালীঘাটের" পট, ক্ষীণ হয়ে এসেছে তার রঙ কিন্তু কী জোরালো তার রেখার টান ও ছন্দ। অকারণ অবজ্ঞায় মৃতপ্রায় হলেও কালীঘাট-শিল্প যেন নূতন রূপ পেল অবনীন্দ্র ভগ্নী সুনয়নী দেবীর সার্থক চিত্রকলায়, হয়ত তাঁর সময়ের অন্য নারী শিল্পী (সেকালের কবি গিরীন্দ্রমোহিনীও অনেক ছবি এঁকেছেন) দের হাতের কাজ ও অপূর্ব্ব আল্পনা দেখে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বাংলার "ব্রত-কথা" লেখেন ও বহু আলিম্পনের নক্সা ব্লক্ করে ছেপে গেছেন। কিন্তু হায় তখন কেবল দেশের বিদেশী প্রভাবান্বিত রবিবর্ম্মার Oleograph চাকচিক্যে দেশে চমক লেগে গেছে ! তিনি কেরলরাজের সাহেব Portrait শিল্পীর বিদ্যা, আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখে, শেখেন ও বহু লক্ষ টাকা (রাজা রাজড়ার ছবি এঁকে) অর্জ্জন করে রবিবর্ম্মা বোম্বাইয়ে ছবির কারখানা খোলেন। সেই কৃতী শিল্পীর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অধ্যেন্দু গঙ্গুলী মশাই কিছু লেখেন। আমি আজ মনে করাই যে বৃদ্ধ বয়সে রবিবর্ম্মা বাংলায় আসেন অবনীন্দ্র ঠাকুরের যোড়াসাঁকোর Studio দেখতে। বোম্বাই-বাঙলার শিল্প-সংযোগ গত শতাব্দীর শেষ দশকেই সুরু হয় কিন্তু আজ সেটি কঠোর প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছে ; কারণ বোম্বায়ে প্রবল বিলাতী শিল্পের প্রভাব আর বাঙলায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ Palmar, Gilhardi প্রভৃতি বিদেশীর কাছে সাকরেদী করলেও ফিরে এলেন ভারতের নিজস্ব চিত্র-ধারায় অবগাহন করতে। মুঘল-রাজপুত-কাঙড়া থেকে সুরু করে অজন্তা ইলোরা-শৈলী এই অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সার্থক শিষ্য নন্দলালের ছবিতে অমর হয়ে আছে। কিন্তু বাংলা লক্ষ্মীর বর থেকে বঞ্চিত বলেই হয়ত তাঁর শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি লক্ষ্মীমন্ত অবাঙালী বা বিদেশী সংগ্রাহক (Collector)-দের হাতে বাইরে চলে গেছে। তবু এখন থেকে চেষ্টা সুরু হোক্ সেই সব ছবির সন্ধান ও তালিকা করার—যেন বাঙালীরাই ভুলে না যায়। ঠাকুর বংশের গুনজ্ঞ রাজা প্রফুল্ল ঠাকুর ছিলেন দেশী রীতির বড় সমঝদার ও তিনি বহু অর্থব্যয়ে শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি কিনে রেখে গেছেন, তাঁর উপযুক্ত পুত্র শ্রীপ্রবোধেন্দু ঠাকুর এ বিষয় লেখা সুরু করেছেন।

আবার পাথুরিয়াঘাটের Tagore Castle হয়ে উঠল পাশ্চাত্য শিল্প সংগ্রহের আড়ত, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের আনুকূল্যে—দেখে মুগ্ধ হয়েছি ; কারণ মনে হয়েছে যেন প্যারিস-রোমের গ্যালারীতে ঘুরছি ; এ ধরণের ছবি মল্লিক বংশের marble Palace মণ্ডিত করেছিল তার প্রমাণ আজও মেলে। আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট G. Washington-এর জীবদ্দশায় আঁকা Portrait কলকাতারই এক জমিদার-বাড়ীতে আছে যেমন দেখেছি লাল কোর্ত্তা পরা Clive সাহেবের ছবি ! বিচিত্র ও বিরাট চিত্রশালা এই আমাদের কলকাতা ; তাই এর যাদুঘরে (Indian Museum) এখনো অনেক 'যাদু' লুকিয়ে আছে তাদের খুঁজে বার করতে হবে। পাশ্চাত্য বলে তার শিল্প নিকৃষ্ট ও বর্জ্জনীয় এ রব উঠেছিল আমাদের 'স্বদেশী' যুগে যখন প্রাচ্যশিল্পের ভক্ত Principal E. B. Havell মাদ্রাজ থেকে এসে Govt. School (এখন

কলেজ) of Arts-এর ভার নেন ও কিছুদিন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে (১৮৭১-১৯৪১) Vice-Principal থাকতে রাজী করেন ; তাঁরা Calcutta Society of Oriental Arts গড়ে তোলেন। সেযুগে কীতকাল আমাদের সার্থক হত এই "সোসাইটি" Exhibition দেখে কালীঘাটের আদিগঙ্গা থেকে চৌরঙ্গীর নূতন চিত্র-কলা আমাদের টেনেছে ও মাতিয়েছে। ১৯০৩ সালে দিল্লী একজিবিশন থেকে ১৯১৩ (নভেম্বর) কবিশিল্পী রবীন্দ্রনাথের Nobel পুরস্কার পর্য্যন্ত প্রায় যতগুলি Exhibition হয়েছে দেখেছি। "Bengal School" বলে যে চিত্র-শৈলী দেশ বিদেশে এত সুখ্যাতি পেল (তখন থেকেই Bombay School ঈর্ষান্বিত) যে Macmillan Co রবীন্দ্রনাথের এক সচিত্র সংস্করণ ছেপে বাংলা শিল্পীদের নাম প্রচার করেন। তারও আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবাসী (১৯০১ থেকে) Modern Reviewতে (১৯০৭ থেকে) প্রতি মাসে দু'বার করে রঙিন ও একরঙা কত দেশী ছবি যে প্রকাশ করেছেন ও দেশী শিল্পীদের উৎসাহ দিয়েছেন Chatterji's Picture Album আজও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সাধারণ্যে ভারত-শিল্প-প্রচার রামানন্দ যা করে গেছেন তার অকুণ্ঠ প্রশংসা অবনীন্দ্রনাথ, O. C. Gangoly ও যামিনী রায় করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের দাদা গগনেন্দ্র (১৮৬৭-১৯৩৮) যেমন ছিলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (অর্দ্ধেন্দু মুস্তফীর বন্ধু ও 'ধাম খেয়াল' ক্লাবের সদস্য), তেমনি নব নব শিল্পধারার প্রবর্ত্তক ও অগ্রণী। তিনি ও তাঁর দুই ছোট ভাই সমর ও অবন মিলে তাঁদের দক্ষিণের বারান্দায় আসর জমাতেন ("জোড়াসাঁকোর ধারে" দ্রষ্টব্য), দেশী বিদেশী শিল্পীদের খাওয়াতেন এবং জাপানী Count Okakuraর মত গুণীকে বাড়ীতে অতিথি রাখেন ; তাঁর বিখ্যাত বই Ideals of the East এই কলকাতার গঙ্গাতীরেই লেখা হয়—"Asia is One" বাণী দিয়ে তার উদ্বোধন। ওকাকুরা চেষ্টা করে এ যুগের শ্রেষ্ঠ জাপানী Y. Taikan-কেও ঠাকুর বাড়ীতে অতিথি করেছিলেন ; সেখানে তিনি "রাসলীলা" ছবিখানি ইন্দো-জাপানী রীতিতে আঁকেন (কোথা গেল সে ছবি ?) ; আবার টাইকনের শিষ্য Kampo Arai এলেন ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান সফরের জীবন্ত উপহার হয়ে এবং জাপানী তথা চৈনিক পদ্ধতি বাঙালী শিল্পীদের শিখিয়ে গেলেন। ১৯২৪ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন হয়ে যখন জাপানে আমি প্রথম যাই তখন Okakura নেই কিন্তু তাঁর ভ্রাতা সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করেন ; ওস্তাদ Taikan ও Kampo Arai নন্দলাল ও আমাকে, তাঁদের অতিথি করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই জাপানের বিখ্যাত চিত্রশালা ও কাঠের block ছাপা জাপানী Prints খুঁজে কিনেছি। কবি Musakoji—রবীন্দ্রনাথের মতন ৭০ পার হয়ে ছবি আঁকা সুরু করেন, তাঁর ঘরে ১৯২৪ সালে এসব আলোচনা করতে তিনি একখানি autograph বই দেখালেন তাতে অবাক হয়ে দেখি গগনেন্দ্র অনীন্দ্রের শুধু নাম সই নয়—তাঁদের তুলির টানগুলিও রয়েছে ! ১৯১১ সালে ৫০ বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে যাই তখন কিনে এসেই কিনেছিলাম দুখানি বই : "ছিন্ন পত্র" (সাধনা যুগের চিঠি পত্র) ও "জীবন-স্মৃতি" যেটি অলঙ্কৃত করেছেন নূতনের সন্ধানী গগনেন্দ্রনাথ (যেন পাকা জাপানী শিল্পীর হেচ্ !) ১৯৩৮ সালে ৭১ বছরে দেহত্যাগ করার আগে তিনি তাঁর বন্ধু Justice Woodroff ও Perey Brown প্রভৃতির সাহায্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীদের সচিত্র Album কিনে আমাদের দেখতে দিতেন। হঠাৎ জাপানী রীতি ছেড়ে গগনেন্দ্র শিল্পে ত্রিকোণমিতি Cubism চিত্রধারা সুরু করলেন : বিলাতী Caricature-কার্টুন আঁকায় তাঁর খুব নিপুণতা ছিল—"বিদ্রূপ-বজ্র" তার সাক্ষী ! তাই বোধায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলায়ও

আমার ছবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটা কথা আছে দেবতারা যেখানে ভয়ে ভয়ে সাবধানে পা ফেলেন, যারা নিজেদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অচেতন তারাই শুধু এরূপ ক্ষেত্রে বেপরোয়া হতে পারে। আমিও কেন যে চিত্রজগতে অনধিকার প্রবেশ করে সেই বেপরোয়াদের দলেই নাম লেখালুম, তার একটা কৈফিয়ত আমার দিক থেকে দেওয়া কর্তব্য। চিত্রশিল্পী হিসেবে এই সাহসের জন্যে আমার কোন কৃতিত্বের দাবি থাকতে পারে না। এরূপ সাহস হচ্ছে অনভিজ্ঞের অজ্ঞতাপ্রসূত সাহস। যেমন কোন যন্ত্রচালিত মানুষ বিপদের রাস্তায় চলেও রক্ষা পায় শুধু এই জন্যে যে বিপদ সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান নেই, আমার পক্ষেও তাই। ছেলেবেলা থেকে যে একমাত্র শিক্ষা আমি পেয়েছি, তা হচ্ছে—চিন্তা ও ভাবের যে ছন্দ, সেই ছন্দের শিক্ষা। তা থেকে আমি এই কথাটা বুঝেছিলাম যে, যা এলোমেলো—যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তার ভিতরে একটা পরিপাটি ছন্দ আনতে পারলেই তবে তার একটা বাস্তব মূল্য হয়—তার বেঁচে থাকার অধিকার জন্মে। অন্যের ছাতের লেখার কাটাকুটিগুলির সামঞ্জস্যহীন কুৎসিত রূপ আমার চোখে পীড়া দিত এবং আমার মনে হোত যেন পাপীদের মতোই তারা মুক্তির জন্যে চিৎকার করছে। তাই প্রায়ই আমি আমার আসল কাজ ফেলে রেখে, ছদ্মবেশে হয়ে এদের নিয়ে বসতাম এবং একটা ছন্দোময় রূপের সংপ্রতায় নিয়ে গিয়ে এদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করতাম। এইভাবে এদের পেছনে বহুদিন সময় ব্যয় করেছি।

এই কাজ করতে করতে আমি একটা সত্য আবিষ্কার করেছি: এই যে অসংখ্য রূপের জগৎ, এখানে অনবরত রেখার ও রেখাঙ্কিত রূপের একটা স্বাভাবিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন চলেছে; যে সব রূপে ও রেখায় একটা সুষ্ঠু ছন্দের প্রবাহ বর্তমান, তারাই শুধু এখানে বাঁচবার অধিকার আছে এবং আমি উপলব্ধি করেছি যে আশ্রয়হীন বিসদৃশের বেকার সমস্যা সমাধান করে তাদের একটা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সম্পূর্ণতায় রূপান্তরিত করাই হচ্ছে সত্যিকারের কলা সৃষ্টি।

আমার ছবি হচ্ছে রেখায় রচিত শ্লোক বা কবিতা। যদি দৈবক্রমে আমার ছবি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে তা শুধু এইজন্যে যে, এর ভিতরে একটা কোনো রূপের ছন্দ প্রকাশ পেয়েছে। এইটেই চরম—এ ছাড়া তার অন্য কোন অর্থ নেই। এতে কোন ঘটনার বর্ণনাও নয় কিংবা কোন ভাবাদর্শের ব্যাখ্যাও নয়—নিছক ছন্দের প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী

রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের Pigalle Galerie-তে। কেবলমাত্র ফ্রান্সে নয়, সারা য়ুরোপে এবং ভারতেও কবির অনুরাগী ব্যক্তিরুন্দ তাঁর নবতম সৃজনী প্রতিভার পরিচয় লাভ করে বিস্মিত হয়েছিলেন।

ঐ বছরেই লণ্ডন, বার্লিন এবং নিউইয়র্কেও তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল।

এরপর ভারতে প্রথম তাঁর চিত্র প্রদর্শনী হয়। রবীন্দ্র-শিল্পগোষ্ঠীর নেতা অবনীন্দ্রনাথের শিল্প অধ্যক্ষ মুকুল দে কলকাতার গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্ট ভবনের একটি প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র জনসমক্ষে প্রদর্শন করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কবিগুরুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ড্রইং, পেন্টিং, এনগ্রেভিং মিলিয়ে মোট ২৬৫ খানি ছবি নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় কলকাতায়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এ তাঁর পরবর্তী চিত্র প্রদর্শনী হয়।

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চারটি পেন্টিং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে UNESCO-র উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আধুনিক চিত্রকলা প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবির সংখ্যা আনুমানিক দু'হাজার। ষাট বছর বয়সে তিনি ছবি আঁকতে সুরু করেন। শিল্পজগতের ইতিহাসে এরকম ঘটনা দ্বিতীয়রহিত।

ছবিতে নাম দেওয়া একেবারে অসম্ভব। তার কারণ আমি কোন বিষয় ভেবে আঁকি নে—দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে, জনক রাজার লাঙ্গলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষত সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি, তারা অনাহূত এসে থাকবে—রেজিষ্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন উপায়ে। জানি রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন তাঁরা অনামীকে নিজেই নাম দান করুন—নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন—২ পৌষ ১৩৩৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোরে আমি পাঠায়েছি মেঘের সোনায়
লেখনীর নটন লেখায়।
নির্ঝরের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কান্নাকাছি,
যে সংসারে হতেছে বিচার
নিন্দা প্রশংসার।
এই সৌন্দর্যের তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা
অমরের উপরে।
অব্যক্ত আছিলি যবে
বিশ্বের বিচিত্র রূপ চলেছিল নানা কলরবে
নানা ছন্দ লয়ে
সৃজনে প্রলয়ে।
অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে
কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।
পথে আমি চলেছিনু। তোর আবেদন
করিল ভেদন
নাস্তিত্বের মহা অন্তরাল
পরশিল মোর ভাল
চুপে চুপে
অর্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্তিরূপে!
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে
আনিয়াছি তোকে।

রবীন্দ্রনাথ

মন তখন ছিল বাতাসে কান পেতে
যে ভাব ধ্বনি খোঁজে তারই খোঁজে
আজকাল আছে সে চোখ মেলে
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে দেখবে বলে—
সে তাকায় আর বলে সংসারটা আকারের মহাযাত্রা!

—রবীন্দ্রনাথ

"আধুনিক" ক্ষেত্রে শিল্প মাথা তুলেছে তাদেরও পণ্ডিতং শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ সেকথা প্রমাণ করেছেন আমার প্রিয় ছাত্র নীরদ চৌধুরী তাঁর সচিত্র ও সারগর্ভ গগনেন্দ্র ঠাকুর প্রবন্ধে।

তাই জোড়াসাঁকোর ধারে দেখি প্রাচীন ও প্রবীণ বহু জাতির বহু রীতির চিত্রকর আসা যাওয়া করেছেন আর সেইখানেই বসে ১৯১০ সালে Royal College-এর অধ্যক্ষ W. Rothenstein (যিনি কবির গীতাঞ্জলী ইংরেজীতে প্রকাশ করেন) রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিকৃতি আঁকেন। তখন তিনি ও কবি কেউ জানতেন না যে—১০ বছরের মধ্যে ১৯৩০-১৯৪০ সালে ৭০ বছরের রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক (Ultra Modern) চিত্র-শৈলী (২০০০ ছবি এঁকে !) প্রবাহিত করে যাবেন : নূতন দৃষ্টি শুধু নয় নূতন মন নিয়ে রবীন্দ্র চিত্র-সম্ভার অবগাহণ করতে হবে ; এ বিষয়ে বিদেশের বহু গুণী তাঁদের মতামত জানিয়েছেন তা কবি-শিল্পী দেহত্যাগের আগে পড়ে গেছেন ; কিন্তু দেশে এই স্বাধীন ভারতে—রবীন্দ্র চিত্রাবলী (গ্রন্থাবলী নয়) সংগ্রহ ও প্রকাশনের ব্যবস্থা আজও ভাল রকম সুরু হয়নি—অবিলম্বে হওয়া দরকার শুধু এইটুকু স্মরণ করাতে চাই। উপযুক্ত শিল্প শ্রীযুক্ত দে তাঁর কলেজে প্রথম Tagore Exhibition সার্থক ভাবে করেছিলেন তাঁর কাছ থেকে অনেক আমরা আশা করি। তিনি "ঠাকুর বাড়ীর", শিল্প-ধারা নিয়ে বড় করে কিছু লিখে গেলে ভবিষ্যৎ যুগের শিল্পীরা তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। দুঃখের কথা যে বাংলার শিল্পপতি শান্তিপ্রসাদ জৈন পরিচালিত Times of India (Annual 1960-61) আধুনিক শিল্পের একছত্র নায়ক বোম্বাই শিল্পীদল এই অপপ্রচার সুরু করে বহুকালের বাঙ্গালী শিল্পীদের নামিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু এর উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ী সেন। তাঁর "বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে।

পিকাসোকে নিয়ে এই কাহিনী।

একবার পিকাসোকে একটি ছবি দেখানো হল এবং তাঁর মতামত চাওয়া হল।

—অত্যন্ত বাজে, বললেন শিল্পী।

আর একটি ছবি এল তৎক্ষণাৎ।

—ইস্ একেবারে রাবিশ, পিকাসো চটপট মন্তব্য করলেন।

শেষ ছবিটি এবার আনা হল শিল্পীর সম্মুখে।

—খারাপ, খুব খারাপ, বললেন শিল্পী।

—আরে এ যে আপনারই আঁকা ছবি, প্রদর্শক বলে উঠল।

তক্ষুনি শিল্পী বলে উঠলেন, ভালো, খুব ভালো এ ছবি, এমন ছবি আর হয় না।

গুরুদেবের চিত্রকলা

নন্দলাল বসু

সাহিত্যে তখন তাঁর জগৎজোড়া সুনাম, ধর্ম-রাজনীতি-সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তাশীল বলে তিনি পরিগণিত, শিক্ষাবিষয়ে তাঁর দুঃসাহসিক নিরীক্ষা দেশবিদেশের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং গানে-গানে তিনি জয় করেছেন জনগণের হৃদয়। ঠিক এই সময়ে গুরুদেব সুরু করলেন ছবি আঁকতে। তাঁর চিত্রকলার অন্তরমহলে যাঁরা প্রবেশ করতে চান, তাঁদের এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

বয়স সত্তরের সীমা ছুঁয়েছে, গুরুদেব হাতে তুলে নিলেন চিত্রকরের তুলি। সাহিত্য-সংগীতের সিদ্ধ শিল্পী তিনি, জেনেছেন সামঞ্জস্য ও নির্বাচনের আন্তরতথ্য এবং গতি ও যতির সার্থক মূল্য। শিল্পের পক্ষে এই গুণগুলি অপরিহার্য, যা (জনৈক ইংরেজ সমালোচকের ভাষায়) 'প্রত্যক্ষ ও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি'-র পরিপোষক, যার সাহায্যে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। নট ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের এই সাধারণীকৃতির ক্ষমতা প্রচুর ছিল। সুতরাং তুলি হাতে নেবার আগেই তিনি শিল্পীর তিনটি অপরিহার্য গুণ আয়ত্ত করেছিলেন – ছন্দের চেতনা, সামঞ্জস্যের চেতনা, আত্মলীনতার চেতনা।

স্রষ্টার মনের আকাশে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত চিন্তার দল ভেসে আসে, একটি সুবিহিত ভাবনায় গাঁথা প'ড়ে তারা আকার নেয়, সুন্দর হয়। মানস বক্তব্য যখন রূপসী হতে চায়, তখন এই গ্রন্থনার ভেতর দিয়েই তাকে আসতে হয়; এর অভাবে ছন্দিত চরণ পরিণত হয় অর্থহীন সশব্দ বাক্যে। আবার, শিল্প-কর্মমাত্রেই নিরুদ্দেশ, তাকে প্রাণদান করে শিল্পীর প্রতিভা। গুরুদেবের চিত্রকলার রূপায়ণের পশ্চাতে সদা-সক্রিয় ছিল শিল্পী-হৃদয়ের ঐ মালাগাঁথা এবং প্রতিভার এই দীপ্ত স্বাক্ষর।

গুরুদেব প্রথম যৌবনে ছবি আঁকার চেষ্টা একবার করেছিলেন। সেসব ছবি, আমার মনে হয়, খুঁজলে এখনও পাওয়া যেতে পারে। তবে পাকাপাকিভাবে ছবির হাতে ধরা দিলেন একেবারে সত্তরের সীমানায় এসে। সকলেই জানেন, কোনরকম অপরিচ্ছন্নতাই তিনি পছন্দ করতেন না, রচনার কোন অংশ কাটতে হলে পরিচ্ছন্নভাবে তার ওপর ঘন করে কালি লেপে দিতেন। ক্রমশঃ দেখলেন—ঐ অবগুণ্ঠিত কাটাকুটিগুলির মধ্যে ছন্দের বেশ একটা আভাস ফুটে উঠছে এবং ওদের এখানে-ওখানে একটু-আধটু কলমের আঁচড় দিলেই সেগুলি আকার নিচ্ছে, ফুল পাখী কিংবা জন্তুর রূপ ধরছে। এইভাবে ছবি আঁকার তাগিদ এল মনের মধ্যে এবং ধীরে ধীরে তা রূপ নিল রীতিমতো চিত্রশিল্পায়নে।

ছন্দ কবিতার সম্পদ, কিন্তু কেবলমাত্র কবিতারই সম্পত্তি নয়। সব শিল্পেরই একটি ক'রে নিজস্ব ছন্দ আছে, যা না থাকলে তারা সার্থক হ'তে পারত না। ছবির যে সৌন্দর্য তাও বিভিন্ন ছন্দের সমীকরণের ফল। প্রয়োজন অনুযায়ী ছন্দের অদলবদল হয়, শিল্পী নতুন নতুন পন্থায় সমন্বয়ের পথ খুঁজে ফেরেন। আত্মপ্রকাশের জন্যে ছন্দের একটি স্বগত শক্তি থাকা দরকার, তা তার প্রাণশক্তি। গুরুদেবের ছবিগুলিতে ছন্দের এই প্রাণশক্তি দুর্মর বলিষ্ঠতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য—ক্রমসহ জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচারিতা, যে জীবন স্থাবিতে জীর্ণ নয়, দুঃগ্রাবণশক্তিতে উজ্জীবিত। তাঁর রেখা ও রঙের বিন্যাসে অবসাদ তাই অনুপস্থিত। এক আশ্চর্য সজীব প্রাণময়তা ছবিগুলির সংজাত গুণ। ভারতীয় শিল্পে এটি তাঁর একটি বিশিষ্ট অবদান।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন, তাকে দেখেছেন নানা রূপে, জেনেছেন নানা রসে। আকারের অন্তরে যে গোপন বিদেহী সত্তা, তাকে তিনি সহজেই ছুঁতে পারতেন। যখনই ছবি আঁকতে বসতেন, অবিচ্ছিন্ন ভাবনা স্বতঃ জন্ম নিত তাঁর মনে, সঙ্গে সঙ্গে 'কলম' চলত সেই অরূপ ভাবকে রেখা-রঙের রূপে অনুবাদ করতে (এখানে 'কলম' শব্দটি সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছি; কারণ গুরুদেব তুলি ব্যবহারই করতেন না, ছবিতে রঙ লাগাতেন প্রায়ই জোলার চাতার কোন দিয়ে)। এইভাবে নিজ শিল্পীর প্রতিভার রূপ আর অরূপ অন্বেষে মিলে গিয়ে সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে।

অনুপাতের প্রচলিত্ব চেতনাও তাঁর ছবির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, যার ফলে সংস্থাপনা ত্রুটিহীন হয়ে উঠেছে। শিল্পগত সামঞ্জস্যের এই আনুপাতিক বিন্যাস কখনও লৌকিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, কখনও বা কলাসমৃদ্ধ আলংকারিক রীতিকে আশ্রয় করে। চিত্রকর যখন হাতী আর ছাগলকে যথাযথ ও পাশাপাশি এঁকে তাদের আনুপাতিক আয়তন বোঝাতে চান, তখন তিনি সাধারণ পদ্ধতিরই অনুসরণ করেন। আলংকারিক রীতিতে অনুপাত যথাযথ থাকে না; কারণ তাঁকে একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার আকারকে রূপ দিতে হয় এবং শিল্পের প্রয়োগগত ঐতিহ্যকে মেনে চলতে হয়। আর চিত্রকর যখন 'গ্রোটেস্ক্' বা অদ্ভুতের রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন তাঁকে এক বিশেষ ধরণের রীতি গ্রহণ করতে হয় এবং আয়তনের অনুপাতকে ইচ্ছে করেই বিকৃত করে দিতে হয়। কারণ তাঁর লক্ষ্য—অদ্ভুত রস সৃষ্টি। গুরুদেবের অনেক ছবি এই গ্রোটেস্ক্-এর বর্ণাঢ্য দৃষ্টান্ত। রঙে-রেখায় এগুলি যেমন অদ্ভুত রসের ব্যঞ্জনা, তেমনি শিল্পসুন্দর সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, এখানেও তাঁর শিল্পী-মানসের বলিষ্ঠতা, জীবননিষ্ঠা এবং অনুপাত-সামঞ্জস্যের সর্বাঙ্গীন চেতনা বিদ্যমান।

গুরুদেবের চিত্রকলা, তার রীতি সবই তাঁর নিজস্ব, তবু তা ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুগত। আমাদের ধ্রুপদী সাহিত্যে ধ্বনিব্যঞ্জনাই মুখ্য, শব্দ ও অর্থের স্থান গৌণ; আমাদের ধ্রুপদী শিল্পেও রেখা ও রঙের স্থান দ্বিতীয়, ছন্দ সুষমার রসের ব্যঞ্জনা আনাই তার মৌল লক্ষ্য। পাশ্চাত্য দেশে আর্টের সৃষ্টি হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে, এবং অনুপাতের সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা হয় গাণিতিক নির্ভুলতায়। পাশ্চাত্যের চিত্র আলো-ছায়ার মায়ায় তিন মাত্রার। ভারতীয় কলার রাজ্যে দুমাত্রার ছবিই বেশি! গুরুদেবের অঙ্কনপদ্ধতি এই দ্বিমাত্রিক ধারার।

অন্যত্র আমি বলেছিলাম, 'গুরুদেবের ছবি বস্তুর অনুকৃতি না হয়েও বাস্তব'। কথাটা বোধ হয় একটু পরিষ্কার করা দরকার। পাশ্চাত্যের চিত্রকর আঁকার বিষয়টিকে নির্ভুলভাবে রূপ দেন। কিন্তু তথ্যের মূলে যে সত্য আছে, তাকে ধরিয়ে না দিলে তো শিল্প হয় না। ত্রুটিহীন কৌশলে, নির্ভুল বিন্যাসে এবং শারীর সংস্থানের যথাযথ অনুপাত বজায় রেখে একটি সিংহের ছবি আঁকা হল; কিন্তু শরীরের জন্তু সিংহ তো সিংহ নয়, তার 'সিংহত্ব' রাজসিকতা-শক্তি-নির্ভয়তার সমাহারে। এগুলিই যদি প্রকাশ না করা গেল, তবে ছবিটি সিংহের বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি হয়েও শিল্প হল না। প্রাচ্য শিল্পী ঐ 'সিংহত্বের ভাব'টিকেই রূপ দিতে চান, তার অবয়ব-সংস্থানকে নয়। তাঁর আঁকা সিংহ বাস্তবের অনুকৃতি না হতে পারে। তবু তা সিংহেরই ছবি বলে মনে হবে। গুরুদেবের ছবিও এই জাতের—দেহের প্রতিকৃতিমাত্র নয়, অমূর্ত ভাবের দ্যোতক। অনেক শ্রম এবং অনুশীলন করে তবেই শিল্পী দেহের অন্তরালে এই বৈদেহী ভাবকে অনুভব ও প্রকাশ করতে পারেন। আগেই বলেছি, প্রাক্-চিত্রকলা পর্বে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও বিমূর্ত ভাবকে স্বগত করেছিলেন, সেই অধিকারনামা তাঁর ছবিতেও। এই দিক থেকেই তাঁর চিত্রকলাকে আমি বলেছিলাম—বস্তুর অনুকৃতি না হয়েও একান্ত বাস্তব।

চিত্রশিল্পের পাঁচটি অঙ্গ, সব মিলে তার অখণ্ড রূপ : ভাব—কারুশৈলী—সুষম সমতা—প্রয়োগ-পদ্ধতি—জীবনমত্তা। বিচারের প্রয়োজনে এদের বিশ্লিষ্ট করে নিতে হয়; ছবিতে এরা এমনভাবে পরস্পর মিলে-মিশে থাকে, এদের কার যে কোথায় সুরু আর কার যে কোথায় শেষ, তা ধরা বা বলা যায় না। শিল্পীর মনে প্রথমে একটি ভাব জাগে, তারপর তিনি তাকে রূপ দিতে বসেন। সব দেশেই শিল্পায়নের এই রীতি। কিন্তু গুরুদেব প্রথমেই আরম্ভ করতেন রূপ দিয়ে, তাঁর কল্পনালোকে ভাব তখনও অনাগত; দেখলে মনে হত, তিনি বোধহয় স্থাপত্যের কোন আল্পনা নিয়ে খেলা করছেন, কিংবা রঙ মেলাবার পরীক্ষায় মেতেছেন; কিন্তু যখন শেষ করলেন, দেখা গেল—সমস্ত রচনাটি একটি সুস্পষ্ট আকার নিয়েছে। প্রাণ পেয়েছে। এক আশ্চর্য শিল্প হয়ে উঠেছে। অনুশীলন তিনি কোনদিন করেন নি। প্রয়োজনীয় রীতি কৌশলের ধার দিয়েও যান নি; অথচ যা সৃষ্টি করেছেন, তা কোনমতেই অবাস্তব খেয়ালখুশি হয় নি। একমাত্র তাঁর পক্ষেই এমনটি সম্ভব ছিল। বিষয়কে তিনি অবহেলা করেন নি, তাকে অতি প্রাধান্যও দেন নি। আবার ছবি আঁকতে-আঁকতে শিল্পীর চিত্তে যে ভাব-রসের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, তাও তিনি সমভাবে আস্বাদন করেছেন।

গুরুদেব একবার আমাকে বলেছিলেন : সত্যের অন্তরে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে, যা অমোঘ সুচিরস্থায়ী। অপ্রাকৃত তার অভিনবত্বের মন্ত্রে আমাদের মনকে টানে বটে, কিন্তু তার মধ্যে সত্য যদি না থাকে, তবে সেই মোহ স্বল্পায়ু হয়। গুরুদেবের অদ্ভুত রসাত্মক ছবিগুলি যে আমাদের মনোহরণ করে এবং কালপ্রবাহেও যে তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে না গিয়ে বেড়েই চলেছে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে—ওগুলির মধ্যে সত্য আছে। সে সত্য বস্তুর অনুকৃতি বা বৈজ্ঞানিক পরিমিতিবোধে নয়, সজীবতায় ও রসতায়, যা প্রাচ্য শিল্পীর স্বধর্ম।

আমাদের প্রাচীন চিত্রলিপির বর্ণোজ্জ্বলতা আজও অম্লান, পশ্চিমের চিত্রলেখার মতো ধূসর নয়। গুরুদেবও তরল উজ্জ্বল আর্দ্রাংশ রঙ পছন্দ করতেন। ইউরোপের চোখ তাঁর ছবির এই উজ্জ্বল গাঢ়তায় মুগ্ধ হয়েছিল। পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ও সমৃদ্ধ বর্ণজ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল সুষম বর্ণ-বিন্যাসের শিল্পচেতনা। রঙ মেলানোর ক্ষেত্রে কখনও কখনও তিনি দুঃসাহসেরও পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন বোধের দুটি গাঢ় রঙকে (গাঢ় নীল ও গাঢ়তর কালো) পাশাপাশি এনেছেন। এবং ; সেখানেও প্রয়োগ এতো নিখুঁত হয়েছে যে, দুয়ে মিলে এক অপরূপ সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে।

অপ্রসাধন এবং প্রকাশের বলিষ্ঠতার জন্যে গুরুদেবের ছবিকে আদিম শিল্পের স্বজাতি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শ্রেণীর দিক থেকে ওগুলি আধুনিক ও বুদ্ধিজীবিত। তাঁর শিল্পসৃষ্টির মূলে যে জীবনায়ন সক্রিয় ছিল, তা একালীন সংস্কৃতি, রুচি ও মননে সঞ্জীবিত, আদিমতার স্পর্শ বা আভাস তাকে দিয়েছে বলিষ্ঠ শক্তিমত্তা।

গুরুদেবের স্বরচিত ভাষ্য তাঁর চিত্রকলা অনুধাবনের সবচেয়ে বড়ো সহায়ক। চিত্রলিপির ভূমিকায় তিনি বলেছেন : "লোকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, আমার ছবির অর্থ কী। আমার ছবিরা যদি এর উত্তর না দিয়ে থাকে, তবে আমিও নিরুত্তর। ওদের সার্থকতা প্রকাশে, অর্থবহনে নয়, ওদের পিছনে কোন চিন্তনীয় বক্তব্যও লুকিয়ে নেই। ওদের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সেইটুকুর কোন মূল্য যদি থেকে থাকে, তবেই ওরা টিঁকবে; নইলে, ভেতরে যতোই নীতিবাগীশ বা বৈজ্ঞানিক সত্য থাক না কেন, ওরা সহজেই বাতিল হয়ে যাবে, চলে যাবে বিস্মৃতির অগম পারে।

[অনুবাদ : গুরুদাস ভট্টাচার্য

ষোড়শ বর্ষ

মাঘ

অষ্টম সংখ্যা

১৩৬৭

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প-ভারতীর সঙ্গে উপেনদার স্মৃতি চিরদিন জড়িত থাকবে। তাঁকে এক বছর হল (৩০শে জানুয়ারী ১৯৬০) আমরা হারিয়েছি। কিন্তু বন্ধুবর শ্রীসতোন্দ্রলালের সঙ্গে আমরা ভূতপূর্ব সম্পাদক ও আমাদের একান্ত প্রিয় উপেনদাকে সর্বদা স্মরণ করি। গল্প-ভারতীর সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ একান্ত ও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর মহাপ্রয়াণ দিবসে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মাহুতি

এবার ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে গিয়ে মনে পড়ল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালে এই আম্রকুঞ্জে গান্ধীজী ও কস্তুরবাঈকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। দুজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষ ছবিখানি শতাব্দী উৎসবে দেখবার মত। ১৯১৫ সালের বসন্তে তাঁরা ছাত্র, ছাত্রী ও বৃহৎ পরিবার নিয়ে গুরুদেবের আশ্রমে আশ্রয় নেন সেকথা গান্ধীজী সর্বদা স্মরণ করতেন এবং প্রাণস্পর্শী ভাষায় Golden Book of Tagore গ্রন্থের উদ্বোধনী লিপিতে সে কথা উল্লেখ করেন। বিশ্বভারতীর অর্থসঙ্কট যে গান্ধীশিষ্য পণ্ডিত নেহেরু সক্রিয়ভাবে দূর করার জন্য চেষ্টা করছেন তাঁর মূলেও গুরুদেবের প্রতি গান্ধীজীর নিষ্ঠা।

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে।
একলা চল একলা চল একলা চলরে।"

গান্ধীজীর অতিপ্রিয় এই রবীন্দ্র সঙ্গীত যেন বাঙলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত সর্বত্র ছেলেমেয়েদের শেখান হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ৯৯ তম জন্মদিবস

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছি তিনি একদিকে রবীন্দ্রনাথের আজীবন সমবয়সী ও নরেন্দ্রদত্ত (বিবেকানন্দের) সহপাঠী। তখন হেদুয়া পুকুরের ধারে ছিল Duff সাহেবের গির্জা (যেখানে নির্ভীক রামমোহন Bible ক্লাশ খুলতে উৎসাহ দেন (১৮৩০) এবং General Assembly কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

এই কলেজের অধ্যাপক দার্শনিক Dr. Hastie তাঁর মনীষী ছাত্র নরেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রকে সমাধির তাৎপর্য বোঝাতে প্রথম সন্ধান দেন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের। ১৮৮০-১৮৮৪ এই চার বছর দুটি বন্ধু ওখানে পড়েন। নরেন্দ্র ১৮৮৩ ও ব্রজেন্দ্র ১৮৮৪ সালে সম্মান অর্থাৎ কলেজে B. A. পরীক্ষা শেষ করেন—একজন ২১ আর অন্যজন ২০ বছর বয়সে। তখনই তাঁরা কি উদার চিন্তাধারা ও পাঠক্রম গড়েছেন তার সন্ধান এখনও সুরু হয়নি। অথচ রবীন্দ্রনাথের পরই এঁদের শতাব্দী উৎসবও আমাদেরই করতে হবে।

১৮৮৫ সালে জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেসের) জন্ম ও ১৮৮৪ সালে (কেশব সেনের মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাব।

১৮৯৩ সালে যখন স্বামী বিবেকানন্দরূপে নরেন্দ্রনাথ দত্ত শিকাগো পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ান্স ধর্মমহাসম্মেলনে ভারতের চিরন্তন বাণী—অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করেছেন তখন তাঁর সতীর্থ অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিরাট পাশ্চাত্য দর্শন শেষ করে ভারতীয় দর্শন মূল সংস্কৃতাদি ভাষা পাঠ সুরু করেন। পরবর্তীকালে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তুলনামূলক দর্শনের (Comparative Philosophy) প্রবর্তক হয়ে ওঠেন। ১৮৯৯ সালে যখন বিবেকানন্দ শেষ বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন—তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। কুচবিহার রাজের আনুকূল্যে বিবেকানন্দ রোমে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে 'বৈদিক ও খৃষ্ট ধর্মের' তুলনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করে সবাইকে চমৎকৃত করেন। এই সময় রোম, প্যারিস ও ফ্লোরেন্স নগরী দেখে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে গভীর ও তথ্যপূর্ণ আলোচনায় ধনড়া Dawn পত্রিকায় ছাপেন ডাঃ শীলের সেই বিস্মৃতপ্রায় অথচ বহুমূল্য রচনা আমার Greater India গ্রন্থে ছেপেছি।

দীর্ঘ তিন বৎসর আমেরিকা ও ইউরোপে বেদান্ত তথা ভারত সংস্কৃতি প্রচারের পর স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের আনন্দ ও উৎসাহে জন্মস্থান কলকাতায় ফিরে আসেন। সেই সময় হেদুয়ার কাছে তাঁর পৈত্রিক বাসভূমিতে তাঁর দুই ভ্রাতা মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র দত্ত বাস করছেন। তিনি যেমন তাঁদের বিলাত ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন সেই রকম দক্ষিণেশ্বরে গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে "মিশন" কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৮৯৭ সালে বেলুড়ে যে বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বামীজী মাত্র ৩৯ বছরেই নরদেহ ত্যাগ করে ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই অমরধামে গমন করেন। শেষবার বিশ্বভ্রমণের পর যখন বাঙালী যুব দল ভক্তিভরে তাঁর গাড়ীর ঘোড়া খুলে রিপণ কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভবনে বিবেকানন্দ সম্বর্ধনা করেন, সেই ঘটনার সাক্ষ্য দেবার মত দু'চার জন এখনও জীবিত আছেন। প্রবুদ্ধের সাংবাদিকপ্রবর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁদের অন্যতম। শ্রীকুমুদবন্ধু সেন তথা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে ও বিবেকানন্দের বেলুড়ে দেহত্যাগের তথ্য আমরা শুনেছি—তাই মহেন্দ্র গুপ্তের "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" ও সারদানন্দের "লীলা প্রসঙ্গ" থেকে সুরু করে, ভগ্নী নিবেদিতার গ্রন্থ "My Master As I saw Him" গ্রন্থাদির ভৌগোলিক তথা ঐতিহাসিক টীকাভাষ্য বর্ণনায় যুবদলকে অগ্রণী হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাত্র ৫০।৬০ বছর আগে এই বাংলাদেশে বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল, সেজন্য আমরা ধন্য। অদ্বৈতাশ্রম প্রকাশিত Collected Works ছাড়া আরও অনুসন্ধান ও আবিষ্কার আছে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন শিষ্যা Sister Christine (ভগ্নী নিবেদিতার সহকর্মিনী) ও শ্রীমতী বার্ক (যিনি অখ্যাত মার্কিন কাগজপত্র ঘেঁটে এক বিরাট গ্রন্থ লিখে আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন)। প্রাথমিক

তথাদৃষ্ট সেই অধ্যাত্মসম্পদ মণ্ডিত ইতিহাস ও গল্প কেউ পাঠালে আমরা গল্প ভারতীতে তা ছাপাতে চেষ্টা করব। সাহিত্যিক বিবেকানন্দ, দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ, ১৮৯২-১৯০২ এই শেষ দশ বছরের বিবরণ সংগ্রহ করে পূর্ব ও পশ্চিমের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ বহু পরিশ্রমে বিবেকানন্দ রচনাবলী প্রকাশ করিয়েছেন কিন্তু এখনও (বাংলায় অনূদিত হয়নি এমন বহু জ্ঞাতব্য তথ্য) বহু রচনা অপ্রকাশিত আছে। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ অর্থাৎ নিবেদিতার জন্ম শতাব্দী কাল পর্যন্ত এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভাব দিয়ে সাধারণ নরনারীদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এ বিষয়ে পূর্বে কিছু লিখেছি। আজ গল্প-ভারতীর মাধ্যমে একান্ত অনুরোধ জানালাম।

নেতাজী সুভাষ স্মরণে—

সুভাষচন্দ্রের কন্যা কল্যাণীয়া অনীতা শুধু মুখশ্রীতে নয় অন্তরের দীপ্তিতে তার পিতৃভূমি এই বাঙলার মেয়ে হয়ে গেছে। শুধু সভাসমিতিতে নয় ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে মেলার ভিড়ে তাকে বাঙালী মেয়ের মত লুটোপুটি করতে দেখেছি। আবার গড়িয়া গ্রামে সাধারণের মধ্যেও তাকে সহজভাবেই মিশতে দেখলাম। কটকে সুভাষ যে গৃহে জন্মান—সেখানে গিয়েও অনীতা পিতাকে স্মরণ করেছে; তাকে দেশবাসীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশাকরি সরকারী সহযোগিতায় অনীতা ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত স্মরণীয় ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করতে পারবে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজীর জীবনী এখনো লেখা হয়নি, কিন্তু সে অসমাপ্ত কাজ বাঙালী ছেলেমেয়েদেরই শেষ করতে হবে। ১৯৪২'এর বিপ্লবে ও ভারত-ছাড় (Quit India) আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী ও দেশের প্রায় সব নেতারাই বন্দী হলেন। সেই সময় বীর সুভাষচন্দ্র কি ভাবে তার মধ্যে আফগান ও রুশদেশ পেরিয়ে জার্মানী পৌঁছলেন Axis সাবমেরিনে চেপে ইতালীয় বন্ধুদের সাহায্যে মালয়ে নামলেন—আজাদ হিন্দ ফৌজ সেখানে গঠন করলেন—এ সবই যেন রূপকথার মত শোনায়। যুদ্ধের পরে জাপানে গিয়ে নেতাজীর বিষয়ে খোঁজখবর করেছি ও ফেরার পথে ইন্দোনেশিয়া ও মালয় প্রবাসী বহু ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে (১৯৪২-৪৫ সালে) নেতাজীর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও নেতৃত্বের প্রত্যক্ষদর্শী।

বাংলার কৃতী ছাত্র তিনি, I. C. S. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রেরণায়—চাকুরী পরিত্যাগ করে দেশসেবার মহাব্রত গ্রহণ করেন। বহুবার কারাবরণের ফলে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হলেও সুভাষচন্দ্র অবিচলিত নিষ্ঠা ও অনন্যসাধারণ কর্মশক্তির সাহায্যে দেশের স্বাধীনতার সাধনা করে গেছেন—দু'দুবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে নিখিল ভারতীয় সম্মান লাভ করেছেন। পরিশেষে কংগ্রেসকর্মীদের প্রতিকূলতা ও ইংরেজের কোপদৃষ্টি এড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে যে সব অসাধ্যসাধন তিনি করেছেন সেজন্য তিনিই একমাত্র নেতাজী নামে বন্দিত হয়েছেন; সে শুধু বাঙালীর নয় ভারতেরই গৌরব। সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর শুভ জন্মদিনে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম বিশেষ করে কাশ্মীর ও হিমালয় সীমান্ত যখন বিপন্ন তখন তাঁর কথা বিশেষভাবে মনে হয়।

তাই স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছা করি যে এই সঙ্কট মুহূর্তে নেতাজীর আদর্শে তরুণ দল এক বিরাট দেশরক্ষা পরিষদ—Netaji Academy গড়ে তুলুক।

চট্টোপাধ্যায় নারায়ণ

বিজ্ঞান বার্তা

সত্যজিৎ

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

প্রতি বছর নভেম্বর মাসে একটি ঘোষণার জন্যে সারা বিশ্বের বিদগ্ধসমাজ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকেন। সেই বিশেষ ঘোষণাটি হচ্ছে, সাহিত্য বিজ্ঞান ও শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শান্তি কার্যে অনন্যসাধারণ অবদানের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কাররূপে নোবেল পুরস্কার সমগ্র বিশ্বে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কারের জনক আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের তিরোভাব দিবসে এই পুরস্কার বিতরণ করা হয় সুইডেনের রাজধানী স্টকহোলমের কনসার্ট হল-এ।

ডিনামাইট আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেল তাঁর ব্যবসাসঞ্চিত প্রভূত সম্পত্তি উইল করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে দান করে যান। এই সম্পত্তির সুদ থেকে প্রতি বছর সাহিত্য, পদার্থ বিদ্যা রসায়ন-বিদ্যা, শারীর ও ভেষজ বিদ্যা এবং শান্তির জন্যে পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হয়। পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানে পুরস্কার ঘোষণার অধিকার আছে ষ্টকহোলমের রয়াল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এর এবং সাহিত্যে সুইডেনের অ্যাকাডেমি অফ লেটার্স-এর, শরীর ও ভেষজ বিজ্ঞানে ষ্টকহোলমের ক্যারোলিন্‌স্কা ইন্‌স্টিটিউট-এর এবং শান্তির পুরস্কার ঘোষণার অধিকার নরওয়ে পার্লামেন্টের একটি কমিটির। জাতিধর্মনির্বিশেষে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর পাঁচটি বিষয়ে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য শান্তির পুরস্কার কোন কোন বছর দেওয়া হয় না (যেমন এই বছর শান্তির জন্যে কাউকে পুরস্কার দেওয়া হয় নি)। বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক বিজ্ঞানীকে যুক্তভাবে দেওয়া হয়, তবে কোন ক্ষেত্রেই তিনজনের বেশী লোকের মধ্যে এই পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হয় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা অনুসন্ধানের সাফল্য একক প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে একাধিক বিজ্ঞানীর যৌথ প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন গবেষণাগারে একাধিক বিজ্ঞানী যে গবেষণায় ব্যাপৃত তার মধ্যে অনেক সময় একটা সহধর্মিতা ও পরস্পর নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এই বিবেচনায় বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অনেক সময় যৌথভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। এ বছরও (১৯৬০) শরীর ও ভেষজ বিজ্ঞানের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যুক্তভাবে দুজন বিজ্ঞানীকে।

বিজ্ঞানে যে দেশের লোক যতবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সেই দেশ বিজ্ঞান গবেষণায় তত উন্নত বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। নোবেল পুরস্কারের তালিকায় জার্মানী এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। এশিয়ার মাত্র চারজন বিজ্ঞানী এই দুর্লভ পুরস্কারলাভ করেছেন—ভারতের অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, জাপানের অধ্যাপক হিদেকী যুকাওয়া এবং চীনের ডঃ সুং দাও লী ও চেন নিং ইয়াং (যদিও তাঁরা মার্কিন প্রবাসী তবু আমরা তাঁদের জাপানী ও চীনা পদার্থবিদ বলেই জানি)।

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

সব ধর্মই সত্য অতএব বিদ্বেষ ভাল নয়। আন্তরিক হলে সকল ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তেরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান খ্রীষ্টানরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে।

বৈষ্ণব বলে—আমাদের কৃষ্ণকে না ভজলে কিছু হবে না, শাক্তরা বলে—আমাদের ভগবতী একমাত্র উদ্ধারকর্তা—তাঁকে না ভজলে কিছুই হবে না। খ্রীষ্টানরা বলে—আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম না মানলে কিছুই হবে না। এসব মনুষ্যের বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্মই ঠিক, আমি যা বলছি তাই সত্য, আর সকলের মত মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ।

• • •

সকল ধর্মাবলম্বীই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করছে, কেউ তাঁকে ডাকছে—ঈশ্বর জগৎপিতা বলে, কেউ রাম বলে, কেউ কৃষ্ণ বা হরিনাম বলে, কেউ বা আল্লা বলে, কেউ মা-কালী, শিব, দুর্গা ইত্যাদি নামে। নাম ভিন্ন; কিন্তু ঈশ্বর এক।

• • •

ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জীব জগৎ, ঘর বাড়ী দ্বার, ছেলে পিলে—এসব বাজীকরের ভেল্কী। বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে, লাগ ভেল্কী, লাগ! ঢাকা খুলে দেখ, কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল। কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য, এই আছে, এই নাই।

• • •

বাজীকর আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য। তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত। যখন চণ্ডী শুনতাম, তখন ঐটি বোধ হয়েছিল। এই শুম্ভ, নিশুম্ভের জন্ম হল। আবার কিছুক্ষণ পরে শুনলাম, বিনাশ হয়ে গেল।

কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী আছেন কাছে। এমন সময় একটা ভারী শব্দ হল।
নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর এ কিসের শব্দ?
শিব বললেন, রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই এ শব্দ।
খানিক পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হল।
নন্দী জিজ্ঞেস করলে, ঠাকুর, এবার কিসের শব্দ?
শিব হেসে বললেন, এবার রাবণ বধ হল।

সুখ

তারাশঙ্কর রায়

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মালা যেখানে গেছে সেখান থেকে শুধু হাতে ফিরে আসার জন্যে যায়নি। গেছে মুক্তা করার জন্য সোনার শুকপাখী আনতে। মাসীমা এ কথা জানতেন না। তাই দিন কয়েক যেতে না যেতেই অধীর হলেন। বলতে লাগলেন, "ওর ফিরতে অত দেরী হচ্ছে কেন? আমি তো ভেবেছিলুম যাবে আর আসবে। দেখবার কী আছে ওই বাজাল দেশের অজ পাড়াগাঁয়ে? নোয়াখালী যে কোথায় তাই আমি জানিনে।"

আমিও কি জানি। ঢাকার কাছাকাছি কোথাও হবে। বোধহয় আসামের দিকে। পাহাড় আছে নিশ্চয়। নইলে মালা কেন যায় মায়াপাহাড়ের খোঁজে? একটু রহস্যময় করে বলি, "দেখবার কিছু আছে বইকি। সাধে কি অত লোক ওখানে ছুটেছে! ভারতের সব অঞ্চল থেকে যাত্রীর ভিড়। যেন রূপকথার রাজপুত্রের মিছিল। রাজপুত্রের দুয়োরাণে রাজকন্যাও।"

বলতে ভুলে গেছি মনোরমা ও মালা দু'জনেরই পরণে ছিল সালোয়ার কামিজ!

সোমনাথ বলে সেই যে সোনার চাঁদ ছেলেটি সে সত্যি অনেক দিন অপেক্ষা করেছিল। শেষে হতাশ হয়ে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে দেশান্তরী হলো। মাসীমা আক্ষেপ করে বলেন, "এ দুঃখ ভোলবার নয়।"

কেমন করে তাঁকে বলি যে তাঁর কাছে যেটা দুঃখ আমার কাছে সেইটেই সুখ! মালা যদি বিয়ে করত, যদি বিলেত চলে যেত, যদি ও দেশে বসবাস করত আমি তাকে সব রকমে হারাতুম। সোমনাথ এমন কিছু হারায়নি। সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। মালার বদলে বীণা কিছু মন্দ মনোমোহন নয়।

বিয়েতে আমিও যোগ দিয়েছিলাম। বীণাকে আমার ভালোই লেগেছিল। সোমনাথকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলুম। তার মাকেও বলেছিলুম, "আপনি কেবল রত্নগর্ভা নন, রত্নভদ্র। সোমনাথের সঙ্গে খাসা মানিয়েছে। রতনে রতন চেনে।"

মালা পৌঁছনোর খবর দিয়ে তার করেছিল। চিঠিও লিখেছিল। মাসিমা আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন। চিঠিতে ছিল, "মা মণি, তোমার মালা যেখানেই থাকুক তোমার কোলেই আছে। আর তার বাবার চোখের তলেই। আমার জন্যে ভেবো না। আমাকে পরের জন্যে ভাবতে দাও। পরকে যাতে আমি আপন করতে পারি।"

আমাকেও তার মনে ছিল। আশ্চর্য! আমার নামেও একদিন একখানা চিঠি এলো। পড়ে দেখি লিখেছে, "বিচারের সময় পরে। এখন ভালবাসার সময়। ভালোবাসলে নির্বিচারে ভালোবাসতে হবে। পাপীকেও। অপরাধীকেও। রাক্ষসকেও। তা যদি না পারি তবে আমরাই কেল। যাদের পাপী ভাবছি, অপরাধী ভাবছি, রাক্ষস ভাবছি তারাও তো মানুষ। তাদেরও তো মা বোন আছে। মা বোনের ইজ্জত তাদের কাছেও তো দামী। তাদেরও তো বাপ ভাই আছে। বাপ ভাইয়ের প্রাণ তাদের কাছেও তো দামী। তারা স্বভাবদুর্বৃত্ত নয়। সৎ চাষী। সৎ কারিগর, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খায়।

ঈশ্বরকে ভয় করে। মানুষের সঙ্গে রকমারি সম্পর্ক পাতায়। কেন তবে পাগল হলো? এক এক জন এক এক উত্তর দেন। আমি শুনে যাই। সরল কথাটা হলো, মানুষে মানুষে ভেদ নেই। ভেদবুদ্ধিটাই সবচেয়ে দোষের। তার থেকেই যাবতীয় দোষের উৎপত্তি।"

আমার তখন ক্রোধে অন্তরাত্মা জ্বলছে। এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা এসে আমাকে আরো রাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, মুসলমানরা নাকি আমাদের ব্রাদার'। তা শুনে আমি ঁাঁজের সঙ্গে জবাব দিয়েছি, "হুঁ। ব্রাদার'-ইন-ল।" তখন খেয়াল হয়নি যে কথাটা দুধারে কাটে। পরে খেয়াল হলে অনে পুড়ে মরি। বিদেশিনী ছবি কিনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। নইলে বুঝিয়ে বলতুম ব্রাদার-ইন-ল কোন অর্থে।

মালার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা ছিল। করতে সাহস হলো না। সে কি এইজন্যেই নোয়াখালী গেছে যে বর্বরকেও, বন্যকেও নির্বিচারে ভালোবাসতে হবে? তা হলে নাটশীদেরও ভালোবাসতে হয়। অসম্ভব। ওর চেয়ে সাপকেও ভালোবাসা সহজ। গান্ধীজীর অহিংসাময়ে কালসাপও বশ মানতে পারে কিন্তু নোয়াখালীর ওইসব নারীধর্ষক! অবিশ্বাস্য। ওদের জন্যে চাই মার্শাল ল। কোর্ট মার্শাল। সরাসরি ফাঁসী।

মালাকে এসব কথা লিখিনে। লিখি, "ভুলে যেয়ো না যে তুমি আনতে গেছ মুক্তা বরার জন্য সোনার শুকপাখী। গান্ধীজীকে ছেড়ে দাও গান্ধীজীর কাজ। তাঁর কাজ তাঁর। তোমার কাজ তোমার।"

আমার মুসলমান সুহৃদ্‌দের সঙ্গে আমার ব্যবধান প্রতিদিন বেড়ে চলেছিল। তখন খেয়াল হয়নি যে ব্যবধান যদি বাড়তে বাড়তে অলঙ্ঘনীয় হয় তবে পায়ের তলার মাটি ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায়, মাঝখানে দেখা যায় ভাদ্রমাসের পদ্মা। পনেরোই আগস্ট এলো। আমার শিল্পীবন্ধুদের একদলকে বসিয়ে দিল, কলকাতায়, একদলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঢাকায়। তার পর থেকে অবিরল চোখের জল ফেলছি। কিন্তু সে কথা পরে। ডিসেম্বর মাসে কে জানত আগস্ট মাসে কী আসছে।

মালা সেই যে আমাকে চিঠি লিখল তার পর একেবারে নীরব। বোধ হয় আমার চিঠির সুর তার ভালো লাগেনি।

প্যারিসে গিয়ে আধুনিকতম চিত্রকরদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবার জন্যে আমার প্রাণ কবে থেকে আকুল। যাইনি, তার কারণ প্রধানতঃ মালাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন কর্তব্যবোধ। আরো কারণ ছিল। আমি একান্তভাবে চেষ্টা করছিলুম আমার ভারতীয় পূর্বসূরীদের সঙ্গেও পা মিলিয়ে নিতে। এ এক দুঃসাধ্য কসরৎ। এক পা মেলাতে হবে ইউরোপীয় আধুনিকের সঙ্গে। আরেক পা মেলাতে হবে ভারতীয় অতীতের সঙ্গে। এ যেন দুই নৌকায় পা রেখে টাল সামলে চলা।

এখন মালা নেই। কবে ফিরবে কে জানে! ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে প্যারিস ঘুরে আসা যায়। ওই সোমনাথের সঙ্গেই এক জাহাজে ভাসতে পারা যেতো। ইচ্ছাটাকে দমন করতে হলো। ভারতেরই খাতিরে। দাঙ্গাহাঙ্গামার দ্বারা নির্ণীত হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের সংজ্ঞা। অনেকের বিশ্বাস ভারতবর্ষ মুসলমানদের দেশ নয়, যেমন ইংরেজের দেশ নয়। তার ঐতিহ্য মুসলমানের নয়, যেমন ইংরেজের নয়। এরা মেঘের মতো উড়ে এসেছে, জল বর্ষণ করেছে, ফুরিয়ে গেছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব আছে ও থাকবে। অর্থনীতি ক্ষেত্রেও। কিন্তু জাতীয় সত্তায় বা জাতীয় চেতনায় এদের স্থান বহমান নয়। আমরা যদি সত্যিকার মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গ চাই ইরানে যাব, সীরিয়ায় যাব। যদি সত্যিকার ইউরোপীয়

সংস্কৃতির সংসর্গ চাই প্যারিসে যাব, রোমে যাব। কিন্তু এদেশের মুসলমান বা ইউরোপীয়ের কাছে যাওয়া বৃথা। এরা ঘুরিয়ে গেছে।

আমার নিজের বিশ্বাস অবশ্য ঠিক তা নয়। আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অবক্ষয় উপস্থিত হয়েছিল। তাই মুসলমানকে তার প্রয়োজন ছিল যৌবনের জন্যে। যখন নিয়ে এলো যৌবন। আগেও একবার এনেছিল মুসলমানরূপে নয়, গ্রীকরূপে। পরেও আবার নিয়ে এলো ইংরেজ রূপে। যৌবন বার বার এসেছে। অবক্ষয় বার বার প্রতিহত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জা ভারতবর্ষেরই। একে হিন্দু বললে অবক্ষয়কেই সনাতন বলা হয়। কারণ অবক্ষয়ের পূর্বে এর নাম হিন্দু ছিল না। এর রূপও হিন্দু ছিল না। অতএব সঙ্গে এর মিল কোথায়? যা সনাতন তা হিন্দু নয়। যা হিন্দু তা সনাতন নয়। হিন্দু মুসলমানের লড়াইটা ভূতের সঙ্গে ভূতের লড়াই। হিন্দুর মতো মুসলমানেরও অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই। থাকলে নিতান্তই স্থূল অর্থে! স্থূলের দ্বারা সূক্ষ্ম সৃষ্টি হয় না। আর্ট হচ্ছে সৃষ্টি। কিন্তু ভবিষ্যৎ আছে ভারত আত্মার। যদি তার সংস্কারমুক্তি ঘটে। যদি সে দশভুজার মতো দশদিকে দশ হাত বাড়ায়। পূর্ব পশ্চিম জ্ঞান না রাখে। হিন্দু মুসলমান জ্ঞান না রাখে।

মেজোমশায়ও ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিলেন। বাইরে যদিও শান্ত সমাহিত। মালার জন্যে অবশ্য। তবে শুধু মালার জন্যে নয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "পঞ্চাশ বছর বয়সের পর মানুষ বাঁচে তার কাজের জন্যে। তার কাজ থেকে তাকে বঞ্চিত কর। দেখবে সে বেঁচে নেই। বেঁচে আছে তার শরীরটা।"

বাস্তবিক কী নিয়ে তিনি থাকবেন। চাকরি তো করবেন না। নিজের বাড়ীতে বসে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা? তারও তো প্রবাহ রুদ্ধ। কবে দেশের সুদিন ফিরবে! পার্ক সার্কাসে ফিরে যাবেন তিনি। স্থানটি কত কাছে অথচ কত দূরে! দিনটিও কত কাছে অথচ কত দূরে!

বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেই মাসিমা বলে ওঠেন, "কেপেছ? ভাড়া ক'যার বেলতলায় যায়? শান্তিপ্রতিষ্ঠা হোক আগে। করবে ইংরেজ। যদি রাজত্ব রাখতে চায়।"

আমি কটাক্ষপাত করি। "আর যদি রাজত্ব না রাখতে চায়?"

"সে কী!" মাসিমার চমক লাগে। "এমন সোনার রাজত্ব কাকে দিয়ে যাবে! তুমিও যেমন। এ জিনিস কি প্রাণ ধরে কেউ কাউকে দেয়? ওরা দিয়ে যাবে না। আমরাই গায়ের জোরে কেড়ে নেব। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? হবে, সুভাষ যেদিন আসবে।"

মাসিমাকে শোনাই লাটভবনের কানাঘুষা। সেখানে মাঝে মাঝে যেতে হয় আমাকে। ইংরেজরা আগের চেয়ে অনেক বেশী দিলখোলা হয়েছে। ব্যবহারও তাদের অনেক বেশী ভদ্র। সমকক্ষের মতো। এই তো সেদিন শুনে এলুম, "কণ্ডিপুরণের বহর নিয়ে আপনাদের নেতাদের সঙ্গে রফা কথাকবি চলছে। ইমিগ্রেশনে ওরা আমাদের অফিসারদের খুশি করে দিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ার এঁরাও যদি খুশি করে দেন তা হলে আমরা কালকেই জাহাজ ধরতে রাজী। চের হয়েছে রাজাগিরি। হাতে রাখব সওদাগরি।"

অরাজকতার প্রশ্ন তুললে ইংরেজ আলাপীরা বলেন, "এসব হাঙ্গামাহুজ্জতের আসল কারণ তো এই যে ইণ্ডিয়ানরা ভাগ না দিয়ে ভোগ করতে চায়। নিজেদের মধ্যে ইণ্ডিয়ার লোক যা হয় একটা মীমাংসা করুক। যে মীমাংসা তারা করবে সেই মীমাংসাই আমরা মেনে নেব। কোনো পক্ষের উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে যাব না।"

ইংরেজদের ধন্যবাদ যে তাদের ভাষায় আমরা সবাই ইণ্ডিয়ান। আর আমাদের সকলের দেশ ইণ্ডিয়া। কায়দে আজম কিন্তু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ইণ্ডিয়ান নন। তাঁর স্বদেশের নাম পাকিস্তান। এই যদি হয়ে থাকে তাঁর দলবলের মনের কথা তবে মীমাংসা হতে পারে না। মীমাংসার ভিত্তিই নেই। এটা জলের মতো বুঝে গান্ধীজী দিল্লী ছেড়ে নোয়াখালী চলে গেছেন সরাসরি আবেদন করতে দেশের ইসলামপন্থী জনগণের দরবারে। তারা যদি কবুল করে যে তারা ইণ্ডিয়ান তা হলে মীমাংসা হবে নেতায় নেতায় নয়, পার্টিতে পার্টিতে নয়, জনতায় জনতায়। কিন্তু তারাও যদি কায়দে আজমের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে তবে মীমাংসার শেষ ভরসাটুকুও লুপ্ত হবে। নোয়াখালীতে মহাত্মা গেছেন নিশ্চয় করে জানতে ইসলাম যাদের ধর্ম ইণ্ডিয়া কি তাদের দেশ, না দেশ নয়? ইণ্ডিয়ান কি তারা আছিতে, না ইণ্ডিয়ান নয়?

মেসোমশায় হঠাৎ বলে বসলেন, "আমিও নোয়াখালী যাব।"

"তুমিও নোয়াখালী যাবে।" মাসিমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "কেন? মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে? না শুধু একবার দেখে আসতে?"

অবাক হলুম আমিও। ভাবলুম মাসার জন্যে তাঁর বাপের মন কেমন করছে। করবে না? আমি কোথাকার কে! আমারি মন কেমন করছে।

"না। সে জন্যে নয়।" মেসোমশায় পরিষ্কার করলেন। "নোয়াখালী গেলে দেখা হবে বইকি, কিন্তু দেখার জন্যে নোয়াখালী যাওয়া নয়। আর ঘরে ফিরিয়ে আনা তো মাসার অনিচ্ছায় হতে পারে না। তার যেদিন ইচ্ছা হবে সে আপনি চলে আসবে।"

একটু থেমে বললেন, "ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হবে যাচ্ছে লণ্ডনে নয়, দিল্লীতে নয়, নোয়াখালীতেই। নোয়াখালীতে যদি আমরা সিদ্ধকাম হই তা হলে দিল্লীতেও আমরা ব্যর্থ হতে পারিনে, লণ্ডনেও আমাদের নিষ্ফলতা ঘটবে না। আর নোয়াখালীতে যদি আমরা অকৃতকার্য হই তা হলে দিল্লীতেও আমাদের অক্ষমতা ঢাকা থাকবে না, লণ্ডনেও সেটা ধরা পড়ে যাবে। শেষ সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে নোয়াখালীর উপর। সে যেদিকে ইঙ্গিত করবে দিল্লী সেই দিকেই চলবে, লণ্ডন সেই দিকেই হেলবে।"

"সব জানলুম। কিন্তু তুমি কেন?" মাসিমা ভুললেন না। তবী তোলে না।

"আমি কেন?" মেসোমশায় বললেন, "কলকাতায় আমি কার কোন্ কাজে লাগছি? কলকাতা এখন মফঃস্বল। নোয়াখালী এখন সদর। ভারতের ভাগ্য তো দূরের কথা, বাংলাদেশের ভাগ্যও এখন কলকাতার হাতে নয়। কলকাতাই বা কার কোন্ কাজে লাগছে? অসভ্যতা সহ্য হয়। আন্‌রিয়ালিটি থেকে আমাকে রিয়ালিটিতে নিয়ে যাও। কলকাতা থেকে আমাকে নোয়াখালীতে যেতে দাও। যাই, দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার দ্বারা বৃহৎ কিছু হবে না, কিন্তু সামান্য কিছুও তো হতে পারে। রাম যখন সমুদ্রবন্ধন করেন কাঠবিড়ালীও চুড়ি ভরে এনে সাহায্য করেছিল।"

মাসিমা তা শুনে লাল হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে কথা জোগাল না। আমার দিকে তাকালেন। যেন আমিও তাঁর পক্ষে। আমি তাকালুম টোগোর দিকে। টোগো তাকাল নীলির দিকে। আমাদের সকলের ভাবনা মেসোমশায়কে কী করে নিবৃত্ত করা যায়। মাসিমা কখনো তাঁকে যেতে দেবেন না। তিনি রক্তের চাপে ভুগছেন। তাঁকে যেতে দিলে বিপদ। ওদিকে তিনিও প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছেন। নোয়াখালী তিনি যাবেনই। তাঁকে যেতে না দিলেও বিপদ। নজরবন্দী করে তাঁর মতো লোককে কাঁহাতক আটকিয়ে রাখা যায়। তাঁর উপর জোর খাটাতে গেলে ফল খারাপ হবে।

এ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি। মাসিমা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, "দেবপ্রিয়, এই সঙ্কটের জন্যে দায়ী তোমার যোন মামা। সে যদি অমন করে নোয়াখালী না যেত ইনিও যাবার জন্যে জোর ধরতেন না। তোমার কি মনে হয় না যে মামাকে টেলিগ্রাম করে ফিরতে বলা উচিত?"

"কোন্ অজুহাতে, মাসিমা?" আমি চটপট বলি।

"পিতার অবস্থা উদ্বেগজনক। এর মধ্যে মিথ্যা কোথাও আছে?" তিনি তাঁর স্বার্থরক্ষার আশ্রয় নিলেন।

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি যে মামা যদি টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ী আসে তো উদ্বেগের উপযুক্ত কারণ না দেখে আমার চলে যাবে। সঙ্গে যাবেন তাঁর বাবা। তার চেয়ে অনেক ভালো সত্যের মুখোমুখি হওয়া। মেসোমশায়কে যেতে দেওয়াই শ্রেয়। সাথী হবেন মাসিমা।

"আমি!" তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "তুমি হয়তো মনে করবে আমি ভীতু। প্রাণের ভয়ে যেতে নারাজ! কিন্তু তা নয়! আমার নজর সব সময় পার্কসার্কাসের বাড়ীখানার উপর। এইখানে বসেই আমি কড়া পাহারা দিচ্ছি। জানো, ও বাড়ীতে এখন টেলিফোন বসেছে। একদিন হয়তো মিলিটারিও বসবে। আমার বাড়ী আমি যেমনটি হতে দেব না। নিজে ঢুকতে না পারি আর কাউকে ঢুকতে দেব না। কিন্তু আমি কলকাতার বাইরে যাই বাড়ীটাও আমার নাগালের বাইরে যাবে। তোমার মেসোমশায়কে এ কথা বোঝায় কে? 'দেশ' 'দেশ' করে তিনি গেলেন। আচ্ছা দেশ কি একটা নিরাকার বস্তু? দেশ হচ্ছে বাড়ী ঘর বাগান। দেশ হচ্ছে পনেরো কাঠা জমি। এই যদি দেশ তো দেশ নিয়ে আমি করব কী, বল।"

এই পারিবারিক সঙ্কটে ডাক্তার বন্ধুরাও হার মানলেন। মেসোমশায় তাঁদের পরামর্শ কানে তুললেন না. বললেন, "শাস্ত্রীর বয়স সাতাত্তর বছর। আমার বয়স বাটেরও কম। তিনি তো শুনতে পাই পা দিয়ে নোয়াখালী চষে বেড়াচ্ছেন। বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে হাঁটছেন। আমি কি এতই অথর্ব! আমার কি এটা ইনভ্যালিড দশা!"

নয়

বড়দিনের সময় এক চিত্রপ্রদর্শনীতে নির্মলের সঙ্গে দেখা। এলাহাবাদ থেকে সে কলকাতা এসেছিল কী একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে। মেসোমশায়ের ঠিকানা খুঁজে পায়নি। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে আবিষ্কার করেছে।

পরিস্থিতির বিবরণ তাকে শোনাই। সে বলে, "উপায় যে নেই তা নয়। মাসিমা যদি অনুমতি দেন আমিই মেসোমশায়ের যাত্রাসহচর হব। তাঁর স্বাস্থ্যের খবরদারি করার ভার আমার। তাঁর শরীরতত্ত্ব আমার অজানা নয়। নোয়াখালীতে গিয়ে তাঁর যদি ঘুরতে ইচ্ছা হয় আমিও তাঁর সঙ্গে ঘুরব। যদি এক জায়গায় থাকতে ইচ্ছা হয় আমিও তাঁর সঙ্গে থাকব। ছুটি! ছুটি আমি যেমন করে পারি জোটাব।"

মাসিমার সামনে হাজির করে দিই তাকে। মাসিমা খুব কুঁচকিয়ে বলেন, "তুমি ডাইরেক্ট পেয়েছ

বলে কি ডাক্তার হয়েছ? অনুৎবিমুখ করলে তুমি পারবে চিকিৎসা করতে? ওষুধ পাবে কোথায় ওই পাওবর্জিত দেশে?"

মেসোমশায় কিন্তু নির্মলের প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে ওঠেন। রাতারাতি পরিকল্পনা তৈরী হয়ে যায়। মাসিমার প্রত্যেকটি আপত্তির খণ্ডন হয়। তিনিও হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, "যাচ্ছ, যাও। কিন্তু বেশীদিন থেকো না। শুনছি আবার গোলমাল বাধবে নোয়াখালীতে। মালাকেও টেনে নিয়ে এসো।"

একদিন নির্মলকে সঙ্গে নিয়ে মেসোমশায় নোয়াখালী অভিমুখে যাত্রা করলেন। শেয়ালদায় তাঁকে তুলে দিয়ে এলুম। বিদায়কালে বললেন, "এ কাজটা আমার কাজ নয়। তবে যাচ্ছি কেন? যাচ্ছি এইজন্যে যে, নাই কাজের চেয়ে কাণা কাজও ভালো। এখন আমার সত্যি বাঁচতে ইচ্ছা করছে।"

লক্ষ করলুম শুধু বাঁচতে নয়। নাচতেও। মেসোমশায় ইউরোপীয় পোষাক পরে যেন নেচে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাচ্ছিল। কে বলবে যে তিনি একজন ইনভ্যালিড! অথচ তাই হতো তাঁর দশা আরো কিছুদিন বেকার বসে থাকলে। পরের বাড়ী নজরবন্দী হয়ে পড়ে থাকলে।

এ মানুষ যে খুব শীগগির নোয়াখালী থেকে ফিরবেন এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে বলিনে এ কথা। পাছে মাসিমা দুঃখ পান। তাঁর ধারণা মানুষ বাঁচে ডাক্তার দেখালে আর ইনজেকশন নিলে আর ওষুধ খেলে। কিন্তু তাঁকে বোধ দিয়ে কী হবে? স্বামীকে যেতে দিলে কী নিয়ে তিনি থাকবেন? তাঁরও তো একটা অবলম্বন চাই। যা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। বাঁচা তো কেবল টিকে থাকা নয়।

মাসিমা এর পরে এক দারুণ দুঃসাহসিক কাজ করেন। সোজা গিয়ে নিজের বাড়ীতে ওঠেন। সেইখানেই বাস করতে থাকেন। অগত্যা আমাকেও প্রাণ হাতে করে তাঁর ওখানে যেতে হয়। যখনি যাই দেখি মাসিমার বাড়ীর ফটকে এক সশস্ত্র গুর্খা পাহারা দিচ্ছে। আর একটা গুর্খা খাটিয়ার শুয়ে বিশ্রাম করছে। তার পাশে শুয়ে আছে তার হাতিয়ার। শুনীতরা রাইফেল। দেখলে গা ছমছম করে।

মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করি, "এসব তো আগে দেখিনি। কবে লাইসেন্স নিলেন? মুসলিম লীগ সরকার কি হিন্দুকে লাইসেন্স দেয়?"

মাসিমা একটু হাসেন। বলেন, "গুণ্ডাদের কে লাইসেন্স দিয়েছে? এত হাতিয়ার তারা পায় কোথায়? বড় কড়াকড়ী কি শুধু ভদ্র গৃহস্থের বেলায়? গুণ্ডার বিরুদ্ধে গুর্খা লাগিয়ে দিয়েছি। ওদের হাতিয়ার ওরাই যেখান থেকে হোক যুটিয়েছে। আমি চোখ বুজে রয়েছি। টাকা চায়, টাকা দিই। এও একরকম ট্যাক্স। গুর্খাকে না দিলে গুণ্ডাকে দিতে হতো। আগেকার দিনে একটাই গবর্নমেণ্ট ছিল। এখন একজোড়া গবর্নমেণ্ট। একটা সরকারী। আরেকটা বেসরকারী। দু'দিন সবুর কর। দেখবে দেশে একটা প্রাইভেট আর্মি গড়ে উঠবে। অস্ত্রশস্ত্র ঘরে ঘরে তৈরী হবে। বোমা একদিন আমিই বানাব। এ বাড়ী কি আমি অমনি ছেড়ে দিচ্ছি।"

কী পরিমাণ মরীয়া হলে মানুষ এমন কথা মুখে আনে। বিশেষত হিন্দুর মেয়ে। আমি বিমূঢ় হয়ে শুনি। প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনটাই করিনে।

মাসিমা বলে যান, "বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' পড়েছ? মুসলমানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিন্দুর ছেলে, হিন্দুর মেয়ে সেদিন কী করেছিল? ইংরেজ এসে মুসলমানের আশা দেয়। ইংরেজকে বিশ্বাস করে আমরা আমাদের হাতের অস্ত্র ইংরেজের হাতে তুলে দিই। ইংরেজ এখন আমাদের রক্ষা করতে অক্ষম।

তা হলে রক্ষা করবে কে? মুসলমান? সেই তো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রধার। আমার 'আনন্দমঠে'র দিন আসছে। গান্ধীজীর অহিংসা কোনো কাজে লাগবে না। তাঁর মহিমা এই গুণ্ডার দল বুঝবে না। নোয়াখালীর বেণাবনে মুক্তা ছড়ালে হবে কী!"

কলকাতা শহরে অকস্মাৎ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য লক্ষিত হলো। টোগোকে জিজ্ঞাসা করলে সেও হাসে। বলে, "কোনটা তোমার চাই? পিস্তল? রিভলভার? রাইফেল? ষ্টেনগান? কত টাকা খরচ করতে রাজী? কাল রাত বারোটার সময় ঘরে বসে পাবে। কোনখান থেকে আসবে জানতে চেয়ো না।"

এই বলে টোগো দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দেয়। সে সুরক্ষিত।

দেখলুম হাতিয়ার চাইলেই পাওয়া যায়। অফুরন্ত সরবরাহ। লাইসেন্স অবশ্য দুর্লভ। কিন্তু কেউ তার অপেক্ষায় বসে নেই। পুলিস যথারীতি হানা দেয়, খানাতল্লাসী করে, কিন্তু পুলিসের লোকেই দয়া করে জানিয়ে দিয়ে যায় যে হানাদার আসছে, খানাতল্লাসী হবে। হাতী ঘোড়া পার হয়ে যায়। ধরা পড়ে চুনোপুঁটি। ষ্টেনগান যার হাতে আছে তার কাছে ঘেঁষবে কে? ওই গাদা বন্দুক কি ছোরা উদ্ধার করে। মোদ্দা কথা হিন্দুর স্বার্থ নয় হিন্দুকে নিরস্ত্র করা, মুসলমানের স্বার্থ নয় মুসলমানকে নিরস্ত্র করা। ইংরেজের স্বার্থে তো কেউ বাদ সাধছে না, তাই ইংরেজেরও স্বার্থ নয় কাউকে নিরস্ত্র করা।

দেশ চলেছে গৃহযুদ্ধের অভিমুখে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হইনি। এবার ভারতের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হব। মনটাকে সেইভাবেই প্রস্তুত করতে আরম্ভ করি। কিন্তু আমার কাজ অসি দিয়ে নয়। তুলি দিয়ে। তবে তুলি ধরার জন্যেও তো বেঁচে থাকা চাই। বেঁচে থাকার জন্যে কি অসি ধরতে হবে? পাব কোথায়? কি ভাবে? টোগো যেখানে পেয়েছে। যেভাবে। চিন্তান্বিত হই।

এমন সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে মিটমাট করুক আর নাই করুক আটচল্লিশ সালের জুন মাসের মধ্যে ইংরেজ এ দেশ থেকে অপসরণ করবে। আমার কাছে এই সম্ভাবনাটা নতুন নয়। এই তারিখটাই নতুন। ইংরেজ তা হলে সত্যি সত্যি চলল। তার যাত্রা শুভ হোক। মনটাকে সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষমুক্ত করি। ইংরেজ বন্ধুরা দেখি পরম আশ্বস্ত। চার দিকের বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব থেকে তাদের আন্তরিক অরুচি। ক্ষমতার বদলেও না। তারাও নতুন করে জীবন গঠন করতে চায়।

মেসোমশায় ইতিমধ্যে ফিরেছিলেন। মাসিমা একদিন আমাকে একটা বিচিত্র বার্তা শোনালেন। বললেন, "দেখ, দেবপ্রিয়, নোয়াখালীর সমস্যা আজকের নয়। তোমার জন্মের আগের। লাট কার্জন বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা কলকাতা থেকে শাসন করা যায় না বলেই তিনি ঢাকা থেকে শাসনের পরিকল্পনা করেন। বঙ্গবিভাগের সেইটেই ছিল প্রাথমিক কারণ। আবার যদি বাংলাদেশ দু'ভাগ হতো আর ঢাকা হতো পূর্ববঙ্গের রাজধানী তা হলে নোয়াখালী শাসন করা সুগম হতো কি না তুমিই বল। যেটা কলমের এক খোঁচায় হতে পারে সেটার জন্যে মহাত্মাকেই বা অমন ভীষের মতো পণ করতে হয় কেন? মালারই বা অমন তপস্যার কাজ কী? আর ইনিই বা কেমন করে আমাকে বিপদের মুখে ফেলে অত দিন ওখানে থাকেন?"

বাংলা ভাগ করার এই অভিনব প্রস্তাব দেখতে দেখতে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। সমস্যা যে অত সহজে মিটতে পারে কারো মাথায় আগে এটা ঢোকেনি। ইংরেজীতে একটি কথা আছে। হেডকে আউট-হেরড করা।" হেরডের উপর টেক্কা দেওয়া। তেমনি এটা হলো জিন্নাকে আউট-জিন্না করা। খোদার উপর খোদকারী করা। তুমি চল ডালে ডালে তো আমি চলি পাতায় পাতায়।

"দেখ, এর মধ্যে একটা মস্ত কূটনৈতিক চাল আছে।" আমাকে বোঝায় আমার রাজনৈতিক বন্ধু হারানিধি দাহা। "বাংলা ভাগ হলে ওরা কলকাতা হারাবে। এটি একটি সোনার খনি। ওদের দশা হবে মণিহারা ফণীর মতো। কিছুতেই ওরা রাজী হতে পারে না। ওরা যদি এতে রাজী না হয় আমরা কেন ওতে রাজী হব? আর ওরা যদি এতে রাজী হয় তা হলে আমরা কেন ওতে নারাজ হব? এসব শুণ্ডাদের পয়লাপার করতে পারলেই বাঁচি।"

"ও পারের হিন্দুরা কি আরো বিপন্ন হবে না?" প্রশ্ন করি আমি।

"ওরা," হারানিধি অম্লানমুখে উত্তর দেয়, "এ পারে চলে আসবে।"

বাজিয়ে দেখলুম গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো মেরুদণ্ড একজনেরও নেই। গৃহযুদ্ধ যাতে না বাধে সেই কথা ভেবে আগে থেকেই সন্ধি করতে বুদ্ধিমানেরা ব্যগ্র। সন্ধির সর্ত পর্যন্ত তাঁদের জিহ্বাগ্রে। বাকী শুধু জিন্নাকে ঢেঁকি গেলানো। তার জন্যে দরকার ছিল মাউন্টব্যাটেনের মতো এক ওস্তাদের। তিনি যা করলেন তা একপ্রকার অসাধ্যসাধন। হঠাৎ নবাবদের কলকাতা ছাড়ার দিন ঘনিয়ে এলো।

সেই যে রাজেন হোসেন সাহেব বা রাজেনদা তিনি মেসোমশায়ের অনুপস্থিতিতে মাসিমার বাড়ী আসতে সাহস পেতেন না। যেই শুনলেন মেসোমশায় ফিরেছেন অমনি ছুটে এলেন দেখা করতে। তখনো মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান পাকা হয়নি। মেসোমশায়ও বিশ্বাস করেন না যে পাকা হবে। তাঁর ধারণা গান্ধীজী ওটা উলটিয়ে দেবেন। যেমন দিয়েছিলেন ক্রিপস্ প্রস্তাব। মাউন্টব্যাটেনকেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে।

"ভাই অমল, এ কী শুনছি, ভাই?" রাজেনদা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। "এ কী আবদার ধরেছিস তোরা? বাংলাদেশ ভাগ করতে হবে! এ কি কখনো ভাবা যায়!"

"তুমি নিশ্চিন্ত থেকো রাজেনদা।" মেসোমশায় অভয় দেন তাঁকে। "দেশ কিছুতেই ভাগ করা হবে না। না ভারতবর্ষ, না বাংলাদেশ। ইংরেজ থাকে, থাক। ওরা গেলে পরে আমরা যেমন করে পারি মিটমাট করব। মিটমাট না হলে তখন দেখা যাবে; নতুন আবহাওয়ায় নতুন করে ভাবা যাবে। আগে হাওয়া বদল।"

রাজেনদা যে খুব খুশি হলেন তা নয়। তিনি ইংরেজ থাকতেই মিটমাট চান। গান্ধী যেন জিন্নার দাবী মিটিয়ে দেন। চরম মহত্ত্ব দেখান। মুসলমান চিরবাধিত হবে। পাকিস্তান যে সব মুসলমানের মনের কথা তা নয়, কিন্তু সব মুসলমানেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তারা যেন নতুন করে পরাধীন না হয়। তাদের শঙ্কা অমূলক হলে তারা কি এমন মরীয়া হয়ে উঠত? তাদের দিক থেকে এটা একটা জীবনমরণ সংগ্রাম। তারাও শান্তি চায়, কিন্তু স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়।

মেসোমশায় বোম্বাইয়ে থেকে বিষণ্ণতর ও বিজ্ঞতর হয়ে ফিরেছিলেন। সর্বদা একটা অন্যমনস্ক ভাব। বেদনার সঙ্গে বললেন, "মুসলমানরা নতুন করে পরাধীন হোক একটি হিন্দুর মনেও এ কামনা ক্ষণ করেও স্থান পায়নি কোন দিন। বহুল প্রচারের দ্বারা মিথ্যা কখনো সত্য হয়ে যায় না। স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যে সংগ্রাম চলে এসেছে তাতে হিন্দুও অংশ নিয়েছে, মুসলমানও অংশ নিয়েছে, শিখও অংশ নিয়েছে। যে স্বাধীনতা আসছে সে স্বাধীনতা সকলেরই এজমালী স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পরে যদি একে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ভোগ করতে পারি, এর দায় একসঙ্গে বহন করতে না পারি, তা হলে একসঙ্গে বসে স্থির করব কেমন ভাবে ভাগ করলে সকলের সন্তোষ। সেটা হবে

আমাদের ঘরোয়া বাঁটোয়ারা। তাতে বিদেশী শাসকের হাত থাকবে না। ভালোবেসে যদি ধরে রাখতে না পারি তবে প্রেমের সঙ্গেই ছেড়ে দেব তোমাদের। তোমরা যদি পাকিস্তান চাও আমাদের হাত থেকেই পাবে, তার সঙ্গে পাবে আমাদের শুভেচ্ছা। আমরাই সে পাকিস্তান রক্ষা করব, তার জন্যে জান দেব।"

রাজেক হোসেন মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "না। না। তোমাদের হাত থেকে নয়। ইংরেজের হাত থেকেই। ওরাই যে আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। ওরাই আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।"

মেসোমশায়ও তেমনি দৃঢ় স্বরে বললেন, "তা হলে ইংরেজের কাছেই দরবার করগে। গান্ধীজীর কাছে মিছে প্রত্যাশা করছ কেন?"

রাজেক হোসেন নিরুত্তর। মেসোমশায় বলতে লাগলেন, "ইংরেজের সঙ্গে যারা লড়াই করেনি তারাই দেখি ইংরেজের হাত থেকে খয়রাত নেবার জন্যে ব্যগ্র। এমন ব্যগ্র যে ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই বাধাতে ভয় নয়। তাও যদি হতো অহিংস কিংবা শুভ্র পদ্ধতিতে! প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রত্যাহার না করলে জিন্নার সঙ্গে গান্ধীর কথাবার্তার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। হিংসার কাছে নতিস্বীকার করার নাম অহিংসা নয়। গান্ধীজীর দেবার যা আছে তিনি যেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তুলে নিলে ব্রিটিশ অপসরণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরলে। সেটা মহৎ দানই হবে।"

"না। না। ওঁর হাত থেকে দান আমরা চাইনে।" রাজেক হোসেন উঠলেন। "তা সে যতই মহৎ হোক না কেন। অপেক্ষাও আমরা করব না।"

মেসোমশায় তাঁকে ধরে বসিয়ে বললেন, "তোমরা শুধু চাও গান্ধীজীর সম্মতি। দেবার মালিক ইংরেজ। কিন্তু ইংরেজ যদি তোমাদের আধখানা বাংলা দেয় নেবে?

রাজেক হোসেন আমতা আমতা করে বললেন, "কী করে নিই?"

"নিয়ো না।" মেসোমশায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। "নেওয়া উচিত নয়। এটা একটা খারাপ চালের পালটা চাল। এটাও খারাপ। দুই খারাপে এক ভালো হয় না। এতে তোমাদেরও অমঙ্গল, আমাদেরও অমঙ্গল। আপাত লাভকে প্রকৃত লাভ বলে ভুল করলে আখেরে ঠকতে হয়। কাঁটা একদিন গলায় বিঁধবেই। সেদিন হয়তো আমাদের জীবিতকালে নয়। জাতি হিসাবে আমরা বাঙালীরা তৃতীয় শ্রেণীর হয়ে যাব। আমাদের সব স্বপ্নের, সব ধ্যানের সমাধি হবে। আমাদের হাত দিয়ে আর কোনো মহৎ সৃষ্টি হবে না। এ বেদনা আর কেউ বুঝবে না, বুঝবে শুধু তোমরা আর আমরা। উভয়ের উত্তরপুরুষ। তাই রাজেনদা, বহু শতাব্দীতে এ রকম মুহূর্ত একবার মাত্র আসে। এটা আমাদের সত্যের মুহূর্ত। মোমেন্ট অব ট্রুথ। আমরা কি বরাবরের জন্যে দু'ভাগ হয়ে যাব?"

এর উত্তরে রাজেক হোসেন কী বললেন, শুনবে? বললেন, "সেইজন্যেই তো বলি, বাঙালী যেন ভাগ হয়ে না যায়, বাংলা যেন ভাগ হয়ে না যায়। পাকিস্তানেই আমাদের সকলের স্থান হবে। ভারতবর্ষ কতবার ভেঙেছে। আবার ভাঙলই বা!"

মেসোমশায় হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন, "বাংলাকে ভালোবাসি বলে ভারতকেও কম ভালোবাসিনে। এক ভালোবাসার খাতিরে আরেক ভালোবাসাকে ত্যাগ করতে পারি কখনো? যাদের অন্তরে প্রেম নেই তারাই ত্যাগ করতে পারে ভারতকে, বাংলাকে।"

"এই যদি হয় বিশ্বাস কথা তবে ইংরেজ চলে গেলেও তোমরা আমাদের পাকিস্তান দেবে না।

দুষা ভোক দিয়ে আমাদের শেষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছ। তার চেয়ে ইংরেজ যা দেয় তাই সই। আধখানা বাংলা দেয় আধখানাই নেব।" বললেন হাকেম সোসেন।

ঘটনার গতি গান্ধীর জন্যে অপেক্ষা করল না। ব্রিটিশ অপসারণের সন্ধ্যামুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে দেখে তাঁর সম্মতি না নিয়েই নূতন শাসকরা পুরাতন শাসকদের দিয়ে চক্ষের নিমেষে দেশ ভাগ করিয়ে নিলেন, প্রদেশ ভাগ করিয়ে নিলেন। ভেবেছিলেন সেই উপায়ে অরাজকতা রোধ করবেন। পাঞ্জাবে কিন্তু তার উল্টো ফল হলো। গান্ধী না থাকলে বাংলাদেশেও হতো।

মেসোমশায় অসুখে পড়লেন। আমি গেলুম দেখতে। আমাকে তাঁর বিছানার ধারে বসিয়ে বললেন, "যে ধার এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিল রে। একসঙ্গে দু'দুটো শাইলক। রক্তধারা বন্ধ হবেই তো। এখন একে বন্ধ করবে কোন ধন্বন্তরি।"

ভেবেছিলুম মালা ফিরে আসবে। ফিরল না। ফিরল মনোরমা। বলল, "মালা তো বিশ্বাসই করে না যে মানুষকে হিন্দু বা মুসলমান বলে চিহ্নিত করলে তার সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়ে যায়। কিংবা দেশকে হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান বলে চিহ্নিত করলে তার সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়ে যায়। নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান বলে চিহ্নিত করাটাই যখন ভুল তখন সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শামিল বলে গণনা করাটাও ভুল। যেখানে পনেরো আনা মিল সেখানে এক আনা গরমিলটাই বড় কথা নয়। তেমনি যেখানে এক আনা মাত্র মিল সেখানে সাম্প্রদায়িক নাম ধারণ করাটাই লজ্জার কথা। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। বিংশ শতাব্দী যখন শেষ হয়ে আসবে তখন এর অসারতা প্রত্যেকের চোখে পড়বে। তা বলে যেসব মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেছে সেসব হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। সেইসব রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় কোথাও হিন্দুর, কোথাও মুসলমানের, কিন্তু সর্বত্র মানুষের। সর্বত্র আপনার লোকের। মালা ভাবছে কেমন করে ওদের প্রাণ ফিরিয়ে আনবে।"

আমিও বিশ্বাস করিনে যে এই ভূতের লড়াই চিরদিন চলবে বা চলতে পারে। কিন্তু আজ মানুষের ঘাড় মটকাবার শক্তি এর অপরিসীম। যা ঘটেছে তা হাস্যকর তো নয়ই। তা ভয়ঙ্কর। যা ঘটবে তা হয়তো আরো ভয়ঙ্কর। মালা পারবে কেন সহ্য করতে! রক্তের নদী দেখতে দেখতে সমুদ্র হবে হয়তো। হাড়ের পাহাড় দেখতে দেখতে হিমালয়। মালা! মালা! তুমি কেন এ পথ দিয়ে যাবে! প্রাণ ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব না সহজ! মুক্তা করার জন্য সোনার শুকপাখী থাকলে তো আনবে।

মনোরমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, "মালার সঙ্গে আপনি থাকলেন না কেন?"

"আমি কেন থাকব?" মনোরমা পাল্টা সুধায়। "কেমন করে থাকব? আমার স্বামী আছে, সন্তান আছে। তাদের কতকাল অবহেলা করব? যদি জানতুম যে এ সঙ্কটের আজ অবসান হবে। তা তো হবার নয়। স্বয়ং মহাত্মাজীকেই দেখলুম অসহায়ের মতো কাঁদতে। তিনিও অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেছেন। মানুষ একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে, ভাইঝী। মহাত্মার কথাও তার প্রাণে পৌঁছয় না। কানে পৌঁছলেও তবু কাজ হতো। মহাত্মার সভায় আসবেই না। তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে প্রেম দেন। তাও কি নেয়? অনেকগুলি মেয়েকেই আমরা উদ্ধার করেছি। কিন্তু যেই আমরা সরে আসব আর মিলিটারি সরে যাবে অমনি আরো অনেক মেয়ে বন্দিনী হবে। মালা যদি থাকতে চায় তাকে ওই বিংশ শতাব্দীর শেষদিন অবধি থাকতে হবে। আমি ততদিন থাকতে পারিনে! তবে আর একজন থাকবেন।"

কৌতূহল দমন করতে পারিনে। জানতে চাই কে তিনি।

"আপনার বড় নির্মলকী।" মনোরমার চোখ হাসে।

"ওঃ! তাই তো! ভুলে গেছলুম তাঁর কথা।" আমি গম্ভীরভাবে বলি।

মেসোমশায় ও মাসিমা দুজনেই মালার জন্যে দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন। বিশেষত গান্ধীজী বিহারে চলে যাওয়ার পর থেকে। মনোরমা ছিল তাদের প্রধান ভরসা। তার স্থান নিল নির্মল। লক্ষ্য করলুম নির্মলের প্রতি মাসিমার অপার নির্ভরতা।

একদিন কথায় কথায় মাসিমা আমাকে বললেন, "তা একালের মেয়েরা যখন নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করবেই, গুরুজনের নির্বন্ধ মানবে না, তখন আমরাই বা কেন আপত্তি করি? আপত্তি করলে শুনছে কে? আমি, বাবা, কাউকে বাধা দিতে চাইনে। একটিমাত্র মেয়ে। তাই আমি একটু ভালো দেখে বিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। এই আমার অপরাধ। এর জন্যে আমাকে ত্যাগ করে বনবাসে যাবার কোন অর্থ হয়? গেল তো গেল। আর ফিরে আসার নামটি নেই। বাপের সঙ্গেও না। মনোরমার সঙ্গেও না। চিঠি লিখলে জবাব দেয়, আমি যদি যাই তবে একখানা টিকিটে কুলোবে না। কিছু না হোক শতখানেক মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইবে। কোন প্রাণে তাদের পিছনে ফেলে যাই? তুমি তাদের কোথায় জায়গা দেবে বল?

আমি আশ্চর্য হলুম। "আপনার বাড়ীতে জায়গা দিতে হবে এমন কী কথা আছে!"

"ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমার এই হতভাগা বাড়ী। দেশ ভেঙে দিয়ে মুসলমানকে যদি বা হটালুম তো বাঙাল উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায়। তাও একটি নয়, দুটি নয়, শতখানেক। বলি এদের পিণ্ডি জোগাবে কে?"

"সেটা," আমি সন্তর্পণে বলি, "দেশ ভেঙে দেবার আগে ছ'বার ভেবে দেখা উচিত ছিল আপনার। হিন্দুকে হিন্দু না পুষিলে কে পুষিবে?"

মাসিমা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "বেশ, তা হলে এ বাড়ীও আমি বেচে দেব।"

একটু ঠাণ্ডা হয়ে আবার বলতে লাগলেন, "হাঁ, মালা আর কী লিখেছে শুনবে? লিখেছে, মুসলমানরাও আমাকে ছাড়তে রাজী নয়। মুসলমানদের প্রায়ান্ধ লোক এসে আমার কাছে ধরনা করে, সবাই বাক। আপনি থাকুন। যা করতে বলবেন তাই করব। সত্যি তারা আমার কথা শোনে। তাদের কথা আমি কেমন করে না শুনি? হাঁ, অনাহারেক মুসলমান যুবক আমার ক'ছে আরজ জানিয়েছে যে আমি যেদিন যাব সেদিন তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। কলকাতা শহর তারা দেখেনি। সেখানে গিয়ে কাজকর্ম করবে। খেটে খাবে। কারো গলগ্রহ হবে না। এই নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলিকে আমি কেমন করে বোঝাই যে কলকাতায় মুসলমান আর নিরাপদ নয়? সেখানে খেটে খেতে চাইলেও ঠাঁই নেই। অধিকার নেই। তাই যদি হয় তবে কলকাতা ফিরে যাওয়া আমার হবে না। আমি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করব।"

আমি বেদনা বোধ করি। বলি, "নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলির কোথাও কি ঠাঁই আছে? তা বলে মালা কলকাতা না ফিরে কতকাল ও মুলুকে থাকবে?"

"নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলি।" মাসিমা জ্বলে ওঠেন। "না হিংস্রপ্রকৃতির বনমানুষগুলি! যাদের আমি এত কষ্টে বেঁচিয়ে বিদায় করতে যাচ্ছি তাদেরি তাই বেরাদরদের উনি খাল কেটে শহরে ডেকে আনবেন। নয়তো অভিমান করে মোগলের মুলুকে থাকবেন। এখন আমি করি কি? কেমন করে

আমার মেয়েকে উদ্ধার করি? ও যদি ভালোবেসে কাউকে বিয়ে করতে চায় আমার দিক থেকে বাধা নেই জেনো। শুধু জামাইটি মুসলমান না হলেই হলো।"

মাসিমার উদারতায় আমি চমৎকৃত হই। এটা কি স্বাধীনতার হাওয়া লেগে? না ভাঙনের দৃশ্য দেখে? আঘাত প্রতিঘাতে দেশ যদিও জর্জর প্রগতির রথচক্র অবিরাম ঘর্ঘর রবে ছুটে চলেছে।

দেশবিভাগের অভাবনীয়তায় হিন্দুরা হত না স্তম্ভিত প্রদেশবিভাগের অকল্পনীয়তায় মুসলমানরা ততোধিক। পাকিস্তানের খসড়া শুধু সাত আট বছর ধরে মাথার উপর ঝুলছিল, কিন্তু পশ্চিম বাংলার বজ্রটি অকস্মাৎ আসমান থেকে পড়ল। মুসলমানরা একবার মুর্শিদাবাদের তখত হারিয়েছিল। এবার হারালো কলকাতার গদি। এমনিতেই তাদের মন খারাপ। তার উপর শোনা গেল পনেরোই আগস্টের দিন হিন্দুরা দেখে নেবে। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, "দাঁড়ান, মশায়। ক্ষমতাটা একবার আসুক হাতে। এমন শিক্ষা দেব যে চিরদিন মনে থাকবে।" আমি শিউরে উঠি।

ভয়ানক এক ট্র্যাজেডী ঘটে যাবে চোখের উপর। প্রথমে কলকাতায়। তার পরে তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গের যেকোন জায়গায়। খুব সম্ভব নোয়াখালীতেই আবার। মালার জন্যে অস্থির বোধ করি। মুসলমানরা যে তাকে ছাড়তে চায় না এর মানে কি এই যে মালা তাদের হস্টেজ? তাকেই তারা নির্যাতন ও হত্যা করবে? হা ভগবান! কেমন করে ওকে নোয়াখালী থেকে পনেরোই আগস্টের আগে টেনে বার করে আনি? বিপদের কথা শুনে ও যদি উলটে কঠিন হয়? যদি বলে, "বিপদ যদি আসে তা হলেই জানব যে মায়াপাহাড়ের পথে চলেছি। কোনো দিকে দৃকপাত করব না। পিছন ফিরে তাকাব না। সোজা এগিয়ে যাব তীরের মতো। বীরের মতো।"

রাজেক হোসেন সাহেব একদিন আমাকে তার মর্মবেদনা জানালেন। তিনি সপরিবারে ঢাকা চলে যাচ্ছেন। বললেন, "পশ্চিমবঙ্গ কবে থেকে বাংলা দেশ হলো? সে তো পাঠান মোগলদের আমলেই। সাত শ' বছর ধরে যাকে আমরা সৃষ্টি করেছি, পালন করেছি, ঐক্য দিয়েছি, নাম দিয়েছি তাকেই তোমরা আজ কলমের এক খোঁচায় দু'খানা করে দিলে। পাকিস্তানের এতদিন কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। এখন হলো।"

আমরা দু'খানা করে দিয়েছি! তার মানে আমিও! "না, স্যার," আমি প্রতিবাদ করে বলি, "আমি এর মধ্যে নেই। সারা ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু, এই তথ্যটাই একদল ভারতীয়ের বরদাস্ত হলো না। তেমনি বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু এ তথ্যটাও একদল বাঙালীর সহ্য হলো না। তথ্য দুটোকে উলটিয়ে দিতে না পেরে তারা তথ্য থেকে পলায়নের পন্থা খুঁজে বার করল। ক্রমশঃ এক খোঁচায় ভারত হলো দু'খানা। সেই একই খোঁচায় বাংলাদেশও দু'খানা হলো। কলমের খোঁচায় হয়েছে বলেই রক্ষা। নয়তো তলোয়ারের খোঁচায় হতো। হতোই এটা ধ্রুব।"

মেসোমশায়ের ইচ্ছা নয় যে রাজেনদারা পাঠান আমলের ভিটামাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গে প্রস্থান করেন। তা শুনে রাজেক হোসেন বলেন, "বাড়ীর মেয়েদেরও ইচ্ছা নয়। কলকাতার মতো স্বাধীনতা ঢাকায় কোথায়? বুলি আলাদা, থানা আলাদা। তবু যেতে হবে। হিন্দুস্থানে আমাদের অতীত আছে ভবিষ্যৎ নেই। আমরা অনধিকারী।"

মেসোমশায় কিছুই বোঝাতে যান কিছুতেই তিনি বোঝেন না। বলেন, "ওসব কে বিশ্বাস করে? ইতিহাস। সেকুলার স্টেট। তাই যদি হবে তো পনেরোই আগস্ট আমাদের মেয়ে সাবাড় করার আয়োজন চলেছে কেন?"

মেসোমশায় জানতেন না। মাসিমা জানতেন। তা শুনে মেসোমশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। "ওরে, তোরা এখানে মাইনরিটি, কিন্তু ওখানে মেজরিটি। আমি যে সর্বত্র মাইনরিটি। টুর্গেনিভের উপন্যাসে সুপারফ্লুয়াস ম্যান। কালতো মানুষ। আমি তা হলে কোথায় যাই। আমার মনে হয় গান্ধীজীও এখন সুপারফ্লুয়াস ম্যান।"

কিছুদিন পরে গান্ধীজী কলকাতা এসে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি সুপারফ্লুয়াস নন। পাঞ্জাবের রক্তসিন্ধুর মতো রক্তগঙ্গা বাংলাদেশে যে বইল না এর কারণ নোয়াখালীতে ও কলকাতায় তাঁর শান্তিব্রত। মালারও এতে সামান্য কিছু হাত ছিল। পনেরোই আগস্ট হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান মাতালের মতো কোলাকুলি করে। আমি তো অবাক। আরেক দিন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল যখন একদল হিন্দু যুবক গিয়ে মহাত্মার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করল।

পনেরোই রাত্রে মাসিমার ওখানে ছোটখাটো একটি ব্যাঙ্কেট। তাঁর বাড়ী তিনি এবার নিষ্কণ্টক হয়ে ভোগ করতে পারবেন। এ যেন দ্বিতীয়বার গৃহপ্রবেশ। তফাতের মধ্যে একজনও মুসলমান অতিথি নেই। নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তারাই আসেননি। তার চেয়েও বড় তফাৎ : মালা নেই। তার অনুপস্থিতিটা সকলের চোখে বাজছিল।

মেসোমশায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। নিশ্চল পাষাণমূর্তি। সকলে একে একে বিদায় নিলে আমার প্রণাম নিয়ে বললেন, "এই দিনটির জন্যে সারা জীবন ধৈর্য ধরেছি। বেঁচে আছি বলে আমি ধন্য। ইন্দ্রত্বের জন্যে তপস্যা করিনি। ইন্দ্র যারা হতে চায় তারা হোক। আমি তপস্যা করেই মুক্ত। হাঁ একটা মুক্তির স্বাদ আজ পাচ্ছি। আমার দেশ আজ মুক্ত। আমার দেশবাসী মুক্ত। তা হলে এই আনন্দের দিনে প্রাণভরে আনন্দ করতে বাধছে কেন? দেশ ভেঙে গেছে বলে কি? আবার জোড়া লাগতে কতক্ষণ? জুড়তে চাইলে ইংরেজ কি বাধা দিতে আসছে? কিন্তু গায়ের জোরে জোড়া দেওয়া চলবে না। দিতে হবে প্রেমের জোরে। তেমন জোরালো প্রেম আজ তুমি ক'জনের মধ্যে দেখলে? কোলাকুলিকেই প্রেম বলে ভ্রম হতে পারে। সে ভ্রম ভাঙতে কতক্ষণ? প্রেম দিতে হলে প্রাণ দিতে হয়।"

পরিস্থিতি আবার অবনতির দিকে গেল। ভেবেছিলুম লড়াই থেমে গেছে। একটুও না। পাঞ্জাবের খবর থেকে বোঝা গেল সমুদ্রমন্থনে শুধু অমৃত ওঠেনি, গরলও উঠেছে। এবং গরলেরই পরিমাণ বেশী। কে ওই বিষ কণ্ঠে ধারণ করবে? নীলকণ্ঠ হবে? দেবতারা সবাই তো সুধাপানে নিবিষ্ট। সে ওই গান্ধীজী। ভারতের ভাগ্য ভালো যে হলাহল পান করার জন্যে শিবও রয়েছেন।

শচীন মিত্র ও স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন শহীদ হন সেদিন চোখভরা জল নিয়ে মেসোমশায়ের কাছে ছুটে যাই। কথা বলতে গিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদি। তিনিও শোকে অভিভূত। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যেন নীরবে। তার পর ধীরে ধীরে বলেন, "ওরাই আমার অকল বরুণ। আমি ধন্য। আমি ধন্য। আমি কৃতার্থ।"

অকল বরুণের পর তো কিরণমালা? মালাও কি এমনি করে আমাদের ছেড়ে যাবে? আমি চোখের জল রোধ করতে পারিনে। তিনি মনে করেন ওটা অকল বরুণের জন্যেই। আমিও গোপন করি। মালার জন্যে প্রাণটা হায় হায় করে ওঠে।

যা ভয় করেছিলুম তাই। মালা লিখেছে তার মাকে, "নোয়াখালী থেকে লাহোর যাচ্ছি। পথে একদিনের জন্যে কলকাতায় নামব! ভেবো না। বাবাকে দেখো। আমার সঙ্গে নির্মলদা যাচ্ছেন।"

রোদে কলসানো খসখসে মলিন ধুতি। কোনো এক আধুনিক ডাক্তারের হাতে পড়া। চুলে তেল পড়েনি কতকাল। গায়ে সাবান লাগেনি। স্নো পাউডার তো দূরের কথা। পায়ের পাতা ফেটে চৌচির। স্থলে স্থলে ক্ষতচিহ্ন। খালি পায়ে হাঁটা হয়েছে বোঝা যায়। ষোল পাঁচড়ারও দাগ ছিল সেরে যাওয়ার পরেও।

মালার মা মেয়েকে দেখে ধ। কণ্ঠ রুদ্ধ করে বললেন, "আমিও গান্ধীর মতো আমরণ অনশন করতে জানি। দেখি তুমি কেমন করে লাহোর যাও।"

তিনি সত্যি সত্যি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তা দেখে মেসোমশাইকেও একাদশী করতে হলো। তিথিটা অমিও সপ্তমী কি অষ্টমী।

মাসিমা বললেন, "আমি ঢের সহ্য করেছি। আর না। আমারি ভুল হয়েছিল তোমাকে মনোরমার সঙ্গে নোয়াখালী যেতে দেওয়া। ভেবেছিলুম দিন কয়েকের মধ্যে ঘুরে আসবে। তুমি যা করেছ আর কোনো মেয়ে আর কোনো দিন তা করেনি। আর কোনো মা তা করতে দেয়নি। ইংরেজের পাকিস্তির দায় তোমাকে বইতে হবে কেন? আমরা কি ট্যাক্স জোগাইনি যে তার বদলে বেগার খেব আর প্রাণে মরব? মেয়েদের তারও বাড়া বিপদ আছে। যমের হাত থেকে না হয় বাঁচলে। কিন্তু নরপশুর কবল থেকে? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! জানো না সতীর দেশের মেয়ে তুমি?"

মালা নিরুত্তর। তার মা তাকে তালাবন্ধ না করেও যা করলেন তা একরকম তাই। অনশনেরও সেই একই ফল হলো। মালা কলকাতায় থামল।

আর নির্মল? সেও বেঁচে গেল মালার জন্যে ভাবনা থেকে। তার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। সে এলাহাবাদ ফিরে গেল। যাবার সময় আমাকে বলে গেল, "যত রটেছে তত ঘটেনি। তবু যা ঘটেছে তা সাংঘাতিক। এখন না ঘটলে পরে ঘটতই। তখন আমরা তাকে বলতুম শ্রেণীসংঘর্ষ। একদিকে শতকরা আশিজন চাষী, অন্যদিকে শতকরা আশিভাগ জমি। কায়েদে আজমকে ধন্যবাদ যে তিনি সেটাকে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করতে দিলেন না। এর ফলে হয়তো শ্রেণী সংগ্রামের দাবা ভেঙে গেল। হিন্দু মুসলমান চাষী একজোট হয়ে আর কোনো দিন লড়তে পারবে বলে মনে হয় না। লড়তে গেলে কোমরে জোর পাবে না। একদিন অনুতাপ করতে হবে।"

এক বছরের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তিন বছরের কাজ মাটি করে দিয়ে গেল। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী তিন বছরের ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। শ্রমিক কৃষকদের দিক থেকে এই। আর জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে? সেদিক থেকে জাতির অবহানি। আর অহিংসবাদীদের দিক থেকে? সেদিক থেকে স্বয়ং গান্ধীজীরই মোহভঙ্গ। জনগণ প্রস্তুত নয়। [ক্রমশঃ]

মাইকেল মধুসূদন ও আধুনিক যুগ

নারায়ণ চৌধুরী

১

আধুনিক কালে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বিশেষভাবে স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে। এক দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে মাইকেলের যুগ আর বর্তমান যুগের মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মাইকেল একান্তভাবেই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মানস-সন্তান ছিলেন। প্রথম জীবনে মাতৃভাষা, জাতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু-ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর বিতৃষ্ণা ছিল। বিদেশী জীবনাদর্শের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যের বশে মাতৃভাষাকে তোলবার চেষ্টা তিনি কম করেন নি। তিনি ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনা করে যশস্বী হবার চেষ্টা করেছিলেন শুধু তাই নয়, ইংরেজ কবিকুলে তাঁর স্থান হবে এমন দুরাশাও তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার মধ্যে যেমন স্বপ্নভঙ্গের গভীর বেদনা আছে, তেমনি আছে নূতন সম্ভাবনার দিগন্তের উন্মোচন। প্রবল নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বিদেশী ভাষায় আত্মপ্রকাশের মোহ থেকে বিচ্যুত হয়ে মাতৃভাষার কল্পপথে সবেগে ছিটকে এসে পড়েছিলেন। তারপর চার বৎসর (১৮৫৮-৬২) একটানা চলে তাঁর মাতৃভাষায় একাগ্র অনুশীলন, এই সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চায় ডুবে ছিলেন বললেও চলে। কিন্তু তার পরেই আবার বিদেশীয়ানার মোহ এবং আত্যন্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়না তাঁর জীবনে দুর্নিবার হয়ে ওঠে এবং সেই তাড়নায় তিনি দেশজ সংস্কার ও জাতীয় সংস্কৃতির নৈকট্য-চেতনা থেকে পুনরায় স্খলিত হয়ে পড়েন। তার পরের ইতিহাস অতীব করুণ, মর্মান্তিক। মধুসূদনের জীবন-নাট্যের নিতান্ত বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি ঘোটানার মূলে কতবিক্ষত এক চিত্তের অনিবার্য নিয়তি পরিণাম। দুই প্রান্তীয় বা বিপরীত প্রবৃত্তির সংঘর্ষে মানুষের জীবনে এরকম দুর্যোগই সচরাচর ঘটে থাকে। এমনকি অমিত শক্তির অধিকারী হয়েও বোধ হয় এমনতর পরিণাম এড়ানো যায় না। শক্তি কেন্দ্রবিচ্যুত হলে তার ফল কত মারাত্মক হতে পারে মধুসূদনের জীবনেতিহাস তার প্রমাণ।

মনে হয় এই রকমের একটি ঘোটানার দ্বন্দ্ব, অপেক্ষাকৃত অনুগ্রভাবে, আধুনিক যুগেও চলছে। মধুসূদন ডিরোজিও-রিচার্ডসনের শিক্ষায় দীক্ষিত হিন্দু কলেজের যে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মুখ্য প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন, সেই গোষ্ঠীর মূল ঝোঁকটি ছিল সম্পূর্ণ জাতীয়তাবিরোধী ও একান্তভাবে বিদেশাভিমুখী। এখনকার মানসিকতায় এরকম সাংঘাতিক একদেশদর্শিতা নেই বটে, তাই বলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের প্রতি মোহ যে আমাদের ঘুচেছে এমন মনে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, পাশ্চাত্ত্য আদর্শ এখনও পর্যন্ত আমাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমাদের চলায় বলায় আচরণে জীবনযাপন পদ্ধতিতে কর্মজীবনে সমাজ জীবনের নানাবিধ উৎসবে অনুষ্ঠানে ব্যবসায়-বাণিজ্যে শাসন-পরিচালনায়—সর্বত্র পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অতি স্পষ্ট। আমরা জাতীয়তার সংগ্রাম করেছি বিজাতীয় পদ্ধতিতে, আমাদের মধ্যে সর্বভারতীয়ত্বের চেতনা ও ঐক্যবোধ এসেছে ইংরেজী শিক্ষার হাত ধরে, এমন কি খোদ্ জাতীয়তা বা 'ন্যাশনালিজম্' বস্তুটিই পেয়েছি ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সংস্পর্শজনিত প্রভাবের ফলে। আমাদের পোশাক-আশাক আহার-বিহার

সব কিছুর উপর বিদেশী প্রভাব মুদ্রিত রয়েছে। আমাদের আধুনিক সাহিত্য একান্তভাবেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতি ও সংঘাতের ফল।

স্বাধীনতা পাওয়ার পরে অবশ্য মুক্তিবোধের উল্লাসে দেশজ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি একটা অভিনব উৎসাহ ও অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে দেশবাসীর মনে, কিন্তু এই উৎসাহ পুরোপুরি স্বাভাবিক মনে হয় না। আমরা এখনও তলায় তলায় প্রবলভাবে বিদেশী ভাবধারার অধীন। অথচ বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করছি, ব্যক্তিগত স্তরে ও জাতীয় স্তরে উভয়তঃ অস্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির জন্য আমাদের আরও বেশী করে জাতীয়তার গহনে প্রবেশের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে যা অনুভব করা যায় তা-ই যে সব সময় কাজে খাটানো যায় তা নয়। বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে বুদ্ধিগত বিশ্বাস কাজে খাটানোর পথে সর্বপ্রধান বাধা হচ্ছে আমাদের গত দেড়শো বছরের সংস্কৃতির বিশেষ 'প্যাটার্ন'। এই প্যাটার্ন প্রায় সবটাই পশ্চিমী। আমরা মুখে বলি বটে রামমোহনের সময় থেকে বাংলা দেশে যে বিশেষ শিক্ষাদর্শ সমাজাদর্শ জীবনাচরণ-পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছে তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় হয়েছে। কিন্তু এ কথা বোধ হয় পুরাপুরি ঠিক নয়। আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে রামমোহনের নাম করি বিদ্যাসাগরের নাম করি মাইকেল মধুসূদনের নাম করি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম করি। কিন্তু এঁদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আর কেউই বোধ করি সর্বাঙ্গীণ ও সার্থক সমন্বয়ের গৌরব দাবি করতে পারেন না। রামমোহন আধুনিক ভারতের স্রষ্টা, ভারতীয় জীবনে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের বাণীবাহক একাধিক সংস্কারের প্রবর্তক, প্রাচ্য জ্ঞান ও পাশ্চাত্য ভোগ অর্থাৎ 'ভুক্তি-মুক্তি' আদর্শের তিনিই প্রচারক কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলতে যা বোঝায় তার দৃষ্টান্ত বোধহয় তিনি নন। রামমোহন সমন্বয়ের পথপ্রদর্শক, পথের গন্তব্যে উপনীত নন। বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্যের ভাব দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর মনের গঠন ও সংস্কার একান্তভাবে স্বদেশীয়। মধুসূদন পাশ্চাত্য ভাবুকতায় ওতপ্রোত হয়ে ছিলেন, মাত্র জীবনের কয়েক বৎসর তাঁর চিন্তা ও কল্পনার পার্শ্ব-পরিবর্তন ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নব-হিন্দুত্বের প্রচারক হলেও যে র‍্যাশনালিজমের ভিত্তির উপর তিনি হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সেই র‍্যাশনালিজমের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনচর্চার সূত্র থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র শিক্ষার ভিত্‌টাই ছিল পাশ্চাত্য, এদেশের লোক-সংস্কৃতি বা গ্রামীণ সংস্কৃতির মাটিতে তাঁর মনের শিকড় খুব বেশীদূর ছড়ানো ছিল না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নূতন ও পুরাতনের সার্থক সমন্বয়ের উদাহরণ প্রত্যক্ষ করি। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ভাবধারায় নিষ্নাত হয়ে তাঁর সাহিত্য ও কাব্যকে এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা মণ্ডিত করে তুলেছিলেন। রামমোহনের প্রবর্তিত সমন্বয় রবীন্দ্রনাথে এসে তার চূড়ান্ত সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু সমসাময়িক কালে এই সমন্বয়ের ধারা দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবেই ব্যাহত হয়েছে। পাশ্চাত্য আদর্শ পুনরায় প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে পাশ্চাত্য আদর্শেরই আধিপত্য দেখতে পাই। সত্যিকার জাতীয়তায় প্রত্যাবর্তনে আমাদের যে আগ্রহ নেই তা নয়, কিন্তু দীর্ঘকালীন পাশ্চাত্যানুবর্তনতার ফলে বিজাতীয় রীতিনীতি ও অভ্যাস আমাদের মধ্যে এমনই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে চেষ্টা করলেই তা থেকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া যায় না। মধুসূদনের কালে যেমন, একালেও তেমনি আমরা ঘড়ির দোলকের মত দুই বিপরীতমুখী প্রবণতার মধ্যে ক্রমাগত দোল খেয়ে ফিরছি—কখনও জাতীয় সংস্কার, মাতৃভাষা ও সাহিত্য, প্রাচ্য জীবনাদর্শ আমাদের মনোহরণ করছে, কখনও তার প্রতিক্রিয়ায় একেবারে বিপরীত প্রান্তে গিয়ে উপনীত হচ্ছি এবং পাশ্চাত্য আদর্শকেই জীবনের একমাত্র সার বলে

অনেক সময় অলীক আকাশ-কুসুম রচনাতেও সময় ব্যয় করতেন। অকৃত্রিম বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা একাধিক চিঠিতে তিনি তাঁর এই দিবাস্বপ্ন-বিলাসের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনে যে বুদ্ধির বলে সাংসারিক মানুষ সচরাচর চলে, তেমন বুদ্ধির তিনি ধার ধারতেন না। সাংসারিক সেয়ানা বুদ্ধির আনুগত্য করবার জন্য মধুসূদনের সৃষ্টি হয় নি: এটি তাঁর জীবনসম্বিৎরই দ্যোতক। তিনি সতত কাব্যকাননে বীণাবাদনে নিরত থাকতে পারলেই তৃপ্ত। তাঁর এই মনোভাবটি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র "সাংসারিক জ্ঞান" নামক সনেটে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে—

কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে?…

• • •

কহে সাংসারিক জ্ঞান—তবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি?
উদাসীন যথা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি!"

সুতরাং বলতে পারা যায়, একপ্রকার স্বেচ্ছাক্রমেই, অন্তর্তাগিদের অনিবার্য টানেই তিনি সংসার-সুখ থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে একান্ত অনিশ্চিত ঘাত-সংঘাতময় জীবনের বিড়ম্বনার মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর কাব্য যেমন নাটকীয়তার উপাদানে ভরা তেমনি তাঁর জীবনও নাট্যভাবে সমৃদ্ধ। বস্তুতঃ তাঁর গোটা জীবনটাই একটা মহানাটক। গভীর অহং চেতনা এই নাটকের মূল ভাব, আর আজন্ম বিদ্রোহী মনোভঙ্গী ও অমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার দুই স্থায়ী বিভাব। মধুসূদনের অহং চেতনার সঙ্গে আভিজাত্যচেতনা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিল। যা কিছু সাধারণ মামুলী গতানুগতিক, তার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার অন্ত ছিল না। ধর্মীয় প্রেরণার আন্তরিকতার বলে তিনি খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন তা নয়, তিনি ক্রিশ্চিয়ান হয়েছিলেন স্বজাতির ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁর বিমুখতা ও বৈরিতা প্রদর্শনের জন্য। রামচন্দ্র আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের তিনি পছন্দ করেন না ("I hate Ram and his rabble"), তাই বিপরীত জীবনাদর্শের প্রতীক রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে বড় করে দেখানোর তাঁর প্রয়োজন ছিল। রাবণের রাজকীয় মহিমা ও আড়ম্বর এবং ইন্দ্রজিতের শৌর্য তাঁর কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছে। সেই তুলনায় রাম-লক্ষ্মণ বহু গুণাবলীর অধিকারী হয়েও তাঁর চোখে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। মধুসূদন স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর প্রত্যয়ের বশে—সে প্রত্যয়ের সঙ্গে, বলা নিষ্প্রয়োজন, আত্মম্ভরির অনেকখানি মেশানো ছিল—আজীবন বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়েছেন। এই বিদ্রোহী মনোভঙ্গীরই মূল্যবান ফসল হল—বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন, বাংলার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক ('কৃষ্ণকুমারী নাটক') ও প্রথম প্রহসন সৃষ্টি ('একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ') এবং সনেট নির্মাণ ('চতুর্দশপদী কবিতাবলী')। মধুসূদনের কাব্যবৈশিষ্ট্য ছেড়ে দিলেও একমাত্র এই চতুর্বিধ অভিনবত্ব-প্রয়াসের জন্যই

তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকা উচিত। এ সবই অন্তর্সঞ্চিত বিদ্রোহী বহ্নিস্ফুলিঙ্গের বহিঃপ্রকাশ, বিশুদ্ধ অভিনবত্বের জন্য অভিনবত্বের অবতারণা নয়। তিনি যে সংস্কৃত কবিদের আদর্শ অনুসরণ না করে হোমার, ভার্জিল, ট্যাসো ও মিল্টনের আদর্শে তাঁর 'মেঘনাদ বধ কাব্য'কে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন তার মূলে শুধুই পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিকাল কাব্যপ্রীতি ছিল না, ছিল গতানুগতিকের প্রতি গভীর বিরাগ। সকলে যে পথ অনুসরণ করে সে পথ মধুসূদনের জন্য নয়—এই ছিল তাঁর মনোভঙ্গী। এই মনোভাব অবশ্য নীতিগত ভাবে সমর্থনীয় নয়, কিন্তু মধুসূদন যা নিজের সম্পর্কে ভাবতেন তা অনেকাংশে কার্যতঃও সত্য ছিল। কাব্যের জ্ঞান এবং বৈদগ্ধ্যের বিচারে তৎকালে তাঁর তুল্য বিদ্বান ব্যক্তি বাংলাদেশে আরকেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিস্বভাবেও কোনরূপ নীচতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। তিনি তা জানতেন এবং তা প্রকাশেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। বৈষ্ণব বিনয় তাঁর ধাতে ছিল না। তাঁর মন একান্তভাবেই পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা কর্ষিত ছিল ব'লে আত্মবৈশিষ্ট্যকে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের এই যে আত্যন্তিক প্রত্যয়শীলতা, এই যে অহং-কেন্দ্রিকতা—এ একেবারেই পাশ্চাত্ত্য মনোভঙ্গীর প্রভাবজাত ফল। সমগ্র মনোভঙ্গী এ-দেশীয় শিক্ষায় উপলব্ধ হবার কথা নয়, হয়ও না। বরং উল্টোটাই হয়। প্রাচ্য জ্ঞান মানুষের নম্রতা ও বিনয় বাড়ায়। এ দুটি মনোভঙ্গীর মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রাচ্যের আদর্শটি অধিক শ্রেয়, তবে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিকোণটির সপক্ষেও যে কিছু বলা যায় না এমন নয়। মধুসূদনের চরিত্রে যে অকপটতা ও মহানুভবতা আমরা লক্ষ্য করি তার মূল তাঁর ওই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত জনদুর্লভ আত্যন্তিক অহং-চেতনার মধ্যেই প্রোথিত রয়েছে বলে মনে হয়। সত্য বটে তাঁর আত্যন্তিক অহং-চেতনা তাঁর বিবেচনা-শক্তিকে অনেকখানি পরিমাণে পঙ্গু করে রেখেছিল—কি জীবনে কি কাব্যে কোথাও তিনি সুস্থির বিবেচনা-শক্তির পরিচয় দিয়ে যেতে পারেন নি—এবং তাঁর স্বভাবে যে impulsiveness বা ভাবোচ্ছলতা লক্ষ্য করা যায় তারও মূলে যে তাঁর ওই 'অহং' (ego) সে কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এই সত্য আমরা কেমন করে বিস্মৃত হই যে, মধুসূদনের অহং-চেতনাই তাঁর সকল সৃষ্টিশীল বিদ্রোহের মূলে ক্রিয়াশীল রয়েছে? তিনি যদি অহং-ভাবান্বিত না হতেন তা হলে বাংলা সাহিত্য চার-চারটে মূল্যবান এবং বহুদূর-প্রসারীফলসম্ভাবনাযুক্ত অভিনবত্ব-প্রয়াসের দ্বারা বোধ হয় সমৃদ্ধও হতে পারত না। মনে রাখতে হবে ইউরোপীয় ছাঁচে লেখা প্রথম বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৮) তিনি রচনা করেছিলেন অনেকটা বন্ধু গৌরদাস বসাকের কথার উত্তরে বাজীর মনোভাব নিয়ে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০)-ও একই মনোভাব প্রসূত। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি নঞর্থক উক্তির পাল্টা জবাব হিসাবে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন বাংলায় Blank Verse-এ সার্থক কাব্য রচনা সম্ভব। তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১) বা প্রহসনদ্বয় (১৮৬০) বা পরবর্তী 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) তিনি ঠিক বাজীর মনোভাব থেকে রচনা করেন নি বটে, তবে বাংলায় ইউরোপীয় ধাঁচের বিয়োগান্ত নাটক ও প্রহসন সৃষ্টি এবং সনেট নির্মাণের পিছনে তাঁর বিদ্রোহী সত্তা সর্বাংশে সক্রিয় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মধুসূদন আজন্ম-বিদ্রোহী ছিলেন। সৃষ্টি-তাড়ায় তাঁর সহজ উল্লাস ছিল বলে মনে হয়। বস্তুতঃ তিনি যদি সংসার-জীবনের হাতে ঠেকে না শিখতেন, সমাজের রূঢ় বাস্তব তাঁর জীবনের পথে যদি নানাবিধ বাধা-বিপত্তি উপস্থাপিত না করত, তা হলে তাঁর কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি কোথায় গিয়ে যে শেষ হত বলা দুষ্কর। তাঁর স্বভাবে গূঢ়সঞ্চিত তীব্র আলাময় বিদ্রোহী আগুন বাধাবন্ধহীন

ভাবে আপনাকে আলিয়ে পুড়িয়ে ক্ষয় করে একদিন হঠাৎ ধপ্ করে নিবে গিয়ে নিঃশেষে ফুরিয়ে যেত। মধুসূদনের প্রকৃতিকে বাধা দিতে পারে এমন প্রতিবন্ধক তাঁর ভাবজীবনে ছিল না,—তিনি বাধাকে বাধা বলেই মনে করতেন না;—একমাত্র সাংসারিক ক্ষেত্রে নানাবিধ নিগ্রহ লাঞ্ছনা দুর্গতি সহ্য করে তবে তিনি খানিকটা আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন। তবে এই চৈতন্যোদ্রেকও সাময়িক এবং ক্ষণিক, তাঁর মোহাবেশ চিরতরে ঘুচিয়ে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট জোরালো ছিল না। সংসার জীবনের হাতে দুঃখ-কষ্ট আর লাঞ্ছনার মার খেয়ে তাঁর অতৃপ্তিকাতর আর অবাধ্য বাসনা ক্ষণকালের জন্য প্রতিহত হয়েছে, আবার দুর্গতির মেঘ কেটে যেতেই মধুসূদনের স্ব-স্বভাব প্রকট হয়ে উঠেছে—তিনি পূর্বে যা ছিলেন তা-ই রয়েছেন। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' সাময়িক বিলাপ মাত্র। এ মোহভঙ্গ স্থায়ী হয় নি।

মধুসূদন-চরিত্রের এই হল কাঠামো। এ কাঠামোর সঙ্গে আজকের দিনের মানুষের মানসিক কাঠামোর মিল আছে। আমি পূর্বে যে দোদুল্যমানতার উল্লেখ করেছি সেই দোদুল্যমানতা যেমন মধুসূদনের স্বভাবে তেমনি একালীন মানুষের স্বভাবেও একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। আমরা এ কালের মানুষ কেন্দ্রবিচ্যুত হয়ে পড়েছি। আমাদের মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। কখনও আমরা প্রাচ্য জ্ঞানের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তপোবনী জীবন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি, কখনও পাশ্চাত্য ভোগবাদের দ্বারা বিমোহিত হয়ে তারই পাদমূলে জীবন সঁপে দিচ্ছি। আমাদের বর্তমান জীবনচর্যার ধারা-ধরণটাই এমন যে তা আমাদের পাশ্চাত্য ভোগবাদের দিকেই সমধিক টানছে। ভোগের পারে আমরা বাসরঘর লিখে রেখেছি বললেও চলে। কোন সুদূর প্রত্যুষে আজ আর আমাদের মনের আকাশে ধ্রুবতারার ন্যায় শোভমান নেই, আমরা প্রত্যহ যেন প্রত্যাষের অন্ধকারে কেবলই পথ হাতড়ে ফিরছি। মধুসূদন তাঁর জীবনের কেন্দ্রে সাময়িকভাবে অধিষ্ঠিত না হয়ে সকল সময়ের জন্য সুস্থিত হতে পারলে কত ভাবে যে জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন তা আর বলে শেষ করা যায় না। আমরাও যদি আমাদের জীবনের কেন্দ্রে ফিরে যেতে পারতাম তা হলে একালের ক্ষুদ্রশক্তি মানব আমরা, আমাদের দ্বারাও অনেক কাজ হতে পারত বোধ হয়। কিন্তু সে সম্ভাবনা নিজেরাই আমরা স্বীয় জীবনতরির দ্বারা খণ্ডিত করে ফেলেছি। আমাদের চৈতন্যোদ্রেক হবে কবে?

মধুসূদনের জীবনে আত্মবিলাপের আকস্মিকতা যে স্থায়ী হয় নি তার একাধিক প্রমাণ আছে। তাঁর 'আত্মবিলাপ' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটি তিনি রচনা করেন ১৮৬১ সনে। তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ বৎসর। এই বয়স প্রৌঢ়ত্বের সূচনাকাল। এই বয়সে মানুষের মনে মোটামুটি রকমের একটা ভারসাম্য দেখা দেয়। নানাবিধ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জীবনের প্রায় মধ্যভাগে এসে মানুষ স্বীয় শক্তির সম্ভাবনা এবং অপূর্ণতার মোটামুটি একটা হিসাব পায় এবং পরিবাসন ক্রিয়ার সাহায্যে নিজের শক্তির সৌধ বুঝে ফেলে তদনুযায়ী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ছাঁটাই করতে সচেষ্ট হয়; পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে তখন সম্ভাব্য পরবর্তী অভিজ্ঞতার ছাঁচটুকু চিনে নেবার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। মধুসূদনের বেলায়ও এ নিয়ম সত্য হতে পারত, কিন্তু, পূর্বেই বলেছি, প্রচলিত নিয়মের মূর্তিমান ব্যতিক্রম রূপেই মধুসূদনের জীবনের সার্থকতা ও মূল্য। যে মধুসূদন আশাভঙ্গের গভীর মনস্তাপে ক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠে বলছেন—

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
অস্ত যায় হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে।

নারিলি হরিতে মণি, রহিল কেবল ফণী।
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন, কেমনে!

তিনিই আবার বৎসরখানেকের মধ্যে "বিষজ্বালা" বেমালুম ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি ধনী হবার আশায় ইংলণ্ডের জাহাজে চাপছেন! বইল পড়ে চার বছরের একটানা কাব্যসাধনার আবেগ, কাব্যখ্যাতির দ্বারা তিনি সমাজে যে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অর্জন করেছিলেন তা শিকায় তোলা রইল—পড়ন্ত যে রঙে জলন্ত পাবক-শিখার পানে ছুটে চলে, তিনিও ঠিক তেমনি রঙে ব্যারিস্টারির আলেয়ার পিছনে ছুটলেন। কি না? দেশে ফিরে এসে একজন নেতা ও মানী ব্যক্তিরূপে সমাজে পরিচিত হওয়ার জন্য। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস আর এই পরিহাস একান্তভাবেই মধুসূদনের পাওনা ছিল। এরকম পরিণতি মধুসূদনেরই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত। ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে পড়েছি অষ্টাদশ শতকের ফরাসী লেখকেরা লেখককে খুব বড় কৃতিত্ব বলে মনে করতেন না, লেখক-জীবনের সাধনা, ওটা ছিল ওঁদের হাতের পাঁচ; কী করে বনেদী চাল বনেদী ভৌলুষ আরও বাড়ানো যায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে সমাজের মান্যমানতা পাওয়া যায় তা-ই ছিল ওঁদের ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা। উনিশ শতকীয় বাঙালীর জীবন থেকেও আমরা একই তথ্য আহরণ করি।

এও ঠিক সেই ব্যাপার। কবিকুলচূড়ামণি রূপে যেন যাঁকে মানায় করে নিয়েছে, তিনি ছুটলেন কিনা আরও বেশী সাহেব সাজবার আশায় অমায় এক ব্যারিস্টারী উপাধির তকমা গায়ে আঁটবার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, বশিষ্ঠও ফেলে দিয়ে আঁচলে কাঁচ বাঁধবার সাধনা একেই বলে। এই অভ্রান্তের সাধনায় নিজেকে লিপ্ত করতে গিয়ে মধুসূদন নিজ জীবনে কী বিড়ম্বনা ডেকে এনেছিলেন সে ইতিহাস সকলেই জানেন।

আর একটি নজীরের উল্লেখ করব। মধুসূদন একবার গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন—

"There is nothing like cultivating and enriching our mother tongue···If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother tongue. That is his legitimate sphere, his proper element·····Let those who feel that they have springs of fresh thought in them fly to their mother tongue..... Our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up."

মধুসূদনের বিখ্যাত সনেট "বঙ্গভাষা"র সঙ্গে এই ক'টি লাইন মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, মাতৃভাষার প্রতি এক সময়ে যেমনি তাঁর বিমুখতা ছিল তেমনি অন্য এক সময়ে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর মনে প্রবল সম্ভ্রমবোধ ও অনুরাগের সঞ্চার হয়। তাঁর সমৃদ্ধ কাব্যফসল শেষোক্ত সময়ের আবেগের দান। কিন্তু এই আবেগ তাঁর জীবনে স্থায়ী হয় নি। মাত্র চার-পাঁচ বৎসর তিনি প্রকৃত অর্থে সাহিত্যসাধনায় নিবিষ্ট ছিলেন, তার পরেই তিক্ততর ও নিষ্ঠুরতর আকর্ষণে সাহিত্যসাধনা থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছিলেন। উদ্ধৃত চিঠিতে ও অন্যান্য রচনায় মাতৃভাষার প্রতি তিনি যে অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন তাতে এতটুকু ফাঁকি ও মেকী ছিল না।—মধুসূদনের চরিত্রে মেকীর জায়গা নেই—, কিন্তু কবির জীবন-নিয়তিটাই এমন যে কোন-একটি বিশেষ আবেগে বেশীদিন আবদ্ধ হয়ে থাকা তাঁর স্বভাবের বিরোধী ব্যাপার ছিল। যে প্রবল অধ্যবসায় ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রথম যৌবনে তিনি ইংরেজী কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই একই উদ্দীপনার বশে তিনি ইংরেজী কাব্যসাধনা ছেড়ে জীবনের প্রায়-মধ্যভাগে মাতৃভাষার সাধনায় তাঁর সবটুকু উদ্যম ও মনোযোগ

নিয়োগ করেছিলেন। আবার মন-মেজাজের আর একটি ফেরতার সময়ে বহু যত্নে ও সাধনায় অর্জিত মাতৃভাষার প্রতি সতীর অনুরাগকে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত পরিত্যাগ করে অসার বিজাতীয়তার তরঙ্গে আপনাকে ভাসিয়ে দিতেও তাঁর বাধে নি। এই হলেন মধুসূদন, এবং মধুসূদনের স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য না বুঝলে তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্যকেও ভাল করে বোঝা যাবে না। সাংসারিক মানদণ্ডে যা ছিল মধুসূদনের স্বভাবের অস্থিরতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা, তাই পরোক্ষে, এক হিসাবে দেখতে গেলে, তাঁর কাব্যরচনার শক্তি জুগিয়েছে। উৎসার প্রকৃতি তাঁর কাব্যে, জীবনে। জীবনের পথে আকস্মিকতার ঝোঁকে ঝলকে ঝলকে তাঁর ছুটে চলা, তেমনি কাব্যসৃষ্টিতেও আকস্মিক প্রেরণার প্রাবল্যটাই বড় কথা। প্রেরণা যখন ফুরিয়েছে তখন রচনাও ফুরিয়েছে। কি জীবনে কি কাব্যে মধুসূদন কোথাও হিসাবী বুদ্ধির দ্বারা চালিত হন নি। সত্যিকারের শিল্পী মন ছিল তাঁর। কবির আত্যন্তিক শিল্পী সত্তা তাঁকে অনেক বিপাকে ফেলিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওইটি তাঁর শক্তিরও উৎস ছিল। তাঁর দুর্বলতা এবং বল একই সূত্র থেকে আহৃত হয়েছে। এ-জাতীয় প্রতিভার ধর্মই হল এই যে, ত স্বল্প সময়ের সীমার মধ্যে তীব্রতম আলোক বিচ্ছুরিত করে; দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে আলোর রোশনাই ছড়িয়ে দেওয়া এরকম প্রতিভার কাজ নয়।

মধুসূদনের অমিতাচারের একটি নীতিগত শিক্ষা আছে বর্তমান যুগের পক্ষে। তা এই যে, শক্তি যতই অপরিমিত হোক এবং প্রাণপ্রাচুর্য যতই অশেষ হোক তা যদি সংযমবন্ধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তা হলে সে শক্তির প্রকাশ প্রতিহত হতে বাধ্য। মধুসূদনের বেলায় হয়েছিলও তা-ই। তাঁর জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি তাঁর অমিতাচার আর অবিমৃষ্টকারিতার ফল। কবি যদি নিজ জীবনকে সংযমের শাসনের দ্বারা উপযুক্তভাবে দমিত করতে পারতেন তা হলে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পক্ষে তার ফল যে কত সুফলপ্রদ আর বৈচিত্র্যময় হতে পারত তা বলে শেষ করা যায় না। যে সামান্য কয় বছর তিনি কাব্যসাধনায় নিয়োজিত ছিলেন তাতেই বাংলা বাণীবিলাস অজস্র পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল, তাঁর সাধনার কাল যদি আরও বিস্তৃত হত এবং তাঁর শক্তি যদি পরিপূর্ণভাবে এই সাধনায় নিয়োজিত হত তা হলে কী অসম্ভব ব্যাপারই না ঘটতে পারত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে! এক মধুসূদনই তাঁর শক্তির দ্বারা বাংলা কাব্য-কাননকে নন্দন-কাননে পরিণত করতে পারতেন—দ্বিতীয় শক্তির প্রয়োজন হত না।

কিন্তু বলেছি, মধুসূদনের তেমন ধাতই ছিল না। হয় তিনি স্বল্পকালীন, নয় তিনি কোন কালের জন্যই নন। প্রথমতঃ তাঁর আত্যন্তিক শিল্পী স্বভাব তাঁর প্রতিভার উদ্যমকে দীর্ঘকালে প্রসারিত করার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, দ্বিতীয়তঃ উনিশ শতকের শিল্পী জগতে প্রচলিত রোমেন্টীয় আদর্শের দ্বারাও তিনি কম প্রভাবিত হন নি। কবি ভারতীয় আদর্শের অনুগত ছিলেন না, তিনি একান্তভাবেই ইউরোপীয় আদর্শের প্রভাবাধীন ছিলেন। সেইটি তাঁকে আরও বেশী করে রোমেন্টীয় হবার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাছাড়া তাঁর গোটা কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষা-দীক্ষাও তাঁকে নিয়ন্ত্রণ-বন্ধহীন জীবনযাত্রার পথে আকর্ষণ করতে কম প্রভাব বিস্তার করে নি। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অমিত লালসা ও বিশ্বাস মধুসূদনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল বললেও চলে।

খুব সম্ভবতঃ মধুসূদনের বিদগ্ধ দৃষ্টান্ত থেকে এ দেশের পরবর্তী কালের শিল্পীরা অপেক্ষাকৃত আত্মস্থ হবার প্রেরণা লাভ করেছেন। রোমেন্টীয় জীবন-যাত্রার আদর্শ এ কালের শিল্পী-মনে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তার উপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত ওই ব্যাপারে একটা মস্ত বড় check বা নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। তিনি স্বীয় জীবনযাপন প্রণালীতে ইউরোপীয় আদর্শের অনুসরণ না

করে ভারতের প্রাচীন ঋষি কবিদের সংযমপূত জীবনের ধারা অনুসরণ করেছেন। বাল্মীকি ব্যাস প্রমুখ ভারতীয় কবি-ঋষিদের প্রজ্ঞা বোধি ও নিরাসক্তি এ যুগের কোন কবি যদি নিজ জীবনে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করে থাকেন তো তিনি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে হয়তো উদ্ধার ক্ষণিক তীব্র আলো-বিচ্ছুরণ চোখে পড়ে না, কিন্তু তাতে আমাদের আক্ষেপ করবার কারণ ঘটে নি, কেন না ওই আলো একটি বিশেষ মুহূর্তে বা বিন্দুতে সংহত না হয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের পরিধির উপর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাতে তাঁর গোটা জীবনটাই প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পীর জীবনাচরণের এইটিই হল ভারতীয় আদর্শ এবং এইটিই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়। আমাদের মহাভাগ্য যে, আমরা আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এক পূর্ণ শিল্পীকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম। সংযমনিষ্ঠ আত্মস্থ অনাসক্ত শিল্পী রূপে তিনি আমাদের সমক্ষে এক ধ্রুব অনির্বাণ আলোকবর্তিকা স্বরূপ বিরাজ করেছেন। সর্ববিধ ভাবাকুলতা প্রবৃত্তিপ্রবণতা ও অহংবোধের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ পথের পথিক তিনি। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের একেবারেই বিপরীত কোটির শিল্পী। মধুসূদনের জীবনচর্যার আদর্শ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের জীবনাচরণের আদর্শ এ যুগে সমধিক কার্যকরী হওয়ায় এ যুগের শিল্পীরা বেঁচে গেছেন। এমনিতেই এ যুগের শিল্পীদের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে অমিতাচারের অন্ত নেই, তার উপর তাঁরা যদি মধুসূদনের জীবনাচরণের আদর্শটিও গ্রহণ করতেন তা হলে তাঁরা কোথায় এসে দাঁড়াতেন ভাবতেও আতঙ্ক হয়।

৩

এবার আমরা মধুসূদনের কাব্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করব। সংক্ষেপেই আলোচনা সারব, তার কারণ এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে এত বেশী আলোচনা হয়ে গেছে যে কিছু মৌলিক বক্তব্য থাকলে তবেই সেটা উপস্থিত করবার ঝুঁকি নেওয়া চলে, নয়তো পুরনো আলোচনার উপর ঘষা-বুলনো যে আলোচনা, সে রকম মামুলী কথার পুনরাবৃত্তির বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। মৌলিক কিছু বলতে পারব এমন আত্মপ্রত্যয় আমার নেই সুতরাং অল্পতেই বক্তব্য নিবেদন করি।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী কবির তালিকায় জয়দেব গোস্বামীর পরেই মধুসূদনের স্থান নির্দেশ করেছেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র প্রমুখের নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু সত্যিকার কবি বলতে জয়দেব গোস্বামীর পরেই মধুসূদনের উপর তিনি তাঁর সুনিশ্চিত পক্ষপাত ন্যস্ত করেছেন। এর কারণ কী? এর কারণ কি এই নয় যে এই দুই প্রধান কবিই নিজ নিজ পথে দুই বিশিষ্ট কাব্য-আন্দোলনের পথিকৃৎ? একজন সংস্কৃত কান্তমধুর ললিত পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত রচনা করে পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের অভ্যুদয় ও কাব্যপ্রেরণার পথ তৈরী করেছেন; অন্যজন বাংলা কাব্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে একাধিক ক্ষেত্রে নব রীতির প্রবর্তন করে আধুনিক কাব্যের পুরোধার গৌরব অর্জন করেছেন। প্রচলিত কাব্যরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আধুনিক কাব্যের সূচনা আর এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কি আঙ্গিক ছন্দঃপ্রকরণ শব্দরীতি ভাষাব্যবহারের দিক দিয়ে কি ভাববস্তুর বিচারে মধুসূদন বাংলা কাব্যের প্রচলিত ধারার প্রতিকূলতা করেছিলেন। তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের পথিকৃৎ শুধু নন, তার দিঙ্‌নির্দেশক তার গতির সঞ্চালক। আধুনিক বাংলা কাব্যশরীরের রক্তে রক্তে তিনি বিদ্রোহের আগুন পুরে দিয়েছিলেন। সেই বিদ্রোহের তেজ পরবর্তী কালে স্তিমিত হয়ে এলেও এখনও তার তাপ একেবারে মুছে যায় নি। বিশ শতকের গুদ্ধোত্তর বাংলা কাব্যে

আঙ্গিক নিয়ে নানাবিধ নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ভাববস্তুর নূতন নূতন পথে সঞ্চারণের মূলে যে মধুসূদনের আদিম বিদ্রোহের প্রেরণা সক্রিয় নেই সে কথা জোর করে বলা যায় না। সাহিত্যে ও কাব্যে গতানুগতিককে ভাঙবার প্রেরণা মধুসূদনই সবচেয়ে আমাদের বেশী জুগিয়েছেন। তাঁর বিদ্রোহের মশাল থেকে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ করা গিয়েছিল তারই আলোতে আজও বাংলা কাব্যের পথ-পরিক্রমা চলছে এমন কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। মধুসূদনের নিজে হাতে জ্বালানো মশালের আগুন আজও নেবে নি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, মহৎ কবিত্বের কৃতিত্ব অপেক্ষা অভিনবত্ব-প্রয়াসের কৃতিত্বই মধুসূদনের সমধিক প্রাপ্য। তা যদি হয়ও, সেও বড় কম কৃতিত্ব নয়। এক একজন কবি এতগুলি দিকে অভিনবত্বের প্রবর্তনার দ্বারা নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন এইটেই একটা বিস্ময়কর কীর্তিরূপে পরিগণনীয়। তাছাড়া কবিত্বেও তিনি প্রবলা শক্তির অধিকারী। বাংলা কাব্যে নমনীয়-কমনীয় ভাবেরই সমধিক চর্চা হয়েছে মধুসূদনের আগে পর্যন্ত। বৈষ্ণব ও মঙ্গল কাব্যগুলিতে বীর্যভাব দার্ঢ্য ও ওজঃগুণের একান্ত অসদ্ভাব ছিল। মধুসূদনের সর্বপ্রধান গৌরব এই যে, তিনি বাংলা কাব্যে এই তিন অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সঞ্চার করে বাংলা কাব্যের এযাবৎ অর্গলবদ্ধ এক নূতন সিংহদ্বারের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। বাংলা কাব্যে সত্যিকার গাম্ভীর্য রসও তাঁর দান। এক্ষেত্রে একমাত্র পূর্ব-নজীর রয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' কাব্যখানি। তবে গাম্ভীর্যের এমন ব্যাপক অনুশীলন ইতঃপূর্বে আর হয় নি।

মধুসূদন স্বীয় স্বভাবের অন্তর্তাগিদের বশে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে রামায়ণের প্রচলিত আদর্শের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর হাতে রামায়ণোক্ত চরিত্রগুলির গুরুত্ব-লঘুত্বের ধারণার অদলবদল হয়েছিল। তিনি রামকে সর্বগুণাধার করে না এঁকে রাবণকে মেঘনাদ বধ কাব্যের নায়করূপে অভিষ্টিত করেন এবং তৎপুত্র ইন্দ্রজিৎকেও প্রায় তত্তুল্য মর্যাদায় ভূষিত করেন। রাবণসুত ইন্দ্রজিতের পাশে রামভ্রাতা লক্ষ্মণ নিতান্ত নিষ্প্রভ মধুসূদনের রূপান্তরিত কাব্যে। এ রূপান্তরকরণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে কি না, হলেও তার মূল্য কতটা, আপাতত সে বিচারক্রিয়ায় প্রবেশ না করেও বলা যায়, মধুসূদন কর্তৃক এই যে রামায়ণের কাহিনীতে ঝোঁকের পরিবর্তন সাধন, অনায়ককে নায়কোচিত গুণে বিভূষণ—এর সঙ্গে আধুনিক কালের মানসিকতার মিল আছে। আধুনিক যুগ আড়ম্বরের পূজারী, শক্তির পূজারী, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন উপায়ের ঔচিত্যে বিশ্বাসী। রাম চরিত্রে কীর্তিত বৈষ্ণব গুণগুলিতে স্পর্শিত আধুনিক মানুষ বড় একটা বিশ্বাস করে না। সত্য ও অহিংসা এ যুগের দুই প্রধান বাণী হলেও, এখনকার বলদর্পী মানুষ তাতে আস্থা স্থাপন করে না। বরং সেই তুলনায় বাহুবল ধনবল লোকবল কূটবুদ্ধিবল ইত্যাদি বলেরই যেন বাজারদর অনেক বেশী। এই আধুনিক মানসিকতারই প্রতীক রূপে মধুসূদন রাম ছেড়ে রাবণের ভজনায় অগ্রসর হয়েছেন। আর এই মানসিকতারই প্রতিধ্বনি ব্যক্ত হয়েছে লক্ষ্মণের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে—

আনায় মারিবারে যারে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে?
• •
মারি অরি, পারি যে কৌশলে।"

এই হচ্ছে এ কালের যুগধর্মোচিত দৃষ্টিভঙ্গী। এই অনুচিত দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়, কিন্তু তাতে তার গতিবেগকে প্রহত করা যায় না। জোয়ারের আবর্তে ঘোলা জলের আবিলতাই বেশী, তাই বলে

জোয়ারকে কি বাধ মানানো যায়, না তাতে বাঁধ দেওয়া চলে? কালধর্ম ভাল হোক মন্দ হোক তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অস্বীকার করার যারা চেষ্টা করেন তাঁরা সংখ্যাশক্তিতে বহুগুণে ভারী বলে জনসাধারণ কর্তৃক নিগৃহীতই শুধু হন। এ যুগে সঙ্ঘবদ্ধ বুদ্ধিচারই জয়। অন্য পক্ষে প্রমীলার গর্বিত উক্তি—

"দানব নন্দিনী আমি, রক্ষঃকুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী।
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে,"

এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ঐশ্বর্যকৌলীন্যের চেতনা, বনেদিয়ানার মনোভাব, উপাদান-উপকরণের দীনতার প্রতি অবজ্ঞা। এ একেবারেই ভারতীয় মানসিকতা নয়, ইংরেজ শাসনের আওতায় আমাদের সমাজে বিত্তকুলীন যে নবধনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, তাঁদের মানসিকতার সঙ্গে এই কটি চরণে ব্যক্ত মনোভাবের কোথায় যেন একটা অলক্ষ্য সাদৃশ্য রয়েছে। উক্তিটি নারীমুখ নিঃসৃত হওয়ায় তার তাৎপর্য কমে না বরং সেই কারণেই আরও বেশী অর্থপূর্ণ। আভিজাত্যের মোহ যখন একটা নবসৃষ্ট সম্প্রদায়ের মনে মত্ততার আবেশ আনে তখন স্ত্রীপুরুষ কাউকেই রেয়াৎ করে না, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই চিত্তকে তা আবিষ্ট করে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। মধুসূদন ছিলেন নব বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি। ওই সমাজের বিশেষ সুখসুবিধার কক্ষপুটে লালিতবর্ধিত হওয়ায় সামাজিক আভিজাত্য সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধরনের মূল্যবোধ তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল—তারই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে তদঙ্কিত রাবণ চরিত্রে মেঘনাদ চরিত্রে প্রমীলা চরিত্রে। মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বের এইখানেই অসম্পূর্ণতা যে তিনি শ্রেণী চেতনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি, স্বশ্রেণীর বিশেষ মানসিকতার দ্বারা তাঁর কল্পনা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নবধনিক সম্প্রদায়ের অমিত আশাবাদী অহংকৃত মনোভাবের প্রতিনিধি কবি তিনি। তাঁর ভিতর যে বিদ্রোহ আমরা লক্ষ্য করি তা একান্তভাবে তাঁরই ব্যক্তিত্বের ভেতর পুঞ্জ একক বিদ্রোহ, আত্মকেন্দ্রিক বিদ্রোহ; এর সঙ্গে প্রচলিত শ্রেণীসম্পর্কের অবসান বা নূতন শ্রেণী সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর মন তেমনভাবে গঠিতও ছিল না। এ যুগের প্রবহমান গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে তখনও অনেক বিলম্ব ছিল।

মধুসূদনের বাংলা ভাষার উপর অধিকার সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে একজন সুপরিচিত লেখক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন, মধুসূদন বাংলা জানতেন এটা নাকি বাংলা সাহিত্যের এক 'দুর্ভাগ্যতম কুসংস্কার'। লেখক এ রকম উক্তি কী করে করতে পারলেন আমরা ভেবে পাই না। এ উক্তি শুধু অসত্যই নয়, সমগ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্ব-ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধারও দ্যোতক। যে মধুসূদনের কাব্য-সাধনার বুনিয়াদের উপর পরবর্তী কালের কাব্য সাধনার উত্তুঙ্গ প্রাকার দাঁড়িয়ে আছে, সেই বিশিষ্ট কবি পরিপূর্ণ বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এমন কথা বললে নিঃসঙ্কোচেই যে অস্বীকার করা হয় এই বোধ পর্যন্ত লেখকের নেই। তা যদি তাঁর থাকত তা হলে মধুসূদনের প্রতি এমন অবমাননাকর মেঘনাদাত্মক উক্তি তিনি কখনই করতে পারতেন না। কেউ কেউ মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দোলালিত কাব্যের, বিশেষ করে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র অতিরিক্ত শব্দালঙ্কার, ভাষাব্যবহারে দুরূহ জটিল বাক্যরীতির আশ্রয়, উপমা-উৎপ্রেক্ষার বাহুল্য ও কষ্টকল্পনা, অপ্রচলিত তথা আভিধানিক শব্দের সমাবেশ, ভাবের আত্যন্তিক গাম্ভীর্য ইত্যাদিকে মধুসূদনের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে প্রয়োগ করে তাঁর ভাষাজ্ঞানের অপ্রতুলতা ও কৃত্রিমতা প্রমাণে সচেষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের সতেরো বৎসর বয়সে লেখা

মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনায়ও এই-জাতীয় অভিযোগ ছিল, কিন্তু আপনারা জানেন যে রবীন্দ্রনাথ পরিণত জীবনে তাঁর এই সমালোচনা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। নিয়েছিলেন এই কারণে যে, ওইরূপ সমালোচনায় মধুসূদনের কাব্যের বহিরঙ্গের সমালোচনা মাত্র করা হয়, তাঁর কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় প্রকটিত হয় না। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে বাংলা কাব্যে এযাবৎ-অলভ্য যে ওজঃগুণ ও গাম্ভীর্যের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই তাঁকে বাক্যরীতিতে ও শব্দসন্নিবেশে কিঞ্চিৎ জটিল রীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল; তাছাড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিজস্ব প্রয়োজনেও তাঁর ওই কঠিনের পথ অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। নয় তো তাঁর কাব্যকে সহজের খাতে তিনি ইচ্ছা করলেই নামিয়ে আনতে পারতেন। তিনি যে লৌকিক ভাষারীতির সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন এবং তার সম্যক্ ব্যবহারও জানতেন তা তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', বিচ্ছিন্ন কবিতাবলী, নাটক ও প্রহসনের সংলাপ পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' থেকে দু-একটি কবিতাংশ উদ্ধার করছি। তা থেকেই বুঝতে পারা যাবে, সুললিত সুছাঁদ সহজবোধ্য বাক্য প্রয়োগেও মধুসূদনের দক্ষতা বড় কম ছিল না।

কি কহিলি কও, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন!
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
ধরে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ?
("সখি")

কিংবা,

কেনে এত ফুল তুলিলি সজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী,
তারার মালা?
আর কি রতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা?
আর কি পরিবে, কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী?
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার—
হতভাগিনী?
হায় লো ভোলারি সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া?
আর কি নাচে লো, তমালের তলে,
বনমালিয়া?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর—
গেছে উড়িয়া।
("কুসুম")

এমন মধুর শ্রুতিমধুর সুছন্দ ভাষায় যিনি কাব্য রচনা করতে পারেন তিনি বাংলা জানেন না এ কথা শুধু যে বিশ্বাসের অযোগ্য তাই নয়, অতীব হাস্যকর। মধুসূদনের প্রথম রচনা 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে (রচনাকাল ১৮৪৮ সনের শেষভাগ) মধুসূদন যে সংলাপের ভাষা ব্যবহার করেছেন তার বাক্যগঠনে তৎসম শব্দের আধিক্যটুকু বাদ দিলে সে ভাষা প্রায় এ কালের ভাষার সমতুল মনে হবে। আর প্রহসন দুটির সংলাপ ব্যবহারে তিনি তো একেবারে কথ্য রীতির চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। এত সব জোরালো বিপরীত সাক্ষ্য থাকতে কেমন করে যে আধুনিক কালের একজন মাত্র লেখক মধুসূদনের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষায় অজ্ঞতার অভিযোগ আনেন আমাদের পক্ষে তা বুঝে ওঠা সত্যিই দুষ্কর।

৪

পরিশেষে আর একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করব।

মধুসূদন স্বধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তর পরিগ্রহ করেছিলেন, ধর্মান্তর পরিগ্রহ করণের জন্য স্বজন কর্তৃক প্রায়-পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। তিনি কলিকাতা মহানগরীতে বাস করেও শুধু তাঁর ওই কার্যের জন্য প্রায়-নিরাত্মীয়ের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তৎকালীন সমাজের পক্ষে তাতে তাঁর কাব্যের রসাস্বাদনে ও তাঁকে কবি হিসাবে স্বীকৃতিদানে কোন বাধা ঘটে নি। তৎকালীন জনসমাজ মধুসূদনকে এক বাক্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে অভিনন্দিত করেছিলেন। এতে সেই যুগের মানুষের সহজ রসরসিকতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আজ থেকে একশো বছর আগে মধুসূদন বাংলার কাব্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। সে যুগ এ যুগের তুলনায় স্বভাবতঃই অনেক বেশী রক্ষণশীল ছিল। প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল মনের পক্ষে বিধর্মিতার অপরাধ ক্ষমা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। অথচ দেখতে পাই, খ্রীস্টিয়ান মধুসূদন কবি মধুসূদনের গ্রহিষ্ণুতার পথে আদৌ বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। তৎকালীন কাব্যের সন্ধানী মানুষ মধুসূদনের খ্রীস্টিয়ান পরিচয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাঁর কবি-পরিচয়কেই নিজেদের কাছে বড় করে তুলে ধরেছিলেন। এতে ঔদার্য, কাব্যরসগ্রহণক্ষমতা, সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিকতার বোধ প্রভৃতি বিভিন্ন গুণের একত্রকালীন পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের জীবিতকালেই মধুসূদন বাংলা দেশ কর্তৃক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন ইহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।"

ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে তদানীন্তন সমাজ কর্তৃক মধুসূদনকে একজন পরমাত্মীয় কবিরূপে গ্রহণের তাৎপর্য আমাদের ভাল করে পরিমাপ করা দরকার। মনে হয় এ কালে আমরা সেই ঔদার্য আর সহজ কাব্যের রসাস্বাদন-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা রাজনীতি দলীয়তা লেখকের ব্যক্তি-পরিচয় প্রভৃতি নানা অবান্তর প্রসঙ্গের দ্বারা রচনার সহজ গুণ গ্রহণরূপ কর্মকে আবৃত করে ফেলেছি। রচনার গুণাগুণ দ্বারা রচনার মূল্য নিরূপিত না হয়ে রচয়িতার ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচয়ের দ্বারা রচনার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। এ অভ্যাসের পরিবর্তন হওয়া দরকার। উনিশ শতকের কাব্যপাঠকের কাছ থেকে যদি আমরা তাঁদের ওই নৈর্ব্যক্তিক রসগ্রহণক্ষমতার আদর্শটিকে গ্রহণ করতে পারি তা হলে আমরা অনেক অনর্থের হাত থেকে মুক্তি পাব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

———

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পুনরাবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

দশ

আপনি চুপ চাপ করে কোথায় চললেন ?

একি ! পিছনে যে খুড়াই ডাকছে। আমাকে মুখ ফেরাতে দেখেই খুড়া হেসে ফেলল, বলল : দুজনের একজনও সুস্থ নন।

বললুম : শরীর দুজনেরই সুস্থ।

খুড়াও রাস্তার উপর নেমে এল। পাশে পাশে চলতে চলতে বলল : ঠিক ধরেছেন, আমি আপনাদের মাথার কথাই বলছি।

এই হোটেলে উঠেই অসুস্থ হল।

কেন ?

মাথা খারাপ হবার মতো কাণ্ড বারেবারেই ঘটছে।

যথা ?

পিছনে টিকটিকি এবং মেয়ে দুইই লেগেছে।

খুড়া খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল : টিকটিকি কে ?

খবর পাননি ?

না তো।

সন্দেহও করেননি কিছু ?

কিছু করছি বলেই ভয় পাচ্ছি।

তবে আমার সঙ্গে আর পথ চলবেন না, লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘরে ফিরে যান।

আপনি কি খুনের আসামী ?

তাহলে ভয় পাবার কারণ ছিল না।

কেন ?

সব কিছু চুকেই গেছে। ভয় পাওয়া উচিত খুনের মতলব আঁটছি জেনে। কেননা জড়িয়ে পড়বার ভয় আছে।

হেঁয়ালি ছেড়ে এবারে সত্যি কথাটা বলুন।

সত্যি কথাটা জানিনে, তবে সন্দেহের কথাটা বলতে পারি।

তবে তাই বলুন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আসছেন, সে খবরআপনাদের বাস ওয়ালা দিয়েছে। আর আমাদেরই হোটেলের

একটা ছোট ঘরে দুজন ভদ্রলোক ফিসফিস করে কথা বলছিল। হোটেলে সন্দেহ করবার মতো দুটো মানুষই আছে—রামানন্দ আর গোপাল। রামানন্দ একটা গবেষণার জন্য এসেছেন, গোপাল কেন এসেছে সেটা কারও জানা নেই। তার হাবভাব কথাবার্তা এমন কি আচার-আচরণও একটু সন্দেহজনক।

এ ইংরেজের রাজত্ব নয়, স্বদেশীর যুগও নয়। তবু কেন সন্দেহ করবে?

সন্দেহ করা ওদের কাজ। ওদের চাকরিই এই। কাউকে সন্দেহ না করলে মাসের পর মাস মাইনে নেবে কোন যুক্তিতে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পর ঋতা বলল: আপনার একটু সাবধানে চলা উচিত।

আমি হেসে ফেললুম।

হাসি নয় গোপালবাবু, অনর্থক ঝামেলা বাধিয়ে তো লাভ নেই।

আপনি আর আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানেন! অনর্থক তো নাও হতে পারে!

আমার বিশ্বাস হয় না।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললুম: আপনার তোয়ালের কথাগুলো বেশ ভাল লেগেছিল।

এখন বুঝি খারাপ লাগছে?

খারাপ নয়, বড় পানসে কথা। এ ধরনের কথা ঘরের ভেতর মানায়।

বলতুম না, স্বামীস্ত্রীতে? কিন্তু ঋতা বলল: পরিচয় নামমাত্র হলেও বোধ হয় মানায়। অন্তত সৌজন্যটা প্রকাশ পায়।

আন্তরিকতার সঙ্কটা আপত্তিকর কিনা, তাইতেই বলি, সৌজন্য তোলা থাক। উপরোধ না দিলেও কেউ অভদ্র বলবে না।

অভদ্র বললেও আমি লজ্জা পাব না।

এ সব কথা রামানন্দবাবুকে কেন বলছেন না? তিনি খুশী হতেন।

তা বুঝতে পেরেছি।

আর কিছু কি বোঝেননি?

ঋতা হেসে বলল: আপনাকে বললে যে উল্টো ফল হবে, তাও বুঝেছি।

তবু কেন বলছেন?

ঝগড়া করতেই আমার ভাল লাগে।

তবে এমন মিনমিনে ঝগড়া কেন করছেন? আসুন না চেঁচিয়ে করি।

আসুন।

ঋতা আবার হাসল! বলল: আপনাকে ধাক্কা খাওয়া মানুষ মনে হচ্ছে।

আপনিও অনেককে ধাক্কা দিয়েছেন।

আমার সম্বন্ধে তো আপনি কিছু জানেন না।

এই সমস্ত কথাতেই অনুমান করতে সুবিধে হচ্ছে। তবে আমাকে যে ধাক্কা দিতে পারবেন না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আপনি এমন নিশ্চিন্ত কেন?

এমন নিচের তলায় আমরা শুয়ে আছি যে সমাজের উপর তলার ধাক্কা সেখানে পৌঁছয় না।

আপনি যে কেরাণীগিরি করেন, তা শুনেছি।

এত তাড়াতাড়ি খবরটা সংগ্রহ করেছেন?

খতা হাসল।

হাসলুম: লোকে যে বদনাম করবে।

কেরাণী না হলে করত।

কেরাণী কি পুরুষ নয়?

মেয়েদের আকর্ষণ করতে পারে এমন পুরুষ নয়। তার জন্যে পদস্থ হওয়া দরকার।

না হলে অপদস্থ তো করতে পারেন।

পুরুষদের অপদস্থ করে বেড়ালে মেয়ে মহলে সুনাম হয়।

আপনি তাহলে সুনামেরই চেষ্টা করুন।

আর আপনি করুন আত্মরক্ষা।

বললুম: কিছু করব বলে এখানে আসিনি।

কিন্তু এসেছেন যখন তখন কিছু করতেই হবে।

তার জন্যে রামানন্দ বাবু আছেন, ওঁকে ধরুন। দরকার হলে—

দরকার হলে কী?

নায়কের ভূমিকা নিতে ওঁর আপত্তি হবে না।

ও ভূমিকাটি অনেকের কাছেই লোভনীয়। বুদ্ধিমান যারা, তারা বোকা সেজে লুকিয়ে থাকে। গভীর জলে অনেকদিন খেলে।

লোকে কি এখানে খেলবার ও খেলাবার জন্যে আসছে?

ভেতরে কোন গোলমাল না থাকলে সহজ হতে বাধা কিসের!

কথাটা যে খুব খাঁটি তা মেনে নিতে দ্বিধা হল না। আর আমি যে ভিতরের গোলযোগের জন্যই সহজ হতে পারছিনে, তা এই মেয়েটার কাছেও ধরা পড়ে গেছে। বললুম: কৌতূহল জিনিষটা ব্যক্তিগত না হলেই ভাল। এই যে লোকগুলো এখানে কাজ করছে, এদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগলে অনেক কিছু জানা যেত।

উত্তর না দিয়ে খতা চারিদিকের কর্মরত মানুষগুলোর দিকে তাকাল। তারা মাছ ধরার বড় বড় জাল বালির উপর বিছিয়ে বসেছে। নিঃশব্দে মেরামত করে চলেছে। কারও মাথায় সাদা টুপি, কারও কাপড়-জড়ানো মাথা। ঘুরে ঘুরে বসেছে, কেউ কারও সঙ্গে কথা কইছে না।

খতা বলল: কাউ দেখেছেন?

আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

খতা আমাকে আঙুল দিয়ে ঘুমন্ত মানুষ দেখাল। উদার আকাশ থেকে এখন উত্তাপ বৃষ্টি হচ্ছে। প্রসারিত সমুদ্র-সৈকতের কোনখানে একটু ছায়া নেই। তবু কতগুলো মানুষ এই গরম বালির উপর নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে ঘুমচ্ছে। ছোটবড় অসংখ্য নৌকো বালির উপর ইতস্তত ছড়ানো আছে। তারই গা ঘেঁষে একটুখানি ছায়া। সেই ছায়ায় মানুষ শুয়েছে। কেউ আবার কাপড় টাঙিয়ে ছায়ার সৃষ্টি করেছে। খতা বলল: সমুদ্রকে এরা সত্যিই ভালবাসে।

তাতে বুঝি সন্দেহ নেই। কষ্টিপাথরের মতো কালো দেহ পাথরের মত মজবুত। রোদে জলে

ঝড়ে নির্বিকার ভাবে সমুদ্রে নামছে, ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে পয়সা আনছে জীবনধারণের জন্য। শেষ রাত থেকে শেষ বেলা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম। তার উপর উটকো কাজ। নৌকো আর জাল মেরামত লেগেই আছে। কখনো হাতুড়ি কখনো সুঁচ। বেশিদিন মেরামত করেও চলে না, আবার নতুন করে গড়তে হয়। কেউ মাছ বিক্রী করে, কেউ হাত ধরে সমুদ্রে স্নান করায়। ঐতো মাথায় ঝাঁকা ভর্তি মাছ নিয়ে মেয়েরা সহরের দিকে যাচ্ছে। এই তো দুনিয়া মাত। এরা যদি সমুদ্রকে ভাল না বাসে, তাহলে আর কে বাসবে?

গুতা বলল: আপনি বুঝি মানলেন না আমার কথা?

এদের কথাই ভাবছি।

কী রকম?

সমুদ্রের গরম বালির ওপর কেমন নিশ্চিন্তে এরা ঘুমচ্ছে। সমুদ্রের গর্জন এদের ঘুমপাড়ানি গান। ছোট ছোট ছেলেরাও দেখুন সমুদ্রের টানে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

গুতা আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি লজ্জা পেলুম। সহসা মনে হল, আমার দুর্বল মনের কোন পরিচয় বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বললুম: সমুদ্রের প্রতি মেয়েদের কোন টান দেখছি না। ওদের মন নিশ্চয়ই ঘরমুখো।

গুতা বলল: এই বাড়িগুলোর পেছনেই দুনিয়াদের একটা বস্তি আছে। দেখেছেন?

না।

চলুন না, একবার দেখে আসি।

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

গুতা বলল: ভয় পেলেন নাকি?

আপনি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কিসের?

মানে?

বস্তিতে এখন শুধু মেয়েরা আছে। কোন পুরুষমানুষকে ঘুর ঘুর করতে দেখলে—

খিল খিল করে গুতা হেসে উঠল। অবাধ উদ্দাম হাসি। যে লোকগুলো একান্ত মনে কাজ করছিল, আমি তাদের চমকে উঠতে দেখলুম। হাসি থামলে গুতা বলল: মায়ের ভয়!

দুর্নামেরও।

আমি সঙ্গে থাকলে বুঝি সে সব ভয় নেই?

সভ্য সমাজের দৃষ্টি তখন আপনার ওপরেই পড়বে।

আর ওদের দৃষ্টি?

ওদের কৌতূহল কম। আমি একা গেলেও যেমন, আপনি সঙ্গে থাকলেও তেমনি। পুরুষ ও নারীকে নিয়ে কোন বিচিত্র সম্পর্ক ভাবতে ওরা অভ্যস্ত নয়।

তাহলে আপনি মায়ের ভয় কেন পাচ্ছিলেন?

সে তো ওদের কাছে নয়, সে আপনাদেরই প্রতিনিধির কাছে। মায়ের চেয়ে দুর্নামেরই বেশি ভয় পাই।

আমি সঙ্গে থাকলে?

দুর্নামটা আপনি বিশ্বাস করবেন না। আর রামানন্দবাবু কিছু সন্দেহ করলে আমার উপকার আছে। আমাকে তিনি পরিত্যাগ করলে আমি পরিত্রাণ পাই।

দুনিয়াদের বস্তির দিকে চলতে চলতে খুতা বলল: বলে দেব।

ছদ্মগাম্ভীর্যে মুখ তার থমথম করছে।

সমুদ্রের তীরে যে বাঁধানো সড়ক, তারই সমান্তরাল রাস্তা, ঠিক প্রথম সারির বাড়িগুলোর পিছনেই। কিন্তু সেই রাস্তায় পৌঁছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে এও পুরীর পথ। দুধারে অসংখ্য খড়ের ঘর, মাঝখানটা প্রশস্ত বটে, কিন্তু ধুলায় অপরিচ্ছন্ন। মনে হবে, পায়ে পায়ে সমুদ্রের সমস্ত বালি এসে এইখানে জমা হচ্ছে। সমুদ্রের মানুষগুলোর গায়ে লোনা জলের প্রলেপ যায় শুকিয়ে, কিন্তু পায়ের বালি ঘরের দুয়োর পর্যন্ত চলে আসে। ছেলেদের পায়ে পায়ে সেই ধুলো উড়ছে। ছেলেরা চক্রাকারে কোন খেলা খেলছে।

নদীর মানুষ নিয়ে অনেক লেখা আছে। পদ্মা, তিস্তার আর গঙ্গার মাঝিদের নিয়ে। সমুদ্রের মানুষ নিয়েও নাকি লেখা হয়েছে, আমি পড়িনি। খুতা ঠিক এই প্রশ্নই করল: এই সব মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু জানেন?

না।

কোন কৌতূহল নেই?

একটা ছিল।

আজ কেন ফুরিয়ে গেল?

বড় ক্লান্ত বোধ করছি।

আপনি খুব আরেশী লোক মনে হচ্ছে।

এ কথার প্রতিবাদ করলুম না। প্রতিবাদ করতে গেলেই কিছু অপ্রয়োজনীয় কথা এসে পড়বে। সব কথা সকলের সামনে বলা যায় না।

খুতা বলল: এদের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে। একটা জিনিস ভারি অদ্ভুত দেখছি। পুরুষরা সারাক্ষণই সমুদ্রে আছে। অথচ মেয়েদের দেখি না। মেয়েরা বোধ হয় সমুদ্রকে ঘেন্না করে। কেন এমন হয় বলতে পারেন?

আমি এদের লক্ষ্য করবার সুযোগ পাইনি। খুতার কথা সত্য কিনা তাও জানিনে। সত্য হতেও পারে। স্বামী যদি সমুদ্র নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকে, স্ত্রী সেই সমুদ্রকে সতীন ভাবলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সভ্য সমাজে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অসন্তোষের এই প্রধান কারণ। এদের বিবাদ বোধ হয় তত তীব্র নয়। জীবনের সমস্যাকে এরা সহজভাবে মেনে নিতে পারে। বললুম: সমুদ্র এদের সতীন।

খুতা খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল: বেশ বলেছেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় এদের ঝগড়া দেখেছি। পুরুষেরা নেশা করে ঘরে ফিরেছিল—

বললুম: দোষ ঐ পুরুষদেরই। ওরা নেশা করে বলেই ঝগড়া হয়।

না না, দোষ ঐ মেয়েদের। অমন নেশা না করলে সমুদ্রের সঙ্গে লড়বে কী করে!

বলে আমার দিকে চেয়ে খুতা কৌতুকে হাসল। আমাকেও হাসতে হবে।

দুনিয়াদের জীবনযাত্রা আমাদের দেখা হল না। দেখা সম্ভব নয়। জীবন যদি ঘটনা হত, তাহলে

তার খবর সংগ্রহ করা যেত, ছাপা চলত খবরের কাগজের পাতায়। জীবনের খবর পাওয়া যায় জীবনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে। আমরা তা পারিনে। দূর থেকে দেখে আমরা একটা ধারণার সৃষ্টি করি। যে ধারণার ভিত্তিতে কোন সত্য নেই। এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম।

বাড়িটের বারান্দায় রামানন্দবাবু অপেক্ষা করছিলেন। শুভার সঙ্গে আমাকে দেখে একেবারে চমকে উঠলেন: আপনি!

হ্যাঁ আমি।

দুপুর রোদে কোথায় বেরিয়েছিলেন?

শুভা উত্তর দিল: বেড়াতে।

রামানন্দবাবু ঠিক এমনটি আশা করেননি। আমতা আমতা করে বললেন: তাইতো।

তাঁকে আশ্বাস দেবার জন্য আমি বললুম: আপনাকেও সঙ্গে নেব ভেবেছিলুম, কিন্তু—

কিন্তু কী?

আপনি ঘুমচ্ছিলেন।

কী যা-তা বলছেন। দুপুরে আমি কখনও ঘুমোই?

আমি ভাবলুম, হবেও বা। কিন্তু শুভা হেসে উঠল উচ্ছলিত কৌতুকে: না না, দুপুরে আপনি ঘুমোবেন কেন! আমরা সমুদ্রের গর্জন শুনেছি।

আমি হেসে বললুম: শুনেছেন বুঝি?

উত্তরে শুভা হাসল। কিন্তু দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমাকে একা পেয়ে রামানন্দবাবু ক্ষেপে উঠলেন। বললেন: এ নিশ্চয়ই আপনার কাজ!

কোন্ কাজ?

এই যে আমার নামে লাগিয়ে বসে আছেন।

একসঙ্গে থাকলে এসব নানা বিপদ। আমাকে যেতে দিন না!

রামানন্দবাবুর মনে পড়ল হোটেলের কনসেসনের কথা। দুজনে এক ঘরে থাকার জন্য কিছু সুবিধা পাওয়া গেছে। আলাদা হলেই খরচ বাড়বে। রাগত ভাবে বললেন: যেতে দিচ্ছি বৈকি।

আর যা বললেন, তা আমার কানে গেল না। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে রামানন্দবাবু অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁকে হোটেলে ফেলে আমাদের বেরিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি।

বললুম: বুঝতেই পারছেন—

রামানন্দবাবু বুঝতে পারছেন বৈকি! (ক্রমশঃ)

পার্শ্বচরিত্র

সুশীল সিংহ

আসলে কুকুরের মৃত্যুটা এ ছবিতে একটা বড় এবং বিশেষ ঘটনা। তাই এ ছবিতে কুকুরের ভূমিকা ও অভিনয়ের গুরুত্ব বোঝার জন্য ছবির কাহিনীর সেইটুকু অন্তত জানা দরকার। দৃশ্যটাও।

এ ছবির কাহিনীতে আছে শরৎকালের এক বৃষ্টিঝরা বিকেলে মণিমোহন এসেছে লহরীর বাড়ীতে। মণিমোহন এ কাহিনীর উপনায়ক। একদিন তার স্বপ্নের সপ্তডিঙা কল্পনার সাগর পাড়ি দিত বাসনার এক দ্বীপ লক্ষ্য করে সেই কন্যার নাম লহরী। একরোখা আবেগ মণিমোহনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সে আবেগে অন্ধ মণিমোহন। যে লহরী অন্যের ঘরণী হয়েছে তার সান্নিধ্যে এসে তাকে পাওয়া মণিমোহনের স্বভাব নয়, ভিক্ষাও নয়। যাকে একান্ত করে চেয়েও সে পায়নি, সেই লহরীকে সে মুছে দেবে পৃথিবী থেকে। মুছে যাবে নিজেও। সেই উদ্দেশ্যে—লহরীকে ও নিজেকে মৃত্যু দেবে বলে—সেই বৃষ্টিঝরা বিকেলে লহরীর বাড়ীতে এসেছিল মণিমোহন। আততায়ীর মত কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র সে লুকিয়ে আনেনি। টিফিন বাক্সে করে কোন হোটেলের রাঁধা মাংস এনেছিল বেশ খানিকটা। বিষ মাখিয়েছিল নিজের হাতে।

লহরী অবাক হয়েছিল। তবু ভদ্রতার হাসি হেসে স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিল সে।

সেই মুহূর্তে একটা চক্রান্তের শিহরণে মণিমোহনের সমগ্র অন্তরাত্মা ক্রমশঃ অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। তাই সে স্পষ্ট বলল, জিনিষ ফিরিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।

—তা কেন? আমরা খানিকক্ষণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে পারি!

—পারি। রোজই পারি। কিন্তু আজ পারি না। চাই না।

—কেন?

—এ কেনর কোন উত্তর নেই। 'চাই না'-এই যথেষ্ট।

বাইরে আকাশে আলোড়ন। ঝর ঝর করে বৃষ্টি ঝরছে। ঘরটার মধ্যে নীরবতা। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে লহরী ভাবছে। তার সেই পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকার দিকে চেয়ে আছে মণিমোহন। লহরীর বিয়ের পর এই প্রায় এক বছরে খুব কম এসেছে সে। হয়ত এই নিয়ে চারবার। কিংবা তিনবার। এর আগে কোন দিন লহরীর স্বামীর অনুপস্থিতিতে এ বাড়ীতে আসেনি সে। আজ এসেছে সে। কেন এল? জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে এই কথাটাই কি ভাবছে লহরী?

—বুঝেছি। ঠিকই তো। এই সময় আসা আমার ভুল, শুধু ভুল নয়, অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা, চলি।

—না। না। সেকি। বস, জানলার কাছ থেকে হাল্কা পায়ে কাছে এসে বিপরীত দিকে বেতের চেয়ারটায় বসল লহরী।

মণিমোহনের মনে হয়ত সেই মুহূর্তে অনেক স্মৃতির টুকরো ভীড় করে এসেছিল। আবেগে অন্ধ ও অপ্রকৃতিস্থ মণিমোহনের মুখের প্রতিটি সূক্ষ্ম রেখা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যেত তা। এইখানটায়

মণিমোহনের অভিব্যক্তির একটা 'ক্লোজআপ' নেওয়া হবে। দেখা যাবে সে তার নিজের একটা ঠোঁট দিয়ে আরেকটা ঠোঁটকে পীড়ন করছে। আর ডান হাতের একটা আঙুল অকারণে ঘষছে টেবিলের ওপর।

মণিমোহন বললে,—স্বর্গের পারিজাত চাইনি, অসন্তব কিছুই দাবী করিনি যে—

কথাটা শেষ করল না মণিমোহন। নিজেই ডাকল, রাধু—

রাধু বাড়ীর চাকরের নাম। রাধু এল। পিছনে পিছনে এল একটা এদেশী কুকুর। গায়ের রঙটা পাঁশুটে। কটা চোখ। লম্বাটে মুখ। দেশী, তবে পথের কুকুর নয়। তাই শরীরটি বেশ চিকন। লহরীর স্বামী সতীশ নাকি তাকে স্নেহ করে।

—রাধু।

—একটা প্লেট নিয়ে এসো।

—একটা? লহরী জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, একটাই।

প্লেট আনতে চলে গেল রাধু। কুকুরটা একটু এদিক ওদিক ঘুরে লহরীর পায়ের কাছে বসে পড়ল।

—রাধু এল।

প্লেটে মাংস চাপল মণিমোহন। একটা মৃদু খোসবাই ছড়িয়ে গেল হাওয়ায়। কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়ে জিব বার করে লেজ নাড়তে লাগল।

একই প্লেট থেকে দু'জনে এই সামান্য খাবারটুকু খাবে এই চেয়েছিল মণিমোহন। আর কিছু নয়। অতি সামান্য।

মণিমোহনের হাত চলে এসেছে প্রায় তার মুখের কাছে। নিজের মুখে নেওয়ার আগে লহরীর দিকে চেয়ে আছে। একটা টুকরো তুলে নিতে লহরী বললে, কোন মানে হয় না এ'ছেলে-মানুষীর।

কুকুরটা তখন চেয়ে আছে লহরীর হাতের দিকে। সেদিকে চেয়ে লহরী বলল, কি রে খাবি?

এই বলে তার হাতের টুকরাটা মাটিতে ফেলে দিল।

—না, না, বলে উত্তেজিত হয়ে তাকে বাধা দিতে চাইল মণিমোহন। তার এই আচরণে বিস্মিত হ'ল লহরী। ততক্ষণে কুকুরটা এক কামড় দিয়েছে। বাঁ পায়ের নখে টুকরোটা ধরে গুছিয়ে বসে খেয়ে ফেলছে টুকরোটা।

টুকরোটা ফুরিয়ে যেতেই কুকুরটা লুটিয়ে পড়ল মেঝের। তার চোখ দুটো বুজে যেতে চেয়েও ঝিক্ ঝিক্ করে জলে উঠছে মাঝে মাঝে। পা দিয়ে সে যেন সিমেন্টের মেঝেটাকে চিরে ফেলতে চাইছে। উগ্র তীব্র ধারালো বিষ—বিস্তর ফেনা টেনে বার করেছে কুকুরটার মুখ দিয়ে।

এই দৃশ্য। মরে যাওয়ার আগে প্রাণটাকে ধরে রাখার জন্য কুকুরটার করুণ, অন্তিম কাকুতি দর্শকের মনে গেঁথে দেওয়া দরকার। ওই টুকরোটা কুকুরটার পেটে না গেলে লহরী আর মণিমোহনের এই দশা হতো। সেই মৃত্যুকে আড়াল করল কুকুরটা। মেকী হলে চলবে না। ভাসির ওপর তুলির টান দিলে যথার্থ মৃত্যুর ছবিতো কিছুতেই ফোটেনা, হাস্যকর কিছু হয়। চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি, মুখের হাঁ, বেড়িয়ে পড়া জিব, অজস্র ফেনা এইসব হুবহু চাই। চাই-ই। অগত্যা একটি কুকুরকে অনুরূপ তীব্র বিষক্রিয়ার সেটের মধ্যে মেরে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পরিচালক তরুণ। কাহিনীর মধ্যে কেবলমাত্র নাটকীয়তা আনা ছাড়াও তিনি এই ঘটনার ব্যঞ্জনার দিকটাও নানাভাবে বুঝে নেবেছেন। প্রথমতঃ মন দেওয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের (আমাদের দেশে) যে বিশেষ ধুর যন্ত্রণা, মণিমোহন একদিক থেকে তারই প্রতিনিধি। ভালবাসার ক্ষেত্রে পাওয়া না পাওয়ার জটিলতা ইতিহাসের আগে থেকেই আছে। যুগের সঙ্গে তার রূপ বদলও আছে। কিন্তু বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা এই মুহূর্তে যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এর আগে তা কোনদিন দেখা যায় নি। লহরীকে মারতে চেয়ে ও নিজে মরে—অর্থাৎ মৃত্যুতে আমরা আমাদের—ভাবাবেগে বোকামীর চরম করেছে মণিমোহন। মাত্রার দিক থেকে ব্যতিক্রম। কিন্তু এই চরমটাকেই—একটা বিকৃত মৃত্যুকে—টুকরো টুকরো করে নানা ভাগে, উপভাগে, বিচিত্রভাবে মণিমোহন লহরীরা কি নিজেদের মধ্যে অহরহ ছড়িয়ে দিচ্ছে না? হবে?

ব্যঞ্জনার অন্তর্দিক হল প্রাণ-যে কি অমূল্য অমৃত আধার তো এঁদের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে ভাবা দরকার। প্রাণ প্রাণই। কুকুরটাকে মরতে দেখে দর্শকের বুকের পাঁজরে টন্‌টন্ করে বাজুক। হায় হায় করে উঠুক। ওটা চাই। কুকুর মরবে। গ্রহণ করা হবে দৃশ্য। যথাযথ।

॥ ২ ॥

সুতরাং একটা কুকুরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যে লোকটির ওপর এঁদের দায়িত্ব দেওয়া হল তার চলতি নাম: পাত্র। পুরো নাম পঞ্চানন মহাপাত্র।

ষ্টুডিও চত্বরের মধ্যেই আউট হাউসের মত একটি ঘুপসি ঘরে থাকে পঞ্চানন। সে মানুষটা মাথায় খাটো, বুদ্ধি পরে আরো খাটো। রোগা চেহারা, চোয়ালবসা মুখ। পঞ্চানন ছাগ মাংস খুব ভালবাসে। এত ভালবাসে যে অনেকের ধারণা তার পূর্বপুরুষ বৈষ্ণব ছিল।

পাত্র যে কবে থেকে ওই ঘরটা অধিকার করে আছে তা সঠিক জানতে হলে ইতিহাস ঘাঁটতে হয়। পঞ্চানন ওখানে আছে, থাকে এবং থাকবে এ কথাটাই সবাই জানে। অনেক নক্ষত্রের ওঠানামা ঘটেছে ওর চোখের সামনে। কিন্তু সে সব ওর পক্ষে কোন অভিজ্ঞতা নয়। কেননা ও কিছু দেখে না। ঠাকুরের উপমা ধরতে গেলে ও হল সেই ভাতের মাছ যার গায়ে পাক লাগে না। ও কেবল আছে। সিনেমার সাতে পাঁচে নেই। অথচ ষ্টুডিওর বাগান, পুকুর সব কিছু মিলিয়ে যে গোটা এলাকা তা ওর সব জানা। সে যেন অনেকটা গাইডের মত। ষ্টুডিওর মধ্যে কখন কোথায় গেলে কাকে পাওয়া যাবে, তা প্রায়ই ও ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে। যেমন। পাত্র কুলির কাজ করে। বিভিন্ন মোট ভারী জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করা, সাজান, এখানকার জিনিষ ওখান করা এই তার কাজ। এই কাজটা কোনদিন কেউ তাকে দেয়নি। সে নিজেই তুলে নিয়েছে।

একদিন ষ্টুডিওতে কুলিগিরি করে দিন গুজরান করতে হবে এ' কথা জেনে পাত্র এখানে আসেনি। অনেকেই জানে এবং সে নিজেও মেজাজী থাকলে হেসে হেসে বলে, জানেন তো আপনাদের—বাবু (সে একজন বিখ্যাত প্রবীণ নটের নাম করে) যখন ঘর ছেড়ে এ 'মাইনে' এলো তখন থেকেই আমি এখানে আছি। আমি হলাম গিয়ে সে বংশের চাকর। খোকাবাবুর মা গিন্নিমা আমায় পাঠিয়েছিলেন সে বাবুকে চোকে চোকে রাখার জন্যে।

তারপর কতদিন হয়ে গেল।

পঞ্চানন বলে, রাখতে রাখতে চোখের নাগাল কাটিয়ে বাবু দোথায় চলে গেলেন। কিন্তু সে রয়ে গেছে আজও।

এ'হেন পঞ্চাননের খুপরি ঘরের কাছে মাস সাতেক আগে একটা কুকুরের চারটে বাচ্চা হয়েছিল। দেখতে দেখতে বাচ্চাগুলো বেড়ে হয়ে উঠেছে। পঞ্চানন ওদের দেখাশোনা করে। বেলা দু'পহরে যখন সে খাওয়া সেব করে তখন নিজে সে ডাকে: আয়। কইরে? মা—আ—য়। ই গেলো যা।

কুকুর চারটেকেই দেখতে মোটামুটি এক। রঙেরও কোন বৈচিত্র্য নেই। তোয়াল, চোখ, থাবা, ওই একই। চারটেরই গায়ে এঁটুলি হয়েছে। দুপুরে নিরিবিলিতে যখন মাটিতে শোয় তখন থেকে থেকে পিঠের ওপর থাবলে ধরে।

পঞ্চাননের ডাক কুকুরগুলোর চেনা। দৌড়ে আসে তারা। জিব বার করে সেজ নাড়তে থাকে পায়ের কাছে ঘিরে। এঁটো কাঁটা ভাত সে ছড়িয়ে দেয়। বোধ হয় এদের জন্যই রুইই ঘরের উত্তিষ্ট সে খানিকটা সংগ্রহ করে আনে। চারটে কুকুর পরস্পরের দিকে চেয়ে গর্—র্—র্ করে ডাকে। তাদের দাঁতালো মুখ কুৎসিত হয়ে যায়। কুস্তী। কাড়াকাড়ি করে খায়।

আর সেই অবস্থায় যাকে পঞ্চানন দাঁড়িয়ে একটার গায়ে গোড়ালি দিয়ে বেমম লাথি মারে, গাল দেয়। কুকুরগুলো তাকে কিছুই করে না। নিজেদের মধ্যেই খাওয়াখায়ি করে।

একদিন উল্লিখিত ছবির তরুণ পরিচালকের তা নজরে পড়ে গেল। তরুণ শিল্পীর গুণই এই যে তা সব কিছুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। বর্জন করার আগে অন্ততঃ একবার ভেবে দেখতে ভোলে না।

ষ্টুডিওর কুলি পঞ্চানন মহাপাত্রকে সেদিন পরিচালক অন্য কাজের বায়না দিলেন। কুকুরকে অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার কাজ। অভিনয় নয়, একটা অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে কুকুরটাকে। এই কাজ।

—তুমি নও, পার্ট করবে তোমার কুকুর।

—আমার কুকুর নয় এঁজে।

—আহ্—হা। তোমার হবে। তুমি পার্ট শেখাবে ওকে।

—আমি?

আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি।

কুকুরটার মৃত্যুর দৃশ্য গ্রহণ করা হবে এই পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক পরিকল্পনা মাথায় খেলে গেল। কুকুরটা সে বাড়ীর কর্তা ও কর্ত্রীর খুব ন্যাওটা, পায়ে পায়ে ঘোরে, এসব দেখানো দরকার। সেটা এমন কিছু কঠিন নয়।

হবে। সব হবে।

॥ ৩ ॥

পেট। খিদে। ওইখানে যা দিলে জানোয়ারও শিক্ষিত হতে দেরী করে না। নিজের গরজে শেখে। কুকুরটাও শিখতে লাগল।

প্রথম প্রথম পঞ্চানন তাকে নিজের ঘরের কোণে বেঁধে রেখে দিত। দু'বেলা খাওয়াতো। স্নান

করাতো সপ্তাহে দু'দিন। বাবুরা কি একটা পার্টিতার আর ওমুখ এসে দিয়েছেন। তাই খাওয়া। গায়ের পোকাগুলো গেলো মরে। ছাদের নিচে ঘরের কোণে চটের বিছানায় সে সদা আরামে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকত। মাঝে মাঝে তার গায়ে হাত বুলোত পঞ্চানন। ফলে তাদের দুজনের মধ্যে অচিরে একটা ভাব ভালবাসার সম্পর্ক হয়ে গেল। পঞ্চাননের চোখের ভাষা, হাতের নির্দেশ কুকুরটা বুঝতে আরম্ভ করল। দরজায় দাঁড়িয়ে সে যে-কোন লোক ও বিশেষ ভাবে তার মার পেটের আর তিন সহোদর সহোদরাকে হাঁক ডাকে বাড়ী থেকে তফাতে রাখতে আরম্ভ করল।

এই সময় একপো মাংস বিনামিত বরাদ্দ হল পঞ্চানন ও তার কুকুরের জন্য। কাঁচা নয়, রাঁধা মাংস। এই বরাদ্দের সংগে সংগে শিক্ষা দেওয়ার রীতিও বদলে গেল ক্রত। অবশ্যই পরিচালকের নির্দেশে। সকাল থেকে অভুক্ত রইল কুকুরটা। মাঝে মাঝে সে করুণ চোখে পাত্রের দিকে চায়। জিব বার করে, লেজ নাড়ে। হাঁ করে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে। তারপর শিকল বাঁধা অবস্থাতেই ছটফট আরম্ভ করল। নখে করে আঁচড়াল মেঝে। তর্জন, গর্জন, পেটে তার ক্ষিদের আগুন জ্বলছে। অবশেষে খানিকটা নিস্তেজ হয়ে সে ঝিমিয়ে পড়ল।

বেলা যখন দু'পহর তখন নিজের খাওয়া শেষ করে পঞ্চানন তার শিকল খুলে দিল। খাবার রাখা ছিল মেঝেয়। কুকুরটা লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। তাকে সামলাতে গিয়ে খাবার খা খেল পঞ্চানন। আর একটু হলে কামড়েও দিত। হিংস্র ভাবে অনুরূপ শব্দ করে কুকুরটা তেড়ে এল তাকে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পঞ্চানন তার খেলা দেখল। ভাতের থালা আর মাংসের বাটী নিঃশেষ করেই কুকুরটা বাইরে বার হয়ে গেল। পঞ্চাননকে নিশ্চিন্ত করে ফিরেও এলো একঘণ্টার মধ্যে। শান্ত। নিশ্চিন্ত। স্বস্থানে শয়ান হল।

এইভাবে পর পর তিনদিন।

চতুর্থ দিনে একটি বেতের টেবিল ও দুটি চেয়ার এলো পঞ্চাননের ঘরে। তা দেখে পাত্র তো হেসে বাঁচে না। এ সবই নাকি তার। বটে? সাত জন্মে চেয়ার টেবিল চোকেনি তাদের ঘরে। কোনদিন দরকারও হয়নি। খোকাবাবু—সে কতদিন আগে—যেদিন সিনেমার নাম শিখালে তখন গিন্নিমার সে কি কান্না। কতবড় বংশ। লক্ষ্মীর মত চেহারা, কেঁদে কেঁদে সারা। খোকাবাবুর তখন যেন কার্তিকের কান্তি। আর কর্তা মশাই? গিন্নীমা লুকিয়ে লুকিয়ে পঞ্চাননকে পাঠালেন কলকাতার ইডিওতে। সেই থেকে সে আছে। তারপর কতদিন হয়ে গেল। তখন এখানকার বাবুরা ছিল বাঁধা, চেনা। এখন কতই আসছে। রোজ। হাজারে। কুকুরের ভাগ্যে এতদিনে চেয়ার টেবিল জুটলো তার। আরাম করে বসে পঞ্চানন একটা বিড়ি ধরাল।

পঞ্চাননের দিক থেকে যাই হোক। সঠিক অভ্যাসের জন্য এ'সবের প্রয়োজন ছিল। দুটো চেয়ারে একটায় বসবে লহরী অন্যটায় মণিমোহন। মাংসের বাটি থাকবে টেবিলের ওপর। বাটি খোলার পর নিজের মুখের কাছে মণিমোহনের মাংস তুলে নেওয়া, লহরীর দিকে চেয়ে থাকা, খাবার তুলে লহরীর কুকুরটার দিকে তাকান ও বলা, 'কি রে খাবি?'……ইত্যাদি এ্যাকসন ও ডায়লগ বলার মত সময় চাই। সেইভাবে কুকুরটাকে শিক্ষিত করা দরকার।

চতুর্থ দিন থেকে মাংসের বরাদ্দ দ্বিগুণ হল। একপো পঞ্চাননের একপো কুকুরের। মাপা। সকাল থেকে অভুক্ত থেকে ভরপেটে খেলে আর বাইরে যাবার দরকার হবে না। শিকল ধরে পঞ্চাননই ঘুরিয়ে আনতে পারবে।

চেয়ার টেবিল ছাড়াও আর একটা জিনিষ এলো পঞ্চাননের ঘরে। লক্ষ্মীকে একখানা বেত।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে কোনকিছুর একটা দানা পড়েনি কুকুরের পেটে। খিদে বাড়ছে আর বাড়ছে। নানাভাবে খিদেটা জানাল সে। ঝিমিয়ে গেল। অবশেষে সূর্য যখন মাথার ওপর উঠল তখন টেবিলের ওপর ঢাকনা খুলল পঞ্চানন। ঘ্রাণে চকল মস্ত লাফিয়ে উঠল। খাবার ছড়িয়ে গেল ঘরময়। ঝোল, টুকরো, ভাত চেটে চেটে খেতে লাগল জানোয়ারটা।

পরদিন থেকে পঞ্চাননকে সহকারী দেওয়া হল একজন। অশিষ্ট অধৈর্য হলে চলবে না। সে বেত চালায়। সপাং। নির্দয়, নির্মোহ।

একটা চাবুকে ঠাণ্ডা হয় না খিদে, মানে না। আরো জোরে আবার চালায়।

এইভাবে রোজ।

কুকুরটা জেনে গেল যে খাবারের বাটি খোলা হলে অস্থিরতা চলবে না। আর সে অস্থির হয় না। গুটি গুটি পায়ে চেয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তারপর পঞ্চাননের পায়ের কাছে গুটিয়ে শুয়ে থাকে। বাটি খোলে পঞ্চানন। গন্ধে উঠে দাঁড়ায় কুকুর। পঞ্চানন একটু সময় নেয় তারপর একটা টুকরো তুলে নিয়ে বলে, 'কি রে খাবি?' কুকুরটা কুঁই কুঁই করে। পায়ের ওপর মুখ রাখে।

একটা টুকরো ফেলে। সবটা খিদে পেটে।

॥ ৪ ॥

আর সামান্য মাত্র বাকী। এবার ওকে একটু সেটে অভ্যাস করিয়ে নেওয়া দরকার। চোখ ঝলসানো আলো, অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়াও আরও অনেক লোক থাকবে, এ ঘরের মাঝে একটু অভ্যস্ত হওয়া দরকার আছে। দু'চারদিন খালি সেটে ঘোরানো হল কুকুরটাকে। এই পর্যায়ে আর একটা নতুন সমস্যা দেখা গেল। চাবুক তার সমাধান নয়। দেখা গেল, পঞ্চাননকে ছাড়া কুকুর এক পাও চলতে রাজী নয়। পাত্র যেন ওকে ভুক করেছে। সে ছুটে এসে পঞ্চাননের পায়ের আড়ালে গা লেপটে দাঁড়ায়।

অগত্যা, নানা ভাবে বুঝিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে পঞ্চাননকে (সহরীর বাড়ীর চাকর) পার্ট করাতে রাজী করানো হল।

হায়, হায়, হায় খোকাবাবুকে সামলাতে এসে এতদিনেও যা হয়নি একটা কুকুর সামলাতে গিয়ে যে তাই করতে হচ্ছে পঞ্চাননকে। চেয়ার টেবিল হলো, নিত্যি মাংস খাওয়া হলো এবার পার্টও হচ্ছে।

কয়েকটা নির্বাক দৃশ্য নেওয়া হল রাধুবেশী পঞ্চানন আর কুকুরটাকে নিয়ে। যেমন সহরীর স্বামী শচীন কাজে বার হয়ে গেছে। দূরে পথের ওপর তাকে দেখা যাচ্ছে এখনও—বাড়ীর চাকর রাধু দরজা বন্ধ করছে আর পাশে রয়েছে কুকুর। এমনভাবে ছবিটা নেওয়া হল যাতে বোধ হবে প্রভুকে—শচীনকে—এগিয়ে দেওয়ার জন্যই কুকুরটা দরজায় এসেছিল। শচীন কুকুরটার গায়ে হাত বুলোচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, এ দৃশ্যও নেওয়া হল। সুবিধে মত জুড়ে নেওয়া হবে। রাধু বাড়ীর যে আসবাব ঝাড় পোঁচ করছে আর তার পায়ে কুকুরটা ঘুরছে এ দৃশ্য তো নেওয়া হলোই। মোট কথা এই দেশী কুকুরটা এই ছবিতে একটা দুর্ঘটনাকে আড়াল করছে সে যে এ বাড়ীর একজন এই কথাটা এইসব নানা টুকরো নির্বাক দৃশ্যের প্রয়োগে দর্শককে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।

পঞ্চানন পার্ট করতে রাজী হয়েছে বটে কিন্তু বলে দিয়েছে যে কথা সে বলতে পারবে না। তাই 'আজ্ঞা' 'হুঁ' 'যাই' 'এই যে' এইসব ছাড়া তার কথা বলা বিশেষ কিছু নেইও।

আজ সেই দৃশ্য নেওয়া হবে। কুকুরটার দুবার দৃশ্য। সবাই তৈরী। সেট সাজানো। বাইরে কৃত্রিম বৃষ্টি হচ্ছে। মণিমোহনের দিকে পিছন ফিরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লহরী। এইখান থেকেই 'টেক'! কয়েকবার মহড়াও হয়ে গেছে। অবশ্য খাওয়াটুকু ছাড়া।

তীব্র আলোর সেট জেগে যাচ্ছে। সাউণ্ড ম্যানের সঙ্গে পরিচালক কথা বলে নিলেন। লহরীর ঘরের লম্বা আয়নায় আলো পিছলে পড়ছে। মণিমোহনের মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরা অন। ক্ল্যাপষ্টিক দেওয়া হল।

পরিচালক ইউনিটের সকলকে বলে দিয়েছেন যে সেটে কুকুর যদি আপন মনে ঘুর ঘুর করে তাহলে অসুবিধের কিছু নেই। সেইভাবেই দৃশ্যটা নেবে। স্বাভাবিকই হবে তাতে।

টেবিলের ওপর ঢাকা টিফিন কৌটোয় মণিমোহনের আনা মাংস রয়েছে। নকল নয়, সত্যি বিব মাখান আছে তাতে। দৃশ্য গ্রহণ চলছে।

—রাধু।

মণিমোহনের ডাকে পাত্র সেটে এসে ঢুকেছে। পিছনে কুকুরটা। লেজ নাড়ছে। জিব বার করছে।

—একটা প্লেট নিয়ে এসো।

—একটা?

লহরী জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, একটাই।

প্লেট আনতে চলে গেল রাধুবেশী পঞ্চানন। কুকুরটা ঘুর ঘুর করে লহরীর কাছে বসে পড়ল। টেবিলে ঢাকা বাটি আছে। বাটিতে আছে কিংবের আগুন নেভাবার খাবার। ও জানে।

রাধু ফিরল। বাটি খুলল মণিমোহন। দুটু খোসবাই ছড়িয়ে গেল হাওয়ায়। কুকুরটা উঠে দাঁড়াল। কুঁই কুঁই করে ডাকল। যেমন ডাকে পঞ্চাননের খুশির ঘরে। লহরীর পায়ের ওপর মুখ রাখল। যেমন রাখত পঞ্চাননের পায়ে।

মণিমোহনের হাত চলে এসেছে প্রায় তার মুখের কাছে। নিজের মুখে দেওয়ার আগে লহরীর দিকে চেয়ে আছে। একটা টুকরো তুলে নিতে নিতে লহরী বলল, কোন মানে হয় না এ ছেলেমানুষীর।

কুকুরটা তখন চেয়ে আছে লহরীর হাতের দিকে। সেদিকে চেয়ে লহরী বলল, কি রে খাবি?

এই বলে তার হাতের টুকরোটা মাটিতে ফেলে দিল।

টুকরোটা ফেলে দেওয়া মাত্র 'না', 'না' বলে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে মণিমোহন। চেয়ারটা ছুলে উঠেছে। এই বাধা দেওয়ার অভ্যাস করানো হয়নি কুকুরটাকে। তাই সে গ-র-র করে একটা প্রতিবাদ জানাল।

তারপরই বাগিয়ে ধরল টুকরোটাকে।

কুকুরটার দাঁত বসে গেছে। ক্যামেরা নিবদ্ধ তারই ওপর। যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব শব্দ সমারোহে হঠাৎ থেমে পড়েছে। নিস্তব্ধ চারিধার। যান্ত্রিক যন্ত্র একঘেয়েমি কানে যাচ্ছে না। চারপাশের নানা ঘূর্ণনী

শিল্পী আর সুনিপুণ অভিনেতাদের মাঝে দাঁড়িয়ে একটা নির্বোধ জানোয়ার তার আহার নিয়ে হাসকাঁস করছে।

যা আশা করা গিয়েছিল মৃত্যুর দৃশ্যে তার চেয়েও ভালো অভিনয় করছে কুকুরটা। মৃত্যুগ্রহণের অথণ্ড মনোযোগে ক্যামেরাম্যানের চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। পরিচালকের দৃষ্টি দৈবিক আবেগে সৃষ্টির উল্লাসে জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

সেই মুহূর্তে পরিচালকের মনে হল পুতুল নাচের নাটমঞ্চের রশিটা তার হাতে। সে পরিচালক। ক্যামেরাম্যান ও অন্যান্য যন্ত্রকুশলীরা তার আজ্ঞাবহ। অভিনেতারা তার সৃষ্টির অংশীদার। আর সকলে দর্শকমাত্র। প্রতিবাদের, প্রতিরোধের অধিকার নেই। সব বোবা। সে যাই করছে, তাই হচ্ছে। মরছে একটা কুকুর।

কুকুর? মাত্র কুকুর?

আশ্চর্য। বাসনার এ দিকটা আগে মাথায় আসে নি। এ তো কেবল একটা সামান্য দৃশ্য এবং নয়। বর্তমান পৃথিবীর হৃদয়কটাই যেন আজ ইুডিওর এই বিশেষ সেটে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যদি আগে একবারও মনে হত তাহলে একটা প্রতীকের মাধ্যমে এ'দিকটারও আভাস দিতে পারতেন তিনি। ইস্। মহা ভুল হয়ে গেছে। যে আইডিয়াটা মনে এলে সেটাকে সেলুলয়েডে বন্দী করা গেল না।

তীব্র বিষে নেতিয়ে যাচ্ছে কুকুরটা। একবার কেঁপে, অন্তিম চাহনিতে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে—মারভেলাস। অপূর্ব! কি করুণ এই চোখ মেলার চেষ্টা—মেঝের ওপর নখের আঁচড় দিয়ে, অজস্র ফেনা উদ্গীরণ করে যখন আশাতীত রকম ভালো অভিনয় করে চলেছে কুকুরটা তখন—,

ঠিক তখন 'ওরে বাপরে' বলে চিৎকার করে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল পঞ্চানন। হুমড়ি খেয়ে প্রায় কুকুরটার ওপর পড়ে গেছে।

কেউ ভুল করেনি। পরিচালকের নির্দেশের এক চুল এদিক ওদিক করেনি কেউ। কথা ছিল পাত্র কোন কথা বলবে না। কথা বলতে সে নিজেই তো চায় নি। এর মধ্যে, চার পাশে সবাই যখন বোবা তখন নিতান্ত একটা গেঁয়ো ভাষণ, 'ওরে বাপরে' বলে কুকুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

—ইডিয়ট।

কাট্।

পরিচালকের বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি পঞ্চাননকে যেন বিঁধছে। দু'পা এগিয়ে এসে পঞ্চাননের মাথা ধরে টেনে বললেন, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।

চার পাশে চেয়ে দেখল পাত্র। সবাই যেন নীরবে দৃষ্টি দিয়ে তাকে দুষছে। কান্নাটা গলা ঠেলে চলে এসেছিল হঠাৎ। বাঁধতে পারে নি। তার চোখ আবার শুকনো খটখটে হয়ে গেল।

এরপর মরা কুকুরটার কতকগুলো ক্লোজ শট নেওয়া হল বিভিন্ন কোণ থেকে। মরা কুকুরের গলায় মালা দিয়ে ছবি নেওয়া হল কয়েকটা। ছবির পাবলিসিটির দীল হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

• • •

পরিচালক মনে ভেবেছিলেন যে এডিটিংএর সময় পঞ্চাননের 'ওরে বাপরে' বলে ডুকরে কেঁদে ওঠা ও কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরা কাঁচি চালিয়ে দেবেন তিনি। বাদ দেবেন।

কিন্তু কি ভেবে ঠিক শেষ মুহূর্তে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। ওটা রাখল।

॥ ৫ ॥

পরিচালকের দৃষ্টি আছে। ছবি প্রদর্শিত হওয়ার পর সমালোচকেরা সমস্বরে অজস্র অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে রাধুবেশী পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় নবীন কিন্তু বর্ষীয়ান অভিনেতা শ্রীপাত্রর। ছবির টাইটেলে পঞ্চাননের নাম লেখা হয়েছে 'শ্রীপাত্র।' তাঁর মেঠো উচ্চারণ, সরল চাহনি, অকৃত্রিম অভিব্যক্তি, বুক ফাটানো কান্না এই সামান্য চরিত্রটিকে এমন অসামান্য করে তুলেছে যে ছবির শেষেও যেন তা পিছন থেকে টেনে ধরে। অপূর্ব। আবেদনময়ী কোন নবীনা অভিনেত্রীকে উপহার না দিয়ে এহেন শক্তিমান একজন পার্শ্বচরিত্রাভিনেতাকে উপস্থিত করার জন্য পরিচালককে সাধুবাদ……ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিরক্ষর পঞ্চানন এসব কথা জানে না। ষ্টুডিওর চত্বরে থাকলে কানে কানে সেও শুনতে পেতো। কিন্তু সেদিনের স্যুটিং শেষে সারারাত নিজের ঘুপসি ঘরের মেঝেয়, দেওয়ালে এবং সব শেষে নিজের বুকের মধ্যে একটা ক্ষুধার্ত কুকুরের কুঁই কুঁই ডাক কিছুতেই থামাতে না পেরে পরদিন ষ্টুডিও ত্যাগ করে চলে গেছে। তার খোঁজ করা হয়েছিল এইমাত্র সেদিন,—যেদিন ইউনিটের সকলকে নিয়ে ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, তাকে পাওয়া যায়নি।

হয়তো পঞ্চানন কলকাতার বন্দরে কুলীর কাজ করে। কিম্বা—

কলকাতায় কত লোক যে কিভাবে নিজের অন্ন সংস্থান করে তা কি কেউ বলতে পারে?

ষ্টুডিও চত্বরে পরিচালকের নির্দেশে কুকুর মরে। বাইরে?

—বাইরে?

পঞ্চানন সেই অনেক বড় কলকাতার, বাইরের কলকাতার বাসিন্দা হয়ে গেছে। হয়তো বা পার্শ্বচরিত্রও।

উক্ত ছবির সমালোচকেরা রাধুবেশী শ্রীপাত্রের পরেই কুকুরের অভিব্যক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তার জন্যেও পরিচালককে সাধুবাদ, ধন্যবাদ……ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বার্লিনের ভূগর্ভস্থ কক্ষে হিটলার ও তাঁর প্রণয়িনী ইভা গম্ভীর মুখে পাশাপাশি বসে আছেন। বার্লিনের পতন হয়েছে, নাৎসীতন্ত্রের ধ্বংস ঘটেছে। আর কোন আশাই নেই। মরতে হবে, তবে শত্রুর হাতে নয়।

হিটলারের হাতে বিষবটিকা। অতি তীব্র বিষ। পোষা কুকুরটাকেও হয়ত এ বিষ খাওয়াতে হবে।

হিটলার ও ইভার মধ্যে অতিষ্ঠ তর্ক উঠল, কে এ বিষ আগে খাবে, অথবা দুজনে এক সঙ্গেই।

ইভা ছলছলে চক্ষে বললেন—"তোমার মরণ আমি চোখে দেখতে পারব না, ও বিষ আমিই আগে খাব।"

হিটলার বললেন—"তুমি শুধু প্রেম দাও নি ইভা, আমার জন্যে তোমার জীবনও দিতে এসেছ। মৃত্যুর পরিমা দিয়ে প্রেমকে অমর করেছ,—তোমার প্রেমের তুলনা নেই।"

—"সে প্রেম শিখেছি আমি তোমারি কাছে।" ইভা বিষের বড়ি তখনি নিজের মুখে ফেলে দিলেন।

"সংগীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের প্রকাশ তার মধ্যে আছে, একথা বলা বাহুল্য ... প্রাণের যে ধর্ম, সংগীতেরও হবে সেই ধর্ম। ... বৈদিক যুগে এক রকম সংগীত ছিল—'সামগান'। সেই সামগান নিঃসন্দেহে তখনকার যাঁরা সাধক ছিলেন তাঁদের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল—বিশেষ রূপ নিয়ে তৎকালীন ক্রিয়া-কর্মে, যজ্ঞে তা রস রূপ পেয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে তা এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে, তখনকার সেই সামগান কি রকম ছিল তা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি না। তারপর এল কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের যুগ। তখনকার সংগীত, নৃত্য, গীত বিশেষত্ব লাভ করেছিল সেই সময়কার গভীর সংস্কৃতি, গৌরব এবং আভিজাত্যের মধ্য দিয়ে। আনন্দ যখন হোয়ে উঠেছিল অন্তর্ভেদী—তখন তারই অনুরূপ সংগীত যে জন্মেছিল তাতে সন্দেহ নাই।

"কিন্তু বাঙ্গলাদেশের একটা বিশেষত্ব আছে; বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি। এই ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হোয়ে ওঠে, তখন সে আপনাকে প্রকাশ করে। তার প্রকৃতিতে যখন উদ্বৃত্ত হয়, তখন সেই শক্তি যায় বর্ধনের দিকে। পরিমিত ভাবে যখন ফলে তখন আপনাকে সে প্রকাশের সম্পদ পায় না। সেই হৃদয়াবেগ যখন তীব্র ছাপায় তখন সে উচ্ছ্বাসকে সে গানে নৃত্যে উচ্ছ্বসিত করে। দেখুন, বৈষ্ণব সংগীত—সমস্ত হিন্দুস্থানী সংগীতকে পিছনে ফেলে বাঙ্গালীর প্রাণ আপনার সংগীতকে উদ্ভাসিত করেছে—যেহেতু তার ভেতরের হৃদয়াবেগ সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল, আপনাকে প্রকাশ না কোরে পারে নি। যে কীর্তন বাঙ্গালী পেয়েছিল তা তৎকালীন পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াবান্ প্রত্যুত্তর। ... আজকের দিনের বাঙ্গালী, যে বাঙ্গালী একদিন এই কীর্তনের মধ্যে, লোক-সংগীতের মধ্যে বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে, সে কি আজ নূতন কিছু দেবে না? সে কি কেবলি পুনরাবৃত্তি করবে?

"আমি বলব, আমি কাউকে জানি না, কাউকে মানি না; আমরা যা-কিছু সৃষ্টি করি না কেন, তার মধ্যে ভারতীয় ধারা আপনি যাবে। আমাদের সেই আত্মা, সেই ভারতীয় প্রকৃতি তেমনি আছে যেমন পূর্বতন কালে কীর্তন-গানে, বাউলে ছিল। সেই রকম আজ যদি বাঙ্গালী আপনাকে সংগীতে চিত্রকলায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে তবে সেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে পারবে না, যদি একমাত্র লক্ষ্য থাকে যা কিছু করবে নিজেকে মুক্ত কোরে—সকল কোরে নয়।"—(২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র পাঠচক্র

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কাব্য

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আর্ষ রামায়ণে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণী কথা ভূতলে প্রচরিষ্যতি॥'

যতদিন গিরি ও নদীর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন ভূতলে রামায়ণী কথা প্রচারিত হইবে।

রামায়ণ সম্পর্কে যে কথাটি বলা হইয়াছে, এক হিসাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রের সম্পর্কেই সে কথাটি সত্য। আমরা এখানে 'কাব্য' কথাটি ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের ন্যায় ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। বাস্তবিক পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনাই দেশ বা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়।

অথচ সাহিত্য কখনও ক্ষুদ্রগামিনী কখনও বক্রগামিনী নদীর ন্যায় প্রবাহিত হয়। যুগে যুগে জীবন ও জগৎসম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে, মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নব-নব পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও ভাষা, ভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায় সাহিত্যের মধ্য দিয়াও যেন 'যবনিকার খোলস খুলিছে হাজার হাজার বছর ধরে।' মানবীয় সাহিত্যের প্রবাহিনী কখনও মন্থরগামিনী, কখনও খরস্রোতা, কখনও গ্রীষ্মকালের নদীর ন্যায় শীর্ণকায়া, কখনও ভাদ্রের নদীর মত কূলপ্লাবিনী। জাতির জীবনে যেমন কখনও আসে জড়তা, কখনও আসে মহাভাবের প্লাবন, সাহিত্যেও তাই। সকল দেশে সকল যুগে মহৎ সাহিত্যের জন্ম হয় না। তবে, প্রত্যেক যুগের সাহিত্যেই বিশেষ প্রবণতা বা Trend লক্ষ্য করা যায়। তাই আধুনিক কাব্যের বিচারেও ইহার বিশেষ প্রবণতাটি লক্ষ্য করিতে হইবে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় আধুনিক, তাহারও কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত আধুনিকতার লক্ষণ ও কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। যে সমস্ত কবির রচনার অংশ এই প্রবন্ধে অনূদিত হইয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত পরিচয় নূতন সংস্করণের গ্রন্থ-পরিচয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যাঁহার লীলামাত্র, তাঁহার নিকট অবশ্য কাল অন্তহীন অর্থাৎ কালের কোন অস্তিত্বই নাই। আমাদের প্রয়োজনের অনুরোধে আমরা সেই অনাদি অনন্ত কালকে কয়েকটি সীমারেখায় চিহ্নিত করি। ব্যাকরণ শাস্ত্রে কালকে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। সাহিত্য বিচারেও আমরা প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক (কখনও কখনও অতি আধুনিক বা সাম্প্রতিক) এই কথাগুলির প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু সাহিত্যে আধুনিকতা যে শুধু কালগত নয়, এ কথা

সকলেই স্বীকার করিবেন। একজন ইংরেজ সমালোচক লিখিয়াছেন, ভিক্টোরীয় যুগে এমন অনেক লেখক ছিলেন যাঁহারা চিন্তার দিক দিয়া অপর কোন শতাব্দীর লেখকের সগোত্র। আমাদের এই বাংলাদেশের মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও এবং চিন্তার ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়া প্রগতিশীল হইয়াও কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ছিলেন ভারতচন্দ্রের অনুগামী। নূতন যুগের ভাবাদর্শ তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, আধুনিকতা 'কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে আধুনিকতার বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলা হয় মডার্ন। বাংলায় বলা যাক, আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'

এক কালে যেসব কবি আধুনিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন, যাঁহারা নিয়মের বন্ধন হইতে সাহিত্যকে মুক্তিদান করিয়া 'নিয়মুনা হি কবয়ঃ' এই উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ 'মধ্য-ভিক্টোরীয়' যুগের কবি বলিয়া পরিচিত। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহারা রোমান্টিক যুগের কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস্, উইলিয়ম ব্লেক প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাব হইয়াছিল এই যুগে। ইঁহাদের পূর্বে চলিয়াছিল ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসিকাল যুগ। রোমান্টিক যুগেও কাব্যের স্রোত নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। ব্যক্তির আত্মপ্রকাশই ছিল তখন কবিদের কাব্য-সাধনার উৎস। তাঁহারা সৃষ্টি করিতেন মায়ার জগৎ, তাঁহাদের কাব্য যাঁহারা পাঠ করিতেন, তাঁহারা মুগ্ধ বিস্ময়ে এই রূপে-গন্ধে-গীতে ভরা পৃথিবীর দিকে তাকাইতেন। তাই আধুনিকেরা বলেন, সে যুগে কবিদের দৃষ্টি ছিল আচ্ছন্ন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিকের মত অনাসক্ত দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিতে পারেন নাই, জগতের কুশ্রীতা বা কদর্যতার দিক হইতে তাঁহারা মুখ ফিরাইয়াছেন। কিন্তু আধুনিক কবিগণ মানুষের মনকে মোহমুক্ত করিতে চাহিলেও নিজেরা অনাসক্ত বা মোহমুক্ত হইতে পারেন নাই। ইঁহারা হয়তো সৌন্দর্যের প্রতি মোহ ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু যাহা কুৎসিত ও কদর্য, তাহার প্রতি ইঁহারা পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ কালের কবিদের এই প্রবৃত্তি সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়, তাঁহারা যেন স্পর্ধাভরে সঙ্কোচের আবরণকে সবলে ছিন্ন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের সম্পর্কে শুধু বিরূপ মন্তব্যই নয়, স্থানে স্থানে কঠোর মন্তব্যও করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'বিশ্বের প্রতি উদ্ধত অবিশ্বাস ও জুগুপ্সার দৃষ্টি আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। • • আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে নির্বিকার বস্তুতন্ত্রভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক'।

এই আধুনিকতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ এমি লোয়েল নামক একটি মহিলা কবির কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটি কবিতায় এই কবি কোন সুন্দরীকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের সৌন্দর্য মোহকে কশাঘাত করিয়াছেন। আর একটি কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন, লাল চটিজুতা দোকান সম্পর্কে। এই মহিলা কবি দেখাইতে চাহিয়াছেন, সৌন্দর্যের প্রতি তাঁহার কোন মোহ নাই। কিন্তু সত্যই কি তাঁহার দৃষ্টি মোহমুক্ত? বস্তুতন্ত্রতার নামে এই আতিশয্য, ইহা অনেকের মনে পীড়া দেয়,

রবীন্দ্রনাথকেও দিয়াছে। কবি এই প্রসঙ্গে এজরা পাউণ্ড ও টি, এস, এলিয়টের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। আধুনিক কালের অনেক কবির মনে সৌন্দর্যের প্রতি, আদর্শের প্রতি এই যে বিরূপতা দেখা দিয়াছে, তাহার মূলে আছে য়ুরোপীয় মহাসমরের প্রভাব। এই মহাসমর মানুষের প্রত্যয়কে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। এতকাল মানুষ যে প্রতিষ্ঠা ভূমির উপর দণ্ডায়মান ছিল, তাহার ভিত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ফলে মানুষ সত্য ও সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আধুনিক কবিতায় সেই মনোভাব সুস্পষ্ট।

অনাসক্ত, মোহমুক্ত দৃষ্টিই আধুনিকতা কিন্তু এই দৃষ্টি কোন বিশেষ কালের সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যের আধুনিকতা শাশ্বত কালের। রবীন্দ্রনাথ সহস্র বৎসর পূর্বেকার এক চীনা কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, সেকালের কবিতাও কতখানি আতিশয্য বর্জিত, মোহমুক্ত ও বস্তুতান্ত্রিক হইতে পারে, কিন্তু সে কবিতার কোথাও মানবতার প্রতি বিদ্রূপ বা অবিশ্বাস নাই। এ কালের তথাকথিত আধুনিক কবিরা চিত্তের প্রশান্তি ও ধৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাই কদর্যতা ও বীভৎসতার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ এত দুর্দমনীয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাদিগকে সাহিত্যে অঘোরপন্থী বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

'বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বল সেন্টিমেন্টালিজম্, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিদ্বেষকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে সৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতি-ভদ্রয়ানার পাণ্ডা বলে ব্যঙ্গ কর, তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উল্টো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয়, অতএব শাশ্বত নয়। সায়েন্সেই বল, আর আর্টেই বল নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন, য়ুরোপ সায়েন্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।'

আমরা দেখিলাম, আধুনিক কবিতার আতিশয্য ও রুচিবিকারকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। যে এমি লোয়েলের কথা কবি উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি চিত্রধর্মী কবি। ইনি কাব্যে যে নূতন ধারার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, উহাকে বলা হয় ইমেজিষ্ট মুভমেণ্ট্। এলিয়টের কাব্যেও খোলা চোখে জীবন ও জগৎকে দেখিবার একটা ভান আছে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সৌন্দর্যের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল বলিয়াই ইঁহারা সেই আসক্তিকে সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। ইঁহাদের দৃষ্টিও যে মোহমুক্ত নয়, সেকথা রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য সম্প্রতি কাব্যের ধারা আবার নূতন পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ যুগের কবিগণ, যেমন রবার্ট গ্রেভস্, জর্জ ম্যাকবেথ, লরেন্স ডারেল, ফিলিপ লার্কিন, এন্ রাইট প্রভৃতি আত্মগত ধ্যানধারণা ও হৃদয়াবেগকে একেবারে অস্বীকার করেন নাই। অবশ্য এ যুগে অন্তত কাব্যের ক্ষেত্রে কোন অসাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিতেছে না এবং এ যুগের কবিরা অনেক সময় ভাষার দুর্বোধ্যতার দ্বারা ভাবের দৈন্যকে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'ভাষা ও ছন্দে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, মানুষের ভাষা একদিন প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ ছিল, কবি উহাকে ভাবের স্বাধীন লোকে মুক্তি দিলেন। মানুষ প্রয়োজনকে অতিক্রম করিতে পারে বলিয়াই তাহার গৌরব। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি,' অর্থাৎ আনন্দ হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি হয়, প্রাণিসকল আনন্দেই বিধৃত থাকে এবং আনন্দেই অনুপ্রবিষ্ট হয়। উপনিষদের ভাবধারায় দীক্ষিত কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—সাহিত্যও আনন্দেরই প্রকাশ, তাই সাহিত্য অহৈতুক। অবশ্য এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নাই, অথবা সাহিত্যের মূল পৃথিবীর মাটিতে নিহিত নয়। আবার আমরা গীতার

তাহার বলিতে পারি, সাহিত্য যেন ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থ বৃক্ষ! আমাদের উক্তি দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ এদেশের আলঙ্কারিকদের রসবাদ ও উপনিষদের ঋষির আনন্দবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কবি রস ও আনন্দকে সৌন্দর্য হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই। কবি বলেন, যেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য, সেখানেই সৌন্দর্য; গোলাপ ফুলের মধ্যে এই ঐক্য আছে বলিয়াই গোলাপফুল সুন্দর। আর এই ঐক্য আমার মধ্যে ঐক্যবোধকে জাগ্রত করে।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের মতে রস জিনিষটি সহৃদয় সংবাদী, ইহা অনুভূতির সামগ্রী। যে আধুনিক কবিতা এই অনুভূতির মর্যাদা দেয় নাই, তাহা শাশ্বত ভাবে আধুনিক নয় অর্থাৎ তাহা বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'অনুভূতির বাইরে রসের কোন অর্থই নাই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ বা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা (সাহিত্যতত্ত্ব)।

এই চলমান, জীবন যার নাম।

এই চলমান নদী, জীবন যার নাম, তার একমাত্র সত্য হলো, সে চলেছে, অবিচ্ছেদ অবিরাম তার গতি।

মানুষের কত পরিশ্রম, কত আকাঙ্ক্ষা, কত প্রাণপাত আবেগ আর আকুলতা, কোন মূল্য নেই তার কাছে। রাজাকে এক নিমেষে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ধুলোয় করে দেয় ধূলো, সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনার শেষে মানুষ রেখে যেতে পারে না তার অন্তিম সংকারের খরচ, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা আর সর্বশ্রেষ্ঠ ভিখিরি একই মাটির নীচে অচিহ্নিত অবস্থায় থাকে পড়ে, কোন জবাবদিহি খুঁজে পাওয়া যায় না সেই বিচারকের রায়ের, জীবন যার নাম।

আবার তার গতির রহস্যলোক থেকে কখন কি মন্ত্রে যে ধূলোকে সে পরিণত করে স্বর্ণমুষ্টিতে, কাল যে পথের ধারে পড়েছিল, জগতের উপেক্ষার জঞ্জালে, রাত প্রভাতে তাকেই টেনে নিয়ে বসায় বিশ্ববাহিত সিংহাসনে, প্রাপ্তির ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে ভিক্ষুকের জীর্ণ থলি, কেউ জানে না কি করে তার রাজ্যে কুঁড়ি হয়ে ওঠে ফুল, ফুল হয়ে ওঠে ফল।

মানুষের সমস্ত বিচার বিতর্ক, অতি সূক্ষ্ম হিসেবের কড়াক্রান্তি বিভাগ, ভালমন্দের চুল-চেরা বিচার, কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না তার জড়হীন গতির শুধু অবিরাম চলা।

তার কাছে একমাত্র সত্য, সে চলেছে, চিরদিন সে শুধু চলেছে, এই চলমান নদী, জীবন যার নাম।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত

শশিনাথ

পাত্র-পাত্রী পরিচয়

সোমনাথ	...	...	সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ
শশিনাথ	...	...	সোমনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
বরেন	...	...	শশিনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু
সুধীর	...	...	শশিনাথের অপর এক বন্ধু
বঙ্কু	...	...	ভৃত্য
উর্ম্মিলা	...	...	সোমনাথের স্ত্রী
লীলা	...	...	উর্ম্মিলার ভগ্নী। সোমনাথের আশ্রিতা
সরযূ	...	...	সোমনাথের পিতৃবন্ধুর কন্যা

নাট্যরূপকারের নিবেদন

পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। পরম শ্রদ্ধাস্পদ উপেন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় 'বিচিত্রায়' লিখি।: আমার সাহিত্য-জীবনের শুরু ছিলেন তিনি। সেই সময় শরৎচন্দ্রের 'বাদুনের মেয়ে', রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' এবং আরও দু'একখানি বিখ্যাত উপন্যাসকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করে অভিনয় করে ছিলাম এবং তাদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে 'শশিনাথ' উপন্যাসটিকেও নাটকাকারে গেঁথেছিলাম। শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ আমার এই নাট্য প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে অনুমোদন করেছিলেন। এতদিন পরে তাঁর 'স্মৃতি সংখ্যায়' এটিকে প্রকাশ করে তাঁকে প্রণাম জানাবার সুযোগ পেয়ে পরম কৃতার্থ বোধ করছি।'

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) ওঃ! লেখাপড়া শেষ না করে বিয়ে করবে না, সেই কথা বলতে চাও?

শশী। হেসে কেন্নে যে? কথাটা একেবারেই তুচ্ছ নাকি?

উর্ম্মিলা। না তুচ্ছ কেন! তাহলে লীলাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলছো তো? তা বেশ তো! এম-এ পাশ করতে তোমার তো আর মাস কয়েক দেরী আছে। তোমাদের মতে লীলা যদি সতেরো বছর অপেক্ষা করে থাকতে পারে, তাহলে আরও দু'চার মাস নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে।

শশী। (হাসিয়া) দেখ বৌদি, বাঙালী বাড়ীর বৌ না হয়ে তুমি যদি উকীল ব্যারিষ্টার হতে, তাহলে পৃথিবীর অনেক উপকার হতো। কিন্তু বৃথা পরিশ্রম করছো—এ মামলা তোমার টিকবে না—কিছুতেই আমার কাছে ডিক্রী পাবে না।

উর্ম্মিলা। (বিরস কণ্ঠে) এ আমার এমনই কি অন্যায় মামলা ঠাকুরপো, যে কিছুতেই টিকবে না?

শশী। অন্যায় না হলেও অনেক সময় মামলা টেকে না।

উর্ম্মিলা! সে তো অবিচার!

শশী। অবিচার নিশ্চয়ই—কিন্তু অবিচার করছে কে? যে জোর করে বিয়ে করাতে চাচ্ছে সে, না যে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না, সে? বিয়েটা যদি শুধু নিজেকে নিয়ে একটা ব্যাপার হতো, তা হলে তোমার কথায় আমি দিনের মধ্যে তিনবার বিয়ে করতাম। কিন্তু এ যে নিজের সুখ দুঃখ ভাগ্য অদৃষ্টের সঙ্গে অন্য একজনকে বাঁধতে হবে। আমাদের বিশ্বর ঘরে সে আবার এমনি বাঁধন যে কাটবে ছিঁড়বে কিন্তু খুলবে না।

উর্ম্মিলা। কিন্তু তোমাকে তো একদিন এ বাঁধনে পড়তেই হবে ঠাকুরপো।

শশী। কে বলে পড়তেই হবে। অবিশ্যি আমি এতবড় আহাম্মক নই যে হলপ নিয়ে বলবো, কখনও পড়তে পারিনে। তবে মনের বর্তমান অবস্থা থেকে অন্ততঃ এটুকু জোর করে বলতে পারি যে, না পড়তেও পারি।

উর্ম্মিলা (অনুযোগের সুরে) কিন্তু কখনও যদি বিয়ে কর, তখন তো মনে হবে যে বৌদিদির অনুরোধ রাখনি।

শশী (হাসিয়া) বেশ তো, তখন না হয় দণ্ড স্বরূপ বিয়ে বন্ধ করে দিও।

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) মন্দ কথা নয়! শাপে বর পেতে চাও! উপস্থিত আর তোমার পড়ার ক্ষতি করবো না—চললাম। কিন্তু মনে করো না যেন রণে ভঙ্গ দিয়ে চল্লাম।

শশী। (হাসিয়া) না, তা কেন—সন্ধি স্থাপন করে চল্লে।

(উর্ম্মিলার প্রস্থান। শশিনাথ পুনরায় তাহার পুস্তকে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎকাল পরে সোমনাথ এবং বরেন প্রবেশ করিল)

সোম। শশিনাথ!

শশি। দাদা! (বই হইতে মুখ তুলিল)

সোম। একটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় আলোচনা করবার জন্যে তোমার পড়ার ব্যাঘাত ঘটাতে বাধ্য হলাম। আলোচনার মধ্যে বরেনকেও প্রয়োজন হতে পারে তাই ওকেও সঙ্গে করে এনেছি। তোমাদের এখনও কোন কথা বলা হয় নি। সব আগে এই চিঠিখানা পড়, তাহলেই ব্যাপার বুঝতে পারবে।

(শশিনাথের হাতে একখানি পত্র দিল, শশিনাথ কিছুক্ষণ ধরিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিল)

সোম। (বরেনের প্রতি) হরিচরণবাবুর সঙ্গে বাবার যে কিরকম বন্ধুত্ব ছিল, তা শশিনাথের চেয়ে আমি আরও ভাল জানি বরেন! ও তখন ছোট, ওর হয়তো মনে নেই, কিন্তু আমি তো দেখেছি, বাবা তাঁকে কিরকম ভালোবাসতেন, আর আপনার মতো করে দেখতেন। তাঁকে আমরা চিরকাল কাকা বলে ডেকেছি। সেই পিতৃব্যতুল্য হরিচরণবাবু আজ বিপদ হয়ে তাঁর গ্রাম থেকে আমাদের সাহায্য চেয়েছেন—তাঁর চিঠি পড়ে আমি অত্যন্ত অস্থির বোধ করছি বরেন।

বরেন। আপনাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না

শশীর সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা এখনিই সব ঠিক করে ফেলছি।

শশী। (পত্র পাঠান্তে মুখ তুলিয়া) দাদা, বরেনকে সব কথা বলেছো?

সোম। না এখনও বলা হয়নি। বলবো বলেই তো ডেকে এনেছি। বরেন শুধু যে তোমার বন্ধু তাই নয়, ও আমার আর একটি ভাই। জান বরেন, আমাদের এই হরিচরণ কাকা ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত তেজী পুরুষ ছিলেন। যৌবনে তিনি বাড়ীর এবং সমাজের অমতে বিবাহ করে গ্রামের মধ্যে নিজের অংশে পৃথক ভাবে বসবাস করতে থাকেন। যতদিন তাঁর স্বাস্থ্য এবং বিত্ত ছিল ততদিন তাঁর সেই তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের কাছে সমাজের কুচক্রীরা এগোতে সাহস করতো না। সম্প্রতি তাঁর ব্যবসা ফেল হয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তার ওপর তাঁর স্বাস্থ্য গেছে ভেঙে। এখন সুবিধা বুঝে সমাজরক্ষকের দল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি অত্যাচার সুরু করেছে।

শশী। আমাদের সমাজে চিরকাল যা হয়ে আসছে, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বরেন। হরিচরণ বাবুর কে আছেন?

সোম। একটিমাত্র মেয়ে। তাকে নিয়েই তাঁর যত বিপদ। কিছুদিন থেকেই তিনি মেয়েটির বিবাহ দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁর রুচির প্রাবল্যে কোন পাত্রই এ পর্য্যন্ত ঠিক করতে পারেন নি। তার উপর এখন তাঁর অসুখ; এ সময় সমাজের লোকেরা চক্রান্ত করে তাঁর ধোপা, নাপিত, ডাক্তার-বদ্যি পর্য্যন্ত বন্ধ করেছে।

বরেন। ইস্! কি ভয়ানক লোক এরা!

শশী। শোন বরেন, চিঠির শেষটা তোমায় পড়ে শোনাই—"আজন্ম-বন্ধু বিশ্বনাথের ছেলে তোমরা, জগতে একমাত্র তোমাদের কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা করতে আমার আত্ম-সম্ভ্রমে বাধে না। তাই তোমাদের জানাচ্ছি যে, যদি এখান থেকে অবিলম্বে কলকাতায় না যেতে পারি, তা হলে বিনা পথ্যে এবং বিনা চিকিৎসায় আমায় মরণ আলিঙ্গন করতে হবে। তা করতে আমি ভয় পাইনে, কিন্তু এখানে শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটার কি গতি হবে, তাই ভেবে ভীত হয়ে উঠছি। দাদা, এখন কি করবে ঠিক করেছো?

সোম। আমার তো মনে হয়, আমাদের কারুর সেখানে যাওয়া দরকার।

বরেন। মনে হওয়া নয় দাদা—যেতেই হবে।

শশী। ঠিক বলেছো বরেন। দাদা, আমি আর বরেন সেখানে যাব এবং হরিচরণ কাকাকে কলকাতায় নিয়ে আসবো। বরেন?

বরেন। আমি তৈরী আছি শশী!

শশী। দাদা, আমরা আজই যেতে চাই।

সোম। আজই যেতে গেলে, বিলাসপুরের ট্রেণ আছে সাড়ে আটটার সময়। কিন্তু তার তো আর মোট আধ ঘণ্টা সময় আছে। আজকে কি আর যাওয়া হবে?

বরেন। কেন হবে না দাদা, শশীতে আমাতে এখুনি বেরিয়ে পড়ি। খাওয়া-খাওয়া কোন রকমে ট্রেণনেই সেরে নেবো এখন। ২৪ পরগণার বিলাসপুর তো দু'ঘণ্টার ধারনি! আজকেই সন্ধ্যের সময় তাঁদের নিয়ে কলকাতায় ফিরতে পারবো। শশী তৈরী হয়ে নাও।

শশী। পাঁচ মিনিটে তৈরী হয়ে নিচ্ছি বরেন! দাদা, আজই আমরা যাবো।

সোম। তোমরা যখন ঝুঁকেছো, তখন যাও। প্রার্থনা করি, ভালোয় ভালোয় কাজ উদ্ধার করে ফিরে এসো। যদি আজকেই তাঁদের আনতে পারো তাহলে সোজাসুজি আমাদের জগৎসুর লেনের বাড়ীতে তাঁদের নিয়ে গিয়ে তুলবে। বাড়ীটা খালি থেকে সুবিধেই হয়েছে। আমি এখনই লোক পাঠিয়ে সব ঠিক করছি। বরেন, আমার এই পার্স্‌টা তোমার কাছে রাখো, এতে শতখানেক টাকা আছে। কি জানি বিদেশ-বিভূঁই জায়গা; সঙ্গে কিছু টাকা থাকা ভালো।

বরেন। শশীর কাছে দিন না দাদা।

সোম। ওর কাছে দেওয়া আর রাস্তায় ফেলে দেওয়া একই কথা, টাকাটা খোয়া যাবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থেকে যায়। তুমিই রাখো, তোমার কাছে দিয়ে আমি ঢের বেশী নিশ্চিন্ত থাকবো।

(জামা গায়ে দিতে দিতে শশিনাথ হাসিল। বরেন সোমনাথের নিকট হইতে ব্যাগটি লইয়া নিজের কোটের ভিতরকার পকেটে রাখিল)

সোম। আমি ততক্ষণ একখানা ট্যাক্সী ডেকে আনাই। (প্রস্থান)

শশী। (প্রস্থান হইতে হইতে) মনে মনে কি সিনেমার হিরোর মত থ্রিল অনুভব করছো নাকি ?

বরেন। সত্যি শশী, আজকের দিনটা কি জানি কেন আমার ভারী চমৎকার লাগছে। মনে হচ্ছে একটা কি যেন অদ্ভুত কিছু করতে যাচ্ছি। নিত্যকার ধরা-বাঁধা জীবন কাটিয়ে, হঠাৎ যেন পুরোদস্তুর adventure-এর মধ্যে ঢুকে পড়েছি !

শশী। চমৎকার লাগছে নাকি ? বটে ! তা তাতে আর আশ্চর্য কি ! কোনও দিনই তো এমন না খেয়ে-খেয়ে তরুণী উদ্ধার করতে ছোট না।

বরেন। তা সত্যি। কিন্তু দেখ, ব্যাপারটা romantic হতো, যদি তোমার জন্যে উদ্ধার করতে যেতাম। এ যেন একেবারে নিরস পরোপকার।

শশী। (হাসিয়া) আরও romantic হতো যদি নিজের জন্যে উদ্ধার করতে যেতে। চল, দেখি, তোমার হয়ে আমি সে কাজটা পারি কি না।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(এক সপ্তাহ পরে। প্রাতঃকাল। একই দৃশ্য। শশিনাথ এবং বরেন)

বরেন। হরিচরণ বাবুর অবস্থার কিন্তু মোটেই কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, মিঃ গুপ্তের সঙ্গে consult করবার জন্যে তুমি একবার তোমাদের পরিত ব্রাউন সাহেবকে আনাও।

শশী। আজকের দিনটা যাক। কাল বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় ঠিক করবো। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বলতো ? আজ ৫।৬ দিন ধরে বৌদি তোমায় ডেকে পাঠাচ্ছেন—এতদিন বাদে আজ সময় পেলে ? কিন্তু এদিকে জগৎপুর লেনে যখনই যাচ্ছি তখনই তোমাকে সেখানে হাজির দেখছি—ব্যাপারখানা কি ?

বরেন। শশী, ধর্ম—আর জাওলামীতে কাজ নেই।

শশী। জাওলামী করলাম আমি ! তার ওপর কাল রাত্রে সেখানে বসে যে-খাওয়াটা খেলে, আমি তো দেখে অবাক ! এমন করে লুচি দিয়ে ক্ষীর খাবার উৎসাহ তোমার তো আগে কখনও দেখিনি বরেন—বৌদিও তো দু'একদিন তোমায় খাইয়েছেন !

বরেন। না ভাই সত্যি—কাল ভারী খিদে পেয়েছিল। তার ওপর উনি পেড়াপিড়ী করতে লাগলেন, তাই যা খাই তার চেয়ে কিছু বেশীই খেয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও অসুখ করেনি ! দিব্যি হজম হয়ে গেছে ! তা ছাড়া কি চমৎকার রান্না !

শশী। তাতো দেখতেই পাচ্ছি। একদিন পাড়াগাঁ বেড়িয়ে এসেই প্রেম লেগেছে।

বরেন। মিছে নয়, হয়তো একটু প্রেম লেগেছে !

শশী। কিংবা হয়তো ভাল লেগেছে !

বরেন। কি—রান্না ?

শশী। কিংবা রাঁধুনী।

বরেন। তা যদি বলো, তোমার রান্নার চেয়ে রাঁধুনী আমার ঢের ভাল লেগেছে। যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি। যেন বিলাসপুর পাকের পদ্মটি।

শশী। সত্যি মেয়েটি বাস্তবিকই অদ্ভুত, নইলে তোমার মত লোকের মুখ দিয়ে কাব্যের ভাষা বেরোয় !

বরেন। বাস্তবিকই এমন সেবার লক্ষ্মী, অতিথি সৎকারে অন্নপূর্ণা মূর্তি জীবনে খুব কমই দেখেছি। প্রথম দিনে বিলাসপুরে তাঁর হাতে যে বস্তু পেয়েছিলাম—কোনও দিন তা ভুলবো না।

শশী। (উচ্চ হাস্য করিয়া) বরেন, তোমার স্নায়ু যে এত দুর্বল, তা জানতাম না। তা হলে আজই গিয়ে ঘটকালী সুরু করি কি বলো ?

বরেন। না—না—শশি, এ রকম করে বলা তোমার ভারী অন্যায় !

শশী। মুখে প্রতিবাদ করলেও, মনে মনে আমার অন্যায় তো বিলক্ষণ উপভোগ করছো দেখছি।

বরেন। তোমার সঙ্গে পারা যাবে না। যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ এমনি করে অস্থির করবে তো? উঠলাম আমি। বৌদিকে বলো, হরেনা এসে এখানে খাব।

(প্রস্থানোদ্যত)

শশী। কিন্তু ওবেলা যে সরযূ তোমাকে ওখানে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছে!

বরেন। You are incorrigible. (প্রস্থান)

(শশিনাথ খাতা-পত্র সাজাইয়া পেন্সিল কাটিতে লাগিল)

(সোমনাথের প্রবেশ)

সোম। (চেয়ারে বসিয়া) বরেন এসেছিল না?

শশী। হ্যাঁ। এই মাত্র চলে গেল।

সোম। আমি কাল সন্ধ্যার পর জগৎসুর লেন-এর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। হরিচরণ বাবুকে দেখে কিন্তু তেমন ভাল বুঝলাম না, শশি।

শশী। বরেনও সেই কথা বলছিল। কিন্তু কোনও ক্রমেই যেন আমাদের তরফ থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি না হয়। তারপর ফলাফলের ওপর যখন আমাদের হাত নেই, তখন আক্ষেপ করা ছাড়া আর কি করতে পারি!

সোম। ও কথা যাক! এদিকে তোমার বৌদিদি যে আমাকে ভারী বিপদে ফেলেছেন!

শশী। (ঈষৎ হাসিয়া) সে তা আর নতুন নয় দাদা। বৌদি তো প্রায়ই তোমাকে এমন বিপদে ফেলেন।

সোম। এবার একটু গুরুতর কথা—তুমি ভিন্ন এর মীমাংসা হবে না।

শশী। কি বল শুনি!

সোম। (ইতঃস্তত করিয়া) লীলার বিয়ের বিষয়ে তোমাকে অনুরোধ করতে বলেছে!

শশী। সে তো ভাল কথা—এর আবার অনুরোধ কি? লীলার জন্যে তো পাত্রের সন্ধান করছি। এই আজই একজনকে আসতে বলেছি—আমার একটি বন্ধু, তুমিও তাকে জানো—যদি সে আসে, তা হলে বৌদিকে দেখাবো, কেমন চমৎকার পাত্র!

সোম। তা নয়! তার ভারী ইচ্ছে, তুমি লীলাকে বিয়ে করো।

শশী। কিন্তু দাদা—বৌদিকে তো এ বিষয়ে আমি সমস্ত কথা বলেছি। বিবাহে আমার অমত আছে।

সোম। ও! তা অবিশ্যি লীলাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে তোমাকে আমি কিছু বলতে চাইনে।

শশী। (মুখ তুলিয়া) তাখো দাদা, তুমি যে-কথা বলছো, সে কথা একেবারেই উঠতে পারে না। তবে কি কারণে আমি বিয়ে করতে রাজী হচ্ছিনে, তা তোমার জানতে ইচ্ছা হতে পারে। প্রথমতঃ আমার মনে হয়, এতদিন ধরে যে সম্পর্কগুলো খাপ খেয়ে গেছে, সে গুলোকে একেবারে অদ্ভুতভাবে উল্টে দেওয়া হবে। দুটো সম্পর্কের কথা ভেবে দেখলে তোমার নিজেরই হাসি পাবে। শালী হবে ভাদ্র-বৌ আর ভাই হবে ভায়রা-ভাই!

সোম। এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তাহলে এ কোন কাজের আপত্তি নয়। আর কোনও আপত্তি আছে?

শশী। আমার দ্বিতীয় আপত্তি—যদিও এইটেই আমার প্রথম আপত্তি হওয়া উচিত ছিল - বিয়ে করবার কোন ইচ্ছে বা কল্পনা আমার একেবারেই নেই। আমি তো আইবুড়ো মেয়ে নই যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার বিয়ে দিয়ে ধারে খালাস হতে হবে!

সোম। তৃতীয় আপত্তি?

শশী। তৃতীয় আপত্তি—আমার মনে হয়, এমন সম্পর্ক করা উচিত নয়, যাতে আত্মীয়ের সংখ্যা না বেড়ে একই থেকে যায়। এই ধর, লীলার অন্য জায়গায় বিয়ে হলে, আমি তো তোমার ভাই থাকবোই—অধিকন্তু লীলার স্বামী তোমার ভায়রা-ভাই হবে; কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি দুইকে এক করে দেবো। ঠিক নয় কি?

সোম। (মুখে বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া) যত সব ছেলেমানুষের পাল্লায় পড়া গেছে! আমি কিছু জানিনে —তোমার বৌদির সঙ্গে বোঝাপড়া কোরো।

(প্রস্থানোদ্যত)

শশী। দাদা—একটা কথা বৌদিকে জানিও যে তিনি যেন মনে না করেন আমি তাঁর চেয়ে লীলার কম হিতৈষী। আমি যদি দেখি, লীলার এমন কোনও পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে যে আমার চেয়ে কোনও অংশে হীন, তখন আমি সে বিয়ে ভেঙে দিয়ে লীলাকে বিয়ে করবো। কিন্তু তার আগে কেন? দেশে তো সৎ-পাত্রের অভাব নেই! লীলা যেন স্বপ্নেও একথা মনে না করে যে সে তোমার আশ্রয়ে আছে বলে তুমি সৎপাত্রের চেষ্টায় একবার রাস্তা পর্যন্ত মাড়ালে না, বাড়ী থেকেই সস্তা জিনিস ধরে দিতে যাচ্ছো!

সোম। (হাসিয়া) পাগল শুধু পাগলা-গারদেই থাকে না—বাইরেও থাকে দেখছি। (প্রস্থান)

(শশিনাথ পড়ায় মনঃসংযোগ করিল। কিয়ৎকাল পরে দরজার পরদার অপর দিকে লীলাকে দেখা গেল—হাতে চায়ের পেয়ালা)

লীলা। শশিদা—

শশী। (মুখ ফিরাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে) লীলা! এস!

(লীলা কাছে আসিয়া টিপাই-এর উপর কাপ রাখিল)

শশী। তুমি চা নিয়ে এলে যে? কালীচরণ কোথায় গেল?

লীলা। কাল রাত থেকে তার জ্বর হয়েছে, আজ যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না।

শশী। বটে, তাই সকাল থেকে তাকে দেখতে পাই নি। চা-ও তাহলে তুমি করেছ?

লীলা। হ্যাঁ।

(শশিনাথ পেয়ালা তুলিয়া চায়ে চুমুক দিল)

লীলা। চিনি কি বেশী হয়েছে?

শশী। নাঃ! ঠিক হয়েছে। আর যদি একটু বেশীই হতো, তাহলেই বা কি এমন ক্ষতি ছিল? মানুষের জীবনটা এতই বড় যে, চায়ে একটু চিনি বেশী হল, কি পানে একটু চুণ কম হল—এ সব সামান্য ব্যাপার গুলোকে একেবারেই গ্রাহ্য করা উচিত নয়। এসব ছোট ব্যাপারগুলো কিন্তু বাস্তবিকই ছোট নয়, এই সব উপাদানের সাহায্যেই আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। আজ যেটা শুধু চায়ের চিনির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, দুদিন পরে সেটাই হয়তো অন্নবস্ত্রের মধ্যে বিরাটরূপে দেখা দেবে। এ তুমি নিশ্চয়ই জেনো, মানুষের মধ্যে যেসব অভাব এবং অসুযোগ দেখতে পাওয়া যায়, বাইরের সঙ্গে তার সংস্রব নেই। সমস্তই মানুষ নিজের মধ্যে রচনা করে। সেই জন্যে মানুষের নিজেরই স্বার্থে প্রথম কর্তব্য, নিজেকে সংযত করা। নিজের মধ্যে এমন সব অভাব সৃজন করা উচিত নয়, যার জন্যে অবশেষে শুধু নিজেরই প্রতি অসুযোগ করতে হয়। আমি যে এ কথা বললাম, এ থেকে যেন মনে করোনা যে তোমার চায়েতে চিনি বেশী হয়েছে। চিনি তোমার ঠিকই হয়েছে। কয়েকদিন আগে বৌদির সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা হয়েছিল। চায়ের চিনির কথায় সেগুলো মনে পড়ে গেল। অথচ দুটো ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাও নয়। বৌদির সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে, তা যদি তোমার জানা থাকে, তাহলে আমার কথার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারবে, আর তা যদি না হয়, তা হলে আমার কথার সহজ সত্যটুকু বুঝে জীবনের মধ্যে খাটাবার চেষ্টা করো। নিজে যেন নিজের অভাব এবং দুঃখের সৃষ্টি কোরো না।

(লীলা বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল)

শশী। চায়ের চিনি একটু বেশী হলে চা নষ্ট হয়ে গেল মনে করা যেমন ভুল, চায়ে পরিমাণের অতিরিক্ত চিনি দেওয়াও তেমনি অনুচিত। কিন্তু সে বিষয়ে তোমার বা আমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। কেন না, তুমি পরিমিত চিনিই দিয়েছো, এবং আমারও চা-টা বেশ ভাল লাগছে। (চা পান)

লীলা। (স্মিত মুখে) কিন্তু এ-সব কথা তুমি কেন বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে শশিদা!

শশী। যতটুকু বুঝতে পেরেছো, তার বেশী বোঝবার

এখন দরকার নেই। দরকার যখন হবে, তখন আমি আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দোবো।

লীলা। দিদি তোমার জন্যে কচুরী ভাজছে, নিয়ে আসিগে।

(লীলার প্রস্থান। অল্পক্ষণ পরে বাহির হইতে ভৃত্যের প্রবেশ)

রঘু। ছোটবাবু! একটি বাবু আপনাকে ডাকছেন!

শশী। বাবু? কি রকম বাবু! কি নাম বল্লে?

রঘু। নাম বল্লেন, সুধীর বাবু! সুন্দর মতন বাবু! মটর গাড়ী থেকে এসে নামলেন।

শশী। ওঃ। ঠিক হয়েছে! যা, যা, রঘু, বাবুকে খাতির করে বাইরের ঘরে বসাগে যা। বল, আমি এখুনি যাচ্ছি।

(রঘুর প্রস্থান। শশী ভিতরের দরজার পরদা সরাইয়া)

বৌদি, বৌদি!

(উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। কেন ঠাকুরপো?

শশী। বৌদি, তোমার জন্যে একটি স্বর্ণ-মৃগ ধরে এনেছি! আমার সেই বন্ধু সুধীর—যার কথা আমার কাছে থেকে শুনেছিলে, সে আজ লীলাকে দেখতে এসেছে। বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, অর্থ—সব বিষয়ে এ যদি আমার চেয়ে ভাল না হয়, তাহলে তুমি আমাকে যা করতে বলবে তাই করবো।

উর্ম্মিলা। (ক্ষুণ্ণ স্বরে) ও আমি চাইনে!

শশী। আমার সঙ্গে তুলনা করেছি বলে মন উঠলো না বুঝি? তা'হলে সেটুকু শুধরে নিচ্ছি। দেখতে দাদার চেয়ে ভাল, লেখাপড়ায় দাদার চেয়ে ভাল, আর অর্থে দাদাকে তিনবার কিনতে পারে। মোটরটা রাস্তায় রয়েছে, দেখলেই বুঝতে পারবে। মাষ্টার বুইক—তিরিশ হাজার টাকা দাম।

উর্ম্মিলা। (কপট ক্রোধে) দাদার উপমা দিলেই মনে করেছো নাকি যে, আমি ভুলে যাবো?

শশী। ভোলা তো উচিত—পতিব্রতাদের লক্ষণই হ'ল তাই!

উর্ম্মিলা। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল—কথার ঝুড়ী হচ্ছ তুমি।

শশী। অতএব কথা কাটাকাটি না করে চট ক'রে গিয়ে দাদাকে পাঠিয়ে দাও। বোলো, প্রিয় মুখুয্যের ছেলে—সুধীর! তাহলেই তিনি বুঝবেন, আর তোমারও তখন বুঝতে বাকী থাকবে না। হ্যাঁ, ভাখো, লীলাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও তো, আর কচুরী না কি ভাজছিলে, তাই দিয়ে জলখাবার ঠিক করে রাখ।

(উর্ম্মিলার প্রস্থান। কিছুপরে লীলার প্রবেশ)

শশী। লীলা, তোমাকে আমি খুঁজছিলাম!

লীলা। কেন শশীদা?

শশী। (বারবার লীলার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) লীলা! তোমার সেই লাল রঙের বাঙ্গালী শাড়ীটা আজ একবার পরলে কেমন হয়?

লীলা। (একটু নীরব থাকিয়া হাসিয়া ফেলিয়া) বাড়ীতে শুধু শুধু সে শাড়ী পরে কি হবে?

শশী। বাড়ীতে কেন? ধর, যদি একটু বেড়িয়েই আসা যায়। আমাদের বাড়ীর সামনে একটা মোটর দাঁড়িয়ে আছে—দেখেছো তো?

লীলা। না, দেখিনি তো! (জানালার ধারে গিয়া দেখিয়া) উঃ! খুব বড় মোটর তো! কার মোটর শশিদা?

শশী। ধর, মোটরটা আমাদেরই হবার উপক্রম হয়েছে!

লীলা। কেনা হবে নাকি?

শশী। হ্যাঁ, একরকম কেনাও বলা যেতে পারে!

লীলা। (হাসিয়া) শশিদার কাছ থেকে কখনো কোনো কথার যদি সোজা উত্তর পাওয়া যায়!

শশী। লীলা, তোমার সেই হীরের টাপটা বার করতে দেরী হবে কি?

লীলা। সেটাও পরতে হবে নাকি?

শশী। হ্যাঁ, মোটরের উপযোগী দুই একটা জিনিষ তো দেখানো চাই।

লীলা। (সহাস্যে) আর কিছু বলবার আছে?

শশী। আর? আর কাপড়ের সঙ্গে মানান করে সেই কালো ব্লাউজটাও পরো।

লীলা। দিদি, জামাইবাবু—এঁরাও সব যাবেন তো?

শশী। সে সব পরের কথা পরে হবে। তুমি তৈরী হ'লেই আমরা বৌদির কাছে যাবো। আমি একবার মোটরটা দেখে আসি, তুমি ততক্ষণ প্রস্তুত হয়ে নাও।

(শশিনাথ ও লীলার ভিন্ন দিকে প্রস্থান।

ভিতর হইতে সোমনাথ ও উর্ম্মিলার প্রবেশ)

সোম। অনেক পুণ্য থাকলে লীলার এ বিয়ে হবে। আমি বাইরে চললাম। তুমি লীলাকে একটু পরিষ্কার করে রাখ।

উর্ম্মিলা। লীলাকে সাজিয়ে দেখাবার কোন দরকার নেই। চোখে যদি লাগবার হয়, এমনি লাগবে।

সোম। নিজের ঘটনা থেকে দুঃসাহস জন্মে গেছে দেখছি। এ চোখজোড়া চুরি করে ছাতের ওপর থেকে যে বস্তু দেখতো, তুমি কি মনে কর জগতের সব বস্তু সেই একই রকম দেখতে?

উর্ম্মিলা। সে কথা নয়। চুরি করা জিনিষ মিষ্টি না হলেও মিষ্টি লাগে। চুরি করে দেখতে বলে ভালো লাগতো, বস্তুর কোন গুণ ছিল না।

সোম। (পত্নীর নাসিকা নাড়িয়া দিয়া) তা নয় গো, তা নয়। জগতের সব বস্তু সমান নয়। কোন বস্তু এমনিই সুন্দর দেখায়, আবার কোন বস্তু সোনায় মুড়ে দিলেও ভাল দেখায় না।

উর্ম্মিলা। সে তুমি আমাকে ভালবাস ব'লে দেখ, নইলে লীলা আমার চেয়ে দেখতে অনেক ভাল।

সোম। (গর্বিত স্বরে) তা'হলে বুঝতে পারছো লোকটা আমি কি রকম খাঁটি। স্ত্রীর চেয়ে শালীকে সুন্দর দেখে না এমন লোক বিরল।

উর্ম্মিলা। ইস্! সাধুপুরুষ! আর ছাত থেকে যখন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখতে তখন কি হতো! তখন তো আমি স্ত্রীও ছিলাম না, শালীও ছিলাম না।

সোম। ছিলে না কিন্তু হলে তো?

উর্ম্মিলা। আর যদি না হতাম?

সোম। না হলে বুঝতাম—আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ।

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) সত্যি বলছি, তুমি যখন তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখতে, তখন আমার লজ্জাও করতো, ভয়ও করতো আর—

সোম। আর কি?

উর্ম্মিলা। আর ভালোও লাগতো!

সোম। ভালোও লাগতো!! তখন তো আমি স্বামী ছিলাম না, যদি আমার সঙ্গে বিয়ে না হোত?

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) তাহলে বুঝতাম আমারও অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ!

(শশিনাথের প্রবেশ)

শশী। বৌদি, সুধীর বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না বলছে। তুমি একবার দেখা কর।

সোম। হাঁ। আমি এখনই যাচ্ছিলাম। শশি, তুমি ততক্ষণ লীলাকে প্রস্তুত করে রাখো। (প্রস্থান)

শশী। বৌদি, সত্যি করে বল, এ সম্বন্ধ তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা।

উর্ম্মিলা। পছন্দ হয়েছে, তবে সত্যি কথা যদি চাও, তা হলে বলি, তুমি রাজী হলে আমি ও একটুও চাইনে।

শশি। (হাসিয়া) লীলার বিয়ের হাঙ্গামাটা আগে মিটে যাক্, তারপর ভালো ক'রে তোমার চিকিৎসা করাতে হবে। তোমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে।

উর্ম্মিলা। যদি বিশ্বাসই করবে না, তবে জিজ্ঞাসা করছো কেন?

শশি। তোমার কথা বিশ্বাস করছি বলেই তো বলছি, তোমার মাথার ঠিক নেই। যাক্, চুপ করো—লীলা আসছে।

(লীলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। (লীলার প্রতি চাহিয়া) ঠাকুরপো তো কম নও! এর মধ্যে লীলাকে কাপড় বদলিয়েছো! কাপড় বদলালে যে লীলা?

লীলা। শশিদা বলেন—মোটরে করে বেড়াতে যাওয়া হবে—আর আমাকে—

শশী। একটু ভুল হচ্ছে লীলা। মোটরে করে যেতে হবে তা তো বলিনি। আমি বলছিলাম, বেড়াতে যেতে হবে, আর বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। এতটা জিনিষকে তুমি নিজেই যোগ করেছো।

লীলা। (সবিস্ময়ে) তুমি বলে না শশিদা, মোটরটা আমাদেরই হবে ?

শশী। আমি তো এখনও বলছি, তার উপক্রম হয়েছে। আমাকে বিশ্বাস না হয়, বৌদিকে জিজ্ঞাসা কর।

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) উঃ! তুমি কি ঠক্ হয়েছ ঠাকুরপো! তুমি সব করতে পারো! তোমরা এখানে একটু দাঁড়াও, আমি খাবার দু-খানা নিয়ে আসি।

লীলা। (বিস্মিত বিরক্ত মুখে) এখানে কার খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে শশিদা ?

শশী। জনৈক ভদ্রলোক, যিনি ওই মোটরটির মালিক এবং আমার বিশেষ বন্ধু—তার জন্যে। তাকে খাওয়ানোর ভার তোমাকে নিতে হবে।

লীলা। (হঠাৎ কঠিন হইয়া) তা আমি পারবো না।

শশী। পারবে না তুমি ? কি করে বলছো লীলা পারবে না ? পুরাকালে অতিথি সৎকার করবার জন্যে লোকে রাস্তা থেকে লোক ধরে আনতো। আর তুমি বলছো কিনা, আমার বন্ধুটিকে খাওয়ানোর ভার নিতে পারবে না! আচ্ছা, বলতো বৌদি, এটা কি রকম ভদ্রতা ?

উর্ম্মিলা। (হাসিমুখে) আমার বোন কখনও কোন অভদ্রতা করতেই পারে না ঠাকুরপো ? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তাছাড়া তোমার আদেশ লীলা কি কখনও অমান্য করেছে, যে আজ করবে। (লীলাকে) আয় আমার সঙ্গে।

[উর্ম্মিলা এবং লীলা ভিতরের দিকে—শশিনাথ বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল। অল্পকাল পরে সুধীরকে লইয়া সোমনাথ ও শশিনাথের প্রবেশ। শশী পরম সমাদরে সুধীরকে চেয়ারে বসাইল]

সোম। (সুধীরকে উদ্দেশ করিয়া) তোমার কথা শশীর মুখে অনেকদিন শুনেছি। আজ তোমার সঙ্গে পরিচয় করে বুঝলাম, কোনও কথাই শশী অতিরঞ্জিত করে বলেনি। তোমার সঙ্গে আমাদের এই পরিচয় যদি আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা হয়, তাহলে তাকে ভগবানের পরম আশীর্বাদ বলেই মনে করবো।

শশী। দাদা, তুমি ভেতরে গিয়ে বৌদিদিকে জল-খাবার পাঠিয়ে দিতে বল। (সোমনাথের প্রস্থান)

শশী। তুমি দেখো সুধীর—লীলা মেয়েটি একটি অপূর্ব বস্তু। রূপের দিক থেকে বলছিনে—মানুষের প্রতি যত্নে, সেবায়, গৃহস্থালীর কাজে-কর্মে, বুদ্ধিতে এবং নিষ্ঠাতাবে অমন মেয়ে হাজারে একটা মেলে না। তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি ওকে নিয়ে আসি।

(শশিনাথের প্রস্থান এবং একটু পরে লীলাকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ। পিছনে ভৃত্য দুই থালা খাবার লইয়া প্রবেশ করিল এবং তাহা টিপাই-এর উপর সাজাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল)

শশী। লীলা, ইনি আমার বন্ধু সুধীর মুখুয্যে—আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ওর মত ছেলেকে বন্ধুরূপে পেয়ে আমি গর্বিত বোধ করি।

(লীলা নমস্কার করিতেই সুধীর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতি-নমস্কার করিল)

শশী। সুধীর—এ হচ্ছে লীলা, যার কথা তুমি হয়তো এর আগেও আমার মুখ থেকে শুনেছ। এর সঙ্গে পরিচয় করলে তুমি যে খুশী হবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। এবং শুধু আলাপ-আলোচনায় নয়, কাজে কর্মেও লীলার পটুত্ব বড় সামান্য নয়। এই যে টেবল্ ক্লথটা দেখছো, এটা লীলার তৈরী; ওই দেওয়ালে রেশমের ছবি টাঙানো রয়েছে ওটা লীলা বুনেছে। লীলা শুধু ইংরেজী শিখেছে মনে করো না—সংস্কৃতে রঘুর তিন সর্গ ইতিমধ্যে শেষ করেছে। (কণেক নীরব থাকিয়া) তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন সুধীর, বোসো না।

(সুধীর নীরবে লীলার প্রতি ইঙ্গিত করিল)

শশী। (হাসিয়া) ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ—লীলা তুমি আসন

গ্রহণ না করলে সুধীর বলতে পাচ্ছে না। তুমি যোসো।

(লীলা কোনো রকমে একখানি চেয়ারে বসিয়া
ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল)

শশী। (খাবারের থালা দেখাইয়া) সুধীর আরম্ভ করে দাও ভাই। না, না, আপত্তি শুনব না। এ সমস্ত লীলা নিজে হাতে ধর ক'রে তৈরী করেছে। শুধু রান্না-বান্নার কাজেই নয়, সঙ্গীতেও ও সিদ্ধিলাভ করেছে। বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাইছো। আচ্ছা, আমি তোমার অনুরোধ যথাস্থানে পৌঁছে দিচ্ছি।

(শশী লীলার কাছে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে তাহাকে
একখানি গান গাহিতে বলিল। লীলা আপত্তি
করিল)

শশী। লক্ষ্মীটি! আমার অনুরোধ, একখানা গান গেয়ে দাও ভাই, তা না হলে যে সুধীরের কাছে অপদস্থ হব। একখানি গান গেয়ে দিলেই তোমার ছুটি।

(লীলা উঠিয়া অর্গানের সুমুখে বসিয়া
একখানি গান গাহিল। তারপর ধীরে ধীরে
প্রস্থান করিল। শশিনাথ তিলক অবধি তাহার
সঙ্গে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুধীরের পাশে
বসিল)

শশী। কি হে, কেমন দেখলে বল?

সুধীর। (হাসিয়া) কবে দিন স্থির করছো বল?

শশী। আর কোন কথা নেই তো?

সুধীর। কোন কথা নেই। শুধু একটা অনুরোধ আছে। বিয়ের দিনটা যত শিগগির সম্ভব স্থির করো।

শশী। (হাসিয়া) লীলার যে এতটা ক্ষমতা আছে, তা জানতাম না। চিরকালের সুধীরকে যে এতটুকু সময়ের মধ্যে অধীর করে দিতে পারে, স্বীকার করতেই হবে, সে অসীম ক্ষমতা ধারণ করে।

সুধীর। আমি স্বীকার করছি ভাই, সত্যিই তিনি অসীম ক্ষমতা ধারণ করেন। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। আমার সম্পূর্ণ মত আমি তোমাকে জানিয়ে চল্লাম, এখন তোমরা আমাকে বাংলা দেশের ঘরের দাঁড়ি-পাল্লায় বসিয়ে ওজন করে দেখ পছন্দ হয় কিনা। তারপর তোমাদের মতামত আমাকে জানিয়ে পাঠিও।

শশী। (সহাস্যে) এ বিনয় প্রকাশ না করলেই ভাল ছিল। কার মতামত তুমি চাওছে? লীলার মত? সেটা ফুলশয্যার রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করে থাকো। আর আমাদের মতের যদি অপেক্ষা থাকবে, তাহলে অন্তরালে তোমাকে নিয়ে এসে তোমার সামনে একটা নিরীহ প্রাণীকে এতক্ষণ ধরে পীড়ন করতাম না।

সুধীর। (উঠিয়া) আচ্ছা, কাল তাহলে গোপাল মামা আর ভটচাজ মশাইকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়ে দেবো।

শশী। কালই—আচ্ছা দিও।

(সুধীর প্রস্থান করিল)

(শশিনাথ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।
যেন কিছু ভাবিতে লাগিল)

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্ব দৃশ্যের অনুরূপ। তিনদিন পরে।
শশিনাথ ও বরেন]

শশী। তুমি যদি সঙ্গে না থাকতে, তা হলে কাল রাত্রে হরিচরণ বাবুর কাছে তোমার সঙ্গে সরযূর বিয়ের কথাটা তুলে একেবারে পাকা কোরে নিতাম।

বরেন। (চাপা গলায়) না না, শশী, ছেলেমানুষী করোনি, ভালই করেছে। কাল ওঁদের ওখানে যাবার আগে তোমার সঙ্গে এসব কথা হবার পর আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, এখন হরিচরণ বাবুর কাছে এ সব কথা তোলা একেবারেই ভাল হবে না। যতদিন না ওঁদের দিক থেকে সরযূর বিয়ের কথা উঠছে ততদিন সে কথাটা আমাদের পক্ষ থেকে তোলা উচিত হবে না। রেঙ্গুন থেকে আমার ফিরে আসবার আগে এ-কথা তুলো না।

শশী। আমি ঠিক যখন একটি সংকল্প করলাম, তখন তার মুখে এমন ক'রে বাধা দেওয়াটা তোমার ভাল হ'ল না। এই সময় আবার তুমি রেঙ্গুন চল্লে। ফিরবে কবে?

বরেন। বোনকে ভগ্নীপতির কাছে পৌঁছে দিয়েই ফিরবো। সবশুদ্ধ দিন পনেরোর বেশী হবে না। কি করবো বল, ভগ্নীপতির অসুখের খবর শুনে পর্যন্ত বোনটি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বসে আছে।

শশী। কিন্তু আমাদের কাছে কথাটা তোলবার আগে হরিচরণ বাবু যদি অন্য জায়গায় সরযূর বিয়ে ঠিক করে ফেলেন, তখন কি হবে!

বরেন। না, সেরকম কখনই হবে না। তোমার অজানায় এঁদের কোনও কাজ হবে না, তা একেবারে নিশ্চয়। আর একটা কথা, তোমার আমার দাবী উপেক্ষা করে এঁরা অন্য জায়গায় যাবেন না। প্রথমে আমাদেরই কাছে প্রস্তাব আসবে।

শশী। এ সিদ্ধান্ত তুমি কেমন করে করছ? তুমি কি মনে কর, আমাদের চেয়ে সৎপাত্র বাংলাদেশে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না?

বরেন। চট্ করে পাওয়া যাবে না—অন্তত আমার রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসবার আগে পাওয়া যাবে না। আগে আমি ফিরে আসি, তারপর পরামর্শ করে যা'হয় করা যাবে।

শশী। কাল মিছে তুমি বাধা দিলে, নইলে কাল তোমার বিয়ের কথাটা পাকা করে নিতাম। কি জান, এ সব কাজ ফেলে রাখতে নেই। লোকে কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম্।

বরেন। (হাসিয়া) লোকের কথা শুনো না ভাই, সবুরে মেওয়া ফলে, লোকে তাও বলে।

শশী। মেওয়া ফলে বটে, কিন্তু কার মেওয়া ফলে, সেই হচ্ছে কথা। তুমি সবুর করলে, যদি আমার মেওয়া ফলে, তাহলেই তো সর্বনাশ!

বরেন। (হাসিয়া) সে ভয় করিনে। বৈরাগ্যের আগুনে ঝলসানো তোমার শুকনো গাছে মেওয়া ফলবে, তার সম্ভাবনা নেই।

শশী। (বরেনের কাঁধে হাত রাখিয়া) অতটা দুঃসাহস ভাল নয়, শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এস। দেরী করে এসে যদি দেখো সেই অল্প সম্ভাবনার ফলটিই ফলেছে, তখন আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না।

বরেন। তা নিশ্চয়ই; কেন না বিশ্বয়টাই সমস্ত জায়গা জুড়ে থাকবে।

শশী। (সহসা) আচ্ছা বরেন, রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে যদি শোনো, ইতিমধ্যে সরযূর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে নিইছি, তখন আমার ওপর তোমার মনের অবস্থা কেমন হয়, সত্যি করে বলবে?

বরেন। বেশ রোমাঞ্চকর করে বলবো?

শশী। বল না।

বরেন। তোমাকে হত্যা করবার জন্যে দোকান থেকে ছোরা কিনে এনেছি শুনলে তোমার মনের অবস্থা যেমন হয়, ঠিক তেমনি!

শশী। (সহাস্যে) খুব চমৎকার উপমাটা দিয়েছো কিন্তু।

বরেন। উঠ্‌লাম। কয়েকটা দরকারী জিনিষ কেনা বাকী আছে। দিন পনেরো পরে দেখা হবে। গুডবাই।

শশী। Wish you God speed বরেন!

(বরেনের প্রস্থান। মিনিটখানেক পরে চায়ের পেয়ালা হাতে উর্মিলার প্রবেশ)

উর্মিলা। ঠাকুরপো, চা খাও!

শশী। (ঈষৎ হাসিয়া) আজ যে বৌদি চা নিয়ে হাজির? কোন মতলব আছে বুঝি? যোসো, বোঝাই গেছে! (উর্মিলা শশীনাথ-প্রদত্ত চেয়ারে বসিল) সম্ভবত বিয়ে সংক্রান্ত পরামর্শ?

উর্মিলা। হ্যাঁ ঠাকুরপো বিয়ে সংক্রান্তই বটে, কিন্তু বলতে আমার ভয় হচ্ছে, তুমি হয়তো বিরক্ত হবে।

শশী। (হাসিয়া) কিন্তু এত ভূমিকার পর এখন না বল্লে যে আরও বিরক্ত হব!

উর্মিলা। আমার মনে হচ্ছে, এ বিয়েতে লীলা সুখী হবে না।

শশী। (বিস্মিত হইয়া হাসিয়া) তোমার সেটা শুধু মনে হচ্ছে, না, কেউ তোমাকে বলেছে?

উর্মিলা। সে একরকম বলাই বয়।

শশী। কি রকম বলেছে, কে বলেছে না জানলে পরামর্শ দিই কি করে?

উর্ম্মিলা। (স্মিত মুখে) তুমি যদি অমন করে জেরা করো, তাহলে হয়তো বোঝাতে পারবো না। অনেক কথা বোঝা যায়, অথচ বোঝানো যায় না। আমি বুঝতে পেরেছি, এ বিয়েতে লীলা সুখী হবে না।

শশী। (চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া) কিন্তু একমাত্র তোমার কথা বিশ্বাস করা ছাড়া আমি যে অন্য কোন রকমে বুঝতে পাচ্ছি নে। লীলা কি তোমাকে কিছু বলেছে?

উর্ম্মিলা। স্পষ্ট কিছু বলেনি। কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে আকারে-প্রকারে কথায়-বার্ত্তায় সে একরকম বলেছে যে, এ বিয়ে সে চায় না।

শশী। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) কি চায় তাও বলেছে নাকি?

উর্ম্মিলা। তাও একরকম বলেছে।

শশী। (রুদ্ধ নিশ্বাসে) কি চায়?

উর্ম্মিলা। তোমাকেই চায়!

শশী। (কিছুক্ষণ পরে) না, তোমরা সকলে মিলে আমাকে পাগল করে ছাড়বে দেখছি। আমাকে চায় মানে কি? আমাকে সে ভালবাসে?

উর্ম্মিলা। বাসে।

শশী। বাসে তো বেশ করে! কিন্তু সে কি স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, সে সুধীরকে বিয়ে করতে চায় না—আর আমাকে বিয়ে করতে চায়?

উর্ম্মিলা। স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, সুধীরকে বিয়ে করতে চায় না—আর প্রকারান্তরে জানিয়েছে তোমাকে বিয়ে করতে চায়।

শশী। ছাখো বৌদি, আগুন নিয়ে খেলা যেমন বিপজ্জনক, মানুষ নিয়ে আর মানুষের মন নিয়ে খেলা করাও তেমনি বিপজ্জনক! লীলার মনে বাস্তবিক যদি কোনরকম বিকার এসে থাকে—আর জন্যে তুমি আর দাদা দায়ী। আমাকে নিয়ে তোমরা কিছুদিন থেকে এমন উৎপাত লাগিয়েছো যে, লীলারও মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, আমি হয়ত খুব একটা অদ্ভুত পদার্থ!

উর্ম্মিলা। এ মন্দ কথা নয় ঠাকুরপো! লীলা ভালবাসলে তোমাকে আর তার জন্যে দায়ী হলাম আমি আর তোমার দাদা, আর তুমি একেবারে দায়ে খালাস! চোর যে, সে হল সাধু—আর যাদের কাছে চোর ধরা পড়ল তারা হল অপরাধী!

শশী। তা তো নয়! চুরি করবার প্রলোভন দেখিয়ে সাধুকে যারা চোর করে তুলতে চায়, তারাই হল, অপরাধী। সে কথা থাক্, এখন তোমার মতলব কি বল। সুধীরের সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে বলছো?

উর্ম্মিলা। আমি কিছুই ভাঙ্তে গড়তে বলছি নে। আসল কথা তোমাদের জানালাম, এখন তোমরা যা ভাল বিবেচনা হয় কর। আমি শুধু বলছিলাম তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে লীলা সুখী হয়!

শশী। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কাতর কণ্ঠে) মোহাই বৌদি, আমাকে তোমরা দয়া করে ছেড়ে দাও। আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী মানুষ, বিয়ে করে নিজেও বিপদে পড়বো—অপরকেও সুখী করতে পারবো না। আমি কবে আছি কবে নেই—তার কোন ঠিক নেই। শুধু তোমার হাতের রান্নার জোরে সংসারে এতদিন টিঁকে আছি, নইলে কবে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে যোগ দিতাম।

উর্ম্মিলা। না, না ঠাকুরপো! আমি তোমার ইচ্ছে বা মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে অনুরোধ করছিনে। লীলার মঙ্গল কামনা তোমার মনের মধ্যে কতখানি আছে, তা আমি জানি বলেই সব কথা তোমাকে খুলে বল্লাম। এখন তাই যাতে লীলা জীবনে সুখী হতে পারে, তাই কর। যে কথা আমি তোমাকে জানাতে এসেছি, তার মূলে কতখানি সত্যি আছে, তা তুমি নিজে পরখ করে দেখতে হয় দেখ। তারপর, যা ভালো মনে হয় কোরো।

শশী। লীলার মঙ্গলের জন্যে যদি কোনও কাজ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করতে হয় বৌদি—তাও করতে আমি সঙ্কুচিত হব না। আবার যখন ঠিক বুঝবো যে আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে লীলার জীবন বাস্তবিকই অসুখের হবে, তখন লীলাকে বিয়ে করতে এক মুহূর্ত্তও

দিয়া করবো না। কিন্তু যা আমি শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধেই করতে পারি, বোহাই তোমার, সখ করে আমাকে তা করতে বলো না।

উর্ম্মিলা। আমি আর তোমাকে কিছুই বলবো না—এখন থেকে লীলার সব ভার তোমার ওপর। তুমি যা ভাল বুঝবে তাতেই তার মঙ্গল হবে।

শশী। এত বড় দায়িত্বের ভার বহন করবার শক্তি কি আমার আছে বৌদি যে তুমি নিশ্চিন্ত মনে লীলার ইহলোকের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছ।

উর্ম্মিলা। হাঁ, সে শক্তি একমাত্র তোমারই আছে। তুমি লীলাকে দেখ, শোন, বোঝো—তারপর যা ভাল মনে হয় কোরো। (শশিনাথ নীরব) এর মধ্যে তোমার কি আছে ঠাকুরপো? যেমন ভাল বুঝবে করবে।

শশী। না ভাববার কিছুই নেই। লীলা নিজের মনই বা কি বোঝে, আর নিজের ভাল-মন্দই বা কি বোঝে? আমি সব ঠিক করে নেব—তুমি কিছু ভেবো না বৌদি। তুমি গিয়ে একবার লীলাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাওতো।

(উর্ম্মিলার প্রস্থান। ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে লীলার প্রবেশ)

শশী। এসো। (তাহার দিকে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল) বোসো। রাত জিগে?

লীলা। (হাসিয়া) না।

শশী। আমি তোমার বৌদিকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। (পদচারণ করিতে করিতে) আচ্ছা লীলা, আমি যে তোমার একজন হিতৈষী, সব রকমে তোমার মঙ্গল-কামনা করি, সে ধারণা তোমার আছে তো?

লীলা। আছে।

শশী। বেশ কথা। সে বিশ্বাস কখনও হারিওনা। আমার কাছ থেকে তুমি জেনে রেখো, কখনো তোমার সে বিশ্বাস হারাবার কারণ ঘটবে না।

লীলা। আমি কি এমনই অকৃতজ্ঞ শশিদা যে, আমাকে একথা জানিয়ে দিলে তবে আমি জানবো—তবে আমার মনে থাকবে?

শশী। কৃতজ্ঞতার কথা কেন বলছো লীলা? তুমি নিজের গুণে আর আত্মীয়তার জোরে আমাদের স্নেহ আকর্ষণ করেছ। তোমার পাওনার বেশী আমরা কিছুই দিইনে যার জন্যে তুমি কৃতজ্ঞ থাকতে পারো। (একটু ইতস্তত করিয়া) একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করছি। আশা করি তুমি অসঙ্কোচে তার যথার্থ ও সরল উত্তর দেবে। একান্ত প্রয়োজন মনে না করলে তোমাকে কষ্ট দিতাম না।

(লীলা নীরব)

(একটু থামিয়া) তোমার কাছ থেকে যেমন সহজ ভাবে উত্তর চাচ্ছি, আমিও ঠিক তেমনি সহজ ভাবে কথাটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো। সুধীরের সঙ্গে তোমার বিয়ে কি তোমার মনঃপূত নয়?—তুমি অসঙ্কোচে এ কথাটার উত্তর দাও—কোন কোন সময়ে লজ্জা-সঙ্কোচ চেষ্টা করেও দূর করতে হয়। (লীলাকে নীরব দেখিয়া) বল লীলা, বল, আমার কথার উত্তর দাও। এ বিয়ে কি তোমার মনঃপূত নয়?

লীলা। না।

শশী। (এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া) বেশ কথা। আচ্ছা, আমার সঙ্গে বিয়ে হলে কি তুমি সুখী হও? বল, লজ্জা করো না!

(লীলা ধীরে ধীরে মুখ নীচু করিল। কোন কথা বলিল না।]

শশী। তুমি যখন কিছুই বলছো না তখন আমি ধরে নিচ্ছি আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি সুখী হও এই তোমার ধারণা! চায়ের চিনির প্রসঙ্গে সেদিন তোমাকে যে কথা বলেছিলাম, তা বোধ হয় তোমার মনে আছে। তুমি আমাকে ভালবাস জেনে খুবই সুখী হয়েছি, কিন্তু তুমিও জেনে রাখ—আমিও তোমাকে কম ভালবাসিনা। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) কিন্তু আমরা পরস্পরকে ভালবাসি বলেই যে আমাদের উভয়ের বিয়ে হওয়া দরকার

বা মঙ্গলকর, তা নাও হ'তে পারে তো লীলা? বিবাহিত জীবন কামনা করে তো আমাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মায় নি! তবে কেন সে ভালবাসাকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে বিবাহ একান্ত প্রয়োজন হবে? তোমার সঙ্গে যার বিয়ের কথা হচ্ছে, সে আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাকে আমি খুব ভাল রকম করেই জানি। বাংলা দেশে এমন একটিও মেয়ে নেই যে সুধীরকে পেয়ে ধন্য না মনে করবে। বিদ্যে বল, বুদ্ধি বল, রূপ বল, অর্থ বল,—সব বিষয়ে সে আমার চেয়ে অনেক ওপরে। দাদার এবং আমার বিশেষ আগ্রহ যাতে এ বিয়ে হয়—বৌদিরও তাই! এ তুমি ঠিক জেনো লীলা, পৃথিবীর মধ্যে যে তিনজন তোমার সবচেয়ে হিতৈষী, তারা তোমার জন্যে যে ব্যবস্থা করবে তাতে তোমার মঙ্গল হবেই। আর আমাকে তো তুমি জানো লীলা—আমি একরকম সন্ন্যাসী-বৈরাগী গোছের জীব, কবে দূরে সরে যেতাম, শুধু তোমাদের স্নেহের দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছো, তাই আছি! আমাকে যতটুকু পেয়েছো ততটুকুই ভালো। তার বেশী পেতে গেলে দেখবে আমি একেবারে অকেজো জিনিস! মন তুমি একেবারে হাল্কা করে ফ্যালো! আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তুমি নিরাময় চিত্তে তোমার নতুন জীবনে প্রবেশ করো, তোমার বিবাহিত জীবন পুণ্যে আনন্দে সার্থক হোক! এর বেশী আমার আর বলবার কিছু নেই।

(কিছুক্ষণ পর্যন্ত দুইজনে নীরব হইয়া রহিল। তারপর)

শশী। লীলা।

লীলা। (যেন চৈতন্য লাভ করিয়া) কি বলছ?

শশী। আমি যা বললাম, বুঝেছো?

লীলা বুঝেছি।

শশী। তাহলে সুধীরের সঙ্গে বিয়েতে আর তোমার কোন অমত নেই তো?

লীলা। (রুদ্ধ নিশ্বাসে) না!

শশী। (আনন্দিত হইয়া) লক্ষ্মী মেয়ে! আজ তুমি আমাকে যে সুখী করলে তার, তা তোমাকে আর কি বলবো! আশীর্বাদ করি, তুমি চির সৌভাগ্যবতী হও!!

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কয়েকদিন পরে। ভুবনেশ্বর। সোমনাথ এবং উর্মিলা দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল]

সোম। সরযূ কোথায়? সে কি খুব কেঁদে পড়েছে নাকি?

উর্মিলা। তা আর পড়বে না! খুব চাপা মেয়ে তাই—নইলে এতো কেঁদে কেটে অনর্থ করতো। মায়ের মুখ জীবনে দেখলে না, জগতে এক বাপ ছিল, তাঁকেও এই বয়সেই হারালো। ওকে দেখলে মায়া হয়।

সোম। হরিচরণবাবু যেদিন মারা গেলেন, সেদিন তো আর তুমি যাওনি; সে দিনটা যে কি করে ওখানে কেটেছে, তা এখন আর ভাবতেও পারিনে!

উর্মিলা। ঠাকুরপোর হাতে সরযূকে সঁপে দেবার পর হরিচরণবাবু আর কতক্ষণ ছিলেন?

সোম। ঘণ্টা দুয়েক বড় জোর। কিন্তু আর কথা কইতে পারেন নি। সেই সময়টা সরযূ বড় উতলা হয়ে পড়েছিল। লীলা সেই সময় ওকে খুব সামলেছে।

উর্মিলা। সরযূ মেয়েটিকে আমার গোড়া থেকেই খুব ভালো লেগেছে! ওকে যে এমন করে ভগবান আমাদের সংসারে পাঠাবেন, তা কল্পনাও করতে পারিনি। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, ঠাকুরপো ওঁকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছে?

সোম। তখন কি করে বুঝবো! সমস্ত দিন অজ্ঞান হয়ে থেকে হরিচরণবাবু তখন সবেমাত্র চোখ মেলেছেন। তাড়াতাড়ি মুখে ওষুধ দিতে গেলাম—খেলেন না। বল্লেন—শশীনাথ কৈ, শশীনাথ! তারপর শশীনাথের হাত ধরে খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। ও-পাশে সরযূ

বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে হাত বাড়িয়ে সরযূর একখানা হাত টেনে নিয়ে শশীনাথ আর সরযূর হাত নিজের বুকের ওপর শশীনাথের দিকে চেয়ে বল্লেন—বল!

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপো কি বল্লে?

সোম। শশী বল্লে—কি বলবো বলুন! হরিচরণবাবু তার মুখের পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বল্লেন—বল, গ্রহণ করলে?

উর্ম্মিলা। (সাগ্রহে) তারপর!

সোম। শশীনাথ বেশ জোর করেই বল্লে—সরযূর সব ভার আমি নিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

উর্ম্মিলা। দেখ, আমার মনে হয়, সরযূকে ঠাকুরপোর হাতে দেবার কল্পনা হরিচরণবাবুর মনে অনেকদিন থেকেই ছিল। এতদিন সাহস করে বলতে পারেন নি।

সোম। আমারও তাই বিশ্বাস। ইদানীং উনি আমার কাছে যখনই সরযূর বিয়ের কথা পাড়তেন, তখনই তাঁর ভাব-ভঙ্গীতে মনে হ'ত যেন আমাকে কি একটা কথা বলতে চাইছেন—অথচ বলতে পারছেন না।

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপোর কথা শুনে তিনি আর কিছু বল্লেন?

সোম। নাঃ। কোনও কথা বলতে পারলেন না; শুধু মুখ দিয়ে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এলো, এবং বোধ হল চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।

উর্ম্মিলা। আচ্ছা, লীলা তখন সেইখানেই বসেছিল?

সোম। ছিল বৈকি! হঠাৎ ও-কথা জিজ্ঞেসা করলে যে?

উর্ম্মিলা। না এমনিই। যাই হোক—এখন পরশুদিন লীলার বিয়ে চুকে গেলেই আমি বাঁচি। তারপর ও-মাসে ঠাকুরপোর সঙ্গে সরযূর চারহাত এক করে দিতে পারলেই খাণ্ডড়ীর কাছে আমি দায়ে খালাস হই। জান তো, ঠাকুরপোকে সংসারী করবার ভার মা আমার ওপর দিয়ে গেছেন। যে একগুঁয়ে ছেলে—এত সহজে যে রাজী হবে, তা ভাবিনি। যাই হোক, সরযূ ঠাকুরপোর অযোগ্য হবে না।

সোম। কদিন ধরে ভারী পরিশ্রম যাচ্ছে—পরশুদিনের হাঙ্গামটা মিটলেই বাঁচি! তুমি যাও, সুধার সঙ্গে বসে খুচরো জিনিষের ফর্দটা তৈরী করে ফেলো; আমি একবার বাজারটা ঘুরে আসি!

[ভিন্ন ভিন্ন দিকে উভয়ের প্রস্থান]

[লীলা ও সরযূর প্রবেশ]

লীলা। আমার বিশ্বাস সরযূ, তোমার দুঃখের পালা ভগবান আগেই সেরে দিচ্ছেন। সুখের দিন তোমার শীগগিরই আসবে।

(লীলা সরযূকে একখানি ইজিচেয়ারে বসাইয়া নিজে আর একখানি সোফায় বসিল)

সরযূ। কি জানি ভাই, সে ভরসা তো আমার একটুও হয় না। কত রকমের দুঃখ আর কত আমাকে এরই মধ্যে ভোগ করতে হয়েছে—তা তুমি একটু একটু জেনেছো। শেষ আশ্রয় আর অবলম্বন ছিলেন, বাবা। তাও তো আমার দুরদৃষ্টে সইলো না।

লীলা। কাকা তোমায় নিরাশ্রয় করে যাননি সরযূ। আশ্রয় ভাঙবার ঠিক আগেই তিনি তোমার আশ্রয় গড়ে দিয়ে গেছেন। (সহসা) আচ্ছা সরযূ, তুমি ছেলেবেলায় শিব পূজো করেছিলে?

সরযূ। (বিস্মিত হইয়া) না। কেন ভাই?

লীলা। আর কোন ব্রতপূজা, যাতে—(লীলা থামিয়া গেল)।

সরযূ। যাতে কি হয় লীলা?

লীলা। (ধীরে ধীরে) যাতে শশীদা তোমার স্বামী হতে পারেন?

সরযূ। এ-জন্মে তো কিছু করিনি ভাই, পূর্ব্ব জন্মে যদি কিছু করে থাকি!

লীলা। এ-জন্মে যদি না করে থাকো, তাহলে নিশ্চয় জেনো, পূর্ব্ব জন্মে তোমার অনেক পুণ্য ছিল—তা না হলে এ কখনো হতে পারে না। শশীদার আশ্রয়ে তোমার সব দুঃখ শেষ হবে সরযূ।

সরযূ। (আরক্ত নতমুখে) ভয় হয় ভাই, আমার কপালে এতই যদি যে এতটা সুখ আমার ভাগ্যে সম্ভব বলে মনে হয় না। তোমার শশীদাকে তো মানুষ নয় লীলা,

তিনি দেবতা! আমি এমন কি করেছি ভাই, যে তাঁর পায়ে চিরদিনের আশ্রয় পাবো!

লীলা। তাঁর নিজের দয়ায় আশ্রয় পাবে। তিনি করুণা কোরে তোমাকে আশ্রয় দেবেন। তুমি তাঁকে খুব বেশী না জেনেও ঠিক বলেছো সরযূ, তিনি দেবতার মত দয়ালু। ঠিক বলেছো তুমি, বাস্তবিকই তিনি মানুষ নন। তিনি মানুষের অনেক ওপরে—মানুষের সঙ্গে তাঁর দেওয়া-নেওয়ার কারবার নেই—তিনি শুধু দিতেই জানেন—নিতে তিনি কিছু চান না।

সরযূ। (সহসা) আচ্ছা লীলা, তোমার শশীদাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে বেশ ভাল হতো, না?

লীলা। (বিহ্বল কণ্ঠে) ছিঃ ভাই—ওকি কথা। তাছাড়া সরযূ, একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে স্থির হয়ে গেছে—এখন এসব কথা বলতে নেই ভাই!

সরযূ। (লজ্জিত হইয়া) আর বলবো না। আচ্ছা, সুধীরবাবুকে তুমি দেখেছো তো লীলা?

লীলা। দেখেছি।

সরযূ। শুনেছি, রূপে গুণে মনে সব বিষয়ে তিনি সমান।

লীলা। আমিও তাই শুনেছি।

সরযূ। তিনি তোমাকে প্রথম দিন দেখে, শুনলাম মুগ্ধ হয়ে গিছলেন?

লীলা। আমিও সেই রকম শুনেছি।

সরযূ। আচ্ছা লীলা?

লীলা। কি?

সরযূ। তোমার মনটা ভাই কোথায় থাকে, কিছুতেই তার নাগাল পাব না কি?

লীলা। (হাসিয়া) আমার মনের নাগাল পাবার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত? আচ্ছা, তোমার কি আন্দাজ সরযূ, আমার মন কোথায় থাকে?

সরযূ। তা আমি আন্দাজ করতে পারিনে—একবার যা মনে করি, পরমুহূর্তেই তা ভুল বলে মনে হয়।

লীলা। কিন্তু তোমার মনের সন্ধান আমি ঠিক জানি—আন্দাজ নয়—একেবারে ঠিক কথা। বলতো কোথায় থাকে?

সরযূ। (বিস্ময়ভরে) বল!

লীলা। মুখে বলবো না। একখানি গান গেয়ে তোমার মনের কথা তোমাকেই শুনিয়ে দেব।

সরযূ। সে তো আরও ভাল।

[লীলা উঠিয়া আসিয়া অর্গানের সুমুখে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল। গান চলিতেছে এমন সময় শশীনাথের প্রবেশ। লীলা তাহাকে দেখিতে পাইল না; সরযূ দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, শশীনাথ ইঙ্গিতে তাহাকে উঠিতে বারণ করিল। গান চলিতে লাগিল। শশীনাথ লীলার পিছনে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল।]

শশী। (গান থামিলে) লীলা, এ গানখানি তুমি কবে শিখেছো?

(সহসা শশীনাথকে দেখিয়া লীলা লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অল্পক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর)

লীলা। সরযূ! এমন করে শশিদার সামনে আমায় অপ্রস্তুত করা তোমার ভারী অন্যায়। কেন তুমি আমায় বলে না!　　(দ্রুত প্রস্থান)

শশী। (অবাক হইয়া) একে আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলাম না, সরযূ! হঠাৎ কখন কি কারণে যে লীলা রেগে ওঠে তা আমার কাছে দুর্বোধ রহস্যের মতো জটিল বলে মনে হয়। (ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া) তোমার জন্যে লীলার পাশের ঘরটি বৌদি সাজিয়ে রেখেছেন। তোমার পড়বার জন্যে রামায়ণ মহাভারত থেকে আরম্ভ করে গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত কুড়ি-পঁচিশখানা বই কিনে আনিয়েছেন। তোমার এখানে কোনও অসুবিধা হবে না সরযূ।

সরযূ। (বিষাদযুক্ত কণ্ঠে) আপনাদের এখানে আমার কোন অসুবিধা হবে না তা জানি। কিন্তু আমিই যেন সকলকে বিব্রত করছি। তার চেয়ে আমি যদি কিছুদিনের জন্যে বিলাসপুরে—

শশী। কিন্তু তাতে যদি আমরা বিব্রত মনে করি? কিসে আমরা বেশী বিব্রত হব, সেটা তোমার চেয়ে

আমরা বেশী বুঝিনে কি? তাছাড়া, শুধু আমাদের বেশী বিব্রত হবার কথাই এর মধ্যে নেই। তুমি কোথায় বেশী বিব্রত হবে? একা বিলাসপুরে, না, লীলা আর বৌদির কাছে এখানে? (সরযূ নীরব) কাকার কাছ থেকে আমি যে অধিকার পেয়েছি, সেকি ভুলে গেছ সরযূ? এখন এ পৃথিবীর মধ্যে তোমার ওপর আমার অধিকার সকলের চেয়ে বেশী। আমার সেই অধিকার খাটাতে তুমি যদি বাধা দাও, তাহলে বুঝবো আমার অধিকার তুমি অস্বীকার করতে চাও। তুমি নিজের বিষয় সব রকম ভাবনা চিন্তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত কোরে আমার ওপর একান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে সব ছেড়ে দাও। আমি তোমার যা ব্যবস্থা করবো, তাতে তোমার নিজের কাছে বা জগতের কাছে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবার কারণ হবে না।

সরযূ। আমি আর কোন বিষয়ে নিজের বিবেচনা খাটাবো না—আপনি যা করবেন তাই হবে। আমি এখানেই থাকবো।

শশী। খুব ভালো কথা; শুনে সুখী হলাম। এখন যাও, গিয়ে একবার লীলাকে পাঠিয়ে দাও।

(সরযূর প্রস্থান)

(উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপো! তোমাকে আমি চারদিকে গন্ধ খোঁজা ক'রে বেড়াচ্ছি! ময়রা এসেছে—ওকে অর্ডারগুলো লিখিয়ে দেবে এসো—তোমার দাদা বাড়ী নেই।

শশী। বৌদির আনন্দ যে আর আর ধরে না দেখছি! কিন্তু তোমার এ আনন্দ আজ কোথায় থাকতো বৌদি, যদি তোমার একগুঁয়েমীকে প্রশ্রয় দিতাম?

উর্ম্মিলা। এ আনন্দ আজ এই রকমই হ'ত—তবে ফাল্গুন মাসের আনন্দটা বাদ পড়তো। তা যা হয়েছে ভালই হয়েছে ঠাকুরপো—আমার আর কোন দুঃখ নেই। সরযূকে পেয়ে আমি বুঝেছি যে, আমরা যখন দুর্ভাবনায় আকুল হয়েছিলাম, তখন ভগবান আমাদের মঙ্গলই করেছেন। সরযূ মেয়েটি একটি অদ্ভুত জিনিষ। একেবারে আসল চীজ, যত মাজবে ঘষবে তত চকচকে হবে—কোনখানে একটুও ময়লা নেই। তোমার ভাগ্য ভাল ঠাকুরপো।

শশী। ভাগ্য আমার নিশ্চয়ই ভালো বৌদি, তোমাকে যখন প্রসন্ন করতে পেরেছি। ফাল্গুন মাসেও তোমাকে ঠিক এই রকম প্রসন্ন করতে পারবো—কারণ সৎপাত্রের ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়নি। তবে পাত্রটির সময় জ্ঞানের একান্ত অভাব—পনেরো দিন বলে ফিরতে একমাস পার কোরে যায়। কিন্তু সে-সব পরের কথা পরে হবে, উপস্থিত তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। তোমরা যে ব্যবস্থা করেছো পুরুত লীলাকে দান করবে, তা আমার একটুও ভাল বোধ হচ্ছে না। বাড়ীতে লোক থাকতে পুরুতে দান করবে কেন?

উর্ম্মিলা। কে করবে বল? তোমার দাদার বা শরীর, তিনি তো পারবেন না!

শশী। আমি করবো?

উর্ম্মিলা। তুমি!! না ঠাকুরপো, তোমার দান করা হতেই পারে না, আর যে কেউ হোক করবে—তুমি না।

শশী। (ক্ষণেক পরে) তা হলে তুমি করো না?

উর্ম্মিলা। শাস্ত্র কি তা তোমরা জানো; আমার মনে হয় দান করবার অধিকার আমার নেই।

শশী। না থাকলে কিনে নিলেই হবে। পয়সা দিলে তোমাদের শাস্ত্রে সবই তো কিনতে পাওয়া যায়।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মা, বাবু এসেছেন।

উর্ম্মিলা। চল্ যাই। তোমার দাদাকে দিয়েই তাহলে ময়রার কর্দ্দ করে দিই—তুমি বরঞ্চ নেমন্তন্নর কর্দ্দটা লিখে নাও।

শশী। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে কর্দ্দ তৈরী করে ফেলছি। (উর্ম্মিলার প্রস্থান। ভিন্নদিক দিয়া লীলার প্রবেশ)

শশী। এস। তোমায় আমি ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। (লীলা নীরব) তোমার শরীর কি ভাল নেই লীলা?

লীলা। কেন ডাকছিলে শশীদা?

শশী। (ইতস্তত ভাবে হাতের মখমল কেসটি খুলিয়া) সত্যি তোমাকে এটা আমি উপহার দেব—তোমার গলায় ঠিক হবে কি না তাই দেখতে এলাম।

(মুক্তার কণ্ঠি বাহির করিল)

লীলা। (সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে) আমাকে আর কতরকমে অপমান করবার সখ আছে শশিদা?—যা আছে সব মিটিয়ে নাও—আর কত রকমে শাস্তি দেবার আছে দাও।

শশী। (অবাক হইয়া) আমি তোমাকে অপমান করছি—আমি তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি?

লীলা। (চাপা গলায়) হ্যাঁ তুমি! তুমি আমাকে অপমান করছো—তুমি আমাকে শাস্তি দিচ্ছ! শুনলে? এখন যাও—আমি আর পারছিনে! (দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া পিছন ফিরিল। তারপর) তোমরা কি মনে করেছো—আমি একটা কাঠের পুতুল যে তুমি যেখানে রাখবে, সেইখানেই থাকবো, যেমন সাজাবে, তেমনি সাজবো? আমার শরীরে কি রক্ত-মাংস নেই যে তুমি যত আঘাতই দাও না কেন, আমি চুপ করে থাকবো?

শশী। (কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া) এমনিই ভুল বুঝলে লীলা? কেবল আঘাত, কেবল অপমান, কেবল শাস্তি? দু'বছর আগে যেদিন প্রথম এ বাড়ীতে এসে ঢুকেছিলে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কেবল কি তাই পেয়েছো—আর কিছু নয়?

লীলা। জানি তোমরা অনেক দয়া করেছো—এই আবর্জনার পিছনে তোমরা অনেক টাকা নষ্ট করেছো—কিন্তু এখন তার ব্যবস্থাও তো হয়েছে। খুব বড়লোকের ঘরে আমার বিয়ে দিচ্ছ। এখন থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদে তোমাদের ঋণ শোধ দিলেও চলবে না কি?

শশী। তা হয়তো হবে। কিন্তু শুধু টাকার ঋণটাই তো ঋণ নয় লীলা—ঋণ পাওয়ারও তো একটা ঋণ আছে—সেটা কি এই মুহূর্তে এমনি করে শোধ করছো।

লীলা। হ্যাঁ, এমন করেই তা শোধ করছি—এমনি করে তোমাদের দাসীত্ব স্বীকার করে—তোমাদের সব হুকুম, সব জবরদস্তি মাথায় তুলে নিয়ে! এখনো যদি কিছু বাকী থাকে তো বল, আর কি করতে হবে?

শশী। (গভীর বেদনস্বরে) তোমারও যা বলবার বাকী আছে বলে নাও লীলা, যত তীব্রতম কথা, যত কঠিন শব্দ—তা সে যত মিথ্যা যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন! উঃ! এ তুমি কি করছো লীলা?

(এইবার লীলা আর নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না। কাতর কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করিয়া সে ধীরে ধীরে চেতনা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। শশিনাথ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। যখন বুঝিল, লীলা মূর্চ্ছা গিয়াছে তখন সে ত্বরিত পদে দ্বারের অর্গল লাগাইয়া দিয়া লীলার বিকল লঘুদেহ দুই বাহুর মধ্যে উঠাইয়া লইয়া সোফার উপর স্থাপন করিল, তারপর পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল এবং মুখে-চোখে অল্প অল্প জলের ছিটা দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে লীলা চক্ষু উন্মিলীত করিয়া উঠিয়া বসিল)।

শশী। (একটু দূরে সরিয়া গিয়া) কাউকে ডাকবো? এখনও কি শরীর দুর্বল বোধ হচ্ছে?

লীলা। (মুখ নত করিয়া) না। (মুখ তুলিয়া) দরজাটা খুলে দাও শশীদা।

শশী। (দ্বার খুলিয়া দিয়া) এখনি উঠছো? তাহলে নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করগে, আর তারই সঙ্গে নিজের মনকে শান্ত কোরে নাও গে। আমি আর বেশী কি বলবো তোমাকে—ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন! না জেনে যদি কিছু অন্যায় করে থাকি তাই—ক্ষমা কোরো! এর বেশী আমার কিছু বলবার নেই!

(ধীরে ধীরে লীলা প্রস্থান করিল। শশিনাথ সোফায় আসিয়া বসিয়া দুই করতলে মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হইয়া রহিল। উর্মিলার প্রবেশ)

উর্মিলা। ঠাকুরপো! (শশিনাথ চকিত হইয়া মুখ তুলিল) কি হয়েছে তোমার ঠাকুরপো?

শশী। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) কিছু হয়নি তো।

উর্ম্মিলা। তবে মুখ অমন শুকনো কেন?

শশী। ভাবনা-চিন্তে কি কম বৌদি! একটা বিয়ের কথা, সোজা তো নয়! (কণেক পরে) বৌদি!

উর্ম্মিলা। কি বল দেখি!

শশী। (এক মুহূর্ত্ত ইতঃস্তত করিয়া) তোমার কথা না শুনে কি জানি হয়তো ভাল হল না!

উর্ম্মিলা। আমি তো বুঝতে পারছিনে ঠাকুরপো, কি ভাল হলো না।

শশী। সুধীরের সঙ্গে বিয়ে হলে লীলা যদি সুখী না হয় বৌদি? এখন কি আর সেকথা ভেবে দেখবার সময় নেই বৌদি?

উর্ম্মিলা। (কণেক চিন্তার পর) না ঠাকুরপো! এখন আর সময় নেই। এখন উল্টো-পাল্টা করতে গেলে একটা ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হবে।

শশী। কিন্তু লীলা যদি অসুখী হয়?

উর্ম্মিলা। হবে না।

শশী। আন্দাজ করছ?

উর্ম্মিলা। না—আমার বিশ্বাস তাই।

শশী। (অন্যমনস্ক হইয়া) তা'হলেই ভাল—কিন্তু এখনো—

(নেপথ্যে—"শশি কোথায় গেলে হে"—বলিতে বলিতে পরক্ষণেই বরেনের প্রবেশ)

বরেন। এই যে, বৌদিদিও এখানে।

(উর্ম্মিলার পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশিনাথের পিঠে বরেন সজোরে কীল মারিল)

উর্ম্মিলা। বাঁচলাম বরেন ঠাকুরপো! তোমার আসতে দেরী হচ্ছিল দেখে আমার এমনি ভাবনা হচ্ছিল! খবর সব ভাল? এত দেরী হলো যে?

বরেন। প্রথমটা খবর ভাল ছিল না। এখন ভালোই। সেরে উঠে ভগ্নিপতিটি কি সহজে ছেড়ে দিতে চায়। অনেক করে পালিয়ে এসেছি।

(শশিনাথ বরেনের প্রতি চাহিয়া মুদুহাস্য করিল)

শশী। বৌদি, শিগ্‌গির বরেনের খাবার ব্যবস্থা কর—ওর বোধ হয় সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয়নি!

উর্ম্মিলা। আমি এখনই চল্লাম—বরেন ঠাকুরপো বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও।

বরেন। ব্যস্ত হয়ো না বৌদি! আমি বাড়ী থেকে জলটল খেয়ে আসছি! তারপর? তোমাদের এখানকার খবর সব ভাল? শশীর কাছ থেকে চিঠিতে হরিচরণ বাবুর মৃত্যুর খবর শুনলাম। সে সময়টা তোমাদের খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে তাহলে? হরিচরণ বাবুর মেয়ে—সরযূ—তিনি ভাল আছেন?

উর্ম্মিলা। হাঁা। ভাল আছে। বেচারার চোটটা বড় বেশী রকমই লেগেছিল—এই বিয়ের গোলমালে একটু সামলে উঠেছে মনে হয়। তুমি সরযূর সঙ্গে দেখা করবে না বরেন ঠাকুরপো?

বরেন। দেখা করবো বৈকি।

উর্ম্মিলা। আচ্ছা আমি তাকে নিয়ে আসছি।

(প্রস্থান)

শশী। (মৃদু হাস্যে) সরযূর সঙ্গে দেখা সেরে একবার আমার ঘরে এসো বরেন। আমি ঘরেই থাকবো।

বরেন। তুমি থাক না!

শশী। না। আমি আমার ঘরে চল্লাম। তুমি এসো।

(প্রস্থান)

(উর্ম্মিলা ও সরযূর প্রবেশ)

বরেন। (সরযূর প্রতি) ভাল আছেন?

সরযূ। (ঘাড় নাড়িয়া) আপনি ভাল আছেন? আপনার ভগ্নিপতি?

বরেন। আমি বেশ ভালই আছি। ভগ্নিপতি সেরে উঠেছেন।

উর্ম্মিলা। (সরযূর শোকক্লিষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া) এই ছেলেমানুষের ওপর দিয়ে, বরেন ঠাকুরপো এরই মধ্যে এত ঝড় বয়েছে যে, একে যেন ভগবানের কৃপায় আর কখনো দুঃখের মুখ না দেখতে হয়।

বরেন। (সহানুভূতির স্বরে) এইটেই বৌদিদি কিছুতেই বুঝতে পারিনে যে, ভগবান যদি আছেন তবু

এ অবিচার অন্যায়ের রাজত্ব গড়ে তাঁর কি উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে? যে নিষ্পাপ পবিত্র তার প্রাণে দুঃখের আগুন জেলে তিনি কি সুবিচার করেন—আর যার হৃদয় অন্যায় অনাচার পাপের কারখানা, তাকে সুখ ঐশ্বর্যের সিংহাসনে বসিয়ে রেখে তিনি কি ইষ্ট সাধন করেন?

উর্ম্মিলা। এসব বড় বড় কথার মীমাংসা আমরা মেয়েমানুষ হয়ে তোমাদের কাছে কি করবো ঠাকুরপো! তবে আমার মনে হয়—এমনি দুঃখ-ভোগের মানুষের হয়তো প্রয়োজন আছে। মনের যে মলা চোখে পড়ে না—চোখের জলের মধ্যে তা হয়তো কাটে।

বরেন। (হাসিয়া) তোমার বৌদি যেমন মন তেমনি কথা বলেছো। কিন্তু এ হলো বিশ্বাসের কথা, এ যুক্তির কথা নয়।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মা! বড়বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন।

উর্ম্মিলা। তোমরা গল্প করো আমি এখনই আসছি।

(প্রস্থান)

সরযূ। বাবার মৃত্যুর পর রেঙ্গুন থেকে আপনি আমাকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, সেখানি পড়ে পড়ে দুঃখের মধ্যে আমি অনেকটা শান্তি পেতাম। আপনার সে চিঠিখানি আমি বোধ হয় কুড়িবার পড়েছি।

বরেন। (সাগ্রহে) আর সেই চিঠির উত্তরে যেচিঠি আপনি আমাকে লিখেছিলেন, তা বোধহয় আমি পঞ্চাশবার পড়েছি! (কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল) আপনার সে চিঠিখানিতে পিতৃ-ভক্তির আর স্থিরবুদ্ধির এমন সুন্দর পরিচয় পেতাম যে, প্রতিবারই পড়ে আমি মুগ্ধ হতাম।

সরযূ। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) আর আমাকে আপনি ব'লে ডাকা আপনার উচিত হয় না।

বরেন। (রুদ্ধ নিঃশ্বাসে) কেন?

সরযূ। (স্মিতমুখে) এখনো কি আপনি মনে করেন আমাকে তুমি বলবার অধিকার আপনার হয়নি?

বরেন। আপনি শব্দটা কি এতই কর্কশ?

সরযূ। সম্পর্ক হিসাবে কর্কশ লাগে। আগে যখন আপনি প্রতিদিন আমাকে আপনি বলে ডাকতেন, অভ্যাসের জন্যে তত খারাপ লাগতো না—আজ রেঙ্গুন থেকে এতদিনের পর এসে "আপনি" বলাতে কানে বড় লাগছে।

বরেন। আমারও তো ঠিক সেই রকম লাগতে পারে।

সরযূ। তা পারে। কিন্তু আপনাকে আমি 'আপনি' বলে অন্যায় হয় না—কিন্তু আপনি যদি আমাকে 'আপনি' বলেন তাহলে হয়।

বরেন। (ঈষৎ নীরব থাকিয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে) তুমি যখন আমাদের এ অধিকার স্বীকার করতো তখন আজ থেকে তোমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবো—আর তোমাকে ডাকতে হ'লে সরযূ বলেই ডাকবো—কি বল?

সরযূ। (লজ্জারঞ্জিত মুখে) নিশ্চয়ই। এর অনেক আগেই তাই করা উচিত ছিল। আপনি যখন আপনার কর্তব্য কিছুতেই করলেন না—তখন কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে আমি আপনাকে কর্তব্য পালন করাতে বাধ্য করলাম।

বরেন। ভাগ্যে কর্তব্যটা নিজে থেকে করিনি—তা'হলে তোমার দ্বারা বাধ্য হবার এ সুখটুকু তো পেতাম না সরযূ!

সরযূ। কর্তব্য ক'রে আপনার সুখ হয় না? কেউ করিয়ে নিলে তবে সুখ হয়?

বরেন। সকলে নয় সরযূ! তুমি করিয়ে নিলেই হয়। তুমি এখনি করে আমার সকল কর্তব্যের কার্যকরী শক্তি হোয়ো—আমার তুচ্ছ জীবনকে সফল কোরো—আমার জীবনের ধ্রুবতারা হোয়ো সরযূ। এ আমার আজকের তৈরী কল্পনার নয় সরযূ—এ অনেক দুঃখে অনেক সুখে অনেক দিনের গড়া আশা। বল একবার—এ আমার শুধু স্বপ্ন নয়?

(উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। তুমি বলেছিলে বরেন ঠাকুরপো বিশ্বাসের কথা। আমার মনে হয়, সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসের এর

বেশী যোগ আছে যে, যা আমরা ঠিক বিশ্বাস করি, সেটা অনেক সময়েই সত্যি হয়। ভগবান আছেন বলে যখন চিরদিন ধরে প্রায় সকল মানুষেরই বিশ্বাস তখন বুঝতেই হবে সত্যি সত্যিই ভগবান আছেন। আমি চলে যাওয়ার পর তোমাদের কি এই কথাই হচ্ছিল বরেন ঠাকুরপো?

বরেন। না, আমাদের সে কথা হচ্ছিল না। কিন্তু তুমি যা বলছো তাই ঠিক বৌদি; বিশ্বাস ঠিক যেন আলো। মুক্তি যেখানে মাথা ঠুকে মরে—বিশ্বাস সেখানে একেবারে পরিষ্কার করে দেয়।

উর্ম্মিলা। সেই জন্যেই তো তোমার সম্বন্ধে আমার মনে হচ্ছে যে বোশেখ মাসের লগ্নটাও আমাদের ফাঁক যাবে না।

বরেন। কেন বল দেখি?

উর্ম্মিলা। সুবাসিনীর কাছে শুনেছি—তোমার বোশেখেই বিয়ে।

বরেন। (সরযূর প্রতি চাহিয়া) এত ধৈর্য্য আমার থাকবে কি? কেন ফাল্গুন মাস কি অপরাধ করলে বৌদি?

উর্ম্মিলা। (সহাস্যে) এত অধীর হয়ে পড়েছো বরেন ঠাকুরপো? কিন্তু আর একজন যদি তোমার চেয়েও বেশী অধীর হয়ে থাকে?

বরেন। তা'হলে সে একজনকে বোলো বৌদি, তেমন অবস্থায় এই মাঘ মাসেও আমার আপত্তি নেই!

উর্ম্মিলা। এ বিবাদ কি আমার দ্বারা মিটবে বরেন ঠাকুরপো? তোমরা দুজনে মিলে এর যা'হয় একটা মীমাংসা কোরো—আচ্ছা, বোসো, ঠাকুরপোকে আমি ডেকে নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

বরেন। (আবেগপূর্ণ কণ্ঠে) শশী এর কি মীমাংসা করবে সরযূ! এ মীমাংসা তোমাতে আমাতে করবো। কিন্তু এ বিষয়ে তুমি যা বলবে তাই হবে সরযূ। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি বলবো—কালকেরই লগ্নে! নিজের সৌভাগ্য থেকে কে দূরে থাকতে চায় সরযূ?

(সরযূ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না)

(উর্ম্মিলার প্রবেশ)

বরেন। কি হলো বৌদি—শশী এলো না?

উর্ম্মিলা। না—তার কাছে গেলাম না। ঠাকুরপো আবার তার নিজের বিয়ের দিন নিয়ে ঠিক করবে!! কোন রকমে তার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে এই ঢের!

বরেন। (দুঃসহ বিস্ময়ে) শশীর বিয়ে নাকি?

উর্ম্মিলা। কেন—ফাল্গুন মাসে ঠাকুরপোর সঙ্গে সরযূর বিয়ে! তুমি জান না?

বরেন। না—

উর্ম্মিলা। জানবেই বা কেমন করে বল; মনের দুঃখে কোন কথা তো কোথাও লেখা হয়নি! আর তা ছাড়া হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল। কাকা শেষ সময়ে সরযূকে ঠাকুরপোর হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন আর ঠাকুরপোও রাজী হয়েছে! খুব সুখবর নয় বরেন ঠাকুরপো?

বরেন। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) খুব! (উঠিয়া) বৌদি, আজ আমি এখন বাড়ী চল্লাম—কাল আবার আসবো।

উর্ম্মিলা। (ব্যস্ত হইয়া) সেকি? তুমি খাবে না?

বরেন। না বৌদি—কয়েকদিন ঘুম হয় নি—আজ একটু ভালো করে ঘুমুবো। তুমি তো জানো—আমি সহজে খাওয়া বাদ দিইনে!

উর্ম্মিলা। তবে একটু মিষ্টি খেয়ে যাও!

বরেন। তাও আজ থাক বৌদি। আচ্ছা বৌদি না জেনে অপরাধ করলে—ক্ষমা পাওয়া যায় না কি?

উর্ম্মিলা। নিশ্চয় পাওয়া যায়। কিন্তু একথা বলছো কেন বরেন ঠাকুরপো?

বরেন। সে আর একদিন বলবো—ঘুম পাচ্ছে বৌদি—আজ চল্লাম।

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

বরেন। কাল করবো। (প্রস্থান)

উর্ম্মিলা। চল সরযূ—আমরা ভাঁড়ার ঘর বন্ধ করে ওপরে যাই। লীলা বোধ হয় এতক্ষণ ঘরে পড়েছে—রাত বড় কম হয়নি। (উভয়ের প্রস্থান)

ধীরে ধীরে রজনীর আলোক ফুটিয়া গেল। বাহির হইতে রাত্রিবেলাকার আলোর অভাব পাওয়া যাইতে লাগিল। বহুদূর হইতে বহু সঙ্গীতের ক্ষীণসুর ভাসিয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে শশীনাথ প্রবেশ করিল। দু'একবার পদ-চারণা করিয়া সে ইজি-চেয়ারটার আশ্রয় করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। তারপর দ্বারের বাহিরে কাহার সাড়া পাইয়া শশীনাথ বলিল—কে? দ্বারের বাহিরে শব্দ হইল—শশীদা—আমি লীলা।

শশী। (উঠিয়া নিকটে গিয়া) তুমি যে এত রাত্রে এসেছো লীলা?

লীলা। একটা কথা বলতে এসেছি।

শশী। আচ্ছা, ভেতরে এসো। (লীলা ভিতরে আসিল) বোসো।

লীলা। বসবার আগে তোমাকে—

[লীলা শশীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। শশিনাথ তাড়াতাড়ি তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া চেয়ারে বসাইল]

শশী। ছিঃ লীলা। এত অধীর হচ্ছ কেন? স্থির হও। চুপ কোরে একটু বোসো—এখন কিছুক্ষণ কথা কোয়ো না।

লীলা। (কিয়ৎকাল পরে) আমাকে ক্ষমা কর শশিদা, আমি তখন বড় অন্যায় করেছি!

শশী। ক্ষমা কাকে করবো লীলা? তোমার ওপর আমার একটুও রাগ নেই—তখনো ছিল না! আমি শুধু এই ভাবছি যে, অন্যায় তুমি করেছো, না, তোমার ওপর করা হয়েছে।

লীলা। নিশ্চয় আমি অন্যায় করেছি! এতবড় অন্যায় জীবনে আমি কখনো করিনি—কেউ বোধ হয় করে না। তোমার অসীম ক্ষমা আমি ভাল করে শোধ দিয়েছি।

শশী। অন্যায় তুমি তখন করোনি লীলা—অন্যায় এখন করছো! তুমি আমাকে তখন যে-সব কথা যেমন করে বলেছিলে, খুব আপনার লোককেই খুব আপনার লোককে তা' অমন করে বলবার অধিকার থাকে। কিন্তু এখন তুমি যা মানিয়ে গুছিয়ে বলতে এসেছো, তা আমার একটুও ভাল লাগছে না। বাস্তবিকই আমাকে তা কষ্ট দিচ্ছে!

লীলা। আমি জানি শশীদা, তুমি সব জিনিষ ক্ষমা করতে পারো, শুধু ক্ষমা চাওয়াকেই ক্ষমা করতে পারো না। কিন্তু সে হল অন্য কথা। আমি শুধু এই ভেবে মরে যাচ্ছি যে, চিরদিন তোমার কাছে শিক্ষা পেয়ে এসে আজ আমার এতটা অসংযম হল কেমন করে!

শশী। নিজের মন সব সময় ঠিক বোঝা যায় না লীলা—সব সময় সব জিনিষ ঠিক ওজন কোরেও দেখা যায় না। আমি নিজেও আমার মনের পরিচয় দু'দিন আগে পাইনি—তাই আজ বুকের ওপর যাঁতার মতো একটা দুঃখের ভার বসেছে। এ দুঃখ আঘাত পেয়ে নয় লীলা, আঘাত দিয়ে!

লীলা। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) আমি যে কথা বলতে এসেছি, শুনলে না তো শশীদা!

শশী। (অধীর আগ্রহে) কি বল?

লীলা। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আর তোমাকে জানাতে এসেছি যে, তোমার শিক্ষা একবার নিষ্ফল হোয়েছে বলে বারে বারে হবে না। আমি বেশ ভালো করে মন ঠিক করে নিয়েছি। আর কখনো আমার অসংযম দেখতে পাবে না।

শশী। কখনো নয়?

লীলা। কখন নয়।

শশী। ঠিক তো?

লীলা। ঠিক।

শশী। (নিরুৎসাহ কণ্ঠে) বেশ ভাই বেশ! আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, তোমার সংযম আর শিক্ষা যেন চিরদিন তোমাকে জীবনের সুপথ দিয়ে নিয়ে যায়। কোনও দিন যেন কাঁটাকাঁকর তোমার পায়ে না ফোটে!

লীলা। তা হলে চল্লাম শশীদা।

পুনরায় লীলা শশিনাথকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর নতনেত্রে বাহির হইয়া গেল। শশিনাথ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল; একবার মনে হইল যেন সে লীলাকে ডাকিতে গেল; কিন্তু মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইল না। পাথরের মূর্ত্তি মতো নিশ্চল হইয়া সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাতঃকাল। সোমনাথের ঘর। নেপথ্য হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। একজন ভৃত্য একটি ট্রাঙ্ক লইয়া প্রবেশ করিল। পশ্চাতে উর্ম্মিলা।

উর্ম্মিলা। এইখানে রাখ, (ভৃত্য ট্রাঙ্ক রাখিল) ছোটবাবুকে ডেকে দে—এক্ষুনি যেন আসে।

(ভৃত্যের প্রস্থান। উর্ম্মিলা ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড়-চোপড় গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে শশিনাথের প্রবেশ)

শশী। ডেকেছো কেন বৌদি?

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপো। সর্ব্বনাশ হয়েছে।

শশী। (উদ্বিগ্ন) কি হয়েছে বৌদি?

উর্ম্মিলা। (ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে কয়েকটা বস্ত্র তুলিয়া তাহার ভিতরে শশিনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) এই দেখ!

শশী। (অবাক হইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল তারপর ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে একজোড়া বার্ণিশের চটি বাহির করিয়া লইল) এতো আমার পুরোনো চটি, এখানে কে আনলে?

উর্ম্মিলা। লীলার ট্রাঙ্কটা গোছোতে গিয়ে তার তলায় দেখলাম এই চটি রয়েছে। (শশিনাথ নীরব) ঠাকুরপো। এতো তোমাকেই আট্‌কাতে হবে ভাই। তুমি ছাড়া কেউ তাকে সামলাতে পারবে না। কাল রাত্রে পরশু লীলা শ্বশুরঘর করতে যাবে—সেখানে বিয়ের কনের ট্রাঙ্ক থেকে পুরুষ মানুষের ব্যবহার করা জুতো বেরুলে কি কাণ্ড হবে বুঝতেই তো পারছো।

শশী। তোমার কোন ভয় নেই বৌদি! আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি! লীলা এখন আছে কোথায়?

উর্ম্মিলা। পোষার ঘরে। কাল থেকে তার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেছে ঠাকুরপো!

শশী। কিছু ভয় কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি একবার লীলাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

(উর্ম্মিলার প্রস্থান)

(শশিনাথ জুতাজোড়াটির প্রতি বারেক সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া ঘরের কোণে আড়ালে রাখিল। তারপর ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে লীলার প্রবেশ)

শশী। লীলা! এসো। তোমার কাছে একটা কথা জানতে চাই ভাই! ঠিক বলবে তো?

লীলা। কি কথা বল?

শশী। দ্বিতীয় ভাগ পড়েছো তো?

লীলা। (অবাক হইয়া) পড়েছি!

শশী। পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে কি করা হয়? (লীলা নীরব) বল? পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে কি করা হয়?

লীলা। চুরি করা হয়।

শশী। পরের চটি জুতো না বলিয়া লইলে কি করা হয় লীলা? (লীলা নীরব; নিশ্চল) বল না লীলা। পরের চটি জুতো না বলিয়া লইলে কি করা হয়?

লীলা। (মুখ তুলিয়া শশিনাথের মুখের পানে চাহিয়া শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে) চটি জুতো ফেরত চাও শশিদা!

শশী। নিশ্চয়ই চাই। ওটা আমার ভারী সখের জিনিষ। বিশেষ যত্ন করে রাখতে হবে। কিন্তু আর পায়ে দেওয়া হবে না।

লীলা। কেন?

শশী। পায়ে দেবার মতো ওটা আর কণ্ডিশন বলে মনে হচ্ছে না।

লীলা। আচ্ছা, চটি তোমায় আমি এখনই ফেরত দিচ্ছি! কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি। আমার মনটাও কি আটকে রাখবে মনে করেছো?

শশী। না তা করিনি। মনটা স্নেহের সঙ্গেই থাকে।

লীলা। আচ্ছা, তাই যদি, তবে আমার শ্বশুরবাড়ীতে কি করে তোমরা আমায় আটকাবে? এই ধর, কথার কথা বলছি, যদি সকালে উঠে সব কাজের আগে একটা কাগজে প্রত্যহ তোমার নাম একশো আটবার লিখি, তাহলে কি করবে? রোজ সকালে সেখানে গিয়ে সে কাগজ পকেটে পুরে নিয়ে আসবে? না—আমার মোয়াত কলম কাগজ কেড়ে নেবে? কি করবে বল?

(শশিনাথ বিস্ময় বিমূঢ়) বল না শশিদা, সেখানে তুমি কি ব্যবস্থা করবে?

শশী। তা আমি জানিনে। কিন্তু তোমার ওপর এই আদেশ লীলা, তুমি সেখানে এসব ছেলেমানুষী একেবারে করতে পাবে না, বুঝলে?

লীলা। (বিকৃত হাস্যে) না—ঠিক বুঝলাম না। আমার ওপর সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে এখন এতবড় আদেশ করছো কোন অধিকারে?

শশী। আত্মীয়তার অধিকারে!

লীলা। কিন্তু তোমার সঙ্গে এখন আমার আত্মীয়তা কত দাঁড়াল, তা জানো? আমি তোমার বৌদিদির বোন, কিংবা তোমার দাদার শালী, বড় জোর তোমার বন্ধুর—

(লীলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল)

শশী। আচ্ছা, সম্পর্কের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তোমার নিজের মনে তো ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দর বিচার আছে? একটা আত্ম-সম্ভ্রম, মান-মর্য্যাদার জ্ঞান নেই কি?

লীলা। (বিদ্রূপাত্মকণ্ঠে) বোধ হয় নেই। থাকলে কি আজ এমন সাজগোজ করে পরের বাড়ী যেতে পারতাম।

শশী। ছিঃ লীলা। এ-সব তুমি কি বলছো? কোনও নাটকের মধ্যেও এমন সব কথা থাকলে বাড়াবাড়ি বলে মনে হোত!

লীলা। তা আমিও বুঝতে পারছি শশিদা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে দিয়ে জোর করে নাটক করিয়ে নাও তো আমি কি করতে পারি। আমি তো চুপ করেই আছি—কথা কইতে চাইনে—কিন্তু তুমি যে বারবার সাঁড়াশী দিয়ে আমার মুখ থেকে কথা টেনে বার করছো!

শশী। (শান্ত কণ্ঠে) তোমার কাছে আজ আমার একটা প্রার্থনা আছে লীলা। যদি তুমি কখনো আমার কাছে কোন সুশিক্ষা পেয়ে থাকো, কোনও দিন যদি আমাকে তোমার একজন শুভানুধ্যায়ী বলে মনে হয়ে থাকে, যদি কোনও সময়ে তোমার উপদেষ্টা মনে করে আমাকে একটুও শ্রদ্ধা করে থাকো তো আজ তুমি যাবার আগে তার দক্ষিণা আমাকে দিয়ে যাও! এটা যদি আমাকে কোনও অধিকার বলে না দাও তো—ভিক্ষের মতো দাও ভাই!

লীলা। কি বল?

শশী। আমাকে এই আশ্বাসটুকু দিয়ে যাও যে, তুমি নিজেকে আর নিজের অবস্থাকে ঠিক মনে রাখবে! এ তুমি কিছুতেই ভুলবে না যে তুমি একজন ভদ্র হিন্দু ঘরের মেয়ে। বহু বর্ষের পর বর্ষ আর বহু বংশের পর বংশ তার যে সব সংস্কার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার দেহে আশ্রয় নিয়েছে, সেগুলোকে সব রকমে বাঁচিয়ে রাখাই তোমার ধর্ম্ম।

লীলা। (ক্রুদ্ধ হইয়া) আমি এত হীন নই যে তোমাকে এই আশ্বাস দিয়ে নিজেকে অপমানিত করবো! তুমি আমাকে যা মনে কর, আমি তার অনেক ওপরে! মোহাই তোমার শশিদা, আর বেশী দেবতা-গিরি ফলিও না। এত অহঙ্কার সইবে না।

শশী। আমি দেবতা, সে কথা কে বললে লীলা?

লীলা। তুমি—তুমি বলেছো! তুমি সাধু! তুমি ঋষি! তুমি দেবতা! স্বর্গের দেবতাকেও তুমি এগিয়ে গিয়েছো। একটি অভাগিনীর কথা মনে করে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে দিয়েই তোমার এ-দেবত্ব শেষ হোক্! তুমি মানুষ হও। তোমার দেবত্ব দিয়ে সে-বেচারাকে যেন আর ওঁড়ো করোনা।

শশী। কে সে লীলা?

লীলা। আমি জানিনে! আর আমি পারছিনে—আমাকে রেহাই করে ছেড়ে দাও! তোমার মঙ্গলের চা

ছুতো তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি যাব—তার ওপর আমার একটুও লোভ নেই!

(প্রস্থান। শশিনাথ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইবার ধীরে ধীরে সোফার উপর বসিয়া দুই করতলে মাথা রাখিল। কিছুক্ষণ পরে বরেনের প্রবেশ)

বরেন। শশি!

শশী। (মাথা তুলিয়া সাগ্রহে) এসো—এসো! কাল দেখা পেলাম না কেন? আচ্ছা লোক তো তুমি!

(বরেন তাহার পাশে বসিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল)

শশী। তোমার হয়েছে কি বলতো?

বরেন। সহর্ষ বিস্ময়—কিংবা সবিস্ময় হর্ষ!

শশী। কেন শুনি?

বরেন। তোমার বিয়ের খবর শুনে।

শশী। আমার বিয়ে?—কার সঙ্গে?

বরেন। শ্রীমতী সরযূবালার সঙ্গে।

শশী। (এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া সহাস্যে) ওঃ! তাই তোমার সহর্ষ-বিস্ময় কিংবা সবিস্ময়-হর্ষ হয়েছে বলছো? আচ্ছা বরেন! কেমন করে এমন একটা মিথ্যে কথা বললে বলতো! আমার বিয়ের খবর শুনে তোমার সবিষাদ-বিদ্বেষ কিংবা সবিদ্বেষ-বিষাদ হয়েছে বল?

বরেন। আমার ভালবাসা কি তুমি এত অগভীর মনে করো?

শশী। না, তা করিনে বলেই তো বলছি। প্রেমটা যত গভীর হয়, ঈর্ষা ঠিক সেই রকম উঁচু হয়। একটা দিয়ে অপরটাকে মাপা যায়। এ মনস্তত্ত্ব মান কি না?

বরেন। (হাসিয়া) আবার প্রেমটা যত বিস্তৃত হয়, আত্মোৎসর্গের শক্তি তত প্রবল হয়। এ মনস্তত্ত্ব মান কি না?

শশী। কিন্তু তোমার প্রেম যে গভীর বলছো?

বরেন। আমার প্রেম সাগরের মতো—যেমন গভীর, তেমনি বিস্তৃত।

শশী। আর আমার প্রেম হচ্ছে বায়ু-রাশির মতো—যেমন উদার তেমনি উদাস! সর্ব্বদা সাগরের জলরাশিকে ছুঁয়ে আছে, কিন্তু কোথাও আটকে নেই।

বরেন। কিন্তু আমার ধর্মতো তা নয় ভাই! তোমার মধ্যে ঝড় উঠলে, আমার মধ্যেও যে ঝড় বড় তরঙ্গ উঠতে থাকে!

শশী। কিন্তু আমি যখন শান্ত আছি, তুমি তখন প্রশান্ত থাকো! তোমার কোনও ভয় নেই। উত্তাল তরঙ্গ নয়, কিন্তু যথাসময়ে তোমার দ্বারে মৃদু তরঙ্গ উঠবে—আমার ঝড়ে নয়—সরযূর প্রেমের সুমন্দ হিল্লোলে।

বরেন। না শশি, এ তুমি অন্যায় করছো! পরিহাস করতে হয় কর, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এ ভাবে সরযূকে নিয়ে আর পরিহাস করা চলে না।

শশী। কেন শুনি, সরযূ তোমার স্ত্রী হবে বলে নাকি?

বরেন। না, সে কারণে নয়। সরযূ তোমার স্ত্রী হবে, স্থির হয়ে গিয়েছে বলে!

শশী। স্থির হয়ে গেছে নাকি? বাঃ বাঃ! তা তো জানতাম না। এ যে রাম বাদ দিয়ে রামায়ণ! এমন পাকা খবরটি পেলে কোথায়?

বরেন। (পরিহাস সহকারে) বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হলাম।

শশী। সূত্র তোমার পাকা কি কাঁচা, রেশমের কি পশমের, তা জানবার আমার একটুও আগ্রহ নেই। শুনে তুমি আশ্বস্ত হও যে বিশ্বস্তসূত্র তোমাকে একেবারে বাজে কথা বলেছেন, যার কোন ভিত্তি নেই।

বরেন। (স্থির কণ্ঠে) ভিত্তি এ কথার খুবই দৃঢ় ভাই, এর ইট-পাথর হচ্ছে, মৃত্যু-শয্যার প্রতিজ্ঞা, আর চুণ-সুরকী হচ্ছে একটি বালিকা-হৃদয়ের অটুট ভালবাসা। এত দৃঢ় যে, এর ওপর মিলনের রাজপ্রাসাদ অনায়াসে গড়ানো যেতে পারে।

শশী। (কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া) সরযূকে বিয়ে করবো বলে আমি কি মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা করেছি নাকি?

বরেন। (হাসিয়া) কি প্রতিজ্ঞা করেছো তা তুমিই জানো, আমি তো তা বলতে পারিনে। কিন্তু যদি সে রকম

কোন প্রতিজ্ঞা করেই থাকো, তাতে তো আমি কোনও দোষ দেখতে পাইনে! কি রকম অবস্থায় তোমাকে পড়তে হয়েছিল, তা বৌদির কাছে শুনেছি। তুমি যে ইচ্ছে করে কোন প্রতিজ্ঞা করোনি, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

শশী। না, তুমি তা বুঝতে পারছো না! যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম, তা ইচ্ছা করেই করেছিলাম, বাধ্য হয়ে করিনি। কিন্তু কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম? সরযূকে বিয়ে করব? না, একেবারেই তা নয়। আমি শুধু সরযূর ভার গ্রহণ করলাম তাই জানিয়েছিলাম।

বরেন। তা হোক্। যাঁকে জানিয়েছিলে আর যাঁদের সাক্ষাতে জানিয়েছিলে, তাঁরা সকলেই তোমার কথায় জেনেছিলেন যে, সরযূকে বিয়ে করবার অঙ্গীকারই তুমি করলে। এ ধারণা সরযূর তখনও হয়েছিল, এখনও আছে।

শশী। তাহলে সে ধারণা সরযূর আর থাকবে না, যখন তোমার সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়ে যাবে। দোহাই ভাই, দুদিন সবুর করো, লীলার বিয়ের হাঙ্গামাটা চুকে যাক তারপর তোমার বিয়ের ব্যবস্থায় লাগবো। অত অধীর হোয়ো না। শিগগিরই তুমি সরযূ-রত্নের অধিকার পাবে।

বরেন। (মৃদু হাসিয়া) অধীর আমি হচ্ছিনে; কিন্তু অধিকার আমি পাই কেমন করে? তুমি যে আগেই অধিকার পেয়ে বসে আছো!

শশী। তাই যদি হয়ে থাকে, তবুও তুমি পাবে।

বরেন। চুরী করে না ডাকাতি করে?

শশী। তার চেয়ে ঢের সহজে। স্বেচ্ছায়, অন্যের বিনা প্ররোচনায় আমি অধিকারচ্যুত হবো।

বরেন। দানসূত্রে নাকি? দোহাই শশি, আর সব জিনিষ দেওয়া নেওয়া চলে, স্ত্রী চলে না ভাই! তার চেয়ে চুরী ডাকাতি করে নেওয়াও ভালো!

শশী। তোমার অধিকার নেই, একথা কেন বলছ বরেন? তোমার চেয়ে বেশী অধিকার সরযূর ওপর আর কারোর নেই। অন্য কেউ জানুক বা না জানুক, আমি তো জানি, সরযূর ওপর তোমার কতখানি ভালবাসা আছে। সেই ভালবাসাই তোমার চরম অধিকার।

বরেন। আচ্ছা মানলাম, সরযূর ওপর আমার ভালবাসার একটা অধিকার আছে। কিন্তু সরযূরও যদি ঠিক সেই রকম ভালবাসার অধিকার তোমার ওপর থাকে, তাহলে তুমি কি ব্যবস্থা করতে চাও? কার অধিকারকে বড় করবে? সরযূর, না আমার?

শশী। একটা কাল্পনিক অবস্থা নিয়ে মাথা খারাপ করে লাভ কি, যখন এ ক্ষেত্রে অধিকারের কোনও লড়াই নেই। অধিকার একমাত্র তোমারই আছে, আর কারো নেই। তোমার ভালবাসা ব্যর্থ হবার মতো সামান্য নয়।

বরেন। আমার ভালবাসা সরযূকে অসুখী করবার মতো সামান্যও নয়। আমার দ্বারা যদি সরযূ অসুখী হয়, তাহলেই বুঝবো, আমার ভালবাসা ব্যর্থ হলো! (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) আর এ কথাও আমি খুব সহজে বলতে পারি শশি, তুমি সরযূর স্বামী হ'লে তোমার ওপর আমার ভালবাসা বাড়বে বৈ কমবে না। (শশিনাথ নির্বাক) চুপ করে রইলে কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছো—অসম্ভব?

শশী। (বিহ্বল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) অসম্ভব—অসম্ভব—বাস্তবিকই অসম্ভব? তোমরা সকলে মিলে যদি এমন করে আমাকে পাগল কোরে তোল, তাহলে তোমাদের সঙ্গে চলা একেবারেই অসম্ভব! (প্রস্থান)

(বরেন কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর প্রস্থান করিবার জন্য উঠিয়াছে এমন সময় সরযূকে লইয়া উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। এই যে বরেন ঠাকুরপো! বেশ যা হোক তুমি! তোমার ওপর আমি নির্ভর করে রয়েছি—আর সমস্ত দিন তুমি ডুব মেরে আছো। বোসো বলছি!

বরেন। (বসিয়া) এই বসলাম। এখন কি তোমার আদেশ বল!

উর্ম্মিলা। কাল তো বিয়ে—কালকের কথা ছেড়ে দাও; পরশুও অনেক কাজ! তাই লীলার ফুলশয্যের তত্ত্বের ছোটোখাটো জিনিষগুলো তুমি এনে ফেলো!

বরেন। এই কথা। দাও ফর্দ—আমি এখনি বেরিয়ে পড়ি!

উর্ম্মিলা। রোস! অত ব্যস্ত হবার কাজ নয়—ফর্দ্দটা একবার মিলিয়ে নিতে হবে। কটা জিনিষ হয়েছে সরযূ?

সরযূ। (হাতের ফর্দ্দ দেখিয়া) পঁচিশটা।

উর্ম্মিলা। আরও পঁচিশটা হবে ঠাকুরপো।

বরেন। যত পঁচিশই হোক না কেন; আমি চোখ বুজে এক এক কোরে সমস্তগুলো কিনে যাবো। উপস্থিত আমি একটু ঘুরে আসি. তুমি ততক্ষণ ফর্দ্দ আর টাকা ঠিক করে রাখো বৌদি।

উর্ম্মিলা। না না, এখন আর যেও না ঠাকুরপো—ফর্দ্দটা তুমি লিখে নাও, আমি বলে যাচ্ছি। টাকা আমার কাছেই আছে।

বরেন। (টেবিল হইতে কাগজ পেনসিল লইয়া) আচ্ছা! বল!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মা, বাবু এসেছেন। (প্রস্থান)

উর্ম্মিলা। আচ্ছা—আমি যাচ্ছি। ফর্দ্দটা তোমরা দু'জনে মেলাও ঠাকুরপো—আমি এলাম বলে। (প্রস্থান)

বরেন। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) দেখুন, আপনি এইখানটায় এসে আগে বসুন। তারপর, ফর্দ্দ থেকে একটা একটা ক'রে পড়ে যান আর আমি লিখে নি।

(সরযূ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বরেন প্রদত্ত চেয়ারে বসিল)

বরেন। নিন। এইবার বলুন।

সরযূ। উৎকৃষ্ট গোলাপ জল—চার বোতল!

বরেন। (লিখিতে লিখিতে) একেবারে চারবোতল গোলাপ জল? আচ্ছা, বলুন। ফর্দ্দটা প্রথমে লিখে নেওয়া যাক!

সরযূ। কেস ওয়াশ—এক বোতল।

বরেন। (লিখিতে লিখিতে) আচ্ছা।

সরযূ। ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার—বড় দুশিশি।

বরেন। আচ্ছা।

সরযূ। তিনোলীয়া ক্রীম—দু কৌটো।

বরেন। আচ্ছা!

সরযূ। হ্যাজেলিন—

বরেন। (বাধা দিয়া) দাঁড়ান, একটা কথা সেরে নিই! দেখুন, ভুল করা মানুষের অন্যায় বটে; কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে সেটাকে সংশোধন না করা তার চেয়েও বড়ো অন্যায়। সেদিন আমি না বুঝে নির্ব্বোধের মত আচরণ করে আপনাকে একটু বিব্রত করে তুলেছিলাম—সেজন্যে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ব্যাপারটা একটা ভুলকে আশ্রয় করে হয়েছিল। ভুলটা কি, তা আপনার জানবার দরকার নেই বলেই বললাম না। যাই হোক্, আপনি সে কথাটা এমন কিছু নয় মনে করে ভুলে যাবেন। বলুন, তারপর কি।

সরযূ। (ইষৎ কম্পিত কণ্ঠে) হ্যাজেলিন রো—দুশিশি।

বরেন। হ্যাজেলিন রো—দুশিশি!

সরযূ। এসেন্স—আটরকম।

বরেন (লিখিতে লিখিতে) আটরকম।

সরযূ। কেস্ পাউডার—তিনরকম।

বরেন। তিনরকম। দেখুন! আমার জন্যে আপনি একটুও ভাববেন না। আমি বেশ আছি! ছেলেবেলা থেকেই আমার স্বভাবটা কি রকম জানেন? সেই যে একরকম পুতুল পাওয়া যায়—সব রকম অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকে, শুইয়ে ছেড়ে দিলেও টপ্ করে উঠে দাঁড়ায়—সেই রকম। সব রকম অবস্থাতেই আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি! আমার জন্যে আপনি ভাববেন না! অন্য কেউ হলে আমি এ কথা বলতাম না—আপনাকে জানি বলেই বললাম; পরের জন্যে আপনি ভারী ভাবেন! বলুন, তারপর কি?

সরযূ। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) সুবাসিত তরল আলতা—দুশিশি!

বরেন। দুশিশি! কি আশ্চর্য্য! তরল আলতাও দুশিশি চাই? এক শিশি সুধীরের জন্যে নাকি? আচ্ছা—তারপর—

সরযূ। বড় হাত আয়না—দু'খানি!

বরেন। দু'খানি!

সরযূ। চিকণী, ক্রশ, কাঁকুই—ড্রেসেট্!

বরেন। ড্রেসেট্! একটু অপেক্ষা করুন! একটা কথা বলি! শশীকে আমি কি রকম ভালবাসি, তা আপনি ঠিক জানেন না! দরকার হলে তার জন্যে প্রাণ দিতেও আমি কুণ্ঠিত হইনে। সে-ও আমাকে সেই রকমই ভালবাসে। কাজেই বুঝতে পারছেন—তার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা শুনে আমার কত খুসী হওয়া সম্ভব! এ বেশ হয়েছে—ভারী চমৎকার হয়েছে—কিন্তু আপনাকে আমার একটা অনুরোধ আছে—শশী যেন কোনও রকমে আমার সেদিন সন্ধ্যের পাগলামীর কথা টের না পায়! বিয়ে হয়ে গেলে তখন না হয় বলা যেতে পারবে—তখন ভারী একটা হাসির ব্যাপার হবে! বুঝলেন কিনা! আচ্ছা বলুন, আর কি আছে! চিরুণী, ক্রশ, কাঁকুই—ড্রেসেট! তারপর?

(সরযূ নিরুত্তরে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নেত্রপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত)

বরেন। (শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে) আপনার চোখে বোধ হয় কিছু পড়েছে। বাইরে গিয়ে একটু জল দিন। আচ্ছা, আমিই না হয় একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তিনদিনপরে। সময়—অপরাহ্ণ। গত পরশু লীলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শশিনাথ শ্রান্ত দেহে নিজের ঘরে একখানি ইজি চেয়ারে শুইয়া ছিল। অত্যন্ত শ্রান্ত এবং অবসন্ন ভাব। কিয়ৎকাল পরে ব্যস্তভাবে সোমনাথ প্রবেশ করিল। তাহার মুখ বিবর্ণ। দুই চোখে আতঙ্কের ছায়া।

সোম। শশিনাথ!

শশী। (মুখ তুলিয়া) দাদা।

সোম। শশি! সর্ব্বনাশ হয়েছে!

শশী। কি হয়েছে দাদা? (উঠিয়া বসিল)

সোম। (চেয়ারে বসিয়া) লীলার অদৃষ্ট যে এত মন্দ তা জানতাম না শশি। তার কপাল একেবারে পুড়েছে।

শশী। তার মানে?

সোম। আজ ওদের ফুলশয্যা হবার কথা! সে-সব কিছু হয়নি! শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে পাকা হোলো না শশি, সুধীর লীলাকে গ্রহণ করবে না বলেছে।

শশী। সুধীর লীলাকে গ্রহণ করবে না বলেছে! কেন এমন বলেছে?

সোম। সুধীর খবর পেয়েছে, লীলার জন্মের ইতিহাস নাকি ভালো নয়।

শশী। সে কি! এ যে অসম্ভব!

সোম। সেই অসম্ভবই হয়তো সম্ভব হয়েছে শশি! সুধীরের খবর মিথ্যে নয়। তার সঙ্গে আজ পথে আমার দেখা হয়েছিল! প্রথমটা তার কথা শুনে আমার বিশ্বাস হয়নি। তারপর তার কথামত দুজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করে যা জানতে পারলাম তার ওপর আর বলবার কিছু নেই!

শশী। সমস্ত কথা আমায় খুলে বল দাদা! আমার মথায় যে কিছুই ঢুকছে না।

সোম। সুধীরের কাছ থেকে যা শুনলাম এবং সুধীরের পরিচিত দুজন লোকের মুখ থেকে যে খবর পেলাম, সেই কথাই তাহলে তোমায় বলি?

শশী। হ্যাঁ বল।

সোম। (একটু ইতস্তত করিয়া) উর্ম্মিলা আর লীলা সহোদরা বোন নয়!

শশী। (সাশ্চর্যে) নয়?

সোম। না! আমার শাশুড়ী অল্পবয়সে একটি মেয়ে প্রসব কোরে মারা যান! সেই মেয়েটি হচ্ছে উর্ম্মিলা। স্ত্রীমারা যাবার পরে শ্বশুর মশায় মেয়েটিকে মানুষ করবার উদ্দেশ্যে এক দূর-সম্পর্কীয়া বিধবাকে এনে নিজের বাড়ীতে রাখেন। কিছুদিন পরে সেই বিধবার—

শশী। হ্যাঁ, তারপর—

সোম। শ্বশুর মশায় মরবার সময় উর্ম্মিলাকে আর লীলাকে তাঁর এক বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুর হাতে সঁপে দিয়ে যান। এঁকে লীলার মা দাদা বলে ডাকতেন, সেই জন্যেই তিনি দাদার পরিচয়ে দুই বোনকে প্রতিপালন

করেন! এই মামারই এক আত্মীয় সুধীরের জমিদারীতে কাজ করে। তার কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেছে! এই ব্যাপারে সুধীর অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছে! আজ সন্ধ্যের পর সে তোমাকে একবার যেতে বলেছে। আসবার সময়ে লীলাকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

শশী। সুধীর কি লীলাকে ত্যাগ করবেই ঠিক করেছে?

সোম। এ-অবস্থায় ত্যাগ না করে আর উপায় কি?

শশী। কেন? লীলার কোন্ অপরাধে সে তাকে ত্যাগ করবে? এ-কথা যখন সে আগে জানতে পারেনি, তখন পরে জানা আর না জানা দুই-ই সমান।

সোম। লীলাকে ত্যাগ না করলে সুধীরকে সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতে হতে পারে; অতটা ত্যাগ স্বীকার করতে সে রাজী নয়!

শশী। (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) কিন্তু লীলাকে গ্রহণ না করলে, লীলাকে সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতে হতে পারে—ততটা নির্মমতা করতে সে রাজী তো?

সোম। তার নির্মমতা কেন বলছো শশি? ঘটনা সত্যি হলে সমাজের মধ্যে লীলার আর স্থান কোথায়?

শশী। (দীপ্তস্বরে) তাহলে তোমার বাড়ীর মধ্যেও তো তার স্থান নেই? দেখ দাদা, কলকাতা সহরে ইট-চুণ ওয়ালা রাজমিস্ত্রির অভাব নেই—কালই এ বাড়ীর মাঝখানে পাঁচীল পড়ে যাবে। তোমার অংশে সমাজের গোয়াল বেঁধো—আমার অংশে লীলা বাস করবে!

সোম। (ক্ষুণ্ণকণ্ঠে) আমি কি তাই বলছি শশি! এ তোমার অন্যায় রাগ করা!

শশী। আমি রাগারাগি করতে চাইনে দাদা! তোমাদের পচা সমাজতত্ত্বের বিষয়ে বক্তৃতা করা বা বক্তৃতা শোনার সময় এবং ধৈর্য আমার নেই! আর তা ছাড়া, এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে বসে জটলা করে পরামর্শ করতেও চাইনে। আমি চল্লুম। আমার মাথায় যা আসে তাই করবো।

সোম। ভাখো শশি! তুমি লীলাকে ভালবাসো তা আমি জানি, কিন্তু আমিও তার শত্রু নই—তার একটা ভালরকম ব্যবস্থা আমরা করবোই! তুমি অধীর হোয়ে অবিবেচনার কোন কাজ যেন করে বসো না। তাতে সকলের চেয়ে লীলারই ক্ষতি বেশী হবে! বিপদের সময় বুদ্ধি স্থির রাখতে না পারাও একটা মস্ত বিপদ!

শশী। সে ভয় নেই দাদা! আর আমার দ্বারা লীলার কোনও ক্ষতি হবে না। এর আগে তোমাদের কথা না শুনে তার যে ক্ষতি করেছি, তার জন্যে যদি তোমার সামনে নাকে-খৎ দিতে বল তো এখুনি দিচ্ছি। কিন্তু আর কোনও ক্ষতি হবে না। লীলা তোমার ভাদ্র-বৌ হবে। আমি তাকে বিয়ে করবো!

সোম। (বিস্ময় এবং উদ্বেগ সহকারে) তুমি!

শশী। হ্যাঁ আমি—ওই যে বৌদি আসছেন। এসব কথা বৌদিকে জানিয়েছো দাদা?

(সোমনাথ সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িল।

ঊর্মিলার প্রবেশ)

এসো বৌদি! একি! কেঁদে কেঁদে তোমার দুচোখ যে একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে! আচ্ছা বৌদি, এ সংবাদ কি এতই ভীষণ যে এত কেঁদেছো? (ঊর্মিলা নীরব) এত দুঃখ কিসের বৌদি! নিয়তি কপালে যতটুকু লিখেছে, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না—তুমিও না, আমিও না। লীলাকে আমরা যেমন জোর করে বিদায় করেছিলাম, তেমনি জোরের সঙ্গে সে আবার ফিরে আসছে—বাইরে যাবার সমস্ত সম্ভাবনা এবারে সে কাটিয়ে দিয়েছে! সে ভারী অভিমানী—দেখো বৌদি, কোন রকমে যেন সে মনে কষ্ট না পায়!

(সোমনাথের প্রস্থান)

ঊর্মিলা। (অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে) আমি আর কি বলবো ভাই, দয়া করে তাকে পায়ে একটু স্থান দিও। সে বড় দুঃখিনী।

শশী। তুমটা কি আমার একদিনও দেখতে পাও নি বৌদি যে, পায়ে স্থান দেবার কথা বলছো? সে কি এত সামান্য, এত অবহেলার সামগ্রী যে দয়া ভিন্ন সে আমার কাছ থেকে আর কিছু পেতে পারে না?

উর্শিলা। তা আমি জানি ঠাকুরপো, তুমি ভিন্ন তার আর কেউ নেই।

শশী। (মৃদু হাসিয়া) ঠিক উল্টো বলছো বৌদি। সে ভিন্ন আমার আর কেউ নেই—তাই আমার কাছ থেকে এত দুঃখ পেয়ে আবার আমারি কাছে সে ফিরে আসছে! তোমরা তাকে দয়া করতে হয় কোরো—কিন্তু সে আমাকে দয়া করবে কিনা জানিনে!

উর্শিলা। সে আবার দয়া করবে কি ঠাকুরপো! আর কি তাকে আগেকার ভেবে দেখতে পাবে? সে এবার এসে, কাউকে আর মুখ দেখাবে না, একদিকে মুচড়ে ভেঙে পড়ে থাকবে।

শশী। (তীক্ষ্ণ স্বরে) কেন বল তো? কার ভয়ে? তুমি যদি বোন বলে তাকে অস্বীকার করো—তোমার বোন বলে সে যদি এ বাড়ীতে আগের মতো সম্মান আর না পায়—তাতে কিছু এসে যাবে না। এবার সে এ বাড়ীর বৌ হয়ে থাকবে—তোমার জা হয়ে সে এবার সম্মান পাবে।

উর্শিলা। (ভয়ে বিস্ময়ে) সেকি ঠাকুরপো!

শশী। যা বলছি ঠিক তাই। এর মধ্যে আর অন্য কোনও কথা নেই! তোমার ওপর যদি একটুও স্নেহের দাবী করতে পারি, তাহলে আজ আমাকে এই আশীর্বাদ করো বৌদি—যেন সে দয়া করে আমাকে গ্রহণ করে—আমার অপরাধের দণ্ড সে যেন নিজের হাতে না দেয়। আমি তাকে খুব চিনি আর বড় ভয় করি!

উর্শিলা। না, না, ঠাকুরপো, এ ব্যাপার এইখানেই শেষ হোক। একে আর বাড়িয়ে তুলো না। কেউ কারুর কিছু করতে পারে না ভাই—সকলেই নিজের নিজের কপালে ভোগ করে। লীলার কপালে বিধাতা সুখ লেখেন নি তাই সে কষ্ট পাচ্ছে! লীলার জন্যে সরযূকে অসুখী করো না ঠাকুরপো—সে তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না।

শশী। তা আমি জানিনে বৌদি। আমিও লীলাকে ছাড়া আর কিছু জানি নে! সরযূ আমার কেউ নয়। সে কষ্ট পায় তো নিজের কপালেই কষ্ট পাবে। লীলাকে সুখী করার জন্যে আমি তত ব্যস্ত হইনি—যত নিজের জন্যে হয়েছি! লীলা ভিন্ন আমার পরিত্রাণ নাই। আমি এখন চল্লাম তাকে আনতে। সে এলে তোমরা যেন কোন রকমে তার মনে কষ্ট দিও না। (প্রস্থান)

(ভিন্ন দিক দিয়া সোমনাথের প্রবেশ)

সোম। উর্শিলা! শশী বুঝি লীলাকে আনতে গেল? আমার ভয় হচ্ছে—কোনও রকম একটা অনর্থ না সে ঘটিয়ে ফেলে! শশী কি বলে জানো? বলে লীলাকে বিয়ে করবে! দেখ দেখি? একি ছেলেমানুষী কথা! এটা কি ভাল বলে তোমার বোধ হয়?

উর্শিলা। না।

সোম। আমারও ঠিক তাই মত। স্রোতের বিপক্ষে গেলে যেমন ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে ডুবে যেতেই হবে তেমনি সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করলে অবশেষে সর্বনাশ হবেই। লীলার জন্যে আমরা সকলেই দুঃখিত! কিন্তু সুখের পথে তাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলেই সে সুখী হবে না। তাতে তাকে আরও কষ্ট দেওয়া হবে। (উর্শিলা নীরব) উর্শিলা।

উর্শিলা। বল।

সোম। শশী যদি কারুর কথা শোনে তো একমাত্র তোমারই কথা শুনবে। তুমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা কোরো। এ বিপদ থেকে তুমি তাকে বাঁচাও। বল, আমার একথা তুমি রাখবে? সুধীর যদি নিজের বংশ মর্যাদার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তো আমাদের বংশই বা তার চেয়ে কম কিসে যে আমরা তাকে কলুষিত করবো? বল, তুমি এ বিষয়ে চেষ্টা করবে?

উর্শিলা। (রুদ্ধ নিঃশ্বাসে) করবো!

সোম। বেশ। আর লীলাকেও তুমি একথা বেশ করে বুঝিয়ে দিও! সে বুদ্ধিমতী; কখনই সে নিজের সুখের জন্যে একটা পরিবারকে বিপন্ন করতে চাইবে না, এ আমি জোর করে বলতে পারি! তাছাড়া তার খোরপোষের ব্যবস্থা সে তো আমরা—

উর্শিলা। দেখো, আমি নিজের মন দিয়ে বুঝতে

পারছি, লীলাকে এত বোঝাবার দরকার হবে না। সে কখনই এটা—

(কান্নার আবেগে তাহার কথা রুদ্ধ হইল)

সোম। কাঁদছো কেন উর্ম্মিলা? আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিলাম? তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে তো আমি কোন কথা বলিনি।

উর্ম্মিলা। (নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া) আমি তোমার সব আদেশ রাখবো—কিন্তু আমার একটা কথা রাখবে? আমার একটা কথার জবাব দেবে?

সোম। কি?

উর্ম্মিলা। আমি যদি লীলার আপন বোন হতাম, তাহলে আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে? আমাকে রাখতে না ত্যাগ করতে?

সোম। (সন্ত্রাসে) এ কথা কেন উর্ম্মিলা?

উর্ম্মিলা। (স্বামীর হাত ধরিয়া) তাই জিজ্ঞাসা করছি, সত্যি বল না, কি করতে? ত্যাগ করতে?

সোম। (মুহূর্ত্তকাল ইতস্তত করিয়া) তোমাকে ত্যাগ না করলেও, সমাজ ত্যাগ করতাম, আর অপবিত্র সন্তানের মা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে তোমাকে রক্ষা করতাম। সমাজের মধ্যে কখনো ব্যভিচার আনতাম না। সমাজ থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু সমাজকে নষ্ট করবার অধিকার কারো নেই!

উর্ম্মিলা। (কম্পিত কণ্ঠে) আর বিয়ের ঠিক আগে যদি জানতে পারতে, তাহলে?

সোম। তাহলে কখনই তোমাকে বিয়ে করে তোমার আর আমার দুজনের জীবন বিড়ম্বিত করতাম না।

উর্ম্মিলা। (সভয়ে) সমাজ কি এতই ভয়ের জিনিষ?

সোম। (শান্তভাবে) হ্যাঁ। সমাজ এতই ভালবাসার বস্তু! তার জন্যে সব রকম ত্যাগ স্বীকার করা যায়। কিন্তু তুমি তো পবিত্র উর্ম্মিলা, তুমি—ওকি! তুমি অমন করছো কেন?

উর্ম্মিলা। ও কিছু না, বুকের মধ্যে কেমন ধড়ফড় করে উঠল!

(নীচু হইয়া সোমনাথের পায়ের ধূলা লইয়া) আমাকে ক্ষমা করো। তুমি যা বলছো, তাই ঠিক, আর সেই রকমই হবে।

(সোমনাথ আকুল আবেগে উর্ম্মিলাকে নিজের কাছে টানিয়া লইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

এক সপ্তাহ পরে। অপরাহ্ণ কাল। নিজের ঘরে একাকিনী লীলা বসিয়া একখানি বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় পিছন দিক হইতে শশিনাথ প্রবেশ করিল। তাহার সাড়া পাইয়া লীলা বই বন্ধ করিল

শশী। এই যে তুমি এখানে রয়েছো, আর আমি সারা বাড়ীময় তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি!

লীলা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কেন আমায় খুঁজছিলে শশিদা!

শশী। বলছি! কিন্তু তুমি উঠে পড়লে কেন? বস!

লীলা। (বসিয়া) তুমি কি এইমাত্র বাড়ী ফিরলে?

শশী। হ্যাঁ, এইমাত্র।

লীলা। তিন চারদিন ধরে কোথায় গিয়েছিলে শশীদা?

শশী। নবদ্বীপ আর ভাটপাড়ায়।

লীলা। যেখানেই যাও—বলে গেলে তো আর বাড়ীর লোক এমন করে ব্যস্ত হতো না।

শশী। কে ব্যস্ত হয়েছিল লীলা—তুমি?

লীলা। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) দিদি তো কেঁদে কেটে সমস্তদিন—

শশী। আর তুমি কি সারাদিন হেসে-খেলে কাটিয়েছিলে? দিদির কথা তো দিদির কাছে শুনে এসেছি—তোমার কথা কি তাই বল না? (লীলা নীরব) তা বলতেও কি তোমার নিষ্ঠায় বাধে লীলা?

লীলা। (স্খলিত কণ্ঠে) নিষ্ঠার কথা বলে আমাকে কি ঠাট্টা করা হয় না শশিদা?

শশী। না, হয় না। হাজার বার বলছি হয় না—

তবু সেই এক কথা? তুমি জানো কোন্ কথা বললে আমি মনে ব্যথা পাই, তাই ইচ্ছে করে আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে সেই কথা বার বার বলো। তোমার প্রকৃতির মধ্যে কি ভয়ানক একটা নিষ্ঠুরতা আছে, তা যদি তুমি বুঝতে লীলা! (কণেক অপেক্ষা করিয়া শান্ত করুণ স্বরে) আমি ভুল করেছি, আমি গুরুতর অপরাধ করেছি, কিন্তু তাই বলে কি এমনি কঠোর ভাবে শাস্তি দেবে? এত দুঃখেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো না?

লীলা। (ভগ্নকণ্ঠে) তুমিও ঠিক জানো শশিদা, এই সব ও পাপের কথা বলে আমি মনে কষ্ট পাই—তাই তুমি এসব কথা বলো। তুমি আমার কাছে অপরাধ করেছো, সেটা যেমন মিথ্যে, আমি তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি, সেটাও তেমনি ভুল।

শশী। (ক্ষিপ্ত বাধিত কণ্ঠে) আচ্ছা, পাপ-পুণ্যের বিচার না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কি জন্যে নবদ্বীপ-ভাটপাড়ায় গিয়েছিলাম তা তো জিজ্ঞাসা করলে না?

লীলা। (শান্ত কণ্ঠে) দরকার ছিল তাই গিয়েছিলে!

শশী। (উৎফুল্ল স্বরে) খুব দরকার ছিল লীলা, আর সে দরকারী কাজে সম্পূর্ণ সফল হয়ে এসেছি। (পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া) এই দেখ, ভাটপাড়া আর নবদ্বীপ থেকে পঁচিশখানা ব্যবস্থাপত্র নিয়ে এসেছি। এগুলো পড়ে দেখো, সমাজের যাঁরা মাথা, মহামহোপাধ্যায়, সার্বভৌম, বিদ্যারত্ন, স্মৃতিভূষণ, বড় বড় সব পণ্ডিত, মুক্তকণ্ঠে তাঁরা বলেছেন—তোমার সে বিয়ে বিয়েই নয়। আবার যথাশাস্ত্র তোমার বিয়ে হবার পক্ষে কোন বাধা নেই। এখন আমার প্রার্থনা মঞ্জুর তো? (লীলা নীরব) তাহলে মঞ্জুর? লক্ষ্মীটি, একবার খুলে বল। আর যদি আরও ভাল করে সন্তুষ্ট হয়ে নিতে চাও, এগুলো তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, পড়ে দেখো। আমি ঘণ্টাখানেক পরে আসবো।

লীলা। (ব্যবস্থাপত্রগুলি সরাইয়া দিয়া) এর আমি একটাও পড়তে চাইনে। এসব মতের কোন মূল্য নেই—কারণ, আমার জন্মের ইতিহাসটা প্রকাশ করে যদি বলতে, তাহলে এর একটা মতও তুমি পেতে না। তাছাড়া, এসব পয়সা দিয়ে কেনা মতের চেয়ে তোমার মতকে আমি অনেক ওপরে স্থান দিই। তুমি যদি বল আবার আমার বিয়ে করা চলে, তাই যথেষ্ট। কিন্তু—

শশী। আবার 'কিন্তু' কি?

লীলা। একটা কিছু করা যেতে পারে বলেই তো করা যায় না।

শশী। কেন করা যায় না লীলা? তাহলে একজনকে দুঃখের অতল থেকে উদ্ধার করা হয় বলে করা যায় না? এত নির্দয়তা তোমার কেন?

লীলা। নির্দয়তা নয় শশিদা, এ আমার অনেক দুঃখে সঞ্চয়। মাস দুই তিনের মধ্যে আমি যা ভুগেছি—একে দুঃখ বল, দুর্ভাগ্য বল, যাই বল না কেন—এ আমি নিজের অদৃষ্টে ভুগেছি, এর জন্যে আমি কাউকে দায়ী করিনে—তোমাকে তো নয়ই! তুমি আমাকে চিরদিন যেমন স্নেহ-দয়া করেছো তেমনিই কোরো। তোমার দয়া আমি মাথায় কোরে রাখবো। তার বেশী আমি চাইনে।

শশী। আর আমার প্রেমটা কি কিছুই নয়? তাকে এমনি কোরে পদদলিত করবে?

লীলা। (দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া মৃদু আর্তনাদে) যা-তা কথা বলো না শশিদা—শুনলেও পাপ হয়! কি প্রেম বলে আমাকে যা তুমি দিতে চাচ্ছ, তা প্রেম না ওটা তোমার দয়া আর আত্মোৎসর্গ! আমার ওপর তোমার এত দয়া বলে আমি কি নির্দয় হয়ে—

শশী। (ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) থামো লীলা থামো আমি জানি মুখে তোমার অনেক কথা জোটে, কিন্তু মনে তোমার একটুও দয়া নেই। তা থাকলে, আজকে আমাকে এমন করে অপমান করতে না! তুমি পাষাণ!—তোমার কি হৃদয় আছে? কেমন কোরে বোঝাবো, এ-দয়া নয়, করুণা নয়, ক্ষতিপূরণ না আত্মোৎসর্গ নয়! তুমি বিশ্বাস করবে না, সেইজন্যে তোমাকে বলতে প্রবৃত্তি হয় না—কিন্তু একথা নিত্য সত্যি, দয়া বলে যাকে তুমি কলুষিত করছো, আমার সে প্রেম, সেই গভীর নিবিড় প্রেম প্রথম টের পেলাম সেইদিন যেদিন সুধীরের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল

তারপর যেদিন তোমার বিয়ে হোল, সেদিন অন্তরের মধ্যে কি ঝড় বয়েছিল তা তুমি কি জানবে—কিন্তু তখন কোনো উপায় ছিল না। তারপর সকলের চেয়ে ভীষণ কথা শুনবে? যখন শুনলাম, সুধীর তোমাকে পরিত্যাগ করেছে তখন অসহ্য রাগের মধ্যেও মনে একটা ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠেছিল। সেই আলো তুমি চিরদিনের জন্যে নিভিয়ে দিতে চাও লীলা?

লীলা। (অনেক পরে সকাতর মিনতিপূর্ণকণ্ঠে) এ ভাল নয় শশিদা! বাস্তবিকই ভাল নয়! এমন করে প্রলুব্ধ করা ভাল নয়। আমি একজন সামান্য মেয়েমানুষ, কতক্ষণ পারবো বল?

শশী। (হাসিয়া) তুমি সামান্য মেয়েমানুষ? মিথ্যে কথা। তোমার মতো কঠিন মেয়েমানুষ আর দ্বিতীয় নেই। তোমার মায়া নেই, দয়া নেই, ক্ষমা নেই! তুমি আবার সামান্য মেয়েমানুষ কোথায়?

লীলা। (সজল কণ্ঠে) সে কি কম দুঃখে শশিদা, সেকি কম কষ্টে! (মুহূর্ত পরে) পূর্বজন্মের অনেক পুণ্য ছিল তাই কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশ হয়ে গেল, নইলে তো —(কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল)

শশী। নইলে কি হোত লীলা?

লীলা। থাক, তা আর শুনে কাজ নেই। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) শশিদা!

শশী। কি বল?

লীলা। তুমি সরযূর কথা একবারও ভাব?

শশী। সরযূর কি কথা, লীলা?

লীলা। সরযূকে বিয়ে করবে বলে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো, আর সরযূ তোমাকে স্বামী মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে এই বাড়িতে বাস করছে—সেই কথা?

(ক্ষণকালের জন্য শশীনাথ বিহ্বল বোধ করিল)

শশী। (মাথা নাড়িয়া সজোরে) সরযূকে বিয়ে করব বলে তো আমি প্রতিজ্ঞা করিনি—আমি শুধু তার ভার নিয়েছিলাম।

লীলা। (বিস্মিত চকিত নেত্রে) কি বলছ শশীদা! তুমি প্রতিজ্ঞা করনি? আমি যে নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

শশী। কিন্তু আমি তো জানি, কি কথা ব্যবহার করেছিলাম। আমি বলেছিলাম—আজ থেকে সরযূর ভার নিলাম। বিয়ে করব, তা বলিনি।

লীলা। কথার মানে কিছুই নয়, তুমি যা বুঝিয়েছিলে তাই সকলে বুঝেছিল।

শশী। তারা ভুল বুঝেছিল। একথা অবিশ্যি তখন কারুর কাছে বলা হয়নি, কিন্তু বয়েসের সঙ্গে সরযূর বিয়ে হবে। বয়েস সরযূকে স্নেহ করে। বয়েসের ভালবাসা ব্যর্থ হবার মতো সামান্য নয়। তার সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে পাকা কথা হয়ে গেছে। সেসব কথা না জেনে যদি সকলে ভুল বোঝে, সেজন্যে আমি দায়ী নই।

লীলা। আমাকে ক্ষমা করো শশীদা, তার জন্যে তুমিই দায়ী। সরযূ জানে, তোমার সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। সে কম দুর্ভাগিনী নয়, শশীদা, সেও আমার চেয়ে কম কষ্ট পায়নি, তার প্রতি তুমি নির্দয় হয়ো না। আমার জীবনের মতো অনেক গোল বাঁধিয়েছে, সে আর এ জীবনে শোধরাবে না। সরযূর এখনো সব ঠিক আছে—তার জীবনটা নষ্ট করো না—তার প্রতি দয়া কর।

শশী। আর আমার জীবনটা কি কিছুই নয়? আমি শুধু আছি, যাতে অন্যের জীবন নষ্ট না হয়, সেই-জন্যে? আমি শুধু মালমশলা? রক্ত মাংস নই?

লীলা। (স্নিগ্ধ স্বরে) সেকথা তো এক হিসেবে সত্যি শশীদা। তোমরা কঠিন, তোমরা শক্ত। তোমরা যদি আমাদের রক্ষা না করবে তো আমরা দুর্বল, বাঁচবো কেমন করে?

শশী। (আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে) তোমরা দুর্বল? কে বলে? তোমরা বজ্রের চেয়েও কঠিন, পাষাণের চেয়েও কঠোর। তোমাদের দয়ামায়া নেই। তোমরা নির্মম, নিষ্ঠুর।

(শশীনাথ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। লীলা ব্যাকুল হইয়া দুই হাত মুখে স্থাপন করিয়া কান্নার বেগ রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল)

তৃতীয় দৃশ্য

[কয়েকদিন পর। রাত্রিকাল। শশীনাথের ঘর। কপালের উপর হাত রাখিয়া শশীনাথ ইজিচেয়ারে শুইয়াছিল। তাহার বুকের উপর একখানা বই খোলা। বোধ হয় বই পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পরে দরজায় ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ হইল]

শশী। (উঠিয়া) কে ?

লীলা। (নেপথ্যে) আমি, শশীদা।

(শশীনাথ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল)

লীলা। ভিতরে আসবো।

শশী। এসো।

(লীলা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল)

লীলা। একটা বিশেষ কথা বলবার জন্যে তোমায় বিরক্ত করলাম।

শশী। কি কথা বল।

লীলা। আজ আমি তোমার কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, শশীদা। এই বোধ হয় তোমার কাছে আমার জীবনের শেষ প্রার্থনা।

শশী। (ম্লান হাসিয়া) তাই যদি হয় তাহলে এ প্রার্থনা আজ না করে আমার অন্তিম দিনের জন্য রেখো, প্রাণটা এখনো কিছুদিন তো দেহে থাকতে পারে।

লীলা। (দুঃখিত কণ্ঠে) এসব কথা বললে মেয়েরা মনে কষ্ট পায় বলেই কি তোমরা এসব কথা বল! তা যাই বল না কেন, আজ আমাকে ফাঁকি দিলে চলবে না, আজ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতেই হবে।

শশী। কি তোমার প্রার্থনা, শুনি ?

লীলা। (ক্ষণেক থামিয়া) প্রথমত আমার সব অপরাধ ক্ষমা করতে হবে, দ্বিতীয়ত কাল সকালবেলা আমাকে বিদায় দিতে হবে !

শশী। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) ক্ষমা করার কথাটা পরে হবে। বিদায় দেওয়ার কথাটা কি শুনি। একেবারে ইহজীবনের মত নাকি ?

লীলা। (নত নেত্রে) বলা যায় না—তাও হতে পারে।

শশী। কথাটা আরও স্পষ্ট করে না বললে বুঝতে পারছি নে।

(লীলা আঁচলের তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া শশিনাথের হাতে দিল)

লীলা। এই চিঠিখানা পড়লেই বুঝতে পারবে।

(অধীর আগ্রহে শশিনাথ পত্রখানা পড়িল)

শশী। (পত্রখানি মুড়িয়া) এ নিকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় কে ? বরেনের ভগ্নিপতি ?

লীলা। হ্যাঁ।

শশী। গোপনে গোপনে বেঙ্গুনে চাকরি ঠিক করেছ। আমি এখন আর তাহলে আমাদের লীলার সঙ্গে কথা কচ্ছি নে, আমি কথা কচ্ছি, বেঙ্গুন বেঙ্গলি গার্লস্ স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে—মাসে তিনশো টাকা মাইনে—স্বাধীন, স্বতন্ত্র, আমাদের সব রকম শাসন বাঁধনের বাইরে। বাঃ।

(একবার লীলার অতি নিকটে গিয়া শশীনাথ তাহাকে দেখিল, তারপর সরিয়া আসিল)

লীলা। (শশীনাথের কাছে গিয়া) তা হচ্ছে না শশীদা, বাজে কথা বলে ফাঁকি দিলে চলবে না, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতেই হবে।

শশী। চমৎকার, লীলা, চমৎকার। এ অতি সুন্দর ব্যবহার। মূর্তিমতী কৃতজ্ঞতা তুমি। সেদিন চক্রবৃদ্ধি হারে ধার শোধ করার কথা তুলেছিলে, তার আর কি বাকী রাখলে না—একেবারে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিলে। চমৎকার।

লীলা। সেদিন আমার ঘাড়ে শয়তান চেপেছিল তাই ওকথা বলেছিলাম। তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করবার নয়, শশীদা।

শশী। (তীব্র কটাক্ষে) তা তো দেখতেই পাচ্ছি তাই একেবারে দেউলের মত মহাজনের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে চাচ্ছ।

লীলা। (দুঃখের হাসি হাসিয়া) কি করব মহাজন যে সর্বদা দেহ গ্রেপ্তারের ভয় দেখায়।

শশী। (বিদ্রূপসহকারে) তাই নাকি দেহটা নতুন মহাজনের হাতে সমর্পণ করছ? তাহাতে তিনিও তোমার সঙ্গে থাকবেন তো?

লীলা। (সবিস্ময়ে) কে?

শশী। তোমার শুশুরমশাই বিশ্বাসঘাতক বরেন?

লীলা। না, না, শশীদা, বরেনবাবু আমার শুশুরমশাই নন, বিশ্বাসঘাতকও নন, তিনি কেন আমার সঙ্গে তাহাতে থাকবেন? কালই আমি যাচ্ছি, এখবরও বোধহয় তিনি জানেন না। বরেনবাবু আমার একান্ত অনুরোধে তোমার কোন কথা জানান নি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমিই সব ব্যবস্থা করেছিলাম। বরেনবাবুর মুখে শুনেছিলাম, নিকুঞ্জবাবুই নিয়োগকর্তা, তাই বরেন বাবু আমার এই পরিচয়পত্রটি দিয়েছেন, তার বেশী কিছু নয়।

শশী। (তীব্রকণ্ঠে) বরেন তোমার কি জানে! পরিচয়পত্র আমার দিয়ে লিখিয়ে নিলে না কেন? আমি লিখে দিতাম, একজন হৃদয়হীনা পাষাণীকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি, দয়ামমতার সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক নেই, ইনি আপনাদের মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী হলে মেয়েরা বেশ শায়েক হয়ে উঠবে।

লীলা। (করুণ কণ্ঠে) না, না, শশীদা, এতে ভালই হবে, এতে তুমি বাধা দিও না। বাস্তবিকই আমি পাষাণী কিন্তু তুমি নির্দয় হয়ে পাষাণের মধ্যে লোভ জাগিয়ে তুলো না।

শশী। (হাসিয়া) নির্দয় হয়ে? কিন্তু তোমার দয়া সেদিন কোথায় ছিল লীলা, যেদিন চটিজুতো চুরি করে আমার মনে লোভের আগুন জেলে দিয়েছিলে? শ্বশুরবাড়ীতে রোজ সকালে আমার একশো আট নাম লিখবে বলে যেদিন আমার মনকে মাতাল করে তুলেছিলে, সেদিন তোমার দয়া কোথায় ছিল?

লীলা। আমার সে দুর্বুদ্ধিকে ক্ষমা কর শশীদা।

শশী। ক্ষমা? কিছুতেই নয়। তার আমি দস্তুর মতো প্রতিশোধ দিতে চাই। কি ক'রে—তা দেখ।

(শশীনাথ ঘরের কোণে রাখা আলমারির কাছে গিয়া আলমারি খুলিয়া একখানি বড় আকারের ফ্রেমে-বাঁধা ছবি বাহির করিয়া আনিল এবং ছবিখানিকে টেবিল-ল্যাম্পের আলোর পাশে ছোট টেবিলের উপর রাখিল। ছবির উপর আলো পড়িল। দেখা গেল, কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে পাশাপাশি দুইখানি ফটোগ্রাফ, একটি শশিনাথের অপরটি লীলার। ফ্রেমটির গায়ে কর্পূরের মালা জড়ানো। ছবি দেখিয়া লীলা শিহরিয়া উঠিল। শশীনাথ লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে ছবির কাছে লইয়া গেল)

শশী। এই দেখ তোমার ছুতো চুরির প্রতিশোধ। দেখ, বাস্তব জীবনে যে দুটি প্রাণী উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পড়ে কাছাকাছি থেকেও পাশাপাশি হতে পারছে না, ছবির জীবনে তারা কেমন পরম নিশ্চিন্তভাবে পাশাপাশি রয়েছে, কোন উদ্বেগ নেই, কোন উৎকণ্ঠা নেই। কেমন লাগছে লীলা? ভারী বিশ্রী কি?

লীলা। (ব্যাকুল ভাবে) দাও, শশিদা দাও, তোমাকে মিনতি করে বলছি, এ ফটোগ্রাফ আমায় ফিরিয়ে দাও। আমি তো তোমার চটিজুতো ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

শশী। অসম্ভব। তাহলে একশো আট নামের প্রতিশোধ দেব কেমন করে?

লীলা। (শিহরিয়া) ছি ছি ছি! একজন সামান্য মেয়েমানুষের জন্যে তুমি নিজেকে অত নীচু করো না শশিদা।

শশী। একজন সামান্য পুরুষের জন্যে তুমি কতো নীচু হয়েছিলে, তা তো আমার মনে আছে লীলা। স্বামীর বাড়িতেও তুমি তার একশো আট নাম লেখবার কথা তুলেছিলে। তুমি যেদিন চলে গেলে সে-ও রোজ রাত্রে একশো আটবারেই তার প্রতিশোধ নেবে। কি করে, তা নিজের চোখে একবার দেখে যাও।

(শশীনাথ সন্তর্পণে ফ্রেম হইতে লীলার ফটোখানা বাহির করিয়া বুকের উপর রাখিল)

লীলা। (আর্তকণ্ঠে) না, না, না।

(ছুটিয়া শশিনাথের কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিল)

শশী। হ্যাঁ, এমনি করে। এই রকম করে প্রতিশোধ নেব।

(অধীর উন্মত্ত আবেগে শশিনাথ ছবির উপর চুম্বন করিতে লাগিল। সে দৃশ্য লীলা বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু তিমিত হইয়া আসিল এবং শশিনাথের দেহের উপরেই তাহার বিবশ দেহ ভাঙিয়া লুটাইয়া পড়িল)

॥ যবনিকা ॥

ভাগ্যের লেখা

ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায়

তারাশঙ্করের হাত দেখিয়া একদা কোন এক জ্যোতিষী-প্রবর বলিয়াছিলেন যে তারাশঙ্করের ভাগ্যে লেখা আছে বিধবা রমণীর প্রেম। জ্যোতিষ শাস্ত্র মন্থন করিয়া জ্যোতিষী-প্রবর হয়ত আরও অনেক গুপ্ত তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সব কথা তারাশঙ্করের মনে ছিল কি না জানি না, কিন্তু মনে ছিল তাহার এই বিধবা রমণীর প্রেমের কথা। সুতরাং ফল ফলিল এই যে বিধবা রমণী মাত্রই হইয়া দাঁড়াইল তাহার ভীতির কারণ। সংক্রামক রোগ ভীত মানুষ যেমন রোগ এবং রোগিণীর সান্নিধ্য এড়াইয়া দূরে দূরে সরিয়া থাকে তারাশঙ্করও তেমনি সরিয়া রহিল, বিধবা রমণীদের সংস্পর্শ হইতে।

অথচ তারাশঙ্করের বাল্যের এবং প্রারম্ভ যৌবনের ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায়, দেখা যায় যে বিধবাদের প্রতি রাগানুরাগের কোন অস্তিত্বই সেখানে নাই! কিন্তু প্রারম্ভে যাহা ছিল না, তাহা আত্মপ্রকাশ করিল মাঝপথে। এবং তাহারই আবর্তে পড়িয়া তারাশঙ্করের জীবনে এক জটীল সমস্যার উদ্ভব হইল। জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যেখান হইতে তাহার ধারাটাই ভিন্ন খাতে বহিতে সুরু করে। তারাশঙ্করের জীবনে সেই মুহূর্তের উদয় হইল। জ্যোতিষী-প্রবরের বাণী মনের আসল তন্ত্রীর উপর ঠিক সময়ে ঘা মারিয়া প্রতিক্রিয়া সুরু করিয়া দিল। তখন হইতেই বিধবা রমণীর সান্নিধ্যে তারাশঙ্করের মন সদা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তারাশঙ্কর কৃতি পুরুষ। অল্প বয়সেই গভর্ণমেণ্টের বড় চাকরীতে সে বহাল। কিন্তু উন্নতির সকল লক্ষণ তাহার মধ্যে জাজ্বল্যমান থাকিলেও এক বিষয়ে সে ভাগ্যহীন। গৃহীর গৃহিণী না থাকিলে তাহাকে যদি লক্ষ্মীছাড়া বলা চলে, তাহলে তারাশঙ্কর লক্ষ্মীছাড়া। সে বিপত্নীক। বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সে, স্ত্রী ছিল সুন্দরী, কিন্তু ভাগ্যে টিকিল না বেশীদিন। উপলক্ষ্য এমন কিছু নয়, সামান্য একটু জ্বর, তাহাই হইল কাল। শ্বশুর শাশুড়ী তারাশঙ্করকে ভাল বাসিতেন ছেলের মত, এ বিপর্যয়ে সে ভালবাসায় শৈথিল্য দেখা দিল না। বরঞ্চ মেয়ে নাই বলিয়া পাছে জামাই পর হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় শ্বশুর বাড়ী হইতে তারাশঙ্করের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল ঘন ঘন। স্ত্রী থাকিলে যদি বা আপত্তি কিছুটা থাকিত এখন সে কারণ নাই। সুতরাং বিনা সঙ্কোচেই তারাশঙ্কর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল। শ্বশুর বাড়ীর প্রধান আকর্ষণ ছিল তাহার বড় শালীকা মাধুরী। মেয়েটি ভাল। লীলা চঞ্চল, বুদ্ধিমতী মেয়ে। রঙ্গ-রসিকতায়, হাসি-গল্পে মজাইয়া রাখিত তারাশঙ্করকে। মুখ টিপিয়া বলিত, তোমার নামটি ভাই বড়, একটু ছোট করে নিতে চাই। তারাশঙ্কর উত্তর দিত, বেশ ত, আপনাদেরই ত জিনিষ, যেমন ক'রে নিলে পছন্দ হয় করে নিন।

—তাই নেব। আর বজ্জ সেকেলে নাম।

—ঘষিয়ে টষিয়ে চকচকে করে একেলে করে নিন।

—সেই কথাই ভাবছি। সিঁদুর আলতা ছুঁইয়ে একেবারে ভোল পাল্টে দেব, চিনতে পারবে না কেউ।

তারাশঙ্কর সহাস্যে বলিত, আর কারো চেনবার প্রয়োজন নেই দিদি, আপনি চিনতে পারলেই হ'ল।

মাধুরীও ছটিবার মেয়ে নয়। বলিল, আমার জিনিষ, আমি না চিনলে, চিনবে কে? তবে ভয়ও হয় মাঝে মাঝে।

—হারিয়ে যাবার?

—উঁহু, কপালে চিহ্ন দিয়ে রাখব। ভয় ভেঙে যাবার।

তারাশঙ্কর বলিত, আমি কি এতই চুনকো দিদি?

—বেজায়। একেবারে কাচের বাসন। চীনে মাটির হ'লে ভয় ছিল না এত।

—তা হলে সাবধানে তুলে রেখে দিন। ভাঙবার ভয় থাকবে না কিছু।

—তা ত হয় না। তুলেই যদি রাখব, তবে বাঁচব কি নিয়ে। নেড়ে চেড়েই ত আনন্দ। কাজ নেই আমার অভয়ে। এর চেয়ে ভয় ঢের ভাল।

এমনই মধুর সম্বন্ধ দুজনার। কিন্তু এ সম্বন্ধেও ছেদ পড়িল। একদিন, যে দিন অদৃষ্টের ফেরে মাধুরী সিঁদুর এবং হাতের লোহা খোয়াইয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সে দিন হইতে তারাশঙ্করেরও শ্বশুর বাড়ী যাওয়া বন্ধ হইল। জ্যোতিষীর বাণী স্মরণ করিয়া মাধুরীর সহিত দেখা করিবার মত মনের বল সে পাইল না। শ্বশুর শাশুড়ী, ছুটিয়া আসিলেন। চিঠির পর চিঠি লিখিল মাধুরী। কিন্তু তারাশঙ্কর অটল। নানা অজুহাতে সে সমস্ত অনুরোধ উপরোধ এড়াইয়া গেল। সুতরাং হাল ছাড়িলেন শ্বশুর শাশুড়ী, আর হাল ছাড়িল মাধুরী।

পুত্রের পুনরায় বিবাহের জন্য পিতা মাতা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছেলের বয়স অল্প। এত অল্প যে বিবাহিতের সংজ্ঞা অপেক্ষা অবিবাহিতের সংজ্ঞায় তাহাকে মানায় বেশী। সুতরাং পাত্রীর অভাব হইল না। মেয়ের মত সৎ পাত্রীর পিতা একে একে সকলেই দ্বারস্থ হইতে লাগিলেন। তারাশঙ্করের দিক দিয়াও বিবাহ বীতরাগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। মৃত স্ত্রীর ক্ষণিক স্মৃতিকে মনের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রেমের রাজ্যে তাজমহলের মত কিছু একটা অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া যাইবে এ বাসনা তাহার কোন দিনই ছিল না, আজও নাই। অতএব বিবাহের কথাবার্তা একপ্রকার স্থির হইয়া গেল। অনুতা, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি এবং রায়বাহাদুরের কন্যা। লেখা পড়ায়, নাচে গানে, আধুনিকতায় অতুলনীয়া। পাত্রী তারাশঙ্করের মনোমত। সুতরাং উপলক্ষের বিশেষ কিছু বাকী রহিল না। কেবল দু হাত এক হইতে বিলম্ব যা। এমন সময় গোল বাধিল। রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা এবং পিতামাতার কাছে থাকিয়াই লালিত পালিত হইতেছে। কথাটা যে কোন কারণেই হ'ক, এতদিন তারাশঙ্করের কানে যায় নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনিল, সেই মুহূর্তেই মায়ের কাছে গিয়া জিদ ধরিল, ওখানে আমি বিয়ে করব না মা।

—কেন রে? মা শঙ্কিত মুখে তাকান পুত্রের দিকে।

—না মা বিয়ে এখন থাক। আমার ইচ্ছে নেই।

—সে কি? ইচ্ছে নেই বললেই ত হয় না বাবা সব যে ঠিক। দিনক্ষণ, এমন কি লগ্নটি পর্যন্ত।

—তা হ'ক মা। এ বিয়ে বন্ধ করে দাও।

—করতে হয় তুই কর। আমার দ্বারা হবে না। মা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু তারাশঙ্কর গোঁ বজায় রাখিল। রায়বাহাদুরের বাড়ীতে সে বিবাহ করিল না।

কথা রাখিতে পারিলেন না বলিয়া পিতা লজ্জিত হইলেন, মা মুখ অন্ধকার করিয়া বসিলেন।

রায়বাহাদুরের কন্যা, পাওনার দিক দিয়া ত বটেই, মানের দিক দিয়াও অনেকখানি সম্মানিত হইতেন তাঁহারা। পুত্রের নির্বুদ্ধিতায় পণ্ড হইল সব।

দিন যেমন কাটা উচিত তেমনই কাটিতেছিল। এমনি সময় অকস্মাৎ আর এক দুর্বিপাক দেখা দিল। বার এবং তিথির যোগাযোগে গ্রহরাজের কক্ষে কয়েকটি প্রধান প্রধান গ্রহের আবির্ভাবে পার্থিব জগতে বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। কলিযুগে মর্ত্তলোকে ইতিপূর্বে এতবড় যোগ নাকি আর সংঘটিত হয় নাই। বিগত যুগে অর্থাৎ দ্বাপরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন আরোহণের অনতিপূর্বে ইহারা একবার এই ভাবে মিলিত হইয়াছিল বটে কিন্তু তারপর কত শত শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে, এইসব মহারথীদের একত্রে মর্ত্তবাসীদের দর্শন দানে সময় এবং সুবিধা কোনটাই হয় নাই। সুতরাং এখন যদি হইয়াছে, মর্ত্তবাসীরাই বা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিবে কেন? অতএব পবিত্র গঙ্গোদককে পার্থিব পাপের ভার লাঘব করিবার একটা প্রতিযোগিতা পুণ্যার্থীদের মধ্যে বেশ সতেজে চলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে আত্মীয়দের বাড়ীতে চড়াও হইয়া তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া গঙ্গানীড়ে পাপ বিসর্জন দিবার বাসনা দূর প্রবাসীদিগকেও সক্রিয় করিয়া তুলিল। যাহাদের আত্মায় ছিল, তাহারা পাপ বিনাশন ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইল। যাহাদের ছিল না তাহারা অপরের সহিত মিতালী পাতাইবার ফিকির খুঁজিতে লাগিল। তারাশঙ্করের মাসিমাকে ফিকির খুঁজিতে হইল না, তিনি শুধু ভগ্নীকে নিজের সাধু সংকল্প জানাইয়া ক্ষান্ত হইলেন। সেই সঙ্গে আর একটু জানাইলেন, যে পুণ্যার্থীনীদের সংখ্যা নগণ্য না হইলেও, কুটুম বাড়ীতে অথবা ভিড় বাড়াইবার পক্ষপাতী তিনি নন। তবে একান্তই যাহারা অপরিহার্য তাহাদের সমভিব্যাহারে নির্দিষ্ট দিনের পূর্বাহ্নেই তিনি ভগ্নীর বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করিবেন। এ বিষয়ে তাহারা যেন নিশ্চিন্ত থাকেন।

চিঠিখানা পড়িল তারাশঙ্করের হাতে। সে হিসাব করিয়া দেখিল অতিথিদের সংখ্যা কম করিয়াও জন দশেক হইবে। সকলেই যে তাহার পরিচিত তাহা নয়, তবে যে বেশী পরিচিত সে শৈলা—মাসীমার ননদের বড় মেয়ে। শৈলা বিধবা। তারাশঙ্করের মনে পড়ে, শৈলা যখন কুমারী এবং নিজেও সে যখন অবিবাহিত তখন দুজনকে কেন্দ্র করিয়া মাসীমার দয়ায় একটা অস্ফুট গুঞ্জরণ এ বাড়ীতে জমিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু কি একটা কারণে তাহা মিলাইয়া গেল। তারপর বিবাহিত শৈলার আগমন তাহাদের বাড়ীতে একাধিকবার ঘটিয়াছে; তাহারা সরলভাবে মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা করিয়াছে, কোথাও ব্যতিক্রম দেখা দেয় নাই; ব্যতিক্রম দেখা দিল শুধু আজ। কুমারী বা সধবা শৈলা তাহার ভীতিস্থল ছিল না, কিন্তু বিধবা শৈলা তাহার হৃদ্‌কম্পের সৃষ্টি করিল। মাসীমাকে নিষেধ করা যায় না, সেটা শোভনীয় নয়। শোভনীয় হয় শুধু কোন অছিলায় নিজেকে আড়ালে রাখা। এ ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি হইল না। তারাশঙ্করের বন্ধু বাড়গ্রামের মুন্সেফ। তাহার ছেলের অন্নপ্রাশন। বাড়গ্রাম হইতে 'তার' আসিল তাহার নামে। তারাশঙ্কর কয়েকদিনের ছুটি লইয়া রওনা হইল বাড়গ্রামের দিকে। ঠিক যে সময় শৈলাদের গাড়ী আসিয়া থামিল তারাশঙ্করদের বাড়ীর দরজায়, সেই সময়ে তাহার ট্রেন ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে রওনা হইয়া গেল বাড়গ্রামের উদ্দেশে। তারাশঙ্কর ফাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু এত করিয়াও গ্রহ কাটিল না। এক দিন সকাল হইতেই রায়বাহাদুর অকস্মাৎ বিশেষরূপে সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কন্যা অনিতার খুঁত যে কোনখানে, এবং খুঁত না থাকিলে কেন যে তারাশঙ্কর এ বিবাহে অরাজি; এ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং আসিয়া গবেষণা জুড়িয়া দিলেন তারাশঙ্করের পিতার সঙ্গে। পিতার ভাবগতি বুঝিয়া তারাশঙ্কর প্রমাদ গণিল। কয়েকদিন পর একদিন অফিস হইতে ফিরিয়া

সে ঘোষণা করিল, জরুরী কাজে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে বদলী করিয়াছেন পূর্ববঙ্গের কোন এক জিলায়। অপ্রত্যাশিত সংবাদ। বাপ মায়ের মনে কতখানি বাজিল তা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু রায়বাহাদুর মুষড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার সব আশা নিরাশায় পরিণত হইল। বাপ মায়ের মুখ দিয়া একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ নির্গত হইল বটে, কিন্তু চাকরী! এখানে বাধ প্রতিবাদ শোভনীয় নয় বলিয়া সকলে চুপ করিয়া গেলেন। তারাশঙ্করও নির্দিষ্ট দিনে বাপ মায়ের আশীর্বাদ এবং পদধূলি একসঙ্গে মাথায় লইয়া দুর্গানাম জপিতে জপিতে কর্মস্থলে রওনা হইয়া গেল।

তারাশঙ্করের অদৃষ্ট ভাল, তাই বিদেশে বাড়ীখানা জুটিল ভাল। ছোটখাট বাংলো ক্যাসানের বাড়ী। এতদিন তালা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, আজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া নবশ্রী ধারণ করিল। তারাশঙ্করের চাকর অবিনাশ ঘরদোর পরিষ্কার করিয়া বেডিং খুলিয়া মনিবের জন্য বিছানা পাতিয়া দিল। তারপর মুখ ধুইবার জল এবং তোয়ালে গুছাইয়া রাখিয়া রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তারাশঙ্কর সত্য সত্যই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু বিপর্যয় কাও বাধিল বিকালের দিকে। অবিনাশ গিয়াছিল বাজারে। ফিরিল অনেক বিলম্বে মাথায় ব্যাণ্ডেজ লইয়া। ভয়ে তারাশঙ্করের মুখ শুকাইয়া উঠিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যেটুকু সে জানিল তাহার মর্ম দাঁড়াইল এই, কোন এক জিনিষের মূল্যকে কেন্দ্র করিয়া এই দুর্ঘটনার সূত্রপাত। দোকানী নিম্নশ্রেণীর এবং অসৎ প্রকৃতির লোক। ভদ্রলোকের সহিত ভদ্র ব্যবহারে অনভ্যস্ত। অর্দ্ধমূল্যের জিনিষকে সে বেচিতে চায় চারগুণ দামে। অবিনাশ নিরীহ লোক, কিন্তু কলিকাতার লোক। সুতরাং কোন জিনিষের কি মূল্য সব তাহার নখদর্পণে। তাই দাম লইয়া সুরু হইল বচসার। এবং তারই শেষ পরিণতি হইল হাতাহাতিতে। আগে ভাগে মহড়া লইয়াছিল বলিয়াই সর্বরক্ষে, সে একাই তিনজনকে ঘায়েল করিতে পারিয়াছে। তবে শত্রুরা সংখ্যায় একাধিক বলিয়া শেষ পর্যন্ত সে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইল। পিছন হইতে লৌহদণ্ডের আঘাতে সে ঘায়েল হইয়া পড়িল।

কাহিনী শুনিয়া তারাশঙ্করের শঙ্কা কমিল না। অবিনাশের শূন্য হাতে আস্ফালন যতই রোমাঞ্চকর হ'ক না কেন কথাটা বড় ভাল নয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ হাঙ্গামায় না পড়িতে হয়। তারাশঙ্কর থানায় একটা ডায়েরী করে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। কিন্তু থানায় যাইয়া যাহা শুনিল তাহাতে তাহার আক্কা খাঁচা ছাড়া হইবার উপক্রম করিল। প্রতিপক্ষেরা এতক্ষণ নিশ্চুপ থাকে নাই। যেলা সাক্ষীসাবুদ সহ তাহারা ইতিমধ্যেই বেশ ফলাও করিয়া অবিনাশের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ নালিশ ঠুকিয়া গিয়াছে। দোকানের মধ্যে চড়াও হইয়া অনধিকার প্রবেশ, রাহাজানি, মারামারি এমন কি ছুরি ছোরা চালান পর্যন্ত কোনটাই বাদ রাখে নাই! নালিশের মধ্যে কোথাও ফল নাই। সবদিক দিয়া আঁট ঘাট বাধিয়া পাকা বন্দোবস্তর সহিত একাজ করা হইয়াছে। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তারাশঙ্কর প্রমাদ গণিল। একজন পাকা উকিলের পরামর্শের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। উকীলেরও সন্ধান মিলিল। উকীল লোক ভাল। মামলার বিবরণ শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, দুশ্চিন্তার কথাই ত তারাশঙ্করবাবু। প্রথম দিনের সম্বর্দ্ধনা যদি এরকম হয়, বাকী দিনগুলি ত সবই রয়ে গেছে। সেগুলির সম্বর্দ্ধনা কেমন হবে তা ভাববার কথাই বটে। তবে আপনারা যত দূর ভাবছেন, ততটা নয়। এ একটা ব্যতিক্রম মাত্র। উকীল তারাশঙ্করের দুর্ভাবনা কাটিল না। বলিল, হতেও পারে। তবে আরও কয়েকদিন আপনাকে বিরক্ত করে যাব সুবোধবাবু। ঘটনার গতি কোনদিকে যায়, সেটাও আপনার জানা প্রয়োজন।

সুবোধবাবু তেমনি হাসিমুখেই বলিলেন, বিলক্ষণ, মাঝে মাঝে কেন, রোজই আসবেন আপনি, খুশি হব। বলছেন ত একা আছেন। সন্ধেটা না হয় এখানে এসেই কাটিয়ে যাবেন। গান বাজনার সখ একটু আছে। তারই আসর বসে সাঁঝে। এই নিয়েই আছি। নির্বান্ধব পুরী অপেক্ষা এটা আপনার পক্ষে মন্দ হবে না।

এ আমন্ত্রণ অনুপেক্ষণীয়। তারাশঙ্কর উপেক্ষা করে না। তৎক্ষণাৎ সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে জানায়, আসব বৈকি! নিশ্চয়ই আসব। আপনি যখন বলছেন, না বলব না। সময় পেলেই এসে বিরক্ত করে যাব।

—তাই যাবেন। আমি আরও খুশী হ'ব। আর মামলার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এসব কেসের পরমায়ু ঐ ডায়েরী পর্যন্ত। তার বেশী নয়।

সেদিনের পর হইতে সুবোধবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে তারাশঙ্করের বেশী সময় লাগিল না। সুবোধবাবু মিশুকে লোক আর তারাশঙ্কর একা তায় বড় চাকুরে, সুতরাং খাতির আছে। সুবোধবাবু গান বাজনার চর্চা করেন বটে কিন্তু যশ নাই। তারাশঙ্করের চর্চা নাই কিন্তু যশ আছে। গলায় সুর আছে আর তান লয়ে মাথা আছে। এদিক দিয়াও মিলিল ভাল। প্রবাসে নিঃসঙ্গ জীবন, সঙ্গ পাইলেই অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। এ দুজনের মধ্যেও অন্তরঙ্গতা জমিয়া উঠিল। বাড়ীতে তারাশঙ্কর যেটুকু থাকে, অবিনাশকে লইয়াই থাকে। বাড়ীর বাহিরে সুবোধবাবুর পরামর্শের প্রয়োজন হয়। এইভাবে বিদেশে তারাশঙ্করের দিনগুলি ভালয় মন্দয় একরকম কাটিতে লাগিল।

সেদিন কি একটা উৎসব উপলক্ষে ছুটি ছিল। সকাল থেকে সুবোধবাবুর বাড়ী যাই যাই করিয়াও তারাশঙ্করের যাওয়া হয় নাই। বৈকালের দিকে সেই উদ্দেশ্যে সকাল সকাল বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরের ঘরে সুবোধবাবুর গলা পাওয়া গেল। কাহার সহিত কি একটা বিতর্কমূলক আলোচনায় ব্যাপৃত! প্রতিপক্ষের গলা না পাওয়াতে তারাশঙ্কর বুঝিল সওয়াল করিতেছেন সুবোধবাবু। তাই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া একটু দ্রুতপদে ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে সে সহাস্যমুখে কহিল, নমস্কার, আসতে পারি—। কিন্তু শেষের কথাটি গলার মধ্যে আটকাইয়া গেল। বাহির হইল না। সামনেই একটি মেয়ে বসিয়া হাসিমুখে সুবোধবাবুর কথা শুনিতেছিল। তাহার সহিত চোখাচোখি হইতেই তারাশঙ্কর থমকাইয়া পড়িল। মেয়েটিও অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল।

সুবোধবাবু ফিরিয়া দেখিলেন। সাদর আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, এস তারাশঙ্কর, এস। তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। ভাগ্যবান পুরুষ বটে তুমি। আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তারাশঙ্কর বুঝিল না কিছুই। শুধু অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সুবোধবাবু বলিয়া চলিলেন, কত মধুসংক্রান্তির ব্রতই না তুমি করেছিলে ভায়া, তাত জানাওনি কোনদিন। তাই না কণ্ঠে তোমার এত মধু। প্রমীলার মুখে তোমার সুখ্যাতি আর ধরে না। বলে, গলা বলতে হয় ত তারাশঙ্করবাবুর। অমন গলা না হ'লে কি গান গাওয়া সাজে, না মানায়। অর্থাৎ যেহেতু আমার কণ্ঠস্বর ওর কানে মধুবর্ষী নয়, সেই হেতু আমার গলা গলাই নয়। বোঝাতে চাইলুম, গলা ভগবানের দান। তার ওপর যখন হাত নেই কারও তখন গান গাইব না কেন। ক্ষতি কি? বলে, ক্ষতি নয়, অপরাধ। পরের শান্তিভঙ্গ জনিত অপরাধ। সুতরাং এ অপরাধের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। শুনে পর্যন্ত ভায়া কি যে অস্বস্তি বোধ করছি মনে মনে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গান গাওয়া অপরাধ? তুমিই বল, এ আমার অপরাধ, না দেবী প্রমীলার নিছক পরশ্রীকাতরতা।

তারাশঙ্কর মহা বিব্রত বোধ করে। এ মেয়েটি যে কে, সে জানে না। ইতিপূর্বে চাক্ষুষ দেখেও নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে কি যে মন্তব্য করা উচিত বুঝিতে না পারিয়া সে পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

সুবোধবাবু তাড়া দিলেন, নিজের সুখ্যাতি শুনে তুমিও যে বোবা হয়ে গেলে দেখছি। এ সব তোমাদের ষড়যন্ত্র।

তারাশঙ্কর হাসিমুখে বলে, আইনজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে বে-আইনীর প্রশ্রয় দিচ্ছেন সুবোধবাবু। ষড়যন্ত্র করবার সময় দিলেন কোথায় যে ষড়যন্ত্র করব। গান গাইলে অপরের যদি শান্তিভঙ্গ হয়, আইন আর বে-আইন ত আপনাদের হাতের মধ্যে। আইনে না পেলে সব অপরাধ খণ্ডন করে নেবেন। তাব'লে গান গাইবেন না অপরাধের ভয়ে! বলিতে বলিতে তারাশঙ্কর থামিয়া গেল। দেখিল মেয়েটি নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহার মুখটি অপর দিকে ফিরান ছিল বলিয়া সে সঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু কেমন যেন খট্‌কা লাগিল যে মেয়েটি হাসি গোপন করিবার জন্যই মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে।

সুবোধবাবু বসিয়াছিলেন এদিকে মুখ করিয়া, তাই প্রমীলার নিঃশব্দ প্রস্থান জানিতে পারেন নাই। তারাশঙ্করের মন্তব্য শুনিয়া উল্লাসভরে কহিলেন, শুনলে ত প্রমীলা। এর ওপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। গান গাইবার অধিকার সকলেরই আছে তা সে তোমার মত কিম্বরকণ্ঠি হ'ক বা না হ'ক। বলিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন, প্রমীলা দরজা দিয়া অন্তর্হিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর আর এক পর্দায় চড়াইয়া কহিলেন, রাগ করে যাও কেন ছোট গিন্নী। বাকীটুকু শুনে যাও। বলিতে বলিতে নিজেই প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উঠিলেন।

তারাশঙ্কর কিছু না বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল। সুবোধবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমার বৌদিদির ছোট বোন, প্রমীলা। কলকাতায় বি, এ, পড়ে। ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। ছুটি হ'লে প্রায় এখানে এসে দিদির কাছে দিনকতক কাটিয়ে যায়। নিজের শালী বলে বলছি না, ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে।

তারাশঙ্কর সহাস্যমুখে বলে, আপনি ভাগ্যবান। শুধু গুণবতী শালীর ভগ্নিপতি বলে নয়—।

—তারই ভগ্নীর পতি বলে, এইটাই বলতে চাইছ ত? কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেল যে। শুনি সাত বছরে ন্যাংড়া আমও নাকি টক হয়ে যায়। এত সাত দুগুণে চোদ্দ। বলিয়া নিজেই জোর করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ইদানীং সুবোধবাবুর সান্ধ্য মজলিসের আসর বেশ খানিকটা ফাঁকা হইয়া আসিল। যাহারা আসিতেন, শীতের আকস্মিক প্রকোপে তাহারাও হাজিরায় কৃপণতা আরম্ভ করিলেন। শেষে অবস্থা দাঁড়াইল এমনই যে তারাশঙ্কর ব্যতীত সে মজলিসে আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সাংসারিক মানুষ সকলেই। মজলিসে না আসিলেও তাহাদের সন্ধ্যা কাটিয়া যাইত। কাটিত না শুধু তারাশঙ্করের। সারা দিনের পরিশ্রমের পর অবিনাশের সাহচর্যে সন্ধ্যা কাটান যায় না। মারামারি আর করে নাই বটে, কিন্তু নেহাত শান্তিতেও দিন অতিবাহিত হইতে দেয় না। আশ পাশের সহিত কলহ তাহার লাগিয়াই আছে। বাড়ী থাকিলে এর মধুর রেশ মাঝে মাঝে তারাশঙ্করকে শুনিতে হয়। অভিযোগ যা আসে সেগুলি সে যথাসাধ্য এড়াইয়া যায়। এই গোঁয়ার অনুচরটি পাছে তাহার সামনে আরও কিছু দুঃসাহসিকতা করিয়া বসে, এই ভয়ে সে বাড়ীতে থাকিবার যেমন যথাসাধ্য কমাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাটা সে কিছুতেই সে বাড়ীতে বন্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাই সুবোধবাবুর মজলিসে তাহার উপস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটে না বলিলেও চলে।

সেদিনও এই মজলিসের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া তারাশঙ্কর যখন সুবোধবাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে বাড়ীর দরজার সামনে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘর বন্ধ। এমন কি আলো পর্যন্ত জ্বলে না। ইতস্তত: করিতেছিল। এমন সময় দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল সুবোধবাবুর ছোট ছেলে অমলের পশ্চাতে প্রমীলা। অমলকে মাঝে রাখিয়া প্রমীলাই কথা কহিল, মজেলের এক জরুরী তার পেয়ে দুপুরের গাড়ীতেই বরিশালের দিকে রওনা হয়ে গেছেন মুখুজ্জে মশাই। ফিরতে হয় ত দু চার দিন দেরী হতে পারে তাঁর। এমন একটু ফুরসৎ পেলেন না যে আপনাকে একটা খবর দিয়ে যান। কিন্তু অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছে আপনাকে—প্রমীলা থামে।

—বলুন, কি অনুরোধ তাঁর। তারাশঙ্কর প্রশ্ন করে একটু আগ্রহের সহিত।

—মুখুজ্জে মশায়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আপনার অনুপস্থিতির অজুহাত অকস্মাৎ যেন দেখা না দেয়।

তারাশঙ্কর স্বভাবতঃই লাজুক মানুষ। লজ্জিত কণ্ঠেই কহিল, না, না তা হবে কেন। আসব বই কি। নিশ্চয়ই আসব।

প্রমীলা আবার বলিল, দিদি আর আমি, দুজনেই মেয়ে মানুষ। পুরুষ বলতে বাড়ীতে আর কেউ নেই। চাকর আর এই ছোট ছেলের ভরসা। এমন কিছুই নয়। তাই মুখুজ্জে মশাই আপনার ওপর অনেকখানি ভরসা রেখেই রওনা হয়েছেন। দিদিও এই কথাই বলছিলেন।

তারাশঙ্কর এতক্ষণ নত দৃষ্টিতে কথা কহিতেছিল। এখনও সেই ভাবেই বলিল, এ ভরসার মর্যাদা রাখবার চেষ্টা আমি যথাসাধ্য করব। দিদিকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলবেন।

প্রমীলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, দিদিরও বিশ্বাস তাই। তবুও তিনি বলে পাঠালেন, অসুবিধে যদি না হয়, সময় হ'লে এক একবার এসে এখানকার খোঁজ-খবর নিয়ে যাবেন।

তারাশঙ্কর মুখ তুলিল। প্রমীলার দিকে তাকাইয়া কহিল, আপনার দিদি আমার বৌদি হ'ন। তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবেন, আমার আসার কোন ব্যতিক্রম হ'বে না। যেমন নিয়মিত ভাবে আসি তেমনই আসব। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে, যতটুকু আপনাদের কাজে আসতে পারি, সেই চেষ্টাই করব। সুবোধবাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত, এ দায়িত্ব আমি সানন্দেই গ্রহণ করলুম। প্রমীলা ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিল, দিদিকে এ কথা আমি বলব। শুনে খুবই নিশ্চিন্ত হবেন তিনি। কিন্তু আপনাকে এ ভাবে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে গল্প করছি শুনলে, দিদি সত্যি রাগ করবেন। আপনি ঘরের ভেতর এসে বসুন, চাকরটাকে পাঠিয়ে দি জানালাগুলো খুলে দিক। আবার সেটাও হয়েছে তেমনি, একেবারে ফাঁকিবাজ। বাবু নেই ত তারও টিকি দেখবার জো নেই।

তারাশঙ্কর সায় দিয়া বলিল, এ নিয়ম সর্বত্রই। যতক্ষণ জোয়াল কাঁধে থাকে ততক্ষণ কাজি, জোয়াল সরে গেলেই পাজি।

প্রমীলা হাসে। তারপরই বলে, আপনার অসুবিধে হবে খুব। কিন্তু সেটুকু কষ্ট না করা ছাড়া উপায় কিছু নেই। পরের উপকার করতে গেলে নিজের অপকার সইতে হয়।

—তা সইব। এ আর এমনই বা কি। আর তা ছাড়া বাড়ীতে আমার করবারও ত কিছু নেই।

প্রমীলা সে কথায় কান দিল না। অমলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কাকাবাবুকে ঘরে নিয়ে

বসাও অমল, আমি হিরুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি। ঘরখানা পরিষ্কার করে দিয়ে থাক সে। বলিতে বলিতে সে বাড়ীর ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমীলা ফিরিল চা এবং জলখাবার লইয়া। তারাশঙ্কর অমলের সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। প্রমীলাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, বলে গেলেন পাঠিয়ে দিচ্ছেন হীরুকে। কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে এলেন চা। এ পর্যন্ত না হয় বরদাস্ত করা গেল কোনমতে। কিন্তু তার সঙ্গে উপাদান যা নিয়ে এসেছেন, সেইটাই দেখছি মুখ্য। তার কাছে চা-টা গৌণ।

প্রমীলা চা এবং জলখাবার নামাইয়া রাখিয়া কহিল, আপনার মত এ বাড়ীতে আমিও একজন অতিথি। কোনটা মুখ্য আর কোনটা গৌণ সে খবর আমার জানা নেই। বলেন ত দিদিকে না হয় একবার জিজ্ঞাসা করে আসি। বলিয়া সে ডিসগুলি নামাইয়া রাখিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারাশঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, থাক এর মধ্যে দিদিকে এনে কাজ নেই। তাঁরা গুরুজন। তাঁদের অসম্মান না করাই উচিত। আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সব। বলিয়া জলখাবারের থালাখানি টানিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল।

প্রমীলা দাঁড়াইয়াছিল। অমলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, কাকাবাবুর সঙ্গে গল্প কর অমল। দিদি বোধ হয় ডাকছেন আমায়, দেখে আসি। বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে দিন রাত হইল অনেক। স্বাভাবিক সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তারাশঙ্কর উঠিতে পারিল না। প্রমীলা 'আসি' বলিয়া সেই যে গিয়াছে, এখনও তাহার দেখা নাই। অথচ কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাওয়াটাও ভদ্রতা বিরুদ্ধ বলিয়া তারাশঙ্কর যাইতেও পারে নাই। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া যাইবার জন্য যখন সে সত্য সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল, সেই সময় প্রমীলাকে দ্বার প্রান্তে দেখা গেল। তারাশঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, রাত হয়ে গেল অনেক। দিদি বললেন, রাতের খাওয়াটা এইখানে সেরে গেলে তিনি খুশি হবেন।

তারাশঙ্কর বলিল, দিদির স্নেহ অপরিসীম। কিন্তু তারই সুযোগ নিয়ে অহেতুক উৎপাত করাটাও অন্যায়। তাঁর ওপর আমার চাকর ব্যাটা হয়েছে হাঁদা গঙ্গারাম। আর একটু রাত হলে হয় ত পুলিশেই খবর দিয়ে বসবে। অতদূর গড়াতে দেওয়া হবে না। বরঞ্চ যতটুকু পারি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরি।

প্রমীলা সহাস্যে কহিল, চাকরটি আপনার লোক ভাল। প্রভুর মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি সজাগ। এর পর আর অনুরোধ করা যায় না। দিদিকে এই কথাই বলি গিয়ে।

—তাই বলুন। আরও বলবেন, বয়সে তিনি আমার ছোট হলেও মানে বড়। খাওয়াতে যখন চেয়েছেন তখন খাব নিশ্চয়ই এবং আনন্দ করেই খাব। তবে আজ নয়, আর একদিন। সুবোধবাবু ফিরে আসুন।

প্রমীলা ঘাড় নাড়িল, বেশ দিদিকে বলব আমি।

—বলবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

—নমস্কার। প্রমীলা দরজা পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, দিদির কথা মনে থাকবে ত? সুবিধে পেলেই এদিকে আসবেন।

—আসব। নিশ্চয়ই আসব। বলিতে বলিতে তারাশঙ্কর রাস্তার উপর নামিয়া পড়িল।

পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগেই তারাশঙ্কর সুবোধবাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরের ঘর আজ আর অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। পূর্ব দিনের মতই সেখানে আলো জ্বলিতেছিল আজও। বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল অমল। তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে বসাইয়া বলিল, চলে যাবেন না, মাসীমা বসতে বলে দিলেন।

তারাশঙ্কর সহাস্য মুখে প্রশ্ন করিল, কিন্তু আমি যে এসেছি, তুমি জানলে কি করে অমল।

অমল বলিল, বারে, আমি জানব কেন। আমি ত খেলা করছিলুম ঘরে। মাসীমা ছাদ থেকে ছুটে নেমে এসে বললেন, তোমার কাকাবাবু আসছেন অমল, তাকে ঘরে নিয়ে বসাও লক্ষ্মী ছেলেটি আমার।

শুনিয়া তারাশঙ্কর চমৎকৃত হইল। মন আপনা হইতেই খুশিতে ভরিয়া উঠিল। প্রমীলার দৃষ্টি যে সজাগ এবং সেই জাগ্রত দৃষ্টির একটা অংশও যে তাহার আগমন আশার অপেক্ষা করিয়া আছে, এইটাই ত তাহাকে আনন্দ দিল। তারাশঙ্করের প্রশ্ন তখনও শেষ হয় নাই, বালককে কি একটা জিজ্ঞাসা করিতেছিল, এমন সময়ে ঘরের বাহিরে কি একটা শব্দ শুনিয়া বালক চকিত হইয়া বলিল, আমায় ডাকছেন। আপনি বসুন, আমি শুনে আসছি। বলিতে বলিতে সে চঞ্চল পদে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর অমল ফিরিল বটে, কিন্তু সঙ্গে করিয়া আনিল বাড়ীর চাকর ছোকরাকে। ছোট চা এবং জলখাবার সাজাইয়া দিল টেবিলের উপর। প্রতিবাদ নিষ্ফল জানিয়া তারাশঙ্কর প্রতিবাদ করিল না। শুধু চেয়ারখানি টেবিলের দিকে আর একটু টানিয়া লইয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে অমলের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। শিশু এবং বালকদের সহিত গল্প করিবার একটা পদ্ধতি আছে। যারা এ পদ্ধতির সহিত পরিচিত তারা পারগ, যারা নয়, তারা অপারগ। তারাশঙ্কর এই শেষোক্ত দলের। সুতরাং সে সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

প্রমীলার আজ দেখা নাই। অথচ এ মেয়েটিকেই তারাশঙ্কর খুঁজিয়া ফিরিতেছিল মনে মনে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহার দেখা পাওয়া গেল না, তখন বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ মনেই সে উঠিয়া পড়িল।

অমল যে কখন নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়াছিল, তারাশঙ্কর টের পায় নাই। এখন সে পাশের ঘরটা দিয়া আসিয়া বলিল, মাসীমা আসছেন এখুনি। আপনি আর একটু বসুন। কথাগুলি বালক এক নিশ্বাসে এমনিভাবে বলিল যেন মুখস্থ করিয়া আসিয়াছে।

তারাশঙ্কর ফিরিল। দেখিল অমলের পিছনেই প্রমীলা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখাচোখি হইতেই সে দু'পা আগাইয়া আসিয়া তারাশঙ্করকে নমস্কার করিয়া হাসিমুখে কহিল, ওখান থেকে সময় করে উঠতে পারিনি একটুও। অমলের মুখে শুনলুম আপনি চলে যাচ্ছেন। শুনে দেখা করতে এলুম। এ আমাদেরই লজ্জার কথা। একজন মানুষকে একা একা এতক্ষণ বসিয়ে রাখা উচিত হয়নি। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে আপনার এভাবে মুখ বুজে চুপচাপ বসে থাকতে।

তারাশঙ্করের মুখে হাসি দেখা দিল। বলল, মিথ্যে বলিব না। অসুবিধে যে একদম হয়নি তা নয়। তবে সেটুকু মানিয়ে নিতে হবে, অন্ততঃ এ কটা দিনের জন্যে।

প্রমীলা বলিল, দিদি এই কথা বলেই রাগ করছিলেন।

—দিদিকে রাগ করতে বারণ করবেন। এ এমন কিছু অসহনীয় নয়।

প্রমীলা স্মিতমুখে বলিল, দিদিকে বলব যে এরকম সজা আপনার অভ্যাস আছে। কিন্তু এত সকালে অবিনাশকে কেন পাঠিয়েছিলেন বলুন ত?

প্রশ্নের মধ্যে খোঁচা নাই। অত্যন্ত সরল প্রশ্ন। তবুও তারাশঙ্কর বিব্রত বোধ করিল। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে বাধিয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র অবিনাশই দিতে পারে। তবে আমার যেটুকু জানা আছে সেইটাই বলি। সকালে বাজারে যাচ্ছিল অবিনাশ। বললুম, সময় যদি পাও ফেরবার পথে সুবোধ বাবুর বাড়ীটাও একবার ঘুরে এস। তবুও খবর একটা পাব, যদি কিছুর প্রয়োজন থাকে। কিন্তু ও কাজ করল উল্টো। দুটি কাজের একটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অপরটাকে গৌণ করে বসল। সুতরাং বাড়ী যখন ফিরল তখন শূন্যগর্ভ বাজারের থলি, শূন্যই রয়ে গেল। প্রশ্ন করে উত্তর পেলুম, দোষ সম্পূর্ণ আমার। একটা লোক দিয়ে হাজার রকম কাজ একসঙ্গে হয় না।

প্রমীলা গালে হাত দিয়া গভীর বিস্ময়ের সুরে কহিল, বেশুন, কাণ্ডকারখানা একবার। সকালটা তা হলে উপবাসেই গিয়েছে বলুন?

তারাশঙ্কর বলিল, একে উপবাস আদি বলি না। বেশী পরিশ্রম বাঁচিয়ে যতখানি সাধ্য তার সে করে দিয়েছে।

প্রমীলা তেমনি বিস্ময়ের ভঙ্গীতেই বলিল, পরিশ্রম বাঁচিয়ে যা করে দিয়েছে সে, তা ত বুঝতেই পাচ্ছি। একে ত এখান থেকেই গেছে সে বেলা করে, তার ওপর বাজার করে নিয়ে যায় নি। কি দিয়ে যে খেয়ে গেছেন, ভগবানই জানেন। প্রমীলা গভীর দৃষ্টি তারাশঙ্করের মুখের উপর মেলিয়া থামিল। তারপর আবার বলিল, অবিনাশের মুখে যা শুনলুম তাতে বুঝলুম, সেই ত আপনার 'কথাইও ছাও' অর্থাৎ একেবারে চাকর বাবুন দুই। এমন লোককে এভাবে ছেড়ে দেন কেন?

তারাশঙ্কর একটুখানি হাসে। বলে, ছেড়ে দেওয়া না দেওয়া আমার ওপর নির্ভর করে না। এ তার খুশি। বাজার সে করে, ইচ্ছা করে অথবা অনুগ্রহ করে, এ আমি জানি না। তবে এক্ষেত্রে ভাবলুম সেই বাজারে যখন যাচ্ছে, তখন এ বাড়ীর খবরটাও নিয়ে আসুক একবার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে।

প্রমীলা কহিল, বিলক্ষণ! প্রয়োজন যদি থাকত, কাল রাতেই জানাতে পারতেন সে কথা। আর মুখুজ্জে মশাই যখন বলে গেছেন, তখন অহেতুক লজ্জা করে গোপন করতে যাব কেন। আর গোপন করলেই চলবে কি ক'রে, যখন দ্বিতীয় কোন অভিভাবক এখানে নেই। তাই বলছিলুম অনর্থক সাত সকালে ওকে আর পাঠাবেন না এখানে। তাতে আপনার সুবিধের চাইতে অসুবিধেই হবে বেশী। খাওয়া হবে না, অফিসেরও দেরী হবে মিছিমিছি। আজ দেরী হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।

তারাশঙ্কর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, হ'লই বা দেরী একটু। আর এর জন্যে সব দোষটা অবিনাশের নয়। আমারও আছে। আমার হুকুমেই সে এসেছিল এখানে।

প্রমীলা বলিল, এমন হুকুম আর দেবেন না।

—কেন? তারাশঙ্কর প্রশ্ন করিল আশ্চর্যে।

—নিজের অনিষ্ট করে পরের ইষ্ট করতে যাওয়াটা বোকামি।

তারাশঙ্কর হাসিয়া উঠিল, ঠিক তাই। অথচ এমন বোকা লোকও আছে।

প্রমীলা গম্ভীর মুখে বলিল, তা আছে। সেইজন্যে আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে এত বড় বোকামি আর করবেন না।

তারাশঙ্কর কহিল, নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি কোন দিন করি আপনাকে ডাক দিব আমার সাবধান করে দেবার জন্যে।

—তাই দেবেন। কিন্তু আর দেরী করবেন না। যা প্রভুভক্ত ভৃত্য আপনার, হয় ত খানায় খবর দিয়ে বসে আছে এতক্ষণ।

তারাশঙ্কর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার প্রাণ খোলা হাসিতে ঘরের দরজা জানলা-গুলিতে পর্যন্ত কাঁপন ধরিল। বলিল, কিছুই অসম্ভব নয় তার পক্ষে। কিন্তু এত বড় সুযোগ তাকে দেব না। তার আগেই বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হব আমি! আচ্ছা, আসি তা হলে।

—আসুন।

তারাশঙ্কর পথে নামিয়া পড়িল। আর প্রমীলা সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! তার অনেকক্ষণ পর আপন মনে দরজা বন্ধ করিয়া বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

দিন দুয়েক পর। অফিসের বড় সাহেব সরকারী খেতাব পাইয়াছে বলিয়া সেদিন সকাল সকাল ছুটি হইয়া গেল। সুবোধ বাবুর বাড়ীর খবরাখবর করা এখন তারাশঙ্করের নিত্যনৈমিত্তের ব্যাপার। আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। বাহিরের ঘরে উদ্‌গ্রীব মুখে দাঁড়াইয়াছিল প্রমীলা। তারাশঙ্করকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া কহিল, বাঁচলুম। কি মুস্কিলেই না পড়েছি। হীরুকে পাঠিয়েছি আপনার বাড়ীতে খবরটা দিতে। শুনেছেন নিশ্চয় তার কাছে? তারাশঙ্কর বিস্মিত হইল। মাথা নাড়িয়া কহিল, না ত। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন ত?

প্রমীলা কহিল, কাল রাত থেকে খোকনের জ্বর। আজ দুপুরের পর একেবারে বেহুঁশ। ডাক্তার চৌধুরীকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। দেখে ওষুধ দিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু এমন পোড়া দেশ যে ওষুধ মেলা ভার। চাকরটা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে ফিরে এল। উপায় না দেখে ওকেই পাঠালাম আপনাকে খবর দিতে।

তারাশঙ্কর দাঁত দিয়া বলিল, মুস্কিলের কথাই বটে। খবরটা সকালের দিকে পেলে এতখানি অসুবিধেয় পড়তে হত না আপনাদের।

—তা জানি। কিন্তু তখন ভাবতে পারি নি যে জ্বরটা এতখানি বাঁকা পথ নেবে। তাই অসময়ে খবর দিয়ে বিরক্ত করিনি।

—ভাল করেন নি। এতে বিরক্তির কিছু ছিল না। বরং অযথা ভোগ করতেন না এতখানি। ব্যবস্থা পত্রখানা দিন। চেষ্টা করে দেখি একবার। ব্যবস্থাপত্র প্রমীলার কাছেই ছিল। বাহির করিয়া দিতে বিলম্ব হইল না। তারাশঙ্করের প্রসারিত হাতের উপর সেখানা তুলিয়া দিয়া কহিল, আশ্চর্য! ওষুধ পাওয়া যায় না এ কেমন কথা।

তারাশঙ্কর ব্যবস্থা পত্রখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিল, ওষুধটা নতুন। হয়ত সব দোকানে এসে পৌঁছায়নি এখনও। যেখানে পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে, আমি জানি। নিশ্চিন্ত থাকুন, ওষুধ আমি নিয়ে আসছি এক্ষুনি। বলিয়া ব্যবস্থা-পত্র খানা পকেটে ফেলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই প্রমীলা বলিল, অফিস থেকে ফিরতে না ফিরতে এভাবে আপনাকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছি শুনলে দিদি রাগ করবেন।

দিদির কাছে কৈফিয়ৎ আমি দেব। রোগের চেয়ে বিশ্রাম কখনও বড় হ'তে পারে না।

ঘণ্টাখানেক পর তারাশঙ্কর যখন ওষুধ লইয়া ফিরিল, তখনও প্রমীলা দরজার নিকট দাঁড়াইয়া। তারাশঙ্করকে দেখিয়া তাহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং কৃতজ্ঞতায় দুটি চোখ ভরিয়া গেল। ভাগর চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর মেলিয়া ধরিয়া মিনতি ভরা কণ্ঠে কহিল, মস্ত উপকার করলেন আপনি।

তারাশঙ্কর বাধা দিয়া কহিল, তা করলুম। কিন্তু উপস্থিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যদি না করতে পারেন, ক্ষতি নেই। ধীরে সুস্থে আর একদিন না হয় করবেন। আপাততঃ খোকাকে ওষুধটা খাইয়ে আসুন। আমি না হয় ঘরে গিয়ে বসছি ততক্ষণ।

প্রমীলা দ্বিরুক্তি করিল না। তারাশঙ্করকে ঘরের মধ্যে বসিতে দিয়া ওষুধ লইয়া বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারাশঙ্কর তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিই অধিকার করিয়া বসিল। আজ অমল নাই। সুতরাং গল্প করিবার সঙ্গীও নাই। প্রমীলার সহিত গল্প করিবার মধুর লোভ ভিতরে ভিতরে যতখানিই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠুক না কেন, এ তাহাকে সংবরণ করিতে হইল। জ্বর বালকের পাশে যে মেয়েটি স্থান করিয়া লইয়াছে, গল্প করিবার লোভে তাহাকে সেখান হইতে টানিয়া আনা কোনমতেই শোভনীয় হইবে না। সুতরাং তারাশঙ্কর যেমন বসিয়াছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল। এ কয়দিনের মেলা মেশায় এ পরিবারের সহিত সঙ্কোচ তাহার অনেকখানি ঘুচিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ প্রমীলার দিক দিয়া যে সঙ্কোচ ছিল তাহা যে ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে এ কথা ভাবিয়া সে অনেকখানি আরাম বোধ করিল। আজকের ঘটনায় প্রমাণিত হইল প্রমীলা কতখানিই না নিঃশঙ্ক তাহার উপর। তারাশঙ্কর একটু নড়িয়া বসিল।

পরদিন।

সকাল বেলাই হীরু আসিয়া খবর দিয়া গেল, খোকা বাবু ভাল আছেন। মাসীমা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে সকাল বেলা তাড়াহুড়া করিয়া ওদিকে যাইবার তেমন কোন প্রয়োজন নাই। অফিস ফিরৎ যাইলেই চলিবে। মাসীমা সব ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবেন।

তারাশঙ্কর বুঝিল, প্রমীলার দৃষ্টি সজাগ। সকাল বেলা ওবাড়ী যাইলে পাছে অফিসের বিলম্ব হয়, খাওয়া দাওয়ার বিভ্রাট ঘটে, সেইজন্য আগে ভাগেই চাকর পাঠাইয়া খবর দিয়াছে। একটা অজ্ঞানিত আনন্দ তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়া গেল।

সে দিন সকাল থেকেই তারাশঙ্করের শরীরটা ভাল ছিল না। এক দিকে অফিসের কাজের অত্যধিক চাপ অপর দিকে অমলকে দেখিয়া রাত করিয়া বাড়ী ফেরা, দুইটাই শরীরের উপর বেশ একটা প্রতিক্রিয়া সুরু করিয়া দিয়াছিল। এ অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগা বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ গত রাত্রের ঠাণ্ডাটা যে বিলক্ষণ লাগিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অফিস হইতেই তারাশঙ্কর ফিরিয়াছিল ক্লান্ত হইয়া। সুবোধ বাবুর বাড়ীতে যাইয়া কখন যে সে চেয়ারে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিল এ সে জানিতে পারে নাই। ঘুম ভাঙ্গিল প্রমীলার ডাকে।

প্রমীলা বলিল, এসে দেখি ঘুমুচ্ছেন অকাতরে। একবার ভাবলুম, ডাকব না। ঘুম যখন ভাঙবে, উঠবেন। কিন্তু একটু একটু করে রাত হয়ে গেল অনেক। কিন্তু এর পর আর সাহস হ'ল না।

তারাশঙ্করের আলস্য তখনও ভাঙে নাই। একটা হাই তুলিয়া কহিল,—কারণ?

—কারণ আপনার কথাইও ছাওটিকে ভয় বেশী। যদি পুলিসে খবর দিয়ে বসে সে।

তারাশঙ্কর হাসিয়া উঠিল। বলিল, শুধু আমিই একা নয়, দেখছি, আপনিও তাকে ভয় করেন বিলক্ষণ।

প্রমীলা হাসি মুখে উত্তর দেয়, করি। আর সেই ভয়েই ত ডেকে দিতে হ'ল আপনাকে। তা না হ'লে ডাকতুম না ত কখন।

—তখন জব্দ হ'তেন আপনারাই। সারা রাত ঘুরতে হ'ত এই আনাড়ী লোকটিকে নিয়ে।

প্রমীলা মাথা নাড়ে। বলে, মনে হয়, না। সারা রাত কেটে যেত এমনি ভাবেই চেয়ারে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে। বিরক্ত করবার সুযোগ পেতেন কখন। কিন্তু বলিহারি আপনার ঘুমকে। ডাকছি কি এখন! ডেকে ডেকে গলা ধরে গেল তবুও সাড়া নেই। রাত্রে করেন কি?

তারাশঙ্কর লজ্জা পাইয়া বলে, রাত্রে ঘুমুই ঠিকই, তবে আজকের ঘুমটা ঠিক স্বাভাবিক ঘুম নয়। ক্লান্তির অবসাদ কখন যে নিঃশব্দে চোখ দুটির উপর স্তর করে বসেছিল জানতে পারিনি। তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অসময়ে। প্রমীলা কণেক চিন্তা করিয়া কহিল, বাড়ী না ফিরলে যদি উপায় থাকত, বলতাম আজকের রাতটুকু এইখানেই থেকে যান। এত রাতে বাইরে বেরিয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাজ নেই।

তারাশঙ্কর বলিল, পথ সামান্য। এ টুকু যেতে বিশেষ কষ্ট হবে না আমার। সে জন্যে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই আপনার।

প্রমীলা বলিল, হীরুকে পাঠিয়েছি গাড়ী ডাকতে। যদি পায়, কষ্ট হবে না বিশেষ। কিন্তু যা দেশ, পাওয়াই মুস্কিল।

প্রমীলার আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হইল। গাড়ী পাওয়া গেল না। অগত্যা তারাশঙ্করকে উঠিতে হইল এবং সেই শীতের রাত্রে আড়ষ্ট শরীরের উপর আরও এক পশলা ঠাণ্ডা লাগাইয়া অনেক রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরিল।

ফল হইল এই যে সকাল হইতেই তারাশঙ্করের শরীরটা বিকল হইয়া পড়িল। অফিস না যাইলে নয়, তাই তাহাকে যাইতে হইল। কিন্তু সকাল সকাল সে উঠিয়া পড়িল। ফিরিবার পথে সুবোধবাবুর বাড়ীর পথটা তাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল অত্যন্ত তীব্রভাবে। তাই এই পথ ঘুরিয়া তাহাকে আসিতে হইল।

আজও দরজা খুলিয়া দিল প্রমীলা। হীরু বাড়ী নেই। দু ঘণ্টার ছুটি নিয়ে সে গেছে কোথায়। সুতরাং বিধি পাঠিয়ে দিলেন অতিথি অভ্যর্থনার ভার দিয়ে।

তারাশঙ্কর খুশি হইল। খুশি মুখে বলিল, এমন অভ্যর্থনা সকলের ভাগ্যে জোটে না। হীরুকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রমীলা আরক্ত হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া কহিল, অভিনন্দনটা তাকেই জানাবেন। এলে, আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব তাকে।

—তাই দেবেন। আমি তাকে বুঝিয়ে দেব ছুটি নেওয়ার উপকারিতা।

—সে বুঝবে। এমন অভিনন্দন পেলে সে সারা বছর ছুটি নিয়ে বসে থাকবে, চাকরীতে আর যোগ দেবে না। বলিয়া সে একটা সলাজ কটাক্ষ, তারাশঙ্করের দিকে প্রেরণ করিল।

তারাশঙ্কর হাসিল। বলিল, আহা বেচারী। এমন দুর্মতি তার যেন কখনও না হয়, এ কথাটাও তাকে আমি বুঝিয়ে বলব।

—বেশ ত, ঘন ঘন অভিনন্দনের লোভে আখেরে যাতে সে দুঃখ না পায় এ উপদেশটাও তাকে দেবেন। কিন্তু আপনাকে আসল কথাটাই বলা হয়নি এখনও। মুখুজ্জে মশাই 'তার' করেছেন। ফিরছেন কাল বিকেলে।

তারাশঙ্কর উদ্ভাসিত হইয়া কহিল বাঁচলেন এবার। অনেক দুর্ভোগই ভোগ করতে হচ্ছিল আপনাদের, যার সমাধান পরের দ্বারা সম্ভবপর নয়।

প্রমীলা ভাল মানুষের মত কহিল, সেই কথাই হচ্ছিল দিদির সঙ্গে। বলছিলুম, রেহাই পেলেন আপনি। পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কি মুস্কিলেই না পড়েছিলেন এ ক'দিন।

তারাশঙ্কর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আমি ভগবান নই। তবে বোঝা যে ভাগ্যবানের আর কটা দিনের জন্য হলেও আমিই যে তার বাহন, এই কথা ভেবে ভারী খুশি হচ্ছি মনে মনে।

প্রমীলা মুখ ফিরাইয়া লইল। অপরের নিকট ধরা পড়িতে সে চায় না। সেই ভাবে থাকিয়াই সে বলিল, আপনার চা পাঠিয়ে দিই, বসুন একটু।

তারাশঙ্কর আপনার আসনে বসিয়া কহিল, তাই দিন। একটু কড়া করেই দেবেন। শরীরটা বিশেষ ভাল ঠেকছে না।

প্রমীলা ফিরিয়া দাঁড়াইল। উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিল, আবার ঠাণ্ডা লাগিয়েছেন বুঝি? জ্বর টর কিছু হয়নি ত?

—জ্বর? মনে হয় না। হলেও সামান্য। তবে জ্বরের চাইতে ঠাণ্ডার প্রকোপটাই বেশী।

—না হওয়াই ভাল। হলে এই বিদেশে বিভূঁইয়ে কি হ'বে বলুন ত? একা মানুষ। দেখবে শুনবে কে? ঐ ত কথাইও হাতের ছিরি। হয় ত ফেলেই পালাবে শেষ পর্যন্ত।

অবিনাশ সম্বন্ধে এতখানি বীতশ্রদ্ধ তারাশঙ্কর নয়। তবুও বলে, বিচিত্র নয়। তবে তার ওপর বিশেষ ভরসা আমি রাখি না। যদি প্রয়োজন হয়, খবর দেব এখানে। তারপর যা করবার করবেন আপনারা।

প্রমীলা মৃদু কণ্ঠে বলে, করব। ঈশ্বর না করুন, তেমন প্রয়োজন যদি কোনদিন হয়, আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। একটু থামিয়া আবার বলিল, এই সন্দেহ আমার হয়েছিল আপনাকে দেখে। আজ আর ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাজ নেই। সকাল সকাল বাড়ী ফিরে যান। চা আমি নিয়ে আসছি এখুনি।

প্রমীলার সন্দেহ অমূলক নয়। তারাশঙ্কর সত্য সত্যই জ্বরে পড়িল। পরদিন সারা সকালটা তাহার কাটিল জ্বরের ঘোরে। বিকালের দিকে জ্বরের তীব্রতা কমিল বটে, কিন্তু বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার প্রবৃত্তি হইল না। এমন কি সুবোধবাবুর বাড়ীর জন্য মনে মনে অনেকখানি উৎসুক থাকিলেও, সুবোধবাবু ফিরিলেন কি না এ খবরটুকুও লইতে পারিল না। সুতরাং বাসনার গতিবেগকে সাময়িকভাবে সংযত করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল। মনকে প্রবোধ দিল যে পরের দিন যাইয়া সে খবর লইয়া আসিবে। কিন্তু অদৃষ্টবাদ সাধিল। সে দিনও জ্বর ছাড়িল না। বরং তাপমান যন্ত্র সে দিন সকাল হইতে আরও বেশী সক্রিয় হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া তারাশঙ্কর হাল ছাড়িয়া শয্যাশ্রয় করিয়া রহিল।

জ্বরটা তারাশঙ্করকে বড় বেশী কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া এই কথাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় হীরু আসিয়া দেখা দিল। একখানা চিঠি তারাশঙ্করের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, মাসীমা বলে দিলেন এর উত্তর নিয়ে যেতে।

তারাশঙ্কর ব্যগ্র হাতে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। মাত্র দু ছত্রের চিঠি। সে রাত্রে জ্বর লইয়া তারাশঙ্কর বাড়ী ফিরিয়াছে, তারপর দু দিন দেখা নাই। এ অঞ্চলে সবাই চিন্তিত। শেষ ছত্রে হীরুর

হাতে একটি সংবাদ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। সই করিয়াছে প্রমীলা। মুক্তার মত সাজান লেখাগুলি ছাড়া লেখার মধ্যে আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। তবুও পড়িতে পড়িতে তারাশঙ্করের মন অশান্ত হইয়া উঠিল। দুই দিন যায় নাই বলিয়া প্রমীলা ব্যস্ত, তাহার জন্য চিন্তিত। ইহার বড় সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে। সে উঠিয়া বসিল। ঝিকে বলিল, তোমার মাসীমাকে বল, শরীরটা ভাল নয় বলেই এ কদিন যেতে পারিনি আমি। একটু সুস্থ হ'লেই দেখা করে আসব। তিনি যেন কিছু মনে না করেন।

তারাশঙ্করের দিনটা কাটিল কেমন যেন এক স্বপ্নের ভিতর দিয়া। প্রমীলা তাহার জন্য চিন্তিত। এইটাই তাহাকে বড় আনন্দ দিতেছিল। তাহার অসুস্থতার জন্য এই বিদেশে যে কেহ উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইতে পারে, জীবনে ইহা এক নূতন অনুভূতি। ইহাকেই সে বারবার নানাভাবে উপলব্ধি করিতে করিতে রাতটুকু কাটাইয়া দিল।

দুর্বল শরীরের ঘুম একটু বেলা করিয়াই ভাঙ্গিল। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। অথচ করিবারও কিছু নাই। সুতরাং তারাশঙ্কর শুইয়াছিল। এমন সময় অবিনাশ আসিয়া খবর দিয়া গেল, উকীল বাবু আসছেন। সঙ্গে আছেন মাসীমা।

অপ্রত্যাশিত সংবাদ। সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিবার পূর্বেই দেখিল, সত্য সত্যই সুবোধ বাবুর পিছনে প্রমীলা আসিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতেছে। কি যে করিবে তারাশঙ্কর ভাবিয়া উঠিবার পূর্বেই সুবোধ বাবু খাটের উপর আসিয়া বসিলেন। সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, আছ কেমন?

তারাশঙ্কর ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল, ভাল। তবে অসুখের চেয়ে দুর্বলতাই বেশী।

সুবোধবাবু বলিলেন, ফিরে এসেই খবর পেলুম ছোট গিন্নীর মুখে, খবর পেলুম, তুমি নাকি জ্বর নিয়েই ফিরেছ আমাদের বাড়ী থেকে। এ কথা তিনিই বুঝিয়ে দিলেন আমায়, যে মানুষ নিত্য এসে খবরা-খবর নিয়ে যান আমাদের, তিনি যখন একেবারেই আসছেন না, তখন অসুখটা সামান্য নাও হতে পারে। কালই আসছিলুম কিন্তু এমনি একটা কাজে জড়িয়ে গেলুম যে ছোট গিন্নীর খুব কম ক'রেও একশো বার তাগাদা সত্ত্বেও, একটিবার যে এসে খবরটা নিয়ে যাব, এমন সময় করে উঠতে পারলুম না। কিন্তু আজ আর ছাড়ান পেলুম না। সকাল না হতেই নিজেই সাজগোছ করে উপস্থিত। রাতে ঘুমিয়েছেন কি না উনিই জানেন। তাগাদা দিয়ে বললেন, অমলের অসুখে ভদ্রলোক করেছেন অনেক। বেশী রাত করে বাড়ী ফিরে ঠাণ্ডা লাগিয়ে নিজে অসুখে পড়েছেন। অতএব আমাদেরও কর্তব্য তাঁর একটা খবর নেওয়া।

জিজ্ঞাসা করলুম, এই আমাদের মধ্যে তুমিও পড় নাকি?

উত্তর হ'ল, 'না' যদি বলি, বেইমানী করা হ'বে। যিনির বার্তা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেতে হয়েছে তাঁর কাছে।

বুঝলুম, ওজর চলবে না। সুতরাং প্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে পড়লুম এক সঙ্গে। কি বল ছোট গিন্নী, ঠিক ঠিক বলেছি ত সব। বাদ পড়েনি ত কিছু? বলিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিমুখে প্রমীলার দিকে তাকাইলেন।

প্রমীলা এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। ক কুঁচকাইয়া বলিল, আঃ! মুখুজ্জে মশাই।

মুখুজ্জে মশাই হাসি মুখে চুপ করিয়া গেলেন।

তারাশঙ্কর কথা কহিল, এ আমার অভাবিত সৌভাগ্য। এ সৌভাগ্য লাভ করতে হ'লে যদি

আমাকে মাঝে মাঝে এ রকম অসুখে ভুগতে হয়, আমি একটুও দুঃখিত হব না। বলিয়া সুবোধ বাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া প্রমীলার দিকে তাকাইয়াই আবার সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বলিল, ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমার অকর্মণ্যতার ঋণ বাড়িয়ে তুলবেন না। আপনাদের অভ্যর্থনা করে নেবার মত যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু আমি অসুস্থ—অন্ততঃ তার খাতিরেও সব ত্রুটী মার্জনা করে নিজেকে মানিয়ে নিন এখানে।

প্রমীলা আকণ্ঠ আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, মেয়েমানুষের বসা দাঁড়া নিয়ে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। নিজেকে আমিই ঠিক মানিয়ে নিয়েছি।

সুবোধ বাবু বলিলেন, তুমি বসলে তারাশঙ্কর বাবু যদি খুশি হ'ন প্রমীলা, তাকে খুশি করাই তোমার উচিত। বিশেষতঃ তুমি যখন অতিথি তখন ব্যস্ত হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

অগত্যা প্রমীলাকে বসিতে হইল। সুবোধ বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিল, মানুষকে খুঁচিয়ে উত্যক্ত করাই আপনাদের স্বভাব। এ স্বভাব যাবে কবে?

—মরলে ছোট গিন্নী, মরলে। তার আগে নয়।

প্রমীলা সে কথায় কান না দিয়ে বলে, বাড়ীতে এ জিনে বেড়ালটি। দিদির সামনে মুখ দিয়ে রা'টুকু বেরয় না। যত উপদ্রব কি আমার বেলায়?

সুবোধবাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, একে উপদ্রব বলে না ছোট গিন্নী, বলে ভালবাসার নিদর্শন।

প্রমীলা আরক্তিম হইয়া কহিল, মুখে আগুন দিন মুখুজ্জে মশাই।

—এই যে দিই। কথায় আছে, ন্যাংড়া আম টক হ'তে সময় লাগে সাত বছর। আমাদের বিয়ে সাত ছেড়ে চোদ্দ বছর হয়ে গেছে। সুতরাং টকে ত' গেছেই, এবার কাঁবতে সুরু করেছে। এ সময় যদি টুকটুকে শিয়ারা-তুলির সন্ধান পাই, ন্যাংড়ার ওপর আর কি মোহ থাকে?

—বাড়ী গিয়ে দিদিকে এই কথাই বলব।

—বোলো। তবে আর একটু বোলো যে বড়র প্রতি যেটুকু অবিচার সে শুধু ছোটর মান বাড়াতে গিয়ে করে ফেলেছেন মুখুজ্জে মশাই।

প্রমীলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা বলব না। বলব মরা গাঙে জোয়ার এসেছে। এ জোয়ারের টান রোধ না করলে হাবুডুবু খেয়ে সারা হবেন ভদ্রলোক।

—বৃথা সন্দেহ ছোট গিন্নী। নতুন জোয়ার বলে তুমি ভয় পাচ্ছ। কিন্তু অমি তিলোত্তমে। মা ভৈঃ। একটু বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু বাবি পাকা। নৌকো বানচাল হতে দেব না কিছুতেই। প্রতাপ আর শৈবলিনীর কথা জান ত? তুমি যদি শৈ হও, তবে এস, আর একবার দেখিয়ে দি, এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার পাশে সাঁতার দিতে দিতে এ জোয়ারে উজান বাইতে পারি কিনা।

প্রমীলা বিপন্ন বোধ করিল। তাহাদের শালী ভগ্নীপতির মধ্যে এ ধরণের ঠাট্টা তামাসা লাগিয়াই থাকিত। কিন্তু সে ঘমিত না। বরং শাণিত উত্তর দিয়া সুবোধ বাবুকে প্রায়ই কোণঠাসা করিয়া ফেলিত। কিন্তু আজ তারাশঙ্করের সামনে সে সকল উত্তরের খেই হারাইয়া ফেলিতেছিল। উপযুক্ত উত্তর মুখে যোগাইতে ছিল না বলিয়া এক সময়ে সে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আর একটু সামাল দিন মুখুজ্জে মশাই। আপনার জঠরাগ্নি ক্রমশঃই যে সক্রিয় হয়ে উঠছে তার প্রমাণ পাচ্ছি। তাকে নিষ্ক্রিয় না করলে অগ্নুৎপাত করে আশে পাশে সকলকে দগ্ধে মারবেন। চুপ করে বসুন ত একটু। তারপর তারাশঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, অবিনাশকে ত দেখছি না কোথায় বলুন ত সে?

তারাশঙ্কর বলিল, রান্নাঘরে হয়ত পাচন সেদ্ধ করতে ব্যস্ত। আলিয়ে মারল আমায়। যেমন রান্না! এক একদিন কান্না পেয়ে যায় খেতে! ডেকে দেব তাকে?

—থাক। আমি খুঁজে নিতে পারব। বলিয়া সুবোধ বাবুর দিকে একটা কটাক্ষ হানিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। শুধু পিছন হইতে সুবোধবাবুর সুউচ্চ সরল হাসি তাহার দু'কানের ভিতর ধাক্কা মারিতে লাগিল।

নীচে রান্না ঘর। অবিনাশ চা করিতে ব্যস্ত। প্রমীলা ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিল, কি হচ্ছে অবিনাশ?

অবিনাশ হাসিল। হাসিলেই তাহার মাড়ি শুদ্ধ বড় বড় দাঁতগুলি অত্যন্ত বেমানান ভাবে বাহির হইয়া পড়িত। মুক্ত হস্ত হইয়াই সে কহিল, চা করছি মাসীমা। বাবু নাম দিয়েছেন পাচন সেদ্ধ। যত ভাল করেই করি না কেন, বাবুর মন পাবার যো নেই। গাদা গাদা চা দিই, পুরো আধ ঘণ্টা ধরে সেদ্ধ করি, তবুও মনের মত আর হয় না। এক চুমুক খেয়েছেন কি না খেয়েছেন, অমনি কাপ শুদ্ধ চা ফেলে উল্টে ফেলে। আর সেই সঙ্গে করবেন আমার মুণ্ডুপাত। হোটেলের মত চা কেমন করে হবে বলুন ত? যে চা করে তার মাইনে কত। দশ টাকায় কি চা করা, ভাত রান্না, বাজার করা সব হয়? আপনিই বলুন না মাসীমা?

মাসীমা বলিবে কি। চায়ের দিকে তাকাইয়া তাহার সর্বশরীর রি রি করিয়া উঠিল। বাস্তবিক চায়ের দুর্দশা দেখিয়া তাহার নিজেরই দুঃখ হইতেছিল। এ চা মানুষে মুখে দেয় কি করিয়া। চায়ের বর্ণ মসীকেও হার মানাইতেছে। চেহারা দেখিলে স্পর্শ করা দূরে থাক, মন আপনিই বিরূপ হইয়া উঠে।

প্রমীলা ঘরের ভিতর আর একটু সরিয়া আসিল। কহিল, বেশী চা দিলেই কি ভাল চা হয় অবিনাশ? কেমন করে চা করতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি, শিখে নাও। বলিয়া অবিনাশকে সরাইয়া নিজেই চায়ের আয়োজনে লাগিয়া গেল।

এক পাশে এক ভাল ময়দা মাখা পড়িয়াছিল। অবিনাশকে প্রশ্ন করিয়া প্রমীলা জানিতে পারিল, অসুখের ক'দিন এক রকম বিনা পথ্যেই বাবুর দিন কাটিয়াছে। আজ সকাল হইতেই ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় অবিনাশের উপর খাবার করিবার হুকুম হইয়াছে। সব প্রস্তুত। শুধু ভাজিয়া দিতে বিলম্ব যা।

ময়দা পরখ করিয়া প্রমীলার বাকরোধ হইয়া গেল। ঘিয়ের ভাল দিয়া রোগীর পথ্য হইবে কি করিয়া। মুহূর্ত ভরে সে সংযম হারাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু পরের চাকরের উপর বিরক্তি প্রকাশ শোভা পায় না বলিয়া সে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি অবিনাশ। তুমি বরং এই টাকা নিয়ে যাও বাজার থেকে ভাল ঘি নিয়ে এস। বলিয়া নিজের কাছ হইতে কয়েকটা টাকা অবিনাশের হাতে তুলিয়া দিল। মুক্তি পাইয়া অবিনাশও হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আর প্রমীলা তারাশঙ্করের রান্নাঘরে বসিয়া তাহারই পথ্য প্রস্তুত করিতে করিতে সহসা মনের মধ্যে এক অভিনব চেতনার সন্ধান পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। খাবার জিনিষ লইয়া যে-মানুষের উপর দিনের পর দিন এরূপ অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে আজ তাহার প্রতি করুণায় মন ভরিয়া উঠিল।

আধ ঘণ্টা পর চা, মিষ্টি এবং জলখাবারের থালা সাজাইয়া প্রমীলা এ ঘরে আসিয়া দেখা দিল। এবং বিস্মিত সুবোধবাবু এবং ততোধিক বিস্মিত তারাশঙ্করের সামনে সেগুলি ধরিয়া দিয়া তারাপতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, নিন গিলুন। হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকবেন না, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, সেদিকে হুস আছে? সকাল

বেলা মুখে ত জল দিয়ে বেরুন নি, তাই না জঠরের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, এবার সুস্থির হ'ন। তারাশঙ্করের দিকে ফিরিয়া কহিল, রোগী মানুষের পথ্য তেমনটি হয়ত প্রস্তুত করতে পারি নি। ত্রুটি মার্জনা করবেন।

তারাশঙ্কর হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ মুখে কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সুবোধবাবুর কণ্ঠস্বরে বাধা পড়িল। তিনি বলিল, তাই করবেন। আলা উপায়ের জিনিষ। তোমার নাম অন্নপূর্ণাই হওয়া উচিত ছিল প্রমীলা। এমনটিতে তোমায় যেমন মানায়, তেমন আর কিছুতে নয়। মাইকেলের মানস কন্যা প্রমীলা যেন গেছো মেয়ে। কোমর বেঁধে, লাঠি ঘুরিয়ে তার আস্ফালন, আমি কি ভরাই কভু ভিখারী রাঘবে? সে প্রমীলা অপেক্ষা এ প্রমীলা অন্নপূর্ণা, যার বাম হাতে চা পাত্র, লুচির থালা ডান করে, অনেক ভাল কি বল হে তারাশঙ্কর? প্রমীলা ধমক দিল, আপনি মুখ বন্ধ করবেন মুখুজ্জে মশাই।

সুবোধবাবু কহিলেন, রাগ কর কেন ছোট গিন্নী। মুখবন্ধ করলে যদি খুশি হও, তাই করলুম। বলিয়া একগাল লুচি সমেত মুখ টিপিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রমীলা হাসিয়া কহিল দোহাই আপনাকে। আহার বন্ধ করতে বলিনি আমি। বলেছি কথা বন্ধ করতে। ও ভাবে সঙ সেজে বসে থাকলে লোকে বলবে কি?

এতক্ষণে তারাশঙ্কর কথা কহিল, আপনি আমার অতিথি। দয়া করে এখানে এসে আমায় ধন্য করেছেন। কোথায় আপনাকে সম্বর্দ্ধনা জানাব আমি, না, ফল দাঁড়িয়েছে উল্টো। এসে পর্যন্ত আমাদের জন্যে আপনি নিজেই ব্যস্ত। এমন কি রান্না করে পর্যন্ত খাইয়ে গেলেন। এতে যতখানিই আনন্দ পাই না কেন, নিজের দৈন্যকেও ত অস্বীকার করতে পারছি না; এ সত্যিই লজ্জার কথা।

প্রমীলা সহজ ভাবেই কহিল, এ লজ্জা আর একদিন ঝালন করবেন। তাতেই আমি সন্তুষ্ট হ'ব।

—তাই করব। এ বাউণ্ডেলের বাড়ী। আপনাদের যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করবার ব্যবস্থা এখানে নেই। তবুও কথা দিচ্ছি অল্পটু হাতে যতখানি সাধ্য অতিথি সেবার ত্রুটি করব না। সে দিন আসা চাই কিন্তু।

—আসব। আপনি ডাকলে নিশ্চয়ই আসব। আর বাউণ্ডেলের বাড়ীর আতিথ্য গ্রহণ করে ধন্য হব।

বেলা বাড়িতে ছিল! সুতরাং সুবোধ বাবু উঠিয়া পড়িলেন। অগত্যা উঠিতে হইল প্রমীলাকেও। তারাশঙ্করকে আরও কয়েকটা দিন বিশ্রাম লইবার জন্য বার বার নির্দ্দেশ দিয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথ চলিতে চলিতে প্রথমে কথা কহিল প্রমীলা। বলিল, তারাশঙ্করবাবুর খাওয়ার কষ্ট দেখলে সত্যিই দুঃখ হয় মুখুজ্জে মশাই।

সুবোধবাবু পথ চলিতে চলিতে অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, তাই নাকি?

প্রমীলা বলিল, সত্যি। আমি নিজের চোখে দেখেছি বলেই বলছি। পুরুষ মানুষ, শুনেছি উপায়ও করেন যথেষ্ট। কিন্তু এক হতভাগা চাকরের হাতে পড়ে, বেচারী না খেয়ে মারা যাবেন দেখছি।

সুবোধবাবু একটু কৌতুক অনুভব করিলেন। পরিহাস করিয়া কহিলেন, মুস্কিলের কথাইত। তবে তুমি যদি ওর এই ভারটা নাও, তা হলে ভদ্রলোক দুটি খেয়ে বাঁচতে পারেন। তারাশঙ্কর লোক ভাল। এ প্রস্তাবে হয়ত রাজিও হতে পারে।

প্রমীলা পরিহাস গায়ে না মাখিয়াই বলিয়া চলিল, শঙ্করবাবুকে অবিনাশের কথা জিজ্ঞেস করাতে

বললেন, পাচন সেদ্ধ করছেন। ভাবলুম, হবেও বা। অসুখের জন্যে পাচন সেদ্ধই করছে। নীচে গিয়ে দেখি চা করছে অবিনাশ। বাগো মা, কি চায়ের ছিরি। কালির রংও ঢের পরে আছে। একপো জলে এক পাইও চা দিয়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে গাঢ় করে এনেছে বললে, এত যত্ন করে করে আমি চা তৈরী করি মাসীমা তবুও বাবুর মন পাই না। বলেন, পাচন সেদ্ধ। এক পাশে মরমা মাখা হয়েছে, যেন রবারের তাল। আমি জোর করে বলতে পারি মুখুজ্জে মশাই এইভাবে যদি রোগী মানুষের সেবা হয় সুস্থ হওয়া দূরে থাক, রোগ সারবে না কিছুতেই।

সুবোধবাবু সরল প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু প্রমীলার কণ্ঠস্বর এবং কথা বলিবার ভঙ্গীমা তাহাকে পর্যন্ত চমকিত করিয়া তুলিল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রমীলার ঈষদুত্তেজিত মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, তাই ত! কি করা যায় বল দেখি।

এ প্রশ্নের মর্ম বুঝিবার মত মনের অবস্থা এখন প্রমীলার নয়। সে সেইভাবেই বলিতে লাগিল, এ দুদিনেই যেভাবে কাহিল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, তাতে আহার এবং সেবার দুয়েরই প্রয়োজন। আমার মতে আত্মীয়দের কাছে তাঁর ফিরে যাওয়াই উচিত মুখুজ্জে মশাই।

—আমিও তাই বলি। কিন্তু এতক্ষণ যখন একত্রে রইলে তখন ও পরামর্শটা দিয়ে এলেই পারতে।

প্রমীলা আশ্চর্য হইয়া কহিল, পরামর্শ দেব আমি? আমার কথা শুনবে কে মুখুজ্জে মশাই?

সুবোধবাবু হাসিয়া বলিলেন, তোমার হুকুম তামিল করতে একা মুখুজ্জে মশাই ধরাতলে অবতীর্ণ হননি ছোট গিন্নী। চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাবেন দেবি যে ভক্তের সংখ্যা অনেক।

প্রমীলা বলিল, আপনি আমায় স্নেহ করেন, তাই প্রশ্রয় যেন সময় সময়। কিন্তু সবাই ত আপনি নন। তাঁরা যেবেন কেন?

—তোমার কেনর জবাব আমার জানা নেই। ও মন রাজ্যের ব্যাপার। তবে এইটুকু বলতে পারি যে তারাশঙ্কর ছেলে ভাল। তোমায় শ্রদ্ধাও করে যথেষ্ট। মনে হয় সে তোমার মর্যাদা বোঝে। তাই কোন আঘাতই সে তোমায় ইচ্ছে করে দেবে না।

প্রমীলার সারা মুখ চোখ অকারণে আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, একজন আর একজনকে শ্রদ্ধা করে কি করে না, আঘাত দিতে পারে কি পারে না, এসব তত্ত্ব তলিয়ে বোঝবার মত বড় মনোবিজ্ঞানী আমি নই মুখুজ্জে মশায়। তবে বলছেন যখন এবার দেখা হলে শঙ্কর বাবুকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেব

—তাই দিও। সুফল কিছু পাবে।

এরপর আর কোন জবাব প্রমীলার দিক হইতে আসিল না। সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। দুজনেই পথ চলিতে লাগিল, তবে কথা আর তেমন জমিল না।

কয়েক দিনের মধ্যেই তারাশঙ্কর রোগমুক্ত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু একটি মাত্র চিন্তা অঙ্কুর তাহার চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। জীবনাদর্শ লইয়া সে গোলে পড়িল। একজন তাহাকে প্রতি মুহূর্তেই কানে কানে বলিয়া দিতেছে, জীবনের গতি পরিবর্তন কর। এ পথ তোমার পথ নয়। যে বলিতেছে সে প্রমীলা। কানের কাছে মুখ আনিয়া ভারী চুপি চুপি বলিতেছে সে, এ তোমার পথ নয়।

মাত্র একটি দিন। ঐ একটি দিনেই প্রমীলা তাহার জীবনে ছাট পাকাইয়া দিয়া গিয়াছে। সেইদিন হইতেই তারাশঙ্কর বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, যে জীবনের স্বাদ প্রমীলা দিয়া গিয়াছে, লোভ তাহাতেই তাহার বেশী, আসক্তিও বেশী।

প্রমীলাকে তাহার ভাল লাগে। তাহার সরল মাধুর্য মনকে নাড়া দিয়া যায়। একদিনের তরে এ গৃহে তাহার আবির্ভাব হয়েছিল অন্নপূর্ণার মূর্তিতে। এ মূর্তি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, অন্তরের সকল সংযমকে বাঁধন হারা করিয়া দিয়াছে। এতদিন যাহা সে বোঝে নাই, আজ তাহা বুঝিয়াছে। অমৃতের যে স্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে সে ভুলিতে চাহে না। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়াই উপভোগ করিতে চায়। তারাশঙ্কর মনে মনে স্বপ্নের সোনালী জাল বুনিতে বসিল। কয়েকদিন আগেকার কথা তাহার মনে পড়িল। প্রমীলা বলিয়াছিল, যাওয়াযায়ি পথ, পথ নয়। যারা সন্ন্যাসী হতে চান, তারা সংসার বৈরাগী হয়ে হিমালয়ে আশ্রয় নিন। যারা তা চান না, তারা পুরা দস্তুর সংসার করুন স্ত্রী পুত্র পরিবৃত হয়ে। এতে সংসারের কল্যাণ হবে। না গৃহী, না সন্ন্যাসী এদের দ্বারা সমাজের কল্যাণ হয় না।

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কিন্তু সেদিন ইহার উত্তর সে পাশ কাটাইয়া গেলেও আজ এটাকেই আশ্রয় করিয়া ভাগ্যটাকে একবার যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য মনে মনে সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তারাশঙ্কর সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

সেদিনও ছিল ছুটির দিন। দুদিন সে সুবোধবাবুর বাড়ী যায় নাই। অফিসের কাজের চাপ যতখানিই হউক না কেন, আসল প্রতিবন্ধক হইয়াছিল তাহার মন। এই দুদিন ধরিয়া সমানে সে মনের সহিত যুঝিয়া আসিতেছিল। অবশেষে যে বিদেহী দেবতাটি অলক্ষে থাকিয়া তাহার অন্তরটিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিতেছিল জয় তাহারই হইল। তারাশঙ্কর সুবোধ বাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

সুবোধ বাবু বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। মহাখুসীতরে তারাশঙ্করকে অভ্যর্থনা করিলেন, এস তারাশঙ্কর, তোমারই প্রতীক্ষা করছিলুম। একা একা হাঁপিয়ে উঠেছি। দুদিন আসনি। প্রমীলা তেবেই অস্থির। বলে, বাউণ্ডেলে লোক, হয়ত অসুখ করেই বসে আছেন। তাই যাবার সময় বার বার করে বলে গেছে তোমার খবরটা নিতে। তোমায় দেখাশুনা করবার কেউ নেই। তাই সে ভারটা দিয়ে গেছে আমার ওপর। তুমি না এলে, এখুনি আমায় ছুটতে হ'ত তোমার কাছে। কিন্তু কি ব্যাপার বলত?

তারাশঙ্করের বুকের ভিতরটা এক অজানিত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কোন অর্থই তাহার বোধগম্য না হওয়াতে সে শুধু সুবোধ বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সুবোধবাবু বলিলেন, আসল ব্যাপারটা এখনও বলা হয় নি তারাশঙ্কর। হঠাৎ প্রমীলার মাতৃ এসে উপস্থিত। শ্বশুর মহাশয়ের অসুখ। মেয়েদের দেখতে চান তিনি। সুতরাং দু'বোনই চলে গেলেন আজ সকালে। সঙ্গে গেল ছেলেরাও। কাল এলে দেখা হ'ত। প্রমীলা সত্যিই তোমার জন্য করে। যাবার সময় পর্য্যন্ত বলে গেছে, শঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা হল না মুখুজ্জে মশাই। সে আপন ভোলা লোক, হয়ত অসুখ করেই বসেছেন। তাঁর খবরটা নিয়ে জানাবেন আমায়। তারপর চুপি চুপি বলে গেল, ছোট গিন্নী সামনে নেই বলে তার অসম্মানটা করে বসবেন না যেন। তা হলে সত্যিই রাগ করব কিন্তু।

তারাশঙ্কর শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, আপনার শালী ভাগ্যটা ভাল মুখুজ্জে মশাই। আজ এই প্রথম তারাশঙ্কর সুবোধ বাবুকে মুখুজ্জে মশাই বলিয়া সম্বোধন করিল।

সুবোধ বাবু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমারটা হয়ত ভাল, কিন্তু তারটা নয়। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা জানি না, এমন যে অমূল্য রত্ন সৃষ্টি করেছেন তিনি, কাহারও ভোগে না লাগাবার জন্য। প্রমীলা বালবিধবা।

মুহূর্ত মধ্যে ঘরের ভিতর যেন অশনিপাত হইয়া গেল। মানুষ যে এমন ভীষণভাবে চমকাইয়া

উঠিতে পারে এ অভিজ্ঞতা সুবোধ বাবুর ছিল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া তারাশঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারাশঙ্করের চোখ দুটি যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল। মুখের শেষ রক্ত বিন্দুটি কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন ধীরে ধীরে শুষিয়া লইতেছিল। মনের সহিত মস্তিষ্কের যে কোন যোগাযোগ আছে তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল না। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থাকিয়া অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, প্রমীলা বিধবা?

সুবোধ বাবু সায় দিয়া বলিতে লাগিলেন, অল্প বয়সেই প্রমীলা বিধবা হয়। তার কোষ্ঠীতে ছিল অল্প বয়সে মৃত্যু যোগ। মেয়ে পর হোতে গেলে, এ কাঁড়া হয়ত খণ্ডাতে পারে, জ্যোতিষিবরের এই বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে শাশুড়ী ঠাকুরানী খুব কম বয়সেই তার বিবাহ দেন। কিন্তু ফলাফল বিপরীত। মেয়ে বাঁচল বটে, কিন্তু জামাই গেল মেয়ের পরমায়ু নিয়ে। ঘরের মেয়ে ফিরে এল ঘরে। বাপ বিচক্ষণ লোক। মেয়ের দুর্ভাগ্যে ভেঙে পড়লেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। বুক বেঁধে লেগে গেলেন, মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলবার জন্যে। তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, লেখাপড়া শিখে নিজেকে নিয়ে থাকবার সুযোগ দিয়েছেন, আর দিয়েছেন সংসারের সর্বময় কর্তৃত্ব। সুবোধ বাবু থামিলেন। হঠাৎ তারাশঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তোমাকে ত আজ সত্য সত্যই ভাল দেখাচ্ছে না শঙ্কর। অসুখ বিসুখ করল নাকি আবার? প্রমীলার কথাই ঠিক হ'ল দেখছি!

যে প্রচণ্ড আঘাত তারাশঙ্করের অন্তরটা কুটি কুটি করিয়া দিতেছিল তাহার বেগ কিছুতেই সে সহিতে পারিতেছিল না। তাই অত্যন্ত ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল, শরীরটা খুবই অসুস্থ সুবোধ বাবু। দুদিন আসতে পারিনি বলেই দেখা করতে এসেছিলুম আজ। এখন বুঝছি, এসে ভাল করিনি। বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন অথচ এসেই এভাবে চলে যাওয়াটাও আমার পক্ষে খুবই অশোভনীয়। কিন্তু মাপ করবেন, আজ আমাকে যেতেই হবে। বলিতে বলিতে বিস্মিত সুবোধ বাবুকে কিছু বলিতে দিবার পূর্বেই সে অত্যন্ত চঞ্চল পদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়াই তারাশঙ্করের মনে হইল তাহার দৃষ্টিশক্তি যেন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কাহারা যেন পৃথিবীর বুক হইতে আলোর সব কয়টি রংই শোষণ করিয়া লইয়াছে। যেদের উত্তরাঙ্গের তুলনায় অধরাঙ্গটি অস্বাভাবিক ভাবে হাল্কা। যেন তার বহিবার কোন সামর্থ্যই আর তাহার নাই। মাথার ভিতর সহস্রাধিক ঝিঁ ঝিঁ পোকা কেমন এক বেসুরা আলাপ সুরু করিয়া দিল। তাহারই মাঝে স্নায়ু তন্ত্রীগুলির উপর হাতুড়ির ঘা দিয়া দিয়া এক অনুচ্চারিত কণ্ঠস্বর তাহাকে জানাইয়া দিতেছিল, প্রমীলা বিধবা, প্রমীলা বিধবা। তারাশঙ্কর সকল সহ্যের সীমা হারাইয়া ফেলিল। তাহার পা দুটি কাঁপিয়া উঠিল। সম্মুখে একখানা রিক্সা দেখিতে পাইয়া কোন মতে তাহার উপর চাপিয়া বসিল।

পরদিন। তারাশঙ্করের ঘুম ভাঙিল অনেক বেলাতে। চোখ মেলিয়া তাকাইতেই দেখিল, অবিনাশ উদ্‌গ্রীব মুখে দাঁড়াইয়া আছে। প্রভুকে চাহিতে দেখিয়া সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, এখন কেমন বোধ হচ্ছে বাবু, শরীরটা ভাল ত?

প্রথমটা কিছু না বুঝিয়া তারাশঙ্কর থাক্ নাড়িল। তারপর রাত্রির কথা স্মরণ হইতেই সে চুপ করিয়া গেল।

অবিনাশ বলিতে লাগিল, কাল কি দুর্ভাবনায় রাত কেটেছে বাবু। চোখের দুটি পাতা এক করতে পারিনি। অনেক রাত করে আপনি ফিরে এলেন রিক্সা করে। চুল উস্ক-খুস্ক, মুখ টলটলে চোখ দুটো।

রাস্তা। আমি ভয়েই মরি। রিক্সাওয়ালা বললে, সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত রাস্তায় বাবু ঘুরিয়ে মেরেছেন আমায়। বাবু ঘাড় দিয়েছে বলে প্রথমে ভয় পেয়েছিল। তারপর যখন বুঝতে পারল আপনি অসুস্থ, তখন অনেক কষ্টে আপনাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনে। ব্যাটা এক টাকা বকশিষ নিয়ে তবে ছাড়ল। আমি ভাবছিলুম, ও বাড়ীতে একটা খবর দিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসি। এমন সময় আপনার ঘুম ভাঙল।

বিগত রাতের কথা তারাশঙ্করের মনে পড়িল। কিন্তু সেদিক থেকে জোর করিয়া মনকে ফিরাইয়া আনিয়া অবিনাশকে বলিল, আমি স্নান করব। জলের ব্যবস্থা কর। এখুনি আমাকে একবার অপিস বেরুতে হবে।

অপিসে আসিয়াই তারাশঙ্কর ওপরওয়ালার কাছে একখানা দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। শরীর ভাল নয়, স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছে, বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন—এই অজুহাতে সে দীর্ঘ দিনের ছুটি প্রার্থনা করিয়া বসিল। তারপর চিঠিখানা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে দুই করতলে মুখ ঢাকিল।

সমাপ্ত

শিক্ষাগুরু ধাঁধাঁয় পড়লেন তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে নিয়ে। তাকে পুতুল গড়তে বললে সে এমন পুতুল গড়ে, যে শিক্ষাগুরু অবাক হয়ে যান, মনে মনে ভাবেন, এ হাত ত মানুষের হাত নয়!

আবার, ছবি আঁকতে বললে ছাত্রটি এমন ছবি এঁকে বসে যে শিক্ষাগুরুর তাক্ লেগে যায়,—এ তুলির টান ত মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।

ছাত্র গুরুর পায়ের কাছে বসে মিনতি করে বলে, গুরুদেব বলে দিন আমাকে আমি কোন্ পথে যাব?

গুরু হেসে বলেন, তুমি অসাধ্য সাধন করতে পেরেছ। দু'পথে একসঙ্গে কেউ চলতে পারে না, কিন্তু তুমি সমানে তোমার অপূর্ব্ব প্রতিভার লীলা দেখিয়ে চলেছ দুই বিভিন্ন পথে। জগতে তোমার মত প্রতিভা আর কার আছে?

শিষ্য সেদিন গুরুর চরণে প্রণাম করে দুই পথেই এগিয়ে চলেছিল।

আজও মাইকেল এঞ্জেলো শুধু অসামান্য ভাস্কর নন, অসামান্য চিত্রকরও বটেন।

একজন আর কয়েকজন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ইংরাজ শাসন ব্যবস্থার আওতায় তাদেরই সমর্থন এবং অর্থে পুষ্ট একদা যে উচ্চ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল এই বাংলা দেশে ও বাংলা দেশের বাইরে নানা প্রবাসী বাঙালী কেন্দ্রে, উপেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে তাদেরই একজন। তাঁর সৃষ্ট গল্প সাহিত্যের চরিত্রগুলির শ্রেণীগত বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই প্রকটিত হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকের বৈঠকী মেজাজ, সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য মিশ্রিত পরিবার এই হচ্ছে উপেন্দ্রনাথের জীবন পরিবেশ। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী তাই স্বভাবতঃ মন্থর।

মিশ্রযুগের ভাবনা, জীবনবোধে নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস অথবা স্কাসটেশন এবং আধুনিক কালের কমপ্লেক্সিটি—উপেন্দ্র জীবন-দর্শনকে অবিশ্বাস কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, সংশয়-সংকটে দোদুল্যমান করে তোলেনি।

উপেন্দ্র-অন্তরঙ্গ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপেন্দ্র পরিচিতিতে যে কথা বলেন তা সর্বতোভাবে সত্য।

'বৈঠকী মেজাজের সদা হাসি-খুসি ভরা অন্তরঙ্গ যে আনন্দ পুরুষ বালিগঞ্জ রেসের দক্ষিণের ঘরটি আড্ডার-আসরে ভরিয়ে রেখেছিলেন, সেখানে তুমি-আমি এবং সবাই মিলে যত খুসি প্রাণভরে দক্ষিণের বিমবিমে বাতাসকে উপভোগ করা যেতে পারে। কোনো কন্সি-কিকির সেখানকার আবহাওয়াকে স্বার্থবোধে মলিন করতে পারে না। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর ঘর-ঘরানার কর্তাদের যে বৈঠক সেই বৈঠকের শেষ বৈঠকটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বৈঠকী উপেন্দ্রনাথ।'

এই বৈঠকে উপেন্দ্রনাথের শিল্পবোধের মূলকথা হচ্ছে আনন্দম্। এই আনন্দকে গাল্পিক উপেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন তাঁর কথা-সাহিত্যে। কবি উপেন্দ্রনাথের রোমান্টিক-মন আর গাল্পিক উপেন্দ্রনাথের স্বচ্ছ ঘরোয়া-জীবন—দুই মিলে কথা সাহিত্যে যে-যুক্তবেণীর সঙ্গম সৃষ্টি করেছে তা নির্ভেজাল, তা পরিচ্ছন্ন, তা স্বচ্ছ। উপেন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যে আশা-আনন্দ, আমোদ-আহ্লাদের দিকটা তাই বড়।

'বেসেছিনু ভালো এই সুন্দরী ধরণীরে
আলোকে আকাশ ভরা উজ্জ্বল ধরণীরে।
বেসেছিনু সুদূরের চন্দ্র ও তারকায়
বেসেছিনু মানুষের সুগভীর মমতায়।
দূরে থাক অভিযোগ, দূরে থাক অভিমান,
কি হইবে খতাইয়া দান আর প্রতিদান ?'

উপেন্দ্র-কবিতার এই কয়েক ছত্র তাঁর সহৃদয় ভালোবাসাময় অন্তর-ব্যঞ্জনারই প্রতিধ্বনি।

প্রকৃতির কবি বন্ধুর জগতে কথাকার। জীবন-ভাবনায়, আলাপ-আচরণে, পারিপার্শ্বিকতায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপনায়, সমাজের সঙ্গে সামাজিকতায়, শিল্পে এবং ব্যক্তিগত জীবনে—উপেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বত্রই একই ভাবের দ্যোতনা।

কয়েকজনের মধ্যে একজন উপেন্দ্রনাথ তাই অনন্যসাধারণ।

জীবনে সংশয় নিশ্চয়ই এসেছে। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগের আঁচ উনবিংশ শতকের মনকে আধুনিককালের বিপর্যয়ে নিশ্চয়ই বিপর্যস্ত করেছে; কিন্তু তাই বলে অবিশ্বাস নেই। ভালোবাসার নরম মাটি থেকে বন্ধুর পথে বিচরণ করতে তাই বলে পথভ্রষ্ট কখনো হননি অনন্যসাধারণ একজন—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁই আজকের যুগে যখন এককের স্বার্থকেন্দ্রিক ঘর, একান্নবর্তী পরিবার বন্ধনচ্যুত, এককের সঙ্কীর্ণ সংসার—তখনো তিনি একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের অস্তিত্বাবক।

সাহিত্যিক মনোজ বসু 'উপীনদা' বলতে বলেন, 'আমাদের একান্নবর্তী সাহিত্যিক যৌথ পরিবারের তিনি সার্বজনীন অগ্রজ। তিনি আমাদের জ্যেষ্ঠ। তিনি আমাদের অভিভাবক। তাঁর বিহনে আজ সবচেয়ে বড়ো দুঃখ, আমাদের আদেশ করবার কেউ নেই।'

গল্প-বলিয়ে উপেন্দ্রনাথ তাঁর গল্প বলার চংটিকে শুধুমাত্র বহিরাবরণে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর অন্তরসত্তাও সেখানে এক। জীবনে যেমন তিনি একজন, দু'জন বা সংখ্যায় দলের দলপতি ছিলেন না, সাহিত্য সৃষ্টিতেও তাঁর আদর্শ ছিল সর্বজনীনতা। সকলকে আনন্দ দিয়ে, আশা দিয়ে, ভরসা দিয়ে যে-জীবন বৃহত্তর, শিল্প-সৃষ্টিতেও সেই শিল্প-কর্মের ছোতনা। তিনি তাঁর সবচেয়ে বড়ো সমালোচক বিষ্ণু নাগের সঙ্গে তাই তর্ক তুলতেন।

বিষ্ণু নাগ বলতেন, 'তেল কিনতে মুদীর দোকানে গিয়ে রামায়ণ পাঠ যদি শুনি, তেল কেনাটাকেই আসল কাজ বলব।'

উপেন্দ্রনাথ পাল্টা জবাব দিতেন, 'কোনটা আসল আর কোনটা নকল, তা হচ্ছে কালের বিচার। তবে তেল কিনতে গিয়ে রামায়ণের গল্প যদি ক্ষণিক তেল কেনাতে বিরতি ঘটায়, তাহলে রামায়ণ পাঠ শোনাকে গৌণ বলে তাচ্ছিল্য করার কারণও দেখি না।'

তেল-নুন কেনা সংসারীর ধর্ম। তেল-নুন লাকড়ির ভাবনা থেকে রেহাই পেয়ে কোনো সাংসারিক-জীব যে শুধুমাত্র রামায়ণ-কাহিনী নিয়ে মেতে থাকতে পারেন, এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। উপেন্দ্রনাথ জীবনে যে সে ভাবনা ভাবেননি তা নয়, আর তাঁর সৃষ্ট কথা-সাহিত্যও যে এই ভাবনায় কখনো আচ্ছন্ন হয়নি তাও নয়। তবে এই তেল-নুনের সমস্যাই জীবনে এবং তাঁর সাহিত্যে শুধুমাত্র প্রাধান্য লাভ করেনি। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে মহান প্রেরণা কবি উপেন্দ্রনাথ প্রকৃতি এবং মানবী শ্রীমতী মৃদুমতী দেবীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সেখানে যেমন অবিশ্বাসের ছায়া নেই, তেমনি গল্প-সাহিত্যিকের জীবন-কেন্দ্রের সবচেয়ে বড়ো প্রেরণাদাত্রী উপেন্দ্রজায়া শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর উদার ব্যবহার এবং সহৃদয় সহানুভূতি সম্পন্ন চিত্ত-পরশ উপেন্দ্রনাথকে মধুর-মেজাজী কথাশিল্পী করে গড়ে তুলেছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বি-এ পড়া ছাত্র প্রায় সমবয়সী বন্ধুতুল্য সুরেনদাদার কলকাতার মেসের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে দুটি অল্প বালিকাবয়সী মেয়েদের স্কুল থেকে প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যে বিভোর হয়ে দেখতো—তাদেরই একজন এলেন বছর দেড়েক পরে সেই নব-যুবকের 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারের' চির-সঙ্গিনী হয়ে। বসন্ত-জীবনে সার্থক এই রোমান্সের রংটি পরিণত অপরাহ্ণের ধূসরকোণেও বিবর্ণ হয়নি। সে জীবনের কবিতা—

আমারো নয়ন রয়েছে এখনো
তোমার স্বপনে মুগ্ধ
পাতা-ঢাকা ফুলে অলির মতন
হৃদয় আমার লুব্ধ।'

এ-জীবনেও বাসর।

তাই সারা-জীবন ধরে উপেন্দ্রনাথ আনন্দ-সন্ধানী, প্রেম-সন্ধানী। পরিপূর্ণ জীবন ঘিরে, পরিপূর্ণ সাহিত্য ঘিরে তাঁর আনন্দ-পথলোকে বিচরণ। সংশয়, কলহ, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, কালরাত্রি তাঁর আনন্দময় সত্তাকে মলিন করতে পারেনি। তৎপরিবর্তে দেবী যোগিনী তাঁর জীবন-পথ, সৃষ্টি-পথের সম্মুখে অবস্থান করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলেন এবং অশুভ তিথি ও প্রতিকূল নক্ষত্র তাঁর যাত্রা যাতে নির্বিঘ্ন ও রাত্রি যাতে সুপ্তিময়ী হয় তদ্বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

— উৎসব অনুষ্ঠানে ও পূজা পার্ব্বণে —

লক্ষ্মী ঘি

বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বার্ত্তা বহন করে।

হাজার হাজার প্রশংসা পত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটী —

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীভূষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক – অমৃতবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। ব্যবহার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

আমি লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল

শ্রীসীতা দেবী

লক্ষ্মীমার্কা ঘি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও সুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

ছোট বড় সকল রকম টিনে পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ, পবিত্র ও স্বাস্থ্যপ্রদ

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী • ৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥

অঞ্জনা

ফেস পাউডার

ত্বকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে

অঞ্জনা প্রডাক্টস্ · কলিকাতা-৬

Pp/1/60

গ্রন্থশ্রী	গ্রন্থশ্রী
সুবোধ ঘোষের সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস **মুক্তিপ্রিয়া** ২·৫০	॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ কলরোলের কবি অনিলকুমার ভট্টাচার্যের আর একখানি আধুনিক কবিতার বই **সাগর-আকাশ** ॥ দুটাকা ॥
বারীন দাশের উপন্যাস **অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা** ৪·০০	
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস **কন্যামৃগয়া** ৩·০০	
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের **শ্রেষ্ঠগল্প** ৫·০০ **সাতদিন** ২·৫০	লিরিকধর্মী কাব্য-উপন্যাস **মেঘপাহাড়ের গান** ॥ দুটাকা ॥
অনিলকুমার ভট্টাচার্যের উপন্যাস **উপনদী** ২·০০	
॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা—১২ ॥	॥ ডি, এম, লাইব্রেরী, কলকাতা—৬ ॥

আসন্নপ্রসবার পক্ষে ভাইনো-মল্টের
সহায়তা একান্ত প্রয়োজন।
ভাইনো-মল্ট বিশিষ্ট খাদ্য এবং পরিপুষ্টিকর
উপাদানের সমন্বয়ে বিশেষভাবে
প্রস্তুত এক স্বাস্থ্যকারী টনিক।
ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও
শক্তি ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল
মাতৃত্বের জন্য

বেঙ্গল
ইমিউনিটি
কোং, লিঃ

ইমিউনিটি হাউস-কলিকাতা-১৩

॥ সদ্য-প্রকাশিত হয়েছে ॥

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা ছোটগল্পের সর্ববৃহৎ সঙ্কলন

ভবানীচরণ-প্যারীচাঁদ থেকে শুরু করে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত শতাধিক বৎসরের একশত খ্যাতনামা কথাশিল্পীর একশত নির্বাচিত গল্পের এ-জাতীয় অতি বৃহৎ সঙ্কলন বাংলা-সাহিত্যে এই প্রথম। সুদৃশ্য কাপড়ের মজবুত বাঁধাই, শিল্পী শ্রীসত্যজিৎ রায়ের আঁকা রুচিস্নিগ্ধ আচ্ছাদন।

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

শত বর্ষের শত গল্প

প্রথম খণ্ড : পনেরো টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ

॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
মহাশ্বেতা (২য় মুঃ)	৫·৫০
মনোজ বসুর	
মানুষ গড়ার কারিগর (২য় মুঃ)	৫·৫০
জরাসন্ধের	
ন্যায়দণ্ড (২য় মুঃ)	৬·৫০
সৈয়দ মুজতবা আলীর	
চতুরঙ্গ (২য় মুঃ)	৪·৫০
দেবেশ দাশের	
পশ্চিমের জানলা	৫·০০

* উল্লেখযোগ্য বই *

সতীনাথ ভাদুড়ীর		আনন্দকিশোর মুন্সীর		ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক	
পত্রলেখার বাবা	৪·০০	**রাঘব বোয়াল**	৩·০০	**রূপোলী চাঁদ** (৩য় মুঃ)	২·৫০
সংকট (২য় মুঃ)	৩·৫০	**ডাক্তারের ডায়েরী** (২য় মুঃ)	৪·০০	ভবানী মুখোপাধ্যায়ের	
সুবোধকুমার চক্রবর্তীর		প্রবোধকুমার সান্যালের		**জর্জ বার্নার্ড শ**	৮·৫০
তুঙ্গভদ্রা	৪·০০	**নওরঙ্গী**	৩·০০	বুদ্ধদেব বসুর	
মণিপদ্ম	৪·০০	**শ্যামলীর স্বপ্ন** (৬ষ্ঠ মুঃ)	৪·০০	**নীলাঞ্জনের খাতা**	৪·০০

পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধির সোনার কাঠি

ব্যক্তির কল্যাণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এই কল্যাণ বা সমৃদ্ধি সাধন একমাত্র পরিকল্পনানুযায়ী প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর। এবং পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় তথা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর।

সুসংগঠিত ব্যাঙ্কের মারফত সঞ্চয় যেমন ব্যক্তিগত সুবিধা বৃদ্ধি করে, তেমনি জাতীয় পরিকল্পনায়ও রসদ যোগায়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক

অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারতের সর্বত্র ব্যাঙ্কিং এবং পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে বৈদেশিকের মারফত

আপনার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুত

—নূতন নূতন উপন্যাস—

সমুদ্র নীল আকাশ নীল	আশাপূর্ণা দেবী	৫৲
অমৃতকন্যা	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৷৹
অলকাতিলকা	অন্নদাশঙ্কর রায়	৪৷৹
মায়ামাধুরী	অবধূত	৪৷৹
নিশ্চিন্তপুরের মানুষ	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৫৷৹
মধুমিতা	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৫৲
সর্বংসহা	সুমথনাথ ঘোষ	৫৲
এই তীর্থ	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৷৹
লীলাভূমি	হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৲
তটিনী তরঙ্গে	প্রফুল্ল রায়	৫৲
একটি পৃথিবী একটি হৃদয়	দক্ষিণারঞ্জন বসু	৪৲
এই দিন এই রাত	প্রভাত দেব সরকার	৩৷৹

প্রবোধনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী

॥ নবম মুদ্রণ—সাড়ে আট টাকা ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে

ভাগবত-রস-রসিক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

কবি

শ্রীরামকৃষ্ণ

শিল্পাচার্য প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ

নূতন সজ্জায়

শোভন প্রচ্ছদপটে

নূতন সংস্করণ

প্রকাশিত

হইল

॥ পাঁচ টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

অন্তিম-উৎসবে

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রভু, তোমার পথের পথিক করিবে কবে ?
কবে সুখভীর রাত হইবে প্রভাত, তব ভৈরব রবে !
যবে ক্লান্ত হইবে আশা,
আর শেষ হবে ভালবাসা,
আর এক হ'বে যাবে আলো আর ছায়া,
সুখ-দুখ, কাঁদা-হাসা ;
তখন গভীর উদাস সুরে
বাজিবে না কি হে দূরে
কল-কল্লোলময় সঙ্গীত মহা-সাগরের কলরবে !
যবে অন্ধ হইবে আঁখি,
আর বধির হইবে কান,
আর প্রাণের মাঝারে থাকিয়া থাকিয়া
কাঁপিয়া উঠিবে প্রাণ ;
তখন বন্ধ হইবে চলা,
শেষ হবে কথা বলা,
তখন বাজিবে পথের-শেষ-চরণ গানে
অন্তিম-উৎসবে !

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—উপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে

'ওহে উপেন, দুটি কারণে তুমি আমাকে বিস্মিত করেছ।'

গুরুদেবের এ-কথায় সত্যিই বিস্মিত উপেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন, 'প্রথম বিস্ময়ের কারণ তুমি কবিতা লেখ। আর দ্বিতীয় কারণ, শুধু কবিতা লেখা নয়, তুমি ভালো কবিতা লেখ।'

14, Lower Pozoungdoung Street, Rangoon
২২শে আগষ্ট, '১৩

প্রিয় উপীন,

এ মাসের যমুনা পাইয়া তোমার 'লক্ষ্মীলাভ' পড়িলাম। এ সম্বন্ধে আমার মত বিশ্বাস করিবে কিনা, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি, "বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কাজ নাই—।" আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেকদিন পড়ি নাই।.....অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো, সংসারের দুঃখের দিকটা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই—শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্ম্মল এবং পবিত্র !.....আমাকে খুসী করা শক্ত, কিন্তু এমন পেলে আমি আর কিছু চাই না। আমার এত বড় সুখ্যাতিতে হয়ত তুমি একটু সঙ্কুচিত হবে এবং সবাই হয়ত আমার সঙ্গে একমতও হবে না, কিন্তু আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই।.....এমন গল্প অনেকদিন পড়িনি।..... ... ইতি —শরৎ

সাহিত্য-সাধনার আর একদিক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পুষ্পের যেমন শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সুগন্ধে, জাতির পরিচয় ঠিক তেমনি তার সাহিত্যে। সাহিত্যের মধ্যে অন্বেষণ করলে যে কোনো জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, রুচি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকে বলে, সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ সাহিত্য জীবনকে অনুকরণ ক'রে চলে। এটা সাহিত্যের খানিকটা দিকের কথা হ'তে পারে,—কিন্তু সব দিকের কথা নয়। সাহিত্য জীবনকে শুধু অনুকরণই করে না, নূতন ক'রে সৃষ্টিও করে, জাতিকে ভেঙে-চুরে পুনর্গঠিত করে। স্বপ্ন দেখিয়ে রূপায়িত করে। একথার প্রমাণ দিতে গেলে, বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে অনুসন্ধানের জন্য সাগর পারে না গিয়ে বাঙলা সাহিত্য থেকে আনন্দমঠকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন আনন্দমঠ রচনা করেন, তখন সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরাজের অভিভাবকত্বের আওতায় নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন। দু-চার জন দেশনেতা ছিন্ন ভারতবর্ষের জনতা তখন স্বপ্নেও দেখতে না যে, অচির কালের মধ্যে সেই অভিভাবকের। সুদূর কাল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা সম্ভব হবে, এমন কি মুক্ত করা উচিত হবে, অথবা মুক্ত করবার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সুদূরপ্রসারী মুক্তি কামনার যে চরম বীজ ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে আনন্দমঠ ছড়িয়ে দিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই লাগ বাংলা দেশে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আনন্দমঠের রুধিরস্রোতী অভিনয়। সেই অভিনয়ের পরিণতি হচ্ছে আমাদের এই বর্তমান স্বাধীনতা। আনন্দমঠ আমাদিগকে শুনিয়েছিল স্বাধীনতা স্বপ্নের জাতীয় সঙ্গীত, আর স্বাধীনতা অর্জনের মূলমন্ত্র বিজয়ী মন্ত্র, বন্দেমাতরম্।

আমি আজ একান্ত মনে কামনা করি, বহু দুঃখে বহু কষ্টে, বহু আত্মত্যাগে আর বহু রক্তক্ষয়ের ফলে যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি, আমাদের সাহিত্য সাধনা যেন সেই স্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণের সহায়ক হয়। সাম্প্রদায়িকতাকে বিনষ্ট ক'রে, প্রাদেশিকতাকে দলিত ক'রে, সকল প্রকার ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে একটি নব ভারতীয় সুর আমাদের সকলের কণ্ঠাগ্রে আয়ত্ত করতে হবে।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড একটি, মানুষের কিন্তু দুটি। একটি তার দেহের, অপরটি জীবনের। দেহের মেরুদণ্ডকে চলিত ভাষায় বলে শিরদাঁড়া, জীবনের মেরুদণ্ডের নাম চরিত্র।

উভয় মেরুদণ্ডের কাজ কিন্তু একই খাড়া রাখা। শিরদাঁড়া খাড়া রাখে দেহকে, চরিত্র জীবনকে।

দেহের মেরুদণ্ডের মত জীবনের মেরুদণ্ডেরও ব্যাধি আছে। দেহের মেরুদণ্ডে যখন ঘুণ ধরে, ক্ষয় রোগের কীটাণু যখন তাঁকে ঝাঁঝরা করে দেয়, তখন দেহ অবনত হয়ে পড়ে, তখন আর তার খাড়া হয়ে চলবার শক্তি থাকে না। মানুষের জীবনও অবনত হয়ে পড়ে যখন তার চরিত্রে ঘুণ ধরে, অপকর্মের দুষ্ট কীটাণু তার চরিত্রকে সর্বত্র ছিদ্রে জীর্ণ করে দেয়। তখন শিথিল হয়ে যায় তার মনুষ্যত্ব, তার পৌরুষ, তখন তাকে পরিত্যাগ করতে থাকে তার বলিষ্ঠতা, সততা, সত্যপরায়ণতা, সৎসাহস।

বাঙালীর কথায়—উপেন্দ্রনাথ

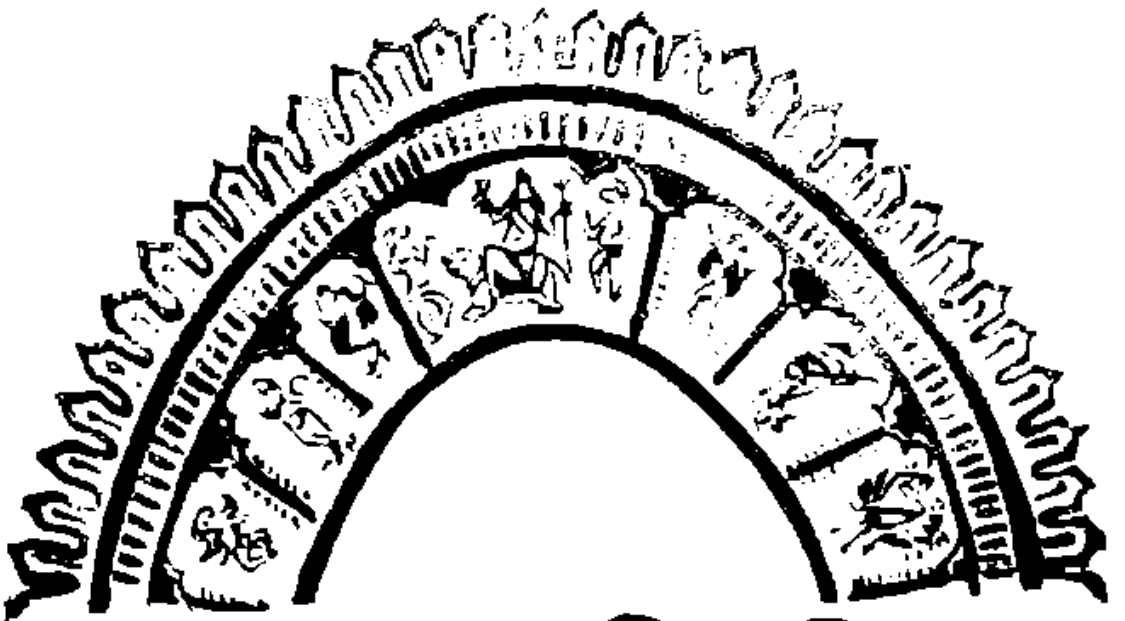

" বাংলার চিত্রশিল্প "

আশীর্ব্বাদ

[পঞ্চাশ বছরের কিশোর তরুণ কবিকে প্রতি পঞ্চম বছরের প্রবীণ দূরা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ।]

নন্দনের কুঞ্জতলে বন্দনার ধারা,
জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী মধুরাতে
লাগালো কে যে নয়নপাতে
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা॥

এনেছে তব জন্মডালা অজর কুসুমরাজি,
রূপের লীলা-লিখন-করা পারিজাতের সাজি।
অক্ষরীর নূতাগুলি
তুলির মুখে এনেছ তুলি'
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি'।

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো তাকে কখনো মোছে অসীম ভোলে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙিন উপহাসি যে হাসে
রং-জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে॥

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
তুমিও তা'রে ইশারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবতর আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইশারা অবিরত॥

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপল মায়া করেছ তুমি জয়।
তব আঁকন-পটের 'পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হ'য়ে রয়॥

চির-বালক ভুবন ছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেয়ার ভেলা 'পরে॥

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নব বালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তা'র ভাষার ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তা'রে ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষ নন্দলাল

শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের শিল্পকলার নবজাগরণের ইতিহাসে পথিকৃৎ এবং গুরু অবনীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর প্রধান উত্তর সাধক এবং শিল্প নন্দলালের নাম অতি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে তাঁর স্থান আজ সুনির্দিষ্ট। রূপের পাত্রে রূপাতীত রস পরিবেশনে সিদ্ধিলাভ করেছেন তিনি, রঙ এবং রেখার ইন্দ্রজালে ভারতবর্ষের মানুষের এবং প্রকৃতির অতীতের এবং বর্তমানের ঐশ্বর্যকে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষীভূত ক'রে দেশে বিদেশে রসিকজনের চিত্তজয় করেছেন তিনি। দীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন এবং আঁকছেন, অনেক শৈলীর অঙ্কনভঙ্গী, অনেক জাতীয় বিষয়বস্তু এবং উপকরণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন এবং দিয়েছেন। কলাবাহুল্য সে সব নিয়ে—তাঁর শিল্প কীর্তির গুণাগুণ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবার যোগ্যতা আমার নেই। তাঁর অনেক শিষ্য আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানা শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন বা স্বাধীন ভাবে ছবি আঁকছেন এবং মূর্তি গড়ছেন; শিল্পী নন্দলাল বসুর রূপসাধনার, কলাভবনের অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুর শিক্ষাদান পদ্ধতির এবং ভারতীয় অলঙ্করণ শিল্পের নবজন্মদাতা নন্দলাল বসুর সৃষ্টি প্রেরণার ইতিহাস বর্ণনার ভার তাঁদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি আজ 'মানুষ নন্দলাল বসুর' সম্বন্ধে কেবল দু'চার কথা বলব, যে কথা খুব কাছের মানুষ ছাড়া, কেউ জানে না, অথচ যা জানা দেশবাসীর প্রয়োজন। অনেকেই জানেন না শিল্প সাধনা নন্দলালের জীবন সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ভারত শিল্পের গৌরববৃদ্ধি তাঁর দিবারাত্রির স্বপ্ন, তাঁর আঁকা ছবিগুলি তাঁর ঐকান্তিক স্বদেশ প্রেমের এবং আন্তরিক প্রকৃতি প্রীতির আংশিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শিল্পের চেয়ে শিল্পী যে কত বড় তা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশলে জানা যায় না।

পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁদের শিল্পী জীবনের কোনো যোগ নেই, পারিবারিক জীবনে অসংযম, সামাজিক জীবনে লোভ, ভয়, বন্ধুবিদ্বেষ প্রভৃতি তাঁদের মনুষ্যত্বকে কলুষিত করেছে, কাননার কাপীদহে রূপের পদ্ম তুলতে নেমে অনেকেই পাঁকের মধ্যে তলিয়ে গেছেন, কেউ কেউ আবার সেই পঙ্কতিলক ললাটে ধারণ করতে গৌরব বোধ করেছেন। শিল্পী নন্দলাল বসু এর আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এমন একটি শুচিশুভ্র নির্দোষ নিরহঙ্কার জীবন আধুনিক কালে বিরল সমাজে বেশি দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, অর্থাভাবে চিরদিন কষ্ট পেয়েছেন অথচ অর্থের জন্য আত্মসম্মান বিক্রয় করেননি কোনোদিন। বন্ধুরা, ছাত্রেরা উচ্চপদ এবং রাজ্যসম্মান নিয়ে সরে গেছেন, তিনি নীরবে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চলেছেন। পারিবারিক জীবনে তিনি একনিষ্ঠ স্বামী, স্নেহময় পিতা, সামাজিক জীবনে তিনি আদর্শগুরু, অকৃত্রিম বন্ধু এবং অন্তরঙ্গ সদালাপী রসজ্ঞ। সভায় তিনি সকলের পিছনে লুকিয়ে বসেন, যেখানে নিজের লোকের চক্ষে পড়বার বা সম্মান লাভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে সেখানে তিনি পারতপক্ষে যান না। আবার বিপদের দিনে প্রয়োজনের ক্ষণে তিনি সবার আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেন। ছাত্রদের নিয়ে সভা সাজান তিনি, নাটমঞ্চ সাজান তিনি, কিন্তু তারপর আর তাঁর সাক্ষাৎ মেলে না। বিপন্ন বন্ধুকে, শিষ্যকে, পরলোকগত সতীর্থের বিপন্ন পরিবারকে অর্থ সাহায্য করেন, আশপাশের গ্রামের দরিদ্র সাঁওতাল, ডোম, বাউরি, প্রতিবেশীদের দাস দাসী তাঁর কাছে বিনামূল্যে ওষুধ নিয়ে যায়। নিজে যেখানে কারো সেবার দায়িত্ব নিতে পারেন না, সেখানে শিষ্য বা বন্ধুদের উৎসাহ দিয়ে কাজে লাগান, উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেন। ছাত্র বিধায় ভূমিকম্পের সেবাকার্যে নিয়ে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে, এক কথায় একশ' টাকা পাঠিয়েছেন মণিঅর্ডারে, তখন তাঁর নিজের বেতন মাত্র দু'শ টাকা। দুর্ভিক্ষে [illegible]

শরীর ঘোগ্‌লা মাঝি মেনিঞ্জাইটিসে আক্রান্ত, ডাক্তারেরা হাল ছেড়েছেন। মাস্টার মশাই দুশ্চিন্তায় আকুল, দুটি ছাত্রকে পাঠালেন বায়োকেমিক ওষুধের বাক্স, পথ্য, স্টোভ, গরম জলের ব্যাগ প্রভৃতি সঙ্গে দিয়ে; তারা দু'দিন দু'রাত অক্লান্ত সেবায় এবং চিকিৎসায় বেচারাকে বাঁচিয়ে তুলল। বুধবারের মন্দিরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ধর্মব্যাখ্যা করছেন, আশ্রম বাসী স্ত্রী পুরুষ শিক্ষক ছাত্র নিঃসঙ্গে শুনছে তন্ময় হয়ে, হঠাৎ ঢং ঢং ক'রে বিপদ সূচক ঘণ্টা বেজে উঠল, কাছেই কোথায় আগুন লেগেছে নিশ্চয়। সকলেরই মন চঞ্চল, কিন্তু কেউ উঠতে সাহস করছেনা, পাছে উঠে গেলে মন্দিরের শান্তি ভঙ্গ হয়, গুরুদেবের প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। সবার আগে উঠে পড়লেন নন্দলাল, তাঁর দেখাদেখি শিক্ষক ও ছাত্রের দল ঘর খালি ক'রে বেরিয়ে পড়ল। ভুবন ডাঙায় আগুন লেগেছিল, তালপুকুর থেকে এবং বিভিন্ন কূয়া থেকে সারি দিয়ে ছেলে মেয়েরা দাঁড়াল, হাতে হাতে ভর্তি বালতি এবং কলসীতে জল যেতে লাগল অগ্নিনির্বাপণের কাজে, খালি কলসী এবং বালতি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে হাতে ফিরে আসতে লাগল। মাস্টার মশাই তখন আগুনের কেন্দ্রস্থলে; কখনও চালায় উঠে জলন্ত বাঁশ কাটছেন, খড় ছড়িয়ে ফেলছেন, কখনও আশপাশের বাড়ীর ঘড়ের চালে ভিজে কাঁথা কম্বল চাপাবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আগুন নিভল, আমরা সবাই কৃতিত্বের গর্বে উচ্ছ্বসিত, মাস্টার মশাইকে আর দেখা গেলনা। আর একদিনের কথা চির জীবন আমার মনে থাকবে। মন্দিরে সেদিন ব্রহ্মের বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই উপাসনা করছেন। মন্ত্র পাঠ এবং সঙ্গীতের পর ভাষণ আরম্ভ হওয়ার আগে যথারীতি শিশু বিভাগের ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মন্দিরের বাইরে কাঁটাল গাছে ছিল একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী মৌমাছির চাক, একটি দুষ্টু ছেলে তাতে কখন এসে খোঁচার ছলে ঢিল মেরেছে। হঠাৎ শোনা গেল একটা আর্ত চীৎকার, দেখা গেল বন্ধ জানালার ফুটো দিয়ে আসা সূর্য কিরণ রেখার মতো একটা ক্রুদ্ধ কালোরেখা এসে পড়েছে কাঁটাল গাছ থেকে ছেলেটির উপর, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করছে। এদিনও সবার আগে উঠে ছুটে গেলেন আমাদের মাস্টারমশাই, নন্দলাল বাবু; আমরা অনেকেই তাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে পড়লুম মন্দির থেকে। নিমেষমধ্যে ছেলেটাকে পাঁজা কোলা করে বুকের উপর তুলে নিলেন তিনি, তারপর ছুটলেন আমাদের পুরাণো অতিথিশালা অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের সব চেয়ে প্রাচীন দোতলা বাড়ীটির দিকে। চোখের উপর দেখলুম মৌমাছির ঝাঁক নামল তাঁর উপর, ক্রুদ্ধ পতঙ্গের আস্তরণে তাঁর সাদা পাঞ্জাবীটা চোখের ওপর কালো কোটে পরিণত হয়ে গেল। দেখতে দেখতে অতিথিশালার দ্বার পথে তিনি অদৃশ্য হলেন, তাঁর পিছনে গেলেন প্রহ্লের শিক্ষক আর্যনায়কম। আর কেউ কাছে যাবার আগেই অতিথিশালার অধ্যক্ষ নিচের তলার সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমাদের তখন শোচনীয় অবস্থা, প্রত্যেকের হাতে পায়ে মুখে নাকে ঝাঁকে ঝাঁকে জীবন্ত বুলেট এসে পড়ছে, জামার কাপড়ে ঢুকছে, যেখানে বসছে সেখান থেকে আর উঠছে না। বিষের জ্বালায় সর্বাঙ্গ জ্বলছে, নিজের যন্ত্রণায় অন্যের কথা মনে নেই কারও। উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে যে যেদিকে পারে ছুটেছে, কেউ লাফাচ্ছে, কেউ কাঁদছে। দোতলার জানালা দিয়ে মৌমাছির দল ঢুকছিল বলে সেগুলিও বন্ধ হয়ে গেছে। বহু অনুনয় বিনয়ে এক বিদেশী অতিথি পিছন দিকের দরজা খুলে আমাদের কয়েকজনকে ঢুকতে দিলেন। দোতলায় গিয়ে দেখি অচৈতন্য ছেলেটিকে তোষক চাপা দিয়ে রেখে মাস্টার মশাই এবং আর্যনায়কম কাঁটা দিয়ে পিটিয়ে পরস্পরের গায়ের মৌমাছি মারছেন। অবস্থা আরও খানিকটা শান্ত হ'তে আরও অনেকে এলো। মাস্টার মশায়ের পা এবং মাথা থেকে মৌরির মতো বড়ো হুল ঠোঙা ভর্তি করে খুঁটে তোলা হ'ল। তারপর প্রবল জ্বর, দারুণ ব্যথা। জিজ্ঞেস করলুম, "আমরা তো পারলুম না, আপনি পারলেন কি ক'রে?" বললেন, "না পেরে যে উপায় ছিল না। খড়্গপুরে দেখেছি রাস্তা দিয়ে একজন ঘোড় সওয়ার যাচ্ছিল, একটা দুষ্টু ছেলে মৌচাকে ঢিল মেরে সরে পড়ল, মানুষটা ঘোড়াশুদ্ধ ছটফট করে মরে গেল মৌমাছির কামড়ে। ছেলেটাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচাতে হবে এই কথাই কেবল মনে ছিল, নিজের কথা কি মনে ছিল তখন!" অপরকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছেন একথা কজন ভুলতে পারে? যাঁরা পারেন তাঁদের আদর্শই আজ দুর্ভাগা দেশের ঘনায়মান অন্ধকারে

শুধু ছুটিতে নয়, প্রতিদিনের জীবনেও নিজেকে ভুলে থাকা নন্দলালের বৈশিষ্ট্য। বন-ভোজনে বা দেশ ভ্রমণে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে কাঠ কাটতে, জল তুলতে, বাসন মাজতে তাঁর আলস্য দেখা যেতনা, আহারে শয়নে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা তাঁর জন্য হবার উপায় ছিল না। পৌষের মেলায় উৎসব প্রাঙ্গণ সাজাতেনও তিনি, আবার আশ্রম পরিষ্কারণের ভার নিতেন তিনি, মাথায় গামছা বেঁধে ঝুড়ি কোদাল আঁচড়া নিয়ে পথে পথে যখন তিনি ছাত্রদের নিয়ে ঘুরতেন জঙ্গল সাফ ক'রে তখন কার সাধ্য বলবে তিনি আশ্রমের মহাকবি ভারত-বিখ্যাত শিল্পী। সমাজের সবার নিচের তলায় যারা বাস করে তাদের সমবেদনা তাঁর অকৃত্রিম, তাদের দুঃখের ভাগ নিতে, তাদের নিরানন্দ গৃহে আনন্দ বিতরণ করতে তিনি সতত উৎসুক। গরীব মানুষ সস্তায় কিনতে পারবে বলে তিনি এক সময়ে দু'চার পয়সা দামে পট এঁকে বিক্রি করেছেন, কার্ডে ছবি এঁকে বিক্রি করেছেন মেলার সময়। তাঁর বেশ-বাসে, গৃহ-সজ্জায় তাঁর মত সর্বজনমান্য শিল্পীর উপযুক্ত আভিজাত্যের কোনো নিদর্শন আজও দেখা যায় না। মহাত্মাজীর আহ্বানে কংগ্রেসের অধিবেশনস্থল সাজাতে গিয়ে তিনি বাঁশের খড়ের তোরণ নির্মাণ প্রবর্তন করেছেন, গরুরগাড়ীকে অলঙ্কৃত করে সভাপতির রথ বানিয়েছেন। অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষ দিয়ে কি সুন্দর প্রসাধন হতে পারে তা তিনি শুধু মুখে ব'লে নয়—কাজে ক'রে দেখিয়েছেন। ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রথম জীবনে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা তাঁর প্রিয় ছিল, পরবর্তী জীবনে অর্জুন, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান প্রভৃতির সঙ্গে সাঁওতালদের ছবি, ছাগল, মোরগ, শালিখ, ফড়িংয়ের ছবি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য তিনি অজস্র এঁকেছেন সমান আনন্দে, আজও এঁকে চলেছেন অনলস নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে। টিনের টবে ফুল গাছ রেখে, কাঁচের গ্লাসে ফুল সাজিয়ে, ঘুঁটির ওপর কোট পরে আমরা যে রুচিহীনতার পরিচয় দিই তাতে তাঁর দৃষ্টি পীড়িত হয়। ভারতবর্ষের মানুষ উপকরণের দৈন্য সত্ত্বেও সৌন্দর্যের পূজা করতে জানত, আজ ভুলে যেতে বসেছে, তাই তার দারিদ্র্যে হীনতাবোধ এসেছে। মাষ্টার মশাইএর ব্রত এই হীনতা থেকে দারিদ্র্যকে মুক্তি দেওয়া। ঘরের বাইরে দুটি ফুল গাছ, ঘরের মধ্যে সুবিন্যস্ত দুচারটি আসবাব এবং তৈজস পত্র, ঘরের দেয়ালে বা মেঝের একটু আলপনা এতেই গৃহকে সুন্দর করা যায়। লাউয়ের খোলা, নারকেলমালা, বেলের খোলা প্রভৃতি থেকে সুন্দর সুন্দর পাত্র করেছেন তিনি, প্রকৃতি থেকে নব নব রূপ আহরণ করে অলঙ্করণশিল্পকে আলপনা, বাস্তিক ও কুলকারীকে নব জীবন দান করেছেন। প্রসাধনের এবং মেয়েদের বেশবাসের সুরুচিসম্মত আদর্শ স্থাপনের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। প্রাক্তন ছাত্রেরা শিক্ষা শেষ করে চাকরীর চেষ্টায় নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে একটি উপনিবেশ স্থাপন করে সংঘবদ্ধ চেষ্টায় দেশের কারুশিল্পের উন্নতিবিধান আর সেই সঙ্গে তাদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করার সঙ্কল্প ছিল তাঁর, সেজন্য অনেক ছাত্রের সহায়তায় জমি কিনে কারু সংঘ স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সম্পাদক স্থান ত্যাগ করায় ও অন্য সদস্যেরা বেশী দিন অল্প আয়ে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে একে একে অন্যত্র চাকরী নিয়ে চলে যেতে থাকায় বৎসর খানেক পরেই কারু সংঘ ভেঙে যায়।

গুরু অবনীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, প্রথম পরিচয়ে তিনি নন্দলালকে কিছু ছবি এঁকে এনে দেখাতে ব'ললে, নন্দলাল এঁকে এনেছিলেন ক্ষুদিরামের ফাঁসিরদৃশ্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসি যাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর নিজের হয়নি, সেজন্য যে কেউ স্বাধীনতাযুদ্ধে বুক ফুলিয়ে ক'রে এগিয়ে যেত তাকেই তিনি আপনজন ব'লে জ্ঞান করতেন। প্রথম যৌবনে ভগিনী নিবেদিতার স্নেহলাভ করেছিলেন তিনি, বিপ্লবী দলের অনেকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। অল্প বয়সে গুরুজনেরা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন, সংসারের দায়িত্ব পড়ে ছিল ঘাড়ে এবং সে দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের সাধনা—তাঁর জীবনের ব্রতরূপে ছিল চোখের সামনে, তাই বোমা বন্দুক নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারেননি তিনি, কিন্তু বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতা, অরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা তাঁর জীবনে ব্যর্থ হয়নি। দেশের অতীতকে, দেশের মানুষকে, মাটিকে তিনি সমস্ত-অন্তর দিয়ে ভালো বেসেছিলেন, বিদেশীর শাসন এবং শোষণ জ্বালা ধরিয়ে ছিল তাঁর দেহে মনে। সেইজন্যেই করতলগত সরকারী চাকরী তিনি উপেক্ষা করে পড়ে থেকেছেন অভাবের মধ্যে। বলতে বাধা নেই নিজেদের রঙ ময়লা হলেও ফরসা রঙের প্রতি আমাদের সকলেরই

দেখলুম যে নিজের কালো রঙের জন্য গর্বিত, সাদা চামড়া দেখলে যার নাড়ি ছেড়ে যায় সে ওই। পরিহাসচ্ছলে বলতেন, "ঈশ্বর তার রঙের বস্তা ঝাড়ি উজাড় করে ফেলেছেন আমাদের গায়ে, ওদের ভাগ্যে কিছু জোটেনি তাই সাদাই রয়ে গেছে ওরা।" বলতেন "আমাদের দেশের মানুষ কালো, দেশের দেবতা কালো (কৃষ্ণ, কালি), দেশের মাটি কালো, কটা রঙ এখানে মানায় না।" মহাত্মাজী যখন স্বদেশের মুক্তিসাধনায় নূতন পথের সন্ধান দিলেন তখন মাস্টার মশায় সে পথের পথিক না হয়েও যারা পথে বেরিয়েছে তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন। বিদেশী বর্জন করেছেন এবং করিয়েছেন, সুতো কেটেছেন এবং কাটিয়েছেন, দেশী রঙে ছবি এঁকেছেন এবং আঁকিয়েছেন। বন্ধু এবং শিষ্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, তিনি দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ শিবিরে গেছেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে, শ্রীনিকেতন আশ্রমে গেছেন, আলিপুর জেলে গেছেন ভিজিটার নিয়ে। মহিষবাথানে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলেছে মাস্টার মশায় বড়ো বড়ো পোস্টার এঁকে দিয়েছেন আমাদের সেগুলি লিনোতে কেটে হাতে ছেপে আমরা নগরে গ্রামে মেলায় মেলায় এঁটে এসেছি। কলকাতা কংগ্রেসের সময় তাঁর 'কাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' প্রচারিত হয়েছিল দু' রঙে ছেপে, মানুষের মাথা দিয়ে গড়া তাতে দুদিক থেকে দু'জন মেয়ে পুরুষ হাত বাড়িয়ে একটা পতাকা তুলে ধরেছে আর মাঝখানে একটা শিশু পতাকাদণ্ডটা ধরে আছে। আর একটা বিরাট পোস্টার ছিল 'লাগ লাগ হেল্‌কীলাগ'। ছবি-মাঝখানে জন বুল দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে ভুগড়ুগি বাজাচ্ছে, আর এক হাতে চাবুক ঘোরাচ্ছে, ছবির উপরে নিচে দুটি করে এবং দুপাশে দু'টি মোট ছ'টি বৃত্তের মধ্যে ইংরেজের হেদনীতির ছ'টি দৃশ্য: যথা হিন্দু সৈনিক পেশোয়ারীদের উপর গুলি চালাচ্ছে, মন্দিরের দরজায় গরুর মাথা রাখা, মসজিদের চূড়োয় শুয়োরের মাথা আটকানো, হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে ছুরি ও লাঠি মারছে ইত্যাদি। 'ইণ্ডিয়াজ ফষ্টার মাদার', নামক আর একটি পোস্টারে মোটাসোটা এক ইংরেজ নার্স মুখ বেঁকিয়ে বলছে 'আনগ্রেটফুল বীষ্ট'। তার পায়ের কাছে একটা বেতের ঝুড়িতে রোগা ছেলে ভারতবর্ষ হাত পা ছুঁড়ে কাঁদছে, কারণ তার মুখে ফীডিং বট্‌লের উল্টো দিকটা। ঘষিয়ে দিয়ে সামনের দিকে লম্বা নল লাগিয়ে চুষে যাচ্ছে তার ধাত্রী। সামনে তাকের ওপর আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রেলগাড়ী এই রকম টুকি টাকি খেলনা সাজানো। আর একখানা পোস্টারে মহাত্মাজী একটা দুর্গের উপরে দাঁড়িয়ে, হাত নেড়ে বলছেন ফিরে যেতে, দুর্গের নিচে সমুদ্র, তাতে ইংরেজ পিঠে পণ্যদ্রব্যের বোঝা বেঁধে সাঁতরে আসতে আসতে ডুবে মরবার উপক্রম করছে। এই রকম অনেক ছবিই তিনি এঁকে দিয়েছিলেন, আজ তাদের চিহ্নমাত্রও নেই, (যদি কারও কাছে কিছু থাকে তবে সন্ধান পেলে কৃতজ্ঞ থাকব) যাঁরা সে সব ছবি দেখেছেন তাঁদের শতকরা নিরানব্বইজন জানতেন না চিত্রকরের নাম, আজও অনেকে জানেননা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে শিল্পাচার্যের এই সহযোগিতার কথা। আজ স্বাধীন ভারতে মাস্টার মশাই দেশনেতাদের স্বীকৃতি পেয়েছেন, সম্মান পেয়েছেন। আজ তাঁর বহু শিষ্য, বহু ভক্ত। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম চিত্রশিল্পী এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল কিন্তু আজও কালি এবং তুলি ছাড়েন নি, প্রতিদিন একখানি ছবি কালির আঁচড়ে না আঁকলে তাঁর তৃপ্তি হয় না। আজও তাঁর মনে ক্ষোভ আছে আধুনিক শিল্পীরা এমন কি তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও প্রতিভাবান কেউ কেউ ভারতবর্ষের অতীতের শিল্পৈশ্বর্যের মহিমা উপলব্ধি করল না, বিদেশীর কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করতে লজ্জাবোধ ক'রল না। বিদেশীর কাছে পাঠ নিতে তাঁর দ্বিধা কোনদিন ছিল না, জাপানী ছবির, ইরোরোপের ছবির মাহাত্ম্য তিনি বোঝেন, সব দেশের ভালো ছবি দেখে তিনি আনন্দ পান, প্রয়োজন মতো তাঁদের শিক্ষা নিজের ছবিতে কাজে লাগান, কিন্তু ভারতীয় শিল্পী ভারতীয় পদ্ধতি ছেড়ে বিদেশী কোনো 'ইজম্'এর দাসত্ব করবে এ তিনি আজও সমর্থন করতে পারেন না। তাঁর মত ভারতপথিক কবীরের মত, বন্ধুর মতো সবার সঙ্গে মিশবে সবার কথা মেনে নেবে, গুণ স্বীকার করবে, কিন্তু নিজের আসনে স্থির থাকবে। প্রৌঢ় বয়সে তিনি আমাদের মডেলিং ক্লাসে যোগ দিয়েছেন, অয়েল পেন্টিংএ হাত দিয়েছেন, তা থেকে যেটুকু জানবার জেনে নিয়ে নিঃশব্দে নিজের পথে ফিরে গেছেন। তাঁর মতে ছবিটা কোন্ ধারায় আঁকা হ'ল সেটা বড়ো কথা নয়, ছবিটা ছবি হ'ল কিনা সেইটেই আসল কথা। আজ

বিশ্ব
ব্যঙ্গ
চিত্র

দেশ বিদেশের ব্যঙ্গ চিত্র

মহাভারত শর্মা

কিছুকাল পূর্বে বিলাতের বিখ্যাত পাঞ্চ পত্রিকার সম্পাদক কলিকাতায় এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে মানুষের হাসির উৎস ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হাসির গল্প এবং ছবির প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু উহাদের যোগান আর পূর্বের মত নাই। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে ব্যঙ্গ কৌতুকের পত্রিকা পরিচালনা করিতে রীতিমত অসুবিধা হইতেছে। তিনি অবশ্য মানুষের হাসির উৎস এইভাবে শুষ্ক হওয়ার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। কিন্তু এ ব্যাপার অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করিবার উপযুক্ত বিষয়। আমাদের দেশে এরূপ ঘটিলে অর্থ নৈতিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইত। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীদেশেও এরূপ ঘটিতেছে এবং তাহা নিশ্চয়ই অন্য কারণে।

মানুষ এখন অতিরিক্ত রাজনীতি-সচেতন। তার প্রতিটি কার্যকারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে দেশের রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যহ তার চিন্তা ভাবনা রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সকল ঘটনা তাহাকে আনন্দিত করেনা; ভীত সন্ত্রস্তকরে। প্রতিদিনের পত্রিকা প্রভাতবেলায় মোটা সরু ছোট বড় নানা হরফে পৃথিবীর সকল দেশের রাজনীতির সংবাদ এবং রাজনৈতিক ঘটনার এমন সব বিবরণ বহন করিয়া আনে যাহা চিত্তকে আনন্দ না করিয়া উদ্বেলিত করিয়া তোলে। চিত্ত আনন্দিত না করিয়া অশান্ত করিয়া দেয়। রাজনীতির চিন্তায় কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু রাজনীতি মহা উৎসাহে সকলের কথাই ভাবে এবং সর্বদা সকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। রাজনীতির এই মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব মানুষের হাসির উৎস শুষ্ক করিয়া দিতেছে।

মানুষ মনে মনে অভব্য অসভ্য থাকিলেও বাহ্যতঃ অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছে। প্রাণখোলা উচ্চ হাসি এখন আর কাহারও মুখে তেমন দেখা যায় না। কৌতুকের কথা যতই গাঢ় হউক না কেন শ্রোতার ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া ক্ষীণ হাসির রেখা চকিতে মিলাইয়া যায়। অসভ্য মাতানো হাসির উচ্চরোল অভব্যতার নিদর্শন মনে করিয়া সকলে সতর্ক থাকেন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইংরাজলেখক চ্যাজলিট বলিয়াছিলেন যে প্রাণখোলা হাসির জন্য এবং সার্থক রসিকতার জন্য কিছু অভব্যতা এবং গ্রাম্যতা (barbarism and rusticism) প্রয়োজন। সেই অভব্যতা এবং গ্রাম্যতা এখন অভদ্রতা বা অসভ্যতা মনে করিয়া সকলে উহা সযত্নে পরিহার করেন। আমাদের অতিরিক্ত ভদ্রতা নির্মমভাবে মনের উদ্বেলিত আনন্দ ও হাসির নির্গমন পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছে।

তথাপি হাসির জন্য মানুষ ব্যাকুল। ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ বলিয়াছেন, হাসিতে প্রাণের আনন্দ উথলিয়া উঠে। দুঃখেও হাসি পায়—কিন্তু কেহ সেই হাসির প্রত্যাশী নন। আমরা সকলেই সুন্দর হাসি কামনা করি। ব্যষ্টি ও সমষ্টির বাক্যে ও কর্মে, সাহিত্যে ও চিত্রে যে মার্জিত আনন্দময় হাসি—তাহাই প্রেয়।

বহুর প্রয়োজনে এই মার্জিত আনন্দময় হাসির সার্থক প্রকাশ গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধে যেমন পাওয়া গিয়াছে তেমন পাওয়া গিয়াছে চিত্রের মাধ্যমে। মানব মনের এই বাঞ্ছিত প্রয়োজন সার্থক করিবার জন্য এ সবের প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া চিত্র, যাহা প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং চিরকাল ব্যবহৃত হইবে। প্রাচীন কালের অর্ধসভ্য মানুষ গুহাগাত্রে সামান্য রেখার স্পষ্ট চিত্র আঁকিয়া ওষ্ঠাধর বিস্ফারিত করিয়া নিশ্চয় আনন্দের হাসি হাসিয়াছিল। তার পক্ষে একথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না যে দূর ভবিষ্যতের সুসভ্য মানুষ তার আঁকা ঐ ছবি আদি কার্টুন নামে অভিহিত করিবে। কার্টুনের আদিপর্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিশেষজ্ঞরা এ কথাই বলেন, যে কোন বিশেষ ভাব অথবা ঘটনা—ছোট ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করাই কার্টুন আঁকা; এবং এই ধরণের চিত্র মানুষ প্রাচীন কালে গুহাগাত্রে আঁকিত এবং বর্তমানে পত্রিকার পাতায় পাতায় আঁকিতেছে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, সকল ছোট ছবিই কার্টুন নয়; আর সকল কার্টুনই হাসির উদ্রেক করে না। কার্টুন মানুষকে হাসায়, মানুষের মনে নতুন ভাবনার সঞ্চার করে, গভীর সমবেদনা

কার্টুন শব্দটি চলে আসলের। এ শ্রেণীর ছবির নাম পূর্বে ছিল ক্যারিকেচার। কিন্তু চিত্রাঙ্কনে যে ললিতকলা প্রকাশ পায় কার্টুন অপেক্ষা ক্যারিকেচরে তাহার পরিমাণ একটু বেশী। কার্টুন ললিতকলার অন্তর্ভুক্ত আছাই। কোন মানুষ বা ঘটনার মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া উহার মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক ভাব ফুটাইয়া তুলিবার দিকেই কার্টুনের অধিক নজর। গভীর সমবেদনার যে কার্টুন তাহার মধ্যেও রঙ্গ থাকে।

কিছুকাল পূর্বে শঙ্করস্ উইক্‌লিতে মুদ্রাস্ফীতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিপদ সম্পর্কে একটি কার্টুন প্রকাশিত হয়। একখানা কাঠের সঙ্গে হাত পা বাঁধা অবস্থায় একটি লোকের সমস্ত শরীর ক্রমবর্ধমান জলে প্রায় ডুবিয়া যাইতেছে—লোকটি কোন প্রকারে নাক উঁচু করিয়া বাঁচিবার চেষ্টায় ব্যস্ত। ঐ কাঠখণ্ড তাহার নির্দিষ্ট আয়ের এবং ক্রমবর্ধমান জলরাশি মুদ্রাস্ফীতির প্রতীক। মুদ্রাস্ফীতির ভক্ত ধারী পক্ষ বাজের লক্ষ্য, আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতীক হাত পা বাঁধা লোকটি সমবেদনার পাত্র।

গভীর বিদ্বেষ বা ঘৃণা প্রকাশের জন্যও এ শ্রেণীর ছবি বিশেষ উপযোগী। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁর আমলে গিলারী নামে এক কার্টুনিষ্টের আঁকা ছবির নিন্দা করেন। গিলারী তার উত্তর দেয়, জর্জের নামে নানাপ্রকার কার্টুনের মাধ্যমে। রাজার শিষ্টতা (Royal Affability) নামে একখানা কার্টুনে রাজা তাঁর বেঁটে মোটা বৌকে বগলদাবা করিয়া এক গ্রাম্য শূকর পালককে বলিতেছে, হে হে বন্ধু, তুমি কেমন আছ? তুমি যাচ্ছ কোথায়? তোমার নাম কি? তোমার বাড়ী কোথায়? হেঁ হেঁ।

কার্টুন আঁকিয়া শাসকসম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে শ্রীঘর বাস করিবার সৌভাগ্য হয় ছ্যানেলার নামে এক ফরাসী কার্টুনিষ্টের। ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর প্যারিসে বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে দরিদ্র শ্রেণী ধনিকের দ্বারা অত্যাচারিত হইবে এমন আশঙ্কা দেখা দেয়। ছ্যানেলার তখন আঁকিলেন, অট্টালিকার কটি লোকের উপরে বসিয়া পাঁচতলার অপর কটি লোক ভূরিভোজনে ব্যস্ত। এই ছবি আঁকার ফলে তিনি জেলে যান।

বিশ্ব ব্যঙ্গ চিত্র এই পাতায় এখন হইতে পরপর নিয়মিত বিশ্বচিত্রের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হইবে। সকলপ্রকার ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন প্রকাশের দ্বারা পরপর রসিক এবং রসজ্ঞ পাঠকবর্গের প্রীতি এবং সন্তোষ বিধান করিতে পারিবে এই ভরসায় নূতন এই বিভাগটির প্রবর্তন করা হইল।

অতি সাধারণ জীবন যাত্রা !

জোশ শোন। দুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। স্যুটকেশটা গুছিয়ে দাও।

বেশী কিছু নয়। জামা-কাপড়, টিনের-ভাংকো, ওয়েষ্টকোট, গরমকোট—এই আর কি !

হ্যাঁ, বেশো একটা সার্জের স্যুট, আর একটা আলাদা স্যুটও দিও।

যদি গলফ্ খেলতে হয়, তাই একটা নিকারবোকার স্যুট আর একটা সাদা ফ্লানেলের টেনিস স্যুট দিও—যদি টেনিস খেলি।

মাছ ধরতেও পারি ; কাজেই একটা টুইডের

একটা মোটা ওভারকোট দিও। আর যদি বৃষ্টি হ

কিছু গরম কাপড়-চোপড়—যদি ঠাণ্ডা পড়ে, আর কিছু পাতলা ছাড়া কাপড়—যদি গরম পড়ে।

আর দেখো : যা সব সময় দরকার—এই ধরো, জুতো, বুট জুতো, টুপি, টাই, সার্ট, মোজা, কলার, সেভিং—সেট, টিফিন-কেরিয়ার—এসব তো দেবেই !

এইসব সুটকেসে ভর্তি করে টাঙ্গিতে তুলে দাও কেমন !

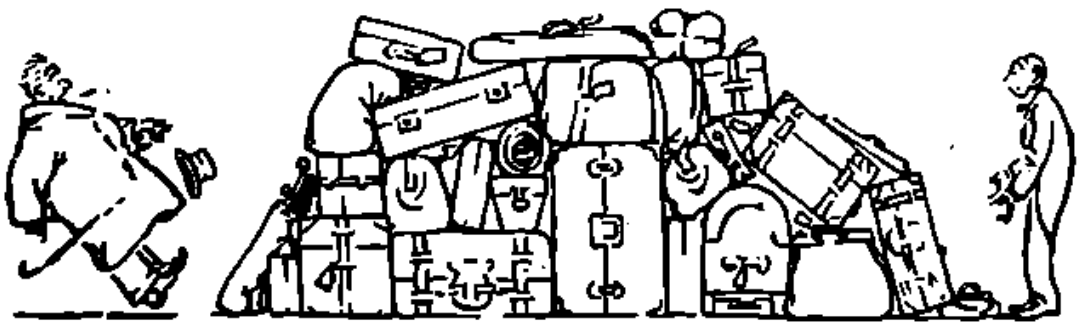

Punch

ষোড়শ বর্ষ ফাল্গুন

নবম সংখ্যা ১৩৬৭

গল্প-ভারতী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ফাল্গুনী শুক্লাদ্বিতীয়া ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি। যে বিরাট ঊর্দ্ধমূল অধোশাখ ধর্মতরু সংশ্রুত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া স্নিগ্ধ পল্লবচ্ছায়ে স্বার্থান্ধ কামনা বাসনার দাবদগ্ধ অসংখ্য নরনারীকে পরমাশ্রয় প্রদান করিয়াছে, এই বিশেষ দিনে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। অনির্বচনীয়ের সেই অপূর্ব প্রকাশের অঙ্কুর লোকচক্ষুর অগোচরে ভারতের তথা জগতের সমস্ত বিশিষ্ট সাধনধারার পুণ্যবারিসেচনে পল্লবিত বিকশিত ও ফলপুষ্প সমন্বিত বিশাল বনীরুহে পরিণত হইল। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে যে পরমাশ্চর্য ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে, দেশকালের ব্যবধানে ইহা তাহারই আর এক বিচিত্র পুনরাবৃত্তি। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমরা ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেছি। আমরা বুঝিতেছি, ভারতীয় সভ্যতার প্রথম বৈশ্ববেখাসিদ্ধ ঋষিকণ্ঠে মানব জাতিকে অভয় দিয়া যে অমৃত বাণী উৎসারিত হইয়াছিল, যাহা বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র অবস্থার মধ্যে নানা মহাপুরুষের কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ বিঘোষিত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় আর এক অলৌকিক চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণীর সত্যকারবাহী স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাপুরুষ সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছিলেন, * * * কালবশে নষ্ট সনাতন ধর্মের সার্বভৌমিক, সার্বকালিক ও সার্বজৈবিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া লোকসমক্ষে সনাতন-ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"...এই নবযুগধর্ম সমগ্র জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবযুগপ্রবর্তক শ্রীভগবান পূর্ণ শ্রীযুগধর্ম প্রবর্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

"মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গত রাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার একদেহ ধারণ করে না। হে মানব, আমরা মৃতের পূজা হইতে তোমাদিগকে জীবন্তের পূজায় আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।

অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্ব সকলের উদ্ভাবন করিবে, যাহাতে ভারতাভ্যন্তর ও ভারত-বহির্ভূত সকল বিরোধী সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করিতে ও এইরূপ অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্য ভাবে উন্নতি সাধক সার্বভৌমিক ধর্মের প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। * *

সে অনেক কথা, এখন সময় নাই। সুতরাং আমি ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।"

পাশ্চাত্যদেশ হইতে স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরিয়া কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তরে স্বামিজী বলিলেন, "আপনারা আমার হৃদয়ের আর এক তন্ত্রী—সর্বাপেক্ষা গভীর তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন—আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম করিয়া যদি কায়মনোবাক্যে দ্বারা আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই। তাহা তাঁহার। * * যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার শক্তির খেলা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্য, বন্ধুগণ জগৎ এখনো সেই নরবরের সহিত পরিচিত হয় নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিতেছি। এখন আমরা যে আকারে সেই সকল জীবনী পাইতেছি, তাহাতে শত শত শতাব্দী ধরিয়া শিষ্য প্রশিষ্যগণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনরূপ কলম চালানোর পরিচয় পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ঐ সকল মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতকে বসিয়া বসিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন যেরূপ উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের তদ্রূপ নহে।

যে ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরায়, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, স্বামী বিবেকানন্দ তাহা স্বদেশে ভারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এবং এই মহাপুরুষের প্রেরণায় তিনি আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সহযোগিতার ভাবী যুগের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি সর্বমানবকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। ভারত এই আহ্বান শুনিয়াছে, ভারতের প্রসুপ্ত মনুষ্যত্বকে পুনরায় অদ্বৈতবেদান্তের ভেরী নিনাদে উদ্বুদ্ধ করিয়া "যত্র জীব তত্র শিব" এই মহামন্ত্রে যিনি দীক্ষা দিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, দুর্নীতি দৈন্য ও ভেদের পঙ্কিল আবর্ত হইতে ভারতের মনুষ্যত্ব নিষ্কলঙ্ক মহিমায় উত্থিত হইয়া পুনরায় বিশ্বমানবের মহামন্ত্রেলনে যথাস্থান গ্রহণ করিবে। আমরা কি ইহা বিশ্বাস করি? আমরা কি ঠাকুরের জীবন ও বিবেকানন্দের বাণীতে বিশ্বাস করি, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত দৈত্রিক শক্তি বিদ্যমান, যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনরুদ্গম হইবে।"

যখন দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী মিলনের পথ উন্মুক্ত হইল, যখন বিশ্বচিত্তে উদ্বোধনের মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, তখনই দেখিতেছি, স্বার্থবুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিতেছে। পাশববলে শক্তিমান পাষণ্ডেরা বুদ্ধির দুর্মতি দিকে দিকে উদ্ধত ভাবে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ইহাকে ধিক্কার দিবার মত নৈতিক বলের উপর যদি বিশ্বাস ও ভরসা না রাখিতে পারি, যদি দুর্বল ধিক্কার আমাদের সংশয়াকুল চিত্ত শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কারের বোঝা ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে অক্ষম হয়, অন্যায় অশিবকে সর্বান্তঃকরণে অস্বীকার করিবার

শক্তির অভাব অনুভব করি তাহা হইলে আইস সকলে মিলিয়া অকৃত্রিম আকুতি লইয়া শরণাগতরূপে এই মহাশক্তির উৎস বিনিঃসৃত কৃপাবারি অঞ্জলি ভরিয়া পান করি। আর গদগদীকৃতবাসে বলি হে রামকৃষ্ণ, হে মহাশক্তির অনির্বচনীয় প্রকাশ, তুমি আমাদিগকে শক্তি দাও, এই ক্ষুদ্রতা, এই গণ্ডীর বন্ধন, এই তুচ্ছ আড়ম্বর, এই আত্মপরায়ণ স্বার্থান্বেষণের কদর্য চেষ্টা হইতে তুমি আমাদের দূরে বহুদূরে লইয়া যাও। যেখানে তোমার তাবৎসম্পদের উত্তরাধিকারী মানব-সন্তানগণ, সর্বমানবের মুক্তি সাধকরূপে বর্তমান মানব সমাজের হিংসা চর্চা, পরের অধিকার লঙ্ঘনের অধর্ম-দুঃসাহসিকতার সমস্ত আলোময় পরিণাম ধৈর্যকঠিন বক্ষে ধারণ করিতেছেন, যেখানে অচল প্রতিষ্ঠ সত্যের উপর ভরসা রাখিয়া তাঁহারা বর্তমান জগতের স্বার্থমথনে উত্থিত গরলরাশি অম্লানবদনে পান করিতেছেন, সেই কঠিন কঠোর কর্মভূমিতে আমরাও বর্তমান হইব, বিশ্বাস রাখিব, তোমার কল্যাণেচ্ছার অবিচল মহিমায় প্রতিহত হইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষা, তুচ্ছ অহংকার মস্তক অবনত করিবে। হে রামকৃষ্ণ, তোমার ভাবীযুগের সংগ্রামের কল্যাণশক্তি আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করিয়া সৈনিকের দৃঢ়তা প্রদান করুক। আমরা অগ্রসর হইব, তোমার পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিব, বক্ষশোণিতে সেই পতাকার উপর লিখিয়া দিব, নবযুগের আদর্শ—ত্যাগ ও সেবা।

মহান আচার্যদেবের নিকট আমি আর একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়—এই অদ্ভুত সত্য যে, জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর বিরোধী নহে। উহারা এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এক সনাতন ধর্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব আমাদিগকে সকল ধর্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব, সমুদয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয় তাহা নহে, পাত্র হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম তীব্র কর্মশীলতারূপে প্রকাশিত, কাহাতেও প্রবলা ভক্তি, কাহাতেও যোগ, কাহাতেও বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। তুমি যে পথে যাইতেছ, তাহা ঠিক নহে, একথা বলা ভুল। এইটি করিতেই হইবে এই মূল রহস্যটি শিখিতে হইবে। সত্য একও বটে, বহুও বটে, বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ না করিয়া আমরা সকলের প্রতি অনন্ত সহানুভূতি সম্পন্ন হইব। যতদিন পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে, এইটি বুঝিলে অবশ্যই আমরা পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি করিতে সমর্থ হইব। —স্বামী বিবেকানন্দ।

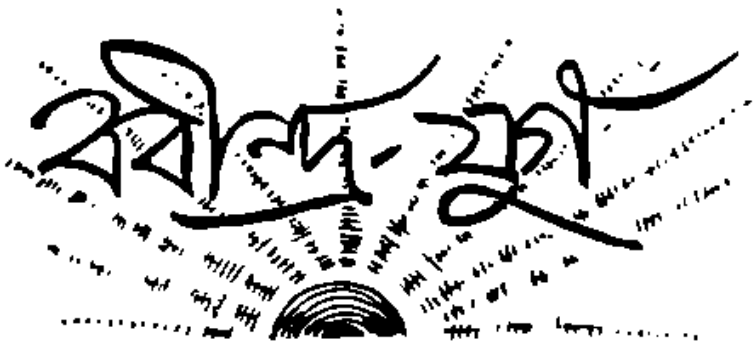

শ্রীকালিদাস নাগ

প্রতা-সত্তাতার পূর্ণ প্রতীক রবীন্দ্রনাথ আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যের জহুরী একথা আজ স্বীকৃত হলেও Nobel পুরস্কার প্রাপ্তির আগে তা কম ভারতবাসীই জানতেন। ১৯১১ সালে ৫০ তম জন্মোৎসবে Rev Milburn কবিকে গভীর শ্রদ্ধা জানান তা লিখেছি ও তাঁর প্রথম বিদেশী ইংরেজ সমালোচক Rev Ed Thompson (1886-1906) বাঁকুড়া Wesleyan College এ রবীন্দ্র পাঠ সুরু করেছেন। ১৯১২সালে সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত Town Hall-এর সভার পর বৎসর তাঁর ৫১ তম জন্মোৎসব আমরা করেছিলাম জোড়াসাঁকোর ঋষি ভবনে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন দত্ত, দিনেন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতিকে নিয়ে। তার চার দিন পরে (১২ই মে ১৯১২) কবি তাঁর পুত্রবধূ ও পুত্রকে সঙ্গে করে তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। আমি প্রবাসী ও Modern Review অফিসে নিয়মিত গিয়ে দেশী ও বিদেশী পত্রিকাদির Press Cuttings রাখতে সুরু করলাম। ৪০ বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের (৪ঠা জুলাই ১৯০২) ঠিক দশ বছর পরে ৭১ বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথ ১৬ই জুন লণ্ডনে পৌঁছলেন। তখন লণ্ডন Royal College of Arts-এর অধ্যক্ষ William Rothenstein (১৯১০ সালে তিনি জোড়াসাঁকো আসেন ও তাঁর স্মৃতিকথায় এসব ঘটনা লিখে গেছেন) তাঁর বন্ধু মহলে কবিকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি আইরিশ সাধিকা ভগ্নী নিবেদিতার অনূদিত কাবুলিওয়ালা গল্পটি Modern Reviewতে পড়ে মুগ্ধ হন। কেশবচন্দ্রের শিষ্য প্রবলাল সেন ও ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীল ১৯১১-১২ সালে লণ্ডনে ছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিম-যাত্রায় উৎসাহিত করেন; ডাঃ শীল Universal Race Congress এর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন; সেটির প্রথম ও শেষ রিপোর্ট দেন ভগ্নী নিবেদিতা, তিনিও তাঁর গুরু বিবেকানন্দের মত অকালে চলে গেলেন (১৯১১)। কবির প্রাণস্পর্শী প্রবন্ধ 'ভগ্নী নিবেদিতা' আমরা প্রবাসীতে পড়েছি ও Modern Reviewতে নিবেদিতার শেষ রচনা 'নীল পাখী' (Blue Bird) বেলজিয়ামের Nobel Laureate Maeterlinke এর সমালোচনা পড়ে মুগ্ধ হই। ১৯১২ সালে মেটারলিংকে Nobel পুরস্কার পান ও সেই সময়ে প্রকাশিত ডাকঘর নাটকে তাঁর প্রভাব লক্ষিত হয়। আইরিশ কবি প্রখ্যাত W. B. Yeats যে ইংরেজী Gitanjali (India Society, London 1912) মুখবন্ধ লেখেন ও সেই বই নোবেল পুরস্কার পেয়ে (নভেম্বর ১৯১৩) পূর্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষ থামিয়ে বিরাট সমন্বয়ের পথে সবাইকে এগিয়ে দিয়েছিল। বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথই সেই সমন্বয়ের সার্থক নেতা ও পথিকৃৎ ও দ্রষ্টা-ঋষি (Seer)। তাই নৈবেদ্য খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে সংকলিত কাব্যের অনির্বাচিত ও নিজস্বতে ইংরেজীতে অনূদিত Gitanjali জগতের বিস্ময় জাগিয়েছিল ও আজও জাগায়। সেকালে কবি তাঁর গল্প ও পদ্য বহু রচনা নিজের মত রূপান্তরিত করেছেন ইংরেজীতে সবাই আমরা জানি। কিন্তু ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত অনর্গল বাংলায় কলম চালিয়ে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ Bilingual (দ্বিভাষিক প্রতিভা) বনে গেলেন কি করে?

এ প্রশ্নের জবাবও সাধারণে না পেলে গীতাঞ্জলির বিশ্ববিজয় দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে থাকবে তাই সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু লিখছি। গবেষণার বিরাট ক্ষেত্র এখানে পড়ে আছে, কিন্তু বাংলার তথা ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় এ কাজে নামেন নি—রবীন্দ্র শতাব্দী উৎসবে সে দুঃখ না জানিয়ে উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পাশও করেন নি; তাই আজ অবধি হয়ত অনেকের ধারণা তিনি ইংরেজী শেখেন নি। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য ত দূরের কথা—ইংরেজীও তিনি ভাল করে শেখেননি এটি মহাভ্রম; তাহলে কোন্ মায়ামন্ত্রে (Magic) তিনি Gitanjali, Gardner থেকে সুরু করে Sadana (Harvard বক্তৃতা) ও Religion of Man প্রভৃতি গভীর রচনা ইংরাজীতে প্রকাশ করে পৃথিবীব্যাপী সাড়া কি করে তুলতে পারেন? মাসিক পত্রিকার ছোট প্রবন্ধে এসব ব্যাপার ভাল করে আলোচনা সম্ভব নয়। তবু তাঁর ৫০ থেকে ৮০ অর্থাৎ জীবনের শেষ ৩০ বৎসর তাঁর সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়, তাই অলিখিত এক থীসিস (Thesis) এর আভাষ আজ দিয়ে যাই।

রবীন্দ্র জন্মের পর বৎসর তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) বিলাত যাত্রা করেন ও তাঁর সহযাত্রী হন স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪-৭৩) যাঁর অকাল মৃত্যুর (৪৯ বছর) পর সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ডায়েরী বা চিঠিপত্রে Captive Lady ও মেঘনাদ বধ রচয়িতা সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন কিনা তার সন্ধান করা হয়নি; কিন্তু প্রতিভা ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩-১৯৬০) তাঁর বাবা ও মা জ্ঞানদানন্দিনীর কিছু চিঠি প্রকাশ করে গেছেন। তাঁদের সঙ্গেই ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাতযাত্রা করেন (১৮৭৮-৮১) ও ইউরোপ প্রবাসীর পত্র রচনা করেন। তখনকার "ভারতী" পত্রিকায় দেখি কিশোর রবি Anglo Saxon এবং Anglo Norman সাহিত্য অবলম্বনে দুটি প্রবন্ধ ও মূল কাব্যের তর্জমা ছেপেছেন! আর বালক অভিনেতা রবি তার বহু ভাষাবিদ দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৯-১৯২৫) উৎসাহে শুধু ইংরেজী নয় ফরাসীও পড়তে সুরু করেন; কারণ "কৈশোরক" গ্রন্থে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ কৃত Hugo Musset ও Lamertine প্রভৃতি ফরাসী কবিদের অনুবাদ ছেপেছেন। ইংরেজ কীট্‌স ও শেলী ব্রাউনিং ও সুইনবার্ণ ত তাঁর মুখ থেকেই আমরা শুনেছি আবৃত্তি করতে। কলেজের অধ্যাপকদের নোট্‌ টুকেও যা বুঝিনি তার চেয়ে গভীরতর অনুপ্রবেশ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়ে গেছেন। আর সেকস্‌পীয়র তাঁর এত প্রিয় যে "ম্যাকবেথ" এর মত কঠিন নাটক স্কুল ছাড়ার আগেই সুষ্ঠু অনুবাদ করেন—ডাইনীদের গান রবীন্দ্র অনুবাদে আজ প্রসিদ্ধ। ১৮৭৮-৮১ তিন বছরে তিনি ভাল ভাল নাটক ও অপেরা লণ্ডনে দেখেন ও Henry Morley'র মত পণ্ডিত অধ্যাপকের তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শুধু সাহিত্য নয় বিজ্ঞান ও দর্শনের কত বই পড়েছেন তার হিসাব কেউ রাখেনি কিন্তু ১৮৮১-৯১ (সাধনা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত) এই দশকে রবীন্দ্রনাথ Herbert Spencer ও তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতদের চিন্তাধারা অনুসরণ করে ভারতী ও সাধনা পত্রিকায় লিখেছেন। দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণ সেরে (১৮৯০) ডায়েরী ও "পঞ্চভূত" (কিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমদের সরল বাক্যালাপ) রম্য সাহিত্যের (Belles Letters) আদি রচনা অধ্যাপক Lowes Dickenson এর গভীর রহস্য প্রাণ এই বই খানি "চীনে ম্যানের" চিঠিতে রূপান্তরিত করে ভারতের সঙ্গে চীনের মৌলিক চিন্তায় মিল রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন; তাই বিবেকানন্দের দেহত্যাগের আগে (১৯০১-২) ভগ্নী নিবেদিতা ও জাপানী মনীষী Count Okakura রচিত—Ideals of the East বইখানি ঠাকুর বাড়ীতে বসে যখন লেখা তখন অবনীন্দ্রনাথ শিল্পে নবজাগরণ সুরু করছেন। ইংরেজ Havell সাহেব ও সিংহলী দেশ-প্রেমিক কুমারস্বামী "Art and Swadeshi" রচনা সুরু করছেন। ঠাকুর পরিবারে রম্য-সাহিত্য ও শিল্পকলার আদর সমানভাবেই চলেছিল। তাই ১৯০৯—১০ সালে—

অর্থাৎ তৃতীয় বিলাত যাত্রার আগেই সুরজ Fox Strang-way ঠাকুর-বাড়ীতে মার্গ সঙ্গীত শুনে স্বরলিপিসহ Music of Hindusthan প্রকাশ করেন। তেমনি শিল্পীপ্রবর Rothenstein জোড়াসাঁকোয় এসে কবি যে শ্রেষ্ঠ গদ্য রচয়িতা সেটি আবিষ্কার করেন; তাঁর ঘরেই প্রথম গীতাঞ্জলি পাঠচক্রে বসে এবং তার ফলে এশিয়ার প্রথম Nobel Prize এল (নভেম্বর ১৯১৩)। তখনও তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত (১৮৭১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চলছে ৭০ বছর ধরে। আমরা সাগ্রহে "তত্ত্ববোধিনী" পড়ি, কারণ কবি নিজে সম্পাদক ও বন্ধু অজিৎকুমার চক্রবর্তী সহ-সম্পাদক।

প্রায় প্রতি মাসে চিঠি অথবা পত্র-প্রবন্ধ গুরুদেব পাঠাচ্ছেন অজিতকে আর তিনি আমায় পড়তে দিচ্ছেন যেমন দিতেন দ্বিজেনদাদা (Dr. D. N. Maitra) Mayo হাসপাতালে। Gitanjali'র ভূমিকা লেখার সময় Yeatsকে অনেক সাহায্য করেন ডাঃ মৈত্র। সেই পাশ্চাত্য অভিযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ যেমন পান তরুণ আইরিশ কবি Yeatsকে, তেমনি প্রবীণ সাহিত্যিক Milton-এর ভাষ্যকার অধ্যাপক Stopford Brookeকে পিতামহ ভীষ্মের মত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম ইংরাজী জীবনী ছাপেন বিখ্যাত Every Man's Library সম্পাদক Ernest Rhys। কিন্তু তিনি বাংলা না জেনে অনেক ভুল করেছেন দেখে বাঁকুড়ার অধ্যাপক Thompson মূল রবীন্দ্রকাব্য পড়তে (১৯১০- ২২) তিনি ছিলেন বাঁকুড়া Wesleyan College এর অধ্যাপক এবং বাঙালী পণ্ডিতের সাহায্যে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের শাক্ত-সঙ্গীতাদি পড়ে একটি বই ছাপান ও Y. M. C. A. প্রকাশনীর তাগাদায় (ভুল থাকলেও) বাংলার সাহায্যে টমসন্ 'Rabindranath Tagore' প্রকাশ (১৯২৩) করেন (এর সংশোধিত শতাব্দী সংস্করণের ভার আমার উপরে এসেছে) এই বইখানি পরে বড় করে Tagore Poet and Playwright (Oxford University Press) প্রকাশ করেন ও Dr. Thompson Oxford-এ বাংলা অধ্যাপনার ভার পান। মৃত্যুর ঠিক আগে তার সংশোধিত সংস্করণ ছাপাতে দিয়ে আমাদের—বিশেষ করে তাঁর বন্ধু অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশকে কৃতার্থ করেন। 'বিদায় অভিশাপ' ও 'উর্বশীর' মত কঠিন রবীন্দ্ররচনা তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করে গেছেন তাঁর কথা পরে বলব। তেমনি Rev. C. F. Andrews ও "গোরা" অনুবাদক অধ্যাপক W. W. Pierson ও শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়ে আজীবন রবীন্দ্র সেবার আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করে গেছেন। পূর্ব ও পশ্চিমের এই সখ্য ও সহযোগিতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ এই দুই ইংরেজ বন্ধুদের কবি পশ্চিম দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ সংগ্রামে সাহায্য করেন (১৯২৩)।

ইংরেজী গীতাঞ্জলীর ভাষা ইংরেজ সাহিত্যিকদেরও বিস্ময় জাগিয়েছিল; আমেরিকার প্রগতিশীল কবি Ezra Pound তখন এক বড় প্রবন্ধ লেখেন ও Chicago Poetry পত্রিকা সম্পাদিকা Harret Monroe সে যেসে কয়েকটি রবীন্দ্র অনুবাদ ছাপেন, তাঁর নিজের কাছে শুনেছি। এখনো জীবিত ৮৭ বছর মার্কিন কবি Robert Frost ১৯১২—১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের দর্শন পান এবং প্রথম মার্কিন Nobel Laureate Sinclair Lewis রবীন্দ্রসম্বর্ধনা সভায় আগে অভিনন্দন করে যান তাঁর বন্ধু গোর্কির ভোজে সেটি স্বচক্ষে Newyorkএ দেখেছি—সেই ১৯৩০-৩১ সালেই কবির শেষ আমেরিকা যাত্রা। ইতিপূর্বে ১৯২৪ সালে তিনি Argentina যাত্রায় অসুস্থ হয়ে ফিরে আসেন।

মার্কিন দেশের নয়নারী Macmillan Co প্রকাশিত লক্ষ লক্ষ রবীন্দ্র গ্রন্থ কিনেছে ও পড়েছে। তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি Canada-U. S. A. থেকে Latin America পর্যন্ত ভ্রমণ কালে (১৯৩০-৩০) দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম অনুবাদ হয় স্পেনীয় ও পর্তুগীজ ভাষায়। কিন্তু বাংলা না জানায় তারা ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ

পড়েই মুগ্ধ! ফরাসী শিল্পী Andre Gide তাঁর কলমের যাদু দিয়ে ফরাসী Gitanjaliও বিরাট প্রচার করেন। কিন্তু মূল বাংলা কাব্য কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও উচ্চস্তরের সেটি দেখাবার জন্য Romain Rolland ও তাঁর ভগ্নী মাদলেনের অনুরোধে (ইনি আমার কাছে বাংলা শেখেন ও চতুরঙ্গ অনুবাদ করেন) আমি প্যারিস ছাড়ার আগে P. J. Jouveএর সঙ্গে মিলে 'বলাকা'র ছন্দে ছন্দে আক্ষরিক অনুবাদ করি, সেটি পড়ে বিশেষ প্রশংসা করে বলেন "The Unknown Tagore"! (এ বিষয়ে অধ্যাপক নীরেন রায় লিখেছেন)।

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। রুশ রাষ্ট্র ও জনসংঘ সেটি বুঝে তাঁদের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের সব গদ্য ও পদ্য রচনা মূল বাংলা থেকে অনুবাদ করিয়ে বহু লক্ষ কপি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন এবার U S S R ঘুরে দেখে গভীর আনন্দ পেলাম।

তাই বাংলা ভাষা হতে চলল এক আন্তর্জাতিক ভাষা বাণীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথেরই আশীর্বাদে। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। এই কথা লিখলাম 'গীতাঞ্জলি'র দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল তোমাকে আমরা পেয়েছি—সেই দিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ঐ একই কথা আওড়াতে চায় যে, তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসবটি ক'রছ তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোন গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয় তা বলতে পারিনে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়—তেমনি মানুষকে বার বার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়। একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম—কোন রহস্যধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম কে জানে। কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখ-দুঃখ ও স্নেহ প্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে জন্ম-লাভ করেছি। বাপ-মায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম, তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মত আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে! সেই জন্যেই আজকের এই আনন্দ। —রবীন্দ্রনাথ।

সুখ

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

দশ

মালার মন থেকে কিছুতেই যায় না যে মায়াপাহাড়ের অবস্থান পঞ্চনদীর তীরে। আর কয়েক বছর এগোলেই সেখানে পৌঁছনো যেত। সেই ক'টি পদক্ষেপ থেকে তার মা তাকে বঞ্চিত করলেন। তাই মুক্তা করার জন্য আর সোনার শুকপাখী হাতের কাছে এসেও হাতের নাগালের বাইরে থেকে গেল।

এ কথা তো সে মাকে বাবাকে খুলে বলবে না। নোয়াখালী সে কেন গেল, সেখানে কী করে এলো তাও তাঁদের জানায়নি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে সে গান্ধীজীর মতো শান্তিস্থাপনের ব্রতে নিযুক্ত ছিল। গান্ধীজী আপাতত সেখানে নেই বলে চলে এসেছে। গান্ধীজী এখন দিল্লীতে। পরে হয়তো লাহোর যাত্রা করবেন। তাই মালারও গতি সেইদিকে। তাঁদের কিন্তু সম্মতি নেই তাতে। পাঞ্জাবে যা ঘটেছে তা অমানুষিক। যেমন মুসলমান তেমনি শিখ কেউ কম মারেনি, কম ধরেনি, কম কাড়েনি, কম পোড়ায়নি। হিন্দুদেরও 'অবদান' নগণ্য নয়। তারাও কারো চেয়ে কম পালায়নি।

মেসোমশায় মালাকে বোঝান, "আমরা এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক। সীমান্তের অপর পারে আমরা যেমন অসহায় তেমনি অনধিকারী। তারাও কি এ পারে যখন খুশি আসতে পারে? লাহোর যাব বললেই তো যাওয়া হয় না। তা যদি হতো গান্ধীজী দিল্লীতে পায়চারি করতেন না। সবুর কর। অবস্থা শান্ত হোক। তার পর যাবে।"

তার পর যাবার দরকার কী থাকবে? মানুষ বিপন্ন বলেই না যাওয়া। মালা আপনাকে বাঁচাতে চায় না। চায় পরকে বাঁচাতে। বিশেষ করে মেয়েদের উদ্ধার করতে। দু'পক্ষই নাছোড়বান্দা যে, যতক্ষণ এরা না ছাড়ে ততক্ষণ ওরা ছাড়বে না। যতক্ষণ ওরা না ছাড়ে ততক্ষণ এরা ছাড়বে না। দু'পক্ষই রাবণ।

আমিও তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। সে বুঝেও বোঝে না। রূপকথার জগতে সীমান্ত নেই। রাজপুত্র ঘোড়া চালিয়ে দেয় অবাধে। কিরণমালাকে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়নি। মায়াপাহাড়ের মায়া সরকার আপত্তি করেনি। বোধহয় টের পায়নি। টের পেলে কি সোনার শুকপাখী বিনা মাশুলে পাচার করতে দিত?

"এটা রূপকথার জগৎ নয়।" আমি বুঝো ধরি।

"তা হলে এটা কিসের জগৎ?" মালা প্রশ্ন করে।

মামুলি উত্তর দিতে আমার বাধে। তলিয়ে দেখলে রহস্যের কূলকিনারা পাইনে। কোটি কোটি সূর্য তারা নীহারিকার দিকে তাকাই, যাদের শাদা চোখে দেখা যায় না সেইসব অণু পরমাণুর দিকেও। বাস্তব কি কেবল মানুষের ক্ষুদ্র সংসারযাত্রা? এ বাস্তব কি দিন দুরোলে অবাস্তব নয়? হাজার হাজার বছর পরে আজকের বাস্তবের মূল্য কী? মূল্য যদি কারো থাকে তবে সে ওই রূপকথার।

"এটা কিসের জগৎ সে কি আমি এক কথায় বলতে পারি, মালা?" আমি সোজাসুজি উত্তর দিতে

অক্ষম চোখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলি, "একে প্রকাশ করতে হলে, অমর করতে হলে রূপকথার প্রয়োজন হয়, সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এতে বাস করতে হলে, প্রাণধারণ করতে হলে রূপকথায় বা সঙ্কেতে কুলোয় না। তার জন্যে চাই বাস্তববোধ। পদে পদে খেয়াল রাখতে হয় যে এটা রূপকথার জগৎ নয়।"

উপদেশের মতো শোনায়। যে কোনো সংসারী বিজ্ঞলোক যে ভাষায় কথা বলে থাকেন। মালা বুঝতে পারে যে তাকে প্র্যাকটিকাল হতে বলা হচ্ছে। সে আপত্তি করে না। বলে, "বাস্তববোধ যদি আমার না থাকে তবে আমি তা অর্জন করতে রাজী! তা বলে যেটা আমার আছে সেটা কেন বর্জন করব? বার বার আশাভঙ্গ মোহভঙ্গ ঘটবে। তা সত্ত্বেও পদে পদে স্মরণে রাখব যে এটা রূপকথার জগৎ।"

মালা আমাকে দিনে দিনে তার মায়াপাহাড়ের অভিযান কাহিনী শোনায়। ঘটনাগুলোর যে অংশটা পাখির সে অংশটা আমি বাদ দিই। যেটুকু অপাখির সেটুকু নিই। তার সঙ্গে আর কিছু মেশাই, যেটা পাখিরের ছোতনা জাগায়। এমনি করে মায়াপাহাড়ের অভিযান কাহিনী চিত্রে রূপান্তরিত হয়। নোয়াখালী চাক্ষুষ করিনি। তার জন্যে ছবি আঁকা আটকায় না। আমি তো নোয়াখালীর বিবরণী সচিত্র করতে বসিনি। আমার পদ্ধতিটাও বাস্তবধর্মী নয়। তার জন্যে অন্য লোক আছে। তাদের বরাত দিলে তারা এমন চমৎকার করে আঁকবে যে মনে হবে যেন অবিকল নোয়াখালীর ঘরবাড়ী পথঘাট ধানক্ষেত মাঠ। আর একালের বর্ণার চামামা। আর তারই মাঝে একটি পথচারী বৃদ্ধ। একালের বুদ্ধ।

না। আমার এসব ছবিতে অবিকল বলে কিছু নেই। সেইজন্যে সকলের ভালো লাগে না। সকলের জন্যে আমি বাঁ হাতে পোস্টার আঁকি। বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকি। তা দিয়ে আমার সংসার চলে। আর ডান হাতে আঁকি যা আমাকে অমর করবে। আমাকে না করুক আপনাকে অমর করবে।

মালা আমার ছবিগুলো দেখে বলে, "হাঁ। হয়েছে।"

এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে! এই তো রসবিচারের শেষকথা। আমি নোয়াখালীও দেখিনি, মালাও নই, অভিজ্ঞতাগুলোও আমার নিজের নয়। তবু যা এঁকেছি তা "হয়েছে"। অন্তত মালার চোখে।

মালাকে আমি ছবি দেখাতে দেখাতে একটু একটু করে ভুলিয়ে নিয়ে যাই লাহোরের পথ থেকে। সে আর বাড়ী ছেড়ে বাহির হবার কথা মুখে আনে না। বোধহয় মনেও আনে না। মাসিমা ও মেসোমশায় তাকে যেতে দেননি বলে সে আর অশান্ত বা বিমর্ষ নয়। মুক্তা ঝরার জন্য আর সোনার শুকপাখী আনা হলো না বলে বিষাদ বোধ করে না। অরুণ বরুণ পাথর হয়ে গেছে, কত রাজ্যের রাজপুত্র পাথর হয়ে গেছে, তাদের জীবন দিতে হবে বলে ব্যাকুল বোধ করে না। এক কথায়, সে আর কিরণমালা নয়। সে মালা হয়ে গেছে।

তাই যদি হলো তবে আর রূপকথার রাজপুত্রের জন্যে প্রতীক্ষা করা কেন?

একদিন ওকে নিরালায় পেয়ে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করি আমি। ও চমকে ওঠে। আমি ওকে আরো বড় চমক দিই। বলি, "তোমার চোখের সামনেই একটা পাথর পড়ে আছে। সে রাজপুত্র না হলেও তুমি তাকে জীবন দিতে পারো। মুক্তা ঝরার জল তোমার বারিতেই আছে, মালা। সোনার শুকপাখীও আছে তোমার হাতে। তুমি কি তাকে বাঁচাবে না?"

মালা প্রথমটা বুঝতে পারেনি কার কথা হচ্ছে। কোন্ কথা হচ্ছে। বুঝল যখন তখন তার মুখে সিঁদুর লাগল। সে সলজ্জভাবে মুখ নত করল। তার পর মুখ তুলে চোখের কোণে তাকালো। তারপর আমাকে চমকে দিয়ে বলল, "তুমি রাজপুত্রই। রূপলোকের রাজপুত্র।"

তা হলে আর কী। আমার আশা আছে। মালার সঙ্গে আর একটি কথাও না। সেই দিনই মাসিমার সঙ্গে দেখা করি। একটু ভৌরচন্দ্রিকার পর নিবেদন করি যে আমি তাঁর কন্যার অযোগ্য পাণিপ্রার্থী।

"তুমি!" মাসিমা বিশ্বাস করতে পারেন না। "তুমি। দেবপ্রিয়! মালার—" তিনি শেষ না করে কেঁদে ফেলেন।

আমি তো ভয়ে নিয়েছিলুম যে তিনি পাদপূরণ করবেন এই বলে, "মতো মেয়ে কি বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা হবে!"

তা নয়। তিনি কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, "তুমি যে আমাদের কত বড় বন্ধু তা এই বিপদের দিনে বুঝতে দিলে। ও মেয়ে কোন্ দিন না লাহোর চলে যায় সেই ভয়ে আমার চোখে ঘুম ছিল না। এ কি সত্যি! তুমি। দেবপ্রিয়! আশ্চর্য! কেন যে এ কথা কোনো দিন মনে হয়নি। কিসে তুমি কম? মালাকে বলেছ? সে কী বলে?"

এর পরে মেসোমশায়ের সঙ্গে কথা। মাসিমাই আমার হয়ে পাড়লেন। তিনিও তেমনি আশ্চর্য। তেমনি প্রীত। তেমনি সম্মত। আনন্দে আমাকে বুকে টেনে নিলেন।

আশ্চর্য হলো না শুধু একজন। সে আমার বোন নীলি। সে নাকি অনেক আগেই টের পেয়েছিল যে এইরকমই হবে। না হয়ে পারে না।

সম্প্রদান করলেন মেসোমশায় যথারীতি। কিন্তু সেইখানেই তাঁর কর্তব্য ফুরোল না। আমাদের দু'জনকে পাশে বসিয়ে তিনি নীরবে উপাসনা করলেন। মনে মনে কী বললেন, কাকে উদ্দেশ করে বললেন তিনিই জানেন। তিনিও ধ্যানস্থ, আমরাও তাই। আমি আমার রূপের দেবতাকে উদ্দেশ করে মনে মনে বললুম, এখন থেকে আমার পূজা তেমন ঐকান্তিক হবে না, প্রেমকে ভাগ দিতে হবে। কিন্তু তোমাকে যা উৎসর্গ করব তার মধ্যে এবার থেকে রসের সঞ্চার হবে, প্রেম মিশিয়ে দেবে রস।

বিয়ের পরে মালা আর আমি মধুমাস যাপনের জন্যে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু পশ্চিমমুখো হতে আমার ভয়। পাছে মালা বলে বসে, "দিল্লী চল। গান্ধীজী এখনো সেখানে।" কিংবা "লাহোর চল। জহরের রোল এখনো উঠছে।" তেমনি পুবমুখো হতেও সাহস হয় না। পাছে শুনতে হয়, "নোয়াখালী চল। যা শুরু করে এসেছি তা শেষ করা চাই।"

তাই দক্ষিণ মুখে যাই। পুরীর সমুদ্রতীরে ডেরা বাঁধি। প্রতিদিন সমুদ্রের স্নান নিই। আমার কতকালের সমুদ্র। একই সমুদ্র এ দেশে আর ও দেশে।

সেই মধুরতম দিনগুলিতে আমরা আর কোনো কথা ভাবিনি। ভাবতে চাইনি। ভাবতে দিইনি খবরের কাগজ পড়িনি। রেডিওর খবর শুনিনি। লোকের সঙ্গে মিশিনি। আমরাই আমাদের সমাজ। চিঠিপত্র যারা লিখত তাদের বলা ছিল কেউ যেন না লেখে। জানতুম সে খবর মালাকে আনমনা করে তুলবে।

আমাদের চারদিকে আমরা এক গজদন্তের মিনার গড়ি। সে মিনারে প্রেম আর শ্রম এই নামের এক যুগল বসতি করে। বাইরের জগৎ বাইরেই থাকে। ভিতরে প্রবেশ পায় না। সে তৃতীয় পক্ষ। মিনারে বসে আমি অনলসভাবে ছবি এঁকে যাই। মালা অনলসভাবে রাঁধে বাড়ে ধোয় মাজে ঝাড়ে মোছে সাজায় গোছায় কাচে। সময় পেলেই সেতার নিয়ে বাজায় আমি কখনো শুনি, কখনো শুনিনে। আমাকে যে তন্ময় থাকতে হয় হাতের কাজ নিয়ে। সেও একপ্রকার সঙ্গীত। তাকে শুনতে হয় চোখ দিয়ে আর

চোখ ভরে। মালার সেতার যেমন আমার জন্যে বাজে তেমনি আমার তুলিও মালার জন্যে রঙের খেলা খেলে।

দুঃখের দিনে একটা মাস যেন একটা বছর। কিন্তু সুখের দিনে একটা দিনের মতো ক্ষীণ। দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়; মাস শেষ হয়ে আসছে দেখে আমি কাতর হই। যেন কী একটা হারিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরে রাখতে পারছিনে। মালা কিন্তু একটুও কাতর নয়। ওজানে যে সুখ ওরই নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। ও যদি না যেতে দেয় তবে যাবে না। যতক্ষণ না যেতে দেয় ততক্ষণ থাকবে। ওর মধুমাস শুধু প্রথম মাসটাই নয়। পরের মাসগুলোও মধুমাস। একটা ফুরিয়ে গেলেও আর একটা তার জায়গা নেয়। পরস্পরার ছেদনেই। একটা হারিয়ে গেলেও আর একটা মেলে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। আমি অকারণে কাতর হচ্ছি। "নিঃশেষ হয়ে যদি যবে তুই ফাগুন তখনো যাবে না।" মহাকবি বচন। আহা! তাই যেন হয়।

বাইরে মহাসিন্ধুর অশান্ত কলরোল। কান বধির করে দেয়। আমাদের গজদন্তের মিনারে বসে আমরা প্রণয়গুঞ্জনের নিরালা গাই। মধুমাস হয়তো কোনো দিন ফুরোবে না। কিন্তু এই ঝড়ঝাপটার যুগে জীবন নিঃশেষ হয়ে যেতে কতক্ষণ! যৌবন তো এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে এলো আমার। আমিও তাই ইচ্ছা করেই বধির হই বহির্জগতের অশান্ত কলরোলের প্রতি সে তার গর্জন নিয়ে থাকুক। আমিও আমার গুঞ্জন নিয়ে থাকি। আমি জানি যে আমি যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাব সেদিনও এই ঝড়ঝাপটার যুগ বাইরে ফুঁসতে থাকবে। একবার পা টিপে টিপে পিছু হটবে, তার পর আবার বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মালাকে নিভৃতে কানে কানে বলি, "দুঃখ পেতে পেতে আমি সুখের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলুম। না দেখলে বিশ্বাস হতো না যে আমার অদৃষ্টে সুখ আছে। এখন আমি সুখের আস্বাদন পেয়েছি। কিন্তু আমার ভয় করছে। এত সুখ কি আমার কপালে সইবে।"

"ভয় কিসের! আমি তো থাকব বলেই এসেছি।" মালা আমার কানে কানে বলে। পাশাপাশি শুয়ে।

"কে জানে কোন্ দিন তুমি আবার রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় দেখে উতলা হবে! বেরিয়ে পড়বে মরা রাজপুত্রদের বাঁচাতে। পাষাণের গায়ে মুক্তা ঝরার জল ছিটোতে। ভুলে যাবে যে যাকে রেখে যাচ্ছ সেও একটা পাষাণ। দুঃখ পেতে পেতে পাষাণ। তোমার কল্যাণে তার শাপমোচন হয়েছে। তোমার অভাবে আবার না পাষাণে পরিবর্তিত হয়।" আমি শঙ্কিত স্বরে বলি।

"না। আমি আর বেরিয়ে পড়ব না।" মালা আমাকে অভয় দেয়। "আমি দেখে এসেছি ও পথে আরো পথিক আছে। আরো পথিক থাকবে। তাদের কেউ না কেউ মায়াপাহাড়ে পৌঁছবে। মুক্তা ঝরার জল আনবে। একদিন না একদিন পাথরের ঘুম ভাঙাবে। হয়তো নিকট ভবিষ্যতে নয়। হয়তো আমাদের জীবনে নয়। কিন্তু আসবে সেদিন। আসবে।"

ও যেন বিশ্বাস ও আশা মূর্তিমতী। অবিচল। অটল। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। আর মনে মনে ধন্যবাদ দিই। আপনাকে। আমার এ সৌভাগ্য দেবতাদের ঈর্ষা না জাগালে হয়।

"মালা", আমি ওকে নিশ্চিন্ত হয়ে বলি, "আমরা দু'জনে যদি দু'জনকে সুখী করতে পারি তা হলে এমন কিছু করলুম যাতে জগতে সুখের অনুপাত বেড়ে গেল। তার ফলে জগতে দুঃখের অনুপাত কমে গেল। এ যেন অমাবস্যার রাত্রে একটি রামশাল জ্বালানো। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যা হয়ে যায় দেয়ালী।

ক্ষণকালের জন্তে হলেও আঁধার আলো হয়ে যায়। আমাদের সুখ আর কারো সুখে বাদ সাধছে না। বরং আর সকলের অজ্ঞাতে আর সকলকে সুখী করছে। একটি পাথরকে প্রাণদানও প্রাণের সর্বতোবিস্তার।"

"আমি কিন্তু," মালা ভেবে বলে, "সুখী হলেই আরো বেশী করে অনুভব করি যে আমার মতো বহু মেয়ে অসুখী। তাদের অ—সুখ কি লেশমাত্র কমল!"

"কমল বইকি।" আমি নিশ্চয়তা দিই। "স্পষ্ট নয় ধরিও। কমতেই হবে। না কমলে জগতের হিসাব মিলবে কেমন করে?"

মালা মৃদু হাসে। "আমি কি অঙ্ক কষতে বিয়ে করেছি? সুখী করতেই আমার আসা। সুখী না করে আমি যাচ্ছিনে। নিজে সুখী না হলেও তোমাকে সুখী করতে আমি যথাসাধ্য করব।"

"নিজে সুখী না হলেও?" আমি অভিমান করি। "কেন সুখী হবে না তুমি? আমি তা হলে কী করতে আছি?"

"তুমি?" মালা আমার হাতে হাত জড়িয়ে বলে, "তুমিও তোমার সাধ্যমতো করবে। তোমার চেষ্টা ব্যর্থ যাবে না। আমি সুখী হব। কিন্তু ওই যে বলেছি। আমি সুখী হলে তো মোগাখালীর মেয়েদের পাঞ্জাবের মেয়েদের অ-সুখ লেশমাত্র কমল না। তাদের অ-সুখ আমার সুখকে লজ্জা দিতে থাকবে।"

আমি বাধা পাই। জগতে শয়তান আছে। তারা শয়তানি করবে। আমি তার কি করতে পারি। অভাগিনী মেয়েরা ভুগবে। আমি তার কী করতে পারি! মাঝখান থেকে মালা হবে অসুখী। আমার আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও অসুখী। হায়। এমন কোনো কৌশল আমার জানা নেই যা দিয়ে দুঃখিনীদের দুঃখ দূর করতে পারি। থাকলে আমি রাজা ক্যানিউটের মতো ঢেউয়ের সমুদ্রকে বলতুম, "সমুদ্র, তুমি হটে যাও।" অমনি সমুদ্র যেত হটে। ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে যারা ঘায়েল হয়েছে তারা আবার উঠে দাঁড়াত। গায়ের বালু ঝেড়ে ফেলত। জল মুছে ফেলত। যেন কিছুই হয়নি। হায়! সমুদ্র হটবে না। ক্যানিউটকেই হটতে হবে।

মালার একটি কথায় আমার একটু আপত্তি ছিল। মুখ ফুটে জানাই, "সাধ্যমতো সুখী করতে যে কোনো পুরুষ পারে। আমি করব সাধ্যের চেয়েও বেশী। আমি করব অসাধ্যসাধন। তাতে যদি তোমাকে সুখী করতে পারি।"

মালা আমার হাতখানি টেনে নিয়ে মুখে ছুঁইয়ে বলে, "আমি তা বিশ্বাস করি। তবু তোমাকে বারণ করব সাধ্যাতীতের সোনার হরিণ ধরে আনতে। সীতার উচিত ছিল রামকে নিবৃত্ত করা। তা না করে তিনি প্রবৃত্ত করেন।"

আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। তৃতীয় জনকে আমি বড় ভয় করি।

মালা বলে যায়, "তুমি মহৎ শিল্পী হবে। এটা পুরুষোচিত উচ্চাভিলাষ। আমি তোমাকে বাধা তো দেবই না, বরং তোমার সহায় হব। কিন্তু স্ত্রীকে সুখে রাখার জন্তে যদি প্রাসাদ তৈরি করাই লক্ষ্য হয় তবে সেটা অনুচিত উচ্চাভিলাষ। দাসদাসী দিয়ে ওরিয়ে দেওয়াও তাই। এর জন্তে যদি তুমি চোখ ধাঁধানো তসবির আঁকো আর মুঠো মুঠো মোহর পাও তা হলে তুমি আমার সমর্থন হারাবে।"

মালাকে সুখী করার জন্তে এসবই আমি পারতুম। কিন্তু পারলে অসুখী হতুম। মালা আমাকে এর থেকে মুক্ত করে দিল।

কলকাতা ফিরে আসার পর আমাদের নিজেদের সংসার শুরু হলো। আমার মা রইলেন আমাদের

সঙ্গে। ভবানীপুরের বাসাটাতে একে জায়গা কম, তার উপর সেকেলে বন্দোবস্ত। বাবার অসুবিধে হবারই কথা। তবু ও হাসিমুখে সহ্য করল। ওর মা ওকে বলেছিলেন তাঁর বাড়ীর এক অংশ ভাড়া নিয়ে নিজের ঘরকন্না পাততে। কিন্তু আমার মাকে সেখানে যেতে বলা যায় না। তিনি নারাজ হতেন। তাঁকে একা ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে যেতে বাবাও নারাজ।

প্রায়ই মাসিমা ও মেসোমশায়ের কাছে যাই। বলা উচিত শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও শ্বশুর মহাশয়। কিন্তু বলতে বাধে। এতক্ষণ যা বলে এসেছি তাই বলে যাচ্ছি। আর বেশী বাকীও নেই। মাসিমার মনে এখন নবীন উৎসাহ। আগের আগের মতো বুধবার বুধবার পার্টি দিচ্ছেন। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সমাজ-কল্যাণও করছেন। নতুন গবর্ণমেণ্টে তাঁর যথেষ্ট খাতির। সেই যে কবে অগাস্ট আন্দোলনের সময় ত্যাগস্বীকার করেছিলেন সেটা এতদিন পরে ডিভিডেণ্ড দিচ্ছে।

মেসোমশায় তেমনি চিন্তাকুল। মাসিমার মতে ওটা একটা রোগ। কেননা দেশ স্বাধীন হবার পর চিন্তার আর কী আছে? যেটা ছিল সেটা তো লক্ষ্যত্যাগ করে মিটিয়ে দেওয়া গেল। কেন তা হলে অনর্থক মন খারাপ করা? এই ভালো। ত্যাগ না দিয়ে ভোগ যখন করা যেত না তখন একভাবে না একভাবে ত্যাগ করতে হতোই। চাকরি ত্যাগ করতে হতো, দোকান ত্যাগ করতে হতো, কারখানা ত্যাগ করতে হতো, খামার ত্যাগ করতে হতো। তেমন ত্যাগাত্যাগির শেষ কোথায়? তার চেয়ে এই ভালো নয় কি? এর মধ্যে একটা চূড়ান্ততা আছে।

কলকাতাকে শান্ত করে গান্ধীজী নোয়াখালী রওনা হয়ে যাবেন এমন সময় ডাক পেলেন দিল্লী থেকে। সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় বিপন্ন। তাঁর মনে আশা ছিল তাঁর নিকটতম সহকর্মীরাই যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন তাঁদের ক্ষমতা তাঁর মিশনের সহায়ক হবে। তিনি দিল্লীতে সফলকাম হয়ে নোয়াখালীতে সাফল্যের জন্যে নৈতিক পাথেয় সংগ্রহ করবেন। কিন্তু মাসের পর মাস যায়। তাঁর মিশন অসমাপ্ত থাকে। তিনি দেখতে পান দেশ ভাগ হয়ে যাওয়াই চূড়ান্ত নয়। ভাগ হয়ে যাচ্ছে জনগণ। ভাগ হয়ে যাচ্ছে চাষী, কারিগর, মুদি, মজুর, ভিখারী। ভাগ হয়ে যাচ্ছে গরিব দুঃখী সর্বহারা। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে রাষ্ট্র কতবার খণ্ড খণ্ড হয়েছে। কিন্তু জনগণ বরাবরই অবিভাজ্য। তারা যদি স্বেচ্ছায় দু'ভাগ হয়ে যেত তিনি বাধা দিতেন না, আফসোস করতেন। কিন্তু তাদের ছলে বলে কৌশলে দু'ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। কয়েকটি মাথা করাচীতে বসে বোড়ের চাল দিচ্ছে। কয়েকটি মাথা দিল্লীতে বসে বোড়ের পালটা চাল দিচ্ছে। এই সর্বনেশে ডিভাস সার্কলের চূড়ান্ততা কোথায়? হতে পারে ওদের লক্ষ্য পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করে ভারতকেও মুসলিমশূন্য করা, ভারতকে হিন্দুস্থানে পরিণত করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পরাস্ত করা। কিন্তু এরাই বা খেলায় যেতে পরাস্ত হতে যায় কেন? পরকে লক্ষ্যভেদ করতে দেয় কেন?

"ওহে ঘেবপ্রিয়," মেসোমশায়ই আমাকে সর্বপ্রথম খবর দেন, "শুনেছ? গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেছেন! আমরণ অনশন!"

"হঠাৎ!" আমি আঁতকে উঠি। এই বুড়ির বয়সে আমরণ অনশন!

"হাঁ। হঠাৎ।" মেসোমশায় উত্তেজিত হয়ে বলেন, "কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। পাকিস্তান খোলাখুলিভাবে ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতরাষ্ট্রও যদি ভিতরে ভিতরে তাই হয় তবে দ্বিজাতিতত্ত্বেরই জয় হলো। গান্ধীনেতৃত্ব রইল কোথায়? গান্ধীজীর বেঁচে থেকেই বা লাভ কী? মানুষ বাঁচে তার কাজের জন্যে। তাঁর চোখের সামনে সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ উৎপাটিত হতে চলেছে। স্বাধীনতা

কি তা হলে সর্বনাশ করার স্বাধীনতা? গান্ধীজী কি তা হলে দেশকে স্বাধীন করে দিয়ে আরবা উপন্যাসের দৈত্যকে ভালার ভিতর থেকে ছাড়া দিয়েছেন? এবার বুঝি সে তার মুক্তিদাতাকেই গেটে পুরবে?"

"ভালো লাগছে না।" মালা আমাকে প্রতিদিন বলে। "বাপুজী আগেও তো অনশন করেছেন। কই, এমন গা ছম ছম তো করেনি?

না। এমন গায়ে কাঁটা দেয়নি আমারও। এবারকার অনুভবটা একেবারেই আলাদা। আগের বার দেশশুদ্ধ লোক চেয়েছে যে তিনি বাঁচুন। এবার বেশ কিছু লোকের মনের ইচ্ছা তিনি মরুন। তাঁকে করতে দেওয়া হবে না। মরতে দেওয়া হবে। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে থাকতে পারবে না। ঘরের শত্রু বিভীষণকে তাড়াও। তাই? হাঁ, বিভীষণও তো তাই ছিল।

"তা মুসলমানদের এখন এ দেশে থাকার অধিকারটাই বা কিসের?" মালিনা গম্ভীরভাবে বলেন। "দেশ ভাগাভাগির আগে যে অধিকার ছিল সে অধিকার কি আর আছে? আর ওখানকার হিন্দুরাই বা কেমন! কেন মরতে পড়ে আছে!"

এই মনোভাব থেকে আমার বন্ধুরাও মুক্ত নন। আমি নিজে মুক্ত, তার কারণ আমি বিহারের জন্য অনুতপ্ত। আমার সে সময় খেয়াল ছিল না যে ভূতের লড়াইতে আমিও পরোক্ষভাবে পক্ষ নিচ্ছি। আমি চাই ভূত ছাড়াতে। যে যার আখড়া গাছে বা গোরস্থানে ফিরে যাক। আমাদের বাঁচতে দিক।

মালা গান্ধীজীর জন্যে চিন্তিত থাকলেও নিজের কাজে অমনোযোগী হয়নি। ওকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমার কাজটিও তুচ্ছ নয়, যদিও বাপুজীর কাজের মতো মহৎ নয়। তোমাকে আমি কার হাতে দিয়ে যাব?"

"কেন?" আমি ওকে পরীক্ষা করার জন্যে বলি, "এতদিন আমি কার হাতে ছিলুম? আমি আত্মনির্ভর হতে শিখেছি।"

"ওমা! খেতে বসে কী খাচ্ছ তাই তোমার খেয়াল থাকে না। খেয়ে উঠে কী খেয়েছ তাও তোমার মনে পড়ে না। খেয়েছ কি খাওনি তাও তুমি ঠিক জানো না। ষ্টুডিওতে দিনমান এক পেয়ালা কফি আর খানকয়েক স্যাণ্ডউইচ খেয়েই কাটিয়ে যাও। আত্মনির্ভর হয়ে কী ছিরি হয়েছিল তোমার!" মালা শুনিয়ে দেয়।

বাস্তবিক। এই ক'সপ্তাহে আমার শরীরের আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। রংটাও মনে হচ্ছে এক পোঁচ ফরসা। এটা একটা অলৌকিক ঘটনা।

"বিয়ের পরে আমি পরিহাস করি," সব মেয়েই সমান। মায়াপাহাড় থেকে ফিরে কিরণমালাকেও বিয়ে না করে স্বামীর জন্যে রাঁধতে হয়েছিল। স্বামীটিও তো সেই রাজপুত্র যে সাত সমুদ্র পেরিয়ে এসেছে, তেপান্তরের মাঠে ঘোড়া ছুটিয়েছে। কোথাও তো লেখে না যে তার সঙ্গে রাঁধুনী ছিল বা সে দু'বেলা খেতে পেয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর তারও পকাশ ব্যঞ্জন না হলে মুখে পলায় ওঠে না।"

মালার পরিহাসবোধ এমনিতেই একটু কম। ও আমাকে ভুল বোঝে। বলে, "তা হলে তুমি বিয়ে করতে গেলে কেন? তোমার ধরণ ধারণ যদি আগের মতোই থাকবে?"

সত্যিই তো। আমি বিয়ে করেছি বলে আমার সাবেক ধরণ ধারণ যে ছেড়ে দিয়েছি বা ছেড়ে দিতে চেয়েছি তা তো নয়। আমার আশঙ্কা আমি বিয়ের পর একটু একটু করে অলক্ষিতে গোব মানা প্রাণী বনে যাব। যাকে বলে গৃহপালিত। সেটা আর কোনো মেয়ের হাতে না বনে মালার হাতে বনেছি

বলে এমন কী সান্ত্বনা। শিল্পীরাও খেতে ভালোবাসে, পরতে ভালোবাসে। কিন্তু তার জন্যে পোষ মানতে ভালোবাসে না। পোষ মানলে এমন কিছু হারায় যার ক্ষতিপূরণ নেই।

মনের ভিতরে আমারও এই অভিলাষটি ছিল যে বিয়ের পরেও আমি যেমনকে তেমন থাকব। সেলিবেট নয়, ব্যাচিলার। আমার জীবন বাপনের ধরন ধারনের উপর বৌ এসে মুরুব্বিয়ানা ফলাবে না। পদে পদে জবাবদিহি চাইবে না। রেঁধে খাইয়ে তৃপ্ত করে ঘাসখৎ লিখিয়ে নেবে না। আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খাবে না। অথচ মালা একদিন বাপের বাড়ী গেলে আমি চোখে অন্ধকার দেখি। যতক্ষণ না সে ফিরে আসে, ততক্ষণ আমার নিশ্চিন্ত হয়ে ছবি আঁকার জো নেই। বুদ্ধদেব তরুণী ভার্যা হলে যা হয়। বেশ বুঝতে পারি যে আমার সেই প্রচ্ছন্ন অভিলাষটি বিয়ের সঙ্গে বেখাপ। সেটিকে বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু তা হলে আবার প্রশ্ন ওঠে, শেষ পর্যন্ত আমি শিল্পী থাকব তো? না বিয়ের সঙ্গে বেখাপ বলে শিল্পীসত্তাটিরও বিসর্জনটা অনিবার্য? থাক, মালাকে এসব বলিনে।

গান্ধীজীর অনশনে চিন্ত হলো। যাদের হার হলো তারা কেন তাঁকে বাঁচতে দেবে? গয়ায় পিণ্ড না পাওয়া ভূতকে প্রমাণ করতে হবে যে তারই বয়স বেশী। সে-ই অধিকতর ভূত। মানুষ তার কাছে সেদিনকার ছেলে। মানুষ বড়জোর একজন গুণীজনের ঘাড় মটকাতে পারে, কিন্তু একজন মহামানবের বুকে বুলেট বসাতে তারও হাত কাঁপবে। ব্রহ্মদৈত্য না হলে কার এত বড় স্পর্ধা হবে?

সেই কালরাত্রি কি পোহাতে চায়! মালা মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে সারা রাত কাঁদে। আমি ওর গায়ে একখানা কম্বল জড়িয়ে দিতে যাই। ও সরিয়ে দেয়। ওকে সম্পূর্ণরূপে রিক্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কত অনুনয় করি। এক পেয়ালা দুধও খাবে না। অগত্যা আমারও অনশন। ওই এক পেয়ালা দুধ বাদ দিলে। মা ঠাকুর ঘরে ঢুকে রামধুন গান করতে থাকেন। তাঁরও সে রাত্রে লঙ্ঘন।

পরের দিন ও বাড়ীতে গিয়ে দেখি মাসিমা ও মেসোমশায় দু'জনেই সমান বিচলিত। মাসিমা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "শুনেছ দেবপ্রিয়, কাল রাত্রে অনেক হিন্দুর বাড়ী ভোজ দিয়েছে। কেউ কেউ নাকি আগে থেকেই তৈরী ছিল। জানত।"

কারো সর্ব্বনাশ, কারো পৌষমাস। আমি ক্রোধে জ্বলি। কিন্তু চোখের জল ধরে রাখতে পারিনে। সারা রাত বাঁধ দিয়ে রোধ করেছিলুম। বৃথা হলো।

মেসোমশায়েরও রাত্রে ঘুম হয়নি। চোখ দুটো কোলা কোলা লালচে। আমাকে পাশে বসিয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ইতিহাসে আমরা আগেও এ দৃশ্য দেখেছি। মানবপুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করছেন আর পুরোহিতদের ঘরে ঘরে ভোজ চলেছে। এমন কি জনতাও তাদের দলে ভিড়ে আনন্দ করছে। সেদিনকার পাপের ফল এখনো ভুগতে হচ্ছে তাদের বংশধরদের। দেখে দুঃখ হয়। সে রকম দুর্ভাগ্য যেন আমাদের বংশধরদের না হয়। আজকের দিনে এই আমাদের প্রার্থনীয়।"

আমরা সকলে মিলে প্রার্থনা করি। অবশ্য এই একমাত্র প্রার্থনীয় নয়। কাকে যেন উদ্দেশ করে মেসোমশায় বললেন, "জীবন তোমাকে যতদূর সাহায্য করা সম্ভব ততদূর করেছিল। আর পারছিল না। এবার মৃত্যু তোমাকে সাহায্য করবে। হাজার হাজার বছর ধরে সাহায্য করবে। এর সীমা নেই, শেষ নেই। তোমার কাজ একদিনও বন্ধ থাকবে না। এক মুহূর্তও না। তোমার কাজের মধ্যেই তুমি বেঁচে আছ। তুমি বেঁচে থাকবে। যে বাঁচায় সে-ই বাঁচে। আমার প্রাণের বিনিময়ে আমি এ প্রাণের

লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলে। ও পারের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভাইকেও বাঁচিয়ে দিলে। আমাদের চিন্তায় ও কর্মে, ধ্যানে ও রূপায়ণে তুমি বাঁচবে। আর কারো সাধ্য নেই যে তোমাকে মারে। তোমার গতি রোধ করে। হে পথিক, তুমি অগ্রসর হয়ে আমাদেরও অগ্রসর করে দাও।"

মালার কান্না কি সহজে থামে! তবু প্রবলতম শোকেরও উপশম আছে। মালা একটু একটু করে শান্ত হলো। ও যেন বহুদিনের অসুখ থেকে সেরে উঠেছে। ওর গায়ে এতদিন হাত দিইনি। আদর করি ওকে।

তারই ফাঁকে সুধাই, "ওগো, তুমি কেন অতটা বিহ্বল হলে?"

"হব না?" ও বিস্মিত হয়ে বলে, "মায়াপাহাড়ের পথে যাদের রেখে এসেছি আর কি ওরা সে পথে এগিয়ে যেতে বল পাবে? একে একে ফিরে আসবে না?"

"তা হলে," আমি কৌতূহলী হই, "আবার খবি পেলে কী করে?"

"শুনেছি এই কথা যেন যে পথিকদের একজন মায়াপাহাড়ে পৌঁছে গেছেন। নিয়ে এসেছেন মুক্তা করার জল। ছিটিয়ে দিয়েছেন পাথরের গায়ে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছেন।" মালা বলে প্রত্যয়ের সঙ্গে।

আমি তার সরল বিশ্বাসে কৌতুক বোধ করি। বলি, "বাকী থাকে সোনার শুকপাখী। সেটি আনতে যাচ্ছে কে?"

"সেটি?" মালা আমার দিকে মধুরভাবে তাকায়। "সেটি আনতে যেতে হবে মায়াপাহাড়ে নয়। রূপলোকে। সেও এক মায়ার রাজ্য। সেখানে যাবে তুমি?"

"আমি! কী সর্বনাশ!" আমি চমকে উঠি। "সে কি সোজা রাস্তা! মালা! মালা! তুমি কি জানো না যে রূপলোকের মার্গও মায়াপাহাড়ের পথের মতোই বিপৎসঙ্কুল। ছায়ামূর্তিরা আমাকে ভয় দেখাবে। সোনার হরিণরা আমার লোভ জাগাবে। আমার প্রহরী হবে কে?"

"আমি হব তোমার বিনিদ্র প্রহরী।" মালা আমাকে কথা দেয়।

"তার পর," আমি আকুল কণ্ঠে বলি, "সংসারের ধান্ধায় আমি ভুলে যেতে পারি কে আমি, কী আমার লক্ষ্য। ওগো, তুমি কি আমাকে মনে করিয়ে দেবে? তোমার নিজেরি মনে থাকবে তো?"

"নিশ্চয়।" মালা প্রতিশ্রুত হয়। "সংসারের ধান্ধা থেকেও যতটা পারি বাঁচাব।"

"তার পর," আমি চিন্তান্বিত হয়ে বলি, "মল্লের সঙ্গে যুদ্ধে আমার প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু অন্যায় যখন উদ্ধতভাবে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, নিরীহকে আঘাত করে, তখন আমি স্থির থাকতে পারিনে। ফলে বিপদ ডেকে আনি। দেবি, সে সময় তুমি কি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে?"

"তৎক্ষণাৎ।" মালা আমাকে দৃঢ় করে দেয়। "সৌন্দর্য আর আনন্দ আনতে যাচ্ছ বলে তুমি কি রাজপুত্র নও! রাজপুত্র হয়ে থাকলে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবেই। তুমি না চাইলেও আমিই তোমাকে যুদ্ধে নামাব। আমি যে তোমার শক্তি।"

"অবশেষে," আমি মন খুলি, "আর একটি কথা। একার সাধনায় আমি রূপদক্ষ হতে পারি। কিন্তু রসবিদগ্ধ হব কী করে? তার জন্যে নিতে হয় নারীর কাছে দীক্ষা। তার জন্যে করতে হয় দু'জনে মিলে যোগসাধন। সখি, তুমি কি আমাকে রসের দীক্ষা দেবে?"

মালা মৌন থাকে। সম্মতির লক্ষণ দেখে আমি ওকে সোহাগ জানিয়ে বলি, "প্রিয়ে, তবে তাই হবে। আমি যাব আনতে সোনার শুকপাখী।"

শ্রীপঞ্চমী, ৭ই মাঘ ১৩৬৭　　সমাপ্ত

ব্যাসদেবের নিকট কতখানি ঋণী এবং সমকালীন চিন্তাধারার দ্বারাই বা তিনি কতখানি প্রভাবিত হইয়াছেন,—তিনি যে ভাবে আখ্যান-বস্তু গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা কতটা ঐতিহাসিক ও কতটা অনৈতিহাসিক, এই সকল বিষয়ে আজও বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই। চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবী নবীনচন্দ্র কতখানি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার পরিকল্পিত কৃষ্ণচরিত্রের বীজ মূল মহাভারতে, বিশেষত ভগবদ্গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে কতখানি নিহিত আছে, সে সম্পর্কেও কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর বিচারেও প্রায় সকল সমালোচকই একই কথার প্রতিধ্বনি (?) করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের চরিত্রকাব্যগুলিও (বিশেষতঃ 'অমিতাভ') কাব্যহিসাবে একেবারেই সার্থক হয় নাই, এমন কথাও বলা যায় না, অথচ কোন কোন সমালোচক ইহাদের মধ্যে কোন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই দেখিতে পান নাই। একজন খ্যাতনামা সমালোচক বলিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী একালে প্রায় অপাঠ্য। এখানে 'প্রায়' কথাটি উল্লেখযোগ্য। যাহা হউক, নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল অতীত হইলেও তাঁহার রচনাবলীর (কাব্য গ্রন্থাবলী ও গদ্য গ্রন্থাবলী) যে বিশদ ও সর্বাঙ্গীণ আলোচনা হয় নাই, ইহাতে আমাদেরই চিন্তার দৈন্য সূচিত হয়।

কিন্তু আমরা নবীনচন্দ্রের রচনাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা শুধু এই কথাটি বলিতে চাই যে, সমালোচনা বা সম্যক আলোচনা করিতে হইলে সম্যক্ দৃষ্টির প্রয়োজন। এই সম্যক দৃষ্টির অর্থ অন্ধ অনুরাগ বা বিরাগ নয়, এ দৃষ্টির অর্থ প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য রসতত্ত্ব, অলংকারশাস্ত্র বা তথাকথিত নন্দনতত্ত্বের প্রতি মোহ হইতে বিমুক্তি। আমরা আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে এই মোহমুক্তির পরিচয় পাইয়াছি।

নবীনচন্দ্রের মধ্যে উনিশ শতকের নানা ভাবাদর্শ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' রচিত হইবার পূর্বে দুইজন কবির নিকট বাঙালী স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল,—রঙ্গলাল ও নবীনচন্দ্র। অবশ্য, কমলাকান্তের দুর্গোৎসবেই বঙ্কিমের ধ্যানমূর্তি প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছিল। যাহা হউক, রঙ্গলাল বাঙালীজীবনের কাহিনী লইয়া কোন গাথা-কাব্য রচনা করেন নাই, নবীনচন্দ্রের মত বাঙালীকে বিদ্রূপের কশাঘাত করেন নাই (অবশ্য, এই বিদ্রূপ নবীনচন্দ্রের বাঙালীপ্রীতি হইতে উৎসারিত), আবার 'সমরসংগীত' রচনায়ও রঙ্গলাল তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। এক হিসাবে নবীনচন্দ্রের 'বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সমর-সংগীত। 'পলাশির যুদ্ধ' সেকালে সারা বাংলার পাঠক-সমাজের নিকট যে বিপুল অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল, তাহা আজ যেন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। 'পলাশির যুদ্ধে' নবীনচন্দ্র সিরাজের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য সেকালের এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন, আবার আর একজন প্রসিদ্ধতর ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, দুর্বৃত্ত ও নানা দোষে কলঙ্কিত সিরাজের পতনে নবীনচন্দ্র মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতিও আমাদের সহানুভূতি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। (অধ্যাপক সুবোধ চন্দ্র রায় সম্পাদিত 'পলাশির যুদ্ধের' ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কোন সমালোচক আবার 'পলাশির যুদ্ধে' নবীনচন্দ্রের ইংরেজ-প্রীতির নিদর্শন দেখিতে পাইয়াছেন কিন্তু মনে রাখা উচিত, এখানে নবীনচন্দ্র সে যুগের ভাবনারই প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। এই ভাবনা নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ঈশ্বর গুপ্তের যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতায়, কিছু রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, এমনকি, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়ও ইংরেজ-প্রীতির নিদর্শন আছে, তথাপি ইঁহাদের সকলের ন্যায় নবীনচন্দ্রও আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয়। প্রতিভাশালী হইলেও ইঁহারা যে যুগের প্রতিনিধি, সেকথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

যাহা হউক, সেকালের বাঙালী শুধু 'পলাশীর যুদ্ধের' কবির কাছে নয়, 'রঙ্গমতী' নামক আখ্যানকাব্য ও 'শংসাধন' নামক খণ্ড কবিতার কবির কাছেও স্বদেশ-প্রেমের দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র যৌবনে ছিলেন নব্য তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রচারক, কিন্তু প্রৌঢ় কবি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জীবনের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা অবলম্বনে কাব্যত্রয়ী-রচনার যে দুঃসাধ্য প্রয়াস নবীনচন্দ্র করিয়াছেন, বাঙালী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব অসামান্য। বাংলার বিপ্লবীদের উপরও যে এই কাব্যত্রয়ীর প্রভাব বড় কম ছিল না, সে কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। এই কাব্যত্রয়ীতে শ্রীকৃষ্ণ ভাতীয়তা ও মানবতার আদর্শের সমন্বয়-মূর্ত্তি, দ্বাপরের শেষভাগে যখন যাগ-যজ্ঞই মানুষের নিকট যথার্থ ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আর্য্য ও অনার্য্যের বিরোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, ভারত যখন বহু খণ্ড ও ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ মানবধর্ম্ম ও প্রেমধর্ম্মের উপর অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাই কাব্যত্রয়ীর প্রতিপাদ্য। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত মহাভারতে নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু কাব্যের আখ্যানবস্তু অনেকাংশে নবীনচন্দ্রের স্বকপোল-কল্পিত। নবীনচন্দ্র প্রধানতঃ মহাভারত-অবলম্বনে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেমধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আবার 'প্রভাস' কাব্যের (তথা 'অমিতাভ' কাব্যের) উপসংহারে তিনি পৃথিবীর নানা দেশ ও নানা জাতির ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উনিশ শতকের নানা বিচ্ছিন্ন ভাবধারা নবীনচন্দ্রের মধ্যে সমন্বিত হইবার প্রয়াস পাইতেছে। 'পলাশির যুদ্ধে' নবীনচন্দ্র যদি জাতি-বৈরের কবি হন, তবে কাব্যত্রয়ীতে তিনি অখণ্ড মানবতাবাদের কবি। কাব্যত্রয়ীর নানা দোষত্রুটি সম্পর্কে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু নবীনচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও অসামান্যতা সম্পর্কে অনেকেই নীরব রহিয়াছেন। কাব্যত্রয়ীর এমন বহু সর্গ আছে যাহা যুগপৎ মহাকাব্যোচিত ও নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ। (যেমন 'প্রভাস' কাব্যে দুর্ব্বাসার বিশ্বরূপদর্শন।) সুতরাং নবীনচন্দ্রের প্রতিভা মহাকাব্য-রচনার উপযোগিনী ছিল না, এ কথা সত্য নয়; দুর্দমনীয় হৃদয়াবেগের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই কবি সর্ব্বত্র সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাই সত্য।

বাংলার কাব্য-সাহিত্যের ন্যায় গদ্য-সাহিত্যেও নবীনচন্দ্রের দান নিঃসন্দেহে স্মরণীয়, কিন্তু গদ্য লেখক হিসাবে নবীনচন্দ্র আজও আমাদের দেশে উপেক্ষিত। তাঁহার 'প্রবাসের পত্রের' ছত্রে ছত্রে পাই ভক্ত-কবির স্বতঃস্ফূর্ত্ত হৃদয়াবেগের পরিচয়। তাঁহার 'আমার জীবন' নানা তথ্যে সমৃদ্ধ, সদ্য-সামরিক বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা উপকরণ এই বিপুল গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত, যে সকল মনস্বী বাঙালীর সান্নিধ্য কবি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিবরণও অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থখানি এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল, সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ তিন খণ্ডে গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া সাহিত্যরসিক পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যাঁহাদের নিকট 'আমার জীবনের' লেখকের 'অহমিকা' অশোভন বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, নবীনচন্দ্র মানুষটি কোথাও নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া কথা বলিতে জানিতেন না, গ্রন্থের অহমিকাকে বিনয় বা সৌজন্যের আবরণে আবৃত করিবার কৌশলটিও তিনি আয়ত্ত করেন নাই। সুতরাং তথাকথিত কুশলী লেখকের পক্ষে তাহা যেখানে প্রয়োজনমত 'the art of concealing thoughts', নবীনচন্দ্রের পক্ষে তাহা সেখানে সর্ব্বদাই 'the art of expressing thoughts'.

যাহা হউক নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবনের' ন্যায় নানাতথ্য-সমৃদ্ধ ও কৌতূহলপ্রদ আরো একখানি আত্মচরিত বাংলায় রচিত হইয়াছে কিনা জানিনা।

উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র ছিলেন আদর্শবাদী। অবশ্য, আমরা শুধু 'ভানুমতী' নয়, 'বঙ্গমতী'কেও উপন্যাস মধ্যে গণনা করি। এখানে একটি কথার উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা নবীনচন্দ্রের কাব্যে কিছুপরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে, এ বিষয়ে তিনি হেমচন্দ্রের মত ব্যর্থ হন নাই। সকলেই জানেন, হেমচন্দ্র সংস্কৃতের অনুসরণে যে তথা-কথিত অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা 'মিলহীন পয়ার' মাত্র।

নবীনচন্দ্রই একমাত্র কবি যিনি কাব্যের মধ্য দিয়া ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের দুইটি ধারা নবীনচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন। একটির নায়ক কেশবচন্দ্র। তিনি শুধু 'নব-বিধানের' আদর্শই প্রচার করেন নাই, তিনি তাঁহার কয়েকজন অনুগামীকে বিভিন্ন ধর্মপ্রচারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, মৌলানা গিরিশচন্দ্র সেন, বেতারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের উপর যথাক্রমে হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ভার অর্পিত হইয়াছিল। একমাত্র প্রতাপ মজুমদার ভিন্ন আর সকলের দানেই বাংলা সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইঁহাদের দানের কথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজও স্বীকৃতি লাভ করে নাই।

উনিশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব আর একটি অসাধারণ ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের নূতন করিয়া এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন যে, ধর্ম উপলব্ধির বস্তু, পাঠ বা বিচারের বস্তু নয়। তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া, নানা ধর্মমতে সাধনা করিয়া এই সত্য প্রচার করিয়াছিলেন যে 'যত মত, তত পথ'। কেশবচন্দ্রের আদর্শ ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালব্ধ সত্যের দ্বারা নবীনচন্দ্র বিশেষভাবেই প্রভাবিত হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের দান হিন্দুধর্মের নব-অভ্যুত্থানে সামান্য নহে, একথা সকলেই জানেন, কাব্যত্রয়ী ও চরিতকাব্য রচনা ভিন্নও তিনি যে পদ্যে ভগবদ্গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ করিয়াছেন, এ কথাও সকলেরই জানা আছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, সে কথা অনেকে জানেন না। তাই নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

'সকল ধর্মের মূলের অভিন্নতা প্রতিপাদন করাই আমার অবতার লীলা লিখিবার উদ্দেশ্য।

একদিন আলিপুর কোর্টে কৌঞ্চদারি মোকদ্দমায় নিবিষ্ট আছি, এমন সময় ডাকে একখানি পত্র পাইলাম। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে, তিনি একজন নিতান্ত ঘৃণিত চরিত্রের ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণছায়া পাইয়া তিনি উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমার 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'অমিতাভ' তিনি তাঁহার ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 'অমিতাভ' পাঠ শেষ করিয়াই পত্র লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমি বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখের কথা প্রতিপালন করিবার জন্য আবার কবে আসিবেন—'পূর্ণ কাল, পূর্ণ ব্রহ্ম আসিবে কখন'? কিন্তু তিনি যে আসিয়াছিলেন, তাহা কি আমি টের পাই নাই? তিনি ত্রেতার 'রাম' নাম এবং দ্বাপরের 'কৃষ্ণ' নাম একত্র করিয়া 'রামকৃষ্ণ' নামে আবার আসিয়াছিলেন। অতএব আমাকে এই 'রামকৃষ্ণের' লীলাও লিখিতে হইবে। এই কয়টি কথায় আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। তাঁহার পত্রের ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বহুপূর্ব হইতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আমি একজন অযোগ্য ভক্ত ছিলাম। কিন্তু তাঁহার নাম ইতিপূর্বে এমন আমার প্রাণে লাগে নাই'।

নবীনচন্দ্রের এই উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, প্রতীচ্য শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেও নবীনচন্দ্র ছিলেন অন্তরে অন্তরে বাঙালী, তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিও তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছিলেন।

গাধা

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

সেদিন বিকেলে ভওয়াবুর বাজারের কাছে কোনরকমে ভীড় ঠেলে ফুটপাথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা লোক একেবারে বুলেটের মতো ছিটকে এসে পড়ল ঘাড়ের ওপর। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। মেজাজটা বিগড়ে গেল ভয়ানক। লোকটা ছড়কে পালাবার আগেই তার হাতটা চেপে ধরলাম। দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলাম—কি মশাই, কানা নাকি? দেখে রাস্তা হাঁটেন না?

বলে তার মুখের দিকে ভাল করে তাকাতেই দেখি—আরে এযে, আমাদের নীলু, নীলকান্ত বক্সী!

বললুম—তুই আচ্ছা লোকতো নীলে! এইভাবে রাস্তা চলেছিস, মানুষ খুন করবি নাকি?

নীলু আমার কথার জবাব না দিয়েই বললে—খবর শুনেছ সন্তদা? ফটকে বে' করেছে?

বললুম—যাঃ, ভাঁওতা মারবার আর জায়গা পাসনি।

নীলু বললে—মাইরি, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি সন্তদা। এই মাত্তর আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম ফটকের ঘরে একটা জলজ্যান্ত বৌ বসে আছে। এ দেখার পর কি কারুর মাথার ঠিক থাকে? তুমিই বল।

কথাটি ভাববার কথা বটে। অন্ততঃ আমার কাছে যতটা না হোক নীলুর কাছে তো বটেই। জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় বে' হল রা? কিছু খবর জানিস নাকি?

নীলু খালি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—জানিনে আবার। জানি সবই। দুনিয়ার সব ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর। খালি আমার বেলায়, যতো সব—

তারপর হাতের জলন্ত সিগারেটটায় গোটা দুই টান মেরে সেটাকে মাটীতে আছড়ে ফেলে বলে উঠল—শ্যালা:।

বললুম—নীলে, তোর যদি খুব কাজ না থাকে তো চল না পায়চারি করতে করতে ময়দানে ঘুরে আসি। ফটকের বৌয়ের কথা কি জানিস বল শুনি।

নীলে বললে—ময়দানে যাও তো চল। আমি তো ফটকের বাড়ী মুখো আর হচ্ছিনে, কাজেই এখন আমার করবার কিছু নেই। তবলা জোড়াটা এক ফাঁকে নিয়ে এলেই চলবে এখন। তবে এখন আমি কিন্তু বলতে পারব না, রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলছে।

বললুম—ময়দানের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে ওসব ঠিক হয়ে যাবে'খন। চল ময়দানে যাবার আগে কোয়ালিটিতে বসে একটু আইসক্রীম খেয়ে যাই।

কোয়ালিটির নামে নীলু একটু ঠাণ্ডা হল। বললে—আচ্ছা চল।

ময়দানে গিয়ে বসার আগে পর্যন্ত কিন্তু নীলু কোন কথাই বললে না। শুম্ মেরে রইল সর্বক্ষণ। কাজেই আমি মনে মনে কেবল ফটিক চাঁদের কথাই ভাবতে রইলুম।

ফটিকচাঁদ গাইয়ে বাজিয়ে লোক। বরাবরই তার গান গাইবার গলা ভাল আর গাইতও ভাল। ইদানীং সে নিজেই গান লেখে, সুর দেয়, নিজেই গেয়ে কলকাতার আসর মাৎ করে। আমি ছেলেবেলা থেকেই ফটিকচাঁদকে বেশ খানিকটা ঈর্ষার চোখে দেখতাম। ফটিকচাঁদের বাবা যখন প্রথম আমাদের গ্রামে ষ্টেশন মাষ্টার হয়ে এসেছিলেন তখন আমরা সবে মাইনর পরীক্ষা দিয়ে বড় ইস্কুলে ঢুকেছি।

শুনলুম তিনি নাকি কোন এক সহরের ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। সেখা থেকে সহরে চালচাল নিয়ে এসেছেন। একদিন মেজ জ্যাঠামশাই-এর সঙ্গে কটিক-এর বাবা এলেন আমাদের বাড়ীতে। সঙ্গে ক-কটাম। কটিকচাঁদের বাবা খুব জাঁক করে বললেন—আমার ছেলেকে লেখাপড়া, গানবাজনা, সব কিছুই শেখাচ্ছি।

মেজ জ্যাঠামশাই প্রাচীন পন্থী গোঁড়া লোক। চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেকে গান শেখাচ্ছেন কী মশাই! তুড়ি দিয়ে টপ্পা গাইবে সবার সামনে সেটা কী ভাল?

ষ্টেশনমাষ্টার একটু কৃপার হাসি হেসে বললেন—ওসব দিন চলে গেছে কৃপানাথ বাবু। আজকাল ছেলেমেয়েদের গানবাজনা শেখান সহরের রেওয়াজ হয়ে গেছে। তা ছাড়া কটিক আমার সুন্দর গান গাইতে পারে, শুনবেন? মেজ জ্যাঠামশাই 'না' বলার আগেই ষ্টেশনমাষ্টার বাবু আমাদের চাকরকে হুকুম করলেন তাঁর বাড়ী থেকে হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসতে। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম আমাদের বয়সী কটিকচাঁদ গম্ভীরভাবে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে লাগল আমাদের বারান্দায় বসে। প্রথমে সে আমাদের দিকে একবার কৃপা কটাক্ষ করে নিয়ে হারমোনিয়ামটা অবলীলায় বাজিয়ে গেল। তারপর গাইতে লাগল—

কতো দিন, আর কতো দিন বহিব
বিরহের ভার কতদিন।
আশা নিরাশায় দিন কেটে যায়
ঘাটে নাহি আসে তরণী,
কতদিন—।

কটিকচাঁদের কৃতিত্বে আমাদের বাড়ীর মা-কাকীমারা, ছোট কাকা, ন'কাকা সবাই মুগ্ধ। শুধু রাশভারী মেজ জ্যাঠাইমা মাকে ডেকে গম্ভীর মুখে বললেন—সেজবৌ, সন্তুকে খবরদার ঐ টেরীকাটা ছোঁড়াটার সঙ্গে মিশতে দিসনি। ও ছোঁড়ার বাপ মিন্‌সে কী বলে ছেলেকে ঐ সব গান শেখাচ্ছে! উচ্ছন্নে যেতে তো আর দেরী নেই দেখছি।

মেজ জ্যাঠাইমার কথা ফেলে মায়ের এমন সাধ্যি ছিল না। কাজেই কটিকচাঁদের সঙ্গে মেলামেশা আমার বন্ধ হল। কিন্তু তাহলে কী হয়, পরের মাসে দেখলাম কটিকচাঁদ ভর্তি হয়েছে আমাদের ক্লাশে। স্কুলে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব জমে গেল। ভাবটা আমিই করলাম। তাকে অনেক পেয়ারা আর নারকেল কুল ঘুষ দিয়ে।

গাইয়ে হিসাবে কটিকচাঁদের খ্যাতি সারা স্কুলে ছড়াতে দেরী হল না। স্কুলের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন-এর সময় কটিকচাঁদ উদ্বোধন সঙ্গীত গাইল—গাও পাখী গাও অমিয় বুলাও।

মাষ্টারদের মহলে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল। তারপর থেকে বছরের পর বছর কটিকচাঁদের পাশের নৌকো বানচাল হতে হতেও সে ক্লাশে উঠতে লাগল ঐ গানের জোরে। প্রতি বছরেই তার উদ্বোধন সঙ্গীতের গাইয়ের আসন পাকা হয়ে রইল প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের সময়।

মেজ জ্যাঠাইমা কিন্তু ভারী দূরদর্শী মহিলা ছিলেন। তাই তাঁর কথা ফলতে দেরী হল না। আমরা তখন থার্ড ক্লাশে পড়ি। শোনা গেল বুঝি ক্লার্ক বাবুর বড় মেয়েটি বয়সে কটিকচাঁদের থেকে বেশ বড় হলেও সে নাকি কটিকের গানের বড় ভক্ত হয়ে উঠেছে। তাই রাত প্রায় দশটা অবধি সে কটিকের বাড়ীতে কাটায়।

একদিন কটীক বললে—সন্তু তোর সঙ্গে কথা আছে।

বললুম—কী বল।

ফটিকচাঁদ বললে—কাউকে বলবি না কিন্তু। আমি প্রেমে পড়েছি।

আমিতো অবাক। লোকে বই পড়ে, এখানে সেখানে পড়ে, গাছ থেকে পড়ে, এমন কী খানায় পর্যন্ত পড়ে জানি। প্রেমে পড়াটা কী ব্যাপার তা জানতুম না।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—সে কি রে?

ফটিক বললে—তুই হদ্দ পাড়াগেঁয়ে। প্রেমে পড়া জানিস না। মেয়েছেলে আর ব্যাটাছেলেতে ভাব হওয়া।

কথা শুনে তো আমার চোখ কপালে উঠে গেছে। শুকনো গলায় বললাম—তোর বৌ কে?

ফটিক বললে—ঘুন্টি। বৌ এখনও হয়নি, তবে আমি তাকে ছাড়া আর কাউকেই বে করব না। এই ছাখ না সে আমার কী লিখেছে।

বলে ফটিক নীল রং-এর খাম বার করলে পকেট থেকে। তাতে গোটা গোটা হরফে লেখা আছে—প্রাণেশ্বর ফটিক, মুখে বলিতে পারি নাই বড্ড লজ্জা করেছিল। আমি তোমারই। তোমারই ঘুন্টি।

সর্বনাশ! আমি চিঠিখানা পড়ে চার দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। ওরে আমার আপাদমস্তক শুকিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন জ্যাঠাইমা কাছে পিঠে কোথাও যেন লুকিয়ে সব দেখছেন।

এরপর ফটিক আমাকে বন্ধুদের বাগানে টেনে নিয়ে গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে টানতে লাগল। আমায় বললে—খানা একটা। আরে এ সব না খেলে বড় হয় না।

আমি ফটিকের ধরান সিগারেটটায় একটা টান মেরে এমন জোরে কেশে উঠলুম যে দম আটকাবার জোগাড়।

ফটিক মতব্বরি চালে সিগারেট টানতে টানতে বললে—নাঃ তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। না পারিস প্রেম করতে না পারিস সিগারেট টানতে।

এরই প্রায় মাস খানেকের মধ্যে শুনলুম ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর আর বুকিং ক্লার্ক বাবুর দুই পরিবারে ভীষণ ঝগড়া বেধেছে। উপলক্ষ্য একদিকে ঘুন্টি অন্যদিকে ফটিক। শুধু তাই নয় ষ্টেশনমাষ্টার বাবু ফটিককে একদিন এমন মার মেরেছেন যে প্রায় এক সপ্তাহ তার স্কুল কামাই, ওদিকে ঘুন্টিও তার মায়ের মারের চোটে কি কি সব কথা জানিয়েছে। সেই সব কথা শুনে ফটিকচাঁদের বাবা বলেছেন ফটিককে জ্যান্ত কেটে ফেলবেন। আমার সঙ্গে একদিন আড়ালে দেখা হতেই ফটিকচাঁদ বললে—দেখলি ঘুন্টিটার বিশ্বাসঘাতকতা। মারের ভয়ে সব বলে দিয়েছে ওর মাকে। আর মিথ্যে মিথ্যে করে কতো কী লাগিয়েছে আমার নামে। অথচ ওই আমাকে শিখিয়েছে। মেয়েদের জাতকে কক্ষণো বিশ্বাস করিস নে সন্তু।

এসব অবশ্য অনেককাল আগের কথা। তারপর আমরা রীতিমতো বড়ো হয়েছি। কিন্তু ফটিকের নারী-বিদ্বেষ এতটুকু কমেনি। আমরা কলকাতায় এসেছি পড়াশুনো করতে। ফটিক দু'একবার ফেল করে কলেজ ছেড়ে দিল। সে গান বাজনার চর্চা করতে লাগল উঠে পড়ে। বাড়িতে রীতিমতো গলা ভাঁজে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক সবই সে গায়। মাঝখানে একটা গান রেকর্ড করে একদিন সে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। এমন এক গান লিখল সে আর তাতে এমন সুর দিল যে তা শুনে সারা বাংলার তরুণরা প্রায় মূর্ছা যাবার যোগাড় হল। ফটিকের এক দূর সম্পর্কের

কিছুদিনের মধ্যে তরুণদের মুখে মুখে সেই গান ফিরতে লাগল। রাস্তায়, ট্রামে বাসে কেবল শোনা যেতে লাগল ফটীকের বাঁধা গান—

বসন্তে পাপিয়া বলে গেল
চলে গেল দিন চলে গেল
তবুও তো প্রিয়া নাহি এল।
জীবনের সুখ চলে গেল
বিরহেতে বুক জ্বলে গেল
ইত্যাদি ইত্যাদি

নীলকান্ত এতদিন ফটীককে পুঁছত না। সে পাড়ার ছেলেদের ভিতরে মস্তানী করে বেড়াত। ফটিক যেই বিখ্যাত হল অমনি নীলু ফটিকের বাড়ী গিয়ে পুরোণ সম্পর্ক ঝালিয়ে তাকে একদিন তাদের পাড়ার বিজয়া সম্মিলনীতে নিয়ে এল। আর তারপর থেকেই সে তার মামার চেলা হয়ে গেল। এক জোড়া বাঁধা তবলা কিনে সে ফটীকের গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে লাগল। গানের টুইশনি করে আর আধুনিক গান গেয়ে ফটীক বেশ ভাল রোজগার করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে নীলুও। টুইশনিতে অবশ্য ফটীকের ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশী হল। কিন্তু তবুও তার সেই ভিতরকার নারী বিদ্বেষ কিছুতেই গেল না।

একদিন আমার সঙ্গে দেখা। বললুম—কিরে ফটিক বে'থা করবি না?

ফটিক বললে—রামঃ। বে করে গাধারা। মানুষে কখনো বে' করে না।

বললাম—বলিস কি রে! চিরকাল হাত পুড়িয়ে খেয়ে বাঁচবি কেমন করে? তোর মা কতো দুঃখ করলেন সেদিন।

ফটিক বললে—মার কথা ছেড়ে দে। টাকা ফেললে রাঁধুনী বামুনের অভাব?

বললাম—কিন্তু রোগে সেবা?

ফটিক বললে—পয়সা ফেললে ভাড়া করা নার্স তোমার বে করা পরিবারে চেয়ে আরাম দেবে বেশী।

বললাম—তা না হয় হল, কিন্তু বয়স তো হয়েছে। একজন সঙ্গিনীর দরকার অস্বীকার করবি কেমন করে?

ফটীক আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু কৃপার হাসি হাসল। বললে—তুই চিরকালই পাড়াগাঁয়ে থেকে গেলি সন্তু। আমার ছাত্রীদের মধ্যে অন্ততঃ পনেরো জন মেয়ে আমাকে পেলে জীবন ধন্য মনে করে। বিয়ের দরকারটা কি!

বললাম—মেয়েদের সঙ্গে ভাব করবি অথচ বিয়ে করার বেলা আপত্তি।

ফটীক বললে—ঠিক তাই। ওদের সঙ্গে ভাব করা যায় কিন্তু বিয়ে যারা করে তারা গাধা। কারণ কোন মেয়েকে বিশ্বাস করতে নেই।

কিছুদিন পরে নীলকান্ত আমার কাছে এসে কাঁদোকাঁদো গলায় বললে—আচ্ছা একি কাণ্ড দেখতো সন্তুদা। বোদেদের মিনির সঙ্গে আমার কতোদিনের আলাপ। অনেক করে বিয়ের ব্যাপারটা পাকা করে নিয়ে এলাম। বিয়ে হলেই মিনির বাপের পেট্রল পাম্পটা আমার হাতে আসবে। সব

ঠিকঠাক। মামা তাতে বাগড়া দিয়ে দিলে। বললে—খবরদার বিয়ে যদি করিস তো আমার ত্রিসীমানা মাড়াসনে। গান বাজনার সিদ্ধিলাভ অত সোজা কাজ নয় যে পেট্রলের ডিপোর খবরদারি করতে করতে তা করা যাবে। তা ছাড়া বিয়ে করা লোকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আচ্ছা তুমি আমায় একটু হেল্প করতে পার? মামাকে—বুঝিয়ে সুঝিয়ে—

বললাম—তোমার মামা বিয়ের ওপর যেমন চটা, তাতে আমার সাধ্যি নেই যে তার মত বদলাব।

সেই কথাগুলো মনে পড়তেই নীলুকে বললাম—আর কেউ বিয়ে করেছে একথা বললে বুঝতাম, কিন্তু ফটীক!

নীলু একটু অন্যমনস্কভাবে বললে—হ্যাঁ সে সম্ভব। ওকে যা মনে করতে তা ও আদবেই নয়।

কোয়ালিটির আইস্‌ক্রীম খেয়ে, একটা গোল্ড-ফ্লেক সিগারেট ধরিয়ে, ময়দানের ঠাণ্ডা হাওয়াতে নীলুর মাথাটা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল।

বললে—তুমি তো জান, কবার মামার ঘরেতে কী রকম চুরি হতে আরম্ভ করল। আমি বললুম—মামা, সব ফেলে বেরিয়ে যাও ঐ রাঁধুনী বামুনের ওপর ছেড়ে দিয়ে এটা ভাল নয়।

সরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়। একবার একটা মেদিনীপুরের ছোকরা চাকর প্রায় পাঁচ হাজার টাকার ঘা দিলে! তারপরের বারে একটা উড়িষ্যাবাসী প্রায় হাজার সাতেক টাকা সাপ করল। বললাম—মামা এবার একটা বিয়ে কর।

তা বলে কী—কক্ষি নেহি। তুই যদি আমায় কোনদিন বে করতে বেখিস তো সেদিন আমায় মামা নামে ডাকিস।

আমি বললাম—ফটিক আমার কাছেই এসেছিল মাস কয়েক আগে একটা বিশ্বাসী চাকরের খোঁজে ও আমিও তাকে বিয়ে করবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম একটি মেয়ে পুলিশ বে' করতে। ওতে দুটো কাজই হত। বৌকে বৌ, পুলিশকে পুলিস, চোর তাড়াতে পারত।

নীলু বললে—তা মেয়ে পুলিশ বে' করেনি ফটিকে তবে দারোগার মেয়ে এনেছে।

অবাক হয়ে বললুম—বলিস কী! একেবারে দারোগার মেয়ে।

নীলু বললে—হ্যাঁ, বিষ্টপুরের কেষ্ট দারোগার মেয়ে!

জিজ্ঞাসা করলাম—শেষ পর্যন্ত কী প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল?

নীলু বললে—আরে ছোঃ।

বলে নিজের বুকটা চিতিয়ে কয়েকটা টোকা মেরে দেখাল।

বললাম—তা হলে?

নীলু বললে—তাহলে আর কী? গত সরস্বতী পুজোয় বাজনা নিয়ে ফটকে আর আমি গেলুম বিষ্টপুরে। অনেক রাত হয়ে গেল গানবাজনা শেষ হতে। তারপর খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হল কেষ্ট দারোগার বাড়ী। শুনলুম কেষ্ট দারোগার একটা মেয়ে আছে। সে মেয়ে নাকি লাঠি খেলা, ছোরা খেলা শুধু নয় কুস্তিতে পর্যন্ত একটা পালোয়ানকে হারিয়ে দিয়েছে। বাড়ীতে একটি বিপর্যয় ষাঁড় আছে তার কাছে ঘেঁষা চাকরগুলো পর্যন্ত ভয়ে কাঁপে। তা সে মেয়ে নাকি তার নাকে দড়ি দিয়ে চরিয়ে আনে। আরও

একেবারে বাকে বলে কাঁসারের আঠার মতো লেগে রইল। খাওয়াটা অবিশ্যি জোর হয়েছিল। রাতের বেলা পেটে বেশ চাপ। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে একটা গাড়ু হাতিয়ে বাড়ীর পিছন দিকে গাড়ুকম্মে যাব, দেখি ওমা আমার ফটিক মামুল আর কেষ্ট দারোগার সেই থুবড়ী আইবুড়ী মেয়ে দুজনে বারান্দার পাশে একেবারে হরগৌরী হয়ে গেছেন দুনিয়া ভুলে। আমি গাড়ুকম্ম মাথায় রেখে এসে খাপটী মেরে শুয়ে রইলুম। যেন কিচ্ছুটি জানিনে।

কলকাতায় ফিরে এসে দেখি ফটকের ঘরবাড়ী সব হাঁ হাঁ করছে। একটা নতুন বেহারী চাকর রেখেছিল ইদানীং। সে টাকা পয়সা বিশেষ কিছু পায়নি, তবে থালা-বাসন-গ্লাস থেকে আরম্ভ করে ধুতি, পাঞ্জাবী আর জুতোগুলো পর্যন্ত বস্তা বেঁধে নিয়ে চলে গেছে। জানতো ফটকে কী রকম সৌখীন লোক। তার তো এগারিতে বিশটা ধুতি পাঞ্জাবী, পঁচিশ জোড়া জুতো। দেখে শুনে ফটকে মামা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। আমিও টিপ্পনী কেটেছিলাম—কী মামা গরীবের কথা বাসি হলে—

তা মামা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল—বাজে বকিসনে নীলে। আমি আবার এর বিহিত করছি।

বলে তক্ষুনি উধাও। চারদিন আর মামার পাত্তা নেই সহরে। আজ গিয়ে দেখি এই কাণ্ড! ঘরে সেই বিষ্টুপুরের কেষ্ট দারোগার মেয়ে বসে আছে মাথায় দেখি লাল ডগডগে সিঁদুর পরা। আমায় দেখে খিক্ করে হেসে বললে—আসুন।

আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমায় যে ভেতে দিয়ে এখন মামা নিজেই কি না বে' করে এল। বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর। অমন মামার মুখ দেখতে নেই। যাও একটা সিগারেট যাও সন্ধ্যা। দেখি কি করে এর শোধ নেওয়া যায়।

দিন পাঁচেক পরের কথা। আজ নয় কাল করে ফটিক চাঁদের বৌ দেখতে যাওয়ার দিনটা ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছিল। সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরেই সটান গেলাম ফটীকের বাসায়।

বাইরে থেকে হাঁক দিলাম—ফটীকচাঁদ আছ নাকি?

প্রথমে কোন সাড়াই পেলাম না। বার চার পাঁচ জোরে জোরে ডাক দেবার পরে ফটীক নিজে এসে দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল। দেখি তার মুখ চোখ বসে গেছে, চেহারাটা যেন তিনমাসের রুগী।

চি চি করে বললে—আয় সন্তু ভিতরে আয়।

ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—হাঁরা তোর হয়েছে কী? তা ছাড়া ঘর দোরের এ কি অবস্থা! ড্রইং রুমের সোফাসেট কার্পেটার সব গেল কোথায়? বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়া ভাব।

ফটীকচাঁদ আগের মতো চি চি করে বললে—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই।

খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বললাম—নতুন বৌয়ের কি কোন অমঙ্গল?—

দাঁতে দাঁত পিষে ফটীকচাঁদ বললে—তাহলে তো আমি বাঁচতুম। এ যে আমার পথে বসিয়ে গেছে। বাড়ীর সমস্ত কার্পেটার বেচেছে। গত পরশু হরিহর ব্যাঙ্ক উঠে যাবে শুনে আমার যথাসর্বস্ব প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা তুলে এনে বাড়ীতে রেখেছিলাম। মফঃস্বলে বায়না ছিল গতকাল। ভেবেছিলাম ফিরে এসে রেট ব্যাঙ্কে জমা দেব। তা তার সমস্তটা নিয়ে ভেগেছে শয়তানী।

বললাম—বলিস কিরে? এই যে শুনলাম দারোগার মেয়ে বিয়ে করেছিস—?

রাগে ফেটে পড়তে পড়তে ফটীক বললে—দারোগা নয় দারোগা নয় ডাকাতের মেয়ে। ব্যাঙ্ক

ডাকাত, একেবারে গাং ডাকাত! ও আমার পথে বসিয়ে গেল—এই হাত আবার চিঠি লিখে রেখে গেছে।

বলে একচিলতে কাগজ ফটীক আমার সামনে মেলে ধরল। তাতে লেখা আছে—তুমি যে এতোদিন বিয়ে না করে ছত্রিশ গণ্ডা মেয়ের সঙ্গে রাসলীলা চালাতে তা বিয়ের আগে আমাকে বা আমার বাবাকে ঘুনাক্ষরে জানাওনি। ভাগ্যিস নীলু আমার সেইসব মেয়েদের লেখা চিঠিগুলো দিল তাতেই জানতে পারলাম তুমি আসলে কী চীজ। তোমার মতো দুশ্চরিত্রের সঙ্গে আমার আদপে পোষাবে না। তাই তোমার সব টাকা কড়ি নিয়ে আমি চললাম। আমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো না। জানতো আমার বাবা কেষ্ট ধারোগা, যার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তুমি বিষ্টুপুরে গেলে নিস্তার পাবে না। ইতি— তোমার যম।

চিঠিটা পড়ে ফটিকচাঁদের মুখের দিকে তাকালাম। ফটীকচাঁদ চিঁ চিঁ করে বললে—নীলেটার সন্ধান আমায় দিতে পারিস সন্তু। চিঠিগুলো যে কখন সরিয়েছিল টেরই পাই নি। এবার দেখা পেলে জ্যান্ত খুন করব।

সভা যখন হোল তখন মঞ্চ হতে আর কত দেরী।

সাহিত্য সভা থেকে অভিনয়ের মঞ্চে চলে এলেন উনবিংশ শতকের অন্যতম স্মরণীয় বাঙালী মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১৮৫৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। তারপর এল বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ।

১৮৫৬ সনের ১১ই এপ্রিল···অভিনীত হোল ভট্টনারায়ণের 'বেণী সংহার'। কালী-প্রসন্নও মঞ্চে নেমে পড়লেন। দর্শকরূপে এলেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার আর্থার বুলার, ভারত সরকারের প্রধান সচিব সিসিল বিডন প্রভৃতি গণ্যমান্যরা।

প্রচুর প্রশংসা পেলেন কালীপ্রসন্ন।

অভিনয় যখন হোল তখন আর নাটক রচনা বাকী থাকে কেন! ১৮৫৭ সনে কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর অনুবাদ প্রকাশ করলেন কালীপ্রসন্ন, অভিনয়ে রাজা পুরূরবার ভূমিকায় অংশ নিলেন তিনি নিজে। স্বনামধন্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এতে অবতীর্ণ হলেন। কলকাতার সমস্ত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ সেদিন সিংহবাড়ীতে ভেঙে পড়েছিল অভিনয় দেখতে।

জাতির জ্ঞানী-গুণীদের অবদানে বাঙলা রঙ্গমঞ্চ সমৃদ্ধ।

আজকের দুনিয়া

পৃথিবীর নানাস্থানে মিশনারী পাঠিয়ে পৃষ্টধর্মাবলম্বী দেশ ধর্মপ্রচারের সাহায্য করেছেন এবং কোন কোন দেশে তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য প্রথমেই মিশনারী পাঠানো যে অত্যাবশ্যক সেটাও স্বীকার করেছেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে গ্রহান্তরে এ উদ্দেশ্যে মিশনারী পাঠানো চলবে কিনা এবং সেই সব গ্রহে ধর্মপ্রচার কাজের উপরে করতে হবে, এও একটা সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, জগতের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ প্রশ্ন করছেন—"Now mankind is hoist on the great brink of conquering space, what sort of missionaries are we going to send out into the wilderness among the stars ?"—কথাটা হেসে উড়িয়ে না দিয়ে বিশেষ করে ভেবে দেখবার মত। ডেলি মিরর্

• • • •

হাসপাতালে নার্সের কাজ মানবহিতৈষণার দিক দিয়ে যে খুবই গৌরবজনক, তা'তে সন্দেহ নেই। প্রায় একশো বছর আগে Crimean যুদ্ধে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল যে আদর্শ সেবাব্রতিনীদের সামনে ধরেছিলেন, আজ তার মহিমা ও প্রভাব জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি অতি সাবধানে চারিত্রিক বিশুদ্ধতার দ্বার দিয়ে নার্সের কাজ যে কত পবিত্র সেটা জগৎকে জানিয়ে গেছেন, "Determined that nursing should become a respectable profession for women, she laid her plans with the utmost care." অবশ্য আজকাল অনেক স্থলে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। তবে Florence Nightingaleও যে একথা না বুঝতেন তা' নয়, তাই তিনি কোন পুরুষের হাতে এঁদের ভার দিতে চাননি, "An important part of her plan was that the control of the nursing staff should be in the hands of a woman." এর কারণ সহজেই অনুমেয়। ব্রিটেন

• • • •

জগতে কোন্ দেশের লোক বেশী চা-খোর, এই নিয়ে একটা বিশ্ব-কমিটি বসে ও জোর অনুসন্ধান চলে। শেষে দেখা গেল ব্রিটেনের কাছে কেউ নয়। ব্রিটেনে প্রত্যেক লোকেই চা খায়, বাদ কেউ যায় না। সেখানে "চা খাই না" কথাটা নেহাৎ অভদ্রতা। তাই "Britain is still the greatest nation of tea-drinkers in the world." সেখানে প্রত্যেক লোক সড়সড়তা প্রায় সাড়ে নয় পাউণ্ড চা খায়। অবশ্য চা ত খায়ই, তার সঙ্গে আরও অন্য "beverage"ও থাকে। এত চা খায় বলেই তারা খুব পরিশ্রমী। ঐ ও.

• • • •

প্রাচীনতম সভ্যতার যে সব নিদর্শন পৃথিবীর নানাস্থানে এখনও পাওয়া যায়, তাদের কাছাকাছি যেতে পেরেছে ত্রিয়েটনাবের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। হ্যানয় প্রদেশের খুব নিকটে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যে সব প্রাচীন জিনিষ আবিষ্কৃত হয়েছে, পণ্ডিতেরা সেগুলিকে দুই হাজার খৃঃ পূঃ বৎসরের সভ্যতার যুগের জিনিষ বলে প্রমাণিত করেছেন। তা' ছাড়া পাহাড়ের গোপন গুহায় পাওয়া গেছে আদিম মানবযুগের

যন্ত্র চিহ্ন। "The mountains are tunnelled with grottoes and caves in which traces of primitive man can be found: stone axes, large-skulled human skeletons etc." এ সব ছাড়াও পরবর্তী আদিম সভ্যতাযুগেরও জিনিষ পাওয়া গেছে, যথা—"pottery, porcelain and articles in bronze etc." পৃথিবীতে যারা মনে করে আমরাই একমাত্র সভ্যজাতি, তাদের কাছে এসব আবিষ্কার বিস্ময়সৃষ্টি করবে, সন্দেহ নেই। ভিয়েটনাম

• • • •

জগতের বিভিন্ন দেশের তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন পুরুষের চেয়ে নারীরা দীর্ঘজীবিনী হন। এর কারণ কি? কি গোপন শক্তির উৎস নারীদের মধ্যে পাওয়া যায় যাতে এরকম দীর্ঘজীবন লাভে সহায়তা হয়। নারীদের মধ্যেই এই শক্তি বর্ত্তমান, পুরুষের মধ্যে নয়। "Why are women outliving men in the majority of countries? The answer many scientists now believes may lie in the very essence of femininity." শুধু মানুষের মধ্যে নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও নারীজাতির এ শক্তি আছে। রুশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা এ তথ্য জোকেন, তাই "all the animals shot into space to date have been female." কেমিনা

• • • •

Darwin বানর থেকে মানুষের বিবর্ত্তন প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছেন, অবশ্য আজকাল তাঁর ও "Theory" খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে পণ্ডিতেরা অভিমত লিখেন। অথচ মাঝে মাঝে বানর-জগতের এমন সব খবর পাওয়া যায়, যা'তে বিবর্ত্তন-বাদকে একেবারেই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি একটি গরিলাকে কিছু শিক্ষা দিলে সে রং-তুলি নিয়ে এমন একটি ছবি এঁকেছে, যাতে বৈজ্ঞানিকেরা চমৎকৃত হয়ে গেছেন ও কেমন করে গরিলা নিজে নিজে এমন একটি ছবি আঁকতে পারল, সে বিষয়ে গবেষণা করছেন। যে ছবি এই গরিলাটি এঁকেছে সেটি সমালোচকদের মতে "The style it would seem is no more abstract than that of many contemporary human artists."

ইলাস্ট্রেটেড্ উইকলি অব্ ইণ্ডিয়া

• • • •

দুধের মধ্যে মাত্র জলটুকু বাদ দিলে সমস্তটা যে মাখনে পরিণত করা যেতে পারে এমন একটি "power churn" আবিষ্কৃত হয়েছে। তা ছাড়া দুধের জলীয় অংশটিও "is being turned into dried skim milk," এবং এটা নাকি "protein deficiency"র পক্ষে খুব উপকারী। দুধ থেকে অনেক কিছুই তৈরী করা যেতে পারে এবং অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাহায্য নিলে যে অসাধ্যসাধন করা যায় তার পরিচয় ক্রমেই পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দেশের dairy farmগুলিতে। ভারত এখন অবশ্য এ বিষয়ে পিছিয়ে আছে, কিন্তু আশা করা যায় যখন তৈয়ারী ব্যাপারে ভারত যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে, সেদিন শীঘ্রই আসছে। কমনওয়েল্থ্ টুডে

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এগারো

রামানন্দবাবু সময় নষ্ট করা পছন্দ করেন না। ঘরে গিয়ে বেশ পরিবর্তন করে এলেন। গলাবন্ধ কোটের উপর গরম চাদর। জিজ্ঞাসা করলুম : কোথায় বেরুচ্ছেন ?

জানিনা।

বেড়াতে বেরুচ্ছেন তো ?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না।

বললুম : সমুদ্রের ধারে, না শহরে ?

আপনারা কি এসব ঠিক করে বেরিয়েছিলেন ?

হেসে বললুম : না।

তবে আমাকেই বা কেন জিজ্ঞেস করছেন !

আপনি বুঝি—

ওতার সঙ্গে বেরবো, একথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই রামানন্দবাবু বললেন : তবে কি আপনার সঙ্গে বেরব !

কিন্তু—

কিন্তু কী ?

তিনি যদি—

আলবৎ যাবেন, আপনার সঙ্গে দুপুরবেলায় যদি বেরতে পারেন তো এবেলায়—

রামানন্দবাবু নির্বাক হয়ে গেলেন।

চেয়ে দেখলুম, দরজার আড়ালে ওতার শাড়ির আঁচল দেখা গেছে। বলছে : সেই ভাল, আজ সন্ধ্যেবেলায় বিশ্রামই নেওয়া থাক।

কথাটা আমাদের নয়, বলল তার দাদা কিংবা বৌদিকে। তারপরেই বেরিয়ে এল।

রামানন্দবাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ওতা বলল : আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

রামানন্দবাবু বললেন : এঁর কথা ইনিই জানেন, আমি আজ বেরব না।

দেখে তো উল্টো মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক নিজের কোট আর চাদরের দিকে চেয়ে বললেন : শরীরটা তেমন ভাল নেই।

ওতা হেসে বলল : আপনিও বসে থাকবেন নাকি ?

এ প্রশ্নের জন্য আমি তৈরি ছিলুম, বললুম : না।

কোথায় যাবেন ?

মন্দিরে।

মন্দিরে !

দুজনেই যেন চমকে উঠলেন।

আমি উত্তর দিলুম না দেখে কর্তা বলল : মন্দিরে গিয়ে কী করবেন ?

গম্ভীর গলায় বললুম : জগন্নাথ দর্শন এখনও হয়নি।

কর্তা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বোধহয় বুঝবার চেষ্টা করল আমি সত্যি বলছি কিনা, তারপর বলল : ধর্মে অনুরাগ থাকা ভাল।

রামানন্দবাবু ভ্রূকুটি কেটে বললেন : অনুরাগ, না আহ্লাদ ?

আহ্লাদ থেকেই অনুরাগের জন্ম। আমাকে দেখে আপনার আহ্লাদ হচ্ছে না বলেই এই রাগ বিরাগ বিতরাগ। রাগারাগি না করে আসবেন আমার সঙ্গে ?

রামানন্দবাবু তেড়ে উঠলেন : কেপেছেন আপনি !

কিন্তু কর্তা তাঁকে চমকে দিল, বলল : আমাকে সঙ্গে নেবেন ?

ছি ছি আপনি কেন মন্দিরে যাবেন !

রামানন্দবাবু বলে উঠলেন : চলুননা, আমরা সবাই মিলে যাই।

কর্তা বলল : তবে আর কি, আপনারা দুজনেই বেরিয়ে পড়ুন। বেশ যানাবে।

বলে ভিতরে চলে গেল।

আমি চায়ের অপেক্ষা করছিলুম। রামানন্দবাবু এবারে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বললেন : ব্যাপার কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা।

আমি উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলুম না।

রামানন্দ বাবু বললেন : কথা কইছেন না যে ?

কী বলব ?

কিছু বলবেন তো।

যা বলবার তা আপনিই বলুন।

ভদ্রলোক গলা নামিয়ে বললেন : মেয়েটার আক্কেল দেখছেন ? এই যাব বলছে, এই না।

আপনিও তো তাই করছেন।

আমি ! কেপেছেন আপনি ?

তারপরেই নরম হয়ে বললেন : আমি কি নিজের ইচ্ছেয় এমন করছি !

বড় অসহায় সুর। আমি আর প্রতিবাদ করলুম না।

চা এসেছিল। চা খেয়ে আমি পথে নেমে পড়লুম।

রামানন্দবাবু বললেন : আপনি চললেন তাহলে ?

যেতে দিন, যেতে দিন। পিছনে আর ডাকবেন না।

এ নিগমবাবুর কণ্ঠস্বর। ভদ্রলোক তাঁর বাইনকুলার নিয়ে বেরিয়েছিলেন। আর তাঁর পকেট রেডিও। পকেটের ভিতর আস্তে আস্তে রেডিও বাজবে, আর তিনি চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে সমুদ্রতীরের জনতা দেখবেন। বসে বসেই তাঁর সময় কাটবে।

রামানন্দবাবু একবার ভিতরের দরজার দিকে তাকালেন।

ডান হাতে আমি মন্দিরের পথ ধরেছিলুম। খানিকটা এগিয়ে মনে হল, এ ভুল করেছি। মন্দির আজ নির্জন নাও হতে পারে। ওতা যদি বেরোয় তো মন্দিরের দিকেই আসবে। আমার শান্তি ভঙ্গ করে সে কৌতুক উপভোগ করবে। তবে কি সমুদ্রের দিকে যাব? কিন্তু তাহলে তো হোটেলের সামনে দিয়েই ফিরতে হবে। রামানন্দবাবু ঘাঁটি আগলে বসে আছেন। কোনরকমে তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও নিমাইবাবুর বাইনকুলারকে ফাঁকি দিতে পারব না। তিনি দেখতে পেলেই রামানন্দবাবুকেও দেখাবেন। হয়তো ওতাও দেখবে। তার চেয়ে আর কোথাও যাই। কোন মঠে কিংবা আশ্রমে।

পুরীর পথে তখন আলো আছে, কিন্তু রৌদ্র নেই। পথিক আছে, কিন্তু জনতা নেই। পায়ে পায়ে আমি মন্দিরের দরজাতেই পৌঁছে গেলুম। চমক ভাঙল পাণ্ডাদের কথায়। তারা সামনের পথ রোধ করে মন্দিরের ভিতর নিয়ে গেল। আমি কি সত্যিই খুব অন্যমনস্ক ছিলুম, না অন্যমনস্কতার নামে কোন সুপ্ত ইচ্ছারই প্রশ্রয় দিয়েছি!

অন্যমনস্ক থাকা আর অসম্ভব। পাণ্ডারা ছেঁকে ধরেছেন: পূজা দেবেন?

আটকিয়া বন্ধন?

আপনার কোন চিন্তা নেই। পঞ্চায়েতের খাতায় শুধু চার পুরুষের নাম লিখে দিন, বাকি ব্যবস্থা আমরাই করে নেব।

সাত রকম আটকিয়া আছে, একশো বত্রিশ থেকে পাঁচ হাজার ছশো পর্যন্ত। যা আপনার খুশি। কোন জবরদস্তি নেই।

আটকিয়া মানে আমি জানিনা, কিন্তু আমাকে এরা খুবই আটকেছে। পুলিশের মতো ঘেরাও করে বোধ হয় পঞ্চায়েতের দপ্তরের দিকেই নিয়ে চলল।

আমি প্রতিবাদ করিনি, আত্মরক্ষার চেষ্টাও করিনি। এই মৌন সহিষ্ণুতা আমার সমর্থন মনে করে পাণ্ডারা উল্লসিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই একরকমের কুরুক্ষেত্র বাধল। কে আমাকে আগে ধরেছে, অর্থাৎ আমার পাণ্ডা হবার অধিকার কার। এই নিয়েই যুদ্ধ। বচসা যখন হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে, আমি তখন সবেগে সরে পড়লুম। ধরা পড়বার সমূহ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী তখন দুজনে ঠেকেছে। অন্য পাণ্ডারা বোধ হয় দেখেও দেখলেন না।

আটকিয়া বন্ধনের গল্প পরে শুনেছিলুম। বাঙালীরা সংক্ষেপে বলেন আটকে। মানে পঞ্চায়েতের খাতায় টাকা জমা দিয়ে জগন্নাথদেবের ভোগের ব্যবস্থা করা। একশো বত্রিশ টাকায় সাধারণ ডাল ভাত তরকারি। সাদা খিচুড়ি তিনশো ষাট, মশলা দেওয়া চারশো চৌত্রিশ। সাড়ে পাঁচশোর পুরী ও ক্ষীর ভোগ, সাড়ে সাত শোর মালপোয়া, আর মোহনভোগ এক হাজার পাঁচশো পঞ্চাশে। পাঁচ হাজার ছশো টাকা খরচ করলে ছাপার পদ ভোগে পড়বে। এই ব্যবস্থা শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র মহাত্ম্যে মুদ্রিত আছে। সাধারণ যাত্রীর জন্যে সংক্ষেপ ব্যবস্থাও আছে। পাণ্ডার সঙ্গে সেসব ঘরাঘরির ব্যাপার। সাড়ে সাত টাকার নিচে আর আটকে হবে না। অন্ন ভোগ হবে। পূজো হবে, মালা হবে। পুরীতে এখনও এক পয়সার মূল্য আছে।

পাণ্ডার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ভেবেছিলুম, কোন নির্জন স্থানে গিয়ে বসব। কিন্তু পিছন থেকে এক বালক বলল: যে দ্বার দিয়ে আপনি ভিতরে এলেন, তার নাম সিংহদ্বার। এইটিই প্রধান দ্বার।

আমার বড় কৌতুক বোধ হল।

বালক তা লক্ষ্য করে বলল : উত্তরে হস্তীদ্বার, অশ্বদ্বার দক্ষিণে, আর পশ্চিমে খাদ্য দ্বার।

আমি তাকে থামিয়ে দিলুম না। উৎসাহ পেয়ে বালক বলল : মন্দিরের চারিদিকে এই প্রাচীরকে মেদনাদ বলে। উঁচু চব্বিশ ফুট। আর বাইশ ফুট চওড়া। উত্তর দক্ষিণে লম্বা ছশো ছেষট্টি ফুট, আর ছশো সাতাশি ফুট লম্বা পূর্ব পশ্চিমে।

আমার পিছনে চলতে চলতে বালকটি বলে চলেছে : উড়িষ্যার অন্য সব মন্দিরের মতো এ মন্দিরেও চারটি ভাগ—মূল মন্দির নাটমন্দির ভোগমন্দির ও জগমোহন। প্রাঙ্গণ দুটি—অন্তর্প্রাঙ্গণ ও বহির্প্রাঙ্গণ।

বালকটি প্রচুর সাহস সঞ্চয় করেছে। বলল : অরুণ স্তম্ভ থেকে দেখাব ?

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

বালকটি আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন না করে বলল : মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে বাইশ হাত উঁচু কালো পাথরের স্তম্ভ। গরুড় স্তম্ভ ভোগ মন্দিরে। প্রথমেই এঁকে প্রণাম করে আলিঙ্গন করতে হয়। অন্তর্প্রাঙ্গণের দেবদেবীর নাম বলব ?

আমি উত্তর দিলুম না।

বালক বলল : পূর্বদিকে চৈতন্য, রাধাশ্যাম ও ভাণ্ডার, রাধাকৃষ্ণ বদরি নারায়ণ ও পুরনো রন্ধন-শালা। উত্তরদিকে কৃষ্ণ পটলেশ্বর জগন্নাথ সূর্য নারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ। দক্ষিণ দিকে রোহিণী কুণ্ড বিমলা ভুবণ্ডি কাক গণেশ চন্দনগৃহ নৃসিংহ মুক্তি মণ্ডপ ক্ষেত্রপাল সূর্য বটেশ্বর মার্কণ্ডেয় মঙ্গলা ও বটকৃষ্ণ। পশ্চিম দিকে লক্ষ্মী সরস্বতী মাখনচোরা গোপীনাথ বড় গণেশ রাধাকৃষ্ণ ও রথযাত্রার আসবাব গৃহ।

বালক এর পরে যে বহির্প্রাঙ্গণের দ্রষ্টব্য তালিকা শোনাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগে একটু এগিয়ে এসে আমাকে লক্ষ্য করল। আমি শুনছি কিনা সেকথা হয়তো জানা দরকার। মনে মনে কিছু বিবেচনা করে বলল : বাহিরের প্রাঙ্গণে একবার যাবেন কি ? এখনো পরিষ্কার আলো আছে।

কোন উত্তর না দিলে সে কী করে আমি দেখতে চাইলুম।

বালক বলল : নতুন রন্ধনশালা হয়েছে পশ্চিমদিকে। অসংখ্য উনুন। প্রতিটি উনুনের উপর সারি সারি হাঁড়ি চাপিয়ে ভাত রান্না হয়। দেখবার জিনিষ।

দেখবার জন্য আমি কৌতূহল প্রকাশ করলুম না।

বালক বলল : ভাণ্ডার গৃহ একাদশী গৃহ গঙ্গা-যমুনা কূপ শ্বেত মণ্ডপ কৃষ্ণ ও মন্দার কল—সবই ঐদিকে। উত্তর দিকে মহাদেব ঈশানপুর লোকনাথ শীতলা উত্তরায়ণ মহাবীর রাধাকৃষ্ণ মহাদেব ও বৈকুণ্ঠপুরী। দক্ষিণদিকে আনন্দ বাজার স্নানবেদী ও চাহনি মণ্ডপ। শিব পূর্বদিকে।

আমি নিশ্চিন্ত হলুম। আর তার নিশ্চয়ই কিছু বলবার নেই। এবারে কয়েকটা পয়সা পেলেই সরে যাবে। আমি পকেটে হাত দিলুম।

বালক তা দেখেও দেখল না। বলল : অক্ষয় বট দেখুন। ভগবানের বপু স্বরূপ।

অন্য ব্রাহ্মণেরা পথরোধ করে বললেন : স্পর্শ করুন। ধন, মান ও পত্নী পুত্রকন্যা যা চাইবেন, তাই পাবেন। এ হল কল্পতরু।

একজন স্ত্রীলোক আঁচল পেতে বসে আছে। কখন এই কল্পতরু থেকে পাকা ফল পড়বে, তারই অপেক্ষা। কল্পতরুর সেইতো বর। খানিকটা খাবে, খানিকটা মাদুলী করে গলায় পরবে।

ব্রাহ্মণদের আমি এড়িয়ে গেলুম।

বালক বলল : এইখানে দাঁড়িয়ে মন্দিরের কারুকার্য দেখুন।

বলে ঠিক উপরের দিকে তাকাল।

তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। মন্দির গাত্রে যে এমন অশ্লীল মূর্তি খোদিত থাকতে পারে, তা আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কোনারকের মন্দিরে নাকি এমন মূর্তি অনেক আছে। কিন্তু পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে এ দৃশ্য মর্মান্তিক মনে হল। আমি চোখ নামিয়ে নিলুম।

আর সেই মুহূর্তেই শুনলুম ঋতার কণ্ঠস্বর : মন্দিরের কারুকার্য দেখছেন?

আমার লজ্জার সীমা রইল না। পালিয়ে গিয়ে যে আত্মরক্ষা করব, তার পথ নেই। একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। কিন্তু তার পরেই নিজেকে সামলে নিলুম। আমার লজ্জা কিসে! যারা এ মূর্তি গড়েছে, তারা লজ্জা পাক। কিংবা লজ্জা পাক এই মেয়েটা! আমাকে অনুসরণ করে এর এখানে আসবার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। সঙ্গে তো কাউকেই দেখছি না! দাদা বৌদি নেই, রামানন্দবাবুও নেই। তবে কি সে একা এসেছে?

ঋতা বলল : এমন মুসড়ে পড়লেন কেন?

বললুম : আপনাকে দেখে।

কিন্তু আমাকে রক্ষা করল সেই ব্রাহ্মণ তনয়। বলল : এই মেউল নির্মাণ হয় উৎকলের রাজা গজপতি বংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবের অধিকার কালে। তিরিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। জগন্নাথদেবকে রণজিৎ সিং সাড়ে তিন কোটি টাকার কোহিনুর দিয়েছিলেন।

বাধা দিয়ে ঋতা বলল : এসব কথা রামানন্দবাবুকে শোনাতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলুম : কোথায় তিনি?

ঋতা হেসে বলল : দাদা বৌদির সঙ্গে চাল কিনছেন। পুরীর চাল ভাল।

ওঁর চালটিও ভাল।

ঋতা হেসে উঠল।

বালক তখন মন্দিরের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। চেঁচিয়ে বলল : তাড়াতাড়ি চলে আসুন। এখন একেবারে ভিড় নেই।

আমরা দুজনেই এক সঙ্গে এগিয়ে গেলুম।

কালো পাথরের বেদীর উপর আমরা জগন্নাথ দর্শন করলুম। দুটো জগন্নাথ একা নন। সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রা, সুদর্শন চক্রও আছে। কাঠের রঙ করা মূর্তি। তাই কলেবর পরিবর্তন করতে হয়। নবকলেবর বিরাট উৎসব।

ঋতা বলল : সুভদ্রা তো কৃষ্ণের বোন। এরা বলছিল বউ।

এ নিয়ে অনেক তর্ক। সেসব তর্কে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই বললুম : একটা কিছু ভেবে নিলেই হল।

বেশ বলেছেন।

কেন?

বউ আর বোন কি এক জিনিষ হল?

একালে অবশ্য দাদা বলে আলাপ শুরু করে বরমালা গলায় দেবার গল্প শুনেছি।

ঋতা রাগত ভাবে বলল : প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

রামানন্দবাবু হলে এড়িয়ে যেতেন না।

তা ঠিক। নিজের জানা না থাকলে জেনে নেবার চেষ্টা করতেন।

রামানন্দবাবু ঠিক এই সময়েই এলেন। দুহাতে দুটো ভারী ঝোলা। যোধপুর পুরীর চাল বইছেন। ওঁর পিছনে খতার দাদা বৌদি। দাদা ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে বললেন: রামানন্দবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা। একটা ঝোলাও আমাকে বইতে দিচ্ছেন না!

বৌদি বললেন: তুমি তো নিশ্চিন্ত হয়েছ দেখছি।

কিন্তু রামানন্দবাবু এ সবের ধারে কাছেও ঘেঁষলেন না। বললেন: আমার সম্বন্ধেই কোন কথা হচ্ছিল মনে হচ্ছে।

বললুম: ঠিক ধরেছেন। ইনি আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলছেন, আপনি হলে একটা সদুত্তর তিনি নিশ্চয়ই পেতেন।

প্রশ্নটা না শুনেই রামানন্দবাবু বললেন: তা পেতেন বৈ কি।

বললুম: তা হলে সুভদ্রা জগন্নাথের বোন না স্ত্রী সেই কথা বলুন।

সর্বনাশ! সুভদ্রা কেন জগন্নাথের স্ত্রী হবেন? জগন্নাথের স্ত্রী তো লক্ষ্মী।

খতা বলল: পাণ্ডারা যে অসম্ভব কথাই বলছে।

ব্রাহ্মণ বালকটি চপিচুপি বলল: চন্দন যাত্রার সময় সুভদ্রার ভোগমূর্তি লক্ষ্মী সঙ্গে যান।

বিপদ দেখুন।

রামানন্দবাবু তাঁর ঝোলা দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, বললেন: ধরুন তো।

আমি হাত বাড়িয়ে সেই ভারী ঝোলা হাতে নিলুম।

রামানন্দবাবু পকেট থেকে তাঁর খাতা পেন্সিল বার করলেন। একটা পাতা খুলে খস খস করে কিছু লিখেও ফেললেন। বললেন: টুকে নিলুম। এ বিষয়ে—

গবেষণা করতে হবে।

কথাটা আমি সম্পূর্ণ করলুম।

রামানন্দবাবু কটমট করে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: কিছু যদি মনে না করেন তো আমি আপনাকে একটু সাহায্য করতে পারি।

উত্তর খতা দিল, বলল: করুন না।

দেবতা তিন জাতের। বৈদিক, পৌরাণিক ও গ্রাম্য। গ্রাম্য দেবতাকে টানাটানি করে যখন পৌরাণিক সম্মান দেবার চেষ্টা হয়, তখনই এ গোলমাল।

খতার দাদা বিস্ময় প্রকাশ করলেন: জগন্নাথকে আপনি গ্রাম্য দেবতা বলছেন?

কারণ আছে। শুধু আকার আকৃতির জন্যে নয়। সম্বরের এইসব অসামঞ্জস্যের জন্যও আমাদের সন্দেহ করা উচিত। পুরাণে যদি বিশ্বাস থাকে তো দেখবেন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতিকে পাঠিয়েছিলেন নীলমাধব দর্শনে। চণ্ডালের দেবতা নীলমাধব। বসুপরবের গৃহে বাস করে বিদ্যাপতি সেই মূর্তি দর্শন করেছিলেন। বসুর পুত্র হৈতাপতি, তারই বংশধর হৈতা ও পতি। হৈতারা শ্রীমূর্তির অঙ্গরাগ করে। পতিরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে পূজার অধিকার লাভ করেছে; রন্ধনশালায় সেঁাঁয়ার শবর শব্দেরই অপভ্রংশ।

রামানন্দবাবু আমার দিকে তাকালেন বিহ্বলের মতো। কোন কথা কইতে পারলেন না।

বললুম: আর একটি কথা নোটবুকে টুকে রাখুন। বৌদ্ধরা এক সময় জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তিকে বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতীক বলে মনে করতেন। এ কথার আলোচনা না করলে আপনার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকবে।

সকলের মুখের দিকে চাইলে নিজেকে হয়তো হিরো ভাবতে ইচ্ছে করবে। তাই কোনদিকে না

ক্যান্সার

নির্মলেন্দু মায়া

আমার স্ত্রী বললেন—তিনি যা বললেন তা আপনারা, বিশেষতঃ যাঁরা ভাড়া বাড়ীতে থাকেন এবং যাকে মধ্যে বাসাবদল করতে আমারি মত বাধ্য হয়েছেন তাঁরা এর মধ্যে নতুন কিছু পাবেন বলে যে কথাটার উল্লেখ করছি তা নয়, তবে ব্যাপার কি জানেন আর দশটা কথার মত এটা নেই! কথার কথা ছিল না, কিছুটা সত্য ছিল।

তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যখানি যে কোন নির্বাচনী বক্তৃতার মত আগে থেকেই অনেকটা জানা ছিল, তবু যখন তিনি বললেন, জায়গাটা বড় অদ্ভুত, এ কোথায় আসলে গো, তখন আমি পরিবেশ সম্বন্ধে ঈষৎ সচেতন না হয়ে পারিনি।

হাওড়া সহরটাই তো আসলে সহরতলী, তারও উত্তরে রেল পুল পার হয়ে এলে হঠাৎ মনে হয় একেবারে পাড়াগাঁয়ে এলুম। সহর বলতে যা বোঝায়, অভ্রভেদী বাড়ী আর অতোধিক লোক, লোকের ভীড়—যেখানে লোক আর লোকই থাকে না শুধু ভীড়টা চোখে পড়ে, ভয়ঙ্কর রকম মানুষ হারিয়ে যাওয়া ভীড়—প্রায় অরণ্যের মত, দুর্ভেদ্য, দুর্গম, নাঃ তার চিহ্নমাত্র এখানে নেই।

আমার স্ত্রী বললেন, বাব্বা, একেবারে পাণ্ডব বর্জিত দেশ, একটা কথা কইবার জন নেই।

স্ত্রীদের অনুযোগ কবে আর সমে এসেছে। একথা উনি ভুলে যাচ্ছেন যেখানে পাণ্ডবগণ ছিলেন সেখানে কৌরবপক্ষীয়দেরও অভাব ঘটেনি। হয়তো আমরাই কৌরবপক্ষে ছিলুম, দুবেলা কলের কাছে কুঁজো কলসী বসানো নিয়ে 'নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' বলে লড়াই করে অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়েছি। তাছাড়া ওপর থেকে নিত্য ছাই ফেলার সেই কেলেঙ্কারীটা যাই বলো, স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছি, এবার আমরাই ওপরে।

—আর তাছাড়া পাতকুয়ো, জল, অফুরন্ত জল, আমি বোঝাতে চেয়েছি, তিনিও বলে উঠেছেন, তাছাড়া পাশেই পুকুর, স্নান বাঁধানো ঘাট, কাপড় ছাড়ার ঘেরা ঘর, কিছুরই অসুবিধে নেই, এমন কি ডুব মারারও—

এই কথাটায় আমি চমকে উঠেছি, হ্যাঁ ভীষণ চমকে উঠেছি, কথাটা আমার কানে কি রকম লাগল ডুবে মরারও—

আমাদের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের অনেক কথা মনে পড়ে গেল, ঝগড়া যে হয়নি তা নয়, তা ছাড়া দুজনেরই একটা অতৃপ্তি রয়ে গেছে, অনেক দীর্ঘনিশ্বাস, চোখের জল, চিত্তক্ষোভ, জানি আমি মরে গেলে উদ্ধার পাব না, আমার সন্তানাদি নেই, হয়নি, মানে আমার স্ত্রী—

তাবলে মরার কি আছে, তাছাড়া আমাদের যেহে মনে দিব্যি যৌবন, তাহলে কথাটা ডুব দেয়া অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ ডুব সাঁতার-টাঁতার হবে, হ্যাঁ আমি দেখেছি, আমার বাড়ীর পেছনেই, আঃ চমৎকার পুকুর দেখাই, একটা নিখুঁত আয়তক্ষেত্র, একপাশে ঝাঁপ দেয়ার ছোটখাট মঞ্চ, আর জল এত পরিষ্কার যে দেখলেই আপনার ঝাঁপ দেয়ার ইচ্ছে হবে।

—ঝাঁপ দেয়ার ইচ্ছে হবে, হবেই, এমন সব কথা আমি শানপুরের হারাণ সামন্তকে বলেছি। শানপুর জানেন না? ওই যে রেলপুলের পর থেকেই যে গ্রামটা—ওটা হোল মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার বাইরে, অর্থাৎ—দাদা, সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে, হাত উল্টিয়ে বলেছেন হারাণবাবু, স্থানীয় যুবক সঙ্ঘের

প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি, যে সঙ্ঘ অমিতবিক্রমে গত দশ বৎসর যাবত সার্বজনীন পুজো করে আসছে আর শক্তিভিক্ষা চাইছে, কিন্তু পুজো করতেই ছেলেরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে যেটুকু শক্তি বা ভিক্ষা যেন তার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না।

হারাণবাবু আগ্রহ সহকারে বললেন, আর কি দেখলেন?

—উঃ, বিস্তর জিনিষ মশাই, আমি বলতে গেছি আর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর কথাটা কানে বেজে উঠেছে, অদ্ভুত, বড়ো অদ্ভুত, আর তখনি চুপ মেরে গেছি।

হারাণবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন: আমরা আর কি করে দেখব, যা উঁচু প্রাচীর—

—আর যা বন্দুকধারী সেপাই, যুবক সঙ্ঘের কেউ একজন টিপ্পনী কেটেছে।

—আর যা বড়বাবুর চরিত্তির আর একজন মুখ ফসকে বলে ফেলেছে আর তার পরেই সব চুপ হয়ে গেছে।

আমার স্ত্রী বললেন, দেখবে এস। আমি তাঁর পিছু পিছু ছাদে উঠলুম, আঃ চোখ জুড়িয়ে গেল, এত সবুজ কোথায় ছিল।

কিন্তু, মনে একটা খটকা লাগল, বাড়ীর পেছনটায় যে অতখানি জায়গা, সব প্রাচীর ঘেরা, উঁচু প্রাচীর তার ওপর কাঁটা তারের বেড়া, তাহলে এই সবটাই বড়বাবুর। বড়বাবু? কি নাম তাঁর। তাঁর নাম কেউ জানে, কেউ জানে না। কিন্তু বড়বাবু বললে অনেকেই বুঝতে পারে। বিরাট লোহার কারখানা তাঁর। শ'য়ে শ'য়ে লোক কাজ করছে। রেল আর জলিয়ারীর একচেটিয়া অর্ডার সাপ্লায়ার। লোহা গলানোর একেবারে লেটেষ্ট কার্বেস, ওয়েষ্ট জার্মানীর নতুন নিউম্যাটিক হ্যামার—চালাই—ঢোলাই—হ্যামারিং—সে এক এলাহি ব্যাপার চালিয়েছেন।

কারখানার বর্ণনা করতে করতে হারাণবাবু লাফিয়ে উঠলেন, হ্যাঁ, কর্মী বটে, বাঘের বাচ্চা, ভোর ছ'টা থেকে রাত বারটা অবধি অবিশ্রান্ত কাজ—কাজ—চান নেই, খাওয়া নেই, খাওয়ার সময় নেই, কিন্তু—ওই এক দোষে গেলেন—হয়তো ওর দোষ নয়—যুগের দোষ—হাওয়ার দোষ—

যুবক সঙ্ঘের এক ছোকরা আমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিত: ওর আপিসে হারাণদা কাজ করেন, যে, বড়কত্তার ব্ল্যাকমার্কেটিংয়ের খবর কিছু কিছু রাখেন।

আমি অবাক। কালোবাজারে লোহা পাচার করা দোষের, খুবই দোষের, কিন্তু—হারাণবাবু যেমন বলেন—ওই এক দোষে উনি গেলেন, ডুবলেন, মরলেন, ওমার হয়ে এসেছে—এসব কথার মানে কি? ওঁর নামে কোনো পুলিশী অভিযোগ নেই, সমাজে, রাষ্ট্রে, সরকারী দপ্তরে—সর্বত্র উনি মহামাননীয় ব্যক্তি, আর টাকা—অজস্র অঢেল টাকা ওনার, তাছাড়া স্বাস্থ্য, অমন লম্বা-চওড়া সুপুরুষ চেহারা দেখা যায় না, তাহলে উনি মরতে যাবেন কেন!

আমার স্ত্রী আঙুল দিয়ে ছোট্ট একতালা বাড়ীটিকে দেখিয়ে বললেন, ওখানে থাকলে মানুষের আয়ু বেড়ে যায়।

আমি বললুম, হারাণবাবু ঠিক উল্টো কথা বলেন।

অবশ্য আমার স্ত্রীর কথায় আমার সম্পূর্ণ সায় আছে। (কার না থাকে!) গেট পেরোলেই যে সুন্দর লন পাবেন আপনি ঘাস ছাটা কল পেলেই মনে হবে এখানেরই দুচারটে অবাধ্য ঘাস ছেঁটে দিয়ে যাই এখনি। তারপর ফোয়ারা। এখন তা ফুরফুর করে উঁচুতে জল ছুঁড়ে মারছে না, কিন্তু এত সুন্দর গঠন সেই নারীমূর্তির যে মনে হবে সে আকাশের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কইছে, তার ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটের ফাঁকে অনেক কথা জমে আছে, আপনি সরে গেলেই সে মুখর হয়ে উঠবে।

কিন্তু আপনি সরতে পারবেন না। আপনার শিল্পরসিক মন মুগ্ধ হয়ে দেখবে সেই ফোয়ারা, সেজান্ত থাকলে একটা তুলনা মূলক আলোচনাও জুড়ে ফেলতে পারেন। আপনার মনে হবে অগস্টো, রোম, লণ্ডনের সেইসব বিস্ময়কর ফোয়ারার কথা, ভিগল্যাণ্ড কি কার্ল মাইলসের মত শিল্পীর নামও স্মরণে আসবে। বড়বাবুর রুচির তারিফ করতে করতে আপনি এগোবেন, পাশে পড়ে থাকবে সাজানো বাড়ীখানা, যার জানলা বন্ধ এবং দরজায় তালা ঝুলছে। তারপরেই পড়বে ফুলের বাগান, লতাবিতান, কুঞ্জ, আর তার মাঝখানে শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি—আশ্চর্য সুন্দর অবয়ব, সুন্দর, সুঠাম, তবু আর্টের নামে তার ভঙ্গীটা আপনি বরদাস্ত করতে পারবেন না, দ্রুতপদে সেটুকু পার হলেই দেখবেন এক সুদৃশ্য সরোবর এক নারীর মতই আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে 'যদি স্নান করিতে চাও—'।

আপনি সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়বেন, অনেক সুখস্মৃতির হাওয়ায় দুলতে দুলতে তাকিয়ে থাকবেন পরপারের ফলবাগানের দিকে।

—আর ঠিক তারপরেই আপনি যে অনেকের খর নজর এড়িয়ে এতখানি চলে আসতে পেরেছেন সেজন্যে অলক্ষিতে পেছন থেকে থাবেন দরোয়ানের হাতে অর্ধচন্দ্র—হারাণবাবু কথাটা শেষ করলেন। এরপর আর কিছু বর্ণনা দিতে যাওয়া আমার পক্ষে নিরর্থক।

ছাতের আলসেয় হেলান দিয়ে আমার স্ত্রী বললেন, অতখানি জায়গা পুকুর বাগান একটা লোকের, আর আমরা মাথা গোঁজার জন্যে—বাকীটুকু দীর্ঘশ্বাস।

একটু নীরবতা। আবার হাওয়া বইল: সে লোকটা কেমন, এ কি তার পয়সার বিলাস না আর কোন উদ্দেশ্য আছে! বাকীটুকু চোখের চাউনিতে প্রকাশ পেল। বড়বাবুকে ঘিরে আমাদের অন্তহীন কৌতূহল, অফুরন্ত জিজ্ঞাসা জমে উঠেছে।

* * *

সেদিন আমার নিদ্রাটি সবে গাঢ় হয়েছে আমার স্ত্রী দারুণ উত্তেজনায় একেবারে ভেঙে পড়লেন: ওঠো, ওঠো শিগ্‌গির, একটা কাণ্ড হচ্ছে—

রাত তখন গভীর। বারোটা তো বটেই। অবশ্য ঘড়ি দেখিনি। দেখেছি প্রায় পূর্ণিমার চাঁদ শিয়রে আসি আসি করছে। চতুর্দিক জ্যোৎস্নার উজান বন্যায় ভেসে যাচ্ছে।

শিয়রে চাঁদ দেখেছি। অর্থাৎ স্ত্রীর পেছু পেছু উঠে সেই ছোট্ট ছাদের আলসেয় গা ঢেলে দিয়েছি। তাছাড়া দোতলার ঘর থেকে বড় জোর পাঁচিলের কার্নিশ দেখা যায়, তার বেশি নয়। তার মানে আমার স্ত্রী এত রাতে ছাদে উঠে দেখে গেছেন!

—অ্যাদ্দিন পরে সন্ধ্যেবেলায় দেখি ঘরখানায় আলো জ্বলছে আমার স্ত্রী ভাঙলেন সব, আমি আর থাকতে পারিনি গো—ওই যে—ওই দেখ—

দেখলুম। অভিভূত হয়ে দেখলুম। লতাকুঞ্জের মাঝখানে এক দীর্ঘকায় সবল পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর শুভ্র পাঞ্জাবীর ওপর জ্যোৎস্না যেন ঢলে পড়ছে, তিনি ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে অল্প মুখ তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

—ছাখো—ছাখো—ওই যে—ওই যে—উত্তেজনার যন্ত্রণায় আমার স্ত্রী যেন কেটেপড়লেন। আমি এক ঝটকায় তাঁকে আলসে থেকে সরিয়ে নিয়ে এলুম। আমি কাঁপছিলুম। আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত নিকটে টেনে নিলুম আমি।

মনে হোল এই মুহূর্ত অসহ্য। দীর্ঘদেহ পুরুষটি এখনো এই মুহূর্তগুলি ধ্যানে স্থির অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন, তাঁর সম্মুখে ওই আশ্চর্য সুন্দর কোমল নারীদেহের আশ্চর্য এক প্রতিমূর্তি—কিন্তু সে কোনো শিল্পীর অতুলনীয় ভাস্কর্যসৃষ্টি নয়, সে জীবন্ত, প্রাণবন্ত, কিন্তু পাথরের মত স্থির, তার সমস্ত দেহের ওপর চাঁদের সমস্ত জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে। মনে হোল এই মুহূর্তে আমি আত্মহত্যা করতে পারি, লাফিয়ে পড়ে বিক্ষত হতে পারি কাঁটা তারের বেড়ায়, এক অসহ্য যন্ত্রণা এবং ততোধিক আনন্দ আমি অনুভব করলুম। আমার সম্মুখে সবকিছু যেন আলোয় আলো হয়ে গেল। আমি আর কিছু দেখতে পেলুম না।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে শিথিল দৃষ্টিতে দেখলুম এক সুবেশা নারী আলোনেভা ঘরের দিকে ফিরে চলেছে আর পুরুষটি যেন ক্লান্ত হয়ে তার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে।

ঠিক ক্লান্ত নয়, অসুস্থ।

হারাণবাবুকে তার কয়েকদিন পরে ওই একটি কথাই কেবল জিজ্ঞাসা করেছিলুম : আপনাদের বড়বাবু কি অসুস্থ?

হাত দুটো চেপে ধরলেন তিনি : কি করে জানলেন আপনি? কাক পক্ষীও যা এখনো টের পায়নি! আমরা—অফিসের লোকেরা সবেমাত্র আঁচ করছি। বলুন, বলতেই হবে, কি করে জানলেন আপনি, দেখছেন, আমার অনুমান সত্যি, আমি ঠিক ধরিছি. বেশ, আপনি না বলেন ক্ষতি নেই, আমার এখন বোধ হচ্ছে আমি বেটা বুঝিছি সেটা একেবারে ফেলবার নয়।

তিনি যে কি বুঝেছেন তার একবর্ণও আমি এতাবৎকাল ধরে যেমন বুঝতে পারিনি আজও পারলুম না। মাঝ থেকে হোল কি বেপাড়ায় এসে যে এক এবং অদ্বিতীয় বন্ধুটিকে পেয়েছিলুম তাকে হারালুম। অর্থাৎ হারাণদা যেন কেমন হয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়, ঐ পর্যন্ত, আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেন না। তাঁর কাছ থেকে শুধু এইটুকু খবর পাই বড়কর্তার খুব অসুখ চলেছে।

একদিন বললেন, বড়বাবুর অসুখটা লিভারের, লিভার পচে গেছে, অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফল।

খুব উৎফুল্ল দেখাল হারাণ বাবুকে : তবে বেঁচে যাবেন, ডাক্তার বলেছে, বিশেষ ভয় নেই, কিন্তু অসুখের কারণ হচ্ছে ওই? আমার অনুমান সত্যি, একেবারে সত্যি।

আর একদিন খুব বিমর্ষ দেখাল তাঁকে, বললেন, না মশায়, এলগিন রোডের সাহেবি হাসপাতালে আর হোল না, ডাক্তার রোগ ধরতে পারেনি, আজ ওনাকে পার্ক সার্কাসের নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হোল, অসুখটা নাকি পেটে জল জমছে। তাহলেও আমার কথাটা—

এ অঞ্চলের সর্বত্র কথাটা রটে গেল, অসুখ, বড়বাবুর অসুখ, খুব ভারী অসুখ, বাঁচে কি বাঁচেনা তার ঠিক নেই। অনেকে তাঁকে দেখতে যাচ্ছে। পার্ক সার্কাস এখান থেকে বেশ দূর, অনেক সময় আর পয়সা লাগে। তবু লোকে যাচ্ছে। বহু মানুষকে তিনি বহুভাবে সাহায্য করেছেন, জীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন তিনি, অনেকেই স্মরণ করছে তাঁর মিশুক স্বভাবের কথা, তাঁর মার্জিত আচরণ আর সহৃদয় ব্যবহারের কথা।

আমি একদিন হারাণবাবুকে কথাটা বলতেই তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন পড়ে নিলেন, তারপর বললেন, বেশ, আগামীকাল রেডি হয়ে থাকবেন। ভিজিটিং আওয়ার্সের মধ্যে যেতে হবে কি না।

আমার স্ত্রীর মুখের রেখাগুলো সন্দেহে কুটিল হয়ে উঠল : তুমি যাবে? নার্সিং হোমে? কেন?

তারপরই তিনি কথার জেরে পড়লেন : আমি দেখছি সেদিনের পর থেকে তুমি কি রকম উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হয়ে পড়ছো।

আমি একটা কিছু বলার আগেই তাঁর করুণ অনুনয় শুনতে পেলুম : বলো, আমাকে তুমি কথা দাও, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না.....

• • •

হারাণ বাবু বললেন, আসুন, ভুতো পরেই আসুন।

দশ নম্বর বেডের রোগীকে দেখেই আমি চমকে দু'পা পিছিয়ে এলুম। এ কাকে দেখছি আমি! কোথায় গেল সেই দীর্ঘ শালপ্রাংশু চেহারা! এ যে একটা ছোট ছেলে রোগা ছেলে একটা কালিপড়া ছেলে বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে।

—কে? হারাণ এসেছ? তোমার ফ্রাঙ্কের টাকাটা তাই দিতে পারিনি, আর তো চেকে সই করতে পারিনা, তুমি তাই—একটা ঘিন্‌ঘিনে গলা কথা বলতে বলতে থেমে গেল, দু' চোখের কাজলকালো প্রান্ত দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

—বড়বাবু! কাঁদবেন না, কথা কইবেন না, কষ্ট হবে, আপনি নিশ্চয় ভালো হয়ে উঠবেন, গরীবের অনেক উপকার করেছেন, তাদের কথা কি ভগবান শোনেন নি!

হারাণবাবু খুব নীচু হয়ে বড়বাবুর চোখের জলটা মুছিয়ে দিলেন। আমি আর সহ্য করতে পারলুম না, আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

• • •

কয়েকদিন পরে হারাণ বাবুকে দেখলুম আরো বিষণ্ণ, নতমুখ। যুবক সঙ্ঘের ছোট্ট ঘরটির একপাশে বসে আছেন।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন আছেন কর্তা?

স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে হারাণবাবু মুখ তুললেন : তিনি মারা গেছেন।

আমার বুকের ভেতর একটা জিজ্ঞাসা ঠেলে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল, সব কথা তাঁকে খুলে বলি, যা দেখেছি তার সব কথা, দেখে আমার মনে যে কামনার আগুন জ্বলে উঠেছে তার কথা, আমার মনে হোল মৃত্যুশোকাতুর মানুষের সামনে মন খুলে সব কথা বলা যায়, এই জগৎ এই জীবন সম্বন্ধে এমন একটা নির্লিপ্ত দৃষ্টি আসে তার যে কোন সত্য কথনেই কোন সঙ্কোচ থাকে না তখন।

কিন্তু ঠিক তখনি সুযোগ করে উঠতে পারলুম না, না পারলুম আমার জিজ্ঞাসার বোঝা নামিয়ে দিতে না মনের কথা প্রকাশ করে বলতে।

বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে জানিয়ে রাখলুম : যদি দেখ গভীর রাতে আমি ঘরে নেই, জানবে ছাদে গেছি।

স্ত্রী শুধোলেন, তোমার কি হোল গো?

আর কি হবে। মনের বোঝা নামাতে পারছি কই। আমি বেশ বুঝছি বড়কর্তার মৃত্যুর পেছনে একটা রহস্য আছে আর সে রহস্য জানেন একমাত্র ঐ হারাণ বাবু। আমি কবে তাঁকে নির্জনে পাব!

সেদিন অনেক রাত অবধি আমি বসে রইলুম। একে একে ছেলেরা চলে গেল, যুবক সঙ্ঘে কেবল রইলেন ওই এক কোণে হারাণবাবু, আর এই কোণে আমি।

হারাণবাবু ওঠবার উদ্যোগ করছিলেন, আমি সরে এসে বললুম, একটু কথা আছে, আপনি সেদিন যে বলছিলেন, সব জেনে গেছি, কি জেনেছেন আপনি? কি সে রহস্য?

আমি 'রহস্য' কথাটার ওপর জোর দিলুম, অনেক দিন থেকেই আমি তাঁর কথায় মৃত্যুর সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছিলুম।

তিনি বিষণ্ণ হাসি হাসলেন, তাঁর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল : আপনি কি বুঝতে চাইছেন আমার কথা।

তারপর কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, আমি যেদিন প্রথম জানতে পারলাম, যেদিন আমার পিগ আয়রণের টেক মিলল না, মাল সট পড়ল, যেদিন লোহার কোটা-পারমিটের হিসেবে গরমিল হোল, পারমিট উধাও হোল, আমি সেদিন বুঝেছিলাম—তখন একদিন করলায় কি জানেন—

একবার আমার দিকে তাকিয়েই চুপ হয়ে গেলেন হারাণবাবু, অনেক পরে ধীরে ধীরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন : বড়বাবুর কামরায় ঢুকলাম, একথা সেকথার মধ্যে বলেই ফেললাম, জানেন ক্যান্সার রোগটার কারণ? তিনি আমার কথা আদৌ বুঝতে না পেরে মুখ তুললেন। আমার মধ্যে কে যেন সাহস যুগিয়ে দিলে, বলেই ফেললাম, দেখুন বড়বাবু, ক্যান্সার রোগের কারণ হচ্ছে দেহের ভেতরকার সামঞ্জস্য হারিয়ে কতকগুলো সেল হঠাৎ ওভার অ্যাকটিভ যানে অতিমর সক্রিয় হয়ে ওঠে, ফলে সেখানে দেখা দেয় ক্যান্সার, এ ব্যাধি ভালো হবার নয়, এর কবলে তলিয়ে যায় গোটা শরীর।

—বড়বাবু আমার ইঙ্গিত ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু কিছুই বলেন নি, শুধু গম্ভীর হয়ে গিছলেন, হারাণবাবু থামলেন।

আমি সবিনয়ে বললুম, আর একটু যদি বুঝিয়ে বলেন—

—কি আর বলব বলুন তো, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, এ হোল সমাজদেহের কথা, এক জায়গায় ক্যান্সারের মত, কতকগুলো মানুষ ওভার অ্যাকটিভ হয়ে উঠেছে, আস্তে আস্তে দেহটা পচে যাচ্ছে। আর তাঁর নিজের মৃত্যু, সে বড় করুণ, বড় দুঃখের সেই আত্মহত্যা—

—আত্মহত্যা করেছেন বড়বাবু? আমি চমকে উঠলুম, কই শুনিনি তো।

—হ্যাঁ আত্মহত্যা, হারাণবাবুর ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল, তিনি যে কালোবাজার চোরাবাজার করেছেন তার যানে কি? তার যানে হোল তিনি গোটা সমাজের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন, তার সমাজসত্ত্ব বিনষ্ট হয়ে গিছল, তিনি সমাজের ভালোমন্দ থেকে নিজের ভালোমন্দকে আলাদা করে দেখেছিলেন, ফলে ভেতরে ভেতরে হয়ে পড়েছিলেন অসামাজিক, মানুষকে আর মনের ভেতরে টানতে পারেন নি, নিজের ভেতরে এসেছিল নির্জনতা, তখন নিজের স্বরূপ যাতে না দেখতে হয় তাই নিজেকে ভোলাতে, ধরেছিলেন মদ, এসেছিল তার আনুষঙ্গিক, অথচ ব্যাপার কি জানেন—হারাণবাবু যেন দুঃখে ফেটে পড়লেন—তাঁর ভেতরে ছিল সমাজসত্ত্বা, সেটা তাকে অহরহ আহত করছিল, আর সেইজন্যই তিনি চান-খাওয়া ছেড়ে কাজের পেছনে ছুটেছিলেন, আসলে তিনি চাইছিলেন আত্মহত্যা করতে—

চোখের কোণ দুটো চিক্‌চিক্ করে উঠল, হারাণবাবু মাথা নীচু করলেন।

আমি ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে এলুম।

বাড়ীতে পা না দিতেই স্ত্রী চেপে ধরলেন, কোথায় ছিলে এত রাত অবধি? বল কোথায় ছিলে, নইলে ওই জলে ডুবে মরব আমি।

আমি শুধু ক্লান্ত কণ্ঠে বললুম, সন্ধ্যের পর ছাদের সিঁড়িটায় একটা তালা লাগিয়ে দিও।

ডাঃ জনসনের ডায়েরী

উপন্যাস। চিত্তরঞ্জন সাইতি

ঘুম ভেঙে যায় রাতে। একটা ভারী জিনিষ ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাই। তার পরই চোখের ওপর ফুটে ওঠে একটা ছবি। দীর্ঘদেহী একটি মানুষ কয়েই হস্‌পিটাল থেকে বেরিয়ে আসছেন। হাতে একটি ল্যাম্প। এদিক ওদিক কি যেন খুঁজে ফিরছেন।

হঠাৎ আলোটা নিভে যায়। শনি-চা-রি-য়া···। একটা আর্ত্ত চীৎকার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। সারজম গাছের ওপর থেকে পাখা ঝাপটে উড়ে যায় বনময়ূরগুলি আর সারোমহনার দল।

এরপর কতক্ষণ স্তব্ধতা। কান পাতলে শোনা যায় দু' চারটে কথা। টুকরো টুকরো, কতক বা অস্পষ্ট।

আমি মরতে চাইনি ডাক্তার। [অতি ক্ষীণ আহত একটা গলার আওয়াজ।]

তবে কেন এমন করলে ?

তোমাকে খু-উ-ব ভাল লাগে, তাই।

এ বনের থেকে তোমাকে মুক্ত করে আমার দেশে নিয়ে যাব মনে করেছিলাম শনিচারিয়া।

তোমার দেশে। [কথা অস্পষ্ট। একটা যন্ত্রণার কাতরোক্তি বলে মনে হয়।]

সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি বিয়ে করতাম।

তোমার ধর্মকে আমি মেনে নিলাম ডাক্তার। কথা দাও, আমার ধর্মকে তুমি ঘৃণা করবেনা।

কথা দিচ্ছি শনিচারিয়া।

এরপর সীমাহীন নীরবতা। পাহাড়ের আকাশ থেকে অতি উজ্জ্বল নীলাভ একটি দ্যুতি ফুটে উঠছে। চন্দ্রোদয় হয়েছে পাহাড়ের ওপারে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এ পারের ছবি।

নতজানু হয়ে বসে আছেন ডাক্তার জনসন প্রার্থনার ভঙ্গীতে। সামনে নিশ্চল শুয়ে আছে আদিবাসী এক কন্যা। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে।

• • •

আপনারা যদি কেউ কখনো সিংভূমের সারান্ডা করেছেন আসেন তাহলে আমার মত এমনি বিচিত্র এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন কিছুকাল। সাতশোটি পাহাড় সারান্ডা নাম নিয়ে সবুজ অরণ্যের পোষাক পরে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তর পূর্বে চলে গেছে। আপনি পাহাড়ী রাস্তা ধরে এগিয়ে আসবেন। একদিকে উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে পাহাড়ী খাদ। তারমাঝে অপ্রশস্ত পথ। পাহাড়ের গায়ে আদিম অরণ্য। শাল, হেসেল, কাঁজা, শিমুলের ঘন বসতি। অজস্র লতাগুল্মের রহস্যময় বলে মনে হবে আপনার সারান্ডা বনভূমি। কুইনা রেখা ধরে চলে আসুন। কিছুদূর এগিয়ে সামনে দেখবেন একটি পাহাড়ী নদী। তারী মিষ্টি তার নাম। কোয়েল নামের সত্যি একটা যাদু আছে। নুড়ির নূপুর বাজিয়ে কোয়েল একখানা নীল শাড়ি গায়ে পাক দিয়ে জড়াতে জড়াতে ছুটে চলেছে।

নদী পেরিয়ে চলতে চলতে আপনি একসময় এসে পড়বেন 'ছোট নাগরা' নামে একটি পাহাড় ঘেরা আদিবাসী গ্রামের মাঝখানে। দূর থেকে দেখতে পাবেন আদিবাসী 'হো'দের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। লাল-কাল মাটির প্রলেপ লাগানো দেয়াল। ঐ পাহাড়ী গ্রামটিতে ঘুরতে ঘুরতে আপনি কয়েকটি চিহ্ন দেখতে পাবেন পাথর-গড়া মন্দির আর ইঁটের তৈরী ভাঙা গড়ের স্তূপ। বনের মাঝে এ ধরণের চিহ্নগুলি সত্যিই আপনাকে অবাক করবে। আপনি ভাবতে ভাবতে

গ্রামটি পেরিয়ে আসবেন। কিছুদূর বনের পথে এগিয়ে এসে বাঁক ফিরলেই আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটি পরিচ্ছন্ন শাল মহুয়ার ঘেরা আস্তানা। বেশ-খানিকটা জমি নিয়ে চমৎকার গাছপালা, লতায় ঢুলে সাজানো জায়গাটি আপনাকে আকর্ষণ করবে বিশেষভাবে। আপনি পথ থেকে একটু উঠে এলেই দেখতে পাবেন কয়েকটি বাংলো টাইপের খড়ো ঘর। তাদের একটির ওপরে কাঠের সাদা রঙ করা ক্রুশ আপনার চোখে পড়বে। এই নিভৃত বনভূমিতে আপনি ক্রুশচিহ্ন দেখে যখন মনে মনে চিন্তা করবেন, কি করে এখানে এল খৃষ্টধর্ম, ঠিক তখনি হয়ত আপনার চোখে পড়বে আর একটি বিচিত্র বস্তু। চার্চের সামনেই বিভিন্ন রকমের কয়েকটি গাছ একত্রে জড়াজড়ি করে উঠেছে। তাদের তলদেশে অতি পরিচ্ছন্ন একটি বাঁধান বেদী। সেখানে বিচিত্র সব আঁকিবুকি কাটা। পশুপাখি বন্যির রক্ত চিহ্ন ও আপনার চোখে পড়বে। আপনি যদি 'হো'দের দেবতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হন তাহলে বুঝতে একটুও দেরী হবেনা যে এটি বন দেবতা 'জায়েরা'র আস্তানা। আপনি নিশ্চয়ই এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাবেন। একই সঙ্গে চার্চের এলাকায় এ ধরণের আদিবাসী দেবতার আস্তানা কি করে থাকতে পারে এই নিয়ে যখন আপনি জটিল চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়বেন, ঠিক সেই সময় আপনি এক অতি বৃদ্ধ পাদ্রীর দেখা পেতে পারেন।

তাঁর তুষারশুভ্র কেশ আর মুখের মৃদু হাসিটি আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

আপনি এগিয়ে গিয়ে এই ধর্মরহস্য সম্বন্ধে তাঁর কাছে কিছু জানতে চাইবেন। তিনি তেমনি মৃদু হেসে আপনার হাত ধরে নিয়ে যাবেন চার্চের ভেতরে। তারপর আপনার হাতে একখানি অতি জীর্ণ পুঁথি তুলে দিয়ে ইঙ্গিতে পড়তে বলবেন। আপনি বৃদ্ধ পাদ্রীর নির্দেশে বাইরে এসে বাঁধান বেদীর ওপর বসে একের পর এক পাতা উল্টে যাবেন। অজ্ঞাত অরণ্য মানুষের অলিখিত এক ইতিহাস ফুটে উঠবে আপনার চোখের ওপর। ডাক্তার জনসনের ডায়েরী থেকে আপনি মধুর আদিম অরণ্যের বিচিত্র অনাস্বাদিত এক রহস্যের সন্ধান পাবেন।

• • •

ডাক্তার জনসনের ডায়েরী—

উৎসর্গ: যে প্রেম আমাকে ধর্ম বিশ্বাসে উদারতা শিখিয়েছে সে প্রেমকে নত হয়ে নমস্কার করি। যে কুমারী আমাকে সেই প্রেম দান করেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করি আমার এই স্মৃতিগ্রন্থখানি।

২০শে জুন: ১৮৯৮

জামদা থেকে হাডসনের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আসতে বেশ লাগল। এখানে ওখানে পাথরগুলো ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে সমতল। কোথাও বা দু'চারটে জলের ধারা চোখে পড়ে। বাংলাদেশে মেয়েদের কপালে লালরঙের যে পদার্থটি দেখেছি এখানে জলের রঙ কতকটা সেই রকম। হাডসন বললেন, এখানকার পাথরে নাকি প্রচুর লোহা আছে।

পথের মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভালই হল। রোদ্দুরে রোদ্দুর চড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ভেতর এতটা পথ আসা সত্যিই কষ্টকর হত। যীশুকে ধন্যবাদ, মেঘ করে বৃষ্টি এল। পাহাড়ের ওপর যখন মেঘ জমে উঠছিল তখন আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সেদিকে। ছোট একটুকরো মেঘ দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের ভেতর পাহাড়ের কোল বেয়ে নামতে লাগল সে মেঘ। শুভ্র-দেহ পাখি যেমন পায়ের উপর ভর রেখে কিছুটা দৌড়ে এসে আকাশে ডানা মেলে দেয়, ঠিক তেমনি পাহাড়ের কোল বেয়ে খানিকটা নেমে এসেই মেঘটা যেন পাখা ঝাপটে উড়ে আসতে লাগল। শোঁ শোঁ শব্দ উঠল। হাডসন ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। আমাকেও নামতে বললেন। পথের পাশে কয়েকটা শালের গাছ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘোড়া দুটোকে সেই গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম।

মুক্তোর দানার মত এক সময় বৃষ্টি ঝরতে লাগল।

প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তারপর অঝোর ধারায়। যেদিক থেকে বাতাস বইছিল আমরা তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েছিলাম। ইচ্ছে করছিল, একটু জলে ভিজি। হাডসনকে ইচ্ছের কথাটা জানালাম। হাডসন হেসে বললেন, ডাক্তার, চিকিৎসার ঘোড়ার কথা চল প্রকৃতি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানা। তারপর ওষুধের কথা।

বললাম, তা মানি, কিন্তু একথা কেন?

এই যে তুমি চাইলে বৃষ্টিতে ভিজতে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজলে সন্নিপাতে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যে দেশে ডাক্তারী করবে, সে দেশের আবহাওয়ার খোঁজ খবর রাখতে হয়।

কথাটা ভালই লাগল। বয়েসের একটা অভিজ্ঞতা আছে। ডাক্তার হলেও আমি তরুণ; হাডসন ফরেষ্ট রেঞ্জার হলেও অনেক প্রবীণ। পুঁথিপড়া শিক্ষার চেয়ে অভিজ্ঞতার দাম অনেক বেশী।

আমরা নিজেদের বৃষ্টির ছোঁয়া থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবটুকু পারলাম না। এলোমেলো বাতাসে কিছুটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। এদিকে পালের বড় বড় পাতার থেকে ভারী ভারী জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল আমাদের মাথা আর পোষাকের উপর।

বৃষ্টি থামলে শান্ত হল প্রকৃতি। গরম অনেক কম বলে মনে হল! আমরা আবার ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম।

বনের ভেতর ঢুকে মনে হল, দিনের বেলাতেই সূর্য ডুবেছে। হাডসন সামনে চলেছেন, আমি আছি পেছনে। পথের অন্ধিসন্ধি হাডসনের নখদর্পণে। তবু চারিদিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন তিনি। আমার কিন্তু চারদিকের গাছপালা, লতাপাতার নিবিড়তা মনোরম মনে হচ্ছিল।

হাডসন ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন! ইঙ্গিতে আমাকে থামতে বললেন। তারপর হাতের ইসারায় যে দৃশ্য দেখালেন তা কোনদিনে ভোলার নয়।

একটি একশিলা পাথরের ওপর বেলের ছায়া এসে পড়েছে। লতায় পাতায় ফুলে জায়গাটি মনোরম। পাশের পাহাড় থেকে ঝির ঝির শব্দে ঝরে পড়ছে একটা ক্ষীণাঙ্গী ঝরণা। ঐ একশিলা পাথরের ওপর পাখা মেলে নাচছে একটি ময়ূর। পাখায় কি উজ্জ্বল রঙের বাহার। কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মেঘভাঙা রোদের দু'এক টুকরো রশ্মি ইতিমধ্যে এসে পড়েছে ওর চিত্রিত পাখার ওপর। আবার চোখে পড়ল আর একটি ময়ূর। একটা মহুয়া গাছের ডালে সে বসেছিল! এবার দ্বৈত নৃত্য শুরু হল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে লাগলাম। বনের নটনটী নেচে চলেছে আপন মনে! দর্শকের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। মানুষের তৈরী করা রঙ্গমঞ্চে যে নৃত্য শিল্পীরা নাচে, তারা কি এমন করে দর্শকদের ভুলে আপনার ভেতর ডুবে থাকতে পারে।

১৫ই সেপ্টেম্বর:

কয়েকদিন যেন বৃষ্টিতে ভেসে গেল পাহাড়ী দেশটা। কুমড়ির বাংলোতে প্রায় বসে বসেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। বর্ষার দিনে পাহাড়ে ধ্বস নেমে পথ দুর্গম করে দিয়েছে। তার ওপর দিয়ে পথ করে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

আমাদের বাংলোর দেয়াল, মেঝে সব কাঠের। ছাউনিটা খড়ের। চাল বেয়ে টপটপ করে যখন বৃষ্টির জল পড়ে তখন জলের রঙটা দেখি লাল। সামনে একটা চেয়ার ফেলে সারাদিন আমি বসে থাকি। বাংলোর চারদিকে কাঠের খুঁটির বেড়া। সেই খুঁটিগুলো আর দেখা যায় না। কত রকমের লতা, পাতা, ফুলে তাদের ছেয়ে ফেলেছে। বাংলোর কর্মচারীদের কাছ থেকে কয়েক রকমের ফুল আর লতার নাম শিখে নিয়েছি। একটি লতার নাম 'মনাপা'। গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনী আর সাদা ফুলে ভরে আছে। বনমল্লী, যুঁই আরও কত ফুল। মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। পাশেই কারো নদী। মাঝে মাঝে বান ডাকে। শোঁ শোঁ শব্দ উঠলেই আমি বাংলো থেকে বেড়িয়ে নদীর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ওপরের পাহাড়ে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই বৃষ্টির জল নেমে আসছে নদী বেয়ে। তার আওয়াজ ভেসে আসে বহু দূরের থেকে।

নদীতে দেখা যাচ্ছে নীল জলের প্রবাহ, পরক্ষণেই কত

উঁচু একটা সৈকত জলের ঢেউ তার ওপর এসে পড়ল। অমনি কূল ছাপিয়ে বইল জলের ধারা।

মাঝে মাঝে কুলিকামিন নিয়ে হাডসন পথের অবস্থা দেখতে বেরিয়ে যান। কখনো বা তাঁর বাংলোতে ফিরে আসার আগেই প্রবল বর্ষা শুরু হয়। মেঘের মাতামাতি চলতে থাকে। বাজের গর্জনের সঙ্গে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা যায়। আশপাশের পাহাড়গুলো সে শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাডসনের জন্যে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ি। বড় জেদী আর একরোখা মানুষ এই হাডসন। বিপদের ঝুঁকি যতটা নেওয়া চলে তার চেয়ে অনেক বেশী নিতে পারেন তিনি। তাই মাঝে মাঝে তাঁর জন্যে চিন্তিত না হয়ে উপায় থাকে না। হাডসন আমার পিতৃবোর বন্ধু। তাঁর ভরসাতেই আমার এখানে আসা। কুলিকামিনেরা পাহাড়ী রাস্তাঘাট তৈরী করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। মাঝে মাঝে জখমও হয়ে ওঠে। তাদের জন্যে সরকারী রিজার্ভ করেছে চিকিৎসকের দরকার। নতুন জায়গা দেখার একটা লোভ ছিল আমার। তাই হাডসনের ডাকে চলে এলাম।

এই বর্ষার ভেতর দু'একদিন হাডসনের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টি বন্ধ থাকলেও পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘ থমকে থাকত। তারই ফাঁকে সূর্যের আলো এদিক ওদিক একটু দেখা দিলেই পাখিরা ঝাঁক বেঁধে রসুনের লোভে জড় হত। নিপুণ শিকারী হাডসনের অব্যর্থ লক্ষ্য। কয়েক জোড়া বন মোরগ, তিতির শিকার করে বুনো লতায় বেঁধে নিয়ে আমরা বাংলোয় ফিরতাম।

রাতে বৃষ্টি নামত। আমাদের বাংলোটা সেই মুহূর্তে মনে হত যেন সমস্ত জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশাল সমুদ্রের বুকে একটি নিঃসঙ্গ তরণীতে আমারা দুটি প্রাণী কোথাও ভেসে চলেছি বলে মনে হত।

হাডসন যেমন শিকারী তেমনি ভোজনবিলাসী। এখানকার বাবুর্চির রান্না তাঁর আদপেই পছন্দ হয়না। রাতে বসে বসে হাডসন তাঁর সংসারের কথা তুলতেন। আগামী শরৎকালে সমস্ত পরিবারকে এনে ফেলার একটা পরিকল্পনাও তিনি এই সময় স্থির করে ফেললেন।

১৭ই নভেম্বর :

একদিন দেখলাম হাডসন আর বাংলো থেকে কাজে বেরুলেন না।

বললাম, কি হল, শরীর খারাপ নাকি?

হাডসন কোন কথা না বলে আমার হাতে একখানা চিঠি দিলেন।

চিঠিখানা এসেছে বোম্বে থেকে। হাডসনের এক বন্ধু সেই চিঠির রচয়িতা। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তিনি। চিঠির মোটামুটি বক্তব্য এই, সরকার একদল মিশনারীকে সাহায্য করেছে পাঠাচ্ছেন আদিবাসীদের ভেতর খৃষ্টধর্মের প্রচারের জন্য। এ কাজে দু'দিক থেকেই লাভ হবে। অখৃষ্টানেরা প্রভু যীশুর মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। তা ছাড়া পরোক্ষে আর একটি বড় রকমের লাভের সম্ভাবনা আছে। সেটি হল, খৃষ্টধর্মের প্রভাবে এলে আদিবাসীদের ভেতর কথায় কথায় বিদ্রোহ করবার আগ্রহ কমে আসবে! তখন সরকারের পক্ষে বনভূমিতে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করা আর ব্যবসা চালানোর সুবিধে হবে।

বললাম, এতে তো আপনারই সুবিধে। আদিবাসীরা আপনাকে কুলিকামিন দিয়ে এখন সাহায্য করতে চাইছেনা, তখন আর এ হাঙ্গামা থাকবেনা।

হাডসন বললেন, চিঠির শেষ অংশটুকু পড়ে দেখ।

চিঠি শেষ করে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, কি আনন্দ, আপনার পরিবারের সবাই দেখছি ঐ দলের সঙ্গেই আসছেন!

হাডসন এবার উঠে বসলেন। এমন উত্তেজিত মুখভাব আমি এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।

বললেন, পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছে দেখতে পাচ্ছ না?

ওঁর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম।

হাডসনের মুখে করুন হাসির রেখা ফুটে উঠল। মুহূর্তে হাডসন শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়লেন, জনসন, এ একান্ত আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা। অন্য কারু জানার কথা নয়।

এমন বলিষ্ঠ মানুষের এমনি কোমল একটা আঘাতের জায়গা থাকতে পারে তা আগে কোনদিন ভাবতে পারিনি!

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা।

হাডসন বললেন, তুমি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট ডাক্তার, তবু এই নির্জন জায়গায় একই সঙ্গে আমরা কাটাচ্ছি, তাই তুমি আমার বন্ধু। তোমার কাছে গোপন করার কিছু নেই আমার।

মনের কোন একটি গোপন কথা হাডসন আমাকে আজ শোনাতে চান, তাই এ ভূমিকা।

হাডসন বললেন, আমার স্ত্রী তাঁর কুমারী জীবনে পিটারের প্রতি আসক্তা ছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হলে পিটার অবিবাহিত থেকে যান, পরে মিশনে যোগ দেন।

হাডসনের ব্যথার কাঁটা কোথায় বিঁধে আছে এতক্ষণে তা বুঝলাম।

সান্ত্বনা দেবার ত্রুটি রাখলাম না। বললাম, কুমারী জীবন আর বিবাহিত জীবনের ভাবনা এক হবে এমন কোন কথা নেই। আজ উনি পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছেন বলে আমরা নিশ্চিত ধরে নিতে পারিনা যে ওঁর মনে এখনও কুমারী জীবনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হাডসন হেসে বললেন, যুক্তি মনকে অনেক সময় প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মন প্রায় ক্ষেত্রেই তাকে স্বীকার করতে চায় না।

বললাম, কোন সন্দেহ থাকলে আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ নিতে পারতেন।

করুণ হাসি হাসলেন হাডসন। বললেন, একবার এক হিন্দুসাধুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছিল। সাধু আমাকে বললেন, যে বাতাস আমাদের নৌকো ডুবায়, জলের ভেতর ডুবে যেতে যেতে আমরা সেই বাতাসকেই প্রতি মুহূর্তে চাই।

কথাটা মনে রাখার মত।

হাডসন বললেন, আমাদের যা পাওয়া উচিত, বা পাওয়া দরকার ছিল, তা সব সময় পাওয়া যায় না। যে আমাদের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটায়, অনেক সময় আমাদের মন তাকেই বেশী করে আগলে রাখতে চায়।

আমি চুপ করে গেলাম। জীবনের রহস্য সত্যই বিচিত্র।

ইতিমধ্যে মিসেস হাডসন এসে পৌঁছলেন! সঙ্গে অবিবাহিতা বোন ডরোথি।

দু'জনের বয়েসে যেমন তফাৎ স্বভাবেও ঠিক তেমনি।

মিসেস হাডসন অত্যন্ত বাকপটু। রসিকতার সঙ্গে সামাজিকতার চমৎকার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। সারাক্ষণ কৌতুক আর হাসির টুকরো ছড়িয়ে চলেছেন।

তাঁর বাইরের এই উজ্জ্বলতার ভেতরে কোথাও যে মনের আকাশে মেঘ জমে থাকতে পারে তা একেবারেই ভাবা যায় না।

ডরোথির প্রকৃতি একটু চাপা। চেষ্টা করেও সে উজ্জ্বল হতে পারে না। স্বভাবের গভীরে কোথায় যেন তার একটা একান্ত নির্জন বসবাসের জায়গা আছে। সেখান থেকে তাকে কদাচিৎ বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

যে ক'দিন পাদ্রী পিটার বাংলোতে রইলেন, হাডসন অন্য মানুষ। চেনাই যায় না যে ভেতরে তাঁর কোন ক্ষত আছে।

আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রইল না। সকাল, সন্ধ্যা পিটারের সঙ্গে চলতে লাগল নানান পরিকল্পনা। স্থির হল, সাসাংগাতে একটি চার্চ তৈরী করে সেখান থেকেই ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে!

সাসাংগায় চার্চ তৈরী হল। কাঠের বাড়ী, খড়ের চাল। চার্চের লাগাও আরও কয়েকখানা ঘর উঠল। পাদ্রী পিটার আর তাঁর দলবল থাকবেন সেখানে। স্কুলের জন্যে জমি তৈরী করা হল।

আমরা সবাই মিলে ঘোড়ায় চড়ে চললাম সাসাংগার চার্চে। সারাদিন রইলাম সেখানে। প্রার্থনায় যোগ দিলাম। প্রথম দিনেই একটি আদিবাসী মেয়েকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হল। মেয়েটি আমাদের বাংলোতে পরিচারিকার কাজ করত। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ

হয়েছিল তার। মীকা নিয়ে মেয়েটি মিশনারীদের কাছেই থেকে গেল।

প্রথমদিকে কাজকর্মের জন্যে তার সেখানে থাকা দরকার হয়ে পড়েছিল।

আমরা ফিরে এলাম বাংলোতে।

২৪শে ডিসেম্বর :

বর্ষায় ভেঙে গিয়েছিল পথঘাট : শরৎকালে সব মেরামত হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কুমুড়ির বাংলো থেকে খানিক দূরে খলকোবাদে গড়ে উঠেছে আমার হাসপাতাল। রোগী অল্পই থাকে, আমাকে প্রায় একা একাই কাটাতে হয়। বসে বসে বই পড়ি। শিকার কাহিনী পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। পাদ্রী পিটার কয়েকখানা বই পাঠিয়েছেন। সবই প্রায় ধর্মগ্রন্থ। এত সহজ করে বইগুলির ভেতর ধর্মের কথা লেখা আছে, যা পড়লে সাধারণ মানুষও ধর্ম-পথের মোটামুটি একটা হদিস পেতে পারে।

হাসপাতালের সামনে একটি চমৎকার শালের বন। তলাকার পাথরগুলো বড় পরিচ্ছন্ন। আমি বসে বসে দেখি একটির পর একটি শালের পাতা খসে খসে পড়ছে। একটু হাওয়া লাগল, অমনি কি বিচিত্র শব্দ করে ওরা ঘুরতে ঘুরতে এক সময় হালকা হাওয়ায় ওরা নেমে গেল নিচের উপত্যকার ভেতর। রাতের আকাশ ঘন নীল। জ্বল জ্বল করে জ্বলছে একটা তারা শালগাছটার ঠিক মাথার ওপর। আরও অগুন্তি তারা আকাশে। সবার ভেতর এটি যেন একটু আলাদা।

কত কাছে, আর কত স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে। যীশুর আবির্ভাবের সময় পূর্বদেশের সাধুরা এমনি একটি নক্ষত্র আকাশে দেখেছিলেন।

শালগাছের মাথার ওপর ঐ তারাটি দেখলে আমার মন কেমন যেন শান্ত আর গভীর হয়ে আসে।

মনে হয়, আমার হাসপাতালে যে রোগীটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রাতে ঘুমুতে পারছেনা, তার ঐ তারার আলোর মত স্নিগ্ধ শান্তি আসুক। জগতের যেখানে যত রোগার্ত, শোকার্ত রয়েছে তারা সুস্থ হয়ে উঠুক, সুখী হোক।

এই শীতের রাত্রি, কুয়াশার চাদর বিছান উপত্যকায় অতন্দ্র চাঁদের আলো, বনভূমির নিম্নতলোকে কীটপতঙ্গের বিচিত্র ধ্বনি আমাকে যেন আবিষ্ট করে রাখে।

৩০শে ডিসেম্বর :

কয়েকদিন আগে আমার হাসপাতালে একটি রোগী এসেছে, সে রাতে কিছুতেই ঘুমুতে পারছেনা। ঘুমের ওষুধ দিলে কিছু সময় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে, তারপর জেগে উঠলেই শুরু হয় গোঙানী। ওর জন্যে এ ক'দিন আমারও চোখে ঘুম নেই।

সেদিনটির স্মৃতি বোধকরি ভুলতে পারবনা কোনদিন।

ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলাম কুমুড়ির বাংলোর দিকে। পথের ধারে দেখলাম কাঞ্চন ফুল ফুটেছে।

এ দেশের গাছপালা আর ফুলের কত নামই না আমার ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে।

একটা দুটো গাছ নয়, শত শত কাঞ্চন ফুলের গাছের যেন বন তৈরী হয়েছে। আমি ঘোড়ায় বসে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ আর ফেরাতে পারলাম না। কোন কোন গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটেছে, আবার কোন গাছে বা ঈষৎ বেগুনী আভার ফুল। গাছ খুব বড় নয়, কিন্তু বড় শোভন সুন্দরভাবে ডালপালা পাতাপত্র মেলে রেখেছে।

আরও এগিয়ে চললাম। বেলা শেষের তখনও অনেক বাকী। শীতের বনভূমি এরই মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। প্রকৃতির কি বিচিত্র আয়োজন। টেকোমা ফুল ফুটে রয়েছে পথের ধারে। গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ রঙের ফুল। খাদের ধারে ঝিলাই গাছটার ছোট ছোট সাদা ফুলে তখনও মৌমাছিদের ভীড় ভাঙেনি। ওদিকে ডাইনে উঁচু পাহাড়ের গায়ে আরাবা গাছে বসে আছে এক ঝাঁক পাখি। বিচিত্র কলরব তুলেছে তারা।

ডালের ফাঁকে ফাঁকে লাল লাল ছোট ফুলগুলি উঁকি দিচ্ছে। শীতের প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে অতি ধীরে এগিয়ে চলেছি আমি, আর মনে মনে ঈশ্বরের অপূর্ব

সৃষ্টির তারিফ করছি। হঠাৎ আমার ঘোড়াটা থমকে দাঁড়াল। সামনে একটি টিলা। ঐ টিলার কোল ঘেঁষেই আমার পথ। পথটা ঐ পাহাড়টার কাছে এসে কোণ তৈরী করে বেঁকে গেছে। এপারের পথ থেকে ওপারের পথটা দেখা যায় না। ঘোড়াটা হঠাৎ থামল দেখে আমি চারদিক তাকাতে লাগলাম। হঠাৎ যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পাহাড়টা যেখানে দুটো পথের কোণ সৃষ্টি করেছে তার নিচেই সাদা সন্টলিকের একটা রেখা অগভীর ত্যালির মধ্যে নেমে গেছে। ঐ সল্ট লিকের পথে উঠে আসছে একটা সম্বর। আর তার কয়েক হাত ব্যবধানে শাল আর হেসেল গাছের আড়ালে থেকে একটি চিতা গুঁড়ি মেরে সম্বরটাকে অনুসরণ করছে। সম্বর কিছু একটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে কিন্তু চিতাটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই লাফাতে লাফাতে সল্টলিক ধরে ওপরের পাহাড়ের দিকে উঠে আসছে, আবার একটু থেমে সিধে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল। ঘোড়ার চড়ে এই পাহাড়ী আঁকাবাঁকা খাদের পথে দৌড়ান সম্ভব নয়। তাতে যে শব্দ হবে চিতাটা সে শব্দে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আশেপাশে একটা গাছ খুঁজতে লাগলাম। ঐ টিলার পাশেই একটা উঁচু পলাশ গাছ ছিল। জুতো খুলে তার ওপর উঠলাম।

এখন টিলার দু'পাশে দুটো পথই আমি দেখতে পাচ্ছি। সম্বরটা লাফ দিয়ে এক ধাপ টিলার ওপর উঠে এল। চিতাটা এখন পথের পাশে একটা ঝোপের আড়ে গুঁড়ি মেরে বসেছে।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। দুটি গরু কতকগুলো কাঠের বোঝা টেনে টেনে আনছিল একটা পথ ধরে, তাদের ঠিক পেছনেই আদিবাসী একটা লোক গরুগুলোকে তাড়িয়ে আনছিল। আমি এই দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। চীৎকার করে সাবধান করতে গেলে চিতাটার দৃষ্টি সম্বরের কাছ থেকে গরু আর আদিবাসীর ওপরে গিয়ে পড়বে। তখন বিপরীত ফল ফলবে।

আমি চুপচাপ প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে হরিণটা আর এক ধাপ লাফ দিয়ে ওপরের বনের কাছাকাছি গেলেই বাঘটা তাকে অনুসরণ করে ওপরে উঠে আসবে। তখন ঐ লোকটার বেঁচে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

কিন্তু সম্বর নড়ল না, বাঘটাও বসে রইল পথের ওপর। আর তাদের মাঝে এসে পড়ল গরুর গাড়ী আর আদিবাসী লোকটি। বাঘটাকে দেখে গরু দুটো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। লোকটা তখনও বাঘটাকে দেখতে পায়নি। সে গরুগুলোকে আরম্বে আনবে বলে হেই-গো হেই-হো করে তাদের পিছু পিছু ঘোড়ে চলল। লোকটি যেই চিতার ধার ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে অমনি একটা থাবা এসে পড়ল তার ঘাড়ে। বলিষ্ঠ লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি গাছের ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠলাম। পাহাড়ে পাহাড়ে আমার সে চীৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

গাছের ওপর থেকে চেয়ে দেখি, বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে একবার আঘাত করে আবার খেলা করে, ঠিক তেমনি লোকটাকে নিয়ে বাঘটা খেলা করতে লাগল।

সূর্যাস্ত হয়ে গেল সামনের পাহাড়ের আড়ালে। পেছনের রাস্তায় একটা হৈ চৈ শুনে তাকিয়ে দেখি কতকগুলি আদিবাসী তীর ধনু নিয়ে মশাল জেলে এদিকে দৌড়ে আসছে। আমি গাছের ওপর থেকে চীৎকার করে তাদের ডাকতে লাগলাম। মশাল দেখে আর হৈ চৈ শুনে বাঘটা লোকটাকে পথের ওপর ফেলে রেখে সরে গেল।

ওরা এসে লোকটাকে ঘিরে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে। আমি গাছের থেকে নেমে এলাম। পথের ওপর থেকে কুড়িয়ে নিলাম আমার ওষুধের ব্যাগটা। লোকটির কাছে গিয়ে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে আমার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে আসতে বললাম। লোকটির তখনও জ্ঞান ফেরেনি। ওরা ওকে আমার হাসপাতালে বয়ে

দিয়ে গেল। আজ ক'দিন ধরে সমানে লোকটার চিকিৎসা চলেছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য হতে পারেনি এখনও।

রাতে বসে বসে রক্তমন্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, এত সুন্দর তুমি, অথচ কি ভীষণ।

১৫ই মার্চ : ১৮৯৯

হাডসনের লোক এসে জরুরী খবর দিয়ে গেল, যেন একটুও দেরী না করে আমি কুমডির বাংলোতে যাই।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালের কাজ গুছিয়ে আমি বাংলোতে গিয়ে পৌঁছলাম। গেটের সামনেই পায়চারী করছিলেন হাডসন। আমাকে দেখেই বেরিয়ে এলেন। বাংলোতে না গিয়ে হাডসনকে অনুসরণ করে আমরা এসে বসলাম কারো নদীর ধারে নতুন তৈরী সাঁকোটার ওপর। হাডসন আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

ব্যাপার কি বলুন তো, কোন অঘটন কি ঘটেছে?

আমার হাত তেমনি হাডসনের হাতের ভেতর ধরা রইল।

কিছুক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে বললেন, রেবেকা পাগল হয়ে গেছে।

রেবেকা হাডসনের স্ত্রী। আমি গত সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেছি। পাগলামোর কোন লক্ষণই তাঁর ভেতর প্রকাশ পায়নি।

বললাম, আনুপূর্বিক ঘটনাগুলো বলে যান।

হাডসন বললেন, ইদানিং প্রায়ই উনি সান্ধ্যকালীন গীর্জায় যেতেন। তুমি জান, নানা কাজে আমাকে বাইরে বাইরে যেতে হয়। আমি ওঁর সঙ্গে যেতে পারতাম না। ডরোথিকে নিয়েই উনি ওখানে যেতেন। সঙ্গে থাকত আমার আরদালী।

প্রথম দিকে গীর্জা থেকে ধর্মবিষয়ক অনেকগুলি করে বই আনতেন। রাত জেগে তাই পড়তেন।

তুমি জান জনসন, কারু স্বাধীন ইচ্ছায় আমি কখনো বাধা দিতে চাই না।

উনি একঘরে পড়তেন, আমি অন্য ঘরে ঘুমোতাম।

এক রাতে ডরোথির সঙ্গে কি নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হল। কিছুই বুঝলাম না। তারপর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছেন। গীর্জায় যান না, একা একাই ঘরের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান। কি যেন হারিয়ে ফেলেছেন, তাকেই পাতি পাতি করে খোঁজেন। প্রথমদিকে ডরোথিকে দেখলে কথা বলতেন না। এখন ওকে একেবারেই দেখতে পারেন না। কারণে অকারণে তেড়ে যান।

বললাম, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আমি দু'একটি কথা আপনার কাছে জানতে চাই।

স্বচ্ছন্দে, হাডসন বললেন। ডরোথির কি আপনার ওপর কোন দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন?

হাডসন যেন আকাশ থেকে পড়লেন, আমার ওপর! ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব নিকট হলেও বয়সের পার্থক্যটা নিশ্চয়ই তুমি লক্ষ্য করেছ।

আপনি আপনার দিকের কথাই বলছেন, ওঁর মনের দিকটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেননি।

চিন্তিত হলেন হাডসন। বললেন, আমি কিন্তু কোনদিন তার কোন আভাস পাইনি।

আচ্ছা এটা কি লক্ষ্য করেছেন, আপনার কাছে ডরোথি কোন কারণে এলে আপনার স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

হাডসন কিছুক্ষণ পেছনের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এক সময় বললেন, তোমার অনুমান সত্য বলেই মনে হচ্ছে ডাক্তার।

ডরোথিকে কোন সময়ে আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকতে দেখলেই উনিও সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হন। ডরোথি চলে গেলে উনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর এদিক ওদিক কি যেন খুঁজতে শুরু করেন।

হাডসনের শেষের কথাটার ব্যাখ্যা ঠিক মত করে উঠতে পারলাম না। হাডসনের ওপর ডরোথির অনুরাগকে সস্নেহের চোখে দেখলে রেবেকা ডরোথিকে চোখে চোখে রাখতে পারেন, কিন্তু এর ভেতর খোঁজাখুঁজির প্রশ্নটা আসে কোথা থেকে।

ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিকমত পরিষ্কার হল না।

বললাম, আপনি বুঝতেই পারছেন, এ রোগটা সম্পূর্ণ মানসিক সুতরাং মনের চিকিৎসা ছাড়া এর নিরাময় সম্ভব নয়। তবে সাময়িক উত্তেজনা যাতে খানিকটা দূর করা যায় সেজন্যে ওষুধ একটা দিয়ে দিচ্ছি।

আমি আর বাংলোর ভেতর গেলাম না। হাডসন আমার সঙ্গে এলেন হাসপাতালে। ওষুধ তৈরী করে দিয়ে বললাম, কয়েকদিন গেলে তারপর নতুন চিকিৎসার কথা ভাবা যাবে, কি বলেন?

কথা বলতে গিয়ে হাডসনের দিকে তাকিয়ে দেখি ওঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেখানে যেন উদ্বেগের কোন ছায়া নেই।

ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে হাডসন হেসে বললেন, নিশ্চিন্ত হলাম ডাক্তার। পিটারকে নিয়ে রেবেকা সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা আর রইল না। ডরোথির ওপর রেবেকার ঈর্ষাই আমাকে এতদিনের দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

হাডসন চলে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। রেবেকার খোঁজাখুঁজির অর্থটা কিছুতেই আমার কাছে পরিষ্কার হল না।

২০শে এপ্রিল:

মার্চে সারান্দা বনভূমিতে যেন উৎসব লেগে গেল। শীতে শালের পাতা ঝরে গিয়েছিল, বসন্তের বাতাসে নতুন প্রাণের জোয়ার এল। কোথা থেকে সুস্থ ডালে জ্বলে উঠল নতুন পাতার আগুন। দেখতে দেখতে বন পাতায় গাছ ছেয়ে গেল। গাছে গাছে ফুল এল এক সময়। থোকা থোকা মাখন-রঙের ফুল।

মিষ্টি একরকম গন্ধে সারা বন মেতে উঠল। মৌমাছি পাড়ার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মধু লুটবার। পাহাড়ী ঝোরার ধারে সাংকারলা লতা ভরে সাদা সাদা ফুল এল। হলুদ রঙের কেশর দুলতে লাগল।

শালের গাছে এসে বসল হাজার হাজার টিয়া। আর রাতদিন গাছে গাছে চলল ওদের জলসা। পাতায় পাতায় মিশে রইল তারা।

এদিকে 'বাহা' পরব শুরু হয়ে গেল আদিবাসীদের। শালের ফুল ফুটল আর ওদের মনে লাগল উৎসবের রঙ। নাচ গান চলল ওদের গাঁয়ে গাঁয়ে। আমার বাসল শালের ছায়ায় মহুয়ার ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে গেল। হাড়িয়া তৈরী চল সেই ফলে। তারপর হাড়িয়ার মধ্যে মাতামাতি।

'হো' সম্প্রদায়ই এ অঞ্চলে বেশী। সাঁওতাল আর লোহার আছে অল্প সল্প।

পরবে মেয়েদের সাজের বাহার দেখবার মত। বনদেবতা 'জাহেরা'র আস্তানায় পুজো দিতে গেল আমার হাসপাতালের সামনের পথ দিয়ে। খোঁপায় গুঁজেছে লাল, সাদা ফুল আর হরেক রকম পাতা। গান গাইছে। বিচিত্র সুর আর ভাষা। তবে এই আদিম অরণ্য পরিবেশের সঙ্গে ওদের এই গানের সুরের কোথায় যেন একটা গভীর যোগ আছে। বহু রাত অবধি শোনা যায় মাদল, নাগরা আর বাঁশির আওয়াজ।

হাসপাতালে বসে বসে শুনতে পাই ওদের গানের সুর! সেই সঙ্গে দু'এক টুকরো কথাও ভেসে আসে।

'হেসামাতা মাতাসেনা, বাড়ীমাতা মাতাসেনা,
হেসামাতা চবজনা, বাড়ীমাতা চবজনা,
সমাগেজা তুইম বন্দলেকেনা:'

আমি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ি। উৎসবের দিনগুলোতে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। ওদের গাঁয়ে আমি যেতে আরম্ভ করেছি। কেউবা সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারু চোখে বা কৌতূহল।

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটল।

একটা লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল। অমনি গাঁ উজাড়। এ রোগ ধরলে কাছে পিঠে যে থাকবে তার নাকি নিস্তার নেই! কথাটা শুনেই আমি গাঁয়ে গেলাম। লোকটার ঘরে গিয়ে দেখি সে কাতরাচ্ছে। ওষুধপত্র সঙ্গেই ছিল। চিকিৎসা শুরু করলাম। কয়েক দিনের ভেতর লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

একদিন বসে আছি হাসপাতালের বারান্দায়। দেখি দল বেঁধে আদিবাসী মেয়ে পুরুষ হাজির। কারু হাতে

মুরগী, কাঁকড়া পাখরা, আবার কেউ এনেছে মাটির ভাঁড়ে হাড়িয়া। মেয়েরা ফুল এনেছে। কি ব্যাপার! ওদের ভেতর দেখি সেই লোকটি, যার চিকিৎসা আমি করেছিলাম! লোকটি ছিল গাঁয়ের মাতব্বর। সে সেরে উঠেই দলবলকে খবর দিয়েছে। তারা তো তাজ্জব। যে লোকটা নির্ঘাত মরবে সে কিনা এমনি বেঁচে গেল। তারপর সব শুনে ভেট নিয়ে এসেছে আমার কাছে।

মেয়েরা এসে বলল, ফুল নে, তোর বউএর লেগে আনলাম।

আর একটি মেয়ে বলল, কই বউ দেখাবিনা?

বললাম, আমার বউ নেই।

ওরা সব হেসে লুটিয়ে পড়ল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে আজও আমি বিয়ে করিনি।

তারপর আমার হাসপাতাল ঘুরে উঁকি দিয়ে আমার বউএর খোঁজ করতে লাগল। শেষে কোন মহিলাকে না দেখতে পেয়ে ওরা আবার ফিরে এল। তারপর যে যার নিজেদের খোঁপায় ফুল গুঁজতে লাগল। আমি ওদের কাছ থেকে কিছু ফুল চেয়ে নিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলাম। ওরা আমার কাণ্ড দেখে হাসতে লাগল। ফুলদানিতে যে কেউ কখনো ফুল রাখতে পারে। তা ওরা ধারণাই করতে পারে না।

একজন ফুলদানির দিকে তাকিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা তোর বউ।

অমনি হাসির ঢেউ উঠল। এই জঙ্গলের মেয়েগুলির ভেতর এত হাসি, এত প্রাণ আছে। দেখলে অবাক হতে হয়।

ওরা মুরগী আর পাখরা আমাকে খেতে দিয়ে গেল। হাসপাতালে বসেই ওরা হাড়িয়া খেল। তারপর আমার উদ্দেশ্যে যে সব প্রশংসা বর্ষণ করতে লাগল তাতে মনে হল, আমি একজন ছদ্মবেশী দেবতা।

ওরা চলে গেল, আর আমি সারাদিন বসে বসে ওদের সারল্যের কথা ভাবতে লাগলাম।

এই যে:

হাডসনের বাংলোতে গিয়ে দেখলাম, কারো নজীর তীর বেঁধে যে খালি জায়গাটা পড়েছিল তাতে সারি সারি ক্যাম্প পড়েছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন হাডসন।

সরকার সারান্দা বনে আদিবাসীদের গাছ কাটা নিষেধ করে নাগরা দিয়েছিল। তাতে আদিবাসীরা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে।

বললাম, ওদের আস্তানার গাছ ওরা কাটবে, তাতে বাধা দিতে গেলেই বিপত্তি আসবে, এতো স্বাভাবিক।

কথাটা তা নয় জনসন। প্রথমে ওদের কাছে নামমাত্র খাজনা চাওয়া হয়েছিল। কথাটা ওরা আমলই দেয়নি। তখন বনের কাঠ কাটা নিষেধ করে নাগরা দেওয়া হয়েছে।

বললাম, আর্মড পুলিস ফোর্স এলো কোত্থেকে? হাডসন বললেন, আমাদের অনুগত যে কয়টি আদিবাসী নাগরা দেবার কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের একটি ছাড়া আর কেউ ফেরেনি।

খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, একটা নাগরাওয়ালাকে অতর্কিতে তীরে গেঁথে গাছের সঙ্গে প্রায় ফুঁড়ে বিদ্ধ করে রেখে গেছে। পরিস্থিতি বিশেষ খারাপ হবার আগেই হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠিয়ে ফোর্স আনা হয়েছে।

বললাম, ব্যাপারটা ঘোরাল না করে সহজ সমাধানের একটা পথ বের করলে হত না?

হাডসন মনে হল উত্তেজিত হয়েছেন। বললেন, রাস্তাঘাট বানাতে সরকারের কি পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে তা তুমি জান, জনসন। যদি তার থেকে কিছুমত রিটার্ণ না পাওয়া যায় তাহলে সরকার সে লোকসান কতদিন বইতে পারবে। বৃটিশ সরকারের অনুগত কর্মচারী হিসেবে আমাদের এ কথাগুলো ভেবে দেখা দরকার নয় কি?

হাডসনের কথার কোন জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে রইলাম। ওঁর মুখ থেকেই শুনতে পেলাম, বরাইবুরুতেও এমনি ক্যাম্প পড়েছে। বললাম, ওরা আমাদের এ

ধরণের প্রস্তুতিকে কি চোখে দেখেছে, তার খবর কিছু পেয়েছেন ?

হাডসন বললেন, টাকা পয়সা আর হাড়িয়া খাইয়ে কতকগুলো ইনফরমার জোগাড় করেছি। তাদের কাছ থেকে যে খবর পেলাম তাতে ও পক্ষের প্রস্তুতি বেশ জোরালই চলেছে বলে মনে হল।

একটু থেমে হাডসন বললেন, ওদিকে ছাতমবুরুর পাহাড়ে লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। সরকার খুব শীঘ্র পাহাড় ভেঙে লোহা তোলার ব্যবস্থা করবে। সেজন্যে ওয়াণ্ডে একটা কলোনী গড়ে তোলারও পরিকল্পনা হয়েছে। তখন এ অঞ্চলটা অনেক বেশী সুরক্ষিত হয়ে যাবে।

বললাম, এই আদিবাসী হো সম্প্রদায় বনের এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে. এদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

হাডসন বললেন, যতটা ভাবছ, পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের পক্ষে সে পরিমাণে অনুকূল নয়।

একটু থেমে বললেন, ইনফরমারের কথা যদি মিথ্যে না হয় তাহলে শুনছি আদিবাসী এক রাজ পরিবারের মেয়ে নাকি সমস্ত হোদের সঙ্ঘবদ্ধ করছে।

কথাটা শুনে কেমন যেন চমক লাগল। এদের ভেতর কোন প্রতাপশালী রাজার অস্তিত্ব থাকতে পারে এ আমার কল্পনার একেবারে বাইরে। তার ওপর আদি-বাসী রাজ পরিবারের মেয়ে হোদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর আমি বিরাট এক রহস্যের গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ফেরার সময় হাডসনকে তাঁর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, নতুন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

কি রকম ?

হাডসন বললেন, আগে আমার কাছে ডরোথিকে দেখলে দু'জনের দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করতেন ; আজকাল ডরোথিকে আমার কাছে আসতে দেখলেই দৌড়ে ঘরে ঢুকে কপাট দিয়ে দেন। অনেক সাধ্যসাধনায় তবে খোলেন।

খুলেই কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। চোখেমুখে তখন তাঁর কেমন যেন ভয়ের ছায়া এসে পড়ে।

বললাম, পিটার আসেননি ইতিমধ্যে ?

এসেছিলেন, কিন্তু রেবেকা তাঁর সঙ্গে দেখাই করলেন না। ডরোথি যেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেল অমনি ওঘর থেকে চেঁচাতে লাগলেন রেবেকা।

হাসপাতালে ফিরতে গিয়ে সারাপথ নানা চিন্তায় ডুবে রইলাম। এই শান্ত নিরুপদ্রব 'হো'রা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কেন ? কেনই বা একজনের জন্মগত অধিকার থেকে অন্যজন তাকে বঞ্চিত করতে চায়। কি লাভ এই বিদ্বেষের আগুন জেলে।

মনে এল সেই 'হো' রাজকুমারীর কথা। এই অরণ্যের ভেতর এমন আগুনই বা ছিল কোথায় ! তার শিখায় একদিন হয়ত সমস্ত বনভূমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

১৩ই মে :

বুরু পাহাড়ে আগুন লেগেছে। হাসপাতালের সামনের বারান্দায় বসে দেখছি। মনে হল আগুনের ফুল দিয়ে একটি মালা গাঁথা হচ্ছে। ক্রমে মালাটি বেড়ে চলল। তারপর এক সময় মনে হল পাহাড়ের গলায় সে মালা সম্পূর্ণ হয়ে দুলছে।

কি প্রচণ্ড গরম এ দেশে। ঘরের বাইরে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কোন কোন পাহাড়ে লোহার পরিমাণ খুব বেশী, গরমও তাই প্রচণ্ড। পাথরের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ল, অমনি আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুনের ছোঁয়া লাগল গাছের শুকনো পাতায় রাশে। দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুন। তারপর সামনে যা কিছু পড়ল, অগ্নিনাগ সব গ্রাস করে চলল।

গরমের দিনে বনে বনে এমনি আগুন লাগে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের কাজ বেড়ে যায় তখন। দামী গাছগুলোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে। যেদিকে আগুন আসবে সেদিকের শুকনো পাতার রাশ বন বিভাগের লোকজন

লাইন ধরে পরিষ্কার করে ফেলে। সাধারণতঃ নদী বা জলার দিকে ঐসব শুকনো পাতা লাইন করে জড়ো করা হয়। আগুন ঐ লাইন ধরে যেতে যেতে এক সময় নদী বা জলায় এসে নিভে যায়।

এবার যেমন গরম পড়েছে অস্বাভাবিক, তেমনি আগুনও জ্বলছে চারদিকে। রাতে যেদিকে তাকাই সেদিকে আলোর মালা। বন পুড়ছে, আদিবাসীদের ঘর পুড়ছে, পশুপাখি পুড়ে মরছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে বনে বনে বিরাট অংশ জুড়ে কালো চিহ্ন দেখা যায়। আগুনের ধ্বংসলীলা এগুলি।

সেদিন বসে আছি, দশ বারোটি আদিবাসী কোলায় বয়ে নিয়ে এল কয়েকটি ছেলেমেয়ে। আগুনে পুড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করলাম। সবাইকে বাঁচান গেল না। দুটি মারা গেল। তাদের মুখ চোখ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এমন অবস্থায় বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। কিন্তু ডাক্তারের ভাবনা তা নয়' যেমন করে বাঁচুক, চেষ্টা করতে হবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার।

একটি দল ভাল হয়ে গেল দেখে, দলে দলে আগুনের পোড়া রোগী দূর দূর জঙ্গল থেকে আসতে লাগল। আমার ছোট হাসপাতালে আর জায়গা দিতে পারা গেল না। এখন ঘোড়ায় চড়ে ওষুধের বাক্সপত্র নিয়ে যেতে হচ্ছে বিভিন্ন জঙ্গল এলাকায়। গ্রামের লোকদের সঙ্গে এমনিভাবে সেবার ভেতর দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে আমার পরিচিতি।

পথের দু'পাশে ওদের লম্বা ধরণের ঘর। মাটির বা পাথরের দেয়াল। খাপরার ছাউনি। ঘরের মুখগুলো কিন্তু পথের দিকে নয়।

হামা দিয়ে আমাকে অনেক সময় ঘরের ভেতর ঢুকতে হয়। এদের ঘরের মাঝে এক ধরণের উঁচু বেদী আছে। সেই বেদীকে ওরা বলে আদিং। আদিংকে ওরা বিশেষ পবিত্রভাবে রাখে। 'হো'দের পূর্বপুরুষদের আত্মা নাকি তার ভেতর থাকে।

হাসপাতালে ফিরতে ফিরতে ভাবি, কত বিচিত্র সংস্কার মানুষের।

কয়েকদিন আগে হাসপাতালে ফিরে দেখি হাডসন আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, পাশে ডরোথি।

কি ব্যাপার? হাডসনকে জিজ্ঞেস করলাম।

ডরোথিকে দেখিয়ে হাডসন বললেন, বিরাট বাধিয়েছে।

টন্‌সিলটা এত বড় হয়েছে, অপারেশন না করলেই নয়। রাঁচিতে থাকার সময়ে অপারেশনের কথা উঠেছিল কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। এখন তোমার হেফাজতেই অপারেশনের কাজটা হয়ে যাক।

ভর্তি করে নিলাম ডরোথিকে। জরুরী কাজ ছিল হাডসনের, থাকতে পারলেন না।

যাবার সময় বলে গেলেন, কয়েকটা দিন ডরোথি থাকবে তোমার এখানে। আমি সময়মত একদিন এসে ওকে নিয়ে যাব।

বললাম, খুব আনন্দের কথা। পরের দিন ডরোথির অপারেশন। সব প্রস্তুত। এনাস্থেসিয়া দেওয়া হল।

একি শুনতে পাচ্ছি! এনাস্থেসিয়ার প্রভাবে ডরোথির অবচেতন মনের কয়েক টুকরো কথা বেরিয়ে এল। কথাগুলি অসংলগ্ন, তবু তার মূল্য কম নয়।

'পিটারকে আমি ভালবাসি। তুমি বিবাহিতা।'··· 'কাছে এসোনা আমাদের, এসোনা বলছি'।—'চিঠি পাবেনা, কিছুতেই পাবেনা।'···'সরে যাও রেবেকা, নইলে হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।'

অপারেশন শেষ করলাম। ডরোথি ঝিমিয়ে পড়ে রইল। জ্ঞান আসতে দেরী আছে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে চিন্তা করতে লাগলাম।

ডরোথি পিটারকে ভালবাসে। রেবেকাও নিশ্চয়ই হাডসনের বিবাহিতা স্ত্রী। প্রকাশ্যে একজন পাদ্রীর ওপর সে ভালবাসা দেখাতে পারছেনা। চিঠি এল কোথেকে!

হঠাৎ রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। রেবেকার কোন কিছু খোঁজার অর্থ পরিষ্কার হয়ে এল। নিশ্চয়ই ডরোথি পিটারকে লেখা রেবেকার চিঠিগুলো কোনরকমে সংগ্রহ

করে লুকিয়েছে। এটা রেবেকাকে ডরোথির ভয় দেখানর কৌশল। রেবেকাকে ভয় দেখিয়ে পিটারের কাছ থেকে দূরে রাখাই তার উদ্দেশ্য। 'হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।' ডরোথি এই এক টুকরো কথায় সবকিছু স্পষ্ট করে ধরে দিয়েছে। রেবেকার উন্মাদনা তাহলে এই কারণে। প্রথম দিকে সে হাডসন আর ডরোথিকে চোখে চোখে রেখেছিল, তার কারণ ডরোথি হাডসনকে তার চিঠির কথা বলে কিনা দেখার জন্যে। পরে তার পাগলামো যখন বাড়ল তখন তার মনে হল, হাডসন নিশ্চয়ই তার গোপন প্রণয়পত্রের কথা জানতে পেরেছে। ইথানিং তাই সে ভয়ে ভয়ে থাকতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু রেবেকার চিঠিগুলো ডরোথি কোথায় লুকিয়েছে। নিশ্চয়ই ডরোথি কাছছাড়া করেনি সেগুলো।

অমনি উঠে গেলাম ভেতরে। ডরোথির হাত ব্যাগ থেকে চাবি বের করে তার সুটকেসটা খুললাম। সুটকেসের ভেতরে ওর দৈনন্দিন ব্যবহারের পোষাক রয়েছে। নাড়াচাড়া করতে করতে তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একরাশ চিঠি।

এ চিঠি নিশ্চয়ই রেবেকার। কারণ রেবেকার হাতের লেখা আমার কাছে অপরিচিত নয়। মাঝে মাঝে বাংলো থেকে আমার নিমন্ত্রণ আসত। সেই নিমন্ত্রণের চিঠি রেবেকাই লিখে পাঠাতেন। তাঁর চিঠির ভাষাও ছিল বিশেষ উপভোগ্য।

চিঠিগুলো কাছে রেখে দিলাম। ডরোথি সুস্থ হয়ে উঠলেন একদিনেই।

হাডসনের কাছে চিঠি লিখলাম, তিনি যেন রেবেকাকে অবশ্যই পাঠিয়ে দেন হাসপাতালে। আমি তাঁর চিকিৎসা করব।

হাডসন চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই রেবেকাকে নিয়ে এলেন।

বললাম, দু'বোনকে আমি কয়েকদিন এক সঙ্গেই রাখতে চাই।

হাডসন বললেন, স্বচ্ছন্দে। উনি চলে গেলে রেবেকাকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম শালবনে বেড়াতে। আমার কাছে রেবেকা চুপচাপ থাকেন, এটা লক্ষ্য করেছি। আমি আগে আগে চলেছি, রেবেকা আসছেন পেছনে। এবার একটু পিছিয়ে ওঁর পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বললাম, আপনার ব্যবহার আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে।

রেবেকা আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, আপনার কোনরকম উপকার করতে পারলে আমি খুব খুশি হই।

রেবেকার মুখে কেমন যেন ভাবান্তর হল।

বললেন, আপনি আমার উপকার করতে পারেন, সত্যি বলুন?

নিশ্চয়ই পারি।

আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেবেকা আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন, না, আপনি পারেন না।

সামনের একটা পাথর দেখিয়ে বললাম, আসুন এর ওপর বসা যাক্। রেবেকা আর আমি বসলাম পাথরটার ওপর।

পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে রেবেকার হাতে দিয়ে বললাম, দেখুন তো হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা।

মানুষের মুখের এমন পরিবর্তন আমি আগে কখনো লক্ষ্য করিনি।

মুহূর্তে রেবেকা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, এ চিঠি আমার, এ চিঠি আমার।

পরক্ষণেই আমার দিকে তাকিয়ে কাগজের মত রক্তশূন্য হয়ে গেলেন. এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন জনসন। ডরোথি আমার সব চিঠিই তো চার্চে গিয়ে পিটারের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে।

বললাম, আমি যদি আপনাকে আপনার সবগুলো চিঠিই ফিরিয়ে দিই।

আমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসলেন রেবেকা।

চিরদিন কৃতজ্ঞ হয়ে রইব মিঃ জনসন।

বললাম, প্রতিদানে আমি যদি কিছু চাই, দেবেন ?

আমি নিশ্চয়ই দিতে চেষ্টা করব জনসন। বললাম, কথা দিন, হাডসনকে ছেড়ে কোনদিন আর পিটারের কাছে যাবেন না!

কতক্ষণ আপনমনে কি ভাবলেন রেবেকা। দু'চোখ বেয়ে জল নামল। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আমি আর বাধা দিলাম না। কাঁদতে কাঁদতে মনটা হাল্কা হয়ে গেলে, মানসিক যন্ত্রণার গুরুভারটা নেমে যাবে।

এক সময় শান্ত হলেন রেবেকা। বললেন, আমি জানতে চাইনা কি করে ডরোথির কাছ থেকে আপনি আমার চিঠিগুলো উদ্ধার করলেন। তবে আমি আর পিটারের কাছে যাব না কথা দিচ্ছি।

ওঁর হাতে চিঠির গোছা তুলে দিতে যেতেই উনি কি যেন ভাবলেন।

আপনি ওগুলো রেখে দিন মিঃ জনসন। মানুষের মন, কখন কি হয় বলা যায় না। চিঠিগুলো আপনার কাছে থাকলে তবু মনে একটা ভয় থাকবে।

বললাম, আপনার ভয় থাকবে কিনা জানিনা, তবে নির্ভয় হয়েছি, এ কথা বলতে পারি।

চিঠিগুলো পাথরের ওপর জড়ো করলাম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

দাউ দাউ করে রেবেকার জীবনের অনেকগুলো স্মৃতি জলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল।

২রা অক্টোবর :

কয়েক মাস বর্ষার ভেতর কাটল। এবার পথের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সরকারী বনবিভাগের পুলিশের যাতায়াতের জন্যে হাডসন বিশেষ পরিশ্রম করে পথঘাট ভালভাবে মেরামত করে রেখেছিলেন। বর্ষায় কর আদায় কিংবা জঙ্গলের বাসিন্দাদের ওপর জোর জুলুমের কোন চেষ্টাই করা হল না।

এই বর্ষায় আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। কাজের ভেতরে থেকেও যা আমি একেবারেই ভুলতে পারছি না।

কয়েকদিন একটানা বৃষ্টির ভেতর হাসপাতালে বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ সকাল থেকে মেঘ কেটে গেল।

বর্ষাধোয়া আকাশে সোনা রঙের রুদ্ধুরটুকু বড় উপভোগ্য হয়ে উঠল। আমি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথের ধারে গাছপালার মখমলের মত সবুজ পাতার ওপর রোদের সোনা গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাই দেখতে দেখতে চললাম। পাহাড়ী ঝোরার ধারে ঐ যে বসে আছে বনেশ পাখি। বড় বড় বাঁকানো শান দেওয়া ঠোঁট। হরিয়াল উড়ে গেল। আকাশের গায়ে যেন মিশে গেল আকাশী রঙ। পথে পথে বন-যুঁই। সবুজ পাতার ওপর একরাশ সাদা তারা-ফুল ফুটিয়ে রেখেছে। কি মিষ্টি গন্ধ।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি আর প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য দেখছি। দেখতে দেখতে কতদূর চলে এসেছি, বুঝতে পারিনি।

সামনে আর এক রূপের জগত আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

একটি শালগাছের তলায়, যেখানে পাথরের গর্ত্তের ভেতর বর্ষার জল জমেছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে শিশুকে নিয়ে মা-হরিণী।

জল খেতে এসেছে বোধহয়। ঘোড়ার পায়ের সাড়া পেয়ে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বর্ষাধোয়া রোদ তাদের সুচিক্কণ দেহের ওপর থেকে যেন পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

ওরা তাকিয়ে আছে, আমিও ওদের থেকে চোখ ফেরাতে পারছিনা। মা-হরিণী বাচ্চাটাকে স্নেহন করতে লাগল। এত স্নেহ জননীর। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। কত শৈশবে মাকে হারিয়েছি।

বর্ষাধোয়া প্রকৃতির মত মনটা কেমন ভিজে আর নরম হয়ে গেল।

বেলা বাড়ল। আমি এপথে ওপথে চলতে লাগলাম। যখন খেয়াল হল তখন দেখি আমি চেনা পথ হারিয়েছি। একটি পথ ধরে কিছু সময় ঘোড়া ছুটিয়ে যাই, আবার অন্য

পথ ধরি। এমনি ভাবে চলতে চলতে এক সময় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এদিকে আকাশ ঘিরে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

সামনে একটি উঁচু টিলা দেখে ঘোড়া ছেড়ে তার উপরে উঠলাম যদি এর ওপর থেকে কোনরকম চেনা জায়গার সন্ধান পাওয়া যায়। টিলার ওপর উঠে সামনে যতদূর দেখা যায়, অসংখ্য পাহাড়ের রাজ্য।

নীল সবুজে মেশা পর্বতস্তর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কি অপরূপ সৌন্দর্য ঈশ্বর এই দুটি চোখের জন্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

বামে চোখ পড়তেই দেখলাম, খুব কাছেই একটি উপত্যকা। সহসা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। গাছপালার ফাঁকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা ভাঙা দুর্গের মত কি যেন আমার চোখে পড়ল।

এখানে আদিবাসী এলাকায় দুর্গ এল কোত্থেকে। ভাল করে দেখলাম, মন্দির রয়েছে একদিকে। একটি জলধারা বয়ে চলেছে দুর্গ বেষ্টন করে।

কতক্ষণ এমনি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ একটা নাগরার আওয়াজ শুনে টিলার ওপর থেকে নেমে এলাম। কোথা থেকে নাগরার শব্দটা আসছে তা বোঝা গেল না। কারণ মুহূর্তে সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে পাহাড়ে। দূরে কাছে যত পাহাড় আছে, মনে হল তাদের প্রতিটির থেকেই এ শব্দ-তরঙ্গ উঠে আসছে।

টিলার থেকে নেমেই ঘোড়ায় চড়ে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে ফিরে চললাম। পাহাড়ী বাঁক ঘুরতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার বিস্ময় চরমে উঠল।

ঘোড়ার ওপর চড়ে একটি মেয়ে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণ 'হো' সম্প্রদায়ের মেয়েদের চেহারার যে রূপ দেখেছি, তার থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল গায়ের রঙের কিছুটা মিল রয়েছে, তবু আদিবাসী 'হো' দের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। দেহের গড়ন সুঠাম। মনে হল যেন পাথর কুঁদে দক্ষ কোন শিল্পী এ মূর্তিটি গড়েছেন।

আমি তার উপস্থিতি ভুলে, সেই বিশেষ ধরণের পরিবেশের কথা ভুলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি প্রথমে কথা বলল, এ অঞ্চলে আসার কারণটা জানতে পারি কি?

পথ হারিয়ে হঠাৎ এসে পড়েছি। আস্তানা? বরাইবুরু না কুমুডির বাংলোতে।

বললাম, এদের কোনটাতেই নয়।

তবে? কথার ভেতর সামান্য একটু ঝাঁঝ ছিল।

বললাম, খলকোবাদের হাসপাতালে আপাততঃ আমার ডেরা।

মেয়েটি সহসা ঘোড়ার থেকে নেমে মাথা নীচু করে আমাকে অভিবাদন জানাল।

আপনিই ডাক্তার জনসন! কথা শুনে আমি হতবাক। এতদূরে এই রহস্যময়ী মেয়েটি আমার নাম জানল কি করে।

আমাকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি বলল, এর আগে আপনাকে আমি না দেখলেও, আপনার নাম আমার কাছে অপরিচিত নয়।

আকাশে মেঘের ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি, বর্ষার প্রায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।

মেয়েটি কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, অনেক দূরে এসে পড়েছেন জনসন, তাছাড়া এই ছোট নাগরা এলাকাটাও ইংরাজদের পক্ষে খুব সুখকর নয়।

আসুন, আপনার পথে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

মেয়েটি আগে আগে চলল, আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ভাঙা চোরা, উঁচুনীচু কত অজানা অচেনা পথ ধরে মেয়েটি অবলীলায় এগিয়ে চলল, আর আমি তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতে লাগলাম।

এক জায়গায় এসে দেখলাম, দুটি পাহাড়ের মাঝে গিরিসঙ্কট। সেই ফাঁকে একটি খরস্রোতা জলধারা বয়ে চলে গেছে উপত্যকার একেবারে ভেতরে। কাছাকাছি এসেই মেয়েটি বলল, সাবধানে আমাকে লক্ষ্য রেখে আসুন।

ওকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সেই দুর্গম স্থানটি পার হলাম।

মনে হল, এই অঞ্চল মেয়েটির একেবারে নখদর্পণে।

এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার পথ প্রদর্শিকা বলল, এখন যতদূর সম্ভব দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে আমাকে অনুসরণ করুন। আকাশের অবস্থা ভাল নয়।

বৃষ্টি হলেই কোয়েল নদীতে বান আসবে। তখন পার হওয়া দুঃসাধ্য হবে। পথ সংক্ষেপ করার জন্যে ওপরের পথ ছেড়ে নিচের পথেই আমাদের চলতে হচ্ছে।

বেশ কিছু সময় চলার পর আমরা কোয়েলের কূলে এসে পৌঁছলাম। ঘোড়া পার হতে গিয়ে পিঠ অবধি জলে ডুবল। আমরা ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে পার হলাম, তাই পোষাক কোনরকমে রক্ষা পেল।

কোয়েল পেরিয়ে আসতেই চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এল। আরও কিছু পথ একসঙ্গে আসার পর মেয়েটি বলল, আশাকরি এখন আপনি আপনার চেনা পথ পেয়ে গেছেন।

এতক্ষণ ওকেই অনুসরণ করে এসেছি, তাই পথ চেনার দরকার হয়নি, এখন চোখ মেলে ভাল করে চারদিকে তাকালাম।

সামনেই কুমড়ির পথ চলে গেছে। দু'জনে পথের ওপর উঠে এলাম।

মেয়েটি ঘোড়ার থেকে নেমে দাঁড়াল, আমিও নামলাম।

আপনি আমাদের জঙ্গলের লোকদের ভালবাসেন সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

বললাম, ডাক্তারের কাছে যেমন রোগের বিচার নেই, চিকিৎসাই একমাত্র ধর্ম, ঠিক তেমনি মানুষেরও বিচার নেই! সেবা করার জন্যেই আমাদের জন্ম।

ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। রহস্যময়ী মেয়েটি আমাকে শেষ বারের মত অভিবাদন জানিয়ে বলল, আশা করি আজকের এই সাক্ষাতের কথা লোকের মুখে রটবেনা।

ডাক্তার জনসন অকৃতজ্ঞ নয়।

বৃষ্টি জোরে জোরে পড়তে লাগল। বাতাস বইল। মেয়েটি ঘোড়ায় উঠে বলল, আপনি যান ডাক্তার জনসন। বান আসার আগেই আমাকে অন্ততঃ কোয়েল নদী পার হয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

দ্রুত ঘোড়া ছুটল। চোখের পলকে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ফিরে চললাম কুমড়ির বাংলো লক্ষ্য করে। কিন্তু অল্প দূর যেতে না যেতেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বাতাসের বেগও দ্রুত হল। একান্ত চেনা পথে আমার কোন অসুবিধে হল না। কুমড়ির বাংলোতে বেলা শেষের আগেই পৌঁছে গেলাম। কিন্তু আমার চিন্তায় কেবল একটি কথা আসা যাওয়া করতে লাগল, বান আসার আগেই সেই রহস্যময়ী নদী পার হয়ে যেতে পেরেছে কি।

১৯শে ডিসেম্বর :

প্রথমে সাসাংদার গির্জা আক্রান্ত হল। আগুন লাগিয়ে কাঠ আর খড়ের তৈরী গির্জা, সংলগ্ন বাসগৃহগুলি পুড়িয়ে দিল বিদ্রোহীরা।

তার আগে বিবাদের সূত্রপাত হল ছাতমবুরুতে। 'হো'দের ঈশ্বর সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার আস্তানা ছিল ঐ পাহাড়ে। সেখানে সরকারী কর্মচারীরা পাহাড়ের চারদিকে সুতরাং সরকারী নিয়ন্ত্রণের ভেতর আনা হল ছাতমবুরুকে।

'হো'দের অসন্তোষ আগেই ধূমায়িত হয়েছিল। সরকারকে কর দেবার ব্যাপারে, বনের কাঠ কাটার ওপর নিষেধ জারির ব্যাপারে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল; তার ওপর ধর্মস্থান যখন বন্ধ হল তখন ধূমায়িত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

এর ফলে সাসাংদার গির্জায় প্রথম শুরু হল বিদ্রোহীদের হানা। পিটার আর তাঁর দলবলের ওপর কোন রকম আক্রমণ করা হয়নি। তাঁরা কুমড়ির ডাক বাংলোতেই আশ্রয় নিলেন।

সরকারী পুলিশ ফোর্স গেল সাসাংদায়। খবর যানেলেই বিদ্রোহীরা সুযোগ পাবে বেড়ে ওঠার। তাই নতুন করে গির্জা তৈরীর কাজ শুরু হল। কয়েকদিনের

ভেতর নতুন হাউনি উঠল। আবার পিটার চললেন তাঁর বলবল নিয়ে। এবার গীর্জা সংলগ্ন জমিতে পুলিশ ব্যারাকও তৈরী হল। গীর্জা আক্রান্ত হলে সরকারী বাহিনী তা রক্ষা করবে। এদিকে আদিবাসীদের ভেতর যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা দলে দলে চলে এল মাসাংগার কাছাকাছি। সরকারের আশ্রয়ে না থাকলে তাদের হয়ত নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। সরকারী পুলিশ মাসাংগার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও টহল দিতে শুরু করল।

কয়েকদিন চুপচাপ কেটে গেল। সরকারী বাহিনী পর্যবেক্ষণ করতে লাগল আক্রমণের প্রকৃতি। ওদিক থেকেও কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না।

কেবল ইনফরমারদের মুখে শোনা যেতে লাগল নানান কাহিনী। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত 'হো', 'সোহোর', 'মুণ্ডারী', 'সাঁওতাল' সম্প্রদায়কে একত্রিত করা হচ্ছে। ঐ একটি মেয়েই এ কাজে অগ্রণী হয়েছে।

মনে মনে মেয়েটিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না। আমি নিশ্চয়ই দেখেছি তাকে। আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, ইচ্ছা করলে সেই রহস্যময়ী তরুণীর দ্বারা সব কিছু করাই সম্ভব।

মেয়েটির নাম নাকি শনিচারিয়া। নামটা বার বার উচ্চারণ করলাম। তার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল আমার চোখের ওপর। কিন্তু আমি কারু কাছে তার কথা বলতে পারলাম না।

আবার খবর পেলাম মাসাংগার গীর্জা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সংলগ্ন গ্রামের একটি কুটিরও অক্ষত নেই। মাঝরাতে যখন সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, শুধু দু'একজন পাহারারার গীর্জা সংলগ্ন ব্যারাকে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তখনি আক্রমণ শুরু হয়।

সকলে জেগে উঠে দেখে গীর্জা জ্বলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে সমস্ত গ্রামখানা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বিদ্রোহীদের ভেতর একটি মানুষেরও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ভোরে উঠে রহস্যের সমাধান হল। তীরের মুখে আগুন জেলে বহু দূর থেকে বিদ্রোহীরা গীর্জা আর গ্রাম লক্ষ্য করে ছুঁড়েছে। তার ফলে এই অগ্নিকাণ্ড।

সরকার এবার এক একটি গ্রাম লক্ষ্য করে খেরাও করল। কর আদায়ের জন্যে মারধোর শুরু হল। কিন্তু খবর পেলাম, একটিও মানুষের কাছ থেকে নাকি কর আদায় করা সম্ভব হয়নি। গ্রামের মাতব্বরদের ধরে নিয়ে আসা হল বরাইবুরুর ক্যাম্পে। সেখানে তাদের ওপর চলল অত্যাচার। কিন্তু কারু মুখ থেকে তাদের প্রধান ঘাঁটির খবর বের করা গেল না।

বরাইবুরুতে গড়ে উঠেছিল সামরিক কয়েদখানা। ধরে ধরে আদিবাসীদের ধরে নিয়ে এসে সেখানে কয়েদ করে রাখা হত। কথা আদায়ের জন্যে চলত নানা রকমের অত্যাচার।

একদিন বরাইবুরুর কোয়ার্টার থেকে আমার ডাক এল। গিয়ে দেখি, কয়েকটি আদিবাসী কয়েদখানার মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাদের নাকে মুখে রক্ত চাপ বেঁধে জমে আছে।

কথা বলে জানলাম, তাদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে অতিরিক্ত প্রহারের ফল।

এদের সুস্থ করে তোলার ভার পড়ল আমার ওপর। কারণ এরা নাকি অনেক কিছুই জানে। বিদ্রোহী আদিবাসী দলের অন্যতম তিনজন প্রধান এরা।

সাধ্যমত চিকিৎসা করলাম। আর্তের চিকিৎসা করা আমার কর্তব্য বলে আমি করলাম। কিন্তু যে অবস্থার ভেতর ওরা পড়েছে তাতে মৃত্যুর আগে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে হল না।

শুনলাম, এরা একটু সুস্থ হলেই আবার শুরু হবে জেরা। দিনরাত্রি পুলিশের লোকে এদের সঙ্গে কথা কইবে। বিশ্রামের কোন সুযোগই দেওয়া হবে না এদের। তারপর নখের ভেতর সূঁচ ঢুকিয়ে কথা আদায়ের চেষ্টা চলবে।

ফিরে এলাম হাসপাতালে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের ওপর এ ধরণের নির্দয় অত্যাচারের ভেতর যে পশু মনোবৃত্তি আছে, আমার আত্মাকে বার বার তা পীড়া

দিতে লাগল। একবার ভাবলাম, চাকরী ছেড়ে চলে যাব এখান থেকে। আবার মনে হল, এখানে থাকলে তবু আহতের সেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। সাধ্যমত তাদের সারিয়ে তোলার চেষ্টা করব। আমার জাতি, আমার দেশ আজ ভিন্ন দেশের মানুষের ওপর যে অন্যায় আচরণ করছে, তার সামান্য কিছু যদি আমার সেবার ভেতর দিয়ে লাঘব করতে পারি। সেদিন আর একটি অমানুষিক ঘটনা ঘটতে দেখলাম।

বরাইবুরু থেকে ডাক আসতে গিয়ে দেখি একটি মেয়ে কয়েদখানায় পড়ে আছে। দেহ তার ক্ষত-বিক্ষত। পরীক্ষা করে দেখলাম, অত্যাচারের শেষ সীমায় সে এসে পৌঁচেছে। মানুষের পশুবৃত্তি কতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তার পরিচয় পেলাম সেদিন।

চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাঁচান গেল না।

মেয়েটি নাকি কয়েকদিন আগে উপঢৌকন হয়ে এসেছিল ইনস্পেক্টর সাহেবের কাছ করবে বলে। তারই নির্দেশ-মত এখানকার পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের একটা গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধানে যায়। মেয়েটিকে কিন্তু আটকে রাখা হয় বরাইবুরুর ব্যারাকে।

পুলিশ বাহিনী মেয়েটির নির্দেশিত পথে এসে পৌঁছল একটি পাহাড়ী নদীর কাছে। নদীতে জল ছিল হাঁটু পরিমাণ। সেখান থেকে গুপ্ত ঘাঁটির দূরত্বও ছিল অনেকখানি। তারা যখন সবাই মিলে নদী পার হচ্ছিল, তখন হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়তে লাগল তাদের ওপর। দু'চারটি ছাড়া বিরাট পুলিশ বাহিনীর প্রায় সবকটিই নিঃশেষ হয়ে গেল।

এরপর মেয়েটির ওপর শুরু হল অত্যাচার। প্রতি পক্ষের গুপ্তচরের ওপর যে ধরণের আচরণ এদের বিধানে আছে, তাই করতে লাগল এরা।

শুনলাম, পুলিশ বাহিনীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার খবর শুনে মেয়েটি সেই যে হাসি শুরু করেছিল, অজ্ঞান হয়ে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে হাসি আর থামেনি।

সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে বলেছিল, তার স্বামীকে মেরে ফেলার প্রতিশোধ সে নিয়েছে।

মৃতের কাছ থেকে চলে আসার সময় টুপি খুলে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে মনে মনে বললাম, এ দেশের মানুষের ওপর আমার শ্রদ্ধা তুমি বাড়িয়ে দিলে।

আমার অন্তরের অভিনন্দন রইল তোমার উদ্দেশে। সর্বময় প্রভু তোমার মঙ্গল করুন।

শুনলাম, উড়িষ্যা থেকে আদিবাসীরা দলে দলে আসছে সারান্ডায়। হাতে তাদের তীরধনু আর টাঙ্গি। তাদের গতি রোধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল সরকার থেকে, কিন্তু সম্ভব হয়নি। গভীর পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা দলে দলে পথ করে চলেছে। সে দুর্গম পথের সন্ধান রাখা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই দলটিকে গভীর অরণ্যের ভেতর দিয়ে যিনি পরিচালনা করে আনছেন, তিনি নাকি অষ্টারোহিণী। এক আদিবাসী কন্যা।

সেই মেয়েটিকে ধরার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হয়ে গেছে।

দিনের আলোয় পাহাড়ের গুপ্তস্থানে আত্মগোপন করে রাতের অন্ধকারে তারা পথ চলে এসে পৌঁচেছে সারান্ডায়।

৭ই এপ্রিল : ১৯০০

এবার হাডসন বরাইবুরুর ডেভ কোয়ার্টারে একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাটি ছিল এইরূপ গ্রীষ্মকালে বনে বনে যখন আগুন লাগবে, আর সে আগুন ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, তখন তাকে নেভাবার কোন চেষ্টাই করা হবে না। বরং নদীর বিপরীত মুখে দুর্গম আদিবাসী এলাকায় যাতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডেভ কোয়ার্টার মেনে নিল হাডসনের এই পরিকল্পনা। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরের মত এ বছরও আগুনের ভয়াবহ খেলা শুরু হয়ে গেল।

সরকারী চেষ্টায় যে আগুনের গতি নদীর পথে চালনা করা হত, তা আর হতে পারলনা। ফলে, আগুনের তাণ্ডব চলল সারা গ্রীষ্মকাল ধরে।

আমার হাসপাতালে কিছু কিছু আগুনে পোড়া রোগী আসতে লাগল। আমি তাদের সেবায় রাতদিন নিযুক্ত রইলাম। কিন্তু বেশীদিন তা করা চলল না। সরকার থেকে আমার কাছে কড়া নির্দেশ এল, আমি যেন আদিবাসী রোগীদের সরকারী হাসপাতালে ভর্তি না করি।

এর উত্তরে আমি জানালাম, আমি ডাক্তার; রোগী এলে তাদের ফেরান আমার সাধারণ সেবাধর্মের নীতির বাইরে। সুতরাং আমাকে এই হাসপাতালের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

আমার সাফ জবাবে কর্তৃপক্ষ কিছুটা নরম হলেন। তাঁরা আর আমাকে বরখাস্ত বা বদলী করতে চাইলেন না।

কিন্তু আর একটি উপায় তাঁরা অবলম্বন করলেন।

বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে নাগরা পিটিয়ে তাঁরা ঘোষণা করতে লাগলেন যে, এরপর যদি কোন আগুনে পোড়া রোগীকে হাসপাতালের পথে বয়ে আনতে দেখা যায় তাহলে তাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

এই ঘোষণায় আমি খুব আহত হলাম। কিন্তু আমার দিক থেকে এর প্রতিবাদে কোন কিছু করার রইল না।

হাসপাতালে রোগীর আসা বন্ধ হয়ে গেল। সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম।

শেষে স্থির করলাম, রাতের বেলাতেই গোপনে আমি পাহাড়ী গ্রামে গ্রামে যাবার চেষ্টা করব।

সেই পর্যন্ত তাই শুরু করলাম। রাতে ঘোড়ার চড়ে পথে যেতে খুব অসুবিধে হত। অন্ধকার রাতে পথ চিনে যেতে পারতাম না। চাঁদের আলোয় বের হতাম। এ অঞ্চল গুলো আমার চেনা জানা হয়ে গিয়েছিল, তাই বিশেষ কষ্ট হত না।

রোগীর সেবা করে যখন হাসপাতালে ফিরতাম, তখন মনটা তৃপ্তিতে ভরা থাকত! পথের বিঘ্ন পত্তর ভয় আমার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারত না।

এবার বিপদ এল অন্যদিক থেকে। ওষুধ ফুরিয়ে এল। কর্তৃপক্ষের কাছে ওষুধ পাঠাবার জন্যে লিখতেই উত্তর এল, সরকারী আগুনে পোড়া কর্মচারীর সংখ্যা নিশ্চয়ই এমন অধিক নয় যে প্রভূত পরিমাণ ওষুধ ডাক্তার জনসনের দরকার হতে পারে।

আমি প্রায় নিরুপায় হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে শুধু হাতে গিয়ে ওদের সমবেদনা জানিয়ে আসি। ওষুধ নেই, তাই আজকাল সবদিন আমার আর গ্রামে যাওয়া হয় না।

এক সন্ধ্যায় হাসপাতালে বসে বসে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। আগুন জ্বলছিল সে পাহাড়ে। আমার মনে এলেও লাগছিল সে আগুনের আঁচ। এমন সময় একটি বলিষ্ঠ মানুষ আমার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। দেখলাম, লোকটি আদিবাসী।

আমাকে অভিবাদন করে সে বলল, ডাক্তার জনসন, যদি অনুগ্রহ করে আগুনে পোড়া রোগীর ওষুধগুলো লিখে দেন তাহলে আমি আপনাকে তা আনিয়ে দিতে পারি।

বিস্মিত হলাম। এখানে কাছেপিঠে এমন কোন মেডিক্যাল স্টোর নেই যেখান থেকে ওষুধ নিয়ে আসা যায়।

বললাম, আমি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ওষুধ এ অঞ্চলে পাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমার হাতের লেখা প্রেসক্রিপসন যেন কর্তৃপক্ষের হাতে কোনরকমে না পড়ে।

লোকটা আমার প্রেসক্রিপসন নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

কয়েকদিন পরেই দেখি সেই লোকটি আবার ফিরে এসেছে। বিরাট একটি ওষুধের প্যাকেট আমার হাসপাতালের বারান্দায় নামিয়ে রেখে সে বলল, ডাক্তার জনসন, আশাকরি এর পর আপনার চিকিৎসায় কোন অসুবিধে হবেনা।

লোকটি আর অপেক্ষা না করে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি একটু অবাক হলাম। প্রথম যেদিন লোকটি আসে সেদিন ভেবেছিলাম দরকারটা ওরই বাড়ীর। হয়ত কোন সম্পন্ন আদিবাসী ও। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। আমি নিজের সম্প্রদায়ের ওপর দরদী এই লোকটিকে মনে মনে অশেষ সাধুবাদ দিলাম।

এরপর আদিবাসীদের সেবা করতে আমার আর কোন অসুবিধেই হল না।

১৭ই ডিসেম্বর :

এবার বর্ষার লড়াই চরমে পৌঁছল। হাডসন এ বছর আরও উৎকৃষ্টভাবে পথঘাট তৈরী করে রেখেছিলেন।

নতুন কয়েকটা পথও শুকনোর দিনে তৈরী করা হয়েছিল। তবে সে সব পথে আশানুরূপ কাজ এগোয়নি। কারণ আদিবাসীরা লড়াইএর জন্যে সরকারী কাজ করতে নারাজ।

এবারও কর্তৃপক্ষ বর্ষাতে চুপচাপ থাকতে মনস্থ করেলন। কিন্তু তার সুযোগ পাওয়া গেলনা।

বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে আদিবাসী তীর ধনু, টাঙি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন পুলিশ ঘাঁটি লক্ষ্য করে। সমানে লড়াই চলল। বাঁধান সরকারী পথ বিদ্রোহীরা জায়গায় জায়গায় কেটে দিলে। বর্ষার জল সেই পথে গড়িয়ে গিয়ে ভয়াবহ খাদের সৃষ্টি করল।

যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

শুনলাম, হাজার হাজার আদিবাসী যোদ্ধা নিয়ে সেই বীরাঙ্গনা ছাতমবুরুর পাহাড় অধিকার করে নিয়েছে।

মনে মনে তাকে অন্তর সাধুবাদ জানালাম। এদিকে ভয় পেয়ে গেলেন হাডসন। রেবেকা আর ডরোথিকে পাঠিয়ে দিলেন আমার হাসপাতালে। বরাইবুরুতে যে লড়াই হল, তাতে উভয় পক্ষেই হতাহত হল অগণিত। আদিবাসীরা তাদের বেশীর ভাগ শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিল ছাতমবুরু উদ্ধারের জন্যে। কারণ সেইটাই ছিল তাদের কেন্দ্রস্থান।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। যে ভাবে বর্ষার সূচনা হয়েছিল তা একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। বর্ষার দিনে আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র রইল না। হাডসন তাদা পথ আবার গড়ে তুললেন। সংবাদ পাঠিয়ে বহু সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশ আনা হল এবার প্রবলভাবে সরকার পক্ষের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। পক্ষকাল যুদ্ধ চলল সমানে। শেষে হটতে লাগল আদিবাসীর দল। ছাতমবুরুর পাহাড় ছেড়ে দিতে হল তাদের। এবার গভীর জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল তারা।

একটি বিষয় বরাবর আমি লক্ষ্য করছিলাম। লড়াইএ যাতে কম লোকক্ষয় হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল নেত্রীর। ছাতমবুরু রক্ষার জন্য আরও বহুদিন যুদ্ধ চালাতে পারত আদিবাসীরা, কিন্তু তা তারা করল না. লড়াইতে এই সূক্ষ্ম বিবেচনা বোধ যাঁর, তাঁর ওপর গভীর শ্রদ্ধা না জেগে পারে না।

বিধাতা সত্যই এবার জঙ্গলের মানুষগুলির বিপক্ষে দাঁড়ালেন। বর্ষাকালে নামমাত্র বৃষ্টি দিয়েই আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল। চারদিকে অনাবৃষ্টি। ফসল ফলল না এককণা। এদিকে দীর্ঘকাল যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আদিবাসীরা। কয়েক মাস পরে তাদের মাঝে নেমে এল ভয়াবহ অনাহার আর মৃত্যুর আতঙ্ক। সারান্দা বন জুড়ে শুরু হয়ে গেল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর ধ্বংসলীলা।

সরকার এবার এক কৌশল অবলম্বন করল। ঘোষণা করা হল, ছাতমবুরুতে সিংবোঙা আর মারংবোঙার মন্দির আদিবাসীদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হবে। তাছাড়া যে সকল আদিবাসী সরকারের কাছে নতি স্বীকার করবে, দুর্ভিক্ষের দিনে তাদের ভরণ পোষণের ভার সরকার গ্রহণ করবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘোষণাও করা হল, যে রাজকুমারী শনিচারিয়ার সন্ধান সরকারকে দিতে পারবে তাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঘোষণার পর কিছুকাল পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর একে একে সরকারী ক্যাম্পে আদিবাসীরা আসতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সারান্দা বনভূমির ক্ষুধার্ত মানুষগুলো জলস্রোতের মত বরাইবুরুর ক্যাম্পে সাহায্যের জন্য ছেয়ে পড়ল।

কর্তৃপক্ষ ক্ষুধার্ত লোকগুলোকে নিয়ে শুরু করল জিজ্ঞাসাবাদ। রোজ নানা ধরণের লোক সাহায্যের আশায় আসা যাওয়া করত। কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে প্রধান ঘাঁটির খবরটা সংগ্রহ করল।

ছোট নাগরার উপত্যকায় সেই ভগ্নদুর্গ, যা একদিন আমি দেখে এসেছিলাম পথ হারিয়ে, সেই দুর্গই হল বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি।

সরকারী পুলিশ বাহিনী আর কালবিলম্ব করল না। ইনফরমারদের সঙ্গে নিয়ে তারা ভগ্নদুর্গ আক্রমণ করল।

লড়াই চলল তীরধনু আর বন্দুকে। বেশী সময় লাগল না।

গুপ্তঘাঁটি সরকারী দখলে এসে গেল। কিন্তু দলের নেত্রী কখন দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে তা কেউ বুঝতে পারল না।

মনে মনে আমি পরম স্বস্তি অনুভব করলাম। প্রভু যীশুর কাছে কেন জানিনা নতজানু হয়ে সেদিন শনিচারিয়ার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানালাম।

২৩শে মার্চ : ১৯০১

দূরে কোন আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের ঝিম্ ঝিম্ আওয়াজ ভেসে আসছিল। আকাশে চাঁদের আলো কত উজ্জ্বল, কেমন স্নিগ্ধ। সামনে শালের বনের প্রতিটি পাতা যেন গোণা যায় সেই আলোয়। মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল একটা উপভোগ্য বাতাস। পথের ধারের কত রঙের ফুলের গন্ধ সেই বাতাসের পাখায় ওড়ান।

কোন কাজ ছিল না হাতে, বসে বসে দেখছিলাম বসন্ত রাত্রির রূপ।

হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল শালের বনের প্রান্তে দুর্গম উপত্যকা থেকে অতি কষ্টে কে যেন উঠে আসবার চেষ্টা করছে।

দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাছাকাছি হতেই চাঁদের আলোয় যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সামনে একটি শালের গাছকে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সেই রহস্যময়ী রাজকুমারী শনিচারিয়া।

আমি কোন কিছু বলার আগেই শনিচারিয়ার মুখে ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল।

ডাক্তার জনসন, আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল।

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, কিন্তু তোমাকে ধরার জন্যে যে সবাই ওৎ পেতে রয়েছে।

আবার সেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল শনিচারিয়ার মুখে।

বলল, ধরা যদি দিতে হয় ডাক্তার, তাহলে তোমার কাছেই দেব।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওর পোষাকের দিকে।

একি, তোমার কাপড় যে ভেসে যাচ্ছে রক্তে!

শনিচারিয়াকে ধরে ফেললাম। বলল, ও কিছু নয় ডাক্তার, তোমাদের লোকেরা আমাকে বলতে গেলে ভুল উপহার দিয়েছে।

বললাম, এসো আমার সঙ্গে। গুলি লেগেছে কি?

ও বলল, তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাইনা ডাক্তার। চলে যাচ্ছি বহুদূর, তার আগে আমার দেশের মানুষের হয়ে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে চাই।

ও কাঁপছিল। রক্তের পরিমাণ দেখে ওর আঘাতের গুরুত্ব যে কতখানি তা আমার বুঝতে বাকী রইলনা।

ওকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালে। শুইয়ে দিলাম অপারেশন টেবিলে। পায়ের ভেতর দিয়ে গুলিটা চলে গেছে। ক্ষতটা গভীর, সারতে সময় নেবে।

পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন শনিচারিয়া বলল, তাহলে সত্যিই আমায় ধরলে ডাক্তার?

বললাম, যতদিন সুস্থ না হচ্ছ ততদিন এ হাসপাতালে আমার নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে। পরে আমার কাজ ফুরোলে যেখানে খুশি যেও।

পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই আমার ডিসপেনসিং রুমে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল, অল্প সময়ের ভেতরে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

বাইরে এসে বারান্দায় বসলাম। সমস্ত ঘটনাটি আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, যার মঙ্গলের জন্যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি, সে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এসে ধরা দেবে, এ

যে একেবারেই অবিশ্বাস্য। এমনি অভাবিত বস্তু কখনো কখনো আমাদের চোখের কাছে এসে যায়। তখন মনে হয় সমস্ত ঘটনাটি যেন অলীক একটা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ঘটে যাচ্ছে।

সারারাত ঘুমল ও, আমি পাশে বসে কাটিয়ে দিলাম। ছুরিতে ডিসেক্সন করে যা দেখা যায় না কোনদিন, ওর সেই শক্তি আর শ্রীকে মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ভোরের কাছাকাছি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু তন্দ্রার ঘোর এসে গিয়েছিল, বাইরে কাদের গলায় আওয়াজে উঠে বসলাম।

দেখি আমার আগেই খনিচারিয়া উঠে বসেছে। ওকে ইসারায় কথা বলতে বারণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

অনেক আগেই ভোর হয়ে গেছে। চারদিক রঙ্করে ঝলমল করছে। হাসপাতালের সামনের পথে দেখি দুটি অশ্বারোহী পুলিশ দাঁড়িয়ে।

মুখোমুখি হতেই ওরা আমাকে অভিবাদন জানাল।

একজন বলল, ডাক্তার জনসন, কাল রাতে কি আপনি কোন স্ত্রীলোককে এ পথে যেতে দেখেছেন?

আমি বিস্ময়ের ভাণ করলাম, এ পথ দিয়ে চলে যেতে, কই না তো!

ওরা আবার অভিবাদন জানিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি সুবাদার সাহেব? আসুন, চা পান হোক।

ওরা ঘোড়া থেকে নেমে এসে বসল হাসপাতালের বারান্দায়।

বাম্বিয়াকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম।

বাম্বিয়া আফ্রিকাসী একটি ছেলে। গত বছর আগুনে পুড়ে গিয়ে হাসপাতালে আসে। ভাল হয়ে ও আর গাঁয়ে ফেরে না, আমার কাছেই থেকে যায়। হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার বাম্বিয়া।

হেসে বললাম, হঠাৎ ভোরবেলা স্ত্রীলোকের খোঁজ কেন সুবাদার সাহেব?

আর বলেন কেন ডাক্তার সাব, ঐ মেয়েটার জন্যে আমাদের দিনে রাতে ঘুম নেই।

কোন মেয়ে আবার!

ঐ যে ডাকু মেয়েটা, যে আফ্রিকাসী জানোয়ারগুলোকে খেপিয়ে তুলেছিল। বললাম, তার জন্যে আপনাদের ঘুমের কামাই নেই কেন?

ওকে ধরতে না পারলে সোয়াস্তি নেই। বাইরে থাকলেই আবার জ্বালাবে। কোনদিক থেকে যে কি করে বসবে বলা যায় না।

বললাম, সামান্য একটা মেয়ে, তার এত দাপট। এতগুলি বাদু বাঁদরের পুলিশকে তাবিয়ে তুলল।

আত্মসম্মানে মনে হল ঘা লেগেছে সুবাদার সাহেবের!

বলল, সামান্য মেয়ে হলে কি আর ধরতে সময় লাগে ডাক্তার সাব। এ মেয়েকে আপনি দেখেননি, তাই এমন কথা বলছেন।

আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই।

তা আর দেখিনি। ছাতমবুরুতে লড়াই হল, সে কি মূর্তি তার। ঘোড়ার চড়ে চোখের পলক পড়তে না পড়তে পাহাড়ের একটা বাঁক থেকে আর একটা বাঁকে চলে যাচ্ছে।

বললাম, তাহলে বেশ রঙ্গ বলতে হয়।

রঙ্গ বইকি। শেষে লড়াইও হয়ে গিয়ে যে পথ দিয়ে ওদের লোকজন নিয়ে নেবে গেল, আমরা তা কোনদিন ভাবতেও পারতাম না।

কোনরকমে পাকড়াও করতে পারলেন না ওকে?

চেষ্টার কসুর করিনি, কিন্তু দেখতে না দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

চা নিয়ে এল বাম্বিয়া। ওদের চা আর কেক খাওয়ালাম। খুব খুশি।

বলল, একটা কথা বলি ডাক্তার সাব, যদি কিছু মনে না করেন।

মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এরা আবার কি কথা বলতে চায়।

মুখে বললাম, আপনারা কোন সংকোচ না রেখেই কথা বলুন। আমি কিছুমাত্র মনে করব না।

ওদের একজন বলল, পুলিশ ব্যারাকের অফিসাররা

মনে করেন, আদিবাসীদের ওপর আপনার নাকি একটু দরদ আছে।

বললাম, নিজের নিজের কাজের ওপর আকর্ষণ থাকাই তো স্বাভাবিক। আমি ডাক্তার, আমার কাছে রোগীর কোন জাত ধর্ম নেই।

ওরা দুজনেই আমার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গেল।

খাওয়ার শেষে উঠল ওরা।

বললাম, সেই মেয়েটিকে কাল রাতে দেখার কথা কি যেন বলছিলেন?

হাঁ, আমরা ওর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, সামনের ভ্যালিটার ঐ প্রান্তে ঘোড়ায় চড়ে সে চলেছে।

সবিস্ময়ে বললাম, তাকে স্পষ্ট দেখলেন।

চাঁদের আলোয় যতটা দেখা যায়। আর দেখুন এদেশে ঐ একটি ছাড়া কোন স্ত্রীলোককে কেউ কখনো ঘোড়ায় চড়তে দেখেনি।

তারপর কি হল?

গুলি ছুড়লাম ওকে লক্ষ্য করে। মুহূর্তে শালের বনের ভেতর মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাহলে সে এতক্ষণে নিশ্চয়ই এ বন ছেড়ে বহুদূর জঙ্গলের ভেতর পালিয়েছে।

ওরা ঘোড়ায় চড়ে ওদের পাঁচ হাজার টাকার শিকারের লোভে বনের দিকে দ্রুত চলে গেল।

ফিরে এলাম ডিসপেনসিং রুমে। এসে দেখি বিছানায় উঠে বসে শনিচারিয়া বামিয়ার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বামিয়া লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। শনিচারিয়া সে দৃশ্য দেখে হেসেই অস্থির।

কপট গাম্ভীর্য মুখে এনে বললাম, ও আমাকে ভয় করে।

হাসি আর থামতেই চায় না শনিচারিয়ার মুখে।

আমার চেয়েও বেশী ভয় ওর? বললাম, কে তোমাকে বেডে হুকুম দিয়েছে, জান, এটা হাসপাতাল। এখানে একমাত্র আমার আদেশই পালন করা হবে।

ওর হাসি থেমে গেল। চোখমুখে অসহায় অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল। পাটা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ও।

হাসি চাপতে চাপতে বাইরে এলাম।

বামিয়াকে বললাম, খাবার দিয়ে এস ভেতরে। আর একটা কথা, ও যে এখানে আছে কেউ যেন না জানে।

বামিয়া মাথা নেড়ে চলে গেল। তের চৌদ্দ বছর বয়েস হবে ছেলেটার। যেমন সরল তেমনি বিশ্বাসী।

এ দেশের মানুষগুলো একেবারে সহজ সরল। এই ক'বছরে কেন জানিনা বড় ভালবেসে ফেলেছি এ দেশটাকে।

বাইরে বসে শনিচারিয়ার কথাই ভাবতে লাগলাম।

কি তাজা প্রাণশক্তি এই মেয়েটির। তবু শিশুর মত ভীরু। একটু কপট ক্রোধ দেখাতেই ভয়ে কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেল।

আশ্চর্য, যার ভয়ে সকলে ভীত, যার নিজের প্রাণের বিন্দুমাত্র ভয় নেই, সে একজন ডাক্তারের সামান্য কথায় ভয় পেয়ে গেল। মানুষের কি বিচিত্র রূপ।

বসে বসে ভাবছিলাম নানান কথা। বামিয়া এসে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি এক কাণ্ড। শনিচারিয়ার সামনে কেক আর দুধ রাখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সে একেবারেই ছোঁয়নি; কেবল কেঁদে চলেছে।

বামিয়াকে বাইরে যেতে বললাম। ও চলে গেলে শনিচারিয়ার কাছে গিয়ে বললাম।

আমাকে দেখে শনিচারিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে লাগল।

বললাম, ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে কখন, কেক, আর দুধটুকু খেয়ে নাও। গায়ে বল না এলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে কি করে।

ও বলল, কিছুতেই ওগুলো মুখে তুলতে পারব না ডাক্তার।

ভাবলাম, আমি খৃষ্টান। কোন কোন আদিবাসী খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু গোঁড়া। তাই হয়ত শনিচারিয়া আপত্তি তুলেছে।

বললাম, দুধটুকু আপাততঃ খেয়ে নাও, ওটা বাবিয়া এনেছে। তোমার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করে দেব।

মুহূর্তে কি যেন ভেবে সামনে পড়ে থাকা প্লেট থেকে কেকটা তুলে নিয়ে ও কামড় দিল।

খেতে খেতে বলল, আমাকে ভুল বুঝনা ডাক্তার। জাতের বালাই আমার নেই। আমার বাবা ছিলেন আদিবাসী আর মা রাজপুতানী। আমি খেতে চাইনি ভিন্ন কারণে।

বললাম, যদি আপত্তি না থাকে বলতে, তাহলে খেতে না চাওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?

খেতে খেতে খাওয়া থেমে গেল।

বললাম, কারণটা যদি দুঃখের হয় তাহলে আমি তা জানতে চাইব না শনিচারিয়া।

ও চোখ মুছে বলল, খেতে গেলেই মনে পড়ে ওদের কথা।

জঙ্গলের কত লোক না খেয়ে কাটাচ্ছে তুমি ভাবতে পারবে না ডাক্তার।

শনিচারিয়ার ওপর শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল।

সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, যতদিন চিকিৎসা চলবে ততদিন আমার দেওয়া খাবার খেতে হবে শনিচারিয়া। তুমি এতে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে।

এবার শনিচারিয়ার মুখে কেমন যেন ম্লান একটুকরো হাসি ফুটে উঠল, সেরে উঠে কি হবে ডাক্তার; তার চেয়ে শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল।

এ কথা কেন?

কোন দিক থেকে মানুষ যখন সকল হতে পারে না তখনই কেবল তার মনে বাঁচা মরার প্রশ্ন জাগে।

তুমি ভাল হয়ে ওঠ, একদিন তোমার সব কিছু আবার ফিরে পাবে।

আমাকে স্বার্থপর ভেবোনা ডাক্তার। আমি আমার সেই ভাঙা দুর্গটুকু ফিরে পাবার জন্যে মোটেই চিন্তিত নই। সারা বনের মানুষগুলো আজ পঙ্গু হয়ে গেল। এ দুঃখ কিছুতেই সইতে পারছি না।

বললাম, সুস্থ হয়ে ওঠ, তখন নতুন কিছু চিন্তা করা যাবে।

একটা যন্ত্রণার ছায়া নেমে এল ওর মুখের ওপর।

ওকে কথান্তরে নিয়ে যাবার জন্য আজ সকালের গল্প জুড়ে দিলাম। সেই সুবাধারদের খোঁজাখুঁজির ব্যাপার।

কথায় কথায় ওর মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়ে গেল।

হেসে বলল, পাঁচ হাজার টাকার ভাগ বুঝি আর কাউকে দিতে চাও না। নিজেই সবটা নেবে?

বললাম, নিজেকে এত অল্প দামের ভাবছ কেন শনিচারিয়া। তোমার আসল দাম আমার অজানা নয়, তাই এত কম দামে কারু কাছে তোমাকে তুলে দিতে চাই না।

ও হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল কোন কথা বলল না।

আমি দরজাটি বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম আমার কাজে।

কয়েকদিন এমনি কেটে গেল। নিভৃতে গল্প করি শনিচারিয়ার সঙ্গে। এ কদিনেই বুঝতে পেরেছি কি বিপুল ঐশ্বর্য ওর ভেতর রয়েছে।

আমার ডিসপেনসিং রুমের জানালাটা খুলে দিলে সামনের উপত্যকা আর তার পরের বড় পাহাড়টা স্পষ্ট চোখে এসে পড়ে।

গভীর রাতে যখন চারদিক ঘুমে ডুবে যায় তখন কোন কোন দিন আমরা দু'জনে বসে বসে গল্প করি।

টুকরো টুকরো কথার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে শনিচারিয়ার জীবনের কথা।

সেদিন এমনি সে গল্পে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। কথায় কথায় বলল, ছোট নাগপুরের দুর্গের কথা। আর তার মৃত পিতামাতার কাহিনী।

বাবা ছিলেন আদিবাসী 'হো' সম্প্রদায়ের লোক। ছেলেবেলা খেতে না পেয়ে এই বনে মনোহরপুরের জায়গীরদার অভিরাম সিংএর বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন।

অভিরাম সিংএর একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে ছিল বাবার চেয়ে অনেক ছোট। বাবা সেখানে

অভিরাম সিংহের আজ্ঞাবলে কাজ করতেন। একটু বড় হলে সেই মেয়েটির সঙ্গে বাবার ভালবাসা জন্মে। দু'জনে বিয়ে করবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

কথাটা ক্রমে অভিরামের কানে যায়। অমনি তিনি এমন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন যে কোমর থেকে তলোয়ার টেনে বাবাকে আঘাত করেন। ফলে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁর একটি হাত দুখণ্ড হয়ে যায়।

অভিরামের রাগ পড়লে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। বাবাকে স্নেহ করতেন খুব। তাড়াতাড়ি লোক দিয়ে রাঁচিতে পাঠিয়ে দেন চিকিৎসার জন্যে। তোমাদের দেশীয় এক ডাক্তার সেখানে বাবাকে সুস্থ করে তোলেন। তিনি নিজের দেশে ফিরছিলেন, বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়ে বাবা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরে নিজের জঙ্গল আবাসেই তিনি ফিরে আসেন।

ফিরেই দেখা করতে যান অভিরাম সিংএর সঙ্গে।

অভিরাম তখন মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা তারাবাঈ বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

কিন্তু সরকার তারাবাঈকে সম্পত্তির অধিকার দিল না। তারা কৌশলে সমস্ত মহাল খাস করে নিল।

বাবার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে চলে এলেন তারাবাঈ। সঙ্গে আনলেন, বহুদিনের সঞ্চিত সোনা। বিয়ে হল দুজনের। ছোট নাগপুরে বাবা বসতি পত্তন করলেন। পাথর সাজিয়ে সাধারণভাবে গড়ে তুললেন দুর্গ। গড়লেন 'গরাম' দেবতার মন্দির। ধীরে ধীরে জঙ্গল মাহালের প্রায় সমস্ত হো'দের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। তাদের ভেতর জাতীয়তার মন্ত্র দান করলেন।

নিজের ধর্মের ভেতর দিয়ে ভগবানকে পাবার চেষ্টা করবে। ভগবানের রাজ্যে জাতির বিচার নেই। অন্যায় সহ্য করবে না। জঙ্গলের লোকেরা বাবাকে তাদের রাজা বা দেবতা বলে মনে করত।

বাবা অত্যন্ত মুক্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন।

কিন্তু প্রকৃতি বাদ সাধল এক সময়। পাহাড় হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠল। ছোটনাগপুরে দুর্গ ভেঙে পড়ল। তার একটি স্তূপের ভেতর আমার বাবা, মা সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল শনিচারিয়া। একটা গভীর বেদনাকে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

ও প্রসঙ্গে ছেদ টেনে দিয়ে আমি বললাম, প্রথম যেদিন আমি তোমাকে দেখি সেদিন কিন্তু আদিবাসী বলে ভুল করিনি।

শনিচারিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠল হঠাৎ, আমি আদিবাসীর মেয়ে ডাক্তার জনসন। আমার দেহে আদিবাসীরই রক্ত বইছে। আমার ধর্ম আর আমার এই জঙ্গলী দেশকেই আমি ভালবাসি।

বললাম, আমি সেজন্যে তোমাকে শ্রদ্ধা করি শনিচারিয়া। আমাকে ভুল বুঝ না।

সহজ হল শনিচারিয়া। আমার হাতটা টেনে নিয়ে বলল, তোমাকে দেখে ইংরাজের ওপর সব অশ্রদ্ধা দূর হয়ে যায় ডাক্তার। আমার বাবাও তোমার মত দয়ালু এক ইংরাজ ডাক্তারের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

যত তাড়াতাড়ি পায়ের ক্ষতটা সেরে উঠবে মনে করেছিলাম; তা আর হল না। শনিচারিয়াকে বেশ কিছুদিন ভুগতে হবে বলেই মনে হল।

মাঝে মাঝে ও অস্থির হয়ে উঠত। বনে বনে রাত্রিদিন ঘুরে বেড়ানই যার স্বভাব, কতকাল ছোট্ট একটি বেডের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায়।

এক একদিন শনিচারিয়া হাঁপিয়ে উঠত।

বলত, কতদিনে সারবে ডাক্তার?

বুঝিয়ে বলতাম, আঘাতটা গুরুতর তাই সারতে একটু সময় লাগছে।

অনুনয় করত, আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যেতে পারবে ডাক্তার। কতদিন চারদিকটা ভাল করে দেখিনি। শালের ফুল ফুটেছে। 'বাহা' পরবের ঢেউ উঠেছে সারা বন জুড়ে। আমার মন কেমন করছে ডাক্তার।

গভীর রাত। চাঁদের আলোয় বন, পাহাড় ভেসে

যাচ্ছে। ওকে সাবধানে ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালের বাইরে।

কতক্ষণ একটি পাথরের চাঁইএর ওপর বসে রইলাম দুজনে। ও কতদিন পরে চারদিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল। আপন মনে মগ্ন হয়ে গেল।

বহুদূর থেকে মাদলের ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে আসছিল। শনিচারিয়া কান পেতে সেই শব্দটুকু শুনতে লাগল। তারপর এক সময় নিজেই ধীরে ধীরে গাইতে লাগল 'বাহা' পরবের গান।

সেই জ্যোৎস্নার চলে ধোয়া বন পাহাড়ের রহস্যময় পরিবেশে সে সুর চারদিকে আশ্চর্য স্বপ্নের জাল বুনতে লাগল। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই অরণ্যকন্যাকে দেখতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আর ধর্ম নিয়ে আলোচনা হত। আমি ওকে প্রভু যীশুর ত্যাগের কথা বোঝাতাম। কথায় কথায় আদিবাসীদের বিচিত্র সংস্কার আর দেবতার কথা এসে পড়ত।

শনিচারিয়া বলত, আমি জানি ডাক্তার, আমাদের ধর্মবোধের ভেতর অনেক কুসংস্কার আছে। কিন্তু নিজের ধর্মের চেয়ে অন্য কোন ধর্মকে আমি বড় বলে ভাবতে শিখিনি।

বলতাম, তোমার মুক্ত মনের কাছে এটা একটা সংস্কার বলেই আমি মনে করি। ও অমনি বলত, তোমার ধর্মও একেবারে কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয় জনদন। তাই খৃষ্টানরাও কিছু পরিমাণে সংস্কারাচ্ছন্ন।

এ তোমার তর্কের কথা হল শনিচারিয়া। ও আবার নীরব হয়ে যেত। কতক্ষণ ভাবত। তারপর বলত: প্রতি জাতির ধর্ম গড়ে ওঠে বহুদিনের সাধনা আর সংস্কারে। এক একটি জাতির কাছে তার ধর্ম তার একান্ত প্রাণের বস্তু। আমার মনে হয় কি জান, নিজের নিজের ধর্মকে ধীরে ধীরে সংস্কার করে নিলে তার ভেতর দিয়েই ঈশ্বরের সহজ রূপটি দেখা যায়।

প্রভু যীশুর প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত থেকেও শনিচারিয়ার কথাকে অস্বীকার করতে পারতাম না।

নানা আলোচনার ভেতর দিয়ে এই অরণ্য কন্যাটি ধীরে ধীরে আমার সমস্ত মনকে অধিকার করে বসল। আমার দিন, আমার রাত্রি, আমার সমস্ত ভাবনা কল্পনা এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগল।

শনিচারিয়ার বিপুল সত্তার মধ্যে আমি ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পরে এক দুপুরে হাসপাতালের বারান্দায় বসে আমাদের কথা হচ্ছিল। বললাম, ডাক্তার ঘরে বলব তোমার অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যাক্, কিন্তু আমার ভেতর আর একটা মানুষ বলছে, অসুখ সারলেই ও পালাবে। যে কটি দিন ও হাসপাতালে বন্দী থাকে সে কটি দিনই লাভ।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল শনিচারিয়ার মুখে। বলল, খাঁচার ভেতর যে পাখি কিছুকাল বন্দী হয়ে থাকে, খাঁচা মুক্ত করে দিলেই কি সে উড়ে যেতে পারে ডাক্তার।

কথা শেষ করেই শনিচারিয়া বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল। হাতের ইসারায় আমাকে পথের দিকে ইংগীত করে ও সরে গেল দ্রুত।

দেখলাম, ঘোড়ায় চড়ে হাসপাতালের দিকে কে যেন আসছে।

কাছে আসতেই দেখলাম রেবেকা। এগিয়ে গেলাম।

কি ব্যাপার, আপনি এ সময়, একা!

রেবেকা ঘোড়া থেকে নেমে হাঁপাতে লাগল।

সময় নেই আমার ডাক্তার জনদন। জীবনে অনেক উপকার করেছেন আপনি, তাই যদি আপনার কোন উপকার হয়, সে জন্যে দৌড়ে এলাম।

বললাম, হাঁপাচ্ছেন আপনি, বসুন এখানে।

রেবেকা বললেন না। বললেন, এখুনি ফিরে না গেলে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

আমি তাকিয়ে রইলাম রেবেকার দিকে।

রেবেকা বললেন, সেই আদিবাসী মেয়েটিকে কারা যেন আপনার সঙ্গে রাতে এই পাহাড়ের ওপর দেখেছে। তারা সরকারকে খবর দিয়েছিল। আজ শেষ রাতে

পুলিশের লোকেরা আপনার হাসপাতাল ঘেরাও করবে। সাবধান থাকবেন ডাক্তার জনসন।

রেবেকা কথা ক'টি বলেই ঘোড়ায় চড়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে বসে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম। ঘোলনতা কেন, আজ যদি ওরা আসে তাহলে শনিচারিয়াকে নিয়েই বের হব ওদের সামনে। যদি কোন সেবা করে থাকি সরকারের, তাহলে তার পুরস্কার স্বরূপ চেয়ে নেব এই অবলা কন্যাটিকে। ওকে নিয়ে আমার দেশে চলে যেতে আশা করি ইংরাজ সরকার বাধা দেবে না। তাহলে এই সারাক্ষার মানুষগুলোকে ক্ষেপিয়ে তোলার যে ভয়, তা আর থাকবে না সরকারের।

শনিচারিয়াকে কিছু বললাম না। রেবেকা আর আমার কথাগুলো বোধ করি শোনেনি শনিচারিয়া। তাহলে গভীর চিন্তায় ডুবে আছি দেখেও এমন হাসি মুখ নিয়ে ও আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না।

শনিচারিয়া বলল, কতদিন ফুল পরিনি খোঁপায়। আজ খোঁপা বাঁধব, তুমি একটু লালের ফুল এনে দেবে।

ফুল এনে দিলাম। আজ অপরূপ করে নিজেকে সাজাল শনিচারিয়া।

রাতে খেতে বসলাম একই সঙ্গে। ও আমাকে পরিবেশন করতে লাগল। ওর চোখে মুখে আজ যেন কিসের তৃপ্তি উপচে পড়ছে।

আমিও মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

শুতে যাবার সময় ও আজ এল আমার কাছে।

বলল, তুমি ঘুমাও ডাক্তার, আমি তোমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিই।

ও বসে বসে বিলি কাটতে লাগল। কি যাদু ও হাতের। আমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা ভারী জিনিষ ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। লাফ মেরে ঢুকলাম শনিচারিয়ার ঘরে। ঘর শূণ্য। বেরিয়ে এলাম পথের ওপর। অন্ধকার রাত। আলো নিয়ে খুঁজতে লাগলাম। ঐ ত, শনিচারিয়া পড়ে আছে পথের ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পথ। হাসপাতালের পেছনে খাড়াই পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নিলাম ওর দেহটা। পরীক্ষা করে দেখলাম, শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

কেন, এমন করলে শনিচারিয়া। ঘর ঘর করে আমি কাঁপতে লাগলাম।

তোমাকে আমার খু-উ-ব ভাল লাগে। অস্পষ্ট কথার স্বর।

তোমাকে বিয়ে করে আমার দেশে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম শনিচারিয়া।

তোমার দেশে!

হাঁ, শনিচারিয়া আমার দেশে। যন্ত্রণার ভেতরেও হাসতে চেষ্টা করল শনিচারিয়া। একেবারে কাছে আমার মুখটা নিয়ে যেতে ইংগীত করল।

তারপর বলল, আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করলাম ডাক্তার। শুধু কথা দাও তুমি আমার ধর্মকে ঘৃণা করবে না।

ওর হাতখানা আমার দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিলাম।

ও নীরব হয়ে গেল। অন্ধকার সরে গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে আবির্ভাব হচ্ছে জ্যোতির্ময় আলোর। আমি নতজানু হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

আপনি ডাক্তার জনসনের ডায়েরী পড়া শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াবেন, তখন ঐ বৃদ্ধ পাদ্রীটি আপনার সামনে এসে আদিবাসীদের বৃক্ষদেবতা 'জায়েরী'র দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তারপর আপনার হাত থেকে ঐ ডায়েরীখানা নিয়ে মৃদু হাসি হাসতে হাসতে ঢুকে যাবেন চার্চের ভেতর।

ফিরে আসতে আসতে আপনার মনে হবে ইনিই কি ডাক্তার জনসন। আমারও তাই মনে হয়েছিল।

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

—"নিজেকে খুব চতুর মনে করো না। বেশী চতুর মনে করা ভাল নয়। যেমন কাক খুব চতুর, নিজেকে খুব চতুর মনে করে, কিন্তু বিষ্ঠা খেয়ে মরে, তেমনি এ সংসার-ক্ষেত্রে যারা বেশী চালাকী করতে যায়, কেবল তারাই ঠকে মরে। মানুষের মন যেন সরষের পুঁটুলি। সরষের পুঁটুলি একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে ওঠে, তেমনি মেয়ে মানুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে তখন স্থির করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। বালকের মন ছড়ায়নি, অল্পতেই স্থির হয়; কিন্তু বুড়োদের ষোল আনা মন সংসারে ছড়িয়ে রয়েছে, সংসার থেকে মন তুলে ঈশ্বরে স্থির করা বড় শক্ত। কামিনী কাঞ্চনে মন খানিকটা ছড়ানো মন কুড়ান যায় হয়ে ওঠে।"

• • • •

—"বড়লোকের বাড়ীর ঝি চাকর কাজ করবার সময় ভাবে সবই মনিবের কাজ, নিজের কিছুই নয়; তেমনি সংসারে থেকে কাজ করতে করতে মনে করবে সবই তাঁর (ভগবানের) কাজ, নিজের বলতে কিছুই নাই। এইভাবে তাঁর উপর নির্ভর করে কাজ করার নামই কর্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম, রূপ ও ধ্যান করা এবং ঐ ভাবে সকল কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে পথ। সংসারে থেকেও ঈশ্বরের আরাধনা চলে। এদেশে দেখেছি, সব চিড়ে কোটে; একজন স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেঁকির মূষলের ভিতর হাত দিয়ে নাড়ছে, আর এক হাতে ছেলে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে। ওর ভেতর আবার খদ্দের আসছে, তার সঙ্গে হিসাব করছে, তোমার কাছে ওদিনের এত পাওনা আজকের এত দাম হলো। এই রকম সে সব কাজ করছে বটে, কিন্তু তার মন সর্বক্ষণ ঢেঁকির মূষলের উপর পড়ে আছে; সে জানে যে, ঢেঁকিটি হাতে পড়ে গেলে জন্মের মত হাতটি যাবে। সেই রূপ সংসারে থেকে সকল কাজ কর, কিন্তু মন রেখো তাঁর (ভগবানের) প্রতি। তাঁকে ছাড়লে সব অনর্থ ঘটবে।"

• • • •

—"যত মত তত পথ। সর্ব ধর্মই সত্য। এক একটি ধর্মের মত এক একটি পথ, ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। যেমন নদী নানাদিক থেকে এসে সাগর-সঙ্গমে মিলিত হয়। নানা ধর্ম, নানা পথ এক ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার মত পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। সব মতই পথ—মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে, একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছনো যায়। তবে কোন পথ শুদ্ধ কোন পথ নোংরা, শুদ্ধপথ দিয়ে যাওয়াই ভাল। যেমন ছাদে যেতে পাকা সিঁড়িতে ওঠা যায়, কাঠের সিঁড়ি, বাঁশের মই, বাঁকা সিঁড়ি, একটা বাঁশ বা একটা দড়ি এর সাহায্যেও ওঠা যায়, তবে একটা জোর করে ধরতে হয়, এতে এক পা, ওতে এক পা দিলে হয় না। একটাতে দৃঢ় হলে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকার বাদীরাও ঈশ্বর লাভ করবে, নিরাকার বাদীরাও ঈশ্বর লাভ করবে। একই জল পান করে থাকে সকলে। জল এক বস্তু, কিন্তু নাম বিভিন্ন। সেইরূপ ঈশ্বর এক বস্তু কিন্তু নাম অনেক আছে। যে কোন একটা নাম ধরে ডাকলেই তিনি দেখা দেন।"

———

যায়, তাহাই নতমস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাতমানসে নহে। যে সকল বস্তু উপার্জ্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি; কিন্তু ভাব তাহার মধ্যে হইতে পারে না। আমাদেরও বিশ্বাস এই যে ভাবের উন্নয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্ফূর্ত্তি সম্ভবে, কিন্তু উপার্জ্জন সম্ভবে না। ···স্বদেশ হইতে যে ভাব উদয় হয়, তাহাই ঠিক। যে-ভাব অন্যত্র হইতে বাছিয়া আনা হয়, তাহা কৃত্রিম, তাহা কোনো কার্য্যেরই নহে। বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায়, হার্প কি শোভা পায়? এই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।

দ্বিজেন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন—যে কারণে ব্রিটানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানিয়া—এথেন্স নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিনার্ভা-এথেনিয়া নাম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। আর্য্য ভাষার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। যতপ্রকার বিদ্যা আছে—গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিদ্যাসমূহের বীজ প্রথমে ভারত-ভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়, পরে তাহার বীজ নানা দেশে বিকীর্ণ হইয়া এতদিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগায়ত্ত হইয়াছে।···তাই সর্ব্ববিদ্যার অধিদেবতাকে আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি।

তারপর তিনি লিখেছেন—আমরা তাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহনপূর্ব্বক এই তো প্রতিজ্ঞা করিলাম—এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন, ভারতীর আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ভারতীর প্রথম আবির্ভাব ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে এবং বহু প্রতিভাশালী কবি, কথাশিল্পী, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানবিদ, চিন্তাশীল সমালোচক ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী—এঁরা নিয়মিত লিখতে লাগলেন। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, রামদয়াল সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রভৃতি অর্থাৎ তখনকার সুধী এবং চিন্তাশীল প্রত্যেকেই ভারতীর সেবায় যে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, সে সব পুষ্প বাঙলার সাহিত্যকাননকে অপূর্ব্ব শোভামাধুরীতে সমৃদ্ধ করলেন। ভারতীতে নব নব বৈচিত্র্যের সমাবেশ—কবিতা, উপন্যাস, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্যালোচনা এককালের যতো নাট্যালয়ের সমালোচনা বেঙ্গলি নাট্য, খেয়াল গান প্রভৃতি বাঙলা মাসিক সাহিত্যে ভারতীই সর্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করে। আচার্য্য কমল ভট্টাচার্য্য প্রায় প্রতি মাসে নানা বিষয়ে লিখতেন। সম্পাদকের বৈঠকে যে চিন্তাশীলতা এবং ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাই, তা অপূর্ব্ব।

এখনকার বহু মাসিকে নানা বিভাগ সন্নিবিষ্ট হচ্ছে—ভারতী পত্রিকা বহুযুগ পূর্ব্বে এমনি নানা বিভাগ নির্দিষ্ট ক'রেছিল।

প্রথম যুগের ভারতীর পৃষ্ঠা শেষে বিষয় বৈচিত্র্যের একটু নমুনা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। সম্পাদকের বৈঠকে বারবণের কয়েকটি বাণী প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটি যশের মহিমা। বায়রণের বাণী—কোনো গ্রন্থ জনসমাজে সমাদৃত হইলে তাহার লেখক চিরকালের জন্য অসুখী হবেন। ইহাতে তাঁহার যশঃ-তৃষ্ণা এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে তাঁহার মন হইতে শান্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। তাঁহার একটি গ্রন্থ জনসমাজে আদৃত হওয়ায় তিনি উৎসাহিত হইয়া আরও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিতে সচেষ্ট

হবেন। লোকের প্রত্যাশা যে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্তী গ্রন্থগুলি আরও উৎকৃষ্ট হইবে এই জন্য নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। কারণ লেখকের আশা এত উত্তেজিত হয় যে তাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ আজকালের এইরূপ ধরণ যে, গ্রন্থকারের একটি রচনাও যদি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর তাঁহার রক্ষা নাই—ইঁহার পূর্বরচিত যদি ৫০ খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকে, তথাপি একটি নিকৃষ্ট গ্রন্থ তাঁহার পূর্বকীর্তির অপলাপ করে।

সাহিত্যে দুর্নীতি-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ের উপর তাহার নীতি নির্ভর করে না, রচনা-প্রণালীর উপরে করে। পাঠকের মনে দুর্নীতভাব উৎপন্ন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হইলে নিশ্চয়ই গ্রন্থ দুর্নীত। গ্রন্থকারের মনের ভিতরকার উদ্দেশ্য অন্তর্যামী জানিতে পারেন, তবে গ্রন্থে যে উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত থাকে, আমরা তাহারই কথা বলিতেছি। সাধারণ নাট্যশালার অভিনয় সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ভারতীতে প্রকাশিত মন্তব্য—নাট্যশালাধ্যক্ষেরা নিশ্চিত জানিবেন যে ভালো অভিনয় হইলে দর্শকগণের সন্তোষজনক হইবে না, ইহা অসম্ভব। যদি দর্শকদিগের রুচি এতই বিকৃত হইয়া থাকে, তাঁহাদের দোষেই হইয়াছে এবং তাঁহাদের হস্তে তাহার সংস্কারের ক্ষমতা আছে।

আর একটি প্রবন্ধে বাঙলা সাহিত্যকে সাহিত্যের রেলগাড়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সমালোচকদের বলা হয়েছে সাহিত্য-রেল কোম্পানির কর্মচারী। বিনাটিকিটে ইঁহারা সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ করিতে পারেন। ইঁহারা চিরদিন পরের টিকিট সমালোচনা করিয়াই জলযোগ করিতেছেন—একখানি টিকিটও ক্রয় করেন নাই। ইহা কি সত্য নয় যে তিনি নিজে আপনাকে যত বড় ব্যক্তিই মনে করুন না কেন, যতক্ষণ না তিনি টাকের পয়সায় টিকিট কিনিবেন, ততক্ষণ তিনি চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী অপেক্ষাও অধিক সম্মান পাইবার যোগ্য নন। কিন্তু এই সমালোচকগণ যে বিনা পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রেতাদিগের সম্মুখে সবখানি আসন পাইয়া থাকেন, ও অহঙ্কারে এতখানি ফুলিয়া উঠেন যে পাঁচটা আরোহীর জায়গা একা জুড়িয়া বসেন, ইহা সর্বতোভাবে ন্যায় বিরুদ্ধ। সাহিত্যের এক শ্রেণীর সমালোচকদের সম্বন্ধে এ-কথা কতখানি খাটে, সকলেই তা উপলব্ধি করবেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদনা করেছিলেন সাত বৎসর; তারপর তাঁর সুযোগ্যা ভগ্নী প্রতিভাময়ী স্বর্ণকুমারী দেবী নিলেন ভারতীর সম্পাদনা-ভার। এ সাত বৎসর দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকলেও স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী লিখেছেন—বড়মামা সম্পাদক ছিলেন নামে—কিন্তু আমার নতুনমামা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) এবং রবিমামা ভারতী চালাইতেন। তিনি লিখেছেন, রবিমামা বিলাতযাত্রা করিবার পর নতুনমামার স্কন্ধেই সম্পূর্ণভাবেই সম্পাদন-ভার পড়িল—তখন তাঁহার একজন প্রধান সহায়ক হইলেন মাতৃদেবী (স্বর্ণকুমারী দেবী)।

ভারতী পত্রিকায় স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস "দীপনির্বাণ" যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় তখন তাতে লেখিকার নাম ছিল না—উপন্যাসখানি তখনকার বিদ্বৎসমাজে খুব সমাদর লাভ করেছিল—দীপনির্বাণের পর তাঁর ছিন্নমুকুল, গাথা (কাব্যগ্রন্থ), মালতী, কাহাকে প্রভৃতি উপন্যাস ভারতীতে প্রকাশিত হয়—সাহিত্যে বাঙালী মহিলা লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীদেবীর আসন আজও সবার উপরে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার কথাসাহিত্যকে সৃষ্টি এবং পরিপূর্ণ করেছিল—তার উপর ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির অনুশীলনের পথ নির্দেশ করেছিল, ভারতী বাঙলার কথাসাহিত্যকে অপরূপ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ করেছে ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি অনুশীলনের পথকে শুধু সুগম করেনি, সে পথে বহু পথিককে আলোকবর্তিকা ধরে অগ্রসর করেছে। বাঙলার গীতিকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে ভারতীর কোলেতে। বিহারীলাল

উদ্ভূত। কেরানীবাবুর নাম শরৎ চক্রবর্তী। তিনি রুখে উঠলেন—কেন উঠবো? বিনা টিকিটের যাত্রী নই! নেটিভের এমন স্পর্দ্ধা! সাহেব তখন তাঁর অঙ্গে সবুট-পদাঘাত চালাতে লাগলো। লাথির পর লাথির ঘায়ে শরৎবাবুর তখনি হলো মূর্চ্ছা! সঙ্গে সঙ্গে দুখানা ট্রেলার ভরতি অত যাত্রী হুড়াদুড় করে ট্রাম থেকে নেমে ছুটে পালালো। নরাধম কাপুরুষের দল! এ-নিয়ে তখনকার দিনের দুখানি সাপ্তাহিক হিতবাদী আর বঙ্গবাসী খুব কাড়াকাটি করে ছিল। বিচারে অপরাধীর কটা টাকা জরিমানা হলো। ভারতীতে তখন সরলা দেবী লিখলেন—এই সব বর্বর গোরার বিরুদ্ধে নালিশ করা কাপুরুষতা—হাতে-হাতে সাজা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি লিখলেন—দু-দুখানা ট্রাম-ভরতি লোক—তারা ঐ কিরিঙ্গিটাকে ধরে যদি দু-ঘা করে চাটি মারতো তাহলে নিরীহ শরৎবাবু প্রাণে মারা যেতেন না।

সাহিত্য-পত্রিকা হলেও ভারতীতে সরলা দেবী তখন এ কাপুরুষতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। সুস্পষ্টভাষায় তিনি লিখলেন—বিলাতী ঘুষির বদলে দেশী ঘুষি, বিলাতী লাথির বদলে দেশী লাথি দেওয়া চাই। তাঁর এ উদাত্ত বাণী তখনকার তরুণ সমাজকে রীতিমত সচেতন করে তুলেছিল—গোরার ভয় প্রশমিত হচ্ছিল।

তারপর ১৯০২ সালের কথা—আশ্বিন মাস···কলকাতার হোট উইলিয়ামে সলত্যান নামে এক গোরা তার ঘরীর বেয়াদবিতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে গুলি করে মারে—Cold blooded murder-এ ব্যারাকপুরে গোরা সোয়ানের সবুট পদাঘাতে এক পাখাটানা কুলির হলো 'গ্রীহা' ফেটে মৃত্যু। ভারতী (আশ্বিন, ১৩০৯) পত্রিকায় সরলা দেবী লিখলেন—ইতর শ্বেতাঙ্গের স্পর্দ্ধা এবং সাহস এতই বর্ধিত হইতেছে যে ভদ্র-অভদ্র সম্ভ্রান্ত দেশী লোককে তাহারা কুকুরের ন্যায় দেখিতেছে।

ঐ বছরেই আশ্বিন মাসে চাঁদপুরের এক ঘটনা। এক বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্যাপটেন জাকসন নামে এক গোরা চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে নামিয়ে দেয়—ডেপুটি কোর্টে নালিশ করেন। বিচারে জাকসনের হয় পনেরো টাকা জরিমানা। এই প্রসঙ্গে ভারতী পত্রিকায় সরলা দেবী লিখলেন—কর্ণপীড়ন, অর্দ্ধচন্দ্র—এদেশের পুরুষেরা প্রাণের ভয়ে বিপদের আশঙ্কায় সমর্থন করিয়া যায় তাহার পর ছাপার অক্ষরে সেই পলায়নকে মূর্ত্তিমান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে: ধিক্।

প্রতিমাসে সরলা দেবী এমনি কথা লিখতে লাগলেন: ভারতীতে লিখলেন,—বরমেকো বীর পুত্র ন চ ভীরু শতৈরপি।···লিখলেন—অক্ষমের আবার ক্ষমা কি। ক্ষমা-সাধনের জন্য প্রথমে ক্ষমতাবান হওয়া আবশ্যক—ক্ষমতার চর্চা প্রয়োজন। সক্ষম ব্যক্তিই ক্ষমা দেখাইতে পারে। অক্ষমের ক্ষমা হাসির কথা।

তাঁর এ-সব কথা নিষ্ফল হলো না। শহর মফঃস্বল থেকে প্রতিমাসে খবর আসতে লাগলো কোথায় কোন সাহেব 'নেটিভে'র সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কিভাবে হাতে হাতে তার শোধ পেয়েছে—এসব সংবাদ ভারতীতে নিয়মিত ছাপা হতো—পড়ে তরুণ সমাজের মন জড়তা ভেঙে লাঠি-সাঠা-নীতি প্রয়োগে তৎপর হতে লাগলো। দেশের আবহাওয়া বদলাতে লাগলো। ভারতীতে শুধু লেখা নয়—তিনি বীরাষ্টমী ব্রত পালনের ব্যবস্থা করলেন—প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসবের ব্যবস্থা করলেন; এবং বীর্য্য শৌর্য্য চর্চ্চার জন্য ভারতীর প্রাঙ্গণে মার্ত্তুজা ওস্তাদকে আনিয়ে তরুণদের অসিক্রীড়া শেখাবার এবং হরদয়ালকে দিয়ে লাঠি চালনা শেখাবার ব্যবস্থা করলেন।

একথা বলার অর্থ, এযুগের অনেকে জানেন না 'ভারতী' একদিকে দেশে যেমন সাহিত্যানুশীলনকে পরিপুষ্টির দ্বারা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে—তেমনি বাঙালীর মনে মনুষ্যত্ব-বিকাশে এবং সত্যবোধ ও জ্ঞানানুশীলনে রীতিমত সাহায্য করেছে।

সরলা দেবীর বিবাহ হয় বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী লাহোরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে। ১৩১১-১২ সাল পর্যন্ত কলকাতায় নিত্য আসা যাওয়া ছিল তাঁর কিন্তু তিনি লাহোর থেকে সম্পাদকীয় কর্তব্য করতেন এবং তাঁর এ-কাজে কলকাতা থেকে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন করতেন তাঁকে সাহায্য।

১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে সরলা দেবী কলকাতায় এলেন। সে বছর নানা গোলযোগে 'ভারতী'র বৈশাখ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়নি। তখন আমাকে ডেকে তিনি ভারতীর ভার দিয়ে বলেন, সম্পাদনার কাজে তাঁকে সহায়তা করবার জন্য ঠাকুরবাড়ী থেকে লেখা সংগ্রহ করা গেলনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি বলেন, নিয়মিত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা লেখা দেবেন না। আমার কাছে ছিল শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' উপন্যাসের কপি—সরলা দেবীর পরামর্শে তিন সংখ্যায় বড়দিদি তিনি ছাপতে বললেন— প্রথম দু সংখ্যায় লেখকের নাম ছাপা হলোনা। সরলা দেবী বললেন, লেখকের নাম ছাপা না থাকলে অনেকে মনে করবেন রবীন্দ্রনাথের লেখা। সেই ভাবেই ভারতীতে বড়দিদি ছাপা হলো, আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' শেষ হলো—সেই সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের নাম দেওয়া হলো লেখক বলে।

কিন্তু বহু প্রয়াসেও ভারতীকে নিয়মিত করা গেল না। ১৩১৪ সালের মাঘ মাসে ভারতীর আশ্বিন সংখ্যা ছাপা হলো। তখন স্বর্ণকুমারী দেবীকে বহু সাধ্যসাধনা করায় ১৩১৫ সালের ১লা বৈশাখ থেকে তিনি নিলেন ভারতী সম্পাদনার ভার। তিনি আমাকে নিলেন সঙ্গে তাঁর কাজে সহায়তা করতে।

তাঁর হাতে 'ভারতী' আবার অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত হলো, কত নূতন নূতন লেখক তিনি সৃষ্টি করলেন। ১৩২১ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল পরলোক গমন করলে তিনি শোকাভিভূত হয়ে ভারতীর ভার অর্পণ করলেন বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে—তখন ১৩২২ সাল থেকে ১৩৩০ সাল পর্যন্ত মণিলাল এবং আমি একযোগে ভারতীর সম্পাদনা করি। ১৩৩০ সালে স্বামিবিয়োগের পর সরলা দেবী এলেন কলকাতায় বাস করতে, তখন তাঁর হাতে ১৩৩১ সালের বৈশাখে ভারতী সম্পাদনার ভার তুলে দিয়ে আমরা অবসর গ্রহণ করি।

ভারতীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে যে সাহিত্যনিষ্ঠা ছিল এবং কলারুচি অনুশীলনে যে আদর্শ ছিল, আমরা দুই বন্ধুতে যথাসাধ্য তা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছি এবং 'ভারতী' থেকে আমরা একটি পাইপয়সা পকেটজাত করিনি—যোগ্য লেখক-লেখিকাকে তাঁদের চাহিদা মতো দেলামী দিয়েছি। এই হলো ভারতীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

আধুনিক শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষা কি নিয়মে চলছে জানেন ?

মাস্টার মশায়রা ভয় করছেন হেডমাস্টারকে, হেডমাস্টার মশায় ভয় খাচ্ছেন সেক্রেটারীকে, সেক্রেটারী স্কুল কমিটির কথা শুনে ঝিমিয়ে যাচ্ছেন, কমিটির সভ্যরা সদা সশঙ্কিত অভিভাবকদের রুদ্রমূর্তি স্মরণ করে, অভিভাবকরা ভেবেই খুন এই বুঝি ছেলেরা এক কাণ্ড করে বসে, আর ছাত্রের বলে—না, তারা কাউকে ভয় করছে না।

সঙ্গীতটিরও অনুবাদ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য রচনাবলী ও উপন্যাসখানির পটভূমিকা নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার বাংলাসাহিত্যের অনুশীলন প্রধানতঃ রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৪০ সালে বাঙালী শিক্ষক দাউদ আলী দত্ত ও সহকারী অধ্যাপক এ, এম, জিমিনের পরিচালনায় লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র, ছাত্রীরা তাঁদের স্নাতক-লাভের বিষয় হিসাবে মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলী নির্ব্বাচন করেন। সাম্প্রতিক কালে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পড়ান হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক লেখকদের লেখাও সম্প্রতি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রীরা বাংলা কাব্যের একখানি সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলনে উনিশ ও বিশ শতকের কবিদের রচনা সংকলিত হয়েছিল।

সোভিয়েট পণ্ডিতদের বিশেষ মনযোগ নিবদ্ধ রবীন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৫৫-১৯৫৭ সালে মস্কোর কথা সাহিত্য ও কবিতা প্রকাশনা ভবন থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনার আট খণ্ডের এক রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "নৌকাডুবি", "ঘরে বাইরে", "গোরা", "চোখের বালি", "শেষের কবিতা", "ডাকঘর" ইত্যাদি। আটখণ্ডের সংস্করণটি সোভিয়েট রাশিয়ায় রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুশীলনে মস্ত বড় সহায়ক। বর্তমানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ১৬টি ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্য অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

সোভিয়েট ভারত বিদ্যাবিদরা কবিগুরুর আসন্ন জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য আয়োজন করছেন। এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে কথাসাহিত্য ও কবিতা ভবন থেকে কবির রচনাবলীর ১২ খণ্ডের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে সোভিয়েট দেশে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা আরও বেশী হবে এবং বাংলাভাষার সমাদর আরও বাড়বে এটাই আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা।

'হাউ ডিয়ার টু মাই হার্ট' গ্রন্থের রচয়িতা এমিলি কিসব্রো সবে মাত্র বক্তৃতা শেষ করেছেন লেখকদের সম্মুখে এমন সময় বেয়ারা এসে একটা চিরকুট দিয়ে গেল।

চিঠি পাঠিয়েছে তাঁর ন' বছরের মেয়ে।

—আঃ শেষ পর্যন্ত আমার ঘরের লোকের কাছ থেকে অভিনন্দন আসছে আমার বইএর জন্যে—বললেন লেখিকা আর পত্রখানি খুলে ধরলেন।

তাতে লেখা আছে : বেশ লিখেছ মা আমি কি দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবো?

দাঁতভাঙা নয়।

খেলাধূলা

হকি লীগ

কোলকাতার খেলার আসর বেশ জমে উঠেছে। মরশুমটা এখন হকির। রোম অলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হবার পর এই প্রথম আনুষ্ঠানিক হকি খেলা চলছে। প্রথম বিভাগীয় হকি লীগের খেলা এখন শেষ হবার মুখে। হকি মরশুম শুরু হবার পর মাঝপথে একটু ভাঁটা পড়েছিল। এর কারণ হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের অংশগ্রহণ। হকি লীগে গতবারের চ্যাম্পিয়ান জনপ্রিয় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব, বিখ্যাত কাষ্টমস দল ও অপর জনপ্রিয় দল মোহনবাগান তাদের পূর্ব সুনাম অনুযায়ী এবার খেলা শুরু করতে না পারলেও, এখন কিন্তু তাদের মধ্যেই চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাচ্ছে। দল তিনটিই প্রায় সমান সমান। এর মধ্যে অবশ্য মোহনবাগান দল তাদের অপরাজিত আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়নি। পয়েন্ট নষ্ট এখন পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল ও কাষ্টমস দল একটি করে করেছে এবং মোহনবাগান দলের একমাত্র পরাজয়ে পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে দুটি। লীগের বড় ম্যাচগুলি এপর্য্যন্ত খেলা হয়নি। এই খেলাগুলির ফলাফলেই চ্যাম্পিয়ানশীপের মীমাংসা হবে।

এবার লীগে বাঙ্গালী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত প্রথম হকি লীগ বিজয়ী ভারতীয় দল গ্রীয়ার স্পোর্টিং তাদের সুন্দর ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলকে মুগ্ধ করেছে। লীগে প্রথম মহঃ স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে গ্রীয়ার দল বিস্ময়ের সৃষ্টি করে! অবশ্য যারা সেদিন খেলা দেখেছিলেন তারা মোটেই বিস্মিত হননি। সেদিনের খেলার পর থেকেই সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন যে জনপ্রিয় দল দুটিকে এই দলের কাছে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। কার্য্যক্ষেত্রে হোলও তাই। জনপ্রিয় মোহনবাগান দল তাদের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের নিয়েও অখ্যাত খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত গ্রীয়ার দলের কাছে প্রথম পরাজয়কে এড়াতে পারলো না। আর অপর জনপ্রিয় দল লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল প্রথমে গোল খেয়ে যাবার পর কোনক্রমে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে সমর্থ হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইষ্টবেঙ্গল—গ্রীয়ার দলের খেলায় উত্তেজনা এমনই চরমে ওঠে যে উভয় দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা তাদের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিকে দমন করতে পারেন না। যার ফলে মরশুমে প্রথম খেলার মাঠে একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই খেলায় মোহনবাগান দলের গ্রাউণ্ড সেক্রেটারী দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকেও আহত হতে হয়। মোহনবাগান দল এইরূপ ঘটনার প্রতিবাদ করে চ্যারিটি ম্যাচে ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে না খেলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মোহনবাগান দলের এই প্রতিবাদ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না, তবে এইটুকুই শুধু বলবো খেলোয়াড়দের চেয়ে খেলাই হোল বড়।

জাতীয় হকি

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারতীয় রেল ও পাঞ্জাব দল। প্রথম দিন খেলা অমীমাংসিত থাকার পর দ্বিতীয় দিন ভারতীয় রেলওয়ে দল পাঞ্জাব দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। এ বছরের প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নতি

দেখা গেল না। হকিতে ভারতের হারানো গৌরবকে উদ্ধার করতে হলে এখন থেকেই প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। এর জন্যে অবশ্য প্রয়োজন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও চেষ্টা। আশা করি ভারতীয় হকি ফেডারেশন এই বিষয়ে উঠে পড়ে লাগবে।

ফুটবল

কোলকাতায় ফুটবল মরশুম শুরু হবে যে মাসে, কিন্তু এখন থেকেই সেই নিয়ে নানান্ রকম জল্পনা-কল্পনা চলেছে। গত ১৫ই মার্চ ছিল ফুটবল খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের শেষ দিন। এ বছর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বেশী হয়নি। এর একটি কারণ বলা যায় জনপ্রিয় মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের দল ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের ছেড়মাসব্যাপী পূর্ব আফ্রিকা সফর শুরু করায় তাদের খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের সুযোগ হয়নি। এরই মধ্যে অবশ্য মোহনবাগানের দুজন তরুণ খেলোয়াড় সুনীল নন্দী ও সুকুমার সমাজপতি চলে এসেছেন জনপ্রিয় ইষ্টবেঙ্গল দলে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই দুজন খেলোয়াড় পূর্ব আফ্রিকা সফরে যাননি। ইষ্টবেঙ্গল দল থেকেও এবার অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড় চলে গেছেন। বিখ্যাত ফুটবল যাদুকর আমেদ খাঁ, বীরবাহাদুর ও কানাইয়ান যোগদান করেছেন মহঃ স্পোর্টিং-এ। রবীনগুহ ১৫ই মার্চ দল পরিবর্তনের শেষদিনে যখন আই. এফ. এ. অফিসে আসেন ছাড়পত্র স্বাক্ষর করবার জন্য, তখন অফিসের বাইরে অপেক্ষমান ক্রীড়ামোদীদের এক অংশ ইট পাথর সোডার বোতল প্রভৃতি ছুঁড়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে—যাকে খণ্ড যুদ্ধ বলা যায়। যার ফলে রবীন গুহ স্বাক্ষর না করেই চলে যান, পরে এক সময়ে লুকিয়ে তাঁকে আসতে হয়। প্রিয় দল থেকে খেলোয়াড় চলে গেলে মনে ব্যথা লাগা স্বাভাবিক। তবে জগতের রীতি হোল 'এক আসে আর যায়'। সেইজন্যে উপযুক্ত কাজ হোল খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের পরিচয় দেওয়া অর্থাৎ সব সহ্য করা। এই ধরণের ঘটনা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়, কারণ এতে নিজেদেরই তো বটেই, এমনকি ক্লাবের সুনামেও আঁচড় পড়ে। খেলার আসরের পবিত্রতা রক্ষা করার ভার ক্রীড়ামোদী, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা সকলেরই। একথা ভুলে গেলে আমাদের জাতীয় চরিত্রেরই হবে অবনতি। আশা করব ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনা আর ঘটবে না। খেলার মাঠের সুনাম ও ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

বৈজ্ঞানিক এডিসন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইন্‌ক্যানডেসেণ্ট ল্যাম্পের জন্যে একটা ফিলামেণ্ট উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন।

এক হাজার ন'শো নিরানব্বইটি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন চলেছে দ্বিসহস্রতম পরীক্ষা। ফলাফল জানার জন্যে সবাই উৎসুক।

এ পরীক্ষাটিও ব্যর্থ হোল।

অসীম ধৈর্যে এডিসন মন্তব্য করলেন, এর মানে হোল পৃথিবীতে এখন দু হাজারটা জিনিষ রয়েছে যাদের নিয়ে আমাদের আর চেষ্টা করতে হবে না।

কত সুবিধে বুঝুন। আমরা যেখানে কেবল ব্যর্থতা দেখছি তিনি সেখানে দেখছেন তার উল্টো পিঠ। আমাদের জীবনেও এমনি দেখা শিখতে হবে: সকল ক্ষতির উল্টো পিঠে লাভ বলে একটি বিষয়।

কাজ সুরু হোল, কত যে তরুণপ্রাণ নিঃশেষে আপনাকে বলি দিল এই সঙ্কট মুহূর্ত্তের তাগিদে তার ইয়ত্তা নেই। কতবার বর্ব্বর মানুষ ও বন্যজন্তুদের ঘোরাঘোরা তার ঘির হোল, ধাম উৎপাটিত হোল, যন্ত্রপাতি চূর্ণ হোল কিন্তু কর্ম্মীদের উৎসাহ বেড়েই গেল। বিপদকে তুচ্ছ করে, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে, নিদারুণ কষ্টকে উপেক্ষা করে তারা নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে চলল। বুকে তাদের বিগুণ উৎসাহ, তিলমাত্রও পিছিয়ে এল না তারা। জীবনমৃত্যুর ভয়াবহ সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দিগ্‌ভ্রান্ত, আতঙ্কে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েও বিগুণ উৎসাহে মরণপণ করে তারা এগিয়ে চলল। শীতের দারুণ প্রকোপ, গ্রীষ্মের দুঃসহ প্রচণ্ডতা, বর্ষার প্রবল আবির্ভাবেও তারা ভুলে গেল না তাদের কাজ। দিনের পর দিন মরণের সঙ্গে চলল তাদের পাল্লা,—শেষে একদিন ভয়মুক্ত হোল তাদের সাধনা,—আফ্রিকার অন্তঃস্থলে বিঘোষিত হোল তাদের মিলিত কণ্ঠে সাফল্যের আনন্দোচ্ছ্বাস।

যারা এই কাজে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের নাম হয়ত কেউ জানে না, কোন ইতিহাসের পাতায় তাদের সন্ধান মেলেনা,—কিন্তু আজ প্রতিমুহূর্ত্তে টেলিগ্রাফের তারে তাদের জয়ধ্বনি শোনা যায়। মৃত্যু কালজয়ীদের দল আজও উদাত্ত কণ্ঠে জগৎকে জানাচ্ছে—মানুষ কি না পারে!

শিল্পীদের উপর ভার পড়ল এমন এক নারীমূর্ত্তি পাথরে গড়তে হবে যার তুলনা জগতে কোথাও পাওয়া যাবে না।

তখনকার দিনের বিখ্যাত ভাস্করেরা উঠে-পড়ে লেগে গেলেন মূর্ত্তি গড়তে।

বিখ্যাত শিল্পী ফিডিয়াস্ তখন অসুস্থ। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন মনে মনে। হয়ত তিনিই একমাত্র পারেন গড়ে তুলতে এই নারীমূর্ত্তি।

তরুণ শিষ্য গুরুর মনের ব্যথা বুঝলেন। কিন্তু উপায় কি?

চারদিকে শিল্পীদের মধ্যে মহা উত্তেজনা। একবছর পরে প্রায় সকলেরই নারীমূর্ত্তি অপরূপ হয়েছে বলে সমালোচকেরা মত প্রকাশ করলেন। পুরস্কার দিতে হলে প্রায় প্রত্যেকেই দিতে হয়।

অসুস্থ ফিডিয়াস এ সব কথা শোনেন আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। হায়, যদি তাঁর বাটালি ধরবার শক্তি থাকত!

হঠাৎ একদিন সমালোচকের দল তাঁর দরজায় এসে হাজির।

ব্যাপার কি?—ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ফিডিয়াস্।

—আপনি এতদিন প্রকাশ করেন নি কেন? আপনার মূর্ত্তিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে কোথাও যে এর তুলনা নেই।

আমার গড়া মূর্ত্তি?—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন ফিডিয়াস।

হাঁ, মহাশয়, আপনারই,—আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী।

ফিডিয়াস্ সন্ধান নিয়ে জানলেন, তাঁর সেই তরুণ শিষ্যটিই এ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছে, আর গুরুর নামেই চালাতে চেয়েছে। লজ্জিত শিষ্যটিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, কিন্তু ভেনাস্‌ডি-মিলোর আজও তুলনা নেই।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ধারা অনুযায়ী গল্প-ভারতী পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবরণ।

১। প্রকাশের স্থান— ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা—৬

২। প্রকাশের সময়— মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম— শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ৩৩/এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬

৪। প্রকাশকের নাম— শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ৩৩/এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬

৫। সম্পাদকের নাম— শ্রীকালিদাস নাগ
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ১০৮, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা—২৬

৬। যে সকল অংশীদার মোট মূলধনের এক-শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—

৭। শ্রীনীলিমা রাণী রায়—৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
শ্রী ডি, দেবী—৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬
শ্রী এস, এল, রায়—৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আমি শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১।৩।৬১

স্বাক্ষর—শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী
প্রকাশক

বিশ্ব
ব্যঙ্গ
চিত্র

দি
ইউনাইটেড্ কমার্সিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

(১৯৪৩ সালে রেজিষ্টারি কৃত)

হেড অফিস : ২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১

অনুমোদিত মূলধন	—	৮,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও স্বীকৃত মূলধন	—	৪,০০,০০,০০০৲
সংগৃহীত মূলধন	—	২,০০,০০,০০০৲
সংরক্ষিত তহবিল	—	২,০৫,০০,০০০৲

শাখা সমূহ

ভারতে : সকল শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান নগর ও শহর

পাকিস্তানে : চট্টগ্রাম ও করাচী

ব্রহ্মদেশে : রেঙ্গুন, মৌলমিন, মান্দালয়

মালয়ে : পেনাং, কুয়ালা-লামপুর, ক্ল্যাং

সিঙ্গাপুর কলোনীতে : সেরাগণ রোড, সিঙ্গাপুর

যুক্তরাজ্যে : লণ্ডন

হংকং কলোনীতে : হংকং এবং কাউলুন।

এজেন্ট :—পৃথিবীর সর্ব্বত্র—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া

ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য্যাবলী :—

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ, অনুমোদিত জামিনের পরিবর্ত্তে ঋণদান দান, বিল খরিদ, ড্রাফ্‌ট দান ও তারে টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করে। আন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক শাখাসমূহ এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্ক সকলবিধ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনের সুযোগ দান করে।

জি. ডি. বিড়লা
চেয়ারম্যান

এস. টি. সদাশিবন
জেনারেল ম্যানেজার

॥ সাহিত্যের চির জয়যাত্রা ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
নবতম ও বৃহত্তম উপন্যাস

বেলাভূমি ৮৲

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
নবতম উপন্যাস

নিশ্চিন্তপুরের মানুষ ৫॥০

অদ্ভুতের নবতমা

মা য়া মা ধু রী ৫॥০

উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪॥০ | মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲ | বশীকরণ ৪॥০ | দুই তারা ২॥০

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের উপকণ্ঠে (২য় মুদ্রণ) ৯৲

মুন্সী (২য় মুদ্রণ) ৮॥০

গল্প-পঞ্চাশৎ ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বহ্নিবন্যা (৩য় মুদ্রণ) ৮॥০

গল্প-পঞ্চাশৎ ৯৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উত্তরায়ণ (৭ম মুদ্রণ) ৫॥০

অভিযান (৩য় মুদ্রণ) ৫॥০

ইমারৎ (২য় মুদ্রণ) ৩৲

প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক ১২॥০

৮১ জন লেখকের ১০২টি গদ্যরচনা-সংকলন—প্রমথনাথ বিশীর ২২০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাসহ

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস

(অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের ভূমিকাসহ)

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

বাঙ্গালা সাহিত্যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি প্রকাশিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র এবং অন্যান্য সকল লেখকের রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয় ও সার্থকতাসহ প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমালোচনার গ্রন্থ। "বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্নদিক লইয়া পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিয়া সাম্প্রতিককালে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীযুক্ত অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস' বইখানি তাহার মধ্যে একখানি উল্লেখযোগ্য বই।"—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত। মূল্য—আট টাকা

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি—হাসি খুসীর মেলা

সুপ্রসিদ্ধ কোলে বিস্কুটএর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক
আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১০

অঞ্জনা

ফেস পাউডার

ত্বকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে

অঞ্জনা প্রডাক্টস্ · কলিকাতা-৬

Pp/4/60

গ্রন্থশ্রী

সুবোধ ঘোষের সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস

যুক্তিপ্রিয়া ২·৫০

বারীন দাসের উপন্যাস

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা ৪·০০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কন্যামৃগয়া (২য় সংস্করণ) ৩·০০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠগল্প ৫·০০

সাতদিন ২·৫০

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের উপন্যাস

উপনদী ২·০০

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা—১২ ॥

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

কলরোলের কবি অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

আর একখানি আধুনিক কবিতার বই

সাগর-আকাশ

॥ দুটাকা ॥

লিরিকধর্মী কাব্য-উপন্যাস

মেঘপাহাড়ের গান

॥ দুটাকা ॥

॥ ডি, এম, লাইব্রেরী, কলকাতা—৬ ॥

শক্তি ও আনন্দ বর্ধনে

লর্ড এর

জেলি ভরা

লজেন্স ও টফি

জেমস্ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ

কলিকাতা-১

JL-4-58

॥ সদ্য-প্রকাশিত ॥

স্বনামধন্য কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

ছল অভিশাপগ্রস্তা
এক নাবন্যময়ী তরুণীর
বহুবিচিত্র অশ্রুসজল কাহিনী

রূপ হোল অভিশাপ

সাত টাকা

দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাবর্তনের
কথাশিল্পীর অবিস্মরণীয়
লিপিকুশলতার বাস্তব সৃষ্টি

নব সন্ন্যাস (৩য় মুঃ) ৭·০০ ॥ কদম ২·৫০ ॥ হাসি ও অশ্রু (সচিত্র) ৩·০০ ॥

প্রতিভাময়ী নবীনা লেখিকা প্রীতিকণা আদিত্যের উপন্যাসোপম ভ্রমণ-কাহিনী

কেদার-তুঙ্গ-বদরীনারায়ণে

॥ ২·৫০ ॥

॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর

ঝকেট (২য় মুঃ) ৩·৫০ ॥

চকাচকী ২·০০ ॥

অপরিচিতা (২য় মুঃ) ৩·০০ ॥

চিত্রগুপ্তের ফাইল (২য় মুঃ) ২·০০ ॥

নারায়ণ সান্যালের

বন্ধীক ৫·০০ ॥

মনামী ৪·০০ ॥

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত অভিনব গল্প-সঙ্কলন

শত বর্ষের শত গল্প ১৫·০০ ॥

ভবানীচরণ থেকে শুরু করে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত
শতাধিক বৎসরের একশত কথাশিল্পীদের নির্বাচিত গল্পের সঙ্কলন।

॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চাঁপাডাঙ্গার বউ (৪র্থ মুঃ) ২·৫০ ॥

বিচারক (৮ম মুঃ) ২·৫০ ॥

মনোজ বসুর

এক বিহঙ্গী (৩য় মুঃ) ৪·০০ ॥

কিংশুক (২য় মুঃ) ২·০০ ॥

নীলকণ্ঠের

অন্ত ও প্রত্যন্ত (২য় মুঃ) ৫·০০ ॥

হরেকরকমবা (২য় মুঃ) ২·৫০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা : বারো ॥

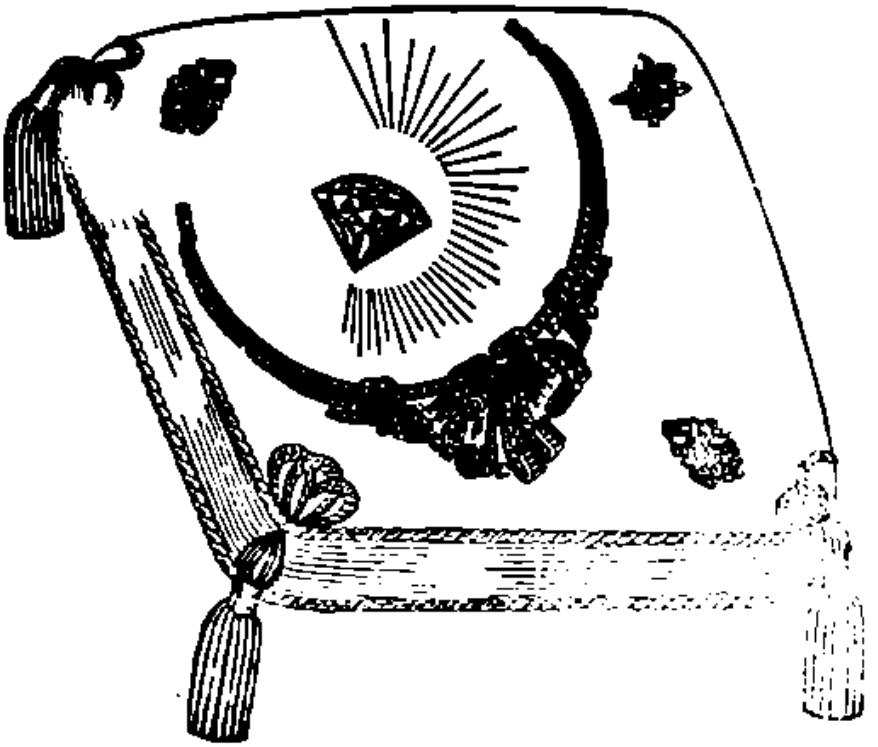

আধুনিকতম রুচির সর্ব্বপ্রকার স্বর্ণ-অলঙ্কার, মণি, মুক্তা, হীরা,
জহরত প্রভৃতির অপূর্ব্ব সম্ভার।
বিবাহ ও উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে উপহার দিবার
নানাপ্রকার অভিনব ও চিত্তাকর্ষক অলঙ্কার।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

স্থাপিত ১৮৮২

১-এ, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা।

ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ :—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন : ৪৭-১২৫৮

চ্যবনপ্রাশ

আজও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যৌষধি

শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের **চ্যবনপ্রাশ** বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

চ্যবনপ্রাশ সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস কাস স্বরভঙ্গ এমনকি দুরারোগ্য ক্ষয়-রোগেও বিশেষ ফলপ্রদ। যে সমস্ত শিশুদের দেহ ক্ষীণ, (Rickety) চ্যবনপ্রাশ তাদের পরম বন্ধু। হৃদ্‌রোগ, দুর্ব্বলতা, রক্তপিত্ত ও ধাতুঘটিত রোগে ইহা মন্ত্রের মত কাজ করে। শক্তিহীন ক্ষীণাঙ্গ ও জরাগ্রস্ত লোকের পক্ষে ইহা অমৃত তুল্য রসায়ন। চ্যবনপ্রাশ সুস্থ শরীরে সেবন করিলে বল, বীর্য, মেধা, কান্তি, বৃদ্ধি হয়। ইহা পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই সকল ঋতুতে সমান উপযোগী।

বহু প্রশংসাপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি—

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলেন :— শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়াছি। ঔষধটি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুযায়ী যত্নসহকারে প্রস্তুত করা হইয়াছে জানিয়াছি।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :— শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ইতিমধ্যেই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বাজারে সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয় বলেন :— শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে আমি বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর কালিদাস নাগ এম, এ ; ডি লিট বলেন :— শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, (কলি) ডি, লিট, (লণ্ডন) বলেন :— শ্রীআয়ুর্বেদম কর্তৃক প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলেন :— বাজারে প্রচলিত চ্যবনপ্রাশ অপেক্ষা শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

ডক্টর ভামকীবল্লভ ভট্টাচার্য এম, এ, পি এইচ্‌ ডি বলেন :— শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ আমার পরিবারের মধ্যে অনেকে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন :— শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ আমি ব্যবহার করিয়াছি। ইহার কার্য-কারিতা প্রশংসনীয়।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, পি এইচ্‌ ডি বলেন :— শ্রীআয়ুর্বেদম প্রতিষ্ঠানের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিলাম। ইহা ব্যবহার করিয়া সর্দি কাসির উপকার হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ মহাশয় বলেন :— "শ্রীআয়ুর্বেদম" নামক প্রতিষ্ঠান হইতে শাস্ত্রোক্ত উপাদানে বিশুদ্ধ ভাবে প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

মূল্য : প্রতিসের—১৮৲ একপোয়া শিশি—৯৲ অর্দ্ধপোয়া শিশি—৫৲
এক ছটাক শিশি—১৲ • ডি. পি. খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীআয়ুর্ব্বেদম

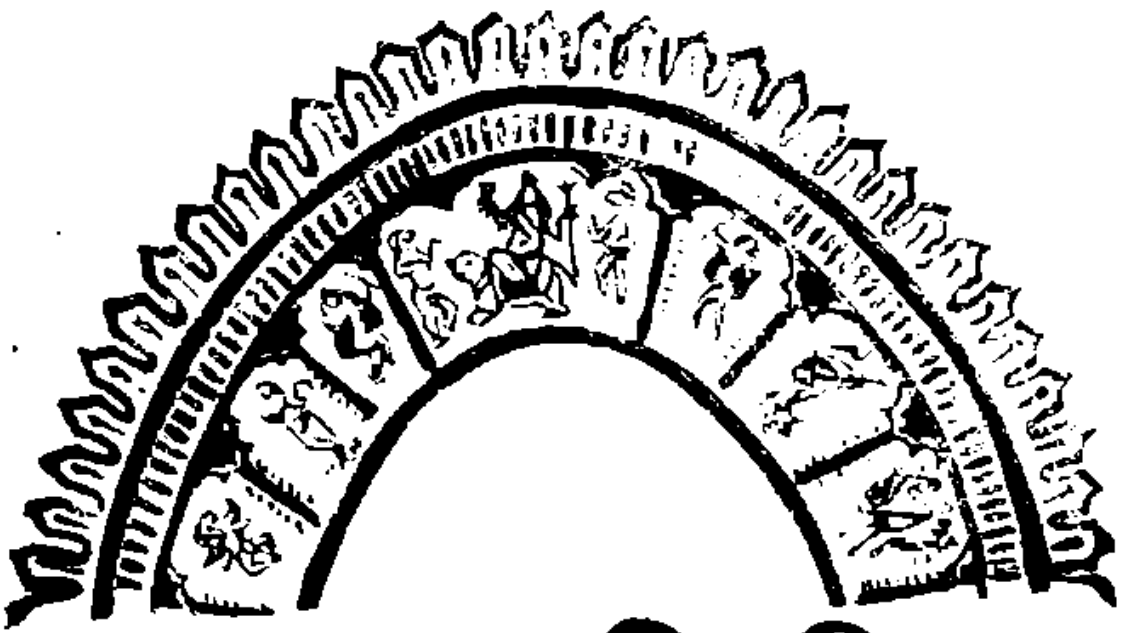

" বাংলার চিত্রশিল্প "

Some Press Opinions

The Bengalee

September 14, 1904.

"A Bengali Artist.—Babu Bama Pada Banerjea, some of whose portraits and paintings have been most deservedly praised by Indians and Anglo-Indians alike has just put on the market a pair of excellent oleographs, the subjects being taken from Hindu Mythology, at a price which competes favourably with similar foreign productions. One is Radha's ordeal and the other Durbasa's wrath against Sakuntala. They are second twins produced by Bama Pada Babu, in the shape of oleographs, the first pair being "Uttara and Abhimanyu" and "Arjun and Urbashi" which, year before last, were so highly appreciated by the entire Hindu public. The artist has left nothing to desire for in the picture before us, which would well adorn the walls of any drawing room in Hindu India. We can scarcely think of better presents to friends and relatives at the approaching Pujahs than this pair of truly excellent paintings."

The Bande Mataram

17th March, 1908.

We are glad to note that the pictures of Santanu and Gunga and Kaikeyee and Manthara, done from the original paintings of Sjt. Bamapada Benerji, the well-known Calcutta artist, are really fine productions of art. They reflect genuine credit to Srijut Banerje's skill. The painter certainly deserves public encouragement and patronage.

AMRITA BAZAR PATRIKA LTD.
2, Ananda Chatterjee Lane,
Calcutta the 11th January, 1918

Telephone No. 2678

Dear Raja Bahadur,

Babu Bamapada Banerje is a famous painter of Calcutta. A printed copy of his testimonials, sent herewith, will show how highly have Maharajas Rajas, high officials and our leading men spoken about his great artistic talents. He needs support. Indeed every Indian who can afford should avail himself of his divine gift. I shall feel very much obliged if you can see your way to utilize his services.

Yours faithfully,
Moti Lal Ghose.

রামাপদবাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার জননীর তৈলচিত্র অঙ্কন করেন। পারিশ্রমিকের কথা উঠিলে শিল্পী বিনীতভাবে বলেন, 'দেখুন, আপনার কাছ থেকে এর জন্য কোন পারিশ্রমিক নিতে আমার বিবেকে বাধে।' ইহার কিছুদিন পরে কাশীরের সুপরিচিত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একজোড়া সুন্দর আলোয়ান পাঠান। আলোয়ান জোড়াটি তিনি রামাপদ বাবুর গায়ে পরাইয়া দিয়া হঠাৎ বলেন 'দেখ ত, তোমাকে টোগা (Toga) পরিহিত রোমানের মত কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, চমৎকার মানিয়েছে। এ জিনিষ তোমাকেই সাজে। আমার মত বেঁটে মানুষকে কি এ সব মানায়? এটা তোমার গায়েই থাক, কেমন?' এই প্রশ্নের দান প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা শিল্পীর ছিল না। তিনি ভাবেন ইহাই প্রকারান্তরে তাঁহার চিত্রাঙ্কনের পারিশ্রমিক।

তখনকার দিনে চিত্রশিল্পের প্রথম বিকাশ দেখা যায় কালীঘাটের পট, কৃষ্ণলীলার পট, জগন্নাথদেব, রামরাজা, সৌর, নিতাই প্রভৃতি পটের মধ্যে। এইসব পৌরাণিক ছবির কাটতিও যথেষ্ট, দামেও সস্তা কিন্তু স্বদেশে ইহার মর্যাদা তেমন ছিল না। যাঁহারা বেশ অবস্থাপন্ন ও সৌখীন তাঁহারা পরপাপন্ন হইতেন বিদেশীর। আবার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিদেশী ছবি তাঁহাদের গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত, আর্টের দিক দিয়া তাহাদের কতকটা মর্যাদা থাকিলেও রুচির দিক দিয়া একেবারে বিকৃত। রামাপদবাবু দেশের সে অভাব দূর করেন। তিনি যখন বিলাত হইতে প্রথম পৌরাণিক ছবি ছাপাইয়া আনেন, তখন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে পূর্ববর্ণিত ঐসকল পট শ্রেণীর ছবি ছাপাইয়া আনিবার পরামর্শ দেন। এই ছবির প্রচলন এখন খুব, আদর ও বেশ এবং অর্থাগমও প্রচুর। শিল্পী কিন্তু জবাব দেন 'আর্টের আদর্শকে ক্ষুন্ন করে, কেবলমাত্র অর্থাগমের ভিত্তির উপর যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত তার নাম 'Prostitution of Art.'' একজন বিদেশী অমর কবি বলে গেছেন "Blessed be the art that can immortalise" শিল্পের আদর্শ অতি মহান, এর বিকৃতি ঘটিলে সমাজ ও জাতির উৎকর্ষ ক্ষুন্ন হয়।

নিজের ব্যবসায়ের দিক দিয়াও রামাচরণবাবুর উদারতা ও বদান্যতা ছিল যথেষ্ট। হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার বেলচেম্বার সাহেবের প্রতিকৃতি অঙ্কনের পর সাহেবের অফিসের এক কেরাণী একদিন একখানি ফটো লইয়া তাঁহার কাছে আসেন। দু'একটি কথাবার্ত্তার পর তিনি এক করুণ আবেদন জানান—'আমি আপনার নাম শুনে ও সাহেবের ছবি দেখে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। দেখুন মাস তিনেক হল আমার সাধ্বী স্ত্রী দু'টী অপগণ্ড সন্তান রেখে স্বর্গারোহণ করেছেন। আমার বিশেষ ইচ্ছা, তাঁর একটা স্মৃতি সম্বল করে শেষ জীবনটা কাটাই। আপনি যদি দয়া ক'রে এই ফটোখানি থেকে একটি তৈলচিত্র প্রস্তুত করে দেন, তাহলে চিরঋণী ও অনুগৃহীত হয়ে থাকি। ছেলেরাও বড় হয়ে তাদের সতীর মাতৃমূর্তি দেখতে পায়। গরীব গেরস্থ আমি, মাসে মাত্র একশটি টাকা বেতন পাই। আপনার মর্যাদা দেবার মত অর্থ আমার নেই। মাফ করবেন, বলতে লজ্জিত হচ্ছি মাত্র একটি মাসের বেতন আমি আপনার চরণে প্রণামী হিসাবে দিতে পারি। এতে আমার সংসারের যত কষ্টই হোক।'—শিল্পী সেই কেরাণী ভদ্রলোকের আদর্শ পত্নীপ্রেম ও আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। ভদ্রলোকের চক্ষে তখন জল। শিল্পীর মনও বিগলিত হয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ছবি আমি আপনাকে বিনা পারিশ্রমিকেই করে দেব, আর সেটি উপহার দেব আপনার মাতৃহারা স্নেহের দুলালদের। ভদ্রলোকের তখনকার অবস্থা বর্ণনাতীত।

কামরূপ কামাখ্যা হতে একদিন সৌম্যমূর্ত্তি এক তান্ত্রিক সাধু নগ্নপদে শিল্পীর নিকট আসিয়া হাজির। সামান্য পরিচয়ের পর সাধু বলেন, 'আমি বহু চিত্রশিল্পীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষে আপনার আশ্রয়ে এসেছি। আপনি আমার ইহকাল পরকাল রক্ষা করুন।' শিল্পী প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারেন না, জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। সাধু পুনরায় বলেন, 'স্বপ্নে আমি আমার ইষ্টদেবীর এক অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন করেছি। কিন্তু কি দুর্দৈব যখনই জপে বসি কিছুতেই সে মূর্ত্তি ধ্যানে আনতে পারিনা। কি হবে মালিক, আমার ধর্ম-কর্ম সব যে যায়!' 'বেশ আমি কি করতে পারি

বলুন!' রামাপদ বাবু উত্তর করেন। সাধু বলেন, 'আপনি যদি দয়া করে আমার বর্ণনা মত আমার ইষ্টদেবীর একটি ছবি প্রস্তুত করে দেন তাহলে আমার ইষ্ট লাভ হয়, আমার ইহকাল পরকাল রক্ষা হয়। আমি সন্ন্যাসী নিঃসম্বল, কপর্দকহীন কাজেই মূল্য দেবার কোন ক্ষমতা আমার নেই। বিনিময়ে শুধু আমি জানাব আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আর কায়-মন-বাক্যে আমার ইষ্টদেবীর কাছে জানাব আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল ও অপার বশ ঐশ্বর্য।' সাধুর অবস্থা দেখিয়া রামাপদবাবু রাজি না হইয়া পারেন না। কয়েকদিন পরে চিত্রখানি লইতে আসিয়া সাধু আনন্দে আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিয়া উঠেন, 'মরি-মরি, এইতো আমার সেই!' শিল্পীও যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কবি নিজের কল্পনার দ্বারা কাগজে কলমে নিজের ভাবধারা বর্ণনা করেন। চিত্রশিল্পী তুলির আঁচড়ে সেই সমস্ত প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন। কিন্তু অন্তের মনোদেশে প্রাপ্ত কল্পিত ইষ্টমূর্তির জীবন্ত আলেখ্য, একমাত্র ভগবৎ প্রেরণা ছাড়া কোন শিল্পীর পক্ষে রচনা করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

বঙ্কিমবাবুর তৈলচিত্র সর্বপ্রথম রামাপদবাবু অঙ্কিত করেন। এখন যে সমস্ত আলোকচিত্র দেখা যায় তাহার প্রায় অধিকাংশই এই শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র হইতে গৃহীত। বঙ্কিম বাবুর বাসভবনে যখন তাঁহার প্রথম চিত্রখানি সমাপ্তির পথে, তখন একদিন তাঁহার বৈবাহিক দীনেশের মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাড়ীতে আসেন। সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিবার সময় ছবিখানির কিয়দংশ তাঁহার নজরে পড়ায় তিনি বলিয়া উঠেন 'এমন অসময়ে দড়া-চূড়া পরে আবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে!' পরে অবশ্য ঘরে ঢুকিয়া তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন।

শিল্পীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্বন্ধে একটি ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার গ্রিফিথ সাহেব ছিলেন একজন দক্ষ শিকারী। একবার এক পতীর জঙ্গলে শিকারে গিয়া তাঁহার একটি চক্ষু হারান। রাণীগঞ্জ সিয়ারসোলের কুমার প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুরের রাজভবনে এক ভোজ সভায় সাহেবের সহিত শিল্পীর পরিচয় ঘটে। চিত্রশিল্পে সাহেবের ছিল প্রবল অনুরাগ। ঐসম্বন্ধে বিশেষ আলাপ আলোচনার পর সাহেব তাঁহাকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে রামাপদবাবু তাঁহার চিত্র অঙ্কনের অভিপ্রায় জানাইলে সাহেব বলেন 'মিঃ বানার্জি এবিষয়ে আমার যথেষ্ট আগ্রহ, কিন্তু ভগবান আমায় একচক্ষুহীন করে আমার সব আশা নির্মূল করেছেন!' কিছুক্ষণ চিন্তার পর রামাপদবাবু জবাব দেন 'আচ্ছা সাহেব, আপনি জানেন, শিকারী যখন একদৃষ্টে শিকারের প্রতি লক্ষ্য করেন তখন তাঁহের একটি চোখ সাধারণত বন্ধ রাখতে হয়। এই পরিবেশে যদি আপনার ছবি আঁকা যায় তাহলে আপনার এই আংশিক ত্রুটি সাধারণের চক্ষে ধরা পড়ে না, অথচ আসল উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়, এতে আপনার আপত্তি কি?' এ প্রস্তাব সাহেবের বেশ মনোমত হয়, তিনি আনন্দের সহিত সম্মতি দেন। পৌরাণিক ভারতের যেসকল চিত্র শিল্পী রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রং তুলিতে আঁকিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। আমাদের অতীত ভারতের চিত্র সংস্কৃতি রামাপদবাবুর শিল্পায়নে আজও বাঁচিয়া।

রাণী এলিজাবেথের পাঁচটি বাস ভবন

ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর পাঁচটি বাসভবন হল— বাকিংহাম প্রাসাদ, উইণ্ডসর ক্যাসল, হলিরুডহাউস প্রাসাদ, বালমোরাল ও সান্ড্রিংহাম।

লণ্ডনের বাকিংহাম প্রাসাদ, উইণ্ডসর ক্যাসল, ও এডিনবরার হলিরুডহাউস, সেখানে স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী একসময় বাস করতেন. এই তিনটি ভবন হল রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও ডিউক অব এডিনবরার সরকারী বাসভবন। অন্য দুটি ভবন—স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত এবার্ডিনশায়ারে অবস্থিত বালমোরাল ক্যাসল এবং সান্ড্রিংহাম—হল রাণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখানে রাণী ও ডিউক প্রতি বৎসর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে অবসর যাপন করে থাকেন।

সফরে বের হতে না হলে রাণী সাধারণতঃ বড়দিনের সময় সান্ড্রিংহামে স্বামী এবং পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে এসে থাকেন। এসকট সপ্তাহে রাণী থাকেন উইণ্ডসরে এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে বালমোরালে।

রাণী ও ডিউক অব এডিনবরা প্রিন্স অব ওয়েলস, রাজকুমারী অ্যান ও অ্যাণ্ড্রুকে নিয়ে বড়দিন আরম্ভ হবার তিন কি চার দিন পূর্বে সান্ড্রিংহামে এসে পৌঁছান এবং সেখানে জানুয়ারী মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাস করেন; রাণী লণ্ডনে ফিরে এসে ইস্টার পর্যন্ত বাকিংহাম প্রাসাদে অবস্থান করেন। ইস্টার তিনি অতিবাহিত করেন উইণ্ডসর ক্যাসলে। উইণ্ডসর গত ৮৫০ বছর ধরে ইংলণ্ডের রাজা এবং রাণীদের বাসভবন হয়ে আছে. এটি প্রাচীন কালের দুর্গ বলতে যা বোঝায় সেই ধরণের একটি দুর্গ। এর ধূসর প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর, সমুন্নত টাওয়ার এবং বিরাটকায় তোরণগুলি স্বভাবতই মানুষের মনকে নাড়া দেয়।

সেণ্ট জর্জেস চ্যাপেলটি স্থাপত্যের গথিক রীতির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত. এটি রাজাদের সমাধি মন্দির, ষষ্ঠ হেনরী, প্রথম চার্লস, তৃতীয় জর্জ, চতুর্থ উইলিয়াম, সপ্তম এডওয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ এবং ষষ্ঠ জর্জের সমাধি এখানে আছে।

রাণী ও ডিউক ইস্টারের সময় প্রায় এক মাস উইণ্ডসরে অতিবাহিত করেন। জুন মাসে এসকট সপ্তাহে তাঁরা সেখানে আবার ফিরে আসেন; এই সপ্তাহটি হল ঘোড়দৌড়ের সপ্তাহ, বহু অতিথি এই সময় ক্যাসলে এসে সামরিক ভাবে বাস করেন।

ইস্টারের শেষে উইণ্ডসর থেকে ফিরে রাণী ও ডিউক যে পর্যন্ত লণ্ডনে অবস্থান করেন, মে মাসে তাঁরা জুইট্‌সান উপলক্ষে চিরাচরিত প্রথায় বালমোরালে চলে যান। সেখানে তাঁরা প্রায় দশদিন থাকেন কিন্তু আগষ্টের প্রথম সপ্তাহের শেষে রাণী ও ডিউক গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগের জন্য বালমোরালে চলে আসেন। বালমোরাল প্রাসাদটি শ্বেত-প্রস্তরের; এটি ডী নদীর তীরে একটি মনোরম পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। সেপ্টেম্বর মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি এখানে থাকেন।

রাণী স্কটল্যাণ্ডে হলিরুডহাউস থেকে তাঁর সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন।

বাকিংহাম প্রাসাদটি ম্যালের ঠিক সামনেই অবস্থিত; এখান থেকে দেখা যায় এডমিরলটি আর্চ ও ট্রাফালগার স্কোয়ার। ব্রিটেন সফরকারীদের কাছে এই প্রাসাদটির আকর্ষণ খুব বেশি, প্রতিদিন শত শত লোকিন ফটোগ্রাফার এখানে ভিড় করছেন প্রাসাদটির চিত্র গ্রহণের জন্য। ১৮১৯ সালে ন্যাশ চতুর্থ জর্জের জন্য এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন, তারপর ১৮ বৎসর বয়সে রাণী ভিক্টোরিয়া প্রথম তা নিজের বাসের জন্য গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে আজ পর্যন্ত তা রাজা ও রাণীর প্রধান বাসভবন হয়ে আছে। বাকিংহাম প্রাসাদে রাণী বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এটি ব্রিটেনের সর্ববৃহৎ বাসভবন। এর কামরা সংখ্যা প্রায় ৬০০।

CALCUTTA

ষোড়শ বর্ষ | চৈত্র

দশম সংখ্যা | ১৩৬৭

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাণী রাসমণি

এ বছরের প্রথম দিনে "কল্পতরু" উৎসবে সভাপতিত্ব করতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের সেবাইৎ রাণী রাসমণির বংশধরগণ। তাঁর অমরকীর্তি মন্দিরগুলি ঘিরে অগণ্য নর-নারী ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ সেদিন সমবেত হন; স্থান মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে যে ক'টি কথা বলেছিলাম সংক্ষেপে জানাই।

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ সালে রাণী রাসমণি স্বর্গারোহণ করেন। তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষেই যেন সেই বিরাট জনতা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মিলেছিল। মৃত্যুর একদিন আগে তিনি তাঁর "দানপত্র" সই করে যান যার ফলে দানধ্যানাদি শতাব্দী ধরে চলছে ও বহু অনাথ আতুর মন্দিরে খেতে পায়।

১৭৯৩ সালে রাসমণি ভক্ত রামপ্রসাদের সাধনপীঠ হালিসহরের কাছে একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাতৃহারা কন্যাকে পিতা হরেকৃষ্ণ দাস "রাণী" বলে ডাকতেন; কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন-নি যে জানবাজারের বিখ্যাত জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর কন্যার ১১ বছর বয়সে (১৮০৪) বিবাহ হবে। সেই বিবাহ সভায়—শোনা যায়—রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি আসেন। ১৮৩৬ সালে রাজচন্দ্রের মৃত্যু হয় ও প্রায় ২৫ বৎসর রাণী রাসমণি আদর্শ হিন্দু বিধবার মত ব্রত নিয়মাদি পালন ও জমিদারীর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। ১৮৫৫ সালে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ১৮৫৬ সালে "ভবতারিণীর" পূজারী রূপে রাসমণিই শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে আনেন। তাঁর জামাতা মথুরবাবু (কথামৃত দ্রষ্টব্য) ২০ বছরের পূজারী ছোট-ঠাকুরের অক্লান্ত সেবা করে গেছেন।

রাসমণির দেহত্যাগের সময় (১৮৬১) শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ২৫ বছর; তারপর আরো ২৫ বছর তাঁর সাধনের বিচিত্র কাহিনী সংকলিত হয়েছে ও ক্রমশ হবে। তারই আভাষ সেদিন দক্ষিণেশ্বরে দিয়েছিলাম

ও সাথী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথক-প্রবর কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। তিনি জানেন যে ১৯২১-২২ সাল থেকে প্যারিসে আদি মনীষী রমাঁ রঁলার (Romain Rolland) সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী রচনায় সাহায্য করি। বিবেকানন্দ শতাব্দী উৎসব (১৯৬২-৬৩) আগত প্রায়; সেই উপলক্ষে, বাঙালীর তীর্থ দক্ষিণেশ্বরে যে সব নরনারী গিয়েছেন (১৮৬৪-১৯৬১) বিশেষ শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান পর্যন্ত (১৮৮৬) তাদের কাহিনীও শীঘ্র প্রকাশ করা উচিত। তাঁদের সর্বাগ্রে থাকতেন 'রাণী রাসমণি' একথা তাঁর অছি—(Trustee)-দের ও তাঁর দেশবাসীদের আজ স্মরণ করালাম, যেমন ১লা জানুয়ারী "কল্পতরু উৎসবে" সবাইকে সেদিন মনে করিয়েছিলাম। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে যে মহীয়সী নারী শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে আমন্ত্রণ করেন ও যাঁর বদান্যতায় আজ অবধি অগণ্য নরনারী, রাণী রাসমণির আতিথ্যে তৃপ্ত হয়েছেন সেই রাণী রাসমণিকে সর্বাগ্রে স্মরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁর—চিত্র সমেত একটি নির্ভরযোগ্য জীবনীও প্রকাশ করে বিতরণ করা উচিত। স্বাধীন ভারতের নারীজাতি এই মহাসেবিকার জীবনী পাঠে প্রেরণা পাবে। বাংলা থেকে শ্রীক্ষেত্র যাত্রার পথ,যেমন রাণী অহল্যাবাঈ করে দিয়েছিলেন তেমনি রাণী রাসমণিও আর এক মহাতীর্থক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে অমর হয়ে গেছেন।

ঋষি বঙ্কিম তিরোধান তিথি

অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কবলে যখন আছি তখন বন্ধুবর অমিয় কুমার মজুমদার (অধ্যক্ষ: হুগলী কলেজ) ফোন করলেন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভাষণ দেবার জন্য হুগলীতে হাজির হতে। অপারগ বলে অনুশোচনা করেই মনে পড়ল—এই রবিবার ২৬শে চৈত্র ১৩০০ কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের গুরু বঙ্কিম-চন্দ্রের নির্ব্বাণ তিথি। রবীন্দ্রনাথের গলায় নিজের মালা তিনি পরিয়ে দিয়েছিলেন মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে। সেই বঙ্কিম 'স্বর্গ হতে বিদায়' নিয়ে রবীন্দ্র শতাব্দী স্মরণে কণতরে যদি এই বাংলায় আসতেন! ১৪০০ সালের পাঠক পাঠিকাদের স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ 'আজি হতে শত বর্ষ পরে' যে কবিতা লিখেছেন তারই এক অপূর্ব্ব রূপান্তর হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছেই পেতাম; কিন্তু এ যেন চৈত্র মাসে "আষাঢ়ে স্বপ্ন"!

তবু রবীন্দ্র শতাব্দী উৎসবে আজ বঙ্কিমচন্দ্রকে বারবার মনে পড়ছে; কারণ, 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রে সুর-সংযোগ করে বিভন-উদ্যান কংগ্রেস মণ্ডপেই গেয়েছিলেন একাই রবীন্দ্রনাথ! তাঁর "বাল্মীকি প্রতিভা"র (১৮৮১) অভিনয় স্বচক্ষে দেখে 'বঙ্গদর্শনে' সার্থক আলোচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাও আমরা ভুলেছি; অথচ সেই তুলনামূলক সমালোচনা তাঁরই সেরা, পণ্ডিত হরপ্রসাদের "বাল্মিকীর জয়" গদ্যকাব্য রচনা উপলক্ষে।

'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) (যার নাট্যরূপ দেন ১৯০৮ সালে "প্রায়শ্চিত্তে") "বঙ্কিমী রীতি"তে রবীন্দ্র রচনা। সেইরূপ বঙ্কিমের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস "রাজসিংহে" পড়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আলোচনা করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে মুখ্য এই দুই মহারথী, শেষ জীবনে কেন সহজ বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে গেয়েছিলেন? বঙ্কিমের "বিজ্ঞান রহস্য" (১৮৭২-৭৫) ও রবীন্দ্রনাথের "বিশ্ব-পরিচয়" (১৯০৪-০৫) দুখানি গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা কেন আজও সুরু হয়নি? "অনুশীলন" তথা 'শান্তিনিকেতন' ভাবধে, জাতীয় চরিত্র

ও শিক্ষার উৎকর্ষ কিভাবে দুই মহামানব দেখিয়ে গেছেন—সেগুলিও বুঝিয়ে দেবার সময় হয়েছে। ২৬শে চৈত্র ১৩০০—প্রত্যেক বাঙ্গালীর স্মরণীয়—গত বছর 'গল্প-ভারতী'তে সে কথা লিখেছিলাম এবারও স্মরণ করালাম। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ স্মারক-প্রবন্ধ "বঙ্কিমচন্দ্র" লিখে গেছেন—তা' থেকে স্কুলের ও কলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি করান উচিত। রবীন্দ্রনাথের শেষ সঙ্কটময় পীড়া দেখা দেয় ১৯৩৮ সালে। তখন আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বঙ্কিমবাবুর শতবার্ষিকীর জন্য প্রস্তুত হই; কপালকুণ্ডলার জন্মস্থান মেদিনীপুরের সমুদ্রতীর ও "বালিয়াড়ী"তে সেদিন বঙ্কিম-শতাব্দী উৎসব করেছিলাম মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে, রবীন্দ্র শতাব্দী ভাষণে সেকথা বলেছি। কাপালিকের যুগ থেকে বর্তমান প্রগতির দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি এই দুই অমর সাহিত্যিকেরই আশীর্বাদে, একথা প্রত্যহ যেন আমরা স্মরণ করি। কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষের তথা আনন্দমঠের ইংরেজী অনুবাদও নূতন চোখে আমাদের পড়া উচিত ও সেই সঙ্গে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস Rajmohan's Wife (প্রবাসী প্রেস) এর বাংলা অনুবাদ করাও আশু কর্তব্য।

আধুনিক নাটক ও নাট্যকার

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাট্যামোদিনী শ্রীমতী Rosamond Gilder কলিকাতা U. S. I. S. প্রেক্ষাগৃহে ভাষণ দিলেন। ১৯৫৬তে তিনি প্রথম ভারতে আসেন ও বোম্বাই ও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ ও মনীষী শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখে যান। সভাপতিরূপে সেদিন তাকে দুঃখের সঙ্গে আমি জানাই যে বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ Actor-dramatist—গিরীশ ঘোষ থেকে অমৃত বসু সবাই পরলোকে। অমৃত বসু ৬২ বছরের প্রবীণ বুধা রবীন্দ্রনাথের "জয়সিংহে" ভূমিকায় অভিনয় দেখে ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। তাঁদের ধারা অনুসরণ করে, কম বয়সেই ছেড়ে গেছেন নটশ্রেষ্ঠ শিশির ভাদুড়ী, তুলসী লাহিড়ী ও বন্ধুবর শচীন সেনগুপ্ত। এঁদের অভিনয়, নাট্যরচনা এবং বিশ্লেষণ-ক্ষমতা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। Moscow ও Leningrad-শিল্পীদের নাট্য-প্রযোজনা এবার দেখে এসেই শচীনবাবুর সঙ্গে আমি আলোচনা করি, তার কিছু স্বাক্ষ্য বহন করছে 'গল্প-ভারতী'—নাট্য পরিচ্ছেদ। কিন্তু এত শীঘ্র শচীনবাবুকে আমরা হারাবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তিনি সাহিত্যিক ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক ছিলেন বলেই যুদ্ধোত্তর যুগের নাট্যসাহিত্য ও "প্রয়োগ-বিজ্ঞান" বিষয়ে বহু মূল্যবান কাহিনী আমাদের দিয়ে গেছেন; সে সব সংগ্রহ করে একটি বই শীঘ্র ছাপান দরকার। তেমনই আশু প্রকাশ করা প্রয়োজন শিশির ভাদুড়ীর বিচিত্র ভূমিকা ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের সঠিক বিবরণী। তাঁর আগে, দানীবাবু (গিরীশ ঘোষের উপযুক্ত পুত্র) ও অর্দ্ধেন্দু মুস্তফীর মত শিল্পীদের বিষয়েও কিছু লেখা হয়নি বলেই তাঁদের আজ আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। অথচ প্রবীণ সাহিত্যিক বিপিনচন্দ্র পাল তারাসুন্দরীর অভিনয় নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে প্রবন্ধ লিখে গেছেন। অমর দত্ত (পণ্ডিত হীরেন দত্তের ভ্রাতা) অভিনেতারূপে খুব নাম করেছিলেন ও রঙ্গমঞ্চের প্রদার বিষয়ে পত্রিকাদিও প্রকাশ করে গেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিজ্ঞ সম্পাদক ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী তাঁর নটগুরু পিতার নামে একটি নাট্য - গ্রন্থাগার স্থাপন করে যান; কিন্তু তাঁর সংগ্রহটি কোথায়? সেগুলি অবলম্বন করে—শিশির-প্রতিভার ঐকান্তিক সমঝদার বন্ধু অমল মিত্রকে অনুরোধ করি, "নাট্যসাহিত্যে ও শিল্পে বাঙালীর স্থান" এ বিষয়ে শীঘ্র একখানি গ্রন্থ

বাংলায় ও ইংরেজীতে প্রকাশ করুন; তবেই এক্ষেত্রে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ অবদান স্বীকৃত হবে এবং বিদেশী গুণীমহলেও প্রচার হবে। সুধীজনের হাতে দেবার মত একখানি বইও আজ মনে পড়ে না। অথচ সারা ভারতে যত নাট্যরচনা ও প্রয়োগ হয়েছে একা বাঙালী তার চেয়ে হয়ত বেশী করেছে। শচীন সেনগুপ্তের অকালমৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে—তাঁর পরিজনদের আমার সমবেদনা জানিয়ে—তাঁর উদ্দেশে এই স্মারক-গ্রন্থের পরিকল্পনা আজ প্রকাশ করলাম। আশাকরি নাট্যামোদীবর্গের সাহচর্য্য এক্ষেত্রে আমরা পাব। Voltaire প্রায় দুই শতাব্দী আগে বলে গেছেন মোটা মোটা কেতাবে যে কাজ ও যে শিক্ষা হয়না তার চেয়ে বড় কাজ হবে ছোট ছোট নাট্য রচনায়; ফরাসী বিপ্লবের আগেই দেখি নাট্য-সাহিত্যের বিপ্লব: Marriage de Figero ও "Seville এর নাপিত" রচয়িতা বোমার্শে (Beaumarchais) সবাইকে আজ স্মরণ করি। শ্রীযুতী Gilderকে স্মরণ করাই যে, প্রায় শতবর্ষাধিক কাল আগে এই কলিকাতার শাদা-কালো নাটুকেদের মধ্যে বৈকুণ্ঠচরণ আঢ্য সাহেব-বিবিদের সঙ্গে সমমর্য্যাদায় "Othello" নাম ভূমিকায় অভিনয় করে চমৎকৃত করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন ত আমাদের আদি "নাট্যকার" এবং কলিকাতায় Shakespeare Society ও বহুকাল ধরে চলেছিল। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ কবিতা (বলাকা দ্রষ্টব্য) লিখে সেক্সপীয়ারের ৩০০ মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ করেন; এবার বাঙালীদের তাই বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে হবে ১৯৬৪ সালের আগেই Shakespeare (১৫৬৪-১৯৬৪) ৪০০ জন্মশতাব্দী পালন করতে তাঁর কিছু নাটক অনুবাদ হলেও বহু বাকী আছে বাংলা ভাষায় রূপান্তর ও অভিনয় করতে।

আজ অনুভব করছি, নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এক-একটি নূতন নূতন যুগ এসেছে বৃহত্তের দিকে, মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদ্ঘাটন করে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না।

তার সভ্যতা এই যে, সকলের যোগে সে বড়ো হয়, সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা; এই হল মানুষের ধর্ম্ম। যেখানে এই সত্যকে মানুষ স্বীকার করে সেখানেই মানুষের সভ্যতা। যে সত্য মানুষকে একত্র করে, বিচ্ছিন্ন করেনা, তাকে যেখানে মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে সেখানেই মানুষ বেঁচে গেল। ইতিহাসে যেখানে মানুষ একত্র হয়েছে অথচ মিলতে পারেনি, পরস্পরকে অবিশ্বাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, পরস্পরের স্বার্থকে মেনেনি—সেখানে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"কথা প্রসঙ্গে"

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

যদিও অখণ্ড স্বাধীন ভারতের আদর্শ ত্যাগ করিয়া—জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করিয়া খণ্ডিত ভারত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে দুর্বল ইংরেজের সহিত আপোষ করিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে তথাপি দীর্ঘকাল পরাধীন (প্রথমে মুসলমানের ও তাহার বন্ধু ইংরেজদের অধীন) ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস অবগত হইবার জন্য নানাদেশে কৌতূহল দেখা যাইতেছে এবং সেই ইতিহাস শুনিবার জন্য নানা দেশের লোকও ভারতে আসিতেছেন। ভারত সরকার এই ইতিহাস রচনা করিতে আগ্রহশীল হইয়াছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথায় কালিদাসের দিগ্বিজয়ী রঘুর সেনাবলের কথা মনে পড়ে—প্রথমে রঘুর প্রতাপ, তাহার পরে অগ্রগতি তাহার পরে সেনাবলের গতিবেগে উত্থিত-ধূলি এবং সর্বশেষে রথাদি চতুরঙ্গিনী সেনা। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামও চারিভাগে বিভাগ করা যায়। প্রথম—দেশাত্মবোধের বিকাশ ও বিস্তার; এই কার্য্য প্রধানতঃ সাহিত্যের ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং জাতীয়তার পাবনীধারা বাঙ্গালার গোমুখী মুখ হইতে নির্গত হইয়া সমগ্র দেশে (অখণ্ড ভারতে) ব্যাপ্ত হয়। দ্বিতীয়—হিংসাত্মক আন্দোলন (physical force movement)—যাহা শাসকদিগের দমনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত সমিতি প্রভৃতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্যাপ্তি ও গতিলাভ করে। তৃতীয়—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। বাঙ্গালায় উহা দ্বিতীয় উপায়ের সঙ্গে—গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের মত প্রতিভাত হয়। বাঙ্গালায় ইহার উদ্ভব—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নীলকরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে। চতুর্থ—ইংরেজের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জন না করিয়া চতুর ইংরেজের প্রস্তাবে দেশ খণ্ডিত—দুর্বল ও বিবাদমান দুই রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ। যে দুইজনের কার্যফলে ইংরেজের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজন উপলব্ধি হয়, তাঁহারা উভয়েই—সুভাষচন্দ্র ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দেশবিভাগ করার বিরুদ্ধে ছিলেন।

স্বাধীনতাসংগ্রাম যে চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহার প্রথম ভাগ যে প্রথমে বাঙ্গালায় উদ্ভূত হয়, তাহা আমরা বলিয়াছি। "হিন্দুমেলা" কংগ্রেসের পূর্ববর্তী এবং ভারতে প্রথম স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়—তাহাই আমাদিগের কাম্য। দ্বিতীয় ভাগ—প্রথমে বোম্বাই প্রদেশে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যায় প্রকাশ পাইলেও সে হত্যা স্বাধীনতার জন্য নহে। সেইজন্য তাহাতেও বাঙ্গালা অগ্রণী। তৃতীয় ভাগে বাঙ্গালার অবদান উপেক্ষণীয় নহে। ইহার পরে বিবেকানন্দের উপদেশ এবং রাসবিহারী বসুর জাপান হইতে ভারত স্বাধীন করিবার চেষ্টায় ও তাঁহার অসমাপ্ত কার্যভার প্রাপ্ত সুভাষচন্দ্রের কীর্তি অতুলনীয়। ইটালীর বিনষ্ট স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল—ম্যাট্‌সিনীর প্রেরণা গ্যারিবল্‌ডীর বাহুবল ও রাজুরের

রাজনীতি। সুভাষচন্দ্র একাধারে সেই তিনের সম্মিলন করিয়া যে জাতীয় সেনাদল গঠিত করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

লালা লাজপত রায় কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালী ভারতের ইতিহাসে নবপর্য্যায় আরম্ভ করিবে, ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত ছিল; সে কাজের গৌরব বাঙ্গালীর।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী কখনও কেবল বাঙ্গালার জন্য কোন অধিকার না চাহিলেও কোন কোন প্রদেশ বাঙ্গালার সম্বন্ধে ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং সেই ভাব কংগ্রেসের নেতাদিগের মধ্যেও লক্ষিত হয়। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া তাহার যে ইতিহাস রচনা করেন, তাহাতে বাঙ্গালীর অবদান খর্ব দেখাইবার চেষ্টা সপ্রকাশ।

স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকার যে বাঙ্গালীকে অর্থ দিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিতে ভার দেন, তিনি বিপ্লবী বলে ছিলেন। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের দাবী যখন ইংরেজ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, তখন "There was a startling increase in the number of patriots whose exploits had been so far unobserved and whose merits had been hitherto unrevealed." এদেশেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কাজেই অর্থ ব্যয়িত হইলেও কিরূপ উপকরণ সংগৃহীত হইল তা বলা যায় না।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহার সম্বন্ধে প্রাদেশিকতাজনিত একদেশদর্শিতার পরিচয় দিলেও বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর সহিত সুপরিচিত। তিনি ছাপরা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া ছাত্রজীবন যাপন করেন। বিশেষ ছাত্রাবস্থায় তিনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "ডন সোসাইটী"র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। জাতীয়তা প্রচারে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের দক্ষতায় ও নিরপেক্ষতায় আস্থাহেতু তিনি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারকে যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহাকে এই ইতিহাস রচনার ভার দেন। এই ইতিহাস রচনা যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাহা বোধ হয় রাজেন্দ্রপ্রসাদ জানিতেন না ইহা যে একটি ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র তাহা রমেশবাবুও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি সোৎসাহে ইতিহাস রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার কাজের আরম্ভ দেখিয়াই যে যে বাঙ্গালী ইহার প্রথম অবস্থায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি বিপদ গণিলেন এবং সে কথা হিন্দুপ্রধান ভারত রাষ্ট্রের শিল্পমন্ত্রী আবুলকালাম আজাদকে জানাইলেন। আবুলকালাম আজাদ রমেশবাবুকে বলিলেন, তিনি যে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালীর অবদানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও—বাঙ্গালীর নেতৃত্ব সত্য হইলেও তাহা বলা চলিবে না; কারণ, যিনি প্রথম উপকরণ সংগ্রহের ভার লইয়াছিলেন, তিনিও বাঙ্গালী। রমেশবাবুও বাঙ্গালী—এমন কি কিছুকাল কলিকাতায় বাস করায় আবুলকালাম আজাদকেও কতকটা বাঙ্গালী বলা যায়; সে অবস্থায় বাঙ্গালীর প্রশংসা আত্মপ্রশংসা বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং সত্য বিকৃত করিয়া বাঙ্গালীর অবদানের গুরুত্ব প্রদর্শনে বিরত হইতে হইবে।

তখন রমেশবাবু বুঝিলেন কেন ভারত সরকার সিপাহী বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সে বিদ্রোহ জাতীয় ব্যাপার নহে; কারণ তখনও ভারতে জাতীয়তার প্রচার ও দেশাত্মবোধের আদর হয় নাই। জাতি হিসাবে বাসের কথা প্রথম উল্লেখ করেন—মনীষী রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইলবার্ট বিল লইয়া যে প্রবল আন্দোলন হয়, তাহারই ফলে ইংরেজ সরকারী কর্মচারী হিউমের চেষ্টায়, বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সম্মতিতে—ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্বরক্ষার উদ্দেশে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস

প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার প্রথম অধিবেশন বোম্বাই সহরে—ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান—ইংরেজের সম্বন্ধে রাজভক্তি পরিপুত। কংগ্রেসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় তাহার দ্বিতীয় অধিবেশনে—পর বৎসর কলিকাতায়। সেই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে রাজেন্দ্রলাল যে অভিভাষণ দান করেন, তাহাতেই তিনি বলেন—

"It has been the dream of my life that the scattered units of my race may some day coalesce and come together; that instead of living merely as individuals, we may some day so combine as to be able to live as a nation."

তিনি যে মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্রভাবে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহাদিগকেও জাতির অংশ বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসাধারণ দূরদর্শিতার ও মানবচরিত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। দীর্ঘকাল পরে পাকিস্তান দাবীতে তাহা দেখা গিয়াছে।

ইহা ভিন্ন, বাঙ্গালীরা সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই—বুঝিয়াছিলেন, তখনও আবশ্যক পরিবেশ সৃষ্টি হয় নাই! এমন কি মনসেনপুরে বাঙ্গালী "ঘোড়া মুনসেফ" প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষিবাহিনী গঠিত করিয়া সেই স্থান বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সকল কারণে ভারত সরকার সিপাহী বিদ্রোহকে—তাহা দিল্লীতে মুসলমান বাদ্‌শাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ হইলেও—জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন।

রমেশবাবু ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন—Shifting of evidence, incessant questioning of authorities, relentless scrutiny of documents. তিনি ইতিহাস বিকৃত করিতে সম্মত হইলেন না। ভারত সরকারের নির্দ্দেশে ইতিহাস রচনায় অসম্মত হইয়া তিনি অবসর নিষ্কৃতি পাইলেন, ভারত সরকারও আজীবন "ঐতিহাসিক" সংগ্রহের সুযোগ লাভ করিলেন। তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন—ডক্টর তারাচাঁদকে—বহুদিন পূর্ব্বে ইনি "ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইস্‌লামের প্রভাব" সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়া এই কাজে তাঁহার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

এই পুস্তক রচনা উপলক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার টাকার "হরিলুট" করিয়াছেন। গত পূর্ব বৎসর লোক সভায় বলা হয়—তখনই ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। ইহার হিসাব কি পাওয়া যাইতে পারে? না—তাহা সরকারের গোপনীয় ব্যাপার?

ডক্টর তারাচাঁদ কেবল যে ভারতের ইতিহাস জানেন না তাহাই নহে, তাহার উপর আবার তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙের খেলোয়াড় যেমন সময় সময় তিনটি ঘোড়ার চড়িতে হয় তেমনই চড়িতে হইয়াছে—মুসলমানের প্রশংসা, বাঙ্গালীর কীর্ত্তিতে মলিনতা লেপন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ও তাঁহার "তথাকথিত" ভাবকদিগের প্রশংসা।

তিনি যে ভারতের ইতিহাস রচনা করিবার অযোগ্য তাহা প্রমাণ তাঁহার স্কুলের ধনি পুস্তক হইতে ২টি উপহার দিলেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে যথেষ্ট হইবে—

(১) তিনি বলেন, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত ইংরেজের অধীন হইয়া গিয়াছিল।"

এই বিষয়ে ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে একজন ইংরেজের (হাণ্টার) উক্তি উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে—

"The British won India, not from the Moghuls, but from theHindus.—Before we appeared as conquerors the Moghal Empire had broken up. Our final and most perilous

wars were neither with the Delhi king, nor with his revolted Mahamadan Viceroys, but with the two Hindu confederacies, the Marathas and the Sikhs-Mahamadan princes fought against us in Bengal, in the Karnatik, and in Mysore; but the largest opposition to the British conquest of India came from the the Hindus. Our last Maratha war dates as late as 1818, and the Sikh confederation was overcome only in 1849.'

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ ও ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নহে, তাহা বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্ররাও বলিতে পারে।

তাহাতপুর ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই।
বাঙ্গালী কবিও (ঐতিহাসিকগণ) লিখিয়াছেন :—

"মহারাষ্ট্রজাতি—নিদ্রাতেও যার
শিয়রে তুরঙ্গ, কটিবন্ধে অসি ;
হলো অপমিত বিক্রমে যাহার
মোগলের বিশ্বত্রাস অট্টহাসী ,
'শেষ পাণিপটে—'এ সাধী' সমরে
স্বাধীনতা তরে পুত সিংহপ্রায়
যুঝিবে জাতি প্রাণ পণ করে—"
ইত্যাদি

এই এসাই সমর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হয়।
মহারাষ্ট্র বিবার পরে কবি নবীন চন্দ্র সেন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন—

"এক পদ আর—সম্মুখে পঞ্জাব—
বীরপ্রসবিনী, শিখের জননী
চিলেনোয়ালায় যাহার প্রভাব
দেখিবা বৃটিশ কেশরী আপনি।"

চিলিয়াওয়ালার যুদ্ধ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে হয়। সে যুদ্ধে ইংরেজের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে, কারণ—"The British lost 2400 officers and men, four guns, and the colours of three regiments." যুদ্ধের তারিখ ১৩ই জানুয়ারী ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ। বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও জানে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ—খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে অষ্টাদশে নহে।

আলিবার্ড ফ্রাইবের প্রয়োচনায় প্রভুর সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মীরজাফর বাঙ্গালার নবাবী পাইয়াছিলেন; শিখদিগের সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোলাব সিংহ কাশ্মীর পাইয়াছিলেন। ইতিহাসের সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উইল ডারাণ্ট কি পাইয়াছেন?

(২) ইনি যে বিষয়ে বিশেষ অজ্ঞ সে বিষয়েও মন্তব্য প্রকাশে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। অর্থাৎ ইঁহার যে কোন উক্তি স্মরণ করায়—"Fools rush in where angels fear to tread." তিনি লিখিয়াছেন —"বাঙ্গালাদেশে রঘুনন্দন ও জীমূতবাহন নামক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থদ্বয় পঠিত হইত।" রঘুনন্দন ও জীমূতবাহন

যে গ্রন্থ নহে গ্রন্থকারের নাম, তাহাও তিনি জানেন না, তাঁহার ইতিহাস কিরূপ হইতে পারে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। ইঁহার এইরূপ আর একটি উক্তির বক্তব্য—পানিনি অষ্টাধ্যায়ী, কৌমুদী ও অমরকোষ রচনা করিয়াছিলেন।

যে বিদ্যা সম্বল করিয়া ডক্টর তারাচাঁদ ভারত সরকারের নির্দ্দেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করিয়া যশী হইতে প্ররোচিত হইয়াছেন তাহার অল্প পরিচয় আমরা দিলাম।

ইহার সঙ্গে আবার তাঁহাকে দুইটি কাজ করিতে বলিয়াছে—

(১) মুসলমান শাসকদিগের প্রশংসা কীর্ত্তন

(২) সন্ত্রাসবাদ বা Physical force movement যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হেয় করা।

প্রথম কাজ তাঁহাকে করিতে হইয়াছে—যে শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারা তিনি কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি মুসলমান ছিলেন এবং ভারত সরকারের বর্ত্তমান সংস্কৃতি দপ্তরের যিনি ভারপ্রাপ্ত তিনিও মুসলমান।

আজ বর্ত্তমান ভারত সরকার কাজে না হইলেও মুখে বলে, তাঁহারা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অহিংসা নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। হিংসা যে কোন কোন অর্থে ধর্ম্ম, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়া গিয়াছেন। আর ভারতে হিংসাশ্রয়ী কবিরা যে দেশপ্রেমের জন্যই আইন লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তাহা তারাচাঁদ স্বীকার না করিলেও রাজা পঞ্চম জর্জ্জ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ ঘোষণায় তাহা বলিয়াছিলেন।

যাঁহাকে ভারত সরকার অর্থ দিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি যে সেই সংগ্রামের কারণ ও উদ্দেশ্য কিছুই বুঝেন না, তাহার প্রমাণ তিনি যা প্রকাশ করিয়াছেন—"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দুইটি দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের সংঘাত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, একদল সম্পদ ও প্রভাব চাহিতেছিল, অপর দলের হাতে তাহা ছিল।" যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের "সন্তান"—তাঁহাদিগের চরণ স্পর্শ করিবার যোগ্যতা এই সরকার পদলেহনকারীর নাই। স্বাধীনতা যে অর্থ অপেক্ষা অধিক কাম্য তাহা ইনি বুঝিতে পারেন না—পারিবেন না। যাহারা বিদেশীর বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে-করিতে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে উঠিয়াছিল, তাহারা অর্থের জন্য দেশসেবা করে নাই—পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করিবে না বলিয়াই তাহা করিয়াছিল। সেইজন্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কারাগারে বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রকে হত্যাকারী কানাই দত্তকে দেবতার স্থানে বসাইয়াছিলেন—

"আপরে কানাই ছিল নন্দের নন্দন,
কলিতে তাঁহার জন্মে দিল দরশন।

মুসলমানরা ইংরেজের বিরুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল—ইহা যারে "গল্প" মনে করিয়া ফিরোজ খাঁ নূন লিখিয়াছিলেন—সিপাহী ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বা যুদ্ধ করিয়াছিল। তেমনই মুসলমানদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য তারাচাঁদ লিখিয়াছেন—মোগল শাসন "স্বাধীন" শ্রেষ্ঠ শাসন। সেইজন্য বিদেশী মোগলদিগের অধীনতা হইতে স্বদেশকে মুক্ত করিবার জন্য সংগ্রামকারী রাণা প্রতাপ ও শিবাজী "উপজাতি সর্দার" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

ভারত সরকারের মুসলমান মন্ত্রী যেভাবে তারাচাঁদকে সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে—যদি আগামী নির্ব্বাচনে বর্ত্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংখ্যাধিক্য হয়, তবে এই ইতিহাস প্রত্যাহৃত হইবে না এবং আরও অর্থের অপব্যয় করিয়া ইহার অবশিষ্ট অংশ রচিত ও প্রকাশিত হইবে। অথচ এইরূপ পুস্তক সম্বন্ধে মধুসূদনের উক্তিই সঙ্গত—"জন্মরাশি তব ফেল কর্ম্মনাশার জলে।"

এখন দেশের লোকের কর্ত্তব্য কি? পশ্চিমবঙ্গে ঐতিহাসিক মণ্ডলী গঠিত করিয়া—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করা। রমেশবাবু সেই মণ্ডলীর উপদেষ্টা হইবেন। সরকারী দপ্তরের দলিল প্রভৃতি তাঁহারা পাইবেন না। সুতরাং, হয়ত তাহাতে কোন কোন ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। সে সব পরে সংশোধিত হইবে।

শুনা যায়, বর্দ্ধমানের জমীদার মহারাজা প্রতাপচাঁদের আনুকূল্যে যখন বাঙ্গালা গদ্যে মূল মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছিল সেই সময় প্রতাপচাঁদের কোন উক্তিতে ক্ষুব্ধ হইয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর অনুবাদ শেষ হইবার পূর্বে তিনি মহাভারতের বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। তাঁহার সাধু সঙ্কল্পে সহায় হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুবাদ কার্যের জন্য উপযুক্ত লোক মনোনীত করিয়া দিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের অনুবাদ তাহার ফল। আজ তাহা অতুলনীয় বলিয়া আদৃত।

তেমনই তারাচাঁদের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ হইতে এই প্রামাণ্য ইতিহাস রচনাও প্রকাশ করিলে তাহাই উপযুক্ত কাজ হইবে। আমরা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি মাত্রকেই এই কাজে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছি।

শেষার কি শেষ আছে!

জেনারেল এডুকেশন বোর্ডের সভাপতির সঙ্গে কথা হচ্ছিল বিখ্যাত মার্কিন জননায়ক থিয়োডোর রুজভেল্টের।

—দেখুন, নিগ্রোদের জন্যে আমি কৃষি ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাই, ব্যস্ ঐ পর্য্যন্ত, তার বেশী নয়, বললেন রুজভেল্ট।

—বেশ, কিন্তু কৃষি ও শিল্প বিষয়ে যারা শিক্ষা দেবে তাদের কোথায় শেখাবেন? শিক্ষাবিদ প্রশ্ন করলেন।

—হুঁ, ওর জন্যে নর্ম্যাল স্কুল করতে হবে। কিন্তু ওর বেশী নয়, বললেন রুজভেল্ট।

—নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকদের কোথায় ট্রেনিং দেবেন? আবার প্রশ্ন হোল।

—কি মুস্কিল, এযে দেখছি সুরু করলে আর শেষ হতে চায় না! রুজভেল্টের মনে সংশয়।

ঐ সংশয় সত্য।

পা বাড়ালেই রাস্তা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এরকম ঘামী অভিনন্দনের পর দিলীপের পক্ষে একটু বিচলিত হওয়া বোধহয় স্বাভাবিক। অন্ততঃ সেই দিনই ঘণ্টা কয়েক পরে তাকে মায়াদের বাড়িতে অস্থির ভাবে পায়চারী করতেই দেখা গেল।

নীরব পদচারণা নয়, পদচারণার সঙ্গে মুখের তোড়ও চলছে সমান বেগে।

কই অভিনন্দন কই? Congratulations, উচ্ছ্বাস, কিছুইত নেই! এত বড় একটা কাণ্ড করে এলাম, আর তোমার একটু সাড়াও নেই তাতে? একটু মৌখিক আনন্দও জানাতে পারো না!

কথাগুলো যে মায়াকে উদ্দেশ করেই বলা হচ্ছে তা জানান বাহুল্য। মায়া বারান্দার একটি টুলে বসে একটু চিন্তিত মুখেই দিলীপের কথা শুনছিল। দিলীপের শেষ কথায় ম্লান একটু হেসে বললে,—আনন্দ জানাতে নিশ্চয় পারি; কিন্তু আপনিও ত একটু বসতে পারেন। অত অস্থির কেন?

অস্থির কেন?—দিলীপ এতক্ষণে একবার দাঁড়াল স্থির হয়ে। তারপর মায়ার কাছে এগিয়ে তিক্ত তীব্র গলায় বললে,—বাঃ অস্থির হব না! এক নিমেষে ভাগ্যের চাকা কি ভাবে ঘুরে গেছে ভাবো দিকি! রাস্তায় ল্যা ল্যা করে যে ঘুরে বেড়াত, যেদিন যা জোটে তাই নিয়েই খুসি থাকত, সেই বেকার বাউণ্ডুলে দিলীপ সরকার নয়; চৌধুরী ইণ্ডাষ্ট্রিজের ফ্লাশ টু অফিসার! একটা কেওকেটা লোক। কি তার খাতির, কি তার প্রতিপত্তি! তার ওপর ছবির মত একটা বাড়ি, সারাদিন চৌধুরীর অফিসে দাওখরি করে সেখানে এসে আরামে গা ছেড়ে দিয়ে যা ইচ্ছে স্বপ্ন দেখা যায়! অস্থির হয়েছি কি সাধে? ব্যাপারটা ভালো করে সামলাতেই এখনো পারছি না যে!

মায়া উদ্বিগ্ন মুখেই এবার উঠে দাঁড়াল। জোর করে তবু একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, তাহলে আপনি ততক্ষণ আপনার অস্থিরতা সামলান। আমি একটু চা করে নিয়ে আসি।

না না কিছু আনতে হবে না!—দিলীপ বাধা দিয়ে কি রকম অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠল।—এখন চায়ের চেয়ে আমার কি দরকার জানো? শুধু একজন মুগ্ধ শ্রোতা।

তার চেয়ে একজন ডাক্তার হলেই ভালো হ'ত না কি!—মায়া পরিহাসের সুরটাই গলায় রাখবার চেষ্টা করলে,—চাকরির উন্নতির সঙ্গে বাড়ি পেয়ে ত মাথা খারাপ হবার জোগাড় দেখছি!

ঠিক বলেছ মায়া! দিলীপের গলা এবার গম্ভীর,—মাথাটা খারাপ হতে দিলে চলবে না। তবে তার জন্যে ডাক্তার লাগবে না। উপায়টা আমি নিজেই বার করে ফেলেছি। অতি সহজ উপায়। স্রেফ সুবিধামত চোখ বুজে থাকতে দেখা। চোখ আর মুখ দুইই বুজে। ব্যস্, দুনিয়ায় আমার উন্নতি আটকায় কে?

সত্যি আপনার হয়েছে কি?—মায়ার গলায় কাতরতা আর লুকোন নয়,—কি বলছেন, কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না।

পারছ না! দিলীপ আবার স্থির ভাবে একটু হাসল,—যা বলছি তার মানে হতে সত্যিই কিছু নেই। জীবনে পরমা কড়ি সন্ধান প্রতিপত্তি যদি হয় সব কিছুর অত মানে খোঁজার দরকার কি? চৌধুরীর কারখানার কার বাড়িতে টালি খসে পড়ে কোন ছেলে মেয়েকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে আমার জানবার কি দায়? আমার বাড়ি ত স্বপ্নের মত সুন্দর। সেখানে বারান্দায় বসে আমরা পূর্ণিমা-চাঁদ দেখব হাত ধরাধরি করে। কোথায় কোন তেলের টিনে কিসের ভেজাল, আটা ময়দায় পাথরের গুড়ো, চোখ বুজে থাকলে'ত আর দেখতে হবে না। আমি দস্তুর মত মোটা মাইনের বড় অফিসার। চোখ বন্ধ করে রাখবার দায় নাই। আমার অত ভাববার দরকার কি?

মায়া এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দিলীপকে লক্ষ্য করছিল। এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দিলীপের হাতে তার হাতটা রাখল। তারপর স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়স্বরে বললে,—শোন। এখুনি তুমি যাও চৌধুরী সাহেবের অফিসে।

তা'ত যেতেই হবে?—দিলীপ নিজেকেই যেন বিদ্রূপ করার সুরে বললে,—শুধু সুখবরটা তোমায় জানিয়ে যেতে এসেছিলাম।

বেশ করেছ!—মায়ার স্বর আগের মতই স্নিগ্ধ,—কিন্তু এর চেয়ে বড় সুখবরের জন্যে আমি অপেক্ষা করব। তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসো।

ছেড়ে দেব চাকরি! দিলীপ কি সত্যিই বিস্মিত? অন্ততঃ গলার স্বরের আলাটুকু না থাকলে মায়ার মুখের দিকে চেয়ে সে যেন নিজের হয়ে ওকালতি করছে ভাবা যেত। সেই জ্বালা নিয়েই সে বললে,—তুমি পরিহাস করছ মনে হচ্ছে! যা কিছু মানুষ চায় সব হাতের মুঠোয় পেয়েও হেলায় ছুড়ে ফেলে দেব তুমি বলতে চাও! এতদিনের সব স্বপ্ন ব্যর্থ করে দেব নিজেই?

তাই দিতে হবে! মায়ার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার সঙ্গে যেন কান্না মেশানো।

দিলীপের চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। মায়াকে যেন নতুন করে চিনছে এমনি ভাবে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে গাঢ়স্বরে সে বললে,—এই তোমার প্রাণের কথা মায়া?

হ্যাঁ, এই আমার প্রাণের কথা! মায়ার কণ্ঠ নিঃসংশয়,—সব কিছু পাবার লোভেও পরস্পরের নোংরা হাত আমরা ধরতে পারব না।

আজ তোমার কাছে কি যে পেলাম মায়া তা মুখে বোঝাতে পারব না। এই সাহসটুকুই তোমার কাছে চেয়েছিলাম। আবার দুর্বল হয়ে পড়বার আগেই তাই যাচ্ছি।

ছুটি পাওয়া পাঠশালার ছেলের মত সবেগে বেরিয়ে যেতে গিয়ে দিলীপ আবার থামল। তারপর ধীরে ধীরে মায়ার কাছে এগিয়ে এসে খানিক চুপ করে থেকে করুণ ভাবে একটু হেসে বললে,—কিন্তু একটা সাধ আর পূর্ণ হ'ল না মায়া। ওই স্বপ্নের বাড়ির বারান্দায় তোমার সঙ্গে বসে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা।

মায়া নীরব। তার চোখের ভাষা বোঝবার উপায় নেই—

দিলীপ নিজেই যান ভ'রে সজোরে হেসে উঠল এবার,—আমাদের মত মানুষেরও এসব কবিত্বের সখ হয়!

আর সে সেখানে দাঁড়াল না।

চৌধুরী কোম্পানীর গেটে বড় বড় গরীর ভীড়। কোনটা আটার কোনটা তেলের কোনোটা কয়লার।

সেগুলোর পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে দিলীপের মনে হয় একটা বিরাট জটিল বন্দরাহ যেন এখনো তাকে মুঠোর মধ্যে ধরবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

ক'খানার এলাকা ছাড়িয়ে আফিস-বাড়িতে ঢোকবার সময় পাশে গাড়ি রাখবার গ্যারেজগুলোর দিক থেকে হঠাৎ কেষ্টর তীক্ষ্ণ রুক্ষ কণ্ঠ শুনে সে থমকে দাঁড়ায়।

কেষ্ট তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলছে,—রাস্তা ছাড়ো। ভালো কথায় বলছি।

সঙ্গে সঙ্গে দাশুর বিষ মাখানো বিদ্রূপের স্বর শোনা যায়,—আরে রোখো ইয়ার! ঘর যাবার এত তাড়া কিসের? নোকরি না হয় খতম হয়েছে। আমরা সব পুরান লোক! এতো জলদি কি আমাদের যায়া কাটাতে আছে।

দিলীপ আর এক মুহূর্ত দেরী না করে সেদিকে এগিয়ে যায়। গ্যারেজের দুয়ারে গিয়ে যখন পৌঁছায় তখন কেষ্ট আগুন হয়ে বলছে—দলের মধ্যে একা পেয়ে বড় সাহস না! কি করতে চাও কি?

কেষ্টকে ঘিরে দাশুর দলের সব কটি গুণ্ডা দাঁড়িয়ে। দাশু কেষ্টর আরো একটু সামনে এগিয়ে এসে কুৎসিত ভাবে হেসে বলে,—আরে কিছু নয় ইয়ার। খালি দুটো বাৎচিৎ—

দিলীপকে সেই মুহূর্তে দলের একজন দেখতে পায়। কনুইএর ঠেলা দিয়ে ইসারা করে দিতেই দাশু একেবারে অন্যমানুষ হয়ে সসম্ভ্রমে হাত তুলে জানায়,—সেলাম স্যার!

অন্যদের হাতও তখন সেলামের ভঙ্গিতে ওপরে উঠেছে।

দিলীপ তাদের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার কি!

কিছু না স্যার! দাশুই জবাব দেয়।—কেষ্টবাবু নোকরী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিছু বখশিষ ভি তাই দিয়ে দেব ভাবছি।

তাদের মুখচোখের ভঙ্গিতে বখশিষের স্বরূপটা দিলীপের অগোচর থাকে না। তবু মুখে ভাবান্তর না দেখিয়ে সে বলে,—ওঃ। আচ্ছা আগে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি। এসো কেষ্ট!

ওখানে গিয়ে কোন লাভ নেই দিলীপ—কেষ্টই আপত্তি জানায়,—তুমি যেতে হয় যাও।

দিলীপ কিন্তু কেষ্টকে ছাড়ে না। এক রকম জোর করেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে বলে,—না, তোমাকেও যেতে হবে।

স্বরটা প্রায় আদেশের।

দাশুর দল বাধা দেয় না, কিন্তু দিলীপকে দাশু এবার যা বলে তাতে ঠিক সম্ভ্রমের সুর আর নেই।

দাশু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে,—নিয়ে যাচ্ছেন যান! আপনি বড়া আফসার, আপনার উপর ত' বাৎ চলে না। তবে কেষ্টকে ছেড়ে গেলেই ভালো করতেন।

দিলীপ মুখ না ফিরিয়েই চৌধুরীর খাস কামরার দিকে কেষ্টকে নিয়ে যায়।

খাস কামরায় চৌধুরী সাহেব তখন বিনোদবাবুকে কি আদেশ দিচ্ছেন। কোন একটা গোলমেলে ব্যাপার নিশ্চয়ই। কারণ দিলীপকে কেষ্টর সঙ্গে ঢুকতে দেখেই চৌধুরী সাহেবের কথা বন্ধ হয়ে যায়।

আসল কথা তখন বলা হয়ে গেছে বোধহয়। কারণ বিনোদবাবুও আর সেখানে থাকেন না। 'যে আজ্ঞে' বলে দিলীপ ও কেষ্টর দিকে একবার ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে তিনি বেরিয়ে যান।

চৌধুরী সাহেব প্রসন্ন মুখে 'আসুন দিলীপবাবু' বলে দিলীপকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে থামেন। কেষ্টর দিকে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।

কেষ্টকে উদ্দেশ করেই বলেন—তুমি! তুমি আবার কি করতে এসেছ? তোমার মাইনে তুমি পাও নি?

কেষ্টর হয়ে দিলীপই জবাব দেয়,—মাইনে পেয়েছে। কিন্তু তার ওপর বখশিসের যে ব্যবস্থা করেছেন সেই বিষয়েই একটু জানাতে এসেছে।

দিলীপের কথাগুলোর রুক্ষতা লক্ষ্য না করবার নয়। তবু চৌধুরী সাহেব বিস্ময়ের ভান করে বলেন,—বখশিষ? কিসের?

যে জন্যে চাকরী ছাড়ালেন সেই জন্যেই বখশিষের ব্যবস্থা করেছেন বোধহয়—দিলীপের গলায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ।

কপালে কটা রেখা ফুটে ওঠা ছাড়া চৌধুরী সাহেবের মুখে তবুও ভাবান্তর নেই এখনো। হেসেই বলেন—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না দিলীপ বাবু।

দরকার হলে তিনি বিদ্রূপের জবাব যোগ্য ভাষায় দিতে পারেন তাঁর পরের কথায় তা বোঝা যায়। মুখের হাসিটা বজায় রেখেই তিনি বলেন—কিন্তু নিজের একটা ড্রাইভার ছাড়াবার অধিকার বোধহয় আমার আছে। আর সে জন্যে কাউকে কৈফিয়তও আমি করি কাউকে দিতে বাধ্য নই।

পর মুহূর্তেই মুখটা তাঁর কঠিন হয়ে ওঠে। কেষ্টর দিকে ফিরে রূঢ় স্বরে বলেন,—তুমি এখন যেতে পারো।

মুখের ভাবের ওপর দখল যে তাঁর অসামান্য আমার দিলীপের সঙ্গে কথা বলাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আপনার যদি অন্য কিছু বলবার থাকে তাহলে···

কথাটা চৌধুরী সাহেব ইচ্ছে করেই বোধহয় শেষ করেন না। গলার স্বরের সামান্য একটু রুক্ষতা ছাড়া বলার ধরণে রূঢ়তা কিছু নেই।

হ্যাঁ বলার কিছু আছে বলেই এসেছি।—দিলীপের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

বলুন তাহলে—বলে নিজের চেয়ারে বসতে গিয়ে চৌধুরী সাহেব আবার কেষ্টর দিকে দৃষ্টি মেলে। স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে বলেন—কই তুমি গেলে না?

না, ও আমার সঙ্গেই যাবে—দিলীপ কঠিন স্বরে জানায়,—আমার কথা খুব সামান্যই। সুতরাং বেশীক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না।

কিন্তু সামান্য কিছুক্ষণেরও বিরক্তি আমি সহ্য করব কেন দিলীপবাবু!

চৌধুরী সাহেব সৌজন্যের মুখোশটা এবার বিনা দ্বিধায় খুলতে থাকেন। পরের কথাগুলিতে তাঁর কণ্ঠ একটু একটু করে রূঢ়তার তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি বলে যান—ছোট বড় ভেদ আমি করি না। কিন্তু আমার ভদ্রতার দাম যারা দিতে জানে না, তাদের নিজের জায়গাটা দেখিয়ে দিতেও জানি। একথাটা একেবারে ভুলে যাচ্ছেন কেন যে এটা চৌধুরী কোম্পানীর অফিস, আর আপনি এখানে সামান্য একজন চাকরে।

দিলীপ সোজা চৌধুরী সাহেবের চোখের দিকে চেয়ে একটু হাসে মাত্র। তারপর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বলে,—সামান্য একজন চাকরে বলছেন! বেশ ওকথাটাই তাহলে মিথ্যে হয়ে যাক।

দিলীপ কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ঘরেই ছড়িয়ে দিয়ে বলে,—ওই আপনার appointment letter আর এই নিন আমার কাজ ছাড়বার চিঠি।

পকেট থেকে আর একটা কাগজ বার করে দিলীপ টেবিলের ওপর রাখে।

চৌধুরী সাহেব ঠিক এই ব্যাপারটার জন্যে নিশ্চয় প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে রাগে ফেটে পড়তে দেখা যায় না। তার বদলে হঠাৎ আরো মোলায়েম হয়ে তিনি বলেন,—ও এখানকার কাজ আপনি ছেড়ে দিতে চান।

ছাড়তে চাই নয়, ছেড়ে দিয়েছি। ছোট বড় ভেবেটা ভুলে এবার সমানে সমানে দুটো কথা বোধহয় হতে পারে।

দিলীপের এই আলাপচারী কথাতেও চৌধুরী সাহেবকে বিচলিত মনে হয়। তিনি মুখ গম্ভীর করেছেন। একটু হেসেই বলেন—হুঁ, সমানে সমানেই তাহলে বলি, চাকরি না ছাড়লেই ভালো করতেন। হঠাৎ ছাড়ছেনই বা কেন? বাড়ি পছন্দ হয় নি?

খুবই পছন্দ হয়েছে!—দিলীপকে এইবার উত্তেজিত দেখায়,—কিন্তু ওই ঘুষেও হাসপাতালের ওই চালি পড়ে যখন ছেলেমেয়ে দুটোকে ভুলতে পারলাম না, হজম করতে পারলাম না অনেক কিছুর সঙ্গে এই পাথরের টুকরোটা।

কয়েকদিন আগে গেটের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া শাদা পাথরের টুকরোটা দিলীপ পকেট থেকে বার করে দেখায়।

চৌধুরী সাহেব নীরবে খানিকক্ষণ পাথরটার দিকে চেয়ে থাকেন তারপর যেন আরো মোলায়েম করে বলেন,—তাহলে শুনুন, ওর চেয়ে বড় ঘুষও আছে।

আছে?—দিলীপ তিক্ত কণ্ঠে বলে,—আর ঘুষ বাড়ালেই থাকে ইচ্ছে কেনা যায় আপনার ধারণা!

ঠিকই ধরেছেন।—চৌধুরী সাহেব অম্লান বদনে স্বীকার করেন।

কিন্তু আমার মত লোককে কেনার ইচ্ছেই বা আপনার কেন?—দিলীপ সত্যিই একটু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে,—বিনা ঘুষেই নিজেদের বেচবার যথেষ্ট লোক ত আছে।

আছে। কিন্তু তারা জোলো জিনিষ।—চৌধুরী নিজের স্বরূপ এবার যেন অসঙ্কোচে উদ্ঘাটিত করেন,—কড়া মদ তৈরী করতে সবচেয়ে মিষ্টি রসই পচাতে হয়। আদর্শের গোড়ামী যার যত বেশী তাকেই গাঁজালে তত বড় কালো পাহাড় তৈরী হয়। আর এই তপস্বী সেই সব কালাপাহাড়ই আমার দরকার।

শেষের কথাগুলো চৌধুরী সাহেব ধীরে ধীরে যেন বিষিয়ে বিষিয়ে বলেন। দিলীপ তখন সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। চৌধুরী সাহেবকে ঠিক এতখানি চিনতে সে সত্যিই পারে নি।

উত্তর দিতে দিলীপের একটু দেরী হয়। খানিক নীরব থেকে সেও ধীরে ধীরে বিষিয়ে বিষিয়ে বলে,—আপনার সরলতায় খুশি হলাম। তবে এই একবার বোধ হয় আপনার ঠিকে ভুল হল। কতখানি মিষ্টি নিজে তা আমি জানি না, কিন্তু আপনার ঘুষে পেঁকে ওঠবার কোন লক্ষণ দেখছি না। সুতরাং একটা কালাপাহাড়-শিকার আপনার ফসকালো।

ফসকালে যে আমার চলে না দিলীপ বাবু।—চৌধুরী সাহেবের চোখের দৃষ্টিতে কৌতুক না কুটিলতার হিসেব ঠিক বোঝা যায় না,—ঘরের খবর যে জেনেছে তাকে চর হয়ে আর বাইরে যেতে দেওয়া যায়?

একটু থেমে যেন রীতিমত স্থির স্বরেই চৌধুরী সাহেব বলেন,—বসুন। শুনি আপনার দাম।

এতক্ষণ ধরে শুধু নিজের গুণ ব'ড়াচ্ছি বলে আপনার ধারণা ?—দিলীপ সত্যিই বিস্মিত।

ধারণা আমার কবি ভুল নয়।—চৌধুরী সাহেব শান্ত স্বরে বলেন—আমিও সেজন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলাম।

ড্রয়ার টেনে একটা কাগজ বার করে দিলীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে চৌধুরী সাহেব আবার বলেন—এটা কি জানেন ?

কাগজটার দিকে অবজ্ঞাভরে একবার চেয়ে দিলীপ বলে,—না।

চৌধুরী সাহেব আবার কাগজটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে সই করতে করতে বলেন।—এটা চৌধুরী কোম্পানীর সব চেয়ে বড় চাকরীর appointment letter. স্বয়ং ওয়ান অফিসারের চাকরী। মাইনেও জানেনই। তাছাড়া আপনার ব্যবহারের জন্যে খরচ খরচা সমেত একটা গাড়ী।

সই করা কাগজটা দিলীপের দিকে ঠেলে দিয়ে চৌধুরী সাহেব হেসে বলেন,—বলুন এবার কি বলতে চান ?

দিলীপ খানিকক্ষণ সত্যিই কিছু বলতে পারে না। চৌধুরী সাহেব তখন তার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

হঠাৎ চৌধুরী সাহেবকেও চমকে উঠে দাঁড়াতে হয়।

এই আমার জবাব !—বলে কাগজটা তার মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে দিলীপ তখন বেরিয়ে যাচ্ছে।

কলিং বেলটা টিপে চৌধুরী সাহেব বলেন,—দাঁড়ান।

দিলীপ বুঝি নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে দাঁড়ায়।

চৌধুরী সাহেব যেন তার প্রতি সহানুভূতির স্বরেই ক্ষুণ্ণ গম্ভীর গলায় বলেন,—এভাবে কাজ ছেড়ে এখান থেকে কেউ এখনো পর্যন্ত যেতে পারেনি দিলীপ বাবু !

বিনোদ বাবু কলিং বেলের হুকুমেই বোধ হয় তখন ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তার ও চৌধুরী সাহেবের দিকে অবজ্ঞাভরে চেয়ে দিলীপ বলে,—যা কেউ পারেনি তাই প্রথম করবার গৌরবটা তাহলে আমার থাক।

চৌধুরী সাহেব যেন নিরুপায় হয়েই কথাটা মেনে নিয়ে বিনোদ বাবুকে হতাশ ভাবে বলেন,—ইনি আমাদের চাকরী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। একটু পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিন।

যে আজ্ঞে—বলে বিনোদ বাবু বেরিয়ে যান।

দিলীপ একটু বিস্মিত হয়েই বলে,—আপনার উদারতার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এ অনুগ্রহটা আর নিতে পারবো না।

সে আপনার মর্জি !—চৌধুরী সাহেব অদ্ভুতভাবে হেসে বলেন,—আমার কিন্তু বলছি আমাদের সম্পর্ক না ছাড়লেই ভাল করতেন।

অত্যন্ত সহজ শান্ত কণ্ঠ, কিন্তু কোথায় যেন একটা দুর্বোধ কিসের ইঙ্গিত তার মধ্যে আছে যা অস্বস্তি লাগায়। সে অস্বস্তিটা অগ্রাহ্য করে দিলীপ পরিহাসের সুরেই বলে,—একদিন হয়তো সেই অনুরোধই করব !

দিলীপ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

যাবার সময় ফিরে তাকালে চৌধুরী সাহেবের চোখ দুটো দেখে অস্বস্তির কারণ সে হয়ত কিছুটা বুঝতে পারত।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ত্ব

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন,—এদেশে 'কাব্য' কথাটি প্রাচীন আর 'সাহিত্য' কথাটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। এদেশের পণ্ডিতদের নিকট 'কাব্য' ও 'সাহিত্য' প্রায় সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি এ কথা মানিতেই হইবে যে, 'কবি' কথাটির অর্থ যতখানি ব্যাপক, 'সাহিত্যিক' কথাটির অর্থ কোন দিন ততখানি ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই। বেদ, উপনিষদ ও গীতার মধ্যে আমরা 'কবি' কথাটির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। যিনি ক্রান্তদর্শী, তিনি কবি, যিনি মনীষী বা মনস্বী, তিনি কবি, আবার যিনি এই বিশ্বের রচয়িতা, তিনি হইতেছেন আদি কবি। যাঁহাকে আমরা আদি কবি বলি, সেই মহর্ষির 'ললাটে' আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী যিনি 'আদিকবি' বা পুরাণ পুরুষের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 'কবি' ও 'সাহিত্যিক' পর্য্যায় শব্দ নহে। 'সাহিত্য' কথাটির মধ্যে ভারতীয় পণ্ডিতদের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় রহিয়াছে। মহামতি কুন্তক সাহিত্য কথাটির অর্থ অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পরলোকগত সুধীর দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'কাব্যালোক' গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কুন্তক বলেন—সাহিত্য কথাটির অর্থ সহিতত্ব বা মিলন। কিসের মিলন? শব্দের সঙ্গে শব্দের মিলন, শব্দের সঙ্গে অর্থের মিলন (এই মিলনটি অবিচ্ছেদ্য বলিয়া মহাকবি কালিদাস ইহাকে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের মিলনের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন), আর বাক্যের সঙ্গে বাক্যের মিলন। রসের বা প্রকাশভঙ্গির অপকর্ষ না ঘটাইয়া যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনার একটি শব্দেরও পরিবর্ত্তন করা চলেনা এবং কবিদের রচনা যে কখনও চিত্রধর্ম্মী, কখনও বা সঙ্গীতধর্ম্মী হইয়া উঠে, মনস্বী কুন্তক এ সকল কথাও সুকৌশলে বলিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্য যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সাধন করে, সাহিত্যের দ্বারা দিয়াই যে আমরা দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করি, সেকথা আলংকারিক কুন্তক বলেন নাই, বলিয়াছেন বিশ্বের বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ। এইজন্য কাব্যালোকের লেখক বলেন, কুন্তকের বিশ্লেষণে যে কথাটি অনুক্ত রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটি তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি, সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে। শাকসব্জির খেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল ফলানোর যোগ। ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। সব্জিখেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্যসংগ্রহ। ফুলের বাগানের যে উদ্দেশ্য, তাকে এক হিসাবে 'সাহিত্য' বলা যেতে পারে। অর্থাৎ মন তার সঙ্গে মিলতে চায়—সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানকার সঙ্গে যোগে মন খুশি হয়।

এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে, হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য'।

অবশ্য, মিলন ভিন্ন 'সাহিত্য' শব্দের আর একটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আছে। যাহা হিতের বা কল্যাণের সহিত বর্ত্তমান, তাহার নাম 'সহিত', আর 'সহিতের' ভাবকেই বলা যায় সাহিত্য। এইজন্য

সাহিত্য শুধু রস পরিবেশনই করে না, ইহা মানুষকে শ্রেয়ের সন্ধানেরও নির্দেশ দেয়। অথচ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্ম তাহার লীলা, ইহার মূলে শিক্ষাদানের বা মত-প্রচারের কোন সজ্ঞান প্রয়াস থাকে না। মহাকবি কালিদাস বা পৃথিবীর অদ্বিতীয় নাট্যশিল্পী সেক্‌স্‌পীয়ার শুধু অন্তরের আনন্দের আবেগেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা সচেতন ভাবে উপদেষ্টা বা প্রচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হন নাই, তাই তাঁহারা সর্ব্ব দেশের ও সকল কালের; আর এই জন্যই আর্ণল্ডের মনস্বী কবি-নাট্যকার গোটে শকুন্তলার মর্ম্মকথা একটিমাত্র শ্লোকে এমন চমৎকারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

সাহিত্যদর্পণকার বলেন, রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ ও আনন্দচিন্ময়। রসের অনির্ব্বচনীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

'শুধু কথা যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্য্যক চঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায়, তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। যা আমরা দেখছি, শুনছি তার সঙ্গে যখন অনির্ব্বচনীয়ের যোগ হয়, তখন তাকেই বলি আমরা রস। অর্থাৎ যে জিনিষটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না'। (ছন্দ)

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্ব্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে'। (সাহিত্যতত্ত্ব)

অন্যত্র—

'ভাষার মধ্যে যখন প্রবল অনুভূতির সংঘাত লাগে, তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে'। (সাহিত্যতত্ত্ব)

এই জন্যই 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং' এ কথা যেমন সত্য, 'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য' এ কথাও তেমনিই সত্য।

মানুষের ভাষা যতদিন জৈব প্রয়োজনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ততদিন পশুর সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলনা। তারপর, কি ভাবে মানুষ প্রয়োজনকে অতিক্রম করিতে শিখিল, কি ভাবে তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি জাগ্রত হইল, বিজ্ঞান তাহার যথাযথ উত্তর দিতে পারে নাই। মানুষের মধ্যে দেখা দিল একটা চিরন্তন অতৃপ্তি, ইংরেজিতে যাহাকে বলা হয় 'divine discontent', তাই মানুষ বিত্তের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই, বিত্তের চেয়ে চিত্তের সম্পদকেই বড় বলিয়া মনে করিয়াছে, তাই এক দিকে সে অজানাকে জানিবার জন্য দুর্দ্দম প্রয়াস পাইয়াছে, প্রকৃতির ও মানব-মনের রহস্য ভেদ করিবার জন্য অক্লান্ত সাধনা করিয়াছে, অসীমের সঙ্গে ধ্যানে মিলিত হইবার জন্য আকুলতা অনুভব করিয়াছে, অপর দিকে, আপনার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিয়াছে। আবার, মানুষ আপন মনীষার সাহায্যে রসতত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব লইয়াও আলোচনা করিয়াছে, ফলে, আমরা পাইয়াছি অলঙ্কারশাস্ত্র, রসতত্ত্ব, নন্দন-তত্ত্ব। এইভাবে মানুষ প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া আনন্দলোক-বিহারী হইয়াছে।

'সাহিত্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তার যে রস তা অহৈতুক। ০ ০ ০ আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে'।

এ কথার অর্থ শুধু এই যে, কবি আপন মনের আনন্দেই সৃষ্টি-কর্ম্ম করেন, তাই সহৃদয় পাঠকের

মনেও তিনি বিশুদ্ধ আনন্দের সঞ্চার করেন। সৃষ্টিকর্মেই কবির আনন্দ কিন্তু নিরঙ্কুশ একটি দৈবী প্রেরণা, তাই কবি যখন আত্মস্থ বা তন্ময় হইয়া সৃষ্টি করেন, তখন শ্রেয়ের দুর্গম পথটিও তাঁহার নিকট উদ্ভাসিত হয়। আমাদের শাস্ত্রে কবিকে বলা হইয়াছে প্রজাপতি এবং তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেন তাহাকে বলা হইয়াছে মায়ার জগৎ। কিন্তু এক হিসাবে এই মায়ার জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ অপেক্ষা গভীরতর সত্য। কবি বা সাহিত্যিকগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতেই কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেন বটে কিন্তু উহা কবির অনুভূতির রসে রঞ্জিত হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর আর একটি জগতে রূপান্তরিত হয়। তাই তাঁহারা আমাদের অন্তরের স্থায়িভাবকে রসে পরিণত করিতে পারেন। আমরা যখন বলি, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তখন শুধু এইটুকু বুঝি যে সাহিত্য-সৃষ্টির সময় স্রষ্টার মনে কোন প্রয়োজন-বোধ থাকে না, এই প্রয়োজনবোধকে বলা যায় Utilitarian considerations, এমনকি, লোক-কল্যাণের কোন সুস্পষ্ট আদর্শও তাঁহার সৃষ্টির প্রেরণামূলে বিদ্যমান থাকে না। অথচ তিনি যে মানুষকে শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করেন না, এ কথাও সত্য নয়। আবার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমাত্রেরই মূল থাকে ভূগর্ভে প্রোথিত কিন্তু শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বদিকে প্রসৃত, সুতরাং ইহা যেন পৃথিবী ও স্বর্গকে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করে। আবার, একথাও সত্য যে, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। সুতরাং শিল্পী অস্কার ওয়াইল্ড যে 'Art for art's sake' নীতির (অনেকে এই অর্থে 'কলাকৈবল্যবাদ' কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন) প্রচার করিয়াছেন, উহা বিভ্রান্তিকর। জি. কে. চেষ্টারটন এই কথাটির পরিবর্তে Art for life's sake কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেক সার্থক কবিকৃতির মধ্য দিয়াই আমরা স্রষ্টার জীবন-দর্শন আবিষ্কার করিতে পারি, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন,—হোমারের রচিত ইলিয়াড ও ওডিসি ও ওল্ড টেষ্টামেন্টের অন্তর্গত বুক অব জবকে (Book of Job) আমরা শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া মনে করিতে পারি। ইলিয়াডের কবি মানুষের জীবনকে দেখিয়াছেন বিরামহীন সংগ্রামরূপে, ওডিসির কবি দেখিয়াছেন একটা নিরুদ্দেশ যাত্রারূপে, আর Book of Job এর কবি দেখিয়াছেন একটা দুর্জ্ঞেয়, দুরবিগম্য রহস্যরূপে।

কিন্তু যাঁহারা কবির সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্রই 'মর্যাল' বা দার্শনিক তত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়ান, রবীন্দ্রনাথ 'পকভূতে' সেইসব প্রবীণ লোকদের মৃদু কশাঘাত করিয়াছেন।

কবি টেনিসন বলিয়াছেন—

'So lady Flora, take my lay,
And if you find no moral there'
Go, look in any glass and say,
What moral is in being fair?
O! to what uses shall we put,
The wild weed-flower that simply blows,
And is there any moral shut
Within the bosom of the rose'?

অবশ্য, পৃথিবীতে এমন দুই একজন সৌভাগ্যশালী কবি বা ঋষিরও আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা অসাধারণ সৃষ্টিকুশলী ও মানব-চরিত্রের অন্তস্তলদর্শী, মানুষের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতির বলেই তাঁহারা সংসারকে দেবপীঠস্থানে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে শ্রেয়ের পথের নির্দেশ দিয়াছেন। আমরা মহর্ষি বাল্মীকি ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে এই শ্রেণীর মহাকবি বলিয়া মনে করি।

দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণী কথার' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ভারতের দুইখানি মহাকাব্য সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা দেশে প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র; ইঁহাদের মধ্যে মধুসূদন বিশুদ্ধ কবি-প্রেরণার বশেই বঙ্গবাণীর সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য ছিল যুগপৎ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও লোককল্যাণ-সাধন। বঙ্গদর্শনের যুগ হইতে (অর্থাৎ 'বিষবৃক্ষের' রচনাকাল হইতে) বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-রচনায় লোক-কল্যাণের আদর্শের দ্বারা প্রণোদিত হইলেও প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র কখনও শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের উপর জয়ী হইতে পারেন নাই। উপদেষ্টা হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অপূর্ব্বনির্ম্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার অধিকারী।

কবি কীট্‌স্ তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—সংসারে দুই জাতের কবি আছেন। এক শ্রেণীর কবি কাব্যের মধ্যে নিজেকে ধরা দেন, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অপরের গোচর করেন। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই শ্রেণীর কবি, তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় তাঁহার জীবন-বেদকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেখানে কোন গোপনীয়তা নাই। আর এক শ্রেণীর কবি বিচিত্ররূপে লীলা করেন কিন্তু নিজেকে কখনও ধরা দেন না। অষ্টাদশ নাট্যশিল্পী সেক্‌স্‌পীয়ার এই শ্রেণীর কবি। তাঁহার রচিত কোন চরিত্রের সঙ্গেই তাঁহার মিল খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। তিনি কি অব্যবস্থিত-চিত্ত দুর্ব্বলমনা হ্যামলেট না দৃঢ়চেতা সাইলক? ঘড়িকল প্রস্পেরো না বিদ্বেষপরায়ণ নির্ম্মম ইয়াগো? এ সব প্রশ্নের উত্তরে শুধু এই বলা যায়—বিচিত্র সৃষ্টিকর্ম্মের মধ্যে স্রষ্টা সেক্‌স্‌পীয়ার কখনও ধরা দেন নাই। এই শ্রেণীর কবিসম্পর্কে কীট্‌স্ মন্তব্য করিয়াছেন—'A poet is the most unpoetical of anything in existence, because he has no identity, no character'

অর্থাৎ—সৃষ্টিতে কবিই যেন সবচেয়ে অকবিসুলভ, কারণ, কবির রচিত প্রত্যেকটি চরিত্রেরই একটি ব্যক্তি-মহিমা আছে, কিন্তু কবি স্বয়ং যেন বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত, কাহারও সঙ্গেই তাঁহার তাদাত্ম্য নাই, তাঁহার কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নাই।

তাই কীটস বলেন—

'What shocks the virtuous philosopher delights the chamaleon poet'

কবি যেন বহুরূপীর মত বর্ণ পরিবর্ত্তন করেন। ইহাতে পূতচরিত্র দার্শনিক চমকিত হন সত্য কিন্তু কবি আনন্দ সম্ভোগ করেন।

বাস্তবিক যে কবি বিচিত্র চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া ভাগবতী লীলার অনুসরণ করেন, তিনি মহাভাগ্যবান, আর তিনি যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, তাহাও যথার্থ অহৈতুক। আবার সংকীর্ণ অর্থে যে রচনার রস সৃষ্টিই মুখ্য, যে রচনা প্রধানত পাঠকের মনে আনন্দ পরিবেশন করে এবং গৌণভাবে লেখকের ব্যক্তিগত মতামত বা জীবন-দর্শনকে পাঠকের হৃদয়ের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিলেও রসবস্তু যেখানে ক্ষুণ্ণ হয় না, তাহাও অহৈতুক। তবে, এ বিষয়ে বিস্তর তর্কের অবকাশ আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহা হউক, বিশুদ্ধ সাহিত্য আমাদের আনন্দ পরিবেশন করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ট্রাজিডি আমাদের যে দুঃখ দেয়, তাহাও এই আনন্দেরই অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাহাই নয়, সৃষ্টির মূলেই আছে কবির বেদনাবোধ। মহর্ষি বাল্মীকির অন্তরের শোক যেদিন শ্লোকরূপে তাঁহার কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইয়াছিল, সেদিন তিনি নিজেও বিস্মিত হইয়াছিলেন। 'ভাষা ও ছন্দে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'অলৌকিক আনন্দের ভার,
বিধাতা যাঁহারে দেন, তাঁর বক্ষে বেদনা অপার,
তাঁর নিত্য জাগরণ, অন্তরিল দেবতার দান,
উর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ'।

বন্ধু

সুশীল রায়

সে দেখা পরম অতর্কিত দেখা। ট্রেন চলেছে দ্রুতগতিতে পাশের কামরায় হাঁড়ি বাজিয়ে ধরে গান করছিল ভিরি। সারা গাড়ির লোক কান পেতে শুনছিল এই গান। মাঝে মাঝে বিরক্তও হচ্ছিল তারা। তার কারণ অন্য। ট্রেনের চাকায় যেন পাশোয়াজ বাজছে। তা বাজুক। কিন্তু বড় বেতালা বোল তার। এই গানের সঙ্গে অমন বাজনা মানায় না। যেন গানের গালে এক একটা থাপ্পড় মারছে।

ভিখিরী মানুষের এমন গলা? গলা নয়, যেন নুড়িরাশি। এ-লাইনে গানের উৎপাত নিয়ে নিত্য এমন কত ভিখারী হাজির হয়। কিন্তু আজকের এই ভিখারীর এমন আচমকা আবির্ভাবটা যেন তাজ্জব একটা চমক। এমন গান কেউ কখনো শোনেনি। না এমন গলা, না এমন ধরন।

ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। আট হাঁটু একত্র করে তার উপর কোঁচা বিছিয়ে নিয়ে তাস খেলা চলছিল, সে খেলা হয়ে গেল শুরুল।

ও কামরায় গলাবাজি করছিল নিত্যানন্দ। এ তার বেসাতি। কাটা ঘা, পোড়া ঘা, চোখ ওঠা, মাথা ধরার ওষুধ বেচার জন্যে মুখস্থ করা বক্তৃতা ঝিড়ছিল সে প্রাণপণে।

হঠাৎ তার বক্তৃতা মাঝপথে থমকে থেমে গেল। কান পেতে সে কী যেন শুনতে লাগল এক মনে। পাশের কামরা থেকে ওটা কিসের শব্দ? নিত্যানন্দের অভ্যাস আছে, জীবনের এমন ঝুঁকি তাকে নিতে হয় প্রায় রোজ। চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। চলে এল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। চলে এল সে পাশের কামরায়।

হাঁড়ি বাজিয়ে গান করে চলেছে ভিরি। নিত্যানন্দ তার হাতের সুটকেসটি বাঙ্কের উপর রাখল, এক হাতে লোহার শিকল ধরে আর এক হাত কোমরে দিয়ে সে শুনতে লাগল এই গান।

নতুন একটা গান ধরেছে ভিরি—

খ্যাপা মন আমার
হরি বলে ডাক রে রসনা।
হরি ব'লে যাবি চলে
যমে ছুঁতে পারবে না।

নিত্যানন্দ তার ক্যানভাসারির কাজ স্থগিত রেখে মশগুল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে এই গান। অবাক হয়ে যাচ্ছে সে। ট্রেনে ট্রেনে ওষুধ ভিরি করে বেড়ানোই তার কাজ। কত রকমারি ভিখারীর সঙ্গে তার দেখা হয়। কিন্তু এমন উঁচুদরের পাকা গাইয়ে ভিখারী সে আর দেখেনি।

চলন্ত ট্রেনে কামরা বদল করার কায়দা নিত্যানন্দ জানলেও ভিরি জানে না। তাই আপাতত তার গান সাঙ্গ হলেও সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল এক কোণে। পরের স্টেশনে গাড়ি থামলে সে আর এক কামরায় গিয়ে গান ধরবে। ভিরি দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে, আর একপাশ থেকে নিত্যানন্দ ক্যানভাসার ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে, তার চাউনি দেখে মনে হচ্ছে সুযোগ পেলেই ওই ভিখারী গাইয়েটাকে সে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

বেচেদায় গাড়ি দাঁড়াল। ভিরি নেমে গেল। তার পিছন পিছন নামল নিত্যানন্দ। প্ল্যাটফর্মে দু-জন দুজনের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল। তাদের এই দেখাটা সত্যিই বড় অতর্কিত দেখা।

তারপর কেটে গেছে প্রায় দশ-বারো বছর। তিরি এখন আর ভিখারী নয়, সে এখন ত্রিতীর্থেশ, সে এখন সম্রাট। যেমন তার নামডাক, তেমনি তার খাতির। কিন্তু নিতাইয়ের জীবনের কোনো বদল হয়নি, এখনো সে নিতাই ক্যানভাসার।

সে আজ দশ-বারো বছর আগের কথা। মেচেদা স্টেশনে পথ আটক করে দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, কী নাম তোমার?

—তিরিতীর্থেশ।

মনে মনে হেসেছিল নিত্যানন্দ। ভিখারীদের আবার নাম থাকে নাকি। বড়ই যেন নতুন লাগল তার, বড় অদ্ভুত ঠেকল। ভিখারীর উচ্চারণে গলতি থাকতে পারে, কিন্তু কথা বলেই যার জীবিকা অর্জন, তার ত্রুটি থাকবে কেন? নিত্যানন্দ একটু থেমে বলল, তার মানে ত্রিতীর্থেশ কি বল?

তিরি মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

—গাড়িতে উঠতে হবে না। এস।

সেই ডাকে কোনো জাদু ছিল কিনা, ত্রিতীর্থেশ আজও ভেবে পায় না। গাড়িতে না উঠে সে নিতাই ক্যানভাসারের পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। তীব্র হুইসেল বাজিয়ে মেচেদা থেকে ছেড়ে গেল ট্রেন।

নিতাই ফিরে চেয়ে বলল, ভিক্ষে তোমার ধাত নয় যে, ভিক্ষে তোমার কাজ নয়। অমন গলা যদি থাকত আমার, দুনিয়া জয় করে নিতাম আমি।

নিজের গলার তারিফ শুনে খুশি হল তিরি। কিন্তু এই গলা নিয়ে দিনে দেড় টাকা কি পাঁচ সিকে যার আমদানি, তার গলার আর দাম কি, তাই ভাবছিল সে।

নিতাই বলল, দিব্যি আরামে বসে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে রেওয়াজ চালাও, দুনিয়া তোমাকে জয় করতে হবে না, দুনিয়াই তোমার কাছে এসে ধরা দেবে তোমাকে। আর কে আছে তোমার? মা ভাই বোন—

মাথা নাড়ল তিরি, কেউ নেই।

নিতাই রঙ্গ করে বলল, কোনো ভিখারিণী?

—না।

—তবে তো লাট হে-তুমি, তবে তো তুমি রাজা। এস—

ত্রিতীর্থেশ পরম অনুগতের মত অনুসরণ করেছিল তাকে। সে আজ দশ-বারো বছর আগের কথা।

নিতাই ক্যানভাসার যেন জাদু হয়ে গেছে ওই জাদুকরের গলার আওয়াজে। তার রেস্ত কিছু নেই। কিছু থাকলে সে বুঁধ ঢেলে দিত ঐ জাদুকরীর পায়ের উপর। নিতাইও সাধারণ মানুষ। উলুবেড়িয়ার জীবনবন চাকির মেয়ে বনলতাকে সে বিয়ে করেছিল রূপের জন্য নয়, ঐ গলার জন্যেই। কিন্তু বনলতাটা মস্ত ঠগিনী, তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ চম্পট দিল পর পারে। সেই থেকে নিতাই একেবারে একা।

ফাঁকা জীবনের ফাঁক পূরণের পথ পেয়ে গেল যেন সে। ধরে নিয়ে এল তিরিকে। কোলাঘাট স্টেশন থেকে বাঁধ ধরে হেঁটে গেলে পনের বিশ মিনিট লাগে, একেবারে নদীটার কিনারেই সে তাকে ঠিক করে দিল এক ডেরা। বলল, কোনো চিন্তা নেই, কোনো ভাবনা নেই, এখানে বসে গলা ছেড়ে গলা সাধো। ভিক্ষে করা তোমার কাজ নয় যে।

তিরি অপলক চোখে তাকাল নিত্যানন্দের দিকে।

নিতাই বলল, বুঝেছি। আমি আছি রে ; আমি আছি। কাটা ঘা, পোড়া ঘা, মাথা ধরা—মানুষের থাকবেই, আমার ব্যবসাও থেকে যাবে। তুমি আর আমি—দুটি মাত্র তো জীব। ফুরিয়ে যাবে না এতে।

তিনি স্বপ্ন দেখছে কিনা বুঝতে পারলেন যেন। এমন কথা চট করে বিশ্বাস ক'রে নিতে তার বাধছিল।

নিতাই রে গলাটা ধরাজ। উচ্চারণ একেবারে মাজা ঘষা। ট্রেনে ট্রেনে লেকচার দিয়ে দিয়ে দুরস্ত করে নিয়েছে ভাষাটাও তাই তার কোনো কথায় ঘোঁয়া নেই, ধোঁয়াও নেই। স্পষ্ট করে সে বলল ; ফাঁসিয়ে যাও ওই হাঁড়ি। দুধি গাইয়ে, তোমার স্নানের সাজসরঞ্জাম সব এনে দেব আমি।—বলেই সে নিজের বুকে হাত দিয়ে বলল, আমি। এই নিতাই কানডাক্তার। কি, বিশ্বাস হচ্ছেনা? ভাবছ, কোনো মতলব আছে আমার?

বিশ্বাস করতে দশ দিন কয়েক লাগেই। তানপুরা, বাঁয়া আর তবলা নিয়ে এসে হাজির হল নিত্যানন্দ। অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাল ত্রিতীর্থেশ। সে যেন আকাশ থেকে পড়েছে এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে। কোনো কথা সরছেনা তার মুখ দিয়ে। চোখ দুটো একবার চক্ চক্ করে উঠলো শুধু, তারপর সে চোখ নামাল।

উবু হয়ে বসল নিত্যানন্দ ; বলল, ওকি হে। চোখ অমন ছলছল করে উঠেছে কেন?

গলা দিয়ে স্বর বার হলনা ত্রিতীর্থেশের। আনন্দের বাষ্পে গলা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

নিত্যানন্দ বলল, তুমি গুণী। বেঘোরে পড়ে এমন কত গুণী মার খেয়ে গেছে। তোমাকে সেই মারের হাত থেকে বাঁচাতে চাই। যদি তা পারি, তবেই আমি ধন্য হে, তবেই আমি ধন্য। আমার মতলব বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা এই।

রূপনারায়ণের কিনারে বেয়ে ওঠে বুড়িবাঁধীর মত নিথর গলা। নদীর কলস্রোতের সঙ্গে মিশে এই গলা যেন বেজে ওঠে সুমধুর জলতরঙ্গের মত। বেলোয়ারী আওয়াজের মত সেই কণ্ঠধ্বনিতে মধুময় হয়ে ওঠে রূপনারায়ণের কিনার।

সুনিপুণ কারিগর তার সূক্ষ্ম যন্ত্রে যেমন গান দেয় নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে তেমনি নিপুণতার সঙ্গে ত্রিতীর্থেশ পালিশ করে তার গলা। ভোর রাত থেকে রেওয়াজ আরম্ভ করে সে। মনে হয় যেন রূপনারায়ণ তার স্রোত থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শোনে ওই গলা।

স্রোতে ভেসে ভেসে তার গলার গান চলে যায় অনেক দূরে। বছরের পর বছর কেটে যায়, সেই সঙ্গে তার নামও ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

নিত্যানন্দ হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে কোলাঘাট স্টেশনে পায়চারি করছিল। কলকাতা থেকে যে ট্রেন আসছে, ওই ট্রেনে চেপে সে তার সর্বরোগহর ওষুধ কিরি করতে করতে খড়্গপুর পর্যন্ত যাবে। এই ফাঁকেও কিছু মাল বিক্রির জন্যে সে স্টেশনের যাত্রীদের মধ্যে ঘুরে ফিরে তার ওষুধের গুণ বর্ণনা করছে। এমন সময় হুড়মুড় শব্দে ট্রেন এসে হাজির।

প্যাসেঞ্জার নামছে উঠছে। মলমলের আর আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে জন-চারেক ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের একটা কুলীকে কি যেন জিজ্ঞাসা করছে।

কৌতূহল হল নিত্যানন্দের। একটু এগলো সে। কান পেতে সব শুনল। কুলীটা কিছু বলতে পারছেনা।

পাশ থেকে উপযাচকের মত নিত্যানন্দ বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

কলকাতা থেকে এঁরা এসেছেন ত্রিতীর্থেশের খোঁজে। তাকে এঁরা একবার নিয়ে যেতে চান।

গর্বে বুক ফুলে উঠল নিত্যানন্দের। সে ভদ্রলোকদের আগে হেঁটে চলল বাঁধের উপর দিয়ে।

নিত্যানন্দ ফিরে তাকাল, একটু দাঁড়াল। বলল, আপনারা শুনেছেন ওঁর গান?

—উঁহু। গান শোনা হয়নি। নাম শুনছি খুব, তাই তো সকলের শোনার এত আগ্রহ।

আর কোনো মন্তব্য করল না নিত্যানন্দ। আবার হাঁটতে লাগল আগে। আনন্দে ছুপা যেন টলে যাচ্ছে তার। বাঁধের উপর থেকে টাল খেয়ে পড়ে যাবে ঐ নদীর স্রোতের মধ্যে।

কলকাতায় গিয়েছিল ত্রিতীর্থেশ। এতদূরে গান গাইতে যাওয়া জীবনে এই তার প্রথম। নিতাইও সঙ্গে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেলনা। বলা যায় না, সেখানে গিয়ে তিরি যদি অপহৃত হয়ে যায়, তা হলে নিতাই তা সহ্য করতে পারবে না।

কিন্তু নিতাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে এল ত্রিতীর্থেশ, একটা রূপোর মেডেল ঝুলিয়ে এল গলায়।

আরো দিন যায়। আরো বছর কাটে। দিনে দিনে গর্বে বুক ফুলে ওঠে নিত্যানন্দের। কিন্তু কাজে তার বিরাম নেই। ক্যানভাস করতে করতে কোনো কোনো দিন সে খড়্গপুর পেরিয়ে চলে যায় মেদিনীপুর পর্যন্ত। একদিন হঠাৎ সে তার লেকচার থামিয়ে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের আলাপে কান পাতে। হাঁ, যা আন্দাজ করেছিল, তাই। গানের গল্প করছে ওরা। ওরা তিরির কথাই বলাবলি করছে। রামপুরের রাজবাড়িতে জলসা হয়ে গেছে পরশু। কলকাতা ও পাটনা থেকে নামকরা ওস্তাদরা এসেছিলেন, আর এখান থেকে গিয়েছিল ত্রিতীর্থেশ—মাতিয়ে দিয়ে এসেছিল সে আসর। সেই গল্পই হচ্ছে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে।

কিছুক্ষণ ওদের ওই আলাপ শুনে নিতাই ঠিক হয়ে দাঁড়াল। এ আলোচনার মধ্যে সে কেন। নিজের মত বেড়ে উঠুক ত্রিতীর্থেশ; নিজের মনে কাজ করে যায় নিত্যানন্দ।

লেকচার আরম্ভ করল সে গলা ছেড়ে। পৃথিবীর যাবতীয় অসুখের অদ্ভুত দাওয়াই আছে তার জিম্মায়, যে রকমের রোগ, যে কোনো পুরাতন ব্যাধি হোক, একবার খেলেই উপশম, তিনবার খেলেই—

একজন প্যাসেঞ্জার বাঁকা মন্তব্য করলেন, তিনবার খেলে কি হবে, মশাই? সব জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি।

নিত্যানন্দ হেসে বলল, হাঁ। শান্তি পাবেন, আরোগ্যলাভ করবেন। এক কৌটা নিয়ে যান সঙ্গে করে। পরীক্ষা করে দেখুন।

অবিশ্বাসী সেই ভদ্রলোক একটু কী চিন্তা করলেন, তারপর এক কৌটো তিনি নিলেন শেষ পর্যন্ত।

বাঁচ বিজ্ঞান বাক্যোক্তি—সব উপেক্ষা করার অদ্ভুত শক্তি অর্জন করে নিতে হয়েছে তাকে। এই শক্তি সে লাভ করেছে বলেই তার বেসাতি চলেছে তার মনের মত। তা না হলে তার চলবে কেন। একা মানুষের সংসার তো তার নয়। তারা যে দুজন। আসলে নিতাই নিজে আধ জন; পুরো হচ্ছে তিরি। গাইয়ে মানুষকে রীতিমত তোয়াজে না রাখলে তার গলা খুলবে কেন?—এই কথা ভেবেই নিতাই নিজের কাছেই নিজের গর্ব যেন জাহির করল।

কোলাঘাটের স্টেশনমাস্টার অতি গুণগ্রাহী ভদ্রলোক। নিতাইকে ডেকে বললেন, ওরে শোন।

বন্ধুর জন্যে এত তো করছ। তোমাকে রাখছ; আরামে রাখছ, খরচের তো কসুর করছ না। নাম প্রচারের জন্যে একটু লাগো।

নিতাই বলল, কিসের কথা বলছেন?

—নামের কথা। নাম ডাক যদিও হয়েছে খুবই। তবুও গাড়িতে গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ওই সময় কথার ছলে তোমার বন্ধুর নামটা প্রচার করলেও তো পার। ওঁর মত গাইয়ে যে নেই, এটা প্যাসেঞ্জারদের জানিয়ে দিলে তাদের মুখে মুখে আরো ছড়িয়ে যাবে চারদিকে।

নিতাই যেন একটু বিরক্ত হয়েছে, এইভাবে বলল, আচ্ছা।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, আসল মালের জন্য কি ক্যানভাস করতে হয়, মাস্টারমশাই। সাচ্চা গুণীর গুণ প্রচার করতে হয় না। আপনিই তার খুসবু ছড়ায়। যা নিয়ে ক্যানভাস করছি এই হচ্ছে ক্যানভাস করার মাল।

একটু থেমে বলল, গোলাপের আতর নিয়ে আমার কারবার, গোলাপ নিয়ে তো নয়।

মাস্টারমশায় সস্নেহে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন; বেশ। যা যা। বড় লায়েক হয়ে গেছিস। বড় কথা শিখেছিস।

কিন্তু কথা শিখবে না কেন সে? কথা বেচেই যে তার জীবনধারণ। কথা যেদিন বন্ধ হবে, সেদিন হয়ও যে বন্ধ হয়ে যাবে তার।

এবার ত্রিতীর্থেশের ডাক এসেছে একটু দূর থেকে। ভাগলপুর থেকে। লখনউ এলাহাবাদ বোম্বাই আর কলকাতা থেকে বাছা বাছা গাইয়ে নিয়ে মস্ত একটা গানের আসর বসছে সেখানে। ত্রিতীর্থেশকেও যেতে হবে।

যাবে। নিতাই খুব উৎসাহ দিতে লাগল তাকে। হেসে বলল, হাটে হাঁড়ি ভাঙব না। সে হাঁড়ি ভেঙে ফেলেছ অনেক আগে। কিন্তু ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কী হলে? তুমি যে এখন সম্রাট।

কৃতজ্ঞতা জানাবারই কথা। কিন্তু তার ভাষা কই। ত্রিতীর্থেশ অপলক চোখে তাকাল নিত্যানন্দের দিকে। চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো তার।

নিতাই বলল, তোমার এ খ্যাতির জন্যে তোমার আনন্দ খুবই। কিন্তু তার চেয়েও আনন্দ কার বেশী বলো তো।

উত্তর দিল না ত্রিতীর্থেশ; উত্তর দেওয়ার ভাষাও নেই, কেবল সে নিতাইয়ের কাঁধে একটা হাত রাখল। নিতাইয়ের জিজ্ঞাসার এইটেই যেন জবাব।

ত্রিতীর্থেশ বলল, এবার তুমি সঙ্গে চলো।

—আমি? আমি কেন?

—এমনি। অমন আড়ালে লুকিয়ে থাকা চলবেনা তোমার। আমার অনুরোধ রাখতে হবে!

যে বেশি কথা বলে না, তার একটি কথারই ওজন খুব। অগত্যা তাই রাজি হতে হল নিত্যানন্দকে। খালি হাতে সে কখনো ট্রেনে চড়েনি। সব সময়ই তার হাতে হাতে লেগে থাকে একটা ওষুধ ভর্তি সুটকেশ। এবার সে সুটকেশের দরকার নেই, এবার সে চলেছে অন্য কাজে। তাই হাত কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। হাত দুটো যেন বাড়তি মনে হচ্ছে, কোথায় রাখবে ঠিক করতে পারছে না। একবার হাত পকেটে রাখে, একবার হাত দিয়ে কোঁচা আঁকড়ে ধরে। তার উপর আরো অস্বস্তি আছে। সে একজন ক্যানভাসার—তাকেও এরা কি রকম খাতির করে নিয়ে চলেছে।

নিত্যানন্দ ত্রিতীর্থেশকে দেখিয়ে বলে, ওঁর দিকে একটু নজর দিন। দেখুন, কিছু দরকার আছে কিনা।

—ওঁর কাছে লোক আছে।

ভাগলপুরের আসর সাতদিন ধরে চলবে। বিরাট ব্যাপার। চোখে ধাঁ ধাঁ লাগার মত কাণ্ড। নিতাই চোখ বড় বড় করে চারিদিকে তাকায়। তার মনে পড়ে দশ-বারো বছর আগের কথা। সেই একদিন, আর এই একদিন। সে দিনের সেই ভিরি-ভিখারী আজ ত্রিতীর্থেশ, আজ সম্রাট। এই আসরে সে গান গাইবে আজ।

এসব নাম কোনদিন শোনেওনি নিত্যানন্দ, জানেও না সে। বোম্বাইয়ের খুব নামকরা গাইয়ে ইনি। সারা ভারতের মধ্যে এঁর আসন নাকি খুব উঁচুতে। গান যখন আরম্ভ হল, তখন নিত্যানন্দ বুঝল, হ্যাঁ। এমন যার গান তাঁর স্থান উঁচুতে হবে বইকি। একটানা দেড় ঘণ্টা গেয়ে গেলেন তিনি গান। গান থামার পর সারা আসর ফেটে পড়ল হাততালিতে।

আরো দু'তিনজন গাইবার পর আসরে এসে বসল ত্রিতীর্থেশ। বুকটা দুর দুর করে উঠল নিত্যানন্দের। একেবারে প্রথম লাইনের একটি চেয়ারে সে বসেছে। এখান থেকে ত্রিতীর্থেশকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়া হল যে, ইনি এখন গাইছেন রামকেলী রাগে খেয়াল, তারপরে একটি ঠুংরি শোনাবেন।

শুরু প্রতীক্ষায় বসে আছে পুরো আসরটা। ঝংকারে বেজে উঠল তানপুরা। চোখ বন্ধ ক'রে বসে আছে ত্রিতীর্থেশ। তারপর সে শুরু করল আলাপ। একটা সূঁচ পড়লে শব্দ পাওয়া যায়, এমনি স্তব্ধতা চারিদিকে।

এত উঁচুদরের গাইয়ে হয়ে গেছে নাকি ত্রিতীর্থেশ। যত বড় বলে সে জানত এ যে তারও বড় হয়ে গেছে। আসরে তারিফের শব্দ বেজে উঠছে মাঝে মাঝে—আর ওদিকে চলেছে সেই গান।

দু ঘণ্টার বেশীই হবে। ত্রিতীর্থেশ করজোড়ে নমস্কার করে গান শেষ করল।

এরপর ঠুংরি হবে। কিন্তু উচ্ছ্বাসে উতল হয়ে উঠেছে সমস্ত আসর। করতালি আর থামেনা কিছুতে।

কয়েকটি ফুটফুটে মেয়ে চকচকে জামাকাপড়ে সেজে ত্রিতীর্থেশের গলায় মালা পরিয়ে দিতে গেল, অমনি উঠে দাঁড়াল ত্রিতীর্থেশ। ইশারায় তাদের ডেকে নিয়ে গেল মঞ্চের নেপথ্যে এবং কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরে এসে বসল নিজের জায়গায় তানপুরা নিয়ে।

হঠাৎ এ কী ব্যাপার? চমকে উঠল নিত্যানন্দ। তার গলায় মালা দিতে এসেছে ওই মেয়েরা?

নিতাই বাধা দিল। অমনি উদ্যোক্তাদের মধ্যের প্রবীণ এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, ওঁর কাছে আমরা সব শুনেছি, ট্রেনে আসতে আসতেও বলেছেন, এখনও আবার বললেন—নিন বাধা দেবেন না মেয়েদের।

নিতাই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না। না, তা হয় না।

তানপুরা শুইয়ে রেখে ত্রিতীর্থেশ নেমে এল। বলল, আমার কাছে দিন। ও-মালা আমিই পরিয়ে দেব।

ত্রিতীর্থেশ নিতাইয়ের গলায় মালা পরিয়ে দিতে দিতে আসরের সকলের উদ্দেশে বলল, আপনাদের আমি বলব সব কথা। যে গানটা এবার করছি এটা শেষ করেই।

ত্রিতীর্থেশ গান ধরল। নিতাই তার খালি হাত দুটো কাঁধে লাগিয়ে নিল। দুই হাত দিয়ে গলার ভারি মালাটার ঝুলন্ত দিকটা ধরে হতচকিত হয়ে সে বসে রইল।

ময়ূরকণ্ঠীর বিচিত্র অবদান

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

ময়ূরকণ্ঠীর বিচিত্র অবদান নৃত্যনাট্য "বাল্মীকির জয়" এবং "মহেশ" বহু বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও মঞ্চস্থ হয়নি। এতে কলকাতার বিদগ্ধ সম্প্রদায়ের দুঃখ যে কী গভীর তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। আরো মর্মান্তিক ময়ূরকণ্ঠীর অকালমৃত্যু। শেষ পর্যন্ত দু'টি অনুষ্ঠান যখন হ'ল না এবং তাদের রিপোর্ট দেবার সুযোগ হল না তখন উক্ত মহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ প্রেস কনফারেন্সে আমাদের কাছে তাঁদের পরিকল্পনা যেভাবে প্রধান করেছিলেন তার বৃত্তান্ত আপনাদের গোচর করা কর্তব্য মনে করি। অপরাপর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হয়তো এই বৃত্তান্ত পাঠে অনুপ্রাণিত হতে পারেন এবং ময়ূরকণ্ঠীর গুরুভার নিজেদের সুদৃঢ় স্কন্ধে উত্তোলন করে নিতে পারেন। তাতেও এই "বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি" গৌরবান্বিত বোধ করবেন।

"এক কাপ চা-এর সঙ্গে একটু আলোচনা করতে পারলে খুব কৃতার্থ"—ময়ূরকণ্ঠীর কর্তৃপক্ষের নিমন্ত্রণের ইংরেজি ভাষাটা ছিল এই রকম—অতি বিনীত এবং সংক্ষিপ্ত। গিয়ে দেখি নেহাৎ চা নয়—তার সঙ্গেও অনেক কিছু—ময়ূরকণ্ঠীর মডেস্ট আয়োজন। আজকাল প্রেস কনফারেন্সের প্রতি কোন কোন প্রতিষ্ঠান এইরকম বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করে একটা আদর্শ স্থাপন করেছেন। অপরাপর প্রতিষ্ঠানও এরকম সুচিন্তিত প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করলে লাভবান হবেন এটা আমার স্থির বিশ্বাস।

যথারীতি পরিচয় সম্ভাষণের পর "দি সাইক্লোন" পত্রিকার বিশ্বম্ভর চ্যাটার্জি একটি কাটলেট চিবিয়ে টাইটা বাঁ হাতে একটু চিলে করে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা এই ইয়ে ময়ূরকণ্ঠী নামটার তাৎপর্য্য কি বলতে পারেন? হোয়াই অন আর্থ এই নামটা আপনারা চুজ করলেন?"

ময়ূরকণ্ঠীর কালচারেল সেক্রেটারি সুললিত তরফদার উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে ফাউণ্ডার প্রেসিডেন্ট চক্রধর পালিত বললেন—থ্যাংক য়ু দেখুন এই নামকরণের মধ্যেও আমাদের কতখানি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের ইনষ্টিটিউসনে গীত এবং নৃত্য দুই-ই শেখানো হয়। কণ্ঠ অতিয়াস্‌লি স্ট্যাণ্ডস ফর গীত অ্যাণ্ড ময়ূর ফর ড্যান্স। বলুন দেখি চয়েসটা কেমন হয়েছে।"

"ইউনিক"—মন্তব্য করলেন সাপ্তাহিক নটবর পত্রিকার মিউজিক ক্রিটিক—ত্রিনারদ।

চক্রধর বললেন—"এই এক বছরের মধ্যেই ময়ূরকণ্ঠীর চারটে ব্রাঞ্চ হয়েছে ইন ফোর কর্ণার্স অফ ক্যালকাটা। শীঘ্রই সেণ্ট্রালে আর একটা খোলা হবে। আজ কলকাতার স্বনামধন্য আর্টিষ্টদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য প্রায় সকলেই আমাদের ইনষ্টিটিউসনে যোগদান করেছেন।"

"দৈনিক শাশ্বতী" পত্রিকার উপেন শীল প্রশ্ন করলেন—"গীতসোপানও ইতিমধ্যে কলকাতায় দুটো ব্রাঞ্চ খুলেছেন মাপ করবেন তাঁদের সঙ্গে আপনাদের কি কমপিটিশন চলেছে?"

"বাই দি বাই" বিশ্বম্ভর বললেন" ওঁরাও তো একটা প্রেস কনফারেন্স কল করেছেন—ডেটটা কবে যে উপেন?"

"কি?" একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন ময়ূরকণ্ঠীর সদস্যবৃন্দ। চক্রধর সবাইকে নিরস্ত করে বললেন—"কমপিটিসন অবশ্য বলতে পারেন—তবে হেল দি কমপিটিসন। দেখুন ওরা আমাদের সব ব্যাপারে কেমন নিখুঁতভাবে ফলো করে। একদিন আমিই নিজের হাতে গীতিসোপানকে গ'ড়ে তুলেছিলাম আর আজ তারা আমাকে তো সরিয়ে দিয়েছেই তার ওপর আমার গড়া ময়ূরকণ্ঠীর ওপরও ওদের আক্রোশ কী ভয়ানক। কিন্তু আমিও দেখিয়ে দেব। ওরা করছে রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা" আর আমরা

করব হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বাল্মীকির জয়"—যা আজ পর্যন্ত কেউ করবার সাহস করেনি। আপনারা শুনে সুখী হবেন আমরা আরো একটি অসমসাহসিক পরিকল্পনা করছি সেটি হচ্ছে শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্পের নৃত্যনাট্যরূপ। আরও আছে রবীন্দ্রনাথের "হোরিখেলা" কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ। বস্তুত এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্যই আপনাদের আজ আমন্ত্রণ করেছি এবং আপনারা যে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এজন্য আমরা যে কত কৃতজ্ঞ তা প্রকাশ করবার ভাষা আমাদের নেই।"

ইতিমধ্যে ড্রিঙ্ক এসে গেল। সবাই সাগ্রহে এক একটি গেলাস হাতে নিলেন। চক্রধরও একটি পাত্র নিয়ে গলা খানিকটা ভিজিয়ে নিলেন। তারপর একটু ভেবে নিয়ে আরম্ভ করলেন—"রবীন্দ্রনাথ একটি চমৎকার কৌশল আমাদের শিখিয়ে গেছেন সেটি হচ্ছে নৃত্যনাট্য। বাংলার প্রায় সব গল্পই চেষ্টা করলে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করা যায়। তবে ক্ষমতা থাকা দরকার। সে ক্ষমতা গীতসোপানের নেই তা আমি বিলক্ষণ জানি এবং এও জানি যে সে ক্ষমতা মঞ্জুরকীর যথেষ্ট আছে। গীতসোপান রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা নিয়ে পড়ে আছে কিন্তু আমরা নব নব সৃষ্টিতে এগিয়ে চলেছি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বাল্মীকির জয়" গ্রন্থটি পড়লেই বোঝা যায় এটি নৃত্যনাট্যের বিশেষ অনুকূল। এ বিষয়ে আমাদের কল্পনা জাগ্রত করেন অধ্যাপক চন্দ্রধর ভট্টাচার্য্য। তিনি আমাদের কালচারেল ডিপার্টমেণ্টের বিশিষ্ট সভ্য। তাঁরই চেষ্টায় বাল্মীকির জয় কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে কয়েকটি প্যাসেজ আমরা হরপ্রসাদের ভাষাতেই রেখেছি কিন্তু তাও যে কেমন মনোরম সুরে রূপান্তরিত হয়েছে তার কিছু নমুনা আপনাদের দিচ্ছি।

চক্রধরের ইঙ্গিতে শিল্পীবৃন্দ প্রস্তুত হলেন। ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। হারমোনিয়াম, তানপুরা বাজল সঙ্গে এসরাজ, বেহালা, গীটার। একজন মণিপুরী খোলে বোল তুললেন। ক্রমে একক, দ্বৈত এবং মিশ্রকণ্ঠে হ'ল সেই কোরাস প্যাসেজ—

ঘুরিতে ঘুরিতে বিশ্বামিত্র পড়িতেছেন
ক্রমে ব্রহ্মার কৌশলে
সেই অবস্থায়
তাঁহার জ্ঞান হইল।
জ্ঞান হইলে তাঁহার
মনের ভাব
কি হইল (কি কি কি তিনবার)
মানুষে কি লিখিবে।
একবার ভাবিলেন—
আমি কোথায় (কোথায় ওরে কোথায়)
দেখিলেন
(মুহূর্ত বিরাম)
পুনর্বার
চক্ষু (সেই অনুপম চক্ষু)
মুদ্রিত হইল;
আবার অজ্ঞান
আবার জ্ঞান হইল

আবার অজ্ঞান (হায় সে কি বেদনায়)
আবার জ্ঞান হইল
　　আবার অজ্ঞান।
একবার ভাবিলেন
　　কোথায় যাইতেছি
(কোথায় কোথায় হায় সে কোথায়)
একবার মনে করিলেন
　　বুঝি নরক নিকটে।
(হায় এ কি সর্বনাশ)
ভয়ে ভীত হইয়া—
　　আবার
　　অজ্ঞান হইলেন।
(হায় বীর একি পরিণতি।) ইত্যাদি।

প্যাসেজটি শেষ হলে চক্রধর হাস্যোজ্জ্বল মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন লাগল কম্পোজিসন ?" নটবর খিলখিল করে হাত কচলে হাসলেন।

চক্রধর বললেন—"এইটুকু প্যাসেজে ছ'রকম বিভিন্ন তালের পরিচয় পাওয়া যাবে আর উত্তর-দক্ষিণ ভারতের প্রায় আটরকম নৃত্যপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। আরও নানারকম নৃত্য প্রয়োগ করা হবে। আমাদের ট্রেনাররা এই পারপাসেই এখন বিদেশে আছেন—শীঘ্রই ফিরবেন।

ছুচোখ স্থির নিয়ে চক্রধর বলতে আরম্ভ করলেন—"মহেশের নৃত্যনাট্যরূপ একটা অসমসাহসিক ব্যাপার। ওটা আমারই আইডিয়া। অনেকদিন আগেই এই আইডিয়া আমার মাথায় এসেছিল এবং আমি এই উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেও ছিলাম।

(হাউ ওয়াণ্ডারফুল—দি সাইক্লোন পত্রিকা)

শরৎচন্দ্র আমার প্রস্তাব শুনলেন। শুনে তিনি আমায় আশীর্বাদ ক'রে বললেন—"আমার মহেশকে নিউ এম্পায়ার স্টেজে নাবাতে পারে এমন প্রতিভা একমাত্র তোমার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি।" আমি তখন তাঁকে নৃত্যনাট্যের উপযুক্ত করে মহেশকে আর একটু ঘুরিয়ে লেখবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি রাজি হয়ে আমাকে কিছুকাল অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। কিন্তু সেদিন থেকেই তাঁর পেটের যন্ত্রণা বাড়তে থাকে এবং অল্প ক'দিনের মধ্যেই আমরা তাঁকে হারালুম।"

চক্রধর স্বর্গত ঔপন্যাসিকের প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললেন—"সুতরাং মহেশের নতুন নাট্যরূপ আর হ'জনা, আমরা সেই পুরোনো গল্পটিকেই নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছি।"

শাশ্বলীর শীল মশাই প্রশ্ন করলেন—"মহেশের ভূমিকাটি বোধ হয় আপনাকেই—"

"না না—" চক্রধর মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—"সে সম্ভব নয়, কেউই করবে না ; অ্যাকচুয়েলি ওটা হবে ভাণ্ডোগ্রে—একটা ওয়াণ্ডারফুল একেই হবে দেখবেন।"

নটবর পত্রিকা আবার খিল খিল করে হাসলেন।

"হ্যাঁ এতেও আমরা কিছু কিছু শরৎচন্দ্রের ভাষা সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করব"—বললেন চক্রবর্তী "বিশেষ করে একবারে শেষে যেখানে গফুর বলছে,—আল্লা আমাকে যত খুসি সাজা দিও—সেই প্যারাগ্রাফটি। এই সব অংশের সুর দিয়েছেন এবং নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন গণসঙ্গীতসংসদের কমরেড গণেশ রুদ্র।

দৈনিক প্রতিনিধির প্রতিনিধি এতক্ষণে মুখ খুললেন—"আচ্ছা হরিখেলা মানে সেই কথা ও কাহিনীর কবিতা? পাঠানমোগলের ব্যাপার নিয়ে কিরকম নাচগান হবে মশাই?"

"যখন হবে তখন দেখতে পাবেন কী চমৎকার পরিকল্পনা আমাদের"—উত্তর দিলেন চক্রবর্তী "কেশব খাঁর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন আবদুল হামিদ। ইনি অনেকদিন ইস্তাম্বুলে থেকে ক্লাসিকাল তুর্কীনাচ আয়ত্ত করেছেন। এঁর সেই অংশটা অনবদ্য—

পত্র পড়ি কেসর উঠে হাসি
মনের সুখে গোঁকে দিল চাড়া
রঙিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে
সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে
সত্তরবার দাড়ি দিল ঝাড়া
পাঠান-সাথে চোরি খেলবে রাণী
কেসর হাসি গোঁকে দিল চাড়া।

এই নৃত্যনাট্যে আমরা রাজস্থানের বিভিন্ন লোকনৃত্যও পরিবেশন করব। এই উপলক্ষ্যে আমরা রাজস্থানে আমাদের ড্যান্সিং স্টাফের তিনজনকে পাঠিয়েছি। তাঁদের আসবার আর দেরি নেই।"

চক্রবর্তী একটু থামলেন। আবার একটু ছিদ্র নিয়ে বললেন—"মোটামুটি আপনাদের কাছে আমাদের স্কীমটা সবই বললাম। এই প্রচেষ্টার আমাদের উপযুক্ত পাবলিসিটি দেবার ভার আপনাদের ওপর। আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব আপনাদের আর বিশেষ করে বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই। আমাদের নৃত্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটু স্পেশাল পাবলিসিটি আমরা চাই—কেন তা আমরা আপনাদের পূর্বেই জানিয়েছি। প্রেসের কাছ থেকে আমরা নিরাশ হব না এ বিশ্বাস আমাদের আছে। ধন্যবাদ।"

আমরাও ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয় নৃত্যনাট্যটি সফল হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল নৃত্যের ট্রেণিং নিতে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা আর কেউ ফেরেননি এবং তাঁদের বিষয় সঠিক খবরও পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ নাকি ফৌজদারি কেসে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কেউ হাসপাতালে গিয়েছিলেন, কেউ পুলিসের অনুসন্ধান থেকে বাঁচবার জন্য আত্মগোপন করেছিলেন। কেউ কোন নর্তকীকে বিবাহ করে স্থানান্তরে প্রস্থান করেছিলেন। প্রধানা নায়িকা সুষমাদা দলুই ভারত সরকারের একজন ডেপুটি সেক্রেটারীকে বিবাহ করে হঠাৎ দিল্লীতে চলে গেলেন। আবদুল হামিদও কাউকে না জানিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। মযূরভঞ্জী সময় নিলে। কিন্তু তাতে ফল হয়নি কেননা দুঃসময় যখন আসে তখন এমন সময় নিতে নিতেই শেষ সময় ঘনিয়ে আসে।

আমি অবশ্য সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে কর্তব্য পালনের ত্রুটি করিনি। গীতসোপানে গিয়েছিলাম অনুরোধ করতে তাঁরা যেন এই দায়িত্ব স্বীকার করতে সঙ্কোচবোধ না করেন কিন্তু হতভম্বের মত অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হল। তাঁদের সেক্রেটারি বললেন—"আপনাদের কাগজে যা খুসি লিখুন মশাই—আমাদের পেছনেও দুর্গাবর্তের সম্পাদক, তমোনাশ-এর বার্তা-সম্পাদক রয়েছে জেনে রাখবেন।" কিন্তু গীতসোপানও আজ নেই। কি ভাবে এই প্রতিষ্ঠান কাল-কবলিত হল সে সম্বন্ধে বলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে। অতএব এ আলোচনা থাক।

দুঃখ এই যে এমন তিনটি অবদান সফল হল না।

বার্ণার্ড ল মণ্টগোমারী

মহাভারত শর্ম্মা

১৯৪২ সালের জুলাই আগষ্ট—

আফ্রিকার মরুপ্রান্তরে ইংরাজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ঘরে বাহিরে সর্বত্র ধিক্কার। সর্বত্র তার বিরূপ সমালোচনা। চার্চিলের মন্ত্রিসভা এবং যুদ্ধ পরিচালনার নীতির বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট বিক্ষুব্ধ মুখর। পৃথিবীর সকল দেশের পত্রিকার প্রধান সংবাদ তখনও ইংরাজের পরাজয় কাহিনী।

আফ্রিকার ভোক্রুকের পতনে ইজিপ্টের পথ তখন শত্রুপক্ষের সেনাপতি রোমেলের নিকট সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। যে কোন সময় রোমেল ইজিপ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে সুয়েজ দখল করে নিতে পারে। তাহলে ভারতবর্ষ সিংহল ব্রহ্মদেশ অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে। ইংলণ্ডের পক্ষে তখন যুদ্ধ করার আশা আর থাকবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু ঐ আগষ্ট মাসের তিরিশ এবং সেপ্টেম্বরের তিন তারিখের মধ্যে ইংলণ্ড এবং সারা পৃথিবী শুনল একজন নূতন ইংরাজ সেনাপতি রোমেলের আক্রমণের মুখেও পিছু হটে আসেনি। রোমেলের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। ক্রমাগত পরাজয় কলঙ্কিত ইংলণ্ডের পক্ষে এ এক শুভ সূচনা এবং এর গৌরব যে সেনাপতির প্রাপ্য তাঁর নাম বার্ণার্ড ল মণ্টগোমারী।

ইংরাজ জাতি আজ মনে করে মণ্টগোমারী পৃথিবীর সমকালের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের অন্যতম। মার্লবরো এবং ওয়েলিংটনের সমকক্ষতো বটেই। তারা তাঁকে বহুবিধ সম্মান দিয়েছে। এখন তিনি লর্ড—ভাইকাউণ্ট মণ্টগোমারী অব আলামিন।

প্রায় ছমাস পরে—নভেম্বরের প্রথম তিন দিনের মধ্যে এল আলামিনে মণ্টগোমারী রোমেলকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। ইংরাজের এই প্রথম জয়—জার্মাণীর এই প্রথম পরাজয়। এল আলামিনের যুদ্ধ ইংরাজ জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

• • • • •

বার্ণার্ড মণ্টগোমারীর পূর্বপুরুষ রোজার মণ্টগোমারী বিজয়ী উইলিয়ামের সহযোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁরা একদলে নরম্যাণ্ডি থেকে ইংলণ্ডে আসেন। গত শতাব্দীতে মণ্টগোমারীর পিতামহ রবার্ট সিপাহী যুদ্ধের সময় ছিলেন পঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গভর্ণর। সেখানকার মণ্টগোমারী জিলার এবং সহরের নাম তাঁর নামানুসারে রাখা হয়। এ জেলার গরু মণ্টগোমারী গরু নামে প্রচুর দুধের জন্য বিখ্যাত।

মণ্টগোমারীর পিতার নাম হেনরী। তিনি ছিলেন পাদ্রী। তাঁর কর্মস্থল ছিল অষ্ট্রেলিয়ার নিচে তাসমানিয়া দ্বীপের প্রধান সহর হোবার্টে। সেখানে মায়ের কড়া শাসনে বার্ণার্ডের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। অল্প বয়স থেকেই বার্ণার্ড অত্যন্ত অবাধ্য এবং একগুঁয়ে—পরিবারের সবচেয়ে খারাপ ছেলে। মা কোনদিনই তাকে শাসন করে পুরোপুরি বাগ মানাতে পারতেন না। স্কুলে ফিরে এসে সেই পুরান স্কুলে পড়বার সময় মা বাবাকে জিজ্ঞাসা না করেই বার্ণার্ড আর্মি ক্লাসে যোগ দিল। কারো কোন কথা—শাসন বা অনুরোধ কিছুই শুনল না।

আমি ক্লাশের সহপাঠিদের সঙ্গে ঝগড়া এবং শিক্ষকদের শাসনের প্রতিবাদ করা তাঁর স্বভাব ছিল। এ স্বভাব তাঁর কোনদিন যায় নাই। তাছাড়া সেদিনের সাধারণ ইংরাজের বিপরীত ছিল তার স্বভাব। তিনি নাচতে পারতেন না। মদ খেতেন না, এমন কি সিগারেটও না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে মেয়েদের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি বা ঔৎসুক্য কিছুই ছিল না তাঁর ওপরওলাদের সঙ্গে সব বিষয়েই কেবল তর্ক করতেন। যখন পদমর্যাদার খাতিরেও তাদের কথা বিনা প্রতিবাদে শোনা প্রয়োজন তখনও বার্ণার্ড মণ্টগোমারী তাদের সঙ্গে বিনাদ্বিধায় তর্ক সুরু করতেন।

শুধু একটিমাত্র বিষয়ে সকলেই মণ্টগোমারীর প্রশংসা করত। খেলাধূলাতে তাঁর অসমা উৎসাহ ছিল। কোন খেলাতেই তিনি হার মানতে চাইতেন না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মাণীর ক্রাউন প্রিন্স বোম্বেতে আসেন। তাঁর দলের সঙ্গে ওয়ারউইক রেজিমেণ্টের যে ফুটবল খেলা হয় তার ক্যাপ্টেন ছিলেন মণ্টগোমারী। কর্তৃব্যক্তিদের আদেশ ছিল ক্রাউন প্রিন্সের দল যাতে খেলায় জিততে পারে এমন সাধারণ খেলোয়ার দিয়ে ওয়ারউইকের দল তৈরী করতে হবে। কিন্তু খেলায় জার্মান দল কোন গোল দিতে পারল না, মণ্টগোমারী দল দিল চল্লিশ গোল। কর্ণেল ডেকে কৈফিয়ৎ চাইলে মণ্টগোমারী উত্তর দিল, জার্মাণীর কাছে আমরা হারতে পারি না।

• • • • •

প্রথম মহাযুদ্ধে মণ্টগোমারী গুরুতররূপে আহত হন। একটা বুলেট তাঁর পাঁজরা ভেদ করে চলে যায়। সকলেই মনে করেছিল তাঁর মৃত্যু অবধারিত। তাঁর জন্য কবরও খোঁড়া হয়। কিন্তু নেহাৎ আয়ু ছিল তাই তিনি সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। এ সময় তিনি পদমর্যাদায় ক্যাপ্টেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইয়োরোপে শান্তির ললিত বাণী প্রায় সকলের মনে ধারণা এনে দিল যে আর যুদ্ধ হবে না। কেন না, যুদ্ধের আর প্রয়োজন নেই। মণ্টগোমারী একথা বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন যুদ্ধ আসবেই, যুদ্ধ হবেই—আগুনের ফুলকি যেমন উপরের দিকেই যায় বিভিন্ন জাতির মধ্যেও তেমনি যুদ্ধ শুরু হয়। সুতরাং সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন চিরকাল। শান্তি ও মৈত্রীর সুমিষ্ট কথা ভাল নিঃসন্দেহ—কিন্তু তাঁর মতে এসকল ভাল কথা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করবার জন্য শক্তিমান হওয়ার প্রয়োজন আছে সৈন্যবাহিনী বজায় রাখিবার প্রয়োজন আছে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যকাল ইংলণ্ডের পক্ষে স্বপ্নময় সুখের সময় —ভবিষ্যৎ কোন বিপদের চিন্তা নাই। সৈন্যবাহিনী আছে—তা শুধু সাম্রাজ্যে শান্তি বজায় রাখবার প্রয়োজনে। কিন্তু সেই সৈন্যদলের উন্নতির চেষ্টা নাই, আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নাই।

মণ্টগোমারীর এসব ভাল লাগছিল না। কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার জন্য তিনি শীঘ্রই নেতা হলেন এবং এসময় থেকে অধঃস্তন অফিসারদের প্রতি সপ্তাহে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে আগামী যুদ্ধের নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর মতে প্রথম মহাযুদ্ধের আত্মরক্ষার নীতি আগামী যুদ্ধের অনুপযোগী হবে। ভবিষ্যতের যুদ্ধে আক্রমণকারী জয় লাভের সুবিধা পাবে—সুতরাং আক্রমণাত্মক প্রস্তুতিই যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। আরও একটা কথা মণ্টগোমারী বলতেন। যুদ্ধের সময় প্রতিটি সৈনিকের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। লক্ষ সৈন্যের একজন হয়ে সে যেন অবহেলিত না থাকে। তার মনে উৎসাহ ও আশা সঞ্চার করে একথা তাকে জানাতে হবে যে যুদ্ধকালে তার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চতম সেনাপতি ছোটখাট খুঁটিনাটি কাজের তদারক না করে সে সব ছেড়ে দেবেন অধঃস্তন কর্মচারীদের উপর। তিনি নিজে ঐ সময় প্রতিটি সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে মিশে তাদের মনোবল বাড়িয়ে তুলবেন। তাছাড়া, বুদ্ধিপ্রসূত

চালাকিও যুদ্ধে খুব প্রয়োজন। শত্রুপক্ষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে হবে। আক্রমণের আগে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এতে সামান্য অসম্পূর্ণতাও বিফলতা আনতে পারে। আর, শত্রুর মর্ম স্থানে একবারেই আক্রমণের চেষ্টা না করে একটু ঘুরে যেতে হবে। সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের অংশে থাকবে সর্বোত্তম এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিশীল বাহিনী—তারা সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হলেও যেন গভীরভাবে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়ে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আরও বড় কথা—লক্ষ্য রাখতে হবে শত্রু যেন আমার পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। আমি যেন তার পরিকল্পনা অনুসরণ না করি।

মন্টগোমারীর এই সকল ধারণা ও যুদ্ধের পদ্ধতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে অবলম্বিত হয়েছে।

• • • • •

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী কত অপ্রস্তুত ছিল তার প্রমাণ যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম তিন মাসের মধ্যে তারা জার্মানীতে একটিও বোমা নিক্ষেপ করেনি বা করতে পারেনি। আর সম্মুখ সমরের কাহিনী ডানকার্কের ঘটনা। ডানকার্কের দুর্ঘটনায়ও মন্টগোমারীর ভাগ্যে প্রশংসা জোটে। কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন তাঁর জন্যেই ইংরাজ সৈন্যবাহিনী নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ফিরে আসতে পেরেছে। মন্টগোমারী বলেন এসময় ইংরেজদের যুদ্ধ পরিচালনার উপযুক্ত ছয় জন সেনাপতিও ছিল না। উপকরণ যা ছিল তা একটা লড়াইয়ের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ এর অন্যতম প্রমাণ।

এই বিষম যুদ্ধের উপকরণ ও সেনাপতি সংগ্রহ এবং তৈয়ার করতে তিন বৎসর লাগে। এবং তাও সম্ভব হয় আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেবার ফলে।

• • • •

অক্টোবরের শেষে আর নভেম্বরের প্রথমে এল আলামিনের যুদ্ধ হয়। মন্টগোমারী এজন্য প্রথম থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৈরী হন। চার্চিলের ইচ্ছা ছিল আরো আগে সেপ্টেম্বরেই রোমেলকে আক্রমণ করা। কিন্তু মন্টগোমারী রাজী হন নি। তিনি পরিষ্কার জানালেন—

১। সেপ্টেম্বরের আক্রমণ ব্যর্থ হবে। পরাজয় নিশ্চিত।

২। অক্টোবরের শেষে আক্রমণ করলে জয় নিশ্চিত। সেজন্য আমি দায়ী।

৩। আমি কি সেপ্টেম্বরে আক্রমণ করব?

চার্চিলের মত দুরন্ধর লোকও একথার পর আর চাপ দিতে সাহসী হলেন না।

নিজের উপর অবিচলিত বিশ্বাস মন্টগোমারীর অন্যতম প্রধান শক্তি। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন ২৩শে অক্টোবরে এক যায়গায় ট্যাঙ্ক আর পদাতিক বাহিনী এমনভাবে অগ্রসর হয় যে সম্মুখের সরু পথে শত্রুসৈন্যের অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে ঐ বিরাট বাহিনী যাওয়া প্রায় অসম্ভব। জেনারেল লামসডেন সে কথা জানিয়ে পথ পরিবর্তনের কথা বললেন। কিন্তু মন্টগোমারী কোন কথা শুনলেন না। ঐ পথেই যাওয়ার পরিকল্পনা আছে—ঐখানেই আঘাত করলে শত্রুর মনোবল ভাঙবে। ক্ষতি হল বটে, কিন্তু পথও পরিষ্কার হল এবং জার্মান বাহিনীও সরে গেল।

যুদ্ধের মধ্যপথে তিনি ট্যাঙ্ক বাহিনীর একাংশ ছত্রিশ ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য সরিয়ে নিয়ে এলেন। ঐ সময় ট্যাঙ্কগুলি পরীক্ষা করে প্রয়োজন মত কিছু বদলে নিলেন। ক্লান্ত মনে হলে সে সৈন্যকে সরিয়ে সেখানে অন্য সৈন্য দিলেন। কিন্তু এজন্য যেদিনে কোন অঘটন ঘটতে পারে মনে করে শত্রুপক্ষ

চিন্তিত—রিচার্ড কেসি স্বয়ং এসে কর্তৃপক্ষের উদ্বেগের কথা জানালেন। মন্টগোমারী অবিচল—বললেন, দায়িত্ব আমার। বিশ্রাম এবং নূতন সৈন্য ও নূতন ট্যাঙ্ক এই দেড়দিন পরে রোমেলকে যে আঘাত করবে সে তা সইতে পারবে না। আর এই দেড়দিনের কথা ভাবচেন কেন? আমরা আক্রমণকারী—রোমেল তো এখন আত্মরক্ষা করছে মাত্র।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। যুদ্ধের প্রারম্ভে রোমেল অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন। তাঁর যায়গায় সেনাপতি ছিলেন জেনারেল স্টুমে। তিনি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হার্টফেল করে মারা যান। তখন বাধ্য হয়ে অসুস্থ রোমেল এসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু পরাজয় এড়াতে পারলেন না। প্রয়োজনীয় পেট্রল তিনি পাননি। সিসিলির অদূরে ইংরাজ সাবমেরিণ তাঁর তেলের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। ইটালিয়ানদের লড়াই আশানুরূপ নয়।

নভেম্বর পাঁচ তারিখে মন্টগোমারী প্রেস রিপোর্টারদের ডেকে বললেন, এখন আলামিনের যুদ্ধ শেষ—আমরা যুদ্ধে জিতেছি। এখন আমরা শত্রুপক্ষকে তাড়া করে ত্রিপোলীর দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে মন্টগোমারীর দু হাজার মাইল ব্যাপী বিজয় যাত্রা সুরু হয়। জার্মানদের এত আয়োজন এত যুদ্ধক্ষমতা কিছুই তাঁর অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি। আলামিন থেকে যাত্রার দু'মাসের মধ্যে জার্মান আফ্রিকা বাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অসুস্থ ভগ্নমনোরথ রোমেল জার্মানীতে ফিরে গেলেন চিকিৎসার জন্য।

* * * *

মন্টগোমারীর যুদ্ধ জীবনে আফ্রিকার অভিযান প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব ইতালী অভিযান। উত্তর ইয়োরোপ এবং উত্তর জার্মানী অভিযান তৃতীয় বা শেষ পর্ব।

প্রথম পর্বের শেষে দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ। আমেরিকার সেনাপতি প্যাটনের সঙ্গে তাঁর আরম্ভ হল সিসিলি এবং ইতালী আক্রমণ। আমেরিকার জেনারেল আইসেনহাওয়ার এবং ইংলণ্ডের জেনারেল আলেকজান্ডার প্যাটন মন্টগোমারীর উপরে—তাঁদের আদেশ অনুসারে চলতে হয়।

মন্টগোমারীর স্বভাব, যুদ্ধের প্রয়োজনে যা চাই বলবেন তা অবশ্যই চাই। যে প্ল্যান তিনি সমর্থন করবেন উপরওয়ালার প্রতিবাদের মুখেও তাই চূড়ান্তভাবে আঁকড়ে থাকবেন। সিসিলিতে আক্রমণ আরম্ভের প্রাক্কালে তাঁর যুক্তি আইসেনহাওয়ার অনেক আলাপ আলোচনার পর মেনে নেন। কিন্তু এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন আইসেনহাওয়ার বিরক্ত হয়ে বলেছেন, তা হলে ব্যাপারটা ওয়াশিংটন আর লণ্ডনই ঠিক করুক কার কথায় কাজ চলবে—আমার না মন্টির। মন্টগোমারী তখন অবস্থা বুঝে আইসেনহাওয়ারের মত মেনে নেন। ইতালীতে যুদ্ধ নানাপ্রকার অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। তখন শীতকাল। বৃষ্টির উৎপাতে যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবহাওয়া কোনদিন পরিষ্কার এবং পথও শুকনো। কিন্তু পরদিন বৃষ্টিতে পথ অসম্ভব কর্দমাক্ত। ট্যাঙ্ক কাদায় বসে যায়। পাহাড়ে নদী তীব্র বেগবতী হয়ে ছুটচে—যুদ্ধের প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। এরূপ আবহাওয়ায় এবং অবস্থায় বড় যুদ্ধ অসম্ভব—যুদ্ধে জয়লাভ অনিশ্চিত। আইসেনহাওয়ারকে সে কথা জানানো হয়। তবু তাঁর আদেশ অনুসারে ছোটখাটো লড়াই করে মন্টগোমরী অগ্রসর হন। শীত শেষ হওয়ার পূর্বেই রোম দখল করার আদেশ ছিল। কিন্তু মন্টগোমারী বলেছিলেন যে পরবর্তী জুনের আগে রোমে পৌঁছানো যাবে না। কার্যক্ষেত্রে ঘটেছিলও তাই।

• • • •

১৯৪৩ এর জানুয়ারীর সময় মন্টগোমারীকে ইংলণ্ডে ফিরে অন্য কাজের ভার নিতে বলা হল।

তাঁর এরোপ্লেন কিন্তু সোজা ইংলণ্ডে গেল না—গেল মরক্কো। নিউমোনিয়া ভুগে অসুস্থ চার্চিল সেখানে আছেন বিশ্রামের জন্য। মন্টগোমারীকে তিনি কিছু কাগজপত্র দেখতে দিয়ে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করলেন। সেগুলি ফ্রান্স এবং জার্মানী আক্রমণ করবার প্ল্যান। ইংরাজ এবং আমেরিকান যুদ্ধবিশারদরা সেগুলি অনেক যত্নে অনেক পরিশ্রমে তৈরী করেছেন।

সব দেখে শুনে মন্টগোমারী বললেন, এ প্ল্যান কাজের নয়। আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর অগ্রভাগ বড় অপ্রশস্ত। যুদ্ধের সেনাপতিদের সংগঠন ঠিকমত হয়নি। এসব বদলাতে হবে।

চার্চিল খাঁ বনে গেলেন। কত বড় বড় মাথা এই প্ল্যান তৈরীর পেছনে খেটেছে আর মন্টি বলে কিনা, এ অচল। তাছাড়া, সব বদলাতে হবে? সময় কোথায়? ইংরোরোপের মূল ভূখণ্ডে উত্তর দিক থেকে আক্রমণ অবিলম্বে করতেই হবে।

এই সময়ের মধ্যেই প্ল্যান অবশ বদল করে ঠিক করবার ভার নিতে রাজী হলেন মন্টগোমারী। প্ল্যান বদল করা হল প্রয়োজন মত। কিছু কিছু মতভেদ দেখা দিলেও তাতে কোন ক্ষতি হল না। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে মিত্রপক্ষের আক্রমণ সুরু হল নর্মাণ্ডীর উপকূলে জার্মানীর উদ্দেশ্যে।

এখানেও রোমেল। ফন রুনষ্টেড্ এবং রোমেল যুদ্ধের দু রকম প্ল্যান করেন। হিটলার পছন্দ করলেন রোমেলের প্ল্যান এবং তাঁকেই এই যুদ্ধের সেনাপতি নির্বাচন করেন। কিন্তু ইংরাজ-আমেরিকান আক্রমণের মুখে জার্মানদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। রোমেলকে শেষ অবধি হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হয়। অনেকের অনুমান, বিষপ্রয়োগে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ইউরোপের যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

• • • •

জর্জ বার্ণার্ড শর খুব ইচ্ছা মন্টগোমারীর সঙ্গে কথা বলেন। তখন মন্টগোমারীর যাতায়াতের খবর খুব গোপনে থাকে। সাধারণ লোকে মোটেই খবর পায় না কখন তিনি আসেন, কোথায় যাবেন।

যুদ্ধের মধ্যে কিছুদিনের জন্য মন্টগোমারী লণ্ডনে এসেছেন বিশেষ কাজে। তখন তাঁর সখ হল কোন চিত্রকরকে দিয়ে নিজের একখানা ছবি আঁকাবেন। দু একজন ছবি এঁকে দিল। কিন্তু মন্টগোমারীর তা পছন্দ হল না। অগাষ্টাস জন নামে একজন চিত্রকরের সঙ্গে পাঁচশ পাউণ্ডের চুক্তিতে মন্টগোমারী আবার ছবি আঁকাতে বসলেন। বার্ণার্ড শর সঙ্গে এই চিত্রকরের পরিচয় ছিল। সুতরাং খবর পেয়ে শ একদিন এসে হাজির। মন্টগোমারী তখন চুপচাপ বসে আছেন আর অগাষ্টাস তাঁর ছবি আঁকছে।

সেদিন ছবি আঁকা আর এগোল না।

কিন্তু দুজন অদ্ভুত লোকের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা হল।

শ একবার বললেন, যুদ্ধ কবে শেষ হবে আমি বলতে পারি।

মন্টগোমারী অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি!

হ্যাঁ। যখন একশ পাউণ্ডের দাম মোটে পাঁচ পাউণ্ড হবে তখন।

শ আবার বললেন, আমাদের শাসনকর্তা যাদের দেখছ তারা দেশ শাসনের কিছু জানেনা। ওদের মধ্যে মাত্র শতকরা পাঁচজন লোক শাসনের উপযুক্ত।

মন্টগোমারী জিজ্ঞাসা করলেন, সেনাপতিদের মধ্যেও তোমার ঐ শতকরা পাঁচজন লোক যুদ্ধ করতে জানে?

না, সেখানে শতকরা পাঁচজন লোকও যুদ্ধ করতে জানেনা।

ঘণ্টাখানেক পরে মন্টগোমারীর গাড়ীর ড্রাইভার দেখল এক দাড়িওলা বুড়ো তাকে এসে বলছে, ওহে, তোমাদের সেনাপতি মশাই বলেছেন তাঁর গাড়ী করে আমাকে বাড়ী পৌছে দিতে। জোরে গাড়ী চালালে হয়ত বুড়োর অসুবিধা হবে মনে করে ড্রাইভার আস্তে চলছিল। কিন্তু শ বললেন, গাড়ীটা জোরে চালাও না কেন। তখন ষাট মাইল বেগে গাড়ী ছুটল। শ ড্রাইভারের কানের কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে আবার বললেন, এই গাড়ীটা বুঝি আর জোরে চলে না। তখন নব্বই মাইল হল গাড়ীর বেগ।

তাঁর বাড়ীর দরজায় এসে শ ড্রাইভারকে এক ক্রাউন বখশিস দিয়ে বললেন, মন্দ নয়।

নিজের ঘরে গিয়ে শ একখানা চিঠি লিখলেন :

"প্রিয় অগাষ্টাস জন, মন্টগোমারীর যে ছবিটা তুমি আরম্ভ করেছ সেটা মুছে ফেল। তারপর নূতন করে আবার আঁকতে সুরু কর। একটি ছোট মানুষের ছবি আঁকবে—সে তোমার দিকে উপর থেকে যেন সোজা তাকিয়ে আছে। পুরো মানুষটা আঁকবে আর তার সামনে কিছু ধায়গা রাখবে। সে হাঁটু বাঁকিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে—চোখ অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে কি খুঁটিয়ে দেখছে—ওই চোখ যেন কেউ না ভুলতে পারে। লোকটার পেছনে থাকবে আফ্রিকার বিরাট মরুভূমি। ফলে তুমি লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের একখানা ছবি পাবে।

লোকটার কী নাক! আর কী চোখ!

ছবির নাম দিও, নিঃসীম সীমানা আর একটি মাত্র লোক।

ভেবে দেখ, একজন সৈন্য তোমাকে ঘিরে ছবি আঁকাচ্ছে আর আমার সঙ্গে কথা বলছে—সে কি ধরণের অদ্ভুত বুদ্ধিমান।—জি, বি, এস।

পরদিন তিনি আর একখানা চিঠি লিখলেন। "প্রিয় অগাষ্টাস জন—আমার গতকালের চিঠির জন্য কিছু মনে কোরো না। বুড়ো হয়ে গেছি। ৮৭-৮৮ বছর বয়স হল। অনেক সময় সন্দেহ হয় যা বলি সব ঠিক বলি কিনা। ছবির বিষয় তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করো। ইতি—জর্জ বার্ণার্ড শ।"

মন্টগোমারী আজকাল বই লিখছেন। দেশ ভ্রমণ করছেন।

কিছুদিন আগে তিনি চীনে গিয়েছিলেন। মাও সে তুং, চৌ এন লাই এবং আরো সব চীনে নেতারা তাঁকে পরম সমাদর করেন। তিনিও চৌ এন লাইকে নিমন্ত্রণ করে এলেন তাঁর ব্যক্তিগত অতিথি হিসাবে ইংলণ্ড বেড়িয়ে যেতে।

দেশে ফিরে এসে বললেন, পৃথিবীতে এখন চারজন লোক শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁদের নাম মাও সে তুং, জহরলাল নেহরু, মার্শাল টিটো এবং স্বয়ং। মন্টগোমারীর মতে এঁরা চিন্তায় ও কর্মে বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাধিক পরিমাণ লোকের জীবনে পরিবর্তন এনেছেন।

* * *

মন্টগোমারী বিপত্নীক। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি আর বিবাহ করেন নি। তাঁর একটি পুত্র আছে।

রোগীর দেহে এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য ঢুকিয়ে দেওয়া হবে যা শুধুই রোগের জীবাণু ধ্বংস করবে কিন্তু দেহের কোনো ক্ষতি করবে না। চিকিৎসার এই পদ্ধতি যিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম পল আরলিক (১৮৫৪-১৯১৫)

পূর্ব জার্মানীর সাইলেসিয়া প্রদেশের স্ট্রেলেন শহরে আরলিকের জন্ম ১৮৫৪ সালে। তাঁর বাবা ছিলেন এক সরাইখানার মালিক। জাতে ইহুদী।

ছেলেবেলা থেকেই আরলিক রঙ খুব ভাল বাসতেন। লাল নীল কালো সবুজ ইত্যাদি রঙ নিয়ে খেলা করতেন। বই খাতায় ছেপে এই সব রঙ লাগাতেন। ডাক্তারী পড়বার সময়ও নিয়মমত শব-ব্যবচ্ছেদ না করে তিনি মৃতদেহের বিভিন্ন অংশে রঙ লাগিয়ে দেখতেন কোথায় কোন রঙ ধরে।

রবার্ট কক যখন যক্ষ্মা জীবাণু আবিষ্কার করেন ১৮৮২ সালে, তখন এই আরলিক একদিন ককের বাড়ি যান যক্ষ্মা জীবাণু দেখতে। কক তখন বাড়ি ছিলেন না। আরলিক দেখলেন, যক্ষ্মা জীবাণুর স্লাইডখানা টেবিলের ওপর আছে। কথিত আছে যে আরলিক সেই স্লাইডের ওপর একটু নীল রঙএর মেথিলিন ব্লু ঢেলে স্লাইডটি ঠাণ্ডা স্টোভের ওপর রেখে চলে আসেন।

পরের দিন বাড়ির ঝিটি এসে যখন স্টোভে আগুন দিয়ে চলে যায় তখন আরলিক এসে দেখেন যে স্লাইডটি বেশ তেতে উঠেছে। তাড়াতাড়ি ওটাকে নামিয়ে মাইক্রোস্কোপে চড়িয়ে তিনি দেখলেন যক্ষ্মা জীবাণু সব নীল রঙে রাঙা হয়ে জ্বল জ্বল করছে।

এখনও ঠিক এই পদ্ধতিতেই জীবাণু কাঁচের স্লাইডে গরম করে আটকে নিয়ে রঙ ধরানো হয়।

জীবাণুতে রঙ ধরিয়ে আরলিকের ধারণা হল, জীবদেহে এই রঙ ঢুকিয়ে দেহটাকে বাঁচিয়ে শুধু ঐ জীবাণুকেই ধ্বংস করা সম্ভব হবে। তাই নানা রকম রঙ নিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু কোনো ফল হল না।

১৯০৫ সালে উপদংশ রোগের (সিফিলিস) জীবাণু আবিষ্কার হল। ১৯০৬ সালে আরলিক জার্মানীর বিখ্যাত গবেষণাগার হুর্স্ট স্পোআর হাউসের সর্বেসর্বা হলেন।

আরলিক দেখলেন স্লিপিং সিকনেসের জীবাণু এবং সিফিলিসের জীবাণুর মধ্যে অনেক মিল। স্লিপিং সিকনেসে আর্সেনিকের যে কম্পাউণ্ড (যৌগিক পদার্থ) ব্যবহার করা হত, তার নাম অ্যাটকসিল।

আর্সেনিক বিষিও সেঁকো বিষ কিন্তু অ্যাটকসিল নির্বিষ। আরলিক তাঁর গবেষণাগারে এই অ্যাটকসিল ভেঙে ৬০০ রকমের বিভিন্ন নির্বিষ কম্পাউণ্ড তৈরী করলেন। এক একটা করে কম্পাউণ্ড তৈরী হয় আর তা স্লিপিং সিকনেসে আক্রান্ত ইঁদুরের ওপর প্রয়োগ করা হয়। এমনি করে ৬০০ রকম কম্পাউণ্ড ব্যবহার করা হল কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া গেল না।

এমনি সময় জাপান থেকে রোগের জীবাণুর আবিষ্কর্তা কিটাসেটো তাঁর এক ছাত্রকে আরলিকের কাছে পাঠালেন। এঁর নাম ডাঃ হাটা।

ডাঃ হাটা জাপানে সিফিলিস নিয়ে কিছুদিন কাজ করেছিলেন জেনে আরলিক হাটাকে অ্যাটকসিলের বর্জিত ঐ ৬০০ কম্পাউণ্ড নিয়ে আবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে বললেন।

ডাঃ হাটা ধীর স্থির অধ্যবসায়ী গবেষক। একে একে তিনি ঐ ৬০০ কম্পাউণ্ড নিয়ে সিফিলিসে আক্রান্ত গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা চালালেন। ৬০৫ নং কম্পাউণ্ড পর্যন্ত কোনো সুফল পাওয়া গেল না। তারপর দেখা গেল ৬০৬ নং কম্পাউণ্ডে যেন বেশ কাজ হচ্ছে। সিফিলিসের ক্ষত শুকিয়ে যাচ্ছে।

আরলিক তখন এই ৬০৬ নিয়ে মেতে উঠলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলেন মাত্র একটি ইনজেকশনের পরেই ঐ রক্তে আর একটি জীবাণুও পাওয়া যায় না।

কিন্তু আর্সেনিক যে সাংঘাতিক বিষ তাতে মানুষের দেহে এই ওষুধ প্রয়োগের বিপদ অনেক। কিন্তু রোগীদের তাগিদে আরলিকের বন্ধুরা এ ওষুধ ব্যবহার শুরু করলেন এবং সবাই খুব আশ্চর্য ফল পেলেন।

সেই সব রিপোর্ট সংগ্রহ করে আরলিক তাঁর এই আবিষ্কার একদিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, ১৯১০ সালে। ভাইসবাডেনের জার্মান মেডিক্যাল কংগ্রেসে। অ্যাটকসিল থেকে উদ্ভূত এই ৬০৬ এর নাম দিলেন, স্যালভারসন অর্থাৎ যে ওষুধ স্বাস্থ্যটাকে রক্ষা করে।

বিশ শতকের এই আবিষ্কার চিকিৎসায় যুগান্তর এনে দিল। হলদে রঙএর এই ওষুধ রোগীর শিরার মধ্যে ঢুকিয়ে দেহটাকে বাঁচিয়ে শুধু ঐ জীবাণুকে ধ্বংস করা এই প্রথম সম্ভব হল। এই চিকিৎসা পদ্ধতির নাম হল, কেমোথেরাপি ; আর আরলিক হলেন এই পদ্ধতির স্রষ্টা।

আরলিকের এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই কালাজ্বরের ওষুধ বেরিয়েছে এবং সালফাড্রাগ আবিষ্কার হয়েছে।

১৯৩২ সালে জার্মানীতে সর্বপ্রথম সালফাড্রাগ তৈরী হয়, রাসায়নিক উপায়ে তৈরী এক রঙ থেকে। লাল ক্রাইসোইডিন রংএর সঙ্গে সালফানিলামাইড সংযুক্ত করে। এর নাম দেওয়া হয় প্রনটসিল।

১৯৩৫ সালে জার্মানীর গেরহার্ড ডোমাগ পরীক্ষা করে দেখলেন যে স্ট্রেপটোকক্কাসে আক্রান্ত ইঁদুর এই প্রনটসিলে আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু মানুষের ওপর প্রয়োগ করবার সুযোগ তিনি পেলেন না।

কথিত আছে, ডোমাগের মেয়ের একদিন এই স্ট্রেপটোকক্কাস ঘটিত জ্বর হয়। প্রচলিত সব ওষুধে যখন কোনো ফল পাওয়া গেল না তখনই ডোমাগ এই প্রনটসিল ব্যবহার করে দেখলেন। জ্বর ছেড়ে গেল।

সেই থেকে বিভিন্ন জার্মান হাসপাতালে এই প্রনটসিল ব্যবহার করে দেখা গেল যে এতে মানুষের সেপটিক জ্বর ছাড়ে। তখন ১৯৩৬ সাল।

জার্মান শিল্পপতিরা এই প্রনটসিল তৈরীর বিবিধ প্রণালী শুদ্ধ পেটেন্ট নিয়ে তবে বাজারে ছাড়লেন। সারা পৃথিবীতে এক হিটলারের জার্মানী এই প্রনটসিলের মালিক হয়ে রইল।

ভাগ্যক্রমে প্যারিসের বিজ্ঞানী ট্রেফুএল দম্পতি গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখলেন, প্রনটসিল দেহের মধ্যে সালফানিলামাইডে পরিণত হয়। আর শুধু সেই জন্যেই সে জীবাণু ধ্বংস করে। অতএব প্রনটসিলে যা কাজ হয় শুধু সালফানিলামাইডেও সে কাজ হয়।

অথচ সালফানিলামাইডের কোনো পেটেন্ট নেই। যার ইচ্ছে সেই এ ওষুধ তৈরী করতে পারে।

সেই থেকে ইওরোপ আমেরিকার সব দেশেই সালফাড্রাগ তৈরী হতে লাগল। দেখতে দেখতে আরও নতুন নতুন সালফাড্রাগ বেরিয়ে গেল। প্রথমে বেরুল সালফাপাইরিডিন যা এম এণ্ড বি ৬৯৩, তারপর সালফা থিওজল এবং সালফাগোয়ানিডিন। সেপটিক জ্বর, নিউমনিয়া মেনিনজাইটিস, দূষিত ক্ষত, ব্যাসিলারি ডিসেনট্রি ইত্যাদি কঠিন কঠিন রোগ সারানো সম্ভব হল।

বিশ শতকের তিন দশকে আর একটি অভিনব আবিষ্কার ডায়াবেটিসে ইনসুলিন। ডায়াবেটিস অতি প্রাচীন কালের রোগ। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকরাই সর্ব প্রথম লক্ষ্য করেন, এ রোগে মূত্রের সঙ্গে চিনি বেরিয়ে আসে। তাই এর নাম ছিল মধুমেহ। কিন্তু কেন এ রোগ হয় আর তার প্রতিকারই বা কী কেউ তা জানত না।

সতেরো শতকে প্রথম জানা যায় যে খাদ্যবস্তু হজম করতে প্যাংক্রিয়াসের জারকরসেরও প্রয়োজন হয়। পিত্তরসের সঙ্গে এই জারকরস মিশে অন্ত্রে খাদ্যবস্তুর হজম সাধন করে।

তারপর উনিশ শতকে জানা গেল প্যাংক্রিয়াসের ভেতর এমন কতকগুলি কোষ আছে যারা এই জারকরস তৈরী করেনা। এই কোষগুলির নাম, আইলেটস অফ ল্যাংগারহানস। এ ছাড়া আরও জানা গেল যে প্যাংক্রিয়াসে এমন কোনো বস্তু আছে যা ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে।

বিশ শতকের প্রথম দশকে দেখা গেল যে ডায়াবেটিসে প্যাংক্রিয়াসের এই আইলেটস অফ ল্যাংগারহানসগুলি শুকিয়ে যায়। তাই থেকে ধারণা হল যে নিশ্চয়ই এরা এমন কোনো হরমোন তৈরী করে যার ফলে ডায়বেটিস হয় না।

বিশ শতকের তিন দশকে ক্যানাডার অখ্যাত এক যুবক ডাক্তার মাত্র কয়েক মাসের চেষ্টায় একদিন কুকুরের প্যাংক্রিয়াস থেকে ঐ হরমোন বার করে কুকুরের ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে সমর্থ হলেন ১৯২১ সালে। এই হরমোনের নাম দেওয়া হল ইনসুলিন। আর যে অখ্যাত ডাক্তারটি এই ইনসুলিন আবিষ্কার করে বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে গেলেন তাঁর নাম, ফ্রেডরিক গ্রাণ্ট ব্যানটিং (১৮৯১-১৯৪৬)।

ব্যানটিং ক্যানাডার লোক। সামান্য এক কৃষকের ছেলে। ডাক্তারী পাশ করে প্রথম মহাযুদ্ধে আর্মি সার্জনের কাজ করে দেশে ফিরে সার্জারি প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। কিন্তু পশার হল না দেখে ওন্টারিও মেডিক্যাল স্কুলে এক চাকরি নিলেন।

এ চাকরি হল ছাত্রদের লেকচার দেওয়া। ছাত্রদের পড়াতে হলে নিজেকেও পড়তে হয়। ছাত্রদের প্যাংক্রিয়াস সম্বন্ধে পড়াতে গিয়েই একদিন ব্যানটিংএর খেয়াল হয় যে কুকুরের প্যাংক্রিয়াস বার করে নিলে যখন ডায়াবেটিস কুকুরের মৃত্যু হয় তখন ঐ প্যাংক্রিয়াসের আইলেটগুলি আলাদা করে নিয়ে ঐ কুকুরটাকে ইনজেকশন দিলে কেমন হয়? ঐ কুকুরের ডায়াবেটিস কি প্রতিরোধ করা যায় না?

এই কথা ভেবে পরদিন স্কুলে গিয়ে ব্যানটিং শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ ম্যাকলিঅডের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, তাঁরই ল্যাবরেটরীতে মাত্র দুমাসের জন্য তিনি প্যাংক্রিয়াস নিয়ে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চান। এজন্য তাঁর চাই একটি সহকারী এবং আটটি কুকুর।

ডাঃ ম্যাকলিঅড বড় বিজ্ঞানী এবং পণ্ডিত। ব্যানটিংএর এই প্রস্তাব তাঁর কাছে নেহাতই পাগলামো বলে মনে হল। তবু তিনি ব্যানটিংকে সুযোগ দিলেন। যা ব্যানটিং চান তারই ব্যবস্থা করে ইওরোপে চলে গেলেন।

ল্যাবোরেটরীর চারতলার ওপরে ব্যানটিং ছোট্ট একখানা খুপরীর মত ঘর পেলেন। তাঁর সহকারী হল ২১ বৎসর বয়সের এক ডাক্তারী ছাত্র। নাম তার চার্লস বেস্ট।

ব্যানটিং প্রথমে একটা কুকুরের পেট কেটে প্যাংক্রিয়াসের নল বেঁধে আবার সেলাই করে দিলেন। ভেবেছিলেন ছ সপ্তাহের মধ্যেই জারকরসের কোষগুলি শুকিয়ে যাবে অথচ আইলেটগুলি থাকবে অক্ষত। কিন্তু তা হল না।

ব্যানটিং আবার ঐ নল বাঁধলেন। এইবার তিন সপ্তাহ পরে কি ফল হয় তা দেখবেন ঠিক করলেন।

তিন সপ্তাহ যে দিন শেষ হবে তার ন দিন আগে তিনি আর একটা কুকুরের পেট কেটে গোটা প্যাংক্রিয়াসটা কেটে বার করে রাখলেন। ফলে এই কুকুরটি ডায়বেটিসে মৃতপ্রায় হল। দশ দিন পরেই এর মৃত্যু হবার কথা। তাই যখন ন দিন পূর্ণ হল তখন ব্যানটিং প্রথম কুকুরটির পেট কেটে দেখলেন,

ডায়বেটিসের কোষগুলি শুকিয়ে গেছে। ভিতরটা প্যাংক্রিয়াস শুকিয়ে বুড়ো আঙুলের মত দেখতে হয়েছে। এই শুকনো ছোট্ট প্যাংক্রিয়াস এখন শুধু ঐ আইলেটসে ভরা।

এই শুকনো প্যাংক্রিয়াস নোনা জলে খলে মেড়ে সামান্য একটু গরম করে ব্যানটিং সিরিঞ্জে ভরে নিলেন। তারপর দ্বিতীয় কুকুরটির অর্থাৎ প্যাংক্রিয়াসহীন মৃতপ্রায় কুকুরটির গলার শিরার ভেতর ইনজেকশন দিয়ে দিলেন।

অবাক হয়ে ব্যানটিং দেখলেন, জল খাবার জন্যে যে কুকুর মুহূর্ত কাল আগেও মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারত না সেই কুকুর এখন এখন উঠে বসে তাঁর দিকে তাকালো। খুশি হয়ে ল্যাজ নেড়ে চিনির জল খেল।

একঘণ্টা পরে ঐ কুকুরটার রক্ত এবং মূত্র নিয়ে পরীক্ষা করে বেস্ট ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, রক্তে চিনি স্বাভাবিক হয়েছে। মূত্রে চিনি নেই।

কি আশ্চর্য আগের দিন এক ফোঁটা চিনির জলও এই কুকুর তার দেহে রাখতে পারে নি। সব মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। আর আজ এই ইনজেকশনের পরে মূত্রে এক কনা চিনিও নেই। রক্তেও চিনি বাড়ে নি।

পাঁচঘণ্টা পরে ব্যানটিং পরীক্ষা করে দেখলেন, ঐ কুকুরের মূত্রে চিনি বোঝায় না। রক্তে চিনি বাড়ে না।

পরদিন কুকুরটা মরে গেল।

ব্যানটিং আবার পরীক্ষা শুরু করলেন। দুটো কুকুরের প্যাংক্রিয়াস দিয়ে এবার একটা কুকুর তিনদিন বাঁচানো গেল। তারপর আর একটা কুকুরকে আটদিন। পাঁচটি কুকুরের বিনিময়ে।

ব্যানটিং বুঝলেন, আইলেটস অফ ল্যাংগারহানস থেকেই হরমোন তৈরী হয়। তারই জন্যে দেহে চিনি পোড়ে। শক্তি উৎপন্ন হয়। এই হরমোনের তিনি নাম দিলেন, আইলেটিন।

কিন্তু ইওরোপ থেকে ফিরে এসে ডাঃ ম্যাকলিঅড-এ তথ্যের কোনো মূল্যই দিলেন না।

ব্যানটিং তখন নিজেই পরীক্ষা চালালেন নিজের খরচে। সহকারী বেস্টের খরচও তাঁকে চালাতে হল।

পুরনো বৈজ্ঞানিক তথ্য ঘেঁটে ব্যানটিং একদিন দেখলেন, নবজাত শিশুর প্যাংক্রিয়াসে আরক রস সৃষ্টিকারী কোষগুলি খুবই কম থাকে। কিন্তু আইলেটস অফ ল্যাংগারহানস থাকে প্রচুর এবং পরিপুষ্ট।

তাই দেখে ব্যানটিং পরদিন বেস্টকে নিয়ে কসাইখানা ঘুরে ন'টি তিন চার মাসের গাভীর ভ্রূণ যোগাড় করলেন। এই ভ্রূণের প্যাংক্রিয়াস নোনা জলে খলে মেড়ে প্যাংক্রিয়াসহীন কুকুরের দেহে ইনজেকশন দিয়ে দেখলেন, রক্তে চিনি স্বাভাবিক হল। মূত্র চিনি মুক্ত হল।

তারপর সদ্য বধকরা গো বৎসের প্যাংক্রিয়াস একটু অ্যাসিড মেশানো অ্যালকোহল ব্যবহার করে দেখলেন একই ফল হল। আগের মতই এ দিয়ে কুকুরের ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা গেল।

এই উপায়ে ব্যানটিং প্যাংক্রিয়াসহীন একটি কুকুর সত্তর দিন বাঁচিয়ে রাখলেন। তখন জানুয়ারী মাস। ১৯২২ সাল।

এইবার ডাঃ ম্যাকলিঅড ব্যানটিং-এর এই পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে মন দিলেন। প্রথমেই ব্যানটিংএর দেওয়া নাম আইলেটিন বাতিল করে এর নাম দিলেন, ইনসুলিন। রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবার ইনসুলিনের প্রকৃতি নির্ণয় করা শুরু হল।

ব্যানটিং এবং বেস্টের চাকরী গেল।

ডাঃ ম্যাকলিয়ড একদিন চিকিৎসকদের আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনে এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। এই প্রতিষ্ঠান একবাক্যে তাঁর প্রশংসা করল কিন্তু ব্যানটিং বা বেস্টের নাম কেউ করল না।

ব্যানটিং এবং বেস্ট তখন এই ইনসুলিন কি করে বেশী তৈরী করা যায় এবং তা মানুষের ব্যবহার যোগ্য করা যায় তার উপায় খুঁজতে লাগলেন। ভাগ্যক্রমে কনোট ল্যাবরেটরীর কর্তৃপক্ষ তাঁদের এ সুযোগ দিলেন। তাঁরা আবার নবীন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন।

ব্যানটিংএর এক বাল্যবন্ধু ছিল নাম তাঁর কো ফিলক্রাইস্ট। তিনি নিজেও একজন ডাক্তার। পাঁচ বছর ধরে ডায়াবেটিসে ভুগে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার আশায় তিনি একদিন ব্যানটিংএর কাছে এলেন।

কনোট ল্যাবরেটরীতে এসে ব্যানটিং এই ফিলক্রাইস্টের ওপর ইনসুলিন প্রয়োগ করবার সুযোগ পেলেন। এখানে টাকার কোনো অভাব নেই। যত খুসি প্যাংক্রিয়স কেনা। ইনসুলিন তৈরী কর এবং ফিলক্রাইস্টের ওপর পরীক্ষা চালাও।

তখন থেকে নতুন নতুন ব্যাচের ইনসুলিন তৈরী হবার পর খরগোসের ওপর পরীক্ষা করেই ফিলক্রাইস্টকে দেওয়া হত তারপর দেওয়া হত টরেন্টোর দুই স্টাফ হাসপাতালের রুগীদের। এই হাসপাতালটি ছিল ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বাহিনী-করা-সৈন্যদের। প্রথম প্রথম ইনসুলিনে খুবই ব্যথা হত। ফুলে উঠত। এমন কি ঘা পর্যন্ত হত। তবু সৈন্যরা সব হাসিমুখে ইনজেকশন নিত।

এমনি করে সৈন্যদের ওপর ইনসুলিন দেবার সুযোগ ব্যানটিং পেয়েছিলেন বলেই ইনসুলিনের এত দ্রুত উন্নতি হয়েছে এবং সর্বসাধারণের জন্য তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। ১৯২২ সালের পর ঐ হাসপাতালে ডায়াবেটিসে কারু মৃত্যু হয় নি।

সম্প্রতি ডায়াবেটিসের নতুন এক ওষুধ বেরিয়েছে। ইনজেকশনের বদলে এই বড়ি খেয়েই ডায়াবেটিস আয়ত্তে রাখা যায়। কিন্তু সকলের এ ওষুধ ধরে না। যাদের বয়স হয়েছে এবং যাদের রোগ বেশীদিন তারাই শুধু উপকার পায়।

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে পলা চিকিৎসার যে উন্নতি হয়েছে এবং কোনো একজনের গ্লাণ্ড আর একজনের অন্ত্র গ্রন্থি বাদ দিয়ে লাগানো হচ্ছে, অথবা একজনের চোখের পর্দা (কর্ণিয়া) অন্যের চোখে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাতে হয়ত ভবিষ্যতে একজনের প্যাংক্রিয়াস ডায়াবেটিস রোগীর দেহে লাগিয়ে (ট্রান্স-প্লান্টেশন) ডায়াবেটিস সারিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

ইনসুলিন আবিষ্কার করে ব্যানটিং চিকিৎসা বিদ্যার নোবেল পুরস্কার পেলেন ডাঃ ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে ভাগ করে। ১৯২০ সালে। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে। ১৯২৩ সালে তাঁকে নাইটহুডের সম্মানে ভূষিত করা হল।

উড়ো জাহাজের এক দুর্ঘটনায় গত মহাযুদ্ধের সময় ব্যানটিংএর মৃত্যু হয় মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে। ১৯৪৩ সালে।

গত মহা যুদ্ধের সব চেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার পেনিসিলিন। পেনিসিলিন সর্ব-প্রথম আবিষ্কার করেন স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, লণ্ডনের সেণ্টমেরী হাসপাতালের ল্যাবরেটরীতে। ১৯২৮ সালে।

ফ্লেমিং এই ল্যাবরেটরীতে জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতেন এবং ছাত্রদের পড়াতেন। একদিন জীবাণু পরীক্ষার একখানা প্লেটে (কালচার প্লেটে) ছাতা পড়েছে দেখে ফ্লেমিং জলের কল খুলে ধুতে গিয়ে

হঠাৎ দেখলেন প্লেটের ওপর ছাতা যেখানে পড়েছে তার চারধারে ইঞ্চি কয়েক জায়গার খোকা খোকা সব জীবাণু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ রকম অদ্ভুত ছাতা তিনি আগে কখনও দেখেন নি। তাই ওটাকে না ঘুঁটে তিনি রেখে দিলেন।

পরে হাতের কাজ সেরে ওটা পরীক্ষা করে দেখলেন যে এ এক সাংঘাতিক জীবাণু-ধ্বংসী ছাতা। এর সামান্য একটু ছোঁয়াতেই ষ্ট্যাফাইল-ককাস ষ্ট্রেপটো-ককাস নিওমোককাস গনককাস এমনকি ডিপথেরিয়া জীবাণু পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই তিনি ভাবলেন এটা নিশ্চয়ই উগ্র কোনো বিষ। কিন্তু খরগোশের গায় ইনজেকশন দিয়ে তিনি বুঝলেন, এ বিষ নয়। তাই তিনি রুগীর ওপর পরীক্ষা করার জন্য হাসপাতালের ডাক্তারদের কাছে গেলেন। কিন্তু অজানা এই ছাতা মানুষের ওপর ব্যবহার করার কোনো ঝুঁকি তাঁরা নিলেন না।

তা ছাড়া এ জিনিষ দেহে ঢোকাবার পর থেকেই তাড়াতাড়ি দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। অথচ পর্যাপ্ত পরিমাণে এ জিনিষ তৈরী করতে তিনি পারলেন না।

মাইক্রোসকোপে দেখলে ঠিক পেনসিলের মত দেখায় বলে ফ্লেমিং এর নাম দিলেন পেনিসিলিন এবং তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল ডাক্তারী কাগজে প্রকাশ করলেন যে মাসে ১৯২৯ সালে। তবু এই পেনিসিলিন বিজ্ঞানীদের মনে কোনো কৌতূহল জাগাল না। শুধু ফ্লেমিং একা এই পেনিসিলিন নিজের ল্যাবরেটরীতে সঞ্চিয়ে রাখলেন দশটি বছর ধরে।

তাই যুদ্ধের ঠিক আগে যখন অক্সফোর্ডের জীবাণুতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ হাউআর্ড ফ্লোরএ এই পেনিসিলিন সম্বন্ধে খোঁজ নিতে ফ্লেমিংএর কাছে এলেন তখন ফ্লেমিং নিজের ল্যাবরেটরীতে গজানো পেনিসিলিন থেকে খানিকটা তুলে ফ্লোরএর হাতে দিতে পারলেন।

দু বছর ধরে ফ্লোরএ, ডাঃ চেইন এবং তাঁর সহকর্মীরা এই পেনিসিলিন নিয়ে গবেষণা করে দেখলেন, ফ্লেমিং এর সব কথা সত্যি। এমন সাংঘাতিক জীবাণু ধ্বংসী কিন্তু নিরিষ জিনিষ আগে কখনও দেখা যায় নি।

১৯৪০ সালে লণ্ডনের এক পুলিস দাড়ি কামাতে গিয়ে তার গাল খানিকটা কেটে ফেলল। ফলে ষ্ট্যাফাইল-ককাস জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে ক্ষত দূষিত হল। সেপটিসিমিয়া হল। সালফা ছাগে তা সারল না। ডাক্তাররা বুঝলেন রুগীর এবার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

খবর পেয়ে ফ্লোরএ ছুটে গিয়ে তাকে পেনিসিলিন ইন্‌জেকশন দিলেন। জ্বর ছেড়ে গিয়ে এবং গালের ফোলা কমে যখন আশা হল রুগীটি বোধ হয় বেঁচে যাবে তখনি সব পেনিসিলিন ফুরিয়ে গেল। নতুন পেনিসিলিন তৈরী হবার আগেই বেচারার মৃত্যু হল।

রুগীর যদিও মৃত্যু হল ডাক্তাররা কিন্তু পেনিসিলিনের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন এবং ফ্লোরএ স্থির করলেন আরও অনেক বেশী পেনিসিলিন তাঁকে তৈরী করতে হবে।

কিছুদিন পরে এই র‍্যাডক্লিফ ইনফারমারি হাসপাতালে পনেরো বছরের একটি ছেলে হিমলাইটিক ষ্ট্রেপ্টোককাসে আক্রান্ত হল। সেই মৃত্যু-ঘরে সালফাড্রাগ যখন কোনো ফল দেখাতে পারল না এবং নিশ্চিত বোঝা গেল যে তার মৃত্যু হবে তখন ফ্লোরএ এই পেনিসিলিন দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন।

তখন ফ্লোরএ ভাবলেন, এমন কোনো উপায় তাঁকে বার করতে হবে যাতে হাজার হাজার টন এই পেনিসিলিন রোজ তৈরী করা যায়। তার জন্য দরকার বড় বড় ওষুধের কারখানা। কিন্তু কারখানার মালিকরা কেন এজন্য লাখ লাখ টাকা ঢালবেন?

ও জন্তে চাই আরও অনেক তথ্য। রুগীর ওপর প্রয়োগের আরও অনেক সুফল এবং পরিসংখ্যান।

ফ্লোরএর স্ত্রী ইথেল নিজেও ছিলেন ডাক্তার। কিন্তু ইদানীং তিনি ঘর সংসারই দেখতেন। ডাক্তারী কিছু করতেন না। ফ্লোরএ অনেক কাকুতি মিনতি করে অবশেষে ইথেলকে এই কাজে লাগালেন। ঠিক হল দিন রাত খেটে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা যতটুকু পেনিসিলিন তৈরী করবেন ঐ অক্সফোর্ড ল্যাবরেটরীতে ইথেল তা দিয়ে রুগীর ওপর পরীক্ষা করবেন এবং পরিসংখ্যান তৈরী করবেন।

হেরিসাইওড কোল্ডস্ট্রীমের শিশিতে সোনার চেয়ে দামী এই পেনিসিলিন ভর্তি করে নিজের স্যানিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে ইথেল সাইকেলে চড়ে র‍্যাডক্লিফ ইনফারমারি হাসপাতালে চলে গেলেন। কি আশ্চর্য মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ১৮৭টি কঠিন কঠিন রোগে তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর এই পেনিসিলিন ইন্‌জেকশন করে রোগ সারিয়ে বিরাট এক কেস রিপোর্ট তৈরী করে ফেললেন।

ফ্লোরএ বুঝলেন, এইবার জনসাধারণের জন্ত এই ওষুধ তৈরী করবার সময় এসেছে কিন্তু যুদ্ধের সময় লণ্ডনে তা সম্ভব নয়। কাজেই তিনি এই পেনিসিলিন নিয়ে আমেরিকায় এলেন। ১৯৪১ সালে।

এখন থেকে পেনিসিলিন আমেরিকার হাতে এল। পিওরিয়ার বিরাট কারবেনটেন্স ল্যাবরেটরীতে পেনিসিলিন গজানো শুরু হল। ফ্লোরএ গ্লুকোজের জলে খাদ্য দ্রব্য মিশিয়ে এক লিটার জলে মাত্র এক হাজার ইউনিট পেনিসিলিন তৈরী করতেন। অথচ একটি রোগীর চিকিৎসার দিনে অন্ততঃ এক লাখ ইউনিট পেনিসিলিনের প্রয়োজন হত। কাজেই আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা বললেন, হয় এ জিনিষ দ্রুত গজাবার কোনো উপায় বার করতে হবে, নয়ত একে করতে হবে বর্জন।

ডাঃ এ জে মরার একদিন এ সমস্যার সমাধান করে দিলেন অতি দ্রুত পেনিসিলিন গজিয়ে যাতে এই জিনিস এত দ্রুত গজালো সে হল সামান্ত শস্ত ভিজানো জল (কর্ণটীপ লিকার)।

এইবার বড় বড় ওষুধের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানরা সব টাকা ঢালতে রাজী হলেন। পেনিসিলিন তৈরী শুরু হল হল বিরাট বিরাট কারখানায়। সারা আমেরিকার রসায়নবিদ, জীবাণুবিদ্, ইঞ্জিনীয়ার, গভর্ণমেণ্ট কর্মচারী এবং গবেষকরা রাত্রি জেগে এই পেনিসিলিনের হিসেব এবং প্রকৃতি নির্ণয় করতে লাগলেন।

জাতির সমবেত চেষ্টায় মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে চল্লিশ কোটী ইউনিট পেনিসিলিন তৈরী হল ১৯৪০ সালে, বৎসরের শেষে দেখা গেল ৯৩ উনিনিট কোটি ৪০ লক্ষ ইউনিট তৈরী হয়েছে।

তখন পেনিসিলিন ব্যবহার করতে হত শুধু যুদ্ধে আহত সৈন্তদের জন্ত। যুদ্ধের পরে কন্‌ট্রোল তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন বিরাট বিরাট কারখানায় এই পেনিসিলিন তৈরী হয়। আমাদের ভারতবর্ষেও তৈরী হয়। এখন পেনিসিলিন আর দুর্মূল্য নয়। গ্রামে গ্রামেও এ জিনিষ পাওয়া যায়।

পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্ত ডাঃ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলেন ১৯৪০ সালে নাইটহুডের সম্মানেও তাঁকে ভূষিত করা হল ১৯৪৪ সালে।

তিনজন ডাক্তার একত্র নোবেল পুরস্কার পেলেন। ১৯৪৫ সালে। স্যার আলেকজান্ডার পেলেন পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্ত আর স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরএ এবং ডাঃ আর্ণেষ্ট বি চেইন পেলেন পর্যাপ্ত পরিমাণে এই পেনিসিলিন তৈরী করে রোগীর ওপর প্রয়োগ করার জন্ত।

৭৪ বৎসর বয়সে স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিংএর মৃত্যু হয় ১১ই মার্চ ১৯৫৫ সালে।

পেনিসিলিন রাসায়নিক কোনো দ্রব্য নয় কিন্তু সাংঘাতিক জীবাণুধ্বংসী। ছাতা থেকে তৈরী

বলে এ জাতীয় ঔষধকে বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পরে আরও অনেক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়েছে। ষ্ট্রেপটোমাইসিন, অরিওমাইসিন, টেট্রামাইক্লিন, ক্লোরোমাইসেটিন, নিওমাইসিন ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে মনে হয় জীবাণু ঘটিত রোগে মানুষ বুঝি আর মরবে না।

এই বিশ শতকের ষাট বছরে একদিকে যেমন জীবাণু ঘটিত রোগ সারাবার জন্য নতুন নতুন ওষুধ বেরিয়েছে তেমনি উন্নতি হয়েছে শল্যবিদ্যা বা সার্জারির। অজ্ঞান করবার অভিনব সব পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে এবং রক্ত দিয়ে অপারেশন জনিত 'শক' প্রতিরোধের উপায় সহজ লভ্য হওয়ায় সব দেশেই এখন কঠিন কঠিন অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে। কলকাতা শহর ছাড়া যে অপারেশন আগে আষাঢ়ের দেশে আর কোথাও হত না মফস্বলেও আজকাল তা অনায়াসে হচ্ছে।

হৃদযন্ত্র বা মস্তিষ্কের অপারেশন পর্যন্ত এখন সাফল্যের সঙ্গে করা যাচ্ছে।

এই শতকের আর একটি অভিনব আবিষ্কার খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন। সে কালে সমুদ্র যাত্রায় টিনে বন্ধ খাদ্য খাবার ফলে এক মারাত্মক রোগ হত তার নাম স্কার্ভি। পরে দেখা গেল লেবুর রস মিশিয়ে ঐসব শুকনো খাদ্য খেলে এ রোগ হয় না। এখন জানা গেছে ভিটামিন সির অভাবেই স্কার্ভি হয়।

খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন তরুণ এক ওলন্দাজ ডাক্তার। তাঁর নাম ক্রিশ্চিয়ান ইজিকম্যান। গত শতকের শেষের দিকে তিনি ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসেন। তখন সৈন্যদের মধ্যে সাংঘাতিক বেরিবেরি হয়েছে। তিনি দেখলেন কলে ছাঁটা শাদা চাল খেয়ে মুরগীদের মানুষের মত বেরিবেরি হয়েছে। লাল চাল খাইয়ে তা সেরে গেল। তাই দেখে তিনি সৈন্যদের কলছাঁটা শাদা চালের সঙ্গে চেকি ছাঁটা লাল চালের খোসার কেন তৈরী করে খাওয়ালেন। বেরিবেরি সেরে গেল। কিন্তু এই লাল চালের খোসায় কি জিনিস থাকে যার ফলে বেরিবেরি সারে তা তিনি বার করতে পারলেন না।

এই জিনিস আবিষ্কার করলেন ডাঃ ক্যাসিমির ফাঙ্ক ১৯১১ সালে। তিনিই এর নাম দিলেন ভিটামিন বি-১।

ক্যাসিমির ফাঙ্ক পি এইচ ডি পোলাণ্ডের ওয়ারশতে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৪ সালে। তাঁর বাবার নাম ডাঃ জ্যাকব ফাঙ্ক। তিনিই ছেলেকে ডাক্তারী পড়তে না দিয়ে রসায়ন বিদ্যা শিখতে পাঠান। ১৬ বৎসর বয়সে ক্যাসিমির ফাঙ্ক বার্লেতে গিয়ে রসায়ন বিদ্যা শিখতে শুরু করেন। ১৯০১ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রি পান। তারপর দু'বছর প্যারিসের পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটে কাজ করে তিনি এক বছর জার্মানীর ভাইসবাডেনে কাটান। শেষে আসেন লণ্ডনের লিষ্টার ইন্‌স্টিটিউটে। এই খানেই তিনি বেরিবেরি নিয়ে গবেষণা করে ভিটামিন বি-১ আবিষ্কার করেন। 'ইটিওলজি অফ ডিফিসিয়েন্সি' ডিজিজ নামে তাঁর প্রবন্ধ বেরোয় ১৯১২ সালে।

আমেরিকার ডাঃ ম্যাকফোলাম মাখন ও ডিমের কুসুমে ভিটামিন এ আবিষ্কার করলেন। আর ইওরোপীয় বিজ্ঞানীরা কড মাছের যকৃৎ থেকে বার করলেন ভিটামিন ডি। লেবু থেকে বেরুল ভিটামিন সি। তারপর বেরুল ভিটামিন ই।

এইসব খাদ্যপ্রাণ এখন রাসায়নিক উপায়ে তৈরী হয় এবং প্রয়োজনীয় সব ভিটামিন একত্র করে মাল্টিভিটামিন নামে বাজারে পাওয়া যায়। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়, সমুদ্রের ওপর, মরুভূমির দেশে, বনে জঙ্গলে, যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা নিজের ঘরে যেখানেই মানুষ থাকুক খাদ্যপ্রাণের অভাব দূর করা এখন সম্ভব হয়েছে। খাদ্যপ্রাণের অভাবজনিত প্রাণঘাতী সব রোগ থেকে আত্মরক্ষা সহজ হয়েছে।

কাচের পাহাড়

আডালবের্ট স্টিফটের

[মূল জর্মান থেকে অনূদিত]

অনুবাদ : সুর্য মিত্র

[আডালবের্ট স্টিফটের-এর রচনাবলি সম্বন্ধে নীট্‌শে মন্তব্য করেছিলেন, 'এখনো এখানে সুন্দরের একটি পৃথিবী র'য়ে গেছে।' দক্ষিণ বোহেমিয়ার ওবেরপ্লান-এ এক তাঁতির পরিবারে জন্মেছিলেন স্টিফটের, সেটা হ'লো ১৮০৫ সালের কথা, যে-বছর ডেনমার্কে জন্ম নিয়েছিলেন হান্স আণ্ডেরসেন। প্রকৃতি-বিজ্ঞান, গণিত এবং শিল্প বিষয়ে অতিনিবেশ সহকারে পড়াশুনো করেছিলেন স্টিফটের, অনেকদিন পর্যন্ত কেবল নানা অভিজাত পরিবারের শিক্ষকতা ক'রেই জীবিকা অর্জন করেছিলেন। অবশেষে তাঁকে অষ্ট্রিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালক নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু একটি দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন ব'লে তিনি ১৮৬৮ সালে আত্মমৃত্যু বরণ ক'রে নেন। 'ডের নাক্‌সমের' ও 'হিটিকো'—এই দুটি বিরাট উপন্যাস ছাড়া স্টিফটের কতগুলি দীর্ঘ ছোটোগল্প প্রকাশ করেছিলেন, যাদের ভিতর এই 'কাচের পাহাড়' ও 'মনে রেখো' সবচেয়ে বিখ্যাত। বিশিষ্ট ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকিয়ে ব'লেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছিলো—এবং এই দিক থেকে তিনি যে আলেমান ইম্প্রেশনিস্টদের পূর্বসূরি এই তথ্যটি 'কাচের পাহাড়' পড়বার সময় আমাদের বারে-বারে মনে পড়ে।—অনুবাদক।]

আমাদের দেশের উঁচু পাহাড়গুলির মধ্যে এক গ্রাম আছে। সেখানকার ছোটো, লাল গির্জেটির চুড়ো উঁচু আর ছুঁচলো, আর তার পিছনে অগুন্তি সবুজ ফলের গাছ। এই লাল রঙের জন্য পাহাড়ের নীল আর অফুরান গোধূলির গোলাপি রঙের মধ্যেও অনেক দূর থেকে গির্জেটি চোখে পড়ে। যে-চওড়া উপত্যকাটির ঠিক মধ্যখানে এই গ্রাম, তার গড়ন ঠিক একটা ডিমের মতো। গির্জেটা ছাড়াও গ্রামে আছে একটি ইশকুল-বাড়ি, গ্রামবাসীদের জন্য মস্ত এক জলঘর, আর অনেকগুলি বড়ো-বড়ো বাড়ি। এই বাড়িগুলোয় সেই পাহাড়ি লোকদের দরকারি সব রকম জিনিশপত্র তৈরি হয়। উপত্যকায় আর পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো আছে অসংখ্য ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর। তাদের মধ্যে অনেকগুলি আবার এতই দূরে যে উপত্যকা থেকে নজরেই পড়ে না, কিংবা যদি-বা পড়ে, সেগুলো ছোটো, কালো-কালো ঝুটকির মতো। সেখানকার লোকদের সঙ্গে এই গ্রামের সম্পর্ক খুবই কম। শীতকালে তাদের কারো মৃত্যু হ'লে তারা ব'সে-ব'সে অপেক্ষা করে, কবে আসবে বরফ-গলার দিন; তারপর বরফ গ'লে পথ পরিষ্কার হবার পর, সেই মৃত আত্মীয়দের কবর দেবার জন্য তারা গ্রামে নিয়ে আসে। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন গির্জের বিশপপ্রধান; সবাই তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে।

উপত্যকার ভিতর দিয়ে বাইরের কোনো পথ চ'লে যায় নি; ফলে বাইরের পৃথিবী থেকে এখানে খুব কম লোকই আসে। কোনো আসে কোনো নিঃসঙ্গ পর্যটক, কোনো-দিন-বা কোনো শিল্পী। গ্রামে যারা থাকে, তারা নিজেদের নিয়েই গ'ড়ে তুলেছে আর এক পৃথিবী। প্রত্যেকের নাম, একের বংশতালিকা অন্যের একেবারে মুখস্থ। একজনের মৃত্যু হ'লে বাকি সবাই অভিভূত হ'য়ে যায়, কোনো নতুন শিশু জন্মালে সবাই জানে তার নাম। সমতলবাসীদের সঙ্গে তাদের ভাষার কিছুটা পার্থক্য আছে। নিজেদের ভিতর কোনো কারণে ঝগড়া বাঁধলে সেটা তারা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করে,

একের বিপদে এগিয়ে আসে অন্যেরা, আবার অসাধারণ কিছু ঘ'টে গেলে ছুটে যায় দল বেঁধে। একদিক থেকে এখানকার লোকেরা ভারি প্রাচীনপন্থী। দেয়াল থেকে কোনো পাথর খ'সে পড়লে আবার সেটাকে যথাস্থানে তুলে রাখে, পুরোনো বাড়ির ধরনে তৈরি করে নতুন বাড়ি, ভাঙা ছাত সারায় হুবহু পুরোনো ছাতের নকল ক'রে। এমনকি সেখানকার চিত্রবিচিত্র রঙের গোরুর বাচ্চা হ'লে বাছুরের রংও হয় ঠিক সেই একই ধরনের চিত্রবিচিত্র আর সেই রং দেখে সহজেই চেনা যায় এটা কোন বাড়ির গোরু।

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে আছে তুষারে মোড়া এক পাহাড় —যার ঝকঝকে চূড়োগুলো দেখলে মনে হয় বুঝি-বা ছাতের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। আসলে কিন্তু অত কাছে নয়। হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম—সারা বছর ধ'রেই তার তুষারের মাঠ আর বড়ো-বড়ো পাথর নিয়ে উপত্যকার উপর ঝুঁকে প'ড়ে সে যেন সব কিছুই তাখে। এই পাহাড়টিকেই, সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ব'লে তার সম্বন্ধে গল্পের শেষ নেই। গ্রামের সকলেরই প্রধান খেয়াল হচ্ছে এই পাহাড়ই যেন তার অস্তিত্বের সবটুকু গর্বই তাদের, যেন তারাই একে বানিয়েছে দিনের পর দিন চেষ্টা ক'রে-ক'রে। সত্যি বলতে, পাহাড়টিও কিন্তু নানাভাবে সাহায্য করে গ্রামবাসীদের। তার তুষার জমানো শরীর থেকে অনবরত জল সরবরাহ ক'রে এই পাহাড় ভ'রে তোলে একটি হ্রদ, আর সেই হ্রদের উপচে-পড়া জলস্রোত ঝর্ণার চেহারা নিয়ে নিচে নেমে এসে উপত্যকার বুকের উপর দিয়ে সুন্দর ঢেউ তুলে স্রোত হ'য়ে ব'য়ে যায়। সেই স্রোত গ্রামের কারখানায় বড়ো-মাপের করাত চালায়, চাকা ঘোরায় মিল ও অন্যান্য কারখানার ছোটো-ছোটো যন্ত্রের, গ্রামকে পরিষ্কার ক'রে ধুইয়ে দিয়ে ঝকঝকে তকতকে ক'রে রাখে, আর সমস্ত গোবর-জেল্লাকে পানীয় জলের জোগান দেয়। অনেক কাঠ পাওয়া যায় পাহাড়ের গায়ের ঘন জঙ্গলে। এই জঙ্গলই আবার তুষারের মস্ত চাঁইগুলো—যাদের আভালাঁশ বলে—আটকে রেখে উপত্যকার বাসিন্দেদের বাঁচিয়ে রাখে।

মস্ত দুটো চূড়ো আছে এই পাহাড়ের, যে-দুটিকে ঠিক শিঙের মতো দেখায়। শীতকালে সে-দুটো ঝকঝকে শাদা হ'য়ে ওঠে, অবিকল স্ফটিকের মতো, আর স্বচ্ছ দিনের গাঢ়-নীল হাওয়ার মধ্যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। চূড়োর চারদিকের পাহাড়ি মাঠগুলো তখন একেবারে শাদা, গড়িয়ে গিয়েছে প্রত্যেকটি ঢালু—ঠিক একরকম দেখায় তাদের, আর এমনকি সেই পাথরগুলো গ্রামবাসীরা যাদের দেয়াল ব'লে থাকে—বরফের শাদা কাপড়ে ঢেকে যায়। পায়ের কাছে ঘুসর কুয়াশামাখা জঙ্গল, তারপরে সেই শাদা দেয়াল, যে-হঠাৎ রূপকথার একটি মস্ত প্রাসাদের মতো আকাশের দিকে উঠে গেছে। গ্রীষ্মদিনের জলজলে সূর্য তার গনগনে হাওয়া বুলিয়ে যখন পাহাড়ের খাড়াই অংশ থেকে তুষার মুছে দেয়, তখন সেই শিং দুটোয় শাদা সরু শিরা—আর মাঝে-মাঝে শাদা ছোপ—চোখে পড়ে। আকাশের বুকে সেই চূড়োগুলো তখন যেন কালো, চোখা দুটি শিং, অথচ তাদের রং হালকা আর নরম আর ফিকে নীল, আর সেই শিরা ও শাদা ছোপের রং ঠিক শাদা নয়—অনেক দূর থেকে ঘন-পাথরের উপর বরফকে যে-রকম দুধের মতো নীল দেখায়, সেই রং। গ্রীষ্মের তাপ যখন সবচেয়ে বেশি, সেই চূড়োর চারদিকের পাহাড়ি মাঠের উপরের অংশে গত বছরের জ'মে-থাকা তুষার কিন্তু তখনো গলে না। শাদা চোখ মেলে তারা যেন উপত্যকার সবুজ গাছগুলিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে তাখে। কিন্তু তলায় তখন শীতের শেকল টুটে গেছে, গ'লে গেছে ঠাণ্ডা তুষাররাশি, আর জেগে উঠেছে বহু বর্ণের অপরূপ বিচ্ছুরণ—ঠিক নীল নয়, ঠিক সবুজ নয়, আবার একটু লালের আভাসও আছে। গ্রীষ্মের উত্তাপ যখন সবচেয়ে বাড়ে, আর যখন পর-পর অনেক দিন ধ'রে চ'লে সেই গনগনে তাপের জের, তখন অনেক উপত্যকার তুষার খেতের আবরণ খ'সে পড়ে, আর অনেকখানি নীল আর সবুজ রং তালগোল পাকিয়ে জবজবে হ'য়ে ব'সে উপত্যকাটির দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকে। অনেক গুহা আর অনেক চূড়ো: এগুলি ঠাণ্ডা, আঁটো, কঠিন

বরফের জন্ম যাদের দেখা যায়নি, বোমটা স'রে যেতেই তারা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, আর যেখানে পাথর মাটি আর কাদার সঙ্গে তুষার মিশে যাচ্ছে, সেই ময়লা জায়গাটাও চোখে পড়ে। বছরের অন্য যে-কোনো সময়ে উপত্যকার উপর দিয়ে যত জল ব'য়ে যায়, তার চেয়ে বেশি জল তখন ধারাবাহিক স্রোত জাগিয়ে তোলে।

এইভাবে চলে হেমন্ত পর্যন্ত। তারপর ক্রমশ ক্ষীণ হ'য়ে আসে স্রোত, আর একদিন ধূসর কুয়াশায় ঢ'কা প'ড়ে যায় আস্ত উপত্যকা। কিছুদিন পরে কুয়াশা কেটে গেলে দেখা যায় আবার তার নরম পোশাক প'রে নিয়েছে সেই পাহাড়, উঁচু পাথর আর তীক্ষ্ণ চূড়োগুলো আবার শাদা হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পাহাড়ে ওঠার কথা বলতে গেলে প্রথমে যে-কথা বলতে হয়, তা উপত্যকার দক্ষিণ দিকের কথা। উপত্যকা থেকেই উঠতে হয় পাহাড়ে, আর একটা চমৎকার পথ উঠেছে দক্ষিণ থেকে। পাহাড়ের দুটি বড়ো চূড়োকে যে-উঁচু অংশ যোগ ক'রে রাখে, স্থানীয় ভাষায় তাকে বলে 'নেক'। যে-পথের কথা বলছিলাম, সেটা 'নেক'-এর উপর দিয়ে অন্য একটি উপত্যকায় পৌঁচেছে। এই স্বচ্ছ তুষার-পাহাড়কে দীর্ঘ একটি ঢেউয়ের মতো গিরিমালার সঙ্গে যে-'নেক'টা যুক্ত ক'রে রেখেছে, তার উপর আছে দেবদারুর দীর্ঘ অরণ্য। সেখানকার সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, যেখান থেকে পথটি এঁকেবেঁকে ধীরে-ধীরে উপত্যকায় নেমে এসেছে, ঠিক সেইখানেই একটি স্তম্ভ খাড়া হ'য়ে আছে, যাকে সবাই স্মৃতিস্তম্ভ ব'লে থাকে। অনেক দিন আগে এক রুটিওলা বাক্স ভ'রে রুটি নিয়ে 'নেক' পেরোবার সময় এই জায়গায় মারা গিয়েছিলো। কে যেন সেই মৃত রুটিওলা, তার বাক্স আর আশপাশের দেবদারু গাছকে এঁকে তলার অন্য কথায় ঘটনাকে বুঝিয়ে—এবং সেই মৃত আত্মার কল্যাণকামনায় সকলকে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানিয়ে—একটি লাল রঙের কাঠের স্তম্ভের উপর ছবিটি এঁটে, লোকটি যেখানে মারা গিয়েছিলো, সেখানে খাড়া ক'রে রেখেছে। 'নেক' পেরিয়ে ওপাশের উপত্যকায় নামিয়ে দোজা 'নেক'-এর উপর দিয়েই অবশ্য যাওয়া যায়। দেবদারুর অরণ্যের মধ্য দিয়ে যেন একটি পথ চ'লে গেছে দিগন্তের দিকে, যা ক্রমশ ঘুরে-ঘুরে উপরের দিকে উঠেছে। সেখান দিয়ে এগিয়ে গেলে এক সময়ে খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছনো যায়। সেখানে একটিও গাছ নেই, শুকনো কতটা জায়গা, মাটিতে ঘাসের শুকিয়ে যাওয়া চাপড়া, আগাছা কাঁটাঝোপ চোরকাঁটা পর্যন্ত নেই! শুধু শুকনো ঢাওলা, আর যে-সব গাছ ক্ষুধিত জমিতেও বেঁচে থাকতে পারে, তাদের দিয়ে যেন একটি অসমতল গালচে তৈরি ক'রে কেউ সেখানে বিছিয়ে রেখেছে। এখান থেকে জমিটা আস্তে-আস্তে বেশি খাড়া হ'য়ে উঠেছে, সামনের পথ তখন দীর্ঘ ও দুর্গম। আসলে তখন এগোতে হয় একটি খালের মধ্য দিয়ে, যেন একটি ফাঁপা পরিখার পথ দিয়ে চলতে হচ্ছে—তার দিকে দিকে দেখা যায় চওড়া, ফাঁকা, বিশাল জলাভূমি; যত এগোনো যায় তত্তই একরকমই দেখায় সেই জলাভূমি, যেখানে কিছুতেই তারো পথ হারাতে পারে না। কিছু পরে পাথর দেখা যাবে। ছোটো-ছোটো ঝোপের মধ্যে হঠাৎ সেগুলোকে দেখলে এক-একটি গির্জে ব'লে মনে হয়। সেই পাথুরে ঢেলালের উপর দিয়ে বেশ কিছুটা পথ উঠে যাওয়া যায়, তারপর আবার শুরু পাহাড়, যার পিঠে কোনো রকম লতাগুল্মও নেই। উপরের স্বচ্ছ হাওয়ার মধ্য দিয়ে সেই পাহাড় সোজা উঠে গেছে তুষারের বেশে। পথের দু-পাশের জমি তখন চালু হ'য়ে যায়ে নেমেছে। এর ফলেই তুষারের পাহাড় 'নেক'-এর সঙ্গে এক হ'য়ে আছে: যতক্ষণ না গত বছরের জমানো তুষারের কাছে পৌঁছনো হচ্ছে, ততক্ষণ বরফ এড়িয়ে যাবার জন্য এখানকার পাথরের কোণের উপর পা ফেলে ফেলে একটু ঘুর চলা যায়। পাহাড়ের কাটলগুলিতে সেই তুষার এত কঠিন হ'য়ে জমে থাকে যে-বছরের প্রায় যে কোনো সময়েই মানুষের ভার সইতে পারে। এরই প্রান্তে তুষারের ভিতর থেকে উঠেছে শিঙের মতো চূড়ো দুটি, যাদের একটি আবার অন্যটির চেয়ে বেশি উঁচু, আর তীক্ষ্ণতা যেন বরফের চোখা ডগা। সেইজন্যেই তাদের আরও

সুন্দর দেখায়। কিন্তু সেখানে ওঠা ভারি কঠিন ব্যাপার। তুষার জ'মে শক্ত হ'য়ে তাদের ঘিরে আছে, হয়তো কোনো রকমে পা রাখবার জায়গা হ'তে পারে। ফলে, যাঁরা এখানে বেড়াতে আসেন, তাঁদের বেশির ভাগকেই এখান থেকে সেই শিঙের মতো চুড়ো দেরিয়ে রইটা দূর থেকে দেখা যায়, শুধু ততটুকু দেখেই খুশি হ'য়ে ফিরতে হয়। যারা অবশ্য চুড়োয়-উঠবে ব'লে মনস্থির ক'রে আসে, তারা প্রয়োজনমতো দড়ি আর পাহাড়ে ওঠবার লোহার সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে আসে।

পাহাড় আছে দক্ষিণেও, কিন্তু কোনোটাই এত উঁচু নয়। অবশ্য তারাও শেষন্তের প্রারম্ভেই তুষারের চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে থাকে, আর বসন্তের অনেক পরে খোলে সেই আবরণ। কিন্তু প্রতিবারই গ্রীষ্মবেলায় গ'লে যায় তাদের তুষার, আর ঝলমলে রোদে পাথরগুলি চকমকিয়ে ওঠে। তাদের গভীর শ্যামল অরণ্যের কোমল রং নানা এলোমেলো নীল ছায়ায় বিচিত্রিত হ'য়ে ওঠে, আর এত সুন্দর দেখায় যে, ইচ্ছে করে যেন সারা জীবন ভ'রে দেখি।

উপত্যকার অন্য পাশের—উত্তর-পূব আর পশ্চিমের—পাহাড়গুলি যেন দিগন্তের কাছে ঢেউ খেলিয়েছে, বেশ নিচু তারা; অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে মাঠ পার যেন; যাদের উপর দেখা যায় নানা অরণ্যের চুড়ো, আল্‌স পাহাড়ের কুঁড়ে—এই ধরনের সব জিনিশ। পাহাড়ের চুড়োর সঙ্গে যেখানটায় আকাশ মিশেছে সেখানে কেউ যেন অরণ্যের সূক্ষ্ম জাল বুনে রেখেছে। এই সুন্দর কালর দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় গাছগুলো খুব একটা লম্বা নয়, বরং দক্ষিণের পাহাড়ের গাছগুলি অনেক বড়ো। কিন্তু পাহাড়টা যেখানে উজ্জ্বল আকাশের গায়ে গিয়ে লেগেছে সেখানে একটিও গাছ নেই।

উপত্যকার মাঝপথে দাঁড়িয়ে অনেক সময় মনে হয় সেখান থেকে বেরোবার কিংবা সমতল ভূমিতে যাবার বুঝি একটিও পথ নেই। পাহাড়ে যারা একাধিকবার এসেছে, তারা অবশ্য এই ভুলের কথা ভালো ক'রে জানে। আসলে কেবল যে উত্তর দিক দিয়ে সমতল ভূমিতে যাবার একাধিক পথ আছে এবং পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে এইরকম অনেকগুলি পথ যে প্রায় সমতল মাটির উপর দিয়েই গেছে, তা-ই নয়; দক্ষিণেতে—যেখানে মনে হয় উপত্যকার চারদিকের খাড়া পাথরের দেয়াল—একটি পথ আছে, যেটা গেছে এই 'নেক'-এর মধ্য দিয়ে।

এই ছোটো গ্রামটির নাম গ্‌শাইড, আর যে-তুষার পাহাড়টি নিচে গ্রামের বাড়িঘরগুলির দিকে তাকিয়ে আছে, তাকে ডাকা হয় 'গাস' ব'লে।

'নেক'-এর ও-পাশে গ্‌শাইডের চেয়েও সুন্দর আরেকটি উপত্যকা আছে; ওই কাঠের তৈরি স্থপতিতল থেকে যে-পায়ে-চলা-পথটি বেরিয়েছে, সেটি সেই উপত্যকাতেই গেছে। তার সামনেই বিল্‌স্ ডোর্ফ নামে একটি শহর—যেখানে হাট বসে। নানা ধরনের কল-কারখানাও আছে সেখানে, লোকসংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। সচরাচর মফঃস্বল শহরের লোকেরা যে-সব কাজকর্ম ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে, তারাও সেই উপায়ে সংসার চালায়। গ্‌শাইডবাসীদের চেয়ে তাদের অবস্থা খানিকটে ভালো। এ-গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে লাগে মাত্র তিন ঘণ্টা; যারা পাহাড়ে থাকে তাদের কাছে এইটুকু পথ বিশেষ কিছুই নয়, অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটা আর নানা কষ্ট স্বীকার করা তাদের অভ্যেস হ'য়ে যায়। তবু এই দুই উপত্যকাবাসীদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন এত বিপরীত, এমনকি চেহারাতেও এত তফাৎ যে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে বুঝি অনেক মাইলের ব্যবধান। পাহাড়ি অঞ্চলে অবশ্য এ-ধরনের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এই দুই উপত্যকাবাসীদের মধ্যে, নিজেদের পক্ষে একটি মিল আছে; দু-জায়গার লোকেরাই প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল, একের সঙ্গে অন্যে মেলামেশা না-করলেও তাদের দিব্যি চ'লে যায়; তাছাড়া নিজেদের উপত্যকাকে তারা অসম্ভব ভালোবাসে ব'লেই সে-জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকবার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। নিজেদের উপত্যকা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে গেলে তারা একটুও বাঁচতে পারতো কিনা সন্দেহ।

মাসের পর মাস কেটে যায়, কখনো-বা কয়েক বছর, কিন্তু তবু গ্‌শাইডবাসীদের কারোই মিলস্‌ডোর্কের বড়ো ঘাটে আসা হ'য়ে ওঠে না ; যদি হয়, তাহ'লেও বছরে একবার, তার বেশি কিছুতেই নয়। মিলস্‌ডোর্কবাসীরাও তাই, যদিও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে একটি যোগসূত্র বজায় রাখতে হয় ব'লে তারা গ্‌শাইডবাসীদের মতো অতটা কুনো নয়। মিলস্‌ডোর্কের উপত্যকার ভিতর দিয়ে একটি বড়ো পথ চ'লে গেছে ; সে-পথে যাবার সময় কোনো পর্যটকই একবার ভাবতেও পারে না যে উত্তরে বিরাট তুষার পাহাড়ের ও-পাশে আরো একটি উপত্যকা আছে, যেখানকার ছড়ানো বাড়িগুলো সংখ্যায় নেহাৎ কম নয়, আর সেই বাড়িগুলির সঙ্গে আছে একটি গির্জে যার সবুজটা চোখা চূড়ে উঠে গেছে।

গ্‌শাইড-এ খুব ভালো জুতো তৈরি হয় : এই জুতোর ব্যাপারে সেখানকার লোকেরা একটু বেশি শৌখিন। খুব ভালো না-হ'লে জুতো তাদের পছন্দ হয় না। বলতে গেলে একজন মাত্র লোক আছে, যে খুব ভালো জুতো তৈরি করতে পারে। গ্‌শাইড-এর সবচেয়ে ভালো বাড়িগুলো যেখানে, তার বাড়িটা সেখানেই। তার দেয়ালের রং ধূসর, জানলার কাঠামো সাদা, পাখিগুলো সবুজ। একতলায় কারখানা, কারিগরদের ঘর, একটি ছোটো ও একটি বড়ো বৈঠকখানা, ছোট্ট একটি দোকান, রান্নাঘর, মাংস রাখার ভাঁড়ার এবং আরো কয়েকটি সাংসারিক জিনিশপত্র রাখার ঘর। দোতলায় ঘরটি বেশ বড়ো। চমৎকার দুটি বিছানা, জামাকাপড় রাখার জন্য সুন্দর পালিশ করা দেরাজ, বাসন রাখার জন্য কাচের তাক, খোদাই-কাজ-করা টেবিল, গদিমোড়া চেয়ার। দেয়ালে টাঙানো সাধুসন্তদের নানা ছবি, দুটি ঘড়ি—লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতার পুরস্কার—আর কতগুলি বন্দুক। পাশেই যে আরেকটি ছোটো কুঁড়ে বাড়ি আছে, তার মালিকও সে-ই। সেখানে থাকবার উপযোগী ঘর মাত্র একটাই—সেটা আগে একটু বড়োও ; অন্যঘরগুলি ছোটো-ছোটো, টুকিটাকি জিনিশ রাখা হয়। ছেলের বা উত্তরাধিকারীর হাতে বড়ো বাড়ি আর কারবার তুলে দিয়ে বাড়ির মালিক সস্ত্রীক এই ছোটো বাড়িতে এসে শেষ জীবনের ছুটি ও অবসর ভোগ করে। তাদের মৃত্যুর পর বাড়িটা খালি প'ড়ে থাকে নতুন বাসিন্দেদের অপেক্ষায়। বড়ো বাড়ির পিছনে ছোটো গরুশালা আর গোলাঘর, তারপরেই বাগান। গ্‌শাইড-এর প্রত্যেক ভালো বাড়িতেই একটি ক'রে বাগান আছে। সেখানে তরিতরকারি, নানা শাকসব্জি থেকে শুরু ক'রে ফুল ও ফল পর্যন্ত পাওয়া যায়। অনেক বাগানে আবার মৌমাছি পোষবার বন্দোবস্তও আছে। পাহাড়ে অনেকেই মৌমাছি পুষে থাকে।

নিজের অধিকারে বড়ো বাড়িটা পাবার আগে এই জুতো-নির্মেতা শ্যামোর হরিণ শিকার ক'রে বেড়াতো। ইশকুলে সে ছিলো খুব ভালো ছাত্র ; তারপর বাবার কাছে জুতো তৈরির নানারকম কলাকৌশল শিখে ব্যবসার কাজে কিছুদিন নানা জায়গায় ঘোরাফেরা ক'রে এসেছিলো। কিন্তু তার চালচলন ছিলো একেবারে অন্যরকম। তার বাবা কিংবা অন্যান্য কারিগররা যে-রকম কালো টুপি আর কালো রঙের লম্বা কোট পরতো, সে-রকম না প'রে, সবুজ টুপিতে অনেক পালক গুঁজে ছোটো একটি কোট প'রে সে ঘুরে বেড়াতো। নাচের আসরে আর খেলার আখড়ায় সর্বদাই তাকে দেখা যেতো, আর কেউ যদি এ-বিষয়ে তাকে উপদেশ দিতে বা নীতিবাচন শোনাতে আসতো তো খুব নিচু গলায় সে শিস দিয়ে সুর বাজাতে শুরু ক'রে দিতো। আশপাশের প্রত্যেক লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায় সে তার বন্দুক নিয়ে যেতো, আর প্রায়ই চাঁদমারি বিদ্ধ ক'রে উপহার নিয়ে ফিরতো। সেই এলেকার প্রত্যেক শিকারি দলে সে থাকতো, ভালো লক্ষ্যভেদ করতে পারে ব'লে যথেষ্ট পরিমাণে সুনামও কিনেছিলো। পাহাড়ে চড়বার লোহার শরঞ্জাম আর দোনলা বন্দুক নিয়েও মাঝে-মাঝে সে বেরিয়ে পড়তো। একবার এভাবে বেরোবার পর মাথায় গভীর এক ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সে ফিরেছিলো ব'লে শোনা যায়।

এখানে অন্য আর যে-লোক জুতোর ব্যবসা ক'রে তার নাম টোবিয়াস। লোকটা বুড়ো খুংখুরে, পুরোনো

জুতো সারিয়ে দেয়াই তার পেশা। তার হাতে সব সময়ই অনেক কাজ জমে থাকে। স্থানীয় জুতো-নির্মেতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবার ইচ্ছে তার বিন্দুমাত্রও নেই, বিশেষ ক'রে অভ্রজনের কাছ থেকে সে যখন প্র'ই চামড়ার টুকরোটাকরা পেয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে গ্রামের প্রান্তে বড়ো-বড়ো ঝোপের পাশে ব'সে সে কাজ করে। তাকে ঘিরে থাকে অসংখ্য জুতো; কোনোটা পুরোনো ঘুসর, কাদা-মাখা, ছেঁড়া; কোনোটা এতই খারাপ যে সারাবারও অযোগ্য। হাঁটু-ঢাকা উঁচু বুটজুতো অবশ্য একটিও থাকে না। কারণ সেখানকার অধিবাসী-দের মধ্যে গির্জের বিশপমশাই আর ইশকুলের মাস্টার মশাই ছাড়া কেউই সে-ধরনের বুটজুতো ব্যবহার করে না, আর তাঁরা সর্বদাই নিজেদের জুতো সারাবার জন্য বড়ো দোকানে যান, সেখান থেকেই নতুন জুতো তৈরি করেন। শীতকালে বুড়ো টোবিয়াস বড়ো ঝোপের পিছনে তার ছোটো ঘরের চুল্লিতে কাঠের আগুন জেলে কাজ করে। গ্‌শাইডেও কাঠ খুব সস্তা।

মিলস্‌ডোর্কে এক রঙের কারবারি ছিলো। গ্‌শাইড থেকে এ-গ্রামে ঢুকতে প্রথম যে-বাড়িটা চোখে পড়ে, সেটা তার। সেখানেই তার ব্যাবসার কাজকর্ম হয়, অনেক লোক কাজ করে তার অধীনে, এমনকি অনেক যন্ত্রপাতিও সেখানে আছে। উপত্যকাবাসীদের কেউই এর আগে কলকব্জা আর যন্ত্রপাতির কথা শোনেই নি, চোখে দেখা তো দূরের কথা। এই ব্যাবসা ছাড়া চাষআবাদের জন্য তার অনেক জমিও আছে। এই ধনী রঙের কারবারির মেয়েকে বিয়ে করার লোভেই আমা-দের জুতো-নির্মেতা সেই পাহাড় ডিঙিয়ে মিলস্‌ডোর্কে এসে হাজির হয়েছিলো। মেয়েটি যে রূপসী—এ-কথা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো; সেই সঙ্গেই শোনা যেতো তার সংসার চালানোর প্রশংসা, তার শুশ্রূষা, নম্রতা আর হিসেবিপনার কথা। গুজব ছড়িয়েছিলো যে, আমাদের জুতোনির্মেতাকে মেয়েটির ভালো লেগেছে। কিন্তু রঙের কারবারি তাকে নিজের বাড়ির ভিতর ঢুকতে দিতো না। এতদিন তার রূপসী মেয়ে বাপের বাড়ির দেয়ালের বাইরে গ্রামের উৎসব মণ্ডপে বড়ো একটা আসতোই না, গুজব রটবার পর তার যেখানেই যাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেলো; শুধু কেবল গির্জেয় যেতে পারে, কিংবা বাগানে বেড়াতেও কোনো বাধা নেই।

এদিকে সেই জুতো-নির্মেতার ভিতরেও এক পরিবর্তন দেখা গেলো। বাবা মা'র মৃত্যুর পর সে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'য়ে বসলো। একলাই থাকতে হ'তো তাকে। আগে সে যেমন সব সময়েই ঘুরে বেড়াতো বাইরে, কেননা ছিলো তো উদাসীন ছন্নছাড়া আর বাউণ্ডুলে, এখন আবার তেমনিই সে সর্বদা নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ রাখতে শুরু করলো। দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত জুতোর শুকতলায় হাতুড়ি পিটে সে কাটিয়ে দিতে লাগলো। দেমাকি গলায় সে বাজি রেখে বলতে লাগলো পৃথিবীতে এমন কোনো লোক নেই যে তার চেয়ে ভালো জুতো বানাতে পারে। সবচেয়ে ভালো কারিগর না-হ'লে নিজের দোকানে সে চাকরি দিতো না, আর যতক্ষণ না তারা তার নির্দেশ-মতো কাজ করতো ততক্ষণ সে ছাড়তো না। আগে গ্‌শাইডবাসীরা জুতো কিনতে আশপাশের গ্রামে যেতো। কিন্তু দেখতে-দেখতে গোটা গ্রামটাই তার খদ্দের হ'য়ে গেলো, তারপর খদ্দের হ'লো সেই উপত্যকার সকলে, শেষে তার কাছে জুতোর বায়না দিতে মিলস্‌ডোর্ক ও অন্যান্য এলেকা থেকেও লোক আসতে শুরু করলো। এই জুতো তৈরীর ব্যাপারে তার নাম এতটা ছড়িয়ে পড়লো যে অনেক দূরের সমতল দেশের অনেকে পাহাড়ে বেড়াবার জন্য তাকে দিয়ে বুটজুতো করিয়ে নিয়ে যেতো।

পরিপাটি সুন্দর ক'রে সে তার বাড়ি সাজালো। ঝিলেমেয়া কুলুঙ্গির তাকের উপর ঝকঝক্ করতে লাগলো জুতোর সারি। প্রতি রোববারে গাঁয়ের সকলে চাঁদনি চকের চারটে লিণ্ডেন গাছের আশেপাশে এসে জমা হ'তো আর তাদের কেউই সেই জুতোর দোকানের কাচের ভিতর দিয়ে অন্তত একবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার লোভ সামলাতে পারতো না। ভিতরে তখন জোর বিকিকিনি আর দরদস্তুর চলছে।

পাহাড়কে সে ভারি ভালোবাসতো, আর তাই পাহাড়ে বেড়াবার জুতোই সে তৈরি করতো সবচেয়ে ভালো। গ্রামের সরাইখানার বহুবার তাকে বলতে শোনা গেছে যে পৃথিবীতে এমন কোনো লোক নেই যে তার চোকানের চেয়ে ভালো একজোড়া পাহাড়ে বেড়াবার জুতো তাকে দেখাতে পারে। সে বলতো, 'তারা এমন জুতোর কথা জানেই না তো বানাবে কি! জীবনে তারা শোনেই নি কী ক'রে এরকম জুতো বানাতে হয়; এ জুতোর শুকতলায় আকাশের তারার মতো ঝকঝকে কাঁটাগুলো কী ক'রে লাগানো হয় আর কী ক'রে লোহার ওজনটা তারা বইতে পারে—এ-খবর আর-কেউ জানে না। যত চোখাই হোক না কেন, পাথরের ধাক্কা যাতে টের না-পায়, তার জন্যে জুতোর বাইরেটা যে কী-রকম শক্ত আর ভিতরটা যে দস্তানার মতো কেমন নরম করতে হয়, সে-কথাই বা কে জানে, শুনি।'

মস্ত একটা মোটাশোটা হিসেবের খাতা ছিলো তার। সেই খাতায় প্রতি জোড়া জুতোর কথা লিখে রাখতো সে: কারা সেই জুতোর মালমশলা দিয়েছে, জুতোটা কোন জাতের হ'লো—এই ধরনের সব কথা! একই ধরনের জুতোগুলোর গায়ে পর-পর নম্বর বসানো থাকতো। সেই কুলুঙ্গির মস্ত একটা তেরাজে সেই খাতাটি বন্ধ হয়ে থাকতো।

মিলসডোর্ফের সেই রঙের কারবারির মেয়েটি তার বাপের বাড়ির বাইরে আসতো না বটে, এমনকি তার বন্ধুস্বজনের বাড়িতে যাতায়াতও সে বন্ধ করেছিলো—তবু গ্‌শাইড-এর সেই জুতোনির্মেতা বেশ বুঝতে পারতো মেয়েটি বাগানে বেড়াবার সময়, গির্জের যাবার পথে কিংবা জানলার ভিতর দিয়ে পাহাড়ি মাঠ দেখার ফাঁকে-ফাঁকে তাকে লক্ষ্য করছে। ব্যাপার দেখে সেই রঙের কারবারির বউ অনেক সাধাসাধনার পর শেষে একদিন এই বিয়েতে তার মাক-উচু স্বামীর মত করাতে পারলো। তা ছাড়া —সত্যি বলতে—তার চেয়ে ভালো পাত্রও তখন কেউ ছিলো না। ফলে বড়োলোকের এই রূপসী মেয়েকে একদিন সে নিজের বউ ক'রে গ্‌শাইড-এ ফিরে এলো। তা সত্ত্বেও কিন্তু রঙের কারবারির দেমাক গেলো না, বরং বললো, 'সত্যিকার বুদ্ধিমান লোকের জানা দরকার কী করলে ব্যাবসার উন্নতি হয়, নিজে আর বউ-ছেলেমেয়ে চাকরবাকর পেট ভ'রে খেতে পায়, আর কী করলেই বা বাড়িঘর ঝকঝক্ করে আর অনেক টাকা জ'মে ওঠে। সংসারে এই জমানো টাকার উপরেই খাতির বাড়ে কমে। অতএব তার মেয়েকে বিয়ের জিনিশপত্র ছাড়া যৌতুক হিশেবে কিছুই সে দিলে না। কারণ—সে বললে—বাকি সবটাই তো এবার থেকে তার স্বামীর উপর নির্ভর করছে। মিলসডোর্ফে রঙের ব্যাবসা আর চাষের বাগানগুলো ধরলে তার সম্পত্তির পরিমাণ বেশ মোটা হ'য়ে দাঁড়ায়—এই সম্পত্তিকে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে দিলে তার সুনামের ক্ষতি হবে। তাছাড়া তার কারবারের মূলধনই হচ্ছে এইসব সম্পত্তি, কাজেই তাকে এখন ভাগ করবে কী ক'রে? ফলে যৌতুক দেবার মতো ছিটেফোঁটা সম্পত্তিও তার নেই। ভবিষ্যতে যখন সে আর তার স্ত্রী মারা যাবে, মিলসডোর্ফের সমস্ত জমিদারি আর রঙের ব্যাবসা তখন অবশ্য তাদের একমাত্র মেয়ে, গ্‌শাইড-এর জুতোনির্মেতার স্ত্রীই পাবে। তারা স্বামী-স্ত্রীতে তখন এই সম্পত্তি নিয়ে যা খুশি করতে পারে। কিন্তু এই পাবার ব্যাপারেও সে কতগুলো শর্ত ঠিক ক'রে দিলে: প্রথম শর্ত হচ্ছে এই সম্পত্তি পাবার ও রাখবার উপযুক্ত হ'তে হবে তাদের, না-হ'লে সেটা পাবে তাদের ছেলে-মেয়েরা। ছেলেমেয়েও যদি না-থাকে তো সম্পত্তির বৎসামান্য অংশ ছাড়া বাকি সবটাই ভাগ ক'রে দেয়া হবে তাদের আত্মীয় স্বজনদের।

আমাদের জুতোনির্মেতা অবশ্য কিছু চায় না। বরং অহংকারের সঙ্গে এইভাবেই দেখাতে লাগলো যে মিলসডোর্ফের এই রূপসী মেয়েটিকেই সে শুধু চেয়েছিলো। বাড়িতে মেয়েটি যে-রকম খেতে-পরতে পেতো, সে-রকম খাবার-দাবার জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করা তার পক্ষে কিছু কঠিন হ'লো না। তার সঙ্গে বিয়ে হবার পর মেয়েটি যে শুধু গ্‌শাইড-এর বা উপত্যকার কাছে-পিঠের

সব মেয়ের চেয়েই বেশি সেজেগুজে বেড়াতো তা নয়, এ-রকম ভালো জামাকাপড়-এর আগে মেয়েটি তার বাপের বাড়িতেও কখনো পরেনি। তার বাপের বাড়িতে যে-রকম খাবারদাবার হ'তো এখানে যাতে তার চেয়ে অনেক ভালোভাবে খাবার ব্যবস্থা হয় এদিকেও সে নজর রাখলো। তার শ্বশুরের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য এতদিন যে-টাকাকড়ি জমিয়েছিলো, তাই ভাঙিয়ে সে ধীরে-ধীরে জমি কিনতে লাগলো। তার জমিজমার কথা সবাই বেশ কলাও ক'রে বলতে শুরু করলো কিছুদিনের মধ্যে।

গ্রশাইড-এর লোকেরা নিজেদের উপত্যকার বাইরে বড়ো-একটা যেতো না। এমনকি মিলস্‌ডোর্কেও তাদের খুব কমই যাতায়াত ছিলো। এই দু-গ্রামের হালচাল ছিলো দু-রকমের, তা'ছাড়া মাঝখানে একটা পাহাড়ের বাধাও রয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো লোককেই সে-গ্রাম ছেড়ে অন্য কোনোখানে গিয়ে ঘর-সংসার করতে শোনা যায় নি—মাঝে-মাঝে শুধু খেতের কাজে তাদের অনেক দূরদূরান্তরে যেতে হয়। কোনো মেয়েই এক উপত্যকা ছেড়ে অন্য উপত্যকায় গিয়ে থাকতে রাজি হয় না—অবশ্য বিয়ের কথা অন্য। তাকে তখন বউ সেজে অন্য উপত্যকায় শ্বশুরবাড়িতে এসে থাকতেই হয়। কিন্তু লোকে ঘোরাঘুরো করতে লাগলো মিলসডোর্কের রঙের কারবারির রূপসী মেয়েটি গ্রশাইড-এর জুতোনির্মেতার বউ হ'লেও সে-গ্রামের লোকদের সঙ্গে ঠিক যেন মিশে যেতে পারছে না। তারা কখনোই তার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি, বরং মেয়েটির সরল আর মধুর ব্যবহারের জন্য ভালোই বাসতো—তবু কেমন যেন একটা লজ্জা আর সংকোচের ভাব তাদের সর্বদাই দূরে দূরে রাখতো। গ্রশাইড-এর ছেলেমেয়েরা সবাই সকলের সঙ্গে যে-রকম মন খুলে মিশতে অভ্যস্ত, কখনোই সেভাবে তার সঙ্গে তারা মিশতে পারেনি। এভাবেই কাটতে লাগলো দিন—কিছুতেই তাদের ভিতরকার আড়ষ্টতা কাটলো না। তার উপর মেয়েটিকে সংসারের কাজ করতে হ'তো না দেখে, আর সব সময়েই সেজেগুজে আছে লক্ষ্য ক'রে, তাদের সেই দূরত্ব তো কমলোই না, বরং বেড়ে চললো।

বিয়ের এক বছর পরে তাদের একটি ছেলে হ'লো, আরও কয়েক বছর পরে একটি মেয়ে। কিন্তু তার মনে হ'তো তার স্বামী বুঝি ছেলেমেয়েদের যতটা ভালবাসা উচিত ততটা বাসছে না, অন্তত সে নিজে যতটা বাসে ততটা তো নয়ই। তার স্বামীর হাবভাব ভারি গম্ভীর ছিলো আর নিজের ব্যাবসার ভাবনায় ডুবে থাকতো ব'লেই সে এ-কথা সন্দেহ করতো। ক্বচিৎ সে আদর করতো ছেলেমেয়েদের, কিংবা খেলতো তাদের সঙ্গে, আর এমন একটা ঠাণ্ডা শান্ত গলায় তাদের সঙ্গে কথা কইতো যেন বয়স্ক লোকের সঙ্গে কথা কইছে। কিন্তু তাদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে কোনোদিন যাতে সামান্য ত্রুটিও না-হয়, সেদিকে সর্বদাই বিশেষ খেয়াল রাখতো।

বিয়ের প্রথম কয়েক বছর রঙের কারবারির স্ত্রী প্রায়ই গ্রশাইড-এ বেড়াতে আসতো। তার মেয়ে-জামাইও মাঝে-মাঝে মেলার সময় বা ছুটির দিনে মিলস্‌ডোকে বেড়াতে যেতো। কিন্তু ছেলেমেয়েরা জন্মাবার পর সে এক অন্য ব্যাপার হ'লো। মায়েরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের এক ধরনের ভালোবাসে, কিন্তু নাতি নাৎনিদের জন্য দিদিমাদের ভালোবাসা একেবারে অন্যরকম: সেই ভালোবাসা এত তীব্র যে ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না। তাদের দেখবার জন্য দিদিমারা যেন সত্যিকার পাগল হ'য়ে ওঠে। রঙের কারবারির স্ত্রী ঘন-ঘন আসতো গ্রশাইড-এ তার নাতি-নাৎনিদের দেখতে, প্রায়ই আসতো, আর সঙ্গে আনতো অনেক উপহার। তার সঙ্গে গল্পগুজব ক'রে যাবার আগে অনেক উপদেশ দিয়ে যেতো। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো এতটা পথ যাতায়াত করা তার পক্ষে ততই কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ালো। তার স্বামীর শরীরও ক্রমশ ভেঙে পড়লো। মা আর মেয়ে তখন পরামর্শ ক'রে ঠিক করলো, এবার থেকে ছেলেমেয়েরাই দিদিমাকে দেখতে যাবে। এর পর থেকে প্রায়ই তারা মায়ের সঙ্গে অন্য গ্রামে বেড়াতে যেতো। মাঝে-মাঝে খুব ভালো ক'রে আগাপাশতলা

জামাকাপড়ে মুড়ে আমার সঙ্গেও গাড়ি ক'রে তারা 'নেক' পার হ'য়ে আসতো। কিন্তু আরো একটু বড়ো হবার পর মায়ের কিংবা আমার সঙ্গে হেটেই তারা মিলস্‌ডোর্কে যাওয়া আসা শুরু করলো। দেখতে-দেখতে বড়ো হ'য়ে উঠলো ছেলেটি, লম্বা হ'য়ে উঠলো লম্বায়—প্রায় চাওাই বলা চলে, আর মজবুত হ'লো তার শরীর, বুদ্ধিও হ'লো খুব। তাই দেখে তার বাবা-মা পাহাড়ের সেই চেনা পথে একলাই তাকে যাতায়াত করার মত দিলো। দিনগুলো খুব পরিষ্কার আর আকাশ অনাবিল থাকলে তার ছোট্ট বোনটিকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি সে চেয়ে নিতো। গ্‌শাইডবাসীদের কাছে এ-ব্যাপারটা কিছু নতুন নয়। হাঁটা তাদের খুব অভ্যেস আছে। তা ছাড়া, মা-বাবারাও চাইতো যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের গড়ন মজবুত হয়, যাতে তারা সব রকম শারীরিক কষ্টই সইতে পারে। বিশেষ ক'রে আমাদের এই জুতোনির্মেতা—যে ছেলেবেলা থেকেই দৌড়ঝাঁপ লাফ আর পাহাড়ে-পাহাড়ে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতো—যখন তার বাল্যবেলার কথা ভুলে যাইনি, তখন সে তো তাতে রাজি হবেই।

ছেলেমেয়েরা সেই পাহাড়ি পথে যতবার যাওয়া-আসা করলে, সে-গ্রামের লোকেরা সবাই মিলেও অতবার সে-পথে যাতায়াত করেনি। আগে গ্রামের লোকেরা শুধু তাদের মাকেই বাইরের লোক ব'লে মনে করতো; এখন, যখন তারা দেখলো ছেলেমেয়েরাও ঘন-ঘন গ্‌শাইড ছেড়ে মিলস্‌ডোর্কে বেড়াতে যায়, তখন তারা তাদেরও বাইরের লোক ব'লে ভাবতে শুরু করলো। তাছাড়া—সত্যি বলতে—তারা কি পুরোপুরি-ভাবেই গ্‌শাইড-এর? তাদের উপর মিলস্‌ডোর্কেরও কি কোনো দাবি নেই?

ছেলেটির নাম কনরাড। এখনি তাকে বাবার মতো গম্ভীর দেখায়। তার মায়ের নামে মেয়েটির নাম হয়েছে সুসান্না, সবাই তাকে ছেঁড়েছুরে ছোটো ক'রে সান্না ব'লে ডাকে। দাদার জ্ঞানে, বিচারবুদ্ধি আর ক্ষমতার উপর সান্নার অগাধ বিশ্বাস। কোনো রকম প্রশ্ন না-ক'রে, তর্ক না-ক'রে তার দাদা যে-পথে যেতে বলতো, সে-পথেই যেতো সান্না। তার মাও ঠিক একইভাবে তার বাবার কথা মেনে চলতো, আর ভাবতো সে-রকম বুদ্ধি আর বিচারশক্তি বুঝি আর কারুরই নেই।

দিন পরিষ্কার থাকলেই সকাল বেলায় দেখা যায় ছেলেমেয়েরা উপত্যকার দক্ষিণের পথ ধ'রে, মাঠ পেরিয়ে 'নেক'-এর উপরকার অরণ্যের দীর্ঘ গাছগুলির দিকে চলেছে। ক্রমশ তারা অরণ্যের কাছে এসে পাহাড়ের উপরকার গাড়ি-চলা পথ ধ'রে চূড়োয় পৌঁছোয়, আর মধ্য-আকাশে সূর্য ওঠবার আগেই পাহাড়ের ও-পাশে মিলস্‌ডোর্কের মাঠ ধ'রে নেমে আসে। আঙুল দেখিয়ে কনরাড বলে এই সমস্ত মাঠই তার দাদামশায়েরই সম্পত্তি। খেতের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তার ছোট্ট বোনটিকে সে চিনিয়ে দেয় কী-কী ফসল ফলেছে। তারপর তাদের চোখে পড়ে বাড়ির ছাতের তলাকার বাঁশ থেকে ঝোলানো কাপড়গুলো শুকোচ্ছে—বাতাসে কখনো সেগুলো পাকিয়ে যাচ্ছে, কখনো যেন যুযুৎসু করছে কিম্ভূতরকম, আর পথ-চলা পথিকের চোখে সেই বিচিত্রভঙ্গিমা অদ্ভুত ঠেকে। কোথায় ঘুরে কারা কাপড় কাচছে আছড়ে, তার আওয়াজ ভেসে আসে হাওয়ায়। তারপর শোনে চামড়ার কলের শব্দ—তাদের দাদামশাই স্থানীয় তাঁতি আর চামড়ার কারবারিদের জন্য ছোট্ট নদীটির পাশে ঐ কারখানাগুলো বসিয়েছেন। শেষে আরেকবার মাঠের কোণে মোড় ঘুরে একটুখানি যাবার পর তারা বড়ো ফটক পেরিয়ে রঙের কারখানির বাগানে এসে পৌঁছোয়। তারা ঠিক জানে দিদিমা তাদের জন্য এখানে অপেক্ষা ক'রে আছেন। তারা পৌঁছোবার আগেই বুড়ি কী ক'রে যেন বুঝতে পারে তার নাতি-নাৎনিরা আসছে। কথাটা মনে হ'লেই জানলার কাছে গিয়ে সে তাকিয়ে থাকে, আর অনেক দূর থেকেই চিনতে পারে তাদের: ঐ তো রোদে সান্নার লাল চাদরটা ঝলমল করছে।

কাপড় ধোলাই আর কাপড় ইস্ত্রির ঘরের মধ্য দিয়ে তাদের সে নিয়ে যায় বসার ঘরে। আদর ক'রে সেখানে

বসায় ; ঠাণ্ডা লাগতে পারে—এই ভয়ে গলার রুমাল আর গায়ের কোট খুলতে দেয় না। তারপর হয় খাওয়া-খাওয়া। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা রুমাল আর কোট খোলবার অনুমতি পায়, দাদামশায়ের বাড়িময় দৌড়ঝাঁপ করে, যা-খুশি তা-ই করার অনুমতি পেয়ে যায় তখন। তাই ব'লে বাঁদরামো করার অনুমতি তাদের নেই। খাবার সময় সর্বদা তাদের দাদামশাই হাজির থাকেন। কী-রকম পড়াশুনো হচ্ছে সে-বিষয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রে কী-কী তাদের দেখা দরকার সে-বিষয়ে তিনি উপদেশ দেন। বিকেলে আবার জামাকাপড়ে মুড়ে দিদিমা তাদের বেরুতে পাঠিয়ে দেন—নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পাঠান, যাতে রাতের আগেই পৌঁছোতে পারে। রঙের কারবারি তার মেয়েকে যৌতুক তো দেয়ই নি, তার উপর প্রতিজ্ঞা করেছিলো মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তির কণাটুকু পর্যন্ত তারা পাবে না। কিন্তু তার স্ত্রী এই প্রতিজ্ঞা মেনে চলতো না। নাতি-নাৎনিকে নানা জিনিশ দিতে তার ভালো লাগে! টাকাটা সিকিটা দেয় তাদের প্রায়ই, এবং শুধু তা-ই নয়, ছোটো-ছোটো ছুটি পুঁটুলি ক'রে তাদের জন্য অনেক সব দরকারি জিনিশ দেয়—এমন সব জিনিশ, যা পেলে নিঃসন্দেহে তারা খুশি হবে। সে-সব জিনিশ গশাইড-এ সেই জুতোনির্মেতার বাড়িতে আছে জানলেও তবু সে দেয়—নিজের দেবার আনন্দেই দেয়; ছেলেমেয়েরা সেগুলো মূল্যবান ধনসম্পত্তির মতো বাড়ি নিয়ে যায়।

বরাবর দিদিমা তাদের তাড়া দিয়ে ফেরৎ পাঠাতেন ব'লে তারা ধীরে-সুস্থে ফিরে যেতে পারতো। মাঝে-মাঝে অবশ্য এখানে ওখানে ব'সে গল্পগুজব করতো তারা, তাছাড়া 'নেক'-এর উপরকার ছোটো-ছোটো হিজল গাছের ধারে ব'সে পাথর দিয়ে বাদাম ভেঙে খেতে, কি খেলতে, কী ভালোই যে লাগে! বাদাম না-থাকলে প্রথম বসন্তে কার গাছ থেকে ঝ'রে-পড়া তামাটে রঙের ফল কিংবা পাতা বা কাঠকুটো নিয়ে তারা খেলাধুলো করে। কখনো-বা রুনরাড তার বোনাটিকে গল্প শোনায়। কখনো-বা সেই লাল নুড়িগুলোর কাছে এসে বাঁ-দিকের অন্য পথ ধ'রে পাহাড়ের চূড়োর দিকে কিছুটা পথ তার বোনকে নিয়ে যায়, আর বলে—এই পথ ধ'রে সোজা এগিয়ে গেলে পৌঁছানো যায় কুয়াশে মোড়া ঝলমলে চূড়োয়—সেখানে আছে মস্ত মস্ত পাথরের চাঁই, শ্যামর হরিণ সেখানে লাফিয়ে বেড়ায়, আর নানাজাতের মস্ত পাখিরা ওড়ে। প্রায়ই তাকে বন ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় সে নিয়ে আসে, আর তারা দুজনে রাখে শুকনো ঘাসে-ভরা মাঠ আর উলুখড়ের ছোটো ঝোপঝাড়। কিন্তু বাড়ি ফিরতে রুনরাড কখনোই দেরি করে না—সন্ধে হবার আগে, আকাশে যখন ঝলমলে লাল ছোপ লেগেছে, ছোটো বোনটিকে নিয়ে সে ফিরে আসে। কোনোদিনই তার দেরি হয় না দেখে বাড়িতে সবাই তার খুব প্রশংসা করে।

বড়োদিনের আগের দিন সকালবেলাটি জ্যোতির্ময় হ'য়ে দেখা দিলো। ভারি সুন্দর লাগলো যখন ভোরের ঝিকিমিকি আলো গশাইডের উপর ক্রমশ স্পষ্ট দিনের আলো হ'য়ে উঠলো। আস্ত আকাশটাকেই যেন ছেয়ে দিয়েছে পাৎলা একটি ওড়নার, আর সবাই অবাক হ'য়ে দক্ষিণ-পূব কোণে সূর্যকে দেখলো আতাফল একটি লাল ফুটকির মতো। বছরের এই সময়টাতেই সূর্য সবচেয়ে দূরে আর সবচেয়ে নিচুতে দেখা দেখা যায়। হাওয়া বইলো এলোমেলো, সুন্দর : মৃদু, মিষ্টি, প্রায় কুয়াশে গরম ঝুলে থাকলো অনন্ত উপত্যকার উপর। পাৎলা মেঘগুলি স্থির আর শান্ত দাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখে জুতোনির্মেতার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের বললো, 'ভারি সুন্দর আজকের দিনটা। বৃষ্টিও অনেক আগেই থেমে গেছে। বাইরের পথে কাদা নেই, শক্ত হ'য়ে আছে শুকিয়ে। গতকাল তোদের বাবা বলেছিলেন আজকের দিনটা পরিষ্কার থাকলে মিলস্‌ভোর্ তোদের দিদিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে যেবেন। যাবার আগে একবার ওঁর মত নিয়ে আয়।'

তখনো ছেলেমেয়েদের পরনে ছিলো রাত্রিবেলার ঢিলে আলখাল্লা আর ঢিলে পাজামা। মায়ের কথা শুনেই তার

এক দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হ'লো, যেখানে বাবামশাই ঘন্টেরের সঙ্গে কথা কইছিলেন। তাদের কথা শুনে সহজেই তিনি মিলস্‌ডোর্পে যাবার অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে আবার তারা এক দৌড়ে মায়ের কাছে ফিরে এলো।

খুব পরিপাটি ক'রে মা তাদের সাজাতে লাগলেন। তাদের যানে মেয়েটিকেই,—কনরাড নিজেই নিজের জামা-কাপড় প'রে তার বোনের অনেক আগেই প্রস্তুত হ'য়ে নিলে, তাই মেয়েকেই তিনি রাজ্যের মোটা-মোটা গরম জামা পরিয়ে দিলেন। তারপর মেয়েকে সাজিয়ে দেবার পরে বললেন: 'সারাকে তোর সঙ্গে নিতে দিচ্ছি—দেখিস খুব সকাল-সকাল ফেরা চাই কিন্তু। পথে এদিক-ওদিক ঘুরবিনা। দিদিমার ওখানে খাওয়াদাওয়া শেষ হ'লেই বাড়ি ফিরবি, একটুও দেরি করিসনে। দিনগুলি এখন ভারি ছোট্ট, আর দেখেছিস কী চটপট সূর্য আকাশ থেকে মিলিয়ে যায়।'

'তুমি কিছু ভেবো না মা,' কনরাড জানালো।

'সারাকে সামলে নিয়ে যাস। দেখিস, যেন হোঁচট না-খায় আর যেন ঘেমে না-ওঠে।'

'দেখবো গো দেখবো, তোমাকে আর ব'লে দিতে হবে না।'

'ভগবান তোদের ভালো রাখুন। যা, দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ব'লে আয় যাচ্ছিস ব'লে।'

বাবামশাই বাছুরের চামড়ার ভারি সুন্দর একটা থলি সেলাই ক'রে দিয়েছিলেন। কনরাড কাঁধের উপর দিয়ে ফিতেটা গলিয়ে নিলো, তারপর দু'জনে মিলে পাশের ঘরে বাবাকে বলতে গেলো। একটুও দেরি করলো না তারা, চটপট ব'লেই বেরিয়ে এলো, মা দু'জনকে আশীর্বাদ করলেন, আর বেড়াতে যাবার ফুর্তিতে শান-বাঁধানো মেঝের দু-জনে একবার নেচে নিলে। গ্রামের চারদিক চক্কর দিয়ে, নানা বাড়ির ফোল ঘেঁষে, ফলের বাগানের বেড়ার পাশ দিয়ে অবশেষে তারা একেবারে খোলা জায়গায় পৌঁছোলো। পাহাড়ের উপরকার অরণ্যের উপর তখন সবেমাত্র সকাল ফুটে উঠছে, তার ভিতর মাঝে-মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমে-ধোয়া শাদা বাষ্প। সূর্য উঠেছে মস্ত, নিটোল, গোল, কিন্তু নিষ্প্রভ। তার আভাহীন লাল চাকাটা যেন ছেলে মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুরে-ঘুরে এগিয়ে চলেছে। পথটা আপেল-গাছের পাতা-ঝরা ডালপালায় ভরা: তাই মাড়িয়ে তারা এগিয়ে চললো।

উপত্যকার কোনোখানে কুয়াশা নেই। শুধু দূরের বড়ো-বড়ো পাহাড় থেকেই গত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে বকবক করছে কুয়াশা। ছোটো পাহাড়গুলোতে কুয়াশা জমেনি—যেন দেবদারু অরণ্যের জামা আর মেতিয়ে-যাওয়া ডালপালার রুক্ষ গেরুয়া পোশাক প'রে তারা শান্ত দাঁড়িয়ে আছে। মাটিও ঠাণ্ডায় জ'মে যায়নি। অনেকদিনের মধ্যে তেমন বৃষ্টিবাদল পড়েনি ব'লে এ-সময়ে শুকনো খটখটে হ'য়ে থাকার কথা। কিন্তু বছরের এ-সময়ে পুরু হ'য়ে শিশির পড়ায় একটু ভিজে-ভিজে ভাব আছে; কিন্তু তাই ব'লে মোটেই পিছল হয়নি, বরং যেন আরো এঁটে গেছে। ফলে তার উপর দিয়ে খুব জোরে হাঁটার সময় মনে হয় শরীরটা যেন হাল্কা হ'য়ে উঠেছে। মাঠে আর বাগে তখনো ছোটো-ছোটো ঘাসগুলি রয়েছে। তাদের চেহারার মধ্যে কেমন একটা শুকনো ধূসর ভাব। মাটির উপর শাদা কুয়াশা জ'মে নেই; খুব কাছ থেকে ভালো ক'রে খেয়াল করলে দেখা যায় শিশিরের চিহ্নও নেই। গ্রামের লোকেরা এ-রকম জমি দেখলে ব'লে থাকে শিগগিরই বর্ষা নামবে।

মাঠের শেষে, একেবারে কোল ঘেঁষে, ছোট্ট একটি পাহাড়ি ঝর্না চোখে পড়ে। তার উপর দিয়ে পায়ে-চলা একটি সাঁকো ও-পারে গেছে। সেই সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে তারা নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঝর্নার জল প্রায় দেখাই যায় না, শুকনো নুড়িগুলোর পাশ দিয়ে নীল একটি রেখা চ'লে গেছে দূরের দিকে। বৃষ্টির অভাবে নুড়িগুলি ধবধবে শাদা। স্রোতের রং আর শীর্ণ চেহারা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় পাহাড়ের উপর এখন দারুণ ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা যে সেখানকার মাটিও জ'মে গেছে, ফলে স্রোতের সঙ্গে

কাদামিশে জলের রং একটুও ঘোলা করতে পারছে না। বরফের চাইগুলোও এমন শক্ত হ'য়ে উঠেছে যে তাদের ভিতর দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা স্বচ্ছ জলই শুধু গ'লে আসছে, আর কিছুই না।

সাঁকোর উপর থেকে তারা ফুর্তিতে উপত্যকার সরু পথ দিয়ে দৌড়তে শুরু ক'রে দিলো। ক্রমশ দেবদারুর বনের কাছে এসে পড়লো তারা। আরো কিছু পরে পৌঁছোলো বনের ধারে, তারপর চললো অরণ্যের ভিতর দিয়ে।

'নেক'-এর উপরকার জঙ্গলে এসে তারা বেশ ক'রে দেখলো গাড়ির চাকার গর্তের মাটিগুলো উপত্যকার যে রকম নরম দেখেছিলো সে-রকম নয়—বেজায় শক্ত। মাটি যে শুকিয়ে কঠিন হ'য়ে গেছে, তা কিন্তু নয়। এটা তারা সহজেই বুঝতে পারলে যে ঠাণ্ডায় এখানকার মাটি জ'মে গেছে। কয়েক জায়গায় মাটির ঢেলা এমনি শক্ত যে তার উপর দাঁড়িয়ে দাপাদাপি করলেও গুঁড়িয়ে যায় না। সব ছেলেমেয়েদের মতোই তারাও বেশ মজা পেয়ে গেলো। গাড়ির চাকার দাগের পাশে-পাশে সরুপথ দিয়ে না-হেঁটে দাগের উপরকার মাটির রেখা ধ'রে তারা চললো, আর পরখ ক'রে দেখতে লাগলো সেই মাটি কতটা শক্ত হয়েছে, তাদের ভার সইতে পারে কিনা। আরো ঘণ্টাখানেক পরে 'নেক'-এর সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছে তারা দেখলো জমিটি এমন শক্ত হয়েছে যে হাঁটলেও শব্দ হয়। সেখানকার মাটির ঢেলা-গুলো এক-এক টুকরো পাথর যেন।

সেটি ফটিওয়ালার লাল স্মৃতিস্তম্ভের কাছে এসে সায়াই প্রথম লক্ষ করলে যে স্তম্ভটা আজ আর দাঁড়িয়ে নেই। যেখানে সেটা থাকবার কথা সেখানে গিয়ে দেখলো লাল রঙের গোল খুঁটিটা, যার উপর ছবিটা ছিলো, শুকনো ঘাসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। খড়ের মতো পাৎলা ঘাসে জায়গাটা ঢাকা। ফলে চিৎপাৎ হ'য়ে প'ড়ে-থাকা স্তম্ভটা ভালো ক'রে চোখেই পড়ে না। এটার এমন করুণ অবস্থা কেন, তা তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। কেউ কি ফেলে দিয়েছে, না কি নিজে থেকেই আছড়ে পড়েছে—কে জানে! তারা লক্ষ ক'রে দেখলো খুঁটিটার গোড়ার দিকটা একেবারে প'চে গেছে। হয়তো এইজন্যই এটা চিৎপাৎ হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছে। জীবনে প্রথম খুব কাছ থেকে ছবিটা দেখতে আর লেখাটা পড়তে পেয়ে তারা খুব খুশি হ'য়ে উঠলো। কিছুই তারা বাদ দিলে না, সবই দেখে নিলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে : সিমনেল কেক-ভরা বাক্সে রুটি-ওলার পাতুর হাত, তার বোজা চোখ, ঘুমের কোট আর আশপাশের দেবদারু গাছ। সব কিছু দেখা হ'লে লেখাটা তারা বানান ক'রে-ক'রে চেঁচিয়ে পড়লো, তারপর আবার চলতে শুরু ক'রে দিলে।

এক ঘণ্টা পরে দু-পাশ থেকেই যেন অন্ধকার কালো বন স'রে গেলো। পাৎলা হ'য়ে এসেছে গাছের সারি : মাঝে-মাঝে দুটো-একটা ওক, কখনো রুপোলি বার্চ। আরো কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে-সঙ্গে চললো ছোটো-ছোটো ঝোপঝাড়, তারপর তারা চালু মাঠ দিয়ে মিলস্‌ডোর্ফের উপত্যকার উপর দৌড়ে নামতে লাগলো।

এখানকার উপত্যকা গ্রশাইড-এর চেয়ে অনেকটা নিচু। সেই তুলনায় মিলস্‌ডোর্ফ অনেকটা গরম। এখানকার উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য গ্রশাইড-এর চেয়ে দিন পনেরো আগে থেকেই এই উপত্যকায় ফসল কাটা শুরু হয়। কিন্তু, আশ্চর্য, এখানকার সমস্ত জমি আজ ঠাণ্ডায় জ'মে আছে। দাদামশায়ের চামড়ার আর কাপড় ধোলাই-এর কারখানার কাছে পৌঁছে তারা দেখতে পেলো চারদিকে সুন্দর সব বরফের টুকরো ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। কারখানার বড়ো-বড়ো চাকা থেকে যে-জল ছিটিয়ে পড়ে, এই বরফের টুকরোগুলো তা-ই থেকেই জন্মেছে। দেখে তারা ভারি খুশি; ছোটোরা সকলেই সহজে খুশি হয়।

তারা যে আসছে—মিসিসা সেটা দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন, তাই এগিয়ে এসেছিলেন। জ'মে যাওয়া ধোলা জলের পাশ দিয়ে তিনি কনরাড আর সায়াকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন।

গরম জামাকাপড়গুলো তাদের গা থেকে মিসিসা

খুলে দিলেন। তারপরে ঘরের ভিতরকার চুল্লিতে কাঠ দিয়ে আগুনটা ঝোরালো করতে-করতে নানা খবর জিগেস করলেন।

নাতি-নাৎনির উত্তর শুনে বললেন, 'খুব ভালো করেছিস। এই তো চাই। তোদের দেখে যে কী খুশি হয়েছি! কিন্তু আজ তোরা চটপট ফিরে যাবি। দিনটা ভারি ছোট, আর ঠাণ্ডাটাও ভীষণ তাড়াতাড়ি পড়ছে। আজ সকালেও মিলস্‌ভোর্কে কোনো কুয়াশা ছিলো না।'

কনরাড বললে, 'গ্‌শাইড-এও ছিলো না।'

'সেই জন্যেই তো তাড়াতাড়ি ফেরার কথা বলছিলুম। নইলে যাবার সময় ঠাণ্ডায় হয়তো কষ্ট পাবি।' তারপর শুরু হ'লো দিদিমার অন্য সব প্রশ্ন: মা কী করছে, বাবামশাই কী করেন, গ্‌শাইড-এ কোনো অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে কিনা, এইসব।

প্রশ্ন শেষ ক'রে দিদিমা তাড়াতাড়ি খাবার ব্যবস্থা করলেন। অন্য বারের চেয়ে অনেক আগেই আজ টেবিলে খাবার সাজানো হ'লো। নাতি-নাৎনিদের জন্য খুব একটা মুখরোচক খাদ্য তিনি নিজেই রান্না ক'রে দিলেন। তারপর তাদের বাবামশাই এলেন, আর বড়োদের সঙ্গে সমান হ'য়ে সান্না আর কনরাড খেতে বসলো। বিশেষ ভালো খাবারগুলো দিদিমা রেকাবি থেকে তাদের তুলে-তুলে দিলেন, আর খাওয়া শেষ হবার পর সান্নার গালে-মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক আদর করলেন। এর মধ্যেই তার গালদুটি টুকটুকে লাল হ'য়ে গিয়েছিলো।

একটুও অপেক্ষা না ক'রে ব্যস্তভাবে ঘুর-ঘুর করতে-করতে দিদিমা তাদের জন্য নানা জিনিশপত্র প্যাক ক'রে দিতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে কনরাডের চামড়ার ঝোলাটা ফুলে ঢইঢুম্বুর হ'য়ে উঠলো। তার পকেটেও হরেক রকমের সব জিনিশ গুঁজলো। সান্নার ছোট পকেটদুটিও খালি থাকলো না। পথে খাবার জন্য এক-এক টুকরো কটিও তাদের দিলেন দিদিমা। থলির মধ্যে দিলেন দুটি গমের পিঠে, আর বললেন খুব খিদে পেলে ওগুলোও যেন তারা খেয়ে নেয়। 'তোদের বাবার জন্য এক প্যাকেট ভালো তাজা কফি দিলুম। গ্লাসের ভিতর কালো কফি ভরা রইলো। ছিপিটা ভালো ক'রে এঁটে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। ওখানকার চেয়ে অনেক ভালো এই কফিটা—একটু চেখে দেখলেই সে তা বুঝতে পারবে। দস্তরমতো ভালো ওষুধের মতো কাজ করে—এত কড়া যে ছোট্ট এক চুমুক খেলেই সমস্ত ভিতরটা একেবারে গরম হ'য়ে ওঠে—এক চুমুকে শীত-কালের সবচেয়ে ঠাণ্ডা দিনেও শীত করে না। ঝোলার মধ্যে আরো সব ছোটো-ছোটো বাক্স আর কাগজের মোড়ক থাকলো। ঘর ক'রে বাড়ি নিয়ে যাবি—বুঝলি তো।'

আরো কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে গল্প ক'রে দিদিমা বললেন এইবার শোওয়াই ভালো। 'দেখিস সান্না, তোর যেন আবার ঠাণ্ডা না-লাগে। জোরে হেঁটে ঘেমে-ওঠার চেষ্টা করবি না। আর সাবধান, কখনো ছুটবি না মাঠে কিংবা গাছের তলা দিয়ে। সন্ধের দিকে যদি হঠাৎ বাতাস বইতে শুরু করে, তাহ'লে আরো আস্তে হাঁটবি। তোদের মা-বাবাকে আমার ভালোবাসা জানাস। বড়ো দিনটা তাদের যেন চমৎকার কাটে, এই আমার কামনা।'

সান্না আর কনরাডের গালে চুমু খেলেন দিদিমা, তারপর তাদের সঙ্গে বাইরে পর্যন্ত এলেন। সঙ্গে ক'রে বাগানের ভিতর দিয়ে গিয়ে খিড়কির দুয়োর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, তারপর দুয়ার বন্ধ ক'রে বাড়ির ভিতর ফিরে গেলেন।

পাহাড়ের ঢালু জায়গাটার ছড়ানো গাছ আর ছোটো-ছোটো ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে উপরে ওঠবার সময় আকাশ থেকে একটি-একটি ক'রে খুব ধীরে-ধীরে তুষারের ফুল ঝরতে লাগলো।

কনরাড বললে, 'যা ভেবেছিলুম, সান্না। বরাবরই মনে হয়েছে আজ আমরা তুষারবৃষ্টি দেখতে পাবো। মনে পড়ছে তো যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম তখনো সূর্যটা দেখা যাচ্ছিলো টকটকে লাল; এখন তার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। গাছের আগায় শুধু ধূসর কুয়াশা ঝ'রে আছে, যার মানেই হ'লো আজ তুষার পড়বে।'

তুষারপাতের সম্ভাবনা আছে দেখে তাদের ফুর্তির অন্ত রইলো না। পড়তে থাকা একটি তুষার-ফুলকে তার জামার কালো হাতার উপর ধরতে পেরে সান্না তো যারপর খুশি হ'য়ে উঠলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার জামার হাতায় সেটি আটকে থাকলো, গ'লে গেলো না। এইভাবে তারা পৌঁছলো মিলস্‌ডোর্ফ এলেকার সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায়। এখান থেকে 'নেক'-এর কালো-করা দেবদারু গাছগুলোর দিকে পথটা চ'লে গেছে। বন যেন সেখানে দেয়ালের মতো ঘাঁটো ও নিবিড়। তারা লক্ষ ক'রে দেখলো সেই বনের গায়ে এর মধ্যেই চমৎকার তুষার পড়ছে—এখন বেশ ঘন ঘন তুষার পড়ছে। সান্না আর কনরাড তৎক্ষণে ঘন বনের ভিতর ঢুকেছে: এখান থেকে বাকি পথটার প্রায় সমস্তটাই বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে।

বনের যেখানে শুরু, সেখান থেকে লাল স্মৃতিস্তম্ভ পর্যন্ত সমস্তটা পথ চড়াই উঠতে হয়। স্মৃতিস্তম্ভ থেকে পথটি নেমে গেছে গ্‌স্লাইড-এর উপত্যকায়। মিলস্‌ডোর্ফের দিকে ঢালটা এত খাড়াই যে পথটা সোজাসুজি উপরে উঠতে পারে নি—পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে এইভাবে ক্রমাগত এঁকেবেঁকে পাকদণ্ডী বেয়ে উঠেছে। স্মৃতিস্তম্ভ থেকে গ্‌স্লাইড-এর মাঠ পর্যন্ত গোটা পথটাই আবার ঘন বনে ভরা—উঁচু-উঁচু ঘেঁষাঘেঁষি গাছ, কোথাও এতটুকু জায়গা ফাঁক নেই। যতক্ষণ না উপত্যকার সমতল জায়গাটায় পৌঁছনো যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত গাছগুলো একটুও ফাঁক হয় নি, তাই বন থেকে খোলা মাঠের মধ্যে পড়লে একেবারে সামনে দেখা যায় গ্‌স্লাইড-এর উপত্যকাটিকে!

'নেক'টা দুটি বিরাট পাহাড়ের চূড়োকে যোগ করেছে। তাদের তুলনায় সেটিকে নেহাৎই ছোটো ব'লে মনে হয়। কিন্তু হ'লে হবে কী, আসলে যদি তাকে কোনো সমতল জায়গায় পোঁতা যায় তো তাকে রীতিমতো এক বড়ো-গোছের পাহাড় ব'লে মনে হবে।

বনের ভিতর এসে তাদের প্রথম চোখে পড়লো মাটির চেহারাটা কী রকম যেন ধূসর হ'য়ে গেছে। যেন তার উপরে ময়দা ছড়ানো হয়েছে। পথের ধারে, গাছের ফাঁকে-ফাঁকে, ঘাসের দীর্ঘ চূড়োগুলোয় তুষার জড়িয়ে আছে, আর হাত-সমান লম্বা নানা ঝোপঝাড়ের সরু ডালগুলোও এর-মধ্যেই তুষারে ঢেকে গেছে, যেন তাদের উপর জ'মে উঠেছে আগুনের দীর্ঘ সাদা শিখা।

'আমাদের বাড়িতে মা-বাবার কাছেও বরফ পড়ছে নাকি দাদা?' সান্না জিগেস করলো।

'নিশ্চয়ই', কনরাড উত্তর দিলে, 'ঠাণ্ডাটাও বাড়ছে, দেখছিস। কাল বেধিস গোটা পুকুরটা আগু জ'মে বরফ হ'য়ে আছে।'

'তাই নাকি!' সান্না বললে।

তার ভাই এ-বার জোরে-জোরে পা চালিয়েছে। তার সঙ্গে তাল রেখে হাঁটার জন্ত সান্না প্রায় ছুটতে শুরু ক'রে দিলো। বাঁকা বাঁকা পথ দিয়ে রীতিমতো জোরে-জোরে তারা এগিয়ে চললো, কখনো পশ্চিম থেকে পুবে, কখনো পুব থেকে পশ্চিমে। তাদের দিদিমা যে বলেছিলেন জোর হাওয়া বেবে, এখনো তার দেখা নেই। বরং চারদিক এত থমথমে যে একটি ডাল কিংবা পাতাও নড়ছে না। শীতকালে বনের মধ্যে বেশ গরম লাগে। তাদেরও মনে হ'লো ঠাণ্ডাটা যেন কমেছে। ক্রমশ বেশি পরিমাণে তুষার পড়তে লাগলো। গোটা ভূমিটা এরই মধ্যে প্রায় সাদা হ'য়ে গেছে। আগু বনের উপর কে যেন পাউডার ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের জামা-কাপড়-টুপিও তুষারে ভ'রে গেলো।

সেই নরম তুষার পায়ে মাড়িয়ে চলতে ভারি মজা লাগলো তাদের। পা দিয়ে-দিয়ে তারা খুঁজতে লাগলো কোনখানটায় সবচেয়ে বেশি তুষার জমেছে, তারপর পা ঘ'ষে-ঘ'ষে এমনভাবে চললো, যেন জল ঠেলে চলেছে। জামাকাপড় থেকে তারা আর তুষার ঝেড়ে ফেললো না।

চারদিক ভারি চুপচাপ হ'য়ে গেছে। ঠাণ্ডার দিনে প্রায়ই বনের মধ্যে অনেক পাখি এদিক-ওদিক উড়ে বেড়ায়। আজ কিন্তু কোনো পাখিরই সাড়াশব্দ নেই। আসবার সময় বরং তারা পাখির ডাক শুনেছিলো, ফেরার পথে কিন্তু একটি পাখিও তারা দেখতে পেলো না—না গাছের ডালে, না আকাশে। আগু বন থেকেই হঠাৎ

যেন প্রাণের সব চিহ্ন লোপ পেয়ে গেছে। তাদের পিছনে শুধু নিজেদেরই পায়ের ছাপ, তাদের সামনে কেবল মসৃণ-তুষার, একটু আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই। তাই দেখে মনে হয় আজ বোধহয় তারা ছাড়া আর কেউই 'নেক'-এর উপর দিয়ে যায় নি। দিক ঠিক রেখে তারা এগিয়ে চললো। কখনো গাছগুলোর কাছে এসে পড়ে, কখনো দূরে স'রে যায়। যেখানে-যেখানে বন আগাছা ছিলো, তাদের ডালেপালায় তুষার জড়িয়ে আছে।

ক্রমশ আরো বেশি তুষার পড়তে লাগলো। ফলে তাদের আর গভীর তুষারের জন্য খোঁজাখুঁজি করতে হ'লো না, চারদিকেই রাশি-রাশি তুষার জ'মে উঠেছে, আর জল জেতে যাবার মতো তুষার ঠেলে তারা চলেছে। ফলে ক্লান্তি তাদের বাড়তে লাগলো খুব। এর মধ্যেই এত ঘন হ'য়ে তুষার পড়ছে যে নিজেদের জুতোর শুকতলার নিচে তারা নরম স্পর্শ পেতে লাগলো। এমনকি তাদের বুটজুতোর চারদিকে সেগুলো জ'মে আটকে যেতে থাকলো। সেই জনহীন শুভ্র বনের সুঁচোলো পাতার উপর তুষার বিঁধে যাবার শব্দ পর্যন্ত তারা শুনতে পেলো।

সান্না জিগেস করলে, 'সেই থামটা আমরা কি দেখতে পাবো, দাদা? সেটা তো শুয়ে পড়েছে, এখন নিশ্চয়ই তার উপর রাশি-রাশি বরফ জমেছে। লালের বদলে থামটার রং এখন নির্ঘাৎ শাদা হ'য়ে গেছে।'

কনরাড উত্তর দিলে, 'তবু দেখতে আমরা পাবোই। তার উপর যত বরফই পড়ুক না কেন, আর সেটা শাদা হোক কি না-ই হোক, মাটির উপর সেটা চোখে পড়বেই পড়বে। দেখিসনি থামটা বেশ মোটাশোটা, আর তার উপর লোহার একটা ক্রুশ আটকানো আছে—ক্রুশটা তো উঁচিয়ে থাকবেই।'

'হ্যাঁ, তাই তো! সে-কথা তো ভেবে দেখি নি।'

এর মধ্যে তারা আরো খানিকটা এগিয়েছে, আর এত ঘন হ'য়ে তুষার পড়তে শুরু করেছে যে খুব কাছের গাছ-গুলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। জমা মাটি আর পথের চাকার দাগের শক্ত মাটির ঢেলাগুলোকে আর বোঝাই যায় না। তুষার-ঝটির জন্য সমস্ত পথটা যেন কেমন নরম হ'য়ে গেছে। বনের ভিতর দিয়ে মসৃণ একটি রেখা যেন চ'লে গেছে: একমাত্র সেটা দেখেই বোঝা যায় এখানে পথ ছিলো। গাছের ডালে-ডালে যেন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে তুষারের শাদা কম্বল। ছোট্ট-ছোট্ট পা দিয়ে তুষারের উপর গভীর দাগ এঁকে পথের মাঝখান দিয়ে তারা এখন চলেছে, হাঁটাও ক্রমশ কষ্টকর হ'য়ে উঠছে, ফলে ধীরে-ধীরে চলতে হচ্ছে। গলার ভিতর দিয়ে তুষার যাতে ভিতরে ঢুকতে না পারে, সে-জন্য কনরাড কোটের কলার উল্টে দিলে। সান্না'র মু-কাঁধের উপর দিয়ে মা শাল জড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটাকে সামনের দিকে টেনে মাথার উপর ভালো ক'রে কনরাড বেঁধে দিলো যাতে কপালের উপর বেশ একটা ঢাকা হয়। মিসিমা যে-হাওয়ার কথা বলেছিলেন, এখনো তার কোনো সাড়াশব্দই নেই। তার বদলে তুষারপাত ক্রমশ আরো ঘন হ'য়ে উঠলো। এত ঘন যে কাছের গাছগুলোও ভালো ক'রে চেনা যায় না। মনে হয় বাতাসের মধ্যে যেন তুষারের থাম দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর ভালো ক'রে কাপড়গুলো বেঁধে তারা এগিয়ে চললো। বাছুরের চামড়ার থলিটা কনরাড নিজের কাঁধ থেকে যে-চামড়ার ফিতেটা দিয়ে ঝুলিয়েছিলো, সান্না চলতে লাগলো সেটা ধ'রে ধ'রে।

তখনো তারা সেই স্মৃতিস্তম্ভটার কাছে পৌঁছায়নি। আকাশে সূর্য নেই ব'লে কনরাড ঠিক বুঝতে পারলো না কটা বাজে। কেবল একটি মাত্র ধূসর শাদা রং সবদিকে।

'আমরা কি শিগগিরই স্তম্ভটার কাছে পৌঁছোবো?' সান্না জিজ্ঞেস করলে।

'কে জানে,' কনরাড উত্তর দিলে, 'আমি তো আর গাছগুলো দেখতে পাচ্ছি না। চারদিকটা শাদা হ'য়ে গেছে ব'লে পথটাও ঠিক চিনতে পারছি না। আমার তো মনে হয় স্তম্ভটাকে আজ আর দেখতেই পাবো না। এত ঘন হ'য়ে বরফ পড়ছে যে সেটা তো ঢেকে গেছেই,' এমনকি থামের কোনো ডগা আর কালো ক্রুশটার চিহ্ন থাকবে ব'লেও মনে হচ্ছে না। তবে তার জন্য কিছু ভাবিস নে। আমরা পথটা ধ'রে চলি; গাছপালার বেড় দিয়ে স্তম্ভের কাছে

পৌঁছে পথটা নিচে নেমে গেছে। আমরা তো এখন সোজা পথ ধ'রে চলবো,—গাছগুলো শেষ হ'লেই দেখবো একেবারে গ্‌লাইড-এর ঘাটে পৌঁছে গেছি। তারপর সেই স'াকো; আর সেখান থেকে আমাদের বাড়িটা তো খুবই কাছে।'

'তাই ভালো,' সান্না তক্ষুনি সায় দিলে।

পথটা ক্রমশ চড়াই উঠছে। সেই পথ দিয়ে তারা এগিয়ে চললো। পিছনে তাদের পায়ের দাগও আর বেশিক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, ঘন তুষারপাতে তা চটপট ঢেকে যাচ্ছে। গাছপালার তীক্ষ্ণ পাতার মধ্য দিয়ে তুষার পড়ার সেই কিনকিনে আওয়াজটাও এখন মিলিয়ে গেছে। শুধু তুষার ফুল তাড়াতাড়ি সেই শাদা কম্বলের উপর নিঃশব্দে ঝ'রে পড়ছে। নিজেদের জামাকাপড়গুলো তারা আরো জোরে আঁকড়ে ধরলো, না-হ'লে চারপাশ দিয়ে ঝরা তুষার ভিতরে ঢুকে যাবে।

বেশ জোরেই তারা হাঁটতে শুরু করলো। কিন্তু পথটা ক্রমশই যেন উপর দিকে উঠছে। অনেক চলার পরেও, যেখানে গতিপথটা থাকবার কথা আর যেখান থেকে পথটা গ্‌লাইড-এর দিকে নেমে যাবার কথা, সেখানে তারা পৌঁছলো না। শেষে তারা এমন একটি জায়গায় এসে পড়লো যেখানে কোনো গাছপালা নেই।

সান্না বললে, 'আমি তো আর গাছপালা দেখতে পাচ্ছি না।'

কনরাড উত্তর দিলে, 'রাস্তাটা তো বেজায় চওড়া, আর তুষার তো কী অবিরাম পড়ছে, দেখতেই পাচ্ছিস। বোধ হয় সেই জন্যেই কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

'তা-ই হবে বোধ হয়,' সান্না বললে।

আরো কিছু পরে থেমে গিয়ে কনরাড বললে, 'আমিও তো কোনো গাছপালা দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই আমরা বন পেরিয়ে এসেছি। অথচ শুধু পথটা উপর দিকেই চলেছে। একটু দাঁড়ানো যাক: হয়তো কোনো চেনা জিনিশ চোখে পড়বে।'

কিন্তু কিছুই তারা দেখতে পেলো না। উপর দিকে তাকিয়ে দেখলো, কেবল ফাঁকা শাদা জায়গা। শিলাবৃষ্টির সময় শাদা আর সবুজ মেঘের রাশি থেকে যে-রকম ঝালরের মতো রেখা দেখা যায়, এখনো সেই রকমই শুধু চোখে পড়ে। একটানা ক'রেই চললো সেই ধোঁয়া তুষার। নিচের দিকে তাকিয়ে তারা কেবল দেখলো, খানিকটা গোল শাদা জায়গা, আর কিছু নয়। দেখেই কনরাড ব'লে উঠলো, 'সান্না, আমার কী মনে হচ্ছে, জানিস? আমরা বোধহয় শুকনো ঘাসের উপর এসে পড়েছি। এখানেই তো গরমের দিনে তোকে নিয়ে বেড়াতে আসতুম। এখানে ব'সেই তো আমরা দেখতুম ঘাসগুলো ক্রমশ পাহাড়ের উপর উঠে গেছে, যেখানে সুন্দর সব বুনো আপেল জন্মায়। কাজেই এখান থেকেই আমাদের ডান দিকে নামতে হবে।'

'তাই বোধহয় ভালো, কনরাড।'

'দিদিমা বলেছিলেন আজকের দিনটা খুব ছোট্ট। তুইও তো দেখতে পাচ্ছিস। আমাদের চটপট যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, কনরাড। তাড়াতাড়ি করাই ভালো।'

'একটু দাঁড়া, তোর জামাকাপড়গুলো আরো ভালো ক'রে ঠিক ক'রে দিই।'

নিজের টুপিটা খুলে কনরাড প্রথমে সান্নার মাথায় পরিয়ে দিলো, তারপর টুপির ফিতে দুটো তার থুৎনির তলায় ভালো ক'রে ফাঁস দিয়ে দিলো। সান্নার মাথায় আর গলায় যে-রুমালটা জড়ানো ছিলো সেটা নেহাৎ পাৎলা। কিন্তু কনরাডের একমাথা কোঁকড়া কালোচুলের ভিতর দিয়ে তুষার স'লে ভিতরে ঢুকতে যথেষ্ট সময় লাগবে। তারপর নিজের কারের ব্যাকেটটা খুলে সে সান্নাকে পরিয়ে দিলে। নিজের ঘাড় আর কাঁধের উপর মাত্র একটি শার্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই সান্না যে-ছোটো শালটা এতক্ষণ বুকের উপর জড়িয়েছিলো আর যে-বড়ো শালটা তার কাঁধের উপর ছিলো, দুটোই সে নিলে। ভাবলে, তার পক্ষে এই যথেষ্ট, একটু জোরে হাঁটলেই আর শীত করবে না।

সান্নার হাত ধ'রে সে এগিয়ে চললো। চারদিকের শ্বেতশুভ্র রঙের উপর নিজের উজ্জ্বল কৌতূহলী চোখ

রেখে খুশি হ'য়েই হাঁটতে লাগলো সাদা। শুধু তার ছোট্ট পা-দুটি কনরাডের সঙ্গে সমান তালে তাল রাখতে পারছিলো না। কনরাড এমনভাবে হাঁটছে যেন একুনি সে আজকের ব্যাপারটার একটা কোনো হেস্তনেস্ত করবে।

আর-কোথাও না-দাঁড়িয়ে তারা এগিয়ে চললো। এ-রকম অবস্থায় শিশু আর পশুদের শরীরে অদ্ভুত একটা শক্তি আসে। কারণ তারা জানে না তাদের বরাতে কী আছে, আর কোন মুহূর্তেই বা তাদের সামর্থ্য ফুরিয়ে যাবে।

কিন্তু হাঁটবার সময় তারা কিছুতেই বুঝতে পারলে না পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসছে কিনা। ডান দিকে মোড় নিয়ে নিচের দিকে মুখ ক'রে এবার তারা হাঁটতে শুরু করেছিলো। কিন্তু তবু আবার তারা এমন পথে এসে পড়লো, যেটা কেবলই উপর দিকে উঠেছে, চড়াইয়ের পর চড়াই ভাঙতে হচ্ছে। প্রায়ই তাদের সামনে বড়ো বড়ো পাথর পড়তে লাগলো। সেগুলোকে পাশ কাটাবার জন্য খামকাই ঘুরে যেতে হ'লো তাদের। একটা পরিখা-পথে তারা হাঁটছিলো। সে-পথ তাদের অনর্থক গোল একটি চক্রের মধ্যে ঘোরালো। অনেক উঁচু চড়াই তারা ভাঙলো—তাদের ছোটো-ছোটো পায়ের তলায় সেই চড়াই পথ বড়ো বেশি খাড়া মনে হ'লো, যদিও বিশেষ কোনো লাভই হ'লো না। যে-পথ নিচের দিকে গেছে ব'লে মনে হ'লো, সে পথে চলতে গিয়ে হঠাৎ তারা আবিষ্কার করলে হয় সেটা সমতল, নয় কোনো গভীর গর্ত, নয়তো এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত সোজা চ'লে গেছে।

'আরি মুশকিল তো! এ তবে কোথায় এলুম, কনরাড?' সাদা শুধোলে।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' কনরাড জবাব দিলে, 'শুধু যদি এমন কিছু দেখা যেতো যেটা দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়।'

কিন্তু তাদের চারদিকে সেই চোখ ধাঁধানো শাদা রং ছাড়া আর কিছুই নেই। চারপাশেই যেন শাদা রঙের ঢাল বিছোনো, আর তার ওপাশেই অনন্ত এক কুয়াশা। সেই কুয়াশা যেন সব কিছুকে গিলে ফেলেছে, ঢেকে ফেলেছে, আর সব শেষে আকাশ থেকে নেমে-আসা অনিঃশেষ তুষারপাতের সঙ্গে মিশে গেছে।

কনরাড বললে, 'সাদা, একটু দাঁড়ানো যাক। আবার একটু থেমে কান পেতে থাকি—হয়তো নিচের উপত্যকার কোনো শব্দ আমরা শুনতে পাবো: কুকুরের ডাক বা ঘণ্টার গম্ভীর ধ্বনি কি কারখানার চাকার আওয়াজ, নয়তো নিদেন কারো গলা। নিশ্চয়ই কিছু আমরা শুনতে পাবো, আর তাহ'লেই বুঝবো কোন পথে যেতে হবে।'

তাই তারা দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলো না। আরো খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো তারা কিন্তু তবু কিছু শোনা গেলো না। কোনো শব্দই নেই; খুব অস্পষ্ট, আবছা—কোনো রকম শব্দই কোথাও নেই। শুধু নিজেদের নিশ্বেসের ক্ষীণ শব্দ তাদের কানে এলো। সেই মৃদুতাহীন স্তব্ধতার ভিতর মনে হ'লো বুঝি তাদের চোখের পাতার উপর তুষার-পাতের শব্দও তারা শুনতে পাবে।

এখনো পর্যন্ত কিন্তু তাদের দিদিমার ভাবিকথন ফলালো না—এখনো কোনো বাতাস ওঠে নি কোথাও। এমন কি হাওয়ার ভিতর ক্ষীণতম স্পন্দনও যেন কোথাও নেই। এদিকটায় এটা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা।

অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর তারা আবার চলতে শুরু করলে।

'থাকগে,' কনরাড বোনকে অভয় দেবার চেষ্টা করলে, 'এতে কিছু এসে যায় না, সাদা। ভর পাসনে—তাহ'লেই হ'লো। আমার সঙ্গে আয়। দেখিস, ঠিক নিয়ে যাবো। শুধু এই বরফ পড়াটা যদি একটু থামতো!'

সাদা অবশ্য মোটেই ভয় পায়নি। তার ছোটো-ছোটো পা বাড়িয়ে আগেকার মতো সে আবার হাঁটতে শুরু ক'রে দিলে। সাদা পথটা যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেবার জন্যে তৈরি হয়ে উঠেছে: সেই অনন্ত শুভ্র পথে তাকে নিয়ে এগিয়ে চললো কনরাড।

কিছুক্ষণ পরেই তারা দেখতে পেলো পাথরের স্তূপ। ভীষণ উজ্জ্বল সেই শুভ্রতার ভিতর থেকে নিজেদের কালো অস্পষ্ট তিন-চার-পাঁচ কোণা শরীরগুলোকে যেন তুলে ধরেছে পাথরেরা: তারা কাছে আসতে-না-আসতেই পাথরগুলো যেন হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে তাদের ঘাড়ে এসে পড়লো! খাড়া সোজা দেয়ালের মতো উঠে আছে সেগুলো; এত সোজা উঠেছে যে কোনো পরিমাণ তুষারই তাদের দু-পাশে জমতে পারছে না, ছিটকে প'ড়ে যাচ্ছে।

'সাম্রা, সাম্রা!' চেঁচিয়ে উঠলো কনরাড, 'এই স্থাখ সেই পাথরগুলো। আমাদের শুধু সোজা এগিয়ে যেতে হবে, সোজা যেতে হবে।'

সোজাই চললো তারা। পাথরের মাঝখান দিয়ে, পাথরের তলা দিয়ে, পাথরের পাশ দিয়ে তারা চললো। পাথরগুলি তাদের খুশিমতো ডান বা বাঁ দিকে যেতে দিলে না—কেবল একটি সরু পথে তাদের চালিয়ে নিয়ে চললো। কিছু পরে পাথরগুলোও হারিয়ে গেলো চোখের সামনে থেকে, সেগুলোকে আর দেখা গেলো না। যেমন হঠাৎ এসে ভাই-বোনে তাদের উপর হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো, তেমনি হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সেগুলো যেন হারিয়ে গেলো। আবার তাদের চারপাশ ঘিরে থাকলো শুধু সাদা কুয়াশা—এতটুকু অন্ধকার নেই কোথাও—শুধু সেই শুভ্র অস্পষ্টতা। মনে হ'লো চারপাশে যেন আলোর ছড়াছড়ি, অথচ তিন পা আগেকার জিনিশ তারা দেখতে পেলে না। যেন সব কিছুই একটা সাদা অন্ধকারের ঘোমটা প'রে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও ছায়া পড়ে নি, আর তাই কোনো মতেই মাপবার উপায় নেই কোন জিনিশটা ঠিক কতটা বড়ো। কোন দিকে তারা চলেছে, উপরে না নিচে, সেটা তারা বুঝতেই পারলে না। হঠাৎ তারা পা ফেলে বুঝলো সামনে একটা চড়াই পড়েছে সামনে: আর সেই চড়াই যেন তাদের দুই ধাক্কা বাড়িয়ে দিয়ে জোর ক'রে তাদের উপরে টেনে নিলো।

'আমার চোখ ব্যথা করছে দাদা,' বললে সাম্রা।

'বরফের দিকে তাকাস না,' কনরাড বোনকে বাৎলে দিলে উপায়, 'বেদের দিকে চেয়ে থাক। অনেক আগে থেকে আমারো চোখ ব্যথা করছে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। বরফের দিকে আমাকে চেয়ে থাকতে হবেই, পথটা লক্ষ্য করা দরকার তো! ভয় পাসনে, বুঝলি। যেমন ক'রেই হোক তোকে আমি গ্‌শাইড-এ নিয়ে যাবো, কোনো ভয় নেই।'

'বুঝতে পেরেছি, দাদা কোনো ভয় নেই।'

আবার তারা এগিয়ে চললো। কত চেষ্টা তারা করলে, ঘুরলো কত মোড়, পেরোলো কত বাঁক, কিন্তু নিচে নামবার কোনো লক্ষণই নেই। মাঝে-মাঝে হঠাৎ দু-পাশের জমিটা খাড়া হ'য়ে ওঠে, মধ্যখানের পথ দিয়ে তারা এগিয়ে চলে—কিন্তু কেবলি উপরে ওঠা। দু-পাশের সেই খাড়া জমি শেষ হবার পর মোড় বেঁকে তারা ভাবে এবার বুঝি নিচে নামতে পারবে। কিন্তু তক্ষুনি নিজেদের ভুলটা অতিকায় হ'য়ে দেখা দেয় চোখের সামনে—হতাশভাবে তাকিয়ে তারা আবার সামনে খাড়া চড়াই। তাদের ছোটো-ছোটো পাগুলি ক্রমাগত পাথরে হোঁচট খেতে লাগলো। কখনো-কখনো আবার পথের মধ্যেকার বড়ো-বড়ো খাপছাড়া পাথরগুলোর জন্ত আসল পথ ছেড়ে তাদের অনেকটা যেতে হ'লো ঘুরে।

তারা লক্ষ করলে নরম তুষারের মধ্যে পাগুলো ডুবে গেলেও তলাকার মাটির শক্ত স্পর্শ আর পাওয়া যাচ্ছে না—মাটির বদলে তলায় আছে যেন অনেক দিনের পুরোনো শক্ত হ'য়ে জ'মে যাওয়া বরফের স্তর। তবু তারা এগিয়ে চললো, চললো বেশ জোরে-জোরেই। হাঁটতে বেশ পরিশ্রম হ'তে লাগলো, কিন্তু থামলেই চারদিকের শূন্যতা তার শুভ্র দস্ত হাত বাড়িয়ে তাদের যেন বন্দী ক'রে ফ্যালে; আবার হাঁটলে পায়ের নিচে তুষারগুলো মচমচ ক'রে ওঠে—তাছাড়া অন্য আর-কোনো শব্দ নেই। আকাশ থেকে একটানা ঘুরে-ঘুরে প'ড়ে পড়ছে তুষারের ফুলকি, নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে এত বেশি পরিমাণে পড়ছে যেন চোখের সামনেই মাটির উপরকার বরা তুষার উঁচু হ'য়ে উঠছে। তাদের নিজেদের

চেহারাও একেবারে শাদা ধবধবে হ'য়ে গেছে, ফলে আশপাশের শাদা জিনিশের সঙ্গে তাদের আর-কোনো তফাৎ নেই। একবার যদি তা'রা একে অন্যের কাছ থেকে দু-এক পা ছাড়াছাড়ি হ'য়ে পড়ে তাহ'লে একজন অন্যকে আর দেখাতেই পাবে না।

তবু ভালো, তুষারগুলো ভাগ্যিস বালির মতো শুকনো। সেই জন্যেই তো পায়ের উপর থেকে তৎক্ষণাৎ ঝ'রে প'ড়ে যাচ্ছে—না-হ'লে তাদের জুতো মোজার সেগুলো জ'মে মুহূর্তে আটকে যেতো, আর যদি-বা ঝ'রে যেতো তবু রেখে যেতো নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেবার জন্যে এক ধরনের চটচটে ভিজে স্পর্শ।

অবশেষে আবার তারা কতগুলো জিনিশ দেখতে পেলো; সেগুলো আর কিছু নয়—অদ্ভুত সব পাথরের টুকরো—অতিকায় রাক্ষসের মতো তাদের চেহারা—এলোমেলো হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। তুষারে তাদের দেহ গেছে ঢেকে, তবু তাদের ফাটলে আর সর্বাঙ্গে তখনো তুষার ঝরছে। আগের বারের মতো এবারেও নজরে পড়ার আগেই পাথরগুলোর উপর তারা প্রায় হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলো।

আরো কাছে গিয়ে আরো ভালো ক'রে তারা পরীক্ষা ক'রে দেখলো। দেখেই চোখ তাদের গোল হ'য়ে গেলো, দেখলো সেগুলো হ'লো আসলে বরফের কতগুলো চাঁই—তাদের সমস্তটাই জমা বরফ। তুষারে ঢাকা হ'য়ে প'ড়ে আছে তারা—শুধু তাদের বিরাট পাশগুলোয় মিহি সবুজ রঙের ঝকঝকে বরফ চোখে পড়ে। সেইখান থেকে ধাপে-ধাপে উঠে গেছে পাহাড়—যেন ফেনার সমুদ্র। কিন্তু তাদের চালু জায়গায় যেন অস্পষ্ট আলোর একটি ঝিকিমিকি—আর তারই ভিতর থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে অদ্ভুত একটি ঝকমকে উজ্জ্বলতা, যেন রাশি-রাশি জহরৎ কেউ এক জায়গায় স্তূপ ক'রে রেখে গেছে। আর রয়েছে তুষারে ঢাকা গোল বল, পাথরের টুকরো, আরো কত জিনিশ—কোনোটা খাড়া, কোনোটা বাঁকা, কোনোটার গায়ে কোনোরকম চোঙ পড়েনি—চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে তারা, যেন দূর পাহাড়ের স্তব্ধ সৌকিদার। গ্লাইড-এর গির্জের চূড়ো সমান উঁচু তারা—তাদের কতগুলোর মধ্যে আবার অদ্ভুত সব গর্ত: সেই গর্তগুলোর আকার নানা ধরনের। কোনোটাতে শুধু একটা হাত, কোনটাতে-বা গোটা একটা মাথা বা আস্ত শরীর, কোনোটাতে-বা খড়-বোঝাই গোটা একটা গোরুর গাড়িই ঢুকে যেতে পারে। বরফের এই চাঁইগুলো ঘেঁষাঘেঁষি পাশাপাশি দাঁড়ানো—কাঁধ সমান উঁচু; ফলে ছোটো-ছোটো ছাত আর গুহা নিজে থেকেই তৈরি হ'য়ে গেছে। সেই ছাতের পাশ থেকে তুষার ঝুলে আছে, যেন কোনো অগোচর জীবের দীর্ঘ শাদা থাবা। সেই বরফের মাঝখানে কালো বাড়ির মতো মস্ত এক বিরাট পাথর দাঁড়িয়ে আছে, তারা দেখতে পেলো। সেটা এত খাড়া যে তার দু'পাশে একটুও তুষার জমতে পারেনি। কিন্তু তাই ব'লে সেটাই এক এবং অদ্বিতীয় পাথর নয়—সে-রকম, কি তার চেয়েও বড়ো-বড়ো, আরো অনেক পাথর বরফের মাঝে-মাঝে সারবন্দী দাঁড়িয়ে; যেন সবা একটি মেয়াল চ'লে গেছে দূরের দিকে। এই পাথরের সারি কিন্তু এক নজরেই চোখে পড়ে না—ধীরে-ধীরে ক্রমশ অস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

সাবা বললে, 'এখানে নিশ্চয়ই অনেক জল ছিলো, না-হ'লে এত বরফ হবে কী ক'রে?'

উত্তরে কনরাড বললে, 'না তো, জল থেকে এ-বরফ জমে নি—এগুলো পাহাড়ের বরফ। পাহাড়ের চূড়োর কাছে এগুলো থাকে—দেখছিস না ঠিক সেই ভাবেই সাজানো।

'হাঁ দাদা, তা-ই তো,' বললে সাবা।

কনরাড বললে, 'বরফের কাছ পর্যন্ত আমরা চ'লে এসেছি। আমরা এখন সেই পাহাড়টার চূড়োয়—কোনটা বুঝেছিস তো? সেই যেটা আমাদের বাগান থেকে দেখা যায়, আর রোদে যাকে দুধের মতো শাদা দেখায়। এখন আমি যা বলছি, মন দিয়ে শুনে নে। সেই বিকেলগুলোর কথা কি মনে পড়ছে আমরা যখন বাগানে ব'সে থাকতুম? কী চমৎকার লাগতো ভেবে

ভাখ! চারদিকে গুনগুন করছে মৌমাছিরা, দূরের থেকে ভেসে আসছে বেরুর গন্ধ, আর আকাশের কোণে জ্বলজ্বলে সূর্য দাঁড়িয়ে আছে।'

'হাঁ, দাদা, মনে আছে আমার।'

'পাহাড়টাকেও আমরা দেখতে পেতুম। কী অদ্ভুত নীল তার রং, ঠিক যেন আকাশের মতো—আর তার চূড়োয় ঝকঝকে সাদা তুষার। তখন অবশ্য গ্রীষ্মকাল, হাওয়ায় আছে তাপ, আর সবে ফসল পাকতে শুরু করেছে। মনে আছে তোর?'

'হাঁ, দাদা।'

'নিচে, যেখানে তুষার শেষ হয়েছে সেখানে, কত রকম রং না দেখা যেতো—সবুজ, নীল, সাদা। সেটাই হচ্ছে বরফের স্তূপ। অনেক দূরে ব'লে আমাদের উপত্যকা থেকে ভালো ক'রে দেখাই যেতো না। বাবা বলতেন, "ও বরফ কোনোদিন গলবে না, যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন ওখানকার বরফও থাকবে।" প্রায়ই আমি লক্ষ করতুম বরফের অনেক নিচেও নীল রংটা লেগে রয়েছে। সেগুলো হয় পাথর আর নয়তো মাটি আর মাঠ—এই কথাই আমার মনে হ'তো। আর তারপরেই শুরু হয়েছে দেবদারু গাছের বন—ক্রমশ সেই বন নিচের দিকে নেমে এসেছে। তাদের ভিতর নানা রকমের পাখির চোখে পড়তো। তারপর দেখা যেতো সবুজ মাঠ, তারপর আবার সবুজ বন, তারপর আমাদের গ্‌শাইড-এর মাঠ আর খেত। তাহ'লেই, বুঝলি তো সাদা, আমরা যখন সেই বরফের উপর এসে পড়েছি, তখন আর-কোনো ভয় নেই—এর পরেই আমরা নামবো সেই নীল রঙের উপর দিয়ে, তারপর দেবদারু বন—যেখানে সেই সব পাখির রয়েছে, তারপর মাঠ, তারপর সেই সবুজ বন, তারপর আমাদের গ্‌শাইড-এর উপত্যকায়; আর তারপরেই খুব সহজে আমাদের গ্রামকে খুঁজে বার ক'রে নেবো।

'বুঝেছি দাদা', ছোট্ট ক'রে উত্তর দিলে সাদা।

ভিতর দিকে একটি পথ চ'লে গেছে। সেই পথ ধ'রে বরফের মধ্যে তারা চললো। সেই সব স্তূপগুলোর মধ্যে তাদের মনে হ'তে লাগলো যেন ছোট্ট দুটি কালো বিন্দু নাচতে বেড়াচ্ছে।

তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি যেন ব'লে দিলো কোনো আশ্রয় নেওয়া উচিত। তাই তারা সেই ছাতওলা জায়গার মধ্যে ঢুকে পড়লো। দু'দিকে বরফ, মাঝখানে দিয়ে এগিয়ে গেছে পরিখার মতো একটি পথ: সেই পথ ধ'রে তারা চললো। কোনোকালে এই পথ: হয়তো ছিলো কোনো স্রোতের: এখন অবশ্য স্রোতটা শুকিয়ে গেছে, আর তার উপরটা শুকনো তাজা তুষার ঢেকে দিয়েছে। তুষারের স্তূপ পেরিয়ে বরফের খিলেনদেয়া এই ছাতের তলা দিয়ে তারা ক্রমশ ভিতর থেকে আরও ভিতরে এগিয়ে চললো। জায়গাটা সম্পূর্ণ শুকনো, তাদের পায়ের তলায় শুকনো জমা বরফ। কিন্তু সমস্ত গুহাটাই অদ্ভুত একটা নীল রঙে ভরা: এরকম নীল রং পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আকাশের চেয়ে অনেক গাঢ় আর সুন্দর এই নীল রং—দেখে মনে হয় যেন আকাশের মতো রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে একটি মেঘমুক্ত উজ্জ্বল দীপ্তি চুঁইয়ে পড়ছে ভিতরে। সরু আর মোটা —নানা ধরনের খিলেন রয়েছে সেখানে, আর তাদের ভিতর দিয়ে নিচে ঝুলছে নানা ধরনের সরু-মোটা ফুঁটোলো বরফের লাঠি কিংবা রেশমের মতো ঝালর। এই পথ তাদের আরো অনেক ভিতরে নিয়ে যেতো কত ভিতরে তা তারা জানে না, কিন্তু আর তারা এগুলো না। সেই গুহার ভেতর আশ্রয় নিলেই যেন তা'দের ভালো হ'তো—বেশ গরম ভিতরে, তাছাড়া তুষারও ঝ'রে পড়ছে না গায়ে। কিন্তু চারদিকে এমন অদ্ভুত নীল আভা দেখে তারা ভয় পেয়ে গেলো, আর ভয় পেয়েই আবার বেরিয়ে এলো। কিছুক্ষণ সেই পরিখার পথেই চলেছিলো, শেষে হাৎড়ে-হাৎড়ে উপরে উঠে এলো। যতটা পারা যায়, চেষ্টা ক'রে-ক'রে বরফের উপর দিয়ে তারা এগিয়ে চললো।

'এবারে সামনের ওই অংশটা পেরুলেই বরফের উপর থেকে আমরা নেমে যাবো,' ফনরাড বললে।

'হাঁ' ছোট্ট ক'রে এই কথা ব'লে সাদা তার ছোটো

হাত দিয়ে আরো শক্ত মুঠো ক'রে কনরাডের হাতটা চেপে ধরলে।

জমা বরফ ছেড়ে ঝরা তুষারের পথ ধ'রে তারা খানিক নিচে নামবার চেষ্টা করলো। ভাবলো এবারে বুঝি উপত্যকায় পৌঁছোবে। কিন্তু খুব বেশি দূর যেতে পারলো না। রাক্ষসের মতো চেহারা আর কেল্লার দেয়ালের মতো উঁচু নতুন আরেক তুষারশিও দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেন পথ আগলে দাঁড়ালো—ডাইনে বাঁয়ে দু-দিকেই। সেই তুষারের শাদা চাদরের ভিতর থরথর ক'রে কেঁপে উঠছে দীপ্ত একটি আলোর আভা রকমারি তার রং—সবুজ আর নীল, এমনকি হলদে আর লালচে। বাঁকাভাবে ঠিকরোচ্ছে তার দীপ্তি।

আগেকার চেয়ে এখন তাদের নজর চলেছে দূরে, কারণ এর মধ্যে সেই ভয়ংকর তুষারপাত ক'মে এসেছে অনেকটা। এখন সাধারণ এক তুষার-পড়া দিন যেন। বিপদের পরিমাণ তখনো তারা আঁচ করতে পারেনি, তাই হাল না-ছেড়ে অতি কষ্টে হাৎড়ে-হাৎড়ে হিমবাহের উপর উঠলো। ইচ্ছে সামনেকার ঢ'লে যাওয়া বর্শাটা পেরিয়ে অন্য পাশে নেমে যাবে। ছোটো-ছোটো খাদগুলো পেরিয়ে, বরফই হোক আর পাথরই হোক —শাদা টুপির মতো উঁচু উঁচু ঢিবি দেখলেই তার উপরে পা রেখে, যেখানে হাটা অসম্ভব সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে, শেষ কালে তারা সেই কেল্লার দেয়ালের মতো বরফের চূড়োয় এসে পৌঁছলো। তারা ভেবেছিলো, অন্যপাশে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে যাবে। কিন্তু অন্য পাশ বলতে কিছু নেই।

যতদূর তাদের নজর চলে কেবল বরফ আর বরফ, বরফ ছাড়া আর-কিছুই না। কোথাও কোণ-তোলা খোঁচা দেয়, কোথাও কানা-ভাঙা, কিম্ভূত, কোথাও-বা ঢিবির মতো উঁচু বরফ—বরফের সেই হিংস্র, শ্বেত, ভয়ংকর মরুভূমির উপর তুষার ক'রে এই কাণ্ড করেছে। নিচে থেকে মনে হয়েছিলো সেটা বুঝি দেয়াল, কিন্তু উপরে এসে তারা দেখলো মোটেই তা নয় আদলে। ওপাশে তুষারের ঢালু পথ নেই, সেখানে উঠেছে বরফের নতুন দেয়াল—তার থাকে-থাকে গর্ত, থাকে-থাকে চিড়-ধরা অসংখ্য নীল রেখার জটিল সব ছ'ক ফুটে উঠেছে। সেই দেয়ালের পিছনে আবার দেয়াল, তার পিছনেও দেয়াল—দেয়ালের পর দেয়াল চ'লে গেছে, সেটায় তুষারের ধূসরতায় দৃষ্টি হারিয়ে যায়।

কনরাড বললে, 'দাদা, এদিক দিয়ে আমরা যেতে পারবো না।'

'না,' সাদা সায় দিলে।

'আমরা বরং ফের উল্টোমুখো চ'লে অন্য কোনোখান দিয়ে নামতে চেষ্টা করি।'

'হ্যাঁ দাদা, তাই বোধ হয় ভালো।'

যেখান দিয়ে বরফের এই দেয়ালে চড়েছিলো আবার তারা সেখানে ফিরতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পেলো না। চারপাশেই বরফ—তাই কোনদিক দিয়ে এসেছিলো সেটাই গুলিয়ে গেলো। এদিকে ঘুরলো, ও-দিকে মোড় নিলে, সে-দিকে বাঁক ফিরলো কিন্তু কিছুতেই সেই বরফের বাঁধা পেরিয়ে আসতে পারলো না—যেন অদৃশ্যভাবে এই বরফের সঙ্গে তারা জড়িয়ে গেছে। নিচের দিকে নামতে চেষ্টা ক'রে তারা দেখলো আবার বরফের উপরেই পৌঁছেছে। যে-দিক দিয়ে তারা এসেছে ব'লে কনরাডের মনে হলো, সেইদিক ধ'রে চলতে-চলতে অবশেষে তারা আরো ভয়ংকর চেহারার মস্ত-মস্ত বরফের চাই-এর উপর পৌঁছোলো—দেখলে মনে হয় বুঝি সেই হিমবাহের একেবারে কিনারে এসে পড়েছে—কিছুই আর বিচিত্র নয় এখন! গুঁড়ি মেরে হাৎড়ে-হাৎড়ে তারা চললো। সেই বরফে-মোড়া জায়গার যারে বিকট চেহারার সব পাথর প'ড়ে আছে—জীবনে এ-রকম অতিকায় জিনিশ তারা ভাবে নি। সেগুলোর উপর তুষারের শাদা চাদর, পাশগুলো যেন ঘ'ষে পালিশ ক'রে দেয়া। কেউ-কেউ বা এ-ওর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, অনেকটা ঝুঁড়েঘরের মতো দেখতে। অনেকে আবার আড়াআড়ি ভাবে একে-অন্যের উপর শুয়ে, যাদের কদাকার খোলের মতো চেহারা। হাতের কাছেই দু-তিনটে

পাথর মাথায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এই পাথরগুলোর উপর ঠিক ছাদের মতো দেখতে আরেকটা পাথর শুয়ে রয়েছে। তার ফলে পাথরের সেই স্তূপটা আপনা থেকেই ছোটো একটা বাড়ি ব'নে গেছে। সেই বাড়ির সামনের দিকটা শুধু খোলা—পিছন আর পাশগুলো ঢাকা। ভিতরটা একেবারে শুকনো—আকাশ থেকে সোজা মাটিতে ঝ'রে পড়লো তুষারের একটি ফুলকিও ভিতরে ঢুকতে পারে নি। ভিতরে এসে ভারি খুশি হ'য়ে উঠলো তারা—যাক কোনো মতে বরফের হাত থেকে তো নিস্তার পাওয়া গেছে। তুষারের বদলে এখন তাদের পায়ের নিচে চেনা মাটি।

এদিকে অন্ধকার হ'য়ে এলো।

কনরাড বললে, 'সান্না', শোন। সন্ধে তো হ'য়ে গেলো—এখন আর নিচে নামার সময় নেই। নামতে চেষ্টা করলে পাহাড় থেকে প'ড়ে যেতে পারি, মস্ত কোনো গর্তের ভিতরে হুমড়ি খেয়ে পড়াও আশ্চর্য নয়। তার চেয়ে বরং এই পাথরগুলোর ভিতরেই আমরা ঢুকি—ভিতরটা বেশ শুকনো আর গরম। এখানেই. আয়, আমরা অপেক্ষা করি। শিগগিরই আবার সূর্য উঠবে, আর তারপর আমরা পথ চিনে নিচে নামতে পারবো। কাঁদিস নে, দোহাই তোর, কাঁদিস নে। দিদিমা আমাদের সঙ্গে যে-সব খাবার দিয়েছে তোকে সবটাই খেতে দেবো।'

সান্না কিন্তু মোটেই কাঁদে নি।

পাথুরে ছাতের এই ঘর তারা শুধু আরাম ক'রে বসতেই পেলো না খুশি মতো ঘুরে বেড়ানোরও বাধা নেই। কনরাডের কাছ ঘেঁষে ইঁদুরের মতো গুটিশুটি মেরে চুপ ক'রে বসে থাকলো সান্না।

কনরাড আবার বললে, 'দেখিস, মা মোটেই রাগ করবেন না। বলবো এই রকম ভয়ানক তুষার পড়ার জন্যেই আমরা ফিরতে পারি নি। শুনে কিছু বলবে না দেখিস। বাবাও বকবে না। শীত করলে কাঠুরেরা যেমন হাত দিয়ে শরীর থাবড়ায় সেই রকম থাবড়াবি—তাহ'লেই আবার গরম লাগবে।'

'হ্যাঁ দাদা, তা-ই করবো,' বললে সান্না।

কনরাড বোধহয় ভেবেছিলো আজ আর বাড়ি ফেরা যাবে না শুনে সান্না হয়তো কেঁদে-কেটে একটা কাণ্ডই বাধাবে। কিন্তু সে-রকম কিছুই সে করলে না। কী দারুণ পরিশ্রম যে গিয়েছে সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাদের নেই। তাই চুপচাপ ব'সে জিরিয়ে নিতে খুব ভালো লাগছিলো তাদের। হাত-পা ছড়িয়ে তারা ব'সে থাকলো।

এ-বারে কিন্তু খিদেটা ভালো ক'রে বোঝা গেলো। প্রায় এক সঙ্গেই দুজনে পকেট থেকে রুটির টুকরো বার ক'রে খেয়ে ফেললো। তাদের দিদিমা যে-কেক আর বাদাম আর নানা সব টুকিটাকি খাবার পকেট ভ'রে দিয়েছিলো, সেগুলোও তারা খেলো।

খাওয়া শেষ ক'রে কনরাড বললে, 'এ-বারে কিন্তু জামাকাপড় থেকে বরফ ঝেড়ে না-ফেললে ভিজে যাবো।'

'হ্যাঁ দাদা,' বললে সান্না।

সেই পাথুরে বাড়ির বাইরে এসে কনরাড তার ছোটো-বোনের জামাকাপড় থেকে তুষার ঝেড়ে দিলে। তার কোটের কোণ ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে উড়িয়ে দিলে তুষার, তার মাথায় নিজের যে-টুপিটা পরিয়েছিলো সেটা খুলে উপরকার তুষারও পরিষ্কার ক'রে দিলো; যেগুলো তবু গেলো না সেগুলো সে রুমাল দিয়ে ঝেড়ে দিলে। তারপর যতটা পারা গেলো নিজের জামাকাপড়ের উপরকার তুষার সাফ ক'রে দিলো।

এতক্ষণে সম্পূর্ণ থেমে গেছে তুষারপাত। তাদের গায়ে আর একটা ফুলকিও ঝ'রে পড়লো না আকাশ থেকে। পাথরের বাড়ির ভিতর এসে তারা চুপচাপ ব'সে থাকলো। একবার উঠে ফিরে এসে বসার পর তারা বুঝতে পারলো কী রকম ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। কনরাড বাছুরের চামড়ার থলিটা খুলে ফেললে; দিদিমা যে-কাপড়টা দিয়ে কাগজের ঠোঙা ক'রে ছোটো বাক্সটা জড়িয়ে দিয়েছিলো সেটা খুলে গরম হবার আশায় নিজের দু-কাঁধে জড়িয়ে নিলে। থলির ভিতর থেকে দুজনকার উপযোগী দুটি ছোটো রুটি বার ক'রে দুটিই দিলে সান্নাকে। সান্না খেতে শুরু করলো।

আর একটা রুটি শেষ ক'রে দ্বিতীয়টারও খানিকটা খেলো সান্তা, তারপর কনরাডকে চুপচাপ ব'সে থাকতে দেখে বাকিটা দিলে ফিরিয়ে। কনরাড বাকি রুটির টুকরোটা খেয়ে ফেললে।

আর তারপর, খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে, তারা শুধু ব'সে ব'সে দেখতে লাগলো।

গোধূলিবেলার ঝাপসা আলোয় সামনের চালু জায়গা যতটা দেখা যায় সবটাই নিরবচ্ছিন্ন তুষারের চকচকে একটি চাদর যেন। অন্ধকারের মধ্যে এখানে-ওখানে তুষারের ছোটো-ছোটো টুকরোগুলো অদ্ভুতভাবে জ্বল-জ্বল ক'রে উঠছে, যেন আকণ্ঠ দিনের আলো পান ক'রে এখন তারা সেই আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে দিগন্তের দিকে।

* * *

পাহাড়ের উপর খুব চট ক'রে রাত হ'য়ে যায়। এখানেও তাই দেখতে-দেখতে রাত হ'য়ে গেলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারদিকে ঘন হ'য়ে উঠলো অন্ধকার। শুধু তুষার-গুলো একরকমের ফ্যাকাশে আলোয় জ্বলজ্বল করতে লাগলো। কেবল যে তুষারবৃষ্টি বন্ধ হয়েছে তা-ই নয়, উপরকার মেঘে-ছাওয়া আকাশটাও ক্রমশ পাৎলা হ'য়ে আসছে। তাদের নজরে পড়লো ছোট্ট ঝকঝকে একটি তারা। এ-দিকে তুষারের ভিতর দিয়ে সত্যিই মনে হয় যেন এক ধরণের আভা বেরোচ্ছে। এখন আর গুহার মতো কিছুই বুলে নেই আকাশ থেকে। তারা সেই গুহার ভিতর ব'সে দেখতে লাগলো। তুষার-মোড়া পাহাড়ের চুড়ো, একের পর এক তারা দাঁড়িয়ে আছে সারি-সারি, —কালো আকাশ পিছনে আছে ব'লে তাদের বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। সারাদিন ধ'রে তারা যতখানে ঘুরেছে তাদের মতে এই গুহার ভিতরটাই সবচেয়ে গরম। ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে ফিরিয়ে নিতে-নিতে অন্ধকারকে ভয় করতে পর্যন্ত তারা ভুলে গেলো। আস্তে-আস্তে ফুটে উঠলো একটি দুটি অনেক তারা : এ-দিকে একটা দেখা যেতে-না-যেতেই ও-দিকে উঠে গেলো আরেকটা, খানিক পরেই মনে হ'লো আকাশে আর এক টুকরো মেঘও নেই।

উপত্যকার বাসিন্দেরা এই সময়ে বাতি জ্বালিয়ে দেয়। প্রথম বাতি জ্বালিয়ে টেবিলের উপরে রাখে তারা, আর বস্‌স ঘর আলোয় ঝলমল ক'রে ওঠে। কোথাও-বা শুধু একটা সরলগাছের মশাল জ্বলে, কোথাও-বা টুকরির মধ্যে জ্বলে আগুন। শোবার ঘরের জানালাগুলো একের পর এক উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে তুষার-ঢাকা রাস্তের মাঝখানে জ্যোতির্ময় এক ঝিকিমিকি ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু আজকের দিনটা বড়োদিনের ঠিক আগের দিন। নিশ্চয়ই আজ আরো অনেক-অনেক আলো জ্বলেছে, আর টেবিলের উপরে কিংবা ক্রিসমাস গাছের ডালে ছোটোদের জন্যে নানা ধরনের পুতুল আর খেলনাগুলো সেই আলোয় ঝকঝক করছে। কত আলোই যে জ্বালানো হয়েছে, তা নিশ্চয়ই আজ গুণে শেষ করা যাবে না—কারণ প্রায় প্রত্যেক বাড়ি কিংবা কুঁড়ে কিংবা ঘরে একটি বা একাধিক ছেলেমেয়ে আছে আর তাদের প্রত্যেকের জন্য সান্তা ক্লস কিছু-না-কিছু উপহার এনেছেন। যীশুর জন্মদিন ব'লেই তো এই উৎসব —তাঁর নির্দেশেই তো আজ এত আলো জ্বলছে। কনরাডের দৃঢ় বিশ্বাস এখান থেকে তাদের গ্রাম বেশি দূর নয়। তবু সেখানকার সেই অসংখ্য আলোর মধ্যে একটিকেও তারা দেখতে পেলো না। আর-কিছুই তাদের নজরে পড়লো না—আশপাশে শুধু ফ্যাকাশে তুষার, আর তারই উপর ঝুঁকে আছে কালো আকাশ, তার মস্ত বাঁকা দিগন্ত নিয়ে, দূরের সব জিনিশ তাদের দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেছে। প্রত্যেক উপত্যকাতেই ছোটোরা এখন না-জানি-কত-কি উপহার পাচ্ছে, শুধু তারা দুজনেই এখন ব'সে আছে বরফের দেশে অনেক উঁচুতে। দিদিমা তাদের যে-সব মজার জিনিশ দিয়েছিলেন, সব এখন সেই গুহার এককোণে প্যাক-করা অবস্থায় বাঘুরের চামড়ার থলিতে প'ড়ে রয়েছে।

এতক্ষণ যে-মেঘ তুষার ঝরিয়েছিলো, সে পাহাড়ের ও-পাশে ডুবে গেলো। তাদের মাথার উপরে ভারি সুন্দর গাঢ় নীল রঙের একটি চাঁদোয়া যেন টাঙানো। এত গাঢ়-নীল যে কালো ব'লে ভুল হয়, কত যে অগুন্তি তারা ভিড় ক'রে আছে সেই চাঁদোয়ায়, তার যেন সীমাসংখ্যা নেই।

সেই তারার ভিড়ের মধ্য দিয়ে কে যেন এঁকে দিয়েছে শাদা একটি ছায়াপথ। দুধের মতো ধবধবে তার রং, আলো প'ড়ে চিকমিক ক'রে উঠেছে। নিচের উপত্যকা থেকে নিশ্চয়ই তারা আগে এই ছায়াপথকে দেখেছিলো, কিন্তু এখনকার মতো এত স্পষ্টভাবে তা তখনো ফুটে ওঠেনি। আস্তে-আস্তে গভীর হ'য়ে উঠলো রাত। সব তারাই যে রাতের সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিমদিকে এগিয়ে যায়, তা তারা জানতো না। জানলে হয়তো তারাদেরকে তাকিয়ে বলতে পারতো রাত কত হ'লো। নতুন সব তারা উঠছে আর পুরোনো তারাগুলো সব ডুবে যাচ্ছে। তারা কিন্তু তাহলে আকাশে বুঝি একই তারায়-কাঁক রয়েছে। আস্তে-আস্তে দীপ্তি ছড়িয়ে দিলো তারারা, আর সেই দীপ্তি ক্রমশ তাদের চারপাশকে অল্প-অল্প ক'রে আলো ক'রে দিলে। তারা কিন্তু সেই আলোয় কোনো উপত্যকা বা কোনো গ্রাম দেখতে পেলো না। চার দিকেই কেবল ধবধবে একটি শুভ্রতা—শাদা ছাড়া আর-কিছুই না। সেই কম্পিত শাদা আলোয় অনেকো মাঝে-মাঝে এখানে একটি ঢেউয়ের মতো কালো পাহাড়, ওখানে একটি কালো পাহাড়ের চূড়ো। আকাশের কোনোখানে চাঁদের দেখা নেই। হয়তো সূর্য যখন ডুবে গেলো, তখন সেও গেছে অস্ত, আর হয়তো এখনো ওঠেনি।

অনেকক্ষণ বাদে কনরাড বললে, 'সাম্বা, কিছুতেই ঘুমোস না কিন্তু, বুঝলি? মনে আছে তো বাবা কী বলেছিলেন? "পাহাড়ে কখনো ঘুমুবি না, ঘুমোলে সেই বুড়ো আশোনৎসাগরের-এর মতো অবস্থা হবে।" সে বেচারা পাহাড়ের উপরে এক পাথরে ব'সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সে-ঘুম আর তার কোনো দিনই ভাঙলো না। আস্ত শরীরটুকু ঠাণ্ডায় জ'মে যাওয়ায় লোকটা ম'রে গিয়েছিলো। মারা যাবার পর চার মাস পর্যন্ত সেই পাথরের উপর সোজাভাবে খাড়া হ'য়ে ছিলো তার দেহটা—তারপর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়।'

সাম্বা যখন কথা বললে, তখন তার প্রত্যেকটি কথায় স্পষ্টভাবে ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠলো, 'না, দাদা, আমি ঘুমুবো না।'

তালো ক'রে জাগিয়ে রাখার জন্য তার কোটের কোণ ধ'রে ঝাঁকুনি দিলে কনরাড, কিন্তু কথাগুলো ব'লেই সাম্বা আবার ঝিমিয়ে পড়লো। আরো খানিক পরে কনরাড তার হাতের উপর মৃদু একটি চাপ অনুভব করলে, ক্রমশ ভারি হ'য়ে উঠলো সেই চাপ, তাকিয়ে দেখলো সাম্বা ঘুমিয়ে তার গায়ের উপর এলিয়ে পড়েছে।

'সাম্বা, ঘুমোস নি, দোহাই তোর, ঘুমোস নি,' বললে কনরাড।

'না,' ঘুমের মধ্যেই ঘোর-লাগা অচানো গলায় সাম্বা উত্তর দিলে, 'আমি তো ঘুমোই নি।'

তাকে জাগাবার জন্যে ঠেলা দিয়ে স'রে বসলো কনরাড, কিন্তু সাম্বা মেঝের উপরেই চ'লে প'ড়ে ঘুমোতে লাগলো। তখন তার দু-কাঁধ ধ'রে জোরে ঝাঁকুনি দিলো কনরাড। সাম্বাকে এইভাবে ঝাঁকাতে গিয়ে কনরাড অনুভব করলে তার নিচের শরীরটাও ঠাণ্ডা আর ভারি হ'য়ে উঠেছে। ধাক্কা খেয়ে সে লাফিয়ে উঠলো, তারপর দোনের হাত দুটি আঁটো ক'রে ধ'রে আরো জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'এই সাম্বা, একবার উঠে দাঁড়া। কিছুক্ষণ না-হয় আমরা দাঁড়িয়েই থাকি, তাহ'লে আর কষ্ট হবে না।'

'আমার তো ঠাণ্ডা লাগছে না, দাদা,' উত্তরে বললো সাম্বা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর শরীরটা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। দাঁড়া, উঠে দাঁড়া এক্ষুনি।'

'বাবের অ্যাকেটটা তো বেশ গরম।'

'আয়, তোকে ধ'রে দাঁড় করিয়ে দি।'

'না,' আপত্তি জানালো সাম্বা, তারপর চুপচাপ হ'য়ে নেতিয়ে গেলো।

তখনি হঠাৎ বিদিমার কথাগুলো মনে প'ড়ে গেলো কনরাডের: 'এত কড়া যে ছোট্ট এক চুমুক খেলেই গোটা ভিতরটা একেবারে গরম হ'য়ে ওঠে। এক চুমুকে শীত-কালের সব চেয়ে ঠাণ্ডা দিনেও শীত করে না।' বাছুরের চামড়ার থলিটা হাতে নিয়ে সে খুলে ফেললো, তারপর মায়ের জন্য পাঠানো কালো কফিতরা ফ্লাস্কটা বাগিয়ে-

হাতড়ে বার করলো। ফ্লাস্কে জড়ানো কাপড়টা সরিয়ে সন্তোষে খুলে ফেললো ছিপিটা, তারপর সান্তার উপর ঝুঁকে প'ড়ে বললে, 'এই কফিটা মিসিসা মায়ের জন্য পাঠিয়েছেন। এক চুমুক চেখে ভাখ, শরীরটা কী-রকম গরম হ'য়ে ওঠে। কী জন্যে ব্যবহার করেছি জানলে মা কখখনো রাগ করবে না।'

সান্তার কিন্তু শরীর আর মন ঘুমে ভেঙে পড়েছে। সে আবার বললে, 'আমার তো শীত করছে না।'

কিন্তু কনরাড ছাড়লে না। বললে, 'বেশ তো, এটা খেয়ে নে, তারপর ঘুমুবি।'

ঘুমুতে পাবে, এই কথা শুনে সান্তা আর দ্বিরুক্তি করলে না। কনরাড তার মুখে কফিটা ঢেলে দিলে, আর কোনো রকমে সেটা গিলে ফেললো সান্তা। তারপর কনরাড নিজেও খেয়ে নিলে খানিকটা।

এই উত্তেজক পানীয়ের ফল প্রায় তৎক্ষণাৎ শুরু হ'য়ে গেলো। এর আগে কখনো কফি খায়নি ব'লে প্রতিক্রিয়াটা তারা আরো বেশি ক'রে অনুভব করলে। ঘুমিয়ে পড়ার বদলে সান্তা আস্তে-আস্তে পুরোপুরি জেগে উঠলো, এমনকি চুলুনিও বন্ধ হ'য়ে গেলো। নিজে থেকেই তখন সে স্বীকার করলে সত্যিই তার শীত করছিলো। এখন কিন্তু চমৎকার একটি উষ্ণতা স্রোতের মতো বইছে তার শরীরের মধ্যে, এর মধ্যেই সেই স্রোত ছড়িয়ে পড়েছে তার হাতে-পায়ে, আবার ফুর্তি ফিরে এলো তাদের মনে, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবও করলে একটুক্ষণ।

যেই টের পাওয়া গেলো যে কফির ক্রিয়া একটু ক'মে এলো, অমনি, তেতো স্বাদ সত্ত্বেও, আবার তারা আরেক কৌটা মুখে ঢেলে দেয়। ক্রমশ তাদের কফি দেহের স্নায়ুগুলোয় যেন আগুন ধ'রে গেলো, আর তার ফলেই ঘুমোবার প্রবল আগ্রহকে কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে তারা।

আস্তে-আস্তে মধ্যরাত নেমে এলো সেই পাহাড়ের উপরে। নেহাৎই ছেলেমানুষ ব'লে এর আগে মাঝরাত পর্যন্ত কোনো দিনই তারা জেগে থাকেনি, বড়োদিনের আগের দিনেও কখনো তারা মাঝরাতের চেহারা ভাখেনি। যদিও উৎসবের আনন্দে তাদের মন ভরা থাকতো, তবু রাত বেশি হবার আগেই ঘুমে ঢ'লে পড়েছে তারা। মধ্যরাতের ঘণ্টাধ্বনির গুনগুনে আওয়াজ কখনোই তাদের কাছে পৌঁছোয়নি। অত কাছে থেকেও এই উৎসবে কখনোই গির্জের ছোকরা সমবেত অর্গ্যানের গান শোনেনি তারা। আর এ-সময় নিশ্চয়ই সবগুলো ঘণ্টা ঢং-ঢং ক'রে বেজে উঠেছে: বাজছে মিলসডোর্ফ-এর ঘণ্টা, বাজছে গ্লাইড-এর ঘণ্টা। পাহাড়ের ও পাশে ছোট্ট একটি গির্জে আছে, সুন্দর তিনটি ঘণ্টা ঝোলে তার মাথায়। স্বচ্ছ, পরিষ্কার তার শব্দ—সেগুলোও নিশ্চয়ই সুরে তারে এখন বেজে উঠেছে। পাহাড়ের নানা জায়গায় মাঠের এ-দিকে ও-দিকেও অনেক গির্জে আছে। সব মিলিয়ে ঘণ্টাগুলো হয়তো গুণেই শেষ করা যাবে না—আজ ঠিক এই সময়টিতে, বড়োদিনের সংকেত ক'রে, নিশ্চয়ই সবগুলি ঘণ্টা বেজে চলেছে: ঢেউয়ের মতো কেঁপে-কেঁপে যাচ্ছে ঘণ্টার শব্দ, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামের উপর দিয়ে। মাঝে-মাঝে গাছপালার মধ্য দিয়েও এ-গ্রামের শব্দ ও-গ্রামে শোনা যায়। কিন্তু তাদের কানে আজ কোনো শব্দই এসে পৌঁছোলো না। পেলো না তারা কোনো রকম মৃদু, গম্ভীর, ভারি শব্দের একটানা অনুসরণ—এত উঁচুতে কোনো শব্দই এসে পৌঁছোতে পারে না। ঘুরে-ঘুরে চালুভাবে পথ নেমে গেছে উপত্যকায়; সেখানে, অন্ধকারের ভিতর নিশ্চয়ই এখন ন'ড়ে বেড়াচ্ছে ছোটো-ছোটো লণ্ঠনের আলো, আর তারই সঙ্গে মিল রেখে নিশ্চয়ই প্রত্যেক বাড়ির মাথায় ছোটো ছোটো ঘণ্টাগুলো বেজে চলেছে। এক গোলাবাড়ি থেকে আরেক গোলাবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছে সেই শব্দ। সকলের কাছেই এই শব্দ মনে পড়িয়ে দিচ্ছে আজকের মঙ্গল উৎসবের কথা। কিন্তু এই সব দৃশ্যের কিংবা শব্দের ছিটেফোঁটাও তাদের কাছে পৌঁছালো না। শুধু এখানে আকাশের গায়ে ঝলমল ক'রে জ্বলছে একলা কতগুলো তারা—তাছাড়া আর-কিছুই নেই কোনোখানে।

ঠাণ্ডায় জ'মে ম'রে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিলো আপেনৎসাগরের—কনরাড ক্রমাগত তার কথা ভাবতে লাগলো, আর ফ্লাস্ক থেকে কালো কফি গলায় ঢেলে নিজেকে আর

ছোটো বোনটিকে গরম রাখতে চেষ্টা করলো। কড়া কফির কালো চামুক খেয়ে ঠাণ্ডা ক'মে যায়, ঘুম পালিয়ে যায়, কিন্তু একটু পরেই যখন তার ক্রিয়া ক'মে আসতে থাকে, তখন সারি বাঁধা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো আরো ভীষণ-ভাবে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠাণ্ডা আর ঘুম আর শরীর যেন আরো বেশি ক'রে ঝিমিয়ে আসে। এ-ভাবে তারা কিছুতেই ঘুমের হাত থেকে নিস্তার পাবে না। শরীরের সব জোড়াগুলো যেন ঢিলে হ'য়ে আলগা হ'য়ে যায়, ভারি হ'য়ে যায় হাত-পা, আর কেবলি মনে হয়, আহা, ঘুমিয়ে পড়ার মতো আরাম কি আর আছে? এই ঘুম যেন মধুর এক গন্ধের মতো ঝিমঝিমে হ'য়ে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে চায়—সব যুক্তিতর্কই শেষ পর্যন্ত হার মেনে যায় তার কাছে। হয়তো তারা ঘুমিয়েই পড়তো। কিন্তু প্রকৃতির এই খোলামেলা বিশাল রূপেরও একটা মোহন নেশা আছে। শুধু আশ্চর্য, তাই নয়, কী বিরাট! তারই অন্তর্লীন শক্তির প্রভাবে তারা জেগে জেগে দেখতে লাগলো। প্রকৃতির সেই অদ্ভুত বিরাট শক্তির সামনে কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করা যায় না, কাজেই শেষ পর্যন্ত ঘুমকে হার মানতেই হ'লো। ভীষণ একটি থমথমে স্তব্ধতা চার দিকে—সেই স্তব্ধতার কাছে বরফের একটি দানাও যেন নড়তে ভয় পায়। তবু তিন তিনবার তারা সেই বজ্রের মতো গম্ভীর শব্দ শুনলো, বরফ কেটে গেলে যে-গভীর আওয়াজ হয়। হিমবাহের উপরটা দেখতে একেবারে জমাট-বাঁধা, এত শুদ্ধ যে মনে হয় যেন শুন হ'য়ে প'ড়ে আছে। ভিতরে-ভিতরে কিন্তু সর্বদাই চলেছে মন্থন, আলোড়ন আর স্রোত—চোখের আড়ালে সেখানে ঘটছে অনেক রকম অদ্ভুত কাণ্ড। ওই ভয়ঙ্কর শব্দগুলো ভেসে এসেছে এইসব হিমবাহ থেকেই, প্রচণ্ড থেকে চীৎকার ক'রে উঠেছে চেউ, স্রোত আর ক্ষুধা। পিছন থেকে তারা তিনবার সেই বজ্রনির্ঘোষ শুনলো শুনতে, যেন আস্ত পৃথিবীটাই দীর্ণ-বিদীর্ণ-চূর্ণ হ'য়ে ফেটে গুঁড়িয়ে গেলো। অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সেই শব্দ, বরফের দেশের চার-দিকেই সেই শব্দ ছুটে বেড়ায়, যেন বরফের প্রত্যেকটি দানা-উপলিরা মেয়ে সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। তারার দিকে চেয়ে তারা শুধু জেগে ব'সে রইলো।

আর এইভাবে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার তারা লক্ষ করলে: সামনেকার তারার ভিড়ে ধীরে-ধীরে ফুলের মতো আলোর একটি অস্পষ্ট রেখা যেন উঠলো জেগে, আধছা এক বাঁকা ধনুঃশরের মতো তার চেহারা। আর সেই আলোর ভিতর দিয়ে সবুজ রঙের একটি মৃদু কম্পন ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো। দেখতে দেখতে সেই ধনুকের মতো বাঁকা আলো স্পষ্ট হ'লো, হ'লো আরো, আরও উজ্জ্বল! ক্রমে সব তারারাই গেলো ফ্যাকাশে হ'য়ে, আর তারপরেই আকাশ জুড়ে ঠিকরে পড়লো সেই আলোর আভা, আর ছড়িয়ে ছাপিয়ে উপচে ব'য়ে গেলো সেই কেঁপে-ওঠা সবুজ রং। যেন প্রাণেরই কোনো এক তীব্র স্পন্দন, এইভাবে কেঁপে-কেঁপে চললো তার স্রোত আকাশের সর্বাঙ্গে, তারা থেকে তারায়। পাৎলা একটি পর্দার মতো সেই স্রোত যেন ঝাপসা এক রহস্যে ঢেকে দিলে শাদা বরফ আর কাচের পাহাড়, আর কালো পাথর। আর, তারপরে, সেই আলোর ইন্দ্রধনুকে ঘিরে জ্বলে উঠলো আরো নানা আলো, যেন মুকুটের চারদিকে হিরে-জহরৎগুলো ঝলমল ক'রে উঠেছে। আর সেই উজ্জ্বলতায় ছেয়ে গেলো আকাশের সর্বাঙ্গ। যেন সেই অকূল আলোর প্রতিটি কণা আলতো ক'রে ছুঁয়ে আছে বুরকে। শেষে ছোটো একটি স্ফুলিঙ্গ, আর ক্ষীণ একটি কম্পন ব'য়ে গেলো সমস্ত আকাশ-বাতাসকে সিউরে দিয়ে। হয়তো সেই অভাবনীয় তুষার-ঝড়ের ভিতরকার বিদ্যুৎকে প্রকৃতি আর ধ'রে রাখতে পারছিলো না ব'লেই অপরূপ এই আলোর স্রোত হ'য়ে নিঃশব্দে সেটা ব'য়ে গেলো—নয়তো নিশ্চয়ই এর ভিতরে রয়েছে প্রকৃতির কোনো অজানা রহস্য। তারপর ধীরে-ধীরে আবার অস্পষ্ট হ'য়ে এলো সেই আলো। প্রথমে মিলিয়ে গেলো ধনুকের চারপাশের আলোগুলো, তার পরে সেই আশ্চর্য আলোর ইন্দ্রধনু কখন যে মিলিয়ে গেলো, তা ভালো ক'রে বোঝাই গেলো না। শুধু আকাশ জুড়ে আবার স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো হাজার-হাজার তারা।

ভাই-বোন কেউ কাউকে কোনো কথা বললো না। শুধু ব'সে-ব'সে বড়ো-বড়ো চোখ মেলে হতবাক তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে।

বিশেষ কিছুই আর ঘটলো না। শুধু অনন্তলে সেই তারাগুলো যেন কেঁপে উঠলো মাঝে-মাঝে, আর কখনো শুধু চোখে পড়লো দু-একটি উল্কা বিদ্যুতের মতো ছুটে চলেছে উপর থেকে নিচে।

অনন্তে লাগলো শুধু কেবল তারাগুলোই—চাঁদের কোনো ক্ষীণ টুকরোরও আর দেখা মিললো না। অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে, নতুন একটি ঘটনা ঘটলো। গোটা আকাশটাই আস্তে, সন্তর্পণে উজ্জ্বল হ'য়ে এলো—আর সেই আলোয় উন্মোচিত হ'য়ে গেলো আকাশের ঘন নীল রং, যেন হঠাৎ কেউ আস্তে, আলতোভাবে কোনো পর্দা তুলে দিলে। যে-তারাগুলো খুব কাপশাভাবে মিটমিট ক'রে জ্বলছিলো, সেগুলো অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। আগে মনে হচ্ছিলো কেউ যেন তারাগুলোকে ছিটিয়ে দিয়ে কোনো শুন্য মহে আকাশের গায়ে আটকে রেখেছে, কিন্তু এখন অনেক তারাই ক্রমে-ক্রমে মিলিয়ে গেলো ব'লে তা আর মনে হ'লো না। আরো কিছু পরে অন্য তারারাও মিলিয়ে গেলো—এমনকি সবচেয়ে অনন্তলে তারারা সুদ্ধ। এতক্ষণে ভালো ক'রে দেখা গেলো সামনের পাহাড়ের তুষারগুলো। সেটার আকাশের একটি অংশ যেন সোনালি রঙে ম'লে উঠলো, আর সেখানকার একখানি মেঘে আগুনের শিখার ঘপঘপে রং লাগিয়ে দিলো। ভাই-বোনে তাকিয়ে দেখলে আকাশ আর তুষারের মধ্যে ঝোলানো পাৎলা নীল অন্ধকার একটু-একটু দুলছে, আর ভোরের শুকতারা যেন ক্রমে নিভে আসছে। তারপরেই সেই কাপশা নীলের উপর হলদে আলো লেগে আকাশ জুড়ে জেগে উঠলো একটি সবুজ আভা, আর তারপরেই চট ক'রে আকাশের এক কোণে আরেক পোঁছ সোনালি পড়লো। দূরের কাপশা পাহাড় কুয়াশার পর্দা তুলে যেন কাছে এসে দাঁড়ালো। দূরের কাছের সব জিনিশ ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে, অন্ধকার থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে আসছে আলো আর ছায়ার টুকরো দিয়ে গড়া যত এক কাচের পাহাড়। সব কিছুই এখন স্পষ্ট দেখা যায় : দূরের তুষার-মোড়া চূড়োগুলো যেন পিছনের নীল আকাশ নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এলো।

'সান্যা, ভোর হ'য়ে আসছে।'

'হ্যাঁ, দাদা।'

'আরো একটু আলো হোক, তারপর আমরা এখান থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে নিচে নামবো।'

আরো করুণা হ'লো। আকাশের কোথাও এখন আর তারার কোনো চিহ্ন নেই। এতক্ষণ তারা যে মস্ত একটা সিঁড়ি বানিয়ে দিগন্তের কাছে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছিলো, সেই সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে নেমে এসেছে ভোর রাতের হাল্কা আলো। আর এখন ভোরবেলাকার সেই নরম আলোয় সব জিনিশই যেন স্নান ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সদ্যোত্থিত, স্নাত, নূতন।

'হ্যাঁ, এইবার আমরা বেরুবো।'

'হ্যাঁ দাদা, এবার চলো।'

দাঁড়িয়ে উঠে আড়মোড়া ভেঙে হাত-পা নেড়ে দেখতে গিয়ে তারা টের পেলো অবসাদের কথা। একটুও ঘুম হয়নি সারা রাত। সকালবেলাকার আলো-হাওয়া তাদের খানিকটা জোর দিলে। আশ্চর্য এক ভাহু জানে ভোর-বেলা। বাছুরের চামড়ার থলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে, সান্যার কারের জ্যাকেটটার বোতাম এঁটে দিয়ে কনরাড পথ মেখিয়ে চললো গুহার বাইরে।

ভেবে রেখেছিলো, দৌড়ে নিচে নামতেই শুধু যতটুকু সময়—তারপরেই তো তাদের গ্রাম, গ্রশাইড। তাই খাবার কথা একবারও ভাবেনি, এমনকি থলিটাও পরীক্ষা ক'রে দেখেনি সেখানে কোনো খাদ্য আছে কিনা।

গোটা আকাশ আলোয় আলো হ'য়ে গেছে। কনরাড চেষ্টা করলে পাহাড়ের চূড়ো থেকে নিচের উপত্যকাগুলো দেখতে : গশাইডকে চিনে বার করা মোটেই শক্ত হবে না, তারপর তো শুধু নেমে যাওয়া।

কিন্তু কোনো উপত্যকার চেহারাই তার নজরে পড়লো না। তার মনেই হ'লো না যে সে পাহাড়ের উপর থেকে নিচের দিকে দেখছে। এ যেন এক অদ্ভুত অচেনা দেশ—

এখানকার কোনো জিনিশের সঙ্গেই পরিচয় নেই। আজকে আবার আরো দূরের ভীষণমতো সব পাথরের স্তূপ চোখে পড়লো, কাল রাতে সেগুলো নজরে পড়েনি। তুষারের উপর খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো। শুধু চোখে পড়লো বরফ, আর পাহাড়, আর পাথরমোড়া ঢালু জমি—এগুলোর পিছনে হয় নীল আকাশ, নয়তো তুষারের দিগন্তের সঙ্গে মিশোনো অনেক দূরের পাহাড়ের তীক্ষ্ণ, নীল চূড়ো!

এমন সময় উঠে এলো সূর্য, আলোর সেই মস্ত ফুলিঙ্গ।

টকটকে লাল গোল অগ্নিকায় একটি দীপ্ত থালা যেন তুষারের সীমারেখা তীব্রভাবে ভেদ ক'রে আকাশে উঠে এলো, আর সেই মুহূর্তে কে যেন তাদের চারপাশের তুষার এক জলজ্বলে লাল রঙে ছুপিয়ে দিলে। যেন হঠাৎ অনেক কোটি গোলাপ ফুল ফুটে উঠলো সেই বরফের প্রান্তরে, আর পাহাড়ের চাঙা চূড়োগুলো তুষারের উপর সবুজ রঙের দীর্ঘ ছায়া ফেলে দিলে।

'সান্তা, যতক্ষণ-না পাহাড়টার একেবারে ধারে এসে পৌঁছোই ততক্ষণ সোজা পথ ধ'রে আমরা যাবো। তারপর নিচের দিকে দেখা যাবে।'

আবার তারা রওনা হ'লো তুষারের ভিতর। সারা রাত ধ'রে তুষারগুলো আরো শুকিয়েছে, ফলে আরো সহজে পা ব'সে যায়। তুষারের বাধা না-মেনে তারা জোরে-জোরে চললো। যত হাঁটে, ততই তাদের হাতে-পায়ে যেন জোর বাড়ে, দেহও হাল্কা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কিছুতেই তারা আর পাহাড়ের কিনারে পৌঁছোলো না, ফলে নিচের দিকে দেখা গেলো না। একটি তুষারে ঢাকা জমি শেষ হ'তেই হয়তো নতুন আরেকটির শুরু হয়, আর মনে হয় প্রত্যেকটিরই শেষ প্রান্তে যেন আকাশ বাঁকা হ'য়ে নামিয়ে পড়েছে নিচে।

শুধু তারা না-থেমেই এগিয়ে চললো।

আর অল্প পরেই আবার তারা এসে পৌঁছোলো সেই বরফের দেশে। কী ক'রে যে এতদূর পর্যন্ত বরফ আসতে পারে, তা তারা কিছুতেই ভেবে পেলো না। তবু পায়ের নিচে তারা স্পষ্ট অনুভব করলে মসৃণ শক্ত জমি। রাত যেখানে কাটিয়েছে, সেখানকার মতো বিরাট চেহারার বরফ এখানে নেই বটে তবু তারা যে বরফের উপর দিয়েই চলেছে সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে বরফের ছোটো-ছোটো টুকরো, ক্রমশ সেই টুকরোগুলো সংখ্যায় বাড়তে লাগলো। শেষকালে এতটাই বেড়ে গেলো যে আবার তাদের শুরু করতে হ'লো হাৎড়ে-হাৎড়ে চলা। তবু দিক ঠিক রেখে চলতে তাদের আর অসুবিধে হ'লো না।

নতুন-নতুন বরফের স্তূপের উপর আবার তাদের উঠতে হ'লো হাৎড়ে-হাৎড়ে, কোনো রকমে।

আবার, আবার তারা বরফের দেশেই এসে পৌঁছোলো। বড়ো দিনের স্বচ্ছ রৌদ্রে তারা প্রথম দেখলো বরফের বিরাট খেত! কী বিরাট সেই প্রান্তর, যেন তার কোনো দিগন্ত নেই! শুধু অল্প পাশে রয়েছে আরো অনেক কালো-কালো পাথর: যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ ক্রমশ উঁচু হ'য়ে উঠেছে আর তুষারে ঢাকা শক্ত বরফগুলো ঘেঁষাঘেঁষি ঠাশাঠাশি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেন ভিড় ক'রে বগল বেঁধে এগিয়ে আসছে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। সেই শুভ্রতার ভিতর চোখে পড়ে অসংখ্য জটিল রকম আঁকাবাঁকা নীল রেখা। যেখানে বরফের চাইগুলো জমাট বেঁধে প'ড়ে রয়েছে সেখানে আরও নানা রেখা বেরিয়ে পথের মতো চ'লে গেছে। এই রেখাগুলো কিন্তু শাদা। এই পথ ধ'রে তারা চললো। না-চ'লেই বা উপায় কী? খানিকটা বরফ পেরিয়ে না-গেলে পাহাড়ের কিনারে পৌঁছনো যাবে না, ফলে নিচের দিকে তাকানোও যাবে না, আর তাদের গ্রাম যে কোন দিকে তাও বুঝতে পারা যাবে না। কেউ কোনো কথা বললে না, শুধু এগিয়েই চললো, প্রথমে কনরাড আর তার পিছন-পিছন সান্তা। পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে গোটা জায়গাটাই যেন চওড়া হ'য়ে ওঠে। কিছুতেই যেন সেই বরফের হাত থেকে নিস্তার নেই। হিংস্র সেই বরফ যেন আমিষের লোভে একেবারে উগ্র হ'য়ে আছে: ঠাণ্ডা শাদা কুণ্ডার মতো দিগন্ত পর্যন্ত

আবারিত হ'য়ে সে প'ড়ে আছে। তারা যেখানেই যাক, এই মস্ত শ্বেত জঠর ছাড়িয়ে যাবে কোথায়? যেখানে যাবে ব'লে ঠিক করেছিলো, সেখানে পৌঁছোবার আশা ত্যাগ ক'রে আবার তারা ফিরলো। উঠতে না পারলে তারা মুঠো ক'রে তুষারপিণ্ডগুলোকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। ফলে সেগুলো গুঁড়িয়ে গিয়ে ভিতরকার গাঢ় নীল রংয়ের বরফের গর্তগুলোকে যেন তুলে ধরে—আর ছানি-পড়া ঘোলাটে অসংখ্য চোখের মতো অপলকে সেগুলো তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। তবু কোথাও না-থেমে তারা ফিরে চললো। এক সময় আবার তারা বরফের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে খোলা জায়গায় পৌঁছোলো।

'সান্ত্রা, বরফের মধ্যে আর যাবো না। ও-দিকে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের উপত্যকাটা কোথায়, তা যখন বুঝতে পারছি না, তখন সোজা পাহাড় থেকে নেমে যাওয়াটাই ভালো। তা'হলে এক সময়ে কোনো-না-কোনো উপত্যকায় পৌঁছোবোই। সেখানকার লোকদের বলবো গ্‌শাইড থেকে আসছি। তা'হলে নিশ্চয়ই সঙ্গে কাউকে দিয়ে আমাদের গ্রামে তারা পৌঁছে দেবে।'

সামনের পথ ধরে তুষারের উপর দিয়ে তারা নিচে নেমে চললো। এবার কনরাড সান্ত্রার হাতটা শক্ত ক'রে ধ'রে থাকলো। কিছুটা যাবার পরেই শেষ হ'লো ঢালু পথ—সামনে আবার তুষারে-ঢাকা খাড়াই শুরু হয়েছে। কাজেই সেই দিকটা ছেড়ে দিয়ে সরু একটি পরিখাপথ ধরে আবার তারা নামতে শুরু করলে। কিন্তু কিছু পরেই আবার ফিরে আসতে হ'লো জমা বরফে। তখন সেই পরিখার একপাশের দেয়াল টপকে তারা নিচে নামবার অন্য পথ খুঁজতে লাগলো। এই চড়াই পথে এত বেশি সোজা উঠতে হয় যে তাদের ভয় হ'লো এবারে বুঝি পিছলে পড়ে। তুষারের ভিতর আরো খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরেও কোনো লাভ হ'লো না। সবখানেই সেই এক ব্যাপার: হয় তুষার হঠাৎ ভেঙে যায় আর তারা হুড়মুড় খেয়ে পড়তে পড়তে কোনো রকমে বাঁচে, নয়তো উপরে উঠতে-উঠতে মনে হয় সে-পথ একেবারে সবচেয়ে উপরের চূড়োয় গিয়ে ফেলবে। বারে-বারে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'তে লাগলো।

এর পরে তারা ভাবলে সেই লাল স্মৃতিস্তম্ভের কাছে ফিরে যাবার কথা। এখন তো তুষারপাত বন্ধ হ'য়ে গেছে আর আকাশও বেশ পরিষ্কার, কাজেই সেখান পৌঁছোনো নিশ্চয়ই কঠিন হবে না। তারপর সেখান থেকে অনায়াসে তারা গ্‌শাইড-এ যেতে পারবে। এই কথাই মেয়েটিকে বললো কনরাড। কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে সান্ত্রা তাকে অনুসরণ করলে। কিন্তু পথটা আর-কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেলো না।

পরিষ্কার রোদ উঠেছে। তুষারের পাহাড় আর তুষারের খেতে এতটুকু দাগ নেই। গতকাল কোন পথে এসেছিলো তারা কিছু কিছুতেই তা চিনে বার করতে পারলো না। তখন তো আশপাশের সবই ঢেকে ফেলেছিলো তুষারের পর্দা, সামনেকার দু-এক পা জমি ছাড়া আর-কিছুই তারা দেখতে পায়নি। চারপাশের সব কিছুকেই মনে হয়েছিলো সাদা আর ধূসর ব'লে। যে সব পাথরের মাঝখান দিয়ে আসতে হয়েছে, সেই সবের চেহারা ঠিক গতকালকের দেখা পাথরগুলোর মতো। আজ আবার নতুন ক'রে তাদের ছোটো-ছোটো পায়ের ছাপ পড়তে লাগলো তুষারের উপর, তাদের গতকালকের পায়ের ছাপ নতুন তুষারের তলায় মিলিয়ে গেছে! শুধু তুষার আর তুষার। তবু তারা এগিয়ে চললো আর ভাবতে লাগলো এইবারে বুঝি পৌঁছোবে। আর তারা কোনো চড়াই বেয়ে উঠতে চেষ্টা করলে না।

গত কালকের মতো আজও তারা মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে চেষ্টা করলো কোনো শব্দ শুনতে পায় কি না। কিন্তু কালকের মতো আজও তারা কোনো শব্দ শুনতে পেলো না—কীণতম আওয়াজ পর্যন্ত নেই—শুধু সব, নিস্তব্ধ। আর তুষার ছাড়া অন্য কিছুই চোখে পড়ে না: শুধু সাদা উজ্জ্বল বরফকে তুষার—মাঝে-মাঝে শুধু এখানে-ওখানে বাঁকা পাঁজরার মতো বেরিয়ে আছে কালো-কালো পাথর বা পাহাড়ের চোখা ত্যাড়া বাঁকা চুড়ো।

অনেক, অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ কনরাডের ম'নে হ'লো অনেক দূরের চাদু ভূষার ঢাকা জমিতে যেন আগুনের আরক্তিম শিখা নেচে বেড়াচ্ছে। মাঝে-মাঝে শিখা সেই কেঁপে-কেঁপে উপরে উঠছে, কখনো বা যাচ্ছে মিলিয়ে। কখনো চোখে পড়ে, কখনো পড়ে না। স্থির হ'য়ে তারা দাঁড়িয়ে রইলো, কিছুতেই আর চোখ ফেরাতে পারলো না সে-দিক থেকে। আর সেই আগুন শুধুই নেচে-নেচে চলতে থাকলো। তাদের মনে হ'লো আগুনটা যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। আস্তে-আস্তে বড়ো হ'য়ে উঠলো আগুনের চেহারাটা, তার নাচ চোখে পড়লো অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে। আর সেটা আগের মতো বার-বার নজরের বাইরে চ'লে যায় না, যদি বা যায় একটু পরেই আবার চোখে পড়ে। আরো খানিক পরে সেখানকার শান্ত নীল বাতাসের ভিতর যেন অত্যন্ত অস্পষ্ট একটি শব্দ ভেসে এলো। অতি ক্ষীণ সেই শব্দ, যেন দূরে কোথাও একটানা কোনো রাখালের শিঙা বেজে চলেছে। আর তাই শুনে তারা দুজনেই চীৎকার ক'রে ডাক দিলে। একটু পরে আবার তারা শুনতে পেলো সেই শব্দ, আবার তারা ডাক দিলে চেঁচিয়ে, কিন্তু সেখান থেকে এক পাও নড়লে না। আগুনের শিখা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তৃতীয়বার শোনা গেলো সেই শব্দ: এ-বারে আরো স্পষ্টভাবে। আবার তারা প্রাণপণ জোরে চেঁচিয়ে উত্তর দিলো। আরো খানিকক্ষণ পরে তারা ভালো ক'রে দেখতে পেলে আগুনটা—আসলে সেটা আগুনই নয়, লাল একটি নিশেন, ক্রুদ্ধগত তাকে নাড়ানো হচ্ছে। আর সেই মুহূর্তেই আবার শোনা গেলো রাখালের শিঙার শব্দ, এবার অনেক কাছে থেকে। আবার তারা উত্তর দিলে।

আর তারপরেই কনরাড চেঁচিয়ে উঠলো, 'সারা! সারা! গ্‌শাইড থেকে সবাই আমাদের খুঁজতে আসছে। নিশেনটা আমি চিনি। সেই ভিনদেশি লোকের কাছে পাওয়া এই নিশেন। সে আর আশেনৎ-সারগের-এর ছোটো ভাই দুজনে মিলে গার্স-এর চুড়োয় উঠে এই লাল নিশেনটা পুঁতেছিলো যাতে নিচে থেকে পাদ্রিমশাই টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে বুঝতে পারে তারা চুড়োয় পৌঁছেছে। সেই ভিনদেশি লোকটিই পাদ্রিমশাইকে এই নিশেন দিয়ে গেছে। তুই তখন নেহাৎই বাচ্চা!'

'হ্যাঁ, দাদা।'

আরো কিছু পরে নিশেনটির সঙ্গেই তারা দেখতে পেলে মানুষের সেই ছোটো দলটিকে। দূর থেকে তাদের মনে হচ্ছিলো যেন কালো-কালো ফুটকি ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে। থেকে-থেকে বেজে উঠতে লাগলো সেই শিঙা, আর ক্রমশই আগিয়ে আসতে লাগলো সেই শব্দ। উত্তর দিতে তারাও ভুলল না। শেষকালে সেই বরফের দেশে তারা দেখলে কতগুলি মানুষ, তাদের মাঝখানে লাল নিশেনটি, হাতে পাহাড়ে ওঠার লাঠি। আরো কাছে এলে তারা লোকগুলিকে চিনতে পারলে। শিঙাটা বাজাচ্ছে ফিলিপ, সে হ'লো গিয়ে গ্রামেরই একজন মেষপালক, সঙ্গে রয়েছে তার দুই ছেলে, আশেনৎসারগের-এর ছোটো ভাই আর গ্‌শাইড-এর আরো কয়েকজন লোক।

'ঈশ্বরের জয় হোক!' চেঁচিয়ে উঠলো ফিলিপ। 'ওই তো ওরা। গোটা পাহাড়টা মানুষে ছেয়ে গেছে। তোমাদের মধ্যে কেউ একজন শিগ্‌গির আল্প-এ ছুটে গিয়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দাও। ঘণ্টার শব্দ শুনলেই অন্য সবাই বুঝতে পারবে যে ছেলেমেয়েদের আমরা খুঁজে পেয়েছি। আর আরেকজন গিয়ে ক্রাবষ্টোনে এই নিশেনটা পুঁতে দাও—তা'হলে আমাদের গ্রামের লোকেরা জানবে এদের পাওয়া গেছে। জানতে পারলেই তারা ভোজ কাটাবে, আর সেই চুল্লিটায় গনগনে আগুন জ্বালিয়ে রেখে—এখনো যারা পাহাড়ে খোঁজাখুঁজি করছে, তারা ধোঁয়া দেখলেই ফিরে আসবে। নাঃ, রীতিমতো এক বড়োদিনই বটে আজ—যা সব কাণ্ড বাগা আর চুন্নি আজ শুরু হবে।"

'আমি আল্প-এ চললুম,' বললে একজন।

'আমি চললুম নিশেনটাকে ক্র্যাবস্টোন-এ পুঁততে,' বললে আরেকজন।

'আর আমরা সিডার-আল্প পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাবো,' বললে ফিলিপ।

ফিলিপের এক ছেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো, আরেকজন তুষারের ভিতর দিয়ে সেই আরক্তিম নিশেনটি নিয়ে গেলো ক্র্যাবস্টোন-এ। আশেনৎসায়গের সান্ত্রার হাত ধরলে, আর ফিলিপ ধরলে কনরাডের হাত।

পথটা ঘুরে-ঘুরে নেমেছে। এই চলতে হচ্ছে একদিকে এই আবার চলতে হচ্ছে ঠিক উল্টো দিকে। কখনো নিচে নামছে, কখনো চড়ছে উপরে। গোটা পথ তুষারে ভরা—কেবলি শুভ্রতা যেদিকে চোখ পড়ে সবই একরকম দেখতে, সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। যে-সব জায়গা সোজা উৎরাইয়ের দিকে নেমে গেছে, সে-সব জায়গায় পাহাড়ে চড়ার লোহার জুতো প'রে ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে তারা পার হ'লো। অনেক পরে তারা শুনতে পেলো ছোট্ট একটি ঘণ্টার শব্দ, নিচে বাজছে। সেই কাঁপনা ক্ষীণ মৃদু শব্দই প্রথম জানিয়ে দিলো যে এতক্ষণে তারা নিচেকার পৃথিবীর একিয়ারে পৌঁছেছে। অনেকটা নিচুতে যে তারা নেমে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই—কারণ তারা দেখতে পেলো তুষারে ঢাকা একটি চূড়ো তাদের মাথার অনেক উঁচুতে নীল শূন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তাদের মন প'ড়ে থাকলো সিডার-আল্প-এর সেই ছোট্ট ঘণ্টাটির দিকে। সেখানেই সকলের জমা হবার কথা। যেতে-যেতে শুরু হাওয়ায় কামানের শব্দও ভেসে এলো—গ্রামের লোকেরা কামান দাগছে। একটু পরেই তাদের চোখে পড়লো কুণ্ডলী পাকিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধোঁয়ার রাশি উঠে আসছে আকাশে।

ছোটো একটি উৎরাই পেরিয়েই তাদের চোখে পড়লো সিডার-আল্প। সে-দিকেই চললো তারা। সেখানকার কুঁড়ে ঘরে আগুন জ্বলছে, তাদের মা রয়েছে সেখানে। আশেনৎসায়গের-এর ছোটোভাইয়ের সঙ্গে সান্ত্রা আর কনরাডকে নামতে দেখে পাগলের মতো চীৎকার ক'রে তুষারের উপর ব'সে পড়লো তাদের মা। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এলো—ভালো ক'রে পরীক্ষা করলো তাদের সর্বাঙ্গ। কী করবে, তা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিলো না—খাবার দেবে, না আগুনে সেঁকে গরম করবে, না কি তক্ষুনি শুইয়ে দেবে খড়ের বিছানায় —সব গণ্ডগোল পাকিয়ে দিলো যেন; ভেবেই পেলো না কোনটা আগে করবে,—তাই সব কিছুই এক সঙ্গে করতে পারলে যদি ভালো হয়। ছেলেমেয়েদের কোনো ক্ষতি হয়নি দেখে তার আর আনন্দের সীমা থাকলো না। তাদের তখন দরকার কিছু গরম খাদ্য আর বিশ্রাম: তক্ষুনি আনা হ'লো খাবার, তারপর তারা খড়ের বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো। দলের অন্যদেরও বিশ্রামের কম প্রয়োজন ছিলো না। শুধু যে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা তাদের জীর্ণ ক'রে ফেলেছিলো, তা-ই নয়—যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তাদের এই তুষার-ঢাকা পাহাড়ে।

কুঁড়ে ঘরের উপরকার ছোটো ঘণ্টাটি না-থেমে একটানা কেবল বেজেই চললো। খানিকক্ষণ তারা বিশ্রাম ক'রে নিলো খড়ের বিছানায়; তারপর নতুন আরেকদল লোকের সাড়া পেয়ে অন্যদের সঙ্গে তারাও বাইরে ছুটে এলো বরফের গড়ানো পথ বেয়ে কারা উঠে আসছে দেখতে।

আসছিলো আর কেউ নয়, সেই জুতো-নির্মেতা, এক সময়ে যার নেশা ছিলো পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো। এবারেও তার হাতে পাহাড়ে ওঠার লোহার সরঞ্জাম। সঙ্গে আছে তার বন্ধু আর প্রতিবেশীর দল।

তাকে দেখে তার স্ত্রী ব'লে উঠলো, 'সেবাস্টিয়ান, ওই তাখো, এরা এসেছে!'

ছেলেমেয়েদের দেখে কিন্তু জুতোনির্মেতা যেন কথা বলার সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো তার শরীর—পরক্ষণেই এক দৌড়ে চ'লে এলো তাদের কাছে; কী যেন বলতে গেলো তার ঠোঁট দুটি কেঁপে-কেঁপে উঠলো, কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরুলো

না। শুধু দু'হাত দিয়ে তাদের জড়িয়ে ধ'রে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে র লো। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকালো সে চোখ তুলে, আর তাকেও কাছে টেনে এনে ভিজে ধরা গলায় শুধু বললে, 'মারা! মারা!'

একটু পরে তুষারের উপর থেকে তার প'ড়ে যাওয়া টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে বন্ধুদের কাছে ফিরে গেলো; ভাবভঙ্গি দেখে মনে হ'লো অনেক কথাই বুঝি বলবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, কিন্তু শুধু এইটুকুই সে বললো, 'ভাইসব, তোমাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

আরো কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলো সকলে। বিশ্রাম করতে পেয়ে অনেকটা ক্লান্তি কমলো ভাই-বোনের। শেষে সেই জুতোনির্মেতা বললে, 'আমরা সবাই যদি জড়ো হ'য়ে থাকি, তাহ'লে ভগবানের নাম নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যাক।'

'সকলের জমায়েৎ হবার সময় এখনো হয়নি,' ফিলিপ উত্তর দিলে, 'কিন্তু বাবা এখনো এসে পৌঁছোয় নি, আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে তার বুঝবে ছেলেমেয়েদের আমরা খুঁজে পেয়েছি। তারপর এই ফাঁকা কুঁড়ে দেখে বিনা দ্বিধায় গ্রামে ফিরে যাবে।'

আবার সকলে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। সিতার আর থেকে খুব বেশি দূর নয় গ্‌শাইড। এমনকি গ্রীষ্ম-বেলায় গ্‌শাইড-এর বাড়ির জানলার ভিতর দিয়ে এই আর পাহাড়ের মাঠ আর ধূসর কুঁড়ে ঘরটি স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু তার নিচেই দেয়ালের মতো খাড়াভাবে পাহাড়টা নেমে এসেছে। অনেকটা নিচু পথ, শীতকালে সে-পথে নামা যায় না; পাহাড়ে ওঠার লোহার সরঞ্জাম না থাকলে গ্রীষ্মকালেও সে পথে ওঠা সম্ভব নয়। সেই জন্যে সেখান থেকে অনেকটা পথ ঘুরে 'নেক' পর্যন্ত গিয়ে স্বিতিস্তের কাছ থেকে গ্‌শাইড-এর দিকে মোড় ঘুরতে হয়। পথে পড়ে একটা মস্ত মাঠ, সেই মাঠ পেরিয়ে যাবার সময় গ্‌শাইড-এর অনেকটা কাছে এসে পড়া যায়। সেখান দিয়ে যাবার সময় তাদের মনে হ'লো গ্রামের কুঁড়ে-বাড়ির জানলাগুলি যেন দেখতে পেয়েছে।

আর পাহাড় পেরোবার সময় গ্‌শাইড-এর ছোট গির্জের ঘণ্টার শব্দ স্পষ্ট তাদের কানে এলো।

আগের দিন থেকে ছোটোদের জন্যে সবাই খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়ায় পাদ্রিমশাই গির্জের প্রার্থনার কাজ বন্ধ রেখে-ছিলেন; ভেবেছিলেন কিছু পরেই হয়তো তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার পরেও তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না দেখে শেষকালে তাঁকে প্রার্থনার কাজ শুরু করতেই হয়েছে।

গির্জের ঘণ্টার গম্ভীর আওয়াজ কানে আসতেই তারা সবাই নতজানু হ'য়ে ব'সে প্রার্থনা করলে। তারপর ঘণ্টার শব্দ থেমে গেলে আবার তাদের যাত্রা শুরু হ'লো।

জুতোনির্মেতা তার মেয়েকে কোলে নিয়ে হাঁটছিলো, আর তার মুখ থেকে এক-এক ক'রে পাচ্ছিলো সব খবর।

'নেক'-এর কাছে কালো বনে প্রবেশ করার আগে তাদের চোখে পড়লো অনেক লোকের পায়ের ছাপ। সেগুলো ভালো ক'রে দেখে জুতোনির্মেতা বললে, 'এ জুতোগুলো আমার তৈরি নয়।'

একটু পরেই ব্যাপারটা বোঝা গেলো। তাদের সকলের সাড়াশব্দ পেয়ে আরেকটি দল সেখানে এসে হাজির—এই নতুন দলটি হ'লো মিলস্‌ডোর্ফের সেই রঙের কারবারির। দুর্ভাবনায় তার রং ছাই-এর মতো ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। মিলস্‌ডোর্ফ-এর কয়েকজন লোক, তার কারখানার সব লোকজন আর বাড়ির চাকরদের নিয়ে সেও খুঁজতে বেরিয়েছে, আর তাকেই দেখা গেলো দলের সকলের আগে-আগে আসতে।

রঙের কারবারিকে দেখেই জুতোনির্মেতা চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'এই যে, এদের পাওয়া গেছে। পথ ভুল ক'রে এরা হিমবাহে পেরিয়ে চ'লে গিয়েছিলো। কার্পের যে বড়ো-বড়ো খাদগুলো আছে, একেবারে তার উপর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো গিয়ে।

'ভগবান!' আর্ত একটা স্বর বেরিয়ে এলো রঙের কারবারির মুখ দিয়ে। 'ওই তো—ওই তো ওরা।

ওরা যে পাহাড়ের চূড়োর দিকে গিয়েছিলো, সে-খবর আমি আগেই জেনেছি। রাতে তোমার কাছ থেকে খবর পেয়েই বনের আনাচে-কানাচে সব কোণে লণ্ঠনের আলো দিয়ে ছেয়ে দিই, কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই চোখে পড়েনি। যখন ভোর হ'য়ে এলো, তখন দেখলুম সেই লাল সমাধি ফলকের পাশ দিয়ে যে পাথে চলার পথ ডুবার-চূড়োর দিকে গেছে তার আশপাশের ছোটো-ছোটো গাছের ডালপালা ভাঙাচোরা প'ড়ে আছে। দেখেই বুঝতে পারলুম যে ওরা এই পথ দিয়েই গেছে। কারণ হাঁটবার সময় তারা এইরকমভাবে গাছপালা ভাঙতে-ভাঙতে চলে। তখুনি ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেলো। যে-পথ দিয়ে তারা গেছে, সে-পথ ছাড়িয়ে অন্য কোনো দিকে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ পথটা শুধু সরু আর গভীর, তা-ই নয়, দু-পাশে তার পাঁচিলের মতো দেয়াল। তারপর নিশ্চয়ই তারা সেই মস্ত পাহাড়গুলোর কাছে পৌঁছোয়। তারপর তো আবার সেই সরু পথ, তার ডান দিকে খাড়া হ'য়ে উঠেছে পাহাড়টা, আর বাঁ দিকে নামবার কোনো জায়গাই নেই। সেই জন্যে ক্রমাগতই তাদের উপরে উঠতে হচ্ছিলো। তৎক্ষণাৎ এই খবর আমি গ্‌শাইড-এ পাঠিয়ে দিই, কিন্তু ফিরতি পথে কাঠরে মাইকেল ব'লে দিলো যে এর মধ্যেই নাকি তোমরা ওদের খুঁজে পেয়েছো। উপরে উঠতে উঠতে আমরা তখন প্রায় এক বুক বরফের মধ্যে এসে পড়েছি। মাইকেলের মুখে খবর পেয়ে সোজা নেমে এলুম।'

মাইকেল বললে, 'ক্রাবস্টোনের উপর লাল নিশেনটি পৎ-পৎ ক'রে উড়ছে দেখেই বুঝলুম এদের পাওয়া গেছে। আমি তো আপনাদের ব'লেই ছিলুম দেয়ালের মতো সোজা পাহাড় বেয়ে এরা নামতে পারবে না—এই পথ দিয়েই তাদের ফিরতে হবে।'

নিজের জামাইকে উদ্দেশ ক'রে রক্তের কারবারি বললো, 'ভগবানের কী আশ্চর্য দয়া দ্যাখো,—একটুও বাতাস বয়নি। আগামী একশো বছরের ভিতর এ-রকম অদ্ভুতভাবে তুষারপাত কখনোহবে কি না সন্দেহ। যেন একটা বাঁশের চাঙা থেকে সোজা-সোজা ভিজে সুতো নেমে এসেছে! বাতাস থাকলে ওদের আর খুঁজে পাওয়া যেতো না।'

'সত্যি তাই!' জুতোনির্মেতা উত্তর দিলে, 'ভগবানের অসীম দয়া!'

মেয়ের বিয়ে দেবার পর থেকে এ-পর্যন্ত একবারও গ্‌শাইড-এ যায় নি রক্তের কারবারি; আজ ঠিক করলে সকলের সঙ্গে সেও সেখানে যাবে।

সবাই তারা চললো সেই লাল রঙের সমাধি ফলকটির দিকে। সেখানে দেখা গেলো একটি স্লেজ গাড়ি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। কাজে লাগাতে পারে ভেবে আগে থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলো জুতোনির্মেতা। তাদের মায়ের সঙ্গে ভাইবোনকে স্লেজে চড়িয়ে অনেক কম্বল আর পশুলোমের কাপড় দিয়ে ঢেকে গ্‌শাইড-এ পাঠানো হ'লো। বাকি দল পৌঁছোলো দুপুরে।

পাহাড়ে-পাহাড়ে আজ যারা খুঁজতে বেরিয়েছিলো ধোঁয়ার সংকেত দেখে তারাও ফিরে এলো একে-একে সব শেষে ফিরলো ফিলিপ: ক্রাবস্টোনের চূড়োয় নিশেনটি পৌঁতবার ভার নিয়েছিলো সেই,—তার ফিরতে সবে হ'য়ে গেলো।

এ-দিকে তাদের দিদিমা অনেক আগেই গ্‌শাইড-এ এসে অপেক্ষা করছিলো। 'আর কখনো শীতকালে ওদের "নেক" পেরোতে দেবো না,' এই কথাই সে বললে বারে-বারে।

এত হৈ-চৈ দেখে তারা কী-রকম যেন হকচকিয়ে গিয়েছিলো। গরম খাবার খাইয়ে তাদের বিছানায় শুইয়ে দেয়া হ'লো। তার ফলেই খানিকটে সুস্থ হ'লে তারা সঙ্গের দিকে। একে-একে প্রতিবেশী আর বন্ধুরা তখন খবর নিতে এসে বসার ঘরে ব'সে গল্প করছে তাদের মা শোবার ঘরে বিছানার পাশে ব'সে তখন মেয়ের হাত ধ'রে রয়েছে, এমন সময় দাদা বললো, 'জানো মা, রাতে পাহাড়ে ব'সে থাকার সময় আমরা যীশুকে দেখতে পেয়েছি।'

'ওরে আমার দুষ্টু মেয়ে,' আদর ক'রে বললে তার মা, 'যীশু যে তোদের জন্যে অনেক জিনিশ পাঠিয়েছেন। শিগগিরই পাবি, দেখিস।'

মোমবাতি জ্বালানো হ'লো সারি-সারি, বাক্স খুলে উপহারগুলো সাজানো হ'লো আর সেইকালে বসার ঘরের দরজাটা খুলে দেয়া হ'লো সপাটে। আর বিছানায় শুয়ে-শুয়েই তারা দেখতে পেলো ঝকঝকে, বলমলে, সুন্দর ক্রিসমাস গাছ, ধীরে-ধীরে তাদের ক্লান্তিকে ছাপিয়ে যেন বড়ো হ'য়ে উঠলো সেই গাছ, ডালেপালায় তার ঝুলছে নানারঙের ফানুশ আর চিনে লণ্ঠন। গায়ে জামা-কাপড় গলিয়ে চটপট বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে গেলো তারা উপহারগুলো নিতে। তারপর ভারি খুশি হ'য়ে বিছানায় ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো।

আজ সন্ধেয় গ্‌শাইড-এর সরাইখানায় অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি হৈ-চৈ। যারা গির্জেয় যেতে পারে নি তারা, আর বাকি সবাই এখানে এসে জমা হয়েছে। সবাই নিজের নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছে, বলছে কে কী দেখেছে শুনেছে, বলছে কে কী করেছে বা করতে বলেছিলো, বলছে কী-কী বিঘ্ন-আপদ ঠেলে এগিয়েছে—এই সব নানা বিষয়। আর কী করলে আরো ভালো ক'রে খোঁজ নেয়া যেতে পারতো, সেই নিয়েও নিজেদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে।

গ্‌শাইড-এর ইতিহাসে এই ঘটনা উজ্জ্বল হ'য়ে থাকলো। অনেক দিন ধ'রে এই নিয়ে কত যে আলাপ-আলোচনা হ'লো, তার ঠিক নেই। অনেক বছর পরে কোনো স্বচ্ছ আলোভরা পরিষ্কার দিনে পাহাড়টির চুড়ো যখন ঝকঝকে হ'য়ে উঠবে কিংবা কোনো বিদেশী পথিকের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হবে—তখনও ওই দিনটির কথা না-ব'লে তারা পারবে না।

আর সেই দিন থেকেই সবাই এই কথাটা বুঝতে পারলে যে, ছেলেমেয়েরা এই গ্রামেরই সম্পত্তি। তারপর থেকে তাদের আর আগন্তুক ব'লে ভাবলে না গ্রাম-বাসীরা—তারা তো ওই পাহাড় থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে এনেছে তাদের। আর তাদের মা সারা শুধু এখন তাদেরই মা নয়, গোটা গ্‌শাইড-এরই মা। ভাই-বোন কিন্তু পাহাড়টি আর সেই শাদা রাতটিকে কোনো দিনও ভুলবে না। বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি মন দিয়ে তারা এবার থেকে পাহাড়টিকে দেখবে—পুরোনো দিনগুলোর মতো ভবিষ্যতেও আবার সূর্যের আলো ছিটিয়ে দেবে মধুর এক উষ্ণতা, আবার দেবদারুর সুগন্ধে ভরে উঠবে সমস্ত বাতাস, আর ঝিমঝিমে হাওয়ায় মৌমাছিরা বেড়াবে গুনগুনিয়ে—আর সেই মস্ত শাদা ঝকঝকে কাচের পাহাড়টিও আকাশের মতো নীল আভা নিয়ে সুন্দরভাবে বুকে দেখবে তাদের।

দরকার নেই বলে কোন সত্যকার দরকারকে যে মানুষ খাটো করেছে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই একটা মর্যাদা আছে, সেইটুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার পর সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরী হয়েছিল। বাহিরে বেরিয়ে দেখলুম, সেজে গুজে রামানন্দবাবু বারান্দায় পায়চারি করছেন। আমাকে দেখে খুশি না হয়ে যেন একটু অসন্তুষ্ট হলেন: আর একটু পরে উঠলেই পারতেন।

ভালোমানুষের মতো জবাব দিলুম: আপনি আমাকে ফেলে যাবেন ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম।

আপনাকে ফেলে যাওয়া উচিত।

কেন?

আপনার পেটে নানা দুরভিসন্ধি।

আর সে জিনিষ যে আপনার মাথায়। আমি ক্ষিধের সময় কাতর, আপনি সারাক্ষণ।

কী রকম?

এই দেখুননা, রাতে বাতি জেলে আপনি মোটা মোটা বই পড়তে লাগলেন। শুয়েও রক্ষা নেই, টর্চ জেলে সারারাত ঘড়ি দেখছেন। আপনার আর কী, সারাদিন ঘুমিয়ে আপনি সারারাত জাগলেন। বাসে চেপে আবার ঘুমবেন। কিন্তু আমার হয়ে গেল।

এতে দুরভিসন্ধির কী দেখলেন?

দেখলাম না। আপনি তো চেয়েছিলেন আমি ঘুমিয়েই থাকি। রাতে তারই জন্তে জাগিয়ে রেখেছিলেন।

আপনি আমাকে এত নীচ ভাবেন! আমিই আপনার খাবার ব্যবস্থা করিনি।

ওঠানের ঘরে উচ্ছলিত হাসির শব্দ পাওয়া গেল। বোধ হয় শোনাও গেল: ঝগড়া বেধেছে।

কিন্তু আমাদের ঝগড়া বাধলনা। হোটেলের বেয়ারা এসে খবর দিল: টেবিলে চা দেওয়া হয়েছে।

ওতা যখন বাহিরে এল, আমাদের চা খাওয়া তখন শেষ হয়েছে। অত্যন্ত তৎপর ভাবে রামানন্দবাবু দাঁড়ালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রসন্নতা দেখলুম। ওতাই তার সঙ্গে এনেছে প্রসন্নতা। উজ্জ্বল দেহে সোনালী পাড়ির নেশা আছে। নেশাটা ফিকে করবার জন্ত সাদা জামা পরেছে। লালে কড়া হত। রামানন্দবাবুর দৃষ্টি উপেক্ষা করে ওতা বলল: আজ ভুবনেশ্বর চলছেন তো?

রামানন্দবাবু গদ গদ ভাবে বললেন: একেবারে তৈরি।

আপনি?

ওতার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম: সমুদ্রের ধারে।

সেকি!

দুজনেই বোধহয় চমকে উঠলেন।

আমি হেসে বললুম: রামানন্দবাবু আরাম পাবেন, আমিও পাব।

ঋতা আশ্চর্য হয়ে বলল : নতুন জায়গা দেখতে আপনার ভাল লাগে না ?

কিছু না করতেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।

এ কথা আমার সাময়িক সত্য। এতদিন ঘুরে বেড়াতেই আমার ভাল লাগত। পথ আমাকে টানে, টানে পথের মানুষ। সেই অদৃশ্য শক্তি আমাকে এমন গভীর ভাবে টানে যে বারে বারে আমি পথে বার হই। কিন্তু এদের কাছে সে কথা আজ গোপন করে আনন্দ পেলুম।

ঋতা বলল : ভালই হল, একজন সঙ্গী পাওয়া গেল।

রামানন্দ বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন : কী বলছেন আপনি ?

উত্তরে ঋতা শুধু হাসল।

না না হাসি নয়, এখন ছেলে খেলা করলে চলেনা। ব্যবস্থা যখন করা হয়েছে, তখন পিছিয়ে থাকা উচিত নয়।

তাঁর কণ্ঠে আমি শিক্ষকোচিত গাম্ভীর্য দেখলুম। ঋতা হেসে উঠল। রামানন্দ বাবু যুবি আরও গম্ভীর হলেন।

ঋতার দাদা বাহিরে বেরুতেই রামানন্দ বাবু তাঁকে আক্রমণ করলেন : আপনারা যাচ্ছেন না ?

ভদ্রলোক এই প্রশ্নের কোন কারণ খুঁজে পেলেন না, বললেন : কেন বলুন তো ?

সেই রকম শুনছিলুম।

না না যাবনা কেন, দুপুরের খাবার পর্যন্ত আমরা তৈরী করে নিয়েছি।

এই দেখুন।

কী দেখব ?

আমরা তো কিছুই সঙ্গে নিলুমনা।

আমার দিকে চেয়ে বললেন : আপনি কী নিলেন ?

আমি তো যাচ্ছি না।

তাহলে—

ঋতা হেসে বলল : তাহলে আপনিও থেকে যান।

ভদ্রলোক আমার উপরেই হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন, বললেন : আপনি মশাই যত নষ্টের গোড়া। কাল সন্ধ্যাতেও আমাদের কম হায়রানি করেছেন।

আমি তো একাই বেরিয়েছিলুম।

আজকেও তো যাবেন না বলে গোলমাল পাকিয়েছেন।

গেলেই তো গোলমাল, না গেলে আবার গোলমাল কিসের।

হুঃ।

এবারে ভদ্রলোকও হাসলেন।

ঋতা আমাকে চুপি চুপি বলল : ভদ্রলোকের পেছনে লেগেছেন কেন ?

সে তো আপনিই লেগেছেন।

ঋতা এ কথার উত্তর দিল না, বলল : ভদ্রলোক মাষ্টার মানুষ। একটু মেনে চললেই তো পারেন।

আপনি মানলে ভদ্রলোক বেশি খুশী হবেন !

শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই গিয়ে বাসে উঠলুম। এক রকমের ছোট বাস। স্টেশন ওয়াগনের চেয়ে কিছু বড়। পনর ষোলজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে বসতে পারে, এমন ব্যবস্থা। ঘতা তার বৌদির পাশে বসল। রামানন্দবাবু বসলেন তার দাদার পাশে। আমি একটু পিছনে। কয়েকটা হোটেল থেকে যাত্রী সংগ্রহ করে বাস ছাড়ল। সকালের রৌদ্র তখনও প্রখর হয়নি।

পুরী থেকে ভুবনেশ্বর ট্রেণে আটত্রিশ মাইল পথ। পূর্ণারোড জংশন হয়ে কলকাতার দিকে। দু-ঘণ্টার পথ। কিন্তু পাকা রাস্তা প্রশস্ত। মোটরে-পথও কম, সময়ও সংক্ষেপ হয়। মাঝপথে পিপলি নামে একটা জায়গা থেকে কোনারকের রাস্তা বেরিয়েছে। পুরী থেকে কোনারক আর ভুবনেশ্বর থেকে কোনারক প্রায় একই রকমের দূরত্ব। সামান্য পথ যা কাঁচা আছে, অদূর ভবিষ্যতে তা পাকা হয়ে যাবে। কোনারক দর্শনের কষ্টের কথা মানুষ তখন অবিশ্বাস্য ভাববে।

পুরী থেকে সাক্ষীগোপাল বারো মাইল উত্তরে। ঠিক হয়েছিল, আমরা প্রথমে সাক্ষীগোপাল দেখব। তারপর ভুবনেশ্বর। ফিরব উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখে। শীতের বাতাস বইছে ঝির ঝির করে। চোখ বুঁজে সেই বাতাস উপভোগ করা ছাড়া এখন আর কোন কাজ নেই।

কিন্তু রামানন্দবাবু চুপ করে বসে রইলেন না। ঘতার দাদার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন, একসঙ্গে আছি, অথচ আপনার নামটা এখনও জেনে নেওয়া হয়নি।

আমার নাম?

ভদ্রলোক কিছু হয়তো ভাবছিলেন। আচমকা এই প্রশ্নে একটু চমকে উঠে বললেন: আমার নাম নীরদ বরণ চট্টোপাধ্যায়।

রামানন্দবাবু নিজের নাম বললেন না, শুধু বললেন বেশ নাম তো।

নীরদবাবুও কৌতূহলী নন। চুপ করে রইলেন।

রামানন্দবাবু আবার বললেন: পুরীতে আপনারা কতদিন থাকবেন?

সব কিছু দেখা হয়ে গেলেই ফিরে যাব।

ছুটি কদিনের?

যতদিন ভাল লাগে।

মানে? আপনি চাকরি বাকরি করেন না বুঝি?

আজ্ঞে না।

তবে কী করেন?

রামানন্দবাবুর প্রশ্নের ভিতর কোন সৌজন্যের ধারাই নাই। আমি দেখলাম, ঘতা তার বৌদিকে ঠেলা দিয়ে হাসছে। কিন্তু নীরদ বাবু রাগ করলেন না, সহজ ভাবে বললেন: কলকাতায় আমার ব্যবসা আছে।

বই এর ব্যবসা?

আজ্ঞে না।

তবে?

লোহার।

বই এর ব্যবসা হলে আমাদের সুবিধা হত।

ও।

কেন তা জিজ্ঞাসা করলেন না ?

কেন ?

উড়িষ্যার উপর আমি একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ লিখছি। আপনাকেই ছাপতে দিতুম। জানেনতো, সব প্রকাশককে আজকাল বিশ্বাস করা যায়না !

মাথাটা কাৎ করে নীরদ বাবু চোখ বুঁজলেন। কিন্তু রামানন্দবাবু থামলেন না। বললেন উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

আমার সন্দেহ রইলনা যে এখন রামানন্দ বাবুকে নিয়ে নীরদ বাবু বেগ পেতে শুরু করেছেন। কারবারী মানুষের কাছে ইতিহাসের কথার চেয়ে লোহার আঘাত হয়তো মধুর মনে হবে। কিন্তু রামানন্দবাবুর দৃষ্টি সেদিকে নেই। বারে বারে তিনি ঘড়ির দিকেই তাকাচ্ছিলেন, এবং তাকে উৎকর্ণ দেখবার চেষ্টায় অন্তকে উপেক্ষা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত পিছন থেকে আমি বললুম : আমি শুনছি রামানন্দবাবু।

এবারে তিনি আর রাগ করলেন না, বললেন : শুনছেন তো, শুনতেই হবে। তারি ইন্টারেস্টিং ইতিহাস। এই কলিঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে অতবড় বীর অশোকের হাত থেকে তরোয়াল খসে পড়ল।

এ গল্পতো শুনিনি।

শোনেননি শুনবেন কোথা থেকে। দি গ্রেট কলিঙ্গ ওয়ার অব অশোক। কী যুদ্ধ, কী রক্তপাত, কী কান্না, দিগ্বিজয়ী অশোক বললেন, এই শেষ, আর যুদ্ধ নয়। বুদ্ধই ঠিক বলেছেন, অহিংসা পরম ধর্ম। এই গল্প দিয়ে উড়িষ্যার ইতিহাসের শুরু। কিন্তু অহিংসা ধর্ম বেশি দিন টিকলনা। দুশো বছর পরেই জৈনরাজা খরবেলা কলিঙ্গ সেনা নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হলেন। কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ রাজা খরবেলা খৃষ্টের দেড়শো বছর আগে প্রবল প্রতাপে রাজ্য পালন করেছেন। শুধু অন্ধ মহারাষ্ট্র ও বেরার নয়, মগধের রাজা পুষ্যমিত্রকেও পরাজিত করেছিলেন। এই পুষ্যমিত্র গ্রীকদের হটিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

কলিঙ্গের এই সম্মান বেশিদিন ছিলনা। জৈন রাজাদের পর এলেন বৌদ্ধ রাজারা। মগধের রাজা শশাঙ্কের এক শিলালিপিতে দেখা যায় যে ৬১০ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গ মগধের অন্তর্গত ছিল। কনৌজের হর্ষবর্ধন কলিঙ্গ জয় করেন ৬৪০ খৃষ্টাব্দে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এলেন কেশরী রাজারা—জনমেজয় যযাতি ও লীলাটেন্দু। ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির সব এই রাজাদেরই কীর্তি। এই সময়েই এলেন প্রাচ্য গাঙ রাজা বজ্রহস্ত। ত্রিকলিঙ্গাধিপতি উপাধি নিয়ে কলিঙ্গ শাসন শুরু করলেন। তালপাতার পুঁথি মাদলা পঞ্জীতে পাওয়া যায় যে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই রাজা অনন্ত বর্মন চোড় গঙ্গ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বিমান আর জগমোহন নির্মাণ করেন। গঙ্গা বংশের রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব। প্রথম ও দ্বিতীয় রাজারাজ, প্রথম ও দ্বিতীয় অনঙ্গভীম, প্রথমও দ্বিতীয় নরসিংহদেব। লোকে বলে কোনারকের সূর্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন প্রথম নরসিংহদেব।

তারপরে মুসলমান আক্রমনের যুগ। ফিরোজ শাহ তুঘলুক নিজে এসেছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীতে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সূর্যবংশীয় রাজা কপিলেশ্বর দেব দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। পরে গোলকুণ্ডার সুলতানদের চাপে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। উত্তরের মুসলমানদের চাপ উড়িষ্যা বেশিদিন সহ্য করতে পারেনি। মুকুন্দ দেব এ দেশের শেষ হিন্দু রাজা। বাংলার সুবেদার সুলেমান কারারাণীর সেনাপতি কালা পাহাড়ের হাতে পরাস্ত হন।

কালাপাহাড়ের গল্প আমি শৈশবে শুনেছিলুম। যাত্রার একটা পালাগানও শুনেছিলুম। তার কাহিনী এখন আর মনে নেই। তবে ইতিহাসের কথাটুকু মনে আছে। আকবর নামা তারিখই মাউদী প্রভৃতি গ্রন্থে

তাকে আফগান বলা হয়েছে। কিন্তু বাঙলা ও উড়িষ্যায় যবনপ্রভু ছিল তিনি ব্রাহ্মণ, নাম রাজু। নবাবের কোন কন্যার প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন। সত্য যাই হোক, তাঁর মতো হিন্দু বিদ্বেষী ইতিহাসে কম আছে। শুধু আসাম বাঙলা ও উড়িষ্যা নয়। কাশী পর্যন্ত সমস্ত দেবালয়ের উপর তার আঘাতের চিহ্ন আজও স্পষ্ট আছে। মাদালা পঞ্জীতে আছে যে মুকুন্দ দেবের পুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দর আমলে কালাপাহাড় পুরী আক্রমণ করেন। জগন্নাথের মূর্তি পাণ্ডারা লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কালাপাহাড় তা খুঁজে বার করে আগুনে পুড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দেন। এই পাপেই নাকি কালাপাহাড়ের হাত পা খসে পড়ে, অকালে তার মৃত্যু হয়।

রামানন্দবাবুর বক্তৃতা তখনও শেষ হয়নি। বলছিলেন: আফগানদের হাত থেকে উড়িষ্যা উদ্ধার করেন আকবর বাদশাহের সেনাপতি মানসিংহ। নাগপুরের ভোসলারা দখল করে আলিবর্দী খানের কাছ থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই আসে ইংরেজের হাতে। দেশ স্বাধীন হবার সময়েও পঁচিশটি দেশীয় রাজা এদেশে ছিল।

কর্তার দিকে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য হলুম। পরম কৌতুকে সে হাসছে, কিন্তু নিঃশব্দে এই হাসি দেখে রামানন্দ বাবুও থেমে পড়লেন। আমার কানের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললেন: ব্যাপার কী?

বোধ হয় আপনার বিদ্যার বহর দেখে খুশী হয়েছেন।

কর্তার হাসিতে যে কৌতুক আছে, তিনি সে কথা ভুলে গেলেন, বললেন: সত্যি! সত্যি বই কি। ইতিহাসের এত খবর কজনে জানে বলুন!

খানিকটা গর্বিতভাবে রামানন্দবাবু বললেন: কাল রাতে অনেক পরিশ্রম করেছি।

তারপরেই বিমর্ষভাবে বললেন: মোটা মোটা বইএ কিছুই তেমন পেলুম না। শেষ পর্যন্ত একখানা চটি গাইড বইএ—

বলেই থেমে গেলেন।

আমিও তাড়াতাড়ি বললুম: বলবেননা, বলবেন না। আপনার সম্বন্ধে লোকের অনেক উঁচু ধারণা।

লক্ষ্য করিনি কখন আমরা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছি। বোধহয় কোন সময় প্রধান রাজপথ ছেড়ে আমরা অন্য পথে এসেছি। মনে পড়ল, সাক্ষী গোপালের কথা। পুরী থেকে বারো মাইল উত্তরে এই মন্দিরটি আমরা যাবার পথেই দেখে যাব বলে স্থির হয়েছিল। বাস এসে একটা ছোট বাজারের ভিতর দাঁড়াল। আমরা সবাই নেমে পড়লুম।

প্রশস্ত বাধানো পথ মন্দিরের দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সামনেই উঁচু অরুণ স্তম্ভ। তোরণের দরজা দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম। উড়িষ্যার নিজস্ব রীতিতে তৈরী একটি সুন্দর ছোট মন্দির।

মন্দিরের কারুকার্য দেখবার মতো অপর্যাপ্ত সময় আমাদের ছিলনা। ভুবনেশ্বর মন্দিরের শহর। নূতন রাজধানীও বটে, তারপরে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। বাস থেকে নামবার সময় ড্রাইভার আমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি আমরা দেবতার দর্শন করে বেরিয়ে এলুম।

যাত্রীরা সচরাচর এখানে ট্রেনেই আসেন। পুরী খুর্দারোড শাখা লাইনের একটি ছোট ষ্টেশন।

মন্দির আধঘাইলের মধ্যে। এক ব্রাহ্মণ বালকের মুখে শুনলুম যে পাশে একটি সরোবরও আছে। তাড়াতাড়ি তা দেখে এলুম। দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বাঁধানো টেম্পাকুলম নয়। গ্রামের পুষ্করিণীর মতো। চারিপাশে সবুজ গাছে ছেয়ে আছে। মনে হয় যাদের সময় অপর্যাপ্ত তারা এখানে সারাদিন কাটিয়ে তৃপ্তি পাবেন। তবু বৃন্দাবন এই বাগানের নাম, সার্থক নাম।

এই দেবতার প্রতিষ্ঠার একটা ইতিহাস আছে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এক ভক্তের মামলায় সাক্ষী দিতে নাকি বিদ্যানগরে এসেছিলেন। রাজা পুরুষোত্তম দেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই নগর জয় করে বিগ্রহের অধিকার পেয়েছিলেন। তিনি স্থাপন করেন কটকে। নীলাচল পরিক্রমায় এসে চৈতন্যদেব এই মূর্তি কটকেই দেখেছিলেন। সে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মোগল আমলে বোধ হয় এই মূর্তি সত্যবাদী গ্রামে তুলে আনা হয়। এই গ্রামেরই নাম সত্যবাদী।

খতাকে দেখতে পেয়ে রামানন্দবাবু বললেন: বৃন্দাবন থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের জন্যে সাক্ষী দিতে এসেছিলেন বলেই দেবতার নাম সাক্ষী গোপাল।

খতা বলল: মামলা কিসের?

মামলা!

রামানন্দবাবুর মুখের অবস্থা বড় করুণ হয়ে উঠল। ভক্তের বিপদের একটা কাহিনী নিশ্চয়ই আছে। তা নাহলে দেবতা কেন ছুটে আসবেন। আমরা তখন বাসে উঠে বসেছি। মন্দিরের নিকটে হলে এক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করা যেত। পয়সার জন্যে যারা বাসটাকে ঘিরে ধরেছে, তাদের মুখ দেখে রামানন্দবাবু ভরসা পেলেন না। আমি বললুম: জিজ্ঞাসা করুন না কাউকে।

কাকে করব।

বড় অসহায় সুর। আমি যখন পাণ্ডাদের দেখিয়ে দিচ্ছিলুম, বাস তখন ছেড়ে দিয়েছে। রামানন্দবাবু খুবই মুসড়ে পড়লেন। কিন্তু খতার দিকে চেয়ে দেখলুম, কৌতুকে তার দুচোখ চকচক করছে।

(ক্রমশঃ)

গির্জার ধর্মকর্তারা আঁকতে দিলেন শিল্পীকে এমন একখানি ছবি যাতে খৃষ্টধর্মের প্রতি লোকের পরম বিশ্বাস ও নির্ভরতা জন্মায়।

শিল্পী বিনীতভাবে জানালেন,—"সে শক্তি আমি কোথায় পাব, বলে দিন আমাকে।"

ধর্মযাজকেরা বললেন,—"সে শক্তি তুমি পাবে আমাদের দেখেই। আমরা ত ধর্মচর্চ্চায় জীবন কাটালাম।"

শিল্পী মনে মনে হাসলেন। কোন কথা না বলে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন পথে ঘাটে।

হঠাৎ একদিন দেখতে পেলেন এক বিষাদাচ্ছন্ন রমনী তাঁর জানালায় বসে আছেন। মুখে তাঁর ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতা। সূর্য্যের আলো তেরচাভাবে তাঁর মুখের উপর এসে পড়েছে ঠিক একটি ক্রুসের আকৃতি নিয়ে। শিল্পী তখনি সে ছবির কল্পনা মনে গেঁথে নিলেন। আজও পল্ কেরো নিজের সেই ছবিটির তুলনা নেই।

মলিন মৃণাল

নীলিমা দাশগুপ্ত

শৈবলিনী জ্বলে উঠলেন, "এমন পা টিপে টিপে যাচ্ছো কোথায় শুনি?" দোতলা থেকে বেড়াল পায়ে নেমে আসছিলো জয়া। সিঁড়ির বাঁকের মুখে ধরা পড়ে গেলো। মায়ের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে হেসে ফেললো, "কী তোমার সজাগ চোখ মা—,দেখলাম তো মায়ার ব্লাউজে একমনে তুমি ফুল তুলছো…"

"হ্যাঁ। মা হ'লে চোখ-কান এমনি সজাগ রাখতে হয়—"

জয়া আর এক ধাপ নামতেই ঝলকে উঠলেন, "কোথায় যাচ্ছিস?"

"এই একটু…, মা, তোমার এবারের ফুলগুলি যা হচ্ছে না—, ঠিক যেন থোকা থোকা জেরিনিয়াম ফুটে আছে, এই জামাটাতে মায়াকে যা—"

শৈবলিনী এক ঝটকায় হাতে বোলানো ব্লাউজটা অদূরে টিপয়ের ওপর ছুঁড়ে দিলেন, "তোর না ভীষণ মাথা ধরেছে, মাথা তোলার উপায় নেই, দীপ্তেনদের সঙ্গে তাই বার হলিনে—, আর এখন পাঁচ মিনিটেই সেরে গেলো—"

"এখন সেরে গেছে মা, একদম সেরে গেছে। এমন সুন্দর বিকেলে কী বাড়ির ভেতর লেপের তলায় থাকতে ইচ্ছে করে?"

"না, এখন তোমার কোথাও যাওয়া হবে না—" শৈবলিনীর কণ্ঠস্বর ঋজু, "আমি ব'লে দিয়েছি দীপ্তেনকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে, আজ সকলে মিলে এক জায়গায় ব'সে তোমার সেতার শুনবো।"

"সকলে মিলে মানে?" দৃষ্টিতে বিস্ময় ঝরালো জয়া। একটু যেন থতমত খেলেন শৈবলিনী কিন্তু দমলেন না। বললেন, "আমরা সবাই, দীপ্তেন—,ইচ্ছে করলে তোমার বন্ধু রেখাও থাকতে পারে…"

জয়া গলা খুলে হেসে উঠলো, "আমরা সবাই মানে—তুমি, ছায়া, মায়া পড়া তৈরী বাদ দিয়ে সেতার শুনতে আসবে না, আর বাবা পরশু ভাকড়া-নাঙ্গাল ড্যাম্ ইন্‌স্পেকশনে যাচ্ছেন, ড্যামের নক্‌শা নিয়ে বাবা এমন মশগুল—খাবার-নাবার সময় নেই…, এখন বাবাকে ঘর থেকে টেনে এনে সেতার শোনানোও যা, মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মারাও তা…, তাহলে শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াচ্ছে, যে আমার সেতার বাজানো তুমি দীপ্তেনকে শোনাবে।"

"তাই যদি আমার ইচ্ছে হয়—" শৈবলিনী গাম্ভীর্যে স্পষ্ট হলেন। জয়া নিচের ঠোঁটের বাঁকোনটা দাঁত দিয়ে একটু চাপলো। কোনো কিছু বিশেষভাবে ভাবলে ওর ভংগি এমনি হয়। চোখ তুলে মা'র থমথমে মুখের দিকে এক চোখ তাকালো, "আচ্ছা সে হবে'খন, আমি একটু ঘুরে আসি…, ওরা ফিরে আসার আগেই আমি চলে আসবো দেখো—"

"উঁহু, তা হবে না। তোমাকে একবারটি ছেড়ে দিলেই তুমি কালকের মতো সন্ধে-টন্ধে কাবার ক'রে একেবারে রাত্রি ন'টার সময় খাবার টেবিলে এসে বসবে, তারপর বড্ড ঘুম পাচ্ছে বলে ঝুপ

করে লেসের তলায় সেঁধোবে। এদিকে আমি তরুবালাকে কত চিঠিপত্র লিখে হীরেনকে মাত্র সাতদিনের জন্ত সিমলে আনিয়েছি। সই জানিয়েছে, কালো হাতে তার কোনো আপত্তি নেই—ছেলে মত দিলেই হলো—"শৈবলিনীর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হ'য়ে আসছিলো—সামলে নিলেন, "সেবার তোমার বাবাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চিঠি লিখিয়ে—তাঁর বন্ধুর ছেলে হেমেনকে আনালাম, সে তিন দিনের জায়গায় ত্রিশদিন থেকে গেলো, মেশামেশি তো দূরের কথা—ভাল করে দুই একটু কথাবার্তাই বললিনে; পাশের বাড়ির প্রেমাকে সকাল সন্ধে ডেকে পাঠালি, আলাপ করিয়ে দিলি হেমেনের সঙ্গে বারে বারে একসঙ্গে বেড়াবার ওদের সুযোগ ঘটিয়ে দিলি, তারপর ফল দাঁড়ালো এই, প্রেমাকে হেমেন একেবারে বিয়ে ক'রে নিয়ে ফিরলো, আর মন্মথবাবু কত কটুকথা শুনিয়ে তোমার বাবাকে পত্র দিয়েছিলেন, যে, তোমার কথামতো হেমেনকে সিমলায় না পাঠালে আমার কপালে এমন উৎকট পাঞ্জাবী বৌ জুটতো না···"

জয়া সিঁড়ির রেলিং ধ'রে নিজের হাসির বেগ থামালো, "—ওরে বাবা—!" আঁতকে ওঠার ভাব ফোটালো জয়া, ভগবান আমাকে রক্ষে করেছেন মা, ক্যাপ্‌টেন হেমেনের হাত থেকে, যিনি সিমলা এলেন ব'লে পাঞ্জাবিনীকে বিয়ে করলেন, তিনি তো মাদ্রাজে গেলে মাদ্রাজিনী, বম্বে গেলে বম্বেবালিনী, রাজস্থান গেলে রাজস্থানী বিয়ে ক'রে বসতেন। যার মনের সেরকম এমনি, তার সঙ্গে আমি ঘর করতাম কী ক'রে মা—?"

মেয়ের মুখভঙ্গিতে হেসে ফেললেন শৈবলিনী। এবার কণ্ঠস্বরে আবেশ ফুটতে দিলেন না আবেদনের সুর এনে বললেন, "আমার বুকের ভেতরটা কিরকম ক'রে তা যদি তুই জানতিস, তাহলে রেখাকে নেমন্তন্ন ক'রে আবার ও বাড়ি এনে রাখতিস না···"

"উঁহু মা, ভালকথা—এইবেলা তোমার সঙ্গে খোলাখুলি সব কথা বলেনি—" এতক্ষণে, সিঁড়ির রাঁক ছেড়ে সিঁড়ির মাথায় মার পাশে উঠে এলো জয়া।

"আচ্ছা মা, তুমি একবার খোলা মনে বেশ ক'রে ভেবে ভাখো তো—,রেখার সঙ্গে এই হীরেনের কী চমৎকার ম্যাচ হবে! হীরেনকে রাজপুত্রের মতো বলছিলে না, রেখাও ঠিক রাজকন্যের মতো—তাই না?"

শৈবলিনী গরগরিয়ে উঠলেন, "রেখার সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধার জন্ত এত চিঠিপত্র লিখে আমি হীরেনকে আনাইনি—"

"আহা, মিলেই বা ওর গাঁঠছড়া বেঁধে। একটি সুন্দর মেয়ের সুন্দর কামনা সার্থক করলে—"

"সুন্দর কামনা সার্থক!···" শৈবলিনীর গালে হাত দেবার মতো গলা, "তোর সুন্দর কামনা নেই?"

"আমার কথা আসছে কিসে, রেখার কথা হচ্ছে—রেখার কথাই শেষ হোক। জানো মা, ম্যাট্রিকের টেস্টে আমাদের ইংরিজী পেপারে রচনা এসেছিলো—তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?—কত মেয়ে কত কিছু লিখলো,—ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হবো, সিস্টার নিবেদিতা হবো, গ্রামসেবিকা হবো, আদর্শ শিক্ষিকা হবো,—কিন্তু, রেখা কী লিখেছিলো জানো, লিখেছিলো,—আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সময়মতো বিয়ে ক'রে ভাল ক'রে সংসার রচনা করা। ইংরিজী শিক্ষয়িত্রী মিস্ খান্না হেসে হেসে ওর সে রচনাটা আমাদের প'ড়ে শুনিয়েছিলেন। রেখা তখন কত ছেলেমানুষ রেখে ঢেকে কিছু লেখেনি। ওর মনের ইচ্ছেটা কলমের মুখ দিয়ে সহজেই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন যদি সামনের বি, এ, পরীক্ষাতে ঐ রচনাটাই আবার আসে, রেখা ও কথা আর কখনো লিখবে না। রেখার বাবা ওর ম্যাট্রিক পাশের পর থেকেই বিয়ের চেষ্টা করছেন, বিয়ের বাজারে মেয়েদের দাম কিসে-নিরূপণ হয় রেখা এই কটি বছরেই তা

বুকে নিয়েছে। এখনকার পৃথিবীতে, রূপ-মুগ্ধ কথাটা বেশ বাদ দেয়া চলে, এখন কথা হলো রূপোমুগ্ধ। দরিদ্র কেরানীর মেয়ের যত রূপই থাকুক না কেন—বিয়ে তার সময় মতো বুরের কথা, হয়তো বিয়ের মূল তার জুটবেই না—" জয়ার কণ্ঠস্বরে মৃদু উত্তেজনা।

শৈবলিনী মেয়ের প্রকৃতি ভালভাবেই জানেন, গলার সুর নামিয়ে বললেন, "তোকে আমি কথা দিচ্ছি জয়া রেখার বিয়ের সমস্ত ভার আমি নেবো কিন্তু দীপ্তেনের সঙ্গে—"

"না মা, ওসব ভার টার নেয়া চলবে না, রেখার ঘাড়ে ও দীনতা চাপিয়ো না। কত হিসেব নিকেশ ক'রে আমি ব'লে রেখাকে এখানে আনিয়েছি। কলেজ চারদিন ছুটি ছিলো—তাই সুবিধেই হলো। না হ'লে দীপ্তেনকে রেখার বাড়িতে সেই লোয়ার কাইথুতে নিয়ে যেতে বেশ মুস্কিলই হতো। কাল সাউথের দিকে গিয়েছিলাম—কতটুকুই বা চড়াই-উৎরাই, ম্যাল রোডে উঠেই দীপেন হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ঈশ্বরের কৃপায় সোজা পা নিয়ে জন্মেছি, আর এখানে—হয় অবটিউজ এ্যাংগেলে হাঁটো নয় এ্যাকিউট এ্যাংগেলে হাঁটো, এ কী দেশ রে বাবা!" জয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো, শৈবলিনী গলা খুলে হাসতে লাগলেন।

"চমৎকার কথা বলতে পারে তো দীপ্তেন?"

"হ্যাঁ। সুন্দর কথা বলেন ভদ্রলোক। আচ্ছা মা, আমি তাহলে এখন একটু যাই—?"

"এখন আবার যাবি কেন—" শৈবলিনী অসহিষ্ণু গলায় বললেন, "ওদের ফেরার সময় তো প্রায় হয়েই এলো—"

"সেইজন্যই তো তাড়াতাড়ি কচ্ছি মা, রেখার সঙ্গে দীপ্তেনের পরিচিত হবার একটু সুযোগ দেয়া চাইতো—" টক্ টক্ ক'রে সিঁড়ির দু ধাপ নামতেই মা'র করুণ গলা শুনতে পেলো জয়া।

"তুই আমার সন্তান হয়েও আমার কষ্ট বুঝলিনে জয়া, আমার মনের দিকে একবারও চাইলিনে আমি যে কত—"

শৈবলিনীর কথা শেষ হবার আগেই জয়া দ্রুত উঠে এসে মা'র গলা জড়িয়ে ধরলো, "মাগো, তোমার কষ্ট বুঝি বলেই তো তোমাকে ছেড়ে আমি কোনোদিন যাবোনা। ছায়া-মায়া গোলাপ ফুলের মতো হয়েছে ওদের বিয়ে দাও। শুধু আমার চেহারাই নয়—আমার প্রকৃতিও কেমন যেন রুক্ষ—আমি সবদিক দিয়েই সংসারের পক্ষে বে-মানান। আমি বাবার মতো দিনরাত শুধু কাজ আর পড়া, পড়া আর কাজ নিয়ে থাকবো। তখন তুমি ভুলেই যাবে মা জয়া তোমার মেয়ে। মুখে তখন জয়া আসবে না—আসবে জয়, ডাকবে জয়, বলবে :জয়।...কে বলে আমাদের ছেলে নেই এই তো জয়, এই তো আমাদের ছেলে—"

শৈবলিনীর চোখ হঠাৎ ছলছলিয়ে উঠলো। কিন্তু সেটাকে চাপা দেবার জন্য খুব জোরে জোরে হাসতে লাগলেন।

মা'র গলা ছেড়ে দিয়ে জয়া এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো।

ক্যাক্টাস ঝোপের আড়াল থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো দীপ্তেন। বড় রাস্তার মোড়ে রেখাকে দাঁড় করিয়ে ও ওর লাইটারটা নিতে এসেছিলো। খানিক আগে ছায়া-মায়াকে ম্যাজিক দেখাচ্ছিলো দীপ্তেন। ওদের হাতে কোনো জিনিষ দিয়ে সেটাও পকেট থেকে বার করছিলো। সেই সময় লাইটারটা পকেট থেকে বার ক'রে রেখেছিলো। তারপর আর মনে নেই।

বাড়ি ঢোকার বড় দরজায় একপা বাড়াতেই শৈবলিনীর চড়া গলা কানে গেলো দীপ্তেনের এবং

জয়ার কথাও। দোতলা ওঠার সিঁড়ির শুরু হয়েছে মেইন দরজার অর্থাৎ বড় দরজার ডানদিক থেকে। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রশস্ত করিডোর পার হ'লে তবে মিলবে ড্রইংরুমের দাক্ষণ্যান বরাবর এসে সেন্টার টেবিলের ওপর মিলবে ওর লাইটার।

বিষয়বস্তু এবং নিজের নামটা কানে যাওয়াতে দীপ্তেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলো। ভাবলো, কথাটা শেষ হোক। তারপর ছুতো ঘষে শব্দ তুলে ও ভেতরে ঢুকবে। কিন্তু, মা-মেয়ের কথাও শেষ হয়না ওর ও সংকট কাটেনা। তারপর, কথা শুনতে শুনতে কিছুটা বোধ হয় আত্মবিস্মৃতই হয়েছিলো দীপ্তেন। চমক ভাংলো জয়ার নেমে আসার পায়ের শব্দে। এমন বিপদে দীপ্তেন জীবনে পড়েনি। বাড়ানো পাটাকে টেনে এনে প্রায় লাফিয়ে পড়লো ক্যাবুটারের ঝোপের পেছনে।

জয়ার হাঁটার দ্রুততা দেখে নিজের মনে হাসলো একটু। তারপর বেরিয়ে এলো ঝোপের পেছন থেকে। লাইটার নিতে ভেতরে আর ঢুকলোনা। কী যেন ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে রাস্তার মোড়ে রেখার কাছে চলে এলো। "বাব্বা! আপনি দেখছি কেমাল বুড়ি তিনটিকেও হার মানালেন—" কলস্বনে হেসে উঠলো রেখা।

অন্যমনস্ক হলো দীপ্তেন। রেখার দিকে তাকালো।

সজ্ঞানে কোনো মেয়ে এমন ক'রে সাজতে পারে নাকি!—দীপ্তেন চোখ নাচিয়ে জোর ক'রে একটু হাসলো, "বিখ্যাত বুড়ি তিনজন কারা? চিনলাম না তো?"

"ম্যালে চলুন, দেখিয়ে দেবো'খন তাঁদের—ইয়া পেট মোটা বুড়ি—থুথুড়ি তিনজন পাঞ্জাবিনী রোজ একটিবার ক'রে 'হ্যান্ডাল পয়েন্ট'টা চক্কর দেন। ঐ রাস্তাটুকু দেখেছেন তো,—ঐ ক'কাল'ং হাঁটতেই ভদ্রমহিলাদের ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে—" আর এক ঝলক হেসে উঠলো রেখা।

"নাকি?" দুচোখে কৌতুক ফোটালো দীপ্তেন, "কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য তাঁদের সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য আজ আর আমার হলোনা। চলুন এবার বাড়ি ফেরা যাক—"

"সেকি!" শুধু বিস্ময় নয় খসখসে অমসৃণ সুর বা'র হলো রেখার গলা দিয়ে।

"বড্ড মাথা ধরেছে—"

"আপনারও মাথা ধরলো?" ভ্রুকুটি ক'রে—টানা টানা চোখে তাকালো রেখা দীপ্তেনের মুখের দিকে।

"আপনার বন্ধু জয়াদেবীকে আপনার কেমন লাগে?" বাড়ি ফেরার পথে রেখাকে দীপ্তেনের প্রশ্ন।

"হঠাৎ এ প্রশ্ন?" তেরছা চোখে রেখা দীপ্তেনের দিকে তাকালো। ভ্রুকুটোর মাঝখানে ছোট একটা আলপিনের মতো ভাঁজ পড়লো রেখার। "না, মানে—ওঁকে আমার যেন কেমন, মানে—ঠিক নর্মাল ব'লে মনে হয় না…"

রেখা সুন্দর দাঁত বেখিয়ে মিষ্টি ক'রে হাসলো।

পাখার ঝাপটায় চারদিক সচকিত ক'রে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো একদল তিতির। দীপ্তেন চোখ তুলে তাকালো, চোখ নামিয়ে বললো "কৈ জবাব দিলেন না তো?"

আঙুল দিয়ে আলতো কপাল ছুয়ে চুলের কার্লগুলি ঠিক করতে করতে রেখা লঘু গলায় বললো, "আপনি ধরেছেন ঠিকই। ধনীকন্যেরা যেমন হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ.—সেইরকম আরকি—"

"কিরকম?" জয়ার বিরুদ্ধ সমালোচনা খুব যেন তারিয়ে উপভোগ করছে—দীপ্তেনের কণ্ঠস্বরে এবং

চোখের মুখের চেহারায় তা ফুটে উঠলো। রেখার কপাল মন্থন। শরীর লালিত্যের ছোট্ট একটা ঢেউ ভাংলো। "মানে, ওর মর্জিরও অন্ত নেই, ঢেউয়েরও অন্ত নেই—"

"খুব জেদী বুঝি?" শেষের ওপর জোর দিলো দীপ্তেন।

"জেদী মানে অসম্ভব জেদী। জয়ার সেদের পরিচয় আর দিন দুয়েক থাকলেই আপনি টের পাবেন।"

"আর মর্জি?"

রেখার ঠোঁটের ভঙ্গিটা প্রখর হলো, বললো, "মর্জি কী জয়ার একটা, লাখোটা···ধনীকন্যের মর্জী—তাই সবই মানিয়ে যায়। এই, ওর লেখার কথাই ধরুন না কেন, কিছুদিন ধরে খেয়াল চেপেছে—লেখিকা হবো, মাথা নেই মুণ্ডু নেই যা মনে আসছে, তাই লিখে চলেছে সমানে···"

"জয়াদেবী লেখেন নাকি?—" হঠাৎ দীপ্তেনের কণ্ঠ ঘিরে সম্ভ্রমের সুর বেরিয়ে এলো।

"লেখে মানে গুচ্ছের ছাই পাঁশ লেখে—" রেখার স্বর তপ্ত, "ওকে আর যা কিছু বলুন সাহিত্য বলা চলে না। সবই বড় মানুষি—মর্জী, বুঝলেন। তবু—" দীপ্তেন মুহূর্ত দুই তিন নির্নিমেষ রেখার মুখের দিকে তাকালো। কেন যে ওর রেখার মুখের চেহারা ভাল ক'রে দেখতে ইচ্ছে হলো কে জানে।

"···তবু ঐ ছাই পাঁশ রচনা পড়েই অনেকে বাহবা বাহবা দিচ্ছে। সাহিত্য হলো মানুষের মনের খোরাক, মনকে—"

"এই যে আমরা এসে পড়েছি···, খুব খুশি হলেম আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে। আপনি অনেক পরিণত অনেক···; এই যে মাসীমা! আপনি কোথাও যাচ্ছেন নাকি?" গেটের ভেতরে ঢুকতেই শৈবলিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ওদের।

শৈবলিনী স্মিতমুখে বললেন, "না, কোথাও যাচ্ছিনা। জয়াকে খুঁজছিলাম—, তা তুমি এসে পড়েছো ভালই হয়েছে···" রেখার দিকে তাকালেন, "এসো তো আমাকে একটু সাহায্য করবে।···দীপ্তেন। তোমাকে এক কাপ কফি—"

"না মাসীমা—" দীপ্তেন হাসিমুখে বললো, "কফি টফি এখন আর কিছু না, বিকেলে বেস্তী-টি খাওয়া হয়েছে, এখন আমি স্রেফ শুয়ে থাকবো, শুয়ে শুয়ে আজকের কাগজটা পড়বো।"

"তা বেশ, তা বেশ—" শৈবলিনী খুশিমুখে রেখাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

দীপ্তেন শোবার ঘরে এলো বটে কিন্তু শুলোনা। বসে রইলো। বেলাম দিয়ে বয় কাগজখানা রেখে গেল। কাগজ ঐ ভাবেই অনাদৃত হয়ে পড়ে রইলো। কপালে ছোটো বড় অনেক খাঁজ ফেলে কী যেন ভাবছে দীপ্তেন। যা ভাবছে তা যেন নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। উঠে দাঁড়ালো। হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে এলো। আবার ফিরে গেলো। জানলার কাছে এলো। এ জানলা থেকে ও জানলা। তারপর একেবারে পাশের জানলা। জানলার কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকালো। বাইরে তখন কুয়াশা। এরই মধ্যে ঘন মেঘের কুয়াশা পরতে পরতে নেমে এসেছে। কিছু দেখা যাচ্ছেনা। পাইন বন, চালু উপত্যকা, উইপিং-উইলোর ঝটলা সব কিছুর ওপরে কুয়াশার আস্তরণ! এক ঝলক বাতাস ঢুকলো। বাতাস বৃষ্টির গন্ধ। —এই কুয়াশায় জয়া বাইরে—দীপ্তেনের অবচেতন মন বললো।

এরপর দীপ্তেনের কী যে হলো, দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা চলে এলো জয়ার পড়ার ঘরের সামনে। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকার মুখে এক মুহূর্ত ইতস্তত: করলো কী করলো না ঢুকে পড়লো। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি

ফেললো। সুন্দর শ্রীমন্ত ঘর। অনেক বই, অনেক খাতা আর অনেক লাইলাকে ভরা একটা চেপ্টা পর্সিলনের ফুলদানী টেবিলের ওপর। দীপ্তেন এসে টেবিল ঘেঁষে দাঁড়ালো। দাঁড়ানো বইগুলো দু আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নামগুলো একটু পড়লো। খাতার পাতা উল্টে উল্টে ওপর ওপর একটু দেখলো।—না, সবই কলেজের নোটস-এর খাতা। কোনো গল্প বা কোনো রচনার খাতা কোনোটা নয়।

দীপ্তেনের কাঁধে দুঃসাহসের ভূত চেপেছে।

দুয়ার খুললো। অনেকগুলি লম্বা আকারের খাতা পরপর সাজানো। ওপরের খাতাটা টেনে বার করলো। খাতার ভেতর থেকে ঠক্ ক'রে কী যেন একটা পড়ে গেলো। তাকালো দীপ্তেন। দেখলো, একটা ছোট্ট গোল প্লাসটিকের কৌটোর মুখ খুলে গেছে আর তার ভেতর থেকে দুটো মেরজাপ বেরিয়ে পড়েছে। মেরজাপ দুটো কৌটোয় রেখে ঢাকনি এটে দুয়ারের একপাশে রেখে দিলো। লম্বা খাতার প্রথম পাতা ওল্টালো। চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো দীপ্তেনের। এক লাইন পড়েই নিজের মনে দীপ্তেন হেসে উঠলো। তারপর দ্রুত প'ড়ে চললো—

: কে কা'র সঙ্গে প্রেম করবে ঠিক হয়ে গেলো।…

গোলগাল ফর্সা মেয়েটির ওপর ছিপছিপে কালো ছেলেটির লোভ ছিলো। কিন্তু, তাতে কী হবে, ক্লাবের সেক্রেটারী অম্বিকাবাবু ঠিক করেছেন ফর্সা মেয়েটির সঙ্গে বার্ধাশেলের ছেলেটির মানাবে। তাছাড়া, বার্ধাশেলের ছেলেটির গানের গলা ভাল—মেয়েটি নৃত্য-গীত পটীয়সী, দুজনের অনেক মিল। সুতরাং কালো ছেলেটির ভাগ্যে জুটলো কালো চাষা-অফিসে কাজকরা চোয়াল জাগানো মেয়েটি। সবাই বেশ খুশিই হলো শেষ পর্যন্ত।

বাছা বাছা রবীন্দ্র সংগীত হলো, প্রেমিক প্রেমিকাদের মধ্যে কে একজন সুন্দর গল্প বলতে পারেন, তাতে একটি অনুবাদ গল্প এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের ব'লে চালিয়ে দিলেন। সবশেষে অম্বিকাবাবু, সেই ছোটো ছোটো চুলের লম্বা ভদ্রলোকটি খুব গম্ভীর ভাবে সভাপতির ভাষণ দিলেন। বলতে শুরু ক'রে দেখলেন, পাশে বসা মেয়েটির চকচকে চিবুকে যেন হাজার পাওয়ারের আলো ঝল্ ঝল্ করছে—বুকের ভেতরটা কেমন হু হু ক'রে উঠলো, কিন্তু তিনি ঘুঘিয়ার লোক, উনপঞ্চাশ বছরের জীবনে বহু বাঘ ও গরুকে একত্রিত করেছেন মুহূর্তের বিকারে তিনি বিচলিত হন না, ঠোঁটটা চুচোলো ক'রে কোনো একটা বিষয় নিয়ে শুরু করলেই তিনি অবলীলাক্রমে তার শেষঘাটে পৌছোতে পারেন। হয়তো দালাইলামা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কোনো না কোনো সূত্রে গগ্যাঁর ছবিতে গিয়ে হাজির হবেন। কিংবা পদ্মিনী নারীর বর্ণনা করতে করতে একবার ছোট্ট ক'রে পৃথিবীর ইতিহাসটা জানিয়ে দেবেন।

কিন্তু কোনো একটা বিষয় প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে গেলে আর একটা বিষয় তো জানতে হবেই, তাছাড়া, অম্বিকাবাবু কলাকুশলী বিদগ্ধ লোক—সব বিষয়ে জ্ঞানদান করা তাঁর সহজাত প্রকৃতি। সুতরাং, একটু চোক গিলে, তিনি তার বক্তব্য শুরু করলেন,—এই যে আমরা—ব'লে একটু থামলেন।

সমস্ত ঘরটায় তার পড়ো ফাঁকটুকু গুঞ্জনে ভ'রে গেলো।

সবাই ভাবলো,—সত্যিই তো, এই যে আমরা—

কেউ তো এমনভাবে এই কথাটা আগে বলেননি। কত সহজ অথচ কত অপূর্ব।

'এই যে আমরা, এক নতুনভাবে জীবন সাজাতে এসেছি—'

এর পরে আর কোনো গুঞ্জন উঠলো না। তারপরের মিনিট পনেরো ওরা তন্ময় হ'য়ে ব'সে রইলো।

মেয়েরা একটু খোঁপা চাপড়ালো। যাদের বেণী ছিলো তারা একটু হিন্দোলিত হলো, ছেলেরা কৃতার্থ কৃতার্থ অন্যমনস্কভাবে গালে হাত বুলোলো।

ইতিমধ্যে এক পশলা লঘুবৃষ্টি হ'য়ে গেলো।

রজনীগন্ধা, সদ্যোনির্বাচিত প্রেমিকযুগল, বাইরে নরম বৃষ্টি—"

অদূরে হাল্কা অথচ দ্রুতপায়ের শব্দ শোনা গেলো, ঝপাস্ ক'রে খাতা বন্ধ ক'রে খাতাটা কোনোমতে দুয়ারে চুকিয়ে দোতলার করিডোরে বার হতেই মায়ার সঙ্গে দীপ্তেনের মুখোমুখি।

"দীপ্তেনদা, শিগ্‌গির আসুন, মা আপনাকে একটিবার ডাকছেন—"

হঠাৎ ধরা-পড়ে-যাওয়া মুখের ভাবটা সামলাতে সামলাতে দীপ্তেন বললো, "এত জোর তলব যে, কী ব্যাপার?"

"ম্যাজিক…" মায়া হেসে উঠলো।

—সেরেছে—দীপ্তেন মনে মনে নিজেকে মুখ ভেংচালো, —খুব ওস্তাদি দেখাতে যাও, এমন গল্পটা পড়া বাদ দিয়ে—যাও এখন শৈবলিনীর সামনে সামিল হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ম্যাজিক দেখাও গে……

মায়ার পিছু পিছু দীপ্তেন দোতলার বড় হলঘরে গিয়ে ঢুকলো।

একমুখ হেসে শৈবলিনী অভ্যর্থনা করলেন, "এসো দীপ্তেন, এসো, বসো, মাথাধরা কী আছে এখনো?"

দীপ্তেন সুস্মিত মুখে ঘাড় নাড়লো।

"তোমার যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে দুএকটা ম্যাজিক যদি আমাদের দেখাও…"

হঠাৎ রেখার দিকে চোখ পড়লো দীপ্তেনের, ভারি কৌতুক বোধ করলো।

এক বাণ্ডিল জটপাকানো উল রেখার সামনে। মুখের চেহারা ভরমুজের মতো গোল ক'রে রেখা জট ছাড়াচ্ছে।

হাসি গিলে দীপ্তেন মায়ার দিকে তাকিয়ে বললো, "এক প্যাকেট তাস আনো তো? ছায়া কোথায়? তাকে দেখছিনে?"

"ছোড়দি এখুনি আসবে—খাতা বই গুছিয়ে রেখে আসছে…"

মায়া তাস আনতে যাচ্ছিলো, দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে বললো, "মা, দিদি আসছে—"

শৈবলিনী উচ্ছ্বল হ'য়ে উঠলেন, বললেন, "তাহলে এখন ম্যাজিক থাক, তুমি সেতার বাজনাই আজ শোনা যাক্ তাহলে—মায়া, চট ক'রে দিদির সেতারটা নিয়ে আয় তো—"

মায়া চলে গেলো।

"এই বেশ ভাল হলো—"সত্যিকার খুশির সুর বাজলো দীপ্তেনের গলায়, ম্যাজিক দেখানোর মুড ওর এখন আদৌ ছিল না।

শৈবলিনী এক মুহূর্ত কি ভাবলেন, তারপর দীপ্তেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি বরং অয়ানকে একটু বাজাতে বলো দীপ্তেন, আমার কথায় হয়তো—" শৈবলিনী থেমে গেলেন। অয়ান ঘরে ঢুকলো। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গে সেতার হাতে মায়া ঢুকলো।

"এই যে অয়ানদেবী, আসুন…" দীপ্তেন সপ্রতিভ আহ্বান জানালো, "আপনার সেতার বাজনা শুনবো ব'লে আমরা সকলে ব'সে আছি—"

একটু যেন হকচকিয়ে গেলো জয়া। একে একে সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মায়ার হাত থেকে সেতারটা নিলো।

সোফার পিঠে সেটা ঠেস দিয়ে রেখে জয়া ধপ্ ক'রে সোফায় ব'সে পড়লো, "দীপ্তেনবাবু। আপনি ফুল ভালবাসেন?" তারপর মা'র দিকে তাকালো, "জানো মা, প্রেমাদের বাড়িতে হিমালয়ান-লিলি যা একখানা ফুটেছে—ওয়াণ্ডারফুল। চলুন দীপ্তেনবাবু, আপনাকে আর রেখাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি—"

দীপ্তেন নিরীহ মুখে বললো, "আমি ফুলও ভালবাসি, বাজনাও ভালবাসি। এখন আমরা বাজনা শুনি, কাল সকালে হিমালয়ান লিলি দেখে আসবো—"

"সকালে কী আর ঐশ্বর্যময়ী লাগবে চাঁদের আলোয় যেমনটি লাগছে…" জয়া বললো।

"কালকেও রাত্রি আসবে—" দীপ্তেনের মুখের চেহারা আরো নিরীহ। আর আপত্তি করা কী করে আর চলতে পারে! অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে তা আর চলে না। মনে মনে মায়ের ওপর বেজায় চটলো জয়া। মাই যে দীপ্তেনকে এ বিষয়ে উস্কে দিয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

"যাই, মেরজাপটা নিয়ে আসি—"জয়া উঠে চলে গেলো। আর তার দুমিনিট পরেই ফিরে এসে মুখের ভাব বিষণ্ণ ক'রে বললো, "দুঃখিত দীপ্তেন বাবু, আপনাকে আজ বাজনা শোনাতে পারলাম না। দুটো মেরজাপের একটাও খুঁজে পাচ্ছিনে—"

তারপর এ ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেবার জন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গগলায় বললো, "ওমা রেখা! তুই এই বেজাল কাজ নিয়ে বসেছিস কেন?' রেখার সামনে এসে নীচু হ'য়ে সমস্ত ছাড়ানো উল আর জটপাকানো উল একসঙ্গে জলা পাকিয়ে নিয়ে ম্যাণ্টলপীসের এক কোণায় রেখে দিল, "মা'র যেমন কাণ্ড! ওষ্টেই অফ টাইম এ্যাণ্ড ওয়েই অফ এনার্জি…"জয়ার কাছ থেকে দীপ্তেন এইরকম কিছু একটা জবাবই আশা করছিলো। তাই অবাক হলো না। কিন্তু ওকে ছুটীমীতে পেয়ে বসলো। মুহূর্ত দুই কৌতুক চোখে জয়ার দিকে তাকিয়ে তারপর উঠে দাঁড়ালো, "দুটো মেরজাপ আমি যেন কোথায় প'ড়ে থাকতে দেখেছি—" আচ্ছা আমি দেখছি,—হলঘর থেকে বেরিয়ে গেল দীপ্তেন।

জয়া ঘাবড়ে গেলো বেশ। মেরজাপ দুটো ও তো কৌটোয় বন্ধ করে দুয়ারের ঘরো খাতার ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছে, তবে বাইরে এলো কী ক'রে? তবে কী ওরই অসাবধানে খাতা থেকে মেঝেতে পড়েছে—আর সিকদীটা যা একখানা পরতান, নিশ্চই মুখে করে বাইরে এনে ফেলেছে। কিছুই আশ্চর্য নেই।

জয়া আর ব'সে থাকতে পারলো না। উঠলো। পায়ে পায়ে চলে এলো।

ক্ষিপ্রহাতে দুয়ার খুলে প্লাসটিকের কৌটো নিয়ে জয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দীপ্তেন। নিজের আশ্চর্য সাহসকে নিজেই যেন ও পিঠ চাপড়ে তারিফ দিয়ে যাচ্ছে। করিডোরে পা দিতেই জয়ার সঙ্গে দেখা। "মেরজাপ পেয়েছেন নাকি?" জয়ার চোখে অকণ্ঠ উৎকণ্ঠা।

"পেয়েছি—" দীপ্তেনের চোখে নিরীহ কৌতুক। হাতের মুঠি খুলে প্লাসটিকের গোল কৌটাটা দেখালো।

"ওহ্—ন…"অত নিজের ঘরে ঢুকে আহ্বান করলো জয়া। দীপ্তেন ভেতরে এলো, জয়া হাত বাড়ালো, "দেখি কৌটোটা—"

দীপ্তেন জয়ার হাতে কৌটোটা দিয়ে দিলো।

"আপনি কিন্তু মাকে বলতে পারবেন না যে মেরজাপ দুটো পাওয়া গেছে—"

"কেন ?"

"আমার ভাল লাগে না—"

"কী ভালো লাগে না ? সেতার বাজাতে না আমাকে শোনাতে ?" দীপ্তেনের চোখে দুষ্টু হাসি।

জয়া চুপ। নিজের ঠোঁটের বাঁ কোণটা দাঁত দিয়ে চাপলো।

দীপ্তেন এর উত্তর আশা করেনি। বললো, "আপনার সঙ্গে আমার দু-একটা কথা আছে। অনুমতি করেন তো নিবেদন করি…" দীপ্তেনের কথার ভঙ্গীতে জয়া হেসে ফেললো, "বলুন—" এতক্ষণে জয়া বেশ স্বস্তি বোধ করলো। ঘরের একমাত্র চেয়ারটা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে বললো, "বসুন দীপ্তেন বাবু—"

"না, এই ঠিক আছে—" টেবিলের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলো জয়া। দীপ্তেন আর এককোণে এসে দাঁড়ালো, "আপনাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখবো না—" এক মুহূর্ত বিরতি, "আচ্ছা, মাসীমা মানে আপনার মা আমাকে এখানে নেমন্তন্ন ক'রে এনেছেন—জানেন ?" হঠাৎ এ কথায় জয়া খুব অবাক হলো। বললো, "জানি।"

দীপ্তেনের চোখে আবার সেই দুষ্টু হাসি।

"তেরশ, মাইল দূর থেকে কেন আমাকে এই নিমন্ত্রণ—তা জানেন ?"

জয়া লাল হলো। ওর ঘাড়-কান-গলা একসঙ্গে গরম হয়ে উঠলো। মার ওপর অভিমানে ভারি হ'তে লাগলো মনের ভেতরটা।

"মাপ করবেন জয়া দেবী—" দীপ্তেন বললো, "আপনাকে অনর্থক বিব্রত করলাম, এর জবাব চাইনে—কিন্তু আপনাকে শুধু আর একটি প্রশ্ন করব।"

জয়া সামলেছে। বললো, "বেশতো করুন না—"

"ঠিক জবাব দেবেন তো ?"

"জবাব যদি দি, ঠিক জবাবই দেবো।"

দীপ্তেন তার প্রশ্নটা মনে মনে একটু ঝরঝরা দিয়ে নিলো। তবু কোথায় যেন একটি দ্বিধা। জয়াকে বিস্মিত-আয়ত-সপ্রশ্ন চোখে তাকাতে দেখে ওর সেই দুঃসাহসের ভূতটা তড়াক্ ক'রে আবার কাঁধে চেপে বসলো। অনায়াসে বলতে পারলো, "আপনার মন কী অন্য কোথাও বাঁধা পড়েছে জয়া দেবী ?"

"মন বাঁধা পড়েছে—তার মানে ?" অবারিত হেসে উঠলো জয়া।

"মানে বোঝা কী খুব শক্ত ?"

"অত্যন্ত।"

দীপ্তেন জয়ার চোখের ভেতর তাকালো। এক আকাশ সাদা সেখানে। হেসে হেসে প্রশ্নটাকে আর একটু প্রাঞ্জল করলো দীপ্তেন, "মানে, আপনার মনের-ঘরে কারো স্থায়ী আসন পাতা নাই তো ?"

জয়ার আবার সেই হাসি। দীপ্তেনের কথায় শুধু কৌতুক নয়, যেন অনেকখানি মজা পাচ্ছে ও। হাসি থামিয়ে বললো, "আমার মনে কোনো ঘর টরই নেই—

"নেই তো ! তবে আর—" কথা শেষ না করে জোরে একটা নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেললো দীপ্তেন। নিজের টেবিলের কোণা ছেড়ে জয়ার সামনে এসে দাঁড়ালো। খুব সামনে। এত সামনে যে দীপ্তেনের নিঃশ্বাস জয়ার গায়ে এসে লাগলো। জয়া অবাক হবার আগেই হাত বাড়িয়ে জয়ার একখানি হাত মুঠিতে তুলে নিলো দীপ্তেন। গাঢ় গলায় বললো, "আমার ভালবাসা দিয়ে তোমার মনে আমার আসন পাতবো—পারবো না জয়া ?"

—একেই কী পৌরুষ বলে ! বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে—যার কাছে চিরকাল মেয়েরা নিজেদেরকে বিকিয়ে বসে ! কী সাহস এই ভদ্রলোকের। শুধু সাহস নয় স্পর্ধা—। কিন্তু…, না, কিছু না…। এসব

লঘুতাকে লেশমাত্র প্রশ্রয় দেয়া চলে না।—নিজেকে প্রাণপণে শক্ত করলো জয়া। দীপ্তেনের স্পর্শটা ছাড়িয়ে নিলো।

"আপনাকে ভালমানুষ ভেবেছিলাম, এসব আপনি কী বলছেন…"

"না, মানুষ আমি মোটেই ভাল নয়—অত্যন্ত খারাপ। একগুঁয়ে, জেদী, মর্জিমাফিক। যা চাই তা না নিয়ে কিছুতেই ছাড়িনে…"

জয়া হেসে ফেললো। ওর হৃদয়ের আধারে এক বিচিত্র অনুভূতির আলোড়ন।

"উত্তর মিলবে না—?" দীপ্তেন জয়ার চোখে চোখ রাখলো।

শঙ্কিত জয়া থেমে থেমে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, "আপনি জানেন না কী মস্ত ভুল আপনি করতে চলেছেন। এর জন্য—"

কথা শেষ হ'তে দিলোনা দীপ্তেন। দুহাত বাড়িয়ে আবার জয়ার হাতখানি টেনে নিলো। হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে জোরে চেপে ধরলো হাতখানি।

"জয়া।…" দীপ্তেনের কণ্ঠস্বর গাঢ়,"পৃথিবীতে এমন মূর্খ কে আছে যে নীলকান্তমণি পেয়েও হারাতে চাইবে?"

ব্রীড়াবনতা জয়া দীপ্তেনের চোখের ভেতর শুধু তাকিয়ে রইলো। নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো। কিছু বলার নেই বলে নয়—মানুষের জীবনে এমন এক একটি মুহূর্ত আসে, যখন কিছু না বলাই অনেক কথা বলা।

দীপ্তেন মৃদু আকর্ষণ ক'রে ছেড়ে দিলো জয়াকে।

"চলো, আমরা হলঘরে যাই—"

"চলুন—"

"চলুন নয় চলো—"

জয়া লাজুক হাসলো। ওর কুমারী হৃদয়ে একটা আশ্চর্য ভালো লাগার—ঢেউ। অস্ফুটে বললো, "চলো—"

সহাস্যে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দুজনে।

সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠাপ্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়।

মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহ মুক্ত মনকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকল প্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে —এখন—কি—না আসতে ও পারে—কিন্তু যোগ্যতা লাভের কথা সর্বাগ্রে।

রবীন্দ্রনাথ

স্বর্ণ-ভূষণা ভারতী

(১৩১৫—১৩২১)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১৩১৪ সালের 'ভারতী' আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত আমি কোনোমতে বার করলুম মাঘ মাসের শেষে—, তারপর বহু অনুনয়-বিনয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীকে ধরে তাঁকে দিয়ে নেওয়ালুম ভারতী-সম্পাদনার ভার। তিনি খুব আপত্তি জানিয়েছিলেন,—বলেছিলেন, অনেককাল এ কাজ ত্যাগ করেছেন,—পাঠক পাঠিকার রুচি কত বদলে গিয়েছে ইত্যাদি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতী রক্ষা করবার জন্ত তিনি নিলেন সম্পাদনার ভার। আমাকে তিনি করলেন তাঁর 'লেফটেনাণ্ট' অর্থাৎ প্রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে 'ভারতী'র জন্ত রচনা সংগ্রহের লেখার এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩১৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশের তোড়জোড় চলতে লাগলো ১৩১৪ সালের ফাল্গুন মাস থেকে। তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে রচনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেন, তাঁর চিঠি নিয়ে আমি পণ্ডিত সতীশ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করলুম প্রবন্ধ সংগ্রহের জন্ত। ১৩১৫ সালের বৈশাখ সংখ্যার জন্ত পাওয়া গেল সতীশ বিদ্যাভূষণের প্রবন্ধ বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়; অবনীন্দ্রনাথের রাজপুতানার কাহিনী অরিসিংহ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন ফেলিসিয়া হাঁসের ফরাসী থেকে অনুবাদ প্রবন্ধ আধুনিক জাপান; রবীন্দ্রনাথ এবং ইন্দিরা দেবী দিলেন দুটি কবিতা। তাছাড়া মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প, প্রিয়ম্বদা দেবীর এবং আমার কবিতা; ধর্মানন্দ মহাভারতীর প্রবন্ধ ডাকের সৃষ্টিকথা। এই সংখ্যা ভারতীতেই দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'বাঙ্গালার নীতিকথা' বেরুতে সুরু করলো।

রিক্তভূষণা 'ভারতী' বৈশাখ থেকে স্বর্ণ-ভূষণা রূপে লোক-লোচনের সম্মুখে আবির্ভূতা হলো। বৈশাখের ভারতী বেরুলো ১লা বৈশাখ তারিখে।

'প্রবাসী' তখন রচনা এবং চিত্র-সম্পদে বাঙলার মাসিক সাহিত্যে বেশ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে—ক' বছরের অব্যবহায় 'ভারতী'র গ্রাহক-সংখ্যা পাঁচশোর নীচে নেমে গেছে—অথচ এই 'ভারতী'ই মাসিক সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছিল—'ভারতী'র গ্রাহক-সংখ্যা উঠেছিল দেড় হাজারের উপর।

ভারতীর ভার নিয়ে যেভাবে স্বর্ণকুমারী দেবী তার গ্রাহক-সংখ্যা বাড়ালেন—তা দেখে তাঁর বিচক্ষণতা এবং কর্মপটুতায় মুগ্ধ হয়েছিলুম। সরকারী গেজেটিয়ার এবং খ্যাকার্স ডিরেকটরি দেখে বাঙলার বিশিষ্ট অফিসারদের এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তিনি ছাপানো পোষ্টকার্ড পাঠালেন; তাতে লেখা ছিল ভারতীর পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবার ব্যবস্থা হয়েছে, সেই জন্ত গ্রাহক হবার অনুরোধ, চিঠির সঙ্গে সঙ্গে বৈশাখসংখ্যা 'ভারতী' ভি. পি. পোষ্টে পাঠাতে লাগলেন। আমি বলেছিলুম, কেরৎ আসবে, তার জন্ত বহু লোকসান হবে।

স্বর্ণকুমারী দেবী জবাব দিয়েছিলেন—একশোখানার মধ্যে ষাটখানা বড় জোর বিক্রি এলেও চল্লিশ জন গ্রাহক পাবো। তাছাড়া হাতে 'ভারতী' এসে পৌঁছুলে অনেকেই হয়তো ফেরত দিতে কুণ্ঠিত হবেন। ফেরত আসার-দরুণ লোকসান কিছু হলেও এ ছাড়া গ্রাহক-সংখ্যা বাড়ানোর অন্য উপায়ই বা কি আছে।

আশ্চর্য—তাঁর এ কথা মিথ্যা হয়নি। পর-পর তিন চার মাস এইভাবে ভি. পি. পোষ্টে 'ভারতী' পাঠাবার ফলে আশ্বিনের মধ্যেই ভারতীর গ্রাহকসংখ্যা এক হাজারের উপরে উঠলো—তখনো তাঁর নাম দেখে ভি. পি. পাঠানোর বিরাম নেই এবং ১৩১৫ সাল শেষ হবার আগেই ভারতীর গ্রাহক-সংখ্যা দেড় হাজারের উপরে উঠলো।

১৩১৫ সালের ভারতীতে স্বর্ণকুমারী দেবীর চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের 'পথ ও পাথেয়' 'সদুপায়' পূর্ব ও পশ্চিম প্রভৃতি অমর প্রবন্ধাবলী পর পর প্রকাশিত হতে লাগলো, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৫ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর ভারত শিল্পের আলোচনা সুরু করেন—তাঁর লেখা 'কি ও কেন' এবং 'পরিচয়'—এ দুটি প্রবন্ধে তাঁর ভারতশিল্পের আলোচনার সূত্রপাত। তাছাড়া দীনেশচন্দ্র সেন, শশধর রায়, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীতে নিয়মিত লেখা দিতে লাগলেন এবং অচিরে স্বর্ণকুমারী দেবীর পরিচালনায় ভারতী তার পূর্ব গৌরব আবার অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৩১৫ সালের ভারতীর ভার গ্রহণ করে স্বর্ণকুমারী দেবী দেবী ভারতীর উদ্দেশে যে কবিতাটি দিয়ে বৈশাখ সংখ্যা সূচিত করেন, সেটি পড়লে দেবী ভারতীর উপর তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতি কতখানি, তা উপলব্ধি হবে। তিনি লিখেছিলেন—

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ
জীবন চউক ধন্য—
দেহপ্রাণমন হউক পতন
জননি, তোমারি জন্য !
• • •
দাও নব বল, আনো সুমঙ্গল,
হে বরদায়িনি ভারতি,
পুরাতন ব্রত করি উদযাপিত
নবোৎসাহে জ্বালি আরতি !

১৩১৫ সালের ভারতীর আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা—রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবীর গল্প 'মাতা পুত্র'। জানিনা, ও গল্পটি ছাড়া তিনি আর কোনো গল্প লিখে গেছেন কিনা।

এ বছরের ভারতী আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত ভারতবিধির প্রেসে ছাপা হলো ; কার্তিক সংখ্যা থেকে ভারতী ছাপা হতে লাগলো মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নব প্রতিষ্ঠিত কার্তিক প্রেসে।

সম্পাদনাভার নিয়ে বৈশাখের ভারতীতে (১৩১৫) স্বর্ণকুমারী দেবী যে লিখেছিলেন—"দেহ প্রাণ মন হউক পতন, জননি, তোমারি জন্য"—এ শুধু কথার কথা নয়—সত্যই তিনি ভারতীর কাজে দেহ প্রাণ মন সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। সকালে-বৈকালে তাঁর কাছে প্রায় যেতুম "ভারতী"র কাজে ; যখনি গিয়েছি দেখেছি, তিনি রাজ্যের রচনা নিয়ে পড়ছেন—শোধরাচ্ছেন—এক মিনিট যেখিনি তাঁকে বসে থাকতে বা

গল্পগুজব করতে। তিনি ভারতীতে রাজনীতির আলোচনা সুরু করেছিলেন রাজ্যের কথা নামে। সম্পাদকীয় মন্তব্য Notes on all local topics নিজে নোট করে রাখতেন, আমি গেলে আমাকে লিখিত 'নোট' দেখিয়ে নির্দেশ দিতেন—প্রবন্ধাকারে সেগুলি লেখার জন্য। আমি ওঁর নির্দেশমতো 'রাজ্যের কথা' লিখতুম। তাছাড়া যে সব গ্রন্থ আসতো 'ভারতী'তে সমালোচনার জন্য, আমাকে যে সব বই পড়ে সমালোচনা লিখতে হতো। সে সব সমালোচনা ছাপা হতো শ্রীসত্যব্রত শর্মা' ছদ্মনামে। এই সত্যব্রত শর্মা' কে, তা জানতেন শুধু তিনি আর জানতুম আমি এবং মণিলাল। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় তাঁকে বলতেন, সত্যব্রত শর্মা কে? মণিলাল? না, সৌরীন? হেসে তিনি বলতেন—বলবোনা। ওটা trade secret. এবং কখনো তিনি কাকেও সত্যব্রত শর্মার আসল পরিচয় প্রকাশ করে বলেননি। 'ভারতী'র প্রত্যেকটি লেখা তিনি নিজে দেখে মনোনীত করতেন—কোনো রচনার সম্বন্ধে মনে দ্বিধা জাগলে আমাকে না হয় মণিলালকে জিজ্ঞাসা করতেন, তখন আমাদের মিলিত-মনোনয়নে রচনা ছাপা বা ফেরত দেওয়া হতো।

তখন একমাত্র 'প্রবাসী' ছাড়া অন্য কোনো মাসিকে ছবি ছাপা হতোনা। বাড়ীতে আপন-জন অবনীন্দ্রনাথের ছবি, তাঁর ছাত্রদের ছবি, অথচ ভারতীতে তা ছাপা হবেনা কেন? মণিলাল এবং আমি তাঁকে ধরলুম—ছবি ছাপাতে হবে। তিনি রাজী হলেন এবং ১৩১৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে একখানি করে তিনরঙা ছবি ছাপার ব্যবস্থা তিনি করলেন। বৈশাখে ছাপা হলো—অবনীন্দ্রনাথের 'শুকসারি সংবাদ'। আমার লেখা সে চিত্রের ব্যাখ্যা ঐ সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল পাঠক-পাঠিকার মিল্ল উপলব্ধি হবে এজন্য। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি আমার সে চিত্র ব্যাখ্যার উপর টিপ্পনী কেটে ছিলেন তাঁর সাহিত্য পত্রে মাসিক সাহিত্য সমালোচনার স্তম্ভে। তিনি লিখেছিলেন সৌরীন্দ্রমোহনের মতো দিব্যদৃষ্টি না থাকলে কেউ ছবিতে আঁকা পাখীর চোখের দৃষ্টিতে ও ভাব উপলব্ধি করতে পারবে না।

ও-কথা থাক! বলছিলুম ভারতীর কাজে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দেহপ্রাণমন'-পতনের কথা! ১৩১৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায় ভারতীতে তিনি একটি গান লিখেছিলেন। সে গানে তিনি লিখেছিলেন—

"আমি কাহাকেও আর জানিনা ভারতি,
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুরছন্দা, সুখানন্দা,
জানিনা প্রভাত জানিনা সন্ধ্যা—
তোমারি পূজার অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
আমি না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি,
চাহিনা মুক্তি চাহিনা সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ—
তোমারি অমৃত বাণী।

এ ওঁর মনের কতখানি খাঁটি কথা, আমি তার পরিচয় পেয়েছিলুম।

১৩১৬ সালে 'ভারতী'র পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ানো হলো—সেই সঙ্গে রচনা-সমৃদ্ধিও বাড়লো। যে 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস লিখে অনুরূপা দেবী বাঙলার কথা-সাহিত্যে অমর কীর্তি অর্জন করেছেন, সেই 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস ১৩১৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'ভারতীতে' ছাপানো সুরু হয়।

ভারতীর পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধি এবং রচনার বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্য হেতু ১৩১৬ সালে ভারতীর গ্রাহক সংখ্যা দু' হাজার পূর্ণ হয়েছিল। তখনকার দিনে এমন গ্রাহক-সংখ্যা ছিল প্রায় কল্পনার অতীত।

ভারতীর কাজের জন্য একটি পয়সা আমি গ্রহণ করিনি—স্বর্ণকুমারী দেবী বারংবার বলতেন—ভারতীর টাকা দেবার সামর্থ্য হয়েছে—কিছু নাও। আমি কিছুতে রাজী হইনি!

তখন তিনি এক কাজ করলেন—পূজার মরশুমে মণিলালের কার্ত্তিক প্রেসে আমার গল্পগ্রন্থ 'দেকালি' প্রকাশিত হলো আমার নিজের ব্যয়ে। কাগজ-ছাপা প্রভৃতিতে খরচ হয়েছিল প্রায় দেড়শো টাকা স্বর্ণকুমারী দেবী জোর করে এ বিলের টাকা ভারতী থেকে শোধ করেছিলেন। আমি আপত্তি তুললে তিনি বলেছিলেন—আমাকে মায়ের মতো মানো তো—কাজেই মাতৃ-আজ্ঞা বলে আমার এ ব্যবস্থা তোমাকে মানতেই হবে।

তাঁর স্নেহ কতভাবেই না পেয়েছিলুম! তাঁর গৃহে প্রায় রবিবারে এবং রাত্রে ডেকে আমি নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি—তিনি আমার বাড়ীতে এসে নিজে জিজ্ঞাসা করে জানতেন, কি কি খাবার আমি ভালোবাসি। এসব ভেবে তিনি আমার মনের মতো ভোজের ব্যবস্থা করতেন।

এ প্রসঙ্গে মণিলালের কার্ত্তিক প্রেসের কথা বলা প্রয়োজন। কার্ত্তিক প্রেস ছিল ২২ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে—শিবনারায়ণ দাস লেনের মুখে দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড বাড়ী—তার নীচের তলার উত্তরদিককার ঘরে। এ ঘরের সামনে ছিল প্রশস্ত বারান্দা—সন্ধ্যার পূর্বে ঐ বারান্দায় প্রত্যহ চেয়ার পেতে মণিলাল, সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি বসতুম। আমাদের সাহিত্যালোচনাই চলতো বেশী করে, নিজেদের লেখা কবিতা-গল্প এই আসরে পড়া হতো এবং পড়ার পর সকলেই স্বাধীন মত ব্যক্ত করতেন। সে মত বিরুদ্ধ গোছ বা অপ্রিয় হলেও কারো মনে হতো না যে, হিংসাবশে রচনাকে মন্দ বলেছে! আমাদের চারজনের মনে মনে ছিল বিরাট মিল। সত্যেন্দ্রর এবং আমার ছিল থিয়েটার লেখার ঝোঁক—মণিলালেরও ছিল, তবে আমাদের মতো অতটা নয়। চারুচন্দ্র থিয়েটারের নামে নাক বাঁকাতেন। তিনি তখন প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক। তাহলেও কাগজে কাগজে সাধারণতঃ যে যেমাখেমি লেখা যায়, আমাদের কারো মনে তেমন ভাব ছিল না—যার লেখা ভালো লাগতো তা যেমন আমরা স্বীকার করতুম, তেমনি যে লেখা ভালো লাগতো না, তা সে যারই হোক—সে লেখার তারিফ করিনি—এমন তখনকার তরুণ সাহিত্য সমাজ আমাদের চারজনকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতো। সে ব্যঙ্গবিদ্রূপ আমরা গায়ে মাখতুম না। তার কারণ আমাদের অক্ষয় কবচ ছিল রবীন্দ্রনাথের এবং গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের স্নেহ। আমার মনে আছে আমার একটি ছোট গল্প 'নির্বন্ধ' ভারতীতে (১৩১৫) পড়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সৌরীন এ তুমি যেন একটি ছবি এঁকেছো। সেই গল্পের সমালোচনা প্রসঙ্গে সুরেশ সমাজপতি তাঁর সাহিত্য-পত্রে লিখেছিলেন, "সৌরীন্দ্রমোহন এ লিলিপুটিয়ান গল্পে পাঠককে অত্যন্ত ফাঁকি দিয়াছেন।

কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে পেয়েছিলুম নিতান্ত আপনজনের মতো—তাঁরা আমাদের সঙ্গে মিশতেন বন্ধুর মতো। ছোট বড় কত আলোচনাই হতো তাঁদের সঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথের গৃহে গিয়ে দেখতুম তিনি তাঁর ছাত্র নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়ে মেঝেয় বসে ছবি আঁকছেন। ছাত্রদের তুলির লেখার নির্দেশ দিচ্ছেন। ভারত চিত্র কলার মর্মকথা আমাদেরও তিনি বোঝাতে বসতেন—সে-বোঝানোর মধ্যে গুরুগিরির আস্ফালন থাকতো না—আমরা না-বুঝে নানা তর্ক তুলতুম—তিনি ধীরভাবে সব বুঝিয়ে সে-তর্কের মীমাংসা করতেন।

রবীন্দ্রনাথের আজ জগৎজোড়া খ্যাতি—পৃথিবীর মানুষ তাঁকে বুঝেছে, চিনেছে তাই স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র তাঁর জন্মের শতবার্ষিকীর উৎসবে সকলে মাতোয়ারা হয়েছে ; কিন্তু ১৩১৫-১৬ সালে নিজের দেশে তাঁর রচনার কি যা আদর ছিল ! এম- ও, পি-এইচ-ডিরা পর্যন্ত বলতেন, বড়লোকের ছেলে—বখামি না করে কবিতা লেখেন—এই যা ! আমরা তখন তাঁর ছোট গল্পগুলি যাতে জনপ্রিয় হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাঁর কটি ছোট গল্প নাট্যাকারে রূপান্তরিত করে তখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করবার উদ্যোগ করেছিলুম। তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর লেখা মুক্তির উপায় গল্পটি আমি ১৯১১ সালে নাট্যাকারে রূপায়িত করি এবং 'দশচক্র' নামে সে নাট্য-রূপায়ণটি অমৃতলাল বসু তাঁর হ্যারিসন থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেছিলেন। সে 'নাট্যরূপ' রবীন্দ্রনাথ শুধু দেখে দিয়েছিলেন, তা নয়, নাট্যরূপটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে ছেপে প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করে ছিলেন।

১৩১৬ সালে আমার উপন্যাস লেখবার বাসনা হয়, তখন শুধু কবিতা আর ছোট গল্প লিখতুম।

উপন্যাস লেখার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বলেছিলেন—হাতের লেখা পাকাতে হলে লেখা মক্‌শো করতে হয়। এক কাজ করো, সেরা বিদেশী উপন্যাস পড়ে মূল কাহিনীটিকে নিজের ভাষায় লেখো। সাবলীল ভঙ্গীতে লেখবার চেষ্টা করো। বিদেশী উপন্যাসের যে সব ঘটনা বা চরিত্র আমাদের দেশের পাঠক সমাজ ঠিক গ্রহণ করতে পারবে না, তা বাদ দিয়ে মূল কাহিনীটি যদি লেখো, তাতে দোষ হবে না। তবে লাইন ধরে কখনো অনুবাদ করবে না—যেমন করে এখন গল্প লিখছো, তেমনি নিজস্ব ভঙ্গীতে কাহিনীটি লিখবে। এতে শিখতে পারবে উপন্যাসের theme কি করে নানা ঘটনা এবং চরিত্র-সমাবেশে ব্যঞ্জিত করা যায়—এই শিক্ষার দরকার আগে। মূল কাহিনী এবং মূল পাত্রপাত্রীদের ফোটাবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র লিখতে হবে—তাদের নিয়ে বেশী টানাটানি করবে না।

তাঁর এ উপদেশ শিরোধার্য করে আমি প্রথমেই ভিক্টর হুগোর Under Sentence of Death উপন্যাসখানির মর্মানুবাদ করি—সেটি 'বন্দী' নামে ১৩১১ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বর্ণকুমারী দেবীও চাইছিলেন ভারতীতে নূতন নূতন বিষয়ের প্রবর্তন করতে—বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন। তাছাড়া স্বর্ণকুমারী দেবী আর একটি নূতন বিষয়ের প্রবর্তন করলেন—১৩১৬ সালে —সেটি হলো বাঙলার মহিলা লেখিকাদের সম্বন্ধে আলোচনা। এ কাজের ভার তিনি আমার হাতে অর্পণ করলেন। তাঁর নির্দেশে আমি প্রথমে লিখলুম বনলতা রচয়িত্রীর কথা। 'বনলতা' কবিতাগ্রন্থ—তার লেখিকা ছিলেন প্রসন্নময়ী দেবী। প্রসন্নময়ী ছিলেন কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর জননী এবং স্বর্গীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ চৌধুরীর সহোদরা। এ বিভাগের জন্য তারপর আমি লিখেছিলুম পর্যায়ক্রমে—'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রী কামিনী রায়ের কথা, বেণু রচয়িত্রী প্রিয়ম্বদা দেবীর কথা,—'শুভ বিবাহ' রচয়িত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণীর কথা, গিরীন্দ্রমোহিনীর কথা, সরোজকুমারী দেবী, অনঙ্গমোহিনী দেবীর কথা প্রভৃতি—এসব লেখায় তাঁদের জীবনী এবং রচনাবলীর আলোচনাও করেছিলুম।

এযুগে বাঙলার মহিলা লেখিকাদের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, দেখেছি। এ লেখার মূলে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী—সে কথা বোধহয় অনেকে জানেন না এবং প্রকাশিত ঐ একখানি গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লেখক বা প্রকাশক স্বর্ণকুমারী দেবীর নামোল্লেখও করেননি।

ভারতীতে স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গান এবং দুটি গল্প 'রাসমণির ছেলে' ও 'পণরক্ষা' প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া চুনীলাল বসুর নগরীর স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, স্বর্ণকুমারী

দেবীর নানা কবিতা গান গল্প এবং 'রাজকন্যা' নাটিকা প্রকাশিত হয়েছিল; নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনা কালে ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙলা-সাহিত্যে সম্পদস্বরূপ গণ্য বহু রচনা এ সময়ের ভারতীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর ঘরে।

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের নাম বোধ হয় বাঙলার বহু তথাকথিত 'চোখরা-চোখরা' সাহিত্যিক জানেন না। তাঁর বহু কবিতাগ্রন্থ—'পেকালি গুচ্ছ' 'গোলাপ গুচ্ছ' প্রভৃতি আজ বাঙালী বিস্মৃতির অতল জলে ভাসিয়ে দিয়েছে! সেগুলির পুনর্মুদ্রণের কোনো চেষ্টা দেখিনা। দেবেন্দ্রনাথের লেখা একখানি কৌতুক-উপন্যাস 'দস্তকচু' হিরণ্ময়ী দেবী এবং সরলা দেবীর সম্পাদনাকালে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর তাগিদে তিনি ১৩১৯ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতীতে' লিখেছিলেন অপূর্ব একটি কৌতুক গল্প 'স্বামী, লাড্ডু ও পেড়া'। এ গল্পটি কোনো গল্পসঙ্কলনের গ্রন্থে আজো দেখলুম না। কেউ তার সন্ধানও রাখেন না! হাসির গল্প হিসাবে এমন গল্প, বোধহয় রবীন্দ্রনাথের গল্প ছাড়া আর কারো লেখনীতে প্রকাশ পায়নি!

স্বর্ণকুমারী দেবী কত নূতন নূতন লেখক লেখিকাকে উৎসাহ দিয়ে তাঁদের রচনা লেখে শুনে ভারতীতে ছাপিয়েছেন, তার সংখ্যা হয়না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে সাহিত্য-রচনায় কৃতী এবং যশস্বী হয়েছেন। 'সম্পাদক' বলতে যে বেদরদী রুক্ষমূর্তির ছায়া অনেকে মানসচক্ষে দেখেন, 'ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। তাঁর দ্বার যেমন ছিল নূতন পুরাতন সর্বশ্রেণীর লেখকের পক্ষে অবারিত, তেমনি সাহিত্যসেবীদের জন্য তাঁর হৃদয় মমতা স্নেহ ছিল অপরিমিত! এমন হয়েছে, কোনো অক্ষম লেখক এসে ধরাধরি করার জন্য তিনি তার লেখা না পড়ে কথা দিয়েছেন, তোমার লেখা ছাপবো, পরে লেখা পড়ে দেখেছেন ছাপাবার যোগ্য নয়—তখন আমাকে দিয়ে সে-লেখা নূতন করে লিখিয়ে ভারতীতে ছেপেছেন। মণিলাল এবং আমি এ-নিয়ে অনুযোগ জানালে তিনি বলতেন—বেচারী বড্ড ধরেছে—না বলে পারে পর্যন্ত ধরেছিল। আমরা বলতুম, এক্ষেত্রে তাকে খাইয়ে দাইয়ে মাতৃস্নেহ পরিতৃপ্ত করবেন, ভারতীতে লেখা ছাপিয়ে মাতৃস্নেহ দেখাবেন না! আমাদের কথায় তিনি হাসতেন।

তবু বলবো, অসীম পরিশ্রমে এবং ঐকান্তিক মমতা-বাৎসল্যে বহু রচনা ভারতীতে ছেপে লেখককে উৎসাহিত করার স্বভাব তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি।

পূর্বে কার্তিক প্রেসে আমাদের চার-বন্ধুর প্রাত্যহিক মিলনের কথা বলেছি। আমাদের চার-জনের আসরে আরো দুজন সঙ্গী এসে মিলিত হলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আর একজন 'জাপান' লেখক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা ছ'জনে পরমানন্দে সাহিত্যালোচনা করতুম। আমাদের ছজনকে লক্ষ্য করে তখনকার সাহিত্যিকরা বলতেন—ভারতীর দল! এই থেকেই ভারতী-গ্রুপের লেখক কথার সৃষ্টি।

এ আসরে শুধু সাহিত্যালোচনাই হতো না—পণপ্রথা মেয়েদের অবরোধ প্রথা-উচ্ছেদের আলোচনা চলতো—সুরেশচন্দ্র ছিলেন এদিকে সবচেয়ে উৎসাহী·· যাকে বলে, fire-brand. স্ত্রীকে নিয়ে তিনি শুধু ট্রামে বেরুনো নয়—সহরের পথে বেড়াতে বেরুতেন,—তাঁর দেখাদেখি চারুচন্দ্রও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাঝে মাঝে ট্রামে বেরুতে সুরু করলেন। আমরা অতটা অগ্রসর হতে পারিনি,—তবে স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ীর খিড়কি-বন্ধ করে বেরুতুম না—এবং ঠাকুরবাড়ীর (জোড়াসাঁকো) মাঘোৎসবে স্ত্রীকে নিয়ে পর্দার বাহিরেই বসতে লাগলুম। তাছাড়া স্ত্রী পুরুষের সাধারণবিবাহে আমাদের খুব উৎসাহ ছিল।

বাঙলা থিয়েটারের সঙ্গে আমার ছিল যোগ—সত্যেন্দ্র আর আমি কোনো নূতন নাটকের প্রথম অভিনয় রাত্রে ঠিক গিয়ে হাজির হতুম।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে মাঝে মাঝে অভিনয় হতো—গগনবাবু, অবনবাবু থেকে সুরু করে মণিলাল, কনক (গগন বাবুর পুত্র) অলক (অবনীবাবুর বালক পুত্র) প্রভৃতি সে অভিনয়ে নানা ভূমিকায় নামতেন। আমরা সে সব অভিনয় দেখতুম।

গগনেন্দ্রনাথের গৃহে তখন প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে বিলাতী ডাকে 'কনটিনেন্টাল' সাহিত্যের নানা বিভাগীয় গ্রন্থাদি আসতো—তাছাড়া ও বাড়ীতে ছিল বিরাট লাইব্রেরী—আমরা লাইব্রেরী থেকে বেছে বেছে বই এনে পড়তুম—এবং পড়া শেষ হলে সে সব গ্রন্থ সম্বন্ধে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে হতো আমাদের আলোচনা। তাঁরা নিজেরা পড়ে অনেক সময় বই বেছে রাখতেন এবং আমাদের সে সব বই পড়তে দিতেন। এমনি ভাবে আমাদের সাহিত্য ও কলারুচি বিকাশে তাঁরা কতখানি সাহায্য করতেন, তা সহজেই সকলে বুঝবেন।

পূর্বে বলেছি, কার্ত্তিক প্রেসে নিত্য বৈকালে আমরা দু'জনে সমবেত হতুম—বেশ মনে পড়ে, ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাসে একদিন বৈকালে সত্যেন্দ্রনাথ এসে বললেন—১৩১৮ সালের বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে—তাঁর পঞ্চাশত্তম বর্ষের জন্মদিনে বিশেষ উৎসব করতে হবে। এ উৎসব-অনুষ্ঠান করাতে হবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে। তাঁর কথা শুনে আমরা কজনে যেন মেতে উঠলুম। আমাদের তখন কি-বা সামর্থ্য—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে এ বিষয়ে সচেতন করে উৎসবের ব্যবস্থা করবো স্থির হলো। এদিকে একটু মুস্কিল ছিল—ম'নে, রবীন্দ্র-বিরোধী কজন সাহিত্যসেবী মিলে তখন নানা বৈঠকে—নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনার নিন্দা-কুৎসা প্রচারে বিশেষ উৎসাহী এবং উদ্যোগী ছিলেন। বাজারে তাঁদের তখন বেশ প্রতিপত্তি ছিল—আমাদের এ প্রস্তাবে তাঁরা যদি ব্যঙ্গবিদ্রূপ সুরু করেন, জানতুম, রবীন্দ্রনাথ এ অনুষ্ঠান তাহলে করতে দেবেন না। রবীন্দ্রনাথকে এ সম্বন্ধে আমরা কোনো আভাস না দিয়ে নিঃশব্দে গিয়ে দেখা করলুম—সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক প্রাজ্ঞ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে। সাহিত্য পরিষদে তখ তখন প্রাচীন পুঁথির আদর। কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে অনেকেই পুরানো পুঁথি আর শিলাপ্রস্তর নিয়ে বিভোর। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সঙ্গে অনেকের পরিচয়ও ছিল না! আমরা (চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্র দত্ত, মণিলাল, ধীরেন্দ্র দত্ত এবং আমি) গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে দেখা করে এ প্রস্তাবের বিষয় জানালুম। শুনে তিনি, উৎসাহিত হয়ে বললেন,—খুব ভালো প্রস্তাব—তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ—দেশশুদ্ধ সকলের উচিত তাঁর জন্মদিনে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করা—কিন্তু সাহিত্য পরিষদ কোনো জীবিত লেখকের সম্বন্ধে কখনো কিছু করেন নি।

আমরা বললুম—করেন নি বলে করবেন না, এমন আইন নেই। বিশেষ রবীন্দ্রনাথের মতো কবিকে সংবর্দ্ধনা!

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—ব্যক্তিগতভাবে এ প্রস্তাবের আমি সমর্থন করছি—কিন্তু পাঁচজনে আপত্তি তুলে বলবেন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র—তাঁরা বেঁচে থাকতে তাঁদের জন্য কিছু করা হলো না—হঠাৎ আজ রবীন্দ্রনাথের বেলায় পরিষদের মাথাব্যথা হলো কেন!

আমরা বললুম—তাঁদের জন্য কিছু করা হয়নি—সে খুব অন্যায়—আমাদের মস্ত অপরাধ। কিন্তু একবার অপরাধ করেছি বলে বারবার সে অপরাধ করবো।

তিনি বললেন—ঠিক কথা। এ সম্বন্ধে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো—কিন্তু এজন্য অনেক টাকা চাই—সে টাকা কোথা থেকে আসবে? এ কাজ নেহাৎ-নেহাৎ করে করা চলে না।

আমরা বললুম—টাকার ব্যবস্থা আমরা করবো।

পরের দিন বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে আমরা দেখা করলুম—হীরেন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্র শীল প্রভৃতি। এঁরা মহাউৎসাহিত হলেন। সকলেই রাজী। আমরা তখন কাজে নামবার উদ্যোগ করলুম।

কিন্তু কাজে নামবার আগে ঐ বিরোধী বিদ্বেষী দলটিকে বাগানো চাই—তারা আড়ালে ইঁদিতে একটু প্রতিবাদ তুললে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বরণী করাতে পারবো না।

বিরোধীদলের দু'চারজন পাণ্ডা তখন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে খুব মানতেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ আমাদের চেয়ে বয়সে বড়। তিনি তখন ও দলের বহু সাহিত্যিককে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করেন—থাকেন ভবানীপুর ষ্ট্রীটে এবং 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে রাজী করিয়ে মুরুব্বি পাকড়ালুম এবং তাঁকে নিয়ে আমরা গেলুম গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কাছে। তাঁকে এ কথা বলাতে তিনি মোটা টাকা দিতে রাজী হলেন। তারপর চাঁদার খাতা খুলে আমরা ধনী এবং মধ্যবিত্ত বহু সজ্জনের দোরে দোরে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহে লেগে গেলুম।

সাহিত্য পরিষদকে রামেন্দ্রসুন্দর রাজী করালেন। তখন স্থির হলো, এমন short notice-এ ২৩শে বৈশাখ তারিখে এত বড় অনুষ্ঠান সাধিত হতে পারে না—১৩১৮ সালের মাঘ মাসে যেন সমারোহে পরিষদ থেকে কবি সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা হবে। এবং ১৩১৮ সালের ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিকপত্রে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনী ঘোষণা প্রকাশিত হলো।

সংবর্দ্ধনা সমিতি গঠিত হলো। সে সমিতির সদস্য ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রকুমার শীল, সারদাচরণ মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যদুনাথ চৌধুরী, রাধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি।

টাকার অভাব হয়নি—বিরোধী দল হকচকিয়ে গিয়েছিল; এবং ১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারি ১৯১২) কলকাতার টাউন হলে হলো রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা। অত বড় টাউন হল লোকে একেবারে লোকারণ্য।

সে সংবর্দ্ধনার বিবরণ দেবার স্থান এ নয়—এ কথার উত্থাপন করলুম শুধু একাজে আমাদের ক'জন বন্ধুর হাত ছিল কতখানি, তা জানাবার জন্য। আমার এ কথার প্রমাণে এখনো আছেন সাক্ষী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

এবারে একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গের উল্লেখ না করে থাকতে পারছিনা! কারণ এ প্রসঙ্গ থেকে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যরুচি এবং সম্পাদকীয় নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে।

দ্বিজেন্দ্রলালকে কেন্দ্র করে ১৯০৫-১৯০৬ সাল থেকে একটি সাহিত্যচক্র গড়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে স্থানীয় ক'জন সাহিত্যিকের আসর বসতো নিত্য। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন থেকে রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে down করবার চেষ্টায় ওঁর কবিতা, গান immoral—তিনি সাহিত্যে দুর্নীতি প্রচার করছেন এবং সে দুর্নীতির স্রোতে দেশে কিশোর কিশোরীরা উৎসন্নের পথে চলেছে—এমনি কথা লিখতে লাগলেন, লিখলেন তাঁর 'সোনার-তরী' কবিতা সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রেফ কতকগুলি আগড়ম বাগড়ম কথায় ভরা। তাঁর এ রচনা প্রকাশিত হলে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার বিপিনবিহারী গুপ্ত,

প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি সে লেখার প্রতিবাদে বহু প্রবন্ধ লিখে 'সোনার তরী' কবিতার ভাবার্থ বুঝিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছিলেন। তারপর সাহিত্য পত্রে 'কাব্যে দুর্নীতি' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন—সে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' অত্যন্ত vulgar immoral এমনি কথা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানগুলির সম্বন্ধে লিখেছিলেন—সেগুলি আগাগোড়া বৈষ্ণব কবিতা থেকে অপহরণ। আমরা এর প্রতিবাদ লিখে 'ভারতী'তে ছাপাতে চাইলে স্বর্ণকুমারী দেবী তাতে রাজী হননি। তিনি বলেছিলেন, না, নোংরামি বা ব্যক্তিগত গালাগালির এতটুকু সাহিত্যে ছাপবেন না! বাঙলা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলাল; তখন খুব পসার-প্রতিপত্তি। তিনি একখানি নাটিকা লিখলেন—নাটিকার নাম 'আনন্দ-বিদায়'। তাঁর থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন কর্তা। অমরেন্দ্রনাথের হাতে নাটকখানি দিলেন তাঁর থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য। রবীন্দ্রনাথকে অতি হেয়ভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে নাটিকাখানি লেখা—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেন একালের শ্রীকৃষ্ণ—সেকালের শ্রীকৃষ্ণ যেমন বাঁশী বাজিয়ে গোপিনীদের কুলমান 'হরণ' করে ছিলেন, একালের রবীন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণ তেমনি লালসা-উদ্রেককারক অশ্লীল কবিতা আর গান লিখে একালের কিশোর কিশোরীদের 'মাথা খাচ্ছেন'। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে অতি কদর্যভাবে আক্রমণ করা হয়েছে সে-নাটিকায়। যথা সময়ে নাটিকার অভিনয় সুরু হলো, প্রস্তাবনার কোরাস-গানের পর প্রথম দৃশ্য সুরু হলো, কিন্তু পনেরো-কুড়ি মিনিট এ দৃশ্য অভিনয় হবার পর দর্শকরা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে মঞ্চের দিকে চেয়ার ছুড়েই ক্ষান্ত হলেন না—দ্বিজেন্দ্রলাল দোতলার রয়েল বক্সে বন্ধুগণ পরিবৃত হয়ে অভিনয় দেখছিলেন, দর্শকরা তাঁকে রীতিমত গালাগাল এবং একজন একপাটি জুতাও তাঁকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছিল। সে জুতার পাটি দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে, না কাঁধে লেগেছিল। থিয়েটারওয়ালা তখনি এ অভিনয় বন্ধ করে দিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল এ আকস্মিক আক্রমণে মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন। দর্শকের দল চীৎকার করে বলেছিল, তোমার এমন স্পর্দ্ধা, রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে আক্রমণ করো।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে মণিলাল, সত্যেন্দ্রনাথ এবং আমি তিনজনে একটি 'আলোচনা' লিখে স্বর্ণকুমারী দেবীর হাতে দিয়ে বলেছিলুম-ভারতীতে ছাপবার জন্য। তিনি ছাপতে রাজী হননি। আমরা বলেছিলুম—রবীন্দ্রনাথ আপনার ছোট ভাই বলে delicacy বোধ করছেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন—না—রবি আমার ভাই, সে কথা ছেড়ে দাও—তিনি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক—সে-হিসাবে তাঁকে আমি মান্য করি—এবং মান্য করলেও এসব নোংরা কথা নিয়ে ভারতীর পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করতে চাই না।

এ ঘটনা থেকে তাঁর সাহিত্যরুচি, সাহিত্যে নিষ্ঠা এবং সম্পাদকীয় মর্য্যাদাবোধের পরিচয় পাই।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে—বলি। ভারতীতে সমালোচনার জন্য যেসব গ্রন্থ আসে, আমি তার সমালোচনা করি। একখানি উপন্যাস এলো সমালোচনার জন্য—উপন্যাসের লেখক প্রবীণ সাহিত্যিক এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে তিনি তখন দেশে গণ্যমান্য এবং প্রতিপত্তিশীল। উপন্যাসে তিনি ব্রাহ্ম এবং প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের নরনারীর চরিত্রাদি নিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন। প্লট খুবই illogical। তা হলেও হিন্দু সমাজের নরনারীদের অত্যন্ত হেয়রূপে অঙ্কিত করেছেন এবং তাদের প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের নরনারীরা নাক সিঁটকে ঘৃণাভরে বরাবর মন্তব্য করেছেন—ওরা তো এমন হবেই, কারণ ওরা যে হিঁদু। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসের প্রতিপাদ্য ছিল, যারা ব্রাহ্ম নয়—তারা অতি কদাচারী, মিথ্যুটে খল, সবাই—আর ব্রাহ্মসমাজে মানুষগুলি আচারে ব্যবহারের সর্ববিষয়ে আদর্শ স্থানীয়।

এই উপন্যাসটি স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখিয়ে আমি বলেছিলুম—এর নিরপেক্ষ সমালোচনা করতে হলে লেখককে সাবেতা করা প্রয়োজন—এমনিভাবে তিনি দলাদলি আর বিদ্বেষ প্রচার করতে চান। স্বর্ণকুমারী

দেবী ‹উপন্যাসের ঐ সব আপত্তিকর অংশ দেখে আমাকে বললেন, তুমি লেখকের এ ত্রুটি ক্ষমা করোনা—বেশ কড়া কথায় এসব প্রসঙ্গ তুলে সমালোচনা করবে। আরো বললেন, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত হলেও তাঁর এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

সেদিন বুঝেছিলুম সম্পাদকীয় ব্রত পালনে তিনি ছিলেন একদিকে যেমন মৃদু কুসুমাদপি, তেমনি অন্য দিকে বজ্রের মতো কঠিন।

এবার আমার ভারতীর কথা বলছি···ভারতীতে বহু নব নব বিষয়ের প্রবর্ত্তন করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমরগ্রন্থ 'আমার বোম্বাই প্রবাস' এবং 'আমার বাল্যকথা' স্বর্ণকুমারী দেবীর জাগিদেই লেখা এবং ভারতীতে সব প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া বিখ্যাত অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক পঞ্চানন নিয়োগীকে দিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা বাঙলা রচনা লিখিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) নিয়মিতভাবে ভারতীর জন্য লেখা দিয়েছেন—সত্যেন্দ্র দত্তর কবিতা এ যুগের ভারতীর গৌরবস্বরূপ ছিল। সাহিত্যের standard ভারতীর রচনাবলীতে সুধী সমাজের বরণীয় হয়ে উঠেছিল। অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুমাধব মল্লিক, কবি কঙ্কণানিধান, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি ছিলেন ভারতীর নিয়মিত লেখক-লেখিকা। 'চয়নি' বা Gleanings নানা সাহিত্যের ভাবসংগ্রহ—এর প্রবর্ত্তন ভারতীই করেছিল। ভারতীতে সাহিত্য, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি সর্ববিষয়ের রচনাদি প্রকাশিত হতো—তাছাড়া সমাজের যেসব আচার-নীতির সংস্কার দিয়ে—যেমন, বরপণ, লৌকিকতা প্রভৃতি বিষয়ে বহু বিতর্ক আলোচনাও প্রকাশিত হতো। দেশের কথা, রাজ্যের কথা যা প্রকাশিত হতো—তার বিষয়বস্তু স্বর্ণকুমারী দেবী নোট করে বলে দিতেন—আমরা তাঁর সে-সব 'নোট' দেখে সে সব আলোচনা লিখতুম। এর ফলে আমাদের চিন্তা করবার শক্তি জাগ্রত হতো—debate করবার সামর্থ্য লাভ হতো। এমন অনেক বিষয়ে তিনি আমাকে দিয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়েছেন—যা লেখবার কল্পনা দূরে থাকুক, লেখবার সামর্থ সম্বন্ধে আমার মনে দারুণ সংশয় এবং ভয় বিরাজ করতো।

তাঁর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল ছিলেন তখনকার দিনের জাতির গৌরব কংগ্রেস—সেই কংগ্রেসের একজন নৈষ্ঠিক কর্মী; তার উপর সব বিষয়ে তাঁর মন ছিল খুব progressive. জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বহু বিষয়ে তিনি সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন—স্বর্ণকুমারী দেবীর সহিত জানকীবাবুর বিবাহের পর জানকীবাবু আসিয়াই তাঁহার ঘরটি নানাবিধ চৌকি কৌচ কেদারায় অতি পরিপাটিরূপে সজ্জিত করিলেন। তখন তাঁহার অনুকরণে আমাদের অন্তঃপুরের সমস্ত ঘরগুলিরই শ্রী ফিরিল। মোট কথা অন্তঃপুরের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইল—এবং যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। জানকী আমাদের পরিবারে আরও একটি নূতন জিনিষের প্রবর্ত্তন করিলেন—সেটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। অনেকে বোধ হয় জানেন না, রবীন্দ্রনাথ নিজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন—আমরা তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি।

ভারতীর সম্পাদনা কার্য্যে জানকীনাথ ছিলেন স্বর্ণকুমারীর প্রধান পরামর্শদাতা—inspiration, স্বর্ণকুমারী দেবী যখন দেশের কথা, রাজ্যের কথা লেখবার নির্দ্দেশ দিতেন—অনেক সময় জানকীনাথ এসে আমাদের কাছে বসতেন এবং দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু সংবাদ এবং বহু উপদেশ দিতেন।

'ভারতী' বছরে বছরে রচনা সম্ভারে উৎকর্ষ লাভ করছিল—স্বর্ণকুমারী দেবীর পরিশ্রমও হচ্ছিল খুব

দেবী—কাজে কখনো তাঁকে ক্লান্ত দেখিনি। কাজে তাঁর ছিল যেমন অদম্য উৎসাহ, তেমনি আনন্দ। ভারতীর এসময়কার পৃষ্ঠাগুলি দেখলে সকলে বুঝবেন, কত নূতন নূতন লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁর চেষ্টায়।

কিন্তু হঠাৎ অঘটন ঘটলো—জানকীলাল দীর্ঘকাল রোগভোগ করে এই সময় পরলোকগত হলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী একেবারে ভেঙে পড়লেন। তবু ভারতীর ভার হাতে নিয়ে শোকের বাহ্য তুলে তিনি ১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত 'ভারতী' সগৌরবে প্রকাশ করলেন; তারপর সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করে বিদায় গ্রহণে উদ্যোগী হলেন।

১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতী' প্রকাশ করে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন। বিদায়-গ্রহণকালে তিনি লিখেছিলেন,—"সুরুচি সুস্নীল সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্র ও মনের প্রসার বৃদ্ধি করাই ভারতীর প্রধানতম কর্তব্য ছিল,—আর আনুসঙ্গিক একটি কর্তব্য ছিল, নূতন লেখকদিগকে গড়িয়া তোলা।"

এ যুগের কথানা মাসিকের সম্পাদক এমন ভাবে কর্তব্য পালন ক'রেছেন জানিনা! —এখন মাসিক পত্রিকা ব্যবসাদারীতে পরিণত হয়েছে! রচনার শালীনতার দিকে দৃষ্টি হচ্ছে শিথিল—লক্ষণ ভালো নয়! রবীন্দ্রনাথও পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে এমনি ইঙ্গিত করে গিয়েছেন।

সম্পাদকীয় কর্তব্য তিনি কতখানি অন্তর দিয়ে সুচারুরূপে সম্পাদিত করেছিলেন, ১৩১৫ থেকে ১৩২১ সালের ভারতীর পৃষ্ঠায় সে পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। মাসিক সাহিত্যের ইতিহাসে সে পরিচয়ের বিশেষ মূল্য আছে। ১৩২২ সাল থেকে কি করে বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমার হাতে ভারতীর সম্পাদনার ভার এলো, 'ভারতীর আসর' কলাবিভাগের নানা ক্ষেত্রে তার activities প্রসারিত করেছিল, সে আর এক সুদীর্ঘ কাহিনী!

মাইকেল এঞ্জেলো র‍্যাফেলকে একদিন বললেন—"জান র‍্যাফেল, দু'দিন আগে ফ্লোরেন্সের উপকণ্ঠে আমি এমন একজন চিত্রকরের সন্ধান পেয়েছি, যাঁর কাছে আমার অনেক কিছু শেখবার আছে।—হয়ত তোমারও।"

র‍্যাফেল বিস্মিত হয়ে বললেন—"এমন শিল্পী ফ্লোরেন্সে আছে তা' ত জানি না।"

মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে র‍্যাফেল গেলেন ফ্লোরেন্সের উপকণ্ঠে। শিল্পী তখন একমনে তাঁর চিত্রাগারে বসে ছবি আঁকছেন। খবর পেয়ে ছুটে বাইরে এলেন দুই মহাশিল্পীর সামনে।

—"আজ আমার মত নগণ্য ব্যক্তির কি সৌভাগ্য!"—শিল্পী বিনীতভাবে অভিনন্দন জানালেন। তারপর তাঁদের দু'জনকে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

স্তম্ভিত হয়ে এঞ্জেলো আর র‍্যাফেল চেয়ে রইলেন শিল্পীর "সেণ্ট্ জন্ দি ব্যাপটিষ্ট" ছবির দিকে। তারপর অ্যাণ্ড্রিয়া ডেল সার্টোকে বললেন—"বন্ধু, তোমার এ ছবি আমরাও কোনদিন হয়ত আঁকতে পারতাম না।"

বঙ্কিমচন্দ্র

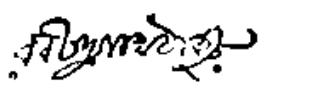

যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলা ভরে লেখে এবং পাঠক অল্প গ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অভ্রান্তমন্ত্রে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মত এমন শুষ্কতার আর কিছুই নাই; তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম তাহা এখনকার সাহিত্য ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন—তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভার বলে যে কার্য্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈল সম্রাটের উদয়রবিরশ্মি সমুজ্জ্বল তুষারমুকুটিত মস্তক চতুর্দ্দিকের নিম্নতরগিরি-পরিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরও কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনও দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন। রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গ সাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত-পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সাহিত্যের পক্ষে যাহা কিছু অযোগ্য, যাহা কিছু অনাবশ্যক,

যাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ পাইত তাহাকে তিনি কদাচ মার্জনা করিতেন না। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি তিনি এমন কঠোর আঘাত এমন সুতীব্র বিদ্রূপ প্রয়োগ করিতেন যে, অনেক সময় তাহা অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হইত;—অনেক সময় মনে হইত এই সকল ক্ষীণজীবিদের প্রতি বঙ্কিমের প্রবল বাহুর আঘাত যথাযোগ্য নহে। বিশেষতঃ তখনও বাঙ্গালা লেখার শৈশব অভ্যাসগুলি দূর হয় নাই। লেখকেরা তখনও বঙ্কিমের নূতন রাজত্বের কঠিন নিয়ম সকল ভালো করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই, সে অবস্থায় সহজেই অনেক ত্রুটী মার্জনা করিয়া দোষকে কম করিয়া দেখিয়া এবং গুণকে বাড়াইয়া তুলিয়া সাধারণতঃ উৎসাহ এবং প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমের রাজত্বও সেরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে নাই। তিনি নির্দ্দয়ভাবে ঠগ বাছিতে গিয়া গাঁ উজাড় করিবার যো করিয়াছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমের এই নিষ্ঠুরতা উচ্চ লক্ষ্য, অটল সংকল্প এবং মহৎ পৌরুষের নিষ্ঠুরতা। বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁহার প্রবল অনুরাগ তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে নির্ম্মমভাবে ছেদন করিয়া ফেলেন। যাঁহার আদর্শ অত্যন্ত উন্নত তাঁহার বিচার অনুরূপ কঠিন। নিজের বাগানের প্রতি যে মালীর যথার্থ অনুরাগ আছে, ছোট-খাট কাঁটা গুল্ম জঙ্গলকে সে তীক্ষ্ণ কোদালি দিয়া সবলে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সকল ক্ষুদ্র তৃণগুল্ম জঙ্গল অনাদরে জন্মে তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, শুধে না ফৌজ সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, তাহার মধ্যে এমন একাকার হইয়া যায় যে নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। তখন ভাল জিনিষ আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণযোগ্য যথেষ্ট রস পায় না, ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসে।

এই কারণে, মন্দ রচনা সাহিত্যের বিচারালয়ে যেরূপ দণ্ড পায় যে রচনা মন্দ নহে, কিন্তু ভালও নহে, যাহাতে কোন ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই কোন সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় নাই তাহাও প্রায় অনুরূপ দণ্ডের যোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। উভয়ের প্রতিই নির্ব্বাসনের আদেশ প্রচার হইয়া থাকে।

জড়তা থেকে মুক্তি দেওয়া, আনন্দ ও ভোগের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলা রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি বিষয়ে, এই হল শিল্পের কাজ। রসভোগের অধিকার শিল্পীর সত্য অধিকার! শিল্পের নানা কৌশল যেমন যেমন অধিকৃত হল, মানবজাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও ভোগাধিকার ও নানা ক্ষমতা অধিকার বিস্তৃত হল, মানব-শিল্পের ইতিহাস এই কথা জানায়। মানব সভ্যতার ইতিহাস এই কথাই বলে। ভাবলোক, রূপলোক, রসলোক এই ত্রিলোকের অধিকার পেতে বিমুখ এমন মানুষ কোথায় আছে!

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশ বিদেশের ব্যঙ্গচিত্র

কার্টুন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। ললিতকলা রসিক এবং ঐতিহাসিক উভয়েই কার্টুনের ইতিবৃত্ত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেন কেরিকেচারের কথা—কোন্ দেশে কবে এই জাতীয় চিত্রের প্রথম প্রকাশ হয় এবং কে কি উপলক্ষে তাহা আঁকেন। সেই প্রাথমিক পর্যায় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সম্পূর্ণই ব্যঙ্গচিত্র বুঝাইতে কেরিকেচার (caricature) শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। কার্টুন শব্দ তৎকালেও ছিল। কিন্তু উহা ছিল ভিন্নতর অর্থবাহী।

আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাষার অধিকাংশ মূল শব্দ গ্রীক অথবা ল্যাটিন ভাষার অনুরূপ অর্থবাহী শব্দ থেকে উৎপন্ন। কেরিকেচার শব্দের মূলও ল্যাটিন ভাষায় প্রসারিত। (ল্যাটিন caricare থেকে ইতালিয়ান caricatura এবং পরে ইংরাজীতে caricature)। ল্যাটিন শব্দের অর্থ বাহুল্য দোষে ভারাক্রান্ত করা; অতিরিক্ত-ভাব আরোপ করা। ইতালিয়ান শব্দটির অর্থ ঐ বাহুল্য দোষ এবং অতিরিক্ত ভাবকে চিত্রের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিল। তখন ইহার অর্থ দাঁড়াইল এই যে, কোন ব্যক্তির (অথবা বস্তুর) সর্বাপেক্ষা বিশেষত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হাস্যকরভাবে অথবা বিকৃতরূপে দেখানর উদ্দেশ্যে অতিরিক্তভাবে অঙ্কিত চিত্র। এ ধরণের চিত্রের বিষয়বস্তু কাহারও ব্যক্তিগত জীবন হইতে পারে, অথবা সামাজিক বা রাষ্ট্র-নৈতিক অবস্থা এবং ঘটনাও হইতে পারে। বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন এ শ্রেণীর চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হাস্যকর বিকৃতি বা বাহুল্য যে অঙ্ক চিত্রিত ব্যক্তির (বা বস্তুর অথবা অঙ্কর) প্রতি দর্শকের মনে অবজ্ঞার বিদ্রূপের অথবা কৌতুকের ভাব সঞ্চার হয়।

দর্শকের মনে এ সকল ভাবের যে কোন একটি অথবা সকল ভাবের সম্মিলিত প্রতিফলন অপর একটি দিক সূচনা করে। তাহা চিত্রকরের মনের পরিচয় এবং চিত্রের উদ্দেশ্য। কেরিকেচার বা ব্যঙ্গচিত্রের উদ্দেশ্য বিচারে চিত্রকরের উদ্দেশ্য অনুধাবন অন্যতম মুখ্য ব্যাপার—কিসের প্রেরণায় এবং কোন প্রয়োজনে সে এই চিত্র আঁকিল দর্শক স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে তাহার উপলব্ধির আনন্দ সম্পূর্ণ হয়; চিত্রকরের উদ্দেশ্য চিত্রিত ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের (অথবা বস্তু বা অঙ্কর) কাজের বা চরিত্রের সমালোচনা করা, তাহার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথবা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্ম লোকহিতের পরিপন্থী মনে হয় তাহার নিন্দা করা—অথবা এমনও হইতে পারে যে দর্শকদের নিছক আনন্দ বিধানের জন্য চিত্রকর কোন বিখ্যাত ব্যক্তি অথবা ঘটনার ব্যঙ্গচিত্র আঁকিলেন। আবার এমনও দেখা যায় যে নিছক ব্যক্তিগত ঈর্ষা এবং অসূয়ার প্রভাবেই ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া চিত্রকর প্রতিপক্ষকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় সফল হইয়াছে, কখনও বা বিফলও হইয়াছে। ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনের পশ্চাতে আধুনিক চিত্রকরের অর্থকরী উদ্দেশ্য প্রাথমিক যুগের চিত্রকরের ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য তখন সম্পূর্ণই ছিল ব্যক্তিগত অসূয়াপ্রসূত।

পুঁথিপত্রে ব্যঙ্গচিত্রের প্রাচীনতম লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রীক সাহিত্যে। প্রাচীন ইজিপ্টবাসীদের দেওয়াল চিত্র অনেক আছে এবং উহাদের মধ্যে ব্যঙ্গচিত্র থাকাও সম্ভব। কিন্তু অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আরিষ্টটল এবং আরিসটোফানেসের লেখায় পাওয়া যায় প্রথম। আরিষ্টটল প্রাচীন গ্রীসের মহাপণ্ডিত। তৎকালীন মানুষ বিদ্যাবিষয়ক যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছে তাহার প্রায় সকলই এই বিরাট প্রতিভাশালী

ব্যক্তির রচনায় স্থান পাইয়াছে। আরিসটোফানেস গ্রীক কমেডি নাটকের রচয়িতা। তেকবৃন্দ (The Frogs) নামক গ্রন্থে তিনি ইসকাইলাস ও ইউরিপিডিসের ট্রাজেডি নাটকের যে আলোচনা করেন তাহা পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য সমালোচনা বলিয়া খ্যাত। ইহারা উভয়েই পসন (Pauson) নামে একজন চিত্রকরের উল্লেখ করিয়াছেন। পসন লোকের বিকৃত বা কৌতুকজনক ছবি আঁকিয়া মজা করিত। কিন্তু ব্যাপারটা তাহার পক্ষে বিশেষ সুখপ্রদ হয় নাই। কৌতুকের পাত্র সকলে সমান সহনশীল মনোবৃত্তির লোক ছিল না। ফলে পসন বিশেষ নিগ্রহ ভোগ করে। সুতরাং ব্যঙ্গচিত্রের প্রাচীনতম সাহিত্যিক উল্লেখে দেখা যায় চিত্রকরের শিল্পাকৃতির পরিণাম কিছুমাত্র আনন্দময় হয় নাই।

রোমের ইতিহাসেও প্রায় অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বুপালাস ও আথেনিস বলিয়া হিপোনাক্স এর এক কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন যিনি। প্রথম দুজন ছিল ভাস্কর, পাথরের মূর্তি খোদাই করিত। হিপোনাক্স কবি। কিন্তু তাহার কদর্য চেহারা কবিজনোচিত বলিয়া বুপালস ও আথেনিস মনে করিত না। সুতরাং কবির চেহারা জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দিত হউক এই অভিলাষে তাহার এক চিত্র আঁকিয়া (সম্ভবতঃ ব্যঙ্গচিত্র) দুই বন্ধু প্রকাশ্যে রাখিয়া দেয়। হিপোনাক্স নিজের কদর্য রূপ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই স্পর্শকাতর ছিল। কেননা, বুপালস ও আথেনিসের ব্যঙ্গের ফলে ক্রুদ্ধ হইয়া সে তাহাদের নামে এমন তীব্র বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করে যে দুই বন্ধু হতাশ হইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনার ফলাফলে মনে হয় রোমের জনসাধারণ ব্যঙ্গচিত্র অপেক্ষা ব্যঙ্গকবিতাই অধিকতর উপভোগ করিয়াছিল।

এর পরে দীর্ঘকাল আর কোন ব্যঙ্গচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের শেষে ইয়োরোপে নূতন চিন্তা নূতন আলোচনার সূত্রপাত হয়। রেণেসাঁসের ফলে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্র ও স্থাপত্যের চর্চা শুরু হয়। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে নূতন উৎসাহ উহাদিগকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে। ব্যঙ্গচিত্রও এই সময় পুনরায় দেখা দেয়। সমাজ ধর্ম ও রাজনীতি সকল বিষয়েই মানুষের দোষগুণ ত্রুটিবিচ্যুতি লইয়া চিত্র অঙ্কনের প্রবণতা প্রকাশ পায়।

রাজনীতি লইয়া ব্যঙ্গচিত্রের প্রথম প্রকাশ ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। মুদ্রাযন্ত্রের তখনও শৈশবাবস্থা। কাঠ খোদাই বা এচিং পদ্ধতিতে তখন ছবি ছাপা হয়। এ ধরণের একখানা ব্যঙ্গচিত্র একজন ফরাসী চিত্রকর ঐ বৎসর আঁকেন। ছবির নাম Le Revers du Jon des Suysses অর্থাৎ সুইস খেলায় পরাজিত। ছবিতে দেখা যায় এক তাস খেলার টেবিলের চারিদিকে চারিজন লোক বসিয়া আছে। এই চারিজন লোক ফ্রান্সের রাজা বাদশ লুই, ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরী, স্পেনের রাজা এবং সুইজারল্যাণ্ডের একজন রাজপুরুষ। ঐ ছবিতে চিত্রকর একথা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে সুইজারল্যাণ্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও ফ্রান্সের রাজা লুই খেলায় জয়ী হইয়াছেন। তখন লুই সুইজারল্যাণ্ডের আপত্তি এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও ইটালীতে কিছু রাজ্য জয় করেন। রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র ইহার পূর্বে আর দেখা যায় নাই।*

---

* Everymans Encyclopaedia.

বাস, ঐ পর্য্যন্ত আর নয়!
আহা বাছা আমার বাড়ীতে এক দিনও 'লিভার' খেতে পায় না — তাই আজ……

তোমার বুকের মধ্যে যেমন দুরদুর কচ্ছে তাতে বুঝতেই পাচ্ছি—তুমি আমায় কত ভালবাস!

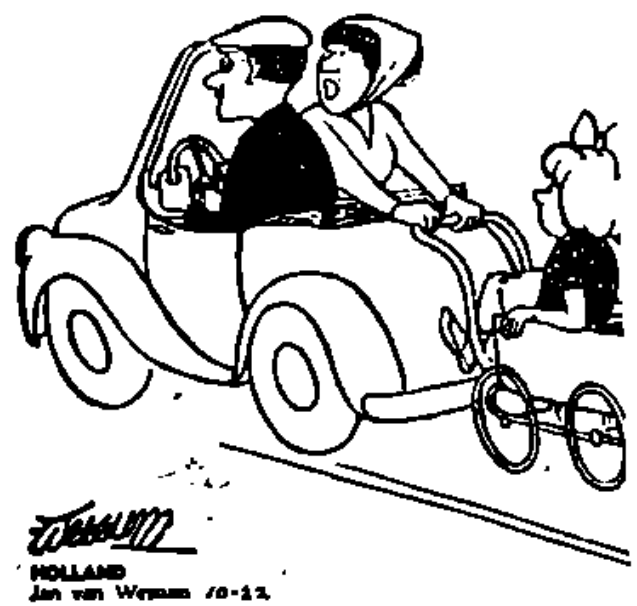

মুখেই শুধু প্ল্যানিং প্ল্যানিং, ও টু-সিটার কার এখন। এবারে চলবে কি করে!!

বাবা! এ যে দাঁতের পাহাড়।

খেলাধূলা

টেনিস

কোলকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের খেলার আসর সম্প্রতি অস্ট্রেলিয় টেনিস দলের আগমনে সরগরম হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গ আলোচনা করার আগে জানিয়ে রাখি ভারত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার ঠিক কয়েকদিন আগেই ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে ৪—১ ম্যাচে এবং থাইল্যাণ্ডকে ৪—০ ম্যাচে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠবার কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। ইন্দোনেশিয়া ও তাইল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের খেলা যথাক্রমে বাম্বুং ও লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি কেবলমাত্র একটি খেলায় ইন্দোনেশিয়ার চ্যাম্পিয়ান লিপজীয়ার কাছে পরাজিত হন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইন্দোনেশিয়া ও তাইল্যাণ্ডের খেলার মান মোটেই উন্নত নয়। ভারতকে এবার ফাইনালে মে মাসের ৬, ৭ ও ৮ তারিখে কোলকাতার সাউথ ক্লাবে জাপান ও ফিলিপাইনের বিজয়ী দলের সঙ্গে খেলতে হবে। একথা স্মরণ থাকতে পারে জাপান ও ফিলিপাইন উভয় দেশেরই খেলার মান যথেষ্ট উন্নত এবং সেইজন্যেই ভারতকে এই দুই দলের বিজয়ীর সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। টেনিস খেলোয়াড়রা যত বেশী অনুশীলন করবার সুযোগ পান ততই মঙ্গল, কারণ এতে তাদের খেলার মানতো উন্নত হয়ই বরং অভ্যাস থাকার ফলে অথবা Slow বা মন্থর গতি হয়ে পড়েন না। ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে চারজন খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত অস্ট্রেলিয় টেনিস দলের এই সময় ভারত সফর নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিনায়ক রমানাথন কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিতলাল ও আখতার আলীকে নিয়ে গঠিত ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তিনটি টেষ্ট ম্যাচে খেলার সুযোগ পায়। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের চারজন খেলোয়াড়ের নাম হোল—বব হিউইট, ফ্রেড স্টোলি, কেন রেচার ও জন নিউকম্ব এবং ম্যানেজার আলফ সেন। টেনিসে অস্ট্রেলিয়া এখন বিশ্বশ্রেষ্ঠ। অস্ট্রেলিয়ার এই চারজন উদীয়মান খেলোয়াড়ও আবার টেনিস প্রতিভার অধিকারী। এদের মধ্যে বব হিউইট তো বেশ নামজাদা খেলোয়াড়। ভারত এই সময়ে ডেভিস কাপ পদ্ধতিতে এদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাওয়ায় বেশ ভাল অনুশীলন তো হোলই বরং একথা বলা যায় যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। এখন এই অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা ভারত ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় কতটা কাজে লাগায় দেখা যাক্।

ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার টেনিস টেষ্টের ফলাফলটা জানিয়ে রাখি। এপ্রিল ৮, ৯ ও ১০ তারিখে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম টেষ্ট খেলা ২—২ ম্যাচে অমীমাংসিত থাকে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণান ও হিউইটের মধ্যে শেষ খেলাটি আলোকাভাবের জন্যে পরিত্যক্ত হওয়াতেই কোলকাতার ফলাফল এই রকম থেকে যায়। এরপর দিল্লীতে এপ্রিল ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত এই টেষ্টে ৩—২ ম্যাচে পরাজিত হয় বটে, অস্ট্রেলিয় ম্যানেজার ভারতীয় খেলোয়াড়দের

যথেষ্ট প্রশংসা করেন। বিশেষ করে তিনি বাংলার তরুন খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জির খেলার উচ্ছসিত প্রশংসা করে বলেন 'এই খেলোয়াড়টির ভবিষ্যত খুবই উজ্জল'। স্মরণ থাকতে পারে জয়দীপ মুখার্জি গত উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশীপে জুনিয়ারদের সিঙ্গলসে বিজয়ী হন এবং ইংলণ্ডের রাণীর সঙ্গে কোলকাতার রাজভবনে বিশেষভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান। অতীতে ভাল বাঙ্গালী টেনিস খেলোয়াড় কয়েকজন ছিলেন, কিন্তু এখন জয়দীপ ছাড়া আর কেউ নেই। আশা করব জয়দীপ কঠোর অনুশীলন ও বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলে অভিজ্ঞতা অর্জন করে বাংলা তথা ভারতের মুখোজ্জল করবেন।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তৃতীয় বা শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয় এপ্রিল ১৫, ১৬ ও ১৭ তারিখে মাদ্রাজের কর্পোরেশন টেনিস স্টেডিয়ামে। অস্ট্রেলিয়া এই টেষ্টেও ৩—২ ম্যাচে জয়লাভ করে 'রাবার' লাভ করে।

টেনিস খেলা বর্তমানে ফুটবল, হকি ও ক্রিকেটের মত জনপ্রিয় নয় সত্য, তবে এর জনপ্রিয়তা যে দিনে দিনে বাড়ছে একথা স্বীকার করতেই হবে। টেনিস হোল অভিজাতশ্রেণী বা ওপরমহলের খেলা। সাধারণের মধ্যে এই খেলার প্রচলন না থাকাতেই জনপ্রিয়তা এর কম। আশা করব এই খেলাও সাধারনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, যার ফলে ভবিষ্যতে আরও অনেক টেনিস প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাবে।

"দি হোলি ফ্যামিলি" নামক জগদ্বিখ্যাত ছবিটি আঁকবার আগে মহাশিল্পী টিটিয়ান্ কি করে যে সে ছবি আঁকবেন, তা'কিছুই স্থির করতে পারছিলেন না।

শুধু স্বর্গীয়ভাব থাকলে চলবে না, তার সঙ্গে মেশাতে হবে সাংসারিক স্নেহ-মমতা আশা-আকাঙ্খা। একই মুখে সব ভাবগুলি একসঙ্গে ফোটানো ত সহজ কথা নয়।

সকালের দিকে ছবি সম্বন্ধে নানা কথা ভাবতে ভাবতে চলেছেন টিটিয়ান নদীর কূলের দিকে।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল নদীতীরের একটি গাছের নিচে এক দরিদ্র মা তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে বসে আছেন। ছেলেমেয়ের মুখে বুভুক্ষার ভাব কিন্তু মায়ের মুখে ভগবানের উপর বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত হাসি।

শিল্পী পেয়ে গেলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ধন। আজ ভাসাই গ্যালারিতে সেই ছবিটি জগদ্বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

• আমার খুকি ঘুমিয়ে পড়ল পাশে
আমার শীতের আকাশে
যেমন একটি তারার বাসা
তেমনি ওর শান্ত ভালোবাসা।

যেখানে ওর মিটিমিটি চোখে
স্বপ্নহাসির দিশা ফিরে থাকে,
ঠোঁটে যেমন ঘুমের টানে
কথা কিশলয়খানি।

• যেমন আমার কানের কাছে
কানের দুলে কান্না ঘুমোয়,
যেমন কাজের অবসাদে
বিদ্যুতে দীপ্ত হাসি
খাদ্য রাতের মুখের দিকে
তাকে চাঁদের ভালো॥

২৫ বৈশাখ
১৩৬৩

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প-ভারতী

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক সংখ্যা

বৈশাখ—১৩৬৮

জন্মদিন

আজ মম জন্মদিন। সবাই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে, কী জানি,
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে; নবসূত্রে গড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণ লিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত॥

• • • •

ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান.
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসসঙ্গে মুগ্ধ যারা, একান্ত আস্থার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাভুক তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি॥

শুনি তাই আজি
মানুষ-অন্তর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাটোর কবরূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
গতশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, ঘৃণাচ্ছলে মানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

বৃথা বাক্য থাক্। তব হেমন্তিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষ-প্রহরের ঘণ্টা ; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্য্যাস্তের রঙে রাঙা পুরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে ; দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।—
আর রবে পশ্চাতে আমার নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরী দ্বারা
এপারের ভালোবাসা—বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্র।

গতবর্ষ শেষ হইবার অনতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালের জন্য আমাদের মধ্য হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছেন।

যে সকল রাজ্যে মহত্ব বিরল নহে, সেখানে কোন যশস্বী লোকের অন্তর্ধান হইলে সমস্ত দেশ শোক করিতে থাকে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে শুভ দৈববশে কদাচিৎ ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি, জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া যখন তাঁহারা সংসারক্ষেত্র হইতে অপসৃত হন তখন এই জড়তাগ্রস্ত দরিদ্র দেশ তাঁহাদের অভাব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

কিন্তু একথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। লেখনী সহজেই লিখিতে চাহে যে, অদ্য সমস্ত বঙ্গদেশ বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগ দুঃখে শোকাতুর। যদি সত্যই বঙ্গদেশের সেই বেদনাবোধ থাকিত তবে আজিকার এই চিরবিচ্ছেদের মধ্যেও সান্ত্বনার রশ্মি প্রকাশ পাইত।

অল্প দিনের মধ্যে আমাদের অনেকগুলি শোকের কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র চলিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি তাঁহাকে ভাল করিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিল না। সেই নির্ভীক মনস্বী পুরুষ দেশের জন্য তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানবিস্তার এবং লোকহিতের জন্য যাহা করিয়াছিলেন বিষয়ী লোক আপনার বৈষয়িক উন্নতি আপন স্বার্থসাধনের জন্য এত চিন্তা এত চেষ্টা এত সংগ্রাম করিতে পারে না। যে ক্ষেত্রেই ইংরাজ বাঙ্গালীর মধ্যে বিরোধ ঘটিত, সেইখানেই রাজেন্দ্রলাল দুর্ব্বল স্বদেশের পক্ষ লইয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইতেন; যদি স্বদেশী বিদেশী কাহারও সাহায্য না পাইতেন তথাপি অটল সাহসে একাকী দণ্ডায়মান হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যুদ্ধে চিরকাল অপরাঙ্মুখ এবং অপরাজিত ছিলেন। এইরূপে অশ্রান্ত নিরলস থাকিয়া অহর্নিশি কঠিন পরিশ্রমে দেশের জন্য তিনি যে জীবন অকালে বিসর্জ্জন করিলেন, দেশ তাঁহার সেই দুর্ম্মূল্য জীবনের অবসানে অকৃত্রিম শোকের এক বিন্দু অশ্রু ব্যয় করিয়াছিল কি না সন্দেহ।

রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ রচনা ইংরাজিতে। বিবিধার্থসংগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বহুপূর্ব্বের কথা। এই কারণে, যদিও তাঁহার নাম দেশবিখ্যাত ছিল তথাপি তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে সে কথা বলা যাইতে পারে না।

বিদ্যাসাগর সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করিয়া একাকী দুর্জ্জয় তেজে দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কাহারও স্তুতিনিন্দা কাহারও সহায়তার কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। যখন সহস্র লোকের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তখনও তিনি একক, যখন সহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন তখনও তিনি একক। সুমহৎ সুদুষ্কর কার্য্যভার সকল তিনি চিরজীবন অসামান্য সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত একাকী বহন করিয়াছেন। বঙ্গভাষার প্রথম স্তর তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিধবার দুঃখ মোচনের জন্য নিষ্ঠুর সমাজের সহিত তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়াছেন, দেশের বিদ্যাশিক্ষা স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধন করিবার ভার লইয়া তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং এই অলস অকর্ম্মণ্য অনুদ্যম দেশে আপনাকে একনিষ্ঠ পরহিতব্রত অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ মহাত্মতার উজ্জ্বলতম আদর্শস্থল করিয়া তুলিয়াছেন—আর যে বঙ্গদেশ তাঁহার জীবনের রক্তে জীবন পাইয়াছে সে আজ বহু কষ্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপলক্ষে

দুই চারিবার সামান্য ব্যর্থ চেষ্টা দেখাইয়াই আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও আমরা সভা ডাকিয়া সাময়িক পত্রে বিলাপসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আপনার কর্তব্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাহার অধিক আর কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। উপর্য্যুপরি বারম্বার অকৃতজ্ঞতা ও অনুৎসাহের পরিচয় দিলে ক্রমে আর আত্মসম্ভ্রমের লেশমাত্র থাকিবে না, এবং ভবিষ্যতে প্রবন্ধ লিখিয়া শোকের আড়ম্বর করিতেও কুণ্ঠিত বোধ করিতে হইবে।

উপকার গ্রহণ করিবার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার শক্তিও বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও সেরূপ দাঁড়ায় নাই যাহাতে আমরা কোন মহৎলোকের দৃষ্টান্ত বা কার্য্য অন্তরের মধ্যে যথার্থরূপে পরিপাক করিয়া লইয়া তাহার ফল উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের কানের কাছে ক্রমাগতই বলা আবশ্যক, তোমার এতখানি উপকার করা হইল, তুমি এতটা লাভ করিলে, তোমার এতখানি পথ নিষ্কণ্টক হইল, অমুক তোমার এত বড় সুহৃদ্। এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে মন্থন করিয়া কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা হৃদয়ের উপরিভাগে ফেনিল করিয়া তোলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে কোনরূপ স্থায়ী পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে কতকটা বাষ্প বিসর্জ্জন করিয়া কোথাও কোন চিহ্নমাত্র না রাখিয়া তাহা বিলীন হইয়া যায়।

যে দেশের এমন দুরবস্থা সেই দেশেই মহৎ লোকের নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জনের আবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সহায়তা নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, অনুকূলতা নাই, কেবল আপনার অন্তরের অপ্রতিহত ধৈর্য্য ও উপবাসসহিষ্ণু অকাতর অনুরাগে চিরজীবন একাকী বসিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

সেই জন্য যে কয়েকটি মহাত্মা আমাদের দেশের কাজে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে মিসরের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে গুটিকতক নিঃসঙ্গ পিরামিডের মত দেখিতে হয়। এই বৃহৎ সমভূমির মধ্যে তাঁহাদের সমুন্নত মহিমা বিশুদ্ধ দেদীপ্যমান হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সুবিশাল বিষাদ হৃদয়কে বাষ্পাকুল করিয়া তোলে। হায়, এত বড় জীবন যাহার নিকট নিঃশেষে সমর্পিত হইয়াছে সে জানিতেও পারিল না তাহার কি সৌভাগ্য এবং সে চিরদিনের জন্য কতখানি লাভ করিল।

ভাবসম্পদকে আমরা এখনও যথার্থ সম্পদরূপে গণ্য করিতে শিখি নাই। সাহিত্যরস যে আমাদের জীবনের খাদ্যপানীয়ের ন্যায় অত্যাবশ্যক তাহা এখনও আমরা সম্যক্ অনুভব করি না। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী শক্তি মাতৃভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনের মজ্জার মধ্যে যে প্রবেশ করিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভা-উৎসের ভাবপ্রস্রবণ হইতে বাঙ্গালী যে নূতন জীবন-রস প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল বঙ্কিমের আবির্ভাবের পরে বাঙ্গালীর জীবনের গঠনে যে তদপেক্ষা এক নূতন বৈচিত্র্যের সঞ্চার হইয়াছে তাহা এখনও আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

এই স্থলে যদি আমি প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নিজের জীবনের সম্বন্ধে আলোচনা করি তবে ভরসা করি শ্রোতৃগণ আমার সেই প্রগল্‌ভতাকে অহমিকা জ্ঞান করিয়া অপরাধ লইবেন না। আজিকার এই শোকের দিনে বঙ্কিমের নিকট কেবল স্বজাতির নহে নিজের নিজের বিশেষ কৃতজ্ঞতাঋণ স্বীকার করিবার জন্য আবেগ উপস্থিত হয় এবং তাহা দমন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করি না।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা বাল্যকালে বাঙ্গলাভাষায় বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। যদ্য ইংরাজি যাহা শিখিতাম তাহার দ্বারা হৃদয়ের পোষণযোগ্য তৃপ্তিজনক কোন রস আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ তৃষ্ণা যথেষ্ট ছিল। কৃত্তিবাস, কাশিরাম দাস, একত্র বাঁধানো বিবিধার্থ সংগ্রহ, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বাঙ্গলা রবিন্‌সন্ ক্রুশো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম। তখন বাঙ্গলা গ্রন্থের সংখ্যা অল্প ছিল এবং বালকদিগের পাঠের অযোগ্য গ্রন্থও অনেক বাহির হইত। এবং আমরা অপরিতৃপ্ত আগ্রহের সহিত ভালমন্দ সকল গ্রন্থই নির্ব্বিচারে পাঠ করিতাম। তরুণ হৃদয়ের সেই স্বাভাবিক ক্ষুধা উদ্রেকের সময় বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন যে নূতন আস্বাদ, নূতন আনন্দ, নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলাম তাহা কোনকালে ভুলিতে পারিব না।

তখনকার বয়স্ক লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে কিরূপভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ মনে নাই। যেটুকু মনে পড়ে তাহাতে বোধ হয় বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর এক দল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য-ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ পূর্ব্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্ত্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেরূপ প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদেরও হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা আনন্দউচ্ছ্বাসের সহিত আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। দুই কালের সন্ধিস্থলে যাহারা না দাঁড়াইয়াছে তাহারা সেই প্রথম প্রভেদ কিছুতেই অনুধাবন করিতে পারিবে না। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই সোনেবকাওলি, সেই সব বালকভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদ্বটত্ত ধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিম-বাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিক পত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে আচ্ছন্ন, প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নব সমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম। সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম—সেই জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সে দিন হৃদয়ে যে এক অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফল লাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ এখন আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রথম প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশিধ্বনি হয় সে রাগিনী চিরদিনের নহে। সে দিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্ত্তব্য, মিশ্রিত দুঃখ সুখ, ক্ষুদ্র বাধা বিঘ্ন, আবর্ত্তিত বিরহ মিলন—তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানা পথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসার-পথে অগ্রসর হইতে হইবে—প্রতিদিন আর সে নহবৎ বাজিবে না। তথাপি সেই এক দিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্ত্তব্য-পথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র বহুস্তে বঙ্গভাষার সহিত যে দিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেই দিনের সর্ব্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দউৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—আজ কোন দিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে কোন দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। কত লোক আপনাকে প্রধান মনে করে; আপনার মত প্রচারকেই আধুনিক বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করে; কত তর্ক কত দ্বন্দ্ব কত ঘাত প্রতিঘাত তাহার আর সীমা নাই।

এইরূপই হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্ব্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা—আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথ-প্রদর্শক। যখন নব-শিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্তৃতপ্রায় বেদ পুরাণ তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।

রামমোহন বঙ্গদেশকে গ্র্যানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আজ তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ চালিয়া তদুপরি পলি মৃত্তিকা ক্ষেপন করিয়া গিয়াছেন। আজ বঙ্গদেশ কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের ভাব প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন সৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সেকথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।

তৎপূর্বে বাঙ্গলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে ঘৃণা এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাঙ্গলা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই জন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহ-পূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভেরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পূর্বতন এণ্ট্রেন্স-পাঠ্য বাঙ্গলা গ্রন্থে দৃষ্টপাত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীনমলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা সুস্থতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই উপেক্ষিতা সঙ্কুচিতা দীনহীনা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন। তখনকার কালে কি যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরাজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে! সম্পূর্ণ ক্ষমতাসত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহা পরিমাণ করা আমাদের পক্ষে সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্যপ্রেম মহত্ত্বভক্তি স্বদেশানুরাগ —শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্বে যাহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবনসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে, শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য।

দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে

অল্প ভাল লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতি লাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মত এমন গুরুভার আর কিছুই নাই; তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত বিপুল চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম তাহা এখনকার সাহিত্য ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন—তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈল সম্রাটের উদয় রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারমুকুটিত মস্তক চতুর্দ্দিকের নিম্নস্থ গিরি পারিষদ্‌বর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরও কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনও দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্তে গঠনকার্য্যে এক হস্তে নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সাহিত্যের পক্ষে যাহা কিছু অযোগ্য, যাহা কিছু অনাবশ্যক, যাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ পাইত তাহাকে তিনি কদাচ মার্জ্জনা করিতেন না। এই সময় স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি তিনি এমন কঠোর আঘাত এমন সুতীব্র বিদ্রূপ প্রয়োগ করিতেন যে, অনেক সময় তাহা অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হইত;—অনেক সময় মনে হইত এই সকল ক্ষীণজীবীদের প্রতি বঙ্কিমের প্রবল বাহুর আঘাত যথাযোগ্য নহে। বিশেষতঃ তখনও বাঙ্গলা লেখার শৈশব অভ্যাসগুলি দূর হয় নাই, লেখকেরা তখনও বঙ্কিমের নূতন রাজত্বের কঠিন নিয়ম সকল ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই, সে অবস্থায় সহজেই অনেক ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া লোককে

কম করিয়া দেখিয়া এবং গুণকে বাড়াইয়া তুলিয়া সাধারণতঃ উৎসাহ এবং প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমের রাজত্বও সেরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই। তিনি নির্দয়ভাবে ঠক বাছিতে গিয়া গা উজাড় করিবার যো করিয়াছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমের এই নিষ্ঠুরতা উচ্চ লক্ষ্য, অটল সংকল্প এবং মহৎ সৌন্দর্যের নিষ্ঠুরতা। বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁহার প্রবল অনুরাগ তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে নির্মমভাবে ছেদন করিয়া ফেলেন। যাঁহার আদর্শ অত্যন্ত উন্নত তাঁহার বিচার অনুরূপ কঠিন।

নিজের বাগানের প্রতি যে মালীর যথার্থ অনুরাগ আছে, ছোট ঘাট কাঁটা শুষ্ক জঞ্জালকে সে তীক্ষ্ণ কোদালি দিয়া সবলে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সকল ক্ষুদ্র তৃণগুল্মজঞ্জল অনাদরে জন্মে তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। কারণ তাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, গুণে না হৌক্ সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, তাদের মধ্যে এমন একাকার হইয়া যায় যে নির্বাচন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। তখন ভাল জিনিস আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণ-যোগ্য যথেষ্ট রস পায় না, ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া আসে।

এই কারণে, মন্দ রচনা সাহিত্যের বিচারালয়ে যেরূপ দণ্ড পায়, যে রচনা মন্দ নহে কিন্তু ভালও নহে, যাহাতে কোন ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই কোন সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় নাই তাহাও প্রায় অনুরূপ দণ্ডের যোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। উভয়ের প্রতিই নির্বাসনের আদেশ প্রচার হইয়া থাকে।

কিন্তু এই কঠিন কার্যের ভার লইতে অনেক সুযোগ্য লেখক কুণ্ঠিত হন। তাহার দুই প্রধান কারণ আছে, এক ত কাজটা অপ্রিয়, দ্বিতীয়তঃ অন্যের অপ্রিয় হইতে হয়।

লেখকের পক্ষে অপ্রিয় হওয়া একটা মহৎ ক্ষতি। কারণ, লেখা বুঝিতে বুদ্ধির যেমন আবশ্যক প্রীতির আবশ্যক তদপেক্ষা অল্প নহে। প্রথম হইতে পাঠকের মনটি যদি অনুকূল থাকে অন্ততঃ প্রতিকূল না থাকে তবে ভাবের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা তাঁহার পক্ষে অনেকটা সহজ হয়। গোড়াতেই বিমুখ হইয়া বসিলে সহস্র তর্কের দ্বারা সৌন্দর্য প্রতিপন্ন করা যায় না। এই জন্য প্রাচীন কবিরা অপর্যাপ্ত নম্রতার দ্বারা পাঠকের মন আর্দ্র করিয়া রচনা আরম্ভ করিতেন—তাঁহারা শ্রোতামাত্রকেই সুধীজন এবং সুধীমাত্রকে ক্ষীরগ্রাহী হংস এবং কেবলমাত্র আপনাদিগকে অভাজন বলিয়া প্রচার করিতেন এবং বোধ করি যথোচিত ফললাভ করিয়া মনে মনে হাসিতে ছাড়িতেন না।

কিন্তু যে লেখক সমালোচনা করেন তাঁহার পক্ষে এই নম্রতা রক্ষা করা বড় কঠিন। পাঠকেরা একেবারে যুদ্ধসজ্জিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র বাঁধিয়া তাঁহার লেখা পড়িতে আরম্ভ করেন, এমন কি অধিকাংশ সময়ে পাঠ না করিয়াই অস্ত্রক্ষেপণ করিতে থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে অবলা সরস্বতীর হাতে গদা নাই, কেবল একটী বীণা আছে মাত্র।

এই কারণে, যে সকল লেখক রচনার দ্বারা অনিশ্চিতমতি পাঠক জাতির মনোরঞ্জনের উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন, সমালোচন কার্যে অগ্রসর হইতে তাঁহাদের অভিরুচি হয় না। রীতিমত এ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে চিত্তও অনেকটা বিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্য যে দেশে সাহিত্যচর্চা অধিক সে দেশে প্রায়ই লেখক এবং সমালোচক সম্প্রদায় স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে এখনও সেই কার্যবিভাগের সময় আসে নাই—এবং বঙ্কিম যখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন সেই সময় আরও সুদূরবর্তী ছিল। সেই জন্য রচনা এবং সমালোচনা এই উভয়

কার্য্যেই তিনি বীরের ন্যায় একাকী গ্রহণ করিলেন। এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গ-দর্শনে যখন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না, শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হৌক্ তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোন উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না,—সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমন করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোন দিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

বঙ্কিম যে দিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন সে দিন হইতে এ পর্য্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। সাহিত্যের প্রতি এখনকার সমালোচনার কোন প্রভাব নাই। সাধারণে এখনকার সমালোচনা কেবল বিজ্ঞাপন স্তম্ভ সজ্জিত করিবার আয়োজন স্বরূপে দেখে। যথার্থ রসবোধ এবং সূক্ষ্ম বিচার প্রকাশ পায় এমন সমালোচনা বহুকাল দেখা যায় নাই। গ্রন্থ সমালোচনার ভার অনেক সময়ে অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং অনেক কৃতবিদ্য লেখকও অত্যুক্তি, কাল্পনিকতা এবং অবান্তর প্রসঙ্গে তাঁহাদের সমালোচনা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন; গ্রন্থের অন্তর্গত সাহিত্যপদার্থকে প্রাধান্য না দিয়া তাহার আনুষঙ্গিক নীতি অথবা অন্য কোন তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়া পাঠকের চিত্তকে যথার্থ সাহিত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করেন। অঙ্গ হিসাবে তাহার গৌরব থাকিতে পারে কিন্তু সমালোচনার হিসাবে তাহার মূল্য নাই। তাহাতে পাঠকদের মনে রসবোধ বা নির্ব্বাচনশক্তির চর্চ্চা হয় না।

সেইজন্য এখনকার সাহিত্যে বিস্তর স্বেচ্ছাচারিতা এবং ইতর ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এখনকার কোন রচনা কোন যথার্থ শ্রদ্ধের সমালোচকের হস্তে কোনরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় না—সকলেই স্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্র জঙ্গলে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যের মধ্যে সংযমের, সৌন্দর্য্যের, শিষ্টতার এবং উচ্চ আদর্শের আবশ্যক কেহ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন না, স্বাভাবিক বিচার শক্তির সহিত নিরপেক্ষভাবে দণ্ডপুরস্কার বিধান করিবার কেহই নাই, পত্রে এবং সংবাদপত্রে উৎসাহ অত্যন্ত মুক্তহস্তে বিতরিত হইয়া থাকে এবং রাজকোষের শূন্য অবস্থায় কাগজের নোট যেরূপ অজস্র অথচ অনাবৃত হইয়া উঠে এই সকল প্রাচুর্য্যবিশিষ্ট সমালোচনাও সাধারণের নিকট সেইরূপ প্রায় বিনামূল্যে বিক্রীত হয়।

এই বর্ত্তমান দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া কাহারও প্রতি দোষারোপ করা আমার অভিপ্রায় নহে। বিশেষতঃ এ দোষের অংশ যখন আমাদিগের সকলকেই বহন করিয়া লইতে হইবে তখন ইহার মধ্যে নিজের সান্ত্বনা বা শ্লাঘার কারণ কিছুই দেখি না। কিন্তু এই অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য-সিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার অভাবে সে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই। ইহাও বুঝিতে

পারিবেন বঙ্কিম যখন আমাদের সাহিত্যতরীর কর্ণধার হইয়াছিলেন, তখন তরণী কেন এমন আশ্চর্য্য বেগে অগ্রসর হইয়াছিল, আর আজই বা কেন সে যথেচ্ছা ভাসিয়া যাইতেছে এবং নানা বাতাসে ঘুরিয়া মরিতেছে। আমাদের কাহারও সে ক্ষমতা নাই, সে সাহস নাই, সে প্রতিভা নাই। আমরা যদি বা স্ব স্ব শক্তি অনুসারে কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু বর্ত্তমানের গতিকে নিয়মিত করা, সমস্ত সাহিত্যকে চালনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বঙ্গদর্শন তখনকার সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের মর্ম্মস্থলে হৃদয়রূপে বিরাজ করিতেছিল—এখন সে স্থান শূন্য। সেইজন্য এখনকার সাহিত্যের বিশেষ কোন আকার প্রকার দেখা যায় না; তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু তাহার রূপ নাই; তাহার কোন লক্ষণ নাই, আদর্শ নাই, বিবেকশক্তি নাই, তাহার পক্ষে সকল পথই সমান। সংসারযুদ্ধে বঙ্গসাহিত্যের সারথী কৃষ্ণ যেন আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে কৃষ্ণের সহিত আজ বঙ্কিমের তুলনা করিলাম। বঙ্কিমের মহাগ্রন্থ কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিলে লেখকের সহিত লেখকের আদর্শ চরিত্রের সাদৃশ্য স্বতঃই মনে উদয় হয়।

সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্ত-মনে বিরলে ভাবের চর্চ্চা করেন, তাঁহার নিজেরই সহিত নিজের নিবিড় সম্বন্ধ। তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা যেন যথা-লাভের মত। আর সাহিত্যের কর্মযোগী নিজের প্রতিভা নিজের আনন্দ দ্বারা সংসারকে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন। একজন স্থির সরোবরের মত, আর একজন চির-প্রবাহিত উৎসের ন্যায়। গভীরতা হয়ত উভয়েরই সমান এবং উভয়েরই অপরিমেয় অন্তরতলে ভাবের অক্ষয় আধার আছে। কেবল একজনের ধ্যান এবং শান্তি, অপরের গতি এবং উৎসাহ।

বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন সান্ত্বনা দিতেন অভাব পূর্ণ করিতেন তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন। এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে দিনে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথক্‌করণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসঙ্কোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষতঃ দুই পক্ষের মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। একদিকে, যাঁহারা অবতার মানেন না তাঁহারা খ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্যদিকে যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রত্যেক প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারাও, বিচারের লৌহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে দেবতাসংগঠনকার্য্যে বড় প্রসন্ন হন নাই। এরূপ অবস্থায় অন্যের হইলে কোন এক পক্ষকে সর্ব্বতোভাবে আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্য-মহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত অতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ কৃত্রিম পরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গলার সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে। এই কাল্পনিকতার কল্যাণে আজকাল অনেক কৃতবিদ্য লোকের মুখেও এমন কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের প্রতি দেবানুগ্রহের এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার এক প্রমাণ এবং কারণ এই যে, পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতবর্ষেই বড়কুরু প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

সকল সময়ে ঠিক এতদূর পর্য্যন্ত না গেলেও আমাদের অনেক লেখক এইপ্রকার অদ্ভুত আতিশয্যের কাছ ঘেঁষিয়া যান। এইরূপ অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক যুক্তির সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

বিশেষতঃ বিষয়টি এমন, যে, ইহা কোন সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের হস্তে পড়িলে তিনি এই সুযোগে বিস্তর হরিহরি, মরিমরি, হায় হায়, অশ্রুপাত ও প্রবল অঙ্গভঙ্গী করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস ভাবের আবেশ এবং হৃদয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনই ছাড়িতেন না; সুবিচারিত তর্ক দ্বারা সুকঠিন সত্যনির্ণয়ের স্পৃহা দ্বারা পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না, সর্ব্বজনগম্য সরল পথ ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা স্বকপোলকল্পিত একটা নূতন আবিষ্কারকেই সর্ব্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাকপ্রাচুর্য্যে এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন, এবং নিজের বিশ্বাস ও ভাবকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশে পাশে দীর্ঘ করিয়া অধিক পরিমাণ লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বঙ্কিম যেখানে ইষ্টকের উপর ইষ্টক স্থাপন করিয়া সমুন্নত সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এখনকার কোন অল্পাধিকারবিশিষ্ট লেখক সে স্থলে প্রচুর

বাষ্পোচ্ছ্বাসবেগে বেলুন নির্মাণ করিয়া একেবারে মেঘরাজ্যে ছাড়িয়া দিতেন—কিন্তু সে বেলুন যতই উচ্চে উঠুক না কেন তাহা চিরস্থায়ী, তাহা কিছুকালের জন্য সাধারণের কৌতূহলজনক কিন্তু বাসযোগ্য নহে, এবং সেই বেলুনযোগে যিনি আপন যশকে ঊর্ধ্বে উড্ডীন করিয়া দিতেন একদিন আকস্মিক পতনে অপমৃত্যুর জন্য সে যশকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত।

বঙ্কিম গীতার উপদেশ অনুসারে কেবলমাত্র আপনার কর্ম করিয়া গিয়াছেন, ফললাভের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। তিনি নিজে কৃষ্ণকে পরিপূর্ণ ভক্তি করিতেন অথচ আধুনিক কৃষ্ণভক্তদিগকে প্রসন্ন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, তিনি কৃষ্ণের দেবত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন অথচ বহুযত্নে বহুসাবধানে কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত অলৌকিক অংশ দূর করিয়া দিয়াছেন; আমাদের দেশের লোকের যে অন্ধভক্তি এবং বিচিত্র অতিবিশ্বাসের দিকে প্রবণতা আছে বঙ্কিম তাঁহার সমস্ত রচনার কোথাও তাহার পোষণ বা সমর্থন করেন নাই, বরং প্রতিপদে তাহাকে আঘাত করিয়া গিয়াছেন।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন। এক দিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্য দিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংকোচ; একদিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্যদিকে অতিপরিচয়জনিত অবজ্ঞা এবং সংস্কারের অন্ধতা; যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয় সঙ্কটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে ধারার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে, সেই ধারার আকর্ষণে তাহাকে সর্বদা সংযত করিতে হইবে। এই সকল ক্ষমতা-সামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল।—সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন তখন বঙ্গসাহিত্যের বড় আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আশা সফল হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না। যুক্তিবিচারকে প্রাধান্য না দিয়া বঙ্কিম যদি নিজেই গুরু সাজিয়া দাঁড়াইতেন, অনুসন্ধান দ্বারা সত্যের দিকে পথ নির্দেশ না করিয়া তিনি যদি নিজেকেই ধ্রুবতারা বলিয়া প্রচার করিতেন দেশের লোকের মনের গতি বুঝিয়া তিনি যদি অন্ধবিশ্বাস এবং অলৌকিকত্বকে আপন পক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন তবে এই দেবানুগৃহীত বঙ্গদেশে অনায়াসেই তিনি একজন নূতন অবতার হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। তবে তাঁহার অসংখ্য ভক্তগণ এমন নিবিড় ঘুঘরচনা করিয়া আজ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত যে, আমরা সাহিত্যভক্তগণ আর সহজে আমাদের গুরুর সমীপবর্তী হইতে পারিতাম না।

বঙ্কিম এই যে সর্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসঙ্গতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত। যে কেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন সকলেই জানেন বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ হইয়া পড়ে হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কতদূর পর্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যাহারা হাস্যরসরসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্তা আচার ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যে সুসঙ্গতির সূক্ষ্ম সীমারেখা সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।

নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অশ্লীলতার সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। অশ্লীলতারই সহিত যেন তাহার কোন একটি সর্ব্বউপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও আস্ফালন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রসঙ্গে বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্ কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীর ভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উদ্ঘাটন করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উষ্ণশিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসঙ্গতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধ-শক্তির আবশ্যক। বাংলা মাসিক অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্য্যের একটি সুন্দর সম্মিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীরপুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্ত্তমান লেখক যে দিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সে দিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সে দিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের নবকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন্ নামক মিলন সভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভাল স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সে দিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই জনমণ্ডলীর মধ্যে একটি অল্প দীর্ঘকায় উজ্জ্বলগৌরকান্তিমুখ শুভ্রধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিম বাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্ব্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক বার তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট-অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী দেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উন্নত

মন্ত্রের ন্যায় একটি উজ্জ্বল মৃতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশাত্মবোধমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে ধিক্কার করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্দ্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসঙ্কোচ পলায়ন দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে কোন প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক্ ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখার অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় না। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইয়া যায় নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য ব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কি চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। বঙ্কিমের প্রতিভা যদি আমাদের পথ খনন করিয়া না দিত তবে আমরা এত দিনে শিশুপাঠ গ্রন্থের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগ শেষ করিয়া বড় জোর চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ভাগে গিয়া উপনীত হইতাম। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইত না। আজ আমাদের কোন লেখা যদি বয়স্ক লোকের পাঠযোগ্য, শিক্ষিত লোকের সমাদরযোগ্য বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদযোগ্য হইয়া থাকে, কোন রচনার একটি অংশও যদি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্থায়ী হইবার উপযোগী সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, তাহা অনেকটা পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসাদে। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের অন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকাচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্ব্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্ব্বদুঃখ-তাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহ-সুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ম্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্ত্তি এখানে উপস্থিত নাই; আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদের কল্যাণেরই

জন্ত। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শ-প্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক্। প্রস্তরের মূর্ত্তি স্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরাজ এবং ইংরাজের আইন চিরস্থায়ী নহে; রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; যে সকল ঘটনা যে সকল অনুষ্ঠান আজ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনায় কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্ত্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একটিমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চির সৌন্দর্য্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার পোষণ করিবার প্রকাশ করিবার এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলীয়ান্ এবং মহীয়ান্ করিয়াছেন। আমাদের যে অন্তঃপুরে সূর্য্যকিরণ এবং বায়ু প্রবেশ নিষেধ সেখানে তিনি নিখিল বিশ্বের আনন্দ প্রবাহ সমীরিত করিবার পথ করিয়া দিয়াছেন, এবং যে বাঙ্গালী হৃদয় অনেক বয়স পর্য্যন্ত অন্তরের মধ্যে অপরিচিত দুর্ব্বোধ বিদেশীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া চিরজন্মের মত অপরিপুষ্ট উপবাসকৃশ এবং হীনবল হইয়া থাকে তাহার দ্বারদেশে তিনি খাদ্য উপনীত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা অপরাপর জাতির নিকট চিরদিন ঋণ গ্রহণ করিয়া অবশেষে কথঞ্চিৎ সুদসমেত তাহা পরিশোধপূর্ব্বক যাহাতে নিজের নিকট আত্ম-সম্মান এবং পরের নিকট শ্রদ্ধার অধিকারী হইতে পারি এমন সুবিধা তিনি করিয়া দিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদের উত্তর পুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণা করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য-স্রোতস্পর্শে জড়ত্বপাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাঙ্গলীর পাঠকদিগের সুহৃদ, এবং সুফলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন আকারে, নূতন উদ্যমে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

অধিক দিনের কথা নহে; ইতিপূর্বেই যে সভায় আমি সাধারণের সমক্ষে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সভাপতি থাকিয়া আমাকে পরম সম্মানিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তখন কে কল্পনা করিয়াছিল তাহার অনতিকাল পরে পুনশ্চ এই সাধারণ সভায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গদেশের হইয়া আমাকে শোক প্রকাশ করিতে হইবে! কে জানিত আমার সহিত তাঁহার সেই শেষ ঐহিক সম্বন্ধ! একদিন আমার প্রথম বয়সে কোন নিমন্ত্রণ-সভায় তিনি নিজ কণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন, সেই আমার জীবনের সাহিত্য-চর্চ্চার প্রথম গৌরবের দিন। তাহার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন; সে সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদরবাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, যে, আজ তাহা লইয়া সর্ব্বসমক্ষে গর্ব্ব করিলে ভরসা করি সকলে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু সেই পুরস্কার যে তাঁহার হস্ত হইতে আমার শেষ পুরস্কার হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। সেই সকল উৎসাহবাক্য সাহিত্যপথযাত্রার মহামূল্য পাথেয়স্বরূপে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইল; তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধনা—১৩০১

[বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর চৈতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ]

আনন্দম্

আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টায়, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক্। আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল তোমার আশীর্বাদ লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি. সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্যের আলোক, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আমাদের মন্ত্র; অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই—আমরা মানব না পরাভব, আমরা জানব না অবসাদ, আমরা করব না আত্মার অবমাননা, চলব দৃঢ়পদে, অসংকুচিতচিত্তে—চলব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত করে—তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাকবে, চারিদিক থেকে আহ্বান আসতে থাকবে 'এসো এসো এসো'—আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চিরজীবনের সিংহদ্বার—কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ—অন্তরে বাহিরে কল্যাণ—আনন্দম্ আনন্দম্—পরিপূর্ণমানন্দম্।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ

যে বছর বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সেই বছরই ফাল্গুন মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রায়পুর গ্রামে এসে সেখানকার জমিদার ভুবনমোহন সিংহ মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা, চৈত্রমাসেও দ্বিতীয়বার ব্রহ্মোপাসনা। পরবর্তী চৈত্রে ভুবনবাবুর পুত্রদের কাছ থেকে তিনি ভুবনডাঙা বা ভুবনডাঙা গ্রামে কুড়ি বিঘা জমির মৌরসী পাট্টা গ্রহণ করেন। এই জমি তখন জনমানবহীন তরুলতাহীন তেপান্তরের মাঠ। দুটিমাত্র ছাতিম গাছ ছিল বাতিঘরের মতো দাঁড়িয়ে। সেই ছাতিমতলায় বসে তিনি ধ্যান করতে ভালোবাসতেন।

প্রথম দিকে তাঁবু খাটিয়ে ওসকরা প্রভৃতি অঞ্চলে নির্জনবাস ছিল মহর্ষির অভ্যাস। কিন্তু জমি খরিদ করার পর তাতে একখানি একতলা ইমারত উঠল। তার পরে সেটি হলো দোতলা। তার চার দিকে আম কাঁঠাল আমলকী শাল দেবদারু ইত্যাদি গাছ লাগানো হলো। ফুলগাছ লাগিয়ে ফুলবাগান করা হলো। এই যে উদ্যানগৃহ এর নাম রাখা হলো "শান্তিনিকেতন"। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বছর দুই। মহর্ষি তাঁর আপন আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে এই নির্জন প্রান্তরাবাস নির্মাণ করেছিলেন। মাঝে মাঝে এখানে এসে কিছুদিন থাকতেন ও ছাতিমতলায় বসে ধ্যান করতেন। বোলপুর স্টেশন থেকে অনতিদূরে বলে কলকাতা থেকে অনায়াসেই যাতায়াত করা যেতো।

প্রায় বারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির সঙ্গে হিমালয়ে যাবার পথে এখানে কয়েক দিন থামেন। সেই তাঁর প্রথম শান্তিনিকেতন দেখা। প্রথম দর্শনেই প্রেম। "সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম—এখানকার অনাবৃদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তালশ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামল শান্তি, ধরিত্রীর সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য।" লিখেছিলেন কবি পরবর্তীকালে তাঁর "জীবনস্মৃতি"তে।

এটা হলো ১৮৭৩ সালের ঘটনা। এর বছর দশেক পরে মহর্ষি প্রেরবারের মতো শান্তিনিকেতনে আসেন। তার পরেও তিনি আরো বাইশ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে নির্জনবাসের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়েছিল। উদ্যানগৃহটি পোড়োবাড়ীর মতো পড়ে থাকে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক ধর্মপিপাসু যুবক বোলপুর থেকে মাঝে মাঝে এখানে এসে প্রেরণালাভ করতেন। তিনি দেখতেন, "প্রকাণ্ড প্রাসাদে মেরামতের অভাবে শ্রীভ্রষ্ট, আসবাবপত্রও যৎসামান্য, উদ্যানের রক্ষণতাদি যত্নের অভাবে অধিকাংশই শুষ্ক ও শ্রীহীন।" অঘোরবাবু ও তাঁর বোলপুরের ধর্মোৎসাহী বন্ধুরা বৎসরান্তে একবার শান্তিনিকেতনে এসে উপাসনা করতেন। বছর তিনেক পরে তিনি কলকাতা গিয়ে মহর্ষিকে দর্শন করেন। "মহর্ষির শরীর তখন খুব দুর্বল, কিন্তু আত্মার তেজ যেন দুর্বল শরীর ভেদ করিয়া ফুটিয়া পড়িতেছে।.....তাঁহাকে পরমাত্মাতে নিমগ্নচিত্ত দেখিলাম। যোগসমাধিধ্যানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি বলিয়া বোধ হইল।" অঘোরবাবু লিখেছেন।

মাস কয়েক পরে অঘোরবাবু পুনরায় মহর্ষির দর্শন লাভ করেন। "মহর্ষি বলিলেন, লোকে বলে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া মিছা ঘুরিয়া বেড়াইয়া কি ফল। লোকে বোধ হয় তোমাদিগকে এই সব কথা বলিয়া থাকে। যে মানের উপাসনা করে সে মানী হয়, যে যশের উপাসনা করে সে যশোবান হয়, যে ব্রহ্মের উপাসনা করে সে ব্রহ্মবান হয়। আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও সেই মহানের উপাসনা করিয়া মহান হই।" অঘোরবাবু দেখেন "মহর্ষি সর্বদাই ব্রাহ্মধর্মের শ্লোক বলিতেছেন। ঈশ্বর প্রেমে যেন সদাই মত্ত।...তিনি বলিলেন, উপনিষদে ঈশ্বরকে প্রজ্ঞানঘন—ঘনীভূত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ প্রজ্ঞার ডেলাবরূপ বলা হইয়াছে। প্রজ্ঞার উপাসনাতে প্রজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে তিনি সৌন্দর্য ঘন—জগতের সকল সৌন্দর্য একত্র করিয়া দেখ, সকল সৌন্দর্য যেন একত্র হইয়াছে—সকল সৌন্দর্য তাঁহারই, তিনি সৌন্দর্য ঘন।"

এসব উক্তি উদ্ধার করার উদ্দেশ্য মহর্ষি ছিলেন সৌন্দর্যঘন ব্রহ্মের উপাসক। তাঁর সেই সাধনা তাঁর পুত্রদের জীবনেও বর্তায়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের জীবনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের উত্তরসাধক।

এর পরে মহর্ষি একদিন অঘোরবাবুকে ডেকে পাঠান। বিস্তর আলোচনার পর ১৮৮৮ সালের গোড়ার দিকে মহর্ষি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ডীড সম্পাদন করেন। ট্রাস্টীরা কলকাতায় থাকবেন, সুতরাং শান্তিনিকেতনে অবস্থানকারী একজন আশ্রমধারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। আশ্রম শব্দটি সেই উপলক্ষে প্রথম ব্যবহার করা হয়। পঁচিশ বছর কাল যা ছিল তা মহর্ষির একান্তবাসের জন্যে নির্মিত শান্তিনিকেতন উদ্যানগৃহ। তার পরে যা হলো তা নিরাকারবাদী উপাসকদের জন্যে রক্ষিত শান্তিনিকেতন আশ্রম। "নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রাস্ট ডিডের লিখিত কার্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর যে কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদয় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রাস্টী নিযুক্ত করিতেছি..." এই হলো দলিলের বয়ান।

তিন হাজার বছর আগে আমাদের দেশে ঋষিরা ছিলেন, তাঁদের আশ্রমও ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্বে আবার ফিরে এলো সেই যুগ। ঋষিরা এলেন, আশ্রম আসবে না? ভারতবর্ষ ছেয়ে গেল আশ্রমে। তপোবন সৃষ্টি হলো কেবল হিমালয়ে নয়, শহরের আশে পাশে, রেল স্টেশনের অনতিদূরে, বৃক্ষবিরল প্রান্তরে। শান্তিনিকেতন যে সময় আশ্রম আখ্যা নেয় সে সময় আশ্রম কথাটা পুঁথির পাতা থেকে সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তার রূপ তখনো স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু নাম স্থির হয়ে যায়। অন্নপ্রাশনেরও ব্যবস্থা হয়। বার্ষিক আয় ছিল ১৮০০৲ টাকা। ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম নির্বিশেষে নিরাকার উপাসনার বিশ্বাসী যে কোনো অতিথি এখানে কিছুদিন বাস করতে পারতেন। খরচ বহন করত আশ্রম।

• আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৪ঠা কার্তিক ১২৯২ সনে (ইংরেজী ১৮৮৫ সালে) এক সভা হয়। এই সভার বিবরণী "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয়েছিল। লিখেছিলেন স্বয়ং অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। "প্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, যিনি ধর্মালোচনা ও ধর্মোন্নতির জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুকাল

ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইঁহারা দুইজনে উপাসনার আচার্যের কার্য করিয়াছিলেন। মোহিনীবাবাবুর বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান পাঠ এবং রবীন্দ্রবাবুর প্রাণস্পর্শী সুমধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চব্বিশ বছর।

পরে ৯ই কার্তিক সন্ধ্যার পূর্বে শান্তিনিকেতনে সাপ্তাহিক উপাসনার সূত্রপাত হয়। মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ছিলেন এক নম্বর ট্রাস্টি। তাঁর অনুরোধে অঘোরবাবু আচার্যের কার্য নির্বাহ করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে উপাসনার কার্য সম্পাদিত হয়। বোলপুর থেকে চার পাঁচ জন ভদ্রলোক যোগ দিয়েছিলেন। এর পরে ১১ই কার্তিক আশ্রমে আসেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। তিনি তখন "কাণ্টের দর্শন ও বেদান্ত দর্শন" নিয়ে তন্ময়। সেই মাসেই মহর্ষি অঘোরনাথকে ডেকে পাঠান ও আশ্রমধারী নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর বোলপুরের বাসস্থান ছেড়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করতে আরম্ভ করেন। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ব্রহ্মোপাসনা হতো। আশ্রমে আমিষভোজন নিষিদ্ধ। অঘোরবাবু নিরামিষাশী। অসুবিধা হলো তাঁর পরিবারের। আশ্রমের বাইরে "নিচু বাংলা" নামে একটি খড়ের বাংলা ছিল। এখনো আছে, কিন্তু খড়ের নয়। তাঁদের যেদিন মাছ খাবার ইচ্ছা হতো সেদিন সেখানে গিয়ে খেতেন। পরবর্তীকালে এটি হয় দ্বিজেন্দ্রনাথের আবাস।

ক্রমে ক্রমে নানা স্থান থেকে ব্রাহ্মরা আসতে লাগলেন। তাঁদের সম্বন্ধে অঘোরবাবু লিখেছেন, "তাঁহারা জাতীয় বা কৌলিক উপাধি ত্যাগ করিয়া সার্বজনীনতা প্রদর্শনের জন্য বিচিত্র উপাধিযোগে আপনাদের নাম উল্লেখ করিতেন। কেহ হইলেন সৈয়দ মুহম্মদ গডসন (Godson), কাহারও উপাধি "ব্রহ্মসন্তান"। বিনোদবাবু "লেডি ফ্রেণ্ড" (Lady Friend) উপাধিতে পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন।"

আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় মন্দির ছিল না। মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯০ সালের শেষের দিকে। স্থাপন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। উপাসনা করেছিলেন তিনি, বক্তৃতা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ আর গান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একটি তাম্রফলকে তারিখ প্রভৃতি খোদাই করা হয়। সেই ফলক, সেই দিনের স্টেটসম্যান পত্রিকা, সেই মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা ভিত্তিমূলে প্রোথিত হয়। আশ্রমধারী অঘোরনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতির সাহায্যে লিখেছেন, "তখন আমার বয়স পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। নির্জন আশ্রম বহু কর্মীতে ভরে গেছে, পাথর কাটা হচ্ছে, তার বিচিত্র শব্দ, তার পর রং-এর কাজ, টিন-টিন রং এসেছে, স্ত্রীলোকেরা তা শিলে বাটছে, ছাঁকছে, তার পর মিস্ত্রীরা লাগাচ্ছে। বহু-রং-এর কাচ কাটা হয়ে লাগানো হচ্ছে।..."

এক বছর পরে মন্দিরের কাজ সারা হয়। তখন ৭ই পৌষ মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন। তাতে ছিল, "অদ্য সর্বসাক্ষী পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের কৃপা স্মরণ পূর্বক এই শান্তিনিকেতন আশ্রমস্থ নূতন ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার জাতিধর্ম অবস্থা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণের ব্রহ্মোপাসনার জন্য উন্মুক্ত হইল।" সেদিনকার প্রাতঃকালীন উপাসনায় বেদী গ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও অচ্যুতানন্দ স্বামী। বক্তৃতা করেন শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। সন্ধ্যাকালের উপাসনায় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একাকী বেদী গ্রহণ করে উৎসব সমাধা করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করার জন্যে তিনি মহর্ষির কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের নন,

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। শান্তিনিকেতনের মন্দির শুধুমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের ঘরোয়া জিনিস হয়ে থাকলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কখনো তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে দিত না। এ মন্দির নিরাকারবাদী ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই আপনার জিনিস। পরের বছর তাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একাকী উপাসনা করেন প্রাতঃকালে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সন্ধ্যাকালে। প্রতাপচন্দ্র ছিলেন কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তথা নববিধান সমাজের আচার্য। মহর্ষির দেখছি অব্রাহ্মণে আপত্তি ছিল না ১৮৯২ সালের শেষে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বেদীগ্রহণে।

জ্ঞানবাবুর জবানীতে "তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সর্বপ্রথম আতসবাজি প্রদর্শন করা হয়, এবং পঞ্চম বার্ষিকে সর্বপ্রথম মেলা ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা হয়। কএক বছরই ভক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর যাত্রার দল নিয়ে এখানে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর দল এখানে কএকবার গান করে গেছে। অনেক উৎসবেই গুরুদেব গানের ভার নিয়েছিলেন। তিনি উপস্থিত থাকলে দু'একখানা গান একলাই গাইতেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় উৎসবে কীর্তন করতেন, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুত্র করুণাকুমার সেন একবার খোল বাজিয়েছিলেন।"

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ তখনো গুরুদেব হননি। তখনকার দিনে তিনি শিলাইদায় জমিদারি দেখছেন আর "সাধনা" সম্পাদনা করছেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর আসা নিয়মিতভাবে পৌষোৎসবের সময়। অন্য সময়ও তিনি আসতেন। অন্য সময় শান্তিনিকেতন ভবনের একতলার বড় ঘরে জাজিম বিছিয়ে উপাসনা হতো। জ্ঞানবাবু তাঁর মাতৃদেবীর পাশে বসে উপাসনায় যোগ দিতেন। তাঁর পিতৃদেবই উপাসনা করতেন। প্রায়ই বাইরের সাধকরা কেউ না কেউ আসতেন, আর এরূপ কেউ এলে তিনিই উপাসনা করতেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায়ই আসতেন। আশ্রমে একখানি বৃহদাকার বাইবেল গ্রন্থ ছিল, তিনি সেখানি সম্মুখে নিয়ে উপাসনায় বসতেন। জ্ঞানবাবু অন্যান্য সাধক অতিথিদের নামের তালিকা দিয়েছেন। তাতে দেখতে পাই অনেকেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি অনেকবার এখানে দেখেছেন। অঘোরবাবুর ডায়ারিতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে বসে এখানে উপাসনা করতেন।

জ্ঞানবাবুর পিতৃদেব অঘোরবাবু প্রায় দশ বছর আশ্রমধারী ছিলেন। তাই তাঁর নিজের স্থিতিও দশ বছর কাল। তার পরেও তিনি বোলপুর থেকে আসা যাওয়া করতেন। তিনি লিখেছেন, "অনেকে মনে করেন কেবল উৎসবের সময়েই এখানে কিছু হতো, অন্য সময় স্থানটি এমনই পড়ে থাকত। একথা ঠিক নয়। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা এখানে নিয়মিত হতো। তা ছাড়া, বিশেষভাবে সাধনভজনের জন্যে অতিথি সমাগম সারা বছর চলতো।" আরো লিখছেন, "বাইরের উপাসকরা এলে আশ্রমে সঙ্গীত, উপাসনা, আলোচনা প্রভৃতি প্রায় সমস্তক্ষণই চলতো। এখানকার আবহাওয়া এমনি ছিল যে আমি বালককালেই অনুভব করেছি এ স্থান বোলপুর কিম্বা আমাদের গ্রামের ন্যায় নয়, এ ধর্মকর্মের স্থান।"

অঘোরবাবুরা চলে যাবার পর শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাজ অচ্যুতানন্দ স্বামী নামক এক উত্তরভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি সংস্কৃত উচ্চারণ করতেন নির্ভুল আর বাংলা বলতেন ভাঙা ভাঙা।

সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্তৃক শুদ্ধভাবে উপনিষদ্ মন্ত্র পাঠ মহর্ষিকে পরম তৃপ্তি দিতে থাকল। যদিও তিনি শান্তিনিকেতনের ত্রিসীমানায় বাস করেন না। এদিকে আশ্রম আর ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার সাধকদের টানতে পারছিল না। ঐ মন্দিরই পৌষোৎসবের সময় যতটুকু সম্ভব দর্শক আকর্ষণ করত। মহর্ষি যেমন জীবন্মৃত, তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজ যেমন জীবন্মৃত, তাঁর শান্তিনিকেতন তেমনি জীবন্মৃত।

এই অচল অবস্থা দূর করার জন্যে বলেন্দ্রনাথ এক ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করেন। আশ্রমের ট্রাস্ট ডীডে ব্রহ্মবিদ্যালয় কথাটির উল্লেখ ছিল, কিন্তু সংজ্ঞা ছিল না। ব্রহ্মবিদ্যালয় কি ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়নের জন্যে, না ব্রাহ্মধর্মের মূলনীতি অনুসারে শিক্ষাদানের জন্যে? বলেন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাকে রূপ দেবার আগেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। সে সময় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদায় তাঁর সন্তানের সাহেব ও বাঙালী শিক্ষক রেখে নিজের ইচ্ছামতো শিক্ষা দিচ্ছেন। অন্যের সন্তানদের দায়িত্ব নিয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিচালনার কথা তাঁর মনে উদয় হয়নি। শান্তিনিকেতনে বসবাস করাও তখন তাঁর ধারণার বাইরে। পাটের কারবারে লোকসান দিয়ে দেনায় জড়িয়ে পড়ার পর তাঁর জীবন একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। সঙ্কটটা আর্থিক তো বটেই। তার চেয়েও বড়। পারমার্থিক।

কবিগৃহিণী আর শিলাইদায় থাকতে চাইছিলেন না, মেয়েদেরও বিবাহের বয়স হয়ে যাচ্ছিল সেকালের নিরিখে। কবি সপরিবারে কলকাতা চলে আসেন, পর পর দুই মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু শিলাইদায় ফিরে যান না। কলকাতায় তাঁর মন লাগে না। তাঁকে তাঁর আভ্যন্তরিক সঙ্কট থেকে উদ্ধার করে শান্তিনিকেতন। বোধহয় ঋণগ্রস্ত গৃহস্থেরও প্রয়োজন ছিল জমিদারি চালাতে না থেকে কম খরচে থাকা। মহর্ষির কাছ থেকে তিনি যে মাসোহারা পেতেন সেই ছিল তাঁর সম্বল। বই থেকে বিশেষ কিছু আয় হতো না।

এর আগে রবীন্দ্রনাথ দুবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন গান করেছেন। ভাষণ দান করেননি। দশম বার্ষিক উৎসবে তাঁকে আচার্য হতে বলেন মহর্ষি। ততদিনে "নৈবেদ্য" লিখে মহর্ষিকে উৎসর্গ করা হয়ে গেছে। কবির জীবন ঋষির জীবনের অভিমুখে যাচ্ছে। তাই ১৯০০ সালে মন্দিরের বেদী গ্রহণ করার পরবর্তী পদক্ষেপ হলো ১৯০১ সাল থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমবাস। ছেলেদের শিক্ষার জন্যে শিলাইদার সেই গৃহবিদ্যালয়ই শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু আশ্রমের ট্রাস্ট ডীডের সঙ্গে তাঁর সামঞ্জস্য ছিল না। অথচ তাকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নাম দেওয়াই যথেষ্ট নয়। রূপও দিতে হবে। এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রভাবে পড়ে কবি পুনরুজ্জীবন করেন প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রম। দুটিমাত্র ছাতিমগাছ গত চল্লিশ বছর বহুসংখ্যক বৃক্ষলতায় পরিণত হয়ে তপোবনের ভ্রম জাগাচ্ছিল। পাঁচটিমাত্র বালক ব্রহ্মচারী নিয়ে শান্তিনিকেতনের নবপর্যায় সুরু হয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

গল্প বলায় রবীন্দ্রনাথ ॥

কোন্ আদিকাল থেকে মানুষ যে গল্প শুনতে চেয়ে আসছে, তার ইতিহাস কেউ দিতে পারে না। অন্ধকার গুহায় বসে অচেনা অজানা জগৎ সম্বন্ধে কত কাহিনী মানুষ রচেছে দেশে দেশে অগণিত ভাষায়। কত শত ভাষা লোপ পেয়েছে, কত সহস্র কাহিনী বিস্মৃত হয়েছে। শিশু বলেছে—'গল্প বলো', যুবক বলেছে 'গল্প করি', যুবতী বলেছে "তোমার গল্প শুনি।" এ গল্প বলার শেষ যেন নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কত সহস্র পত্রিকায় প্রতি বৎসর কত লক্ষ গল্প বের হচ্ছে এবং কত লক্ষ মুদ্রিত হচ্ছে—তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। মানুষ নিরন্তর যেমন কথা বলছে, তেমনি সে গল্প করেও চলেছে। মানুষের গল্প বলা ও শোনা নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলে আসছে।

এই গল্প বলার ও শোনার নেশার ছাপ রয়ে গেছে সংস্কৃত বেদাদি গ্রন্থ থেকে সুরু করে—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কাব্যে, নাটকে, কথাসাহিত্যে. জাতকে, অবদানে, মঙ্গলকাব্যে, কেচ্ছা কাহিনী, কাদম্বরীতে। য়ুরোপে কত বিচিত্ররূপের মধ্যদিয়ে কত ভাষায় তার প্রকাশ পেয়ে চলেছে। কত ভঙ্গীতে তার প্রকাশ গাথা, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প। ছোট গল্প কবে থেকেই বলা হচ্ছে।—ইতিহাস, পুরাণ, মহাকাব্যের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর মধ্যে অসংখ্য ছোটগল্প। আধুনিক যুগের মানুষ বাইরে তার যতই বৈভব বৃদ্ধি হয়ে থাক অন্তরে তার দেবতা ও দানবরা চিরবাসা বেঁধে আছে, আদিকালের রাত্রির অন্ধকারে যে গল্প সে শুনতো—আজও সে দেখছে আলোকিত রঙ্গমঞ্চে সজীব নরনারীকে অভিনয় করতে গল্পের নায়ক নায়িকারূপে। সেলুলয়েড ফিল্মে আর ইঞ্চি তোলা ফটোগ্রাফ ও শব্দযন্ত্রের সহায়তায় তাদের রূপ ও কণ্ঠস্বর রূপালী পর্দার উপর বহু গুণিত হয়ে ফুটে উঠ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যের কথা উঠলে আমরা তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু এই গল্প বা কাহিনী বলার মাধ্যম কি কেবল গদ্যই? গদ্য ত এসেছে অনেক পরে; এককালে কবিতাই তো ছিল প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম গদ্য, ছোটগল্প ও উপন্যাস নয়। কবিতায়, নাটকে, নাট্যকাব্যে, প্রহসনে, হেঁয়ালী নাট্যে, ব্যঙ্গ কৌতুকে, গদ্যছন্দে রবীন্দ্রনাথ কত গল্প যে করেছেন, তার সমগ্র আলোচনা হয় নি।

আমরা এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলা থেকে যার সূত্রপাত—সেই গল্প বলার কথাই বলবো রেখাঙ্কনে।

বয়স যখন বৎসর এগারো-বারো, তখন বালক রবি পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রা করেন—পথিমধ্যে শান্তিনিকেতনে কিছুকাল থাকেন, সেই বয়সে তাঁর প্রথম গল্প বলার রূপ নিল পৃথ্বীরাজ পরাজয় নামে নাটকে। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছেন "তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীর রসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করিতে পারে নাই।" তবে আমাদের মনে হয় এই কাহিনী

অবলম্বন করেই কবি বিশ বৎসর বয়সে 'কবিচণ্ড' নাটকটি রচেছিলেন। জীবনস্মৃতিতে ঐ নাটকের নাম পর্যন্ত করেননি। একবারই এ বই ছাপা হয়েছিল; অবশ্য রবীন্দ্র রচনাবলী অচলিত খণ্ডে এটি মুদ্রিত হয়েছে।

হিমালয় ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার পর লিখলেন 'বনফুল' কাব্যোপন্যাস—অর্থাৎ উপন্যাস লিখলেন কবিতায় (১৮৭৪-৭৬)। তখন বয়স বছর চোদ্দ হবে। ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে (১৮৮৪ শ্রাবণ) ভারতী পত্রিকার আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথের পদ্যে, গদ্যে, গল্প বলাও সুরু হলো। "কবি কাহিনী"র নামের মধ্যেই প্রকাশ যে এটা একটা কাহিনী নিয়েই লেখা। পদ্যে গদ্যে গল্প কাহিনী সুরু হ'ল ভারতীর প্রথম সংখ্যা থেকেই। প্রথম দুটো সংখ্যায় "ভিখারিণী" নামে একটি ছোটগল্প বালকের লেখনী থেকে বের হলো। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন যে, বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত ছোটগল্প বলার প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। আর তাঁর এই ষোল বছরের লেখা গল্পের মধ্যে ছোটগল্পের ঠাট বজায় আছে।"

"ভিখারিণী"র পর সুরু করেন রীতিমতো একটা উপন্যাস—'করুণা'; সাত মাসে ১৪টি পরিচ্ছেদে ভারতীতে প্রকাশিত হয়; শেষ হয়নি তা' কবি বিলাত চলে গেলেন বলে।

'করুণা'র সঙ্গে যুগপৎ চলেছিল 'কবি কাহিনী'; পূর্বেই বলেছি এটি কাহিনী। 'কবিকাহিনী' সম্বন্ধে কবি অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু 'করুণা'র নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। এসব রচনাকে কবি তাঁর স্থায়ী সাহিত্য সংগ্রহে আদৌ স্থান দেননি।* তবে এসব লেখারও প্রশংসা পেয়েছিলেন খ্যাতনামা লেখকের কাছ থেকে। চন্দ্রনাথ বসু 'করুণা' সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, তাহলে একটু বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, তাঁরই বয়স কেবল আঠারো ছিল না। সমস্ত দেশটাই যেন ঐ বয়সের ছিল, অর্থাৎ বিচারের মান প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

শৈশব সঙ্গীত তাঁর প্রথম কবিতা সংগ্রহ; তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত কবিতা। এই কবিতা সংগ্রহে কয়েকটি গাথা আছে; গাথা ইংরেজিতে ballad. ব্যালাড কি তা মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, স্থানীয় ইতিকথা 'পুরাকাহিনী' লোককথা নিয়ে কবিতা। 'প্রতিশোধ' ও 'লীলা' রীতিমত রোমান্টিক গাথা—হত্যা মৃত্যুতে অবসিত। "ভুলবালা", "অপ্সরার প্রেম" ও গাথা, এদের মধ্য থেকেও গল্প বের করা যায়। এ গাথাগুলির কয়েকটি আমাদের মনে হয়, আহমদাবাদ, বোম্বাইএ লেখা। তবে "ভগ্নতরী" নামে গল্প কবিতাটি বিলাতে লেখা। এই কবিতাটি লেখার কথা কবি জীবনস্মৃতিতে ভালোভাবেই বর্ণনা করেছেন। এটি একটি রোমাঞ্চকর গল্প করে লেখা যায়। এই সব গাথা ভারতীতে প্রকাশিত হয় ১২৮৪-১২৮৭ বঙ্গাব্দের মধ্যে।

বিলাতে থাকতেই "ভগ্নহৃদয়" লিখতে আরম্ভ করেন, তারপর ফেরবার পথে জাহাজে বসে কিছুটা ও অবশিষ্টটা দেশে এসে লেখেন। ভগ্নহৃদয়কে গীতিকাব্য বলা হয়েছে; শিথিল গল্প নিয়ে এটি রচিত। রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি কাব্য লিখেছেন, তা গল্পের ক্ষীণ সূত্রের পাশে দানা বাঁধাবারই চেষ্টা। এই গীতিকাব্য নিয়ে জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

বিলাত থেকে দেশে ফিরলেন ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এক বৎসর পরে যে "বাল্মীকি প্রতিভা" গীতি-নাট্য লিখলেন তাও ত গল্প। খানিকটা সংস্কৃত রামায়ণ কিছুটা কৃত্তিবাসী বাংলা

---

* রবীন্দ্র রচনাবলী অচলিত খণ্ডেও 'করুণা' স্থান পায় নাই।

রামায়ণ, বাকীটা বিহারীলালের সারদামঙ্গল প্রভৃতি থেকে কাহিনী, ভাব, ভাষা নিয়ে এটা লেখেন। বেশ ছোট গল্প করে কাহিনীটি লেখা যেতে পারে।

বাল্মীকি প্রতিভার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'কালমৃগয়া'। এটাও রামায়ণের কাহিনী নিয়ে লেখা।

এতক্ষণ আমরা যে সব বইএর কথা বললাম, তার অধিকাংশ অচলিত। বাল্মীকি প্রতিভার যে রূপ আমরা আজকাল দেখি, তা, 'কালমৃগয়া'র অনেক কিছু জুড়ে নূতন করে লেখা। বাল্মীকি প্রতিভার প্রথম রচিত সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত খণ্ডে স্থান লাভ করে আছে।

রবীন্দ্রনাথের যে-সব গল্প উপন্যাস তাঁর রচনাবলীর মধ্যে স্থান লাভ করেছে তার প্রথমটি হচ্ছে 'বউঠাকুরাণীর হাট'। বিশ বৎসর বয়সের রচনা এটি (১৮৮১-৮২)। সাধারণ পাঠকের কাছে এই উপন্যাস ততটা সুপরিচিত নয়—এর থেকে তৈরী নাটক প্রায়শ্চিত্ত, মুকুটধারা, পরিত্রাণ বেশী পরিচিত।

১৮৮৩ সাল। রবীন্দ্রনাথের এখনো বিবাহ হয়নি, গেছেন কারোয়ারে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। সেখানে একটি গল্প লিখলেন নাটকরূপ দিয়ে। কবিতায় ও গদ্যে সংলাপ আছে এতে। এটি হচ্ছে "প্রকৃতির প্রতিশোধ।" সুন্দর একটি ছোটগল্প লেখা হতে পারে কাহিনীটি নিয়ে।

কারোয়ার থেকে কলকাতায় ফিরে 'ছবি ও গান' লিখলেন। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে তাঁর বিবাহ হলো। তাঁর কয় মাস পরে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহ উপলক্ষে "বিবাহোৎসব" নাটিকা অনেকে মিলে লিখলেন। এর পূর্বে বাড়ীর পাঁচজনে মিলে বারোয়ারী নাটক লেখবার আয়োজন হয়। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে সবটা সামলে 'নলিনী' নাটক খাড়া করতে হয়েছিল। এইটাই তাঁর প্রথম গদ্য নাটক। কবিতায় লেখা নাটকের মধ্যে গদ্য সংলাপ কিছু পাওয়া যায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' জনতার কলরবের মধ্যে।

১৮৮৫ এপ্রিল (১২৯২, বৈশাখ) হতে 'বালক' মাসিকপত্র বার হলে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র রচনা তাতে প্রকাশিত হতে থাকলো। এর মধ্যে গল্প বলার অংশটা খুবই বেশি। প্রথম লিখলেন 'মুকুট'। তারপর 'রাজর্ষি' উপন্যাস সুরু হলো। হাস্যকৌতুক বা হেঁয়ালি নাট্য চলেছে 'রাজর্ষি'র পাশাপাশি প্রায় প্রতি মাসে; এগুলিও তো গল্পমূলক। 'কড়ি ও কোমলের' কয়েকটি কবিতা গল্পধর্মী। লিরিক কবিতা, ধর্মসংগীত, নানা বিষয়ের প্রবন্ধের পাশাপাশি, কাছাকাছি চলছে গল্প বলা।

গদ্য উপন্যাস রাজর্ষি পুস্তকাকারে বের হলো ১৮৮৭ সালের গোড়ায়। বালক পত্রিকায় মাত্র ২৬টি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়—পুস্তকাকারে হলো ৪৪ পরিচ্ছেদ।

এবার 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য লিখলেন 'সখী সমিতি'র ফরমাইশে। কবির পরিচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার [নলিনী] সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। একে সেই নাটকের সংশোধন স্বরূপও বলা যেতে পারে। এই গীতি নাটিকার গোড়ায় কবি নিজে গল্পটিকে দৃশ্যে দৃশ্যে বর্ণনা করেছেন।

গীতিনাট্যের মধ্য দিয়ে গল্প বলা এই শেষ—বহু দশক পরে নৃত্যনাট্যে এই গল্প বলার নেশা নূতন রূপ নিয়েছিল।

ইতিপূর্বে বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া নামে যে দুইটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন তা পৌরাণিক আখ্যানমূলক। কিন্তু মায়ার খেলার সেরূপ পটভূমি নেই।

এবার লিখলেন পুরাপুরি পঞ্চাঙ্ক নাটক 'রাজা ও রাণী'; এর পিছনে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা আছে বলে জানতে পারি নি। এর পর এক বৎসরের মধ্যে লিখেছেন 'বিসর্জন' নাটক। এ নাটকের মূলটা রাজর্ষির মধ্যে থাকলেও অনেক পরিবর্তন করেছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে গোবিন্দ মাণিক্য সুপরিচিত।

"মায়ার খেলা", "রাজা ও রাণী", "বিসর্জন" প্রভৃতি রচনা পর্বে 'মানসী'র কবিতাগুলিও লেখা হচ্ছে, এর অধিকাংশই তীব্রভাবে ব্যক্তিগত ও লিরিক্যাল। তবে 'মানসী'র মধ্যে অনেক কবিতা আছে, যা গল্পধর্মী; এক একটা কবিতা থেকে ছোটগল্প বা রম্যরচনা করা যেতে পারে। আমাদের বক্তব্য কেবল লিরিক কবিতা লিখে, গান রচে ও গেয়ে সব কথা বলা হয় না, যতক্ষণ না মানুষের জীবনে তার রূপটি ফুটে উঠে।

১৮৯১ সালে হিতবাদী সাপ্তাহিক বের হবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে গল্প বলার যে অত্যন্ত সহজ আবেগ নিরুদ্ধ ছিল, তা প্রথম নির্গত হলো। এই বৎসরের শেষভাগে নভেম্বর মাসে সাধনা পত্রিকা বের হতেই রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র রচনার মধ্যে ছোট গল্প একটা বড় স্থান গ্রহণ করলে। সাধনা চলে মাত্র চার বৎসর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ষোল বৎসর থেকে আশী বৎসর—এই ৬৪ বৎসরের মধ্যে ৯০টি গল্প লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'সাধনার' এই চার বৎসরেই লেখেন ৩৬টি। এটা যেন গল্প বলার যুগ।

এই চার বৎসরের মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায় অভিশাপ' নাট্য কাব্য, 'সোনার তরী', 'প্রহসন', 'ছোটগল্প', 'বিচিত্রগল্প' 'দুইখণ্ড' 'কথা চতুষ্টয়' 'গল্পদশক' বের হয়। সাধনার পর্বটাকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের প্রথম স্বর্ণ যুগ বলা যেতে পারে; এবং এ পর্বের বিচিত্র রচনা সম্ভারের যা বাংলাভাষা ও সাহিত্যে অমরস্থান অধিকার করে থাকবে, তা হচ্ছে কবির গল্পগুচ্ছ।

১৮৯৬ সালে 'মালিনী' কাব্য নাট্য ও 'চৈতালি' কাব্যগুও প্রথম কাব্য গ্রন্থাবলীতে। 'মালিনী' বৌদ্ধ অবদান থেকে কাহিনী নিয়ে নাটক। চৈতালির মধ্যে গল্প নেই কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র কাহিনী ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে, রেখার টানে যেন বলা হয়েছে। 'লিপিকার' কথা কবিকার মতো লিখবার উপাদান চৈতালির মধ্যে প্রচুর।

এরপর দুটি বৎসর কবির জীবন কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ে কাটে। রচনার সংখ্যা কম। তবুও পাই বৈকুণ্ঠের খাতা প্রহসন। এও গল্প নাটকের রূপে প্রকাশিত।

সম্পূর্ণ নূতন কাব্য 'কথা ও কাহিনী' (১৯০০) দেখা দিল। 'কথা'র প্রবেশিকা কবিতায় কবি তুলেছেন সেই আদিকালের ধ্বনি :—

"কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চাও
কথা কও, কথা কও।
"তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
লিভাদয়ের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।"

রবীন্দ্রনাথ সেই বিস্মৃত নীরব কাহিনী কবিতায় প্রকাশ করলেন। 'কাহিনী' খণ্ডে গল্পধর্মী কবিতা ও নাটক আছে কয়েকটি।

১৯০১ সাল থেকে এই গল্প বলা রূপ নিল প্রহসনে ও উপন্যাসে। ভারতীর জন্য লিখলেন রঙ্গচিত্র 'চিরকুমার সভা' ও বঙ্গদর্শন নব পর্যায়ের সম্পাদক হয়ে সুরু করলেন "চোখের বালি" উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে গল্প উপন্যাসে নূতন পথ এলো।

এরপর চল্লিশ বৎসর রবীন্দ্রসাহিত্যের যে বিচিত্র সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে বেশ বড় অংশে এই গল্প—তা যে মাধ্যমেই প্রকাশ হয়ে থাক্।

রবীন্দ্রনাথ চোখ দিয়ে যা দেখতেন, কানে যা শুনতেন, বইয়ে যা পড়তেন—এই সব মিশে গিয়ে মনের গহনে যেতো তলিয়ে। তারপর একদিন অনুকূল মুহূর্তে, প্রেমের বেদনায় বা বিরহের স্পর্শ সুখে সুরের রূপে মূর্ত হতো কখনো গানে—কখনো কবিতায়। কিন্তু এটাই কবির সামুদায়িক রূপ নয়। তাঁর মানবিক হৃদয় মানুষের মধ্য দিয়ে আপনার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চাইতো বলে এতো গল্প কাহিনী লিখে বিচিত্র নরনারী সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাসের পাতায় পরীক্ষার্থী ছাত্রদের স্মৃতির মধ্যে আশ্রয় পেয়ে আছেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা। কিন্তু সাহিত্যিকদের সৃষ্ট অলীক চরিত্রগুলিই সাধারণ মানুষের মনকে ভরে রেখেছে। এই অলীকের প্রতি আকর্ষণ বলে গল্প বলিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো মজলিশে উপস্থিত হলেই গল্প বলতে হতো তাঁকে। গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পের কৌতুকপ্রদ ইতিহাস আছে।

গল্প শুধু রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি—অনেক সাহিত্যিক বন্ধুদের গল্পের খোরাক জুটিয়ে দিয়েছেন।

মানুষের সেই আদিম প্রেরণা গল্প বলা এবং গল্প শোনা তার নিবৃত্তি আজও হয়নি। তবে গল্পের বিষয়, বলার ভঙ্গী বা মাধ্যমের বদল হয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের ধারাও বদলেছে। ষোল বৎসর বয়সে লেখা 'ভিখারিণী' ও আশী বৎসর বয়সে লেখা 'ল্যাবরেটরী' যেন দুই যুগের দুই মানুষের রচনা। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-সাহিত্যে এই চলমানকালের স্পর্শ রয়ে গেছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

অন্তঃপ্রেরণা

আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র;—তাহারা যে অনামতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনামতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একদিক।

রবীন্দ্রসঙ্গীত দেশী—কি অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল পর্য্যায়ভুক্ত এ'নিয়ে একদল রসিক এখনো চিন্তা থেকে বিরত হন নি এবং সেদিক থেকে একটে অপেক্ষা ক'রে দুটি দল বা পক্ষ স্বীকার করাই সমীচীন। দুটির ভিতর একপক্ষ রবীন্দ্রনাথের গান বা সঙ্গীতকে চিরাচরিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে পৃথক বলেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় দেশী বা সাধারণ আঞ্চলিক সঙ্গীত, আর অপর পক্ষ সঙ্গীতশাস্ত্র থেকে ভাষাঙ্গ, রাগাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ প্রভৃতি বিভাগ ও সঙ্গে সঙ্গে ঘাট বা মেল, অলংকার প্রভৃতির নিদর্শন দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বলেন অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত। দু'পক্ষের প্রচেষ্টাই প্রণিধানযোগ্য। কেননা শ্রেণী বিভাগের কাজ আসলে সার্থক না হলেও অন্তত রবীন্দ্রনাথের গানের প্রকৃতি, রূপ ও মাধুর্য বোঝার তাঁরা কতকটা সুযোগ-সুবিধা পান।

রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার ধারা আগাগোড়া লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চিরাচরিত প্রথা ও প্রচেষ্টাকে তিনি বাদ দেন নি, আবার নির্বিচারভাবে চিরাচরিত ধারাকে অনুসরণ তথা অনুকরণও করেন নি। বরং ক্রমবিকাশের নিত্য নূতন গতিপথে অগ্রসর হয়ে তিনি অগণিত গান রচনা করেছেন এবং ক্রম-অভিব্যক্তির মাঝে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভও করেছেন। বস্তু, প্রকৃতি ও গতির ঐতিহাসিকতাকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তাই বলে সকল-কিছুকে নির্বিচারে গ্রহণ করতেও যে পারেন নি তা তাঁর জীবনী আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়। অথচ সংশয় ও সৃষ্টি—ভাঙা ও গড়া এই দ্বন্দ্বের স্রোতে তাঁর সৃষ্টির পথ চিরদিন গতিচঞ্চলই ছিল। চিরচঞ্চল ছিল তাঁর কল্পনা, সাধনা ও সৌন্দর্যবোধচালিত কর্মশীল লেখনী!

এখন দেশী ও অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত বলতে আমরা বুঝি কি? "দেশী" শব্দটির অর্থ দু'রকম: এক দেশে দেশে প্রচলিত সাধারণ শাস্ত্রশাসন তথা বিধি-নিষেধহীন সঙ্গীত এবং অপরটি দেশীয় তথা লৌকিক অভিজাত সঙ্গীত। সাধারণ বিধিনিষেধহীন গান পল্লীর ছেলেমেয়েরা এবং লোকে মাঠে-ঘাটে সুদূর প্রান্তরে গান করে মনের আনন্দে। নৃত্য বা বাদ্যও থাকে তার সঙ্গে, কিন্তু তারাও শাস্ত্রীয় শাসনে শাসিত নয়। লৌকিক অভিজাত অর্থে দেশী কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধির অন্তর্ভুক্ত সঙ্গীত। সেদিক থেকে ক্ল্যাসিক্যাল যুগের (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—৫০০ থেকে খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিক) গান্ধর্ব বা মার্গ শ্রেণীর ও গান্ধর্বোত্তর পরিশুদ্ধ সঙ্গীতও দেশীসঙ্গীত। খ্রীষ্টীয় ৫ম-৭ম শতকে মতঙ্গ দেশীসঙ্গীতের বিচিত্র সম্ভারের আলোচনায় "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থের রচনা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন সঙ্গীত তথা গান রচনা করেছিলেন তখন নিশ্চয়ই বৃহদ্দেশী বা সঙ্গীত-রত্নাকরের শাস্ত্রশাসন গ্রহণ করেন নি, স্বাধীন আনন্দের উচ্ছলতাই তাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল তাঁর সৃষ্টিপথে। বাল্যকালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সৌন্দর্যানুভূতি থেকে আরম্ভ ক'রে পরবর্তী ক্রম-আবর্তিত জীবনে বিচিত্র পল্লীগীতি, পদাবলীকীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতির রস ও রসানুভূতি পর্যন্ত সকল অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেই তিনি গান রচনা করেছিলেন। তাই ভাষাদি শ্রেণীবিভাগের সাহায্য নেবার তাঁর দরকার হয় নি, অথচ গানে রাগ ছিল, রাগে বিশুদ্ধতা ও মিশ্রণ ছিল, এবং রস ও ভাবানুভূতির বিচিত্র স্পন্দন—সকলই ছিল এবং এখনও

আছে। থাট ও রাগবর্গীকরণের কথা নিশ্চয়ই তিনি জানতেন, কেননা বিংশ শতকের গোড়া থেকে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের কথা ছেড়ে দিলে বিশেষ ক'রে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে ভারতের কৃতবিদ্য হিন্দু ও মুসলমান উস্তাদদের আনাগোনার অবাধ গতি ছিল। নিত্যনিয়মিতভাবে সেখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসতো। সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থের সার-সংকলন ক'রে শাস্ত্রীয় আলোচনার ব্যবস্থা না থাকলেও রাগের জাতি ও প্রকৃতি, বাদী সংবাদী প্রভৃতি লক্ষণ, বিভিন্ন রাগ কোন্ কোন্ থাটের অন্তর্গত, গানের স্বর ও রাগের রূপ এবং রস-প্রকৃতি এসব নিয়ে যে রীতিমতভাবে আলোচনা হত না তা কে অস্বীকার করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সকল আসরে বা আলোচনায় যোগদান না করলেও অধিকাংশ আলোচনার সংস্কার যে তাঁর হৃদয়কে স্পন্দিত করত না তাও বলা যায় না।

কিন্তু তা হলেও লক্ষ্য করার বিষয় যে, তিনি ঐ সকল আলোচনার নির্দেশকে তাঁর গান-রচনার গতিপথে সম্ভাষণ জানান নি। রাগ হিসাবে ভৈরব, ভৈরবী, আনন্দ-ভৈরবী, জয়জয়ন্তী, মল্লার, বেলাবলী, যোগিয়া, কলিঙ্গড়া, বেহাগ, সাহানা, খাম্বাজ প্রভৃতির রূপবিকাশকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন, স্বরের সঙ্গে কথার যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে রচনা ক'রে সাহিত্য বা কাব্যরসের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাই ব'লে অমুক রাগ অমুক থাটের অন্তর্গত, এই বাঁট বা তান এই গানের সহকারী, এই অলংকার থেকে এই থাট বা মেলের সৃষ্টি—এ'রকম ব্যাকরণনিষ্ঠ আলোচনা নিয়ে কোন গ্রন্থ তিনি রচনা করেন নি; অথচ তাঁর সৃষ্টির কাজ অব্যাহতই ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র গানের প্রসঙ্গে বিচিত্র রাগের রূপ ও রসানুভূতির চাক্ষুষ পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নাট্যশাস্ত্র বা অন্যান্য প্রামাণিক সঙ্গীতশাস্ত্রের নির্দেশ নিয়ে রাগ ও কথার মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভৈরো ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ," "মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা", "মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিঃশ্বাস" প্রভৃতি (শ্রীশান্তিদেব ঘোষ-রচিত "রবীন্দ্র-সংগীত", পৃঃ ৮৯—৯০)। এভাবে পরজ, ভৈরবী, কানাড়া, ভূপালী, খাম্বাজ, সাহানা কত-কিছু রাগের রূপ ও রসমাধুর্যের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে ভৈরবাদি রাগের সংস্কৃত ধ্যানশ্লোকের নিছক বঙ্গানুবাদ বা তার তাৎপর্য দেবার চেষ্টা করেন নি। তারপর রাগসজ্জা ও রাগনাম লক্ষ্য করে তিনি কোনদিনই গানের কথা সাজাবার যত্ন করেন নি, কিংবা তাঁর গানের কাব্য বা সাহিত্য রাগের রূপকে আগাগোড়া অনুসরণ করে তারই অনুযায়ী রসসৃষ্টি করার আকুলতা গ্রহণ করেন নি। "রবীন্দ্র-সংগীত" বই থেকেই তার একটা নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। শ্রীশান্তিদেব বাবু লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথ গানের কথার সঙ্গে যিনি মতের চলতি নিয়মবিরোধী রাগিণী মিশিয়েও খুবই আশ্চর্য রস সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ'মিশ্রণকে অসম্পূর্ণ বলে অবজ্ঞা করাও সম্ভব নয়। যেমন রাগেশ্রী বা ইমন-ভূপালিতে বর্ষার গান, ভৈরবীতে বীর্যের গান রচনা করেছেন যা শাস্ত্রানুযায়ী সম্ভব নয়" (পৃঃ ৯৫)। সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগগুলির রচনা প্রকৃতির (Nature) সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে বাঁধা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এ' বন্ধন পরাধীনতার বাঁধনের মতোই দুঃসহ ছিল বলে মনে হয়। তালের বেলায়ও তাই, নৃত্যছন্দের বেলায়ও তাই। নাটকের রচনা ও প্রকাশভঙ্গীর বেলায়ও ঠিক তাই। তাই শাস্ত্রের চিরাচরিত বাঁধনকরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান তথা সঙ্গীতকে অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণীর সঙ্গীত বলার সার্থকতা যতটুকু—ততটুকুই সার্থকতা আবার তাকে আঞ্চলিক সঙ্গীত শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করার। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে সকল শ্রেণীর

গানই স্থান পেয়েছে। সকলের সঙ্গে মিতালী পাতিয়েও সে আবার নিজের একটি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে, এটাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ ক্রমবিবর্তনশীল সমাজের পথচারী। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, বিশ্বসৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ-পর্যন্ত কোন প্রাণীই—কোন মানুষই সমাজের এই পরিণতিকে অস্বীকার করে নি বা অতিক্রম করে নি। পূর্বেই বলেছি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি যোগসূত্র আছে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের রচনায়, বর্ণনায়, সুরবিকাশে এবং অর্থ ও ভাবপ্রকাশে সে আদর্শ সুপরিস্ফুট করেছেন। সমাজের গতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন মানুষের রুচি ও দৃষ্টভঙ্গিতে অনেক-কিছু পরিবর্তন সৃষ্টি করে, আর তারই জন্য মানুষ নিত্য-নূতনভাবে সকল-কিছুকে দেখে, উপভোগ করে ও বর্ণনা করে। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সমাজের এই গতি ও প্রকৃতি বাস্তব মূর্তি নিয়ে ধরা পড়েছিল এবং পড়েছিল বলেই তিনি ভরত, মতঙ্গ, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব, নান্যদেব, অভিনবগুপ্ত এবং পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রী ও সঙ্গীত-ভাস্করদের মতো গানে, রাগে, তালে ও নৃত্যে মিশ্রণ এনেছেন, পরিবর্তন এনেছেন, আবার পুরাতনকে অনুসরণ ক'রেও সকল-কিছুর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। এটা তাঁর প্রতিভারই কৃতিত্ব। এটা রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয়। যা এককালে ঘটেছে তা পুরাতনই। সেই চিরাচরিত পুরাতনকে অনুসরণ করেই আবার নূতনের পথ উৎসারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তাই পুরাতনকে অবজ্ঞা করে নি, কিন্তু পুরাতনকেও হুবহু অনুসরণ করে নি। তাই বলা যায়, পুরাতনের মাধুর্যকে নিয়ে তিনি নূতনের জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন, সার্থকও হয়েছে তাঁর সংকল্প ও সাধনা। তাঁর গান ধর্ম ও অধ্যাত্ম অনুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁর গান প্রকৃতির গুণগানে মুখর হলেও প্রকৃতিনিয়ন্তা পরমপুরুষের চরণেই বারবার প্রণতাঞ্জলি জানিয়েছে। সত্য-শিব-সুন্দরের রূপ দর্শন ও তাদের রসানুভূতির আকুলতাই তাঁর গানের গতি ও জীবনছন্দকে মহিমান্বিত করেছে। তাঁর গানে বা সঙ্গীতে তাই এত আবেগ ও এত আকর্ষণ। শুধুই বিচার নয়, আত্মানুভূতির আকুলতাই তাঁর সঙ্গীতকে প্রাণবান করেছে। যে সঙ্গীত মানুষের অন্তরে স্থায়ী স্পন্দন সৃষ্টি ক'রে তাকে প্রাণবান করে রূপান্তরিত করে সেই সঙ্গীতই মহৎ ও শাশ্বত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত এই কৃতিত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে।
হংস যেমন মানস যাত্রী, তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র স্মরণে।

কবিগুরু বলেছেন "আজকের দিনে বাঙালী, যে বাঙালী একদিন এই কীর্তনের মধ্যে লোকসংগীতের মধ্যে বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে, সে কি আজ নূতন কিছু দেবে না? সে কি কেবলি পুনরাবৃত্তি করবে?" তাঁর এই বাণীর মধ্যে সঙ্গীতের মর্মকথা রয়েছে। শিল্পের সার্থকতা তার নবসৃষ্টি, তার স্বকীয়তার মধ্যে। চিরপ্রচলিত ধারায় শিক্ষালাভ, পুরাতনের গবেষণা, জ্ঞানের পথ সুগম করে কিন্তু শিল্পের প্রাণ সঞ্চার হয় তার নব রূপায়ণে। গুরুর শিক্ষার যথাযথ রক্ষণ ও পুনরাবৃত্তি, সাধনা ও নিষ্ঠার পরিচায়ক। সেখানে শিল্পী নিছক সংস্কারের ধারক ও বাহকরূপে গৌরবান্বিত—কিন্তু সঙ্গীতের প্রগতি ক্ষেত্রে যা'কে যুগের স্মারক বলা যায়, সেখানে তাঁর স্বীকৃতি যৎসামান্য। কিন্তু জগতে এরূপ শিল্পস্রষ্টা অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের অবদান, শিল্পে নূতন আলোকপাত, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে।

ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি আদি যুগে। সঙ্গীতের ইতিহাস বলে—ক্রমান্বয়ে সে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। পুরাকালে সঙ্গীতজ্ঞগণ বা সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ রক্ষণশীল ছিলেন সত্য কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই অন্ধ সংস্কারবশত প্রগতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু স্রষ্টাশিল্পীর বিরাট প্রতিভার অবদান সঙ্গীতকে যুগে যুগে সংস্কারমুক্ত করে তাকে নবালোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

সঙ্গীতে সংকীর্ণতার স্থান নেই—প্রকৃত শিক্ষায় যেখানে ব্যতিক্রম, সেখানেই সংকীর্ণতা আসে। সঙ্গীতের ধর্ম উদার, মহান্। যথারীতি সঙ্গীত শিক্ষায় চিত্তের প্রসারতা হয়—মনে জাগায় মানবিকতা, সামাজিকতা ও প্রেম। শিল্পের সাধক সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী। সাধনার মধ্যে শিক্ষাদানের মধ্যে সন্ধান পায় পরমানন্দের। মনীষী রোমা রোঁলা বলেছেন, "Art is a joy of life". এই আনন্দের সন্ধান যে শিল্পী পেয়েছে সেই জগতে বরেণ্য। শিল্পীর ধর্ম আনন্দ অনুভূতি ও আনন্দ পরিবেশন। নব সৃষ্টির মূলে আছে এই আনন্দ। পুনরাবৃত্তির মধ্যে কৃতিত্ব থাকতে পারে কিন্তু আনন্দ নেই।

লীলাময়ী প্রকৃতির অপরূপ রূপকে মানুষ সঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশ করল। ধ্বনি অসীমত্ব সীমার মাঝে এনে তাকে রূপ দিল মানুষ সুরলহরীতে। কোন্ অজানা ইঙ্গিতে মানুষ এগিয়ে চল্‌ল এই কাজে কেউ বলতে পারে না।

সঙ্গীতের মূল রূপ এক—তার ধারা বিভিন্ন হলেও তাঁর আদর্শ এক, লক্ষ্য এক। সঙ্গীতের জাতিভেদ নেই। যাঁরা সত্যই সঙ্গীতরসিক, তাঁদের কাছে সকলপ্রকার সঙ্গীতই পরম শ্রদ্ধার বস্তু।

এই ধারণা আনতে হলে শিক্ষা পদ্ধতি উদার হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রকৃত শিক্ষাপদ্ধতির অভাবে অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনে অন্ধ সংস্কার বদ্ধমূল হয়। যা' শুধু তার নিজের ক্ষতি করে না সঙ্গীত সমাজেরও ক্ষতি করে। সেক্সপিয়র লিখেছেন—"সঙ্গীতে বেরসিক ব্যক্তি না কি মানুষ খুন করতে পারে"—কিন্তু আমি বলি মানুষ খুনের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করে সঙ্গীতকেই খুন করে অসঙ্গত সমালোচনা ও অবাঞ্ছিত মতবাদের দ্বারা। সঙ্গীতের আদর্শ তার উদার ভাবধারার মধ্যে তার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের সহিত আমাদের যোগাযোগ এবং উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনার উল্লেখ করি। আমাদের পরিবার সঙ্গীতানুশীলন, রক্ষণ ও গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ এবং ক্লাসিক সঙ্গীতে অন্যতম ঘরানারূপে পরিচিত। সাধারণত দেখা যায়, যাঁরা ক্লাসিক সঙ্গীতচর্চা করেন, তাঁরা অন্যান্য গানকে যথার্থ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। কিন্তু আমাদের পরিবারে সঙ্গীতচর্চায় এরূপ সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ছিল না। ক্লাসিক সঙ্গীতের সহিত, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং বাঙ্গলার অন্যান্য প্রসিদ্ধ সঙ্গীতধারাও আমাদের পরিবারে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল।

আমরা ছেলেবেলায় গান শিখতাম ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী এবং তার সঙ্গেই চর্চা করতাম বাঙ্গলার দরদী গান—যে গানগুলি আজ পর্যন্ত মনে প্রাণে গাঁথা হয়ে আছে। গ্রীষ্মাবকাশে আমরা দেশে যেতাম। যখন রুদ্র কালবৈশাখী সন্ধ্যাকাশ ঢেকে দিত, তখন আমরা এক সঙ্গে সুরু করতাম "ঐ বুঝি কালবৈশাখী"। "এস হে এস সজল ঘন", "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে", "এস শ্যামল সুন্দর" গান গেয়ে আমার বরষা বরণ করতাম। কবিগুরুর ঋতুসঙ্গীতগুলি ছিল আমাদের অতি প্রিয় গান। রবীন্দ্রনাথ ও বাঙ্গলার অন্যান্য কবিগণের রচিত স্বদেশী সঙ্গীত আমাদের অন্তরে এক অপরূপ উদ্দীপনা সৃষ্টি করত। রবীন্দ্রনাথের—"আমরা সোনার বাঙ্গলা", "এবার তোর মরা গাঙে", "সার্থক জনম আমার" অতুলপ্রসাদের "হও ধরমেতে ধীর", "বল বল বল সবে", "আ'মরি বাঙ্গলা ভাষা" দ্বিজেন্দ্রলালের "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা"—গানগুলি আমাদের অপরিসীম আনন্দ দান করত।

উপরোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করলাম, কারণ আজকের দিনে প্রগতির যুগে যখন শিল্পধারা উদার ও ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয়, তখন দেখা যায় ক্লাসিক সঙ্গীত শিক্ষার্থী বাঙ্গলার সঙ্গীত সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। কিংবা রবীন্দ্রসঙ্গীত, কীর্তন কিংবা পল্লীসঙ্গীত শিক্ষার্থী কণ্ঠ সাধনা এবং ক্লাসিক সঙ্গীতের অনুশীলন প্রয়োজনীয় মনে করে না। এইরূপ বিচ্ছিন্ন সঙ্গীত শিক্ষার ধারা যথার্থ উন্নতির পথে প্রতিকূল। সঙ্গীতের পূর্ণ রূপ তার সমন্বয়ে। সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন ভাবকে রূপায়িত করেছে—এই অবিচ্ছিন্ন যোগ সম্বন্ধে ধারণা ও শিক্ষালাভ প্রয়োজন। এ-যুগ সমন্বয়ের যুগ। জাতিতে জাতিতে সমন্বয়, মানুষে মানুষে সমন্বয় জগতের কল্যাণ সাধন করে। সঙ্গীতেরও সমন্বিত রূপের সাধনাই তার মর্মকথা।

আগেকার দিনে যাঁরা কণ্ঠ সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ হতেন তাঁরা কিন্তু যন্ত্রসঙ্গীতেও অভিজ্ঞ হতেন এবং যন্ত্রসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞগণও কণ্ঠ সঙ্গীতের সাধক ছিলেন। এমন কি বিখ্যাত মৃদঙ্গ বা তবলাবাদক-গণও রসিক সুসঙ্গতকার হওয়ার মানসে গান ও যন্ত্র শিখতেন। প্রকৃত সমঝ তাঁর দ্বারাই সম্ভব যিনি গান নিজে গাইতে পারেন বা যন্ত্র বাজাতে পারেন।

উন্নতি বা নবসৃষ্টির প্রতিবন্ধক হয় অন্ধসংস্কারমূলক শিক্ষাধারা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সঙ্গীত শিক্ষার ধারাকে উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। চিরপ্রচলিত ধারার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার শিল্পী যাতে নবসৃষ্টির অনুপ্রেরণা পায় এরূপ শিক্ষা ধারা প্রবর্তন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ভাবুক বাঙ্গালী, চিন্তাশীল বাঙ্গালী, প্রতিভাশালী বাঙ্গালী কেবলমাত্র পুরাতন আবৃত্তি করেই নিবৃত্ত হবে একথা ছিল তাঁর ধারণার অতীত।

বাঙ্গলার বরেণ্য শিল্পী যদুভট্টের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন অভিনবত্বের সন্ধান। তাই তিনি যদু ভট্টকে সার্থক শিল্পী ও স্রষ্টারূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ভাবের পূজারী কবি, ভাবরস

সমৃদ্ধ সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হতেন। যদুভট্টের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ আর একজন সঙ্গীত শিল্পীর প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। তিনি মদীয় পিতামহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বনামধন্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী যাঁর সুযশ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাঙ্গলার জনগণ তাঁর গানে মুগ্ধ ছিল। হাজার হাজার সঙ্গীতরসিক শ্রোতা তাঁর গান শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। গোসাইজী কলিকাতায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গীতাচার্য ছিলেন বহুদিন এবং ঠাকুর পরিবারের অনেককে সঙ্গীতশিক্ষা দান করেন। যাঁরা গোসাইজীর গান শুনেছেন, তাঁরা জানেন তিনি প্রায়ই আসরে ধ্রুপদ, খেয়াল গেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু করতেন। 'মোরে বারে বারে ফিরালে', 'স্বপন যদি ভাঙিলে', 'নাথ হে প্রেম পথে', 'বিমল আনন্দে জাগ রে', 'পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গল' প্রভৃতি বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি তাঁর কণ্ঠে অতি মধুর ভাবে ধ্বনিত হত। গোসাইজী কর্তৃক গীত হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, গানগুলি রবীন্দ্রনাথের হিন্দীভাষা গান রচনায় বিশেষ সহায়ক হয়। গোসাইজী কাশীমবাজার রাজদরবারে সঙ্গীতাচার্য পদ গ্রহণ করে কলকাতা থেকে চলে যান। তিনি আজীবন রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন।

মদীয় পিতৃদেব তাঁর বাল্যস্মৃতি কথাপ্রসঙ্গে লিখেছেন যে দশ বৎসর বয়সে তিনি যখন প্রথম কলকাতায় আসেন (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে) তখন তাঁর গান শুনে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উচ্চপ্রশংসা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন নিজ ভবনে তাঁর গান শুনে অতিশয় প্রীত হন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভ্রাতাগণও সে সভায় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় ৩০। পিতৃদেব এখনও বলেন "রবীন্দ্রনাথের সে তরুণ উজ্জ্বল চেহারা এখনও চোখে ভাসে।"

আমার পিতা যখন যৌবনে পুনরায় কলকাতায় আসেন এবং সুনাম প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকেই কবিগুরুর সহিত তাঁর যোগাযোগ আরম্ভ হয়। প্রথম সাক্ষাতের দিনই রবীন্দ্রনাথ আমার পিতাকে কয়েকটি গান গাইতে বলেন—যা তিনি মহর্ষিকে শুনিয়েছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল পরেও রবীন্দ্রনাথ সে গানগুলি ভুলে যান নি।

আমার পিতা ১১ বৎসর বয়সে বর্ধমান মহারাজাধিরাজ স্বর্গত বিজয়চাঁদ মহতাবের সভা-সঙ্গীতাচার্য পদে নিযুক্ত হন। কার্য উপলক্ষ্যে বর্ধমানে থাকলেও তিনি প্রায়ই কলকাতা আসতেন বিশেষ করে কবিগুরু যখন কলকাতা অবস্থান করতেন।

তখনকার কালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ছিল সভ্যতা শিল্পসংস্কৃতির কেন্দ্র। দেশ বিদেশের গুণী এ বাড়ীতে আসতেন এবং কবিগুরু এবং তাঁর আত্মীয়বর্গের সহিত পরিচিত হয়ে ধন্য হতেন। সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীগণ এখানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাগ সঙ্গীত রচনায় ভারতীয় সঙ্গীতের যে শ্রেষ্ঠ ধারা বাঙ্গলার বিষ্ণুপুরে—ভাব সম্পদে মাধুর্যমণ্ডিত এবং কাব্যভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল সেই ধারাকেই গ্রহণ করেন। মহাত্মা রামমোহন প্রমুখ স্বনামখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতাগণ যে সকল গুণী সঙ্গীতাচার্যগণের নিকট রাগরাগিনী ও গান সংগ্রহ করেন তন্মধ্যে বিষ্ণুপুরের গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আমার পিতা হিন্দী ও বাঙ্গলা গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহ দান করতেন। একবার কলকাতায় জোড়াসাঁকো বাড়ীতে সন্ধ্যায় কবি আমার পিতার স্বরচিত কয়েকটি ধ্রুপদ গান শোনেন। তন্মধ্যে একটি ইমনকল্যাণ রাগের গান তাঁর খুব ভাল লাগে। গানটির প্রথম লাইন "শ্যামকো দরশন

নাহি।" গানটির সুর ও ছন্দ অনুকরণে কবি রচনা করেন "সংসারে কোন ভয় নাহি।" তখনকার দিনে অনেক সাহিত্য কি সঙ্গীতসভায় কবিগুরু সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতেন। একবার এক সভায় আমার পিতার গানের পর কবি ভাষণ দিতে আরম্ভ করে প্রথমে বলেন "গৌরকেশ্বরের গান হল এবারে দাড়িশ্বরের বক্তৃতা"। পিতার খুব বড় বড় গোঁফ ছিল, সেজন্য তামাসা করে অনেক সময় গৌরকেশ্বর বলতেন।

১৯২৬ কি ২৭ সাল হবে। আমি পিতার সঙ্গে কবিগুরুর দর্শনে যাই এবং তাঁকে গান শোনাবার সৌভাগ্য হয়। কবিগুরুর রচিত গান "প্রভাতে বিমল আনন্দে", "স্বপন যদি ভাঙিলে" প্রভৃতি গান শুনিয়েছিলাম। স্বরলিপি সম্বন্ধেও আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করেন। সেদিন সকালে কয়েকজন সাহিত্যিকও উপস্থিত ছিলেন। পরে বসুমতীর সম্পাদক সতীশ মুখোপাধ্যায় কবির লেখা নিতে আসেন। কবি সতীশবাবুকে বললেন "বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।"

তখন বহু বিদেশী সাহিত্যিক শিল্পী কবিগুরুর দর্শনলাভে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে আসতেন। তাঁদের সঙ্গীত শোনবার জন্য কবিগুরু প্রায় আমার পিতাকে ডাকতেন। রবীন্দ্রনাথ অতিথিগণকে ভারতীয় রাগ-রাগিনীর বিকাশ ও তার গভীর ভাব সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর জন্মোৎসব কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে অতি বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আমার কাকা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর সঙ্গীতকার্যসূচীর ভার পড়ে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপিকারগণের মধ্যে আমার কাকা অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের অধিকাংশ গানের স্বরলিপি করেন ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি প্রণেতা স্বর্গত কাঙ্গালীচরণ সেন। 'গীতাঞ্জলি' এবং অন্যান্য গানের স্বরলিপি করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'গীতলিপি' ৬ষ্ঠ খণ্ডে এবং পরে কবিগুরুর গান স্বরলিপি করেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। কবিগুরুর জন্মোৎসবে আমার পিতা বিখ্যাত রবীন্দ্র-সঙ্গীত "আজি মম মন চাহে" গেয়েছিলেন। আমি সে সভায় "কার মিলন চাও বিরহী" এবং "স্বপন যদি ভাঙিলে" এই দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলাম। এই সভায় কবিগুরুর নানা পর্যায়ের গান সমবেত কণ্ঠে ও অনেক শিল্পী দ্বারা গীত হয়। জন্মোৎসবের পূর্বে প্রায় মাসাধিককাল বিচিত্রাভবনে রিহার্সাল হত প্রতিদিন সন্ধ্যায়। দিনেন্দ্রনাথ নিজে উপস্থিত থেকে সমবেত গানগুলি শেখাতেন। এই জন্মোৎসবের পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আমি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে তাঁকে শুনিয়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীত অনেক শুনেছিলেন এবং ওই বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও অনুশীলন ছিল অসাধারণ। একদিন পিতা তাঁর কণ্ঠে কতকগুলি পুরাতন বিখ্যাত হিন্দীগান শুনেছিলেন। বিভিন্ন প্রকারের কানড়া ও মল্লার তিনি শুনে শুনে আয়ত্ত করেছিলেন। নায়কী কানড়ায় খেয়াল "বল্ যা রে কুনরিয়া" ও ধামার "আয়ো ফাগুন" তিনি গেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে সঙ্গীত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষ্ণুপুরের রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর ভ্রাতা নকুলচন্দ্র গোস্বামীকে সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত করেন। রাধিকাপ্রসাদ, কাশীমবাজারের রাজা মানবীর স্বর্গত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর রাজদরবারে নিযুক্ত হবার পর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল যাবৎ আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য ছিলেন। মধ্যে অবাঙ্গালী ওস্তাদ শ্যামসুন্দর

মিশ্র যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিনিও কিছুদিন আদি ব্রহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য ছিলেন। তখনকার দিনে অবাঙ্গালী ওস্তাদ যাঁরা বাঙ্গলায় থাকতেন তাঁদের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের জন্য সঙ্গীত শিক্ষক সমস্তকার নিয়োগকালে সব সময় আমার পিতার সহিত পরামর্শ করতেন এবং বিষ্ণুপুরের সুযোগ্য শিক্ষকদের পছন্দ করতেন। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথ আমার পিতাকে বহুবার বলেছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের কার্যভার গ্রহণের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও নানা কারণে সম্ভবপর হয়নি।

১৯৩৬ সালে কবিগুরুর শান্তিনিকেতন সঙ্গীত ভবনের জন্য একজন ক্ল্যাসিক্যাল ওস্তাদ নিয়োগের জন্য শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখেন আমার পিতার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে। তিনি চেয়েছিলেন আমাদের পরিবারের কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা। তখন জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র শ্রীঅশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় আসে সঙ্গীত-চর্চা ও কলেজে অধ্যয়নের জন্য। ইন্দিরা দেবী বার বার রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে একদিন অশেষকে সঙ্গে নিয়ে বরানগরে কবির নিকট নিয়ে যান। অশেষের বয়স তখন মাত্র ১৭ বৎসর। প্রথমে দেখেই বলেন "বড় ছোট" তারপর গান শোনেন বরাত করে—ধ্রুপদ, খেয়াল, প্রভৃতি। কবির রচিত "মোরে বারে বারে ফিরালে" গানের মূল হিন্দী গান "মোরি নৈ লাগান" গানটি গাইতে বলেন। গান শুনে কবি অতিশয় খুশি হন এবং ১৯৩৭ সালে অশেষকে সঙ্গীত ভবনে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। আমার পিতার প্রণীত 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা', জ্যেষ্ঠতাত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সঙ্গীত মঞ্জরী'তে প্রকাশিত বহু ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পার সুর ও ছন্দ অবলম্বনে কবিগুরু গান রচনা করেন। বাঙ্গলা ১৩২২ সালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী থেকে আমার পিতাকে "স্বরসরস্বতী" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আমি শান্তিনিকেতনে 'উত্তরায়ণে' কবিগুরুকে গান শোনাই। তিনি গান শুনে অতিশয় প্রীত হন এবং কয়েকদিন পরে ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাকে একটি মানপত্র দিয়ে আশীর্বাদ ও উৎসাহিত করেন। মানপত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত হল—

"Sreeman Ramesh Chandra Banerjee is a talented musician of the Indian Classical School. He comes from a family of musicians and he has a thorough schooling in his subject under the guidance of his renowned father Sangit Nayak Gopeswar Banerjee. Sreeman Banerjee is more over fortunate in having a voice which is at once sweet and expressive. I hope his telant will meet with proper recognition."

কবিগুরুর ভ্রাতুষ্পুত্রী স্বর্গতা প্রতিভা দেবী চৌধুরাণী 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' নামক একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিদ্যালয়টি তৎকালে সারা বাঙ্গলার মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সে সময়ের বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ ঐ বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। বিষ্ণুনাথ রাও, শ্যামসুন্দর মিশ্র, কৌকড খান, কেরামতুল্লা খান (বিখ্যাত সরোদ বাদক) ব্রজেন গঙ্গোপাধ্যায় ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯১৭ সালে মদীয় পিতৃদেব ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। প্রতি বৎসর ওই বিদ্যালয়ের 'রাখীবন্ধন উৎসব' কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট্ হলে অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হত। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায়ই এই বিদ্যালয়ে আসতেন এবং এর উন্নতিবিধানে

সচেষ্ট ছিলেন। সঙ্গীত সঙ্ঘের উৎসবে এবং পারিতোষিক বিতরণী সভায় আমি আসতাম এবং সে সময়ও কবিগুরুকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়।

কবিগুরুর গানের মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতের সমন্বিত রূপ বর্তমান। জগতের আর কোন মহাকবি এত গান লেখেন নি। তাঁর গান যেমন বিভিন্ন পর্যায়যুক্ত তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। বাঙলার গানের ভাণ্ডার তিনি পূর্ণ করে গেছেন। তাঁর ক্লাসিক গান সুর ব্যঞ্জনা ও সুর মাধুর্যে অতি অপূর্ব। তাঁর গান আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। জগতের কোন সঙ্গীতস্রষ্টা গীতিকার বা কবি এরূপ সাড়া বিশ্বের শ্রোতা আকর্ষণ করেন নি।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

• • • •

জীবনবীণা

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়—লোকে লোকে জীবন বীণা বাজে। কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত সুর, কত দেশে কত কালে, সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখদুঃখের জন্মমৃত্যুর আলোক-অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত-অভিঘাতে, বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। • • • সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্ বীণার এই আমি এবং আমার মতো এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝংকৃত হয়ে উঠছে। কী সুন্দর আমি! কী মহৎ আমি! কী সার্থক আমি!

• • •

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে—
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী-মাঝে,
কাজল ঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুম-সুরভি-মাঝে বীণরণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ও মহাজন পদাবলী ।

সে কোন্ বৎসর আমার মনে নাই, কিন্তু দেখিতে গিয়াছিলাম শ্রীনিকেতন। সেই উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে গিয়া শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ সেইদিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে আসিবেন। মনে করিলাম, ভালই হইল শ্রীনিকেতন পরিদর্শন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

সেদিন সন্ধ্যায় আর দেখা করিতে চেষ্টা করিলাম না। কারণ কবি আজ পরিশ্রান্ত, পরদিন সকাল বেলায়ই তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করা বিধেয়।

পরদিন সকাল বেলায় শ্রীনিকেতন যাইবার কালে, রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। তিনি সে সময় অসুস্থ। আমি তাঁহার সহিত কথা কহিতে এমন একটি বিষয়ের অবতারণা হইল যাহাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক সৌম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া উত্তেজনার ভাব আনয়ন করিলেন। আজ আর আমার মনে পড়িতেছে না—যতদূর মনে হয় তাহাতে শরৎচন্দ্রের কথাই উঠিয়াছিল। উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি দেখিলাম যে তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে এমন লোক উপবিষ্ট আছেন, যিনি উত্তেজনার মোড় ফিরাইয়া দিতে চান। আমি এক অবসরে চট্ করিয়া বলিলাম, "আমি একটি পদাবলী বলি, শুনিয়া আপনি হয়ত খুশি হইবেন।"

"কো কহ অপরূপ প্রেম-সুধানিধি
কোই কহত রস-মেহ।
কোই কহত ইহ সোই কল্পতরু
মনুমনে হোয়ত সন্দেহ॥
পেখনু গৌর চান্দ অনুপাম।
যাচত যাক মূল নহি ত্রিভুবনে
ঐছে রতন হরিনাম॥
যো এক সিন্ধু বিন্দু নাহি যাচত
পরবশ জলদ-সঞ্চার।
মানস অবধি রহত কল্পতরু
কো অছু করুণা অপার॥
যছু চরিতামৃত শ্রুতি পথে সঞ্চরু
হৃদয় সরোবর পূর।
উথড়ই নয়ন অধম মরুভূমহি
হোয়ত পুলক-অঙ্কুর॥
নাম হি যাক তাপ সব মীটই
তাহে কি চাঁদ উপাম।
ভন ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত
কোটি কোটি একঠাম॥

পদটি আবৃত্তি করিতে করিতে আমার মনে পড়িল আর একদিনের ঘটনা। সেদিন অজ্ঞান ফটিক প্রভাতে রবীন্দ্রবাবুর দর্শনে গিয়াছিলাম। সেদিন আমার সঙ্গে নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় এবং আমার মেজছেলে গিয়াছিল। রবীন্দ্রবাবু আমাকে দেখিয়া সেদিন প্রভাতে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে তুমি নাকি কীর্তনের আলোচনা করছো?" আমি বলিলাম "না এমন কিছু না। তবে আমি দেখিলাম যে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও ভাষা লোকে ভুলে যাচ্ছে। বৈষ্ণব মহাজনদের গীতে এই সুন্দর পদটি আছে—

"যার পদ রহিরে রহিরে রহিরে।"

তখনি রবিবাবু একেবারে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "আচ্ছা শোন দেখি আমার সুর হচ্ছে কি না", বলিয়া তিনি গান ধরিয়া দিলেন। রবীন্দ্রবাবু বলিলেন "আজ তিরিশ বছর আগে রাজসাহীতে যখন লোকেন পালিত জজ্ ছিলেন, সেই সময় পদটি শুনেছিলাম শিবু কীর্তনীয়ার মুখে।" আমি ত অবাক; তিরিশ বছর আগে এ গানটি শুনেছিলেন, তাহার সুর ও ছন্দ এই তিরিশ বছরের ব্যবধানেও অটুট রহিয়াছে।

আর একদিনের কথা মনে পড়িল। সেদিন রবিবাবু Universityতে কমলা lecture দিচ্ছিলেন। তিনি গোবিন্দ দাসের একটি পদ কিছু সংশোধিত আকারে বলেছিলেন—

"শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ।
ফুল্ল মল্লিকা মালতী-যূথী
মত্ত মধুপ ভোরনী।"

এখানে প্রায় গ্রন্থে প্রচলিত পাঠ উপেক্ষা করিয়া তিনি "মত্ত মধুকর" কথাটির জায়গায় "মত্ত মধুপ" কথাটি ব্যবহার করেন। এই সকল দৃষ্টান্ত দিয়া কি হইবে, তাঁহার অল্প বয়সে রচিত 'ভানুসিংহের পদাবলী' রহিয়াছে। বিদ্যাপতি বা বৈষ্ণব মহাজনদের পদের আর কোন সার্থক অনুকরণ হয় নাই।

আমি ভাবিতেছিলাম যে কবি আমার কথিত পদটির ব্যাখ্যা নিশ্চয় জানেন, কিন্তু দেখিলাম যে পদটি সম্বন্ধে তাঁহার জানা নাই। আমি বলিলাম "আমি এমনভাবে ব্যাখ্যা করবো যেন কেউই কিছু জানেন না।" আমার এই উক্তিতে কিছু শ্রোতারাও যেন বিশেষ বিরক্ত হইলেন বলিয়া মনে হইল। শেষে নিচের কলিতে আমি যখন ঘটকালী করিতেছিলাম তখন ইহাদের কেহ কেহ প্রায় সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার মত। কিন্তু আমি আরম্ভ করিতে তাঁহাদের কুঞ্চিত ভ্রূ একটু সরল হইল বলিয়া বোধ হইল। ঘটকালী কথাটি কদাচিৎ কখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ঘটকের কাজ উভয় পক্ষের মধ্যে মিলন সাধন করা। এখানেও তেমনি ঘটকালীর অর্থ অগ্র-পশ্চাতের মধ্যে মিলন দেখানো, আমি বলিলাম—

নাথ হি যাক
সব তাপ মিটায়ী
তাহে কি চাঁদ উপায়।

প্রশ্নকর্তা এই প্রশ্ন করিতেছেন যে "তুমি ত' বলিলে অনুপম গৌরচন্দ্রকে দেখিলাম, কিন্তু তুমিই ত উপমা দিলে। কবি তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে আমি ত উপমা দিই নাই, শুনিতে ভালো শুনায় তাই আমি গৌরচন্দ্র কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। যাঁর নামে ত্রিতাপ জ্বালা মিটে যায় তাঁহাকে "গৌরচন্দ্র" বলিবার আমার উদ্দেশ্য নয়। কোটি কোটি চাঁদ এক জায়গায় মিলিত হইলেও তাঁহার তুলনা হয় না।"

পদটির ব্যাখ্যা করিয়া আমি অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু সুদীর্ঘ পাঁচ মিনিট কাল অবনত নয়নে কবি চাহিয়া রহিলেন। আমি তখন একটি নমস্কার করিয়া শ্রীনিকেতন চলিলাম।

কেহ গৌরচন্দ্রকে অপূর্ব প্রেম-সুধার সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করেন। আবার কেহ বলেন যে তিনি রসের মেঘ। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে স্বর্গের কল্পতরু বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। রসের মেঘ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন যেহেতু তাঁহার নয়ন যুগলে অবিরাম বারি ঝরিতেছে। আবার কেহ গৌরচন্দ্রকে দেখিলে স্বর্গের কল্পবৃক্ষ বলিয়া মনে হয়, কেন? (গৌরচন্দ্র কি সব কল্পনা, কি সব প্রার্থনা পূরণ করেন? কিন্তু গৌরচন্দ্রকে চরম ও পরম ফলদাতা মনে করেন। কারণ লোকে অনেক কিছু কামনা করে সব ফল কি তিনি দেন?

সেই অঙ্গ আমি বিনু
বিষয় কেনে দিব?
স্ব চরণামৃত দিয়ে
বিষয় ভুলাইব।

কিন্তু আমার মনে কোনটাই লাগিতেছে না কারণ আমি গৌরচন্দ্রকে দেখিলাম যে তিনি উপমা রহিত। লোকের বহুমূল্য রত্ন থাকিলে সে অনেক ধনদৌলত দিলেও রত্ন ছাড়িতে চায় না, কিন্তু আমার গৌরচন্দ্র অমূল্য যে হরিনাম তাহা দ্বারে দ্বারে দেখে লোককে বিতরণ করেন। সিন্ধুর সঙ্গে উপমা কি হয়? কারণ সমুদ্র অগাধ জলরাশি হইলেও তৃষ্ণার্ত যে জন তাহাকে বিন্দুমাত্র দেয় না। মেঘের সঙ্গের উপমার কথা বলিতেছ, কিন্তু পবনের দ্বারা চালিত হইয়া কোথাকার মেঘ কোথায় বর্ষণ করিবে তাহা কিছুই বলা যায় না। কল্পবৃক্ষ লোকের সাধ কামনা অনুসারে ফল বিতরণ করে। কিন্তু এমন করুণাময় কে আছে যাহার আসিতে হয় না। যাহার চরিতামৃত শ্রুতিপথে প্রবেশ করিলেই হৃদয়রূপ সরোবর পূর্ণ হইয়া যায়। যাহার কথা শুনিলে অধম অথবা নিকৃষ্ট মরুভূমিতে পুলক অঙ্কুর সঞ্চার করিতে পারে।

'নাম হি যাক' প্রভৃতির পূর্বেই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

অধ্যাপক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

রবীন্দ্র-কথিকা।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সম্বন্ধে অল্পস্বল্প আলোচনা করবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে।

কিন্তু তা যে-সে ব্যাপার নয়। ছোট একটি নিবন্ধে তার ছিটেফোঁটা ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। গোটা ছেড়ে ফোঁটায় যাঁদের অরুচি নেই তাঁদের জন্যই দু-চার কথা বলব।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন আমার কিশোরবয়স। প্রখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (পরে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি অভিনেতাদের অন্যতম প্রবীণ পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা) আত্মীয়তার সুবাদে প্রায়ই আমার মাতুলালয়ে যাতায়াত করতেন। তাঁরই আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় প্রথম দেখবার সুযোগ পাই।

পটুয়াটোলায় স্বর্গীয় নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের বাড়ীর উঠানে রঙ্গমঞ্চ বেঁধে অভিনয় হয়েছিল। অভিনেতারা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লোক। বলা বাহুল্য, স্ত্রী-ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন পুরুষরাই।

অভিনয় নাটক ছিল "বিসর্জন"। রাজার ও লক্ষ্মণমাণিক্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিনয়েন্দ্রনাথেরই দুই অনুজ—ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন। বাকী সবাই ছিলেন আমার অপরিচিত।

এটুকু আজও আমার স্মরণ আছে যে, অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ অচেনা এক নাট্যজগতে এসে পড়েছি। প্রায় শিশু বয়স থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি, তার সঙ্গে এই নাট্যাভিনয়ের অনেক-কিছুই মেলেনা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, এখানে অভিনেতারা সৃষ্টি করেন নব নব ভাবের ছবি এবং তাঁদের ভাবণে ক'রে পড়ে অনুভায়মান কাব্যরসের ধারা—পেশাদার থিয়েটারে যা দুর্লভ। সেই কাঁচা বয়সেই আমার মন এটুকু ভাসা ভাসা অনুভব করতে পেরেছিল। তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বুঝতে পেরেছি, কাব্যরসে "বিসর্জন" ও "রাজা ও রাণী"কে হার মানাবে, এমন নাটক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আজও অভিনীত হয়নি।

এই নাট্যাভিনয়ের কয়েক বৎসর পরে 'স্বদেশী'র যুগে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হ'ল। টাউন হলের এক বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন শিবাজী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ কবিতা —বাংলা কাব্যসাহিত্যে যা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার প্রধান সম্পদ কণ্ঠস্বর ও আবৃত্তিকৌশল। এই দুই দিক দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে অতুলনীয় বলে মনে হ'ল। "মাইক" তখনও অলীক স্বপন, যন্ত্রগুণে কারুর কিস্‌কিসানিকেও চীৎকার ক'রে তোলা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু অত-বড় টাউন হলের অমন যে বৃহৎ সভাগৃহ—বিপুল জনতা যার কোথাও তিলধারণের ঠাঁই রাখেনি, রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠস্বর তার সর্বত্র গম্-গম্ করতে লাগল এবং সেই কণ্ঠস্বরের মধ্যে পাওয়া গেল নবরসের বিচিত্র উৎসব—বিভিন্ন শব্দার্থ প্রকাশ করবার জন্যে তা হয় কখনো কঠিন, কখনো কোমল, কখনো করুণ, কখনো শান্ত, কখনো বা বীর্যবন্ত।

তার পরের বারে রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম গায়ক রূপে।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ারের উত্তর দিকে অবস্থিত একখানা মেসবাড়ী। তারই পূর্বপ্রান্তে বাসা বেঁধেছিলেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং তাঁরই ঘরে বৈকালে বসত উদীয়মান লেখকদের সাহিত্য-বৈঠক। সেইটিই ছিল আমার জীবনের প্রথম কাব্যকুঞ্জমন্দির। সেখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কবি মোহিতলাল মজুমদার (তখনো কবি-খ্যাতি অর্জন করেননি) প্রভৃতি। সাহিত্য ও আর্ট নিয়ে চলত নিয়মিত আলোচনা এবং তার মধ্যে বিশেষরূপে আলোচ্য ছিল রবীন্দ্রসাহিত্য। সেই মেসবাড়ী আজও বর্তমান, কিন্তু বৈঠকধারীদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ বর্তমান নেই ইহলোকে।—যদিও বৈঠকের সজীব চিত্র আজও যখন-তখন ফুটে ওঠে অতীত-স্মৃতির পটে।

সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "কাব্যে দুর্নীতি"র ধুয়া তুলে সাহিত্যের বাজার গুলজার ক'রে তুলেছেন। খালি গুলজার নয়, বিবাক্ত। একদিন বৈকালে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সেই সব কথা নিয়ে আলোচনা করছি, এমন সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে এসে বললেন, "গা তুলুন, গা তুলুন!"

—"কেন, কি ব্যাপার?"

—"জয় বয়ে যায়—রবীন্দ্রনাথ এখনি এসে পড়বেন য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে।"

ব্যস্, আর কোন কথা নয়। চট্‌পট্ উঠে পড়লুম এবং তিন জনে দ্রুতপদচালনা করলুম য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের দিকে।

তখন ইন্‌স্টিটিউটের নূতন বাড়ি তৈরি হয়নি। গোলদীঘির উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ছিল ইন্‌স্টিটিউটের অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ি। সভাস্থলে গিয়ে দেখলুম চারিদিক জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে—জনতায় প্রায় প্রত্যেকেই যুবক। বহুকষ্টে একপ্রান্তে তিনখানি আসন সংগ্রহ করলুম।

ওস্তাদ গায়ক ইমদাদ আলি খাঁ সবে বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন এবং আজ ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে কিছু বলবেন এবং সেই সঙ্গে দেবেন তার কয়েকটি বিশেষত্বের নিদর্শন।

খাঁ-সাহেবকে এইভাবে পরিচিত ক'রে রবীন্দ্রনাথ উপবেশন করলেন—সেদিন তাঁর আর কোন কর্তব্য ছিল না।

তারপর খাঁ-সাহেবের গাওয়া শেষ হ'ল যথাসময়ে এবং রবীন্দ্রনাথও দাঁড়িয়ে উঠে সভাভঙ্গের কথা ঘোষণা ক'রে প্রস্থানোদ্যত হ'লেন। ঐপর্যন্ত।

তাঁকে যেতে দেয় কে?

সভাশুদ্ধ যুবকের দল সমস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলেন—"আমরা আপনার গান শুনব, আমরা আপনার গান শুনব!"

গান না শুনিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করা অসম্ভব বুঝে নাচার রবীন্দ্র মৃদু হাসিমাখা মুখে আবার চেয়ারের উপরে ব'সে পড়লেন এবং কোনরকম বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে খালি গলায় চাঁছা-ছোলা স্বরে গেয়ে চললেন—

"তুমি কেমন ক'রে গান কর হে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।"

সভাস্থলের দেওয়ালে দেওয়ালে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই মধুরবী সঙ্গীতের স্বরতরঙ্গ, সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ।

বোধ করি সেই বৎসরেই সাহস সঞ্চয় ক'রে নিজেই গিয়ে হাজির হলুম জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের সামনে। সেও এক কৌতুককর কাহিনী, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর।

তারপর অনেকবার গিয়ে বসবার সুযোগ পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের গানের তলায় এবং তাঁর মূল্যবান সংলাপ শোনবারও সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

কিন্তু অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকে দেখবার অবসর পাইনি। তাঁর একাধিক অভিনয়-চিত্র দেখেছি এবং লোকের মুখে মুখে বার বার শ্রবণ করেছি তাঁর অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—কিন্তু পরের মুখে ঝাল খেয়েই তুষ্ট থাকতে হয়। তারপর হঠাৎ মিটল মনের আক্ষেপ।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। বাঁকুড়ায় মহা দুর্ভিক্ষ। কবির কর্ণপটে গিয়ে আঘাত করতে লাগল দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের করুণ ক্রন্দন। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না—আর্তদের সাহায্য করবার জন্যে করলেন এক অভিনব অভিনয়ের অনুষ্ঠান। হু হু ক'রে টিকিট বিক্রি হ'তে লাগল।

অভিনীত হবে সম্প্রতিচিত পালা "ফাল্গুনী"। রঙ্গমঞ্চ বাঁধা হ'ল পুরাতন ঠাকুরবাড়ীর সুবিস্তৃত আঙিনায়। রঙ্গমঞ্চের উপর তেমন অপরূপ দৃশ্য-সংস্থানের কৌশল বাংলাদেশে আগে আর কেউ দেখেনি—যবনিকা ওঠবার পর সেইদিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে সবাই অবাক হয়ে উপভোগ করতে লাগল তার সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য। একই সঙ্গে তা তুলির লিখন ও কবিত্বের আলিম্পন। কেবল সেই দৃশ্য-সংস্থান নিয়েই একটি পৃথক্ প্রবন্ধ রচনা করা যায়।

মূল নাটক "ফাল্গুনী"র সোড়াপত্তন করলে "বৈরাগ্যসাধন" নামে ছোট্ট একটি পালা। তার মধ্যেই অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখলুম এক নবীন কবির ভূমিকায়। দেখেই দৃষ্টি সচকিত হয়ে উঠল। মনে প্রশ্ন জাগল—এই কি "কড়ি ও কোমল" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনার যুগের তরুণ কবি? রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাটের কোঠায়। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হ'তে লাগল, যেন তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে লীলায়িত যৌবনের তারুণ্য উচ্ছলিত হয়ে উঠছে—চোখের সামনে মূর্তিধারণ করেছে যেন ফাল্গুন-জাগানো নবীন বসন্তসখা! ভাবভঙ্গীতে তারুণ্য, কথাবার্তায় তারুণ্য, চলাফেরায় তারুণ্য—দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়ে গেল যেন সঙ্গীতময় তরঙ্গিমার ইঙ্গিত!

তারপর "ফাল্গুনী"তে রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন বৃদ্ধ অন্ধ বাউল সেজে। অন্ধ বাউল বৃদ্ধ বটে, কিন্তু প্রাণের আলোকে দীপ্যমান তার বার্ধক্যও হয়ে উঠেছে সুদর্শন। বোধ হয় ফাল্গুনেরই প্রেরণায় অন্ধ বাউলের প্রাচীনতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল তারুণ্যের তরঙ্গ—নাচের ভঙ্গিতে লীলায়িত দেহে হাতের একতারা বাজিয়ে সে গান ধরলে:

"ধীরে বন্ধু, ধীরে!"

সে গীত এবং গায়কের মূর্তি আমার স্মৃতির মধ্যে অমর হয়ে আছে, কারণ রঙ্গমঞ্চের উপরে আর কোন গায়কই গান গেয়ে তেমন ভাবের অভিব্যক্তি দেখাতে পারেননি। অত্যুক্তি নয়, সত্যকথাই বলছি।

পরের বৎসরেই অর্থাৎ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আবার দেখলুম অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকে। কবির নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশে অতুলনীয় "বিচিত্রা সভা"। সাহিত্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে সেই সভা ছিল সর্বতোমুখী গঠনপাঠন, নিয়মিত আলোচনা চলত প্রতি সপ্তাহে। তার উপরে সেখানে বড় বড় গাইয়েরা এসে গান গাইতেন এবং প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী দেখাতেন নৃত্যকৌশল। একবারেই স্টেজ বেঁধে

হত অভিনয়, যাত্রার আসরও বসত। তেমন সভা বাংলাদেশে আর কখনো হয়নি এবং রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে আর কখনো হবে ব'লেও বিশ্বাস করি না। শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা গর্ব করেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিচিত্রা সভার সভ্য।

বৃহৎ হলঘর। তারই পশ্চিম প্রান্তে ছোট—কিন্তু রূপকথার মায়াপুরীর মত আশ্চর্য এক রঙ্গমঞ্চ বেঁধে অভিনীত হ'ল রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীবিখ্যাত "ডাকঘর" নাটক। সমগ্র নাট্যাভিনয়ের কথা এখানে বলা চলবে না—কেবল অল্পের মধ্যে উল্লেখ করব রবীন্দ্রনাথের কথা।

দুই বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম পরস্পরবিরোধী তিন শ্রেণীর তিনটি ভূমিকায়—"বৈরাগ্য সাধনে" নবীন কবির, "ফাল্গুনী"তে প্রাচীন অন্ধ বাউলের এবং "ডাকঘরে" ঠাকুরদার। প্রত্যেক ভূমিকার নিজস্ব বিশেষত্ব বজায় রেখে যে ভাবঘন অভিনয় তিনি করে গেলেন, প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছাড়া আর কারুর পক্ষে তা সম্ভবপর নয় এবং সে শ্রেণীর নাট্যশিল্পী তখন বাংলাদেশে একজনও ছিলেন না। তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে আরো কয়েকখানি গুরুগম্ভীর নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর বিভিন্নরসান্বিত বিচিত্র ও অপূর্ব অভিনয় দেখে তাঁর অতুলনীয়তা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমার ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে উঠল। তুলনাই যদি করতে হয় তাহ'লে বলব—রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথই।

"ফাল্গুনী" ও "ডাকঘর" নাট্যাভিনয়ের মঞ্চশিল্পে যেসব শিল্পীরা নবযুগের উপযোগী রূপকল্পনার যে উচ্চ আদর্শ, আমাদের পেশাদার রঙ্গালয় তা গ্রহণ ক'রে লাভবান হ'তে পারেনি। বলতে কি, গিরিশোত্তর যুগে আমাদের পেশাদার রঙ্গালয় সব দিক দিয়েই উচ্ছন্নে গিয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। পরে তাকে সর্বনাশের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে কতকটা পরস্থ করলেন যে শিশিরকুমার, তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে রবীন্দ্রভক্ত এবং তাঁর অভিনয়কার্যে পাওয়া যেত নাট্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের বহু বিশেষত্বই।

রবীন্দ্রনাথ নিজের নূতন নূতন রচনা যাচা-বাছা রসিক শ্রোতাকে পাঠ ক'রে শোনাতে ভালোবাসতেন। তাঁর এই নাটকীয় পাঠ বা আবৃত্তি হ'ত পরম উপভোগ্য।

বোধ করি সেটা ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আনন্দ-সংবাদ এল, তাঁর নবরচিত নাটক "মুক্তধারা'র পাঠ শোনবার জন্যে তিনি আমন্ত্রণ করেছেন অল্পসংখ্যক বন্ধুজনদের। এখানে নূতন ক'রে পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি না ক'রে আমার "সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধার ক'রে দিলুম: "সেদিনকার সান্ধ্য আসর বসেছিল অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতলের বসবার ঘরে। শ্রোতার সংখ্যা বেশী ছিল না। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তিন সহোদর তো ছিলেনই, আর ছিলেন "ভারতী" গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন সাহিত্যিক।... করাশপাতা কক্ষতলের দ্বারখানে এসে আসনে আসীন হলেন রবীন্দ্রনাথ,—দীর্ঘ ঋজু দেহ, মুখে মৃদু হাস্য, দুই আয়ত চক্ষে প্রতিভার শান্তস্থির দৃষ্টি, পরিধানে গাঢ়তাঙা রেশমী পাঞ্জাবী ও কাপড়।... আমরা তিনদিক দিয়ে তাঁকে বেষ্টন ক'রে বসলুম, তিনি পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ আরম্ভ করলেন অনতি উচ্চস্বরে।... যে অতুলনীয় কবিত্ব ও রচনাকৌশলের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছেন পাঠককে তা বিস্ময়ে অভিভূত না ক'রে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যখন আবৃত্তি করতে বসলেন,

তখন নাটকের ভাবং বিশেষত্ব ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল ফুলের মত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনুপম কণ্ঠস্বরের অধিকারী, তাঁর কণ্ঠের মধ্য দিয়ে যে কোন ভাব অভিব্যক্ত হ'তে পারত,—যে গুণ নেই বহু শ্রেষ্ঠ অভিনেতার।"

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের মুখে গদ্যে ও পদ্যে আরো যে কত শ্রেষ্ঠীর কত রচনার আবৃত্তি শ্রবণ করেছি, এখানে তার কর্ণ দাখিল করবার জায়গা নেই। তবে আর একদিনের আবৃত্তির কথা আমি কখনো ভুলব না। তাকে ঠিক আবৃত্তিও বলতে পারি না, কারণ তা ছিল আবৃত্তি ও অভিনয়ের মধ্যবর্তী একটা কিছু।

হঠাৎ সাধারণ রঙ্গালয়ের কপাল ফিরল। আমাদের সাধারণ বা পেশাদার রঙ্গালয়কে কবি ভালো চোখে দেখতেন না এবং সেই কারণেই সেখানকার জন্যে লেখনীধারণ করবার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয় না—এ কথা তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি। তাঁর সেই সব কথা তিনি ইহলোকে বর্তমান থাকতেই মৎসম্পাদিত "নাচঘর" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।

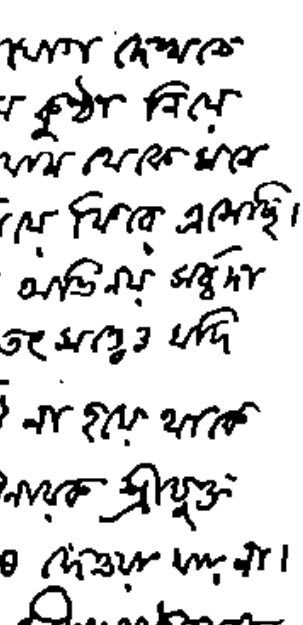

কিন্তু শিশিরকুমারের নাট্যনৈপুণ্য দেখে নবযুগের পেশাদার বাংলা রঙ্গালয়ের দিকে তিনি কতকটা আকৃষ্ট হন এবং শিশিরকুমারকে আশ্বাস দেন যে তাঁর জন্যে তিনি অর্দ্ধেন্দুকে নিয়ে একখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করবেন। "নাচঘরে" সে কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ পাননি। তবে সর্বপ্রথমে শিশিরকুমারের জন্যেই "চিরকুমার সভা" বা "প্রজাপতির নির্বন্ধ"কে ঢেলে সেজে তিনি খাঁটি নাটকের রূপ দেন এবং তারই পাঠ শোনাবারজন্যে আমাদের—অর্থাৎ "ভারতী"র দলভুক্ত কয়েকজন সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করেন।

সেদিন বিচিত্রা সভার হলঘরে বাইরের আর কেউ ছিলেন না—বিচিত্রা-সভায় তিনি সর্বদাই জনতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন, কিন্তু সেদিন সেখানে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে কাছাকাছি একলা পেয়ে মনে বিশেষ আনন্দবোধ করলুম এবং আবিষ্কার করলুম আর একটি সত্যকে। বুঝতে পারলুম, রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন উচ্চশ্রেণীর হাস্যাভিনেতা। তিনি আগেও হাস্যনাট্যের মঞ্চাভিনয়ে প্রেক্ষাগারে হাসির লহর তুলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, কিন্তু সে-সব আমার লোকের মুখে শোনা কথা।

নতুনভাবে মার্জিত, সংস্কৃত ও পরিবর্তিত "চিরকুমার সভা"র পাণ্ডুলিপি পাঠের সময়ে কবির চোখ-মুখের ভাব হয়ে উঠল কৌতুকরসে তরল ও নৃত্যশীল এবং পাত্র-পাত্রীর সমস্ত ভূমিকাই তিনি ফোটাতে লাগলেন পঞ্চম নবরসের কৌতুকীয় রঙে। উপরন্তু কত সহজে তিনি অবলম্বন করতে পারলেন পুরুষদের ও মেয়েদের ভূমিকায় যথাক্রমে পুরুষালী ও মেয়েলী ঢং! রঙ্গরাজের মত চটুলভঙ্গি ও ভাষণ

তাঁর পক্ষে যে এতটা সহজ ও স্বাভাবিক, বাহির থেকে তাঁকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে এ সত্যটা কয়জনে আন্দাজ করতে পেরেছে ?

গানের কথাগুলি কবি মুখ দিয়ে কেবল উচ্চারণ ক'রে গেলেন না, মৃদু সুরে শুনিয়ে আমাদের কানে মধুবর্ষণ করলেন।

সাধারণতঃ মঞ্চাভিনয়ের সময়েও তিনি বেশী হস্ত-পদ সঞ্চালন করতেন না এবং সেদিনকার কৌতুকনাট্যের রসনিবেদনের সময়েও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্ধোত্থিত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী সঙ্কেত ছাড়া আর কোন অঙ্গসঞ্চালনের দরকার হয় নি—অধিকাংশ ভাব পূর্ণগৌরবে অভিব্যক্ত করেছিল তাঁর ভ্রূ, চক্ষু ও কণ্ঠস্বর।

আসল কথা হচ্ছে, গোটা "চিরকুমার সভা"র কৌতুকাভিনয় ক'রে গেলেন তিনি একা-একাই !

মনের মণিকোঠায় অমূল্য মণিকণের মতো দীপ্তি বিতরণ করে এই দিনের চিরনূতন স্মৃতিটি। আজও তা চোখের সামনে ভাসে, আজও বিস্মিত হই।

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত "চিরকুমার সভা" আজ পর্যন্ত অসংখ্য অভিনয় লাভ করেছে। আমিও তা একাধিকবার দেখেছি এবং উপভোগ করেছি। কিন্তু একক রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অভিনীত "চিরকুমার সভা"র সঙ্গে তুলনা করলে সাধারণ রঙ্গালয়ের "চিরকুমার সভা" অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে - চাঁদের সামনে তারার আলোর মত।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বিনার্ডা থিয়েটারের সামনে সেদিন দারুণ ভিড়। দেশবাসী শুনেছে চৈতন্য লাইব্রেরী আহ্বান করেছে এক বিশেষ অধিবেশন, রমেশচন্দ্র দত্ত এসেছেন সভাপতি হয়ে, আর রবীন্দ্রনাথ পাঠ করছেন একটি প্রবন্ধ, বিষয়—'স্বদেশী সমাজ'।

সময় : ২২শে জুলাই, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ। সারা প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ, বাইরে লোকারণ্য, জনতার চাপে এই বুঝি দরজা ভেঙে পড়ে, চতুর্দিকে জনসাধারণের কী আগ্রহ, কী উত্তেজনা।

শেষে ঘোড়সওয়ার পুলিশ ডেকে ভিড় সামলাতে হোল।

এই স্মরণীয় ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়ে শুধু রাজনীতির চর্চা না করে পল্লীসেবার গঠনমূলক কর্মে দেশবাসীকে ব্রতী হতে হবে।

এ যুগের গ্রাম সংস্কার ও পল্লীসংগঠনের সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ।

উদারচরিত রবীন্দ্রনাথ ॥

রবীন্দ্র চরিত্রের যে মহৎ গুণ আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে সে তাঁর পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। বাল্যকাল হ'তে সুদীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯১৭ সালে এগার বৎসর বয়সে আমি তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করি। শান্তিনিকেতন তখন একটি আদর্শ পরিবার। যে পরিবারে কর্তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। একই রকম সাদাসিধে আবাসে সকলের বাস। একই পাকশালায় সকলের আহার।

গ্রাম থেকে এসেছিলাম। জাতিতে ব্রাহ্মণ। কখনো অব্রাহ্মণের হাতে অন্ন গ্রহণ করি নি। কিন্তু তার জন্ম কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। পাকশালায় ব্রাহ্মণদের পংক্তি ছিল পৃথক। ব্রাহ্মণেরাই তাতে পরিবেশন করতেন। অবশ্য কোনো ব্রাহ্মণ যদি অন্য পংক্তিতে বসতে চাইতেন, তাতে আপত্তি ছিল না।

দীর্ঘকাল ভোজন গৃহে এক দীর্ঘ ব্রাহ্মণ পংক্তি দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন বলেন নি—"এখানে ব্রাহ্মণ পংক্তি রাখা চলবে না, একে উঠিয়ে দিতে হবে।"[১] কিন্তু একদিন সেই ব্রাহ্মণ পংক্তি নিজের থেকেই উঠে গেল। কেমন করে গেল, কবে গেল, কারো লক্ষ্য হয় নি। দীর্ঘ পংক্তি হ্রস্ব হতে হতে একদিন একেবারেই অস্তিত্ব হারালো।

জোর জবরদস্তির কোনো প্রয়োজন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সাহচর্য, রবীন্দ্র-সাহিত্য, রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয় ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রভাবপূর্ণ আশ্রমিক আবেষ্টনীতে, সর্বপ্রকার মানসিক সংকীর্ণতা ধীরে ধীরে দূর হতো।

জাতিভেদে অবিশ্বাসী সংস্কারপন্থী রবীন্দ্রনাথ এবং জাতিভেদে বিশ্বাসী সনাতনপন্থী বিধুশেখর শাস্ত্রী একই আশ্রমে পরম অন্তরঙ্গভাবে বাস করেছেন। রবীন্দ্র-মতাবলম্বীর চেয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের মতাবলম্বীর সংখ্যা কম ছিল না। প্রথম দিকে বরং তাঁর মতের লোকই বেশি ছিল। কিন্তু তার জন্য কোনোদিন শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য হয় নি।

এইরূপ মতবিরোধ সত্ত্বেও শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমে যখনই নূতন কিছু প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে প্রবল বাধা পেয়েছেন। কিন্তু কবি তার জন্য কোনোদিন কারো উপর জবরদস্তি করেন নি। মতানৈক্যের জন্য কাউকে আশ্রম ত্যাগ করতে বলেননি। কখনো তাঁকে এজন্য ধৈর্যচ্যুত হতে দেখি নি।

---

[১] ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কৃত প্রথম কার্যপ্রণালীতে আছে : "যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দু সমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান, তাঁহাদিগকে কোনো প্রকারে বাধা দেওয়া বা বিরূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহার স্থানে হিন্দু আচার বিরুদ্ধে কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।"

ধরিত্রীর ন্যায় অসীম ধৈর্যে পরম স্নেহে তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বীদের তাঁর আশ্রমে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁদের রক্ষা করেছেন। আশ্রমবাসীদের কেউ ছিলেন হিংসাত্মক বিপ্লবী, কেউ অহিংসপন্থী, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রীষ্টান, কেউ বা নাস্তিক।

প্রভাতে পাঠারম্ভের পূর্বে বৈতালিক এবং ছুটির দিনে মন্দিরে উপাসনা হোতো—যা এখনো হয়। সকলকে তাতে যোগ দিতেই হবে এমন কোনো জুলুম ছিল না। তবু প্রায় সকলেই তাতে যোগ দিতেন।

শান্তিনিকেতনের মন্দিরটি পৃথিবীর এক অদ্বিতীয় দেবস্থান। এ শান্তিনিকেতন আশ্রমের হৃৎপিণ্ড। এর প্রতি স্পন্দনে ধ্বনিত হচ্ছে—"এ আশ্রম, এখানে কোনো দল নেই, সম্প্রদায় নেই। মানস সরোবরে পদ্ম যেমন বিকশিত হয়, তেমনি এই প্রান্তরের আকাশে, এই আশ্রমটি জেগে উঠেছে, একে কোনো সম্প্রদায়ের বলতে পারবে না।"

আশ্রমেরি মতো এ মন্দির কোনো সম্প্রদায় বিশেষের নয়—এ সর্ব মানবের। যে কোনো ধর্মের, যে কোনো সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তি এ মন্দিরে আচার্যের আসনে বসতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সর্বধর্মাবলম্বী সজ্জনকেই আচার্যের আসনে বসতে দেখেছি।

জুলুমকে আমরা সভ্য মানুষ নিন্দা করি। কিন্তু সে সাধারণতঃ দেহের উপর জুলুমকেই। সকলকে নিজের মতে আনবার জন্য আমরা অন্যের মনের উপর জুলুম করি। কিন্তু তাতে আমাদের সভ্য মন খুশি হয় না। আমাদের পরিবারে, সমাজে, দেশে, রাষ্ট্রে সর্বত্র এ ঘটতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের সময়ে শান্তিনিকেতনে এ কখনো দেখেনি। এ এক মহৎ শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের সংসর্গে এসে পেয়েছি।

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান।"

—১৮ই আষাঢ়, ১৩১৭ (১৯১০)।

রবীন্দ্র-কাব্যের এই সাদর আহ্বান রবীন্দ্র-জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর সেই ক্ষুদ্র আশ্রমের ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয়েও তাঁর আন্তরিক আহ্বানে আর্য, অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, ইংরাজ, খ্রীষ্টান সকলেই এসেছেন।

খ্রীষ্টান ব্রহ্মবান্ধবই প্রথমে (১৯০১-২) এই শিশুবিদ্যালয়ের ভার নিয়েছিলেন। ইংরেজ এণ্ড্রুজ (১৯১৪—৪০) এবং পিয়ার্সন (১৯১৪—২৩) আমরণ এই আশ্রমের সেবা করে গেছেন। শান্তিনিকেতনের গঠনকার্যে তাঁদের দান কম নয়।

"শুনি তব উদার বাণী—
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসীক মুসলমান খ্রীষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে।"

—১৯১১-১২ (১৩১৮)

রবীন্দ্রনাথের উদার বাণীর আকর্ষণে, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসীক, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পূর্ব, পশ্চিম—চীন, তিব্বত, জাপান, পারস্য, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশের বিদ্যার্থী ও বিদ্বানগণ রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর বিশ্বের নীড়—বিশ্বভারতীর রূপদানে সহায়তা করেছেন।

সুদূর নরওয়ে হতে ষোল বছরের বালক এসেছে ছাত্র হয়ে। ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে একই ছাত্রাবাসে বাস করেছে—একই পাকশালায় অন্ন গ্রহণ করেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন—সংজনপ্রিয় পঞ্চনদবাসী ৺ জিয়াউদ্দিন ছিলেন বিশ্বভারতীর আদর্শ ছাত্র এবং উত্তরকালের আদর্শ অধ্যাপক। তেমন মধুর চরিত্র বেশি চোখে পড়েনি।

নানাদেশীয়, নানাজাতীয়, নানা ধর্মীয় ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলের উপর রবি-কিরণের ন্যায়, রবীন্দ্রের স্নেহ সমভাবে বর্ষিত হতো। তিনি ছিলেন সকলেরি সমান প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের সময়ে ধর্ম বা মতের অনৈক্যের জন্য বিশ্বভারতীর পরিবারে কখনো অশান্তি ঘটে নি। শান্তিনিকেতন নাম সার্থক হয়েছিল।

শিশু বিদ্যার্থীগণ, কেবলমাত্র ভূগোল পুস্তকে নয়, চোখের সামনে পৃথিবীর জীবন্ত রূপ প্রত্যক্ষ করতো।

রবীন্দ্রনাথের পরমতসহিষ্ণু উদার কবিচরিত্রের এক মধুর নিদর্শন আমার ছাত্রজীবনের একটি ঘটনা হ'তে দিচ্ছি :—

আমি তখন যুবক। বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের ছাত্র। ১৯১৭ সালে আগত সেই গ্রাম্য ব্রাহ্মণ বালকটি—অব্রাহ্মণের হাতে অন্নগ্রহণ করলে যার জাত যেতো—তার তখন আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই বালক তখনকার আমাকে দেখে চিন্‌তে পারতো না। ভগবদ্‌ভক্ত রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে আমি ভগবদ্‌দ্রোহী। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমার মনোভাব আমি কঠোর ভাষায় কবিতায় ব্যক্ত করি। এরূপ একটি কবিতা সেদিন আমি প্রকাশ্যে সাহিত্যসভায় পাঠ করি; সেদিন সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক আচার্য ছিলেন সভাপতি। কবিতাটির তিনি কঠোর সমালোচনা করলেন। মন খারাপ হয়ে গেল। কয়দিন খুব বিমর্ষতার মধ্যে কাটলো। শেষে একদিন কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে এলাম। দুদিন পরে তাঁর মতামত জানতে গেলাম। সেদিনের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। উৎকণ্ঠা, ভয়, উদ্বেগ, আশা নিরাশা—কত না বিচিত্র মনোবৃত্তি অন্তরে একত্রিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের মুখে হাসি দেখে বুকে বল এলো। তিনি বললেন—কবিতাগুলি ভাল হয়েছে। আমি চমকে উঠলাম। তখন বলেই ফেললাম—"আপনি ভগবদ্‌ভক্ত হয়ে একথা বললেন। আচার্য কঠোর মন্তব্য করেছিলেন।"

উত্তরে তিনি বললেন—"কবির কি মত তাতো আমার দেখবার নয়। কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা, তাই আমার দেখবার। কবির অন্তরের ভাব কবিতায় রূপ পেয়েছে, তাই আমার ভাল লেগেছে। তোর সঙ্গে আমার মতের মিল নাই বা হলো।"

আমি মুগ্ধচিত্তে তাঁকে প্রণাম করে খুশি হয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

রবীন্দ্রনাথের পরমতশ্রদ্ধাশীল বিশাল কোমল কবিহৃদয়ের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি :—

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিধবা পত্নী সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তিনিকেতনের আদর্শ শিক্ষক সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর তিনটি ভগ্নী অবিবাহিতা। প্রথমা রমা (হুটু) সুললিতকণ্ঠী রবীন্দ্রসংগীতে পারদর্শী, রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছাত্রী।

রমা তাঁর শিক্ষাবসানে সংগীতভবনের শিক্ষয়িত্রী হয়েছেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর কনিষ্ঠা দুই ভগিনীর বিবাহ হলো। তারপর তাঁর নিজের বিবাহ। বিবাহ স্বজাতির মধ্যে নয়—তাই বাধা। তাঁর অভ্যন্ত বাধিতা। কিন্তু কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি যাবেন না। কন্যা যাতে সুখী হন—তাতেই তিনি কৃতসংকল্প। তবে তখন তাঁর একমাত্র ইচ্ছা—হিন্দুমতে সনাতন পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে কন্যার বিবাহ হোক।

জাতিভেদ-প্রথার ঘোর বিরোধী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন। আশপাশের গ্রামের কোনো পুরোহিতকেই রাজি করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ শেষে তাঁর বিশেষ পরিচিত বাইরের এক অধ্যাপককে পৌরোহিত্যের জন্য অনুরোধ করলেন। রবীন্দ্রভক্ত সেই অধ্যাপক তাতে রাজি হলেন না। উপরন্তু কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়ে পত্র লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুপত্নী "দুটুর মার" ইচ্ছা পূরণ করতে না পেরে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন—একথা আশ্রমের সর্বত্র আলোচিত হচ্ছিল। আমি তখন বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের ছাত্র। সংস্কার-পন্থী ছাত্রদের একজন নেতা। বন্ধুদের মধ্যে একদিন নেহাৎ পরিহাসচ্ছলে বলেছিলাম—"ভারি তো এক কাজ! তার জন্য ব্রাহ্মণ পাওয়া যাচ্ছে না। এ তো আমিই দেরে দিতে পারি।"

কথাটা কেমন করে রবীন্দ্রনাথের কানে যায়। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান।

প্রাতঃকাল। উদয়নের উপরতলায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্যামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগে রবীন্দ্রনাথ প্রাতরাশে বসেছেন। আমি যেতেই বললেন—"তোকে দুটুর বিয়ে দিতে হবে।"

আমি স্তম্ভিত। দুটু আমার দিদির বয়সী। যাঁর সংগে তাঁর বিবাহ তিনি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক। তাঁদের বিবাহে আমার মতো অর্বাচীন পৌরোহিত্য করবে—এও কি সম্ভব? পরিহাসবিজল্পিত বাক্যকে স্বয়ং গুরুদেব যে গুরুত্ব দেবেন—তা কল্পনা করতে পারিনি।

গুরুদেব অত্যন্ত গম্ভীর। ব্যথিতস্বরে তিনি বলে চললেন—"দুটুর মা জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। শেষ বয়সে আবার এমন এক আঘাত পেলেন। তাঁর মানসিক অবস্থা আমি বেশ অনুভব করতে পারছি। আমি অনেক চেষ্টা করলুম—ব্রাহ্মণ-পুরোহিত পাওয়া গেল না। তুই এ কাজ কর। তোর ভাল হবে।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন—"দুটু তোর সংগে পড়েছে, তোর বন্ধু। তাকে সাহায্য করবি নে।"

তাঁর কথায় আমিও ব্যথিত হলাম। বললাম—"কিন্তু আমি কি পারবো? কখনো যে এ কাজ করি নি।"

তিনি বললেন—"তার জন্য ভাবিস নে। ক্ষিতিমোহনবাবু সব ঠিক করে দেবেন?"

শুভদিনে শুভলগ্নে (২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল), শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে হোম করে হিন্দুমতে হিন্দুপদ্ধতিতে যথারীতি রমার বিবাহ হোলো। জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী রবীন্দ্রনাথ সেই বিবাহবাসরে নীরবে শ্রদ্ধাভরে উপবিষ্ট ছিলেন। দীর্ঘ বিবাহপদ্ধতির শেষের দিকে, রাত্রি অধিক হওয়ায় পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে তিনি গৃহে ফিরে যান।

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-চিত্রের উপক্রমণিকা ॥

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ প্যারিসের Gallery Pigalles নামক প্রদর্শনী গৃহে তাঁর চিত্রকলার এক প্রদর্শনী করেন। ইতিপূর্বে কবির চিত্রশিল্পের অনুশীলন সম্পর্কে তাঁর জনকয়েক অন্তরঙ্গ ছাড়া অন্য কেউ জানত না। অতিশয় গোপনে তিনি তাঁর ছবির একটি সংগ্রহ এবার ইউরোপ যাত্রার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্যারিস পৃথিবীর শিল্পচর্চার রাজধানী; তাবৎ শিল্পবিদের প্রতিভার মূল্য নির্ধারণের প্রধানতম কেন্দ্র। যে শিল্পী প্যারিসের সমালোচক ও শিল্পীদের দ্বারা অভিনন্দন লাভ করতে পারেন পৃথিবীর শিল্প-বিদদের মধ্যে তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রভূত সাহস ও আত্মবিশ্বাস না থাকলে সহসা কোন অজ্ঞাত পরিচয় শিল্পীর পক্ষে প্যারিসের কোন প্রদর্শনীগৃহে চিত্র বা ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করা সম্ভবপর হয় না। নিজের ছবি সম্পর্কে প্রকাশ্যে নানা বিধা ও সন্দেহ প্রকাশ করে থাকলেও মনে মনে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলে কবি তাঁর ছবির পসরা নিয়ে সোজা এই প্যারিসে এসে তার প্রদর্শনী সাজাতে পারতেন না। শিল্প সমালোচকেরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে চমৎকৃত হলেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার যে সব আলোচনা প্রকাশিত হল তাতে প্যারিসের শিল্পানুরাগীদের বিস্ময়মুগ্ধ অভিনন্দন কবি-শিল্পীর উদ্দেশ্যে বর্ষিত হল; উষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবি দেখলেন অগ্রজ শিল্পীদের মিছিলে নিজের স্থানটি তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। কবির নানাবিধ প্রতিভার মধ্যে চিত্রাঙ্কনের প্রতিভাও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে স্বীকৃতি লাভ করল।

প্যারিসের পরে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রদর্শনী জার্মানীর বার্লিনে এবং ইংলণ্ডের বার্মিংহামে প্রদর্শিত হয়; এই উভয় দেশেই রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা বিশেষভাবে অভিনন্দন লাভ করে। অতঃপর স্বদেশে ফিরে এসে কবি তাঁর দেশবাসীকেও নিজের আঁকা ছবির স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কবির অন্যান্য প্রতিভা যেমনভাবে তাঁর সমসাময়িক দেশবাসী ও বৈদেশিক অনুরাগীদের অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁর চিত্রশিল্প কিন্তু তেমনভাবে সাধারণো গৃহীত হয়নি। প্রকৃত প্রস্তাবে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর চিত্রশিল্পের তেমন প্রচার হয়নি এবং তাঁর প্রতিভার এই বিশিষ্ট দিকটি সম্পর্কে তেমন সচেতনতা আত্মপ্রকাশ করেনি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্পর্কে সাধারণের এই উৎসাহের হৈতু সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। একথা সহজেই বলা যেতে পারে যে, সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা যতটা জানি তার মধ্যে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের স্থান অতিশয় নগণ্য। রবীন্দ্রনাথকে আমরা একখানি মহাগ্রন্থের মত ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে দেখেছি। এই মহাগ্রন্থের পর্বগুলি যেমন তিনি নিজেও বেশ কিছু পরিমাণে খুলে দেখিয়েছেন তেমনি অন্যান্য বহু রবীন্দ্রানুরাগীও তা বিশ্লেষণ করে আমাদের গোচরীভূত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কবি নিজেও খুব প্রকাশশীল ছিলেন না। কবে তিনি চিত্রাঙ্কনে পাঠ গ্রহণ করলেন, কিভাবে ছবি আঁকায় এতটা পারদর্শিতা অর্জন করলেন এবং তাঁর ছবির মাধ্যমে কোন্ বাণী প্রচারিত হল সে সম্পর্কে সাধারণের জ্ঞান খুবই ক্ষীণ।

প্রচলিত পদ্ধতিতে কবি কখনও ছবি আঁকার পাঠ গ্রহণ করেন নি। গতানুগতিক ভাবে যেমন তাঁর

বিদ্যাভ্যাসও হয়নি, নিতান্ত আপন প্রেরণায় তিনি নানা বিদ্যা অধিগত করেছিলেন অনেক পরিশ্রম প্রভূত অধ্যবসায় এবং নিরলস সাধনায় তেমনি চিত্রাঙ্কনেও তাঁর অধিকার জন্মেছিল, স্বনির্ধারিত পথের অনুসরণে। তাঁর জীবনস্মৃতির একজায়গায় আছে তিনি জাজিম বিছানো কোণের ঘরে একখানি ছবি আঁকার খাতা নিয়ে ছবি আঁকতেন। এই ছবি আঁকার খাতাখানার শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল তা জানা যায় না। ঠাকুর পরিবারের বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে যেমন পুথিগত বিদ্যার স্থান ছিল তেমনি দেহগঠন চর্চা, সঙ্গীত ইত্যাদি অনুশীলনের দিকেও ভালরকম নজর দেওয়া হত। এই কারণেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথকেও বাল্যকালে হয়ত কোন পেশাদার শিল্পশিক্ষকের কাছে রেখা ও বর্ণবিন্যাসের শিক্ষা নিতে হয়েছিল। কিন্তু পুথিগত বিদ্যাচর্চার মতই শিল্পবিদ্যার চর্চাও তাঁর তেমন এগোয় নি এবং পরবর্তী কালে এই প্রারম্ভিক রেখা ও বর্ণ বিন্যাসের চর্চা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে কোন সাহায্য করে নি। তবে তাঁর পরিবারে শিল্পবিদ্যার চর্চা বেশ ভালভাবেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শিল্পী হিসাবেই প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিলাভ করেন নি, জোড়াসাঁকোর বাড়ী এক সময় ভারতবর্ষের শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গগনবাবু এবং অবনীন্দ্রনাথ যখন তাঁদের নিজেদের ছবি আঁকার জেদের দিয়ে ভারতীয় শিল্পের দিব্যরূপটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্রত করছিলেন তখন তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরাও এসে সমবেত হয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর এই মহাপীঠে। আরও এসেছিলেন এ সময়ে খ্যাতনামা জাপানী ভারত-ভক্ত প্রতিভাধর ওকাকুরা, সিংহলে উপনিবিষ্ট ভারতসন্তান ও পরবর্তী যুগের ভারতশিল্পের প্রধানতম ব্যাখ্যাতা আনন্দ কুমারস্বামী, বিবেকানন্দ-শিষ্যা আইরিশ মহিলা ভগিনী নিবেদিতা। শিল্পকলা নিয়ে ঠাকুরবাড়ীতে যখন এই রকম প্রবল আলোড়ন আপাত-দৃষ্টিতে তখন রবীন্দ্রনাথ আপন কাব্য সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন; অপর্যাপ্ত ধারায় তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্য স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এই প্রাঙ্গনকে সংহত করে কোন প্রতিভাধরের পক্ষেই হয়ত অন্য কোন আঙ্গিকের অনুশীলন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সকলের অজ্ঞাতে তাঁর কাব্য চিত্রগুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কবিতার মাধ্যমে তিনি যে শিল্পসত্তার অন্তরঙ্গভাবে রচনা করে চলেছিলেন সে রচনা যে কি পরিমাণে চিত্রধর্মী ছিল তার পরিচয় রেখে গিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের এই আমলে আঁকা অনেক ছবিই কবির কাব্যরূপকে অবলম্বন করে উৎসারিত হয়েছিল। অবনীবাবুর আঁকা বিখ্যাত 'কচ ও দেবযানী'র ছবি, 'সাজাহানের স্বপ্ন' ইত্যাদি ছবি যেন কবির কল্পলোকেরই রেখা ও বর্ণের রূপদান। পরে যখন কবি নিজেই চিত্রশিল্পী-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর ছবি তাঁর কবিতার গীতধারারই রেখাময়ী রূপ (My pictures are my Versification in line—1930, Paris)।

রবীন্দ্র-প্রতিভানিঃসৃত গীতধারার এই রেখাময়ী রূপের বিবর্তনের ইতিহাস প্রভূত কৌতূহলের উপাদানে সমৃদ্ধ। কবির পাণ্ডুলিপির খাতায় যখন কবিতার খারিজ করা পংক্তিগুলিকে কেটে দেওয়ার প্রয়োজন হত তখন কবি সেই কঠোর হাতের দাগকাটা রেখাগুলি দেখে পীড়া বোধ করতেন; তাঁর মনে হত রূপরাজ্যের অনুভূতির পথে এই চাবুকের মত রেখাগুলি নিতান্তই অশোভন অত্যাচার। অনেকদিন তিনি এই কঠিন রেখাগুলিকে মনের আবেগপূর্ণ প্রেরণার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করবার প্রয়াস পেয়েছেন; যার ফলে পাণ্ডুলিপির পাতায় নানা বিচিত্র রূপগর্ভ নক্সার আবির্ভাব হতে থাকে। পড়ন্তবেলার আকাশের মেঘসম্ভারে যেমন শিশুমন নানা বিচিত্র চেনা অচেনা রূপের সকার প্রত্যক্ষ ক'রে উল্লাস আর আনন্দবোধ করে, শিশুমনের গভীরে যে মগ্নচৈতন্য অফুরন্ত রূপলোকে বিচরণ করে তারই আভাষ প্রত্যক্ষ ক'রে শিশু যেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে, কবির মনও তেমনি আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠত স্বরচিত ওই ইঙ্গিতময়

অপূর্ণাঙ্গ রূপদৃষ্টে। এমনি করে পাণ্ডুলিপির খাতায় তাঁর রূপজগতের আভাষ আত্মপ্রকাশ করে, খুলে যায় এক নূতন সম্ভাবনার দিক।

কবি তাঁর পাণ্ডুলিপির পাতায় এই যে রূপজগতের আভাষ প্রত্যক্ষ করেন তাই নিয়ে তাঁর চিত্র-চর্চার সূত্রপাত হয়। পাণ্ডুলিপির খারিজ করা পংক্তিগুলি জমাট বেঁধে একটা অপূর্ণাঙ্গ রূপ সৃষ্টি করলে কখনও কখনও কবি সেই রূপকে পূর্ণাঙ্গ করবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতেন, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই অপূর্ণাঙ্গ রূপ ইঙ্গিতগর্ভ চরিত্র নিয়ে প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে যেত। এমনি করে কবি তাঁর নিজের প্রয়াসে এক রূপলোকের সৃষ্টি করেছিলেন যে রূপলোকের বিচিত্র অধিবাসীরা কল্পনার জগত থেকে এসে ধরা দিয়েছিল তাঁর কলমের মুখে; এই বিচিত্র রূপলোকে প্রবেশাধিকার লাভ ক'রে কবি মশগুল হয়ে পড়লেন; আস্তে আস্তে এই রূপজগত তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে লাগল; তাঁর প্রতিভা এক নূতন বিচরণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করে প্রবল আবেগে সেই অজ্ঞাতপূর্ব রূপলোকে প্রবেশ করবার জন্য উদ্যোগ করল। তাঁর চিত্রাঙ্কন অনুশীলনের সূত্রপাত হল।

পাণ্ডুলিপির পাতা থেকে প্রথম ছবি কিভাবে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে একক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হল তার সন্ধান এখনও সম্ভবপর হয় নি। ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কখনও পূর্ণ উদ্যমে কবির চিত্রাঙ্কন-চর্চার সূত্রপাত হয়। এই সময় কবি মনে করেন যে তাঁর কাব্যরচনার প্রবাহ কিছু পরিমাণে তিমিত হয়ে পড়েছিল; প্রবল প্রভাব বিস্তার করে তার সৃষ্টিক্ষমতা বহুল পরিমাণে কলাসরস্বতী আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন; বাধা হয়ে কাব্য তার মুষ্টি শিথিল করে দেয়। কাব্য রচনায় কবি যে আনন্দ অনুভব করতেন যে বেদনা-গর্ভ অনুপ্রেরণা প্রবলভাবে তাঁকে কাব্য রচনায় ব্রতী রাখত সেই অনুপ্রেরণাই তাঁকে চিত্র অঙ্কনে অনুপ্রাণিত করেছিল, তিনি ছবি আঁকায়ও অনুরূপ আনন্দই অনুভব করতে থাকেন। কবিতার মতই অজস্রধারায় তাঁর ছবির মিছিল চলতে শুরু করল, কোনো বাধাবন্ধন মানল না—অজস্রতায় তাঁর ছবি কবিতা থেকে কোনো ক্রমেই কম নয়। সত্য বলতে কি অল্প সময়ের মধ্যে (১৯২৬—৩০ খ্রী:) তিনি যত ছবি এঁকেছিলেন কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির অজস্রতা বোধ হয় তত্টা প্রাচুর্য লাভ করে নি।

এই সময়টাতে ছবি আঁকা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। অভাবনীয় দ্রুততার সঙ্গে তিনি তখন ছবি এঁকে চলেছেন; এক মুহূর্ত ধৈর্যধারণ করবার সময় নেই। ছবি আঁকার তার আধার ও আঙ্গিক নিতান্তই তাঁর প্রতিভানুগ এবং বিশিষ্ট। ছবি আঁকার জন্য তার খুব চটকদার আধারের কখনই প্রয়োজন হত না; প্রায় সব ছবিই তাঁর জলরঙে আঁকা; আবার কিছু ছবি কালি কলমের, পেন্‌সিলের বা শুকনো রঙেরও আছে। তেলরঙে ছবি আঁকার মত সময় ও ধৈর্য তাঁর ছিল না, তাই তেলরঙে ছবি আঁকার চেষ্টা তিনি করেননি। যাতে রঙ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় তার জন্য অনেক সময় তিনি রঙে স্পিরিটও মিশিয়ে নিতেন। আঁকবার জন্য তুলির ব্যবহার মাঝে মাঝে করে থাকলেও, তুলো, ন্যাকড়া, কার্ডবোর্ডপেন, কলমের উল্টো দিক—এমনি নানা বিচিত্র উপকরণের হাতের কাছে যা পাওয়া যেত তাই দিয়ে তিনি ছবি আঁকতেন। অনেক সময় ছবি আঁকার দ্রুততায় হাতিয়ার যদি নষ্ট হয়ে যেত বা ভেঙ্গে যেত তবে সেই ভাঙ্গা হাতিয়ার দিয়েই ছবি শেষ করতেন, তাঁর প্রবল সৃষ্টি প্রেরণা কখনও বাধা মানত না।

এমনি করে যে ছবি আঁকা হত তার বৈচিত্র্য এক অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর রূপজগতের সৃষ্টি করে শিল্পানুরাগীদের চমৎকৃত করেছিল। তাঁর ছবির পট যেমন সাধারণ এবং প্রথাবিরোধী, আঙ্গিক যেমন নিতান্তই স্বতন্ত্রধরনের এবং নিজস্ব তেমনি আঁকা ছবির রূপ-কল্পনাও একান্তভাবেই কবির স্বতন্ত্র এবং বিশেষ

প্রতিভার পরিচায়ক, এর সঙ্গে সাধারণভাবে প্রচলিত ছবির কোন যোগাযোগ নেই। অনেকে এই ছবিকে অতি আধুনিকতাবর্ষী Surrealistic বলে অভিহিত করবার চেষ্টা করে থাকলেও, আধুনিকতাপন্থী futuristic, cubistic, surrealistic বা অনুরূপ ক্রমপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাঁর ছবিগুলিকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; মানুষের মূর্তি (সে, খাপছাড়া); পশুমূর্তি (চিত্রলিপি); প্রাকৃতিক দৃশ্য, (landscape) এবং চতুর্থ পর্যায়ের Composition. কিন্তু এই শিল্পের মানুষ, পশু বা প্রাকৃতিক দৃশ্য স্বাভাবিক দৃশ্যজগতের মানুষ, পশু বা প্রাকৃতিক বনপ্রান্তর আকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটা অপরিপূর্ণ রূপসত্তায় এইসব বিষয়োপকরণ সমৃদ্ধ, এরা নিতান্তই কবির ব্যক্তিগত বিশিষ্ট দৃষ্টিতে অনুভূত লোকোত্তর রাজ্যের ছবি; বাস্তবের জগতে এই সব বিষয়ের আসল থাকলেও এরা শিল্পীর একান্ত নিজস্বদৃষ্টিতে বিশিষ্ট। মানুষ বা পশুর বা প্রকৃতির বৃক্ষপ্রান্তর বিন্যাসে যে প্রাথমিক বর্ণসম্পাত আত্মপ্রকাশ করেছিল কবির চিত্রে যেন তারই পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। যে উদ্দাম আবেগ, যে গভীর উন্মাদনা যে প্রবল শক্তিসত্তা, যে বর্বর চিত্তবৃত্তি, যে আদিম প্রবৃত্তি কবির উপলব্ধির রাজ্যকে আন্দোলিত করেছিল যার আভাষমাত্র তিনি যেখায় সেখায় তাঁর কাব্যে উপন্যাসে বা নাটকে রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, সেই অবরুদ্ধ চেতনাই যেন দুয়ার ভেঙে এই ছবির ভেতর দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কাব্য বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত form বা রূপবৃত্তকে অতিক্রম করে কবি কখনও বৈপ্লবিক স্বাধীনতা আশ্রয় করেন নি; কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে গোড়া থেকেই তিনি বিপ্লবী। এখানে তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা কোন বিশেষ form কে স্বীকার করতে চায়নি। তাঁর নিভৃত চৈতন্যের অনুভূতিকে তিনি সমস্ত সংস্কারের অতীত করে একান্ত এবং পরিপূর্ণভাবেই মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই কবির চিত্রে দেখা যায় এক অভূতপূর্ব রূপজগৎ, আপন বৈশিষ্ট্যে, আকৃতিতে, এবং বীর্যবত্তায় সমৃদ্ধ, আপন রূপপরিমায় পূর্ণ।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মন তখন ছিল বাতাসে কানপেতে
যে ভাব ধ্বনি খোঁজে তারই খোঁজে
আজকাল আছে সে চোখ মেলে
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে দেখবে বলে—
সে তাকায় আর বলে সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।

রবিবাসরীয়

রবীন্দ্র-যুগ (১৯১২-১৯১৭)

তৃতীয়বার বিলাত যাত্রার আগে রবীন্দ্রনাথ ৫১তম জন্মদিন পালন করেন নিভৃতে। মে মাসের কিছুদিন শিলাইদহের শান্ত পরিবেশে কাটান, কিছু গান লেখেন (পরে গীতিমাল্যে মুদ্রিত) ও ইংরেজী Gitanjali-র প্রথম খসড়া শুরু করেন। ২৪শে মে পুত্র রবীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে নিয়ে তিনি বোম্বাই যাত্রা করেন। হয়ত মনে পড়েছিল ১৮৭৮—৮১ ও ১৮৯০ সালে দু'বার সমুদ্র পারাপারের কথা যখন কিশোর থেকে যুবক রবীন্দ্রনাথ নূতন গদ্যরীতির প্রবর্তন করে গেছেন: 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' (ভারতী) এবং 'সাধনা' যুগের সার্থক রচনা ও 'পঞ্চভূত' তার প্রমাণ। গদ্য-সাহিত্যের জনক অমর শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র—মনে হয় এসব রবীন্দ্র-রচনার কিছু পড়ে গেছেন এবং তাঁর অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে অর্ঘ্য রচনা করে গেছেন বাংলা গদ্যে তা অতুলনীয়—(সে কথা গত বৎসর চৈত্র সংখ্যায় লিখেছি)। 'বিষবৃক্ষ' রচিত না হলে হয়ত 'চোখের বালি' আমরা পেতাম না; আবার 'আনন্দমঠ' না পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র অনুসরণ আমাদের হয়ত সহজ হত না—এসব আলোচনারও সময় এসেছে। প্রবাসীতে গোরা উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে, মাসের পর মাস, আমরা পড়েছি ও তার আগেকার রচনা 'চোখের বালি' (১৯০৩) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের রচনা। এসব কথা মনে রেখে চিন্তানায়ক কবি গদ্য সাহিত্যেও কত বড় দান করে গেছেন তা ভাবতে হবে। তখন মনে পড়বে ইংলণ্ডে ও আমেরিকা পৌঁছে তিনি শুধু ইংরেজী Gitanjali লেখেন নি, মূল্যবান বহু প্রবন্ধ লিখে নূতন ভাবে ইংরেজী গদ্য রচনা করে, Caxton Hall, London ও Chicago এবং Harvard প্রভৃতি স্থানে পাঠ করে পাশ্চাত্য লোকের মনকেও নাড়া দিয়েছেন: বিশ্বযুদ্ধের আগে (১৯১২-১৪) Sadhana—ও Personality থেকে শুরু করে Nationalism (১৯১৬) এর বজ্রনির্ঘোষ, জাপান আমেরিকা ও ইউরোপে বিতর্ক তথা আত্মজিজ্ঞাসার ঝড় তুলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের (১৯০২) দশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের প্রতিবাদ ও সমন্বয়ের বাণী তেজের সঙ্গে শুনিয়ে এই বিতর্কের অবতারণা করেন।

সে-সব কথা মনে না রেখে, আজ শুধু Gitanjali-র সমাদর ও Nobel পুরস্কার লাভ নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়; কবির শতাব্দী বৎসরের মধ্যে ত নয়ই। তবু স্থানাভাবে সংক্ষেপে বলি, 'কবি' তথা 'চিন্তানায়ক' ও 'গদ্য-শিল্পী' রবীন্দ্রনাথকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

ইংরেজী Gitanjali প্রকাশের আগেই শিল্পী Rothenstein এর মত—রাজনৈতিক নেতা Ramsay Macdonald (পরে শ্রমিক-দলের প্রধান মন্ত্রী) বাংলায় এসে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন ও সেখানে একদিন কাটিয়ে যে সহানুভূতিপূর্ণ আলেখ্য লিখে গেছেন সেটি সযত্নে আবার পড়া উচিত। ভারতের কঠিন সমালোচক মিশনারী ও শ্বেত-শাসকবর্গ ভারতের যে নিষ্ঠুর ছবি সব এঁকে গেছেন তার সতেজ প্রতিবাদ করেন স্বামী বিবেকানন্দ ও কবি রবীন্দ্রনাথ—এটি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সর্বদা স্মরণ করতে হবে। সে কথা বলেছিলাম, ১৯৫৮ সালে আমার 'রবীন্দ্র-নরেন্দ্র যুগ' বক্তৃতায়, লণ্ডন Gandhi Hall-এর সভায়। Kingsley Martinও কিছু দিন আগে ভারত থেকে ফিরে সেখানে বক্তৃতা দেন। তখন রবীন্দ্রনাথের নাইট-পদবী বর্জনের আক্রোশ ইংরেজের মন থেকে সরেছে। ভারত Commonwealth-এর সদস্য থেকে গেছে।

স্বাধীন ভারতের প্রায় ৩৫০০ হাজার বাঙালী লণ্ডনে উপস্থিত। তাঁরা ও আমেরিকাবাসী ভারতীয়েরা বিরাট রবীন্দ্র শতাব্দী উৎসবের আয়োজন করছেন; তাই পূর্ব-পশ্চিমের যোগসেতু রবীন্দ্র ও নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) কে স্মরণ করালাম। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদী Kipling পূর্ব-পশ্চিমের স্বত-বিরোধিতাই প্রচার করে গেছেন; কিন্তু তার প্রতিবাদে বিদেশী-সমালোচকরাই শুরু করেন: 'শ্রীযুক্ত Kiplingএর রচনা ও সিপাহী-বিদ্রোহের প্রকোপ ইংরেজ মনের উপর ভারত সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে তুলেছিল সেটা 'সতী বোনা ও স্নেস' ইত্যাদির আলোচনায় যেন এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে···কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ সেতু বাঁধলেন ও 'The Twain shall never meet' যে অসত্য সেটা প্রমাণ করে দিলেন। বহু ভাষাবিৎ মার্কিন কবি Ezra Pound ১৯১২ সালে কবির কাছে ইংলণ্ডে ছিলেন; তিনিই Gitanjali-র কিছু ইংরাজী কবিতা Poetry পত্রিকায় (Chicago) প্রথম ছাপেন ও তার ফলে সোর গোল পড়ে যায়। চিকাগো বাসীরা হয়তসেকথা আজ স্মরণ করবেন যেমন করেছিলেন ১৮৯৩ সালের Chicago Parliament of Religions.

১৯১২ সালে Scottish Church কলেজ থেকে B. A. (ইতিহাসে অনার্স) পাশ করে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে M. A. (ইতিহাস) বিভাগে ভর্তি হলাম। ছাত্র জগতের সেই মর্মরণ থেকে প্রতি সপ্তাহে যেতাম গঙ্গাতীরে Metcalf Hall গ্রন্থাগারে; বন্ধুবর সুরেন কুমার তখন নিয়মিত পাঠকদের সাহায্য করতেন। তিনি জানতেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রবাস-ভ্রমণ কালে তাঁর সম্বন্ধে বিদেশী পত্রিকাদি যা কিছু ছাপা হচ্ছে তার সন্ধানে প্রধানত আমি আসি। তাই Gitanjali, Gardner, Creecent Moon, Chitra প্রভৃতি Macmillan কোং প্রকাশ করা মাত্র London Times থেকে শুরু করে Athenium ও Nation থেকে শুরু করে Quarterly ও Edinburgh Review এবং Hubert Journal থেকে আমি তন্নতন্ন করে নোট্ নিতাম। ক্রমশঃ ফরাসী ও জার্মাণ পত্রিকায় দেখি রবীন্দ্র-সমালোচনা বেরুচ্ছে—দুটি ভাষায় দক্ষ ছিলেন বন্ধু সুরেন কুমার; তাই তাঁর সাহায্যে 'চুম্বক' নিতাম ও তাঁর পরামর্শ মত অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার ও রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের সাহায্য ও নেতাম—সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ তাঁদের স্মরণ করি। কারণ ১৯১৯—২০ সালে যখন Paris বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হই—এই সব ভাষা আয়ত্ত না হলেও তার চর্চা কেটে গেছে। শান্তিনিকেতনের cuttings book আজ অনেকের কাজে লাগছে। কিন্তু তার শুরু হয়েছিল রবীন্দ্র প্রবাস কালে। সেকথা ইহুদী শিক্ষক Aronson-কে বলেছিলাম ও তিনি কিছু লিখেও গেছেন। এ বছর পূর্ব-জার্মাণী থেকে আর একজন ছাত্র এসেছেন 'Tagore in Germany' নিয়ে গবেষণা করতে।

১৯২৬-২৭ সালে Tagore in France নিয়ে অনেক কিছু আমি Romain Rolland-এর সাহচর্যে প্রকাশ করেছিলাম। তাঁর বন্ধু কবি P. J. Jouve-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে (১৯২৪) অপূর্ব রবীন্দ্র কাব্য 'বলাকা' বাঙলা থেকে ফরাসী Cygne গ্রন্থ প্রকাশ করি। Macmillan সংস্করণ মিলিয়ে সাহিত্যের জহুরী ফরাসী সমালোচক আমাদের 'বলাকা'য় মুগ্ধ হয়ে "The Unknown Tagore" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে আমাদের উৎসাহ দেন। ইচ্ছা ছিল কবির "কণিকা"ও এভাবে ফরাসী Momentance নামে প্রকাশ করি, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণীয়ের বিজ্ঞ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকায় বিদেশী কাগজ থেকে কত রবীন্দ্র-তথ্য ছেপে গেছেন তার Indexও করা হয়নি শুধু কবিবন্ধু

C. F. Andrews-এর জীবনী-লেখিকা Marjorie Sykes তার কিছু ব্যবহার করেছেন আমার সঙ্গে পরামর্শ করে। অধ্যাপক Pearson-এর রবীন্দ্র-সেবা ও অতুলনীয় কারণ তিনিই প্রথম ইংরেজ যিনি চলতি করে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন—অচলায়তন প্রভৃতি নাটকে কবিগুরুর সঙ্গে অভিনয় করেন ও বিরাট 'গোরা' গদ্য-মহাকাব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। Pearson-এর "Santinketan" বইখানির বিষয়ে Rev. Edward Thompson বক্রোক্তি করলেও, বিদেশে তার বহুল প্রচার দেখেছি। টম্‌সনও তাঁর স্ত্রী বাঁকুড়া Wesleyan College-এ (১৯১০-২২) প্রায় ১২ বৎসর কাটান ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্ত সাধকদের উপর বই লিখে ক্রমশঃ 'রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক ইংরেজী প্রথম বই ও তার পূর্ণতর সংস্করণ (১৯২৯) পর্যন্ত লিখে London বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D. উপাধি পান। কলিকাতা Y. M. C. A আমাকে ভার দেন তাঁর ছোট বইখানি সংশোধন করে রবীন্দ্র-শতাব্দী সংস্করণ প্রকাশ করতে। Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের Oriel কলেজে কাজ পেয়ে টম্‌সন বাংলার তথা ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপনা করে অনেক বই লিখে গেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—১৯১৩ সালের নভেম্বরে যখন রবীন্দ্রনাথ Nobel পুরস্কার প্রাপ্তির খবর পেলেন তখন টম্‌সন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। পরে তিনি অনেক বার কবির কাছে এসেছেন। বিদায় অভিশাপ ও 'উর্বশী'র মত গভীর রচনাগুলি তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। কিছু ভুল ত্রুটি স্বভাবতই ছিল (প্রবাসী দ্রষ্টব্য)। তাঁর বন্ধু অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের কাছে প্রতিপদে টম্‌সন ঋণ স্বীকার করেছেন; অথচ কবির সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক বিচারের কঠোর সমালোচনা টম্‌সন করেছেন বলে সেকালে রবীন্দ্রনাথ ও বহু কবি-ভক্ত দুঃখ পেয়েছেন। কবির স্বর্গারোহণের পর টম্‌সন তাঁর বৃহৎ বইখানির বহু সংশোধন সংযোজনাদি করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি হঠাৎ মারা যান। রবীন্দ্র-সাহিত্য ছাড়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাও তিনি পড়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ঐক্ষিতীশ সেনকে শ্রীকান্ত অনুবাদে সাহায্য করেন। এইভাবে দেখি রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় (১৯২১-৪১) ভারতের অন্য ভাষার চেয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই পাশ্চাত্য দেশে বহুল প্রচার লাভ করে। টম্‌সনই প্রথম সতর্কবাণী শোনান,—Macmillan প্রচারিত রবীন্দ্র-অনুবাদ কিছুকাল প্রচারে ও অর্থাগমে সাহায্য করলেও—আখেরে বাংলা ভাষা তথা রবীন্দ্র-প্রতিভাকে ম্লান করবে; তাই প্রমাণ হল এবার রাশিয়ায় দেখে এলাম রবীন্দ্র সংস্করণ ৩০ লক্ষ প্রকাশিত হয়েছে। তাদের অনুবাদ হল মূল বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে, ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ নয়।

১৯১২-১৫ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজ রস-বোধের উপর নির্ভর করে—নিজেই তাঁর বাংলা রচনা গুলিকে ইংরেজী পোষাক পরিয়েছেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি হয়েছে না বাংলা না ইংরেজী; সেকথা Elmherst-এর মত তাঁর ইংরেজ ভক্তও স্বীকার করেছেন ও টম্‌সন কঠোরভাবে সে সব ত্রুটি দেখিয়েছেন। Shakespeare-এর বহু অনুবাদ থাকলেও আজ কত দেশে কত ভাষায় নূতন অনুবাদ হচ্ছে—তাঁর আসন্ন ৪০০ জন্মোৎসব (১৯৬৪) উপলক্ষে। তাই সাধুবাদ করি রুশ রবীন্দ্র-ভক্তদের যাঁরা শতাব্দী উৎসবে সার্থক অনুবাদ (১৯৬১) প্রকাশ ও বহুল প্রচার করেছেন। সেকালের ইংরেজদের মধ্যে ডাঃ Grierson (Linguistic Survey) সাহেব বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশ করেন ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তা পড়েন; তেমনি J. D. Anderson I. C. S. মনীষী দীনেশচন্দ্র সেনের বন্ধুত্ব করে ক্রমশঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ করেন (সবুজ পত্র—"বাংলা ছন্দ" আলোচনা দ্রষ্টব্য)। জার্মাণ পণ্ডিত Winternitz ও Czech অধ্যাপক Lesny শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছিলেন, বাংলা শিখে কিছু অনুবাদও

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

॥ মধ্যরাত্রে ঝড়ের আবেদন ॥

সমস্ত দিনের
ক্লান্তির পর
সন্ধ্যা নেমেছিল,
আমি তখন
সন্ধ্যালোকে
একটুকু আলো জ্বালবার
চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম।
তখন হঠাৎ
তীব্র প্রবাহে
ঝড় এসে
দুটি কুমারীর মতো
দুই দিক থেকে,
বিনাশের কথা নিয়ে
আমার ঘরে প্রবেশ করল।
আমি
ঝড়ের
সে রাত্রে আলো জ্বালতে
আর পারি নি।
ঝড় যে
মধ্যরাত্রে
এমন আবেদন
করবে
তা আমি
ভাবি নি।

করেন। মার্কিন-প্রবাসী বাঙালী বন্ধুবর বসন্তকুমার রায় প্রথম তাঁর অনুবাদ ও প্রবন্ধাদির সাহায্যে আমেরিকায় প্রচার করেন দেখেছি। তাই ১৯১২-১৩ শীতকালটি যখন রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় কাটান—সেখানে অনেকে তাঁর ইংরেজী অনুবাদের চেয়ে মূল বাংলা ছন্দে তাঁর আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। Ezra Pound তার সাক্ষ্য দিয়েছেন ও তাঁর কাব্য যে শুধু ভাবাত্মক নয় সুর-ধর্মী তাও প্রশংসা করে বলেছেন। আমার "সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে এ সবের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেছি। ১৯১১ সালের রচনা ও "জনগণমন" জাতীয় সংগীতে কবির সুর সংযোগ যে অনেক সুরবিন্যাস ও হার্মনীর সৃষ্টি করবে তাও বলেছি। যন্ত্র সঙ্গীতে আমরা পিছিয়ে পড়েছি আর পাশ্চাত্য যন্ত্রীরা অনেক এগিয়ে আছে; তাই রাশিয়ার এখন Tagore Opera ও Ballet যেমন দ্রুত এগিয়ে চলেছে তেমনি ফরাসী ও জার্মাণ সুর-শিল্পীরাও রবীন্দ্রনাথের এক নব সুর-লোক সৃষ্টিও বিরাটভাবে প্রচার করবেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনকে বিশ্ব-ভারতীর উপযুক্ত করে তুলতে হবে, সেটি বুঝিয়ে গেছেন Dr. & Mrs. Bake রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম বৈজ্ঞানিক স্বরলিপি প্রকাশ করে।

১৯১২-১৩ সালে ও তার আগে যদি কেউ কবির কণ্ঠ-সঙ্গীত record করে থাকেন হয়ত এ বৎসর তা প্রকাশিত হবে। অজিত চক্রবর্তীর কাছে শুনেছি বিলাতে কবির "ডালিয়া" নাটিকার মধ্যে দেশী সুর ইংরেজী কথায় কবি নিজেই বসিয়ে গাওয়াতে উৎসাহ দেন—যেমন "অলি বার বার ফিরে যায়" গানটি "The bee is to come and the bee is to hum···" ঝেঁপ মিশ্র রাগে কবি গাইয়ে ছিলেন যখন "Princess of Arakan" নামে তাঁর ছোট গল্প "ডালিয়া" কে নাটিকা-রূপে অভিনয় করান হয়। তবে ইংরেজী 'চিত্রা' বা ফরাসী 'ডাকঘরে' সুর-বিন্যাস করা হয় কিনা সন্ধান করতে হবে। জার্মাণরা তো অমন সুরকার; হয়ত তাঁদের রচনাও কিছু বেরুবে। কবিভক্ত দেবব্রত মুখার্জি The King of the Dark Chamber (রাজা ১৯১০) ও Post Office (ডাকঘর ১৯১২) অনুবাদ করেন, হয়ত রবীন্দ্রনাথ দেখে দেন ও অনুমোদন করেন।

কিন্তু Evelyn Underhill নামে বিদুষী ইংরেজ মহিলা তার Mysticism বই লেখা শেষ করে, যেন ওৎ পেতে ছিলেন! রবি ঠাকুরের কবিতা খ্রীষ্টান (Mystic) মরমীয়াদের সমগোত্রীয়—একথা যেই বলা আর অজ্ঞানী সাহিত্যিকরা বীতশ্রদ্ধ হতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথও ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে 'গীতাঞ্জলি'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর সব যেন পঞ্চম থেকে খাদে নেমে গেল। তাঁর প্রেমের অপূর্ব কবিতাগুলি Gardner বক্সে যেন আত্মহত্যা করল! আসল দুঃখের কারণ হল এই যে, মূল গীতধর্মী তাঁর প্রেম সঙ্গীত ও কাব্যগুলির খানখেয়ালী চুম্বকধাত্ব কবি ইংরেজীতে দিলেন, পাকা ইংরেজ বা মার্কিন কবিদের সহযোগিতা চাইলেন না। আমেরিকায় তাঁর সঙ্গে মিলেছিলেন—কবি Robert Frost, আজও বেঁচে আছেন; তাঁকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। W. B. Yeats বাংলা মোটেই জানতেন না, ডা: জিজেন মৈত্রর কাছ থেকে কিছু শুনে ইংরেজীতে তাঁর মন্তব্য করে গেছেন। কবি Sturge Moore কিন্তু দেখেছি তাঁর গ্রন্থাবলীতে "কর্ণ ও কুন্তী" ইংরেজীতে ভাল অনুবাদ করে গেছেন; Ed Thompson যেমন 'কচ ও দেবযানী'র অনুবাদ করেন। যে সময়ের কথা বলছি তখনো রবির অন্তর্দশায় শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হয়নি, শুধু তাঁর 'বড়দিদি' গল্পটি (বেনামিতে) ভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, শ্রদ্ধেয় সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখক গল্পভারতীতে লিখেছেন। 'ভারতী' অফিসে সেকালে আমিও যেতাম কারণ প্রবাসীর সহ-সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই দু'টি পত্রিকার বন্ধু ও আমাদের

বোলপুর তীর্থের-সহযাত্রী (১৯১১ থেকে)। তিনি আবার কাণ্ডিক প্রেস প্রতিষ্ঠাতা মণি গাঙ্গুলীর বন্ধু (আচার্য অবনীন্দ্র জামাতা)। সেখানে বৈঠকে জমিয়ে তুলতেন রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরিবেশক অজিত চক্রবর্তী তাঁরাও আমাদের মাতিয়ে তুলতেন। স্বরলিপি প্রচার তখনো কম হলেও সরলা দেবীর "শত গান" আমরা পেয়েছি, "আলাপিনী"র সঙ্গতও শুনেছি। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী (Lady Chaudhurani) ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী (প্রমথ চৌধুরীর পত্নী) তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনায় বহু শ্রেষ্ঠ মার্গ-সঙ্গীতের তানমান্ কর্তব সমেত স্বরলিপি ছাপতেন তাঁদের "আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা"র (আজ সেগুলি দুষ্প্রাপ্য); সেকাল থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত (১৯৬০) প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের ও তাঁর যুগের কত গান ও সুর— রক্ষা করে গেছেন ভাবলে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। তাঁর সঙ্গে "গীত-বিতান" সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি (১৯৪১). সেও ২০ বছর হয়ে গেল। এখন ছেলে মেয়েদের রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখা কত সহজ হয়েছে। অথচ আমাদের যুগে "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল" ছাড়া গান শেখার অন্য উপায় ছিল না। মনে পড়ে, কণ্ঠকণ্ঠে তখনী দিনেন্দ্রনাথ গেয়ে চলেছেন "আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে"। আবার অজিতদাকে ধরে নিয়ে বন্দী করেছি আলিপুরে আমার মামার বাড়ীতে ; সেখানে তিনি গাইছেন—

"যেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।"

সে গানে শুধু নরলোক নয় পশুলোকও স্তম্ভিত! কারণ আমার মাতুল ৺বিজয়কৃষ্ণ বসু (ইলা পাল চৌধুরীর পিতা) আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রথম স্বদেশী অধ্যক্ষ ; তাই রবীন্দ্রনাথ Nobel পুরস্কার নিয়ে দেশে ফিরে যখন আমায় চিঠি লিখতেন, ঠিকানা লিখতেন—Kalidas Nag, Zoological Gardens (Human section)। পাছে 'নরসিংহ ও শার্দুলদের খাঁচায় চিঠি চলে যায়'! সন্ধ্যায় আলিপুরের বাগানে, সবাই বেরিয়ে গেলে আমি আমার বন্ধুদের মামীমার অতিথিরূপে সমাদর করে নিয়ে বসাতাম হংস-বলাকা অধ্যুষিত পশুশালার ডড়াগ তীরে ; সেখানে গান গল্প যেমন হত তেমনি প্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হাস্যরসিক 'ভাতাদা' (সুকুমার রায়), প্রশান্ত মহলানবীশ ও কবি জীবনময় রায় প্রভৃতি আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে রবীন্দ্র-উৎসব সার্থক করতেন ('রবি বাসর' তখন ছিল না)। প্রশান্ত ও সুকুমার ১৯১২ সালে বিলাত চলে গেলেন, আর গেলেন মামীমার দুই বৈজ্ঞানিক ভ্রাতা অধ্যাপক সুরেন মৈত্র ও তাঁর অনুজ ডা: বিজেন মৈত্র। প্রশান্ত ছাড়া অনেকে দেশে ফিরলেন ১৯১৩ সালে। এ বছর ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ বিদেশেই কাটান ; London Caxton Hall-এ তাঁর বক্তৃতাগুলি শেষ করে Duchess Nursing Home-এ প্রায় একমাস কাটিয়ে দারুণ অর্শ রোগ থেকে কবি মুক্তিলাভ করেন। ইংরেজী Gitanjali-কে বিশ্বের দরবারে যিনি শীর্ষস্থান দেন সেই বন্ধু Rothenstein-এর কাছে অগস্ট (১৯১৩) মাসটি কাটাবার সময় সুস্থশরীর রবীন্দ্রনাথ যেন নব প্রেরণায় গেয়ে উঠলেন "গীতিমাল্যের" গান :

"প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।"

Life more life : Light more Light—সেন অমর জার্মাণ কবি Goethe-র সমধর্মী সুরকার রবীন্দ্রনাথ। আশ্বিনের শরৎ সূর্যও দেখে সুরে যেন তাঁর আত্মজীবনী লেখেন (১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৩)—

"জানি গো দিন যাবে
এদিন যাবে—

টম্‌সন এটি অনুবাদ করে বলেছেন যেন ভক্ত রামপ্রসাদের গানই শুনছি।

দেশে ফিরেই এসব গান তিনি তাঁর শিল্প-শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে ছিলেন—সেই আমাদের আনন্দক্ষণের সাক্ষী ছিলেন কবি প্রিয়ম্বদা দেবী ("শেফু" রচয়িত্রী), তাঁর সঙ্গে অনেক আনন্দ-স্মৃতি কালো-পর্দার আড়ালে আজ চলে গেছেন! আমরা দু'চারজন মাত্র আছি—যাঁরা কথা বন্ধ অমল হোম উল্লেখ করে গেছেন, কিন্তু হায় তিনিও আজ নির্বাক্। কবি দেশে ফিরে আমাদের এক আনন্দ সভায় দেখা দিলেন, সুকুমার রায় ও সুপ্রভা দেবীর শুভ-বিবাহ বাসরে। তাঁদের একমাত্র কৃতী পুত্র সত্যজিৎ রায়কে (শিশুকালে পিতৃহীন) একথা স্মরণ করাই। তার আগে ১৪।১৫ নভেম্বর Empire পত্রিকায় সান্ধ্য সংখ্যায় চমকপ্রদ খবর পেলাম—গুরুদেবের Gitanjali Nobel Prize পেয়েছে। সেই দিন থেকে আর ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কবিবন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি কী গভীর আনন্দ-বেদনার আবেগে প্রবাসী ও Modern Review-তে নীরব রবীন্দ্রবন্দনা করে গেছেন; বন্ধু প্রিয়রঞ্জন সেন (১৯৪১) বলেন: 'রবি-হীন জগতে বাঁচতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই'—রামানন্দ বাবুর এই কথার মধ্যেই সব প্রকাশ হয়েছে।

১৯১৩ সালে আর এক আনন্দের বন্ধু প্রাণাচার্য নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, Dr. J. C. Bose (১৮৬১-১৯৪১), ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, হেমেন্দ্রমোহন বসু (H. Bose), Justice আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি মিলে এক Special Train রিজার্ভ করিয়ে আমাদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে তুললেন। যথাযোগ্য ভাষণাদির মধ্যে কবি-সম্বর্ধনা হল। কিন্তু অনেক "হুজুগে লোক" হঠাৎ হাজির, তার মধ্যে আবার রবীন্দ্র-বিরোধীরাও ছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বাচনিক ধন্যবাদ জানিয়ে, প্রতিপক্ষদের উল্লেখ করে কিছু কঠোর উক্তি সেদিন করেন; ফলে আতিথ্য জলযোগাদি প্রত্যাখ্যান করে অনেকে বিকালের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেলেন। পত্রিকাতে প্রতিবাদের ঝড় উঠল—রবীন্দ্র-সমালোচক বিপিনচন্দ্র পাল একা কবিকে সমর্থন করলেন। বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে ও চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচুর অর্থানুকূল্যে তখন দেখা দিল "নারায়ণ" পত্রিকা ভবানীপুরে।

আর একদিকে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ নামলেন 'সবুজ-পত্র' প্রকাশ করে। প্রবন্ধ গৌরবে ও প্রবীণ হরপ্রসাদের রচনায় (বঙ্কিমচন্দ্র সংখ্যা) যেমন নারায়ণের নূতন রূপ ফুটল তেমনি ভাষার দীপ্তি ও মৌলিক ভাবের সম্মিলনে সবুজ-পত্র যেন এক নবযুগের সূচনা বা প্রেরণা এনেছিল, (বন্ধুবর হারীতকৃষ্ণ দেব এ বিষয়ে সবিস্তার লিখেছেন)। পাশ্চাত্য নারী-শক্তির অপূর্ব বিকাশ ইউরোপ আমেরিকায় দেখে এসে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় নারীর সম্ভাব্যতার সঙ্কেত দিলেন "স্ত্রীর পত্র" লিখে (বিপিন পালের প্রতিবাদ স্মরণীয়)। সেই সঙ্গে কথ্য-ভাষায় তার সার্থক উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' (Home and the World রূপে অনূদিত) লিখলেন। বিমলা ও সন্দীপদের চরিত্রাঙ্কন নিয়ে আবার বিতর্ক দেখা দিল। ভুল করে কেউ বললেন Ibsenএর ছোঁয়াচ লেগেছে রবীন্দ্রনাথে, যেমন ১৯১২ সালের 'ডাকঘরে' তাঁরা পেয়েছিলেন মেটার্লিঙ্কের প্রভাব (ওই বছর বেলজিয়ন মনীষী Maurice Materlinck Nobel পুরস্কার পান)। কিন্তু বাঙালী রবীন্দ্রনাথ সেই শেলী কীট্‌সের যুগ থেকে শুরু করে একালের পাশ্চাত্য

শিল্পীদের সঙ্গে সংযোগ রাখলেও কারো ছাঁচে ঢালা হতে পারেন না ; সেটা সেকালে তাঁর দেশবাসীরা বোঝেন নি আজও বোঝেন কিনা সন্দেহ। Tolstoy-এর শেষ যুগের অনেক লেখা রবীন্দ্রনাথ পড়তেন জানি (উদ্ধৃতিও করেছেন)। তিনি টলস্টয়ের মৃত্যুর (১৯১০) কুড়ি বছর পরে Moscow দিয়ে 'রাশিয়ার চিঠি' লিখে সে দেশের নরনারীদের তাঁর অভিনন্দন ও আশীর্বাদ দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার করার হয়ত সময় এসেছে ; কিন্তু আমাদের প্রস্তুতির দৈন্য অপরিমেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যই প্রধানত পড়ান হয় ; রবীন্দ্র-সাহিত্য যদি স্থায়ী আসন পায় তবেই হয়ত উপযুক্ত ও তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব হবে। 'সবুজ পত্রে'র যুগে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

Tolstoy-এর কথায় মনে পড়ল তাঁকে স্মরণ করেছিলেন সাহিত্যিক নন, কর্মবীর মহাত্মা গান্ধি ; তিনি ১৯০৯-১০ সালে যে সব চিঠি লেখেন, Roman Rolland নির্দেশে সেগুলি আমি "Tolstoy and Gandhi" গ্রন্থে ছেপে রাশিয়া পরিদর্শন সুযোগে Tolstoy Museum-গুলিতে উপহার দিয়ে এসেছি। গান্ধিজীর Passive Resistance চরম ভাবে ভারতের স্বাধীনতা কিভাবে আনে তারও ইঙ্গিত ওই গ্রন্থে দিয়েছি। গান্ধিজীর দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ সংগ্রামের মধ্যে সহায়করূপে গিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের বাণী নিয়ে—C. F. Andrews ও W. Pearson। তাঁদের যখন বিদায় দেন তখন আমি শান্তিনিকেতনেই ছিলাম, তাই বুঝেছিলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই গান্ধিজী একুশ বছরের কর্মভূমি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে সপরিবারে কেন গুরুদেবের অতিথিরূপে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। আজও শান্তিনিকেতনে তাই "গান্ধি-দিবস" পালিত হয়। দুই মহামানবের মিলনতীর্থ তাই শান্তিনিকেতন—সেখানেই (১৯৪৮ সালে) মহাত্মাজীর স্মারক-সম্মেলন বসেছিল।

১৯১৩-১৪ সাল, শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের সঙ্কটকাল (crisis) : পশ্চিমে তখন ইতালী ও তুর্কীদের নিয়ে লেগেছে Balkan যুদ্ধ। সুদূর প্রাচ্যে Manchu রাজবংশ ধ্বংস করে বিপ্লবী চীনারা গড়ছে গণতান্ত্রিক নব্য চীন রাষ্ট্র। তার মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা শেষ M.A. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। তার মধ্যে আসছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক H.A.L. Fisher ; তিনি আমাদের ভাষণ দিলেন Bonapartism বিষয়ে। Oxford অধ্যাপক Paul Vinogradoff বক্তৃতা দেন Kinship in Early Law বিষয়ে। তখন দুজন বিখ্যাত ভারত-তত্ত্বজ্ঞ (Indologist) কলিকাতায় আসেন—অধ্যাপক H. Oldenburg (Goettingen) এবং Hermann Jacobi (Bonn)। বেদ থেকে বৌদ্ধ বিনয়পিটক ছিল ওলডেনবার্গের বিশাল গবেষণা কেন্দ্র। তাঁর সঙ্গে আসেন অধ্যাপক জাকোবী তিনি জৈন শাস্ত্রে পারঙ্গম অথচ মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পড়ালেন "ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র"। তিনি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে চান ; তাই তাঁকে আমি জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিয়ে যাই। সেখানে কবি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ মিলে অপূর্ব আলোচনা করলেন ও জাকোবী সন্তুষ্ট হয়ে এলেন। রুশ বিপ্লবের তিন বছর পূর্বে Vinogradoff ছিলেন Oxford বিশ্বালয়ে Comparntive Jurisprudence-এর অধ্যাপক। তিনিও আমার সঙ্গে এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করতে। সেই পরিচয়ের উপর নির্ভর করে Oxford অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফ রবীন্দ্রনাথকে আবেদন পাঠান যে ১৯১৭ বিপ্লবের পর রাশিয়ার শিক্ষক ও ছাত্রমহল খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Appeal সই করে ভারতের সমবেদনা জানান। বর্তমান ক্রুশ্চেভ—সোভিয়েট সভায় হয়ত এই Vinogradov-এর আত্মীয় এক পদস্থ ব্যক্তি। রাশিয়ার

সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন সজাগ ও সহানুভূতিশীল। তাঁর প্রস্তাগার থেকে আমরা—কলেজ ছাত্রদল শুধু টলস্টয়, টুর্গেনীভ, ডস্টয়ভস্কীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি পড়িনি, Chekov ও Andrew এর নাটকও পড়েছি। তেমনি বেলজিয়ামের মেটারলিঙ্ক রচিত প্রায় সব নাটক ও Ibsen সোঁর স্কাণ্ডিনেভীয় বিচিত্র নাটক সম্ভার কবি পড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ১৯১৪-১৫ সালের রচনা ও প্রেরণাই বাংলা সাহিত্যকে প্রথম বিশ্ব-সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন করেছিল; শতাব্দীর উৎসবে তাই "রবীন্দ্র-যুগ" উপলক্ষ্য করে কিছু বলে যাই। এক্ষেত্রে যেমন সার্থক সমালোচক লেখক ছিলেন অক্ষিতদা. (তত্ত্ববোধিনী ও প্রবাসী দ্রষ্টব্য) তেমনি অক্ষয়কুমার দত্তের উপযুক্ত পৌত্র বন্ধুবর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের নূতন বই জোগাতেন। তাঁর ঘরখানি ছিল যেমন নানা দেশের নানা ভাষার সাহিত্য-কুঞ্জ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে তিনি দান করে গেছেন); তেমনি বাংলা ভাষায় বৈদিক কবিতা থেকে, পালি প্রাকৃত গাথা ও ফার্সী আরবী জাপানী ইত্যাদি কত ছন্দের কবিতাগুলি সত্যেন দত্ত বাংলার রূপ দিয়ে গেছেন। অথচ তাঁর 'ফুলের ফসল' 'তীর্থ সলিল' প্রভৃতি আজ কয়জন পড়েন? সত্যেন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে রবীন্দ্র-ভক্ত ও তাঁর গান এত ভালবাসতেন যে—বোলপুরের বন্ধুদের না পেলে আমাকে ধরে সেকালে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনতেন। তাঁকে 'বিচিত্রা' ভবনে কবি সম্বেলনে রবীন্দ্রনাথ 'কলম উপহার' দেন। মাত্র ৪০ বছরেই অকালে সত্যেন দত্ত আমাদের ছেড়ে গেলেন ও পিতৃতুল্য রবীন্দ্রনাথ মর্মস্পর্শী এক কবিতা লেখেন সবাই জানে। বন্ধুবর অমল হোম 'সত্যেন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁকে অর্ঘ্য দেন। সেই দলের কবিদের মধ্যে মনে পড়ে করুণানিধান, যতীন বাগচী প্রভৃতি সবাই গত—শুধু আছেন সৌভাগ্যক্রমে কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও আমার পিতা কালিদাস রায়।

১৯১২ সালে ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা করেই দেহত্যাগ করেন মনীষি নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; তাঁর উপযুক্ত পুত্র বন্ধুবর দিলীপ রায় সেকালের কথা মনোজ্ঞ ভাষায় লিখে যাচ্ছেন। তাঁদের আসরের আর এক কবি ছিলেন—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য কিন্তু কবিতা লিখে শেষ দিন অবধি গভীর তৃপ্তি পেয়ে গেছেন; যেমন সেকালের কবি-বন্ধু দেবেন সেন ও অক্ষয় বড়াল। কবির সহপাঠী ও খাঁটি সমবয়সী লোকেন পালিতকেও এই সঙ্গে স্মরণ করি। কারণ তাঁকে প্রায় সবাই ভুলেছে অথচ তিনি কত পুরাণ কবিতার ইংরেজী অনুবাদ প্রথম করেন ও কবির কণিকা উৎসর্গে তার কথা আছে। ভগিনী নিবেদিতা কবির কাবুলীওয়ালা অনুবাদ করে তাঁর বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের Modern Review-তে ছাপান ও সেই গল্প পড়েই শিল্পী Rothenstein কলিকাতা ঠাকুরবাড়ী এসে অবনীন্দ্র-ভবনে রবীন্দ্রনাথকে (Gitanjali প্রকাশের দুবছর আগে ১৯১০) আবিষ্কার করেন ও রেখাচিত্রে তাঁর মুখচ্ছবি এঁকে বিশ্ববিশ্রুত করে দেন। সেই মৌলিক রেখাচিত্রখানি হয়ত কলকাতায় কোথাও আছে।

১৯১৩ নভেম্বর Nobel Prize পর্ব থেকে শুরু করে ১৯১৪ 'সবুজপত্র' প্রতিষ্ঠা বাঙালীর তথা বাংলা সাহিত্যের এক নব যুগ শুরু করে। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালী' ভাষার পর প্রমথ চৌধুরীর চল্‌তি ভাষাকে শিল্প-পর্যায়ে তোলা—সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম চল্‌তি ভাষার উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' নাটকে, পত্রিকা-পরিচালনায় নূতন যুগের যেন সূচনা করেছিল। ৫৫ বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের গদ্য লেখনরীতি ও চিন্তা ধারাকে বদলে দিলেন না, কবিতায়ও নূতন সুর দিলেন: 'চির যুবা তুই যে চিরজীবী"…'আয় প্রমত্ত আয় রে আমার কাঁচা'।

এই সময়েই বাঙালী তরুণদের তিনি ডাকলেন। ক্রমশঃ বিশ্বযুদ্ধ লাগতেই বিশ্বের তরুণ তরুণীদের জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন তাঁর মহাকাব্য "বলাকা" : তার শুরুতে পড়লাম—

'এবার বুঝি এল সর্বনেশে গো'।

কবিকে প্রশ্ন করেছিলাম—কেন এমন প্রচণ্ড বেদনায় ঢেউ লাগল আনন্দ সাগরে?

কবি বলেছিলেন: যেন রুদ্রের পদধ্বনি শুনছি! অবাক হয়ে M. A. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি—International Law-এর প্রশ্নের জবাব লিখছি; হঠাৎ খবর এল Serbia-র গুপ্ত-ঘাতকের হাতে বিরাট Austro-Hugarian Empire-এর অধিকর্তা যুবরাজ সস্ত্রীক নিহত। বেড়াগাকের আগুন লেগে গেল যেন সারা ইউরোপে। জার্মানী তার বিরাট সৈন্য নিয়ে পূর্বে Poland ও পশ্চিমে Belgium-France-কে আক্রমণ করল।

'ঘরে ঘরে সুরু হল আরামের শয্যাতল—'

'দূর হতে কি শুনিনু? মৃত্যুর গর্জন?'

এমনি বুক কাঁপান ছন্দে ও সুরে কবি একের পর এক অমর কবিতাগুলি লিখে গিয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে শুনেছি—পত্রিকায় ছাপা হতে পড়েই তাঁকে প্রশ্ন করেছি। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের ছেলেমানুষী প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বিশ্বকবি কিন্তু আমাদেরই কবি —একথা ভাবতে বুকটা ভরে উঠত।

সেই বিশ্বজোড়া অশান্তি ও ধ্বংসলীলার মধ্যেই কবিগুরুর প্লান করছেন বেরিয়ে পড়বার; কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে Passport মেলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও শক্ত। দু'বছর লেখালিখির পর ১৯১৬ সালে Pearson সাহেব ও মুকুলদে কে নিয়ে জাপান হয়ে কবি আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ পেলেন। সে সব কথা "রবীন্দ্র-পরিক্রমায়" সবিস্তারে লিখব। ইতিমধ্যে গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকায় একুশ বছর Passive Resistance শেষ করে Smuts Gandhi চুক্তি স্বীকার করিয়ে London গেলেন। প্লুরিসী সন্দেহ করায় গান্ধিজীর সেখানে ভাল চিকিৎসা হয়—অবশেষে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে সপরিবারে তিনি শান্তিনিকেতনে হাজির হলেন। গুরুদেবের সঙ্গে গান্ধিজীর এই আকস্মিক মিলন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে যেন এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে দিল। অথচ তথাকথিত কংগ্রেসী ইতিহাসে ১৯২১ সালের আগে বাংলা ও রবীন্দ্রনাথের কোন কথা নেই। কয়খানী ইতিহাসগুলো শেষ হলে হয়ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও চিন্তাধারার অনুসরণ নূতনভাবে শুরু হবে। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতেও UNESCO পরিকল্পিত সভ্যতার ইতিহাস, বহু অর্থ ব্যয়েও লেখা শেষ হল না। কিন্তু মৃত্যুর চরম পরীক্ষা ও তরুণদের প্রাণের মূল্যে অমৃতের অভিসারকে অভিনব রূপ রবীন্দ্রনাথ দিলেন, তাঁর "ফাল্গুনী" নাটকে। ১৯১২ সালে "অচলায়তন" অভিনয় দেখেছি শান্তিনিকেতনে। ১৯১৫ সালে রচিত 'বলাকা'র সাথী 'ফাল্গুনী'র অভিনয় দেখে আমরা যুদ্ধ বলায় শান্তিনিকেতনে ও জোড়সাঁকোর প্রাঙ্গনে। সেই জোড়াসাঁকোর Prince Dwarakanath-এর বাড়ি তখন জীর্ণ, যখন তাঁর পৌত্র রবীন্দ্রনাথকে কাঁধে করে আমরা নিমতলার ঘাটে নিয়ে এলাম ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ঐতিহাসিক 'মহর্ষি ভবন' ক্রয় করে ও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজন করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন; কিন্তু দুঃখের কথা যে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের বিশাল ভবন ও দক্ষিণের বারান্দা—বেচে, কিনে, ভেঙে আবার গড়ে রবীন্দ্রভারতী গড়লেও তাদের

করুণ ইতিহাস সবাইকে ব্যথিত করেছিল। আর একটি ঐতিহাসিক ভবনও অবাঙালীর করায়ত্ত হয়েছে ; যেখান থেকে বিরাট মহাভারত বঙ্গানুবাদ করিয়ে, পুণ্যশ্লোক কালীসিংহ বিতরণ করেছিলেন। সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীটিও চিহ্নিত করা উচিত—"বিদ্যাসাগর ভবন"-এর মত। ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগর স্বর্গারোহণ করেন ; আজ মাত্র ৭০ বছরেই (১৯৬১) বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনে কত বিরাট ঘটে গেছে।

পাথুরিয়াঘাটার রাজবাটীও সাহিত্য সঙ্গীত ও নাট্যচর্চার কেন্দ্রস্থলে ছিল। মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ছিলেন মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু ; তাই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ও কিছু নাটক এখানে মধুসূদন (১৮৪৮-৬২) উপহার দেন। তেমনি সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতচর্চায় বহু অর্থ ব্যয় করে ও পূর্ব পশ্চিমের যুগ্ম-সেতু গড়ে জোড়াসাঁকোকে যেন নবরূপ দেন। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাটিকে উজান বাইয়ে তাঁর জন্মস্থান, কলিকাতাকে বিশ্ব-মানবের তীর্থ-স্থান করে গেছেন, এই আমাদেরই সপ্তাতীরে। 'ফাল্গুনী'র অন্ধ বাউলের ভূমিকায় গীতাভিনয় করে রবীন্দ্রনাথ শোনান—'ধীরে বন্ধু সো—ধীরে ধীরে,'—স্তব্ধ হয়ে চোখের জল ফেলে সন্ধানী বাউলের পরকেশ দেখেছি ; আবার সেই গম্ভীর পরিবেশ রচনার আগে ৫৬ বছরের রবীন্দ্রনাথ 'কবিশেখর রূপে' সবাইকে মুগ্ধ করেন—'আমারে খেপিয়ে বেড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কে ?' এই প্রাণ মাতানো গানের সঙ্গে তাঁর একক বহুছন্দ নৃত্যাভিনয় (১৯১৬) সবাইকে অবাক করেছিল। শান্তিনিকেতনে 'নটীর পূজার' নৃত্যাভাষ রচনার দশ বছর আগে নটরাজ রবীন্দ্রনাথই প্রথম নৃত্য করেন। অটুট স্বাস্থ্য ও সম্পূর্ণ অভিনয়-প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই ফাল্গুনী ও বলাকার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণের বার্তা নিয়ে ১৯১৬ সালে এক রাত্রির অভিনয় লব্ধ প্রায় ১০০০০৲ টাকা বাঁকুড়া-দুর্ভিক্ষ ত্রাণার্থে তাঁর বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে কবি বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যু-যজ্ঞ উত্তীর্ণ হতে যেন বাঁশি দিলেন প্রশান্ত মহাসাগরে।

ব্রহ্মদেশ ও মালয় পেরিয়ে কবি এলেন জাপানে ; সেই প্রথম ওয়েলে পদার্পণ করলেন (২৯ মে ১৯১৬) "তোষামারু" জাহাজে। কিন্তু তোষণ-নীতি উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ জাপানী পত্র ও পত্র লেখক Y. Noguch ও S. Tosan দের স্পষ্ট ভাষায় শোনালেন সতর্ক বাণী। কবি দেখালেন জাতীয়তাবাদের (Nationalism গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) বীভৎস রূপ, সেটা যা কিছু সুন্দর ও জীবন্ত তাদের ধ্বংস করে লোভে ভয়ে ও বুদ্ধি তাড়ায়ে। কবিবন্ধু সেকালের গুরু Okakura তখন পরলোকে। আর এক সাম্রাজ্যবাদী জাপান ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এক জোট হয়ে যুদ্ধে নেমেছে। তেমনি ১৯১৭ সালে আমেরিকাও Monroe-নীতি ভুলে সে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তাই জাপানীরা পরাধীন ভারতের কবিকে শুনতে অরাজী—বহু কঠোর সমালোচনাও তারা করেছিল। তবু প্রসিদ্ধ শিল্প পত্রিকা Kokka-দল শিল্পসংগ্রাহক Harasan তাঁকে খুব যত্ন করেন এবং Canadamarn জাপানী জাহাজ চড়ে শিল্প মুকুল দে ও অধ্যাপক Pearson-কে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম কূলের মার্কিন শহর Seattle-এ নামলেন। এই পশ্চিম কূলেই স্বামী বিবেকানন্দ San Fransisco-তে "বেদান্ত কেন্দ্র" স্থাপন করেন। সেখানে আমি ১৯০১ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দের অতিথি ছিলাম (Miss Burke—Vivekananda দ্রষ্টব্য)।

৩৪ বছর আগে যে শান্ত পরিবেশে আমেরিকাকে রবীন্দ্রনাথ দেখেন সে মার্কিন মুলুক বদলে গিয়ে, যেন যুদ্ধে নামবার জন্য প্রস্তুত। কোথায় তার বৈর্য ভারতীয় কবির বাণী শোনার ? তবু Ponds Lyceum বক্তৃতায় অনেক চক্ষুশূল ভেদে শ্রান্ত হলেও কবি তাঁর শান্তি মন্ত্র শোনান ও জাতীয়তাবাদকে

কঠোর সমালোচনা করে এসেছিলেন। তাঁর প্রাণনাশেরও গুপ্ত প্রচেষ্টা (ভারতীয় সদর পার্টি মারফৎ) হয়েছিল শুনেছি। সে সব কাগজপত্র হয়ত Washington Supreme Court এখন খুলে দেখাবেন। মার্কিন চিন্তাশীল লেখকরা কিন্তু তাঁকে বুঝেছিলেন যে তিনি শুধু Prophet ও Seer বা ভাবুক কবিই নন ; তাঁর তর্কশাস্ত্রে (Logic) অধিকারেও শ্রদ্ধেয়। তাই কবির Nationalism পড়ে অনেক যুবক যুদ্ধ বর্জন করে এবং ওই গ্রন্থের কিছু অনুবাদ বিলাতে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত Trench এ পৌঁছায়। সে খবর পেয়ে মনীষী রম্যা-রলাঁ (Rolland) রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চেনেন (শেষ চিঠি ১৯৪১তেও তাঁকে স্মরণ করেন) এবং তাঁদের যুদ্ধ বিরোধী ইত্তাহারে রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেন। তাই Detroit (Ford Motor কেন্দ্র) শহরের যুদ্ধবাদী এক পত্রিকা তাঁদের শাসিয়ে বলেছিল যে রবিঠাকুরের "চিনি মেশান তিক্ত বিষ কোনও কাজে লাগে না শুধু তরুণদের বিভ্রান্ত করবে—" অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথকে অমর Socrates-এর উচ্চাসনে বসান হ'ল। Tagore in America (Argentina ও Canada সমেত) যখন লেখা হবে তখন রবীন্দ্রনাথের অবদান—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পরিস্ফুট হবে।

দশ মাস পরে তিনি ফিরে এসে (মে ১৯১৬—মার্চ ১৯১৭) শুধু শান্তিনিকেতনে নয়—বিচিত্রা ভবনে সাহিত্য ও শিল্পের যেন নব পরীক্ষা-সমীক্ষা শুরু করলেন। তাঁর জাপানে ছাপা 'স্ফুলিঙ্গ' (Fire Flies) থেকে বহুমানব ও 'মুক্তধারা' (১৯২১) রচনা পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধকালীন গদ্য ও পদ্য রচনার গভীর বিশ্লেষণ এখনো করা শুরু হয়নি। কারণ জাপানী ও মার্কিন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত সমালোচনাদি একত্রীকরণ এখনো হয়নি। হয়ত কবির দ্বিতীয় জন্ম শতাব্দী থেকে এই সব অত্যাবশ্যক অথচ ভারতে আজও দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্র—সংগ্রহ সুরু হবে। তাঁর সঙ্গে Pearson সাহেব ছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক কারণে বন্দী হয়ে তিনি ইংলণ্ডে Home interned হন (১৯১৬-২০) ; আর শিল্পী মুকুল দে Etching শিখে গুরুদেব ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীদের আলেখ্য রচনা করেন। তাঁর সঙ্গে জাপানী চিত্রকর Kampo Arai এদেশে এসে সুদূর প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতির মিতালি দৃঢ় করেন যেটি Y. Taikan ও Okakura এবং অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র (১৯০৪-১২ সালে) শুরু করেন। (উদ্বোধনে আমার "বিবেকানন্দ-নিবেদিতা" অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রবোধচন্দ্র সেন

যাবার সময় সোনার কিরণটুকু। এখনি ছুটির
ঘণ্টা বাজবে। মুক্তি পাবার আনন্দে ছেলেরা
প্রস্তুত হচ্ছে। শুকনো ঝরা পাতা যেমন সমস্ত
গাছের পরিত্যক্ত শূন্যে উড়ে যায় তেমনি চঞ্চল
আনন্দিত্ত ছড়িয়ে পড়বে। কতকাল এই বন্ধুটিকে
প্রতিদিন দেখেছি, তবু আমার জীবনের সঙ্গে তার
যেটুকু সম্বন্ধ তাতে তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই নি,
এখানের বন্ধনী সে ইঙ্গিতে চোখে মোর সুর
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি'; কখনো বা হঠাৎ আঘাতে
বৈশাখের, কষ্ট মোর ঝরিয়াছে উত্তপ্ত দুপুরে,
ব্যথা মোর করেছে প্রকাশ; সব মিলে যেন তার
প্রাণের সমাজে। এ সময়ের কাজ যাত্রা সেরে যখন
ক্লান্তের পশ্চাতে ফিরিয়া মোর দৃষ্টি নমস্কার
করিব দান এ জন্মের প্রতিদেবতার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ
১৩৪১

মৃণালিনী দেবী।

যদিও জোড়াসাঁকোয় মামার বাড়ীতে আমি মানুষ, গুরুদেব-পত্নী মৃণালিনী দেবীর সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা ঘটে নি। তিনি যখন অকালে পরলোকগমন করেন তখন আমার মাত্র আট নয় বছর বয়স। তারও বছর আটেক পরে পুত্রবধূরূপে গুরুদেব আমাকে তাঁর শূন্য সংসারে ডেকে নেন। তখন তাঁর ও বাড়ীর অন্যান্য সবাইকার মুখ থেকে আমি আমার শাশুড়ী মায়ের কথা কিছু কিছু জানতে পারি।

মৃণালিনী দেবী তৎকালীন প্রথামত আমার চেয়েও অল্প বয়সে মহর্ষি-ভবনে কনিষ্ঠ বধূরূপে প্রবেশ করেন। বিবাহের সময় তাঁর বয়স নয় দশ বছরের বেশি ছিল না। যশোর দক্ষিণডিহীর গণ্ডগ্রাম ফুলতলায় তাঁর বাপের বাড়ী। পিতা বেণীমাধব রায়চৌধুরী ছিলেন ঠাকুর পরিবারেরই কোন জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী। খুবই আশ্চর্যের বিষয় বলতে হবে পিরিলী বাড়ীর এই বোধোদয় পড়া মেয়েটি সন্ধ্যা সঙ্গীত ও প্রভাত সঙ্গীতের লেখক সুদর্শন, সুপুরুষ উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথের যোগ্য স্ত্রী হতে পেরেছিলেন। রূপে গুণে বংশমর্যাদায় ঠাকুর বাড়ীর এই প্রতিভাবান যুবকের পালটি-ঘর বলতে বাঙালী সমাজে তখন কেউ ছিল না। কবি কিন্তু গুরুজনের আদেশক্রমে এই বিবাহে সাগ্রহে সম্মতি দিয়েছিলেন; পরিহাস করে নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র নিজে ছাপিয়ে বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন, এবং বালিকা বধূকে অল্পে অল্পে নিজের মনোমত করে গড়ে তুলেছিলেন। ("খেয়া" দ্রষ্টব্য)

সুখদুঃখময় সংসারে তাঁদের যুগল জীবন পরিণতি লাভ করতে লাগল। ছোট বউকে তিনি যে কীভাবে তাঁর সংসারযাত্রার সঙ্গিনী করে নিলেন, তাঁর কর্মজীবন ও ধর্মজীবনের সহচরী করে নিলেন তার একটা সুন্দর ছবি পাওয়া যায় মৃণালিনী দেবীকে লিখিত গুরুদেবের চিঠি পত্রে যা বাকি চিঠিপত্র প্রথম খণ্ড রূপে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন।

এই চিঠিপত্রের শেষ চিঠিতে গুরুদেব তাঁকে ডেকেছিলেন কলকাতার পাষাণ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যেন শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে নূতন রচিত এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন ও গুরুদেবের পাশে এসে দাঁড়ান। সে ডাকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁর গহনাপত্র সব কিছু তিনি দান করেছিলেন বিদ্যালয়ের দেনা মেটাতে। সব চেয়ে বড় কথা যে তিনি নিজেকেও দিয়েছিলেন। মৃণালিনী দেবী অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা ছিলেন এবং অতিথি পরিচর্যায় ও রোগীর শুশ্রূষায় তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। আমার বড় জা এই আশ্রমের বড়মা হেমলতা দেবী ও পূজনীয় হরিচরণ বাবু সে যুগের আশ্রম পরিবারের কথা ও আশ্রম-জননী মৃণালিনী দেবীর কথা বিশদভাবে লিখে গেছেন। শোনা যায় এখানকার শিশুদের পরিচর্যায় তিনি নিজেকে এমন নিঃশেষে দিয়েছিলেন যে অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে ও তিনি দুরন্ত রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগ থেকে তিনি আর মুক্তিলাভ করতে পারেননি। ১৯০২ সালে ২৩শে নভেম্বর মাত্র ২৯ বছর বয়সে কলকাতায় তিনি দেহরক্ষা করেন।

বাবামশায়ের সংসার শূন্য হয়ে গেল। এই যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ তাঁর মনে কী গভীর বেদনার রেখাপাত করেছিল তার পরিচয় আছে 'স্মরণ' বলে ছোট বইটিতে। এছাড়া হেমলতা দেবীর লেখায়, বিবিবির লেখায়, চিত্তরঞ্জন দাসের ভগ্নী ঊর্মিলা দেবীর লেখায়, প্রভের হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার

স্বামীর রচিত পুস্তকে মধুর স্বভাব ও মৈথিলীর সেই মহীয়সী রমণীর সামান্য একটু পরিচয় ইতস্তত: পাওয়া যায়।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই দূর সম্পর্কীয়া এক আত্মীয়ার তত্ত্বাবধানে এই 'দেহলি' বাড়িতে মাতৃহীন শিশুদের জন্য আশ্রয় রচিত হয়। এককালে এরই আশেপাশে নূতন বাড়িতে কালীমোহন-বাবু ও তেজেশ বাবুর অভিভাবকত্বে শিশুবিভাগের পত্তন হয়েছিল। এই শিশুদের মধ্যে একজন ছিলেন গুরুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ। এঁরই জন্য উত্তরকালে গুরুদেব শিশুর কবিতা রচনা করেন। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মেজো মেয়ে রানী চলে গেল, অকালে শমীও চলে গেল। ফুল ফোটবার আগেই ঝরে পড়ল। অন্তরে যতই বেদনা পেয়ে থাকুন এই উপর্যুপরি মৃত্যুর আঘাত নিয়ে গুরুদেবের রচনায় কিম্বা আচরণে শোকের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ দেখি না। তিনি শান্তিনিকেতনের সমস্ত শিশুর মধ্যে তাঁর শমীকে পেয়েছিলেন। আমার মনে হয় যাঁর নামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ পাঠশালার নাম আজ আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হতে চলল, তাঁর বিদেহী আত্মাও আনন্দলাভ করবেন এই ভেবে যে, যে শিশুরা তাঁর বক্ষের ধন ছিল, যাদের জন্য তিনি তাঁর প্রাণপাত করতে ইতস্তত: করেন নি, তাদের পঠনপাঠনে খেলাধুলায় দেহলির এই শূন্য অঙ্গন আনন্দ কলরবে মুখর হয়ে উঠবে।

'মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করে কবি-পত্নীর প্রতি যাঁরা তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, সেই বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে আমার অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হোক্।

প্রতিমা দেবী

স্মরণ

তখন নিশীথরাত্রি ; গেলে ঘর হতে
যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায় বারতা।
সুপ্তির বিশ্ব-মাঝে বাহিরিলে একা—
অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলেম দেখা।
মঙ্গল মূরতি সেই চিরপরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত।
গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে ?
এ ঘর হইতে কিছুই নিলে না কি সাথে ?
বিশ বৎসরের তব সুখ দুঃখ ভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার।
প্রতি দিবসের প্রেমে কতদিন ধ'রে
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল করে
পরিপূর্ণ করি তাঁরে স্নেহের সঞ্চয়ে
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে !
তোমার সংসার—মাঝে, হায় তোমা—হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন—দুর্দিন—
তখন এ শূন্য ঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে ?
আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে, কল্যাণী, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চির-সন্ধ্যা তরে ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে সমুদ্র, শুদ্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা ; মনে হল পাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁপে কেঁপে।···
যুগ যুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্যগর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহাদীপ মহাবন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
লেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
মূর্তিহীন ব্যর্থতার নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
হানিছে তরঙ্গ তব।···

হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাত্রে নিদ্রাহীন চোখে
কারাদমরুর মধ্যে দাঁড়াইয়া শুদ্ধ ঊর্ধ্বলোকে
চাহিলাম ; শুনিলাম নক্ষত্রের রক্তে রক্তে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন ; দেখিলাম শূন্যমাঝে
আঁধারের আলোকব্যাকুলতা।···
রূপনিঃস্ব হাহাকার
অমূর্ত বুদ্বুদ্ কিছু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে—
ধূলায় ধূলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্ত রূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল।

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে ;
কোথায় সকল তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে।
ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ, ছিল বুঝি ভাষা,
বিশ্বস্মৃতিনির্ঝরের তীরে তীরে বুঝি কত বাসা
বেঁধেছিল কোন্ অন্নে ; দুঃখে সুখে নানা বর্ণে ছাঁদে
তাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি

অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে। আকার হারালো তারা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা
সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ বাধা প্রাণের নিভৃত খেলাঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মৃতি-ভরে, আশ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে ধারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শুষ্ক দীর্ঘশ্বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে।

'আন্‌ভেন' জাহাজে লেখা ২১ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখের এই কবিতার একটি অনাবিষ্কৃতপূর্ব রহস্যলোকের দ্বার এক মুহূর্তে একটু যেই খুলে গেল আমরা চকিতে দেখতে পেলেম আদিঅন্তহারা এক বিপুল বিশাল অপ্রকাশের রহস্য, নিখিল সৃষ্টিতে আর মানবসত্তার নিখিল অন্তর্লোকে। আলো, অন্ধকার। বস্তু ছায়ামূর্ত বস্তু মৃত্যুঃ। সম্মতি এবং অসম্মতি নিয়ে এক অপরূপ। আমরা প্রাণীমাত্রেই আলোকের দিকে উৎসুক, উন্মুখ। অমৃতেরই কাঙাল। নিখিল সৃষ্টির লীলাটি যে কোন্ মহাপ্রলয়ের তলে তরঙ্গিত রঙ্গমঞ্চের একদেশে অভিনীত, সে আমরা জানতে চাইনে; না চাওয়াই স্বাভাবিক। অথচ যথার্থ কবি যিনি, তিনি হন সত্যকাম, সত্যদ্রষ্টা, সত্যের অনুভবী। আলো-অন্ধকার সুন্দর-অসুন্দর প্রিয়-অপ্রিয়ের বিচার বিবেকের বশে একটিকে ত্যাগ ক'রে অন্যটিকেই যে একান্তভাবে বেছে নেবেন, শেষ পর্যন্ত, এ তিনি পারেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা লিখেছেন, অপ্রকাশ অব্যক্তের একটু যদি আভাস দেওয়া যায়। রঙ এবং রেখার যোগে মোহাবিষ্টের মতো ছবির পর ছবি এঁকে গেছেন—যার নির্দিষ্ট কোনো নাম রূপ অথবা পরিচয় নেই অথচ যা বিশ্বপ্রকাশের তলে তলে নিয়তই সচল এবং সচেষ্ট, স্বপ্নের মতো অস্থির পরিবর্তমান এবং অলক্ষচারী, চকিতে তার একটু যদি ছায়া এসে পড়ে, একটি কোনো অনুচ্চারিত কথা বোবার-ইঙ্গিত-হেন ভাষায় আমাদের প্রতিবোধে বিধিত হয়।

এই অপ্রকাশের অনন্ত রহস্যের বিস্তার দেশে, বিশেষতঃ কালে; আমার দেশকাল-রচিত বিশ্বভুবনেও তেমন নয়, যেমন চেতনসত্তার অপরিসীম অন্তর্লোকে। কেননা, দেশকালের আনন্ত্যের ধারণা কিম্বা সত্যতা মানুষের প্রাণ এবং চেতনার ভিতরে বৈ বাইরে কোথাও নেই; আর সেই প্রাণ বা চেতনা সমুদয় দেশকালের আধার এবং আধেয়-স্বরূপ মনে হয়, একই কালে তাকে আলিঙ্গন করেছে আর অতিক্রম করে আছে,—আপনাকে আপনি সে জানে না, হয়তো কোনো দিনই জানতে পারবে না। অরূপ-অব্যক্তের যেটুকু ব্যক্ত নিরূপিত, যেটুকু স্মিত উদ্ভাসিত—যেটুকু আপনার সীমায় সীমায় অসীমের একটু-না একটু প্রতিবিম্ব ধ'রে আছে হৃদয়ে—'সীমার মধ্যে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর'—তারই প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ কবি, ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস হোমার-দান্তে-শেক্‌স্‌পীয়র দেশ-বিদেশের খ্যাত-অখ্যাত অগণ্য কবিকুলের ধারাবাহী একজন, আমাদের এদেশে আর এই যুগে। কিন্তু, যা ব্যক্ত হয়নি কোনো কালে, হবারও নয়, রূপনিঃস্ব যে বুদ্বুদ হাহাকারে অসীম শূন্য তারায় তারায় রোমাঞ্চিত, আসলে যা জাগ্রত-চেতনার অন্তরালবর্তী আপন গহন গভীর সত্তারই একখানি প্রতিভাস মাত্র, অগণ্য-আলোকবর্ষ-পরিমিত দেশে দেশান্তরে প্রসারিত—সেই অজ্ঞাত অপরিজ্ঞের রহস্যের আবেশেই তিনি চিত্রকর! সেক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দের প্রিমিটিভ ব'লে তাঁকে মনে হতে পারে, মনে হতে পারে ষাট-সত্তর বৎসর বয়সের এক শিশু। কিন্তু সে সমস্তই আমাদের অনুমান মাত্র, বাস্তব সত্য কখনোই নয়। বাস্তব সত্য এই যে, প্রতিক্ষণে দিন এবং রাত্রির ধারা

আলিঙ্গিত যেমন পৃথিবী, অথচ দিবাভাগে জাগ্রত আলোকিত অর্ধেকের সঙ্গেই মানুষের বিশেষ পরিচয়, অপরার্ধ একেবারে অজ্ঞাত অপরিচিত না হলেও অনেকটাই না-দেখা এবং না-জানা, অজ্ঞাত অপরিসীম শিহরণে পক্ষায় রহস্যে ও মোহমায়ায় আবৃত—মানুষের জীবনটি, তার অস্তিত্বটি ঠিক তেমনি। দিবাভাগের বর্ণনা এবং ব্যঞ্জনা নিয়েই সকল সাহিত্য আর রূপকলা চিরদিন ব্যাপৃত আছে; রাত্রির উল্লেখ কোথাও কোথাও থাকলেও, অন্ধকারের রূপ আঁকবে কে? সার্থকতা কিছু আছে কি? কালে কালে এই ছিল কবি বা রূপকারগণের মনোভঙ্গী। অথচ, বলাই হয়েছে, মানব-সত্তার অনেকটা অন্তত সব সময় আবৃত করে আছে রাত্রি। তার রহস্য কি কোনো কালে কিছুই জানা যাবে না, কেউ জানবে না, জানাতে পারবে না? আমরা অনুমান করতে পারি, কালে কালে বড়ো কবি বা শিল্পীদের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকবে। রাত্রিকে জানতে হলে রাত্রির অধিকারে যেতে হয়। রাত্রির মায়ায় আবিষ্ট হতে হয়, নিজের উপর নিজের অধিকার হারাতে হয়—স্বচ্ছন্দ-চেষ্টার এবং চেতনার অধিকার। তেমন জানার ফল কী? আবার, দিনের এলেকায় এনে রাত্রির অবগুণ্ঠন যদি মোচন করি, সে আর রাত্রি থাকে না। এ এক বিষম সমস্যা। আপাতত যেন তার একটি সমাধানই দেখা যায়, যার সাধনে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ মন দিয়েছিলেন মনে হয়—দিন এবং রাত্রি, চেতনা এবং আবেশ, জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়ের মিলন-মোহানায় ব'সে নিজেকে বস্তুবৎ সমর্পণ করা অদৃষ্ট কী এক শক্তির হাতে; আলোছায়ার বিচিত্র পর্দায় মেলে দিয়ে অথবা একটির উপর আর একটি চাপা দিয়ে, শব্দ অর্থ ইশারার অতি বিচিত্র লুকোচুরি খেলায় এবং দ্বন্দ্বে, যা ধরা দেবার তাই সে ধরে দেবে, যেটুকু ছিটকে প'ড়ে প্রকাশ হবার তাই লোকে সবিস্ময়ে দেখবে। 'তাৎপর্য কী' এ প্রশ্নের সংগত কোনো জবাব নেই। অমেয় আঁধার সমুদ্রতল থেকে মোহমুক্তের জাল ফেলায় এই রূপ উঠে পড়েছে বটিও, সঙ্গে সঙ্গে তার সংজ্ঞা বা পরিচয় সেটাও উঠে আসেনি—তাই নানাপ্রকার অনুমান হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে লাভ কী? চক্ষুহীন দেখায় হঠাৎ যা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অবাক্ বিস্ময়েই তার যথার্থ উপভোগ। প্রশ্ন ক'রে বিশেষ ফল নেই। অথবা এমনও বলা যায়, উন্মথিত প্রলয়ের থেকে শুধু 'অস্তি'টুকু যদি জেগে উঠে থাকে, প্রাণচাঞ্চল্য অল্প হয় আর চেতনা ও আনন্দের উন্মেষও হয় দূরবর্তী, তাতেই বা ক্ষতি কী? এটিও তো দেখবার এবং জানবার বিষয় এরই স্ব-ভাবে।

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনে বোধ করি এ সাধনারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, রবীন্দ্র-চিত্রকলাকে বিপুল গভীর আশ্চর্য এক প্রতিভার রূপসাধনা হিসাবে না দেখে শুধু, তারই সর্বব্যাপক জীবনসাধনার অঙ্গাঙ্গীভাবে দেখাও সম্ভব, হয়তো সেই দেখাই যথার্থ। মর্তপৃথিবী দিন-রাত্রি আলো অন্ধকারের পর্যায়ে নিত্য আলিঙ্গিত সে আমরা জানি বা লক্ষ্য করেছি। এখন অন্যভাবে বলা যায়, সচেতন মনুষ্যসত্তা একমাত্র পার্থিব ভুবনেই তো বাস করে না। স্বর্গ মর্ত পাতাল তিনলোক নিয়ে তার অস্তিত্ব; জাগ্রত সক্রিয় সচেতন জীবনটি পৃথিবীতে হলেও, স্বর্গ এবং 'রসাতল' তার অস্তিত্বের বাহিরে নয়—এবং এই তিনেরই 'মাত্রা' স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে আছে তার সকল ভাবনায় বেদনায় কামনায় কল্পনায়, জ্ঞানে এমন-কি অজ্ঞানে, এবং প্রতিটি পদক্ষেপে ও চেষ্টায়। তিনের প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি এই আমরা জানি বা শুনেছি—স্বর্গ বা দ্যুলোক স্বতঃই জ্যোতির্ময়, আনন্দময়, চৈতন্যময়; মর্ত বা ভূপৃথিবী আলো এবং অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, দিবা ও রাত্রি, এই দুয়েরই ভোগভূমি তথা দ্বন্দ্বময়; আর, পাতাল নাগলোক, নিম্নজ্ঞান, অবচেতনা বা অচেতনা যে নামই দিই-বা কেন অস্তিত্বের সর্বশেষ আর সবচেয়ে নিচের তলাটিকে, সে বুঝি চির অমানিশার দেশ, চির অন্ধকার,—তার সীমাহীন বিস্তারে, গুহায় গহ্বরে,

ভরলিত তরঙ্গিত একাকারে যে-সমস্ত প্রাণের বেদনা, প্রেতের কামনা, জড়ীভূত জীবনাবেগ, ভাষাহীন আর্তনাদ ও হতাশা, তারাই লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভেসে বেড়াচ্ছে, নির্দিষ্ট আকার হয়তো পাচ্ছে না। এই নিরন্তর বিক্ষোভ, এই নিঃসঙ্গ চাহাকার, এই 'আঁধারের আলোকব্যগ্রতা' এবং রূপনিঃস্বের অদৃশ্য বুভুক্ষা, সৃষ্টিউন্মুখ প্রলয়পয়োধির প্রলয়বেদনা ও ক্রন্দন—এরই আভাস পেয়েছেন কবি মধ্যরাত্রের বিনিদ্র মুহূর্তে কূলহীন কল্লোলমুখর মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে, সম্মুখে পশ্চাতে উর্ধ্বে অধে এবং আপনারই সত্তার ভিতরে নিষ্প্রাণ অবচেতনার অপরিসীম বিস্তারে এবং তারই ফলে বিস্মিত বেদনাহত চিত্তে যে জিজ্ঞাসা জেগেছে কোনোখানে তার কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

আর্টের অন্যতম সংজ্ঞা হল—রসরূপ। মর্ত জীবনের যা কিছু অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির যা কিছু দেখা শোনা ও কল্পনা তাকেই অমর্ত চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত করে উপস্থিত করা—তারই আশ্চর্য এক রূপান্তরসাধন। ফলে লৌকিক দুঃখ শান্তি তো অলৌকিক এক আনন্দে বা অমৃতে অপূর্ব পরিণতি লাভ করেই; এমন কি, কামনা লোভ, বিষাদ ব্যর্থতা, মর্মান্তিক যাতনা ও ক্ষোভ, রিপুর তাড়না, সে সবও অদ্ভুত এক পরিণতির ভিতর দিয়ে ঠিক যে লোভ ক্ষোভ কিম্বা যন্ত্রণাই থাকে এমন নয়। এমন না হলে কোনো যুগের কোনো বিয়োগান্ত কাহিনী, কোনো মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি কাব্যে নাটকে গীতে অভিনয়ে রূপকলায় মানব-সাধারণের সমাদর পেত না। আলোক ও চেতনার পরশমণি-ছোঁয়ানো রূপের এই রূপান্তর-বশতই আর্টের চরম ফল হল স্রষ্টা এবং রসিক, ব্যক্তি এবং সমাজ, উভয়েরই একপ্রকার চিত্তশুদ্ধি, পরিণামে এক শান্তি ও সামঞ্জস্যে সচ্ছন্দ স্থিতি, এক নবীভূত বোধ বা চেতনা—বোধ করি গ্রীক মনীষী তারই নাম দিয়েছেন ক্যাথার্সিস।

কিন্তু এই-যে রূপান্তর-সাধন সে তো জাগরজীবনের সুখদুঃখ-বিচিত্র আলো-ছায়াময় যা-কিছু রূপ, যে-কিছু অভিজ্ঞতা, তার সম্পর্কেই প্রযোজ্য। জাগরণের আড়ালে এবং অতলে সত্তার যে নিগূঢ় রহস্য, যে আকাঙ্ক্ষা আকূতি ও বিভীষিকা, সে কি শুধু সুপ্তজনের মানসে স্বপ্নের অনায়ত্ত ছায়াবাজি রূপেই দেখা দেবে ও মিলিয়ে যাবে—অন্তরালে থেকে অলক্ষে হয়তো জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করবে, সার্থক করবে অথবা প্রায়শঃই ব্যর্থতায় ভরে দেবে, বুদ্ধিবিকার কিম্বা মানসিক অসুস্থতা পানে নিশির ডাকে আর মায়াবিনীর হাতছানিতে প্রলোভিত করবে—তাকে কি কোনদিনই জানা যাবে না?

বুদ্ধি দিয়ে জানা যাবে না একথা সত্য। চিরনিশা অথবা চিরপ্রদোষের তমিস্রচর এই-সমস্ত বিরূপ বিকৃত ক্ষোভ ও বাসনা, যাদের এক কালে হয়তো ছিল সার্থক রূপ ও ব্যঞ্জনা, হয়তো ছিল না—যারা কোনো জন্মে বিশ্বশীতিনির্ঝরের তীরে তীরে অথবা জীবজীবনের কূলে উপকূলে হয়তো বাসা বেঁধেছিল, হয়তো বাঁধেনি—নির্দিষ্ট আকার পায়নি, বেদনাময় চেতনাচকল সার্থক জীবন-লাভের সম্ভাবনা আজও আসেনি—দিনের সুস্পষ্ট আলোকে এদের মুখ চেনা যাবে না। অস্থির রূপ ও পরিবর্তমান ভাবভঙ্গী নিয়েই স্বপ্নে অথবা জাগরস্বপ্নে এরা দেখা দিতে পারে—তার বেশি আশা করা যায় না। আবার সেই মুহূর্তেই যদি তাদের বন্দী করা হয় রঙে রেখায় অথবা কোনোরূপ ভাবে ভাষায় তন্ত্রীতে, চিরচলিষ্ণু অন্ধ প্রাণাবেগের অনেকটাই ধরা যাবে না। রহস্যসমুদ্রের অতল থেকে বীবরের জালে যে-সব অদ্ভুত আশ্চর্য প্রাণী উঠে আসে, এখানকার বাতাসে কতক্ষণ তারা নিঃশ্বাস নিতে পারে? কতক্ষণ তাদের জীবন থাকে? এও তেমনি।

লোকোত্তর প্রতিভায় উদ্ভূত আর্টের যে প্রক্রিয়া আবহমান কাল থেকে দেখা যায় দেশে দেশে,

ধারই প্রভাবে প্রাচ্য পাশ্চাত্য, প্রাচীন বা অর্বাচীন, ভাবৎ রূপকলার স্বরূপ বা সংজ্ঞার্থ একপ্রকার নির্দিষ্ট হয়ে গেছে রসিক সমাজদারের হৃদয়ে মনে, এক্ষেত্রে সেটির কোনো অবকাশই ঘটে না। অর্থাৎ এই অজ্ঞাত অপরিচিত অদ্ভুত 'বস্তুতন্ত্র'-সংঘের কতকটা নিরূপণ চলেও রূপান্তর-সাধনের প্রশ্নই ওঠে না। কেন না, ভেবে দেখতে গেলে, রূপান্তরের ব্যাপারটি আসলে জন্মান্তর জীবনান্তরেরই আর এক নাম। আমরা পূর্বেই বলেছি, সুপ্তির জিনিসকে জাগরণে ধরে রাখলে, অতলের প্রাণীকে নিছুর রৌদ্রালোকে অনাবৃত ক'রে দিলে, তার নিজস্ব জীবন ও ছন্দ বহুক্ষণ থাকে না।

মানুষী সত্তার অবচেতন স্তরের উদ্ঘাটনে সাম্প্রতিককালে দেশে বিদেশে যে বিপুল বিশাল বিচিত্র রূপকৃতির উদ্ভব হয়েছে, যে বিরূপলোক বা জাদুময় জগতের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেছে, সে-সবেরই এই যেন সামান্য গুণ বা সাধারণ লক্ষণ বলা যেতে পারে। তৎসত্ত্বেও চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অসামান্যতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দক্ষিণ আমেরিকার বিলুপ্ত বিধ্বস্ত সংস্কৃতির উৎখাত আবিষ্কৃত শিল্পসামগ্রী আর আফ্রিকার চিরতমসাচ্ছন্ন মহাদেশে উদ্ভূত অদ্ভুত রূপরীতি সুসভ্য য়ুরোপের প্রাণ উচ্ছৃঙ্খল প্রতিভার কতকটা প্রভাব বিস্তার করে থাকলেও, অনেকটাই হয়তো য়ুরোপীয় রূপকলার শেষ দিকের অতিসচিত বাস্তব অনুকৃতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বা পরিণতি—আমাদের দেশে যাঁদের কল্পনাকে বা প্রতিভাকে নূতনতার চমক দিয়ে এ জিনিস বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছে তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ও উল্লেখযোগ্য হলেন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শিল্পী শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ। একজনের রূপসাধনার আভাস আমাদের গোচরে এসেছে, অন্যজনের রূপরচনার ধারা নূতন নূতন চিত্রে ও মূর্তিতে—আজও অনিঃশেষ হলেও তার প্রকৃতি ও প্রকরণ আমাদের সম্পূর্ণই জানা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের থেকে এঁদের বিশেষ পার্থক্য এই যে, এঁরা উভয়েই সাদৃশ্যনির্ভর রূপায়ণে বিশেষভাবে দক্ষ হয়েও—শেষ পর্যন্ত রূপসাদৃশ্যকে উপেক্ষা করে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বা অস্বীকার করেছেন। ফলে সাঁতার জানলে যেমন জলে ডুবে মরা কঠিন, এঁদেরও কতকটা তাই হয়েছে মনে হয়। অর্থাৎ মানবচেতনার প্রচ্ছন্ন গুহাগহ্বরে আশ্রিত অতলস্তমিস্রচর বিরূপলোকের অধিবাসীদের আবিষ্কার করেছেন ও গোচর করেছেন আমাদের কাছে বিশ্লেষণপটু বুদ্ধিবৃত্তির এক অভিনব শক্তি ও শৃঙ্খলা দিয়ে। বিরূপাকৃতির স্বচ্ছন্দ প্রবাহ এবং শক্তি, অন্ধ আবেগের সংহত সংরুদ্ধ প্রকাশ, বাঁধা পথের বাঁধনে কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে সন্দেহ নেই, স্বতঃস্ফূর্তি ও অকৃত্রিমতা হারিয়েছে। তুলনায়, রবীন্দ্রনাথ কিছুই প্রায় দেখেন নি রূপরচনার দেশী বিদেশী কোনো প্রকরণ; কোনো উদ্দেশ্য মনের সামনে রেখে কখনো জাগ্রত কালী রঙ ব্যবহার করেন নি মনে হয়, অথবা কদাচিৎ কোনো উদ্দেশ্য থেকে থাকলেও সে তাঁর আয়ত্তে আসেনি—তাঁর রূপকৃতি বা চিত্ররচনা নিজস্ব স্বভাবে স্বতঃই নিরূপিত হয়েছে এবং লোকোত্তর প্রতিভার বা অসামান্য ব্যক্তিসত্তার যে স্বাক্ষর পড়েছে এই অভিনব সৃষ্টির সর্বত্র সে তাঁর সচেতনভাবে লেখা এমন বলা যায় কি? অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট চিত্র যেগুলিকে বলা যায়, যার মধ্যে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিশেষ ছাপ দীপ্ত হয়ে উঠেছে বা চাপা আগুনের মতো নানা রঙ্গপথে রক্তরাগের ঝলকে ঝলকে দেখা দিচ্ছে, সে-সবের কিছুই ভেবেচিন্তে, সময় ও সুযোগ নিয়ে, উদ্দেশ্য ও উপায়ে মিলিয়ে অঙ্কিত হয়নি। সে-সবই যতটা বিস্ময়ে অভিভূত করে দর্শকজনকে, ততটাই অ-বাক্ বিস্ময়ের বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। কবি-মনীষী ও বাক্‌পতি হয়েও তিনি কোনো ব্যাখ্যা কোনোদিন দেননি বা দিতে পারেননি। অপূর্ব এক চিত্রলোকের এইসব অধিবাসীরা আছে বা হয়েছে—এছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আর কোনো জবাবদিহির কথা ওঠে না। মনোবিজ্ঞানীরা সত্য কল্পিত অথবা সত্য-ও-কল্পনা-মিশ্রিত ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে পারেন—চিত্রকারী প্রতিভার তাতে লাভ ক্ষতি সামান্যই

নিখিল রবীন্দ্রচিত্রকৃতি কোনো কোনো সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত হলেও সবই যে এক শ্রেণীতে পড়ে এমন নয়। রেখা রূপ ও ভাবের একপ্রকার মন্ত্রগুঞ্জ ছন্দ প্রায় সবই দেখা যায়, তা ছাড়াও কোথাও বিশেষ বিশেষ চারিত্র, কোথাও বা কমবেশি রূপসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। প্রায়শঃই ধূসরচিত্রগুলিতে প্রদোষ-রহস্যের বিশাল এক স্তব্ধির বিষাদ ও শান্তি ফুটে উঠে অন্ধ ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে দূরপ্রসারিত রসলোককেও স্পর্শ করেছে সন্দেহ নেই। যে কোনো আদর্শেই বিচার করি রসরূপ হিসাবে তাদের অপূর্বতা বা অনন্যতা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

রবীন্দ্রচিত্রকৃতির সকল বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সে অধিকার অর্জন করতে হলে যে পরিমাণ সময় পরিশ্রম অভিনিবেশ ও মননের আবশ্যকতা তারও সুযোগ নেই। তার অনন্যতার বিষয়ে দু একটি কথা যা মনে এল তাই আমরা সবিনয় সম্ভ্রমে উপস্থিত করেছি। পাশ্চাত্য কলারসিক বিদ্বজ্জন যদি বলে থাকেন এদেশে আমরা যে জিনিসের সন্ধানে হাৎড়ে বেড়াচ্ছি, তোমার চিত্রকলায় তাই উজ্জ্বল, পরিস্ফুট' পরিশীলতা সৌষ্ঠবের বাগভঙ্গিমা বাদ দিয়েও তার অর্থ হয়তো এই যে, যে দ্বিধাহীন বলিষ্ঠতা, ঐকান্তিক একমুখী ব্যক্তিসত্তার এষণা ও স্বাক্ষর, নিবিড় গভীর বোধ-সঞ্জাত অকৃত্রিমতা নব্য কালের অবাস্তব বা অতিবাস্তব রূপকলায় প্রায়শঃই অনুপস্থিত, রবীন্দ্ররচনায় তারই প্রাচুর্য দেখা যায়। বিচিত্র বুদ্ধির খেলা দেখানো, বিশেষ কোনো মতবাদের বা মনস্তত্ত্বের প্রমাণ সাজানো—তার উদ্দেশ্য নয়। যেখানে তার সহজ সার্থকতা ও স্বাভাবিকতা, সে স্থলে যেমন আছে লেখাঙ্কনের শুদ্ধোপেত অস্খলিত আশ্চর্য রেখাশৈলী, বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাসের আলো- আঁধারি মায়াজাল ও ব্যঞ্জনা, স্থাপত্যোচিত নির্মাণ, সমুদয় চিত্রপটে পরিব্যাপ্ত স্পর্শযোগ্য রঙ ও রেখার বুনানি, ছন্দ, বিশেষ বিশেষ চারিত্ররূপ, তেমনি এমনও অনেক অদৃষ্টপূর্ব অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত রূপ যা কেবল বলে 'এই যে আমি', অর্থাৎ, 'আমি যে হয়েছি বা রয়েছি তার প্রমাণ আমাতেই'—একটি সূক্ষ্ম স্বপ্নের পর্দার ওপার হতে অজ্ঞাত অপরিচিত লোকের সেই বাণী আমাদের কানে না এলেও প্রাণে ধ্বনিত হয়।

আমাদের আলোচনায় রবীন্দ্রচিত্রের অতিবাস্তবিকতায় বা স্বপ্নসাদৃশ্যেই আমরা বিশেষ মনোযোগ দিয়েছি। কারণ, সেখানেই তাঁর অপূর্বতা ও শ্রেষ্ঠতা। অথচ, বহু টাইপ-সৃজনে, মুখাকৃতি-অঙ্কনে ও ভূদৃশ্য-রচনায় তাঁর অবিসংবাদিত দক্ষতা—সেটির উল্লেখ করতেও ভুলি নি। সেযোক্ত রূপরাজিও যে মরমনের অতল গভীর থেকে স্বতই ভেসে ওঠেনি এমন নয়। বিশেষ এক ধরনের মুখাকৃতি ও চোখের দৃষ্টি ঐ ভাবেই পটের উপর ফুটে উঠে আমাদের বিস্ময়বিমুগ্ধ করে; ভাবভঙ্গীগত এই ঐক্যের কারণ কী সে সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেন, 'নতুন বৌঠানের (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী) চোখ দুটো এমন ভাবে আমার মনের মধ্যে গাঁথা আছে যে মানুষের ছবি আঁকতে বসলে অনেক সময়েই তাঁর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে জল জল করতে থাকে—কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তাই ছবিতেও বোধ হয় তাঁর চোখেরই আদল এসে যায়।' শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত রবীন্দ্র চিত্রকলা (পৃঃ ৩২)

কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি হলেও বিশ্বসৃষ্টির ভিন্ন দুটি দিকে এই দুই প্রতিভার মুখ ফেরানো এবং তাৎপর্যের দিক দিয়েও পৃথক। একটিতে সমুদয় বিশ্ব জীবনকে অলৌকিক অপূর্ব এক আলোকে উদ্ভাসিত ও রূপান্তরিত করা হয়েছে। তারই ফলে যেমন এই রূপস্রষ্টার তেমনি রসিক দ্রষ্টার মুগ্ধ পুলকিত চেতনার এক আশ্চর্য উদ্‌বোধন। আর একটিতে বিশ্ব সৃষ্টির গহন গভীর অন্তরালে অথবা প্রলয়লীন সত্তায় আকারের কাঙাল যে সব স্মৃতি ও কল্পনা, অন্ধ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা, তাদেরও বুঝি রূপ দিতে বসেছেন চিত্রকর অপূর্ব এক নেশায়

রবীন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ॥

কল্পনা করে নিতে পারি শর্বরীর ধ্যানমৌন সভায় অসীম আকাশে মহাতপস্বী মহাকাল শুধু বসেই বসে নেই। খণ্ডকালের খণ্ডদেশের খণ্ড পাত্রপাত্রীকে নিয়েও তাঁর নিত্য নূতন নর্তন চলেছে।

বিশ্বপত্রে বৃদ্ধ মহাকাল অহরহ
লিখে চলে জীবনের ক্ষণিক ইতিহাস

এই চর্যাপদকে নামরূপকালের সীমায় ফেলে আমরা নামকরণ করেছি—ইতিহাস। বলেছি ক্ষান্ত কর মুখের ভাষণ তব। এমনি এক কাহিনীর শুরু হয়েছিল সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরের যুগল মসনদ, তখত্‌তাউস্, ময়ূরসিংহাসন তছ্‌নছ্। একদিকে হর হর মহাদেও রব, আর একদিকে রোহিলা, রাজপুত জাঠ, নাদির শা আমেদ শার দল। ভারত ইতিহাস সতিকার পদ্মাসনে বসেছে কাটল, তিনি হয়েছেন চঞ্চলা। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বণিকের মানদণ্ড হরজটা-ভ্রষ্ট ভাগীরথীতীরে কখন থমকে দাঁড়িয়েছে, হাত মিলিয়েছে, মুনাফা সংগ্রহ করেছে, তারপর অলক্ষিতে রাজদণ্ড তুলে নিয়েছে। সেই যুগসন্ধিক্ষণে শুধু পূরবৈয়া বায়ুর শন্‌শনই শুনিনি, পশ্চিমী প্রবল বাত্যার বনবনও শুনেছি। যমুনার কল্লোলের সাথে নহবতে তান মিলিয়ে এলো। গঙ্গার ঘাটে এসে লাগলো সোনার তরীতে ভরা নতুন পশরা—জ্ঞানবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবোধের চেতনা, নূতন দিগ্‌দর্শন, নূতন মেন্তী ভাবনা। পুরোনো দিনের স্মৃতিকে শ্রুতিকে সম্বিধায় না দিলেও মন্থন হলো শুরু। সেই আলোড়নে বেরিয়ে এলো চারণের দল—কেউ জ্ঞানী, কেউ গুণী, কেউ সন্ত সাধু, কেউ কবি, কেউ শিল্পী, কেউ কর্মী, কেউ ভাবুক। এরা শুধু মিল মেহাম সেলার চলায়ের কথাই তোতাপাখীর মত আবৃত্তি করে না, মনুষাজবন্ধাহারীতলারিতকেও বলে টানে, শুধু নিরীশ্বরবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যুক্তিতর্ক নিয়েই দিন কাটায় না, বিদ্বজ্জন সমাজে ভক্তির ফোয়ারাও তোলে। এরা নানা মুনি, এদের নানামত; কিন্তু এক জায়গায় এদের মিল ছিল—তারা উদাত্ত সুরে বলেছিল—আমাদের মন্ত্র হবে চলা, যন্ত্র হবে জানা, তন্ত্র হবে শোনা—চোখ মেলে আমরা দেখবো, কান পেতে আমরা শুনবো, নিজের মতন করে বুঝবো, নিজেদের মন দিয়ে, মান দিয়ে প্রাণ দিয়ে, ধ্যান দিয়ে ধারণা দিয়ে, রচনা করবো নিজেদের সমাজ, সংস্কৃতি, স্বর্গ। এঁদের চোখে স্বপ্ন নেমেছিল বিশ্বামিত্রের, মহীদাসের, চারুবাক্ চার্বাকের, আবার চৈতন্যের শংকরের, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষী তপস্বীদের। কেউ বললে এঁরা হচ্ছেন আলালের ঘরের দুলাল, এ সব হচ্ছে নব বাবুদের বিলাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনমন জাগেনি—উপরতলার জন কয়েক লোক ভাবোন্মত্ততায় গড়াগড়ি দিয়েছে—এখানে জীবনের গণচেতনা ভাষা ও ভাষ পায়নি। ইতিহাসের বহিরঙ্গের মালমশলা খাতাখতিয়ান কি সাক্ষ্য দেবে জানি না কিন্তু অন্তর্জগতের মথিমন্থনে সেদিন যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল সে তো সত্যি, সেইটিই তো ঊনবিংশ শতাব্দীর দান বিংশ শতাব্দীর ভাবলক্ষ্মীর পাদপীঠে। বাংলাদেশ চিরকালই কুললুপ্তের দেশ, অপাংক্তেয়দের দেশ, তার রক্তে আছে চঞ্চলতার বীজ—সে পান্থ, সে পথিক—সে সদাজিয়া, সে মরমী চণ্ডালী ডোম্বী নিয়ে তার ঘর, মানুষ নিয়ে তার কারবার—

তার মন্ত্র হচ্ছে—

হে ভৈরব, হে শংকর, সবারে দিয়েছ বর
আমারে দিয়েছ শুধু পথ

তার পরিব্রাজক তাই তো গেয়েছেন—

হে ভারত, ভুলিয়ো না তোমার আরাধ্য গৌরীপতি শংকর

তাইতো আমাদের পূর্বসূরীরা বলতেন—এ হচ্ছে পাখীর দেশ. তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনর্সংস্কারমর্হতি—

আমরা পাখীর জাত
আমরা হেঁটে চলার ভাও জানি না, উড়ে চলার ঘাত

উনবিংশ শতাব্দীতে উড়েই চলেছিল বাংলাদেশ—ভারতপথপথিক বাংলাদেশ শুধু মহাভারতের চক্ষু পথেই বেরোয়নি, তীর্থবারি সংগ্রহ করেছে, পূজার ফুল এনেছে, তার মানসম্মান নিবেদন করেছে, নিয়ে এসেছে তার কথা ও কাহিনী, তার আচার ও বিচার, তার ভাষা ও ভাষা, তার মেধা ও মনীষা, তার জীবন্ত মনন ও রতন্। এরই প্রতীক রামমোহন রামকৃষ্ণ, এরই প্রকাশ বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ, এরই সিদ্ধি বিবেকানন্দ অরবিন্দ, এরই বাহক ও ধারক আরো বহু মনীষী ও সাধকের দল।

এঁরাই জেনেছিলেন

কূলের উপরে কূলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ

এই যে দিকপালরা দিকে দিকে নিজেদের প্রসারিত করে দিলেন, এঁদের একজনের প্রভাব আর একজনের উপর পড়েছিল কিনা। কবিগুরুর কথাই ধরা যাক। কারণ প্রথমতঃ তিনি ছিলেন এক বিশেষ স্পর্শকাতর মানসের অধিকারী। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যেখানে যা কিছু ঘটেছে তার কম্পন ধরা পড়েছে তার মনের সূক্ষ্ম সিস্মোগ্রাফে—রূপ নিয়েছে অবচেতনায়। তাছাড়া তিনি ছিলেন দুই শতাব্দীর মানুষ—ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর অর্ধেক কেটেছে উনবিংশ শতাব্দীতে আর এক অর্ধেক বিংশ শতাব্দীতে। অনেক কিছু বৈষম্যের সমন্বয় হয়েছে তাঁর মনে—ফিউডাল যুগ থেকে তিনি চলে গেছেন রাশিয়ার কলেক্টিভিসমে—Turning the tide of wealth from individual to the collective humanity, পুষ্পখচিত বনস্থলী থেকে দোসহজনার মিলনবিরহের বেদনাবন্ধুর পথে, ভেদচিহ্নের তিলকরূপ সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে ব্রাত্যমানুষের কাছে। প্রকৃতি থেকে তিনি গেলেন প্রকৃতির অধীশ্বরের সামনে, আবার নেমে এলেন মানুষের দুয়ারে—এই তো তাঁর পরিক্রমার ইতিহাস।

ভাবতে ইচ্ছা করে কবিগুরুর মনে তাঁর সমসাময়িক কোন্ সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভাব বিস্তার করেছিল, কাদের তিনি তাঁর মনের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন—

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অনেক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন্

জানি তিনি অর্ঘ্য দিয়েছেন—অকুণ্ঠিত সে শ্রদ্ধা—রামমোহনকে। রামমোহন তাঁর কালের নন, কিন্তু তিনি দেখেছিলেন তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথকে বঙ্কিমকে বিদ্যাসাগরকে। অরবিন্দও রবীন্দ্রের নমস্কার পেয়েছেন। পরিপূর্ণযোগে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকারই যে আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার ধারা সত্তা যেখানেই ওতঃপ্রোত সেইখানেই কবির প্রণাম পৌঁছেছে। পরের যুগে গান্ধী

মহারাজের শিষ্য বলে যেমন নিজেকে অভিহিত করলেন, আবার সুভাষচন্দ্রকেও তিনি অভিনন্দন জানালেন কারণ তাঁর ভিতরে তিনি দেখেছিলেন বীরত্বধর্মের মহিমা। তাই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠতে পারে যে তাঁর জীবনের কাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দেরও কাল। প্রায় তাঁরই সমসাময়িক কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আবিষ্কৃত হয়েছিলেন, স্বীকৃত হয়েছিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তাঁরই যৌবনে কমলাক্ষ বিবেকানন্দের আবির্ভাব, দিগ্বিজয় ও তিরোভাব। দক্ষিণপাণি দক্ষিণ দেবতার ডাক অনেকে শুনলো, ছুটলো দক্ষিণেশ্বরে। নরেন দত্তও ছুটেছিল কান মলতে ও বাজি রেখে রসগোল্লা খেতে, কিংবা রসে ভক্তি হবে, দেখে এলো এমন এক মানুষকে যার ভিতর শংকর আর চৈতন্যের হয়েছে সমন্বয়।

যিনি জগচ্চন্দ্র হার পরেছেন গলায়
অশ্রুজলে সিক্ত করা, প্রেমরসের ভাবন যেওয়া।

পরমহংসদেবকে তিনি প্রণাম জানিয়েছেন, একথা রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর ধর্মসম্মেলনের ভাষণেই রয়েছে। অপূর্ব এক কবিতায় তিনি বললেন—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
যেখানে তোমায় মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ দিল এ জগতে
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেইখানে আমার প্রণতি দিলাম আনি।

এ প্রণাম স্বতঃউচ্ছ্বসিত প্রণাম—কিন্তু একথাও সত্য যে তাঁর সামগ্রিক কবিচেতনায় রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব স্বল্প, তাঁর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা নেই বললেই হয়, তবু গভীরতম মর্মে একটি ঐক্যের সূত্র আছে যার পরিণতি মানুষের মহামানবত্বের কল্পনায়, জীবই শিব, এই রূপ আরোপে। কবিচেতনার এই দিকটির সঙ্গে বিবেকানন্দের বহুবাণীর সামঞ্জস্য আছে। হয়তো এই ঐক্যের সূত্র খুঁজতে যেতে হবে মূল উপনিষদের বাণীতে—যদিও একজন দ্বৈতবাদ থেকেই অদ্বৈতে পৌঁচেছেন, আর একজন অদ্বৈতবাদ থেকে দ্বৈতে এসে নেমেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, তিনি বাল্যকাল হতেই মহর্ষি প্রবর্তিত নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার অভ্যস্ত। তিনি নিজেই বলেছেন—উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—দেশের ধর্মসাধনার ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত। এমন কি পরবর্তী জীবনে নিরাকার উপাসনাতেও তাঁর উদাসীন্য এসেছিল।

"The Solitary enjoyment of the Infinite in meditation no longer satisfied me, and the texts which I used for my silent worship, lost their inspiration without my knowing it". (Hibbert Lectures—Religion of Man, pp. 165-66)

কবি মানুষের ধর্মের যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তা বলে না "যত মত তত পথ" তা বলে মানুষের সমগ্র মনুষ্যত্ব যে উপাসনা পদ্ধতি পরিস্ফুট করে তাই আদর্শ সাধনা। মানুষের তিন মূলবৃত্তি—

এ এক রাতের রেলগাড়ি
ছাড়ল পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

চলেছে সে নাকি নাহি জানে।
কেউ বলে যন্ত্রে সে, থাকে-কিনু নয়ে।
মনোহীন বলে তারে, তবু একেবারে
প্রাণধন ঢালি দিয়া কিছুনা সে পারে।
বলে সে অনিচ্ছিত, তবু জানে সবে
নিশ্চিত তার গতি।

নামহীন সে একেলা রাতের পার হয়ে যায়,
একেলার যারা সাথি রয়েছে সেথায়
তারি মনে রহে নিশ্বাস —
সন্দেহ-আড়ালেতে দুরুদুরু কাঁপে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিশীথের বিরামবিহীন যাত্রীদের তলে।

— রবীন্দ্রনাথ

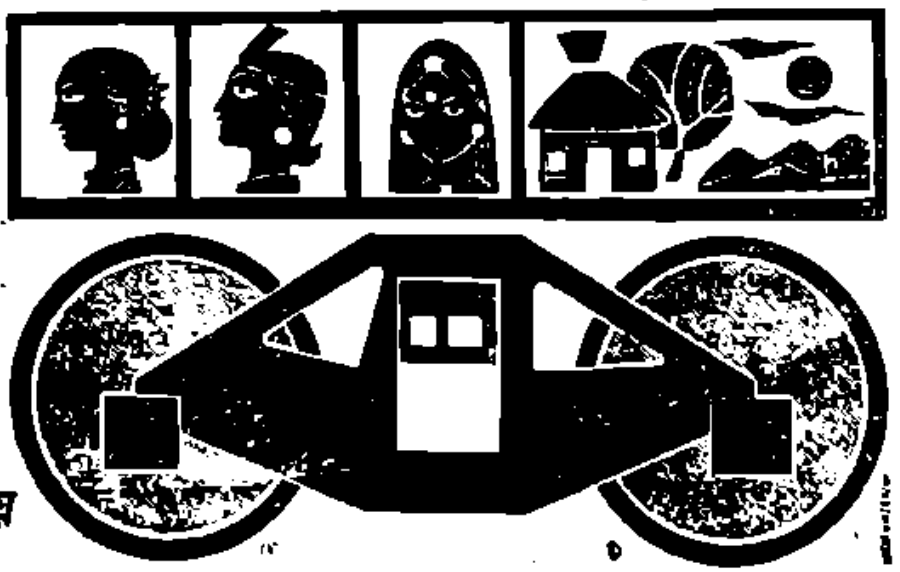

পূর্ব রেলওয়ে

জ্ঞানশূন্য, কর্মে আসক্তি, প্রীতিভালবাসা। সে উপাসনা সম্ভব দেবতাকে মানুষের মধ্যে আবিষ্কার করে মানুষের সেবায়—এ যেন বাউলদের কথায়

জীবে জীবে চাহিয়া দেখি সবই যে তার অবতার
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার!

গীতাঞ্জলিতে রসে বশে থাকার কথা ভাবতে পারা যায় বটে, কিন্তু ভক্তিগদগদ ধর্ম তাঁর বিশেষ অনুমোদন লাভ করেনি, অন্ততঃ তার আতিশয্য—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীত গানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায় যেই জনহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উজ্জ্বল প্রেম ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ। (নৈবেদ্য)

সেইজন্য ভাবানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিমাপূজা তাঁর আদর্শে খর্ব হয়ে গেছে। অবশ্য সাহিত্যের প্রতীক কল্পনায় তিনি মাঝে মাঝে প্রতিমাকে অসীমের সীমা হিসাবে গ্রহণ করেননি যে তা নয়। প্রকৃতির ঐশ্বর্যময়ী রূপলালসা তাঁকে এক মহামায়ার সন্ধান দিয়েছে—দেবীসূক্তের ভাবাপৃথিবী যিনি আবিষ্ট করে আছেন। যেখানে বিবেকানন্দ বললেন—সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী ...করালিনী কর মর্মচ্ছেদ, ঘুচাও মায়াভেদ, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বড় জোর বলবেন—এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী.....

কিন্তু আসলে,

মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারা বেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজাখেলা।—(নৈবেদ্য)

তাদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগ ছিল না, কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে "আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতর ভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানব আত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাহাকে বারবার নমস্কার করি", (রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড)।

তাই,　　বিশ্বসাথে যোগে যেথা বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে নয়-বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়
সেথায় আপন আমারো।

বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক কোন্ পর্যায়ে পড়ে তার আলোচনা করলে দেখা যাবে যে কবি শুধু নীরস জ্ঞানমার্গের পথিক নন্, তিনি রসিক, তিনি সগুণ ব্রহ্মের উপাসক—রূপ থেকে রূপান্তরে তাঁর গতি—জল পড়ে পাতা নড়ে—বিস্ময়ে তার প্রাণ জাগে,—গান সাড়া দেয়—আকাশে দ্যুলোকে ভূলোকে তিনি দেখছেন প্রাণকে, আনন্দকে.....

এই শেষ কথা নিয়ে নিঃশ্বাস আমার যাবে থামি
কতো ভালোবেসেছিনু আমি।
অনন্ত রহস্য তার উছলি আপন চারিধার
জীবন মৃত্যুরে দিল করি একাকার
বেদনার পাত্র মোর বারংবার দিবসে নিশীথে—
ভরি দিল অপূর্ব অমৃতে—

বাহিরের সন্ন্যাসকে তিনি তাই কোনদিন গ্রহণ করেননি যতদিন না অন্তরের সন্ন্যাস কবি-বাউলকে গেরুয়ার রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে।

তাই কি ? সকলি মায়া ? আসে থাকে
আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ আর সব আছে,
আর নাই ?
... ...
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন
কাহার স্বপন ?

কিন্তু আর এক বিবেকানন্দ ছিলেন—যাঁর দৃপ্ত পদক্ষেপ, অনির্বাণ তেজ, কম্বুকণ্ঠ, দার্চ্য বলিষ্ঠতা, নিষ্ঠা, কবির মনকে উদ্বেল করেছিল, তাঁর প্রণাম কেড়ে নিয়েছিল—সেই বিবেকানন্দ—যেরদণ্ড যাঁর খাড়া, মন যাঁর নমনীয়, দেহ যাঁর অনাবিল, চিত্ত যাঁর অমিতবিত্ত—জ্ঞানের দণ্ড হাতে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত যে পরিব্রাজক ঘুরে বেড়ালেন, যিনি বেদান্তের সূত্রের সাত্ত্বিক ভাষ্য করলেন, শুধু মুখের কথায় নয়, কাজে. জীবনের নিত্য পরিক্রমায়, যিনি বলতে পারেন—কাজে লেগে যা, জমি তৈয়ারী কর, ফেলে দে ধ্যান, মুক্তিমুক্তি, হাজার হাজার বিবেকানন্দ গড়ে উঠবে, যাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষ ফুটে বেরুবে ভুনাওয়ালার চুপড়ি থেকে, মুটে-মজুর মুদ্দফরাসের ঝুড়ি থেকে, জাজীর ঘর থেকে। ১৩১৪ সালে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধে কবি লিখলেন—ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস—এতো, হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, আর্যের নয়, অনার্যের নয়, স্বতন্ত্র কারোর নয়·····মহা ভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর—সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ নিয়ে আজ আমাদের মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করে তুলতে হবে—গতিবদ্ধ থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র না করে তুলি। তারপর তিনি বললেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষিগণ একথা বুঝেছেন এবং এই মনীষীদের মধ্যে মুক্তকণ্ঠে রামমোহনের সমান আসন তিনি বিবেকানন্দকে দিলেন।

(রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড)

দিলীপের স্মৃতিচারণে পড়ি যে, জালিনওয়ালাবাগে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভায় রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডনে সভাপতিত্ব করতে বললে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—তোমাদের কি লজ্জা করে না একটুও, জালিনওয়ালাবাগে আমরা পশুর মত মার খেয়েছি—সেইকথা এখানে হাটে বাজারে প্রচার করতে চাও—এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাইত তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদের এসে ডাক দিয়েছিলেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত বলে—কাঁদুনি

পাননি, আমাদের হাজারো দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কিভাবে দীক্ষা দিয়াছিলেন ভারতের সত্যকীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেননি—আমরা বড় আর্ত, বড় দীনহীন, বলতেন—ভারতের বড় বিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও, তার বাইরের দারিদ্র্যকেই বড় করে দেখোনা—আমেরিকানদের সামনে এসে তিনি মাথা উঁচু করেই বলেছিলেন ভারতের ঐশ্বর্যতত্ত্বের কথা—যদি কেঁদে ভাসাতেন—দুটি ভিক্ষা দাও গো……তা হলে না পেতেন ভিক্ষা, না পেতেন সমাদর।

কবি তখনও নোবেল প্রাইজ পাননি,—বিশ্বসভায় তাঁর আসন তখনও পূর্ণ নয়—শিকাগো থেকে চলেছেন রচেষ্টারে—একটি আন্তর্জাতিক সভায় বক্তৃতা দেবেন। বিষয়—Race Conflict; তিনি বললেন যে জীবনের গভীরতর রূপান্তর সাধনে, চৈতন্যকে সর্ববাধা হতে প্রেমের মধ্যে মুক্তিদানে এবং নরের মধ্যে নারায়ণের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতেই মানুষের মুক্তি—এই কথাই হারভার্ডে গিয়ে যখন বললেন তখন সেখানকার এক প্রবীণ অধ্যাপক বললেন যে বিবেকানন্দের পর ভারতবর্ষের বাণী এতো উঁচু সুরে আর কেউ বলেনি। যাঁরা আসেন তাঁরা অনেকেই বিবেকানন্দের বুলিকে উল্টোপাল্টা করে আবৃত্তি করে কাজ চালিয়ে দিচ্ছেন।

ভগিনী নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীদের মধ্যে এক সেতুর কাজ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের গোরা ও ঘরেবাইরে এর কিছু প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। কবির জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখছেন যে, ১৩৩। সালের প্রবাসীতে কবি, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি অনুক্রমণিকা লিখেছেন প্রবন্ধের অধিম চক্রবর্তী ও ডাঃ সরলীলাল সরকারের পত্রালাপের মুখবন্ধ হিসাবে, তিনি বলেন—আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলের মধ্যে আছে ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ……মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আত্মপ্রকে নয়।

তাই বিবেকানন্দ বললেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—

রাখোরে পূজা থাকরে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলো বালি
কর্মযোগে তাঁরি সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরি।

তাইতো—আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়—

এই মহামানবের প্রেক্ষিকাতেই রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এক মার্গে এসে পৌঁচেছেন—কবি ও কর্মী সমধর্মী হয়েছেন, সব সাধনার ধারা এসে এক ধেয়ানে মিলেছে—

ঐ মহামানব আসে
জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মোৎসব ॥

রবীন্দ্রনাথ ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন ১২৬৮ সালে। এখন দেশব্যাপী এমন কি পৃথিবীব্যাপী উৎসব হচ্ছে, এই দিনটি স্মরণ করে। মনে পড়ছে অর্ধশতাব্দী আগের কথা, তাঁর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বাংলা দেশে কি রকম উৎসব হয়েছিল। তখন তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন আমাদের মধ্যে এইসব উৎসবে উৎসবরাজরূপে। উৎসবগুলির সবচেয়ে বড় অংশ ছিল আমাদের কাছে তাঁকে দেখে আনন্দ পাওয়া, তাঁর কাছে বসতে পাওয়া।

১৩১৮ সালের বৈশাখে শান্তিনিকেতনে তাঁর জন্মোৎসব হয়। সেই আমার প্রথম শান্তিনিকেতন যাওয়া। ২২শে বৈশাখ আমরা যাত্রা করলাম রাত্রির ট্রেনে। একদল ছেলেমেয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, সঙ্গে অভিভাবকরূপে ছিলেন আমার পিতৃদেব ও একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা। আমাদের দলের নয়, অথচ আমাদের পরিচিত, এমন অনেক মানুষ দেখলাম সেই একই ট্রেনে। জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এবার "রাজা" নাটক অভিনয় হবে বলে শুনেছিলাম, তার জন্যে অনেক সাজ-সরঞ্জাম এই গাড়িতেই চলেছে দেখলাম। নূতন জায়গায় যাচ্ছি, এ লাইনে আগে কোনোদিন আসিনি, কাজেই কৌতূহলে ঘুম আসছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য দু চোখের পাতা একটু বুজে আসছিল। রাত্রি দুটো কি আড়াইটার সময় ট্রেন এসে বোলপুর ষ্টেশনে থামল। সে ষ্টেশনের চেহারা কতটা বদলেছে জানি না এখন, তবে সতেরো আঠারো বছর আগে একবার গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম, চেহারা প্রথমদিকে যে রকম দেখেছিলাম, প্রায় তেমনিই আছে। অল্প সময় এখানে ট্রেন থামে, কাজেই হুড়োহুড়ি করেই নামতে হল। সঙ্গে লটবহর বেশী ছিল না এই যা রক্ষা। সবাই নেমেছে কি না, জিনিসপত্র সব নেমেছে কিনা সব একবার মিলিয়ে নিতে হল। তার পর ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখা গেল একটি ঘোড়ার গাড়ি আর একটি বলদ বাহিত bus আমাদের নিতে এসেছে। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে কয়েকটি যুবক আর বালক উপস্থিত, তাদের মধ্যে জন দুই আমাদের পূর্ব পরিচিত। আমাদের গাড়ি চড়ার ইচ্ছা বেশী ছিল না, নূতন জায়গায় এসেছি বেশ চারিদিক দেখতে দেখতে হেঁটে যাব, কিন্তু যাঁরা নিতে এসেছেন, তাঁরা এতে একেবারেই অসম্মত, আমাদের গাড়ি না চড়িয়ে তাঁরা কিছুতেই ছাড়বেন না। অগত্যা উঠলাম গাড়িতেই। শুক্ল পক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্নায় চারিদিক উদ্ভাসিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বোলপুরের বাজার ছাড়িয়ে খোলার মাঠের মধ্যে এসে পড়লাম। বালিকার চোখে সেই আলোকপ্লাবিত প্রান্তর স্বপ্নলোকের মত সুন্দর লেগেছিল। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, কিন্তু এখনও যেন সে দৃশ্য মানস চক্ষে সুস্পষ্ট দেখতে পাই। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলাম। রাস্তার উপর নেমে পড়লাম। একজন চাকর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে গিয়ে একটি চওড়া বারান্দা ঘেরা একতলা বাড়িতে উঠলাম। বাড়িটির চারদিকেই বাগান। শুনলাম এটি কবির বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি। তিনি তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে পুরী বেড়াতে গেছেন, তাই অতিথিদের এখানে তোলা হয়েছে। বাড়িটির নাম শুনলাম নীচু বাংলা।

রাত তখন ভোর হয়ে আসছে, আর না শুলেও তখন চলত। কিন্তু আমাদের দেখা শোনা করার ভার পড়েছিল কতকগুলি বালকের উপর, তারা আমাদের বিশ্রাম করাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। শুনলাম পরদিন সকালে স্পোর্টস আছে। তাড়াতাড়ি উঠবার সংকল্প নিয়ে শুলাম, ক্লান্ত থাকায় ঘুমিয়েও

পড়লাম। তবে ঘণ্টা দেড় দুইয়ের মধ্যেই আবার উঠে পড়ে তৈরী হয়ে নিলাম, খেলা দেখতে যাবার জন্যে। বাড়ীর বাইরে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বাড়ীটির সামনে আর দুইধারে ফুলের বাগান আমলকির বাগান, কিছুদূরে তালগাছ ঘেরা একটি দীঘির মত দেখা যাচ্ছে, পিছনে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ।

ছেলেদের খেলা মাঠে হওয়াই সম্ভব মনে করে আমরা সেইদিকেই চললাম। চারিদিকেই মাঠ আর খোয়াই, অনেক দূরে দূরে দু-একটি সাঁওতাল পল্লী দেখা যাচ্ছে। এটা পঞ্চাশ বছর আগেকার শান্তিনিকেতনের বর্ণনা, পাঠক তা মনে রাখবেন। ওখানে তখন দুটির বেশী পাকা বাড়ি দেখিনি, আর সবই ছিল মাটির বাড়ি, খড়ের চাল। বিজলীর বাতি ছিল না, মোটরকার ছিল না। বাঙালী ছাড়া বিদেশী মানুষও দু'একটির বেশী দেখিনি। মাঠের ভিতর দিয়ে খানিকদূর যাবার পর একটি ছোট ছেলে এসে খবর দিল যে আমাদের জন্যে খেলা আরম্ভ হতে পারছে না। আমরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি হেঁটে খেলার জায়গায় উপস্থিত হলাম। খেলা অনেক হল, এবং ছেলেরা বাহাদুরও পেল ঢের।

তখন অবধি রবীন্দ্রনাথ খেলার মাঠে আসেন নি, তাঁকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম। অবশ্য চোখে তাঁকে দেখেছিলাম অনেকবারই এর আগে, তবে পরিচয় ছিল না। খেলার মাঝামাঝি একটি ছেলে বলে উঠল, "ঐ যে গুরুদেব আসছেন।" সকলে ফিরে তাকালাম। গেরুয়া রঙের পোশাকপরা দীর্ঘ তেজঃপুঞ্জ মূর্তি ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। দু-একটি কথা বলে তিনি অন্যদিকে চলে গেলেন।

খেলার শেষে তিনি আমাদের সঙ্গে নীচু বাংলোয় এসে বসলেন। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক ছেলের দল তখন আমাদের প্রাতরাশ খাওয়াতে ব্যস্ত, অথচ আমাদের তখন খাবার সময় কোথায়? রবীন্দ্রনাথের কাছে বসব, তাঁর কথা শুনব, এরই জন্যে তখন আমরা উৎসুক। বাইরের বসবার ঘরটিতে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে গেলাম। ছেলের দল এতে হাল ছাড়ল না, জলখাবারের পাত্র সমেত এই ঘরেই এসে হাজির হল। অগত্যা সেইখানে, তাঁর সামনে বসে বসেই কিছু আমাদের খেতে হল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে তিনি অন্য অতিথিদের খবর নেবার জন্যে উঠে গেলেন। এর পর আমাদের স্নানাহারের আয়োজন চলতে লাগল। শুনলাম এদব পর্ব শেষ হবার পর কবি আবার মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কখন আসবেন সেটা ঠিক জানা ছিল না। সকলে মিলে খুব উচ্চকণ্ঠে গল্প করতে করতে আমরা নাওয়া খাওয়া সারতে লাগলাম। হঠাৎ সেই কলরবের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন। অকস্মাৎ শান্তশিষ্ট হয়ে বসার চেষ্টাটা আমাদের খুব সফল হল না। যা হোক সবাই তখন শান্ত হয়ে বসলাম। আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় অনেকগুলি ভদ্রমহিলাও এসে সভায় যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে কবির বৈবাহিকা ছিলেন একজন। রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়েই কথা বলছিলেন, আবার থেকে থেকে মেয়েদের সঙ্গে রসিকতাও করছিলেন। এতে আমি অত্যন্তই বিস্মিত হয়েছিলাম মনে পড়ে। ওঁকে পুরাকালের তপোবনের ঋষিদের মতই কিছু একটা ভেবে এসেছিলাম, তিনিও যে এরকম হাস্য পরিহাস করেন তা ভাবতে পারিনি। একজন ভদ্রমহিলা শান্তিনিকেতনের দারুন গ্রীষ্মের কথা তোলাতে, রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমি গরমের মাত্র একটি গুণ জানি, সেটি হচ্ছে কবিতা লেখা।"

একবার একজন শিক্ষক এসে তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বাকী ভদ্রমহিলারাও উনি এখনকার মত চলে গেলেন ভেবে সভাভঙ্গ করে চলে গেলেন। গান ও পাঠ শুনতে পাব আশা করে আমরা বসেছিলাম। দুঃখিত চিত্তে ভাবলাম আশা পূর্ণ হল না। তবে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ একেবারে চলে যাননি, বারান্দায় একটি বেতের ইজি চেয়ারে বসে আছেন।

আমরা মেয়েরা এসে আবার তাঁকে ঘিরে বসলাম। একজন "খেয়া"র কবিতা শুনতে চাইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী। তখনকার দিনের কথা মনে করলে এইটাই বিশেষ ভাবে মনে পড়ে যে কখনও ত তাঁকে কারো অনুরোধ উপেক্ষা করতে দেখিনি, সে যত ছোট, যত অর্বাচীনই হোক্ না কেন। তাঁর শ্রান্তি ক্লান্তি যেন ছিল না। পাঁচ ছ'ঘণ্টা একাসনে বসে অম্লানবদনে গান গেয়েছেন, কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন, গল্প করেছেন।

কিন্তু কোন্ কবিতাটি পড়া হবে তা আর কিছুতেই ঠিক হয় না। তখন তিনি বললেন, "আমার নূতন লেখা "জীবনস্মৃতি" তোমাদের পড়ে শোনাই, সেটাই তোমাদের বেশী interesting লাগবে।"

"জীবনস্মৃতি"র অনেকখানিই তিনি সেদিন পড়ে শুনিয়েছিলেন। সন্ধ্যা এসে পড়ায় পাঠ থামাতে হল। হেঁটেই বাড়ি ফিরে গেলেন। তখন তিনি পুরনো অতিথিশালার বাড়িতে থাকেন, সর্বদাই হেঁটে যাওয়া আসা করতেন। বেশ দ্রুতগতিতে হাঁটতেন তিনি। দু'চারবার তাঁর সঙ্গে হাঁটবার চেষ্টা করে দেখেছি, আমাদের সাধ্যে কুলায় না।

বিকেলে আর একপালা ছেলেদের খেলা দেখা গেল। সন্ধ্যার সময় আবার গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হলাম। অনেকক্ষণ বসে তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করলেন। তখন আমাদের কতই বা বয়স, কেউ বা স্কুলে পড়ি, কেউ বা সবে কলেজে উঠেছে। অথচ কত সময় যে তিনি ব্যয় করলেন আমাদের জন্যে। বয়স্ক অতিথিরা সেবারে আমাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই পক্ষপাতিত্বে ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন। মনে হয়, একজন শান্তিনিকেতনকে "শান্তিনিকেতন" বলে অভিহিতও করেছিলেন।

২৪শে রাত্রে "রাজা" অভিনয় হল। সেদিন আর রবীন্দ্রনাথের দর্শন আমরা পেলাম না। নানা কাজে তিনি সকাল থেকে ব্যস্ত ছিলেন। নিজে "রাজা" এবং "ঠাকুরদাদা"র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অভিনেতাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ ত তিনি সবটাই করেছিলেন, আবার তাদের সাজান, make up করা, তাও সেকালে তাঁকেই করতে হত।

সন্ধ্যার পর "রাজার" অভিনয় আরম্ভ হল। তখন "নাট্যঘর" বলে বড় একটি মাটির ঘরে অভিনয় হত। অভিনয় এই আমার প্রথম দেখা। দেখে একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের আর কি বর্ণনা দেব? তাঁর সব কিছুর তুলনা একমাত্র তাঁতেই মিলত। কিন্তু কোনো ছদ্মবেশেই তিনি নিজেকে লুকোতে পারতেন না। আকাশের সূর্যকে যেমন সাজিয়ে অন্যমূর্তি ধরান যায় না, তাঁকেও তেমনি অন্য কোনো মূর্তি ধরান যেত না।

নাচতেও তিনি খুব ভাল পারতেন। যাঁরা তাঁর বৃদ্ধ বয়সের মূর্তি শুধু দেখেছেন, তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন।

২৫শে বৈশাখ, ভোর পাঁচটায় আম্রকুঞ্জে তাঁর জন্মোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। আমরা ঠিক সময়ে উপস্থিত হবার জোরে রাত থাকতে উঠে পড়ে, তৈরি হয়ে নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হলাম। উৎসবক্ষেত্র আল্পনা ও ফুলপাতায় অতি সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল।

কবি অল্প পরেই এসে উপস্থিত হলেন। দেখতে দেখতে সভাক্ষেত্র ভরে উঠল। আচার্যের কাজ করলেন তিনজন, পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন ও নেপালচন্দ্র রায়।

রবীন্দ্রনাথকে অসংখ্য পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হল। সভার অতিথিদেরও ফুলের মালা ও চন্দন দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল। দিনেন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের নিয়ে সময়োচিত গান করলেন। আচার্যরা মন্ত্রপাঠ করলেন, ছাত্রদের উপদেশ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই সমস্ত কিছুর উত্তরে ছোট একটি ভাষণ দিলেন।

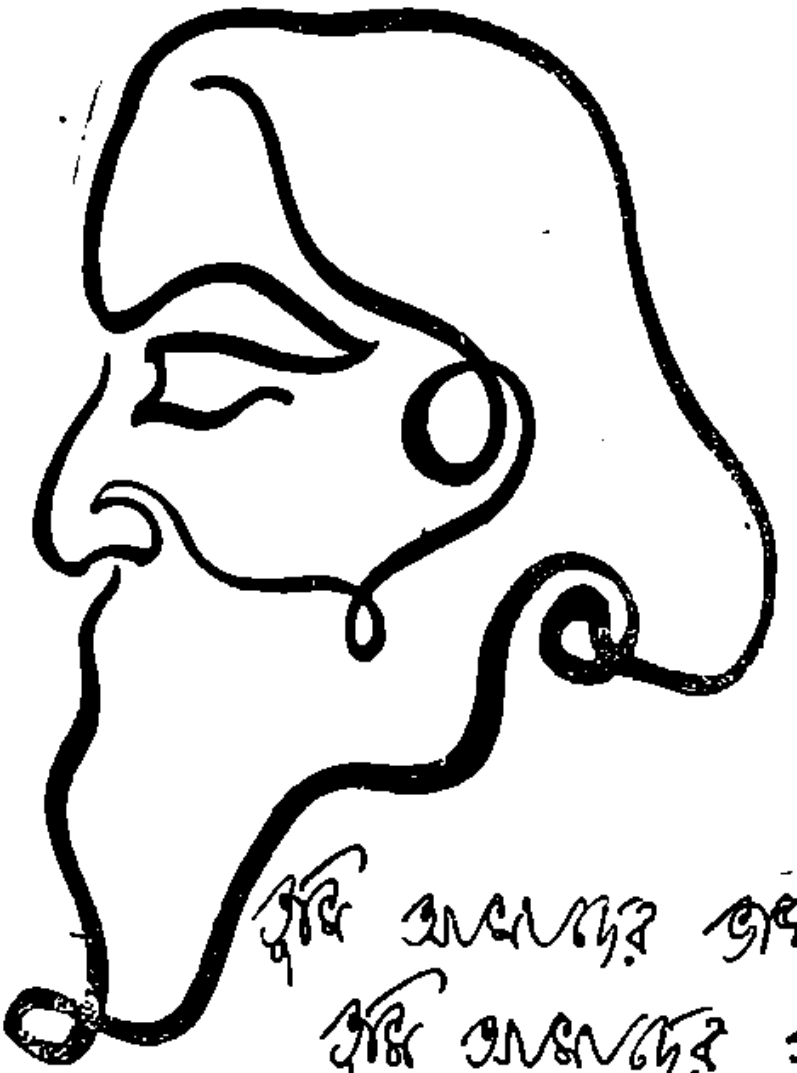

তুমি আমাদের ভাষা
তুমি আমাদের গান,
তুমি আমাদের শিক্ষা
তুমি আমাদের দীক্ষা,
তোমাকে নমস্কার —

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে **লক্ষ্মীবিলাস** কর্তৃক প্রচারিত

সভা ভাঙবার পর কবিকে প্রণাম করবার ঘটা পড়ে গেল। প্রায় তিনশ' স্ত্রী-পুরুষের প্রণাম নিতে তাঁকে আধ ঘণ্টার বেশী দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তিনি সমস্তক্ষণই নতমস্তকে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওই দিনই দুপুরে বেলীর ভাগ অতিথি চলে গেলেন। আমরা পরদিন যাব স্থির করলাম। "জীবনস্মৃতির" বাকিটুকু রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনবার আশায় তাঁর কাছে বার দুই তিন দূত পাঠান হল। বালিকাদের আগ্রহ দেখে অবশেষে তিনি অন্য কাজ কর্ম ফেলে চলেই এলেন। এ রকম ব্যবহার করতে কেন যে আমরা তখন সঙ্কোচ বোধ করিনি, জানি না। কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা ছোট হলেও তাঁর চোখে ছোট নয়। বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ "জীবনস্মৃতি" শোনা গেল। বৃষ্টি আসায় ঘরে ঢুকতে হল।

২৭শে রাত্রে সম্ভবতঃ আমরা সেবারকার মত শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় ফিরলাম। রাত্রি তিনটায় ট্রেন, প্রায় মাঝরাতে রবীন্দ্রনাথ এসে আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে গেলেন। এটাও অল্প বয়সের অর্বাচীনতায় তখন সাধারণ ব্যাপার বলেই ভাবলাম।

শ্রীসীতা দেবী

আমার জীর্ণ পাতা যারা বেলা যারে যারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥
তাইত আমার এই জীবনের নিচ্ছায়ে
ফাল্গুন আসে ফিরে ফিরে দক্ষিন বায়ে,
নতুন সুরে গায় উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ডারে ডারে ॥

ওগো আমার বিচিত্রনূতন, দাঁড়াও হেসে,
ধনুর তোমার বিয়ন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে বিরল মধুর সাথের আলোয়,
সাগর তীরে যাত্রা আমার সেই ভুলালো,
তোমার বাঁশি নিক সাঁঝের একতারে,
সুরে আমার উঠুক তারা সারে সারে ॥

২৪ বৈশাখ
১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবি-রশ্মি ॥

অনেকদিন আগের একটা ঘটনা আজ মনে পড়ছে। নিউ ইয়র্কে এক বাঙালী ভদ্রলোকের সংবেদনা দেখে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে আমি অভিভূত হয়েছিলুম। ডায়েরির একটা পাতায় তার বিবরণ লিখে শেষ হয়নি, পরম উচ্ছ্বাসে অসংখ্য পাতা অসংকোচে লিখে ফেলেছিলুম।

হডসন (Hudson) নদীর তীরে সূর্যাস্তের গল্প শুনেছিলুম বন্ধুদের কাছে। সে নাকি এক অপূর্ব দৃশ্য। নদীর পারে গ্রাণ্ট মেমোরিয়াল, তারই চিবির উপর বসে সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। সায়াহ্নের সময় আমি এসে সেই চিবির উপর বসেছিলুম।

সূর্যাস্তের তখনও দেরি ছিল। আমি মানুষ দেখছিলুম। হঠাৎ মনে হল, একজন ভারতীয় একটু তফাতে বসে খাতায় কিছু নোট করছেন। দেশের মানুষ এখানে দেখতে পাব, এমন আশা ছিল না। কিন্তু দেখে অবধি তাঁর সঙ্গে ভাব করবার জন্য মন উন্মুখ হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সরে সরে তাঁর পাশে গিয়ে বসলুম।

ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলেন। আরও চমকালেন বাঙালী শুনে। বললেন, তিনি নিজেও বাঙালী। তারপর একসঙ্গে তাঁর হোটেলে ফিরেছিলুম—হেরল্ড স্কোয়ার হোটেলে।

আমি তাঁর টেবিলের উপর বইএর সংগ্রহ দেখে আরও বিস্মিত হয়েছিলুম। প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ, নেশন, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান টাইমস প্রভৃতি নানা পত্র পত্রিকা, কিন্তু সবই পুরনো। ভদ্রলোক আমার বিস্ময় দেখে হেসে বলেছিলেন: একটা পাগলামি করছি।

সেই পাগলামির কথাও তিনি আমায় বলেছিলেন: আমি বাঙলা সাহিত্যের ছাত্র ছিলুম। এক সময় আমার একমাত্র আফসোস ছিল যে বাঙলাদেশের সাহিত্যিক নাটক লেখেন না, লেখেন অভিনেতারা, আর কিছু ব্যবসায়ী ভাল উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে থাকেন।

কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়, কিন্তু আমি প্রতিবাদ করলুম না।

ভদ্রলোক বললেন: সম্প্রতি আমার সবচেয়ে বড় এবং এক ক্ষোভের বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের অবজ্ঞা। তিনি ভ্রমণে বিলাসী ছিলেন, কিন্তু ভ্রমণ সাহিত্যকে যোগ্য মর্যাদা দেননি। এই যে পত্র-পত্রিকা দেখছেন, এর থেকে আমি উদ্ধার করেছি যে কবি পৃথিবীর কোন স্থান না দেখে ছাড়েননি, কিন্তু লিখেছেন এত কম যে তা দিয়ে আমার ক্ষুধা শুধু বেড়েছে। একটু কফি খান, কিংবা কড়া কিছু।

কফিই ভাল।

কফি খেতে খেতে ভদ্রলোক বললেন: শুনে আশ্চর্য হবেন, রবীন্দ্রনাথ এই হোটেলে উঠেছিলেন, আর ছিলেন এই ঘরে, তাঁর এক পাশে ছিলেন ডাঃ ডি. এম. মৈত্র, আর এক পাশে রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী। এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা কিছু জানেন?

না।

ভদ্রলোক একখানা বই সংগ্রহ করে এনে বললেন: দেখুন ডাঃ মৈত্র কী বলছেন, বলে পড়তে লাগলেন: আমেরিকায় নেমে এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছিলেম। মনে করেছিলেম কয়জন মিলে একটু বরোয়া গোছে থাকব, সেই চেষ্টায় বাহির হলেম। আমার য়ুরোপীয় পোষাক ছিল। একটি বোর্ডিং হাউসে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ঘর আছে?' বলে 'হ্যাঁ'। কিন্তু পর মুহূর্তেই কবির আলখেল্লা পরা দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারা দেখেই বলে, 'না নেই,'—এমন কয়েক জায়গায় ব্যর্থ হয়ে হেরল্ড স্কোয়ার হোটেলে আশ্রয় নিলেম।

রবীন্দ্রনাথ এর পরের বছর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: কবি কেন এখানে এসেছিলেন জানেন?

না।

ডাঃ মৈত্র লিখেছেন: রবীন্দ্রনাথ বহুদিন থেকে অর্শরোগে খুব কষ্ট পেতেন। লণ্ডনে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল যে কাটিয়ে ফেলবেন। প্রসিদ্ধ একজন সার্জনের সহিত কাটাবার দিন স্থির হল। তারপর কবির চিত্ত বিচলিত হয়ে উঠল, হঠাৎ মত বদলে ফেললেন। আগে একবার হোমিও-প্যাথিটা ভাল করে দেখাতে চাইলেন। বাইওকেমিকও দেখবেন বললেন। কাটাবার ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেল।

আমেরিকার কবি বোধ হয় ডাক্তার ক্লাসের চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উল্টো কথা বললেন, এটা কি অস্ত্র সাধ্য নয়? সার্জন কি তাই বলেছে?

কবি বললেন, আমি না কাটিয়ে ঔষধের দ্বারা সারাতে চাই।

ঔষধে কোন ফল হয়নি। লণ্ডনে এসে অস্ত্রোপচারে তাঁকে আরোগ্য লাভ করতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম: এসব কথা আপনি কোথায় জানলেন?

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন: ঐ সব কাগজ পড়ে।

টেবিলের উপর স্তূপীকৃত কাগজ দেখালেন আঙুল দিয়ে।

তারপর বললেন: আমার দুঃখ কী জানেন? কবি কোন কথা নিজে লিখলেন না। তাঁর সঙ্গীসাথীরা ছোটখাট প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু বস্‌ওয়েলের মতো কোন জীবনী লেখেননি। রামনাথ বিশ্বাসের মতো পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরেছেন, কিন্তু তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে তার কিছুই নেই।

আমি আপত্তি জানিয়েছিলুম। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি, যাত্রী, জাপানযাত্রী, জাপানে, পারস্যে, রাশিয়ার চিঠি—এসব বই আমার জানা ছিল। বলেছিলুম: ভ্রমণ কাহিনী তিনি যথেষ্ট লিখেছেন।

সে কথা বললে তো আত্মকথাও তিনি লিখেছেন। শুধু জীবনস্মৃতি কেন, তাঁর পত্র সাহিত্যে জীবনের অনেক কথাই আছে। আপনি কি জানেন যে কবি বারো বার বিদেশ যাত্রা করেছিলেন, আর দেশে এমন কোন জায়গা নেই যা তিনি দেখেননি?

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের একটা সীমা ছিল। আমি চয়নিকা ও সঞ্চয়িতার কিছু কবিতা পড়েছি। কিছু গান শুনেছি, আর গল্প উপন্যাস পড়েছি কিছু। ভ্রমণ ভাল লাগে বলে ভ্রমণের বইও কিছু পড়েছি। এই বিদ্যা নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হবার সাহস হল না।

ভদ্রলোক বললেন: ভারতবর্ষের উপরে তিনি কোন ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন কি? আমি তাঁর পুরী-ভুবনেশ্বর বা কোনারকের মন্দিরের উপর একটি প্রবন্ধ পড়েছি। অপূর্ব লেখা। কিন্তু ঐ একটিই। তারপর—

তারপর তিনি কবির বিদেশ ভ্রমণের একটি ফিরিস্তি দিলেন। তিনি বিলেত গিয়েছিলেন আটবার, দুবার আমেরিকায়, জাপানেও গেছেন চারবার, রাশিয়া গেছেন, দক্ষিণ আমেরিকা গেছেন, এমন কি হনলুলুও বাদ দেননি। কিন্তু ভ্রমণ কাহিনী কই! চিঠি নিয়ে তো আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি, কবির চোখে সেই দেশগুলো দেখতে চেয়েছিলাম।

বললুম: চৈতন্যদেবের সঙ্গী গোবিন্দদাসের মতো কেউ সঙ্গে থাকলে আপনার আশা পূর্ণ হত।

সঙ্গীর তো অভাব ছিল না কবির, কিন্তু আমরা সামান্যই পেয়েছি।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাল করে আলাপ হবার পরে জানতে পেরেছিলুম যে তিনি আমেরিকায় আছেন রবীন্দ্রনাথের উপর গবেষণার জন্য। বিশ্বভ্রমণেরই ইচ্ছা। কবি যেখানে একবারও গেছেন, সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর সম্বন্ধে নানা তথ্য আহরণ করবেন। তারপর যদি সম্ভব হয়—

কথাটা শেষ করতে তিনি পারেননি, উচ্ছ্বাসে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তাঁর বাসনার কথা বুঝে ফেলেছিলুম। মুগ্ধ হয়েছিলুম। বাড়ি ফিরে সেই রাত্রেই আমার ডায়েরির অনেকগুলো পাতা লিখে ফেলেছিলুম।

কিছুদিন আগেও আমি উল্টে পাল্টে সেই ডায়েরির পাতা দেখেছি। তাতে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের একটা তালিকা আছে। সেই ভদ্রলোক আমাকে দিয়েছিলেন। ১৮৭৮ সালে সতের বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিলাত যাত্রা করেন আধারে, ১৯০২ সালে বাহাত্তর বৎসর বয়সে উড়োজাহাজে তাঁর শেষ বিদেশ যাত্রা পারস্যে। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয়বার তিনি বিলেত যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ পর্যন্ত পৌঁছে মুসৌরিতে তাঁর পিতার কাছে চলে আসেন। তারপর অনেকদিন পর ১৮৯০ সালে আবার বিদেশ ভ্রমণে বার হন। ইটালি ফ্রান্স হয়ে বিলেত গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন ভিক্টোরিয়া ও মাল্টা দেখে। ১৯১২ সালে তাঁর ভ্রমণের সূচী ছিল ব্যাপক। বিলেত থেকে আমেরিকা, সেখান থেকে বিলেত হয়ে দেশে ফেরেন। প্রথম দুবার গিয়েছিলেন নিজের শিক্ষার জন্যে, তৃতীয়বার গেলেন বিদেশের সাহিত্যামোদীদের সঙ্গে পরিচিত হতে। অনেকের সঙ্গে পরিচয় তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, অনেকের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন অকুণ্ঠ, আর পরের বছর পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। প্রাচ্য দেশে প্রথম পুরস্কার। সমস্ত পৃথিবী চমকে উঠেছিল।

১৯১৬ সালে কবি জাপানে গিয়েছিলেন। রেঙ্গুন সিঙ্গাপুর হংকং হয়ে জাপান। জাপান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকা। ষোলটি নগর ঘুরেছিলেন। কিন্তু ক্যানাডার নিমন্ত্রণ করেছিলেন প্রত্যাখ্যান। শুধু কাশগোটামারু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নয়, ভারতীয়দের প্রতি ভেদনীতিরও প্রতিবাদে। আমেরিকা থেকে কবি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে দেশে ফিরেছিলেন।

চার বছর পরে তিনি চতুর্থবার বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। বিলেত থেকে তিনি ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ঘুরে আসেন। তারপরে যান আমেরিকা। সেখান থেকে ফিরে সমস্ত য়ুরোপ ঘুরেছিলেন—ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, বাভেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া।

এর পর থেকে আরও ঘনঘন বিদেশ যেতে লাগলেন। ১৯২৭ সালে আবার জাপান গেলেন রেঙ্গুন পেনাং কুআলালাম্পুর সিঙ্গাপুর হংকং সাংহাই ও চীনদেশটাকে মোটামুটি দেখে।

পরের বছরেই গেলেন দক্ষিণ আমেরিকা। ফিরলেন য়ুরোপ হয়ে।

দুবছর পর আবার বেরুলেন। আগে যা দেখেননি এবারে সে সমস্ত দেশও দেখলেন। ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বিলেত এবং গেলেন নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও জার্মানী। তারপর চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক, গ্রীস ও মিশর।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দেখেছিলেন তার পরের বছর ১৯২৭ সালে। ব্রিটিশ মালয়, সিঙ্গাপুর, মালাক্কা, কুআলালাম্পুর, ইপো, তেলাক, আনসন কুমাল, কাংসর তাইপিং, পেনাং সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ-সুরাবায়া, তরকর্ত, প্রাম্বানাম, যোগ্যকর্ত, বরবুদুর, শ্যাম, লঙ্কা—কিছু বাদ দেননি।

দশমবার বেরিয়েছিলেন দুবছর পরে। জাপান কানাডা আটলান্টিক ইন্দোচীন সিঙ্গাপুর হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

তার পরের বছরেই আবার বিলেতে যান। সেখান থেকে জার্মানী ডেনমার্ক হয়ে রাশিয়ায় যান প্রথমবার। তারপর আমেরিকা।

তাঁর শেষ বিদেশ অভিযান পারস্যে। ইরাক যোগদাদ হয়ে ফিরে আসেন।

এইসব ভ্রমণের বৃত্তান্ত যে শুধু নয়, ভদ্রলোক বার বার সেকথা বলেছিলেন। কিন্তু কবি নিজে কিছু বলেননি। সেই তাঁর ক্ষোভ। পরবর্তীকালে কবি অমিয় চক্রবর্তী এক জায়গায় লিখেছিলেন: স্বপ্নে সঙ্কলিত রূপরেখায় বাঁধা পড়েছে এমন বহুমূর্তি, দেশী বিদেশী নানা দৃশ্যনাট্য যা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রবেশ করতে পারেনি। সেখায় ভ্রমণকালীন ঘটনা বা ব্যক্তি বিশেষের প্রসঙ্গ বেশি তোলেননি তার একটা কারণ হয়তো এই যে ঐতিহাসিক সমগ্রতা দিতে হলে রবীন্দ্রনাথকে নিজের কথা অনেকটা বলতে হত। সেই নিজের কথা তাঁরই প্রতি অভূতপূর্ব সম্মান-সমারোহের সঙ্গে জড়িত। সেখানে আত্মকাহিনীই বড় হয়ে উঠত। পৃথিবী জুড়ে তাঁকে নিয়ে উৎসব অভ্যর্থনার বিরাম ছিল না; এ বিষয়ে কিছু লিখতে কবি কতদূর কুণ্ঠিত হতেন তা সকলেরই জানা আছে। শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে তিনি অযাচিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেয়েছিলেন। পরিভ্রমণের যোগে মিলিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে যেসব আলাপ আলোচনা হয়েছিল তারও বর্ণনা কবি দেননি। কেননা চলার পথে সাক্ষাতের মধ্যে গভীর পরিচয়ের অবকাশ ছিল না; কারও প্রতি অবিচার বা আংশিক বিচার করা তাঁর স্বধর্মের বিরোধী মনে করতেন। বিভিন্ন দেশীয় জনতা বা বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে মতামত তাঁর লেখায় প্রকাশ পায়নি; কত বিচিত্র মানুষ এবং লোক-ব্যাপারের ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে, কিন্তু নিজের সম্পর্কিত ইতিহাসের পরিচয়ে অভিজ্ঞতাকে তিনি বেঁধে রাখেননি।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ কাহিনী আলোচনার জন্য এ গল্পের অবতারণা করিনি। এ গল্প লিখছি সেই ভদ্রলোকের কাহিনীটা সম্পূর্ণ করতে। অনেক দিনের ব্যবধানে তাঁর স্মৃতি কিছুটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডায়েরির পাতায় তাঁর নাম খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু সে নাম প্রকাশ করা আজ কোনমতেই উচিত হবে না। সন্ধ্যা বেলায় একটা বিলিতি হোটেলে এক বিদেশিনীর সঙ্গে তাঁর দেখা পেয়েছি দীর্ঘদিন পরে। ভদ্রলোক একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন, কিন্তু আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। আমি তাঁর গবেষণার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ভদ্রলোক একটা ভেংচি কেটে বললেন : আরে ছোঃ।

কেন?

আপনি কি সেই হেয়ড্ স্কোয়ার হোটেলের কথা এখনও মনে রেখেছেন?

সে তো মনে রাখবার মতই কথা।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন হা হা করে। তারপর বললেন: ইয়াঙ্কিদের মতো আপনিও দেখছি সেকথা বিশ্বাস করেছেন।

তবে?

রবীন্দ্রনাথের নামে আমি নিজের ঘর বাড়িয়ে সোসাইটিতে ঢুকেছিলুম। তারপর এই ব্যবসা।

বলে পানীয়ের গেলাসটা তুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

বললুম, ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক বললেন: আমেরিকায় কোন দরকার থাকলে বলবেন। আমার কারবার ভাল জমেছে। সব বিষয়েই সাহায্য করতে পারব।

এ কথার উত্তরেও আমি বললুম: ধন্যবাদ।

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উত্তর-জীবনে বিশ্বমানবতার আদর্শের বার্তা বিশেষভাবে প্রচার করে গেছেন। বিশ্ব-মানবতার আদর্শের সঙ্গে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বমৈত্রী, 'এক জগৎ-পরিবার' প্রভৃতি আদর্শ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং এ সকল আদর্শের বাণীও তাঁর কণ্ঠে একই কালে উদ্গীরিত হয়েছে।

কবির মনোজীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে কবির শেষ অধ্যায়ের এই বিশিষ্ট ভাবটিকে একটি মহান্ দিক্-চিহ্ন স্বরূপ গণ্য করা যেতে পারে। এই বিবর্তন একদিনে সাধিত হয়নি। ধীরে ধীরে পথে পথে মনের ক্রমিক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এই ধ্রুব প্রত্যয়টিতে এসে উপনীত হয়েছিলেন। তারপর ক্রমেই তাঁর মধ্যে এই প্রত্যয় জোরালো হয়ে ওঠে এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কবি এই আদর্শে অবিচল ছিলেন।

কবি প্রথম জীবনে বহু সংস্কারের হাতে-ধরা হয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন। এদেশের প্রচলিত আদর্শ ও সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই তিনি তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যসাধনার সূত্রপাত করেছিলেন। তখনও তাঁর চিন্তায় কল্পনায় ও জীবনসাধনার রীতিতে বৈপ্লবিকতার স্পর্শ লাগেনি। গতানুগতিক ধ্যান-ধারণাগুলিকে শুরুতেই অতিক্রম করে যাওয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয় না, তা তিনি যত বড় মানুষই হোন; রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। কিন্তু কবির মনোজীবনের এ এক প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, যতই তিনি জীবনের চলার পথে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর দেহের ও মনের বয়স বেড়েছে, ততই তিনি গতানুগতিক ধ্যান-ধারণা, প্রচলিত আচার-আচরণ প্রভৃতিকে পশ্চাতে ফেলে নূতন কালের ভাবধারাকে গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে গেছেন। রবীন্দ্র-জীবনসাধনাকে এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় যে তা ছিল সংস্কার থেকে সংস্কারাতীতে উত্তীর্ণ হওয়ার নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। প্রথম বয়সে তাঁর মনোজীবনের উপর একাধিক প্রচলিত সংস্কারের আধিপত্য ছিল—এমন সংস্কার, যা কালের পরিবর্তনে তার উপযোগিতা হারিয়েছে অথচ যা শুধু প্রথার জোরে সমাজে টিকে আছে—কিন্তু বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই, এ সকল সংস্কারের প্রভাব তাঁর মনে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে নূতন কালের প্রত্যয়ের প্রতি আস্থা, নূতন যুগচেতনা। এ বস্তু রবীন্দ্রনাথের মনের সবলতার তথা নিত্য নব নব ভাবকে গ্রহণ করবার ক্ষমতার এক আশ্চর্য প্রমাণ।

কবির মনোজীবনের বিবর্তনের স্তর পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, কবির প্রথম বয়সের ধ্যান-ধারণার মধ্যে জাতীয়তার আদর্শ একটি বিশেষ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন অধিকার করে ছিল। আমাদের দেশে তখনও জাতীয়তার আদর্শের শৈশব। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের প্রভাব তখন আকাশে-বাতাসে সঞ্চরমাণ। এই মন্ত্রের গূঢ় প্রভাবে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে তখন অখণ্ড জাতিত্বের চেতনা ক্রমস্ফুরিত হয়ে উঠছে এবং পরাধীনতার মর্মজ্বালায় নিপীড়িত ভারতবাসীর চিত্ত স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই ভাবের আবহে লালিত হয়েছে। তাই দেখতে পাই, সে যুগের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র প্রমুখের সহায়তায় হিন্দুমেলার প্রবর্তনা, রাখী বন্ধন উৎসবের সূচনা, স্বদেশী শিল্পের উজ্জীবন-প্রয়াস, এবং নানা ভাবে জাতীয়

আচার-আচরণ প্রভৃতিকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা। মাতৃভাষার চর্চা ঠাকুরবাড়ীর এই নব-জাগৃতি আন্দোলনের কেন্দ্র অধিকার করে রয়েছে। এ সকলই নবমুদ্রিত জাতীয়তার আদর্শের দ্যোতক এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সুরে বাঁধা।

জাতীয়তার শৈশব অতিক্রান্ত হয়ে জাতীয়তার বাল্যের সূচনা হল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠায়। জাতীয়তার কৈশোর এল ১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রবর্তনায়। হিউম, ওয়েডারবার্ন, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী, স্যার ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দমোহন বসু, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা হলেন এই জাতীয়তা-যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক। তারপর আমরা জাতীয়তার পূর্ণযৌবন প্রত্যক্ষ করলাম ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে। অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখেরা জাতীয়তার এই সবল আন্দোলনের নেতৃত্ব করলেন।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উল্লিখিত প্রতিটি পর্বের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সূচনাকাল থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যাহ্নকালীন খরদীপ্তির কাল পর্যন্ত কবি বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। এই দুই পর্বে, বিশেষতঃ বঙ্গভঙ্গের কালে, অগণিত স্বদেশী গান রচনা করে ও গেয়ে তিনি বিদেশী সাম্রাজ্য-শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মানসকে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের বলে

"ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হোক জয়।"

কবি প্রণামে

পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসঙ্ঘ লিঃ

: বিক্রয় কেন্দ্র :

• ১। ১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১
• ২। কুটীর শিল্প বিপনী, ১১-এ, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা—১
• ৩। ১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯
• ৪। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের অগ্রগতির ইতিহাসে এমন একটা সময় এল যখন তিনি জাতীয়তার আদর্শে আর তৃপ্ত রইতে পারলেন না। তাঁর মন আরও বৃহত্তর, উদারতর আদর্শের স্বপ্নগ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। কবি সচকিত চিত্তে উপলব্ধি করলেন, প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় জীবনে জাতীয়তাবাদী অভীপ্সা ও আদর্শের একটা অগ্রসর ভূমিকা আছে, একটা প্রগতিশীল ভূমিকা আছে। জাতীয়তাবাদ যেখানে জাতীয় চেতনায় ঐক্যবোধ আনে, তার আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত করে, তাকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংহত হবার প্রেরণা দেয়, সেখানে জাতীয়তাবাদ প্রগতির ধারক ও বাহক এবং অতি-প্রশ্নের একটি আদর্শ। কিন্তু জাতীয়তার এই প্রগতিশীলতার একটা সীমারেখা আছে। সেই সীমরেখা অতিক্রান্ত হলেই মুশকিল। তখন জাতীয়তা আর প্রগতিলক্ষণাক্রান্ত থাকে না, তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দেখা দেয়। জাতীয়তার এই প্রতিক্রিয়ার অধ্যায়ে তার মধ্যে দেখা দেয় উগ্র স্বাজাতিকতা-বোধ, জাত্যভিমান, পরজাতি বা পরসম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ, আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠত্ব-চেতনা। এবং এই মনোভাবগুলিরই সূত্র ধরে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে হিংসাচার, গোপনতা, রাজনীতিতে ক্রুর কুটিল ছলাকলার পথ। স্বদেশের শেষ পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিস্তারের মধ্যে কথিত লক্ষণগুলি ক্রম-প্রকট হয়ে উঠল। কবির সম্যক্‌দর্শী তীব্র অনুভূতিপরায়ণ মন জাতীয়তার এই বিসদৃশ অভিব্যক্তিগুলিকে কোন মতেই স্বীকার করে নিতে পারল না এবং ক্রমশঃ এর বিরুদ্ধে তাঁর হৃদয়মন বিমুখ হয়ে উঠল। উগ্র স্বাজাতিকতার আদর্শের বিরুদ্ধে ক্রমেই যে তাঁর মন কঠিন হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ তাঁর রচনা এবং জীবনাচরণ উভয়ক্ষেত্রে মিলতে লাগল।

রচনার ক্ষেত্রে কবির সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবিরোধী মনোভাবের প্রথম সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করলাম তাঁর 'গোরা' নামক বৃহদায়তন উপন্যাসে (১৯১০)। এই উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী আদর্শের উপর আন্তর্জাতিক আদর্শের জয় দেখানো হয়েছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করে তার জায়গায় গোষ্ঠী ও ভূগোলের চিহ্নবিহীন উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যটিকে 'গোরা' উপন্যাসের একেবারে কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গোরা উপন্যাসের নায়ক গোরা প্রথমে উগ্র তীব্র মুসলমান জাতীয়তার নীতির ধ্বজাধারী ছিল, কিন্তু পরে ঘটনার সংঘাতে তার এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। গোরার প্রকৃত পরিচয়ের উদ্‌ঘাটন তার এই পরিবর্তনের মূল কারণ হয়ে দেখা দেয়। যে-গোরা প্রথম জীবনে অত্যুগ্র হিন্দুয়ানির বশে ফোঁটা-তিলক কাটা জীবনের সার করেছিল, শেষ পর্যায়ে দেখা গেল সেই গোরাই সাম্প্রদায়িক আচার-বন্ধনের বাধা অতিক্রম করে সর্বসংস্কারমুক্ত বিশ্বনাগরিকতায় উত্তীর্ণ হল। গোরা তার পালিকা মাতা আনন্দময়ীর মধ্যে তার এই নবভাবের প্রতীক খুঁজে পেল। গোরার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। 'গোরা' উপন্যাসে চিত্রিত গোরার জাতীয়তা থেকে আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণ রবীন্দ্রনাথের মনের সমধর্মী বিবর্তনেরই সাক্ষ্য বহন করছে মাত্র।

এর পরের রচনা 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে (১৯১৫) উগ্র জাতীয়তার বিরুদ্ধে কবির প্রতিকূল মনোভাব আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। ঘরে-বাইরের সন্দীপ চরিত্রটি সঙ্কীর্ণ স্বাজাতিকতার আদর্শের এক মূর্ত প্রতীক। সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তার মূলমূলে অমূল্য নামক এক যুবকের মূল্যবান প্রাণ বলি হওয়াটাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সন্দীপের চরিত্রের বিপরীতে নিখিলেশকে দাঁড় করানো হয়েছে। নিখিলেশের মধ্যে আমরা আন্তর্জাতিক আদর্শের আভাস পাই। বিমলার মন সন্দীপ ও নিখিলেশের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত। তার

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
যেথা যেথা মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া॥

এখানে কবির বিশ্ববোধে প্রত্যয়শীলতার ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি এমন ঘর খুঁজছেন, যেখানে স্বদেশ-বিদেশের গণ্ডী অন্তর্হিত, ভূগোলের সীমান্ত লুপ্ত। বাল্মীকি-রামায়ণে আছে "উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" উদার-চরিত যাঁরা, সমগ্র বসুধা তাঁদের কুটুম্বস্বরূপ। কবিও একই মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে সমুৎসুক। তিনি এ কবিতার অন্যত্র বলছেন—

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি কথা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে॥

এবং সবশেষে এই উদার ঘোষণা করেছেন যে, "প্রবাস কোথাও নাহিরে নাহিরে জনমে জনমে মরণে।" বাস্তবিক, পৃথিবীতে প্রবাস কোথাও নেই, যদি গোটা সংসারটাকেই আত্মীয় মনে করা যায়। এই জাতীয় আত্মীয়তার ক্ষমতা তাঁদেরই জন্মায় যাঁরা উদার কল্পনার বলে দেশ-জাতির গণ্ডী অতিক্রমণে সত্যিসত্যি সমর্থ হয়েছেন। কবির সেই উদার কল্পনা ছিল, সুতরাং জাতীয়তা থেকে বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হতে তাঁর অসুবিধা হয় নি।

অপেক্ষাকৃত পরেকার যুগে কবি সমভাবের আর একটি কবিতা লেখেন, যার ভিতর বিশ্বজনীনতার সুরটি শ্রুতিগ্রাহ্যরূপে পাওয়া যায়।—

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই॥

কবির জীবনাচরণেও আমরা বিশ্বজনীনতার আদর্শের অভিমুখে ক্রমিক অগ্রগতি দেখতে পাই। জাতীয়তার সম্পর্কে যে সময়ে কবির মোহমুক্তি ঘটতে আরম্ভ করেছে সেই সময়ে দেখা গেল, কবি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখ্য ক্ষেত্র কলিকাতা শহর পরিত্যাগ করে শান্তিনিকেতনের নিভৃত আবেষ্টনীতে গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। নগরের কোলাহল থেকে দূরে পল্লীর নিভৃতিতে তিনি শান্তি খুঁজছেন। শহরের ভাবাভোল আর বিক্ষেপের মধ্যে প্রীতি-প্রেমের অনুশীলন হয় না। এখানে চিত্তের একাগ্রতা পদে পদে ব্যাহত হতে থাকে। তাই তিনি পল্লীজীবনের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকেই নির্বাচন করে নিলেন তাঁর মানবপ্রেমের অনুশীলনের ক্ষেত্ররূপে। এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে বিশ্বজনীনতার সুরটি বড় সুন্দর মেলে।

তারপর ১৯২১-২২ সনে কবির মনোভাবের সর্বাধিক বৈপ্লবিক রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করলাম। কবি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়কে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন। সে এমন এক প্রতিষ্ঠান, বিশ্বের সকল দেশের সংস্কৃতির হাওয়ার অবাধ অনুপ্রবেশের জন্য যার সরলা জানলা নিত্য খোলা রয়েছে, যেখানে

বিভিন্ন দিগ্‌দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাবের আদান-প্রদান হবে এই আশা নিয়ে তাকে একটি আন্তর্জাতিক মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। বিশ্বভারতী সার্থকনামা, কেননা সে এমন এক স্থান "যত্র বিশ্বম্ ভবতি একনীড়ম্"। অর্থাৎ বিশ্ব একনীড় হয়ে বাস করে সে এমন জায়গা। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর মধ্যে কবি তাঁর আন্তর্জাতিকতার স্বপ্নকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টা চরিতার্থতায় ভূষিত হয়েছে এমন কথা আমরা বলতে পারি। বিশ্বভারতী প্রকৃতই একটি আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র। বিশ্বের তাবৎ শ্রেষ্ঠ ভারতী বা সংস্কৃতির সম্মেলন-কেন্দ্র হল এই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর থেকে কবির মনোজীবনে আন্তর্জাতিক মৈত্রী সৌভ্রাত্র ও বিশ্বমানবতার আদর্শটি উত্তরোত্তর জোরালো হয়ে ওঠে। "বিশ্বজগৎ আমারে মিলিবে কে মোর আত্মপর" এই ভাবটি কবির চিন্তায় ও বচনে মূর্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে কবি এক অননুভূতপূর্ব আত্মিক বন্ধন অনুভব করেন এবং তাঁর ধ্যানকল্পনায় বিশ্বমানবতার স্বপ্ন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে থাকে। কবির জীবনের শেষ পর্যায়ে বিশ্বভারতী আর বাংলাদেশের একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল না, তা সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞজনদের ভাবের আদান-প্রদানের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে নানা দিগ্‌দেশাগত মনীষী ও শিক্ষার্থীদের নিত্য আনাগোনা চলত। তাঁদের চোখে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববোধ ও বিশ্ব-দৃষ্টির (world-vision) প্রতীক হয়ে উঠেছিল। আচার্য সর্বপল্লী-রাধাকৃষ্ণন যথার্থই বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম পৃথিবীতে বিশ্ব-সহযোগিতার যুগের (era of world co-operation) প্রবর্তন করলেন।

কবি শেষের জীবনে যে সকল কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা লিখে গেছেন তার সব কিছুর মধ্যে কবির বিশ্ববোধের পরিচয় স্পষ্ট। এই ভাবটির প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি কবির শেষ বয়সের রচনাবলী অনুধাবন করি তা হলে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে নূতন তাৎপর্য ও নূতন অর্থ-ব্যঞ্জনার সন্ধান পাব।

নারায়ণ চৌধুরী

বল বল, বন্ধু, বল, তিনি তোমার সাথে আছে
যার ঠাঁই তার কিনে নেওয়া মড়ো দালানের খাঁচাতে।
মুক্ত দিনের আলোর মাঝে
জীবন খেলার সাথী সাজে
বল, সেথায় পরান তিনি বিছান তোমার প্রাণে,
বল, তিনি সাথে সাথে থেকে তোমার দুয়ার টানে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতনের কথা ॥

১৯১৭ ও '১৮ সালে আমরা শান্তিনিকেতনে বাস করতাম। আমার ছোট ভাই মুলু ছিল সেখানের বিদ্যালয়ের ছাত্র। তার শরীর খুব ভাল ছিল না। সেই জন্য যদিও সে আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গেই বাস করত, তবু তার দিকে একটু নজর রাখবার জন্য আমার বাবা আমাদের দুই বোনকে নিয়ে আশ্রমে একটি খোড়ো বাড়ি কিনে সেইখানে বাস করা ঠিক করলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "রামানন্দ বাবুকে আমাদের আশ্রমে বন্দী করতে পারলে খুশি হব।" তাঁর মুখের কথাটা অবিকল হয়ত লেখা হল না, তবে প্রায় হয়েছে মনে হয়।

সেকালে আশ্রমের বেশীর ভাগ ঘরেই খড়ের চাল আর মাটির দেয়াল ছিল। আমাদের বাড়িটিও সেইরকম। বাবা সেটিকে সুদৃঢ় এবং মজবুত করবার জন্য দেয়ালগুলির দুপাশে চুণবালির plaster করিয়েছিলেন এবং মেঝেতে সিমেন্ট প্লাস্টার করিয়েছিলেন। বাড়ির চারধারে লাল সুরকি ঢেলে বাড়িটি দেখতে বেশ সুন্দর হয়েছিল। কিন্তু গ্রীষ্মের রাত্রে দরজা বন্ধ করে দিলে গরম ঘরে বাস করা যেত না, অথচ বাইরে খোলা মাঠে শোওয়াও মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ মনে হত না। তখন প্রত্যেক দরজার শুধু তারের পাল্লা লাগানো হত, যাতে বায়ু চলাচলে কোনো বাধা না পড়ে। আমাদের ঘরে শোবার তক্তাপোষ এবং বাবার লেখবার চেয়ার টেবিল ছাড়া আর বিশেষ আসবাব ছিল না। কিন্তু তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ঘরেরও প্রায় এই রকমই অবস্থা ছিল। তাঁর শয্যা দোতালার ঘরের মেঝেতেই পাতা হত। চেয়ারও সংখ্যায় বেশী ছিল না। অতিথি অভ্যাগতরা এলে বসতে মোড়া দেওয়া হত। অনেকে ছাদের আলসের উপরও বসতেন। সবই সেখানে শোভন মনে হত। মনে আছে একবার সন্ধ্যায় দেহলির ছাদে আমরা রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য বিশ্রামের সময় তাঁকে ঘিরে বসে আছি এমন সময় ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত ও তাঁর স্ত্রী দেখা করতে এলেন। আমরা শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট দম্পতি কিছুমাত্র ইতস্তত: না করে ছাদের আলসের উপর বসে পড়ে গল্প জুড়ে দিলেন।

যখনকার কথা বলছি তখন ছেলেদেরই অভিনয় হত "নাট্য ঘরে"। সেটি একটি লম্বা মাটির ঘর, তারও চাল খড়ের। ছেলেদের সেটি বাস গৃহই ছিল, তবে অভিনয়ের দিনের জন্য তাতে একটি উচ্চ মঞ্চ ছিল। বিশেষ দিনে ফুল পাতা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হত। তখন মেয়েরা অভিনয় করতেন না আশ্রমে। মেয়েদের পার্ট ছেলেরাই নিতেন। এই সময় আমরা আশ্রমবাসিনী মেয়েরা ঠিক করলাম একটা 'ক্যাবিল প্লেস পার্টি' করব। পুরুষদের মধ্যে বোধ হয় বাবাকে আর রবীন্দ্রনাথকে শুধু দেখতে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের স্ত্রী কচ সেজেছিলেন এবং আমি রাম সেজেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন। তার প্রধান কারণ আমাদের ছদ্মবেশটা সার্থক হয়েছিল। আমার ভগ্নী সীতাদেবী এবং সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী এণাদেবী মেয়েদের ভূমিকাই নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখে গিয়ে দিনু বাবুকে বলেছিলেন, "কি আশ্চর্য দিনু! সীতা হুবহু সীতা আর এণা হুবহু এণার মত হয়েছিল।"

এরপর তাঁর ইচ্ছা হল আমাদের দিয়ে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করাবেন। দেহলিতে আমরা তাঁর কাছে শিখতে যেতাম। যতদূর মনে আছে আমি রাণী কল্যাণীর ভূমিকায় এবং দিনু বাবুর স্ত্রী কমলাদেবী ক্ষীরির ভূমিকায় ছিলেন। কমলাদেবী বেশ ঝঙ্কার দিয়ে পড়তেন, আমরা রবীন্দ্রনাথের সামনে একটু ভয়ে ভয়ে পড়তাম। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত অভিনয়টা হল না। আমাদের সে সময় কলকাতা চলে আসতে হল। রবীন্দ্রনাথের কন্যা বেলাদেবী তখন পীড়িতা ছিলেন। তাই তাঁকেও মাঝে মাঝে চলে আসতে হত। বোধহয় এই সব কারণেই জিনিসটা দাঁড়াল না।

পুরাকালের শান্তিনিকেতনে পাউরুটি পাওয়া যেত না। আশ্রমে মাঝে মাঝে একরকম ছোট রুটি তৈরী হত। তাও বোধহয় আরও ৩।৪ বৎসর পরে। এই সময় বোধহয় কলকাতা থেকে কবির জন্য ভাল রুটি যেত। এক একদিন দুপুর বেলা তিনি অকস্মাৎ একটা মস্ত বড় রুটি নিয়ে এসে হাজির হতেন। আমাদের তাতে তিন চার দিন চলে যেত। আমরা দুই বোন তখন 'প্রবাসী'তে সংযুক্তা দেবী নাম দিয়ে নূতন উপন্যাস লিখতে শুরু করেছি। কবির নূতন বই বেরোলে তিনি তার উপর 'সংযুক্তাদেবী কল্যাণীয়াসু' লিখে নিজের হাতে আমাদের কুটিরে এনে আমাদের দিয়ে যেতেন। তখন সেটা কতই সহজ ছিল; আজ মনে হয় কি একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল নীচু বাংলা। সেটিতে বাস করতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পুত্রবধূ হেমলতা দেবী। দ্বিজেন্দ্রনাথ বাবাকে খুব ভালবাসতেন। প্রায়ই নানা রকম কাগজের বাকস তৈরি করে তাঁর ভৃত্য মুনীশ্বরের হাতে বাবাকে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি বাবাকে বলতেন "প্রবাসী মঠের রামানন্দ স্বামী।" তাঁরা তিন চার ভাই বিপত্নীক ছিলেন বলে তিনি বাবাকে বলতেন, "বলুন দেখি মশায়, কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁচতে পারে।" দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি রিক্‌শ গাড়ি ছিল। কখন তাতে চড়ে কখনও বা হেঁটে তিনি আমাদের কুটিরে আসতেন। এই আসা বেড়াতে আসা নয়, সেখা সম্বন্ধে জরুরী কাজ থাকলে ব্যস্ত হয়ে চলে আসতেন। নতুবা বাড়ি ছেড়ে কোথাও তিনি নড়তেন না। রবীন্দ্রনাথের যখন আমেরিকা যাবার কথা হয় তখন তিনি বলেন, "রবি বড় অস্থিরচিত্ত। কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারে না।"

সে সময় 'প্রবাসী'তে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। এই প্রবন্ধটির জন্য বাবাকে অনেক নূতন টাইপ তৈরি করাতে হয়েছিল। ছাপার ভুল দেখলে তিনি চটে যেতেন। তাই একবার একটা পুরা ফর্মা ফেলে দিয়ে বাবা আবার নূতন করে ছেপে দিয়েছিলেন।

সেকালের সেই আশ্রমে আশ্রমের বাহির থেকে রবীন্দ্রভক্ত বেশী লোককে আসতে দেখতাম না। ছাত্রদের মধ্যে নেপালী, দক্ষিণী, মণিপুরী, ওড়িয়া কিছু ছিলেন। তখনকার নিয়মিত অতিথির দলে ছিলেন যদুনাথ সরকার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অমল হোম প্রভৃতি। অবাঙালীরা তখন সবে রবি কবিকে চিনতে শিখেছেন; দু'চারজন মাঝে মাঝে আসতেন, বেশী নয়। নাম মনে পড়ে অধ্যাপক তারাপুর ওয়ালা, বোমানজি, যমুনালাল বাজাজ এই রকম কয়েক জনের। বোধ হয় সেই সময় বোকয়ানভ বলে এক রাশিয়ান ছিলেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নানা উৎসবের হোতারূপে আজকাল যাঁদের নাম শুনি, সেকালে তাঁদের অনেককেই আমরা কোনোদিন দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের কন্যা বেলা দেবীর মৃত্যুর পর আশ্রমে এক সময় সপরিবারে আসেন অধ্যাপক ক্ষিতিভূষণ অধিকারী। তাঁর তৃতীয়া কন্যা তখন ছিলেন শুধু রাণু,

এখন সেডি রাস্থ বুখারি। এই সময় থেকে এই পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হয়। ভানুমতী নাম্নী একটি গুজরাটি মেয়ের নাম মনে আছে, পুরুষদের নাম মনে নেই।

রবীন্দ্রনাথের দেহলি গৃহ দোতলা হলেও অতি ক্ষুদ্র ছোট্ট একটি নীড়। আমাদের কুটিরের সঙ্গে মাঝে একটি মাঠের ব্যবধান মাত্র ছিল। তাঁকে আমাদের বারান্দা থেকে সারাদিনই আমরা দেখতে পেতাম। একথা অনেক জায়গায় অনেক বার বলেছি। ভোরে তিনি পূর্বমুখে আসন করে ধ্যানে বসতেন। তারপর চা খেয়ে বারান্দার কোণে লেখার কাজ নিয়ে বসতেন। অনেক বেলা পর্যন্ত কাজ চলত। সকালে লোক তাঁর কাছে গেলে পছন্দ করতেন না। প্রথম প্রথম জানতাম না বলে অনেক সময় ছেলেমানুষি করে গিয়ে পড়েছি। কিন্তু কখনও কোনো বিরক্তি দেখিনি। রাত্রেও তিনি অনেক রাত পর্যন্ত জাগতেন। বেশীরাত্রে শালবীথিকায় একলা একলা ঘুরতেন। তাঁর দোতলার ঘরটিতে বিছানাপাতা মশারি টাঙানো থাকত। ছোট একটি লণ্ঠন এককোণে জ্বলত। কিন্তু তিনি যে কখন শুতেন বুঝতে পারতাম না।

আশ্রমের মেয়েদের "প্রেয়সী" বলে একটি হাতের লেখা কাগজ ছিল। আমি ছিলাম সম্পাদিকা। তখন নূতন লিখতে শিখছি। হাতের লেখা কাগজের জন্যও বেশ খাটতাম। দুপুর বেলা বাড়ি বাড়ি লেখা সংগ্রহ করে বেড়াতাম। একদিন এই রকম দুপুরে ঘুরছি দেখে তিনি দেহলির উপরতলা থেকে আমাদের ডেকে পরিহাস করে বললেন, "এই দুপুর রৌদ্রে অমুক আর অমুকের বাড়ি লেখা জোগাড় করে বেড়াচ্ছ? আমি কি তাদের চেয়েও খারাপ লিখি? আমার কাছে ত চাইলে না।" বলা বাহুল্য কথাগুলি নির্মূল লেখা গেল না।

শ্রীশান্তা দেবী

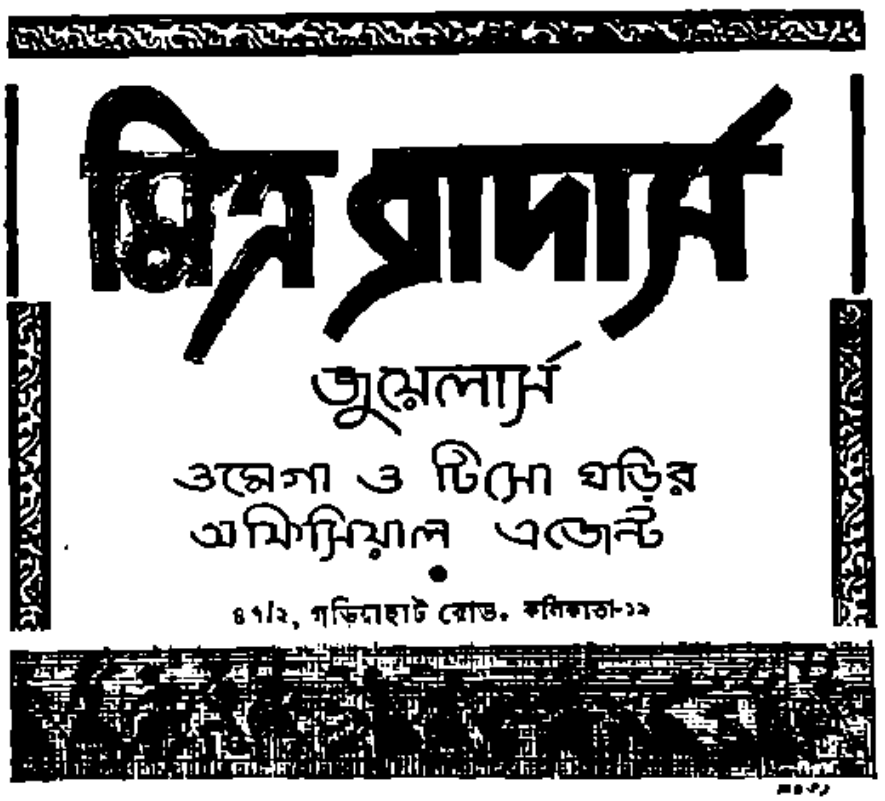

কবি-চেতনা।

সেই পুরানো উপমাটাই আবার দিতে হয়।

এক গণ্ডূষ জল দিয়ে সমুদ্রের মহিমা বোঝান যায়!

সুতরাং কবি রবীন্দ্রনাথকে মাসিক পত্রের একটি নিবন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করছি না। শুধু তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করার বিষয় যদি একটু প্রকাশ করতে পারি তাহলেই নিজেকে সার্থক মনে করব।

তিন পাতার আলোচনায় যেমন নয় তেমনি তিন সহস্র পাতার তথ্য তারিখ কণ্টকিত অতিকায় গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথকে বোঝানো যায় তা অবশ্য মনে করি না। অলোক সামান্য হবার সে অভিশপ্ত নিয়তি যদিও তাঁর বেলায় অচল হয়ে থাকবে না। রাশি রাশি বই তাঁর সম্বন্ধে লেখা হবে। পর্বত প্রমাণ সে টীকা-ভাষ্যের তলায় রবীন্দ্রনাথই না হারিয়ে যান।

রবীন্দ্রনাথ জীবনে রাশি রাশি কবিতা লিখেছেন। ছেলেবেলা 'শ্লেট' এ থেকে শুরু করে মৃত্যুর দিন দুই আগে পর্যন্ত। পণ্ডিতদের মোটা মোটা কেতাবে তার সন তারিখ, কোথায়, কেন, কিভাবে লেখা সব হদিস্ মিলতে পারে।

ইচ্ছে হলে সে সব ধৈর্য ধরে পড়ে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ কি কলমে কোন্ কালিতে লিখতেন তাও। কিন্তু তাতে কি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বোঝা যাবে?

রবীন্দ্রনাথ ত শুধু কবিতাই লেখেননি। কি না লিখেছেন গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস নাটক ভ্রমণ কাহিনী ছড়া গান হাসির নক্সা, এমন কি বিজ্ঞান ইতিহাসের বই। শুধু লেখেন নি, তিনি অনেক কিছু করেছেন.—জন পঞ্চাশ ক্ষমতাবান মানুষ এক জীবনে যা করে উঠতে পারেন না।

এই সব কিছু মিলে রবীন্দ্রনাথ। তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের এক অনন্য যুগসন্ধিক্ষণের বিস্ময়কর বাঙ্ময় চেতনা। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত ধারাবাহিক বিশ্বমানব-নাট্যের যে বিরাট অবিশ্রান্ত প্রচণ্ড পট পরিবর্তন চলল, আজও যা শেষ হয়নি তিনি তারই মুকুর, ব্যাখ্যাতা, নায়ক, দিশারী ও অন্যতম প্রাণ-পুরুষ। যুগান্ত আলোড়নের তিনি অদ্বিতীয় বাণীমূর্তি।

তাঁর সমস্ত কবিতায় তাঁর এই পরিচয়ই আমাদের উপলব্ধি করবার।

তাঁর কাব্যজগৎ বিপুল বিচিত্র। সেখানে উত্তুঙ্গ অভ্রভেদী গিরিশিখরের মহিমা আছে আবার আমলকি বনের অকারণ ঝিকিমিকি আলোর খেলাটুকুও। তাতে নদী, বন, গিরি, প্রান্তর, সমুদ্রের অফুরন্ত বৈচিত্র্য, ছয় ঋতুর আশ্চর্য পালাবদল, দিনরাত্রির নিত্যনব রূপান্তর। নিজের কবিতার ছন্দের মতই—বিপরীত তিনি মিলিয়ে কঠোরে।

এই কবিতা আমাদের অমূল্য উত্তরাধিকার। আজকের যুগে কেউ আমরা গরীব কেউ ধনী। বাপ মা কারুর জন্যে মোটা টাকা রেখে যান ব্যাঙ্কে, বিষয় সম্পত্তিতে। কারুর বেলা শুধু দেনা আর দারিদ্র। কিন্তু এ উত্তরাধিকার আমাদের সকলের। এক অলোকসামান্য চেতনায় প্রতিফলিত রূপান্তরিত হয়ে বিবর্তমান মানব মনের সমস্ত হৃদয়-বোধের সম্পদ আমাদের জন্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে শুধু আমাদের নেওয়ার অপেক্ষায়।

সুস্থ থাকলে আমাদের শরীর প্রায় সর্বত্রই সজাগ। যেখানে ছোঁয়া যাক, সাড়া দেয়। কারো কোথাও বেশী, কোথাও কম।

কিন্তু মনের বেলা তা নয়। আমাদের মনের সাড় সব জায়গায় এবং সকলের সমান নয়, তার অনেক মহল আমাদের নিজেদেরই অগোচর।

বৃষ্টিধারা যেমন শুকনো নিষ্প্রাণ মাটিকে জাগায়, তেমনি উপযুক্ত স্পর্শ পেলে আমাদের মনও অভাবিত ভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারে নিজেরও অগোচর সব কোণে কানাচে।

মনের এই সর্বাঙ্গীন জাগরণই জীবনের পরমার্থ নয় কি!

মাটির কাছে মেঘের দান যা, আমাদের মনের কাছে রবীন্দ্রনাথ তাই হতে পারেন তবু যদি নিজেদের মেলে ধরতে আমরা পারি।

রবীন্দ্রনাথকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন আশ্চর্য যন্ত্রের সঙ্গে একদিকে বুঝি কিছুটা তুলনা করা যায়। সাধারণ ইন্দ্রিয়গোচর বা অগোচর সমস্ত তরঙ্গই তাঁর কাছে ধরা পড়েছে, তা রূপান্তরিত করে আমাদের কাছে তিনিই আবার পাঠিয়ে দিয়েছেন গ্রহণযোগ্য করে।

তুলনা ওইখানেই শেষ। রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন তা যন্ত্রের অসাধ্য। তিনি জীবন ও সৃষ্টির সঙ্গে সব সংস্পর্শে সাড়া দিয়েছেন বিশাল বৈচিত্র্যে, সাড়া তুলেছেন তেমনি।

তাঁর কবিতায় ও গানে ধরা দেয়নি এমন কিছু ভাবতরঙ্গ আছে বলে জানি না। তার সংখ্যার বিপুলতাই বিস্ময়কর, আরো বিস্ময়কর তার বিস্তৃতি। যেখানে যা কিছু ছুঁয়েছে তাতেই তাঁর মন গানের সুরে বেজে উঠেছে দুলে উঠেছে কবিতার ছন্দে। ছুঁতেও তাঁর কিছু বাকি নেই।

আর সেই ছোঁয়া আমাদের মনে তরঙ্গিত হবার অপেক্ষাতেই তাঁর সমস্ত রচনায় সঞ্চিত হয়ে আছে।

প্রচলিত ধারণা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গেই তাঁর প্রতিভার সূর্যোদয়-সূচনা। সূচনা অনেক আগেই হয়েছে। হয়েছে শুনেছি শ্লেটের ওপর লিখে লিখে অকাতরে মুছে ফেলা অসংখ্য কবিতায়। কিংবা তারও আগে দোতলার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সেই সাহিত্যের অমর বটগাছটার দিকে চেয়ে থাকায়।

এই চেয়ে থাকাই তাঁর কবিত্বের বুঝি সব চেয়ে বড় কথা;—চেয়ে চেয়ে এই বিশ্বকে তার বিরাটত্বে তার জটিলতায় তার অতি সাধারণ সহজ খুঁটিনাটিতে প্রাণভরে দেখায়।

দেখে ত অনেকেই, কিন্তু প্রাণ ভরে কি! প্রাণ ভরে তখনই যখন মিথ্যার কৃত্রিমতার কোন ঢাকনা তার থাকে না, যখন তার তৃষ্ণা থাকে তীব্র। রবীন্দ্রনাথের জীবন তৃষ্ণা জলের জন্যে মরুর কি আলোর জন্যে বীজের তৃষ্ণার চেয়েও প্রচণ্ড। এই তৃষ্ণাই তাঁকে জীবনের আর সৃষ্টির সব কিছু দেখায়,—এই দেখাই তাঁর কাব্যে ঝলকিত হয়ে ওঠে।

তাঁর এই দেখা শুধু বাইরে থেকে আলাদা হয়ে দেখা নয়, যা দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। সেইখানের তাঁর কবিসত্তার অনন্য বিশেষত্ব।

তাঁর একটি চিঠিতে পাই "শান্তিনিকেতনের সঙ্গে মিশ খায় এমন একটি মনের ভাব আছে, তাকে বলা যেতে পারে উজ্জ্বল প্রশান্ততা।.....কিছুদিন থেকে সেই রকমের একটি পরিব্যাপ্ত পরিতৃপ্তি আমার মনে বিরাজ করছিল—জানলা থেকে বাইরের দিকে চাইলেই সমস্ত কিছুর সঙ্গে একটি সহজ মিলনের অনুভূতি সেই মুহূর্তেই আমার চেতনাকে কচি ধানের কোমল সবুজ প্রাণের রঙে রাঙিয়ে দিত।...আমার মনে হয় যে সপ্তকে আমার জীবনের গান বাঁধা এইটেই তার মূল সুর।"

মূল সুর তাঁর কবি-প্রকৃতিরও নিশ্চয়।

এই চিঠির কথাগুলিই কতবার কতভাবে যে তিনি লিখেছেন তার অন্ত নেই।

পৃথিবীকে রূপে রসে সমস্ত বৈচিত্র্যে দেখার জন্যেই তিনি তৃষিত বাইরের ও মনের চোখ মেলে রাখেন, আর তার চেয়ে বড় কথা সেই দৃশ্যমানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

এই একাত্ম হওয়াতেই বুঝি আর সব কবিদের সঙ্গে তাঁর দুস্তর পার্থক্য। এই পার্থক্যটুকু না থাকলে তাঁকে প্রধানতঃ প্রকৃতি বিলাসী কবি বলেই হয়ত লেবেল মেরে ছেড়ে দেওয়া যেত। বিশ্ব প্রকৃতিই যে তাঁর মনকে সব চেয়ে গভীর ভাবে দোলা দিয়েছে এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। কিন্তু সে দোলায়ও কবিতা হয়ে যা বেরিয়েছে তা শুধু প্রকৃতি প্রশস্তির পর্যায়ে ত পড়ে না। অন্তর্চেতনা আর প্রকৃতি সেখানে কোন আশ্চর্য যাদুতে একাকার হয়ে গিয়ে রসের আর এক অলৌকিকতায় পৌঁছে দেয় না কি? তাঁর প্রকৃতি-প্রাণ যে কোন গান কি কবিতায় এ কথার প্রমাণ মিলবে। প্রকৃতি-সম্বন্ধে কবিতা অন্য-বিস্তর বিশ্বের অনেক শ্রেষ্ঠ কবির কাছেই আমরা পেয়েছি, কিন্তু 'মেঘের কোলে কোলে যায়রে চলে বকের পাঁতি। ঘর ছাড়া মোর মনের কথা গাঁথি গাঁথি' এই কোন রকম বাছাই না করে তুলে দেওয়া উদাহরণটিতেও প্রকৃতি-আশ্রিত হয়েও তা উত্তীর্ণ হওয়া যে বোধের পরিচয় আছে তার জুড়ি পাওয়া সহজ নয় বলেই জানি।

প্রকৃতিপ্রধান কবিতায় যেমন, অন্য নানা ভাবের নানা জাতের—কবিতায় কোন মহলটাই বা তিনি বাদ দিয়েছেন—কবিতায়ও তেমনি সাধারণ কাব্য বিচারের মাপকাঠিতে তাঁকে মাপতে যাওয়া হাস্যকর। ভাব ভঙ্গি কারুকলার বৈচিত্র্য তাঁর অনুসরণ, কিন্তু তিনি আর সকলের থেকে স্বতন্ত্র ও অনন্য শুধু এই সবের বৈশিষ্ট্যে ও প্রাচুর্যে নয়, স্বতন্ত্র তাঁর কাব্য প্রেরণার নির্মল স্বতস্ফূর্ত আন্তরিকতায়। সেখানেও তিনি একাধারে স্রষ্টা ও দ্রষ্টা কিন্তু এই দেখা আর দেখানোর একাগ্রতা বাইরের কোন কৃত্রিম কাব্য-সংজ্ঞা প্রমাণের বাহাদুরী দিয়ে সাধিত নয়। তার ছন্দস্পন্দন সমস্ত কাব্যকলার পরম উৎস সেই গভীর অতল চেতনা সমুদ্র থেকেই তরঙ্গিত।

নিছক অনুস্বার বিসর্গের নিষ্প্রাণ শাস্ত্র সেকালের হলেও যেমন একালের হলেও তেমনি অচল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাবের সময় তথাকথিত সনাতনীরা পুঁথিপড়া নকল পাণ্ডিত্যে যেমন তাঁকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন, একালেও ইলিয়ট পাউণ্ড-পড়া ও ম্যালার্মে র‍্যাঁবোর সাত কান-কেরতা হুজুগে বুলি কপচানো কিছু কবি-পণ্ডিতম্মন্যেরাও তেমনি। স্পষ্ট করে বলার সাহস না থাক আকারে-ইঙ্গিতে তাঁরা এইটেই বোঝাতে চেয়েছেন যে তাঁদের কাব্যশাস্ত্রের বিচারে রবীন্দ্রনাথের একালের কবি হিসেবে গণ্য হবার যোগ্যতা তেমন নেই।

না থাকা-ই স্বাভাবিক। কারণ তিনি পৃথিবীতে একান্ত বিরল কালাতীত কবিদের-ই একজন। আসল নকল কোনো শাস্ত্র যার নাগাল পায়না রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই প্রাণ-তরঙ্গের বাণীময় প্রকাশ। তা শুধু বিচার বিশ্লেষণ উপভোগের সামগ্রীই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু। তা যেমন বিশালতায় তেমনি বিশেষে, আমাদের বাক্তিসুষ্ট সমস্ত চেতনা-উদ্বাসিত-করা সঙ্গীতময় বোধন-মন্ত্র।

কবিতার অনেক সাময়িক হুজুগ উঠবে পড়বে, কিন্তু যে অনিমেষ আকাশ হৃদয় রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে মেলে দিয়ে গেলেন, নিজেদের মূঢ়তায় ছাড়া তার মহিমা-মাধুর্য কোনদিন আবৃত হবে না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্র প্রতিভা ও লোক-সাহিত্য।

রবীন্দ্র প্রতিভার একটি বিশেষত্ব এই যে জগতের কোন বস্তুকেই তাহা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে নাই, সাধারণ বিষয়ের মধ্য হইতেও অসাধারণত্বের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের সাধনা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব যখন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর অভিজাত সমাজকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিবার উপক্রম করিল, তখনই রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন সাধনার মধ্যে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার পূর্বে এ দেশের জীবনের মধ্যে কি কি সম্পদ রহিয়াছে, তাহা সুগভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বেশী ছিলনা, সেই বয়সে জীবনে সাধারণতঃ মোহই সৃষ্টি হয় সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে মোহ জয়লাভ করিতে পারে নাই। জীবনের সর্বপ্রকার অবহেলার ক্ষেত্র হইতেই সত্যকে সন্ধান করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বাংলার লোক-সাহিত্য প্রীতির মধ্যে তাহার অন্যতম নিদর্শন লাভ করা যায়।

জাতির শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা পায়, ঐতিহ্যকে স্বীকার করিয়াই জাতীয় কবির সাধনায় সিদ্ধি আসিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের সাধনা যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহারও প্রধান কারণ ইহার সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগ। এই বিষয়টি আমরা নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলেও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যে এখনও যথার্থ আকৃষ্ট হইতে পারে নাই, তাহা বাংলার লোক-সাহিত্য। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের সাধনা ভারতীয় উপনিষদের চিন্তাধারায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবিদিগের ভাবধারায় শক্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে যে ইহা প্রথম প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়াছে, তাহা আমরা অনেক সময় বিচার করিয়া দেখি না। ইহার অর্থ ভারতীয় উপনিষদ কিংবা পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের যতটুকু জ্ঞান আছে, বাংলার লোক-সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের ততখানি জ্ঞান নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাধনার মূলে তাঁহার লোক-সাহিত্যের রূপ রস ও ভাব সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহার সমগ্র সৃষ্টিকেই জাতীয় ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলাদেশের ছেলেভুলানো ছড়া ও পল্লীসাহিত্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার প্রথম আবেদন প্রচার করেন, তখনও বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে প্রায় পনের বৎসর বাকি। ইতিমধ্যে 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অখণ্ড ভারতের হিন্দু আদর্শ অপেক্ষা সেদিন বাঙ্গালী জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই যে বিচরণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার সে'দিনকার বাংলার নিরক্ষর পল্লীসমাজের অলিখিত সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিবার মধ্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। লোক-সাহিত্যের উপকরণ যে তিনি সে'দিন বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগারে সাজাইয়া রাখিবার জন্যই সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই নহে তিনি সে'দিন নিজের ধ্যানে ও চিন্তায় তাহা সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেযুগের সকল রচনার মধ্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে তিনি তাঁহার 'বিষ্টি পড়ে টাপুর-

টুপুর নদী এল বান' নামক কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালের বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়াও তিনি তাঁহার জীবনে ইহার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা নানাভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা'র যুগে রচিত বহু কবিতার ভিতর দিয়াই বাংলার লোক-সাহিত্যের বহু বিষয়কে আধুনিক রোমান্টিক চেতনায় সঞ্জীবিত করিয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের দুই দিক্‌পাল মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরূপ আকর্ষণের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। সেইজন্য তাঁহাদের রচনা আজ প্রাচীন বা classic-এর পর্যায় ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু জাতীয় রস ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রায় আশী বৎসর পূর্বেকার রচনাও এখনও সেই পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে নাই।

পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক সাহিত্য কিংবা ভারতীয় উপনিষদ পাঠ করিয়া যেমন রবীন্দ্রনাথ ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়, বাংলার লোক-সাহিত্য সম্পর্কে তাহা সম্ভব ছিল না। ইহাদের মূল্য তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ইহাদের সংগ্রহ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তারপর সংগৃহীত উপকরণগুলিকে নিজে হইতে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠকের রসবোধ জাগ্রত করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলাদেশের ছড়াগুলি সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন তখন এই বিষয়ে তাঁহার সম্মুখে কোনও আদর্শ ছিল না, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনা পাঠ করিয়া যে তিনি বাংলার লোকসাহিত্য বিষয়ে অনুরাগী হইয়াছিলেন, একথাও সত্য নহে। কারণ, তখন পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য দেশে লোকসাহিত্য বিষয়ক রচনা নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় ছিল, স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়া যে রবীন্দ্রনাথের মনে দেশপ্রীতির জন্ম হইয়াছিল, এ কথাও সত্য নহে। কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার জন্মের পূর্ব হইতেই দেশানুরাগ সেই পরিবারের একটী বিশেষত্ব ছিল। বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছে। এই বিষয়টি আমরা নানা কারণে গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে চাহি না। প্রথম কারণ এই যে ইহার দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে একান্ত বাঙ্গালীত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া অনুভব করা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম ইহার বিরোধী বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহার অন্যান্য কারণও আছে তাহা এখানে বিস্তৃত করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। তবে একটি কথা এখানে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে স্বদেশপ্রেমের উপর ভিত্তি করিয়াই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই স্বদেশপ্রেম হইতেই তাঁহার বাংলার লোক-সাহিত্য বিষয়ক অনুসন্ধানের প্রেরণা আসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আজ হইতে সত্তর বৎসর পূর্বে তাঁহার ছেলেভুলানো ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তখনও দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই কিংবা সামগ্রিকভাবে দেশ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে নাই। তবে অচিরকাল মধ্যেই জাতির যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইল তাহার দ্বারা পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রাণান্তকর প্রয়াস পাইতে লাগিল তাহার প্রস্তুতি পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়াগুলি সংগ্রহ করিবার মধ্যে বাঙ্গালীর গৃহ ও তাহার সাধারণ জীবনের প্রতি যে মমতা প্রদর্শন করিলেন তাহার প্রেরণা সেই যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশহিতৈষী বাঙ্গালীরই অন্তর অধিকার করিয়াছিল, তাহা না হইলে রবীন্দ্রনাথের ছেলেভুলানো ছড়াগুলি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাংলা দেশব্যাপী লোকসাহিত্যের বিভিন্ন

উপকরণ সংগ্রহ করিবার এত ব্যাপক সাড়া পড়িয়া যাইত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই সংগ্রহের ভিতর দিয়া বাঙালী জীবনের এই অবহেলিত সম্পদের প্রতি যেভাবে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন তাহাতে অতি সহজেই এই জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়া এই বিষয়ে তাহার কর্তব্য পালনে ব্রতী হইল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছেলেভুলানো ছড়াগুলি যেভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহার খুঁটিনাটি বিবরণ আজ আমরা জানিতে পারি নাই। এ কথা সত্য তাঁহার পরিবারের মধ্য হইতে এই বিষয়ে যে তিনি খুব সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহা নহে। কারণ যে স্তরের সমাজ জীবনের পরিচয় তাঁহার সংগৃহীত ছড়াগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় তিনি সেই সমাজ হইতে উর্দ্ধতন স্তরে বাস করিতেন। যেখানে পল্লীর সমাজজীবনের নিবিড়তা আছে সেখানেই লোকসাহিত্যের পুষ্টি, কিন্তু যেখানে নাগরিক জীবনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন পরিবার পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে সেখানে লোক-সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিতে পারে না, অবিলম্বে প্রাণশক্তি হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের বিশেষত্ব এই যে ইহা নির্জীব নহে। একটি জীবন্ত সমাজ হইতে ইহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। ইহাদের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ও জীবনের উত্তাপ অনুভব করা যায়। অতএব আমাদের একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, এই উপকরণগুলি রবীন্দ্রনাথ কোথা হইতে কিভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিবার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে, ইহা সর্বাংশে যান্ত্রিক, হৃদয়ে স্পর্শহীন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ তেমন নহে। কোনও যান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া তাহা সংগৃহীত হইয়াছে এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। তবে একথা মনে হইতে পারে যে, যেভাবেই হউক ইহা সংগৃহীত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ ইহাদিগকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী মার্জিত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু একথাও সত্য নহে। কারণ শিক্ষিত মন লোকসাহিত্যকে মার্জিত করিতে গেলেই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠিবে। তাহার ফলে ইহার সমস্ত আবেদন ব্যর্থ হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি সংগ্রহ যে সার্থক আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আজ লোক-সাহিত্যের যে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের উপর যদি তাহাও আরোপ করা যায় তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাঁহার প্রত্যেকটি ছড়াই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অথচ আজ হইতে সত্তর বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই কাজ যে কিভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত গ্রাম্য সাহিত্য প্রবন্ধটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কোনও ব্যক্তির উপর ইহাদের সংগ্রহের ভার দিয়াছিলেন এবং কি প্রণালীতে যে এই সংগ্রহ কার্য অনুসরণ করিতে হইবে তাহাও তিনি তাহাদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার একজন সংগ্রাহক তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, "প্রাচীনা স্ত্রি আজকাল মেয়েদের কাছে এইরূপ কবিতা শুনিবার প্রত্যাশা নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না। বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে উহা জানেন না। দুই একজন জানিলেও সকলে জানেন না, সুতরাং পাঁচটি ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলেই পাঁচ গ্রামের পাঁচজন বৃদ্ধার আশ্রয় লইতে হয়। এদেশের পুরাতন বৈষ্ণবীগণের দুই একজন মাঝে মাঝে এইরূপ কবিতা বলিয়া ভিক্ষা করে দেখিতে পাই। তাহাদের কথিত ছড়াগুলি সমস্তই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক। এইরূপ বৈষ্ণবী সচরাচর মেলে না এবং মিলিলেও অনেকেই একবিধ ছড়াই গাহিয়া

থাকে। এমত স্থলে একাধিক নূতন ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত বহু বৈকল্পীর সাহায্য আবশ্যক। তবে শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির কৃপায় প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দু'একটি বিদেশিনী নূতন বৈকল্পীর 'অয় রাধে' শুনিতে পাওয়া বড়ো কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে।"

এই উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইতেছে যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতেই বাংলার সমাজ ও পারিবারিক জীবনের ভাঙন ধরিয়াছে। লোক-সাহিত্যের বিষয়গুলি প্রধানত স্ত্রী সমাজ কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই যুগে স্ত্রীশিক্ষা বর্তমানকালের মত এত বিস্তৃতিলাভ না করিলেও কেবলমাত্র যুগপ্রভাব বশতঃ অশিক্ষিত স্ত্রী সমাজও ছড়াগুলি আবৃত্তি করা কিংবা স্মৃতিকে রক্ষা করা অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে এই ছড়া সংগ্রহের কার্যটি সহজ ছিল তাহা মনে করিবার কিছু কারণ নাই। তথাপি এই বিষয়ে নিরুৎসাহ না হইয়া রবীন্দ্রনাথ জাতির একটি অমূল্য সম্পদ যেভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে আজও আমরা বিস্ময় অনুভব না করিয়া পারি না। তাহার পর কেবলমাত্র সংগ্রহই নহে, কারণ উদ্দেশ্যহীন সংগ্রহের কোনও মূল্য নাই, তাহা দ্বারা ভাষাতত্ত্ববিদ বা নৃতত্ত্ববিদের উপকার সাধিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা আমাদের সমাজে নিতান্ত মুষ্টিমেয়। সুতরাং ইহাদের প্রয়োজনে লোক-সাহিত্যের সংগ্রহের কার্যে কেহই উৎসাহ অনুভব করিতে পারে না। অতএব রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, সামাজিক জীবনে ইহাদের সুদূরতীর তাৎপর্যের কথা এবং রস বিচারে ইহাদের সূক্ষ্মভাবে মূল্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। উচ্চতর বাংলা সাহিত্য কোথায় যে যথার্থ শক্তিলাভ করিয়া ক্রমাগতই পুষ্টিলাভ করিতেছে তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের ভিতর দিয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম। এই সংগ্রহ কার্যে কেবলমাত্র অন্ধ স্বদেশভক্তি নহে, কিংবা গবেষকের তথ্য পরিবেশন নহে, ইহাদের যে একটি শাশ্বত সাহিত্যিক মূল্য আছে, তাহাই তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। সেইজন্য ছেলেভুলানো ছড়াগুলি যেমন কখনও পুরাতন হয় না, তেমনই তাঁহার এই বিষয়ক প্রবন্ধটিও কখনও পুরাতন হইয়া যাইবে না। ইহাতে চিরন্তন সাহিত্যের রসোপলব্ধির পরিচয় আছে। লোক-সাহিত্য কিংবা মৌখিক সাহিত্যও যে লিখিত সাহিত্যের মতই পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য, তাঁহার আলোচনার দ্বারা দিয়া ইহাই প্রকাশ পাইল। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রোমান্টিক কবি-মানস ভারতের প্রাচীন রসৈশ্বর্যকে তাহার ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছে, তিনি আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের ভিতর দিয়াও তাঁহার সূক্ষ্মতম ভাববিলাসিতা এবং সৌন্দর্যবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলার পল্লীর অলিখিত সাহিত্য সম্পদও যে সেইভাবে তাঁহার সকল শ্রদ্ধা ও রসবোধ আকর্ষণ করিয়াছে, ইহা তাঁহার মত সার্বভৌম কবিত্ব শক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত রসদৃষ্টির অভাবে তাহাদের পরিবেশন বিদগ্ধ সমাজে তেমন আর সার্থক হইতে পারে নাই।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র-শতাব্দী ও আত্ম-সমীক্ষা ॥

ত্রিবিধ ঋণ

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ত্রিবিধ ঋণ-পরিশোধের কথা বলিয়াছেন—দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও ঋষি-ঋণ। আমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ, তর্পণের দ্বারা পিতৃ-ঋণ ও শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা ঋষি-ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার মধ্য দিয়াই যথার্থ ঋণ-পরিশোধ হয়। আবার পিতৃ-পিতামহ ও পূর্বপুরুষগণের ধ্যান-ধারণাকে অনুক্ষণ সঞ্জীবিত রাখাই ঋণ-মুক্ত হইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে যদি আমরা যথাশক্তি এই ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করি, যদি রবীন্দ্র-ভাবধারায় অবগাহন করিয়া আমরা নবজন্ম লাভ করি, তবেই শতবার্ষিক উৎসব সাফল্যে মণ্ডিত হইবে। তাই আজ যখন পৃথিবীর সর্বত্র সাড়ম্বরে রবীন্দ্র-শতাব্দী উদ্‌যাপিত হইতেছে, তখন আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-সমীক্ষার গুরুতর প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদিগকে আজ এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—কবিগুরু তাঁহার অকৃপণ দানের ফলস্বরূপ যে অক্ষয় সম্পদ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা কেমন করিয়া তাহার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে রসস্রষ্টা কবি, সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও সহৃদয় মনীষী। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্যকর্ম বিচিত্র ও বহুমুখী। রবীন্দ্র-রচনাবলীর যেমন একটা রস-সম্ভোগের দিক আছে তেমনই একটি কল্যাণের দিকও আছে। কালিদাসের মেঘদূত কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কেও সেকথা বলা চলে। আমরা বলিতে পারি—কালিদাসের খণ্ডকাব্যের ন্যায় রবীন্দ্র-সাহিত্যেও পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। পূর্বমেঘ পথের সৌন্দর্য দেখাইয়া আমাদের নয়ন ও মন ভোলায়, আর উত্তরমেঘ আমাদের কল্যাণের পথের সন্ধান দেয়। কয়েক বৎসর পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'র একটি সংখ্যায় আমি এই কথাটিই বিশদ করিয়াছিলাম।

ত্রিবিধ বিরহ : ত্রিবিধ মিলন

একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষী বলিয়াছেন, আধুনিক মানুষের মনে জাগিয়া আছে ত্রিবিধ বিরহ—প্রকৃতির সঙ্গে বিরহ, মানুষের সঙ্গে বিরহ, তুমার সঙ্গে বিরহ। জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে ও তুমার সঙ্গে মিলিত হইয়া জীবনকে আনন্দময় ও রসঘন করিয়া তুলিতে পারে।

এই জীবন-রসায়ন আবিষ্কার করিয়াছেন ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ। তাঁহারা আমাদিগকে সেই মন্ত্র শুনাইয়াছেন যে মন্ত্রের শক্তিতে আমরা অভয়, অশোক ও অমৃত হইতে পারি। ভারত দীর্ঘকাল সেই বিদ্যা বিস্মৃত হইয়াছে যে বিদ্যার বলে মানুষ অমর হয়, সেই সাধনা বিস্মৃত হইয়াছে যে সাধনার বলে মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী হয়, সেই শিক্ষা বিস্মৃত হইয়াছে যে শিক্ষার বলে মানুষ প্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে, ভুক্তি ও মুক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সাধনাও বস্তুত সমন্বয়েরই সাধনা। কর্মের সঙ্গে মননশীলতার, যুক্তির সঙ্গে ভক্তির, বীর্যের সঙ্গে মৈত্রীর, প্রেমের সঙ্গে শক্তির, ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়েই যে মানুষ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের সাধনা তাহারই দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—প্রকৃতির মধ্যে জীর্ণতা, বার্দ্ধক্য বা মৃত্যু নাই, আছে নব-জীবনের প্রস্রবণ। তাই প্রকৃতি হইতে নিত্য যে আনন্দ-নির্ঝর উৎসারিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করিয়া আমরাও জরা-ব্যাধিকে অতিক্রম করিতে পারি। আমরা লোভ ও স্বার্থপরতার শৃঙ্খলে কারারুদ্ধ বলিয়া বাহিরের উদার আকাশ, মুক্ত বায়ু প্রভৃতির আহ্বান শুনিতে পাই না। এ আহ্বানে যদি আমরা সাড়া দিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের রুদ্ধ অর্গল উন্মুক্ত করিতে হইবে। উপনিষদের ঋষি বলেন, আনন্দ হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, আনন্দেই পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে, আবার আনন্দেই অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, উপনিষদের এই আনন্দবাদই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই আনন্দরূপম্ অমৃতমেরই লীলা-বৈচিত্র্য দর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতির আনন্দ-সায়রে ডুব দিয়া জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিবার যে সাধনা, সে সাধনা ভারতীয় ঋষির, সে সাধনা রবীন্দ্রনাথের। এ সাধনাকে বলা যায় আনন্দের সাধনা। এ সাধনার প্রধান কথা – In Tune with Nature.

শুধু বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে নয়, মানুষের মধ্যেও চলিয়াছে তাঁহার লীলা। যিনি এক, তিনিই বহুর মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছেন। আমার আত্মাই সর্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, এই ভাবনার দ্বারাই আমরা শোক ও মোহকে অতিক্রম করিতে পারি। আপনাকে সর্বলোকে ও সর্বভূতে ব্যাপ্ত করিবার সঙ্কেত রহিয়াছে গায়ত্রী মন্ত্রে। ইহা কল্পনাবিলাস নহে, ইহা উপলব্ধির বস্তু। নিজেকে সর্ব মানবের তথা সর্বভূতের মধ্যে ব্যাপ্ত করিবার সাধনা প্রেমেরই সাধনা। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ মৈত্রী-ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অবশ্য যেখানে—

'জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রবল অন্যায়,
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে রক্তের বন্যায়।'

সেখানে রবীন্দ্রনাথ জাতিপ্রেমকে ধিক্কৃত করিয়াছেন, আর এইজন্য পাশ্চাত্য দেশের যে উগ্র স্বাজাত্যাভিমান মানবধর্মকে পদদলিত করে, তাহার বীভৎস নির্লজ্জতাকে তিনি কশাঘাত করিয়াছেন কিন্তু যে স্বদেশপ্রেম শুভবুদ্ধি বা কল্যাণ-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, কবির দৃষ্টিতে সে স্বদেশপ্রেম মানব-প্রেমেরই শরণি, বিশেষত, মহামানবের মিলনভূমি এই ভারত তাঁহার নিকট তীর্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। তিনি স্বদেশের মধ্য দিয়াই সর্বদেশকে ও সর্বদেশের মধ্য দিয়া স্বদেশকে চিনিয়াছেন। ইহা একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা।

রবীন্দ্রনাথের ছিল মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ। তাই কবি মানুষের জয়গান গাহিয়াছেন, কেননা, মানুষ সৃজনধর্মী, মানুষ মননশীল, জ্ঞানে, কর্মে, চিন্তায় ক্রমাগত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়াই মানুষের ধর্ম। মানুষ নিত্য নূতন জ্ঞান আহরণ করে, অজানাকে জানিবার জন্য, অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করিবার জন্য, প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য মানুষের মনে আছে এক সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা। গ্রীসের প্রমিথিউসের মত মানুষ নিয়তির শৃঙ্খলকে ছিন্ন করিতে চায়, নিয়তির কাছে নতি স্বীকার না করিয়া আপন ভাগ্য আপনি গড়িতে চায়। মানুষের এই সাধনা পৌরুষেরই সাধনা। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের এই সাধনা কবিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে।

আমাদের জাতীয় জীবনে যে জড়তার অজগর পুঞ্জীভূত হইয়াছে, কবি তাহাকে অপসারিত করিতে চাহিয়াছেন। মানুষের প্রতি মানুষের সাধনা কবির চিত্তকে বেদনায় ব্যথিত করিলেও তিনি

ইহাকে চিরন্তন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি চিরকাল সর্বপ্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রোমেক্ ম্যাটসিনি যেমন বলিয়াছেন—

'Whenever you see corruption by your side and do not strive against it, you thereby betray your duty'

রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলিয়াছেন—

'অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে'।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইবার শক্তি ও সাহস যদি আমরা অর্জন না করি, তবে কি রবীন্দ্রনাথের শত-বার্ষিকী উৎসব ব্যর্থ হইয়া যাইবে না?

'নৈবেদ্যে'র একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রার্থনা জানাইতেছেন -

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন অঙ্গনতলে দিবস-শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত'।

মানুষের মধ্যে আর একটি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, উহা দূরের সঙ্গে মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা। মানুষের মধ্যে জাগিয়া আছে এই চিরন্তন বিরহ। এই বিরহের কথা বলিয়াছেন পারস্যের কবি জালাল-উদ্দীন রুমি ও ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—আমার কাব্যের একটি মাত্র মূল সুর আছে। সেটি সীমা ও অসীমের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কথাই আমি বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিয়াছি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের সহিত পাশ্চাত্যের হিউম্যানিজমের পার্থক্য। ধ্যানযোগে বিরাটের সঙ্গে মিলিত হইবার এই যে সাধনা, ইহা শান্তরসের সাধনা। এই সাধনায় তিনি দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে। মধ্য যুগের 'মরমিয়া' সাধকগণও

রবীন্দ্রনাথের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সাধক কবি দাদুর বাণীই যেন প্রতিধ্বনিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'আবর্তন' কবিতায়—

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
　　গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে,
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
　　ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
　　রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
　　সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
　　ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
　　মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'

স্মরণীয় ত্রিকথা

রবীন্দ্র-শতাব্দী উপলক্ষ্যে আমাদের তিনটি কথা বিশেষ স্মরণীয়।

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সমকালীন চিন্তাধারা ও পারিবারিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে কবি-প্রতিভার বিরাটত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব না। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথে কি রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের পরিবেশ তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশে কতটা সহায়তা করিয়াছিল, সমকালীন মনীষীদের চিন্তাধারার দ্বারা তিনি কতটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, বাংলার বরেণ্য সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁহার কোথায় সাদৃশ্য ও কোথায় পার্থক্য ছিল, তাঁহার কবি-মানসের ক্রমবিকাশে কতখানি ভারতীয় ও কতখানি পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ছিল, তাঁহার সমাজ-চিন্তা, রাষ্ট্র-চিন্তা, শিক্ষা-দর্শন প্রভৃতি তাঁহার জীবিতকালের ঘটনা-পুঞ্জের দ্বারা কতটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ রূপে জানিতে পারিব। রবীন্দ্র-প্রতিভা বিরাট ও বিশ্বতোমুখী বলিয়াই একটা শতাব্দীর ভাবধারা তাঁহার মধ্যে সংহত হইয়াছিল, তাই শতাব্দীর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচার করিতে হইলে আমাদের সম্যক দৃষ্টির প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু খণ্ড সত্য আছে, সেগুলিকে আমরা যদি পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচার করি, তবে অপরের বুদ্ধিভেদ ঘটাইব। রবীন্দ্রনাথ রিয়ালিষ্ট, রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক, রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক প্রভৃতি কথাগুলি যেমন কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খণ্ডিত সত্য, তেমনি রবীন্দ্রনাথ হিউম্যানিষ্ট, রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ-প্রেমিক, রবীন্দ্রনাথ জীবনরসরসিক, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানী প্রভৃতি উক্তিগুলিও মনস্বী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অর্দ্ধ সত্য। কবির প্রতি সব চেয়ে গুরুতর

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ।

প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন, তার সঙ্গী ছিল সুরেলা কথা আর ছন্দিত নাচ। এগুলি মুখ্যতঃ স্বদেশী যাত্রাভিনয় এবং সাগরপারের অপেরার মিশ্রণে অভিজাত সৃষ্টি। কবির মূল লক্ষ্য ছিল—নাচ নয়, গান; সুর দিয়ে তাই তিনি নিত্য নতুন ও দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেছিলেন—'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা'য়। নৃত্যনাট্য তিনি লিখেছিলেন—শেষ জীবনে, ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এগুলির মধ্যে ব্যালে এবং মাত্র জাতীয় বিদেশী নৃত্যকলার আভাষ অনেকে পান। তবু এগুলি স্বরূপতঃ রাবীন্দ্রিক, নাচ-গান-কথা সব মিলিয়ে এক অভিনব সৃষ্টি।

অভিনব হলেও হঠাৎ-সৃষ্টি নয়। দীর্ঘ সাত বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তবে তিনি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যের রাজ্যে উপনীত হয়েছিলেন। কালানুক্রমিক সূচীতেই তথ্যটি পাওয়া যায়। ১৯২৬-এ 'পূজারিণী' কবিতার সঙ্গে নাচ যোগ করে হল 'মণীর পূজা'; নাটকীয়তা থাকলেও একে 'নৃত্য-কাব্য' বলাই সঙ্গত। পরের বছর লিখলেন 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'। এখানে নাচের ভূমিকা বড়ো হলেও গানের প্রাধান্য অনেক বেশি এবং নাটকীয়তা অনুপস্থিত। ১৯৩১-এ 'শাপমোচন' এবং 'শিশুতীর্থ' কবিতা দুটি এল নাচের রাজ্যে। দৃশ্য-বিভাগ করা হল নাটকীয় ভঙ্গীতে, সে সুযোগ এখানে বিদ্যমান। প্রথমটিতে পাই গল্প, দ্বিতীয়টিতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গতিমুখর চিত্র। তবু এরাও পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য নয়, তার দেখা পাওয়া গেল পরবর্তী রচনায়—'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬) এবং 'শ্যামা' (১৯৩৯)। তাসের দেশ ছাড়া বাকি তিনটিই প্রাচীন কাহিনী থেকে গৃহীত এবং রূপান্তরিত হয়েছে। সে রূপান্তর সুন্দরের অভিমুখে, যার ফলে প্রথম অভিনয়-রজনী থেকে আজও পর্যন্ত এগুলির আবেদন আমাদের কাছে সমান ও অপরিসীম রয়ে গেছে।

শিল্পী সৃষ্টি করলেন তাঁর শিল্পকে দুর্লভ প্রতিভার সোনা-স্পর্শে, দর্শক-শ্রোতা-পাঠক তা দেখে-শুনে-পড়ে তৃপ্ত হল, রসবিমুগ্ধ হল, আবারও দেখার জন্যে উন্মুখ হল। শিল্পের ইতিবৃত্ত শুধু এইটুকু নয়, তার পেছনে আরও অনেক কার্য-কারণ বিদ্যমান। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ আকাশচারী সৌন্দর্যের উপকরণ রচনাতেই নিঃসেবিত-প্রতিভা নন; সচেতন অথবা অবচেতনে তাঁর প্রতিভা ও শিল্পসৃষ্টির পটভূমিকায় স্বতঃ-বিদ্যমান রয়েছে বাস্তব—পৃথিবীর ইতিহাস এবং তাঁর স্বগত পরিবেশ। এই ইতিহাস ও পরিবেশ তাঁর চিত্তে-চিন্তায় মননে-শিল্পবোধে নানামুখী ছায়া ফেলেছে, কবির ভূমৈব ব্যক্তিত্ব সেই ছায়াকে আত্মস্থ করে ফুটিয়ে তুলেছে কায়ারূপে। অন্যান্য রচনার মতো তাঁর নৃত্যনাট্যগুলিরও উপকরণ এসেছে বাহির-জগত থেকে, মনোজগতের মধুরকরী আলোয় সেই বহিরঙ্গ উপকরণ পরিণত হয়েছে আত্মগত অপরূপ শিল্পে। সত্য উপনীত হয়েছে সুন্দরে। উভয়ের যোগ অক্ষুণ্ণ আছে, তবু আপাতদৃষ্টিতে তা চোখে পড়ে না, মনকে পীড়িত করে না। লৌকিক জগৎ থেকে ভাব-উপাদান গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বজায় রেখেও অলৌকিক মায়াময় রূপলোকের সৃষ্টি—এই বিরল কৃতিত্বেরই অপর নাম প্রতিভা। আলোচ্য নৃত্যনাট্যগুলি সেই প্রতিভার দীপ্ত স্বাক্ষর। এদের আবেদন সর্বজনীন ও সর্বকালীন—শুধু সুন্দর বলে নয়, সত্য তথা বাস্তব

ঘনিষ্ঠ বলেও। সেই ঘনিষ্ঠতার সূত্র খুঁজে না পেলে এদেরও সম্পূর্ণ করে কোনদিন জানা যাবে না। তেমন করে জানতে গেলে আমাদের ডুব দিতে হবে রবীন্দ্র-জীবনীর অতলান্ত গভীরতায়, ছুঁতে হবে তার বিপুল বিচিত্র পরিধি। আমরা তিনটি দিক থেকে অগ্রসর হব—সমকালীন ইতিবৃত্ত, কবির কালানুগ আদর্শ-চেতনা এবং তাঁর মানস-পরিমণ্ডলে নৃত্য-গীত-চিত্রকলার তৎকালীন প্রভাব-প্রতিভাব।

রবীন্দ্র-জীবন বিপুল বৈচিত্র্যে প্রসারিত। তার মধ্যে শেষ পর্বের জটিলতা বিস্ময়কর। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৩—এই চোদ্দ বছরের পরিধিসীমায় কবি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন, বিচিত্র ভাবনার আবর্তে পড়েছেন। এই কয়েক বছরে তিনি দুবার ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন —দেখেছেন তার সমরবিধ্বস্ত রূপ এবং তারই কবরের ওপর একদিকে শান্তির অন্যদিকে নতুনতর যুদ্ধের আয়োজন। তিনি গেছেন সোভিয়েট রাশিয়ায়—লক্ষ্য করেছেন তার নৈরাজ্য জীবন সাধনা, এবং গ্রহণ করেছেন অর্থনৈতিক রূপান্তরের বলিষ্ঠ প্রয়াস। মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ তাঁর চিত্তে দিয়েছে এশিয়ার ঐক্য ও বৃহত্তর ভারতের নতুন ভাবনা। জাপানী রূপসজ্জা তাঁর মনকে বিমুগ্ধ করেছে। এদিকে ঘরের মধ্যেও জটিল যন্ত্রণা। ব্রিটিশ সরকারের প্রশ্রয়ে সাম্প্রদায়িকতার পরিপুষ্টি, আত্মকলহ—শুধু হিন্দু-মুসলমানে নয়, বর্ণহিন্দু ও তপশীলী ভেদবুদ্ধিতেও। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের দস্তুর কামড়, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার বিভ্রান্ত মোহ—দুদিক থেকে ভারতবাসী তখন নিদারুণ মার খাচ্ছে, আর জেলের মধ্যে অসহ অত্যাচার সহ্য করছেন দুপ্ত দেশসাধকগণ। অথচ দেশবাসী সেই অনুপাতে জাগ্রত ও সক্রিয় নয়। ডাক দিয়েছেন তিনি ভারতীয়কে, সর্বপ্রকার অন্যায়-অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে, মনুষ্যত্বের বিচ্যুতিতে ব্যথিত হয়েছেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও দেশকর্মের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে গান্ধীজী, জহরলাল ও নেতাজী বারবার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে। সে প্রেরণা সত্যসন্ধী। দ্বিতীয় গোলটেবিল-বৈঠক ব্যর্থ হল, গান্ধীজী গ্রেফতার হলেন, কবি তার প্রতিবাদে শাসক গোষ্ঠিকে পত্র লিখলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে যারবেদা জেলে গান্ধীজী অনশন করলেন, কবি তাঁকে এবং তাঁর হরিজন-আন্দোলনকে সমর্থন করলেন রচনা ও কর্মের মাধ্যমে। বিশ্বভারতীতে খোলা হল 'সংস্কার-সমিতি', যার মূল লক্ষ্য ছিল—জাতি ও বর্ণভেদের বিলুপ্তি। পুনশ্চ কাব্যের 'মানবপুত্র-শিশুতীর্থ শুচি-প্রথম পূজা-রঙরেজিনী' ইত্যাদি কবিতা এই হরিজন আন্দোলনের অনুগামী। কবির চিত্ত সাধারণ মানুষের সহযাত্রী হয়ে উঠল। বিশুদ্ধ ও ইহবাদী মানবসত্তার নির্মূঢ় প্রকাশ রোমাঁ রোলাঁর আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রে, যেখানে মানুষকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে শুধু মানুষ হিসেবে, যে পত্রে রবীন্দ্রনাথ সর্ব অন্তঃকরণ দিয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই জাতি-ধর্ম-বর্ণহীন মনুষ্যধর্মের আদর্শ সমকালীন রচনায়ও পরিস্ফুট হয়েছে।

কিন্তু কেবলমাত্র মানুষই তো পৃথিবী নয়, মাটি ও প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে সে বাঁচতে পারে না। আলোচ্য পর্বে কবির প্রকৃতি-প্রীতি নতুন রূপ পেয়েছে। প্রকৃতির লীলারঙ্গের সঙ্গে অভেদে তিনি লক্ষ্য করেছেন মানবজীবনের রঙ্গলীলা, উভয়কে নিকটতম সান্নিধ্যে অনুভব করেছেন। তারই ফলে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপন-হলকর্ষণ-বর্ষামঙ্গলের নতুনতর প্রয়োজনা, মাটির ওপর মমত্ববৃত্তির প্রতিরোধ, তারই ফসল 'মহুয়া-বনবাণী-বসন্ত-নবীন-কেতকী-শ্রাবণগাথা' ইত্যাদি। এই বাস্তবদৃষ্টিতে তিনি জীবনকে দেখছেন এখন। তাই রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে দেশের উপযোগী

করে প্রয়োগের কথা ভাবছেন, সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন দিয়েছেন এবং গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে আরও প্রসারিত ও সর্বজনীন করে তোলার চেষ্টা করেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন। সমকালীন প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসেও এই ভাবনা রূপান্তরিত আকারে স্বতঃ বিদ্যমান। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ একদিকে বাংলার লোকসংগীত সংগ্রহে আগ্রহী, অন্যদিকে বিজ্ঞানবুদ্ধির পরিপোষক; অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি যোগসূত্র স্থাপনে রত, আবার সর্বপ্রকার মোহ-বন্ধন-অন্ধতা মোচন করে সামনের দিকে মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। এই প্রসঙ্গে আরও দুটি বিষয় উল্লেখ্য। সমকালীন সাহিত্যে ও জীবনে যৌন-উন্মাদনার জোয়ার তখন উচ্ছ্বসিত; কবি তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন সংযত শ্রীময়ী প্রেমের বাণী নিয়ে। এই নীতি ও রুচির সপক্ষে সংগ্রামের পরিচয় নানাভাবে ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনাবলীতে, আন্তর্জাতিক মহিলা-সংঘকে লেখা চিঠিতে। দ্বিতীয়তঃ তিরিশের দশকে শান্তিনিকেতনে খোলা হল নারী বিভাগ, গার্ল গাইডের শাখা 'সহায়িকা' এবং মিশ্র-অভিনয়ের ধারা প্রবর্তিত হল। নারীকে কবি নিয়ে এলেন পুরুষের পাশে। তপতী-বাসরী-মহুয়া-রক্তকরবী ইত্যাদি তার সৈন্দিক স্বাক্ষরলিপি, চিন্তার সাক্ষ্য আছে প্রবন্ধে।

এই এলোমেলো বিচিত্র ঘূর্ণাবর্ত থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আহরণ করলে দেখি, দীর্ঘ চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে কবির সামনে এসেছে নানা সমস্যা। সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি দেখছেন বেসুর-বেতাল অসংগতি ও তার-অসহ্য অসংযম, লোভ ও হীনতা। স্বদেশে দেখছেন—নিষ্ক্রিয়তা, জড়ত্ব, অন্ধ সংস্কারমোহ, সম্প্রদায় ও বর্ণবিভেদের চেতনা, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক কারিগরিযোগের অভাব, নীতি-বিরোধিতা এবং উপনিবেশের পক্ষে যা স্বাভাবিক, সেই শোষকের নির্মম অত্যাচার। বেদনার্ত কবি জিজ্ঞাসা রেখেছেন মানুষের সামনে 'প্রশ্ন' কবিতায়, 'মুক্তধারা' নাটকে; ইতিহাসের অমোঘ পরিণতির ছবি দেখিয়েছেন 'কালের যাত্রা'য়; নিজেকে 'ব্রাত্য' বলে ঘোষণা করেছেন; প্রচার করেছেন 'মানুষের ধর্ম'; এবং সব মিলিয়ে মানুষের-জীবনের-মাটির বস্তুসম্মত ও শিল্পসম্মত এক অধিতীয়-অপরূপ ছবি এঁকেছেন 'পৃথিবী' কবিতায়। সমগ্র ইতিহাসের পটভূমিকায় মানবের অগ্রগতি, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে সার্বিক মুক্তি—এইই তাঁর কাম্য। এবং সেই কামনার পরিপূর্তি অনুভব করেছেন 'রুদ্রের আহ্বান ও আশীর্বাদ'এর মধ্যে।

সমকালীন জীবনের এই স্রোতাবর্ত এবং তাদের ঘিরে কবির বিবর্তিত ভাবনা—এই পটভূমিকে না জানলে নৃত্যনাট্যগুলির ভূমিকা সম্যক্ বোঝা যাবে না। কারণ এই পশ্চাৎপটের প্রেক্ষণীতেই এগুলি জীবন্ত—সত্যের ভিত্তিতেই এরা সুন্দর এবং সেই সুন্দরের সহযোগী মহৎ আদর্শ। নটীর পূজা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নৈতিকতা এবং শোষক শ্রেণীর নিষ্ঠুরতার ও অভিজাতশ্রেণীর ঔদাসীন্যের প্রতিচিত্র; নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় কবির বিশ্ব-সংগতিবোধ পরিস্ফুট, যাকে কবি চাইছেন তাৎকালিক পৃথিবীর বিপর্যস্ত জীবনের মাঝখানে; শিশুতীর্থ শ্রীষ্টের জন্মকাহিনীসূত্রে ইতিহাসের রূপ-রেখা-পরিণাম নির্ণয়, যেখানে মানুষই মানুষের পরিত্রাতা; সুন্দর ও সুশ্রী রূপসৃষ্টির এবং সুস্থ যৌন-নীতির ফসল শাপমোচন; তাসের দেশ স্বদেশবাসীর সনাতন-পন্থা ও অসুন্দর জড়ত্বের প্রতি-বিদ্রূপ; চণ্ডালিকা গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের হরিজন-আন্দোলনের সহায়িকা; চিত্রাঙ্গদা নবজাগ্রত নারীধর্মের প্রলিপ্ত চিত্র; যেখানে নারী পুরুষের নর্মসহচরীমাত্র নয়, বীর্যবতী কর্মসহচরী; এবং যৌন-উন্মাদনায় উচ্ছৃংখল মানুষের অসংযমের পরিণাম-ব্যথিত চিত্র—শ্যামা।

এই আদর্শ নৃত্যনাট্যগুলিতে রূপায়িত হয়েছে কাহিনী চরিত্র ও পরিণতির বিবর্তন বিশ্লেষণ মাধ্যমে। স্বনামখ্যাতা 'পূজারিনী' কবিতায় নৃত্যরত নটীর পূজায় রাজার নির্মমতা এবং রাজপুরনারী ও পুরবাসীদের ভীতিবিহ্বল ঔদাসীন্যের বিপরীতে শ্রীমতীর আদর্শ-নিষ্ঠা ও একাগ্র চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং আত্মদান ফুটে উঠেছে। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় কবি বন্দনা করেছেন বিশ্বপ্রকৃতিকে, যেখানে আছে নিয়ম, নীতি, ছন্দ এবং ধ্বংস মাধ্যমে নবজন্মের কথা। শিশুতীর্থে তাঁর বক্তব্য : যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের শোভাযাত্রা চলেছে পৃথিবীর বুকে নতুন সমাজ রচনার আন্তরিক আকাংক্ষায়; তার চলার পথে কতো প্রলোভন, স্বার্থবোধ, হিংসা, ঈর্ষা, দলাদলি, লুণ্ঠন, হত্যা, অবশেষে অনেক উঁচু-নীচু পেরিয়ে মানুষ পৌঁছল প্রেমের ও শক্তির তীর্থে, নবজাতক মানুষেরই দ্বারদেশে; ঘোষণা করল : 'জয় ঐ মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের'। শাপমোচনে বললেন : যে দেখতে ও অনুভব করতে জানে, অসুন্দরের মধ্যেও সে সুন্দরকে দেখে, দেহের দেহলীতেই স্পর্শ করে মনকে; সেই দর্শন ও অনুভব সংযত ও সমৃদ্ধ, তাই সত্য। তাদের দেশ নিয়মের রাজত্ব, নিষ্প্রাণ-নিরর্থক-নিরাবেগ এবং নঙর্থক নিয়মের বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা; বিদেশী রাজপুত্রের আবির্ভাবে সেই নিয়ম ভাঙলো, যারা ছিল পুতুল, তারা হল মানুষ এবং প্রথম ঘুম ভাঙলো নারীসমাজেরই (উৎসর্গপত্রে নেতাজীকে উদ্দেশ্য করে কবি তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে দিয়েছেন)। চিত্রাঙ্গদা সনাতন পন্থায় ললিতকোমল রূপের আকর্ষণে বীরের মন পেতে চেয়েছিল, তাই পেল ক্লান্তি ও প্রত্যাখ্যান; প্রত্যাখ্যাতা আত্মসচেতনা নারী স্বরূপে জেগে উঠল, রাজেন্দ্রাণী হয়ে, 'একাধারে মিলিত পুরুষ ও নারী'-রূপে, শুধু প্রেম নয়, শক্তি নিয়েও; তখনই অর্জুন তাকে গ্রহণ করল, দুজনে মিলে শুরু হল জীবন-প্রবর্তিণ, কল্পনায় স্বর্গ রচনা নয়, বাস্তবে পদচারণা। শ্যামাও বিভ্রান্ত; কামের উত্তেজনার ভালোবাসার ফুল ফোটাতে চেয়েছিল নীতিবিহীন অন্যায়ের বৃন্তে; চিত্রাঙ্গদা ভুল করেছিল, শ্যামা অন্যায় করেছিল, চিত্রাঙ্গদা আত্মশোধন করেছিল, শ্যামা সংশোধন করেনি; তাই তার পরিণতি ট্র্যাজেডিতে। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি সমাজের কাছে পেয়ে এসেছে ঘৃণা-অবহেলা-দুরত্ব; বুদ্ধশিষ্য আনন্দ তার হাতে জল পান করে সরিয়ে দিল সেই ব্যথা, তার আপন মহিমাকে জাগিয়ে দিল; কিন্তু এই জাগরণ বাইরে থেকে হলেই হয় না, ভেতর থেকেও জাগা দরকার; তার অভাবে চণ্ডালিকা কামনা করল আনন্দকে, জাদুকরী মাকে দিয়ে তাকে আকর্ষণ করল; অবশেষে সে বুঝতে পারল নিজের ভুল বিধ্বস্ত প্রিয়তমকে দেখে, তখনই তার আত্মসংশোধন ও আত্মসাক্ষাৎকার ঘটল। যে নিচে পড়ে আছে, সমাজ তাকে দেবে অবাধ স্বাধীনতা ও অধিকার; তাকে নিজেকেও অর্জন করতে হবে ওই অধিকার ও স্বাধীনতা, ওপরে ওঠার শক্তি এবং এগিয়ে চলার শিক্ষা; বাহির-জগৎ দেবে পথ, তার ওপর পা ফেলে চলতে হবে নিজেকেই নিজেরই জোরে। সমাজের তথাকথিত শূদ্রদের সম্বন্ধে যেমন, তেমনি নারী সম্পর্কেও এসত্য সমভাবে প্রযোজ্য—যোগন বাইরে থেকে, উদ্বোধন অন্তর থেকে। নৃত্যনাট্যগুলিতে জীবনের এই বাহির-ভেতরের অসংগতি (যা সর্বত্র বর্তমান) এবং সামঞ্জস্য (যা সর্বকালে প্রয়োজন) ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

শেষতঃ নৃত্যনাট্যগুলি বিচার কর্মের দিক থেকেও। নট-নটী-নৃত্যকলার আদর ধ্রুপদী যুগে ছিল, আধুনিককালে এরা অপাংক্তেয় হয়ে একপাশে পড়ে ছিল, অভিজাত আসরে পরিবেষণের অনুমতি পেলেও আসনের আভিজাত্য পায়নি। কবি নাচকে ভদ্রসমাজে নিয়ে এলেন, যার প্রতিফলন

আজ ব্যাপক। আলোচ্য পর্বের শুরু থেকেই শান্তিনিকেতনে নাচের আসর জমতে থাকে: মণিপুরী, কথাকলি, ভরতনাট্যম্ এবং কাথিওয়াড় ও অন্যান্য প্রান্তের নৃত্যশিল্প। কিশোর রবীন্দ্রনাথ বিলেতে নাচ শিখেছিলেন, প্রৌঢ়-রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় নৃত্যকলার (অভিজাত ও লোকায়ত দুইই) সঙ্গে সংঘর্ষিতা অনুভব করলেন। অপিচ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং সিংহলের বিশিষ্ট নৃত্যকলাও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। নাচের মধ্যে তিনি দেখলেন আনন্দ ও শক্তির, একক-ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টি-মনের অপূর্ব অভিপ্রকাশ। দার্জিলিঙে কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে শ্রীমতী ঠাকুরের নাচ এবং শান্তিনিকেতনে উদয়শংকরের নৃত্য-প্রদর্শনী তাঁর চিত্তকে এই শিল্পের দিকে আরও বেশি করে টেনে নিয়ে গেল। মনে মনে এই নতুন পথে চলার যে তাগিদ তিনি অনুভব করছিলেন এবং ইতিপূর্বে-লেখা নৃত্য-কবিতা ও গীতি-নৃত্যে যার আভাস দিয়েছিলেন, রূপক-নাট্যে যার প্রকাশ ঘটেছিল কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে, তা বিকশিত হল পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যের সমাহারে। যে-আদর্শ ও বক্তব্য প্রবন্ধে-নাটকে-গল্পে-কবিতায়, সেই কথা এখানেও—এর আবেদন সর্বজনীন, স্পষ্ট ও দীপ্ত।

নৃত্যনাট্যগুলির ঐতিহাসিক পটভূমিকা একপক্ষে বহিরঙ্গ—যেখানে সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্র-মানুষ-মন-চিন্তার আবর্তন এবং তাদের কেন্দ্র করে কবির মহৎ বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা। এর অন্যপক্ষ অন্তরঙ্গ—যেখানে রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিগত শিল্পী-সত্তা, আন্তরচৈতন্য ও তজ্জাত অবচেতন প্রকাশকলা। শিল্পীর আনন্দ প্রকাশে, স্বগত ভাব অনুযায়ী তিনি ভঙ্গি নির্বাচন করেন; শিল্পী-প্রতিভার পরিধি যতো বড়ো ও বিচিত্র, তার প্রকাশভঙ্গিও ততো ব্যাপক ও বিবিধ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পরিধি-বিহীন, তাই শিল্পের নানাদিকে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। নৃত্যকলাও তেমনি তাঁর অন্যতম মাধ্যম, যার সাহায্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, যেখানে আত্মবিকাশের নতুন এক পথ দেখেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন: আলোচ্য পর্বে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল—ছবি আর গান, রেখা আর ধ্বনি। নাচের মধ্যে দুটোই এসে মিলেছে. গীতিকার ও চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ সমন্বিত হয়েছেন নৃত্যনাট্যকার রবীন্দ্রনাথে। এই সময়ে ছবি ও কবিতা-গান ঘনিষ্ঠতম, অনেক ক্ষেত্রে একটি অপরের পরিপূরক; নৃত্যকলা তাতে দিল পূর্ণতা। একদিন যেমন গান নিয়ে, আরদিন যেমন ছবি নিয়ে, আর একদিন তেমনি নাচ নিয়ে মেতে উঠলেন তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষায়—মহড়ার সময়ে কেবলই রদবদল করছেন পাণ্ডুলিপিকে, নাচ-কথা-গান-অভিনয়কে নিখুঁত করে তুলছেন ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে বারবার। কুশীলবের পরিচ্ছদেও অভিনবত্ব আনলেন ভারতীয় রীতির সঙ্গে দীপময় ভারত-রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। রঙ্গমঞ্চের পিঠ থেকে দৃশ্যপটের উপদ্রব তুলে দিলেন, নিয়ে এলেন নতুনতর প্রতীকী মঞ্চ-স্থাপত্য, সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় যা রসসমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'রূপরাজ্যের কলা ছবি, অরূপ রাজ্যের কলা গান।' তাঁর নৃত্যনাট্য রূপ-অরূপের সুষম সমন্বয়। তার সুর-শ্রীমতী কথা, গানের উচ্ছল সমারোহ, তালে-লয়ে নাচের বিবিধ মুদ্রা ও রেখা এবং একক ও সমবেত দেহের চলনে-বলনে ফুটে ওঠে এক একটা ছবি। গান আলাদা, ছবি আলাদা; নৃত্যনাট্যকার তাদের দেশ-জামা-চওালিকায় একই সঙ্গে উপভোগ করেছেন ছবি আর গান (কণ্ঠ ও যন্ত্র দুইই)। আবার, এরই মধ্যে আছে গল্প, নাটক ও কবিতা। সব মিলিয়ে কবি যে শিল্প রচনা করলেন, তা অপেরা-ব্যালে-গীতাভিনয়-যাত্রা-কিছেলকো নয়, এক নতুন এবং স্বতন্ত্র

রাবীন্দ্রিক শিল্প। তার সাদৃশ্য যদি কোথাও খুঁজতে চাই তো মিলবে আদিম মানুষের জাদু-কৃত্যাভিনয়ের মধ্যে, যেখানে শিল্পের সব শাখাই এক আধারে জাত ও পরিবেষিত, যেখানে মানুষ সমষ্টি-মনা। বলা বাহুল্য, দুয়ের মাঝে হাজার-হাজার বছরের এবং সৃজনী প্রতিভার দুস্তর ব্যবধান। তবু তাঁর ছবির (এবং ভাষার ইমেজের) মতো তাঁর এই নৃত্যনাট্যেও বিদগ্ধ রসিকচিত্ত খুঁজে পাবে —আধুনিক শিল্পে প্রিমিটিভ কলার সার্থকতম প্রয়োগ-প্রতিমা। নটরাজ-শিল্প রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতম প্রকাশবাহন নৃত্যনাট্য, একথা হয়তো অত্যুক্তি বলে মনে হবে। কিন্তু তাঁর গানের পরেই যে এদের দ্বিতীয় স্থান, এ সিদ্ধান্তের বিপরীত মন্তব্য বা ভিন্নতর মনোনয়ন অসম্ভব সাধনা।

অসম্ভব যে, তার প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায় নৃত্যনাট্যগুলির প্রত্যয় ও প্রকরণ, বক্তব্য ও শিল্পরূপ যথাবিহিত বিশ্লেষণ করলে। পরবর্তী কয়েকটি নিবন্ধে আমরা সেই চেষ্টা করব বিস্তৃতভাবে। শুধু পরিচয়িকাটুকুই বর্তমানে বক্তব্য।

গুরুদাস ভট্টাচার্য

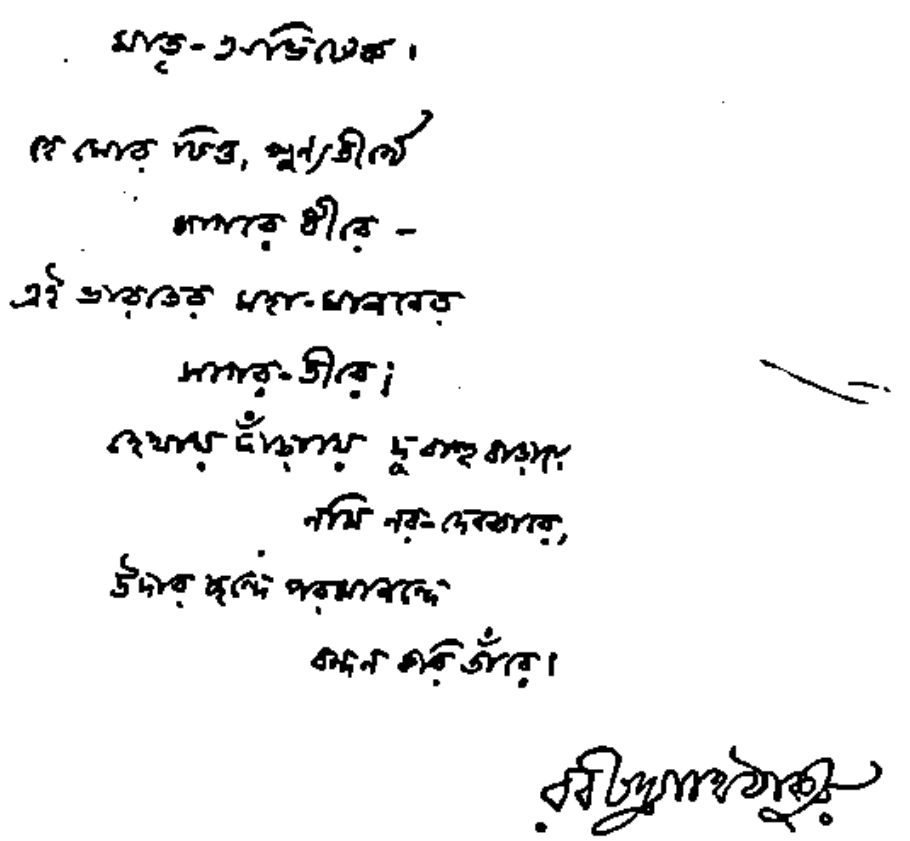

প্রত্যভিনন্দন

বেদান্তশাস্ত্রবিদ্ বন্দীদাসের প্রতি

বিশ্বাসীদের শঙ্কা দিল অন্তরালের রহিল বন্ধন।
সিদ্ধান্তে বিরোধ সাঁঝে, সংগীত না থামিল ক্ষণিক।

সোনালির রঙ্গ হোতে
উষ্ণীষের উর্দ্ধ স্রোতে
বন্দী সবি উদ্ধারিল সাদোস্কের কী অভিনন্দন॥

ধূসরিমার ভিতি ভেদি' অন্তর আকাশে দিল আসি'
সুমসুখে থাকি রথে সাতার খুসির মন্ত্র বাণী।

মহাকাল কণ্ঠালীর
কী রব শুনিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে ফিরাইল অমর্ত্য নরের অভিলাষী॥

'অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা শুনালো বিস্ময়!
আত্মবিসর্জন করি' সাধনারে কে দানিল সফল:

ভৈরবের আনন্দের
ফুরোল দিবিল কে রে,
বন্দীর মৃত্যুসন্ধানে ধূসরে কে দিল পরিচয়॥

১৩ পৌষ
২৩৮

শ্রীরবিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ—স্বদেশী—বয়কট ॥

স্বদেশী ছদ্মনামে বঙ্গদেশে যে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের দান অসাধারণ। তাহার কারণ যে ছিল না, তাহা নহে। তাঁহার মৌলিক স্বদেশপ্রীতি যে উৎস হইতে উদ্গত—তাহা তাঁহার পিতৃদেবের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিকে জাগিয়েছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিরুদ্ধের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়াছিল। বস্তুত, সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে যাহারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

মনে রাখিতে হইবে, দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ইংরেজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন—তাহার সব কাজই ইংরেজীতে হইত। ম্যাক্সমূলার তাঁহার একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—ঐ পত্রের ভাষা এত উৎকর্ষ-পরিচায়ক যে, একটি শব্দও পরিবর্তিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। ম্যাক্সমূলার ইংরেজদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"Yet how many people are there even among members of the Indian Civil Service, who could look upon this man as their equal, not to say, as their better?" বলা বাহুল্য তিনি ঐ সকল লোকের বহু উর্দ্ধে ছিলেন।

যাঁহাকে "ন্যাশনাল নবগোপাল" বলা হইত—সেই নবগোপাল মিত্রকে সাহায্য করিয়া দেবেন্দ্রনাথ "হিন্দুমেলা" প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। জাতীয়তাবাদ প্রচার সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। সেই মেলায় বালক রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস জাতির রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হয়। রবীন্দ্রনাথের ভগিনীপতি (স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী) জানকীনাথ ঘোষাল, তাহার সম্পাদকের কার্যে, প্রতিষ্ঠাতা হিউমের সহকর্মী ছিলেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হয়। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন,—"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।" রবীন্দ্রনাথই কংগ্রেসের এক পরবর্তী অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র গান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে প্রতিনিধিদিগের সম্বর্ধনার জন্য তাঁহার রচিত গান—"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।" বালগঙ্গাধর তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে—বোম্বাই শহরে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য উপযুক্ত ব্যবহারাজীবী না পাওয়ায় যখন কলিকাতা হইতে ব্যারিস্টার পাঠান হয়, তখন যাঁহারা সে জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন।

লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে যখন বাঙ্গলায় স্বদেশী নামে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ সে প্রস্তাবের প্রতিবাদে অগ্রণী হইয়া আসিয়াছিলেন। বিদেশী শাসক বাঙ্গালীদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, এই সঙ্কল্প লইয়া যে "রাখী-বন্ধন" অনুষ্ঠান হয়, তিনি তাহার জন্য যে সব রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল সেই সময়ের জন্য নহে—তাহা সর্বকালের উপযোগী। তখন রবীন্দ্রনাথ গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে—বাঙ্গালীর দেশপ্রেম প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য অরবিন্দ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"A poet of sweetness and love, who has done much to awaken Bengal."

"বয়কট" অর্থাৎ বিদেশী পণ্য বর্জন স্বদেশী আন্দোলনে অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। প্রথমে উহা প্রকাশ পায় নাই বটে, কিন্তু ঐ অস্ত্রেই বাঙ্গালী বিদেশী শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিল। বালগঙ্গাধর তিলক উহাকে বলিতেন—বিলাতী "বহিষ্কার।" ওই "বয়কট" যখন সপ্রকাশ হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহা ঘৃণাব্যঞ্জক—এই কথা বলিয়া আন্দোলন হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন।

সে সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা বলিবার পূর্বে "বয়কট" কি ও কিরূপে উদ্ভূত হয়, তাহা বলা প্রয়োজন। উহার উদ্ভব আয়ার্ল্যাণ্ডে। তখন আয়ার্ল্যাণ্ড (ভারতবর্ষেরই মত) ইংরেজের অধীন। ইংরেজ জমিদাররা আইরিশ প্রজাদিগকে "উচ্ছেদ" করিয়া সেই জমি অধিক খাজনায় বিলি করিতে থাকেন। আত্মরক্ষার প্রয়োচনায় প্রজারা সংঘবদ্ধ হয়। তাহাদিগের এক সভায় আইরিশ রাজনীতিক পার্ণেল বলেন—যদি কোন আইরিশ জমি হইতে উচ্ছেদ হইলে সেই জমি আর একজন আইরিশ লয়, তবে কি করা হইবে? শ্রোতাদিগের মধ্যে একজন বলেন—তাহাকে গুলি করিয়া মারিব। তাহাতে পার্ণেল বলেন, না—তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশের অন্য উপায় অবলম্বন করা ভাল—You must show him on the roadside when you meet him. You must show him in the streets of the town. You must show him at the shop-counter, in the fair and in the market place and even in the house of worship"—যেন সে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত—অস্পৃশ্য। এক মাস যাইতে না যাইতে জমিদার আর্ল অব আর্ণের প্রজারা তাঁহার কর্মচারী ক্যাপ্টেন বয়কট সম্বন্ধে সেই ব্যবহার আরম্ভ করে। তাহারা বুঝাইয়া ও ভয় দেখাইয়া, ক্যাপ্টেন বয়কটের কাছে ভৃত্যরা চলিয়া যায় এমন করে এমন অবস্থা হয় যে, ধোপা তাঁহার কাপড় কাচিতে অস্বীকার করে, নাপিত তাঁহার ঘোড়ার নাল বাঁধা বন্ধ করে। রুটিওয়ালা তাঁহাকে রুটি দেওয়া বন্ধ করে ইত্যাদি"—No one would save his crops. No one would drive his car. The smith would not shoe his horses, the laundress would not wash for him, the grocer would not supply him with goods, even the post boy was warned not to deliever his letter." সরকার সেনাদল দিয়া লোক পাঠাইয়া ক্যাপ্টেন বয়কটের ফসল তুলা ব্যবস্থা তুলাইয়াছিলেন। পার্ণেল হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন, একটি ফসলের জন্য যত আনা খরচ হইয়াছিল! ব্যবস্থাটির কি নাম দেওয়া যায় একজন সাংবাদিক তাহা জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলেন—"বয়কট"। ইহা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। এই নাম কয় বৎসর পরে ইংরাজী অভিধানে স্থান পায়।

বাঙ্গলায় একটি কথা আছে "ধর্মঘট"। তাহার উৎপত্তি প্রতিবাদে। মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার পৈত্রিক বাসগ্রাম ভদ্রপুরে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব করিতেন এবং সেই উপলক্ষে

গ্রামবাসীদিগকে এক একখানি বস্ত্র দিতেন। সেই গ্রামের ও অঞ্চলের তন্তুবায়গণ সেই বস্ত্র বয়ন করিত। একবার তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তি বলেন, তাঁহার মত লোকের পক্ষে গ্রামবাসীদিগকে এই সাধারণ কাপড় দেওয়া সঙ্গত নহে। তিনি শান্তিপুরে মিহি কাপড় দিবার ব্যবস্থা করেন। নন্দকুমার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এদিকে তন্তুবায়গণ একটি ঘটে গঙ্গাজল ভরিয়া তাহা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল তাহারা পূজার নন্দকুমারের গৃহে যাইবে না এবং পরস্পরকে সাহায্য করিবে। তাহার পরে তাহারা সেই ঘট মস্তকে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া তন্তুবায়দিগকে ঐ প্রতিজ্ঞা করাইল। নন্দকুমারের লোক যখন টাকা লইয়া শান্তিপুরে তন্তুবায়দিগকে দাদন দিতে গেল, তখন শান্তিপুরের তন্তুবায়রা ওই প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া টাকা লইতে অস্বীকার করিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া মহারাজা নন্দকুমার স্থানীয় তন্তুবায়দিগকেই পূর্ববৎ বস্ত্রবয়নের ভার দিলেন। ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ ছিল।

বয়কট সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব ছিল না। কিন্তু প্রয়োজনেই বাঙ্গালীরা বয়কট অবলম্বন করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কথায় অরবিন্দ বলেন—তিনি আপনার অনুসৃত যে আদর্শ সকলকে গ্রহণ করিতে বলেন, তাহা সম্ভব নহে। "The saintliness of spirit which he would see brought into politics is a reflex of his own personality colouring the political ideas of a sattwic race."

অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে বলেন—বয়কট কি সত্য সত্যই হিংসার বিকাশ? ইহা আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ। যাহাকে ধীরে ধীরে হত্যা করা হইতেছে, সে যদি অত্যাচারীকে আঘাত করে, তাহা কি অন্যায় বলা যায়? "বয়কট" দ্বারা আতঙ্ক বলিয়া বর্জন করা—ওই ব্যক্তির হত্যাকারীকে, যে অস্ত্র পায় তাহাই লইয়া, আক্রমণ করিতে বিরত হইতে বলাও তাহাই। Doubtless the self-defender is not precisely actuated by a feeling of holy sweetness towards his assilant: but to expect so much from human nature is impracticable."

রবীন্দ্রনাথ যে স্বয়ং দেশমাতৃকাকে বলিয়াছিলেন—

"যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে।"

—তাহাতে কি প্রেমের বিকাশ ছিল? তিনি যে দেশমাতৃকার বর্ণনায় বলিয়াছিলেন—মা বাঙ্গালাদেশের হস্তে অকল্পরূপে বাহির হইয়াছেন—"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে"—সে খড়্গ কি বালকের খেলিবার খড়্গ? না তাহা খরশান অস্ত্র?

এ বিষয়ে দুইজন মনীষীর মত আমরা উদ্ধৃত করিতেছি -

(১) বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

(ক) অহিংসা পরম ধর্ম, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ধর্ম প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম। নচেৎ হিংসাচারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম নহে বরং পরম ধর্ম।"

(খ) আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধও ধর্ম; আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম। আমরা বাঙ্গালী জাতি, আজি শত শত বৎসর সেই অধর্মের ফল ভোগ করিতেছি।"

(২) স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"অহিংসা ঠিক, নির্জ্জের বড় কথা; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলেছেন, তুমি সেরপ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তবে তুমি পাপ করবে। • • অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ—দুর্বলের পক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।"

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, আয়ার্ল্যাণ্ডে বয়কট অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে বাঙ্গলার একজন মনীষী ইংলণ্ডের পণ্য বর্জন করিতে—ভারতীয়দিগকে বলিয়াছিল—সে আত্মরক্ষার্থ।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন মল্লিক—বাঙ্গলার বাণিজ্য সম্বন্ধে তিন খণ্ডে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। মল্লিক মহাশয় কিছুদিন ভারত সরকারের দপ্তরে চাকরি করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন—ব্রিটিশ শাসনে ভারতের বাণিজ্য দিন দিন বিস্তারলাভ করিতেছে। দেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইতেছে। তিনি ওই পুস্তক কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রয়োচনায় রচনা করিয়াছিলেন কি না জানিবার উপায় নাই। পুস্তকখানি বহু তথ্যপূর্ণ ছিল। ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া "মুখার্জ্জীজ ম্যাগাজিন" পত্রে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভোলানাথবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জ্জন করেন। তিনি এ সম্বন্ধে শাসক ইংরেজ জাতির অবলম্বিত নীতির নিন্দা করিয়া লিখেন—

"It may be summarised as a policy wholly and purely of interest, and not of duty. At first prohibitive, next aggressive, then suppressive, it has at last become repressive—setting bounds to native ambition for anything approaching commercial rivalry."

ইতিহাস যে ইহাই প্রমাণ করে, তাহা বলা বাহুল্য। ভারতবাসীর পূজাপার্বণেও বিলাতী পণ্য ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া ভোলানাথবাবু বলেন—

দৈহিক বল প্রয়োগ না করিয়া, রাজশক্তির কোনরূপ বিরোধিতা না করিয়া, আইনের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া—(অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) আমাদিগের প্রনষ্ট গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের করায়ত্ত। আমাদিগের এই চরম অবস্থায় আমাদিগের ব্যবহার্য একমাত্র অস্ত্র নৈতিক বিরোধিতা অবলম্বন করা কোনরূপ অপরাধ নহে। "আসুন আমরা বিলাতী পণ্য ব্যবহার করিব না।" "Let us make use of this potent weapon by resolving to non-consumence the goods of England." তিনি অন্য নামের অভাবে ইহাকে "moral hostility" বলিয়াছিলেন। ইহা যে কত কার্য্যোপযোগী তাহা তিনি তখনই বুঝিয়াছিলেন। পরে—"স্বদেশী" আন্দোলনের সময় তাহা প্রতিপন্ন হয়। তখন বাজারে প্রথা ছিল—লক্ষ্মীপূজার সময় ব্যবসায়ীরা "লাকী ডে" বলিয়া—পরবৎসরের জন্য মাল কিনিবার চুক্তি করিতেন। "বয়কট" আরম্ভ হইলে—য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা সন্ধ্যা

উত্তীর্ণ হইলেও ব্যবসায়ীরা আসিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন আশা করিয়া বসিয়া ছিলেন,—কোন ভারতবাসী ব্যবসায়ী আসেন নাই ; কারণ, তাঁহারা জানিলেন মাল বিক্রীত হইবে না।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন বাঙ্গালী এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সে প্রস্তাবে বাঙ্গালার মনীষীসম্প্রদায় ঘৃণাব্যঞ্জক বলিয়া আপত্তি করেন নাই।

সেই জন্যই অরবিন্দ বলিয়াছিলেন—রবীন্দ্র এ বিষয়ে আপনার আদর্শে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—তাহাতে সাধুর আদর্শ অবলম্বিত হইতে পারে না বলিয়াই তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই—পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না।

"বয়কট" তাহার কাজ করিয়াছিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের "বয়কট"-নিন্দা ভুলিয়া যাইব—তাঁহার "স্বদেশী আন্দোলনে"র দান—পরোক্ষভাবে "বয়কটের" সহায়ক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা নিবেদন করিব।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাংলার একটি চিরস্মরণীয় দিন—৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ সাল।

ইংরেজ সরকার ঘোষণা করেছে বঙ্গচ্ছেদ। ওদিকে বাঙালীর মধ্যে চলেছে রাখীবন্ধন উৎসব। রাখী বন্ধনের মন্ত্র দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আজ তিনি পথে নেমে এসেছেন, মিলেছেন সর্বসাধারণের সঙ্গে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছেন তিনি। গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে দেশমাতৃকার মঙ্গল প্রার্থনা করছেন। সকল মানুষের হাতে রাখীবন্ধন করছেন।

অপরাহ্ণে আর এক অভূতপূর্ব দৃশ্য—কেডারেশন হলের প্রতিষ্ঠা-উৎসব শেষে বিপুল জনতা চলেছে মিছিল করে, তারা গাইছে রবীন্দ্রনাথের গান :

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে……
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।

মিছিলের সঙ্গে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম বাঙালীর জীবনে সেদিন এনেছিল নতুন চেতনা।

রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য।

১

রবীন্দ্রনাথ যখন সত্যিকার ছোটোদের বই লিখলেন, বেখানে বড়োরা কিছুতেই হাত বাড়াতে পারবেন না, কেবল ঈর্ষা করবেন, তৃষিত হবেন, এবং নিজেদের বড়ো হওয়াকে নিয়ে আপশোষ করবেন,—অর্থাৎ 'সহজ পাঠ' যখন বেরোলো—তার অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে 'শিশু' আর 'শিশু ভোলানাথ', 'মুকুট' আর 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'রাজর্ষি' আর 'বিসর্জন' এবং তারপরে তো আরো নাম যোগ করা যায়, যেমন 'ব্যঙ্গকৌতুক' 'হাস্যকৌতুক', এদিকে 'অচলায়তন' 'শারদোৎসব' 'কথা ও কাহিনী' এমন কি 'ডাকঘর' আর 'লিপিকা', উপরন্তু 'গল্পগুচ্ছ'-র প্রথম দুই খণ্ড তো আছেই ; 'সহজ পাঠে'র পরেও তো আরো লিখলেন, 'সে' 'খাপছাড়া', 'ছড়া', 'ছড়ার বই' 'গল্পসল্প' 'ছেলেবেলা'—মৃত্যুর অনেক পরে বেরোলো 'চিত্র বিচিত্র' ; এবং তাছাড়াও অনেক লেখা ছড়িয়ে থাকলো সাময়িকীর পাতায়, যা হয়তো ভবিষ্যতে কোনোকালে সংকলিত হবে। কিন্তু কেবলমাত্র 'সহজ পাঠ'ই বোধ করি ছোটোরা তাঁর কাছ থেকে একেবারে সম্পূর্ণ ক'রে, এবং নিজের ক'রে পেলো, যেখানে বড়োদের কোনোই অধিকার নেই। বড়োরা কেবল ঈর্ষা করতে পারেন ছোটোদের ভাগ্যকে, কেননা যে-বয়সে কেবলমাত্র ক-খ চিনলেই যথেষ্ট, সেই বয়সেই এই বইটির এক ও দুই নম্বর সাহিত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়, চিনিয়ে দেয় শব্দ, ছন্দ, বর্ণ, গন্ধ ও রস, গ'ড়ে তোলে এক বিস্মিত পৃথিবী, যেখানে ফুল প্রজাপতি হ'য়ে উড়ে যায়, প্রদীপের আলো হয় ছোট্ট জোনাকি, আর খালি ডাল কেবল এক রাতেই ফুলে ভ'রে যায়। অন্য সব লেখার বেলায় বড়োরা কেবল দূর থেকে তৃষিতের মতো দেখেই স'রে যাবেন না, রীতিমতো এটা অবরদখল করবেন, ভাগ বসাবেন, অনেক সময় তো মুক্তের মতো ছোটোদের হাত থেকে কেড়ে নেবেন বইটি, তারপর নিজেই তন্ময় হয়ে যাবেন অস্পষ্ট এক উষা বেলায়, যাকে বলি শৈশব, যখন রাঙা হাতে রঙিন খেলনা পেলে তিনিও রঙ লাগিয়ে দিতেন মেঘে, ফুলে সমীরণে, জাগিয়ে দিতেন নাচ, গান, সুর, মাধুর্যের ভাসা উপচে সব কিছুর উপর দিয়েই ব'য়ে যেতো লাবণ্যের ধারা।

যে-কথাটা বারে-বারেই মনে পড়ে, তা হ'লো বেদনার মতো গভীর এক মাধুর্যের লীলা। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের শৈশব-সাধনার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হচ্ছে অন্তর্লীন বিষাদ। এককালে সমস্ত পৃথিবী ছিলো অধিকারে, ধাতু ধুলো হাওয়া পুকুর—সব এককালে হুকুম শুনতো আমার, এখন ক্রমেই যত বড়ো হ'য়ে গেলাম, ধীরে ধীরে সব হারিয়ে গেলো। স্বপ্নের মতো, ব্যথার মতো এই হারাবার বোধ বারে-বারে বুকের মধ্যে গুনগুন করে ওঠে, যখনি এই বইগুলির সম্মুখীন হই, আর আকুলতা জেগে ওঠে ফিরে পাবার জন্য ; কিন্তু সেই পাখা কোথায় পাবো, যার সোনালি ঝাপট এই নষ্ট দিনগুলি থেকে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে সহজের ভেতর, যেখানে লুপ্ত হয়নি বিশ্বাস-করার এবং বিস্মিত হবার ক্ষমতা, যেখানে জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেদের খেলার ভিতর করুণার স্রোত এসে বারে-বারে ঢেউ তুলে দিয়ে যায়। আর কখনো সেই দিনগুলিকে ফিরে পাবো না—এই বোধটাই ভিতরে ভিতরে বিষাদ ছড়িয়ে দিয়ে যায় আমাদের মধ্যে, যে-বিষাদ ধীরে-ধীরে আবার সব নতুন ক'রে

গ'ড়ে দিয়ে যায় আমাদের স্মৃতির ভিতর এক নূতন জগৎ : হারানো সব নগরীর স্মৃতি, আশ্চর্য প্রাসাদ আর জাদুর পালিচা, দূর দেশান্তর আর মস্ত রাজার বাড়ির, পাষাণের মিনার আর ধবধবে পক্ষীরাজের ডানার হাওয়া—সব ধীরে-ধীরে ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে অন্তহীন ফিতের মতো বেরিয়ে আসে, সব জেগে ওঠে একে-একে, ফিশফিশ ক'রে কথা ব'লে ওঠে পুতুল, পাখি আর ধাতুমূর্তি, পর্দা উঠে যায় ধুলো মাটি আর হাওয়া থেকে। যেহেতু এই অপরূপ সোনার কাঠির স্পর্শ সংগোপনে তাঁর কবিতার ভিতর লুকিয়ে আছে, যার ফলে ঘুমের দেশে জেগে ওঠে জাগরণের কলস্বর, সেই জন্যই মনে হয় আমরা যাদের শিশু সাহিত্য বলি, তা কোনো আলাদা জিনিস নয়, নয় কোনো খণ্ডিত কি অপূর্ণ কি অলীক প্রদেশ, বরং তার ভিতর যদি পরিণত, পূর্ণ ও সমগ্র জীবনের নানা স্পন্দন পাঁচকোনা নক্ষত্রের মতো দীপ্তি বিকিরণ ক'রে ওঠে, তা হ'য়ে ওঠে সাবালক, হ'য়ে ওঠে সকলেরই আনন্দের অংশ, জীবনের সম্পদ। এই কথা প্রযোজ্য বয়স্কপাঠ্য সাহিত্যের প্রতিও ; যে-সাহিত্য আবহমান, চিরকালের উদ্দেশে যা নিবেদিত, যা জীবনের পরম ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে—ছোটোদের প্রথম দাবি শুরু হয় সেই মহাকাব্য থেকে ; ধীরে ধীরে পরিধি বেড়ে যায়, বৃত্ত বিস্তারিত হয়, ক্রমশ তার অন্তর্ভুক্ত হয় বিশ্বের পুরাণ, রূপকথা, আর সেই সঙ্গে ডন কুইক্‌সোট, রবিনসন ক্রুশো, রবিন হুড, গালিভারের ভ্রমণ কথা ; তালিকা আরো বাড়িয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু কী দরকার? ডিকেন্সকে কি বাদ দিতে পারি, কিংবা টলস্টয়কে? তবু তো এঁরা নিজে থেকে কিছু কিছু শিশুসেব্য কাহিনী রচনা করেছেন, কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র কি হুগো ওয়াইল্ড, কি ব'দ্‌লা—এঁরা? এই চিরন্তন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না হ'লে কোনো শিশুরই অধ্যয়ন কি সম্পূর্ণ হ'তে পারে? আসল কথা, জীবনে কখনো কখনো এমন মুহূর্ত আসে, যখন সকল ভেদ-জ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে এক বিপুল অখণ্ডতাবোধের সম্মুখীন হই আমরা। রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য সেই বোধ দেয় আমাদের। তার কতগুলি কারণ ছিলো, সেগুলি লক্ষ্য করার মতো।

২

সারা জীবনে অনেক কয়মারেশি কবিতা রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এমনকি 'সাধনা' সম্পাদকীয় বিভাগের সম্পূর্ণ ভার যখন নিজের হাতে তুলে নিলেন, তখন শুধু কবিতাই নয়, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা এমনকি সাময়িকী পর্যন্ত তাঁকে লিখতে হ'তো। কিন্তু ছোটদের জন্য যখন তিনি লিখতে গেলেন, তখন বাইরের তাগিদ যতটা না ছিলো, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো নিজের প্রয়োজন। এই কথাটাকে ভালো ক'রে বোঝা দরকার।

শিশুসাহিত্যের অনেক লেখকের মধ্যেই এই ধারণাটি প্রচলিত আছে যে, ছোটোরা হ'লো অবোধ, অপোগণ্ড ও নিঃসাড়, ফলে তাঁরা 'করুণা ক'রে' ছোটোদের জন্য যে-সব জিনিস লিখে যেন, তা ঠিক এই মনোভাবের ফলেই হ'য়ে ওঠে ভাবালুতার গুরুপুর এবং ন্যাকামোছের ভাষায়—অনেক সময় তা প্রায় ইয়ার্কির পর্যায়ে পৌঁছে যায়—তাঁরা যে-সব জিনিস রচনা করেন তার ভিতর কদর্যে ছেলেমানুষি থাকে। ছেলেমানুষি নামক ব্যাপারটি যদি কারো রক্তের ভিতরে না থাকে, তবে তাকে চেষ্টা ক'রে আয়ত্তে আনতে যাওয়াই বাতুলতা। শিল্পের ভিতর হয়তো অন্য সব বানানো জিনিস সহ্য হয়, কিন্তু এই শিশু সুলভ সরলতাটিও যদি বানাতে হয়, তাহ'লে লিখতে যাওয়ার দরকার কী। কোনো বড়ো,

এবং সচেতন লেখকই এরকম করেন না। সে রামবাবু আপিশে মস্ত বড়ো ভারি ও ভারিক্কী, তিনি বাড়ি পৌঁছে নাতনিকে পিঠে করে ঘোড়ার অভিনয় যখন করেন, কিংবা নাতনিকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানারকম হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি ক'রে থাকেন, তখন তা অনেক সময়েই দর্শকের ঠোঁটের কোণে হাসির আভা বিকিরণ করতে পারে বটে, কখনো তাকে আমরা অসহ্য ভাঁড়ামিপনার পর্যায়ে ফেলি না। কেন না সেখানে শেষ পর্যন্ত আমাদের এটা মানতেই হয় যে, ভালোবাসা ও বাৎসল্য নামক মানবজীবনের দুটি মহৎ অভিজ্ঞতা ওই সব অঙ্গভঙ্গির মধ্য থেকে অবিরলভাবে ঝ'রে পড়ছে। কিন্তু যে সব লেখক ছোটোদের অবজ্ঞা করেন, তাঁরাই তাদের ভাবেন অবোধ ব'লে, এবং ফলে যে-সব বানিয়ে তোলা ন্যাকাভাবের আমদানি করেন তা প্রায়ই রসগোল্লার চটচটে রসের মতো ঝ'রে-ঝ'রে পড়ে, যদিও রসগোল্লার সেই শ্বেত গোলতার মতো স্বাদু ও পুষ্টিকর সামগ্রী তাতে কিছুই থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটোদের জন্য লিখলেন, সব সময়েই তা জীবনের গভীর থেকে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিলো। নিছকই একটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাঁকে লিখতে হয়েছিলো : আমরা জানি 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কটি কবিতাই তিনি রচনা করেছিলেন মাতৃহীন শিশুদের সান্ত্বনা দেবার জন্য—সম্পূর্ণ নিজের ব্যাপার ছিলো তা ; এবং আরেকটি কারণেও তা সম্পূর্ণ নিজস্ব—যখন সেই মাতৃহারা শিশুদের জন্য তিনি এই আশ্চর্য কবিতাগুলি রচনা করলেন, তখন কি তিনি নিজের বাল্যবেলার সেই বিষণ্ণ অভাববোধটিকেই স্মরণে আনেন নি ? জোড়াসাঁকোর সেই মস্ত বাড়িটিতে ছোটোদের থাকতে হ'তো বাড়ির চাকরদের আওতায়—মায়ের সঙ্গে দেখা হ'তো ক্বচিৎ কখনো। ফলে 'মা' নামক অভিজ্ঞতাটিকে সেই বয়সেই তাঁকে মনে-মনে বানিয়ে নিতে হয়েছিলো ; মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর নিজের ছেলেমেয়েদের ভিতর তিনি কি সেই শিশু-রবিকে আবিষ্কার ক'রে নেন নি ? 'পুরোনো বট' 'রাজার বাড়ি' 'কাগজের নৌকা' এই সব কবিতা নিশ্চয়ই এখানে চট ক'রে মনে প'ড়ে যাবে আমাদের, যারা চাবিকাঠির মতো একটি রহস্যময় জগৎ আমাদের কাছে উন্মোচিত ক'রে দেবে, যেখানে ধীরে-ধীরে আমরা আবিষ্কার ক'রে নিতে পারি ছোট্ট রবীন্দ্রনাথকে, যিনি শীতকালের শেষ রাতে গায়ে শাল জড়িয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে শিশিরের শব্দ শুনতেন, যিনি জল পড়া ও পাতা নড়ার অবিরল দোলার মাঝখানে দেখেছিলেন ছন্দের লীলা। 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ' এই সব পড়তে পড়তে সবচেয়ে প্রথমে আমাদের কাছে যেটা মনে হয়, তা হ'লো এই যে, এই কবিতাগুলির নায়ক একজন ভাবুক শিশু, যে কল্পনায় এক আলোছায়ার জগৎ তৈরি ক'রে নেয়, যেখানে ইচ্ছে মতো মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার জন্য কখনো হওয়া যায় চাঁপা, কখনো বা হ'য়ে ওঠা জলের মধ্যে ঢেউয়ের লীলা। রোজ যা তা কত কী ঘটে, তার বিরুদ্ধে, এই অতি সাধারণ আকর্ষণহীন তুচ্ছ দৈনন্দিনের বিরুদ্ধে, সে মনে-মনে তৈরি ক'রে নেয় স্বয়ম্পূর্ণ এক কাল্পনিক বিশ্ব, যেখানে আকাশ হ'লো মা, আর চাঁপা গাছ হ'লো সেই ভাবুক শিশুটি। রবীন্দ্রনাথ বলতে আজকের দিনে আমরা যাঁকে বুঝে থাকি, তাঁর সব প্রবণতাই সংগোপনে এই সব কবিতার ভাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে আছে, আর হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে তা যখন রশ্মি-জ্বালা রক্তিম বিস্ফুরণ পাঠিয়ে দেয়, তখন অচমকে নতুন ক'রে জানলা খুলে গেলো দূর-কালের দিকে, আর রাশি-রাশি হাওয়া পাঠিয়ে দিলো অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা, যার আঘাতে দুলে কেঁপে উঠলো কাগজের নৌকার অলৌকিক পাল আর আমরা নতুন ক'রে যাত্রা শুরু করলাম দিগন্তের দিকে। এই কবিতাগুলির ভিতরে যে কেবল শিশু-নায়কটিই কবিত্বের স্পন্দনে প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে তা-ই নয়, যা-

কিছু আছে প্রাকৃতিক ও নিশ্চেতন, রবীন্দ্রনাথ তাদের ভিতরেও আরোপ ক'রে দিয়েছেন নিজেকে, ফলে এমন কি মস্ত লম্বা তালগাছ শুদ্ধু এক ভাবুকও বিষণ্ণ কবি হ'য়ে আমাদের কাছে দেখা দিলো। ফুল হ'য়ে গেলো প্রজাপতি, মিটমিট জোনাকির মতো ছোট্ট হালকা পাখায় উড়ে-উড়ে বেড়ালো প্রদীপের আলো, আর পুকুরের জল তার ডানা কাঁপিয়ে আকাশে উড়ে গেলো মেঘ হ'য়ে। কোন্ সেই সোনার কাঠি, যার স্পর্শ এই রূপান্তরকে সম্ভব ক'রে তোলে, এই প্রশ্নের উত্তরে এক মুহূর্তও ভাবতে হয় না আমাদের, চোখ বুজে ব'লে দিতে পারি এই সোনার কাঠি হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যিনি কবি—প্রথমত কবি, এবং প্রধানত কবি। যদি তিনি এইসব রচনার পরতে পরতে মিশে না থাকতেন, যদি রবীন্দ্রনাথ বালসেব্য কবিতা রচনার জন্য অন্য এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, তাহ'লে নিঃসন্দেহে এইসব কবিতা এত বিচিত্ররূপে অন্তহীন ও ভোগ্য হ'তো না। যেহেতু স্বয়ং তিনি আছেন, তাই আছে অবারিত দিগন্তের ডাক, যা পরে জগতের আনন্দ যজ্ঞে এক বিপুল আমন্ত্রণলিপিকার মতো দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়লো। যেহেতু তিনি আছেন, তাই আছে 'দুই আমি'র সেই আশ্চর্য দ্বন্দ্ব, যেখানে নীড়ে আর আকাশে, ধূলায় আর কালপুরুষে, রূপে আর অরূপে অবিরাম কানাকানি চলে এক গোপন ভাষায়[১]। ছোটোদের জন্য লিখতে গিয়ে তিনি কৌটোর ভিতরে গন্ধের মতো সম্পূর্ণ নিজেকে ভ'রে দিয়েছেন, কিংবা তাঁর নিজের উপমা ব্যবহার ক'রেই ব'লা যায় যে, যেন জলের ভিতর ঢেউ হ'য়ে তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন নিরবধি সমুদ্রের দিকে। কোথাও নিজেকে সংকুচিত করেন নি এতটুকু, হারান নি তাঁর সচেতনতা, তাঁর অস্মিতা, ব্যক্তিত্বের বিরাট প্রসার—বরং তাকেই নিংড়ে আরো মোলায়েম ক'রে একেবারে যেন সারাৎসারে পরিণত ক'রে দিয়েছেন।

৩

এ রকম হবার আরেকটা কারণ ছিলো।

রবীন্দ্রনাথ চিরকাল 'দূর থেকে শিশুকে দেখছেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদবোধে ব্যথিত হয়েছেন, বার-বার তৃষিত হয়েছেন তাকে ফিরে পাবার জন্য' : সেই জন্যই এইসব রচনা ছিলো তাঁর শৈশব-সাধনারই অন্তর্ভুক্ত, যে সাধনার মূল কথা হলো, 'শিশু হবার ভরসা আবার জাগুক আমার প্রাণে, লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে'। এই উৎস থেকেই সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছিলো তাঁর প্রকৃতির সাধনা, গানে কবিতায় গল্পে যার অজস্রতা আমাদের সব সময়ে আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতি সম্বন্ধেও একই বিচ্ছেদ-বোধ তাঁর 'বৃথা জীবনের দীর্ঘশ্বাসে'র শততম পুনরুক্তির ভিতরও এমন এক প্রাণবন্ত বিষাদের অন্তঃসার পুরে দেয়, যা আবেগের গভীর চাপে ও বিশ্বাসের উত্তাপে আমাদের ভিতর বারে-বারে জাগিয়ে তোলে স্বর্গের জন্য এক অসীম আকুলতা। বাইরে থেকে কুড়িয়ে এনে কবিতার ভিতর পুরে

---

১ 'শিশু ভোলানাথে'র সেই ছোট্ট কবিতাটি যার ভিতর 'দুই রকমের দুই খেলা'র কথা আছে, যেখানে উল্লেখিত হয়েছে 'আকাশ-ওড়া' আর 'ধুই-খেলা'র গোপন কানাকানির কথা, তা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সেই বিখ্যাত তত্ত্বকথার চাবিকাঠির মতো কাজ করতে পারে, যে তত্ত্বের নামকরণ করা হয়েছে সীমা ও অসীমের প্রণয় লীলা।

যেমনি তিনি, ভিতর থেকে তা হ'য়ে উঠেছে নিজে-নিজেই ঘুমের ভিতঃ স্বপ্নের মতো, আর সেই জন্যেই এই পৃথিবী যেমনভাবে দিনে-দিনে উন্মোচিত হয়েছে তাঁর কাছে, তারার ভাষায়, জলের গলায়, মেঘের রঙে, গাছের পল্লবে, ফুলের গানে যেমনভাবে বারে-বারে ডাক পাঠিয়েছে তাঁর কাছে, ঠিক সেই কথাটিই তিনি অনুরণ্ত বার অবারিত ক'রে ব'লে দিয়েছেন। এই জন্যই তাঁর তালগাছ রক্তেমাংসে সজীব হ'য়ে ভাবুকতায় তন্ময় হ'য়ে পড়ে, এই জন্যেই তাঁর 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' একটি আবর্তিত ও স্পন্দমান জৎপিণ্ডে পরিণত হয়ে যায়। বিচ্ছেদই যদি না-থাকে তাহ'লে বারে-বারে কেন ডাক আসবে? প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতে পারছেন না ব'লেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার আকুলতা তাঁর এত প্রবল। শৈশব থেকে বিচ্ছিন্ন ব'লেই তাঁকে তৃষিত ভাবে শিশু হবার সাধনা করতে হয়। সীমার ভিতরে আছি ব'লেই তো অসীমের ডাক শুনতে পাই, না হ'লে অসীমকে আবার অসীম ডাকবে কি? শিশুকে আবার শৈশব সাধনা করতে হয় নাকি? বনের গাছপালাকে কি কখনো চেষ্টা করতে হয় গাছ হবার জন্য? সমালোচনার ছুরি-কাঁচি দিয়ে তাঁর রচনাকে যে ঘাস-মতো কেটে নেয়া যায় না, তার কারণই হ'লো রচনার ভিতর ভাঁজে-ভাঁজে তিনি অন্তর প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; কোনো লেখাতেই তিনি নিজেকে চেপে, ঢেকে প্রকাশ করতে পারেন নি, তাঁর ব্যক্তিত্ব এতই জলের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে স্রোতের ধারায়। সেই কারণেই সদর স্ট্রিটের বাড়িতে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' যেদিন হ'লো সেদিন থেকেই বিচ্ছেদের এক কূলপ্লাবী বোধে তাঁর বিষাদ সমস্ত রচনার ভিতর ছড়িয়ে পড়লো—আর তাঁর রচনার ভিতর বর্ষার কালোমেঘের এত যে সমারোহ, মেঘলা আকাশ থেকে এত যে ছড়িয়ে চাপা এক বিষণ্ণ আভা, তাই কি এই আদিগন্ত ব্যাকুলতার দিকে ইঙ্গিত করে না। তাঁর রচনার সর্বত্র এই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ছড়িয়ে আছে—এই হ'লো উৎস, যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে আকুল নদী, জলে সেখানে ঢেউ জেগে ওঠে, আর ঢেউয়ের ভাষায় যেখানে দূরের গান।

এই কথাটাও স্পষ্টভাবে তিনিই ব'লে দিয়েছিলেন, 'যাত্রী' নামক গ্রন্থের 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশে[২]। সেখানেই বিশদভাবে তিনি বলেছেন যে, এই কবিতাগুলি লিখেছেন নিজের জন্য—এগুলি হয়েছে তাঁর আত্মপ্রকাশের বাহন। বিশ্বের শিশু সেব্য রচনার মধ্যে যেগুলি চিরজীব, তারা সকলেই তাই, সব সময়েই তারা জীবনের মূল্যায়ন করে, বাণী পাঠিয়ে দেয় মানবাত্মার উদ্দেশে, চিরকালে ও নিখিলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি একই সঙ্গে এত হাসি-কান্না কৌতুকে-বিষাদে এত বিচিত্র ও বিপুল, এত হালকা, নির্ভার ও বিশ্লেষণবিমুখ যে তা যেন প্রায় অপার্থিব হ'য়ে উঠেছে—স্বর্গের সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয় যেন তারা, ছড়িয়ে দেয় এমন বিশ্বজোড়া, স্নেহ ও বাৎসল্যের ঢেউ যে, আমরা তার ভিতর অবগাহন ক'রে স্নিগ্ধ, লজ্জিত ও সুকুমার হ'য়ে উঠি। এর সঙ্গে তুলনা করা যায়, ঠিক

---

২ 'দেওয়ালের মধ্যে কিছু কাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তাকেই মানুষ স্পষ্ট ক'রে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্য এত বড়ো আকাশেরই কাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি ক'রেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তলাকে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে।' - পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি : রবীন্দ্রনাথ।

এমন কবিতা কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ; 'অপাপবিদ্ধের গান' ও 'অভিজ্ঞতার গান' এই দুই জোড়া-বইয়ের নাম মুহূর্তে আমাদের মনে প'ড়ে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্লেকের কবিতাগুলিকে তাঁর তুলনায় অনেক বেশি 'হিংস্র' ব'লে মনে হয়, এবং অনেক বেশি সরলীকৃত—অপাপবিদ্ধের সরলতার পরেও যেহেতু অভিজ্ঞতার বিপুল রক্তপাত থাকে, সেই জন্য ব্লেক প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে যান—সদর্থেই এই নিষ্ঠুরতা, তিনিও চেয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের মতোই—সর্বজীবে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করতে, কিন্তু এখানেই হয়তো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মূল বিরোধ, যার ফলে বনের ভীষণ বাঘের জলজ্বলে রূপকে—মেষপালক ও শুভ্রপশমাবৃত মেষশাবক সত্ত্বেও—কিছুতেই ভুলে যাওয়া যায় না। খ্রীষ্টান ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্লেকের দিব্যদৃষ্টির, তৎকালে বিরোধ বেধেছিলো—এ-কথা সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে পাপবোধ প্রবল ব'লেই শেষ পর্যন্ত হয়তো ব্লেকের কবিতায় এত বেশি হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের ভিড়, যারা শীতে কুয়াশায় রক্তে ও মজ্জায় কোনো এক হিংস্র ভীষণতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরাদৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছিলো সেই জগৎ পারাবারের তীর, যেখানে ছেলের দলের মেলা—সেখানে ভীষণ ঢেউও শেষ পর্যন্ত পুজার ঘর বলে; সেখানে আকাশের ঝড় সুদূর জলে তরী ডুবিয়ে দেয় আর মরণদূতেরা উড়ে চলে বটে, কিন্তু শেষ অবধি সারা বেলা কেবিল ওই সুনীল জল নাচে; ব'সুর ঘর পাতার ভেলা খেলার তরী সব কিছুই অপহারীত্বের ইঙ্গিত দিলেও শেষ পর্যন্ত নিখিল প্রাণের লীলাস্পন্দে জগৎ-পারাবার ভ'রে যায় ঢেউয়ের ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট মেয়ে যখন বলে 'হারিয়ে গেছি আমি', তখনও ব্লেকের সঙ্গে তাঁর তফাৎটা স্পষ্টই থাকে মেহে, বাৎসল্যে, করুণায়, যার ভিতরে গোপনে কাজ ক'রে যায় এক ঝলমলে কৌতুকের প্রবণতা[৩]।

৪

এই কৌতুকের প্রসঙ্গে সকলেরই নিশ্চয় বহু রচনার কথা মনে প'ড়ে যাবে, 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র চপল সুষমা বাদ দিলে, যে বিষয়ের পুরোধা হয়ে আসে কাহিনীর 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সবচেয়ে প্রথমে আমাদের চোখে পড়ে যে ধারা এবং যে-সব বিষয় তাঁর কৌতুকের লক্ষ্য, তারাও তার অসীম স্নেহ থেকে বঞ্চিত নয়। 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র ভিতর যাদের তিনি ঠাট্টা করেছিলেন, তাদের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি অসীম ধারায় প্রবাহিত হয়েছিলো। যখন বিষয় আরো গুরুতর, এবং বিশ্বমানবের একটি চিরন্তন সমাজকে স্পর্শ করলো, তখনও তিনি তাঁর সমুখীন হয়েছেন স্নেহের সুষমা নিয়ে। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র উদ্দেশ্যমূলতা এবং বিরাট বস্তুস্ফীতি পরে নানা জায়গায় তাঁর রচনায় সুরে ফিরে এসেছে, এবং কখনো-কখনো তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠে চাপা, গম্ভীর ও ভাবাতুর; কিন্তু এখানে ঝলমল করে উঠেছে তাঁর ভাষা; মিল আর ছন্দের কৌশলে আমরা চমকে যাই,

---

৩ শুধু বোধহয় গল্পগুচ্ছের 'ক্ষুধা' গল্পটি এবং তার সঙ্গে যুক্ত কবিতাটির ভিতর—একজন রাশী রবীন্দ্রনাথের মুখে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল, যিনি মানুষের হিংস্রতা ও নির্মমতায় ক্ষুব্ধ চকিত, উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন। না হলে 'রাজর্ষি'র স্বপ্ন স্বরূপ যে প্রশ্ন তার মনে জেগেছিলো, 'এত রক্ত কেন।' সে প্রশ্নকেও তিনি অন্তিম বিশ্বাসের চাপে অন্য এক দিগন্তের সন্ধানী করিয়েছিলেন!

চমকে যাই কবিতার ভিতর কথা বলার অচল স্রোতোময়তার ব্যবহার দেখে, ঘরোয়া ও আটপৌরে ভাষার স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যে-ভাবে তিনি মূল উদ্দেশ্যের সম্মুখীন হলেন, তা আমাদের মুগ্ধের মতো আটকে রাখে। আর যা আকর্ষণ করে, তা হলো সেই অসীম ক্ষমা ও স্নেহ, যা নিয়ে তিনি সমগ্র বিশ্বের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেখানেও বাণী আছে মানবতার উদ্দেশে, মস্ত এক জটিল সমস্যা সম্পর্কে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন বিকিরণ করে দিয়েছে দূরস্পর্শী বহু রশ্মি—আর এই উপায়টিই ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর প্রায় সব রচনায়। কবিতাগুলির কথা তো আগেই একটু-একটু আলোচনা করেছি, কিন্তু 'সে', 'গল্পসল্প' প্রভৃতি শেষ জীবনের রচনাগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'সে' ও 'গল্পসল্পে'র ভিতর কেবল বিশেষ গল্পরূপের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে না, সেখানে সাহিত্য ও শিল্পের নানা সূত্রও তিনি কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যেভাবে 'সে' আরম্ভ হ'লো, তাই দেখেই হয়তো অনেক অনভ্যস্ত শিশু-পাঠক বই সরিয়ে রেখে দেবে কিন্তু একটু এগোলেই,—যেখানে 'সে' এসে হাজির হলো, সেখান থেকেই—মস্ত এক টান অনুভব করা যায়। যেখানে 'সে' এসে আজগুবি ও খেয়াল রসের রচনার সংজ্ঞার্থ ব'লে দিলে, সেখানে 'মহীয়ান আবোল-তাবোল'-এর মূল কথাটি গল্পের ছলে বলা হয়ে গেলো। বিশেষ করে, 'সে'-র দেহ বদলের অভিজ্ঞতাটি তো এক পরম ভোগ্য জিনিসে পরিণত হ'লো, তার কারণই হ'লো আগে আমরা এই রচনাকে উপভোগ করার মূল সূত্রগুলি পেয়ে গেছি। 'গল্পসল্পে'ও এইভাবে প্রায় সবগুলি গল্পের সূচনায় ধীরে ধীরে জীবন ও গল্পের কতিপয় মূল সূত্রকে ব্যক্ত করে দেয়, যা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে, এই পাশলের দলে ভিড়ে বহুস্তর অর্থময়তাকে আমরা পরিষ্কার করে নিতে পারি। কিন্তু দুটি বইই মাঝে-মাঝে বিষণ্ণ হয়ে যায়, সুকুমারের অন্তর্ধানের পর 'সে' প্রায় বিষণ্ণ ও 'ট্রাজিক' একটি উপন্যাসে পরিণত হয়ে যায় এবং দুটি বইয়ের মধ্যেই ধীরে ধীরে শ্রোতৃদের ছোটো থেকে বড়ো হওয়া লক্ষ্য করে নিতে পারা যায়। এই বই দুটির সঙ্গে মনে পড়ে 'খাপছাড়া' 'ছড়া' ও 'ছড়ার ছবি'—এই বই কটির ভিতরেই আমরা অনুভব করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক অচেতন এক প্রতিভাবান 'বৃদ্ধ' লেখককে—যিনি 'অবসর-কালের আত্মবিনোদনের' জন্য খেয়ালি হয়ে দেখা দিলেন নতুনতর এক ভঙ্গিতে।৪ লোভনীয় সন্দেহ নেই, এবং উপভোগ্য; কেননা এখানেও যখন ধীরে ধীরে বিপদের সান্নিধ্য লক্ষ্য করি, তখন ধীরে ধীরে দেখতে পাই আড়ালে একজন 'অচেতন প্রতিভাবান' ছাড়াও আরেকজন ব্যক্তি আছেন, যিনি বিষণ্ণতার পূজারি—যিনি আমাদের ব্যথার মূল্য বুঝিয়েছেন।

---

৪ '(অবনীন্দ্রনাথের) 'ভূতপত্রীর' সঙ্গে 'সে' আর (সুকুমার রায়ের) 'আবোল-তাবোলের' সঙ্গে 'খাপছাড়া'র তুলনা করলে তৎক্ষণাৎ জাতের তফাৎ ধরা পড়ে; আগের বই দুটির স্বাচ্ছন্দ্য এখানে নেই, এরা বড়ো বেশী সাহিত্যিক, বড়ো বেশি সচেতন—এমনকি আত্মসচেতন; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক যে মহাকবি তিনি মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যান, আর তাঁরই হাতের নতুন কৌশল আমরা অভিজ্ঞ পাঠকরা চিনতে পেরে খুশি হই। সুকুমার রায়ের, অবনীন্দ্রনাথের—'সে'-র মুখের কথা দিয়েই বলছি—'কেরামতিটা কম ব'লেই সুবিধা' ছিলো।'—বাংলা শিশু সাহিত্য (আলোচনা): বুদ্ধদেব বসু।

এই বেদনার প্রসঙ্গেই আসে তাঁর 'রূপকথা'গুলি, যেগুলিতে স্পষ্টভাবেই উন্মোচিত হয়েছে ঐন্দ্রজালিক সম্মোহন। এখানেই স্মরণীয় সেই আশ্চর্য যুগান্তরকারী গ্রন্থ 'লিপিকা' যার মধ্য দিয়ে তিনি জগৎকে নতুনভাবে উপস্থিত করে দিলেন।

৫

'পরির পরিচয়', 'সুয়োরাণীর সাধ', 'ভুল স্বর্গ', 'রাজপুত্তুর' এমনি অনেক রূপকথা আমাদের মনে পড়ে যাবে, যার কোনো কোনো আভাস ইতিপূর্বে দেখেছি 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'য় ও পরে 'গল্পসল্প'। 'গল্পসল্প'র 'রাজরানী' ও 'চন্দনী' যেমন, তেমনি অন্যত্রও—সর্বত্রই—রূপকথার ভিতর তিনি পূর্ণ পরিণত জীবনের ওজন পুরে দিয়েছেন, যার সাক্ষাৎ 'তাসের দেশ' বা 'একটি আষাঢ়ে গল্পে'ও বিদ্যমান। পোষমানা, আইন মানা, নিক্তিমাপা কাঠখোট্টা জীবনের বিরুদ্ধে যে বিরূপতা তিনি চিরকাল প্রকাশ করেছেন, যে জীবনযাত্রার ভিতর প্রাণহীন কতকগুলি ভদ্রতার আড়ালে হৃদয়বৃত্তির বিরোধী অমার্জিত ও অশালীনতার শাণিত ও বক্র নখর বিদ্যমান, তাকেই রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেছেন। 'তোতাকাহিনী'ও নিশ্চয়ই সকলে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করবেন। কিন্তু এই রূপকথার আলোচনায় দিনেমার লেখক হান্স আণ্ডেরসেনের নাম উল্লেখ করতে হয়—বিশেষ করে হৃদয়শালীনতার বিরুদ্ধে হান্স আণ্ডেরসেনের বিরূপতাও স্মরণীয়। কিন্তু হান্স আণ্ডেরসেনের গল্পে যখন 'রাজপুত্র' শূকর পালকের ছদ্মবেশে রাজকন্যার মুখোমুখি হন, তখন অন্ধ-বঙ্গ কলিঙ্গের রাজকন্যা দেখে রবীন্দ্রনাথের রাজার যে-ভাবে মোহভঙ্গ ঘটেছিলো তারও সেইভাবে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজা পরিশেষে রাণী হবার যোগ্য একটি মেয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যে কালে ঠাণ্ডা দেশের এই রাজপুত্র এই হৃদয়হীন রাজকন্যাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আঘাতে বিপর্যস্ত করে দেন। হান্স আণ্ডেরসেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গির এই তফাতটি আবার য়ুরোপীয় মানসতার সঙ্গে ভারতীয় চিত্তের যৌন বিরোধের দিকে ইঙ্গিত করে। হান্স আণ্ডেরসেনের রূপকথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রূপকথার তুলনা নানা কারণে হ'তে পারে। কেননা দুজনেই এই যুগে—পরি ও ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব যে কালে মানা হয় না—মৌলিক রূপকথা রচনা করেছেন;—অস্কার ওয়াইল্ড, সেলমা লাগেরলফ, আঁতোয়ান দ্য সাঁতেক্সুপেরি, এবং আমাদের দেশের অবনীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু এঁদের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এঁদের রূপকথার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে এইসব রূপকথার ভিতর দিয়ে নিখিল চিত্তের উদ্দেশে তাঁরা বাণী পাঠিয়েছেন,—আধুনিক যুগের সমস্যা ও চিরকালীন সমস্যা—উভয়কেই তাঁরা স্পর্শ করে গেছেন। বিশেষ ক'রে আণ্ডেরসেন দেড় শতাধিক রূপকথা রচনা করেছিলেন বলে তাঁর কথাই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এই রূপকথাগুলির ভিতর আণ্ডেরসেন নিজেকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন, তুলে দিয়েছেন ধুলোমাটি গাছপালার উপরকার আবরণ, যার ফলে সপ্রাণভাবে সবাই এসে আমাদের কাছে কথা বলে যায়। দুঃখকষ্ট, আঘাত, মোহভঙ্গ, প্রেম, বিষাদ, বেদনা, মৃত্যু, পাপ, পুণ্য, শান্তি—এবং সর্বোপরি ঈশ্বর—এইসব মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে সেখানে তিনি কথা বলেছেন, যার ভিতর তিলে তিলে আমরা যাকে অনুভব ক'রে নিই, তিনি আণ্ডেরসেন স্বয়ং, নিঃসঙ্গ, একলা, বিষণ্ণ

এবং মহীয়ান।* এবং সর্বোপরি, নিষ্ঠুরও। 'লাল জুতো', 'ছায়া' কিংবা 'রুটি' যে মেয়েটি মারিয়েছিলো তার গল্প—দ্বন্দ্বে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত, 'ছায়া'র ভিতরে পাপ ও পুণ্যের সংঘাত অতিরিক্ত প্রবল, আর কারেন বা ইঙ্গের শাস্তি যে এত নিষ্ঠুর, তার কারণই হ'লো খ্রীষ্টান ঐতিহ্যে পাপবোধ প্রবল, ও শেষ বিচারের চেতনা। রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখাই এত নিষ্ঠুর শাস্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে নি। যে আণ্ডের-সেনকে পাই 'বিদ্রী হাঁসের ছানা'র কি 'জলকন্যাদের ছোটোবোনে', 'বুড়ো ওকের শেষ স্বপ্নে' কি 'বড়ো রাস্তার বুড়োবাড়ি'তে সেই নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ, ও বিধুর আণ্ডেরসেনই রূপকথার রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী। 'পরির পরিচয়' কি 'ঘুমোরাণীর সাধে'র আকাশ-স্পর্শী বিষণ্ণতা কেবল কোমলতা ও অশ্রুপাতেই সহন-যোগ্য; তারা যদি রূপকথা না-হ'তো, যদি তাদের নিয়ে এক আস্ত মাপের উপন্যাস লিখতেন তিনি, তাহ'লে সেই বিষণ্ণতার চাপ আমাদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হ'তো। যেমনভাবে ছেলেকে বুকে চেপে ধ'রে মা জন্মের রহস্য ব্যক্ত করেন, ব্যক্ত করেন ভালোবাসার অসীমতাকে ('ইচ্ছে হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে') এবং শেষ কালে তাকে চিরকালের ইচ্ছের সঙ্গে মিশিয়ে দেন, তেমনিভাবে রূপকথার মায়ালোকে গালিয়ে দিয়েছিলেন ব'লেই এই সমস্ত বয়স্কজনের পক্ষে উপভোগ্য সামগ্রীও ছোটোদের উপযোগী হ'য়ে উঠেছে। হয়তো মনের ধাতেই এই রকম ছিলো—স্নেহ, করুণা, বাৎসল্যের ধারা পরিপূর্ণ। সর্বভূতে ও সর্বজীবে দয়া—এই বোধটিই পরতে-পরতে মিশে আছে সব রচনায়—আণ্ডেরসেনের রচনায় যেমন। গ্রিম, পার্ল পেরো বা দক্ষিণারঞ্জনের মতো তাই তারা সব অর্থেই কেবল শিশু সেব্য নয়, মানব জীবনের অভিজ্ঞতা হ'য়ে উঠেছে। তা যে হ'তে পেরেছে, তা কেবল এইসব রচনার ভিতর আমরা পুরোপুরিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাই ব'লে: ছোটোদের জন্যে লিখতে গিয়ে তিনি যদি নিজেকে টুকরো ক'রে কেটে-ছেঁটে দিতেন, তাহ'লে তা সম্ভব হ'তো কিনা সন্দেহ। ফুলের পাপড়িতে যেমন ভাবে ভাঁজে ভাঁজে গন্ধ মিশে থাকে, তেমনি এইসব রচনার পরতে-পরতে তিনিই আছেন। দূরের থেকে সৌরভে ভ'রে উঠি, স্নিগ্ধ ও নন্দিত হই, তারপর দেখি আকুল হ'য়ে তা চ'লে গেলো দূরের দিকে। আর এত নির্ভর, এত স্বচ্ছ, এত বিকীর্যমান ও অসীমস্পর্শী যে আমরা অবাক হয়ে কেবল তাকিয়ে থাকি, আর কোন এক পরিমল ছড়িয়ে যায় পবনে, যেন এক সোনার কলস নদীর স্রোতে অকারণে ভেসে গেলো দূরকে লক্ষ্য ক'রে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* গর্কির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে টলস্টয় হান্স আণ্ডেরসেনের রূপকথার মূল চাবিকাঠিটির সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আণ্ডেরসেনের রূপকথা প'ড়ে এমন লোকের সাক্ষাৎ পাই, যিনি জীবনের সব ব্যর্থতা সহ্য ক'রে অবশেষে ছোটোদের কাছে এসে নিঃসঙ্গতাকে ভুলে থাকলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতা যে কী বিপুল ছিলো, তার প্রমাণই এটা—কেননা ছোটোরা কখনো—ভদ্রতার বালাই রাখে না ব'লে—কাউকে ক্ষমা করে না, যদি কাউকে অপছন্দ করে তো চিরকালের মতো অপছন্দ করে। তবু যে আণ্ডেরসেন ছোটোদের কাছে গিয়েছিলেন, তার কারণই হ'লো এক ব্যর্থতাবোধ ও নিঃসঙ্গতা।

শান্তিনিকেতনের আদিপর্ব ॥

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে যে "বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়" আজ সভ্যসমাজে সর্বত্র পরিচিত সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি শৈশবকালের যে চেহারা যে ভৌগোলিক অবস্থা যে পরিধি এবং পরিবেশ ছিল তার সঙ্গে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা, পরিধি এবং পরিবেশের মধ্যে সে কী বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে সেটা তাঁরাই সম্যকরূপে বুঝতে ও দেখতে পারেন যাঁরা পঞ্চাশ বছর আগে শান্তিনিকেতন-আশ্রম বিদ্যালয়ে বাস করেছিলেন। তাঁরা এখন "বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে"র রাজ্যে এসে পথ ভ্রান্ত দিশাহারা পথিকের মতন হয়ে পড়েন। তাঁদের মনে সেই অতীতটা জেগে ওঠে, বর্তমানের পাশে নিতান্তই একটা স্বপ্নের মত। বহু কষ্টে হাতড়ে খোঁজার মতন, তাঁরা ৪।৬টি সেকেলে ঘরবাড়ি দেখে, এর সাথে তার সাথে ঘুরে ফিরে সেকেলে ২।৪ টে পথঘাট চিনে কোনো রকমে সেই অতীতকালের স্মৃতিকে স্বপ্ন-বন্ধন থেকে মুক্ত করে কিছুটা বস্তুরূপে দেখতে পান। এই দেখার মধ্যে দুই রকমের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই রকমের রূপ হচ্ছে উপমায় যাকে বলা যেত বিসর্জন দেওয়া প্রতিমার রঙ্ মাটি খসা—ভাঙা কাঠ-বাঁশ আর তাতে খড়্‌কুটো দেওয়া কোনো কালের প্রতিমার জীর্ণ ভগ্নাবশেষ। আর এক রকম দেখার মধ্যে যে রূপটি দেখা দেয় সেই পুরাতনকে নতুনের অবদানে সজ্জিত করা ঐশ্বর্যময় রূপের মতন। কবিদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে পারা যায়—সেকালের বিদ্যালয়ের চেহারা ছিল আড়ম্বরহীন সুন্দর আর আজকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা অনেকটা ঐশ্বর্যময়। এই ঐশ্বর্য থেকে সৌন্দর্য, একেবারে বাদ পড়েনি। অতীতের আশ্রম বিদ্যালয় এবং বর্তমানের বিশ্বভারতী —বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে দুটি চেহারা বা প্রকৃতির কথা বললাম—একথা কিন্তু তাঁদেরই অনেকের মনের কথা যাঁরা এখন বিশ্বভারতীর রাজ্যে থাকেন না,—যাঁরা ছিলেন চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে শান্তিনিকেতন—আশ্রম বিদ্যালয়ে, এখন কখনো কখনো এসে পড়েন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্যে বেড়াতে কিম্বা কোনো কাজে। এঁদের একদলের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের চেহারা, অতীতের প্রকৃতিই মধুর স্মৃতি হ'য়ে আছে এবং বর্তমানের চেহারা এবং প্রকৃতি এঁদের তেমন আনন্দ দেয় না। অন্যদল সেকালের শান্তিনিকেতন—আশ্রম বিদ্যালয়—সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং ভক্তি পোষণ করলেও বর্তমানের চেহারা দেখে ভড়কে যান না, ঘমে যান না। জাগতিক রাজ্যের অলঙ্ঘ্য নিয়ম স্বরূপ পরিবর্তনের যে রীতি সর্বত্র কোথাও মন্থর গতিতে কোথাও বা দ্রুত গতিতে আদিকাল থেকে চলে আসচে, সেই রীতিকে এঁরা স্বীকার করেন এবং বলেন ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, পরিবর্তিত এই রূপের বা প্রকৃতির প্রতি বিমুখ না হ'য়ে—এর সম্মুখীন হয়েই কল্যাণের ও বিশ্বভারতীর উন্নতির জন্য কর্তব্য-সাধন করতেই হবে। পুরাতন এবং নূতনের সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু যাঁরা বাল্যকাল থেকে কিম্বা ত্রিশ, চল্লিশ—পঞ্চাশ বছর ধ'রে টানা এই পরিবর্তনের ভিতরেই থেকে বুড়ো হয়ে গেছেন তাঁদের কারো কারো কাছে এই পরিবর্তন ঠিক তেমনি ভাবেই গা এবং মন সহা হয়ে গেছে—যেমন ক'রে তাদের—প্রতিদিনের দেহের এবং মনের ফের-ফের বা পরিবর্তন দুঃখে সুখে গা সহা হয়ে যায়। এই গা সহা মনোভাবের মধ্যে একটা অনাসক্তভাব আসা অস্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক। এঁদের জীবনের প্রতিদিনের যে দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তন ঘটে সে পরিবর্তন কিন্তু এঁদের

॥ বৈষ্ণব পদাবলী ॥

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম ও বর্তমানে প্রাপ্তব্য একমাত্র আকরগ্রন্থ। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। কবি জয়দেব হইতে শুরু করিয়া দুই শতাধিক পদকর্তার প্রায় চার হাজার পদাবলী সঙ্কলিত। কঠিন পদমাত্রেরই টীকা সন্নিবিষ্ট। পরিশিষ্টে পদাবলীর বর্ণানুক্রমিক সূচী ও শব্দার্থ সংযোজিত। ডিমাই অক্টেভো আকারে লাইনো হরফে মুদ্রিত হওয়ায় সহজ ব্যবহার্য ও বহনযোগ্য। পদাবলী রসিক ও কীর্তনীয়াগণের অপরিহার্য গ্রন্থ। [মূল্য ২৫৲]

॥ রামায়ণ কৃত্তিবাস রচিত ॥

বাঙ্গালীর অতিপ্রিয় এই চিরায়ত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থটিকে সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিসাজে সুরুচিসম্মত একটি অনিন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশন পারিপাট্যে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৯৲]

॥ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ॥

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তি-সাধনা ও শক্তি সাহিত্যের তথ্যসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫৲]

॥ রমেশ রচনাবলী ॥

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত; তাঁহার যাবতীয় উপন্যাস জীবদ্দশাকালীন শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ও একত্রে গ্রন্থিত। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [৯৲]

॥ বঙ্কিম রচনাবলী ॥

প্রথম খণ্ডে বঙ্কিমের যাবতীয় উপন্যাস একত্রে (তৃতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ)।

দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য সমগ্র রচনা। [১৫৲]

উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রতি খণ্ডে সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।

॥ জীবনের ঝরাপাতা ॥

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নিনেয়ী সরলা দেবীচৌধুরাণীর আত্মজীবনী ও নবজাগরণ যুগের আলেখ্য। [৪৲]

॥ রবীন্দ্র দর্শন ॥

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনবেদের সুখপাঠ্য প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২৲]

Samsad Anglo Bengali Dictionary

বহু প্রশংসিত ইংরাজী—বাংলা উচ্চ মানবিশিষ্ট আধুনিক শব্দকোষ। ১৬৭২ পৃষ্ঠা মজবুত অথচ পাতলা বাইবেল কাগজ—সহজ বহনযোগ্য সুদৃঢ় বাঁধাই। [১২৷০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, :: কলিকাতা—৯

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাবেন ॥

সচেতন ক'রে ক'রে ঘটে না—ঘটে এমন কৌশলে ধীরে ধীরে যে এঁরা ভাল ক'রে টেরই পান না যে তাঁদের মাথার একরাশ কালো চুল কখন থেকে এক একটি ক'রে ধীরে ধীরে শাদা হয়ে যায়। টের পান কখন? যখন মাঝে মাঝে আয়নায় দেখতে পান কালো মাথা শাদা হয়ে গেছে। এই শাদা চুলকে কাঁচা কালো করা যায় না ভেবে বুড়োরা আপশোষ করেন দুঃখ করেন কিন্তু কালো চুলের বিরহে নিজের মাথাটা গর্দান থেকে ফেলতে চান না। শাদা চুলকেই স্বীকার ক'রে নিয়ে—প্রয়োজনানুযায়ী কখনো চুল চিরুণী বুরুশ দিয়ে আঁচড়ান কেউরা সেই সঙ্গে কলপও ব্যবহার করে চুলের পরিবর্তনকে সুশ্রী করবার জন্য চেষ্টা করেন। অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে মানিয়ে নেন।

যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে শান্তিনিকেতনে—শান্তিনিকেতনের সমাজে আছেন তাঁদের পারিবারিক জীবন যাত্রা ও সাংসারিক জীবনও বিশ্বভারতীর পরিবর্তনশীল জীবনের সঙ্গে সুখে-দুঃখে তাল মিলিয়ে চলেছে। তাল সব সময় যে ঠিক থাকে তা নয়—বেঠিক হ'য়ে যায় তখনি যখন তাঁরা কোনো অবসর ক্ষণে, স্মৃতি-দর্পণে অতীত দিনের কম জটিল জীবনের ছবি চেয়ে দেখেন। তখন হয় তো দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ভাবেন—কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম আর কোথায় চলেছি। এই দুর্ভাবনাও কিন্তু স্বল্প মেয়াদী। তার পর পরিবর্তনের সঙ্গে হাত মিলিয়েই চলেন। অনিচ্ছা থাকলেও চলেন। কেননা হাত না মিলিয়ে চলবার উপায় নাই।

এই পরিবর্তনের রাজ্যে হাত মিলিয়ে চলার কথা এই জন্য বলছি যে—হাত মেলানো ব্যাপারে দু-এর মধ্যে একটা সময়য় বা কম্প্রোমাইজ হওয়া প্রয়োজন। কেননা সেকালের অস্তিত্ব অমান্য করবার উপায় নেই। কারণ গাছের অস্তিত্বের উপরেই যেমন নির্ভর করে নতুন পাতা, নতুন নতুন শাখা—প্রশাখার আবির্ভাব তেমনি পুরাতনকে আশ্রয় করেই সমাজে, দেশে যুগে যুগে চলেছে নতুনের অভিযান। নতুন বাড়ি তৈরী হয় নতুন ভিত্তির উপরে। কিন্তু যে জাতির ধর্ম সভ্যতা বহুদিন সঞ্চিত সংস্কৃতি বা কালচারের ভিত্তির উপরে গড়ে উঠেছে সে জাতির পক্ষে তার সেই অতি পুরাতন সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে আমূল খুঁড়ে ফেলে তাতে সম্পূর্ণ নতুন-সমাজ, সভ্যতা তৈরি করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই জন্যই যে সেই ভিত্তি প্রাচীন হলেও শক্ত। আট দশ হাজার বছর ধরেও ওই ভিত্তির দৃঢ়তা এখনো ভারতবর্ষে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। এই সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যায় নিজের বিচার বুদ্ধির আশ্রয় নেব না, কেননা বর্তমান প্রবন্ধে "বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের" সেকাল এবং একাল নিয়েই যখন আলোচনা করছি তখন এই বিশ্বভারতীর আদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতির কোন্ চিন্তা ধারা কেন্দ্রিক সে সম্বন্ধে "শান্তিনিকেতন" এবং "বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম" এই দুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠাতাদের বক্তব্যকেই পাঠকদের সামনে তুলে ধরাই সঙ্গত।

বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কি কোনো পূর্ব ভিত্তি আছে অথবা এটা সম্পূর্ণ একটি নূতন প্রতিষ্ঠান যার পূর্ব কোনো ইতিহাস নেই, ভিত্তি নেই,—এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে রয়েছে। যাঁরা বিশ্বভারতীর ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন তাঁদের কাছে এরকম কোনো প্রশ্ন না ওঠবারই কথা। যাই হোক যাঁদের মনে এই রকমের প্রশ্ন আছে তাঁদের কাছে বিশ্বভারতীর জন্ম-কথা আশা করি ভালই লাগবে।

বর্তমানে "বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের" ভিত্তির তিনটি স্তর দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত "শান্তিনিকেতন," দ্বিতীয় স্তর ওই "শান্তিনিকেতনের" ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথের

"বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম" এবং ওই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ-ভিত্তিতে তৈরি "বিশ্বভারতী সোসাইটি"। এই বিশ্বভারতী সোসাইটি বা বিশ্বভারতীই রূপান্তর লাভ করেছে "বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে"। এইবার দেখা যাক কী উদ্দেশ্যে "শান্তিনিকেতন" হয়েছিল। মহর্ষির কথাতেই উদ্দেশ্য হচ্ছে—এই—

"এই শান্তিনিকেতনে অদ্য সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্টদেবতা পশুপক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্তির বা চিত্রের বা কোনো চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি এই শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীব হিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিষ ভোজন বা মদ্যপান, এই স্থানে হইতে পারিবে না। কোনো ধর্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোনো প্রকার নিন্দা বা অবমাননা এই স্থানে হইবে না।"

এরূপ উপদেশাদি—এ সম্বন্ধে ছাত্রদের কাছে লিখিত চিঠিই প্রমাণ ক'রে তিনি তাদের কত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। অনেক ছাত্র-ছাত্রীকেই তিনি চিঠি লিখতেন, কেবল দু-একজনকেই নয়। কিন্তু কাকে কি লিখেছেন কেন লিখেছেন সে তো আর জানবার উপায় নেই সেগুলো সাধারণের কাছে আত্ম প্রকাশ না করলে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ আমাকে যে সব চিঠি লিখেছেন তার কয়েকটি পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। চিঠিগুলি এই—

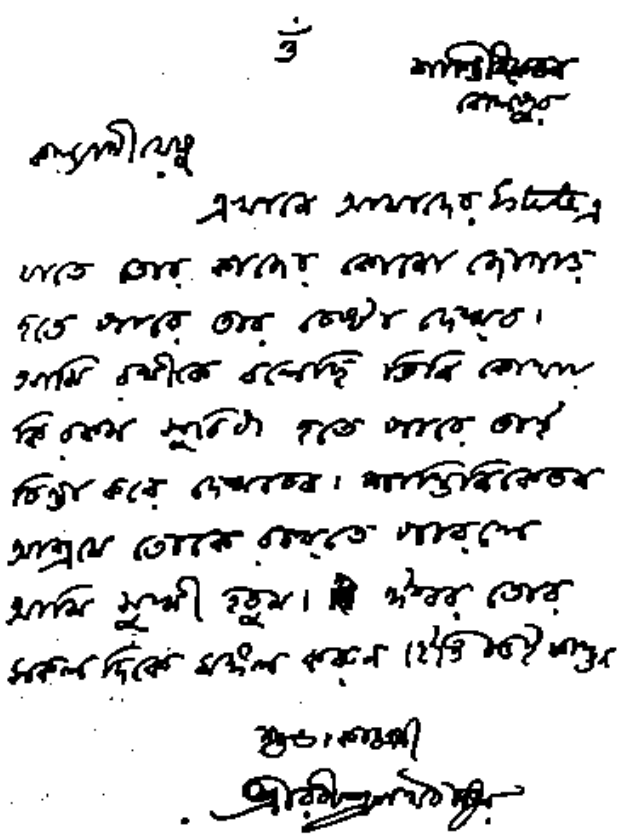

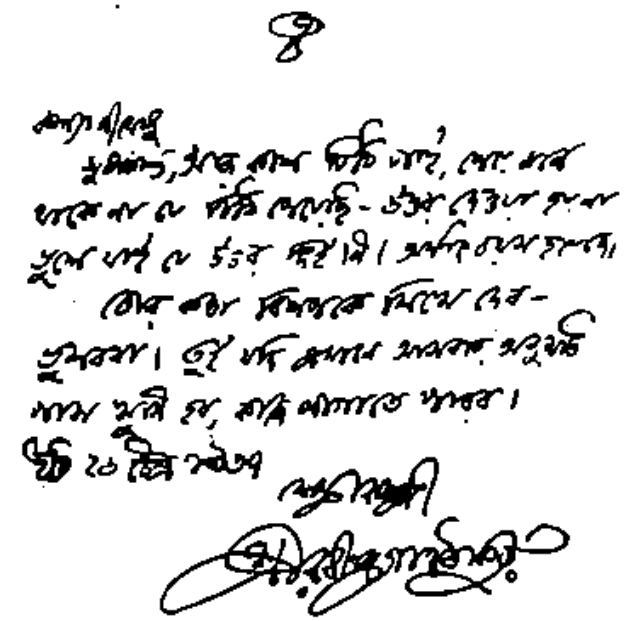

এই সময়ে সাংসারিক দুর্যোগে পড়ে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে অন্যত্র চাকুরীর সন্ধান করবার চিন্তা করছিলাম। রবীন্দ্রনাথ আমাকে অন্যত্র যেতে দিতে অনিচ্ছুক অথচ আশ্রম-বিদ্যালয়-

তহবিলে তখন অর্থের যথেষ্ট টানাটানি। রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করছিলেন ঠাকুর স্টেটে এমন কোনো পদে আমাকে নিয়োগ করা যে পদের বেতনের টাকায় আমার তখনকার অভাব মেটে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের কাছেই শান্তিনিকেতনেই আমাকে তাঁর প্রয়োজন মত চাকুরী দিয়ে রাখলেন, জমিদারী সেরেস্তার কাজে যেতে দিলেন না। এই সময়ে সংসারী হয়ে থাকবার, অর্থ উপার্জন করে দু-পয়সা সঞ্চয় করে বুদ্ধিমান গৃহস্থ হবার ইচ্ছা তেমন প্রবলভাবে আমার ছিল না, বরং বিপরীত ইচ্ছাই ছিল। শান্তিনিকেতন এবং বাড়ীর সংস্রব ত্যাগ করে কিছু দিন দারিদ্রহীন জীবন যাপন করবার মতলব আঁটছিলাম। ২।৪ জন সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গেও আলাপ-জমাবার সুযোগ ঘটলে, আলাপ করতাম: সরলভাবে এই রকম মনের ভাবটা রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখলাম এবং শান্তিনিকেতন থেকে অবসর গ্রহণের অনুমতি চাইলাম। রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠির উত্তরে যা লিখেছিলেন তা এই—

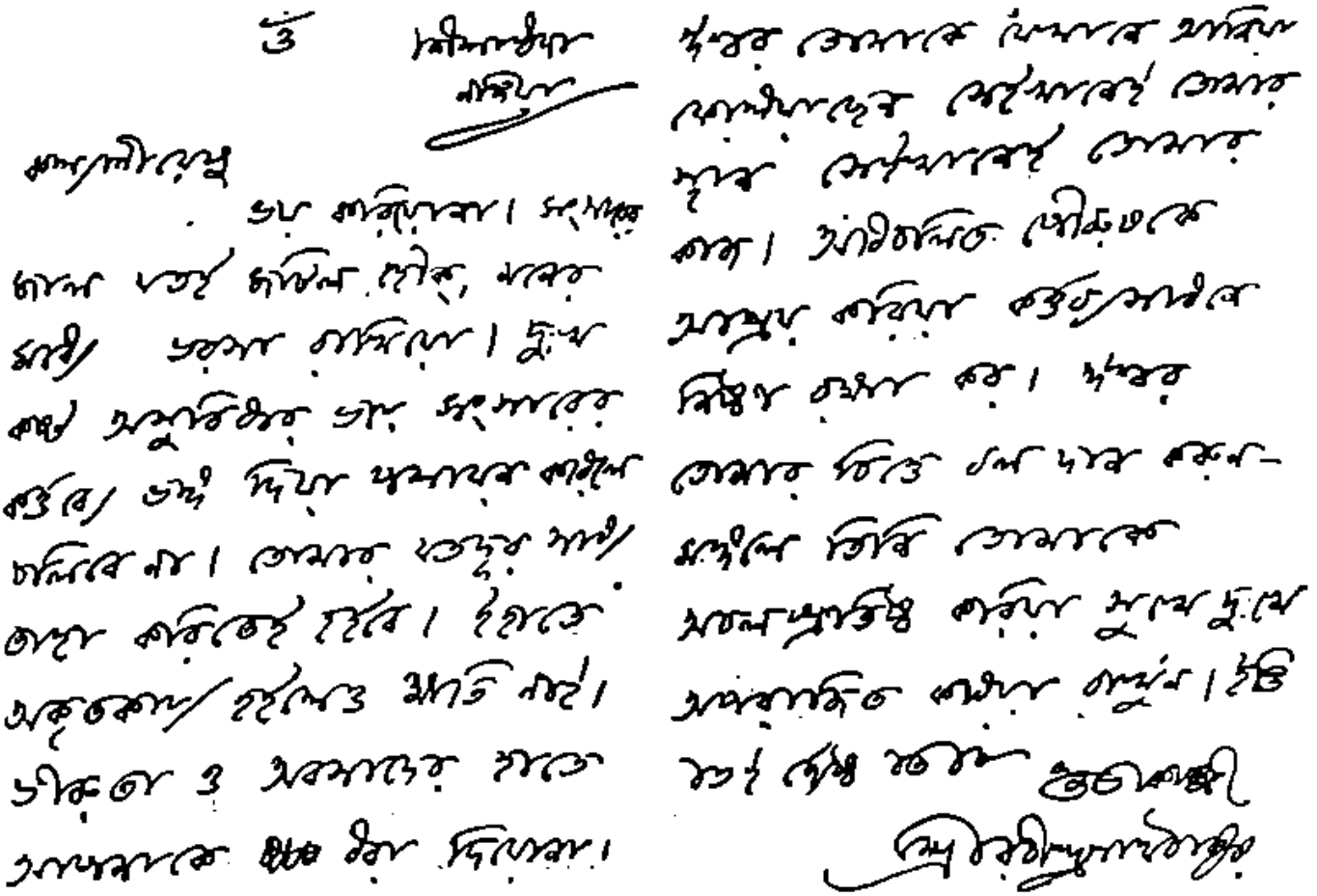

উপরের চিঠি পেয়ে আমি সংসার ত্যাগী হবার সংকল্প পরিত্যাগ করে সংসার কর্তব্যে এবং শান্তিনিকেতনের চাকুরী কর্তব্যে ইচ্ছায়—অনিচ্ছায় মন দিলাম। বৈরাগী হয়ে, সংসার ত্যাগ করবার কিম্বা চাকুরী ত্যাগ করবার মনের ভাব আমার আদৌ ছিল না। তখন মন ছিল একটু বেশি স্বাধীন

গোছের। কারো হুকুমমাফিক চলা, কারো বাধ্যবাধকতার মধ্যে যাওয়া, যে কাজ ভাল লাগে না, সেই কাজই রোজ করা, এসব যেন আমার পক্ষে দুঃসহ ছিল। এইজন্য জীবনে কোনো স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করিনি, কারণ কোনো পরীক্ষাই দেইনি। যে বই পড়তে ভাল লাগে না এখনো পড়ি না, তখনো পড়তাম না। বেশ বে-পরওয়া স্বভাব ছিল। আজ বেশ বুঝতে পারি ওই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকে স্নেহের বন্ধনে শান্তিনিকেতনে—তাঁর সংস্রবে না বাঁধলে—আমার জীবনটা একটা বেয়াড়া মোড় নিত। সে মোড় আমাকে হয় তো চরম দুর্দশার পথে ঠেলে দিত।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
　　মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
　　এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
　　ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
　　নবজীবনের আশ্বাসে!
'জয় জয় জয় হে মানব-অভ্যুদয়'
　　মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ উত্তর কলকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হ'ন, পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক মানচিত্র তিনিই নতুন করে রচনা করে গেলেন। ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে শুধু তিনি পুনরাবিষ্কার করেননি বরং

"সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দ হাসিতে ভরা
যে দিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবই ভালো"

এমনতরো উপলব্ধিতেই তিনি ভারতের মর্মসাধনাকে প্রকট করেছেন, একনিষ্ঠ শুভবাদে তাঁর বিশ্বাস চিরদিন অম্লান থেকেছে। উল্লিখিত স্তবকটি যদিচ ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু বিশ্বমানবের কাছে এর চেয়ে মহৎ ঘোষণা সেদিন আর কেউই করেন নি।

দেশবাসীর সঙ্গে এই বিরাট পুরুষকে আমরাও তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

কে, সি, দাশ, প্রাইভেট লিমিটেড

আবিষ্কারক—রাসোগোল্লাই

কলিকাতা।

মেঘ ও রৌদ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য

নাট্যরূপ—যোগিনাথ মৈত্রেয়

যবনিকা উত্তোলিত হইলে মঞ্চে দেখা গেল একটি গ্রাম্য পথের ধারে একটি বাড়ি। বাহিরের একটিমাত্র ঘর পাকা, এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইষ্টকের প্রাচীর গুটিকতক মাটির ঘর বেষ্টন করিয়া আছে। পথ হইতে জানালার গরাদ দিয়া দেখা যাইতেছে, একটি যুবাপুরুষ খালি গায়ে তক্তপোষে বসিয়া বামহস্তে ক্ষণে ক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহার চতুর্দিকে তক্তাপোষের উপর অনেকগুলি পুস্তক ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। ঘরের মধ্যে তাকের উপর পুস্তকের রাশি।

ঘরের বাহিরেই গ্রামের পথ। সেখানে একটি ডুরে কাপড়পরা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা লোহার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া এই নতপৃষ্ঠ পাঠনিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিতেছে ও এক একবার ঘরের অন্যান্য পুস্তকের স্তূপের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

হঠাৎ যুবক পুস্তক হইতে চোখ তুলিল। সম্মুখে কে দাঁড়াইয়া আছে একবার ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া লইল। যুবক এমনিতে চোখে কম দেখেন। মেয়েটিকে ভাল করিয়া নজর করিবামাত্রই যুবকের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। হাতের বই নামাইয়া সে উঠিল। তাকের উপর হইতে ঝকঝকে একটি বাঁধানো বই খুলিয়া বলিল—

শশিভূষণ। সিরিবালা ছবি দেখবি আয়।

সিরিবালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

শশিভূষণ আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সিরিবালা আবার সেই গরাদে ঘেরা জায়গাটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শশিভূষণ হাতের পুস্তক ফেলিয়া আবার ছবির বইটি তুলিয়া লইল। কয়েকটি পাতা উল্টাইয়া একটি সুন্দর ছবি বাহির করিয়া সিরিবালার দিকে বইটা ফিরাইয়া কহিল—

শশিভূষণ। এমন ছবি যে না দেখে সে ঠকে।

সিরিবালা (বাহির হইতে)। ওটা কিসের ছবি ?

শশিভূষণ। এটি একটি বেলুনের ছবি।

সিরিবালা। বেলুন কি ?

শশিভূষণ। ভেতরে আয় তবে বলব।

সিরিবালা পাশের দরজা ভিতরে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘরের মধ্যে তক্তাপোষের একধারে গিরিবালা বসিয়া ছবির বইয়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। শশিভূষণ তাহার দিকে চাহিয়া আছে। গিরিবালা পুস্তক হইতে মুখ তুলিল।

গিরিবালা। কই বেলুন কি বললে না?

শশিভূষণ। বেলুনে করে লোক আকাশে উড়তে পারে।

গিরিবালা (গলায় স্বরে প্রবল বিস্ময়)। আকাশে উড়তে পারে? পাখীর মতন?

শশিভূষণ। হাঁ।

গিরিবালা। কি করে ওড়ে?

শশিভূষণ। বেলুনে একরকম গ্যাস ভরে দেয়। তাতে বেলুনটা অনেক হাল্কা হয়ে ভাসতে ভাসতে উড়ে যায়। ছবিতে দেখতে পাচ্ছিস না:—কি ভাবে বেলুনটা ওড়ান হচ্ছে।

গিরিবালা আবার ঝুঁকিয়া পড়িয়া বেলুনের ছবি দেখিতে লাগিল। তারপর মুখ তুলিয়া শশিভূষণকে প্রশ্ন করিল।

গিরিবালা। বেলুন কি সূর্যটির কাছে যেতে পারে?

শশিভূষণ। না অতদূর যেতে পারে না। সূর্য্যি পৃথিবী থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আছে কিনা?

গিরিবালা। আচ্ছা, শশিদাদা সূর্য্যি বড় না এই পৃথিবীটা বড়? তুমি তো অনেক বড় বড় বই পড়। তুমি তো আমার দাদার থেকে অনেক বেশী পণ্ডিত। দাদা বলে তার বইয়ে নাকি লেখা আছে সূর্য্যিটা পৃথিবীর থেকে অনেক অনেক বড়। (ঠোঁট কুঁচকে বিজ্ঞ হবার ভান করিয়া) কি জানি বাপু আমার তো বিশ্বাস হয় না। চোখের সামনে দেখছি সূর্য্যিটা কতটুকু! তা তোমার বইগুলো তো আমার দাদার থেকে অনেক মোটা। তুমি নিশ্চয়ই ঠিক বলতে পারবে।

শশিভূষণ। সূর্য্যি পৃথিবী থেকে অনেক বড়। কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূরে আছে বলে ছোট দেখায়।

গিরিবালা। কোন্ বইয়েতে এসব লেখা থাকে শশিদাদা?

শশিভূষণ। কেন, ভূগোলে? তুই ভূগোল পড়লেই এসব জানতে পারবি।

গিরিবালা (হতাশার ভঙ্গীতে)। আমি পড়তেই জানিনা। সেদিন দাদার আখ্যানমঞ্জরী নিয়ে একটু পড়বার চেষ্টা করছিলুম, তা দাদা এসে আমার কান মলে বইটা কেড়ে নিলে। কত বললুম, দাদা আমায় একটু পড়তে শেখাবি রে? তা বলে কি মেয়ে মানুষের অত লেখাপড়া শেখার দরকার কী?

শশিভূষণ। (গলায় সমবেদনার সুর লইয়া) গিরি তুই লেখাপড়া শিখবি?

গিরিবালা। কেউ যদি শেখায় তো এক্ষুণি শিখি।

শশিভূষণ। বেশ, তাহলে তুই রোজ আমার কাছে আসিস। আমিই তোকে লেখা-পড়া শেখাব।

গিরিবালা আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া হাততালি দিয়া বলিল—উঃ, আমি লেখাপড়া শিখলে কী মজাই

না হবে। কথামালা, আখ্যানমঞ্জরীর সব গল্প পড়তে পারব। (তাহার পর সেইরূপ আনন্দে নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল। শশিভূষণ স্মিত মুখে তাহার গমন পথে চাহিয়া রহিল।)

কিছুক্ষণ পরে দরজায় মৃদু করাঘাত হইল। পরক্ষণেই গিরিবালার পিতা হরকুমার দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

শশিভূষণ হরকুমারের নিকট গিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল—কে আপনি? (তাহার পর চিনিতে পারিয়া) ও, হরকাকা আসুন, বসুন।

একটু থামিয়া পরে প্রশ্ন করিল—কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কী?

হরকুমার (তক্তাপোষের একধারে বসিতে বসিতে)। আর বোলো না বাবাজী। ছোট লোকদের আস্পর্দা যা বাড়ছে দিন দিন, জমিদারী রক্ষে করাই কঠিন হয়ে উঠল। আমার জমিদার বাবু তো দিব্যি আছেন নাকে সরষের তেল দিয়ে, মরতে মরণ এই হর নায়েবের। তবু তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে এ তল্লাটের প্রজাগুলোকে এখনও শায়েস্তা রেখেছি। কিন্তু চরের ওপরের এক ব্যাটা চাষীকে জব্দ করতে আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে। ব্যাটা ওখানকার গাঁয়ের মোড়ল হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে সুরু করেছে। সেদিন নায়েবের পাওনা আদায় করতে গিয়েছিলুম তো ব্যাটা আমাকে না হক যা নয় তাই বলে অপমান করেছে তা বাবাজী তুমি তো একজন এম, এ, বি, এল একটা পরামর্শ দাও দিকিনি। ওকে আমি ঘাড়ে ধরে উৎখাত যদি না করি তো আমার নাম—

শশিভূষণ। (হরকুমারের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া)। তা আপনি কী করবেন বলে ঠিক করেছেন?

হরকুমার (শশিভূষণের কাছে ঘেঁষে এসে কুটিল হাস্য সহকারে)।—চার পাঁচটা জেলায় ঐ ব্যাটার নামে ডাকাতি, মারপিট, বকেয়া খাজনা, জালিয়াতির নজির দেখিয়ে নালিশ রুজু করে দেব। সেইজন্যেই তো তোমার পরামর্শ নিতে এলুম। মামলাগুলো এমন করে বাঁধতে হবে—

শশিভূষণ। (গম্ভীরভাবে) মিথ্যে মামলা তো?

হরকুমার (প্রথমে একটু থতমত খাইয়া তারপর হেঁ হেঁ শব্দ করিয়া হাসিতে হাসিতে)। হাঁ হাঁ মিথ্যে বৈকি বাবাজী। কিন্তু মিথ্যে মামলা না করলে ও ব্যাটাকে ঘায়েল রাখা যে অসম্ভব।

শশিভূষণ। আমাকে মাফ করুন হরকাকা। আমি আপনাকে মিথ্যে মামলার পরামর্শ দিতে পারব না। আইনকানুনগুলো সরকার বাহাদুর তৈরী করেছে কেন জানেন? দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করতে। তাদের অপব্যবহার আমি করতে পারব না। তা ছাড়া আমি আইনের কতটুকুই বা জানি বলুন?

হরকুমার। (পাটোয়ারী হাসি হাসিতে হাসিতে) হাঁ তা তো বটেই বাবাজী। পাশ করা থেকে ঠায় এই গাঁয়েতেই তো বসে আছ। না গেলে আদালতে না করলে মামলা-মকদ্দমা। তা আইন ভুলে যাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক বাবাজী। হেঁ হেঁ, আমার যেমন ভুতে ধরেছিল। প্রতিবেশী বলে আমি এলাম কিনা তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে। আচ্ছা উঠি।

[হরকুমার প্রস্থান করিলেন।]

এনামেলের বাসন

* দামে সস্তা
* ভারে লঘু
* ব্যবহারে টেঁকসই
* বিজ্ঞান সম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিমিটেড

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,

কলিকাতা—১২

তৃতীয় দৃশ্য

শশিভূষণের ঘর। দেখা গেল শশিভূষণ গিরিবালাকে বর্ণমালা শিখাইতেছে।

গিরিবালা বর্ণপরিচয় সম্মুখে রাখিয়া বর্ণমালা ঝড়ের মতো মুখস্থ বলিয়া যাইতেছে।

শশিভূষণ। উঁহু, ওভাবে বললে হবে না। অক্ষর চিনে বলতে হবে। আচ্ছা এটা কী অক্ষর বল দেখি?

গিরিবালা। বর্গীয় 'জ'

শশিভূষণ। আর এইটা?

গিরি। 'ল'

শশিভূষণ। বর্গীয় 'জ' আর 'ল' জুড়ে মিলে কী হল?

গিরি। 'জল'।

শশিভূষণ। জল কোথায় থাকে বল দেখি?

গিরি। ওমা তা আর জানি না। জল থাকে পুকুরে, নদীতে, বিলে।

শশিভূষণ। কিন্তু সবচেয়ে বেশী জল থাকে সমুদ্রে। সব নদী গিয়ে তাদের জল সমুদ্রে ঢেলে দেয়। কিন্তু সমুদ্রের জল খাওয়া যায় না, ভারী লোনা। এই পৃথিবীতে মাত্র একভাগ স্থল বাকী তিন ভাগই জল।

গিরি (সবিস্ময়ে)। তাই নাকি? (পরে তরল করে) আচ্ছা শশিদাদা কবে আমি কথামালার গল্পগুলো পড়তে পারব বলত?

শশিভূষণ। খুব বেশী দিন লাগবে না। তোর পড়াশোনায় যে রকম চাড়, তুই ছ' মাসের মধ্যেই কথামালা পড়তে পারবি।

শশিভূষণের কথায় গিরিবালা খুশী হইয়া উঠিল। একটা বড় বই শশিভূষণের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—তুমি এই বইটি পড় আমি শুনি।

শশিভূষণ চোখে চশমা আঁটিয়া শেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাকবেথ পড়িতে লাগিল। গিরিবালা তাহার মুখের কথাগুলি গিলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

গ্রামের রাস্তার উপর শশিভূষণের সেই পরিচিত পরাণে ঘেরা জীর্ণ বাহিরের ঘরটি। জানালার পরাণে দিয়া দেখা যাইতেছে শশিভূষণ তাহার অভ্যাসমতো তক্তাপোষে বসিয়া মনোযোগ সহকারে একটি গ্রন্থ পাঠ করিতেছে মাঝে মাঝে হাত পাখা নাড়িয়া বাতাস খাইতেছে।

ঘরের বাহিরে পথে গিরিবালা আঁচলে গুটিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত পরাণ ঘেঁষিয়া জানালার সম্মুখ দিয়া বারম্বার এদিক ওদিক করিতেছে। গিরিবালা পূর্বের অপেক্ষা কিছুটা মাথায় বাড়িয়াছে। তাহার বয়স এখন দশ ছাড়াইয়াছে। পরনে তাহার একটা ডুরে

শাড়ি। গাছ কোমর বাঁধা। তাহার মুখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে ভিতরে পাঠনিবিষ্ট শশিভূষণের সহিত তাহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। কিন্তু আপাততঃ কোনমতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ পূর্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইতে চাহে যে, সম্প্রতি কালো জাম খাইতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করিনা।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও শশিভূষণের ধ্যানভঙ্গ হইল না। তখন গিরিবালা ঘোটাকতক জামের আঁটি কাঠের দরজায় ছুড়িয়া মারিল। খট খট করিয়া শব্দ উঠিল ও শশিভূষণ হাতের বই রাখিয়া জানালার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে ডাকিল—গিরিবালা।

গিরিবালা অবিচলিতভাবে নিজের অঞ্চলের মধ্যে জাম পরীক্ষাকার্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপন মনে এক এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কোনো একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, কই আজ আমাকে জাম দিলে না।

গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে খাইতে আরম্ভ করিল। শশিভূষণ এবার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবির অ্যালবাম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী কবির অঙ্কিত বারোখানি বর্ণাঢ্য চিত্রের একটি সংকলন (৩৬ সি এম × ৩৪ সি এম) প্রকাশ করেছেন। ছন্দোময় রেখায় ও বর্ণসম্পদে অনবদ্য এই চিত্রগুলির বিষয়বস্তু মানুষের আবক্ষ ও পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, কাল্পনিক পশু ও পাখী। ভূমিকার পাতাটিতে কবির স্বহস্তে অঙ্কিত প্রতিকৃতির ছোট একটি ছবি এবং চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব লেখার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই চিত্র-সংকলনের কিছু কপি জনসাধারণের মধ্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি কপির দাম ৮৲ (১২ শিলিং বা ২৷৷০ ডলার)। বিক্রয়-লব্ধ সমস্ত অর্থ চ্যান্সেলারের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জয়ন্তী তহবিলে দেওয়া হবে।

একমাত্র পরিবেশক :

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

কলিকাতা * এলাহাবাদ * বোম্বাই

৷ সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় ৷৷

গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পর সহসা অঞ্চলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের আম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শশিভূষণ কিছুক্ষণ তাহার গমন পথের দিকে হতভম্বের মতো চাহিয়া রহিল। তাহার পর মাটি হইতে আমগুলি একটি একটি করিয়া কুড়াইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল। আমগুলি তক্তাপোষের একধারে রাশিকৃত করিয়া রাখিয়া সে জানালার গরাদের কাছে আসিয়া বাহিরে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরেই আবার গিরিবালা সেই জায়গায় আসিয়া হাজির। তাহার দৃষ্টি এখন আর জানালার দিকে নয়। সে ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া ভূতলে কিছু অনুসন্ধান করিতেছে।

এবার শশিভূষণ গম্ভীরভাবে আমের রাশি হইতে দু' একটি তুলিয়া খাইতে লাগিল ও আঁটিগুলি গিরিবালার দিকে ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। পরে দরজার বাহিরে আসিয়া গিরিবালার হাত ধরিল।

গিরিবালা হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু পলাইলনা। শশিভূষণের পিছনে মুখ লুকাইয়া খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। শশিভূষণ তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ঘরের মধ্যে দেখা গেল দুজনে মুখোমুখি বসিয়াছে।

শশিভূষণ বলিল, কেমন এবার ভাব তো।

গিরিবালা (হাসিতে হাসিতে)। এখনো না।

শশিভূষণ। তা হলে কখন ভাব হবে?

গিরিবালা। আগে কুমারসম্ভবের থেকে শ্লোক শোনাও।

শশিভূষণ। আচ্ছা বেশ, শোনো,—

দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা
লক্ষ্মী পয়া চান্দ্রমসীব লেখা
সুপোষ লাবণ্য ময়ান বিশেষান
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরানি।

শশিভূষণ শ্লোক বলিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল গিরিবালা বিভোর হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শশিভূষণের ঘর। ঘরের মধ্যে দুইটি তোরঙ্গ, গোটাকতক পুঁটুলি ইতস্তত: ছড়ান। পুস্তকের রাশি তাক হইতে নামিয়া মেঝেতে গড়াগড়ি যাইতেছে। শশিভূষণ অত্যন্ত বিমর্ষভাবে কতকগুলি পুস্তক লইয়া একটি পুঁটুলি বাঁধিতে ব্যস্ত।

পাশের দরজা দিয়া গিরিবালা প্রবেশ করিল।

গিরিবালা। একি শশিদাদা পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধছ কেন?

শশিভূষণ। আমি কলকাতায় চল্লুম রে গিরি।

গিরিবালা। হঠাৎ কলকাতা যাচ্ছ কেন? দরকার আছ বুঝি?

শশিভূষণ (গিরিবালার দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া)। না দরকার এমন কিছু নেই।

গিরিবালা। তবে ?

শশিভূষণ (পোঁটলা বাঁধা ছাড়িয়া গিরিবালার সমুখে আসিয়া বসিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল)।—এ গাঁয়ে আমার থাকা দিন দিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। (তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া)—জানিস গিরি, আমি শহরে মানুষ নই। শহরে মানুষের মতো যেখানে সেখানে চটপট কথা বলতে পারি না। শহরে মানুষের মতো কেতাদুরস্ত হয়ে চলতে পারি না। তাই ভেবেছিলাম গ্রামে এসেই থাকব। জীবনটা এখানে শান্তিতেই কাটবে। কিন্তু দেখছি ভুল করেছিলুম। এখানে আমার থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছে।

গিরিবালা। কেন অসম্ভব হচ্ছে।

শশিভূষণ। হরকাকা আমার ওপর নানা কারণে প্রসন্ন নন। তাই তিনি যতদিক দিয়ে পারেন আমাকে উত্যক্ত করে তুলেছেন।

গিরিবালা। কে—বাবা ? কেন তুমি বাবার কী করেছ ?

শশিভূষণ। জানতঃ আমি তাঁর কোন ক্ষতি করিনি। তিনি একদিন একটি প্রজার বিরুদ্ধে আমাকে মিথ্যে মামলা সাজিয়ে দিতে বলেছিলেন। আমি রাজী হইনি। শুনতে পাচ্ছি সেই মামলাতে তিনি হেরে গেছেন। পাঁচ জনের কাছে তিনি বলে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি সেই প্রজাকে সদা পরামর্শ দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার ওপর অত্যাচার সুরু করেছেন নানান দিক দিয়ে। আমার ক্ষেতে তাঁর গোরু মোষ ছেড়ে দিচ্ছে। সেদিন বাড়িতে একগাদা কড়াইয়ের খোলাতে সন্ধ্যেবেলা কে যেন আগুন দিয়ে গেল। বাড়িখানা পুড়তে পুড়তে বেঁচে গেল বরাত জোর। তার ওপর আমার প্রজাপাইককে উনি রীতিমতো উস্কে দিচ্ছেন। তারা আমাকে পর্যন্ত ভয় দেখায় উল্টে আমার নামে মিথ্যে মামলা করবার—খাজনাপাতি দেওয়া তো দূরের কথা। এদিকে রাস্তায় বার হলেই তো হরকাকার লোকেরা আমাকে মারবে বলে শাসায়। সম্প্রতি আবার হামলা করছে ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবে বলে। তার থেকে নৈতিক প্রাণটি থাকতে থাকতে কলকাতায় চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু যেতে আমার এতটুকু ভাল লাগছে নারে গিরি।

গিরিবালা। (ছলছল চোখে শশিভূষণের হাত ধরিয়া) না তুমি যেও না। তুমি চলে গেলে আমার বড্ড মন কেমন করবে। তাছাড়া আমার পড়া বলে দেবে কে ?

শশিভূষণ। (সজল চোখে) আমারও তোর জন্যে খুবই মন কেমন করবে গিরি। তুই যেসব পড়া তেঁতুল, কুলের আচার, কেয়া ফুলের খয়ের আমার জন্যে এনে দিতিস সে সব তো আর কলকাতায় আমায় কেউ এনে দেবে না। কিন্তু আমি এখানে থাকলে এদের অত্যাচার দিন দিন বাড়বে। কোন্ দিন হয়ত সত্যি সত্যি আমাকে মেরে ফেলতেও পারে।

গিরিবালা চোখে আঁচল দিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটু পরে চোখ মুছিয়া কহিল।

গিরিবালা। কিন্তু বাবা আর তোমাকে মারতে পারবে না। সাহেব আজ বাবাকে খুব মেরেছে। বাবা বাড়ি এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে সকাল থেকে। উঠছে না, কারুর সঙ্গে কথা বলছে না, খাচ্ছে না কিছু। খালি শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

শশিভূষণ। (বিস্মিত হইয়া) কোন্ সাহেব মেরেছে রে ?

গিরিবালা। ঐ যে আমাদের গাঁয়ে জরেন ম্যাজেষ্টর এসেছে, সে।

শশিভূষণ। কিন্তু সাহেব হরকাকাকে মারল কেন?

গিরিবালা। তা কি করে জানব?

শশিভূষণ। চল গিরি তোদের বাড়িতে যাব একবার। হরকাকার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

(দুইজনের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

হরকুমারের ঘর। হরকুমার ম্লান মুখে বসিয়া আছে। তাঁহাকে খুবই ক্লিষ্ট দেখাইতেছে। গিরিবালা শশিভূষণকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

গিরিবালা। বাবা দেখো শশিদাদা তোমাকে দেখতে এসেছে।

শশিভূষণ। শুনলাম নাকি জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে মেরেছে?

হরকুমার। (অত্যন্ত ক্লিষ্ট কণ্ঠে প্রায় কান্নার সুরে) ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি নিজে হাতে আমার গা কতক মারতেন তো আমার কিছু বলার ছিল না বাবা শশি। কিন্তু এক ব্যাটা মেথরকে দিয়ে আমার সেই লোকারণ্যের মাঝখানে কানে ধরিয়ে ঘোড় দৌড় করালে। আমার পিতৃপিতামহের এতো বড়ো নাম—ওঃ হো হো হো।

(হরকুমার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন)

শশিভূষণ। (সান্ত্বনার সুরে) একটু চুপ করুন হরকাকা। কাঁদলে তো এর প্রতিকার হবে না। কিন্তু আপনাকে এই অপমান করার কারণটি কি?

হরকুমার। (ঈষৎ সামলাইয়া লইয়া) কদিন আগে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসা থেকে তাঁকে ভারে ভারে ভেট পাঠাচ্ছি। কোথায় গ্রামের সেরা রুই মাছরে, মুর্গী, মুর্গীর ডিমরে, কিছুরই ত্রুটী রাখিনি বাবা। বলি একে ম্যাজিস্ট্রেট তায় আবার সাহেব। একেবারে সাক্ষাৎ কাঁচা খেকো দেবতা। ষোড়শোপচারে পুজোর ব্যবস্থা করেছিলুম বাবা। কিন্তু—

শশিভূষণ। (অধৈর্য হইয়া) কিন্তু কী হল পরে তাই বলুন।

হরকুমার। (পাশে রাখা ঘটি হইতে এক ঢোক জল খাইয়া) কিন্তু কাল সকালে সাহেবের মেথর এসে হাজির আমার বাড়িতে। বলে কী সাহেবের কুকুরের জন্যে চার সের ঘি দিতে হবে।

শশিভূষণ। (অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া) সাহেবের কুকুরের জন্যে চার সের ঘি! কুকুরে এত ঘি খায়?

হরকুমার। কেপেছ তুমি! ও ঘি ও ব্যাটার নিজের ভোগে লাগত। ব্যাটার আবদার শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল, বুঝলে বাবা? তাকে ঠাট্টা করে বল্লুম, বাপুহে সাহেবের কুকুর বিলিতি কুকুর বটে, আমাদের দিশী কুকুরের থেকে সে ঘি অনেকটা বেশী হজম করতে পারে সে কথাও মানি। কিন্তু তা'বলে একেবারে চার সের ঘি তাকে খাওয়ালে তার গায়ে কি একটি লোমও থাকবে? বেটাকে ঘি না দিয়ে তাড়িয়ে দিলুম। ব্যাটা একে জাতে মেথর তায় আবার গো-খাদক ম্লেচ্ছের ভৃত্য যায়। সাহেবকে গিয়ে লাগালে সে নাকি আমার কাছে কুকুরের জন্যে মাংস কোথায় পাওয়া যায় তাই জিগ্যেস করতে এসেছিল, আমি জাতে বামুন বলে তার ওই কথায় তাকে সবার সামনে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি।

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র

আনন্দবাজার

পত্রিকা

✱

আজও

সর্বাগ্রগণ্য

✱

অধুনা বাংলা সংবাদপত্রজগতে

নিঃসঙ্কোচে নূতন পথিকৃৎ

✱

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ স্টারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১

শুধু বাই নয় সাহেবের নামেও নাকি যা-তা কথা বলেছি। ব্যস্, তারপর আর কি আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে সাহেবের কী চোখ রাঙানী—"তুমি কী কারণ বশতো আমার মেথরকে ভুর করিয়াছ?" আমি যতো বলি সাহেব তোমার মেথর মিথ্যে কথা বলেছে, তা সাহেবের কানেই গেল না। সেই ব্যাটা মেথরকে দিয়ে আমার কানে ধরিয়ে ঘোড়দৌড় করালে টাবুর চতুর্দিকে। সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য।—ওঃ হো হো হো হো। (আবার তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে)। আমি যদি সত্যকারের ব্রাহ্মণ সন্তান হই তো ওই বেটা গো-খাদক সাহেব আর ওই বেটা মেথরের মস্তকে বজ্রাঘাত হবে। নির্বংশ হবে, নির্বংশ হবে—

শশিভূষণ। (হরকুমারকে বাধা দিয়া) থামুন হরকাকা। ও শাপশাপি দিয়ে সাহেবদের অত্যাচার থামান যাবে না। আপনাকে সাহেবের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মোকদ্দমা আনতে হবে। আমি আপনার উকিল হয়ে লড়ব।

(হরকুমারের কান্না উঠিয়া গেল। ঠোঁটের দুই পাশ ঝুলিয়া পড়িল। বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করিয়া)

হরকুমার। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা! বল কি বাবা শশি? ও যে একেবারে অ্যাস্ত কেউটে সাপের গর্তে হাত ঢোকানো।

শশিভূষণ। ম্যাজিস্ট্রেট হোক আর যেই হোক। আইন সবাইকেই মেনে চলতে হয়। তা ছাড়া প্রত্যেকটি লোকের নিজের নিজের সম্মান নিয়ে বাঁচবার অধিকার আছে। আপনি নিজে একজন মানী লোক। আপনার পিতৃ পিতামহের নাম এ তল্লাটে সবাই জানে। আজ আপনি ভাগ্যদোষে নায়েব। কিন্তু আপনার স্বর্গীয় পিতা পিতামহরা তো এখানকার প্রখ্যাত জমিদার ছিলেন। আপনাকে কানে ধরে ঘোড়দৌড় করান মানে শুধু আপনাকেই অপমান করা নয়। সে অপমান আপনার বংশ গৌরবকেও ক্ষুণ্ণ করে। না হরকাকা আমি আপনার কোন কথাই শুনব না। আপনাকে মানহানির মোকদ্দমা আনতেই হবে। এই সাহেবরা বড্ড বাড় বেড়েছে। এর প্রতিকার করা দরকার। ওদের জানিয়ে দিতে হবে আমরাও শিক্ষিত ভদ্র মানুষ। আমাদের মান সম্মান আছে। আমাদের আত্মমর্যাদা আছে।

হরকুমার। (ক্লিষ্ট কণ্ঠে) বাবা তুমি যথার্থই বলেছ। এই ব্যাপারে আমার উঁচু মাথা নীচু তো হয়েইছে। আমার বংশগৌরবও একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তাছাড়া গাঁয়ের শত্তুররা তো রীতিমতো হাসাহাসি শুরু করেছে এই নিয়ে। সবই ঠিক, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে মোকদ্দমা!—

এমন সময়ে বাহিরের রাস্তায় ঢাক ঢোলের আওয়াজ উঠিল। ঘ্যান ঘ্যান করিয়া কাঁসি বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গান শোনা গেল :—

গোরা সাহেবের ভালবাসা।
সেখানে নেই বাসুন শুদ্দুর
সেখানে নেই ভদ্দর চাষা॥
গোরা সাহেবের ভালবাসা॥
সেদ ভেট ভারে ভারে
পূজো দিতে দেবতারে
পাব বর মনে বড় আশা।
কলির দেবতার এমনি টান
মেথর দিয়ে ধরিয়ে কান
ঘোড়দৌড় করিয়ে দিলে খাসা॥
আমরা বলি ছি ছি ছি
এমন হলে গলায় দড়ি দি
সমাজে করতাম না যাওয়া আসা॥

হরকুমার। শুনছ বাবা শশি। ওই শোন। আমার শত্রুরা আমার এই দারুণ অবস্থায় কী মজা লুটছে দেখেছ? (হঠাৎ মাথা খাড়া করিয়া তক্তাপোষে চাপড়াইয়া পাগলের মতো) কুছ পরোয়া নেই। আমি নির্ঘাৎ মামলা করব সাহেবের নামে শশি। এ অপমান আমার সহ্য হবে না।

শশিভূষণ। (হরকুমারের হাত দুটি ধরিয়া) শুনে খুব খুশি হলাম। আপনি কোন ভাবনা করবেন না। আমি নিজে আদালতে গিয়ে কেস লড়ব।

হরকুমার। (বিস্মিত হইবার ভান করিয়া) বাপু, শুনলাম তুমি নাকি অকারণে কলকাতায় যাবার আয়োজন করছ? না না, তা কিছুতেই হতে পারে না। তুমি হলে আমাদের গাঁয়ের কতো বড় একটি আশা ভরসা। তোমার মতো বিদ্বান বিচক্ষণ ছেলে গাঁয়ে থাকলে আমরা কতো সাহস পাই মনে। না না, তোমার কলকাতা যাওয়া হতেই পারে না। তা ছাড়া আপাতত: আমাকে এই ঘোর অপমান থেকে উদ্ধার করতেই হবে বাবা।

শশিভূষণ। নিশ্চয়ই করব।

(শশিভূষণের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য

শশিভূষণের ঘর। শশিভূষণ তক্তাপোষের উপর রাশি রাশি আইনের পুস্তক নামাইয়া আনিয়াছে। তাহারই মধ্যে ডুবিয়া সে একটা প্রকাণ্ড কালো মলাটের আইনের বই পড়িতেছে। মাঝে মাঝে সেখান হইতে চোখ তুলিয়া বাহিরে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া বক্তৃতা করিতেছে। আবার পুনরায় পুস্তকের পাতার মধ্যে হারাইয়া যাইতেছে।

পাশের দরজা দিয়া গিরিবালার প্রবেশ। তাহার এক হাতে একটি ছিন্নপ্রকার চারু পাঠ, মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা ও অন্য হাতে কলাপাতায় মোড়া কিছু আচার জাতীয় দ্রব্য। গিরিবালার প্রবেশ শশিভূষণ গ্রাহ্য না করিয়া আগের মতোই সেই প্রকাণ্ড পুস্তকের মধ্যে ডুবিয়া রহিল। গিরিবালা সেই দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবে বোধ হয় সে শশিভূষণের কাছ হইতে কোন রকম একটু আহ্বান আশা করিতেছিল। কিন্তু শশিভূষণের ধ্যান ভাঙিল না। তখন গিরিবালা ডাকিল।

গিরিবালা। ও শশিদাদা ওটা কি বই পড়ছ?

শশিভূষণ। (পুস্তক হইতে চোখ না তুলিয়া নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে)—উঁ?

(তাহার পর জানালার গরাদের দিকে চাহিয়া) Your honour, I seek for your justice for the sake of law and order. (এই পর্যন্ত আসিয়া শশিভূষণের বক্তৃতা ঠেক খাইয়া গেল। সে আবার পুস্তকের মধ্যে ডুবিয়া গেল।)

গিরিবালা।—ও শশিদাদা, ওটা কি বই পড়ছ? খুব ভাল বই?

শশিভূষণ।—(পূর্বের মতো পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই)—হুঁ।

গিরিবালা।—(শশিভূষণের হাতের পুস্তকটির দিকে চাহিয়া মুখ মটকাইয়া ভেংচি কাটিয়া

আপনমনে)—ভাল না ছাই। বইটির চেহারাটা দেখনা যেন একটা মুখকো কালো হোঁদল কুতকুতে। ওরই কিছুতেই ভাল বই নয়।

(তাহার পর গিরিবালা তাহার হাতের চাকপাড় খুলিয়া দুলিতে দুলিতে পড়িয়া যাইতে লাগিল।)

শশিভূষণ সেদিকে নজর না দিয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া কয়েকবার পায়চারি করিয়া লইল। হাত দিয়া বার বার মাথা চুলকাইল। তাহার পর জানালার গরাদগুলোকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—

শশিভূষণ।—Honourable sir, the despotism of the whitemen have shaken the patience of the docile Indians. There are bindings of law and order in every form of administration and your Honour, I regret very much to state that the white administrators, are too careless to them. They treat the Indians like the animals of the street. What can be more deplorable than that in whole history of Humanity! And your Honour, I like to submit to you sir, that this case will bear a bright example of the same fact which will undoubtedly prove my statement that I have made just now.

গিরিবালা পড়া থামাইয়া অবাক হইয়া শশিভূষণের বক্তৃতা দেওয়া মূর্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর জানালার কাছে আসিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—

গিরিবালা।—স্বর্ণ ভাই, তুই আসনে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

কিন্তু তাহার চীৎকারেও শশিভূষণের ধ্যান ভাঙিল না। সে তাহার সেই মোটা পুস্তকটি লইয়া আবার তাহাতে মনঃসংযোগ করিয়াছে।

গিরিবালা উঠিয়া গুটি গুটি দরজার কাছে গেল। তাহার পর দরজার উপর হুমড়ি খাইয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমিদার বাবুর বাটি। জমিদার বাবু একটি সাজান ঘরে লম্বা একটা কৌচের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া কসিতে তামাক টানিতেছেন। মাথার উপর টানাপাখা চলিতেছে। পাশের দরজা দিয়া হরকুমারের প্রবেশ।

হরকুমার। (বিনীত ভঙ্গীতে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে) হুজুর আমায় তলব করেছেন!

হরকুমারকে দেখিয়া জমিদার বাবু ভ্রূ কুঁচকাইয়া উঠিয়া বসিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে হুংকার ছাড়িয়া উঠিলেন।

জমিদারবাবু।—তুমি আজই তোমার কাজে ইস্তফা দাও, নায়েবি করা তোমার দ্বারা হবে না। নিজের সর্বনাশ তো তুমি করবেই—আমারও সর্বনাশ করে ছাড়বে। সায়েব সুবোধের সঙ্গে কীভাবে ব্যাভার করতে হয়, বুড়ো হয়ে মরতে চললে, আজও তা শেখোনি। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব কাল আমার বাড়িতে অতিথি হয়েছেন। সায়েব লোক ভাল তাই সবকথা আমায় খুলে বললেন, অন্য সায়েব হলে ওর মধ্যে সর্বনাশ করে ছাড়ত।

কল্যাণীয়েষু

সমাধিলেখ এবার বেরি, তুমি নেই। তাঁরা বোধ হচ্ছি। এখানে সেই সমাধির চারধারের কোলাপেষবার তোমার কাছ চুঁইয়ে যায় সমাধি। সমালোচনা করবার মত কথা সবের মধ্যে ঐরকম— তুমি যাবলে নেই বলে সেজন্যই সমাধির কথার লেখা হয় নেই। যা হোক মুখোমুখি দাঁড়াব। চলবে পড়ছি বিদায় — সমাধি মন্দিরের দরজা করব। সেখানে যোগ কোলা দিয়ে কোথায় দরজা সইব লেখা ছিলির কার দেখতে হবে। ইটালি, ফুটবলের ক্লাসিসি, ভেনাসের, ভিনাস ফুটবলের এবং নরোয় — এই নাম দেখা দেখাতে হবে। তোমরা কেউ মনে সমাধির রেখা হবে। যা হোক এই ফুটবলারের ধর্মী কোনো সবাই সমাধি পুরুষ দেখতে পারবে।

দেখে ফিরে ফুরের মোতে। সমর সমাধানের ফুটবলার

নক্ষত্রের সুকুমারী সমুদ্রবাসে ফাঁদ ফাঁদ মিথ্যেকথা দেয় দাদু। তুমি কি ভাবো সমি এখন দেখে বাড়িবাসের পর গ্রাম কর ঘরের চলবার দেখ কর? সমাধানে তুমি আবার দোষ মাব করে? সমি যদি ঘরের ঐখানে ঘরের দোতে পড়ে বিরাজের সমাধিটি দিয়ে পারের চড়ুয়া দিয়ে সমি সমাধি সমার চাত দাব দে, — তোমার কুমারীদের সঙ্গিতে সমার ঘুম হবেনা। তোমরা সমাধানের মেয়ে দাব তার বাড়ি দাঁড়াবে তখন মিলীর মেয়েসমাধার তার ধরার দেবে কে? সমি দাঁড়ি হিসাবে পারের পাথরে, সমাধি দাব হচ্ছ সুযোগমতো চাবি, সমাধানের কাছ হচ্ছি করে দাঁড়ি দেওয়া— সমার সমাধানের হলের লোক নই— ধরবার ভাবুকে তার সমাধানের তার পড়ে। এতদিন এটুকু তোমার লেখা উচিত ছিল যে সমি ঘরোয়া সমাধানের। যা হোক, দেখা হিলে মোকাবিলা হবে। ইতি তোমার মমা।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাধি/বেড়ীর সমার কথার দিয়ে— তুমার ঘিরি ঘুরাবার নেই— সমাধি দুটিতে।

কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র

হরকুমার।—(ক্লিষ্ট কণ্ঠে) হুজুর একগ্রাম লোকের সামনে আমাকে তিনি যে অপমানটা করেছেন—

জমিদার।—(চোখ পাকাইয়া হরকুমারের কথায় বাধা দিয়া) ওঃ ওঁকে অপমান করেছেন। অপমান যদি করে থাকেন তো বেশ করেছেন। ওঁরা হলেন ধওমুণ্ডের কর্তা। তুমি অপরাধ করেছিলে তার সাজা তোমাকে তিনি দিয়েছেন।

হরকুমার।—(পূর্ববৎ ক্লিষ্ট কণ্ঠে) হুজুর আমার অপরাধটা কোথায়? সায়েবের মেথর এসে আমার কাছে সায়েবের কুকুরের জন্যে চার সের ঘি চাইল।—হুজুর আপনিই বলুন না, কুকুরে চার সের ঘি খেতে পারে। সেইটা দিইনি বলে সে আমার নামে মিথ্যে করে নানা কথা সায়েবের কাছে লাগাল। তাইতেই সায়েব রেগে গিয়ে—

জমিদার বাবু।—(হরকুমারের কথায় আবার বাধা দিয়া দাঁতমুখ খেঁচিয়া)—ঘি যখন চাইল তখন বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা দিলে না কেন? ঘি কিনতে কি তোমার বাপের কড়ি লাগত?

হরকুমার।—আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দুর্বুদ্ধি হয়েছিল।

জমিদার।—তাছাড়া দেখছি তোমার বুকের পাটাও তো কম নয়। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নামে আবার মানহানির মোকদ্দমা এনেছ? কুমীরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করবে? সায়েবের নামে নালিশ করতে তোমায় কে বললে?

হরকুমার।—(চিঁ চিঁ করিয়া) দোহাই হুজুর ধর্মাবতার, নালিশ করবার ইচ্ছে আমার এতটুকু ছিল না। ওই আমাদের গাঁয়ের শশি, এম. এ. বি. এল. হয়ে এসে বসে আছে আজ ক'বছর। তার কোথাও মামলা মোকদ্দমা জোটে না। সেই ছোঁড়াই আমাকে নিতান্ত জোর করে প্রায় আমার মত না নিয়েই এই মামলা দায়ের করেছে হুজুর। আমার কোন দোষ নেই এতে।

জমিদার।—(ভেংচি কাটিয়া) তুমি কচি খোকা, তুমি কিছু জান না বটে! (তাহার পর) একটু থামিয়া) ওসব উটকো উকিলের কথা খবরদার শুনবে না। যাও মামলা তুলে নেও গে। আমি সায়েবকে ডাকছি তাঁর হাতে পায়ে ধরে মাফ চেয়ে নাও।

(জমিদার বাবু উঠিয়া গেলেন ও কিছুক্ষণ পরে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবকে লইয়া প্রবেশ করিলেন) হরকুমার উভয়ের পায়ের কাছে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। পরে উঠিয়া হাঁটু গাড়িয়া হাত জোড় করিয়া কহিলেন—

হরকুমার। হুজুর মা-বাপ, আমাকে মাফ করুন হুজুর।

জমিদার বাবু। (সায়েবের দিকে চাহিয়া) সায়েব আমার ভারী রাজভক্ত হুজুর। ওর দ্বারা এ কাজ হয় নি। গাঁয়ে এক ছোকরা উকিল আছে, নাম শশীভূষণ না কি। তার এখনও গোঁফ দাড়ি গজায়নি হুজুর সে-ই সায়েবের নাম দিয়ে মোকদ্দমা ঠুকেছে। না হলে আমার সায়েব তেমন লোক নয় হুজুর। আপনি এবারটা ওকে মাপ করুন। ও যা অপরাধ করেছে তার জন্যে ও প্রায়শ্চিত্ত করবে।

(হরকুমারের প্রতি চাহিয়া) সায়েবের বাড়িতে কাল খুব বড় দেখে একটা ভেট পাঠাবার ব্যবস্থা কর গে।

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট।—সায়েববাবু, রাগের মাথায় তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়া আমি দুঃখিত আছি।

হরকুমার।—(বিগলিত হইয়া, হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে) তাতে কি হয়েছে হুজুর, তাতে কী হয়েছে। আপনি হলেন আমাদের মা-বাপ। মা-বাপ কখনো রেগে শাস্তি দেন কখনো আবার আদর করে কোলেও টেনে নেন। এতে সন্তানের বা মা-বাপের তো দুঃখের কারণ থাকতে পারে না।

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আমি শুনিয়াছি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শশী উকিলকে মামলা উঠাইয়া লইতে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। সে রাজী হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সেজন্য ভারী রাগ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া মামলা উঠাইয়া দাও। আর তাঁহাকে বলিবে যে শশিভূষণ কংগ্রেস করে। তাই যে কোন উপলক্ষ্যে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করিবার জন্য সে প্রস্তুত।

হরকুমার—হুজুর আমি কালই জেলায় গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে। আর হুজুর যা যা বললেন, ও সবই আমি বলে আসব হুজুর। (হরকুমার প্রস্থান করিলেন)

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট।—(জমিদারের দিকে চাহিয়া) We should crush these pricking thorns of Congress at any cost.

তৃতীয় দৃশ্য

হরকুমারের বাড়ির বাহিরের ঘর। হরকুমার একখানা মলিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরিয়া বাহিরে যাইবার আগে পান চিবাইতে চিবাইতে তামাক খাইতেছেন। ঘরের বাইরের দিকের দরজাটা খোলা তাহার সম্মুখে রাস্তা। ভিতরের দিকে দরজা দিয়া হরকুমারের গৃহিণী প্রবেশ করিলেন। স্থূলকায়া মাঝবয়সী মহিলা।

গৃহিণী।—বলি এসব বড়াচুড়ো এঁটে চললে কোথায়?

হরকুমার।—জেলায় যেতে হবে এখুনি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট করে দেছেন। এখন আমি যাকে খুশি বেঁধে এনে পঞ্চাশ টাকা ফাইন আর ছ'মাস জেল দিতে পারি।

গৃহিণী। (বাহিরের দরজা দিয়া দেখা গেল শশিভূষণ দরজা দিয়া একটু মুখ বাড়াইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল) ইহারা কথায় ব্যস্ত থাকায় তাহা লক্ষ্য করিল না।

গৃহিণী। - তা তোমার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের তো এত পীরিত হবার কথা নয়। তুমি তো শুনি শশী উকিলের পরামর্শে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মোকদ্দমা করেছ।

হরকুমার। হর নারেব যদি শশি উকিলের পরামর্শে চলত তো স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দু দিনে তাকে পথে বসতে হতো। আমি কি সেই ছেলেরে বাবা? আমি মামলা টামলা সব তুলে নিয়ে ছুটো ম্যাজিস্ট্রেটকে ভেট দিয়ে একেবারে গলিয়ে জল করে দিয়েছি। কথায় বলে না, পূজো পেলে যম পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় তো সায়েব। অনেক কৌশল করে আজকাল বাঁচতে হয়, বুঝলে গিন্নি।

গৃহিণী। তা তুমি যা খুশি তাই করগে। কিন্তু আমার কথাগুলো কানে তুলবে কবে? কবে থেকে বলছি গিন্নি এই দশ ছাড়িয়ে এগারতে পড়ল। একটা ভাল ছেলের সন্ধান কর। অনারারী ম্যাজেষ্টর হলেই কি ভাল ছেলে তোমার বাড়ি বয়ে এসে মেয়েকে বে' করে যাবে।

হরকুমার। আঃ, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? হবে হবে সব হবে। অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ির

মেয়ে নেবার জন্যে ভাল ছেলেদের বাপেদের মোলা সব্ সব্ করবে গিন্নি, সব্ সব্ করবে। তা ছাড়া আমি খরচ পত্তরও করব যথেষ্ট। ছেলের জন্যে তুমি ভেবো না, চাঁদির জুতো মেরে আমি ছেলে নিয়ে আসব। হাঃ, হাঃ, হাঃ।

(হরকুমার একপ্রকার আত্মপ্রসাদ ও দম্ভ মিশ্রিত হাসি হাসিতে লাগিলেন।)

এমন সময় ভিতরের দরজা দিয়া গিরিবালা নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল ও তাহার পিতা মাতার সম্মুখ দিয়া বাহিরের দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

গৃহিণী। এই দ্যাখো এতো বড়ো মেয়ে যেই যেই করে পাড়া বেড়াতে চললেন।

হরকুমার (রুক্ষ স্বরে)। এই গিরি, কোথায় যাচ্ছিস।

গিরিবালা (থমকিয়া দাড়াইয়া)। শশিদাদার বাড়ি।

হরকুমার (মেয়েকে ভেংচি কাটিয়া)। শশিদাদার বাড়ি। শশিদাদার বাড়িতে কি গুড় আছে? (ধমক দিয়া) যাঃ ঘরে যা। শশিদাদার বাড়ি যেতে হবে না। বাড়ি মেয়ে, আজ বাদে কাল শ্বশুর ঘর করতে যেতে হবে, সে খেয়াল নেই। লাজ লজ্জা বলতে সব পুড়িয়ে খেয়ে বসে আছে। ঘর কন্নের কাজ গেল এখন ব্যাং ব্যাং করে শশিদাদার বাড়ি চলেছেন। খবরদার ফের যদি শুনি তুমি শশির বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছ তো দেখবে তোমায় আমি কি করি।

(গিরিবালা আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে মৃদুগমনে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বাহিরে দেখা গেল শশিভূষণও দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।)

চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য

গঙ্গার ঘাট, সকালবেলা একটা নৌকাতে মাঝি শশিভূষণের টিনের বাক্স ও পুস্তকের বোঝাগুলি ঘাট হইতে তুলিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে। শশিভূষণ ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের দিকে— চাহিয়া আছে। অদূরে গ্রামের মধ্যে শানাই বাজিতেছে। তাহারই শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। জনৈক গ্রামবৃদ্ধ স্নান করিতে নামিতেছিলেন। শশিভূষণকে দেখিয়া আগাইয়া আসিলেন।

গ্রামবৃদ্ধ। কি বাবা শশি, এই সকালবেলা সেজে গুজে ঘাটে দাঁড়িয়ে যে?

শশিভূষণ। কলকাতায় চললাম জ্যেঠামশাই।

(হেঁট হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিল)

গ্রামবৃদ্ধ। সেকি! গ্রামে আজ প্রকাণ্ড উৎসব, হর-নারায়ণের মেয়ের বে'। সাঁয়া গা নেমন্তন্ন। আর তুমি কিনা আজই গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছ?

শশিভূষণ। কিন্তু আমি তো কোন নিমন্ত্রণ পাইনি জ্যেঠামশাই।

বৃদ্ধ। এঁ্যা, সেকি! তুমি হলে তার পাশের বাড়ির লোক আর তোমাকেই কিনা সে বাদ দিলে! এঃ হরটা একেবারে চামার। অবশ্য জানতুম তোমার সঙ্গে তার আকড়া আকড়ি সেই ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে মামলা উঠিয়ে নেবার পর থেকেই। কিন্তু এসব সামাজিক ব্যাপারে যে কুচ্ছ

শত্রুতা মনে রাখে সে ব্রাহ্মণবেশী চণ্ডাল। তাছাড়া আমার বড়ছেলে বলছিল, তোমাকে নাকি হর নানান উৎপাতে একেবারে উদ্বাস্ত করে তুলেছে ?

শশিভূষণ। জ্যেঠামশাই, একটু শান্তিতে থাকবার জন্যে দেশে এসেছিলাম। কিন্তু হরকাকা আমাকে টিঁকতে দিলেন না। সেই মামলা তুলে নেবার পর থেকে হরকাকা আমাকে আর আদবে সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই উঠে পড়ে লেগেছিলেন আমাকে গ্রাম থেকে তাড়াতে।

বৃদ্ধ। উঃ কী পাষণ্ড। যাই হোক্ বাবা আশীর্বাদ করি যেখানেই থাক আত্মধর্ম থেকে বিচ্যুত হোয়ো না। দেখবে ঈশ্বর তোমার সহায় হবেন।

(বৃদ্ধ গিয়া গঙ্গায় নামিলেন। শশিভূষণ তেমনি উদাস নেত্রে গ্রামের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

মাঝি। বাবু মশাই, জোয়ার এসে গেছে উঠে পড়ুন।

শশিভূষণ। (অন্যমনস্কভাবে) উঃ ?

মাঝি। (নৌকা ছাড়িয়া শশিভূষণের কাছে আসিয়া) বাবুমশাই জোয়ার খুব জোর এসেছে, এবার উঠে পড়ুন। বেলা তো অনেক হল।

শশিভূষণ। (গ্রামের দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ, চল চল।

(নৌকায় গিয়া উঠিয়া বসিলেন)

বয়র বয়র বলিতে বলিতে বলিতে মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকার মধ্যে শশিভূষণ দুই হাঁটু চিপিয়া ও তাহে ওষ্ঠ চিপিয়া ক্রন্দন রোধ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গার ঘাট পরদিন সকাল। ধীরে ধীরে একটা নৌকা ভিড়িল। তাহার ভিতর হইতে প্রথমে শশিভূষণ লাফাইয়া নামিল। তাহার পর মাঝি ও মাল্লারা কয়েকটি লোককে নামাইয়া আনিল। লোকগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাহাদের চোখমুখ শুকাইয়া গিয়াছে। মাথার বেশ বিপর্যস্ত, চোখে ভয়বিহ্বল দৃষ্টি। এই লোকগুলির বেশবাস মাঝি মাল্লাদের মতোই। শশিভূষণ সবাইকে ধরিয়া গঙ্গার ঘাটের উপর বসাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ক্রন্দনরত ব্যক্তি। হায় আল্লা, আমার কী সর্বনাশ হল। আমি একেবারে পথে বসলুম। আমার অত বড় নৌকোখানা একখানা কাগজের নৌকোর মতো ফুস করে ডুবে গেল। ও হো হো—

(আবার বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর আকাশের দিকে চাহিয়া ক্রন্দনরত নেত্র তুলিয়া) খোদাতালা, তুমি যদি সত্যি হও তবে এর বিচার কোরো মালিক ; কোম্পানীর জাহাজের শাহা সায়েবের এ অত্যাচার, তুমি এর বিচার কোরো।

(তাহার ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন ঘাটের লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। ওদিকে শশিভূষণ নৌকা হইতে মাল নামাইতে ব্যস্ত।)

অনেক ব্যক্তি। (উত্তেজনা সহকারে) কি হয়েছে সে মিঞা জান ?

মিঞাজান। (অশ্রু মুছিয়া) কোম্পানির জাহাজ আমার নৌকোর সঙ্গে কাল বিকেলে পাল্লা দিতে শুরু করলে। আমার নৌকো বোম্বাই পাট। দু'খানা পাল তুলে দিয়েছিলুম। তাতে দক্ষিনে বাতাস লেগে নৌকো আমার রাজহাঁসের মতো তর তর করে ছুটছেন বাবা। ইষ্টিমারখানা আমার নৌকোটাকে ধর ধর হতেই আমি তিন নম্বরের ছোট পালটা তুলে দিলুম। ইষ্টিমার আমার নৌকোর কাছে হেরে গেল। সুমুন্দির পো ম্যানেজার ইষ্টিমারের ওপর থেকে তাই-না দেখে বন্দুকের গুলিতে আমার পালখানা ঝাঁঝিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা বানচাল হয়ে গেল। (শশিকে দেখাইয়া) এই বাবুর নৌকা তখন আমার পাশেই ছেল তাই রক্ষে। বাবু আমাদের জানে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আমার চাচার পো আবদুল ভেতরে মশলা পিষ্‌ছেল, তাকে আর পাওয়া গেল না বাবা। হায় আল্লা, (আবার বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল)

শশিভূষণ। কেঁদো না বড় মিঞা। আমি তোমার নৌকো আর পাট উদ্ধার করবার জন্যে এক্ষুনি লোক লাগাচ্ছি। আবদুলেরও সন্ধান করছি। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। ওই কোম্পানির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে তোমাকে পুলিশে দরখাস্ত দিতে হবে। এদের অত্যাচার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ওরা এদেশের লোককে মানুষ বলেই জ্ঞান করে না।

মিঞাজান। (কান্না থামাইয়া, অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইয়া) নৌকো তো মজেছে বাপজান, এখন নিজেকেও মজাতে বলছ ?

শশিভূষণ। না, না, মজাতে বলব কেন ? কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে অত্যাচার যে বাড়তেই থাকবে।

দ্বিতীয় মাঝি। সায়েবদের সঙ্গে কাজিয়া করা কী সোজাকথা বাপজান ?

তৃতীয় মাঝি। ওরা হল গিয়ে সরকারের জাত, আইনকানুন সব তো ওদের দিকেই বাবু।

মিঞাজান। তা ছাড়া বাপজান, গেরথমেই তো পুলিশকে এক কাঁড়ি টাকা ঘুষ দিতে হবে। কাজ কম্ম, আহার নিদ্রে ছেড়ে দিয়ে কেবল কোট আর ঘর করতে হবে। তারপর সায়েবের নামে নালিশ করলে কি বিপাকে সরকার ফেলবে তা কে জানে ? তাছাড়া আমরা মুরখ্‌খু লোক, না জানি আইন, না জানি কানুন—

শশিভূষণ। তোমার কোন ভয় নেই মিঞাজান। আমি ওকালতি পাশ করেছি, আইন কানুন কিছু কিছু আমার জানা আছে। আমি তোমাদের হয়ে কেস লড়ব।

দ্বিতীয় মাঝি। কিন্তু আদালতের খরচাও তো কম নয়।

শশিভূষণ। আদালত খরচা আমি দেব যা লাগে। তোমরা শুধু নালিশ কর একবার। আমি তোমাদের হয়ে সাক্ষী জোগাড় করব। ইষ্টিমারের প্যাসেঞ্জাররা সবাই সাক্ষী দেবে। এ কেসে তোমাদের জিত নির্ঘাৎ। আর একবার জিততে পারলে সায়েবের কাছ থেকে তোমার নৌকোর খেসারতের টাকা সবটা আদায় করা যাবে।

মিঞাজান। যদি খেসারত আদায় করা যায় তবে আমি নালিশ করতে রাজী। কিন্তু আমি কিছু বকল বইতে পারব না বাপজান। ও সব কোট কাচারি দেখলে আমার বুকের মধ্যে গড়ের বাদ্যি বাজতে থাকে।

সরস্বতী লাইব্রেরীর কয়েকখানা বই

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

দেশ পরিচয় ২·৫০

"ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, ভাষা, ধর্ম—এক কথায় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে শুধু মাত্র কিশোরদের কেন, অনেক প্রবীণ ব্যক্তিরও স্বাভাবিক অজ্ঞতার কথা সকলে অবগত আছেন। অবশ্য এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। আলোচিত গ্রন্থে রাজনীতিবিদ ও সুপরিচিত জননেতা শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বশ্রেণীর পাঠকদের উপযোগী করে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির এক পূর্ণাবয়ব পরিচয় দেবার প্রয়াসী হয়েছেন…" —আনন্দবাজার পত্রিকা

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত [৪র্থ সংস্করণ] ১·০০

"কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা ভালো কাগজে ছাপা ছবিওলা একখানা ঝকঝকে বই। লেখক চন্দ্রগুপ্ত এবং তৎকালীন ইতিহাসকে অবিকৃত রাখিয়া ছেলে মেয়েদের জন্য সুন্দর, সহজ ভাষায় এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, পুরু প্রভৃতির সহিত তাঁহার যুদ্ধের ইতিহাসও, কিশোর-কিশোরীরা এই কাহিনীর মধ্য দিয়া বিস্তৃতভাবে জানিতে পারিবে।" —যুগান্তর

সৃষ্টি ও সভ্যতা [শোভন ৩য় সংস্করণ] ২·৫০

"দেশ" পত্রিকা বলেন - সৃষ্টির আদি থেকে পৃথিবীর ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে। সভ্যতা কেমন করে গড়ে উঠলো, তারপর তার বিকাশ ও পরিণতি কোথায় এনে পৌঁছে দিয়েছে পৃথিবীকে, লেখক তা সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মুখ্যত ছোটদের জন্য লেখা হলেও এ গ্রন্থ সকলের জন্যই। অজস্র ছবি দিয়ে বইটিকে বুঝবার সুবিধা করে দিয়েছেন প্রকাশক। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই যত বেশী প্রকাশিত হয় ততই দেশের মঙ্গল।

অধ্যাপক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা ৩·০০

"দেশ" পত্রিকার অভিমত ··· বর্তমান যুগে শিক্ষা-সমস্যা লইয়া পৃথিবীময় দুশ্চিন্তা। গ্রন্থকারের কৃতিত্ব যুগোপযোগী এই সমস্যাটি সমাধানের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। অবাধ্য শিশুদের শিক্ষা সমস্যার বিভিন্ন দিক যথাসম্ভব অল্প কথায় অথচ সুবোধ্যভাবে গ্রন্থটিতে আলোচিত হইয়াছে। দেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বহু প্রচলিত হউক—ইহাই কামনা করি।"

অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়ের সদ্য প্রকাশিত

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ ৬৲

স্বদেশী যুগের উজ্জ্বল ইতিহাস।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারের সম্পদ হয়ে থাকবে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ [২য় সংস্করণ] ১·৭৫

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

নরেন্দ্রনাথ রায়ের বইটি সুষ্ঠু ভাষায় রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' যে বিদ্রোহের কাহিনী চিরস্মরণীয় করে দিয়েছেন, সেই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীই গল্পের আকারে ছোটদের জন্য লিখিত এই বইতে পরিবেশন করা হয়েছে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ মৌমাছির তিনখানা বই ॥

রাষ্ট্রজ্ঞানের মধুভাণ্ড [শোভন সংস্করণ] ৩·০০

"রাষ্ট্রজ্ঞানের মধুভাণ্ড" বইটি নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর অতিরিক্ত পঠনের উপযোগী করে লেখা। ভারতের—রাষ্ট্র সাধনা, রাষ্ট্র চেতনা, রাষ্ট্র বিপ্লব, রাষ্ট্র-সংগ্রাম, রাষ্ট্র সংস্কার, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও নয়া ভারতের ভিত্তি—এই আটটি অধ্যায়ে ভাগ করে এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য মৌমাছি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রশ্ন ও জবাবের আকারে এই বইয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন।…… কিশোরদের জন্য লেখা হলেও বয়স্ক ও বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই এমন সুন্দর একটি রেফারেন্স বই হাতের নাগালে নিশ্চয়ই রাখবেন।"…… —আনন্দবাজার

মনীষীদের ছোটবেলা [৬ষ্ঠ সংস্করণ] ২·২৫

"রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, পরমহংসদেব, এডিসন, হেনরী ফোর্ড, ছান্স এণ্ডার্সন, স্যার রাজেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী—এই নয় জনের ছোট বেলার কাহিনী কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া ছেলে-মেয়েরা জ্ঞান এবং আনন্দ দুইটাই পাইবে। মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতা বিশেষ প্রশংসনীয়।" —যুগান্তর

অমর বাণী ১·২৫

"আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদের দেশের মনীষী ও মহাত্মাদের কতকগুলি বাছাই করা 'অমর বাণী'র সংকলন।……

পুস্তকখানিতে কয়েকজন মনীষীদের প্রতিকৃতি ও পরিশিষ্টে 'অমর বাণী' রচয়িতাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থটির সম্পদ-বৃদ্ধি করিয়াছে। এরূপ সংকলনের পথ-প্রদর্শক হিসাবে গ্রন্থকার অভিনন্দন যোগ্য।"

—আনন্দবাজার

॥ ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ ॥

শশিভূষণ। সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। কাল এসো আমি তোমাকে সঙ্গে করে পুলিশের কাছে নিয়ে যাব। আজ বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করগে।

ডোঙা নৌকোর মাঝিদের প্রস্থান। শশিভূষণও প্রস্থানোদ্যত। এমন সময়ে গাঁয়ের পথে শানাই ও ঢোলের বাজনা শোনা গেল। একটু পরেই একদল স্ত্রী লোকের সহিত সদ্যবিবাহিতা গিরিবালা ও তাহার বর আসিয়া হাজির হইল। সঙ্গে গাঁয়ের বহু ছেলে পিলে। হরকুমার ও তাঁহার গৃহিণীও কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন। শশিভূষণ ঘাট ছাড়িয়া দূরে একপাশে দাঁড়াইল।

জনৈকা ঠানদিদি কাঁদিতে কাঁদিতে গিরিবালার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন—

ঠানদিদি। দিবি মহাদেবের মতো সোয়ামী পেয়েছিস দিদি। পাকা চুলে সিঁদুর পরে ঘর সংসার কর। ও ভাই বর; আমার নাতনির যেন অযত্ন না হয় দেখো।

(গিরিবালা তাহার মাতা-পিতাকে প্রণাম করিল। হরকুমারের গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গিরিবালাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল)—

হরকুমারের গৃহিণী। যা যা বলেছি সব মনে রেখো মা। শ্বশুর-শাশুড়ির আদর যত্নে যেন কোন ত্রুটী রেখো না। ঘর সংসারের কাজে সব সময়ে মন রেখো। কেঁদো না মা তোমার বাবা এই ক'দিন পরেই তোমায় দেখতে যাবেন। তা ছাড়া তুমি তো লিখতে শিখেছো, সময় পেলেই আমাদের চিঠি দিও।

লেখাপড়ার কথা হইতেই গিরিবালা সচকিত হইয়া উঠিল। গাঁয়ের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া নৌকাতে উঠিল। নৌকা বয়র বয়র করিয়া ছাড়িয়া ছিল। গাঁয়ের সবাই চলিয়া গেল। সবশেষে শশিভূষণ চোখের চশমা খুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে গাঁয়ের রাস্তা ধরিল।

তৃতীয় দৃশ্য

গঙ্গার ঘাট। শশিভূষণ পুনরায় বাক্স পোঁটলা লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিতেছে। মাঝি জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে। শশিভূষণ সেই পূর্বের উল্লিখিত গ্রাম বৃদ্ধের সহিত কথাবার্তা কহিতেছে।

গ্রাম বৃদ্ধ। কী বাবা' আবার যে কলকাতায় যাচ্ছ? তোমার মামলার কী হল?

শশিভূষণ। সতকাল ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিয়েছেন। ইষ্টিমার কোম্পানীর ম্যানেজার বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ। সেকি, এতবড় অপরাধ করে খালাস পেয়ে গেল! ইংরেজের এই অন্যায় অত্যাচার তোমরা এর কী কোন প্রতিকার নেই বাবা?

শশিভূষণ। কিন্তু ত্রুটী যে আমাদেরই জেঠামশাই। আমি একটি ভাল সাক্ষী জোগাড় করতে পারলাম না, যাতে করে প্রমাণ করি যে সাহেব ইচ্ছে করে নৌকোর পালে গুলি ছুড়েছে। ইষ্টিমারের যাত্রীদের নামধাম সংগ্রহ করে দোরে দোরে ঘুরেছি। হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করেছি। সবার এক কথা "আমি এসব ব্যাপারের কিছু দেখিনি।" আমাদের কি এতটুকু মনুষ্যত্ব আছে জেঠামশাই যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তেমন করে প্রতিবাদ করব আমরা। আমরা সাহেবদের ভয়েই আধমরা হয়ে আছি।

আমি একটি সাক্ষী দাঁড় করাতে পারলাম না। অন্যদিকে সাহেব বললে সে আকাশে উড়ন্ত পাখি শিকার করছিল। তারই একটি গুলি হঠাৎ কেমন করে ছিটকে এসে পালে লাগে। এটি তার ইচ্ছাকৃত নয়। অথচ আমি জানি, আমি নিজে দেখেছি সাহেব ইচ্ছে করে বন্দুক তুলে পালে গুলি করেছে।

(তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে) নাঃ এখানে মানুষ বাস করতে পারে না জ্যাঠামশাই। চলি তাহলে।

(নীচু হইয়া বৃদ্ধের পদ স্পর্শ করিয়া নৌকায় উঠিল।)

নৌকা বদর বদর করিয়া ছাড়িয়া দিল।

চতুর্থ দৃশ্য

নদীর এক অংশের দৃশ্য। একপাশে নৌকা যাতায়াতের রাস্তা, বাকিটায় বাঁশ পুতিয়া জেলেরা জাল পাতিয়াছে। পাশে তীরে শশিভূষণের নৌকা বাঁধা। বেগ বেগ করিয়া জালের উপর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নৌকা আসিয়া পড়িল। জেলেরা একদিক হইতে চেঁচাইয়া উঠিল—সামাল, সামাল।

পুলিশ সাহেবের বোট থামিল। সাহেব বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া হুকুম দিলেন—পুলিশ সাহেব। হারামজাদাদের জাল টুকড়া টুকড়া করিয়া কাটিয়া দাও। আর উহাদের গরদান ধরিয়া এখানে লইয়া আস।

(হুকুম পাইয়া সাহেবের লোকেরা চারটি জেলেকে গর্দান ধরিয়া আনিল।)

জেলেরা সমস্বরে। (জোড় হস্তে) হুজুর, আমরা কিছু জানি না। আমরা নিরপরাধ।

পুলিশ সাহেব। চোপরও হারামজাদারা। জুটা মারিয়া সোজা করিব। এই বজ্জাতগুলিকে বাঁধিয়া রাখ।

অন্য নৌকার উপর শশিভূষণকে দেখা গেল। তাহার গায়ের জামায় বোতাম পর্যন্ত লাগান হয় নাই। পায়ের চটি জুতো বদল করা হয় নাই।

শশিভূষণ। স্যর, জেলেদের জাল ছেঁড়বার বা তাদের ওপর উৎপীড়ন করবার কোন অধিকার আপনার নেই।

পুলিশ সাহেব। ওয়ার কা বাচ্চা টুম্ কোন্ হ্যায় ?

বলার সঙ্গে সঙ্গে শশিভূষণ তাহার নৌকা হইতে সাহেবের নৌকায় লাফাইয়া পড়িল এবং সাহেবের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে এলোপাথাড়ি কিল, ঘুসি ইত্যাদি মারিতে লাগিল। সাহেবের লোক তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং শশিভূষণের উপর নির্যাতন শুরু হইল। শশিভূষণ তাহা সামলাইতে না পারিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল।

পুলিশ সাহেব। হাঁ, ঠিক হইয়াছে। এইবার এই ওয়ার কা বাচ্চাকে থানায় নিয়ে চল।

পঞ্চম দৃশ্য

আদালতের দৃশ্য। এজলাস শেষ হইয়াছে। জজ শশিভূষণের পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। শশি আদালতের এক পাশে একটি বেঞ্চে বসিয়া আছে। শশির বাবা শশির নিকট আসিলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি তিনি। পাকা চুলে ভরা মাথা। তাঁহার মুখে চোখে উদ্বেগের চিহ্ন।

শশির পিতা। শশি দুনিয়াকে তুমি আজও চেননি। যে ছেলেগুলোকে পুলিশের লোক উৎপীড়ন করল, তারাই তোমার বিরুদ্ধে উল্টে সাক্ষী দিয়ে গেল। শুনতে পেলুম তারা নাকি হর নারেবের প্রজা। হর নারেবের শাসানিতে তারা উল্টে সাক্ষী দিয়ে গেল। তাছাড়া তোমার নামে পুলিশে যে সব চার্জ এনেছে যেমন আঘাত করা, অনধিকার প্রবেশ, পুলিশের কর্তব্যে ব্যাঘাত,—এর সব কটাকে কাটান যায় যদি উঁচু আদালতে আপিল করা যায়। তুমি যদি বল আমি উঁচু আদালতে আপিল করি।

শশিভূষণ। বাবা আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন। পাঁচ বছর জেল হয়েছে শুনে আমি খুশিই হয়েছি। এই দুনিয়াটা এতো কদর্য হয়ে গেছে যে এখানে বাস করার থেকে জেলের মধ্যে থাকা অনেক ভাল। আর যাই হোক সোহার বেড়ি তো মিথ্যে কথা বলবে না। কিন্তু জেলের বাইরে আমাদের যে স্বাধীনতা তা আমাদের সব সময়ে বিপদেই ফেলছে। আর যদি সৎসঙ্গের কথা বলেন তাহলে জেলের মধ্যে মিথ্যেবাদী, প্রতারক, কৃতঘ্ন আর কাপুরুষের সংখ্যা বাইরের তুলনায় অনেক কম। কারণ সেখানে জায়গা হল পরিমিত। বাইরে এদের সংখ্যা অনেক বেশী। আচ্ছা আসি বাবা।

(সে তাহার বাবার পায়ের ধুলা লইল। পুলিশ আসিয়া হাতকড়া লাগাইল। বৃদ্ধ পিতা চোখ মুছিতে লাগিলেন। শশিভূষণকে লইয়া পুলিশ দুইজন চলিয়া গেল।)

পঞ্চম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য

পাঁচ বৎসর পরে। বন্ধ জেলের দরজা খুলিয়া গেল। কয়েক জন পুলিশ বাহিরে আসিল ও তাহাদের পশ্চাতে শশিভূষণও বাহিরে আসিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার চেহারার পরিবর্তন হইয়াছে। মুখে বলিরেখা দেখা দিয়াছে। মাথায় বড় বড় চুল ও মুখে গোঁফ দাড়ি। পরনে অর্ধমলিন ধুতি-পাঞ্জাবী। শরীর অত্যন্ত কৃশ। দেখিলে মনে হয় দীর্ঘ দিন রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে বাহিরে রাখিয়া পুলিশরা এ্যাবাউট টার্ণ করিয়া জেলের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। জেলের দরজা আবার বন্ধ হইয়া গেল। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া একপশলা বৃষ্টি নামিল।

শশিভূষণ। (স্বগতোক্তি করিল) এখন যাই কোথায়? এতদিন জেলের মধ্যে ছিলাম থাকার ভাবনা ছিল না। কিন্তু এই দীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে বাইরের দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাবা তিন বছর আগেই মারা গেছেন। ছোটভাইও তো সি. পি. তে বাড়ি করে সেখানেই বসবাস করছে। গ্রামের পৈত্রিক সম্পত্তির সমস্তটাই হরকুমার গ্রাস করেছে। এখন যায় কোথায়?

(এমন সময় সমুখে একটি সুবৃহৎ মুড়ি গাড়ি আসিয়া শশিভূষণের কাছে থামিল।) তাহার উপর হইতে একজন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জোড় হস্তে জিজ্ঞাসা করিল।

ভৃত্য। আজ্ঞে আপনার নাম কি শশিভূষণ বাবু?

শশিভূষণ। (বিস্মিত হইয়া) হ্যাঁ, কেন বলত?

ভৃত্যটি গাড়ির দরজা খুলিয়া বলিল। দয়া করে এতে উঠুন বাবু।

শশিভূষণ। (যথেষ্ট বিস্মিত হইয়া)—আমায় কোথায় যেতে হবে ?

ভৃত্য। আমার মনিব আপনাকে ডেকেছেন।

এই রকম কথাবার্তা হইতে হইতে চারপাশে জনাকয়েক লোক দাঁড়াইয়া গেল। তাহারা কৌতূহলী দৃষ্টিতে শশিভূষণের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শশিভূষণ। (লোকগুলির দিকে একবার চাহিয়া অস্বস্তি বোধ করিয়া) চল কোথায় নিয়ে যাবে। (বলিয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ভৃত্যটি কোচম্যানের পাশে বসিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতার রাজপথ। একস্থানে রাস্ত তুলিয়া পুলিশ যানবাহন আটকাইয়া দিয়াছে। সেখানে দেখা গেল ছুড়ি গাড়ির মধ্যে শশিভূষণ বসিয়া আছে। তাহার দৃষ্টি রাস্তায়। রাস্তায় একদল বৈরাগী ওপিয়ন ও খোল করতাল সহযোগে গান গাহিতেছে।

এসো এসো ফিরে এসো—নাথ হে, ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত
বঁধু হে, ফিরে এসো !

গাড়ি চলিবার উপক্রম করিতেই শশিভূষণ মুখ বাড়াইয়া বলিল—

শশিভূষণ। একটু রাখো তো কোচোয়ান।

গাড়ির মধ্যে বসিয়া শশিভূষণ তন্ময় হইয়া গান শুনিতে লাগিল।

ওগো নিঠুর, ফিরে এসো হে !
আমার করুণ কোমল, এসো।
ওগো সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর, ফিরে এসো !

বৈষ্ণবরা চলিয়া গেল। কিন্তু গাড়ির মধ্যে বসিয়া শশিভূষণ আপন মনে গাহিতে লাগিল—

আমার নিতি সুখ ফিরে এসো !
আমার চির দুখ, ফিরে এসো !
আমার সব-সুখ-দুখ-মথন-ধন, অন্তরে ফিরে এসো !
আমার চির বাঞ্ছিত, এসো।
আমার চির সঞ্চিত, এসো।
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন,
ফুল বন্ধন ফিরে এসো !
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো।
আমার মুখের হাসিতে এসো হে,

আমার চোখের সলিলে এলো !
আমার আদরে, আমার ছলনে,
আমার অভিমানে ফিরে এলো !
আমার সর্ব স্মরণে এলো,
আমার সর্ব ভরমে এলো—
আমার
আমার ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এলো।

শশিভূষণের দুচোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। সে তাহা কোঁচার খুঁটে মুছিয়া জ্যোৎস্নাকে বলিল।—এবার চল আমায় কোথায় নিয়ে যাবে।

তৃতীয় দৃশ্য।

একটি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে ভৃত্যসহ শশিভূষণ প্রবেশ করিল। ঘরটির চার দিকেই বড়ো বড়ো আলমারিতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজান।

ভৃত্য। আসুন বাবু, এই খানটায় বসুন।

(সে একটি সোফা দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। সোফার সামনে একটি টেবিল) তাহার উপর কতকগুলি বই খাতাপত্তর ছড়ান। তাহাদের মধ্যে হইতে ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণ ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাতে তুলিয়া লইল একখানা ভাঙা স্লেট, গুটি কয়েক পুরাতন খাতা, একটি ছিন্নপ্রায় ধারাপাত, কথামালা ও একখানি কাশীরাম দাসের মহাভারত। শশিভূষণ স্লেটটি তুলিয়া বার বার দেখিতে লাগিল।

তাহার কাঠের ফ্রেমে তাহার নিজ হস্তাক্ষরে কালি দিয়া খুব মোটা করিয়া লেখা—গিরিবালা দেবী। শশিভূষণ সেদিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। ও সঙ্গে সঙ্গে সোফার উপর অশক্তের মতো বসিয়া পড়িল।)

শশিভূষণ। (স্বগতোক্তি করিল) এটা তাহলে গিরিবালার বাড়ি! সেই তিলকুচি গ্রামের সেই ছুরে-কাপড় পরা ন'বছরের মেয়ে গিরিবালা! সেই জীর্ণপ্রায় কুটীর। গাঁয়ের সেই নির্জন পথ! আর এই কলকাতায় প্রকাণ্ড অট্টালিকা, জমজমাট কোলাহলে ভরা জগৎ। কতো তফাৎ, কতো তফাৎ।

(শশিভূষণ সেই স্লেট বইয়ের স্তূপের মধ্যে দুই বাহু বিস্তৃত করিয়া দিল। তাহাদের উপর মুখ রাখিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল।)

শশিভূষণ। সেই আমার গরাদে দেওয়া বাইরের ঘর, সেই বইয়ের স্তূপ, সেই গিরিবালা।

গিরিবালা বলিতেই তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল মুখ তুলিল। সমুখে দেখিল গিরিবালা হাতে রূপোর থালায় ফলমূল মিষ্টান্ন সাজাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় ঘোমটা নাভি পর্যন্ত টানা। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, পরনে শুভ্র থান। গিরিবালা নিরাভরণ বিধবা বেশধারিণী।

শশিভূষণ। (বিস্মিত হইয়া) একি! তুমি গিরিবালা।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট

সকল অনুষ্ঠানেরই উপযোগী

ক্রীম ক্র্যাকার
গোল্ডেন পাফ্
চীজলেট্
নিমকি
ক্লাব স্ন্যাক্স
থিন এ্যারারুট
মারী
পেটিট্‌বার
ব্রিটা
সার্কাস
খাস্তা
জেষ্টা
জিন্‌জারনাট
নীস্
ডাইজেসটিভ্
কেয়ারী কেক্

বোর্ণ ভিটা
ম্যাল্কো
কোকোনাট কুকীজ
এরারুট ক্রীম্
ম্যাল্কো ক্রীম
অরেঞ্জ ক্রীম
কটেজ্ ক্রীম
ডেইন্টী ক্রীম
ফিঙ্গার ক্রীম
এমব্যাসী ক্রীম
বোরবণ্
স্যাভরী অ্যাসর্টেড ব্যারেল
ক্যামিলি অ্যাসর্টেড ব্যারেল
অ্যাসর্টেড ক্রীম ব্যারেল
আফটারনুন টী অ্যাসর্টেড টিন
ফেসটিভেল অ্যাসর্টেড ড্রাম
এ্যালেন বেরীজ রাস্ক

উৎকৃষ্ট বিস্কুট প্রস্তুতকারক :

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই

গিরিবালা। (হাতের থালা টেবিলে রাখিয়া শশিভূষণের পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে)। হাঁ, আমিই গিরিবালা। (যখন সে মুখ তুলিল তখন তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। বলিল।)—একি চেহারা হয়েছে তোমার শশিদাদা ?

শশিভূষণ। (বিমূঢ়ের মতো) কেন ভালোই তো আছি। কিন্তু তুমি—?

(তাহার আর বাক্য স্ফূর্তি হইল না। দুই চোখ কাটিয়া অশ্রু নামিয়া আসিল। চশমার কাঁচ বাহিয়া সেই অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শশিভূষণ তাহাদের রুদ্ধবার কোন চেষ্টাই করিল না। বাহিরের দিক হইতে খোল করতালের সহিত গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

"এসো, এসো হে ! এসো, এসো হে !"

যবনিকা

॥ গ্রন্থবীর বই ॥

সুবোধ ঘোষের লেখার নতুন করে পরিচয় না দিয়ে এই কথাই বলা যায় আধুনিক কথা-সাহিত্যে তিনি অনন্যসাধারণ। 'মুক্তিপ্রিয়া' উপন্যাস এ কালের জীবন-বার্তার স্বাক্ষর।

সুবোধ ঘোষের সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস

মুক্তিপ্রিয়া ২·৫০

বারীন দাস এ-কালের নাম করা কথা-সাহিত্যিক, তাঁর নব প্রকাশিত 'অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা', 'জীবন-ধর্মী'।

বারীন দাসের উপন্যাস

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা ৪·০০

স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের ক্ষেত্রে যুগোত্তীর্ণ। 'কন্যামৃগয়া' উপেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কন্যামৃগয়া (২য় সংস্করণ) ৩·০০

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের একটি লেখাও যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন তাঁর রচনার স্বকীয়তা।

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের উপন্যাস

উপনদী (বেতারে অভিনীত) ২·০০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠগল্প ৫·০০

সাতদিন (স্বনির্বাচিত গল্প) ২·৫০

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা—১২ ॥

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

কলরোলের কবি অনিলকুমার ভট্টাচার্যের আধুনিকতম কবিতার বই

॥ সাগর-আকাশ ॥ ॥ দু' টাকা ॥

লিরিকধর্মী কাব্য-উপন্যাস

॥ মেঘ পাহাড়ের গান ॥ ॥ দু' টাকা ॥

॥ ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা—৬ ॥

দেশনায়ক ॥

সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধশক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে পাড়ে তালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, জীর্ণ দেহে রোগের মতো, তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে, আপনকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; সৌভাগ্যের জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টি সম্মুখে ঊর্ধ্বে তুলে ধ'রে মান বাঁচাতে হবে তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ ক'রে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল ক'রে তোলে।

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তখন নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এইরকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা—তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে যেখানে তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে ইতিহাসের সুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চারিত্রশক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলা দেশ যত-কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত ক'রে তুলবে—এই চাই। আপাত পরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলা দেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রসন্ন দিকে বিমুখ; এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের

মধ্যেই—বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে—তবেই সে বাঁচবে। বিংশ দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এইখানেই। কিন্তু কেন যদব 'যদি' কেন প্রকাশ করব সংশয়! মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচতেই হবে। বাঙালি অদৃষ্ট-কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোলো; সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালি মারের উপরে মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। বিষাদমুক্ত মুক্তাজ্জ্বল আশার পতাকা বাংলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালি আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত। বাঙালির পরস্পরবিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্মঅংশের বিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জিত ও দীনতা বিকৃত হোক তোমার আদর্শে—জয়ে পরাজয়ে আপন আত্মসম্মম অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।

বাঙালী নৈয়ায়িক—বাঙালি অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা বুদ্ধির পথে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্র-সন্ধানের ভাঙন-লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য। ভুলে যায় এই তার্কিকতা নির্মমী বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতামাত্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, মতউদ্ভূত ইচ্ছার। বাঙালির সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃপদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি করে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ।

বাঙলাদেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলের বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বাহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালি সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কি না এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করে নি, বিচার করে নি—কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।

তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীর-হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণনিবেদন, আজ নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ লেখা দিয়েছিল, তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন করুক, তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্বিতাকে?

আমরা দেশের যৌবনের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ

প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙালির স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই-সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে নবযৌবনে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।

বলতে পারো, এত বড়ো কাজ কোনো একজনের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। সে কথা সত্য। বহু লোকের দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হতে পারলে তবেই হবে অসাধ্যসাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা কখনোই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন, সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তারা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্যদান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।

এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে, বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নতুন যুগের উদ্‌বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলনযজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলাদেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক—তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

বহুকাল পূর্বেএকদিন আর-এক সভায় আমি বাঙালি সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর-এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ নেই, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক—কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তার পরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে, যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।

১৯৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনটি দিন না তিন বিন্দু মধু।

মানুষ চির একা! এই একাকিত্বের মাঝখানে সার্বজনীন, বিশ্বপ্রেমিক হয়েও যে মানুষটি চির একা, চির একক ছিলেন, সেই মহামানবটিই হলেন যুগস্রষ্টা মহাকবি রবীন্দ্রনাথ।

আমরা ধন্য! আমরা পুণ্যবান। কেননা আমরা যে যুগে জন্মেছি, যে যুগে বড় হয়েছি, কথা বলেছি, লেখাপড়া শিখেছি, এক কথায় মানুষ হয়েছি, সে যুগ তো তাঁরই রচনা, তাঁরই সৃষ্টি!

সেই জীবন্ত মহর্ষিকে, মহাব্রাহ্মণকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো, আমি আজ তাই ধন্য!

আমরা যে মাতৃভাষায় কথা বলতে শিখেছি সে ভাষা তো তাঁরই দান। যে মানুষ একা একটি ভাষার রূপদান করে গেছেন জাতির চৈতন্য সত্তাকে নাড়া দিয়ে নব জাগরণের পুণ্যদ্বারে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেছেন সেই মহামানবের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা ছাড়া আমাদের আর কি আছে?

হিমাদ্রির মত অটল অস্পৃষ্ট যে মানুষ, সে মানুষের বিরাট প্রতিভাকে মাথা নত করে মেনে নেওয়া ছাড়া সাধারণের আর কি করার আছে। এ যে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজারই মত তাঁরই ভাষায় তাঁরই স্তব গাওয়ার প্রচেষ্টা।

প্রথম যেদিন তাঁকে দেখি সেটি আমার জীবনে একটি বিশেষ দিন। মহা বিস্ময়ের দিন। তখন আমি স্কুলের ছাত্রী, রবীন্দ্রনাথের কথা অনেক শুনেছি। তাঁর কবিতা অনেক পড়েছি তাঁর গান প্রাণ মন উদ্বেল করেছে, কিন্তু সে ব্যক্তিত্বময় মানুষটিকে দেখার সৌভাগ্য আমার তখনও হয়নি।

বিশেষ দিন বিশেষ মুহূর্ত মানুষের জীবনে আসে। আমারও এসেছিলো। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। সিনেমা থিয়েটার দেখার সৌভাগ্য ঘটত না বললেই হয়। তাই যখন শুনলুম—রবীন্দ্রনাথ আসছেন কলকাতায় তাঁর শান্তিনিকেতনের নিভৃত নিকেতন ছেড়ে দলবল নিয়ে, তাঁরই রচিত, তাঁরই ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা গীত ও অভিনীত নাটক আমাদের শোনাতে এবং সেই শোনার সৌভাগ্য আমাদেরও হবে অভিভাবকদের সৌজন্যে তখন কয়টি দিন আমাদের অপরিণত ভাবালু মন বিস্ময়মুগ্ধ কল্পনায়ায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো।

সে যুগে মেয়েরা একা একা চলাফেরা করতে পেত না। সে যুগে বহু পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার কোনও প্রয়োজনই স্বীকৃত হইনি, উপরন্তু বিলাস বলে মনে করা হ'ত। বহু ক্ষেত্রে তা নিন্দনীয়ও হ'ত আর একত্রে ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষা কল্পনাও করা যেত না। সে কালে মেয়েদের গান গাওয়া সভ্য সমাজ ভাল চোখে দেখতেন না। এক শ্রেণীর অপাংক্তেয় মেয়েরাই নৃত্যগীত বা নাটক নাটিকা করতেন। যে কালে নৃত্যগীতোৎসব নটনটীদের একমাত্র উপজীব্য ছিলো সেই রকম এক যুগে ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের সর্বজন সমক্ষে নৃত্যগীত নাটক দেখাতে অবতীর্ণ হওয়ার দুর্জয় সাহস তিনি দেখিয়ে গেছেন। এ শুধু তাঁর মত বিরাট প্রতিভা, তাঁর মত ব্যক্তিত্ব ছাড়া সম্ভব হত না। সব রকম কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকার ভেঙে তিনি নরনারীকে মুক্ত আলোর পুণ্যধারায় স্নান করিয়েছিলেন—সত্যই তিনি আলোর স্বর্ণাধারায় বহু গ্লানি ধয় ক্লেদ ধুয়ে মুছে বাঙালীকে নবধারা জলে স্নান করিয়ে গেছেন। একটা নতুন যুগ সৃষ্টি করে আমাদের নবজন্মে দীক্ষিত করে গেছেন।

ধীরে ধীরে রহস্য যবনিকা উঠলো। আনন্দে বিস্ময়ে পুলকিত চিত্তে দেখলুম অবিকল মানুষটি

স্টেজের একধারে বসে আছেন। মনে হল কাব্যে পুরাণে পড়া ঋষি আজ জীবন্ত রূপ নিয়ে তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছেন। রূপ অনেক দেখা যায় কিন্তু সেদিন সে মহামুহূর্তে সেই জীবন্ত অপরূপকে দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটল। তরুণ রবীন্দ্রনাথকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। জানি না তখন তিনি কেমন ছিলেন, তবে তাঁকে দেখে যাবে যাবে এই কথাই মনে হয়েছে বয়সই মানুষকে সুন্দরতম করে! জ্ঞানদীপ্ত প্রাজ্ঞময় অপরূপ করে!

রঙ্গমঞ্চের পর্দা উঠলো। আমরা প্রেক্ষাগৃহের নিচের তলায় বসেছিলুম। আনন্দচঞ্চল বিমুগ্ধমন সামনের পানে তাকিয়ে ছিলো মহাবিস্ময়ে। সত্যই সে দিনটি পুণ্যদিন একসঙ্গে বাংলার দুই প্রথিত-যশ পুত্রকন্যাকে একত্রে প্রথম দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সেদিন সে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের মধ্যে ছিলেন ভ্রাতৃজা সরোজিনী নাইডু। বাংলার দুই কবি, দুই রসবেত্তা পরম রসিক, পরস্পরকে অভিবাদন করলেন, ঠাট্টা করলেন। সরোজিনী নাইডুর রসিকতায় মহাকবি হাসলেন, হাসি যে কত সুন্দর কত কমনীয় হতে পারে সেদিনের আগে বুঝিনি!

পর্দা পড়ল—আবার উঠলো।

রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা আরম্ভ হলো। তাঁর সর্বক্ষণ মঞ্চের এক প্রান্তে তিনি বসে রইলেন। আদ্যন্ত পাঠ করলেন তিনিই নাটকটি। সে কণ্ঠ যে শুনেছে সেই শুধু জানে কি যাদু ছিলো তাতে যে শোনেনি তাকে বোঝানো যাবেনা, যায়না! জগতে এমনও কিছু বস্তু আছে যা ব্যাখ্যা করা যায়না বুদ্ধি দিয়ে বিচার্য নয়—শুধু অনুভব করার যা শুধু হৃদয় দিয়েই গ্রহণ করা যায়।

তাঁর সঙ্গে তাঁর আরামকেদারার পায়ের কাছে বসে গান করছিলেন যিনি তিনিই শ্রীমতী দুটু নামে পরিচিতা ছিলেন। তিনি যে তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন সে দৃষ্টি থাকলেই বোঝা যাচ্ছিল। গানের সমকে সমকে কত না স্নেহে তিনি তাঁর পিঠ চাপড়ে কণ্ঠ মিলিয়ে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। সে উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে গানে গানে ভুবন ভোলানো মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। গায়িকার সুকণ্ঠ বটে। সে কণ্ঠ বুঝি কবি কণ্ঠকেও থেকে থেকে ম্লান করে তুলছিলো—উদ্দীপিত উদ্বেলিত কবি নাট্যের মাঝখানে যেন আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। যুগল কণ্ঠের গানের মহিমায় যেন স্বপ্নমায়া রচনা করছিলো। দীর্ঘদিনের ব্যবধানের পারে বসেও আমি যেন আজও সে ছবি জীবন্ত আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি। আজও যেন দূরত্বের যবনিকা ভৃত্যার অনন্ত রহস্য পার হয়ে তাঁর কণ্ঠের—"ওরে সর্বনাশী!" কথাটি আমার মর্মে এসে বিঁধছে। সার্থক হয়ে আছে আমার জীবনে চিরদিনের মত প্রথম নাটক দেখা। সে নাটক আমার মনে এমনই ইন্দ্রজাল রচনা করেছিলো যে আজও আমি তার স্বপ্ন দেখি। তারপর কত নাটক কত থিয়েটার দেখেছি কিন্তু তেমনটি আর দেখিনি। সেই চণ্ডালিনীর বেদনা আমার মনে মানব মনের অনন্ত বেদনার দোলায় চির দোলায়মান। চণ্ডালিনীর সে অশ্রুজল আমার মনের বিরহ পদ্মটিতে আজিও অম্লান। আজিও শিশির বিন্দুর মতই নিটোল। সে দিন সে রাত্রি আমার চোখে মায়ার অঞ্জন পরিয়ে আমাকে বহু দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো।

এরপর আবার তাঁকে দেখি নটীর পূজা নাটিকায় রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্তে সমাসীন। বারবার কতবার কত ক্ষণে সেই একই নটীর পূজা নাটিকা করেছেন, আমরাও দেখেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যাদুর-মায়ায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে রক্তমাংসের মানুষগুলি যেন সেই সেই চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে যেতো। তারা ভুলে যেত তাদের আর সব পরিচয়, আর সব সত্তা। তারা তখন নাটকের নায়ক নায়িকা ছাড়া

আর কিছুই থাকতো না—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে তারা আপন আপন চরিত্রে তদ্‌গত প্রাণ হয়ে যেত। তারা তাদের বাহ্যজ্ঞানও বুঝি হারিয়ে ফেলতো!

আর একটি দিন আর একটি ছবি স্মরণ করে আজকের মত আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

বসন্তের শেষ হয়েছে। অশোকে কিংশুকে শিমুলের ডালে ডালে আবির খেলা সমাপ্ত প্রায়। তপ্ত বাতাস রাঙা ধূলির তুফান তুলে ছুটে চলেছে কোন্ দিকে? সে শান্তিনিকেতন আজ হারিয়ে গেছে। সে শান্তিনিকেতন সত্যই শান্তির নিকেতন ছিলো। গাঁয়ের পথে এখানে ওখানে প্রায়ই দেখা যেত মাটি মায়ের কোলের ছেলে সাঁওতাল সাঁওতালি। যৌবনের জয়কেতন রক্তপলাশ তাদের কালো কেশে হাতে কারো বাঁশের বাঁশি। আলো করা কালো রূপে পথিক জনের চোখে তারা মায়ার অঞ্জন পরিয়ে খোয়াইয়ের ডাক পৌঁছে দিতো।

কয়েকটি কুটির। মাটির ঘর নিয়ে একান্ত নিরালার মাঝখানে একটি পরিচ্ছন্ন গওগ্রামেরই ছবি আঁকতো সে দিনের শান্তিনিকেতন। স্বচ্ছ আকাশের উদার নীলিমা মনকে মুক্তির পথে টেনে নিয়ে যেত। মহা অসীমের স্পর্শ এনে দিতো গোপনে প্রাণের নিভৃত নীড়ে। কলির শেষ ব্রাহ্মণ শেষ তপস্বী দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিলো এমনি একদিনে।

আকাশে বাতাসে আমের বোলের মন ভোলানো গন্ধ মনকে মদির করে তুলেছিলো। তারও আগে গান গেয়ে ঘুম ভাঙিয়ে গিয়েছিলো ভোরের বৈতালিক। পরিপূর্ণ শান্তির রূপটি বুকে নিয়ে সে সত্যই আশ্রম ছিলো। আর সেই আশ্রম আলো করে বসেছিলেন যেন জীবন্ত রূপ নিয়ে মহর্ষি বাল্মীকি।

উত্তরায়ণের সামনে পূর্ব দিগন্তের পানে চেয়ে স্তব্ধ ধ্যানমৌন হয়ে বসেছিলেন শ্বেতশ্মশ্রু এক মহামানব। চলা আমার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো সে অপার্থিব রূপ দর্শনে। পাতা খসানোর শব্দটিও যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিলো। মুখর হয়ে চাপল্য দেখাতে পারিনি সে বন্দনীয় মুহূর্তটিতে।

কবি বাহ্যজ্ঞান শূন্য। আকাশের গায়ে প্রভাত সূর্য যেন অবাক বিস্ময়ে তাঁকেই দেখছিলেন। কবি কি মনে মনে বলছিলেন—'হে পূষণ অপাবৃণু' তোমার সত্য স্বরূপ আমায় দেখতে দাও। আবরণ উন্মোচন কর!"

অথবা দিনেশ্বরই বুঝি ছুটে এসেছিলেন সেই মর্ত্যের জ্যোতির্ময়কে দেখতে। কে কাকে দেখতে এসেছিলেন জানি না—সেই মুক্ত প্রাণের আর মুক্ত আলোর কোলাকুলি দেখে আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলুম।

সেই আত্মসমাহিত ধ্যান মৌনকে দূর থেকেই প্রাণের প্রণাম জানিয়ে চুপে চুপে পালিয়ে এসেছিলুম। সফল হয়েছিলো সেদিন আমার ভুবনে সূর্য ওঠা!

বিভা সরকার

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিন্নপত্রাবলী

ছিন্নপত্র গ্রন্থে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে লেখা ১০৭টি পত্রের সারসংকলন করা হয় ১৩১৯ সালে। বর্তমান গ্রন্থে ইন্দিরাদেবীকে লেখা কবির আরও ১০৭টি পত্র সংকলিত। পূর্বোক্ত 'ছিন্নপত্র'-সমূহেরও পূর্তির পাঠ এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। একাধারে কবি রবীন্দ্রনাথ ও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের এমন অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত এক-একখানি ত্রিবর্ণ চিত্রে, অবনীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত এক-একখানি প্রতিকৃতিতে ও অন্যান্য একবর্ণ চিত্রে অলংকৃত। মূল্য বাঁধাই ১০·০০ টাকা, পুরু কাগজে ছাপা ও কাপড়ে বাঁধাই ১২·৫০ টাকা।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

১২৯৮ ও ১৩০০ বঙ্গাব্দে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। কবিকর্তৃক সম্পাদিত পরবর্তী পাঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে বিচ্ছিন্নভাবে সংকলিত থাকিলেও এই দুই খণ্ড গ্রন্থের যথাযথ পুনর্মুদ্রণ ইতিপূর্বে হয় নাই। বর্তমান সংস্করণে দুই খণ্ড একত্র গ্রথিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া 'ডায়ারি'র প্রাথমিক খসড়াটিও আদ্যন্ত সংকলিত হওয়ায় এই গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য যেমন বহুগুণ বাড়িয়াছে, তথ্যসন্ধানী বিদ্বজ্জনের নিকট ইহার আকর্ষণ বা একান্ত আবশ্যকতাও অল্প হয় নাই। একাধিক প্রতিকৃতিচিত্রে ও পাণ্ডুলিপিচিত্রে ভূষিত, প্রাসঙ্গিক সংকলন ও গ্রন্থপরিচয়-সংযুক্ত। মূল্য কাগজের মলাট ৫·০০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই ৬·৫০ টাকা।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

সচ্ছন্দ চলিত বাংলায় লেখা এই গ্রন্থখানিতে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম ইংলণ্ড-গমন ও প্রবাসযাপনের (১২৭৮-৮০) বিবরণ দিয়াছেন মনোহর ভাষায় ও ভঙ্গীতে। প্রথমে ভারতীতে (১২৮৮-৮৯) ও পরে গ্রন্থাকারে (১২৮৮) প্রকাশিত। কবির জীবনকালে অদ্যাবধি আকারে ইতিপূর্বে আর কখনো ছাপা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভাব এবং ভাবনার বিবর্তন ধারায় এটির একটি বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রজীবনের দূর অতীতের একটি অধ্যায় মনশ্চক্ষে ছবির মতো ফুটিয়া উঠে। মূল্য কাগজের মলাট ৪·৫০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই ৬·০০ টাকা।

বীথিকা

কাব্যখানি পরিণত রবীন্দ্রপ্রতিভার দান-রূপে রসে রেখায় ও রসে বিচিত্র এবং অপরূপ হইলেও, সাধারণের নিকট তেমন পরিচিত নহে। এই কাব্যের সুমুদ্রিত শতবার্ষিক সংস্করণে সমকালীন দশটি নূতন কবিতা সংযোজন অংশে দেওয়া হইয়াছে আর বিভিন্ন কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুর দ্যোতক কয়েকখানি রঙিন ও একরঙা ছবিও আছে। ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে সংকলিত না হওয়ায় কবিতা-কয়টি যেমন রসিকজনকে পুলকিত করিবে, রূপরসিক মাত্রেই খুশি হইবেন স্বয়ং কবির এবং শ্রীনন্দলাল বসুর আঁকা সুচিত্র সম্ভারে। মূল্য আংশিক কাপড়ে বাঁধাই ৬·৫০ টাকা।

সাধারণ সংস্করণ রঙিনচিত্রাদি-বিহীন হইলেও, নন্দলাল-অঙ্কিত প্রচ্ছদে এবং কবির হস্তলিপির চিত্রে ভূষিত। মূল্য ৩·৭৫ টাকা।

শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তকে মুদ্রিত দশটি গদ্যকবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ বা রূপান্তর বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে এই সংস্করণের 'সংযোজন' অংশে মুদ্রিত। সচিত্র সংস্করণ : কাগজের মলাট ৫·৫০ টাকা। বোর্ড বাঁধাই ৫·৫০ টাকা।

কালান্তর

নূতন সংস্করণে সাতটি প্রবন্ধ (রচনা ১৩৩৮-৪৬) প্রথম গ্রন্থভুক্ত হইল। মূল্য ৫·৫০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

॥ রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি দর্শন ॥

মিলটনের রাষ্ট্রনৈতিক মত জানতে গেলে মোটামুটি তাঁর 'এরিও পেজিটিকা' পড়লেই চলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত জানবার তেমন কোন সহজ পথ নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ রচনার মধ্যে তাঁর মত ব্যক্ত হয়েছে। রচনার ধারাকে তাই, 'ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত'। তবে, অন্যান্য খ্যাতিমান শিল্পীদের মত রবীন্দ্রনাথেরও একটি নির্দিষ্ট জীবনদর্শন আছে; অভিজ্ঞতার পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রচনার বিভিন্নতা ঘটলেও, জীবনদর্শনের নির্দিষ্ট দীপ্তিটি তাঁর সব রচনাতেই ভাস্বর। তাই পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি ঐক্যসূত্র আছে। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত বলতে এই ঐক্যসূত্রটিকেই বোঝায়।

ডাঃ শচীন সেন-এর ইংরেজিতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রাজনীতিদর্শন বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত নিজেই ব্যক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, কোন উৎসুক গবেষক বিচ্ছিন্নভাবে সংগৃহীত বিক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্য দিয়ে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত আহরণ করার চেষ্টা করলে রচনার সঠিক তাৎপর্য-বিশ্লেষণ নাও হতে পারে। তাই, ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন রাষ্ট্রিক সমস্যা সম্বন্ধে আমি কী ভেবেছি, কী বলতে চেয়েছি, তা নিজেই কুড়িয়ে এনে সংক্ষেপে আঁটি বাঁধবার চেষ্টা করা ভালো মনে করি।" এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতকে "ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালের আদর্শের" উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর স্বভাবসুলভ মনস্তাত্ত্বিকতার মধ্য দিয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে জীবনের মহত্তম বিকাশের দিকে। স্বভাব সীমার বাইরে লোভনীয় মরীচিকার প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বহিরঙ্গের কলকোলাহল তাই তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয়। অভিযোগ, আন্দোলনকে বিদেশী-বিতাড়ন ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দিকে কেন্দ্রীভূত করার একপ্রকার নিষ্করুণ নির্বুদ্ধিতা আছে। রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা করায়ত্ত হ'লেই ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান হবে—এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা আন্দোলনগুলি পরিচালিত। রবীন্দ্রনাথ এই নিষ্ফল উত্তেজনার কথা উল্লেখ করেছেন: "কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।"

'পরাধীনতা' কথাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ অর্থপূর্ণ। ভারতবাসী ভারতবর্ষকে হারিয়েছে শুধু ইংরেজ-শাসনের জন্যে নয়; দেশের সঙ্গে দেশের মানুষের পরিচয়হীনতার ফলেই অধিকার লুপ্তি। সমাজের সম্মিলিত শক্তি ছিল ভারতবর্ষের বৈভব। পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত সখ্য গড়ে উঠেছিল বহু যুগ ধরে। শিক্ষাদীক্ষা, ন্যায়ধর্ম, দান-প্রতিদান, সবই চলত সমাজের পরিধির মধ্যে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের বাইরে। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষ চিরকালই সমাজপ্রধান দেশ, "রাষ্ট্রপ্রধান নয়: রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা

প্রসারিত।" রাষ্ট্রশাসনের বাধ্যবাধকতার সীমা ভারতবর্ষে কখনও সমাজকে গ্রাস করেনি। রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের বাইরে সমাজ তার নিজস্বত্ব বজায় রেখেছে যুগ যুগ ধরে। তাই, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সনাতন সমাজ ব্যবস্থাকে বিশেষ বিঘ্নিত করেনি। এখানে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে ভারতবর্ষকে পৃথক করা যায়। "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট্ বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত দেশের সমস্ত কল্যাণ কর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।"

সমাজ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবস্তু। আধুনিককালে ম্যাকাইভার প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভংগীর কিছুটা ঐক্য আছে। ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস গ্রীস-রোমে শুরু হয়েছিল। সেই প্রাচীনকাল থেকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের একীকরণ ইউরোপীয় সমাজনীতির মূল কথা। পরবর্তীকালে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের হাতে সমাজ রাহুগ্রস্ত হয়েছে। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা বিনাদ্বিধায় সমাজকে সমগ্রভাবে সমর্পণ করেছেন বুভুক্ষু রাষ্ট্রের মুখে। প্লেটোর রিপাব্লিক্'এ, হেগেলের দর্শনে ও আধুনিককালে মার্ক্সীয় রচনায় রাষ্ট্র ও সমাজের পূর্ণ একীকরণ চোখে পড়ে। ইউরোপে একনায়কতান্ত্রিক শাসকেরা বারংবার সমাজকে আত্মসাৎ করেছেন দর্শনশাস্ত্রের নজির দেখিয়ে। একথা প্লেটোর 'দার্শনিক রাজার' ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, হিটলার বা সোভিয়েট শাসকদের ক্ষেত্রেও তেমনই প্রযোজ্য। রাজনীতির এই মৌলিক সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতনতা রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনাকে একটি বিস্ময়কর বিশিষ্টতা দিয়েছে।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির মূলসমস্যা রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যার আলোচনা করেছেন। ইউরোপে সমাজ বারংবার বিদ্রোহ করেছে রাষ্ট্রের রাহুগ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে। "লিবার্টি" কথাটির বহুল প্রচলন রাষ্ট্র ও সমাজের অবিরত সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ ফল। রাষ্ট্রশাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধানের সমস্যা পাশ্চাত্যে প্লেটো-এরিস্টটল থেকে শুরু করে বর্তমানকালে ম্যাক্ আইভার, বার্কার, ল্যাস্কি—প্রত্যেকটি চিন্তাবিদের রচনায় আলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে একটি ভারসাম্যাবস্থা আবিষ্কার করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অনুরূপ রাজনীতি বা সমাজনীতি প্রযোজ্য কিনা এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেন। ভারতীয় রাজনীতির লক্ষ্য স্থির করা উচিত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজনের ভিত্তির উপর। রবীন্দ্রনাথের ধারণা করাসী দার্শনিক মণ্টেস্কুর আইন-সংক্রান্ত আলোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে ভারতবর্ষকে পৃথক করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয় আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না।" নেশন্-স্টেট্ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে, "হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।" রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি ঔদাসীন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্বভাব। রবীন্দ্রনাথ এই

ঔদাসীন্যটিকে বরণ করেছেন। ক্ষমতা ভিত্তিক রাষ্ট্রশাসনকে গ্রহণ করলে বিরোধ ও অশান্তিকে চিরস্থায়ী করতে হয়। ইউরোপের মত রাষ্ট্রশক্তির সংগে সমাজের কৃত্রিম বিবাহবন্ধন সৃষ্টি করে সামাজিক অশান্তিকে গ্রহণ করতে রবীন্দ্রনাথ রাজী হন নি। কারণ, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সে পথে প্রবাহিত হয়নি। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে এ দিকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।" ইউরোপীয় সভ্যতার রাষ্ট্রমুখীনতা যেমন সত্য ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সমাজমুখীনতা তেমনই সত্য। একটি সম্বলিপ্সু, অপরটি সত্যসন্ধী। রাষ্ট্রীয় মাহাত্ম্য অর্জনের ভ্রান্ত পথ ভারতবর্ষের নয়, 'নেশন' গড়ে তোলার অপপ্রচেষ্টা ভারতবর্ষের পক্ষে বিপজ্জনক। প্রত্যেক সভ্যতার মূল আশ্রয়টি উদার ও ব্যাপক হওয়া উচিত। ধর্মভ্রষ্ট আশ্রয় বরণ করা আত্মঘাতী পরিকল্পনা। ঈপ্সিত লক্ষ্যকে নীতি ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই কাম্য।

রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় প্রাচীন চিন্তাবিদ্‌দের মত নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতিশাস্ত্রের সমন্বয় চোখে পড়ে। ভারতের রাজনীতিকে ভারতের শাশ্বত ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে রবীন্দ্রনাথ রাজী হননি। 'কর্মহীন উত্তেজনা' তাঁর লক্ষ্য নয়, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মধ্যেই ভারতবর্ষের মুক্তি খুঁজতে গেলে সমগ্র প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে বাধ্য। স্বরাজ পাওয়ার আগে স্বরাজের কাজ নির্বাহ করার সামর্থ্যের পরিচয় দেওয়া চাই। পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন না হলে রাষ্ট্রীয় শাসন করায়ত্ত করলেই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন হয় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি রসোজ্জ্বল "যে মানুষ বলে 'আগে ফাউণ্টেন পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব, বুঝতে হবে তার লোভ ফাউণ্টেন পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে 'আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব', তার লোভ পতাকা ওড়ানো উদিপরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামোটার' পরেই।"

রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য :—

স্বরাজ পাবার আগে সামর্থ্য সৃষ্টির প্রয়োজন; গ্রহণের আগে প্রস্তুতির। এই প্রস্তুতির পথ রচিত হবে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ সেবার মধ্যবর্তিতায়। এই প্রসঙ্গে সমবায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি প্রণিধানযোগ্য। মন্থর অথচ নিশ্চিতগতিতে সমাজের স্বাধীন ক্ষেত্রে ব্যক্তি চরিত্রের উন্নতি-সাধনই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। এ বিষয়ে কার্ল ম্যান্‌হাইম্ প্রমুখ আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রশাসনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলে জনমনের পক্ষে এই আকস্মিক পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়। এর ফলে একযুগের সংস্কৃতিগত পার্থক্য (culture lag) সমাজে জটিলতার সৃষ্টি করে। শাসনের প্রকৃতির সংগে শাসিতদের পরিচিতি ঘটতে অসুবিধা হয় বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকস্মিক পরিবর্তন একনায়কতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে অতি আধুনিক বলা যেতে পারে। বিশেষ করে, সমসাময়িক কালে ব্রিটিশ শাসনের আকস্মিক বিভাড়নের বিরুদ্ধাচরণ করে রবীন্দ্রনাথ এ কথা লিখেছিলেন। অসমসাহসিকতার সংগে দূরদৃষ্টির একটি বিচিত্র সমন্বয় তাঁর ধারণাগুলিতে বহুমূল।

রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় পরিস্ফুট। সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করতে অসুবিধে হয়। রাষ্ট্রসম্পর্কে ঔদাসীন্য তিনি নির্দ্বিধায় করেছেন এমন সময়ে যখন বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হ'বার জন্যে অবিরত আন্দোলন চলেছে। ব্যক্তিচরিত্রের সমুন্নতি তিনি আশা করেছেন সমাজ-সেবার মধ্যে। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দেহ। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অগণতান্ত্রিক পরিবেশে সমাজের মুক্ত এলাকা ব্যক্তির অধিকারে কতখানি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। অগণতান্ত্রিক শাসনে রাষ্ট্র ও সমাজের অবশ্যম্ভাবী একীকরণ ঘটে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে-বিশিষ্ট সরকারের অস্তিত্ব বজায় রেখে সমাজকে সঞ্জীবিত করার প্রচেষ্টাটি সমস্যামূলক। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। ব্যক্তিচরিত্র উন্নত করার দিকে তাঁর লক্ষ্য সন্নিবেশিত। তাই, গৌণ প্রয়াসে বা বাধ্যবাধকতার চতুঃসীমায় ব্যক্তিকে বিসর্জন দিতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। এদিক থেকে তাঁর আলোচনার ধারাটি পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা নৈরাজ্য-বাদীদের সমগোত্রীয়। জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ একই ভাবে উনবিংশ শতকে ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ও সংখ্যাগরিষ্ঠের নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তিকে মুক্ত করতে গিয়ে মিল্ রাষ্ট্রের সীমানা বেঁধে দিয়েছিলেন। নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রকে উৎখাত করতে চেয়েছিল, আর, রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকে অন্তেবাসী রেখে সমাজ-ভিত্তিক ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তর্ক করা যায়। তবে, আধুনিক কালের রাজনীতি আলোচনায় ব্যক্তি-মনীষীর অস্থিতে বহুকঠিন রাষ্ট্রসৃষ্টির যে প্রবণতা চোখে পড়ে তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ আজও নিরন্তর প্রতিবাদ করে চলেছেন, এবং এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও প্রয়োজনীয়তা।

মোহিত ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী

আর আপনার এ বছরের নতুন রেডিও!

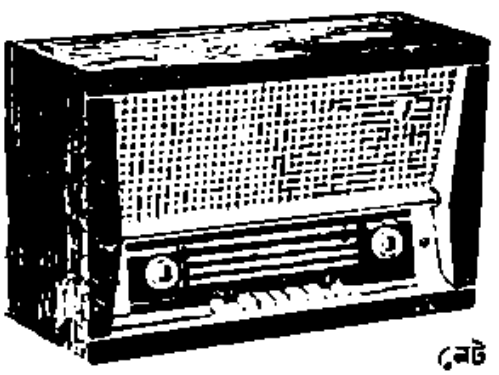

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যারা বছরই রেডিওতে বৈচিত্র্যের উৎসব সৃষ্টি চলতে থাকবে। নতুন 'এইচ এম্-ভি' রেডিওর মাধ্যমে আপনার পরিবারের উৎসবমুখর করে তুলুন।

মডেল ৫১৬৯ এ-সি মেইনের জন্য।

৯ ব্যাণ্ড, ৪ লুডস্পীকার, 'পিয়ানো' ব্যাণ্ডের সংযুক্তিক্ষ ক্যাবিনেট।

নেট দাম ৪৫০৲ সেন্ট্রাল এক্সসাইজ কর ৭২৲ এবং ৫২২৲ টাকার উপর বিক্রয় ইত্যাদি কর।

The Hallmark of Quality
Trade Mark Regd.

Member of the Radio Manufacturers' Association of India.

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

কেবল 'এইচ্-এম্-ভি' ডীলারের কাছেই কিনুন।

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে চতুরঙ্গ একটি চিহ্নিত নাম। বিগত বাইশ বছর যাবৎ বাংলা দেশের তরুণ ও প্রবীণ সাহিত্যকার সৎ সাহিত্যপাঠক ও সার্থক চিন্তাজীবীর মিলনস্থল হ'তে থাকতে পারায় সৌভাগ্যে চতুরঙ্গ গর্বিত ও আনন্দিত। তেইশ বছরের সূচনায় চতুরঙ্গ তার পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক অনুগ্রাহক ও লেখকসমাজকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছে।

বৈশাখ থেকে চতুরঙ্গের বর্ষারম্ভ। আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্রমাসে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার দাম ১·২০ ন. প, বার্ষিক চাঁদা সডাক ৫·৫০ ন. প.। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

চতুরঙ্গের কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮ সংখ্যা "রবীন্দ্র-সংখ্যা"রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। বিশিষ্ট ভারতীয় লেখকদের রচনা ছাড়াও বিদেশী লেখক-লেখিকার—যাঁদের মধ্যে কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন—ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত রচনা এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে।

কার্যালয় : ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলকাতা ১৩

বাঙলার কাব্য। হুমায়ুন কবির

সমাজ-মানসের বিস্তৃত পটভূমিকায় হাজার বছরের গৌরবময় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাঙলার কাব্যধারার গতি প্রকৃতির মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ। ৩·০০

মার্কসবাদ। হুমায়ুন কবির

আধুনিক চিন্তাজগতের স্মরণীয় মনীষীর যুগান্তকারী দর্শন ও মতবাদ বোঝার পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ। ২·৫০

পটলডাঙার পাঁচালী। যুবনাশ্ব

"কল্লোল" পত্রিকার অগ্রণী মশালচীর একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। গভীর জীবনবোধ, কঠোর সত্যনিষ্ঠা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যের স্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত। ২·২৫

প্রাপ্তিস্থান :

চতুরঙ্গ। ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলকাতা ১৩॥ মিত্রালয়। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলকাতা ১২॥ বাক্ সাহিত্য, কলেজ রো কলকাতা ১২।

আনন্দের অভিসারে।

বিশ্বলোকের দিকে তাকালে একটি সহজ স্বতোৎসারিত বিস্ময়ে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে: চতুর্দিকে প্রাণের এত যে অফুরন্ত আয়োজন এর মূল বস্তুটি কি! কোন্ গূঢ় এষণায় প্রবল প্রাণ এমন আত্মগত আবেগে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে! বাধা তো কম নেই কোথাও—সর্বত্র হনন হিংসা ও ঈশ্বরতার আভাস, কোথাও আহার্য অনুপস্থিত, কোথাও সঞ্চয়ের ঘরে শূন্যতার আতঙ্ক। নিজেকে বিস্তারের ক্ষেত্রে কত দ্বন্দ্ব, আঘাত।

অন্নের জন্যেই কি জীবন! পার হও এই লঘু স্তর। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ভ্রমণ কর। এই সত্তা কি প্রাণময় কোষে পূর্ণ। চলো, গভীরে চলো স্বাদু উৎসের সন্ধানে। মনের দ্বারাই সমস্ত বুদ্ধি বর্ধিত হচ্ছে, কিন্তু তাই কি! আরো—আরো। অন্ধকারময় গভীরে চলুক অন্বেষণ—বিজ্ঞান (অধ্যবসায় শক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ) থেকেই কি সমস্ত জাত ও পালিত হচ্ছে না! না, তাও বুঝি নয়, সকল অন্বেষণের অন্তে মিললো একটি আশাতীত প্রাপ্তি: আনন্দের জন্যেই এই প্রাণক্রিয়া। আনন্দ: যিনি সত্য জ্ঞান অনন্তরূপে ব্যাখ্যাত, তা থেকেই সমস্ত জাত বর্ধিত····· আনন্দাভিমুখেই সকল জীবের প্রতিগমন।

একটি অকারণ অবারণ আনন্দলীলা রয়েছে মহাবিশ্বে। যা বিশ্বলোকে রয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত হোক আমার চেতনায়, আমার অনুভবে আসুক একটি আনন্দশিহরণ যাতে জীবন সার্থক সুষমাময় মহৎ হয়ে ওঠে। একটি বিরাট উপলব্ধিতে যেন নিখিলের অপার আনন্দবর্ষণ গ্রহণ করতে পারি। আনন্দের মধ্যে আমি যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

এতেই আমার জীবনের নব নব লোকে উত্তরণ। এ হোল প্রতিমুহূর্তে বিশ্বকে আমার এবং আমাকে বিশ্বের করতে করতে বাঁচা। এ হোল নির্জীব জড়তাপূর্ণ জরাগ্রস্ত নিরানন্দের অন্ধকার থেকে আলোকের মঙ্গলতীর্থে যাত্রা। আনন্দ বহন করে আনে প্রবল জীবনীশক্তি, প্রচুর কর্মের উদ্দীপনা। সহস্র আঘাত বিপদ ও দুঃখের সম্মুখীন হবার সাহস ও ক্ষমতা দান করে। দুঃখকে এড়িয়ে নয়—তার আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার অপচেষ্টায় রত না হয়ে এ আমাদের দৃঢ়পদে অসঙ্কোচে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়। সুখ এবং ঐশ্বর্যের বিকার ও ক্লান্তি এবং নিজের মধ্যে এক অসহায় বিপন্ন অবস্থা যা আমাদের ঠেলে দেয় আত্মহননের দিকে শ্রেষ্ঠা অবলুপ্তির দিকে তার হাত থেকে উদ্ধার করে। প্রাণ তখন প্রাণেরই সন্ধানে ফেরে।

সংসারের এত গ্রন্থিল কর্মভার কেই বা বহন করত যদি না আকাশ পরিপূর্ণ করা আনন্দ থাকতেন! কর্মসাধনার এই এক মন্ত্র। তুমি কর্ম করবে কেন! কেন তুমি তোমার আহার নিদ্রা আরাম ও বিষয়বাসনার উর্ধ্বে ও বাইরে গুরুভার দায়িত্বপূর্ণ কর্মযোগ অবলম্বন করবে। এর কারণ বিচ্ছিন্নতায় মানুষের মুক্তি নেই, মানুষের সাধনা অমৃতের সাধনা বিরাটের সাধনা, এই প্রাণ বিরাট, এর তো অন্ত নেই। তুমি তোমার নিত্য প্রয়োজনের উর্ধ্বে কর্মযোগী হয়ে কর্মে আনন্দকেই লাভ করবে বলে, ত্যাগ স্বীকার করবে আনন্দ পাও বলে, উপলব্ধির মধ্যে ত্যাগেই তখন ভোগের আনন্দ যখন সকলকে গ্রহণ করে বিশ্বমানবের জন্যে এক মহতো মহীয়ান ব্রত উদযাপনের সার্থকতায় জীবন সীমাহীন বিস্তার লাভ করে।

জীবনে কেমন করে মানুষ বিহার করবে আনন্দে! বিশ্বের আনন্দযজ্ঞের আমন্ত্রণে কেমন করে সে যোগ দেবে!

আনন্দ সর্বত্র বিরাজ করছে, আনন্দ রয়েছে মানুষের আপন অন্তরে, হৃদয়ের নিভৃতকক্ষে, মানুষকে তার অন্তরের মণিকোঠার সন্ধান নিতে হবে, চাই চিত্তের উন্মেষ উদ্বোধন জাগরণ। এ আনন্দ বস্তুযোগে গড়ে ওঠে না, উপকরণের সুখের ভাণ্ডারে একে খুঁজে পাওয়া যাবে না। লোভ, আসক্তি এবং স্বার্থপরতা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। জীবনযাত্রায় আসুক একটি সহজ সুরের স্বাচ্ছন্দ্য, একটি বাহুল্যবর্জিত সারল্য, চিত্তে আসুক ঔদার্য, নম্রতা, প্রীতির আকুলতা, প্রেমে পুলকে প্রসন্নতায় নিখিল বিশ্বজীবনধারার সঙ্গে ব্যক্তি জীবন মিশে যাক, একটি অকম্পিত বিশ্বাসের প্রসাদে জীবন কৃতার্থ হয়ে উঠুক।

আনন্দকে লাভ করলে মানুষের মরণেও আনন্দ। মানুষ যখন স্বেচ্ছায় অপরের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয় তখন তার চেতনায় থাকে এই তীব্র আনন্দিত যন্ত্রণা। মৃত্যু তখন প্রাণ হয়ে ওঠে। এই আনন্দ—এই আত্মবিসর্জনের যোগে—সমগ্র মানবসমাজের প্রকৃষ্ট গতি তথা মুক্তি।

কাব্যে সংগীতে নিবন্ধে ভাষণে—সর্বোপরি নিজের জীবনে—আচরণে প্রতিফলিত করে আমাদের সকলের গুরু মানবশ্রেষ্ঠ মহাকবি বিশ্বের সকল মানুষকে আনন্দলোকে অভিসার যাত্রার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

নির্মলেন্দু মান্না

কবিগুরুর শতবার্ষিকীতে জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা—
আর চাই আপনাদের ঐকান্তিক সহানুভূতি ও আশীর্বাদ।

গেঞ্জী, টী সার্ট, টেনিস সার্ট
প্রভৃতি
ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী
তাই দেখতে সুন্দর, পরেও আরাম।

পাইওনিয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ পাইওনিয়ার বিল্ডিং,
কলিকাতা-২

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন—পাইওনীয়ার নিটিং মিলের ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইলাম। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহাদের হোসিয়ারী দ্রব্য ধৌত করিবার বিরাট আধারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য.....

আয়ন এক্সচেঞ্জিং স্তম্ভের মধ্য দিয়া চালিত জল বিশুদ্ধ হইয়া আধারগুলি পূর্ণ করিয়া থাকে।

ফোন : ৫৬-২৯৮৩

শতবর্ষ পরে।

কবিতার পরমায়ু নাকি কমে আসছে।

আধুনিক কালের যন্ত্র-সভ্যতার সম্প্রসারণে মানুষের মনের তটভূমিতে রসের ধারার ঘাটতি পড়ছে; আজকের দিনের মানুষ matter of fact নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। তাই কবিতা আর কবিতা নৈব নয়। নিতান্তই যদি কবিতা স্বল্পায়ু হয়ে বাঁচতে চায় তবে সে তার পার্থিব দেহ নিয়ে না হয় প্রয়োজনের চাহিদাকে মিটিয়ে বাঁচুক; কিন্তু অমৃতের বরপুত্র হয়ে অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার দিন আর তার নেই। কেননা, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার লতা শুকিয়ে যায়।

আধুনিক কালে এই রকম মন্তব্য যাঁরা করেন, তাঁদের মতে কবিতার সঙ্গে সভ্যতার একটা প্রচ্ছন্ন বৈপরিত্য আছে। একথা অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও আমাদের দেশে না হোক, পৃথিবীর অন্যত্র কবিতা-বিমুখতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে যে আদর্শ রাষ্ট্র করেছিলেন, তার এলাকা থেকে কবিকে তিনি বহিষ্কৃত করেছিলেন।

সৌভাগ্যের বিষয়, প্লেটোর পরে কয়েক হাজার বছর কেটে গেছে; এবং পৃথিবী বৃদ্ধ হলেও কবিতা আজো তরুণী।

উপনিষদে কবিকে ত্রিকালজ্ঞ কালোত্তীর্ণ বলে প্রশস্তি জানানো হয়েছিল। আধুনিক যুগে কিন্তু কবিতার কদর ও কবির সম্মানের উপনিষদকারের স্তুতিবাচনের মতো নয়। কিছুদিন আগেও শোনা গিয়েছিল, ফরাসী দেশে কবিরা জনসাধারণকে কাব্যমুখী করবার জন্যে সুলভ মূল্যে দলবদ্ধভাবে কবিতা প্রচার ও বিক্রয়ে রাজপথে নেমেছিলেন। আমাদের দেশেও তার সূচনার ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আয়ুষ্কাল কতোদিন তা নিয়ে বিষয়গতভাবে আমরা একটু ভেবে দেখতে পারি। অর্থাৎ, রবীন্দ্র-কাব্য উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হবে, না, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কাব্যরসিকের কাছেই মিউজিয়াম্ পিসের মতো রক্ষিত হবে!

রবীন্দ্রনাথও একথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি আশাবাদী। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল গভীর। শতবর্ষ পরেও তিনি আশা করছেন, ভাবীকালের উৎসুক পাঠক কৌতূহল ভরে তাঁর কাব্য পাঠ করবে। নতুন কবিদের জন্যেও রবীন্দ্রকাব্য-পরিচিতি উজ্জ্বল থাকবে। ১৮০০ সালের কথায় ১৩০০ সালের কবির আত্মপ্রত্যয় দেখি—

'সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে,
কবি এক জাগে—
কত কথা পুষ্প প্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে,
একদিন শতবর্ষ আগে।'

এখন গবেষক ভাবতে পারেন রবীন্দ্রনাথের এ আত্মপ্রত্যয় ভিত্তিহীন কিনা!

এই প্রসঙ্গে প্রধান প্রশ্ন, বিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার করার মতো অবিনশ্বর কোনো বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র-কাব্যে আছে কিনা!

টমসন কল্পনা করেছিলেন কোনো আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে রবীন্দ্রকাব্য যদি ভস্মীভূত হবার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সেই অবস্থায় একটিমাত্র কবিতাকে যদি উদ্ধার করার সময় থাকে, তবে তিনি

বোরিসভ মৈত্রেয়'র

সুবৃহৎ উপন্যাস

উত্তর সাগরের তীরে ৮·০০

বিদেশের পটভূমিকায় বিদেশী চরিত্র নিয়ে লেখা উপন্যাসও যে সার্থক ও পঠনযোগ্য হয়ে ওঠে আলোচ্য গ্রন্থখানি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এ গ্রন্থের লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও দেশের মানুষগুলিকে, তাই তারা উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে এ গ্রন্থের পাতায় পাতায়। লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, গ্রন্থখানি পড়তে পড়তে চরিত্রগুলিকে মোটেই ভিন দেশী বলে মনে হয় না, বরং আমাদের আশপাশের নানান জনের ছায়া পড়ে তাদের ওপর। বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমানা প্রসারের যে সুস্থ আন্দোলন সুরু হয়েছে আজকের দিনে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সে ক্ষেত্রে এক সার্থক সংযোজন। দূর সমুদ্র মানুষ সহরের এক অনাস্বাদিত পূর্ব পরিবেশ উপস্থাপনায় আশ্চর্য শিল্প কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

বৈচিত্র্যাভিলাষী পাঠক-পাঠিকারা নিঃসন্দেহে এক নতুন ধরণের খোরাক পাবেন এ গ্রন্থে।

স র স্ব তী গ্র ন্থা ল য়

১৪৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ফোন-২৪-৩১১৫

কাজে নিখুঁত
সময়ে নির্ভুল

ঝক ঝকে তকতকে

ক্যালকাটা প্রেস সার্ভিস

৪৫, আলগাঁ লেন। কলিকাতা - ১২

EPS/3·41

'উর্বশী'কে উদ্ধার করবেন। বিস্মৃতির হাত থেকে রবীন্দ্রকাব্যকে উদ্ধার করার এই সমর প্রচেষ্টার অর্থ কী? পৃথিবীতে কতো কবি কবিতা লিখে গেছেন, সকলকে তো সমানভাবে আমরা মনে রাখি না; কেউ বা হয়তো মহাকালের রথের চাকায় নিষ্পেষিত হয়ে অবলুপ্ত হয়, আবার কারো বা স্থান হয় চলমান রথের গৌরবের আসনে। রবীন্দ্রনাথ কী সেই আসনে অধিষ্ঠিত?

যে আমার মনের কথা বলে তাকে আমি মনে রাখি, যে অনেকের মনের কথা বলে তাকে অনেকে মনে রাখে। শেক্সপীয়রের রচনায় সমসাময়িক রীতিনীতি বেশকুষার যে বর্ণনা সেটাকে ভুলে গেলেও মানুষের শাশ্বত সত্যের রূপায়ণকে কেউ ভুলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথেও যে গভীর মানবতা বোধ, যে সংবেদনশীলতা কাব্যের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত, তা চিরকালের আনন্দের উৎস। প্রবহমান কালের গতিতে মানুষের যে অংশটা পরিবর্তিত হতে থাকে, সেটাকে নিয়ে যিনি মাতামাতি করেন, তাঁর প্রশস্তি সাময়িক। কিন্তু, এই আপাতঃ চঞ্চল কালপ্রবাহের অভ্যন্তরে মানুষের যে অবিকৃত চিরন্তন সত্যটি লুকিয়ে আছে, তাকে উপলব্ধি করে প্রকাশিত করেন যে কবি, তিনিই কালোত্তীর্ণ হন।

ইলিয়ড ওডেসির কবি, রামায়ণ মহাভারতের কবি—এই জন্যেই চিরকালের কবি। রবীন্দ্রনাথও তাই সর্বকালের মানুষের কবি। ওডেসির লোটাস-ইটারদের মতো চলার পথে অতীতকে বিস্মৃত হবার প্রবণতা আছে মানুষের মধ্যে। সেটা কিন্তু সভ্যতার সঙ্কটকাল। তারপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের ইতিহাসের পার্শ্বপরিবর্তন হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'রেনেসাঁস্'। এর অর্থ রুদ্ধগতি বর্তমান কালের দুর্গতি দূর করবার জন্যে অতীতের শাশ্বত সত্যের সাহায্য গ্রহণ। এ ঘটনা ইতিহাসে বার বার ঘটেছে। মানুষ তখন মহাকবিদের, মহর্ষিদের লেখনী থেকে প্রমিথিয়ুসের মতো আলো নিয়ে এসে বর্তমানের অন্ধকার দূর করেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই মহাকবি মহর্ষিদের একজন। হিমালয়ের মতো তিনি বিরাট, হিমাদ্রির মতো তিনি মহদাশ্রয়। যুগের বয়েস তাই তাঁর আয়ুষ্কালকে সীমিত করতে পারে না।

সত্য সুন্দরের উপাসনা রবীন্দ্রকাব্যে। তাঁর কবিতা যেন সুন্দরকে লেখা প্রেমপত্র। রবিরশ্মি শাশ্বত কালের দীপ্তিতে প্রেমোজ্জ্বল। রঁলাঁ এবং টলস্টয়ের মতে অমর রচনার উদ্দেশ্য হবে দেশকালের গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনহীন গ্রন্থিবন্ধন। রবীন্দ্রকাব্যে সেই চিরকালের সুরটি বাঁধা।

বস্তু জগতের মধ্যেও বৈকুণ্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়ার যে মহৎ সৃষ্টি, তাকে জরা গ্রাস করতে পারে না। মৃত্যু সেখানে জয়ী নয়। কিন্তু সোয়ালার গলির বীভৎস বাতাসও মুহূর্তের সোনার কাঠির পরশে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

'তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটি ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।'

যে কবির কাব্য 'ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে, এক বৈকুণ্ঠের দিকে—

শুধু শতবর্ষ কেন, শত সহস্র বর্ষ পরেও তাঁর কবিতার পরমায়ু সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ কোথায়? টমসন কুড়োবেন উর্বশী, আমি মধ্যবিত্ত আমার অধিকার নিয়ে সোয়ালার গলিতে, আমি কুড়োবো ক্ষণকালের জন্যে বৈকুণ্ঠের ধাম। আর বাকীজনের জন্যে থাকবে যথাযোগ্য কাব্যভোজ।

অমিলকুমার ভট্টাচার্য

আমার জীবন।

আমার জন্মের তারিখ ৬ই মে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ। বাল্যকালে ইস্কুল পালাইয়াই কাটাইয়াছি। নিতান্তই লেখার বাতিক ছিল বলিয়া শিশুকাল হইতে কেবল লিখিতেছি। যখন আমার বয়স ১৬ সেই সময় ভারতী পত্রিকা বাহির হয়। প্রথমত এই পত্রিকাতেই আমার গদ্য লেখা অভ্যস্ত হয়। আমার ১৭ বছর বয়সে মেজদাদার সঙ্গে বিলাত যাই—এই সুযোগে ইংরাজি শিক্ষার সুবিধা হইয়াছিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপক হেন্‌রি মর্লির ক্লাসে ইংরাজিসাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছিলাম। একবৎসরের কিছু উর্দ্ধকাল বিলাতে থাকিয়া দেশে ফিরিয়া আসি। জাহাজে "ভগ্নহৃদয়" নামক এক কাব্য লিখিতে সুরু করি—দেশে আসিয়া তাহা শেষ হয়। অল্পকালের মধ্যে সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার ২০ বৎসর বয়সে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর সহিত আমার বিবাহ হয়।

ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, রাজা ও রাণী, সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যগুলি পরে পরে বাহির হইয়াছে—তাহাদের প্রকাশের তারিখ প্রভৃতি আমার মনে নাই। সোনার তরী কবিতাগুলি প্রায় সাধনা পত্রিকাতেই লিখিত হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিনবৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল। এই সময়েই বিষয়কর্ম্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্ব্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত—কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমলবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিল। কৃষ্ণকমলবাবুও সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প, সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম। সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়। আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষঅনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষ্যে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই। তরুণ বয়সে ভারতীতে বৌঠাকুরাণীর হাট লিখিয়াছিলাম ইহাই আমার প্রথম বড় গল্প।

এই সময়েই আমি বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন—তখন তাঁহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহের অঙ্কুরমাত্র দেখি নাই - তিনি তখন একদিকে বেদান্ত অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। কোনোকালেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। বিদ্যালয় দুই এক বৎসর চলার পর ১৩০৭ সালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বঙ্গদর্শন পাঁচ বৎসর চালাইয়া তাহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে বিদ্যালয় লইয়া নিযুক্ত আছি। উপাধ্যায় ৺মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমার বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন—কিছুকাল ইহাকে তিনি চালনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আমার গ্রন্থাবলী বিস্তর পরিশ্রমে Edit করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে বিষয় ভেদ অনুসারে আমার সমস্ত কবিতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার জীবন ও রচনার ইতিহাস সংক্ষেপে উপরে লিখিয়া দিলাম। শন তারিখের কোনো ধার ধারি না। আমার অতি বাল্যকালেই মা মারা গিয়াছিলেন—তখন বোধহয় আমার বয়স ১১।১২ বৎসর হইবে। তাঁহার মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া অমৃতসর হইয়া ডালহৌসী পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে যান—সেই আমার বাহিরের জগতের সহিত প্রথম পরিচয়।

সেই ভ্রমণটি আমার রচনার মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেই তিন মাস পিতৃদেবের সহিত একত্র সহবাস কালে তাঁহার নিকট হইতে ইংরাজি ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতাম এবং মুখে মুখে জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা ও নক্ষত্র পরিচয়ে অনেক সময় কাটিত। এই যে স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তিনমাস স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছিলাম ইহাতেই ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের সহিত আমার সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই শেষ বয়সে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার শোধ দিতেছি—এখন আমার আর পালাইবার পথ নাই—ছাত্ররাও যাহাতে সর্ব্বদা পালাইবার পথ না খোঁজে সেইদিকেই আমার দৃষ্টি। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৭। ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

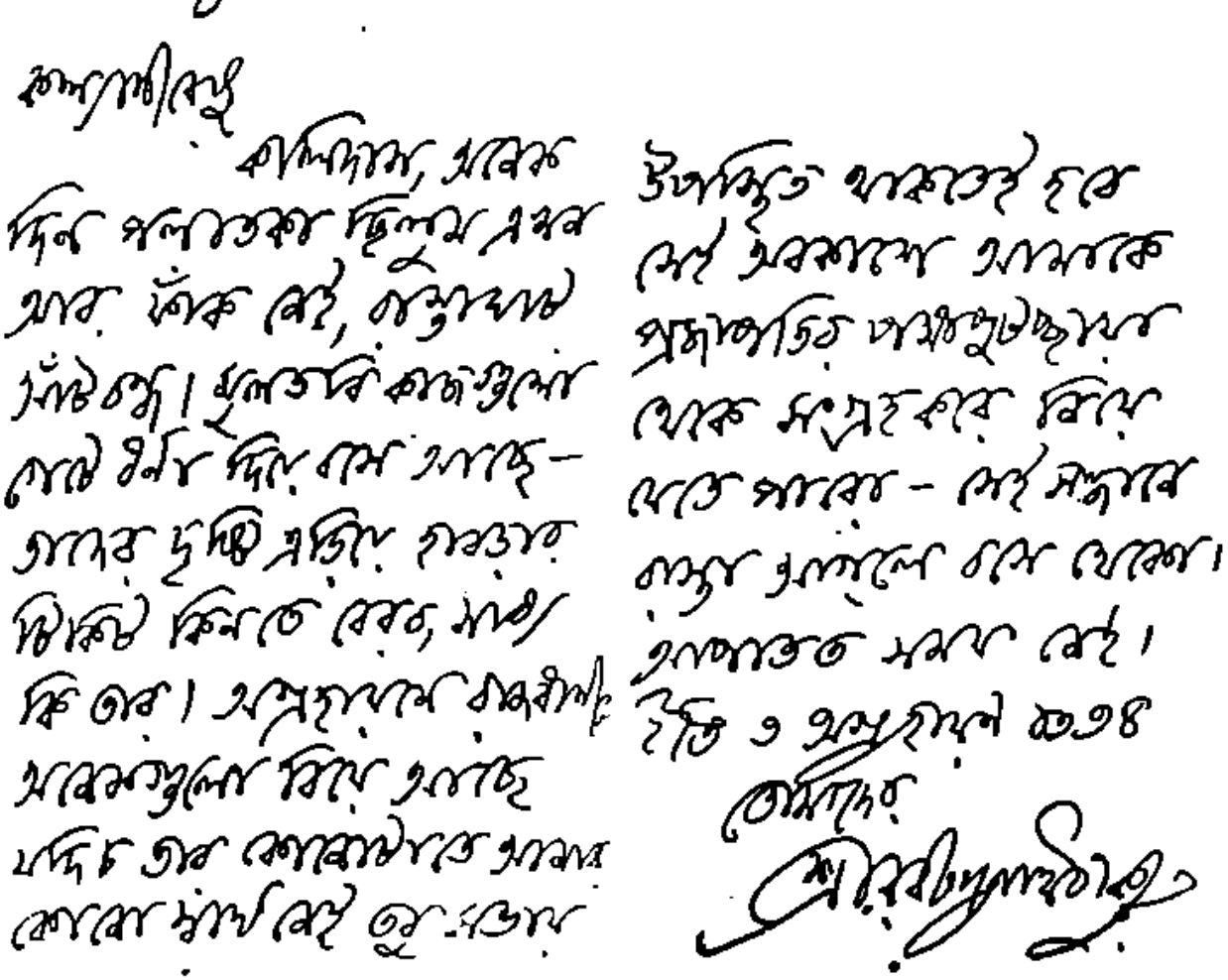

কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র।

Rabindranath IN PICTURES

Herein we present a galaxy of rare and beautiful pictures of Rabindranath, representing different aspects of his glorious life.

These pictures speak in silence but with eloquence and carry living memories of bygone days. They bring light and delight to all beyond all barriers and are a constant source of joy, pleasure, contentment and inspiration. They will live and live for ever.

Rabindra Centenary Number

GALPA-BHARATI

WORLD PEACE

The supernational spirit of humanity has at last built its body in the League of Nations. Though we in a country like India can hardly hope to help her mission through powerful politics yet let us raise our voice in expressing our hope that she will bring peace in this world by establishing justice between nations and removing all that is menacingly noxious in the attitudes of powers that rule the destiny of men in the present age.

Rabindranath Tagore

The above message was addressed by Tagore on the occasion of the World Disarmament Conference holding its session in Geneva under the auspices of the League of Nations. The ideals upheld by the League and allied organisations working for World Peace were then undergoing the severest trial. Yet faith if born of sincere conviction, should not falter. Through Violence to extinction or through Non-violence to perpetuation and progress—that is the sphynx-riddle mankind is faced to solve to-day ; and the note of hope sounded by the seer of India, should fortify our hearts to "greet the unseen with a cheer."

The world to-day is wild with the delirium of hatred,
the conflicts are cruel and unceasing in anguish,
crooked are its paths, tangled its bonds of greed.
All creatures are crying for a new birth of thine,
Oh Thou of boundless life,
save them, rouse thine eternal voice of hope,
Let Love's lotus with its inexhaustible treasure of honey
open its petals in thy light.

O Serene, O Free,
in Thine immeasurable mercy and goodness
wipe away all dark stains from the heart of this earth.

Thou giver of immortal gifts
give us the power of renunciation
and claim from us our pride.
In the splendour of a new sunrise of wisdom
let the blind gain their sight
and let life come to the souls that are dead.

O Serene, O Free,
in thine immeasurable mercy and goodness
wipe away all dark stains from the heart of this earth.

Man's heart is anguished with the fever of unrest,
with the poison of self-seeking,
with a thirst that knows no end.
Countries far and wide flaunt on their foreheads
the blood-red mark of hatred.
Touch them with thy right hand,
make them one in spirit,
bring harmony into their life,
bring rhythm of beauty.

O Serene, O Free,
in thine immeasurable mercy and goodness
wipe away all dark stains from the heart of this earth.

Rabindranath Tagore.

INTERCHANGE

Vida D. Scudder.

(Wellesley, Mass., U.S.A.)

'Arise ye little glancing wings and sing your infant joy,
For everything that lives is holy.'
'Verily from the Everlasting Joy do all objects have their birth.'
'None could live or move if the energy of the all-pervading joy did not fill the sky.'
'In what manner do we accept this world, which is a perfect gift of joy ?'
'Gladness is the one criterion of truth.'

Thus the One Voice speaks through many voices : through William Blake as through the ancient Upanishads, and through the poet who in these latter days reports and interprets their great message.

'Ist Er in Werdenlust
Schaffender Freude nah.'

So East and West alike proclaim.

Among the gifts which Rabindranath Tagore has brought us, we may surely count his power to recall those who even in our action-driven West have entered into the secret places. Again and again, Blake comes to mind, as we read the early essays, Sadhana, or the poems of love, human or divine. There is the same honour for the 'luminous imagination,'—that creative force, in which, Blake says, all things exist ; the same large freedom in a love that casts off bonds. Above all, we find a like profound insight into a Humanity that is divine.

'Thou art a Man ; God is no more :
Thine own humanity learn to adore.'

Might not this couplet of Blake's serve as motto to Tagore's last noble book, "The Religion of Man" ? 'The idea of the humanity of our God, or the divinity of Man the Eternal, is the main subject of this book,' says Rabindranath.

One could proceed far with such comparisons with Blake. But other association crowd the mind. In that compelling drama, The King of the Dark Chamber, is it Tagore who reports the words of the unseen King, to his bride who may touch him but not behold,—or is it St. John of the Cross ? When at the close of the play the old Initiate, the penitent bride, the conquered enemy, meet on the way seeking the Unknown God, pursued and pursuer, have we not metaphor cognate to "The Hound of Heaven" ? Delighting in Tagore's early love poems, we perceive for what good reason he was called the Shelley of India. How natural that it should have been Yeats who in 1912 introduced him to the European public ! (Yeats by the way compares him to Thomas a Kempis). We can recede

far into the thought of the west and still find parallels. The Religion of man reiterates earnest witness that Reality means escape from separateness : so old Boethius, 'Know thou then that unity and goodness are the same.' In Tagore's exquisite praises of the divine revelation conveyed by natural beauty, can be found almost a transcript of passages from St. Bonaventura's Itinerarium Mentis in Deum.

In the pure full stream of mysticism flowing from St Francis may indeed perhaps be recognized the closest analogue to Tagore. There are passages from Capuchin sermons of the seventeenth century which sound like commentaries on the penetrating ecstasies of Gitanjali. The movement, inspired by the saint who sang the "Lauds of the Creatures" is at its most distinctive, as free as Tagore himself from the asceticism which in West as in East has often betrayed men into ingratitude. Neither Tagore nor the greater Franciscans ever confuse the complete surrender of greed and claim for which they both stand, with denial of natural good: alike they find in such surrender pushed to the limit, the entrance into fullness of life and joy.

Yet if Tagore shares the perceptions of the Western soul on its highest levels, one hastens to rejoice that he has nothing in common with its more cynical moods. With what refreshing scorn he castigates the 'chuckle of an exultant disillusionment' that is 'becoming contagious', while 'the knights-errant of the cult of arson are abroad, setting free to our time-honoured altars of worship' ! As he repudiates the crass pseudo-realism of the pessimist, so he transcends the scientific materialism even among us now obsolescent. With what spirit he maintains that not in detail of process but in marvel of result we are to look for ultimate reality ! The lad who recoiled disgusted from a dissected windpipe, came to incorporate in his thought all that Western science has taught concerning the advance of physical life. Yet he puts the scientific concepts of the West at the service of the mystic wisdom of the East. 'I could not bear the artizan to occupy the throne that was for the artist who concealed the machinery and revealed the creation in its ineffable unity.' Eloquently he reminds us that 'in the secret chamber within the heart' 'the fire of Nature's workshop is transformed into lamps of a festival, the noise of her factory is heard like music. The iron chain of cause and effect sounds heavily outside in Nature but in the human heart its unalloyed delight seems to sound as it were like the golden strings of a harp.'

In such absorption of European culture by a temperament distinctively Eastern, Tagore's greatest originality may perhaps be found. Might it be surmised that by a rhythm of compensation, Western mysticism at its best owes much to an Oriental strain, while conversely the mysticism of the East gains new richness when it accepts the gifts of Europe? This fusion of elements is characteristic of Tagore, as it is of a great spirit from Japan, Kagawa. The genius of these men has triumphed over Separation. It has broken down the invisible barriers which divide race from race. Tagore can bring home to us with balanced appreciation the gifts, with the perils, for which two civilizations stand : 'the best

ideal in the West, the great truth of fight,'—a 'holy spirit,' which yet at its worst 'breeds unappeasable greed for material gain, and leads to unmeaning slavery to things' ; and the Eastern 'inner concentration of mind' where 'the peace of the extinguished desire may become the peace of death; and the inner world in which we would dwell become a world of incoherent dreams.' If there is value in the stormy approach of East and West which we are now experiencing, it may be because the clash of these contending ideals shall become a marriage whence a more adequate ideal than either shall be born. Such marriage is foreshadowed in the writings of Tagore.

The poet is especially useful to us because he separates himself from the 'time-honoured tradition' of those negative Hindu schools whose aim is 'to reach a condition wherein mind becomes perfectly blank, losing all its activities. When he says that this discipline 'may be valuable as a great psychological experience, but all the same it is not religion,' we sigh with relief. Tagore has always disclaimed, too completely it would seem, the title of philosopher but it is true that his teaching springs from that living experience which underlies the plane of thought. The very claim of life has turned him from the quest for vacancy; it has led to his asserting that conscious union in love with 'the Eternal Person manifested in all persons' is our central aspiration. As we share such aspiration, as we advance toward such union, antagonisms of race and nation will vanish. The poet severed relations with active politics in 1907. But in the deeper regions of psychical life, he is doing much to draw civilizations together. All the nations, says he, are breaking their shells; and he helps in the process. It is fitting that we bring tribute of gratitude to one who so sets us inwardly free from the prison of false nationalism as from that of the personal self; who in his work illustrates the possibility of fecund marriage between East and West; and who enables us to see with clearer vision, in the energy, often so disconcerting of this bewildering universe, 'the play of love.'

The Great One comes,
sending shivers across the dust of the Earth.
In the heavens sounds the trumpet,
in the world of man the drums of victory are beaten,
the hour has arrived for the great Birth.

To-day the gates of night's fortress
crumble into the dust—
On the crest of awakening dawn
assurance of new life
proclaims "Fear Not".

The great sky resounds with paeans of victory
to the Coming of Man.

Rabindranath Tagore.

OUR TAGORE

Karl Egle.

(Merited Worker of Culture of the Latvian SSR.
One of the first translator's of Tagore).

It was not a slip of pen when I wrote "Our Tagore" as a title. The poet has long become near and dear to us, as if he were one of us.

And it is only natural. A poet-patriot, humanist and fighter for freedom cannot but be liked by the industrious and peaceful Latvian people.

To me personally Tagore's poetry has always been very near, for I have been translating his wonderful productions, the content of which always amazed me by its profundity, for many decades. My first translations of Tagore's poetry into Lettish were printed in 1918. I have translated many of his books since then. The book of his verse entitled "The Gardener" and the play "Post" appeared in Latvia in my translation in 1921. When Tagore gave his consent to the publication of his works in Lettish, I, together with poet Richard Rudzit, started working on the translation of a complete edition of Tagore's productions. Nine volumes had been put out before the Great Patriotic War.

While working on the translation and popularization of Tagore's works I corresponded with the great writer. Tagore always found time to answer my letters. I still have some of Tagore's letters and preserve them as a great treasure. In some of them the peot rejoices at the fact that his works appeared in Lettish the roots of which are closely interwoven with the roots of Bengali.

I was particularly charmed by Tagore's attentive and kind attitude towards translators. He knew well how much effort and labour was to be spent, sometimes, on the translation of his new productions. Extremely modest and polite, an ardent champion for the truth, happiness and freedom, Rabindranath Tagore inspired us to creative work and gave valuable advice.

I am a very old man. The greater part of my life was dedicated to the translation and popularization of the works of the great Indian writer, on the decline of my life, I feel a particular joy in realising that cause to which I devoted so much energy has acquired a truly nation-wide scale in Soviet Latvia.

Whereas previously, in bourgeois times, Tagore's books had been published in editions never exceeding three or four thousand copies, the number has gone up at least ten times by now. The prose and poetry of this great thinker and original artist won warm sympathies of the two million-strong Latvian people living on the Baltic shores.

Even after the great poet's death I have been corresponding with Indian friends. I sent to the Tagore Museum in India all publications of his works in Lettish put out after the great Patriotic War. I also sent to the Museum bibliographical materials on Tagore printed in Latvia.

The Soviet people observe the centenary of Rabindranath Tagore's birth on a wide scale. The Latvian Publishing House will put out a selection of Tagore's works in Lettish to mark the occasion.

Great men are immortal. Tagore's works are immortal, too.

• • • •

I love India, not because I cultivate the idolatry of geography, not because I have had the chance to be born in her soil, but because she has saved through tumultuous ages the living words that have issued from the illuminated consciousness of her great sons : Satyam, Jnanam, Anantam Brahma, Brahma is truth, Brahma is wisdom, Brahma is infinite ; Santam, Sivam, Advaitam, peace is in Brahma, goodness is in Brahma, and the unity of all beings.

The householder shall have his life established in Brahma, shall pursue the deeper truth of all things and in all activities of life dedicate his works to the Eternal Being.

Thus we have come to know that what India truly seeks is not a peace which is in negation or in some mechanical adjustment, but that which is in SIVAM, in goodness, which is in ADVAITAM, in the truth of perfect union ; that India does not enjoin her children to cease from KARMA, but to perform their KARMA in the presence of the Eternal, with the pure knowledge of the spiritual meaning of existence ; that this is the true prayer of Mother India :

He who is one, who is above all colour distinctions, who dispenses the inherent needs of men of all colours, who comprehends all things from their beginning to the end, let Him unite us to one another with the wisdom which is the wisdom of goodness.

Rabindranath Tagore

RABINDRANATH TAGORE IN GERMANY

Hans Ockhardt.

The Nobel Prizewinner

When Germany's newspaper readers opened their morning papers on November 13, 1913, they shook their heads in surprise. Rabindranath Tagore had been honoured with the Nobel Prize for Literature. Hardly anyone had heard his name up to then and never before had a non-European received this high honour. But soon surprise gave way to curiosity and people began to praise the German translation of the book which had brought the high honour to the poet. "Gitanjali", a "handful of hymns", bore evidence of a new India that was known by hardly anyone on the European continent. To be sure, also, the importance of India's philosophy had long been acknowledged by German scholars—one needs only mention the names of Arthur Schopenhauer, Max Muller and Paul Deussen. But still, for most people India was at that time only the land of wonders of a far-distant past, which seemed not to share in the culture of the present. But Tagore's poems, which now were published in many magazines in German translation, weren't speaking to their readers from a far-away past. Tagore brought a message that in its form, it is true, bore unmistakably the marks of this country of wonders ; in their contents, however, they far over-leapt the borders of one country and one people. Tagore had something to say to his German readers today. Thus it is not surprising that in spite of the First World War, which soon broke out and isolated Germany from the cultural activity of the world, not less than thirteen works of the poet appeared in German translation by various renowned adapters between 1914 and 1921.

Birthday Present of the German People

Though his work had gained the poet many friends in Germany, a wider public first began to notice him again in 1921. Tagore spent his 61st birthday with friends in Switzerland. Indians living in Paris had planned to honour him on that day with a special birthday edition made up jointly of Indian and European contributions. Unfortunately this idea of a West-Eastern festival publication failed because some authors refused their co-operation if Germans too were to be asked for contributions. In Germany, however, the philosopher R. Eucken, the professor of theology A. V. Harnack, the professor of Indian culture H. Jacobi, the dramatist Gerhard Hauptmann, the poet Hermann Hesse and other renowned personalities had got together about the situation. They appealed to a circle of German publishers, writers and scholars to make their books available for a bequest to Tagore's school in Santiniketan. More than 400 books were contributed, the congratulatory address stated : "The bequest is an expression of admiration for the creator of the library in Santiniketan.....The books shall speak to

all those who in India, the homeland of deep intellect, want to obtain information about Germany and her share in human enlightenment." Tagore appreciated and reciprocated the sentiments expressed by this gift in his answer : "More than any other country of the world, Germany has contributed to opening up and broadening the channel that connects the forces of reason and spirit of the West with India. The homage of love that Germany gave today to a poet of the East on her own initiative certainly will still further deepen these relations by imbuing them with an intimate and personal character".

By Plane Through Germany

A few days later Tagore's friends were able to welcome him for the first time in Germany. However, at first only on a through trip to Sweden, which he interrupted at Darmstadt for a talk with old friends and once more in Hamburg for lecture at Hamburg University. This lecture and the echo that it received in the press sufficed to make his lecture tour that began two weeks later a triumphal procession. Because of the shortness of the time that was at his disposal, Tagore flew from one city to the other—at that time not yet an everyday, still quite a sensational enterprise. In the assembly hall of the University of Berlin he gave an address on "The message of the forests and India"—a discourse that even to today lives in the memory of those who were lucky enough to get into the packed hall. By calling the forests the source of Indian culture and by avowing that he himself derived his essence from them, Tagore touched an inner chord of the German people above all. Tagore's distinction that for the West the ocean is the source of national individuality hardly applied to Germany. Did not the German fairy tale, and the literature of the Romantic era in particular, live by the dark mysticism of the forests ? It became clear from Tagore's lectures that it is no coincidence that German philosophy and poetry in the 19th century experienced such deep influence from India in particular.

In the Universities of Munich and Frankfurt Tagore found no less response. "Bridges between East and West !"—Tagore, a world poet "—Herald of a new age !" So ran the headlines of the big newspapers as his journey progressed. Suddenly people everywhere were talking about India. Pictures and reports about India, its landscape and its people, were appearing everywhere in illustrated papers and monthly magazines. In one of the most widely read papers, the "Frankfurter Zeitung", a whole week of lively discussions took place on the question whether or not Tagore's way could be a model for the Western personality. However much opinions differed here, one thing was agreed upon : This man had something to say which could simply not be ignored.

Tagore Week in the School of Wisdom

Tagore spent the last week of his visit in Germany as guest of the Grand Duke of Hesse in Darmstadt. There Count Hermann Keyserling, an old friend of Tagore, had founded a "School of Wisdom" in the gardens of the Grand-ducal castle whereas

Tagore had in Santiniketan—he tried to find a new synthesis between the soul of the East and the spirit of the West. Here the poet asked to be available for a week to meet with people from all circles of German life. Tagore met many responsive and receptive persons during this time, and many a good discussion was held. Unfortunately, a few misunderstandings also occurred. The organisers of the Tagore Week certainly tried honestly to convey to the poet good and positive impressions of German culture and German spirit. Therefore they had carefully selected the circle of those who were to meet with Tagore. Too carefully, for thus it was only a meeting with an esoteric circle, which, it is true, represented a quietistic humanism akin to the ideas of Tagore, but which was by no means representative of the German personality of that time. Tagore, by contrast, had wanted to meet the real human being. He didn't care simply to become acquainted with the ideal of a few. Thus although the impression of Germany and her people which Tagore took along upon his departure on June 20, 1921, was beautiful and harmonious, it was not a picture of the reality of this turbulent time. Nevertheless, the interest that was awakened towards him personally and for his message was real and lasting.

What had evoked this surprising interest? Without doubt it was above all the fascination that derived from the outstanding personality of the great poet. Without doubt also the political situation in post-war Germany had opened up people's hearts and minds to receive his message. His work "Nationalism", which was translated into German immediately after the war, had evoked the strongest echo. It didn't remain unnoticed that at a time when nobody in the world wanted anything to do with Germany and the Germans, a world-renowned personality like Tagore was the first to plead in public for understanding and sympathy for the defeated enemy.

But things didn't rest with this political open-mindedness alone. Tagore was welcomed in Germany in 1921 above all as poet, and specifically as lyric poet. His dramas also appealed above all by their unparalleled confidence and clearness of representation, aside from their mythical and philosophical content. In his stories it was the poet's great love of humanity and his especial love for children that won him countless friends. But with the poet one began to know Tagore the thinker too. The herald of a message of peace, of joy and of love of humanity developed in his lectures a philosophy in which many thought they recognised once more the spirit of their own philosophic heritage, the spirit of German Mysticism and German Idealism. So it was that a wave of affection surged from Germany towards Tagore, which led him to say: "I really have the feeling of a rebirth in the heart of the people of this great country that accepted me as one of her own".

"Why do you love India?"

Twice again, in 1926 and in 1930, the great spokesman of India was a guest in Germany. Many honours were bestowed on him. When he opened an exhibition of his own paintings in Berlin in the presence of the famous graphic artist and sculptor

Kathe Kollwitz, his friends came to know an entirely new side of this universal artist. But Tagore on his side also took an abundance of new impressions back to his homeland. For instance, in 1930 he attended the Passion Play in Oberammergau, and visited several major art galleries. He spoke over the radio to a large community of listeners. As during his first visit, again this time the lecture halls were too small to accept all those who wanted to hear and see him.

During one of the poet's visits to Germany a little girl handed him a bunch of flowers and said "I love India". "Why do you love India?" returned the poet. "Because you love God !" The comment Tagore made at that time may still be valid today for every country everywhere. "The praise is too high. I wish it were true. The world is waiting for a country that loves God more than herself".

It is for the artist to remind the world that with the truth of our expression we grow in truth. When the man-made world is less an expression of man's creative soul than a mechanical device for some purpose of power, then it hardens itself, acquiring proficiency at the cost of the subtle suggestiveness of living growth. In his creative activities man makes Nature instinct with his own life and love. But with his utilitarian energies he fights Nature, banishes her from his world, deforms and defiles her with the ugliness of his ambitions.

This world of man's own manufacture, with its discordant shrieks and swagger, impresses on him the scheme of a universe which has no touch of the person and therefore no ultimate significance. All the great civilizations that have become extinct must have come to their end through such wrong expression of humanity : through parasitism on a gigantic scale bred by wealth, by man's clinging reliance on material resources ; through a scoffing spirit of denial, of negation, robbing us of our means of sustenance in the path of truth.

It is for the artist to proclaim his faith in the everlasting YES—to say : "I believe that there is an ideal hovering over and permeating the earth, an ideal of that Paradise which is not the mere outcome of fancy, but the ultimate reality in which all things dwell and move."

I believe that the vision of Paradise is to be seen in the sunlight and the green of the earth, in the beauty of the human face and the wealth of human life, even in objects that are seemingly insignificant and unprepossessing. Everywhere in this earth the spirit of Paradise is awake and sending forth its voice. It reaches our inner ear without our knowing it. It tunes our harp of life which sends our aspiration in music beyond the finite, not only in prayers and hopes, but also in temples which are flames of fire in stone, in pictures which are dreams made everlasting, in the dance which is ecstatic meditation in the still centre of movement.

Rabindranath Tagore

TAGORE AND POLAND

K. Dunin—Keplicz

It is surprising to know that Rabindranath Tagore never visited Poland, although there is a common impression to the contrary. Yet his inability to visit Poland has never stood in the way of his popularity with the Polish intelligentsia nor his love for the Polish people.

Tagore had deep sympathy with the Polish people for the sufferings the Polish people had faced for the sake of their ideals, their freedom and had expressed the hope that their idealism would ultimately overcome all hurdles.

The beginning of this century was a period of flourishing development of literary life in Poland. But this interest was, at the time, confined to the civilization of old India. Till 1913 Tagore was quite unknown in Poland. The award of Nobel Prize to Tagore drew the attention of literary circles. Polish intelligentsia's acquaintance with Tagore was made through translations for there were few people acquainted with the Bengali language.

It was during his tour of the United States of America, in 1916, when he went there to raise funds for his international university at Santiniketan, that Tagore met a famous Pole, Paderewski, the Prince of Pianists and the first Premier of free Poland. At the end of this meeting the pianist played a musical farewell to the Indian poet. Another Pole to leave a deep impression on him was Stanislaw Szukalski, a sculptor. Tagore referred to him as a "Sculptor of extra-ordinary talents."

INTENDED VISIT

After the first world war Tagore went to Europe and it was then that he intended to visit Poland. There his arrival was awaited with immense excitement. The Polish poet Antoni Lange even wrote a Sanskrit poem of welcome for the occasion. On the eleventh hour Tagore had to put off his visit.

Even before his intended visit to Poland Tagore's name had appeared in Polish literary periodicals. The first mention came perhaps in 1914 along with translations of excerpts from GITANJALI. The same year the first fragments of his poems were published. The full text translated by poet Kasprowicz was published in 1918. The journal Pro Arte And Studio published in 1917 the first extensive essay dealing with the poet's work available at that time in English. Next year saw the publication of a joint volume consisting of GITANJALI, THE CRESCENT MOON, and THE GARDENER, under the title GITANJALI. This translation is in prose, as is Tagore's English version, but it is rhythmical prose and conveys an impression of purest poetry.

This translation helped to consolidate Tagore's fame in Poland as chiefly a lyrical poet with strong mystic colouring but other characteristic features of his literary activity remained unknown in Poland. Many essays on Tagore followed. One of the most important contributions was an article by Henryk Elzenberg, himself a philosopher specializing in problems of aesthetics. He made a thorough study of his work available in Europe stressing above all the ethical element apparent in all his poems.

A further growth of interest in Tagore's works was recorded in 1902. In that year Leopold Staff published the complete text of his translation of FRUIT GATHERING written in Poetic prose. THE KING OF THE DARK CHAMBER and Tagore's article on NATIONALISM. The article aroused a wave of protest among the Polish intelligentsia. His views, taken literally, meant a blow at the very foundations of the existence of Polish nation—a mortal blow to their newly won independence. To another Polish version of the article Tagore wrote a short foreword in which he emphasised the necessity to observe the principles of ethics not only within a community but also in international relations.

However, in the following years, 1922-23, Tagore's popularity in Poland reached a culminating point. Seven volumes of Tagore's works were brought out in the series "Noble Laureate Library." In 1922, a collection of his short stories **Night of Fulfilment** was published, followed in 1923 by a new edition with some more stories added to it. The volume was reprinted in 1928. During this period **The Wreck, Sadhana, Whispers of the soul** and **Stray Birds** were made available to the Polish readers. In 1923 was also published a collection of short stories under the title HUNGRY STONES. The dramas CHITRA and MALINI translated by Roman Fajans and lyrical poems LOVER'S GIFT and CROSSING and another version of THE CRESCENT MOON also appeared in the same period.

Tagore's popularity in Poland had been so great that frequently more than one translations of single works appeared at the same time.

Tagore himself displayed keen interest on Poland. When shortly before the outbreak of the Second World War an Indo-Polish Association was formed in Calcutta and Tagore consented to be its first Honorary Chairman. The association developed a lively activity during the war and rendered valuable assistance to Polish refugees in India. In his last message which he sent to the Association on the 150th anniversary of Poland's May Constitution he wrote :

"I warmly associate myself with the 150th anniversary of the May Constitution of Poland—may justice and humanity prevail in a peaceful reconstruction of civilization."

People's Poland, after its inception in 1945, is taking all the more interest in studies on and about India and Tagore has his due place in the hearts of the Polish people. His works are appearing in new editions. They are making appearance on the television. RED OLEANDER has already been translated into Polish and is to appear soon on the book

shops. Many articles on Tagore have appeared in the literary magazine "Oriental Review". One of new streets in Warsaw and some streets in the towns of Lodz and Zielona Gora were named after the great Indian poet during the ORIENTAL NATIONS WEEK celebrated during October 1958.

Tagore is a golden link in the friendship of the two great nations—India and Poland—and his name will always remain dear to the hearts of the Polish people.

Speak to me, my friend, of him,
and say that he has whispered
to thee in the central hush of the stars
and in the heart of the peace
where life puts on its armour.
Say that thy utmost need is of him
and that he ever seeketh thy straying heart
through tangle of paths.

Rabindranath Tagore

RABINDRANATH TAGORE

George E. Gordon Catlin M. A. Ph.D. F. R. S. L.

Tagore's fertile poetry assumes many forms, rhyming and *Vers libre*, sonnet and epic —and, above all, that of short poems which would be set to music and sung by the villagers and by the boatmen on the Ganges. Just there, in the popular quality of the work of this great and withdrawn aristrocrat, lay the major secret of his success and influence. To be frank, he was prolific to the point of verbosity and tedious repetition. He tended to the pretty, the saccharine—or, to use Edward Thompson's excellent metaphor, in his easier moments his sweet and fragrant inspiration tended to resemble that beautiful water hyacinth which yet clogs the rivers of the Ganges delta and, as I have myself seen, the canals around the far forts of Mandalay. This pervasive sweetness is his weakness. Whereas the great Goethe uttered the maxim, " never a day without a line ", with Tagore it became almost a case of a poem a day. Admittedly he never became, thanks to a lyric quality, quite as flat as Wordsworth at his wordy worst ; but such vast production did indeed spell an inflation which depreciated the value of his poetic currency, despite so many golden minted pieces. Tagore the poet was also Tagore the playwright and Tagore the great educationalist. Perhaps his private school at Santiniketan, founded in 1900, later to become his international university, his Visva-Bharati, was too kindly with its father-figure, in encouraging and applauding his every production. In his *Santiniketan* Song (published in *Eastern Affairs* in 1936) he refers to Santiniketan as "the darling of your hearts.....our dreams our rocked in her arms." However, sometimes we find that what has given forth sweetness is a lion in strength, *ex forte suavitas*.

What, then, is the value of the best of Tagore's poetic and dramatic work ? In reaching a judgement on his work, it should be added, we must beware of what I can best call a chronological illusion. Because his Western reputation dates from his second visit to England (his first was in 1877) and the award of the Nobel Prize in 1913, we tend to think of him as a contemporary of the Georgians—of George V and even of T. S. Eliot. More humbly we recall those days when, along with Tagore's writings, those of Michael Fairless, with her *Brother Hilarius*, were popular and when, in expensive editions, *The Wisdom of the East* series sold so widely. Those were the days of the late Edwardian afternoon sunshine, before the Great War. But, in fact, much of Tagore's best work had already been done before the present century began. He was, that is, a Bengali Victorian. It is an indication of his stature that, whereas some think he "dates" so much, actually he survives as a spokesmen of India, dating so little.

As a Bengali poet Tagore was the inheritor of a specific tradition and must be judged in terms of it. Indian history is as luxuriant and multiform as Indian sculpture.

The European refers to the "history of India" But the Indian eye immediately detects differences : the area of the god-descended Rajputs, with their ancient rose-red cities ; the area of the Malayalam tongue, which no Moghul emperor ever subdued, with its very early indigenous Christian population of several millions ; the ancient Kingdom of Bengal, with its great wealth and separate language. Who, having visited these areas, can confuse the one with another ? Further, the specific poetry of the Bengal villages of recent centuries has been under a Vaishnava influence, an influence of lyric religious popular songs. This influence is both clear in Tagore's work and accounts for his early popular appeal to his countrymen. Like Hu-shih in China, who was acclaimed as the Dante of modern China—in terms, not of any *Divine Comedy* but of *De Vulgari Eloquio*—so Rabindranath Tagore became the great master and creator of a vernacular literature. Whether he might not have achieved more, had he commanded Hindi, is another matter. It is part of the character of India that one of its greatest writers could use a language unintelligible to so many others. Fate had it that Tagore was very much of a patriotic Bengali. Possibly for this reason he was never an Indian chauvinist. His tendency was to compare India, not to France or Britain, but to all Europe, if a United Europe. This emerges clearly in his *Creative Unity* (1922). His concern was with India's unity on a basis tolerable to each section. He was a world-citizen whose patriotism spread out from a centre of Bengal.

Four political events indeed stand out in Tagore's life. All are marked by the characteristic of moral indignation. In 1900 he published his Stories and Tales, a collection of patriotic songs. He campaigned against the administrative division, under Lord Curzon, of the ancient Kingdom of Bengal—a problem still with us and to which I shall return. Two decades later, in a famous letter he resigned his Knighthood after the Jallianwalla Bagh affair, with which the names of General Dyer and Sir Michael O'Dwyer are connected. Writing in 1919 to the Viceroy, Lord Chelmsford, while paying tribute to the "nobleness of heart" of his predecessor, he concludes, "the time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings".

Later still, the swaraj movement with its demands for refusal to use foreign cloth and for a concerted policy of non-co-operation, swept India. Usually, Gandhi and Tagore, who first met in 1915, stood together. Most of us have seen the famous photograph of those two "patres patria" seated beside each other, taken in Santiniketan. But, on this occasion, Tagore was alarmed by the isolationist excesses of swaraj; he feared a chauvinism not impossible in Bengal; and, as his manner was, he withdrew into himself and into his beloved school near Bolpur. There is an unwonted note of asperity—but, after all, the Mahatma was capable of impatience—in Gandhi's comment: "I have

found it impossible to soothe suffering patients with a song from Kabir". Tagore, on the other hand, the champion of Rammohan Roy of the Brahmo-Samaj as against Gandhi's View, saw what he supposed to be "the distracted mind of the West knocking at the gate of India for its peculiar wisdom. "And is it to be met by a hoarse shout of exclusion?"

The fourth great event, of the Second World War, found the two leaders together. Japanese admirers, years before had asked for Tagore's sympathy in Japan's action in China. The circumstances. Noguchi claimed, were unique. "Military circumstances", replied Tagore, "are always unique". In 1940, just before Tagore's death, Eleanor Rathbone, a woman not marked by tact but of great ardent intention, appealed to Tagore to persuade India to come into the war against Hitler, whatever the human cost, on the side of freedom. His reply was fierce. If the war is for human and national freedom, what freedom did India enjoy ? India had been brought by the *raj*, into the Second World War without even being consulted. No wonder Sir William Rothenstein, even thirty years before, had been warned by the Establishment, when he determined to visit India, "lest he encourage the Nationalists." The brute issue whether Hitler was to win or lose—or, for that matter, whether Stalin was to win or lose—was not one that weighted with the mind of the poet. who shared much of the pacifism of the Eastern sages. With justification he resented a moral lecture from those who, however honest and even excellent their intentions in the name of a *jihad* for freedom, withheld political freedom from India herself.

If I may venture to take in vain the words of a very great man, there are three things by which I personally should wish to be remembered. I may have made some contribution to building a political science and to getting it taken seriously ; and I hope that I have added to the arguments, and have indeed propaganded, for an Atlantic Community. But chiefly I like to recall that I had the honour of being draftsman of the International Declaration in Support of Indian Independence of 1943, which was signed by several Members of the British Parliament, some of whom later to become Privy Councillors and Ministers. The issue was precisely whether India was to be offered Home Rule, defined in London, as an act of grace ; or whether India was to be, not sullen, but formally free to follow *her own* deliberate choice, whether as republic or otherwise, and whether within the Commonwealth or without.

These were the hot issues of 1943-47, when some of us were happy to join with Sir Stafford Cripps, against even the majority of the Opposition, not to speak of the Government, in urging (with the sad Irish history in our minds) the bolder solution, because we also believed what it would prove to be the happier one. Although history, for a while, with unhappy events in the Punjab and Bengal, paused with suspended balance, we have no cause at all to regret a solution glorious in our annals. Nor is it beneath notice that, at the beginning of this time, encouraged by Agatha Harrison, by Messrs Amiya Bose and

Pulin Seal and by Dr. Godrington, while bombs were falling in London in 1944, in the Alpine Club in Audley Street, a quite creditable exhibition of Indian sculpture and art was held, drawing attention to India's great heritage and contribution; and also a Tagore Society (formed in 1936 by Mr. Seal) was revived, of which your lecturer had, what he felt to be the no small honour of being vice-chairman. To this extent Sir William Rothenstein's and Yeats, and Henry Revinson's tradition of honour for Indian culture and for Rabindranath Tagore's especial contribution, was maintained, even under war conditions.

My sole regret here is that a considered and well-supported plan, by Hindus and Moslems alike, for maintaining the unity and a measure of autonomy for the great and once individual Kingdom of Bengal, in which plan I had some finger, unhappily proved abortive—nor was it greatly aided by the then British appointee as Governor of Bengal. At least, however, if this failed, I had the double happiness of visiting India, in 1947, at the time of the Cripps Mission, at the invitation of the then President of Congress, Maulana Azad, and then, a second time, in 1948, for the Inter-Asian Conference in Delhi on the invitation of his successor as President, Mrs. Naidu, and of visiting then Santiniketan.

Tagores political career may have been detached and spasmodic in its incidents. His leadership in political ideas was not and indeed was given precise literary formulation in lectures in Japan, the great emergent Asian country of the early years of this century, as well as in the United States, later published in 1920 as *Nationalism*, as well as in his still later (1934) correspondence with Gilbert Murray, published as *East and West* and his *Crisis of Civilisation*. I may speak with the bias of political philosopher, but, his plays apart, his *Nationalism* seems to me to be the most important of his prose works. Certainly it throws flood of light in the explanation of what may seem to be inconsistencies in his practical political activities.

To begin with, India was for him "not a Nation"; and he registered his alarm at the thought that India might become one, in the peculiar sense in which he chose to use that term. It is necessary here to appreciate the idiosyncratic but important sense in which he uses the word. It is sharply different from that in which Abde Renan, who defined it as a perpetual plebiscite in living together, or in fact most political theorists have used it. It is not the tribe nor the people; and is set in contrast to the People and Society.

It is obvious that the poet was scarcely a comfortable and conforming member of a dynamic Indian nationalist movement. These were errors into which Tagore never fell. Anyhow, as already remarked, a supporter of Brahmo-Samaj, he was also a Brahmin but a kind of heretic one. "Society itself", said Tagore, far from being preoccupied with power", has no ultimate purpose. It is an end in itself. Nevertheless, it does require a measure of organisation as touching its means.

India, let us emphasise—like Italy with Mazzini, and Germany, we may add, under Konrad Adenauer—has been blessed by having as its great leaders of thought and action, at a time of fundamental political crisis, three men, all verily *patres patriae* founders of Modern India, but also dedicated internationalists and world citizens, Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore and Mohandas K. Gandhi, Panditji, Gurudev and the Mahatma. In the words of Tagore, "we have to consider that the west is necessary to the East. We are complementary". We may yet entertain the doubt whether, when Tagore writes, "I am against the general idea of all nations", then in the common meaning of the words (if not his own), he does not go too far and ignore significant community values. But when he writes, "There is only one history—the history of man"—his voice is in accord with that tradition which is that of Buddha, of St. Paul, of Erasmus of Rotterdam, and of Goethe, the greatest tradition of Humanism.

Tagore emphasised that the problem of India was social rather than civil-political. But here he was not so much concerned with economic problems of under-development and of what Professor Rostow would call "the take-off", but with the racial question. While he firmly condemned the rigid caste-system, as a weakness of India, he was prepared to justify its origins as what might be called an attempt at "peaceful co-existence" among India's various races, Aryan and Dravidian—an attempt, he thought, more successful than that in South Africa or in the Southern States of America. Spending his time between Calcutta and the Bengal country-side, he was, like Gandhiji, a defender of the village. Like Gandhi, he protested with all his heart against human civilisation being shaped and considered, artificially, upon the pattern of what fitted most efficiently into the requirements of Heavy Industry—as tends to be done alike in the Soviet Union and the contemporary West. Rather he wanted the pattern to be found in the rational human needs of the consumer—perhaps someday the consumer of leisure—first satisfied in terms of a society of co-operatives and light Industry. Being no economist it cannot be said that he ever successfully brought the two needs together. But in terms of the human hopes of a sane society, his intention was right.

Above all, he did not feel that the wealth of India was to be found always by leaping into the car of commercial progress and by embracing all and everyone of the inventions of natural science. His views were rather of one kind with William Blake's. In the recent controversy started up by Sir Charles Snow about the educational values of the natural sciences and of the humanities, he would have come down imperiously to warn us against Sir Charles as a heresiarch, an enemy of culture. He did not hesitate to refer to "the vulture, science"

He perhaps underestimated, unlike Plato , what the natural and mathematical sciences have to contribute to a rational culture, although he was probably not wrong in regarding the product of undiluted training in the natural and mathematical sciences as a barbarian. Certainly for Tagore it was, in its commercial blatancy, indubitably an irritant. He did

not realise that, in the words of Sir Charles Snow, "industrialisation is the only hope of the poor". He confused it with competitive commercialism and failed to see that the alternatives were either the greater misery of the villagers or that unwanted populations should choose to remove themselves from the earth. In his view "the West" was like a man stone-deaf. He could see the fingers of the musician's hands mechanically striking the chords. But such a man was incapable of appreciating the glory of music.

Despite whatever may be said by critics, both of style and of literary fashions, "the Great sentinel" the poet of India, the humanist and world-citizen, peer in his own fashion of Dante, Erasmus and Goethe, is likely not only to be recalled as one of the founding trinity from which Nehru's India has sprung, but to remain in his own right immortal. This will be because he was able to sing songs in the river villages of Bengal or in his school by Bolpur but, still more, because he was able to intuit and to express verities which are not those either of India or of the East alone, but of the profoundest human spirit. It has recently been said by the Warden of All Souls, addressing the British Academy, that essentially great poetry may be defined as the product of a great poet. It is an honour to pay homage to him and—as he himself would have liked it—to what is yet greater than Tagore, to the Mother India that produced him and which has, through the centuries, always been able to express one mighty aspect of the human spirit itself.

Extracts from the Sir George Birdwood Memorial Lecture.

Visva-Bharati represents India where she has her wealth of mind which is for all. Visva-Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best.

Rabindranath Tagore

TAGORE IN YUGOSLAVIA

The personality and the works of the great Indian Poet and thinker of world-wide fame, Rabindranath Tagore, have been figuring in Yugoslavia's cultural life for the past fifty years. The first Yugoslav translation of Tagore appeared on the eve of the First World War, and the latest, in 1960. This testifies to a lasting presence of this great Indian poet and humanitarian among Yugoslav people, a deep reverence of the Yugoslav reading public and cultural workers for the author of "Sacrifices", "The home and the world" and "The King of the dark Room."

In Yugoslavia, the 100th anniversary of the birth of Rabindranath Tagore will be marked by great celebrations. The Yugoslav Writers' federation has set up a special committee for arranging these celebrations, headed by one of the greatest living Yugoslav writers, Miroslav Krleza. As part of these celebrations gala performances will be held. one of the Yugoslav theatres will produce a play by Tagore. while the Belgrade publishing enterprise "Nolit" will print a book of Tagore's essays by the end of 1961. But this is not all. The literary magazines and the newspapers published in Yugoslavia have printed a series of essays and reviews on Tagore besides a number of translations of his works. In addition to this, a delegate of the Yugoslav Writers' Federation, will attend an International conference on world literary problems, scheduled for November 11-18, 1961, in New Delhi, called by UNESCO in honour of the 100th anniversary of the birth of Tagore.

It is undoubtedly an interesting fact that Rabindranath Tagore visited Yugoslavia in 1926, and this event is now evoked in the Yugoslav Press. On that occasion he visited the Yugoslavia towns of Belgrade, Zagreb and Sarajevo.

On his arrival in Belgrade he was touched by the welcome to him :

"I am delighted because of this welcome and I am confident that my stay in Belgrade will be one of the most pleasant experiences of my life," Tagore stated on that occasion. After his lecture delivered at the National University of Belgrade the students put a wreath of laurels on his head.

It is worth noting what were Tagore's impressions of the Yugoslavs gained during his stay in Yugoslavia :

" .....You here are the people very much different from those in the West.... I am pleased to see that here, in your country everything has not yet been fully balanced. This is indicative of your youth, securing a mature, safe old age, with a strong, new culture and civilization, which can even exceed that of the west.... "

Those words uttered by Rabindranath Tagore are especially now cherished by the Yugoslav people.

A souvenir of this visit by Tagore to Yugoslavia is his portrait bearing his autograph, a sketch by the Yugoslavia writer Branimir Cosic (1903-1934), the author of one of the most important Yugoslav novels published between the two world wars—"The Mown Field." Cosic was also an amateur painter.

Over twenty editions of the translations of Tagore's works have so far been published in Yugoslavia :

"Gitanjali" (1934, 1960) ; "The Crescent Moon" (1917) ; "Sacrifices" (1921) ; "Nationalism" (1921) ; "The Gardener" (1922, 1956) ; "The Home and the World" (1924, 1930, 1955) ; "Selected Poems (1929) ; "The Wreck" (1930) : "Nationalism" (1932)The Home and he world (1955) "Epics" (1958) etc.

Of Tagore's plays only one was given in Yugoslavia by the Moscow Artistic Academic Theatre as a guest performance in 1924.

In the past fifty years many essays, reviews and notes were written in Yugoslavia about Rabindranath Tagore, while in several publications, a large number of translations of Tagores poems, prose works and articles were printed. The best known translators and critics of Tagore's works are the writers Alojz Gradnik (1882) and Franc Bevk (1890) ; literary historian Antun Barac (1894-1955), classical philologist and philosophical writer Dr. Milos Djuric ; literary historian Dr. Vojislav Djuric and others.

It is for the artist to remind the world that with the truth of our expression we grow in truth. When the man-made world is less an expression of man's creative soul than a mechanical device for some purpose of power, then it hardens itself, acquiring proficiency at the cost of the subtle suggestiveness of living growth. In his creative activities man makes Nature instinct with his own life and love. But with his utilitarian energies he fights Nature, banishes her from his world, deforms and defiles her with the ugliness of his ambitions.

This world of man's own manufacture, with its discordant shrieks and swagger, impresses on him the scheme of a universe which has no touch of the person and therefore no ultimate significance. All the great civilizations that have become extinct must have come to their end through such wrong expression of humanity ; through parasitism on a gigantic scale bred by wealth, by man's clinging reliance on material resources ; through a scoffing spirit of denial, of negation, robbing us of our means of sustenance in the path of truth.

It is for the artist to proclaim his faith in the everlasting YES—to say : "I believe that there is an ideal hovering over and permeating the earth, an ideal of that Paradise which is not the mere outcome of fancy, but the ultimate reality in which all things dwell and move."

Rabindranath Tagore

This is my prayer to thee, my lord—
strike, strike at the root of penury in my heart.

Give me the strength lightly to bear
my joys and sorrows.

Give me the strength to make my love
fruitful in service.

Give me the strength never to disown
the poor or bend my knees before insolent
might.

Give me the strength to raise my mind
high above daily trifles.

And give me the strength to surrender
my strength to thy will with love.

Rabindranath Tagore

LOKENATH CHEMICAL WORKS
CALCUTTA-28.
Makers of
Chitra
TOILETRIES.

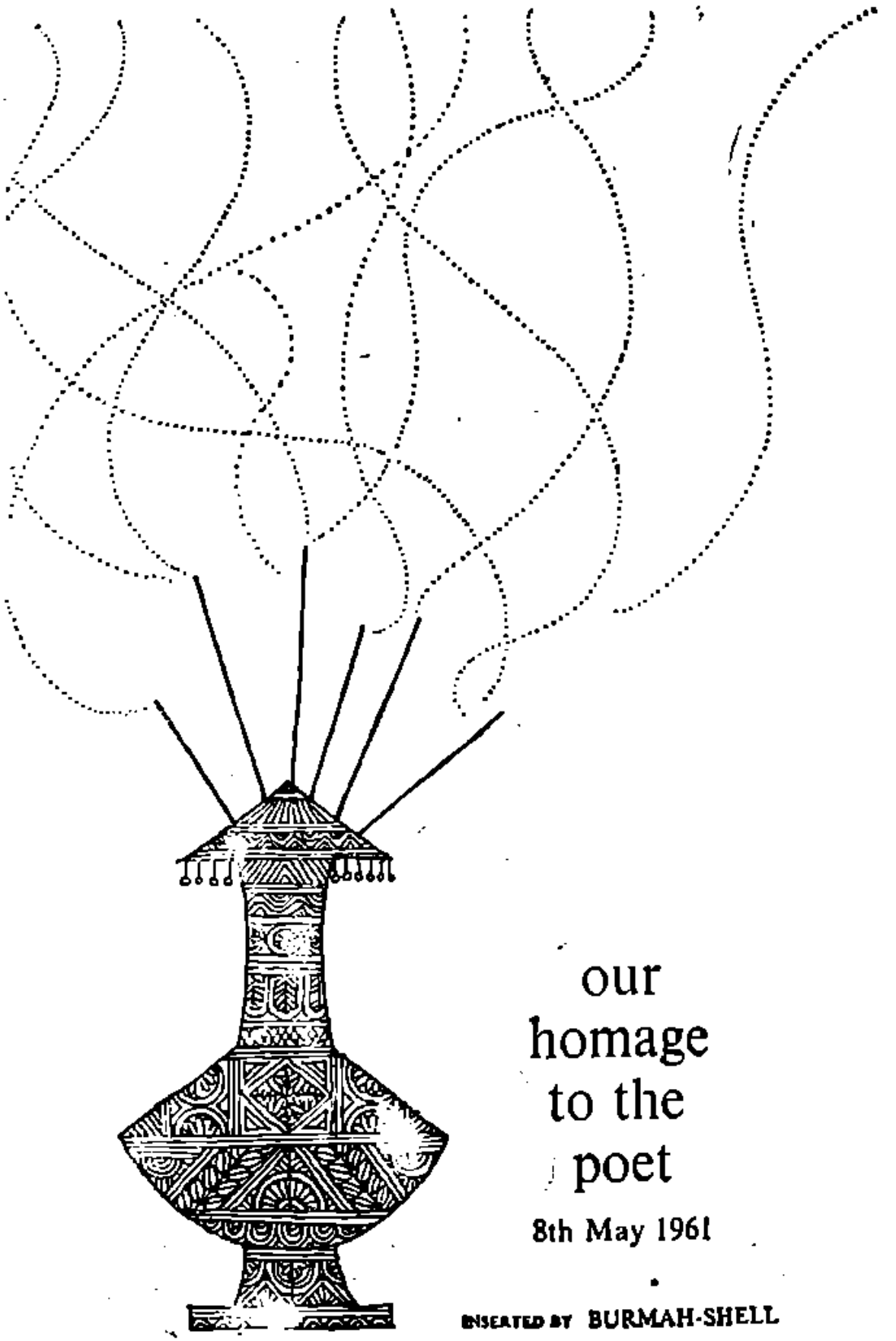

our homage to the poet

8th May 1961

INSERTED BY BURMAH-SHELL

RABINDRANATH'S WIT AND HUMOUR

Pramatha Chowdhuri

HEINE, the famous lyric poet of Germany, once said that life is so desperately serious at bottom, that it would be unendurable but for the mixture of the serio-comic.

No great mind is blind to this comic aspect of life. And great writers express their sense of the comicality of things and ideas by what is known as wit and humour. Our pre-British literature shows that Bengali poets were not devoid of either. The Chandi Kavya, which was written in the seventeenth century, is full of humorous descriptions of priests—Hindu and Mahomedan, and of grocers etc. In the eighteenth century we find the narrative poems of Bharatchandra sparkling with witty epigrams, some of which have become current coin in our language.

That Rabindranath, the great Indian Poet, is also the wittiest writer of Bengali prose, is well-known to all who are familiar with his works. His stories and critical and polemic essays are shot through and through with startling witticisms. Wit may be described as spiritual lightning. Both have the same suddenness and swiftness, the same brilliance and immaterial piercing quality. Sparks of wit clear our mental atmosphere and reveal the disconcerting character of all that is stupid and heavy, inert or mechanical, in men and manners. I know of no other writer except Heine, who is at the same time a great lyric poet and a consummate wit.

Humour, on the other hand, betrays an attitude of amused tolerance of the comic aspect of life and things. It is more human than wit and appeals to our whole mind, both emotional and intellectual. The art of the humorist is a creative art.

The great masters of humour often create their characters. For example, Sancho Panza is not a person taken from life. He lived only in Cervantes' mind. But is there any human being more real than Sancho Panza ? I refer to the immortal creation of literary art, to show that humorous characters come out of the mind of a great writer ; of course, they are not all compact of imagination, but are based on observation. It is this sense of humour that makes Rabindranath so human.

Rabindranath's literature is too vast for one to pick and choose humorous passage from. I may mention here only two books, one a collection of letters, Chinna-Patra, and the other a history of the development of his literary life,—Jivan Smriti (My Reminiscences).

These letters abound in humorous descriptions of men and things. They have been written with so much gusto, that they can be read over and over again with unfailing enjoyment. Jivan Smriti was written later In my opinion it is a perfect specimen of mature Bengali prose. Its object is to give us an insight into his poetic genius ; but all the same an under-current of mellow humour runs through the whole book. It is absolutely free from satire, although some of the people he came across in his boyhood naturally lend themselves to caricature.

In this paper I have kept his prose writings only in view, although some of his light verse staggers us by the marvellous jugglery of words and rhymes, in which wit and humour interpenetrate.

Fashions in literature that rapidly tire of themselves seldom come from the depth. They belong to the frothy rush of the surface, with its boisterous clamours for the recognition of the moment. Such literature, by its very strain, exhausts its inner development and quickly passes through outer changes like autumn leaves—produces with the help of paints and patches an up-to-dateness, shaming its own appearance of the immediately preceding date. Its expressions are often grimaces, like the cactus of the desert which lacks modesty in its distortions and peace in its thorns, in whose attitude an aggressive discourtesy bristles up, suggesting a forced pride of poverty. We often come across its analogy in some of the modern writings which are difficult to ignore because of their prickly surprises and paradoxical gesticulations. Wisdom is not rare in these works, but it is a wisdom that has lost confidence in its serene dignity, afraid of being ignored by crowds which are attracted by the extravagant and the unusual. It is sad to see wisdom struggling to seem clever, a prophet arrayed in caps and bells before an admiring multitude.

Rabindranath Tagore

RESEARCH IN TAGORE ARCHIVES

RABINDRA-SADANA
SANTINIKETAN

Kshitis Roy
Curator, Rabindra-bhavan, Visva-bharati.

The collection at Rabindra-Sadana, Santiniketan reflects the many-sidedness of the poet. Probably, there are few other personality-museums which can compare with it in richness and variety. Amongst other things it has :

I. Most editions of his literary works begining with KAVI-KAHINI published in 1878. These include poetry, novels, short stories, plays social and allegorical, in prose and verse, essays on social, educational, political, philosophical and religious subjects, literary criticism, letters, autobiographical memoirs, text books and books for children etc. all of which total up to the formidable figure of nearly 300 individual titles, later collected in about 30 volumes of his complete works, consisting of nearly 10,000 pages of closely printed matter.

II. Roughly one-sixth of his total literary output is available in *English* translation. Barring a few curious exceptions, Tagore was translated into all the civilised languages of the world—including Indian languages other than Bengali. The bulk of these translations, symbolizing his universal appeal are preserved in Rabindra-Sadana. Of particular interest is a show-case displaying nearly 60 Language-editions of the book *Gitanjali*. The French version is inscribed to the Poet with Homage profound by his expert translator, Andre Gide.

III. Then there are books on or about him in all the languages of the world, books containing contributions or introductions from his pen and also books which he used and in which at times he made copious marginal notes.

IV. Next to the books are the journals—some of them edited by Tagore and others containing writings by or on him.

V. Then there are the press-cuttings—files of clippings from World-press, dating from 1912, dealing with his life and work, his tours around the world, lectures and interviews given by him.

VI. Of manuscripts Rabindra-Sadana has nearly 300—the earliest is dated 1878 when the Poet was a boy of 17.

VII. There are more than 5000 letters—the earliest is dated London 1846. In this Prince Dwarkanath takes his eldest son Devendranath to task for devoting his time to spiritual pursuits instead of looking after more mundane matters. There is a letter which Debendranath writes to his youngest son Rabi asking him why he wants to buy a new harmonium when

the old one is already being repaired. Then, there are the letters exchanged between the Poet and Gandhiji—a testament.....of their lifelong friendship, and letters from other eminent contemporaries all over the world.

VIII. The Poet was a master of the language of words. But when meaning failed him, he would express himself in *melody*, particularly in his earlier years. In his later days he took recourse to *painting*. Rabindra-Sadana has the words of all his Songs, more than two thousand of them, and nearly a thousand of the melodies that he composed to harmonize with the meaning of the words, preserved in printed notation. More than a third of his songs are available here in voice-records, some of them in the Poet's own voice. Another interesting collection is that of scores of Western musical compositions based on or inspired by the work of Tagore. Of these more than a hundred have come to our notice. They are suited for vocal or instrumental rendering in a variety of media—there is at least one from Hungary which is designed as a full opera with 'Chitra' as its theme.

IX. Painters, portraitists, photographers—all of them vied with one another to depict in their own medium the wonderful mobility and majesty of the face and features of Rabindranath. In the result, the museum has rich collection of these portraits as also a large variety of material for an illustrative documentation of his long life and the large portion of it that came into the lime-light. Unfortunately cine-films are few and far between. Of the few that are there, there is a short-length dealing with the last meeting that Gandhiji had with Rabindranath in 1940. There is another that has come as a gift from the U. S. S. R. showing a few shots of the poet's visit to Moscow in 1930. The *final* is impressive—it shows Rabindranath drawn up to his full stature reciting the words of his song JANA GANA MANA, now the National Anthem of India. Here he looks, every inch of him, the patriarch and the great sentinel that he was. Among the portraits of particular appeal are some of the reminiscent studies of his uncle by Abanindranath. There is an element of sadness and wistfulness about them which it is difficult to describe.

X. Mention has already been made of the Personalia Room, situated in the first floor of Udayana. It was in this suite of rooms that he spent his last living days at Santiniketan. It was from here that he was escorted to Calcutta on July 25, 1941—never to come back. These rooms are now a part of the Museum—only they contain things of intimate personal association with him—the generous breakfast cup out of which he drank his morning ration of milk mixed with a dash of coffee, the set of fountain pens he used to write or to draw with, his last pair of spectacles, his favourite chair Argentina—a gift from Victoria Ocampo, a bedside table with phials of biochemic pills, and of course the last pair of bedside slippers he used—a host of other things. Nearby are glazed cases containing gifts, souvenirs and mementos—a real Muraasmasa Samurai sword which is supposed to cut a running stream into two, a scent-bottle from the Roman times which came as the gift of a Catholic cardinal, a Jade Seal of the Chinese name with which he was honoured by the Crescent Moon Society of Peking (1924), the Nobel

award with citation in Swedish Leaves and acorns from a Linden tree he planted by the shore of Lake Balaton in Hungary in 1927, the gold pocket-watch (a wedding present) he had to sell to find money for Santiniketan, gold-plates with enamelled inscription felicitating the Poet on his seventieth birthday, the draft of his letter renouncing Knighthood, the last letter to be signed by him being a message of farewell (so it proved to be) to his daughter-in-law, Pratima Devi. These are all mementos of a vivid personality—to see them is to feel a kind of living presence pervading the room.

TAGORE PAINTINGS

XI. Of all the gifts that have come down from him, probably the most intriguing and the least understood are his paintings. Somehow the average visitor cannot reconcile himself to the idea that the same hand that wrote those exquisite poems could paint these pictures—some of them so very peculiar if not downright grotesque. The average visitor will need a lot of training before he is able to see the fine points of Tagore's paintings. Here he speaks not only with a different idiom—that of line and colour—he also deals with a different world, the world of form as distinguished from the world of meaning. There have been poets who painted before him, Blake for example. For them painting was a handmaiden of poetry or vice versa. But, Tagore the painter was a being separate from Tagore the poet except for the fact that for both beauty with an irresistible appeal and creativity was almost a second nature. Tagore emerged as a painter when he was above sixty. Unschooled and untrained as he was when the urge came upon him, he daubed away, as in a fever of creativity, in whatever medium he could lay hands on. The outcome was more than 2000 pieces : masks, portraits, compositions, landscapes—all of them done within about fifteen years time. Not that painting enjoyed his undivided loyalty. Oh no! As a matter of fact, those fifteen were the crowning years of his creative life. All his dance-dramas, and the new poetry of his latter years, his experimental long short stories—all of these separate streams joined together as it were in a broad river at the point where it meets the the open sea of Eternity !

Rabindra-Sadana has the bulk of Tagore's painting in its keeping—holding them, as in a trust, against the day when the world acclaims them as an universal heritage.

HUMAN INTEREST

" So, that was the size of slippers that the Poet used to wear ", said one of the visitors to the Personalia Room of Rabindra-Sadana, as he looked at the slippers

with fascinated attention. This happened during the week-long observance that we have at Santiniketan to mark the passing away of Gurudeva Rabindranath Tagore. During this week Rabindra-Sadana, in all its sections including the room where some of his personal effects are kept, is thrown open to visitors.

The remark made by this visitor is in no way an exception. That is how the average run of visitors seems to react to the articles exposed to public view. Another attraction is the Nobel Prize. Such curiosity is understandable and our patient guides do all they can to satisfy such enquiring minds. Let us, however, consider for a moment how the perceptive individual would react to Rabindra-Sadana and what plan he would assign to it within the frame-work of the Visva-Bharati.

I would have to think of such a man discovering for himself how Santiniketan and Sriniketan, twin children of the creative mind of Gurudeva, and the Visva-Bharati as a whole, remain as a tangible memorial to him. He fostered and nourished them with loving care over a period of *10 long years* : and it was not for nothing that in his very last message to Gandhiji, he described the Visva-Bharati as a vessel which was carrying his life's best treasures. The entire Visva-Bharati in its physical *locale* and in the way it functions as a vehicle of his ideas and aspirations, should become, as Sri Jawaharlal Nehru put it, "the best monument and memorial to this magnificent son of India." It is within the frame-work of the highest achievement of his career that we have to consider the real significance of Rabindra-Sadana.

Rabindra-Sadana symbolises the efforts of the Visva-Bharati to perpetuate the memory of its Founder in a living and tangible manner. Shortly after his passing away, the idea took shape to establish at Santiniketan a permanent institution in his name and memory. It was in this way that the Rabindra-Sadana came into formal existence in July 1942. The poet's son Sri Rathindranath Tagore who was also the Chief Executive Officer of Visva-Bharati then readily placed at its disposal all his valuable collection of everything connected with his father. This, together with the library and archives attached to the office of the Founder-President, formed the nucleus of the new institution. The suite of rooms in the southern wing of the Udayana building, where the Poet spent some of the last days of his life, was set apart to accommodate Rabindra-Sadana. During its existence over a decade and a half the Rabindra-Sadana collection has been added to and enriched, with other gifts that came from friends and admirers in India and abroad.

From the beginning the objectives of the Rabindra-Sadana were laid down in clear-cut terms. It was not to be regarded as a memorial in the conventional sense, nor a dead museum exhibiting a few pieces of reliquary value. It was to develop into a living institution : on one hand it was to be an academy for the study and appreciation, interpretation and dissemination of the works of Rabindranath, on the other, it was to be a store-house, of his literary and artistic creations of articles connected with his life and

COVERING THE INDUSTRIAL BELT

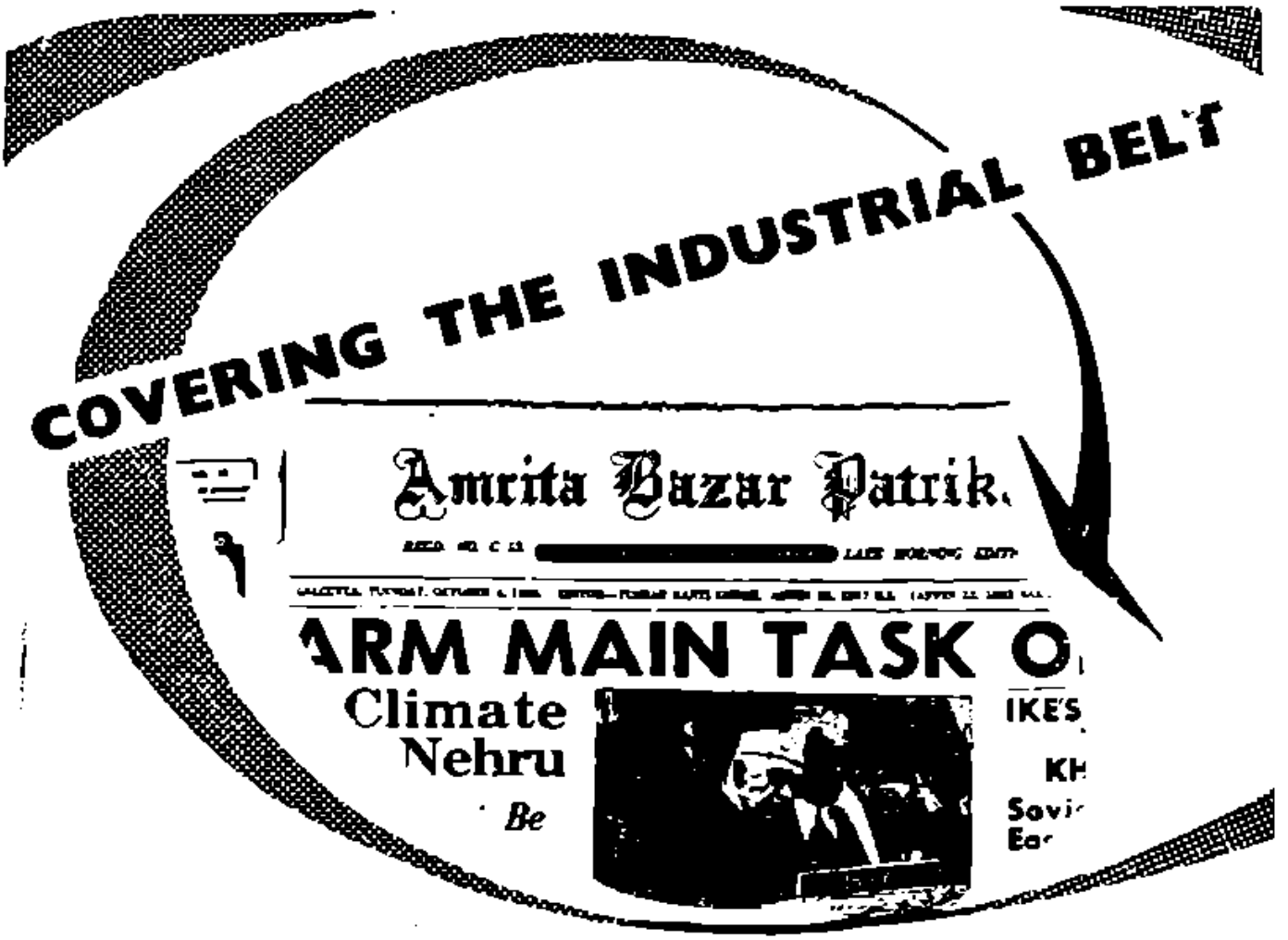

AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA

has the

Largest Circulation

in

Calcutta

Greater Calcutta

North Eastern India

Industrial Belts of West Bengal

Combined Circulation 1,00,377 Copies per day

With facilities for reproduction in

NORTHERN INDIA PATRIKA

ALLAHABAD

with

Wide Circulation

in

Allahabad

Madhya Pradesh

Industrial Belts of Uttar Pradesh

PATRIKA HOUSE, CALCUTTA-3.

CLOUDS heap upon clouds and it darkens. Ah, love, why dost thou let me wait outside at the door all alone ?

In the busy moments of the noon-tide work I am with the crowd, but on this dark lonely day it is only for thee that I hope.

If thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly aside, I know not how I am to pass these long, rainy hours.

I keep gazing on the far-away gloom of the sky, and my heart wanders wailing with the restless wind.

Rabindranath Tagore

Kalpana

FOR STYLISH READY MADE GARMENTS

11B, Chowringhee Road, Calcutta-13.

PHONE : 23-8026

works and a shelter for various material associated with his memory. Thus when brought into full functioning order Rabindra-Sadana will :

collect, preserve and display material connected with the life and work of Rabindranath Tagore.

provide facilities for the proper use being made of such material for the study of the life and work of Rabindranath Tagore with particular reference to his manifold contributions in the creative, cultural and constructive spheres, and for the propagation of his ideas and message.

arrange for Lectures. Publications. Symposia Performances. Recitals etc. of cultural or educational import.

That is the impression that the perceptive visitor will carry away with him after he has gone round the different sections of Rabindra-Sadana—the impression of a man universal in his appeal and myriad minded in his creative self-expression—a complete man who by his word and by his deed and by the example of a noble life nobly lived will live for all times.

He is his own monument. What monument can we raise to his memory that will encompass the range and depth of his genius or measure up to his lofty achievements in varied fields ? And yet, there is all over the world an earnest desire particularly in the context of the Poet's Centenary in 1961, to try and do something to preserve his heritage.

It was probably in response to this general demand that the Chancellor of the Visva-Bharati, Sri Jawaharlal Nehru, who is also the Prime Minister of India, announced in the Christmas of 1957 that plans were being made to complete the re-organization of Rabindra-Sadana " by the time of the celebration of the Centenary."

What these plans will be in details, will certainly be made known to the public at the proper time. This much is sure that whatever its geographical location, Rabindra-Sadana is and will continue to be not merely a national memorial but a *world memorial* to Tagore—a memorial which it will be the duty and pleasure of the people all over the world who love and revere Tagore or draw inspiration from him or believe in his values, to foster and sustain.

OUR RESPECTFUL HOMAGE

TO

KAVIGURU

ON THE AUGUST OCCASION OF HIS

HUNDREDTH BIRTHDAY CELEBRATION

J. N. DUTT & SONS

DEALERS IN MOST ATTRACTIVE & HIGHCLASS READYMADE GARMENTS

BEST QUALITY TOILETRIES AND SPORTING GOODS.

Please pay a visit and be satisfied

J. N. DUTT & SONS

212A & B, MAHATMA GANDHI ROAD,

HARRISON ROAD, BURABAZAR,

CALCUTTA-7

MY HOMAGE TO GURUDEVA RABINDRANATH TAGORE

Prof. Tan Yun-Shan

Director, Visva-Bharati, Cheena-Bhavana, Santiniketan.

Gurudeva Rabindranath Tagore was well-known to the outside world as the greatest Poet of modern India as Kalidasa, author of Meghaduta or "THE CLOUD MESSENGER", and Asvaghosa author of BUDDHACHARITA-KAVYA or "Hymns in Praise of the Life of Buddha", were in ancient times of this great country.

But Rabindranath was not merely a great poet. He was much more and much greater than a great poet. His songs are perhaps of even greater emotional appeal to his own people than his poetry. His poetry undoubtedly ranks with the hymns of the other great poets, not only of India but of the world, not only of the present but of the past and may be also of the future. But there is hardly anything to match his songs from the very beginning of human civilization up to now.

Moreover, he was a great educationist, a great philosopher, a great theorist, a great novelist, a great dramatist, a great essayist, a great painter, a great singer, a great orator and what not. He could really be called "all in one", "all in all", and "all and all". His great genius and talent, his profund vision and wisdom, his vast erudition and versatility, his lofty ideas and ideals, his universal love and compassion, his broad mind and heart, his magnificent spirit and soul, his gracious appearance and deportment, and even his beautiful voice and laughter had few peers in the world.

Yet again, to me he was more of a saint and teacher than anything else. He was an embodiment of Indian as well as Eastern or Asian cultures and traditions. He was really a Maharishi or an Avatara of Indian as well Asiatic or Eastern Philosophies and religions. He was and still is and will ever be a supreme Mahaguru or Gurudeva not only of Santiniketan and India but also of Asia and the world.

What Gurudeva impressed and inspired me most were his absolute humanism, universalism and altruism ; his love and affection for China and the Chinese people ; his understanding and appreciation of Chinese learning and culture ; and his advocacy and promotion of Sino-Indian studies, Sino-Indian Cultural Interchange, Sino-Indian Friendship and Fraternity, Sino-Indian Amity and Unity. It was his firm and fast belief as well as my sincere and ardent conviction that through these we shall be able to change the atmosphere, to alter the situation, to transform the condition of this world of our time ; and in the long run create a new world and a new era where and when there will be only real love, peace, harmony and unity of all mankind without any dispute, quarrel, conflict, struggle and fight, not to mention war.

It was for this reason that I have long devoted my humble self, body and mind, to the service of Gurudeva, through Gurudeva to his Institution, to this great country and people of India.

O, Gurudeva ! this is the Centenary of your birth. Although physically you no longer live and remain with us in this world, yet your noble spirit and soul, your lofty ideas and ideals, your glorious teaching and mission, your splendid literature and art, will ever live in the world as long as the world itself lives, till the end of time.

O, Gurudeva ! My homage to thee, to thee my devotion !

———

CROWN IS CROWN

USE ONLY INDIA'S BEST

CROWN

BRAND

ALUMINIUM UTENSILS

They are made from PURE VIRGIN ALUMINIUM and therefore harmless to human health.
They are made from sufficient thick metal, therefore, they are strong and last longer.
There is an experience of over 50 years behind the craftmanship of CROWN BRAND and therefore they are attractive, of modern shapes and easy to clean.
They are easily available everywhere at economic prices.

Aluminium Suitcases for School Children and Air Travel as well as anodised articles in every elegant fast colours are our speciality.

Manufactured by

JEEWANLAL (1929) LIMITED

CROWN ALUMINIUM HOUSE

23, BRABOURNE ROAD, CALCUTTA-1.

BOMBAY - MADRAS - RAJAHMUNDRY - DELHI - ADEN.

For all round Satisfaction and Service

BUY

Phoenix

FANS

Available in
DE-LUXE, SUPER DE-LUXE,
JANTA B-2 AND
FIELD MARSHALL MODELS

MANUFACTURED BY –

THE ENGINEERING WORKS OF INDIA PRIVATE LTD.

1/4C, GUN FOUNDRY ROAD, CALCUTTA-2.

SOME STRAY THOUGHTS ON MODERN ART IN INDIA

RABINDRANATH TAGORE

Man is humble before Science. When he does not understand the theory of Relativity he blames himself, he does not blame Einstein for it. But unfortunately Art has no such advantage. Most people are insolently opinionated about artistic production and think that their own taste is the final criterion of merit, and it has to be suffered in silence. One should know that like every other faculty of the mind, taste has also to be trained, educated and refined. Otherwise it will be very difficult for us to fully receive the message carried by different expressions of Art.

When I was young, our education had no place for the aesthetic side of man's nature. It had no room for Art. Our students qualified through Euclid, English Grammar and the most difficult spelling-system of that language and imagined that they had all the equipment of culture complete in them. I remember the time when the Art School was opened in Calcutta. Some of my own relatives, my nephew Abanindranath Tagore among them, were students of that school; and fortunately for us a very wise teacher in the person of an Englishman, Mr. Havell, came at that time to take charge of the institution. I am proud to say that Abanindranath had the temerity to acknowledge the truism that India during the days of her glorious past must have had a medium of self-expression in her pictures and sculpture and architecture, which was her own. But when times are unfortunate, truisms are hardest to understand, and to believe. Our people too have suffered from the idea that there was no such thing as a civilised standard of Art in India all throughout her history, that it had to be borrowed from European sources and that only Greece and Italy had proper expressions of Art. That was the idea with which they began their studies of Art. They went on laboriously copying plaster-of-paris models and some drawing books set before them and one could imagine the result was not very happy, to say the least. At this moment Abanindranath started this movement amidst a hailstorm of derision and contempt but he persisted and the movement having passed through several stage, is still going on developing its inner possibilities every day. At the beginning, I am afraid, it was imitative, but instead of imitating European models, which are very distant to us, for we have no opportunity to know them thoroughly, they began to copy their own past. This was also unfortunate. But I suppose it had to be gone through to cure them of that pride in borrowing things which are not their own—that unnatural pride. So it went on and through sheer persistence the genius of Abanindranath won in the end. And now the whole country is deluged with cheap imitations of this school, though productions

In Commemoration
of Rabindranath's
Centenary Celebration
1861-1961

May the admirers of Rabindranath go on increasing all the World over and may peace and patience prevail in all lands and minds.

BENGAL BISCUIT FACTORY

PRIVATE LIMITED

CALCUTTA 28

are not lacking which have true merit. This movement has produced some really great artists like Nandalal Bose and various others and it is making its influence felt all over India. I find that most of the teachers who are employed in the Art Schools in different centres have come from the same place and were all students of Abanindranath and they have gained a reputation wherever they have been. So now is come the time when our artists have awakened to the idea that there are only two kinds of Art—one which is good and the other which is bad.

But no such exclusive definition can be made that a particular kind of Art is Indian or Oriental or of any other specific kind. One knows how the history of Art in Europe has been changing fast. Those who belong to the past centuries cannot recognise the modern forms of Art. It would be completely foreign to them, and this is but natural. The human mind is growing and those with no modern art-experience require that form of self-expression to be adjusted to them. Unfortunately we in India of the present day, never had a background of experience in the artistic life of man. We are very parochial in our knowledge and therefore very crude in our critical appreciation of anything which is modern. The time has come when our artists should come into closer touch with modern life in India. They must realise the artistic meaning of life and give expression to it, for there can be no great Art which does not move with Life itself.

EINSTEIN TO TAGORE.

Thou sawest the fierce strife of creatures, a strife that wells forth from need and dark desire. Thou sawest the escape in calm meditation and in creations of beauty. Cherishing these, thou hast served mankind all through a long and fruitful life, spreading everywhere a gentle and free thought in a manner such as the Seers of thy people have proclaimed as the *Ideal*.

Berlin W. 23 Mai 1931.

Du siehst den wilden Kampf der Geschöpfe,
der aus Not und dunklem Begehren kommt.
Du siehst Rettung in stiller Betrachtung und
in den Werken der Schönheit. Diese pflegend
hast Du dem Menschen gedient durch ein
langes, fruchtbares Leben, allen wilden
und freien Sinn verbreitend, wie es die
Weisen Deines Volkes als Ideal aufgestellt haben.

Albert Einstein.

"BANGA LUXMI"

THE MOST POPULAR NAME IN THE TEXTILE WORLD
SERVING THE TEXTILE NEEDS OF INDIA FOR
OVER HALF A CENTURY
WITH
CONSTANT PROGRESS
AND
GREATER PRODUCTIONS

THE BENGAL LUXMI COTTON MILLS LIMITED

H. O.—7, CHOWRINGHEE ROAD,
CALCUTTA—13.

With best compliments of :—

THE EAST BENGAL RIVER STEAM SERVICE LIMITED.

87, SOVA BAZAR STREET,
CALCUTTA

Phone :
H. O. 55-1138
55-1019

Ghat : 33-1767

Man is true, where he feels his infinity, where he is divine, and the divine is the creator in him. Therefore with the attainment of his truth he creates. For he can truly live in his own creation and make out of God's world his own world. This is indeed his own heaven, the heaven of ideas shaped into perfect forms, with which he surrounds himself; where his children are born, where they learn how to live and to die, how to love and to fight, where they know that the real is not that which is merely seen and wealth is not that which is stored. If man could only listen to the voice that rises from the heart of his own creation, he would hear the same message that came from the Indian sage of the ancient time:

"Hearken to me, ye children of the Immortal, dwellers of the heavenly worlds, I have known the Supreme Person who comes as light from the dark beyond."

Rabindranath Tagore.

Inserted by—SADHANA AUSADHALAYA - DACCA
206, Cornwallis Street, Calcutta - 6
Sadhana Nagar, Calcutta - 48.

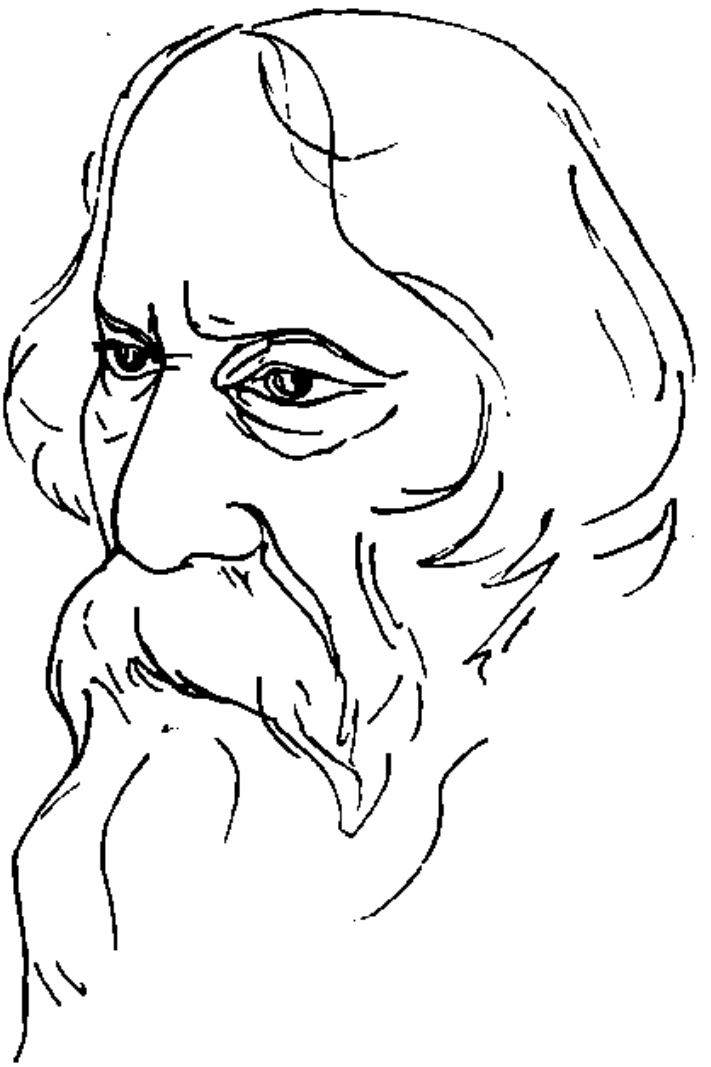

Thou hast made me known to friends whom I knew not. Thou hast given me seats in homes not my own. Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger.

Rabindranath Tagore

Our thanks are due to the Following Persons and Institutions.

Sri Sudhi Ranjan Das—Vice-chancellor. Visva-Bharati University.
Sri Kshitish Roy—Curator, Rabindra Sadana, Santiniketan.
Sm. Sita Devi
Sri Sudha Kanta Roychowdhury.
Visva-Bharati
Publishers of the Golden Book of Tagore.
United States Information Services.
British Information Services
Consulate of the Federal Republic of Germany.
Soviet Information Services.
Polish Embassy.
Yugoslav Embassy.

PHOTOS :

His Last Foreign Tour—1932
Tagore as President, Rammohan Centenary.
Tagore at 59. — Courtesy : Bourne & Shepherd
Tagore at 69.
Tagore at 50

Tagore at 71
Tagore at 75 — Courtesy: Universal Art Gallery
Ramanuj Professor Rabindranath

A Picture by Rabindranath — Courtesy: B.K. Roy Chowdhury

CALCUTTA UNIVERSITY

গল্প-ভারতী

ষোড়শ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৮

সম্পাদকীয়

৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের মধ্যে তাঁর একমাত্র জীবিত বংশধর রথীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত। তাঁর অনুজা মীরা দেবী ও পত্নী প্রতিমা দেবীকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই। প্রায় ৫০ বছরের সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে (১৯১০—৬০) সংক্ষেপে জানান সম্ভব নয়। তাঁর ঋষিকল্প পিতার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদিযুগের পড়ুয়া রথীন্দ্রনাথ। তাকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পরই Illinois Universityতে কবি ভর্ত্তি করান সন্তোষ মজুমদারের সঙ্গে—পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন কবির ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের চিত্র এবং প্রবন্ধাদি কবি-বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৯১০ সালে কবি শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর (অবনীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী) সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দেন ও রথীন্দ্রনাথকে সোরা উৎসর্গ করেন। তাঁরা দুজনে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে ১৯১২—১৩ সালে ইউরোপ, আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। বি. এস. সি. পরীক্ষার পর ডি. এস. সির থিসিস দেবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও রথীন্দ্রনাথ মনীষী পিতার আমেরিকান লেকচারস্ রচনা ও মুদ্রণে সাহায্য করার জন্য শেষ পর্য্যন্ত থিসিস্ না দিয়েই দেশে ফেরেন এবং শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতনের জমি ও চাষ আবাদের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দীর্ঘ দিন রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভগ্নীপতি নগেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কাজ করেন। সেইসব দিনের তথ্যপূর্ণ ইতিহাস শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীরা হয়ত কোনদিন প্রকাশ করবেন কিন্তু তাঁদের সহকর্মী কালিমোহন ঘোষ (শান্তিদেব ঘোষের পিতা) ও সৌরগোপাল ঘোষের মৃত্যুর পর বহু তথ্যই হয়ত অজ্ঞাত থেকে যাবে।

১৯১১—১৯২১ এই দশ বছর আমরা জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে আলোচনা, পাঠাগারের অধিবেশন ও অভিনয়াদিতে সর্ব্বদা রথীবাবুকে পেয়েছি। ক্যালকাটা সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টসের আয়োজিত প্রদর্শনীতে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথকে শিল্পের সমঝদার হিসাবে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। ক্রমশঃ তিনি Interior decoration এবং Landscape gardening এর ক্ষেত্রে এতটা উৎকর্ষ লাভ করেন যে Indian Museum ভারতীয় মিউজিয়াম

ভবনে নেতী রাণু মুখার্জীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় এবং সচিত্র পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা উপহার দেন তা সকলেই জানেন। শেষ কয় বছর রবীন্দ্রনাথ শিল্পী জীবন যাপন করে দেরাদুনে দেহত্যাগ করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শতবার্ষিকী

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও সহকর্মী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের তিরোধান দিবসে অনুষ্ঠিত দু'একটি সভায় তাঁর দেশপ্রেমের উল্লেখ দেখলাম কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথা ঐতিহাসিক গবেষণা বিষয়ে উল্লেখ করতে তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য কাউকে পেলাম না। অথচ তাঁরই প্রচেষ্টায় সারা ভারতের কেমিষ্ট্রি চেয়ার (Chair) ও অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েছেন অনেকে। আজ কিন্তু সে কথা সকলেই বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় "History of Hindu Chemistry" প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আরো বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—সেগুলি বিক্ষিপ্ত ও বিস্মৃতপ্রায়। প্রফুল্লচন্দ্রের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হবে জানি, সেই সুযোগে "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার", প্রাণী বিজ্ঞানাদি বাংলায় মৌলিক রচনা ও ইংরাজী সাহিত্য ও সমাজসেবা বিষয়ে তাঁর লেখাগুলি পুনর্মুদ্রিত হলে আনন্দিত হওয়া যায়।

প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল ধরে লিখে এসেছেন। Shakespeare তাঁর নিত্যপাঠ্য ছিল দেখেছি—আবার ফরাসী Moleiree এর প্রবন্ধগুলি পাঠ করে তিনি রোমাঞ্চিত হচ্ছেন প্রীতি জানিয়েছেন। সাহিত্যিক প্রফুল্লচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের বড় সমঝদার ছিলেন সে কথা আমরা জানি। রবীন্দ্র মাতুলালয় যশোহর—সেই যশোহরের মাইকেল ও জননী জাহ্নবীর কথাও প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন। সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ও তাঁর শিষ্যদের সম্মান দেখান। তাঁদের তথা মহীশূরাদি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই শতবার্ষিকীর সময় সংযোগ স্থাপন করা আমাদের উচিত। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫০০০৲ টাকা প্রফুল্লচন্দ্রের শতবার্ষিকী ভাণ্ডারে দান এসেছে দেখে খুশী হলাম।

বাঙালীকে চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করার সাধনায় অগ্রণী হয়ে নামাতে চেষ্টা করেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং সেজন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ। আগামী (১৭ই শ্রাবণ বা আগষ্ট) তাঁর জন্মশতাব্দীর আরম্ভ—সেই উপলক্ষ্যে 'বিজ্ঞান-সাহিত্যে বাঙালী' বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন। গল্প ভারতীতে ও প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আমরা বিশেষ সংযোজন প্রকাশের চেষ্টায় আছি। তাঁর আজীবনের উপার্জ্জন তিনি বিজ্ঞান ও বাণিজ্য প্রসারেই দিয়ে গেছেন তার জলন্ত সাক্ষ্য রয়েছে—বেঙ্গল কেমিক্যালে। এটি বাংলা তথা বাঙালীর গৌরবের কথা। তাঁদের অনুরোধ জানাই বাঙ্গলী সভা সমিতি ছাড়াও স্থায়ীভাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আয়োজন করতে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রফুল্লচন্দ্র চেয়ার স্থাপনের জন্য কাণ্ড গঠন করেছেন সে খবর পেয়ে আমরা সুখী হয়েছি। কিন্তু শুধু অর্থে নয় দেশসেবার জলন্ত প্রতীক যে আচার্যদেব তাঁর জীবন ও আদর্শ কিভাবে বাঙালীদের প্রাণে পুনঃস্থাপিত করা যায় সে কথা অন্য শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভাববার বিশেষ সুযোগ এসেছে। আশাকরি তাঁর অতিপ্রিয় বিজ্ঞান কলেজ ও তার ছাত্রছাত্রীরা একথা মনে রেখে ১৭ই শ্রাবণের আগে তাদের পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হবেন।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ডঃ পি. কে. রায় (Mental and Moral Sciences) ডি. এস. সি পান—তারপর ডঃ অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬) ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৮২-৮৮) ডি. এস. সি. পান। জীবিতাবস্থায় তাঁর বাংলা জীবনী লিখেছিলেন তাঁর সাংবাদিক-বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—প্রথম তাঁর প্রবীণ পত্রিকায় ও পরে প্রবাসীতে ছাপেন।

কথাপ্রসঙ্গে

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

ইংরেজ দেশ-বিভাগ করিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া যাইবার পরে খণ্ডিত ভারতের সরকার যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করিয়া তাহা রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সে সকলের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার আনুকাল—দশ বৎসরে শেষ হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার কাজ আরম্ভ হইল।

সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের সভাপতি, তখন তিনি দেশের (তখন দেশ খণ্ডিত নহে) উন্নতির জন্য পরিকল্পনা রচনার ব্যবস্থা করেন। সে কাজে ডক্টর মেঘনাদ সাহা তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ জন্মতিথিতে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া হীনতার আবর্জ্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্ব্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।"

এই কথা তখন অনেকের মনকে চঞ্চল করিতেছিল। ইংরেজ শাসনের যে অংশ শোষণ তাহার দ্বারা সে ভারতের সমৃদ্ধ শিল্প নষ্ট করিয়াছিল, বাণিজ্য ব্যাহত করিয়াছিল, যে দেশ কৃষিপ্রধান ছিল তাহাকে কৃষিপ্রাণে পরিণত করিতে দ্বিধানুভব করে নাই। সে কথা বাঙ্গালার দুই জন মনীষী বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—ইংরেজীতে রমেশচন্দ্র দত্ত, বাঙ্গালায় সখারাম গণেশ দেউস্কর। রমেশচন্দ্রের পুস্তক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই দেশবাসীকে "বয়কটে" প্ররোচিত করিয়াছিল—"Without the Economic History and its damning story of England's commercial and financial dealings with India we doubt whether the public mind would have been ready for the Boycott. In this one instance it must be said of him that he not only wrote history but created it."

স্বাধীনতা অর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প সুভাষচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন—স্বাধীনতালাভের পরে দারুণ দৈন্যই দেশবাসীর সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে বিষম বাধা হইবে। তিনি পূর্ব্বাহ্নে সে জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ লইয়া রাশিয়ার জনগণ বিপ্লবের রক্তসিক্ত পথে অগ্রসর হইয়া রাজতন্ত্র অর্থাৎ স্বৈরশাসনের অবসান ঘটায়—রাজপরিবার নিশ্চিহ্ন করে। তাহার পরে গণনেতারা

শাসনভার পাইয়া প্রথমেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহায়তায় উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা আরম্ভ করেন। সুভাষচন্দ্র রাশিয়ার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরিকল্পনা সমিতির ভার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে দিয়াছিলেন।

ভিন্ন পথে সুভাষচন্দ্রের ও গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যখন—সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করিয়া লইয়া জওহরলাল প্রভৃতি ইংরেজের সহিত আপোষ করিয়া ক্ষমতাশাসন লাভ করেন তখন তাঁহারা সুভাষচন্দ্রের অসমাপ্ত কার্যের পদ্ধতি লইয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়া তাহা রূপায়িত করিবার কার্যে প্রবৃত্ত হ'ন।

কাজে প্রথম অন্তরায়—অর্থাভাব। দেশ দরিদ্র; কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণ ব্যয়সাধ্য। তাঁহাদিগকে উপায় চিন্তা করিতে হইল।

এই প্রসঙ্গে শিল্পসমৃদ্ধ তিনটি দেশের বিষয় উল্লেখ করা যায়—ইংলণ্ড, জার্মানী ও আমেরিকা। ইহারা কে কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল?

প্রথম ইংলণ্ড। ডীন ইঙ্গে বলিয়াছেন, ক্লাইভ বাঙ্গালা জয় করার পূর্বে ইংলণ্ডের শিল্পসমৃদ্ধি ছিল না। শিল্পসমৃদ্ধি অতর্কিতভাবে আসিয়া দেশের শ্রী ও দেশবাসীর মনোভাব পরিবর্তিত করে। ইহার প্রথম প্রয়োচনা ক্লাইভ কর্তৃক বাঙ্গালা জয়ের পরে বাঙ্গালা লুণ্ঠনের ("Plunder of Bengal") যে অর্থ ৩০ বৎসর বিস্তীর্ণ প্রবাহে ইংলণ্ডে প্রবেশ করে তাহাই।

দ্বিতীয় জার্মানী। রাজা প্রথম উইলিয়ম, তাঁহার চাণক্যপ্রতিম মন্ত্রী বিসমার্ক ও সেনাপতি কাউণ্ট ভন মলকে—এই ত্রয়ম্পর্শে জার্মানীর খণ্ড খণ্ড রাজ্যসমূহ লইয়া জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হয়। জার্মানী ফ্রান্সকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার দুইটি সমৃদ্ধ প্রদেশ (আলসেস ও লোরেণ) গ্রাস করে এবং নগদ যে টাকা আদায় করে, তাহার পরিমাণ—৫০০ কোটি পাউণ্ড (এক পাউণ্ড=প্রায় ১৫ টাকা)। সেই টাকা মূলধন করিয়া জার্মানী শিল্প-প্রতিষ্ঠা করে। সে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

আমেরিকা বিস্তীর্ণ দেশ। সে তাহার কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি করিয়া—বিদেশে তাহা রপ্তানী করিয়া লাভের অর্থ মূলধন করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে।

ইংলণ্ড যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং জার্মানী যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল সেই দুইটির কোন পথ অবলম্বন করিবার সুযোগ বা সামর্থ্য (প্রবৃত্তির কথা না হয় না-ই বলিলাম) ভারতের নাই। কিন্তু আমেরিকা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, সে উপায় সে অবলম্বন করিতে পারিত। সেচ, সার ও পথ—এই তিনের উন্নতি সাধন করিলে তাহা হইতে পারিত। অবশ্য তাহা সময়সাপেক্ষ এবং চমকপ্রদ (spectacular) নহে। সুভাষচন্দ্র যদি তাঁহার বিজয়বাহিনী লইয়া ভারতে প্রবেশ করিতে পারিতেন, তবে—তাঁহার নেতৃত্বে—অন্তত ভারত সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কি উপায় অবলম্বন করিত, তাহা বলা যায় না। বিশেষ তিনি যখন পরিকল্পনার সূত্রপাত করেন, তখন ভারত পরাধীন—আন্তর্জাতিক হিসাবে তাহার অর্থনীতিক অবস্থা কি হইবে, জানিবার উপায় ছিল না।

ইংরেজের নিকট হইতে যাহারা খণ্ডিত দেশের দুই ভাগের যে অংশে (ভারতে) শাসনভার লাভ করিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, ধনী দেশসমূহ ভারতকে ঋণ দিতে প্রস্তুত—এমন কি ভারত আপনাকে "অনুন্নত" বলিয়া আত্মসম্মানক্ষুণ্ণ করিলে অর্থদান করিতেও পারে।

বিদেশে ঋণ গ্রহণের বিপদও যে নাই, এমন নহে। তাহার প্রমাণ মিশরে পাওয়া গিয়াছে। খদিব ইসমাইল ১৮ বৎসর মিশর শাসন করিয়া ৬ শত কোটি টাকা ঋণে দেশকে জড়িত করিয়া গিয়াছিলেন। তখন মিশরের লাঞ্ছনার অবধি ছিল না এবং বিশ্বযুদ্ধে যদি পৃথিবীর মানচিত্র নূতনভাবে অঙ্কিত করিতে না হইত, তবে সেই লাঞ্ছনার পরিণতি কি হইত, বলা যায় না।

সে যাহাই হউক, ভারত সরকার বিদেশে ঋণ গ্রহণ করিয়া দেশে দ্রুত শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে মুক্তদ্বার (open door) নীতি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বিদেশী ধনীদিগকে ভারতে শিল্পে মূলধন প্রয়োগের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রথম চিন্তার বিষয়—আবশ্যকীয় অর্থ।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে দিল্লীতে এক সভায় প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, ভারত বিদেশে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে আর তাহা করিতে হইবে না—এখনই তাহার শেষ।—"আমরা আমাদিগের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২য়) রূপায়িত করিতে বিদেশে ঋণ গ্রহণ করিয়াছি। সে ঋণ আমরা পরিশোধ করিব। বড় বড় দেশও উন্নতির জন্য বিদেশের সাহায্য গ্রহণ করে। আমরা আশা করি, আমরা আবশ্যক ঋণ পাইব। যে সকল দেশ আমাদিগকে (ঋণ দিয়া) সাহায্য করিবে, আমরা তাহাদিগকে সেজন্য ধন্যবাদ দিব। কিন্তু আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, চিরদিন বিদেশের সাহায্যে নির্ভর করা কল্যাণজনক নহে। আমরা একবার বা দুইবার বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভর করিতে পারি। আমি আশা করি, এইবার আমরা যে ঋণ গ্রহণ করিতেছি, তাহাই শেষ—তাহার পরে আর বিদেশে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে না।"

লোক আশ্বস্ত হইয়াছিল—আর ঋণ গৃহীত হইবে না—তাহার প্রয়োজন হইবে না এবং যে ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তাহা পরিশোধের উপায় করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই সরকারী দপ্তরের হিসাবে নির্ভর করিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন। কারণ, যদিও তিনি বলিয়াছেন, তিনি সময় সময় চিন্তা না করিয়াই উক্তি করেন এবং শেষে সে জন্য তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়, কিন্তু দেখা যাইতেছে, এ ক্ষেত্রে তিনি যে হিসাবে নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে নভেম্বর—অর্থমন্ত্রী লোক সভায় বলিলেন, তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য ভারতকে প্রধানতঃ বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে; এমন কি বিদেশের যে সাহায্য পাওয়া যাইবে আশা গিয়াছে, তাহাতে কুলাইবে না—দেশেও লোককে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরও কর দিতে হইবে—"Which may seem harsh but which are inevitable."

লোকের সব আশা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। প্রধান মন্ত্রীর কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। বুঝা গেল—দশ বৎসরে দুইটি পরিকল্পনায় বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার মত মূলধন দেশে উৎপন্ন হয় নাই। ঋণ গ্রহণ করিলে তাহা সুদ সহ পরিশোধ করিতে হয়। অর্থ-মন্ত্রীর কথায় প্রধান মন্ত্রী লজ্জিত হইলেন কি না জানি না, তবে বিস্মিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাগজে কলমে" যে দেখা গেল—দুইটি পরিকল্পনায় ভারতে ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয় বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে আয়ের টাকা গেল কোথায়? অর্থাৎ স্বদেশেই কেন তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য আবশ্যক

অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হইল না? সে জিজ্ঞাসার কোন উত্তর মিলিল না। বিপুল ব্যয়সাধ্য তৃতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইল।

এখন লোকের পক্ষে ভারতের ঋণের পরিমাণ পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন হইয়াছে।

ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রীর বিভাগ যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—গত ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত যে বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার পরিমাণ—২৭২৭ কোটি টাকার কিছু অধিক। এই টাকার অধিকাংশই ঋণ—২০৯১ কোটি টাকার কিছু অধিক ঋণ। ধারে পণ্য প্রদানের আর্থিক মূল্য—৬৩৬ কোটি টাকারও অধিক। আবার মোট যে টাকা সাহায্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত কয় দফা সাহায্য আছে—ফ্রান্স, জাপান ও সুইটজারল্যাণ্ড যেগুলির ব্যবসায়ীরা ধারে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছে, রকফেলার ফাউণ্ডেশান যে টাকা দিয়াছেন, আমেরিকার প্রতিষ্ঠানাদি কৃষা করিয়া যাহা দান করিয়াছেন—ইত্যাদি। ইহাও অল্প নহে। মোট টাকার মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ৩৯৪ কোটি টাকার কিছু অধিক দেওয়া হয়—অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রদত্ত হইয়াছিল।

বৈদেশিক ঋণ ব্যতীত ভারত স্বরাষ্ট্রেও ঋণ গ্রহণ করিয়াছে—এমন কি "প্রাইজ বণ্ড" দিয়া লোককে ঋণ কিনিতে প্রলুব্ধ করাও হইয়াছে।

লোকসভায় গত ১০ই মার্চ্চ অর্থমন্ত্রী ভারতের মোট ঋণের হিসাব দিয়েছেন—বৈদেশিক ঋণ—প্রায় ৮২৬ কোটি! আর মোট ঋণ—৪৯৭১ কোটি টাকা। বৈদেশিক ঋণের এই হিসাবের সহিত অর্থ বিভাগের—উদ্ধৃত হিসাবে সামঞ্জস্য কিরূপে সাধিত হয়, বুঝিতে পারা যায় না।

সে যাহাই হউক, অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন—বর্ত্তমান বৎসরে বৈদেশিক ঋণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় যে সুদ দেয় তাহার পরিমাণ ২০ কোটি টাকা।

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ যে ভারত সরকার সহজসাধ্য অনুভব করিতেছেন না, তাহা গত ৩০শে জানুয়ারী বন্ হইতে প্রেরিত একটি সংবাদে বুঝিতে পারা যায়। ঐ দিন যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তদনুসারে পশ্চিম জার্ম্মাণী ভারতকে রুরকেল্লা ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিতে সময় বাড়াইয়া দিয়াছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ টাকা দেয় ছিল। তখন ভারত সরকার পরিশোধের সময় বাড়াইয়া লইয়াছিলেন—এবার আবার বাড়াইতে হইল। কবে ঐ টাকা দিতে হইবে, তাহা প্রকাশ নাই। যে ধনী ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম তাহাকে "নাতক ধাতক" বলা হয়। ভারত অবশ্য "নাতক ধাতক" নহে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এক্ষেত্রে তাহার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিস্তি পরিশোধ করা অসুবিধাজনক বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। মহাজনও সময় দিয়াছে।

তবে এইরূপ ব্যবস্থায় যে রাষ্ট্রের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা বলা যাইতে পারে।

ইহার উপর তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য ইতোমধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঋণ গ্রহণের আয়োজন ও ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। অর্থমন্ত্রী হয়ত দেশে দেশে যাইয়া বলিবেন—"ভারত অনুন্নত, তোমরা উন্নত দেশ, তাহাকে সাহায্য করিয়া উন্নত কর। ভগবান তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন।" অর্থাৎ "দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়"—যাহার অর্থ আছে, তাহাকে দিও না; কারণ, ঔষধ ব্যাধিগ্রস্তেরই পথ্য—যাহার ব্যাধি নাই, তাহার ঔষধের প্রয়োজন কি?

অবশ্য নিশ্চয়ই বিবেচনার বিষয়।

পশ্চিম জার্মাণী তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের জন্য প্রায় ৪০ কোটি টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত জার্মাণী যদি এত টাকা ঋণ দিতে পারে, তবে দশ বৎসরে ভারত কেন তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য আবশ্যক অর্থ দিতে অক্ষম তাহাও বিবেচনার বিষয়।

এই সঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। আজ নানা দেশে যে অবস্থা তাহাতে মনে হয় যেন, বারুদের স্তূপ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে—সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাতে বিস্ফোরণ হইতে পারে। যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়, তবে বিদেশ হইতে আর সাহায্য পাওয়া যাইবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাজনরা তাহাদিগের প্রাপ্য আদায় করিবার চেষ্টাও করিতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের এই বিপদের আশঙ্কা মনে রাখা প্রয়োজন। আবার দেশেও যে বিপদ অতর্কিতভাবে আপতিত হইয়া বিপদ ঘটাইতে পারে না, এমন নহে। ভূমিকম্প, ঘূর্ণীবাত্যা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপালাদির উপদ্রব—এ সকল যদি অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটায়, তবে ভারতের পক্ষে ঋণ পরিশোধের জন্য দেয় টাকা দেওয়া সম্ভব হইবে না। কারণ, সঞ্চয়ের অভাব এবং লোকের দারিদ্র্য। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—তোমার কাপড়ের পরিমাণ বুঝিয়া কোট প্রস্তুত করিবে। আমাদিগের কথা—অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবে—নহিলে মনস্তাপ করিতে হইবে।

সকল পরিকল্পনা যে শুভফলপ্রদ হইয়াছে, এমনও নহে। দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাজ্যে বন্যা সৃষ্টি করিয়াছে—উহাতে অনেক জমি বালুকাতে ঢাকা পড়িয়া চাষের অযোগ্য হইয়াছে। সিঁদরীর সারের কারখানার ব্যয় হিসাবের তুলনায় অনেক অধিক হইয়াছে। প্রিক্যাব গৃহ নির্মাণ প্রচেষ্টা কেবল অর্থনাশ হইয়াছে।

কথায় বলে সাবধানের বিনাশ নাই। ভারত সরকার পরিকল্পনার সেই কথা স্মরণ রাখিলে ব্যর্থতায় ও বিপদের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। পরিকল্পিত কোন কাজ যদি বৈদেশিক সাহায্যের অভাবে অসমাপ্ত থাকে, তবে তাহা কেবল ক্ষতির কারণই হইবে। দেখা যাইতেছে, গত দশ বৎসরে আমাদিগের ক্ষতি সহ্য করিবার মত শক্তি সঞ্চিত হয় নাই।

এই সঙ্গে ভারতে বিদেশী মূলধন প্রয়োগের বিষয়ও বিবেচ্য।

গত ২৮শে জানুয়ারী বাঙ্গালোরে জাপানী প্রতিষ্ঠানের সহযোগে গঠিত ঘড়ী নির্মাণের কারখানার ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে ভারত সরকারের শিল্পমন্ত্রী শ্রীমহুভাই সাহা বৈদেশিক সাহায্য আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, যে সকল বিদেশী ভারতে শিল্পের জন্য অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা হইবে না। এবিষয়ে ভারত সরকারের নীতি—"মুক্তদ্বার নীতি।"

গত দশ বৎসরে ভারতে বৈদেশিক মূলধন প্রায় ২০০ কোটি টাকা বাড়িয়াছে—

(১) ইংলণ্ডের মূলধন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ২০৩ কোটি টাকা ছিল, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯৮ কোটি টাকা হইয়াছে।

(২) আমেরিকার মূলধন—দশ বৎসরে ১১ কোটি হইতে প্রায় ৬০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

বিদেশের মূলধন প্রয়োগ অভিপ্রেত কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। সে মতভেদ এ দেশেও আত্মপ্রকাশ যে করে নাই, এমন নহে। দেশ যখন ইংরেজের শাসনাধীন তখনই দেশের লোকের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যে "ফিসক্যাল কমিশন" নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার

সদস্যগণ এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৈদেশিক মূলধনে দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা সমর্থন করেন নাই। একজন সদস্য বলিয়াছিলেন, দেশে শিল্পসমৃদ্ধিই আমাদিগের কাম্য। সেই জন্য যত দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধি ঘটে, ততই ভাল। যত অধিক মূলধন প্রযুক্ত হইবে, শিল্প তত দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইবে—আর যত দ্রুত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে—পণ্যব্যবহারকারী দেশবাসীকে তত দ্রুত পণ্যের জন্য অল্প মূল্য দিতে হইবে (অর্থাৎ দেশে পণ্য উৎপন্ন হইলে বিদেশী পণ্যের তুলনায় তাহার মূল্য অল্প হইবে। আর কিছু না হইলেও আমদানী ভাড়া লাগিবে না।) মূলধন বৃদ্ধি বিদেশী মূলধন প্রয়োগের একমাত্র লাভ নহে। যে বিদেশী শিল্পপতিরা এ দেশে মূলধন প্রযুক্ত করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে ভারতে যে সকলের অভাব তেমন অনেক জিনিষও আমদানী করেন—ভারতের পক্ষে সে সকলের বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আমাদিগকে শিল্পকৌশল ও ব্যবস্থার জন্য বিদেশী শিল্পপতিদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাঁহারাই নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন এবং (কল ব্যবহার করিয়া) উৎপাদন বৃদ্ধি করেন।—"Apart from the intrinsic benefits of increased supplies of capital the foreigner who brings his capital to India supplies India with many things of which, at her present stage, she stands greatly in need. It is on the whole the foreign capitalist who imports into the country the technical knowledge and the organisation which are needed to give an impetus to industrial development."

এই কমিশনের পরে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বৈদেশিক মূলধন প্রয়োগের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য "একস্টারন্যাল ক্যাপিটাল কমিটী" নিযুক্ত করা হয়। তাহাতে চারিজন য়ুরোপীয় ও পাঁচ জন ভারতীয় ছিলেন। ভারতীয়দিগের মধ্যে ছিলেন—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শিবস্বামী আয়ার; রাজা রাজকানাথ মিত্র তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং বিঠলভাই জাভেরী পেটেল কোন কারণে পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে তুলসীচন্দ্র গোস্বামী সদস্য হইয়াছিলেন।

সেই সমিতি বলেন, দেশের পক্ষে দেশের অর্থে (অর্থাৎ মূলধনে) শিল্প প্রতিষ্ঠিত করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতে মূলধনের অভাব। সেই অভাবের জন্য বৈদেশিক মূলধন প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিনাসর্ত্তে বৈদেশিক মূলধন ব্যবহার করা দেশের পক্ষে কল্যাণজনক হইতে পারে না। সেইজন্য কতকগুলি সর্ত্তে বৈদেশিক মূলধন প্রয়োগ সমর্থন করা যায়। ভারতীয়দিগকে শিল্পলাভের সম্ভবমত সুযোগ দান ও ডিরেক্টারদিগের মধ্যে ভারতীয় গ্রহণ—সেই সকল সর্ত্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

দুর্গাপুরে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ বিদেশীর এমন কথাও শুনা গিয়াছে। তাহাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দিগের পরিচালন-ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়। বিশেষ চেষ্টায় যে দেশে স্বল্প সময় হইতে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংলণ্ডে শ্রমিকদিগের নিকট হইতে সমবায় পদ্ধতিতে শিল্পের জন্য মূলধন সংগ্রহ ব্যবস্থায় তাহা দেখা গিয়াছে। এ দেশে এখন শ্রমিকরা যে পারিশ্রমিক পায়, তাহা হইতে ঐরূপে শিল্পের জন্য সরকার মূলধন সংগ্রহ করিতে পারেন না। সহজে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভর করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠায় বিপদ ঘটিতে পারে।

ভারত সরকার যে হিসাব ধরিয়াছেন, তাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনা (যদি রূপায়িত হয়) শেষ হইতে ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ কি দাঁড়াইবে, তাহার জন্য বার্ষিক সুদ কত দিতে হইবে

এবং কতদিনে ও কি উপায়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইবে—সে বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেশের লোককে প্রদান করা সরকারের কর্তব্য। কারণ, যাঁহারা ঋণ গ্রহণ করিয়া উন্নয়ন ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহারা হয়ত পাঁচ বৎসর পরে জীবিত বা ক্ষমতার আসনে থাকিবেন না; কিন্তু দেশের লোককে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। দেশের লোককে কতদিন শ্রমস্বীকার ও ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে এবং কতদিনে সেই শ্রমের ও ত্যাগের ফলে লোকের অভাব কমিবে তাহা না জানিতে পারিলে লোকের পক্ষে ত্যাগকষ্ট দুর্বিসহ হইয়া যে অসন্তোষের সৃষ্টি করিবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। এবার যে ভারতে উৎপন্ন চিনি বিদেশের বাজারে মূল্যের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না, তাহা লক্ষ্য করিবার ও চিন্তার বিষয়।

দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভারতের মৈত্রীভাবনা

ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা,—সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়।···অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায়; সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্র ভাবনাতেই এই অহং ভাব লুপ্ত হয় এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোক দীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারেনি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ড-সীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটিই ভারতের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তাহলেই আমরা ধন্য। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব ক'রে মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তাহলে আমরা নিজেকে বিশুদ্ধ ক'রে ভারতবাসী বলতে পারব, সেজন্য আমাদের নতুন করে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করলেন। এ অভিজ্ঞতা মর্মান্তিকও হয়েছিল। কারণ মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

১৯২০ সালে "টরোনেটটার" পত্রিকার প্রতিনিধিরূপে এবং পরে 'ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিসে'র সংবাদদাতারূপে তাঁর জীবনের অনেকখানি কাটে ফ্রান্স ও স্পেনে। প্যারিসে মার্কিন উপনিবেশ থেকে তিনি "দি সান অলসো রাইজেস্" উপন্যাসটির উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯২৬ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হেমিংওয়ে সর্বপ্রথম খ্যাতিলাভ করলেন। এর মৌলিক রচনাশৈলী অন্যান্য মার্কিন লেখকদের প্রভাবিত করেছিল। তিনি অলঙ্কার বর্জন করে নিত্য জীবনযাত্রার সহজ ছন্দ ও সত্যবস্তুকে তাঁর ভাষায় প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। অনেক বড় জিনিসকে তিনি সংক্ষেপে সহজ কথায় বর্ণনা করেছেন। কথাবার্তার ভাষা রচনায় তিনি খুব ছোট ছোট শব্দ ব্যবহার করা পছন্দ করেন।

১৯২৯ সালে প্রকাশিত হল "এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস"। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কিন উপন্যাস বলে এটি সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছিল। পৃথিবীর ১৮টি ভাষায় উপন্যাসটি অনূদিত হয়েছে।

১৯৩০ সালে হেমিংওয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে ফ্লোরিডায় একটি বাড়ী কিনলেন। এরপর যথাক্রমে ষাঁড়ের লড়াই নিয়ে লেখা "ডেথ ইন দি আফটারনুন", শিকার কাহিনী "দি গ্রীন হিল্স্ অব আফ্রিকা" এবং যুক্তরাষ্ট্রের পটভূমিকায় লেখা "টু হ্যাভ অ্যাণ্ড হ্যাভ নট" প্রকাশিত হল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের মধ্যে থেকে হেমিংওয়ে যে উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন তা তাঁর "ফিফথ কলাম" নাটক ও "ফর হুম দি বেল টোল্স্" উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছিল।

দুই মহাযুদ্ধকালের অন্তর্বর্তী সময়ের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকরূপেই যে হেমিংওয়ে দেশে-বিদেশে সম্মান পেয়েছেন তা নয়, ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর স্থান ছিল উচ্চে। উপন্যাসের মত ছোটগল্পের মধ্যেও তাঁর সংঘাতময় দুঃসাহসিক জীবনের প্রতি অশেষ ভালবাসার নিদর্শন মেলে, অথচ এই ছোটগল্পগুলি কাব্যধর্মীও হয়ে উঠেছে সহজেই।

হেমিংওয়ের ছোটগল্পগুলি একত্র সঙ্কলিত হয়ে "দি ফিফথ কলাম অ্যাণ্ড দি ফার্স্ট ফরটিনাইন স্টোরিজ্" নামে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪০ সালে "ফর হুম দি বেল টোল্স্" প্রকাশিত হওয়ার পর দশ বছর হেমিংওয়ের আর কোন রচনা প্রকাশিত হয় নি। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হল "অ্যাক্রস দি রিভার অ্যাণ্ড ইনটু দি ট্রীজ্" উপন্যাসটি। এতে অবসরপ্রাপ্ত এক সৈনিকের কাহিনী বলা হয়েছে।

খুব অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকই এত দীর্ঘ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত করেছেন এবং খুব অল্প সংখ্যক লেখকই আকস্মিক মৃত্যুকে এত বেশি সংখ্যক রচনায় স্থান দিয়েছেন। যুদ্ধ ও মৃত্যুই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোট গল্পের উপজীব্য।

স্বীয় যৌবনস্মৃতি ও একটী বৃহৎ উপন্যাস হেমিংওয়ের অপ্রকাশিত গ্রন্থের তালিকায় রয়েছে। এই স্মৃতিকথা রচনা সমাপ্ত করে হেমিংওয়ে সম্প্রতি তা সংশোধন করছিলেন।

———

॥ নাট্যকার ডি, এল, রিচার্ডসন ॥

ক্যাপ্টেন ডি, এল রিচার্ডসন.....

নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট এক মনীষীর ছবি মানসচক্ষে ভেসে ওঠে। একাধারে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট এক অধ্যাপক, কবি, নাট্য-সমালোচক, প্রবন্ধকার এবং আরো অনেক কিছু। ইংরেজী-সাহিত্য এবং বিশেষ করে সেক্সপীয়রেরিও নাট্য-সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা আজ সর্বজন-বিদিত। তাঁর সম্বন্ধে মেকলের উক্তিটিও তাই। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বলেছিলেন এদেশের অনেক কিছু ভুলে গেলেও রিচার্ডসনের কণ্ঠে সেক্সপীয়রের নাটকের আবৃত্তি কোনদিন বিস্মৃত হবেন না। বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে মানুষটি জন্মেছিলেন, দানও করে গেছেন অপরিসীম। অবিস্মরণীয় দান, যার অনেক কিছুর সঙ্গে আজকের বিদগ্ধ সমাজ সুপরিচিত। তবে নাট্যকার রিচার্ডসন সম্বন্ধে অনেকেরই হয়ত জানা নেই, তাই সে সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ হয়।

১৮৪১ সালে বেশ সমারোহের সঙ্গে পার্ক ষ্ট্রীটের নবনির্মিত গৃহে সাঁসুসি রঙ্গালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল। বিগত শতকের কলকাতার শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় সাঁসুসি। ওদেশের প্রথম শ্রেণীর নাট্যশালার সঙ্গে অনায়াসে তাকে তুলনীয় করে তোলবার জন্যে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেননি প্রতিষ্ঠাতারা। সে কী অভিনয়, কী দৃশ্যপট, সাজ-সজ্জা সকল দিক দিয়েই। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। নাট্যসাহিত্যের একজন প্রকৃত সমঝদার রিচার্ডসনের নাট্যশালা প্রীতিও কম ছিল না। পথে ঘাটে আপন ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতেন—*Are you going to the theatre to-day ?*" এখানকার একাধিক রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িতও ছিলেন। বেশ ঘনিষ্ঠ-ভাবেই। সাঁসুসিরও তিনি ছিলেন একজন। তাই সকল দিক দিয়ে প্রগতিশীল নাট্যশালাটির জন্যে একটি নাটক রচনার বাসনা হল। ১৮৪০ সালের এক পত্রিকা সংবাদটি প্রথম প্রকাশ করল (ইংলিশম্যান ১৮ই মে ১৮৪০), বললে এ ধরণের একটা গুজব তাদের কানে এসেছে। তারা লিখলে—শুনছি বন্ধুবর সে হাফেজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নতুন রঙ্গালয়ের জন্যে ডি, এল, আর এক নাটক রচনা করবেন ঠিক করেছেন। সংবাদ সত্য কিনা জানিনে। তবে সত্যি হলে নতুন এক পথে জয়যুক্ত হওয়ার জন্যে কবিকে অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পাব। এও বললে যে, মকাভিনয়গুলির ওপর লেখা তাঁর সমালোচনা পড়লে নাটক রচনার রীতিনীতির সঙ্গে তিনি যে সুপরিচিত তা বেশ বোঝা যায়। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রকৃতির ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষায়ও যে দখল আছে তা তাঁর নানাবিধ কাব্য পাঠ করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়। তবে নাটকটিকে জনপ্রিয় করতে হ'লে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে দু একটা পরামর্শ দিলে। বললে, মঞ্চাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সেটি লেখা উচিত এবং তার রিহার্সালের সময় নাট্যকারের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু যে জানা যায় নি তাও জানালে।

সুদীর্ঘ একটি বছর কেটে গেল। এ সম্বন্ধে আর কিছু শোনা গেল না, গুজবও নয়। কবির নব-প্রচেষ্টার কথা কলকাতাবাসীদের মন থেকে প্রায় মুছে গেল। এমন সময় সেদিনের সামলকরা এক কাগজ (বেঙ্গল হরকরা, ৭ই এপ্রিল ১৮৪১) বিষয়টিকে আবার তাদের চোখের সামনে তুলে ধরল। বললে, নাটক রচনা সম্পূর্ণ হয়েছে। আরো অনেক খবর দিলে। গোড়াতেই দারুণ এক স্বীকারোক্তি করল। বললে,

পত্রিকাস্তরে প্রথম সংবাদটি পড়ে একেবারে তারা আশান্বিত হয়নি। বরং লে-হাভের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কবি এক দুঃসাধ্য কার্যে ব্রতী হচ্ছেন বলে তাদের মনে হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ নাট্য সমালোচকদের মতো নিঃসন্দেহে তিনি একজন। তবু নাটক রচনায় কতখানি সফলতা অর্জন করবেন সে সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবে পত্রিকা জানাল, নাটকের একটি কপি তাদের হাতে এসেছে এবং তা পাঠ করে অতীতের অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণার জন্য তারা সত্যিই দুঃখিত, লজ্জিতও বটে। এও লিখলে যে, সত্য স্বীকারোক্তির কথা মনে রেখে নাট্যকার নিশ্চয় তাদের অন্যায় সন্দিগ্ধতার কথা ভুলে যাবেন এবং তাদের মার্জনা করবেন তারা আশা করে।

রচনাটির সম্বন্ধেও অনেক কথা জানালে। গোড়ায় একটি পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত নাটক লেখা নার্কি কবির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দর্শকরা ছোট নাটিকার পক্ষপাতী। তাই শেষ পর্যন্ত যত বদলালেন এবং তিন অঙ্কের একটি নাটিকা রচনা করলেন। এও জানালে যে, বুনারের 'ইটালী' গ্রন্থের 'দি-ব্যাগ অফ গোল্ড' গল্পটির ওপর ভিত্তি করে পালাটি রচিত। গল্পের বিষয়বস্তুও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করল। নাট্যরূপ দিতে গিয়ে যতদূর সম্ভব তার যথার্থতা বজায় রাখা হয়েছে। অথচ নাটকের গতি বা মাধুর্য কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি এও জানাতে ভুলল না। অভিনয় কালে পালাটি যে অগণিত দর্শকহৃদয় আকৃষ্ট করবে তাও বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই পত্রিকা মন্তব্য করল।

সবশেষে নবপ্রচেষ্টায় অসামান্য সাফল্য লাভ করায় নাট্যকার রিচার্ডসনকে পত্রিকা তাদের অন্তরের অভিনন্দন জানিয়ে বললে নতুন পথের যাত্রা তাঁর অব্যাহত রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ নাট্য-কারদের পাশে তিনি আসন গ্রহণ করবেন ভবিষ্যদ্বাণী করল। তারপর তাদের অননুকরণীয় ভাষায় সুন্দর ও ছোট একটি বক্তব্য করে সেদিনের সংবাদটি শেষ করেছিল। সেটি উদ্ধৃত করে দিই, হয়ত পাঠকদের ভালো লাগতে পারে। ডি, এল, আর কে উল্লেখ করে লেখে—"Well done D. L. R! this is as it should be—teach the rulers that they ought to pay the army a little better."

অমল মিত্র

সেণ্ট হেলেনায় বন্দী হয়ে মহাবীর নেপোলিয়ঁ অত্যন্ত স্বল্পভাষী হয়ে পড়েছিলেন। সারাদিনের মধ্যে নিতান্ত দরকারী দু' একটি কথা ছাড়া তিনি প্রায় কোন কথাই বলতেন না। তাঁর দৃষ্টি প্রায়ই নিবদ্ধ থাকতো দূর দিকচক্রবালে, যে দিকে ফ্রান্স আছে। রক্ষী অনুচর হয়ে যাঁরা কাছে থাকতেন তাঁরা এসময়ে নেপোলিয়ঁকে কোন প্রকার বাধা দিতেন না।

একদিন একজন রক্ষী অনুচর তাঁকে প্রশ্ন করলেন—আপনি কি ভাবছেন?

নেপোলিয়ঁর মুখে ভ্রূকুটী ফুটে উঠল, তিনি বললেন—ফ্রান্স।

—আপনি কি দেখছেন?

—ফ্রান্স।

—আপনার ধ্যান-ধারণা ও স্বপ্ন কি?

—ফ্রান্স।

নেপোলিয়ঁ আর কোন কথা না বলে গম্ভীর ভাবে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

আজকের দুনিয়া

মৃত্যুর মুখোমুখী

একটু নড়লেই নিশ্চিত মৃত্যু, ছেলেটি চোখের সামনে দেখল তার এক সঙ্গী মারা পড়ল সামান্য একটু ভুলের জন্যে, সে স্থির নিশ্চল হয়ে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল।

চোদ্দ বছরের বালক রয় বেল্লন সমরশিক্ষার্থী হিসেবে ট্রাকে করে চলেছিল যুদ্ধবিদ্যা অনুশীলনের উদ্দেশ্যে। ট্রাকের মাথায় ছিল এরিয়াল। হঠাৎ এরিয়ালের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগল মাথার ওপর তেত্রিশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎশক্তিবাহী তারের সঙ্গে, তার ছিঁড়ে পড়ল ট্রাকের ওপর, মুহূর্তে ট্রাকের সমস্ত ধাতব অংশ দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলল, ট্রাকের একটা অংশ ধরতে গিয়ে রয়ের সামনে মারা পড়ল অ্যাটকান। তাকে বাঁচাতে গিয়ে দুই বন্ধুর হাত পুড়ে গেল।

রয় বেল্লন বুঝল এটুকু নড়লেই মৃত্যু। সে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না সুইচ অফ্ করা হল। অসাধারণ ধৈর্য ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে রয়। এই বহুপ্রধান সভ্যতার যুগে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে আর তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে চাই দৃঢ়তা ও অচঞ্চলতা।

—ডেলি মেল

যে নদী মরুপথে

এ যুগের বিখ্যাত ইংরেজ কবি ডাইলান টমাস মারা গেলেন অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে। তাঁর স্ত্রী কেইটলিন নিজেকে আবিষ্কার করলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব অসহায় রূপে। নেপোলিয়নকে যেখানে নির্বাসিত করা হয়েছিল সেই এলবা দ্বীপে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেকেও অনুভব করলেন বন্দিনীরূপে।

ছেলেদের খেতে দিলেন নিজেকে অনাহারে রেখে···একটা সস্তা ভাড়া করা ঘরে থাকতেন ·····ভাড়া বাকী পড়তে একদিন প্রায় পথে এসে দাঁড়াতে হল।

চতুর্দিকে শূন্যতা, নিদারুণ অসহায় অবস্থা।

কলম ধরলেন কবিপত্নী, লিখে চললেন···বিষয়: বঞ্চনা উপবাস ও মৃত্যুর মুখোমুখী একটি জীবন।

বইটির নাম দিলেন—লেফট্-ওভার লাইফ টু কিল্। অর্থাৎ ডাইলানের মৃত্যুর পর তাঁর জীবন যা নিহত হতে চলেছে।

বইটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন লণ্ডনের এক প্রকাশকের কাছে। এটি একটি মূলস্রোত রচনা হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

ডেলি মিরর

শেষের সেদিন কিবা ভয়ঙ্কর

আমরা সকলেই জানি এই বিশ্বের বিদ্যমান শক্তিগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। কিন্তু যা আমরা জানি না তা হচ্ছে এই প্রস্তুতির স্বরূপ কি, তার ফলই বা কি রকম।

একটি রাষ্ট্রশক্তির কথা ধরা যাক—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের বৃহত্তম একটি সংগঠন, অকল্পনীয় বস্তুসম্পদ এবং ধ্বংসাত্মক শক্তির অধিকারী একটি প্রতিষ্ঠান এ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে—স্ট্র্যাটেজিক্ এয়ার

কম্যাণ্ড। সংক্ষেপে এস এ সি। সারা বিশ্বের সত্তরটি বিমান ঘাঁটির কর্তৃত্ব এদের হাতে। দু'হাজার বোমারু বিমান, এক হাজার পেট্রোলবাহী বিমান এবং অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র এর রয়েছে।

যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে লণ্ডনের কথা বাদ দিলাম, নিউইয়র্ক, চিকাগো, লস এঞ্জেলেস সব নিঃশেষে মুছে যাবে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে। কিন্তু তখনও ধ্বংসমুখর এই পৃথিবীর চল্লিশ হাজার ফুট ওপরে উড়তে থাকবে একখানি বিমান যেখান থেকে সম্পূর্ণ পৃথিবী ধ্বংস করার শেষ আদেশ আসবে। এই হল ফ্লাইং কম্যাণ্ড পোষ্ট। ভূমিস্থিত সমস্ত বিমানঘাঁটি ধ্বংস হয়ে গেলেও যাতে যুদ্ধ চালানো যায় সেই মতো সমস্ত ব্যবস্থা এই ফ্লাইং কম্যাণ্ড বিমানটিতে করা আছে।

যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে শত্রুকে একেবারে নির্মূল না করে আমেরিকা ক্ষান্ত হবে না, তাতে যদি সমস্ত মানুষ মারা পড়ে তাও স্বীকার।

—ডেলি মিরর

তুমি মোরে কি দেখাও ভয়!

ছেলেদের ভয়কে জয় করতে শেখানো হচ্ছিল ইংলণ্ডের অ্যাস্টন চার্চল প্রিপারেটরি স্কুলে। ছেলেদের বলা হল: মনে করতে থাক তোমরা আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছ আর তোমাদের দেহগুলো ধীরে ধীরে ধুলোয় মিশিয়ে যাচ্ছে।

দু'জন অভিভাবক ছাত্রদের স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। অর্ধেক ছেলে স্কুলে এল না এ শিক্ষা গ্রহণ করতে।

অনেকে বলেছেন এ শিক্ষা মনস্তত্ত্বসম্মত। ভয়কে জয় করতে হলে শিশুদের মনে করতে হবে ভয়াবহ এক পরিস্থিতি, এতে তাদের কল্পনাশক্তি প্রখর হবে, বুদ্ধি খুলবে।

কিন্তু বর্তমানে এ মত পরিত্যক্ত হয়েছে। একথা স্বীকৃত হয়েছে যে শিশুমন হল অতি কোমল এবং অতিশয় কল্পনাপ্রবণ। মৃত্যুচিন্তা তাদের ক্ষতিই করবে।

স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করে শিক্ষাসংস্কারে উদ্যোগী হয়েছেন।

—ডেলি মিরর

ধুলির ধন

স্কুল থেকে লেখাপড়া শিখে এসে ছেলে মাকে জিজ্ঞেস করলে—মা, একথা কি সত্যি যে আমরা এসেছি পৃথিবীর ধুলি থেকে?

—হ্যাঁ বাবা, মা বললেন।

—আবার ধুলিতেই আমরা ফিরে যাব, এও কি সত্য? ছেলের পুনরায় প্রশ্ন।

—হ্যাঁ বাবা।

—ঠিক বলেছ, এই আসাযাওয়ার ব্যাপারটা ঘটেছে, ঘটতে চলেছে, ছেলে বলে উঠল।

—কি করে জানলে তুমি বাছা? মা প্রশ্নকর্তা।

—ঐ তাখোনা খাটের বিছানাটায় কত ধুলো জমে উঠেছে—ছেলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

—ইলাস্ট্রেটেড উইকলি

শ্রী সন্ধানী

অমৃত কথা ও কাহিনী

যীশুখৃষ্টের কথা

—"যে শাসন ভালবাসে, সে জ্ঞান ভালবাসে; কিন্তু যে অনুযোগ ঘৃণা করে, সে পশুবৎ। জ্ঞানবান পুত্র পিতার শাসন মানে, কিন্তু নিন্দুক ভৎর্সনা শোনে না। মানুষ নিজ মুখের ফল দ্বারা মঙ্গল ভোগ করে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের প্রাণ দৌরাত্ম্য ভোগ করে। মানুষের মনোব্যথা মনকে নত করে, কিন্তু উত্তম বাক্য তা হর্ষযুক্ত করে। সতর্ক লোক জ্ঞান আচ্ছাদন করে, কিন্তু হীনবুদ্ধিদের হৃদয় সজ্ঞানতা প্রচার করে। আশাসিদ্ধির বিলম্ব হৃদয়ের পীড়াজনক, কিন্তু বাঞ্ছার সিদ্ধি জীবনবৃক্ষ। অজ্ঞানের মুখে অহঙ্কারের দণ্ড থাকে, কিন্তু জ্ঞানবানদের ওষ্ঠ তাহাদিগকে রক্ষা করে। দরিদ্র আপন প্রতিবাসীরও ঘৃণিত, কিন্তু ধনবানের অনেক বন্ধু আছে।"

• • •

—"অলসের পথ কণ্টকের বেড়ার ন্যায়, কিন্তু সরলদের পথ রাজপথ। যে উপকার পাইয়া অপকার করে, অপকার তাহার বাড়ী ত্যাগ করিবে না। প্রচুর ধন অপেক্ষা সুখ্যাতি বরণীয়; রৌপ্য ও সুবর্ণ অপেক্ষা প্রসন্নতা ভাল। তুমি দুষ্কর্মী লোকদের উপরে ঈর্ষা করিও না, তাহাদের সঙ্গে থাকিতেও বাসনা করিও না। কেননা তাহাদের চিত্ত অপকারের কল্পনা করে, তাহাদের ওষ্ঠাধর অনিষ্টের কথা কহে। প্রস্তর ভারী ও বালি গুরু, কিন্তু অজ্ঞানের অসন্তোষ ঐ উভয় অপেক্ষা ভারী। ক্রোধ নিষ্ঠুর ও কোপ বন্যাবৎ, কিন্তু অন্তর্জ্বালার কাছে কে দাঁড়াইতে পারে? ধনবানের ধনই তাহার দৃঢ় নগর, দরিদ্রদিগের দরিদ্রতাই তাহাদের সর্বনাশ।"

• • •

—"জ্ঞানীদের সহচর হও, জ্ঞানী হইবে, কিন্তু যে হীনবুদ্ধিদের বন্ধু সে ভগ্ন হইবে। অমঙ্গল পাপীদের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়ে, কিন্তু ধার্মিকদের মঙ্গলরূপ পুরস্কার দত্ত হয়। যাহারা অনিষ্ট কল্পনা করে, তাহারা কি ভ্রান্ত হয় না? কিন্তু যাহারা মঙ্গল কল্পনা করে, তাহারা দয়া ও সত্য পায়। সত্য সাক্ষী লোকের প্রাণ রক্ষা করে, কিন্তু যে অসত্য কথা কহে, সে ছলনা করে। আশুক্রোধী অজ্ঞানের কার্য করে, আর কু-কল্পনাকারী ঘৃণার পাত্র হয়। অবোধদের অধিকার অজ্ঞানতা, কিন্তু সতর্কেরা জ্ঞানমুকুটে বিভূষিত হয়। যে প্রতিবাসীকে তুচ্ছ করে, সে পাপ করে; কিন্তু যে হীনহীনদের প্রতি দয়া করে সে ধন্য। কোপন স্বভাব লোকের সহিত বন্ধুতা করিও না, ক্রোধীর সঙ্গে যাতায়াত করিও না; পাছে তুমি তাহার আচরণ শিক্ষা কর, আপন প্রাণের জন্য ফাঁদ প্রস্তুত কর। ধার্মিকেরা বর্দ্ধিষ্ণু হইলে প্রজাগণ আনন্দ করে, কিন্তু দুষ্ট লোক কর্তৃত্ব পাইলে প্রজারা আর্তস্বর করে।"

॥ ঈর্ষা ॥

[বড় গল্প]

স্কুল জীবনের পরে মাত্র বার কয়েক দেখা হয়েছে রাধাপ্রসাদের সঙ্গে। একসঙ্গে পড়তুম আমরা। বড় লোকের ছেলে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদের তখন নাম ছিল না। আমাদের মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের লোক বললেই ঠিক বলা হবে। উনিশ শো ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের মিত্রদের নাম বাঙালী সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। রাধাপ্রসাদের বাবা অন্নদাচরণ মিত্র ছিলেন ব্যারিস্টার। দীর্ঘদিন কলকাতার হাইকোর্টে নীরবে তপস্যা করবার পর হঠাৎ তিনি সিদ্ধি লাভ করলেন। প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়িটা কিনে ফেললেন। কিনতে সময় লাগল না। মাছির মতো মক্কেলরা উড়ে আসত রাধাপ্রসাদের বাবার কাছে। যেন এক রাত্রির মধ্যে আচার ব্যবহার আদব-কায়দা এবং জীবন যাপনের রীতিনীতিও বদলে গেল সব। পাকা হুজুর সাহেব বনে গেলেন ওঁরা। ইত্যবসরে রাধাপ্রসাদের দুই কাকাও দিল্লীর দপ্তরে দুটি বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হয়ে বসলেন। সবাই বিলেত ফেরৎ, অতএব উচ্চশিক্ষিত। আচার ব্যবহার বিলেতী ছাঁচে ঢালা। কথাবার্তাও চলে ইংরেজী ভাষায়। রাধাপ্রসাদের ঠাকুরদা যে একটা মহকুমা আদালতে মোক্তারী করতেন সেকথা কেউ আর মনে রাখলেন না।

আমরা সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়তুম। প্রসাদের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব ছিল আমার। সামাজিক পদমর্যাদায় আমরা যে ওদের সমান নই, তা সে জানত। তাই ব'লে রাধাপ্রসাদ কখনো উচ্চতার দাবি করে নি। ওর ব্যবহার থেকে শ্রেণীবিভাগ বোঝা যায় নি কোনোদিনও। প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের বাড়িতেও বার কয়েক গিয়েছি আমি। আদর আপ্যায়নের ত্রুটি কখনো চোখে পড়ে নি আমার।

হঠাৎ একদিন স্কুলে আসা বন্ধ করে দিল রাধাপ্রসাদ। ভেবেছিলুম অসুখবিসুখ করে থাকবে। তারপর শুনলুম বিলেত চলে গিয়েছে। সেখানেই লেখাপড়া করবে। সেই সময় কলকাতার উচ্চতম সামাজিক স্তরে যে-কটি বাঙালী বাস করতেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিলেত অঞ্চলেই লেখাপড়া করত। তাতে যে ওরা আমাদের চেয়ে বেশি বিদ্বান হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসত তা নয়। বোধ হয় ইংরেজ পরিচালিত বণিক অফিসে মোটা মাইনের চাকরি পেতে সুবিধে হতো এদের।

স্কুল জীবনের পর রাধাপ্রসাদের সঙ্গে আমার যখন প্রথম দেখা হ'ল তখন দশ-বারো বছর পার হ'য়ে গিয়েছে। বিলেতে থাকতে কোনদিনই সে আমায় চিঠি লেখে নি। যোগাযোগ ছিল না। অতএব ওর কথা ভুলে গিয়েছিলুম। যখন দেখা হ'ল তখন ওকে আমি চিনতেই পারি নি। রাধাপ্রসাদ কিন্তু দূর থেকে দেখে আমাকে চিনে ফেলেছিল।

ঘটনাটা ঘটল পার্ক স্ট্রীটের ওপর। বোধ হয় উনিশ শো পঞ্চাশ সাল। একদিন বিকেল বেলা আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে বা হাতটা দ'রে পার্ক স্ট্রীটের দিকে হাঁটছিলুম। বছর দুই আগে আর্ট কলেজ থেকে পাশ ক'রে স্বাধীনভাবে ছবি আঁকার ব্যবসা করছিলুম। ঐ স্কুল স্ট্রীটে বড় একটা

মানপনের দোতলার ছিল আমার স্টুডিও। আমি সেই দিকেই যাচ্ছিলুম। মোড়টা পার হ'য়ে আসবার পর হঠাৎ দেখি একটা ঝকঝকে নতুন গাড়ি এসে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। এতো কিনার ঘেঁষে হাঁটছিলুম যে আমিও থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। আমার আর গাড়িটার মধ্যে বোধ হয় এক ইঞ্চির বেশি ফাঁক ছিল না। খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। অসাবধান হ'লে গায়ে আমার ধাক্কা লেগে যেতো।

গাড়িতে ব'সেই কে যেন বলল, "এই একটু দাঁড়া, আমি আসছি।" কথাটায় কান দিলুম না। পুব দিকেই হাঁটতে লাগলুম। গাড়িটাও আমার পেছনে পেছনে এগুতে লাগল। এবার আমার নাম ধরেই ডাকল, "এই সনত, একটু দাঁড়া ভাই। আমি রাধাপ্রসাদ।"

আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। গাড়ি থেকে নেমে আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে সে বলল, "আমায় চিনতে পারছিস না? প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের রাধাপ্রসাদ মিত্র আমি। এক সঙ্গে সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়তাম, মনে নেই?"

"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরে এতো দিন পর! আমার ধারণা ছিল বিলেত থেকে ফিরে আসিস নি। তারপর কেমন আছিস, কি করছিস? চল্ না কোথাও গিয়ে বসি? ঐ তো একটা চা-এর দোকান রয়েছে। উঃ দশ-বারো বছর পার হ'য়ে গিয়েছে। এতো দিন বনবাসে থাকতে পারলি?"

"বনবাস?" হেসে উঠল রাধাপ্রসাদ, "বনবাস কি বলছিস রে, আমি তো লণ্ডনে ছিলুম।"

"হ্যাঁ, জানি। আমাদের কাছে লণ্ডন আর বোম্বের মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। কলকাতার বাইরে গেলেই বনবাস। তারপর কলকাতা কেমন লাগছে?"

"হেল্—নরক। নে সিগারেট খা—" টিন্‌টা আমার দিকে এগিয়ে ধরল রাধাপ্রসাদ। ধরিয়েও দিল সে। দু একটা টান দিয়ে আমি বললুম, "জানি তোরা সাহেব মানুষ, কলকাতার মতো একটা ছোট জায়গায় তোদের দম আটকে আসে। তবু বলব বাঙালীর কাছে কলকাতাই স্বর্গ—"

"স্বর্গ?" পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করল প্রসাদ, "একটু দাঁড়া সনত, আমি আসছি।" রাধাপ্রসাদ গাড়ির কাছে চ'লে গেল। মনে হ'ল একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। স্ত্রীকণ্ঠ ব'লেই ধারণা হ'ল আমার। রাধাপ্রসাদ কি বিয়ে করেছে?

বোধ হয় মিনিট দুই পর্যন্ত আমি একাই দাঁড়িয়েছিলুম। তখন কিন্তু ভাবতে পারি নি যে, রাধাপ্রসাদের সঙ্গে আমার আরও বার কয়েক দেখা হবে। ওর হাবভাব থেকে বুঝতে পেরেছিলুম, আমাদের মতো বাঙালীর সঙ্গে ওরা পথে দাঁড়িয়ে কথা বলে। ব্যবধান রাখতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেমন ক'রে যে ওর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলুম আমি, সেই কাহিনীটা শুনলে আপনারা বিস্ময় অবাক হবেন।

মিনিট দুই পর ফিরে এল সে। আবার সেই পরিহাসের সুরেই প্রশ্ন করল। "কি বলছিলি যেন? স্বর্গ, না?"

"আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ—তোরা তো কলকাতাকে নরক বলবি। খবরের কাগজের সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখে নরক-বার্তা ঘোষণা করবি। তবুও আমরা ভাই জোব চার্নক-এর কীর্তিটাকে স্বর্গের মতো মনে করি। প্রতি বছরই লোক বাড়ছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে গাদা-গাদা লোক আসে। খাদ্য, অর্থ এবং প্রতিপত্তির লোভে নানা রকমের প্রতিভা এখানকার ফুটপাতে ঘুরে

বেড়ায়। ভিড় দেখছিস? নরকের প্রতি এতো লোভ কেন? চল্, একটা চা-এর দোকানে ঢুকে পড়া যাক।"

"এই সময় চা? তার চেয়ে বরং চল 'কারণো'-র বারান্দায় গিয়ে বসি। একটু হুইস্কি খেলে তোর কি জাত যাবে?"

"আমরা কলকাতার লোক। জাত কাত কিছু নেই ভাই। বেশ, বেশ অন্য একদিন আবার গল্পগুজব করা যাবে। কতো দিন থাকবি ভারতবর্ষে?"

"এখন আছি। চাকরি করছি। কন্ডেমেন্‌টেড জব। সাহেব কোম্পানী। তুই কি করছিস?" পাইপ ধরাল প্রসাদ।

"এই বছর দুই আগে আর্ট কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরিয়েছি। স্টুডিও খুলেছি। এখন চাকরি-বাকরি করবার ইচ্ছা নেই। স্বাধীনভাবে কিছুদিন কাজ করব। একদিন আসিস আমার স্টুডিওতে।"

"তুই আর্টিস্ট!" যেন আকাশ থেকে পড়ল রাধাপ্রসাদ, "এমন শখের লাইন বেছে নিলি কেন? সংসার চলবে কি করে?"

"একা মানুষ, অল্পস্বল্প রোজগার করতে পারলেই হ'ল। চল না, আমার স্টুডিওটা একবার দেখে আসবি? এই তো কাছেই—ক্রি স্কুল স্ট্রীট।"

রাধাপ্রসাদ পেছন ফিরে গাড়ির দিকে দৃষ্টি ফিরল একবার। মনে মনে কি যেন ভাবছিল সে। ভেবে নিয়ে বলল, "আচ্ছা অন্য একদিন যাব। তোর ঠিকানাটা দে। কার্ড আছে না?"

পকেট থেকে কার্ড বার ক'রে ওকে দিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম "আজকে বুঝি অসুবিধে আছে?"

"হ্যাঁ। সঙ্গে একটি ভদ্রমহিলা আছেন। মানে বুঝতেই তো পারছিস, বিয়ের বাজারে আমার এখন সাংঘাতিক ডিমাণ্ড। মেয়েটির সঙ্গে বিলেতেই আলাপ হয়েছিল। মিস ইলা মহলানবীশ। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতুম···কিন্তু তোর বোধ হয় পছন্দ হবে না।"

"বিয়ে তো করবি তুই, আমার পছন্দ-অপছন্দর সঙ্গে সম্পর্ক কি?"

"পাগল! মিস মহলানবীশকে আমি বিয়ে করব না।"

"তবে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিস কেন, প্রসাদ?"

"লেগে রয়েছে, কি করি বল? বিলেত থেকে জ্বালাতন করছে। আচ্ছা তা হলে চলি। একদিন সন্ধের দিকে তোর স্টুডিওতে গিয়ে উপস্থিত হবো। বাই, বাই—।"

গাড়িতে উঠে বসল রাধাপ্রসাদ। ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটিকে দেখলাম আমি। মিস মহলানবীশের জন্য মনে মনে দুঃখ বোধ করলাম। আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া পতঙ্গের নাকি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মিস মহলানবীশ তো পতঙ্গ নন, মানুষ। হয়তো পুড়বেন না।

তারপর আরও মাস ছয় কেটে গেল। রাধাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয় নি। আমার স্টুডিওতে আসে নি সে। আমি ওর কথা ভুলে গিয়েছিলুম। জীবন সংগ্রামের ঝুঁকি নিতে হচ্ছিল। আর্টিস্ট হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে অনুতাপ আসছিল মনে। দু একখানা অয়েল পেইনটিং আঁকবার অর্ডার যে পাই নি তা নয়। কিন্তু খদ্দেররা দাম দিতে চান না। ক্রি স্কুল স্ট্রীটের স্টুডিয়োর ভাড়া এরই মধ্যে

বাকী পড়েছে। আয় যা হচ্ছে তা পুরো মাসের খরচ কুলিয়ে উঠছে না। অতএব এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে রাধাপ্রসাদের কথা মনে রাখা সম্ভব হয় নি। ওরা বড় লোক। ব্রিটিশ আমলের সুখ-সুবিধার মধ্যে লালিত পালিত। স্বাধীন ভারতবর্ষে সামাজিক এবং আর্থিক সুখসুবিধার পরিমাণ আরও বেড়েছে। ভোগের বস্তু হজম ক'রে উঠতে পারছে না এরা।

তবুও রাধাপ্রসাদকে আমার ভাল লাগে। কেন যেন মনে হয় ওর সঙ্গে আমার কোনোদিনও ছাড়াছাড়ি হবে না। বন্ধুত্বের বাঁধন খুব দৃঢ়। সাক্ষাৎ হয় না বটে, কিন্তু মনে মনে অনুভব করি আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগশীল। অলিখিত আইনের মতো এই অনুরাগটা যেন সর্বজনস্বীকৃত।

মাসছয় পরে রাধাপ্রসাদ সত্যি সত্যি একদিন এসে উপস্থিত হ'ল! ঘরে ঢুকেই আমাকে জড়িয়ে ধরল সে। ছবি আঁকা শেষ ক'রে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম আমি। সন্ধের পর আমি আর স্টুডিওতে কাজ করি না। অবিশ্যি জরুরী কাজ থাকলে কোনো কোনো দিন রাত দশটাও বেজে যায়। প্রায় মিনিট দু তিন ওর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে রইলুম আমি। বুঝলুম প্রচুর পরিমাণে মদ খেয়েছে সে। পা-এর ওপর সোজাভাবে দাঁড়াতে পারছে না ব'লে আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

আমি এবার ওর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলুম। ওকে ধ'রে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলুম সোফার উপর। জিজ্ঞাসা করলুম, "এতো বেশি খাওয়ার দরকার কি?"

হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল রাধাপ্রসাদ। ফরসা মুখটা লালচে হ'য়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল লাল রংটার মতো ওর কান্নাটাও কৃত্রিম। বোধ হয় সুখী এবং ধনী লোকরা প্রাচুর্যের প্রেরণায় মাঝে মাঝে অভিনয় করতে ভালবাসে। আমি তাই নিজে থেকে কোনো প্রশ্নই করলুম না। জানতে চাইলুম না কেন সে হঠাৎ অমনিভাবে কেঁদে উঠল।

সোফার ওপর গা এলিয়ে দিল প্রসাদ। অলস সিগারেটের ডগা থেকে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সে বলল, "আমার বাঁচা সনত, মরে গেলুম। দিনরাত জ্বলছি।"

"তাই তো দেখছি—চেইন স্মোকার। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছিস।"

আহত বোধ করল রাধাপ্রসাদ। পরিহাসটুকু হজম করতে পারল না। ধমকানির সুরে বলতে লাগল সে, "জ্বলছি তো ভেতরে, সিগারেটের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? আখ সনত, তোর এই মধ্যবিত্ত মনোভাব ছেলেবেলা থেকেই আমি সহ্য করতে পারতুম না। এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন আমি খুব সুনীতিপরায়ণ! এই যাঃ—" উঠে পড়ল প্রসাদ, "গাড়িতে ব'সে রয়েছে—আমি চলি।"

"কে ব'সে রয়েছে?"

"মিস খান্না। সত্যি মনে পুড়ে মরলুম। ভাবছি এবার বিয়ে ক'রে ফেলব। তুই কি বলিস, সনত?"

"হ্যাঁ, আমিও বলি বিয়ে ক'রে ফেল। মিস মহলানবীশ কোথায় গেলেন?"

"টোকিও।"

"টোকিও!" বিস্ময়ের ভঙ্গী করলুম আমি।

"ফরেন সার্ভিসে ঢুকেছে। আমাদের রাষ্ট্রদূতাবাসে সেক্রেটারীর কাজ একটা জোগাড় ক'রে দিতে হ'ল। আমি আর পেরে উঠছিলুম না। মিস মহলানবীশ এভাবে আমাকে আগলে ব'সে থাকত যে আরও সত্যিকার কুমারী কাছে আসতে পারত না। টোকিওতে গিয়ে এখন সে সুখেই

আছে। আর মিস খান্নার সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিই। হ্যাঁরে সনত, তোর মডেল দরকার হয় না?"

"হয়। কিছু কিছু অরিজিনাল কাজ করছি।"

"তা হ'লে মিস খান্নাকে তুই নে। প্রচুর মদ খায়। চোখ দুটো ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। দু'দিকের চোয়াল দেখলে মনে হবে—ও কি রাগ করলি না কি? তা হ'লে তুই একবার ওকে ডাক। ভাল মডেল। শুধু সতীলক্ষ্মীদের ছবি এঁকে কি করবি? ওকে তুই নে। আমি আর খেয়ে উঠছি না। ওর বাবা মিষ্টার খান্না আমাদের কোম্পানীর একজন ডিরেক্টার হয়েছেন। ওর একটা ছবি যদি আঁকতে পারিস তা হ'লে হাজার পাঁচেক টাকায় বিক্রি করিয়ে দেব। টাকা রোজগার করতে না পারলে শিল্প বাঁচবে না, শিল্পীও মরবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালো বাজারে মিষ্টার খান্না যা টাকা কামিয়েছেন তা থেকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়েও ছবি তিনি কিনতে পারেন। আর—"

"না, আজ থাক। অন্য একদিন দেখব। তুই আবার কবে আসবি?"

"যে কোনদিন এসে উপস্থিত হবো। যাই, যাই—"

বিদায় দেওয়া সত্ত্বেও রাধাপ্রসাদ অপেক্ষা করতে লাগল। ইজেলের দিকে দৃষ্টি ফেলল সে। একটা অর্ধ-সমাপ্ত প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে বলল, "আমার জন্য একটা ছবি আঁক। তোর আঁকা একটা ছবি আমি নিজে কিনতে চাই। দাম যা চাইবি দেব। পুরো দামই দেব।"

চলে গেল রাধাপ্রসাদ। আর কোনো কথা হ'ল না। গাড়ি হাঁকিয়ে ক্রি স্কুল ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে গেল সে। নিঃসন্দেহ হওয়ার পর আমিও ষ্টুডিও বন্ধ ক'রে বেরিয়ে পড়লুম পথে।

এরপর আরও একটা বছর পার হ'য়ে গেল। রাধাপ্রসাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই সময় আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠেছিল। আর্টিষ্ট হওয়ার জন্য মাঝেমাঝেই অনুতাপ হচ্ছে। বোধ হয় ভুল ক'রে ফেলেছি। রাধাপ্রসাদের মতো একটা বিলেতী কোম্পানীতে চাকরি গেলে আর্থিক সংকটের মধ্যে হাবুডুবু খেতুম না। এখন একেবারে অচল অবস্থার উদ্ভব হল। এমন কি ছবি আঁকবার মালমশলা কেনবারও পয়সার অভাব হয়েছে। ষ্টুডিওতে মোটা দশ ছবি এঁকে ফেলে রেখেছি। খদ্দের নেই। যে-মেয়েটি মডেল হিসেবে কাজ করত সে আর আসে না। টাকা দিতে পারছিলুম না। এমত অবস্থায় রাধাপ্রসাদের কথা মনে পড়ল। সে একটা ছবি আমার কিনতে চেয়েছিল। হয়তো ছবি পছন্দ হ'লে ভাল দামই দেবে সে।

একদিন বিকেলের দিকে প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীটে এসে উপস্থিত হলুম। প্রসাদের বাবা এবং মায়ের সঙ্গে বহু দিন আগে একবার দেখা হয়েছিল। আমি তখন আর্ট কলেজে পড়ছি। প্রসাদ অবিশ্যি বিলেতেই বাস করছিল। প্রসাদের বাবা ব্যারিষ্টার মিত্র শুনে সেদিন খুবই খুশী হয়েছিলেন যে আমি অয়েল-পেইনটিং-এ হাত পাকাচ্ছি। তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল, মিষ্টার অমলনারায়ণ মিত্র শিল্পকলা সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী এবং খবর রাখেন অনেক। আজকে ভাবলুম, হয়তো তিনিও আমার দু'একখানা ছবি কিনতে পারেন। আমার ষ্টুডিয়োতে তাঁকে একদিন আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসবার পরিকল্পনা নিয়ে রওনা হ'য়ে গেলুম প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীটের দিকে।

অনেক দিন এখানে আসিনি। ফটক দিয়ে বাগানে ঢুকে দেখলুম, রাজমিস্ত্রীরা কাজ করছে। বাড়িটা ছিল দোতালা। এখন তিনতালা হচ্ছে। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলুম না। হঠাৎ এঁদের

তিনতালার দরকার হ'ল কেন? প্রসাদ তো এঁদের একমাত্র সন্তান। হাওয়ার অভাব হওয়ার তো কথা নয়।

যাই হোক ভেতরে ঢুকে শুনলুম প্রসাদ কিংবা ব্যারিষ্টার মিত্র এখনো বাড়ি ফেরেন নি। কখন ফিরবেন তাও কেউ বলতে পারল না। হতাশ হ'য়ে পড়লুম আমি। অন্তত একখানা ছবি আমার বিক্রি করা দরকার। বুড়ো বেয়ারাটাকে চিনতুম আমি। বেরিয়ে আসবার মুখে তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। সে বললে যে, প্রসাদের মা বাড়ি আছেন। বড়সাহেব এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবেন। ছোটসাহেবের ফেরবার কোনো বাঁধাধরা টাইম নেই। অনেক রাত করে ফেরেন তিনি। একেবারে পুরোপুরি মাতাল না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি ফেরবার কথা মনে পড়ে না তাঁর। আমি বললুম, "তা হ'লে বরং প্রসাদের মা-কে বলো আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"আধঘণ্টা খানিক অপেক্ষা করতে হবে বাবু।"

"কেন?"

"এখন তিনি কাপড়-চোপড় পরবেন। বাথরুমে ঢুকেছেন। বেরুতে বেরুতে সাড়ে পাঁচটা বাজবে। আপনি বসুন, চা খান।"

আমার মনের যা অবস্থা তাতে পাঁচ ঘণ্টাও হ'সে ব'সে অপেক্ষা করতে পারতুম। আমি ব'লেই নিয়েছিলুম, প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীটে একখানা ছবি আমার বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যাঁরা প্রতি বছর হাজার হাজার টাকার আসবাব কেনেন তাঁরা কেন দু'একখানা ছবি কিনতে পারবেন না? অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই কিনবেন।

চা খাওয়াও শেষ হ'য়ে গেল। ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় প্রসাদের মা আমায় ডেকে পাঠালেন। দোতালায় উঠে গেলুম। বহুদিন আসি না বটে, কিন্তু পথঘাট সব আমার চেনাই ছিল। প্রত্যেকের জন্যই আলাদা আলাদা ড্রইং-রুম। বুড়ো বেয়ারাটা বলল, "মেমসাহেব ড্রইং-রুমে আছেন, আপনি সেখানেই যান।"

ভেতরে ঢুকে পা-এর ধুলো নিলুম। মনে হল প্রসাদের মায়ের বয়স বাড়েনি। বরং কমেই গিয়েছে। আশ্চর্য বোধ করলুম আমি। বছর দশেক আগেই তো তাঁর মাথার পাকা চুল দেখেছিলুম। এখন দেখলুম তাঁর মাথায় একটিও পাকা চুল নেই। বোধ হয় প্রসাধন-বিজ্ঞানের দৌলতে বয়সটা তাঁর কমে গিয়েছে। বিজ্ঞানের বাহাদুরী আছে বটে! পাকা চুলকেও কাঁচা ক'রে দিয়েছে বোধ হয়।

"বোসো সনত, বোসো। তারপর কি মনে ক'রে? বহুদিন তো এদিকে আসোনি। প্রসাদ বলছিল, তুমি না কি ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে বসে ছবি আঁকছ আজকাল?"

"ওখানেই আমার ষ্টুডিও।"

"বেশ বেশ। সপ্তাহে অন্তত একবার তো মার্কেটে যাই, তোমার ছবি কিন্তু কখনো আমার চোখে পড়েনি। কোন্ মার্কেটে তোমার ছবি বিক্রি হয়, সনত? দু'একখানা সঙ্গে এনেছ না কি?"

"আজ্ঞে না। দরকার থাকলে নিয়ে আসতে পারি গিয়ে—"

"তাড়াতাড়ির কিছু নেই। আজকাল তো বিলেতী কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার কেটে কেটে অনেকেই ঘর সাজাচ্ছে। পয়সা দিয়ে কিনতেও হয় না। গোটা কয়েক ছবি আমিও বাঁধিয়ে রেখেছি। সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় ওঠবার সময় দেখোনি?"

"দেখেছি।"

"হাঁ, এতো ভাল ছবি চোখে না প'ড়ে পারেই না। বিয়ে করেছ না কি, সনত?"

"না।"

"এ-সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করছ না কিছু?"

"আজ্ঞে না।" হতাশায় মন আমার ছেয়ে গেল। ছবি বেচবার যে এক আনা সম্ভাবনাও নেই তা আমি বুঝতে পারলুম। এখন যেন পালাতে পারলেই বাঁচি। প্রকৃতপক্ষে আমি ভাবছিলুম ব্যারিষ্টার মিত্রের সঙ্গে দেখা না হ'লেই খুশী হবো। উঠে পড়বার ছুতো খুঁজতে লাগলুম একটা। এমন সময় মিসেস মিত্র বললেন, "স্বাধীন ভারতবর্ষে বাংলাদেশের বিয়ের বাজার খুব গরম। উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। আজকাল বাঙালী ছেলেরা দু'শো তিনশো টাকার বেশি মাইনে পাচ্ছে না ব'লে উঁচু সমাজে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। পার্ক ষ্ট্রীটের কাছেই তো ষ্টুডিও তোমার—তুমি কিছু দেখতে পাওনা সনত?"

বিনীতভাবে বললুম, "আজ্ঞে হাঁ। সাদা সাদা সঙ্কট দিনরাত্তির দেখতে পাই। উঁচু সমাজের অধিকাংশ মেয়েই অবিবাহিতা।"

"সেই জন্যই প্রসাদকে নিয়ে বিপদে পড়েছিলুম—" মিসেস মিত্র আত্মতৃপ্তিতে চোখ বুজলেন, "দেড় হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে—ভারি অংক। আমরা তো অস্থির হ'য়ে উঠেছিলুম বাছা। প্রতিদিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাঁচ সাতজন পিতামাতা এসে উপস্থিত হতেন এখানে। উনি তো মক্কেলদের সঙ্গে কথা কইবার ফুরসত পেতেন না। আমরা তাঁদের হাত জোড় ক'রে বলতুম, 'ছেলেতো আমাদের ঐ একটি—এতো লোকের অনুরোধ রাখব কি ক'রে?' বুঝলে সনত, এরপর থেকে এঁদের বোধ হয় বড়বাজারে যেতে হবে উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে। বাড়ি, গাড়ি এবং তারও পরে কেউ কেউ নগদ টাকাও দিতে চেয়েছিলেন। আমরা নিই নি।" এই পর্যন্ত ব'লে হঠাৎ তিনি আলোচনা বন্ধ ক'রে দিলেন। চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না। কিছু একটা বলা দরকার। তাই আমি বললুম, "আমার আর প্রসাদের একই বয়স—ছাব্বিশ পার হচ্ছি। বিয়ে দিন ওকে। ও কি কাউকে এখনো ভালবাসে নি?"

"ভালবাসবার সুযোগ পেল কোথায়? একজনের সঙ্গে তো বেশি দিন মিশতে পারে না। মেয়েরা বড্ড বেশি বিরক্ত করে ওকে। তাই এমন মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করেছি যাকে ও এখনো দেখে নি।"

"বিয়ে ঠিক হ'য়ে গিয়েছে বুঝি?"

"হাঁ, আসছে মাসের তিন তারিখে বিয়ে। আর মাত্র সাত দিন বাকী। ওদের জন্যই তিন তালাটা তৈরি হচ্ছে। প্রসাদের কোম্পানীটা মাসিক পাঁচ শো টাকা ভাড়া দেবে।"

"কোথায় বিয়ে ঠিক হ'ল?"

"আমাদের ঠিক সমান ঘর হ'ল না। রীণার বাবা ইউনিভারসিটিতে অধ্যাপনার কাজ করেন। পাঠ্য বই লিখে প্রচুর পয়সা করেছেন। আমরা কিছুই চাই নি। শুনলুম হাজার পঞ্চাশ খরচ করবেন। মেয়েটি বি-এ পড়ছে। এঁদের মধ্যবিত্তই বলা চলে।"

"মেয়েটিকে প্রসাদ একবার দেখলেই তো পারত।"

"মেয়ে দেখবার কৌতূহল আর ওর নেই। রীণার বাবা ডক্টর মজুমদার প্রসাদের কথা শুনে অবাক হ'য়ে গিয়েছেন। এককোটিতে আজকাল এমন ছেলে একটিও পাওয়া যায় না। রীণার জন্য

পাত্র খুঁজতে তিনি তো ভারতবর্ষের কোনো বাজারই বাদ রাখেন নি। মেয়ে দেখার ব্যাপারে প্রসাদ কি বলেছিল জানো?"

"আজ্ঞে না।"

রুমাল বার ক'রে হাতের চেটো মুছতে মুছতে মিসেস মিত্র বললেন, "প্রসাদের কাছে যখন ডক্টর মজুমদার মেয়ে দেখার প্রস্তাব করলেন তখন সে বলল, 'আমি দেখব না। মায়ের যদি পছন্দ হয় তা হ'লেই আমি খুশী হবো।' এখন তোমরা সবাই বিচার ক'রে বলবে আমার পছন্দটা প্রথম শ্রেণীর হয়েছে কি না। বড় ভাল মেয়ে রীণা। দেখে মনে হয় এখনো কারো প্রেমে পড়ে নি। সত্যিকারের কুমারী।" হেসে উঠলেন মিসেস মিত্র।

আমার আর বসবার দরকার ছিল না। বসলে লাভ হতো না কিছু। উঠে পড়লুম আমি। বললুম, "প্রসাদকে বলবেন আমি ওর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলুম। বিশেষ কিছু কাজ ছিল না। অনেকদিন দেখা হয় না তাই।"

"তোমার ঠিকানা জানে তো সে?"

"হ্যাঁ। বার কয়েক আমার স্টুডিওতে গিয়েছে। ফিরতে ওর খুব রাত হয় বুঝি আজকাল?"

"বোধ হয় কাজ বেড়েছে অনেক। আমি একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। রাত্রিতে ওর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয় না।" আমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত হেঁটে এলেন প্রসাদের মা। আর কোনো কথা হল না। সিঁড়ির দু'দিকে দেয়ালের গায়ে গোটা কয়েক ছবি টাঙানো রয়েছে। ক্যানেভাস কেটে ছবিগুলো বাঁধিয়ে এনেছেন মিসেস মিত্র। পার্ক স্ট্রীটের একটা বড় দোকান থেকে ফ্রেম করানো। খুবই দামী ফ্রেম। পয়সা খরচ করতে হয়েছে। কেনই বা করবেন না? ছবিগুলো তো পয়সা দিয়ে কিনতে হয় নি। পয়সা দিয়ে ক'টা লোকই বা ক্যানেভাস কেনে!

প্রসাদের সঙ্গে দেখা হ'ল না ব'লে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। সত্যিই টাকার খুব দরকার ছিল। আগামীকাল সকালে কিছু টাকা আমার হাতে আসা চাই। ছ'মাস ভাড়া দিতে পারি নি। বাড়িওয়ালাকে বলেছি তিন মাসের ভাড়া কাল সকালে গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব।

প্রিটোরিয়া স্ট্রীট ধরে ক্যামাক স্ট্রীটের দিকে হাঁটছিলুম। খুব ধীরে ধীরেই হাঁটছিলুম। হঠাৎ যদি রাধাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় তো জরুরী কাজটা শেষ করে যেতে পারব। রোজই সে রাত করে ফেরে জানি, কিন্তু আজ হয় তো তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে। দু' একদিন কি মানুষের শ্রান্তি আসে না? আর সাতদিন পরে ওর বিয়ে। হয় তো এখন আর মেয়েদের নিয়ে হোটেলে ব'সে সময় নষ্ট করবে না প্রসাদ। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে আজ। এই ভেবে মোড়ের মাথায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি।

আগামীকাল সকালে অন্তত শ তিন টাকা আমার দরকার। প্রসাদ তো একখানা ছবি আমার কিনতেই চেয়েছিল। হাজার টাকার ছবি তিন শো টাকাতেই বিক্রি ক'রে দেব আজ। ওদের কাছে তিন শো টাকা তো কিছুই নয়। তিনতালা তৈরি হচ্ছে। বসবার ঘরের যে-কোনো একটা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলে ঘরের সৌষ্ঠব যে একটু বাড়বে তাতে আর সন্দেহ নেই। শিক্ষিত লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে ওর। হয় তো রীণার চোখেও ছবিটা ভাল লাগবে।

প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে গত আধ ঘণ্টার মধ্যে একখানা গাড়িও ঢুকল না। দু' চারখানা বেরিয়ে

যেতে দেখলুম, কিন্তু ঢুকতে দেখলুম না একখানাও। বোধ হয় এখানকার বাসিন্দেরা সবাই বেশি রাত ক'রে বাড়ি ফেরেন। শুনে এলুম অফিসে এঁদের হাড়ভাঙা খাটুনী। ফেরবার মুখে ক্লাব কিংবা হোটেলে ঢুকে ঘণ্টা করেক বিশ্রাম করেন এঁরা। ঘোড়ের মাথায় শুধুশুধি অপেক্ষা ক'রে লাভ নেই। সাতটা বেজে গিয়েছে। কি করি, কোথায় যাই ভেবে ঠিক করতে না পেরে স্টুডিওর দিকেই হাঁটতে লাগলুম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে স্টুডিওতে ব'সে ছবি আঁকাই ভাল। একটা 'নিউড' প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। প্রসাদের চোখে এটাই ভাল লেগে যেতে পারে। হয় তো এর মধ্যেই নারী-দেহের প্রতি কৌতূহল ওর শেষ হ'য়ে যায় নি। স্টুডিওতে ফিরে এসে কাজ করতে বসলুম আবার।

বোধ হয় এক ঘণ্টা পরেই গাড়ির আওয়াজ পেলুম আমি। মনে হল এটা প্রসাদেরই গাড়ি। গত এক ঘণ্টার মধ্যে এক বিন্দু রং-ও আমি খরচ করি নি। প্রতি মুহূর্তে ওরই আগমন প্রতীক্ষায় তুলি হাতে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সেছিলুম। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে নিজেই গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালুম। ওকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসবার জন্য কোনোদিনই ব্যস্ততা দেখাই নি। আজকে কিন্তু ব্যস্ততার হাজার চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল আমার প্রতি পদক্ষেপে। দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। কাণ পেতে রাখলুম সিঁড়িতে ওর পা-এর আওয়াজ শুনতে পাই কি না। মিনিট দুই অপেক্ষা করার পর ফিরে এলুম ঘরে। রাধাপ্রসাদের গাড়ি ওটা নয়।

ঐ ছবিটাই আবার আমি আঁকতে বসলুম। আঁকতে আঁকতে তন্ময় হ'য়ে গেলুম। ঘণ্টা দুই পরে মনে হ'ল ক্যানভাসের ওপর একটি জীবন্ত নারীকে সৃষ্টি করেছি আমি। রং-এর বন্ধন কাটিয়ে উঠেছে সে। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্তিম। শিরাউপশিরায় তার উত্তপ্ত মৃগ-মদ প্রবলবেগে প্রবাহিত—প্রতীক্ষমানা প্রিয়তমের সঙ্গকামনায় আবেগ চঞ্চল। এ-ছবি প্রসাদকে পাগল করে দেবে। দাম দিতে দ্বিধা করবে না সে। হাজার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এমন নারী-দেহ রাধাপ্রসাদ চোখে কখনো দেখে নি। ঝুঁকে বসে ছবিটাকে শেষ করতে লাগলুম। রাধাপ্রসাদ আসবে। এখন মাত্র রাত দশটা, ক্রি স্কুল ষ্ট্রীট এই সময়ে জড়তা কাটিয়ে উঠল। মদিরেক্ষণার চোখে মত্ততার প্রথম প্রহর। রাধাপ্রসাদ আসবেই।

কখন যে রাত শেষ হ'য়ে গেল টের পেলুম না। পূবের জানালা দিয়ে আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। চমকে উঠলুম আমি। ভোরের আলোয় ছবিটাকে কুৎসিত মনে হচ্ছে। কল্যাণের চিহ্ন কোথাও নেই। এ শুধু রাতের পণ্য—অবিক্রিত রক্ত মাংসের মতো হতাশায় পংকীল। আমি বোধ হয় শুধু রাধাপ্রসাদকে আকৃষ্ট করবার জন্যই সারা রাত বসে ছবি এঁকেছি।

এটাও অবিক্রিত রইল।

[দুই]

সাতদিন পর বীণার সঙ্গে রাধাপ্রসাদের বিয়ে হয়ে গেল। পাত্রের আয়ের কথা সবারই জানা ছিল। রূপ দেখেও খুশী হলেন সবাই। বীণা যে অত্যন্ত ভাগ্যবতী সে সম্বন্ধে কারো আর সন্দেহ রইল না। বরের বন্ধু হিসেবে আমিও খানিকটা সম্মান পেলুম সেখানে। বিরাট জনসমাবেশের

মধ্যে তলিয়ে যেতুম না আমি। রাধাপ্রসাদই ভাসিয়ে রাখল আমায়। রীণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

বিয়ের অনুষ্ঠানটা শেষ হ'য়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। ধুতি পরে খুবই অসুবিধা বোধ করছে রাধাপ্রসাদ। জীবনে আগে কখনো সে ধুতি পরেনি। পাঞ্জাবী গায়ে দেয় নি। আমি ওর কাছে কাছেই ছিলুম। একটা চ্যাপ্টা ধরণের হুইস্কির বোতল আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল সে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেই রাধাপ্রসাদ স্নানঘরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও যেতে হ'ল স্নান ঘরের দরজা পর্যন্ত। বোতলটা ওর হাতে তুলে দিলুম আমি। যতদূর মনে পড়ে এক ঘণ্টার মধ্যে বার পাঁচেক স্নান ঘরে ঢুকেছিল রাধাপ্রসাদ। বোতলটা খালি হয়ে গিয়েছিল। রীণা যে টের পায় নি তা নয়। মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়ে বলেই বিয়ের রাত্রে প্রতিবাদ করতে সাহস পায় নি। ভেবেছে, উঁচু সমাজের সবাই বোধহয় একটু আধটু মদ খায়।

কিন্তু এক ঘণ্টা পর ব্যাপারটা একটু জটিল হ'য়ে পড়ল। রীণার মা এলেন আশীর্বাদ করতে। রাধাপ্রসাদ ভেবেছিল শাশুড়ীর সঙ্গে বোধহয় করমর্দন করতে হবে। তারপর কি মনে ক'রে সে একেবারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। শাশুড়ীর পা-এর ধুলো নিচ্ছে সে। আমি দেখলুম রীণার মুখে অসহায়তার ছাপ। ফিসফিস ক'রে আমাকে বলল রীণা, "ওঁকে তো কেউ নাকে খৎ দিতে বলে নি—"

বললুম, "না, না নাকে খৎ দেওয়ার ছেলে সে নয়, ধুলো নিচ্ছে।"

"মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন কেন তবে?"

"বোধহয় শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি গদগদ হয়ে উঠেছে। জীবনে এই তো প্রথম পা-এর ধুলো নিচ্ছে রাধাপ্রসাদ।"

"তা ব'লে এতোক্ষণ প'ড়ে থাকবেন মাটিতে? ছি, ছি—মা কি ভাবছেন বলুন তো!"

আমিও একটু অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলুম। শাশুড়ীর পা জড়িয়ে ধরে পড়ে রয়েছে সে, আর উঠছে না। ভক্তি প্রদর্শনের ইতিহাসে রাধাপ্রসাদ বোধহয় অদ্বিতীয় হ'য়ে থাকতে চায়। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু হ'য়ে পড়ল। রীণার মা সেকেলে মানুষ। কিছুই বুঝতে পারেন নি। তিনি শুধু বলতে লাগলেন, "ভের হয়েছে উঠে বসো বাবা।"

আমি কিন্তু তখন বুঝতে পারলুম, উঠে বসবার ক্ষমতা ওর নেই। এক বোতল কাঁচা মদ পান করবার পর ভক্তির বোঝা মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। আমি গিয়ে ওকে তুলে নিয়ে এলুম। সোফার ওপর বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "প্রসাদ, শরীরটা কি খারাপ লাগছে তোর?" মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানাল সে।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী খুশী হয়েছেন খুব। সারা বাড়ীতে খবর রটে গেল জামাই তাঁর সাহেব হওয়া সত্ত্বেও আদবকায়দায় একেবারে ষোল আনা বাঙালী। রীণাকে বললুম, "বোধহয় সারাদিন উপোস ক'রে আছে। তাই মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছে। এবার খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ুক। আমি চলি।"

রীণা কোনো কথা বলল না। ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। ওর মুখের ভাব দেখে আমার সেদিন মনে হয়েছিল যে, সমান ঘরে বিয়ে হলেই রীণা বোধহয় সুখী হতে পারত। আমার বিশ্বাস, এই কথাটা রীণাও তখন ভাবছিল।

আরও মাস দুই কেটে গেল, রাধাপ্রসাদ আমার স্টুডিওতে আসে নি। আমি নিজেও যাইনি প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে। হাজার দুই টাকার একটা নতুন অর্ডার পেয়েছি। সেটা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলুম। দিন দশ বারো নিরিবিলিতে কাজ করতে পারলে ছবিটা শেষ ক'রে ফেলতে পারব। কিছুদিনের জন্ত আর্থিক সমস্তা থেকে মুক্তি পাব আমি।

মাঝে মাঝে রীণার কথা মনে হয় আমার। ওর সেই বিয়ের রাত্রের অসহায় অবস্থার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রশ্ন ওঠে মনে: রীণা কি সুখী হয়েছে? সুখী হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। প্রসাদকে নিয়ে বিপদে পড়বে রীণা। কিন্তু রীণাকে নিয়ে প্রসাদের কখনো সমস্তা হবে না। হেসে খেলে নিরুদ্বেগে আমোদ-আহ্লাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে সে। স্রোতের সাথী থাকবে একাধিক। সেই ভিড়ের মধ্যে রীণা যদি গা ভাসাতে না চায় তাহলে সুখের সন্ধান করে লাভ কি?

বিয়ের রাত্রিতেই মুখের রেখাগুলো ভেঙে গিয়েছিল রীণার। প্রত্যেকটা রেখা আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। নিজের অজ্ঞাতসারে কাগজের ওপর সেদিন আমি কালি দিয়ে একটা ছবিও এঁকে ফেলেছিলুম। রীণার মুখের সঙ্গে হয়তো মিলবে না, কিন্তু ভাঙা ভাঙা রেখাগুলির প্রচ্ছন্ন ব্যথার রূপ দিয়েছিলাম আমি। আমার বিশ্বাস, রাধাপ্রসাদ আজও তার স্ত্রীর মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে নি। দেখলেও শতসহস্র মুখের মধ্যে সে-মুখটা যে-কোনো একটার মতো মনে হয়েছে ওর কাছে। রীণার বিশেষত্ব চোখে পড়ে নি ওর। এই বিশেষত্বটুকু আবিষ্কার করার মধ্যেই ওদের সুখী হওয়ার মূলমন্ত্রটি লুকিয়ে রয়েছে।

ওরা কেউ আসে নি আমার কাছে। তবুও নিজের স্টুডিওতে ব'সে অদৃষ্ট দুটি চরিত্রের সুখদুঃখের কথা আমি কেন ভেবে মরছি তার মূল কারণ কিছু খুঁজে পাই না। বিস্মিত বোধ করি। কখনো কখনো হতবুদ্ধির মতো তুলি হাতে নিয়ে ইজেলের সামনে ব'সে সময় কাটাই। তারপর এক সময়ে ক্যানভাসের ওপর রেখা টানতে থাকি।

গত দু'দিন ধরে আমি আর কিছুই করি নি। শুধু দুটো চোখ এঁকেছি। চোখ দুটো দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছি। অস্থিরতা কিংবা অসহায়তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। নির্মেঘ আকাশের মতো শান্ত এবং অচঞ্চল। এই শান্ত ভাবটাকে আমার কাছে প্রায় স্কান্ডিকেল মনে হচ্ছে। রীণার চোখ তো এমন। যদি হতো?

মাস পাঁচেক পর দুপুর বেলা আমার স্টুডিওর বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, "সনতবাবু, আসতে পারি?"

নারীকণ্ঠ। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। রীণা না কি? হ্যাঁ, রীণাই তো। প্রসাদের স্ত্রী। পাঁচ মাসের মধ্যে চেহারা বদলে গিয়েছে। ভেঙে চুরে শত টুকরো হয়ে গিয়েছে বললেও মিথ্যা বলা হবে না।

"এসো, এসো—কি মনে ক'রে?" চেয়ার এগিয়ে দিলুম ওকে। ব'সে পড়ল সে। দেরি করলে হয়তো বা প'ড়ে যেতো রীণা। টলছিল। প্রসাদের মতো ওর স্ত্রীও কি মদ খায়? মদের গন্ধ পেলুম আমি। চেয়ারের গায়ে দেহটা এলিয়ে পড়েছে। উঁচু সমাজের মেয়েদের মতো বেশভূষা। মাথায় খোঁপা নেই—চুল কেটে ছোট ক'রে ফেলেছে। স্ল্যাকস্ পরা। ওপরের অংশটায় সামান্ত একটু জায়গা ঢেকে রেখে বাকী সবটাই খুলে রেখেছে রীণা। মনে হয়—সে বুঝি এইমাত্র কবর থেকে

উঠে এল। আমি শিল্পী, আমার চোখে নগ্নতা অশ্লীল ব'লে মনে হয় না। কিন্তু বীণার পুরো দেহটাই আজ আমার কাছে অশ্লীলতার নিকৃষ্ট নমুনা ব'লে মনে হ'তে লাগল।

চোখ-আঁকা ক্যানভাসটা ইজেলের ওপর তুলে নিয়ে এলুম। সেটা সরিয়ে রেখেছিলুম ঘরের এক কোণায়। আমি উঠে বসলুম টুলের ওপর। বীণা সেই যে চোখ বুজে চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়েছিল এখনো ঠিক সেইভাবেই আছে। কোনো প্রশ্ন করলুম না আমি। ব'সে ব'সে রাত্রির কথা ভাবছিলুম। সেই সঙ্গে তুলির আঁচড়ে ভাঙা মুখের পুনর্গঠনের চেষ্টা করতে লাগলুম আমি।

মিনিট পনেরো পর চোখ খুলল বীণা। জিজ্ঞাসা করলুম, "এতো দিন কোথায় ছিলে তোমরা ?"

"ইয়োরোপে। মাস দুই ঘুরে এলুম।" একটু থেমে বীণা প্রশ্ন করল, "আমার চেহারা দেখে ঘৃণাবোধ করছ না ?"

"না।"

"কেন ?"

"আমি শিল্পী। নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলবার ক্ষমতা আমার আছে। আমার তো গড়বারই কাজ, বীণা। প্রণয় কেমন আছে ?"

"খুব ভাল। বিলেতে আমরা পুরো একমাস ছিলাম। সেখানে ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'ল সবচেয়ে বেশি। বিলেতের মাছ ভারতবর্ষের ডাঙায় ভাল থাকে না। তুমি তো ওর সবচেয়ে বড় বন্ধু, না সনত ?"

"কি করে বলি, পরীক্ষা তো দিই নি কখনো। চা আনাব ?"

"দরকার নেই।"

"তা হ'লে দেখছি আপ্যায়ন করবার মতো কোনো জিনিসই এখানে নেই। সিগারেট খাও না কি ?"

"খাই। তুমি কি মনে করবে ভেবে এতোক্ষণ বলাই নি। আমার নিজের কাছেই আছে—" হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বিলেতী সিগারেটের টিন বার করল সে। আমার দিকে এগিয়ে ধ'রে বলল, "আজ বরং তুমি আমার একটা সিগারেট খাও। এখন তো রোজই আসব তোমার কাছে—"

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন ?"

"আর তো আমার কেউ নেই···এই ভাঙা দেহ নিয়ে কার কাছে যাই বলো ? তুমি শিল্পী তোমার কাছে আসব···জোড়া দিতে পারবে ?"

"চেষ্টা করতে পারি।"

"শুধু রং-এর বাহাদুরী দেখালে চলবে না, সনত। রং-এর সঙ্গে ভালবাসার গন্ধ মেশাতে হবে। গল্পটা শুনবে না কি ?"

"কোন্ গল্পটা ?"

"মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে আমি এমন বুড়ী হ'য়ে গেলাম কি ক'রে ?"

"তোমরা বড়লোক, তোমাদের গল্প শুনে আমার কি লাভ ?"

ফস ক'রে উঠে পড়ল বীণা। ইজেলের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এ কার ছবি আঁকছ ? এই চোখ দুটো কার ?"

"আমার এক বন্ধু পত্নীর।"

পাঁচ বছরের গল্প শুনতে আমার সবশুদ্ধ পাঁচ ঘণ্টাও লাগে নি। গত সাতদিন থেকে সে প্রত্যেক দিনই একবার ক'রে আমার এখানে আসছে। ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের বেশি বসে না। তারই মধ্যে অল্প অল্প ক'রে নিজেদের কথা ব'লে যায়। অবান্তর কথা যে থাকে না তা নয়, থাকে। হয়তো অবান্তর কথাই বেশি বলে সে। পরে আমি নিজের, মনে মনে গল্পটা গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। যেটুকু শুনেছি তাতে অবাক হয়েছি অনেকবার। কেন যেন বার বার মনে হয়েছে, শুধু ভালবাসার অভাবটাই ওর সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়। ওর দেহ-মনের অধঃপতনের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ঈর্ষা। ঈর্ষার আগুনে জলে-পুড়ে খাক হ'য়ে গিয়েছে রীণা।

বিয়ের পরে প্রসাদের জীবন-যাপনের পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আসে নি। রাত ক'রে বাড়ি ফিরত সে। মদ্যপানের মাত্রা একটুও কমে নি। রীণা সোপনে খোঁজ করতে লাগল এতো রাত অবধি প্রসাদ সময় কাটায় কোথায়। খোঁজ নেতে অসুবিধে হ'ল না। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে হয় সে হোটেলে যায়, নয়তো ক্লাবে। প্রশ্ন করলে সে নিজেও তাই বলত। এগুলোকে সে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ব'লে উড়িয়ে দিত রীণার কাছে। মেয়েদের সংসর্গ ত্যাগ করবার জন্ত অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছে। তাতে কাজ হয় নি কিছু। হয়তো মধ্যবিত্তদের মতো ঘরের বউ সেজে ব'সে থাকত ব'লে রীণার প্রতি প্রসাদের আকর্ষণ কোনোদিনই গভীর হয় নি। ভাবতে ভাবতে এই ধরণের একটা উপসংহারে এসে একদিন পৌঁছে গেল রীণা। তারপর ভাবল সে, প্রসাদের উপযুক্ত হ'তে হবে। স্বামীর সঙ্গে সেও ক্লাবে এবং হোটেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহুলোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দ্বিধা করল না। উচু সমাজকে নকল করতে গিয়ে অনেক বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলল। অন্ত মেয়েদের সঙ্গে রাধাপ্রসাদ মেশে ব'লে ঈর্ষার আগুনে জলেপুড়ে মরেছে রীণা। এখন রাধাপ্রসাদকে জালিয়ে মারবার জন্ত সেও অন্ত পুরুষদের সঙ্গে মিশতে লাগল। স্বামীকে ঘেঁষিয়ে ঘেঁষিয়ে অন্তের সঙ্গে সিনেমায় যেতো। পিকনিক-এ যাচ্ছে ব'লে পরপুরুষের পাশে ব'সে চ'লে গেছে ডায়মণ্ড হারবার। কাকদ্বীপের ডাক-বাংলোতেও রাত কাটিয়ে এসেছে। ফিরে এসে প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি রাগ করো নি?"

"পাগল! রাগ করব কেন?"

রীণা বলেছিল সেদিন, "বুঝলে সনত, রাগ করা তো দূরের কথা উল্টো, প্রসাদ আমার আদর করতে লাগল। ও যে ঈর্ষায় জলে-পুড়ে মরছে না সেই কথা ভেবে আমি আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম। সব রকমের সংযম হারিয়ে ফেললাম আমি। ওর চেয়েও বেশি মাত্রায় মদ খেতে লাগলাম। হাসিমুখে প্রতিমাসে বিলের টাকা চুকিয়ে দিত সে। এতো কাণ্ডের পরেও ওর মনে এক বিন্দু ঈর্ষারও সৃষ্টি হ'ল না। তেলেবেগুনে জলতে লাগলাম শুধু আমি। সনত, তুমি কি বিশ্বাস করো যার মনে ঈর্ষা নেই, তার মনে ভালবাসাও নেই?"

"হ্যাঁ, ও দুটো ব্যাপার দুটি জমজ ভাই-এর মতো।"

"তাই হবে, তাই হবে। এরপর আমার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না। অনেক দিন যারা এসেছেন দেখা করতে। বসবার ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, শেষ পর্যন্ত দেখা করিনি। সংসারের

সবার প্রতি রাগ আমার। প্রসাদও মদ খায়, মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, অথচ মানসিক লজ্জার কষ্ট পায় না সে—স্বাস্থ্যের অবনতিও ঘটে না। বরং গত ক' মাসের মধ্যে শরীর ওর ভাল হ'ল। নতুন কোনো লোকের সঙ্গে পরিচয় হলে সে ওর বয়স ধরতে পারে না—বলে উনিশ কিংবা কুড়ি।"

"কুড়ি আর ছাব্বিশের মধ্যে তফাৎ কিছু নেই, বীণা।"

"তুমি তো তা বলবেই সনত। তুমি ওর বন্ধু। প্রসাদের চল্লিশ বছর-বয়স হলেও তুমি বলতে কুড়ি আর চল্লিশের মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। নতুন লোকেরা আমায় দেখে বলতে লাগল প্রসাদের চেয়ে বয়সে আমি বড়। এই সব শুনে একদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। ট্রামের তলায় লাফিয়ে পড়বার জন্ত ফ্লাব থেকে বেরিয়েও পড়েছিলাম আমি। জীবনের ব্যর্থতা আর সইতে পারছিলাম না। ভগবানের এ কি রকমের বিচার? প্রসাদের বয়স কমছে, অথচ আমার কেন বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে? ভগবান এর জবাব দিতে পারবেন না জানি। তুমি শিল্পী, তুমি সৃষ্টি করো। তুমি এর জবাব দাও, সনত।"

"দেব, অবশ্যই দেব। আগে চা খেয়ে নাও! বোধ হয় ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।"

"চা? গত ক'মাসের মধ্যেও তো এই সব পানীয় আমি একবারও জিবে লাগাই নি। ছি ছি, করেছ কি সনত? এই সব ছেলেমানুষী হ'ল একটু রঙীন জল কোথা থেকে নিয়ে এলে তুমি?"

"আমি আনি নি, আমার বেয়ারাটা নিয়ে এসেছে। এই সময় আমি একটু ঐ ধরণের হাল্কা পানীয় রোজই পান ক'রে থাকি। পুরনো অভ্যাসটা একেবারে বর্জন ক'রো না, বীণা।"

পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে প্রসাদের স্ত্রী বলতে লাগল, "বেশ, খাচ্ছি। তোমার কাছে তো যুক্তির ব্যবস্থা নেই। শুধু চা খেয়ে কি ক'রে যে সৃষ্টিকার্যের প্রেরণা পাও বুঝতে পারি না। ঐ তো দেখছি একটা উলঙ্গ নারীর ছবি এঁকে রেখেছ। ও হয়নি, সব ভুল। ওটাও একটা চা-এর মতো ছেলেমানুষী পানীয়। প্রসাদ দেখলে হাসতে হাসতে মরে যেতে পারে। অতো বড় একটা অভিজ্ঞ লোকের সামনে ঐ ছবিটা বার ক'রো না, সনত।"

"তোমার কি ধারণা প্রসাদের অভিজ্ঞতা অনেক?"

"তুমি ওর বন্ধু, ওকে তো কচি খোকা বলবেই। থাক, থাক—তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও। প্রসাদ কেন মানসিক লাঞ্ছনায় কষ্ট পায় না, স্বাস্থ্য ওর প্রতিদিনই ভাল হয় কি ক'রে?"

"তোমায় ও এতো বেশি ভালবাসে যে, লাঞ্ছনার কথা ভাবতেই পারে না।"

"তোমার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়—" গর্জন ক'রে উঠল বীণা, "ভালবাসে? এই কথাটার ইংরেজী পরিভাষার সঙ্গেও পরিচয় নেই ওর। থাকলে, ওর বন্ধু বদ্রুয়াকে প্রসাদ খুন ক'রে ফেলতো। খুন ক'রে পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতো। বিচারকের সামনে উপস্থিত হ'য়ে অনুরোধ করত হুজুর, আমায় আপনি ফাঁসি দিন। সন্ধে হ'লেই গলাটা শুকিয়ে আসে। আর এক পেয়ালা চা দাও না, সনত।"

টি-পট থেকে চা ঢেলে দিলুম আমি। এক টানে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়ে বীণা বলতে লাগল, "একদিন ঈর্ষায় একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠলাম। সন্ধের পরে ক্লাবে দেখা হ'ল প্রসাদের সঙ্গে। পাইপ টানতে টানতে বেশ হাসিখুশি মনোভাব নিয়ে ঘরে ঢুকে প্রথমেই আমার দিকে দৃষ্টি দিল সে।

ইশারা ক'রে আমার টেবিলে ডেকে নিয়ে এলাম। বললাম ওকে, 'আজ আমি তোমার বন্ধু বড়ুয়ার সঙ্গে রাত্রের শো-তে সিনেমায় যাচ্ছি।' অত্যন্ত অনাসক্ত সুরে প্রসাদ বলল, বেশ তো—বাড়ি ফিরে তোমার জন্ত অপেক্ষা করে, জেগে থাকব। ঠোঁটে নতুন ক'রে লিপস্টিক মাখাতে মাখাতে বললাম আমি, 'মনে হচ্ছে বড়ুয়া আমায় ভালবাসে। জানো, বড়ুয়া তার বৌ-কে ডিভোর্স করেছে? লোকটা বড্ড বেশি অসুখী ছিল।' খবরগুলো দিলাম ধীরে ধীরে। প্রতিটি কথা এতো স্পষ্ট ক'রে বললাম যে, প্রসাদ মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করল। ওকে চিন্তা করতে দেখে আনন্দের আর সীমা রইল না আমার। ভাবলাম, এতোদিন পর ওর মনে খানিকটা ঈর্ষার উদ্রেক করতে পেরেছি আমি। নিশ্চিন্ত মনে গা এলিয়ে ব'সে একটা সিগারেট ধরালাম। প্রসাদ উঠে পড়ল। আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে বলল সে, 'বড়ুয়ার মতো লোক কাউকে কখনো ভালবাসতে পারে না। তোমার সঙ্গে তামাসা করছে সে। এদের আমি ভাল ক'রে চিনি।' পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিলিয়ার্ড ঘরের দিকে চ'লে গেল প্রসাদ। ওর এই নির্বিকার ভাব দেখে আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। একটু সুস্থ বোধ করার পর মনে হ'ল আমার ওজন কমে গিয়েছে। আমার রক্ত ও স্নায়ু ক্রোধের উত্তাপে লাভা স্রোতের মতো গলে গলে যেন গড়িয়ে চলেছে নর্দমার দিকে। আমি ভেবেছিলাম প্রসাদ গিয়ে বড়ুয়ার টুঁটি চেপে ধরবে। পরস্ত্রীকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাসবার জন্ত কৈফিয়ৎ চাইবে। অন্তত আমার ওপর যে রেগে উঠবে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করিনি আমি। কিন্তু কিছুই হ'ল না। প্রসাদ নির্লিপ্তভাবে মিস খারার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলতে লাগল। ভাবো সনত, এদের সমাজে দেখতাম প্রত্যেকের মধ্যেই এই ধরণের একটা নির্লিপ্তভাব। ডিভোর্স হওয়ার দিনও বড়ুয়াকে দেখলাম দিলীপ মুখুজ্জের সঙ্গে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করছে। দুর্গাপুরে লাখ পঁচিশ টাকার কনট্রাক্ট পেয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করছিল বড়ুয়া। আমি তো বুঝতে পারি না, সংসারই যদি না রইল তা হ'লে টাকা রোজগার করার অর্থ কি। বাবা যদি আমায় দুশো টাকা মাইনের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে বিয়ে দিতেন তাতেও আমি সুখী হতাম।" রীণার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কি যে বলব বুঝে উঠতে পারলুম না আমি। সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষাই বা কই? এতো অল্প বয়সে মেয়েটা কষ্ট পাচ্ছে দেখে খুবই আবেগ চঞ্চল হ'য়ে উঠলুম। রীণার যদি স্বামী না থাকত তা হলে হয়তো বিধবা বিয়েও আপত্তি থাকত না আমার। মাসে দুশো টাকার বেশি রোজগার করার ক্ষমতা আমার অবশ্যই আছে।

সোজা হ'য়ে ব'সে রীণা আবার বলতে লাগল, "আজকের মতো সেদিনও আমি ক্লাব ঘরে বসে চোখের জল ফেলতে লাগলাম। বোঝবার চেষ্টা করছিলাম, প্রসাদ কেন তাদের সমাজের বাইরে এসে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হ'ল। তুমি কি এর কারণ কিছু জানো সনত?"

"জানি। নিজের সমাজের মেয়েদের প্রতি ওর কোনো অনুরাগ নেই। তাদের ও এতো ভালভাবে চিনেছে যে, পাত্রী নির্বাচনের সময় খোঁজ করেছে তোমাদের সমাজে। তুমি বোধহয় একটু ভুল করেছ।"

"কি ভুল?"

"প্রসাদকে কি চিনতে পারো নি।"

"এ কথা কেন বলছ সনত?"

"মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশাটাকে ওরা এক গেলাশ জল খাওয়ার মতো সহজ মনে করে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এক সঙ্গে বুঝি দশ জনের প্রেমে পড়েছে সে।"

"বন্ধুর হ'য়ে ওকালতি করছ করো, আপত্তি করব না। কিন্তু আমি এখন কি করব? ডিভোর্সের কথা তুলব না কি ওর কাছে?"

হাতে ধ'রে সোফা থেকে টেনে তুললুম ওকে। বললুম, "চলো তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। রাত তো কম হয়নি। প্রসাদের সঙ্গেও দেখা ক'রে আসব।"

একটা ইজেলের ওপর চোখ পড়ল রীণার। ছুটে গিয়ে ইজেলের কাছে দাঁড়াল সে। জিজ্ঞাসা করল, "এ ছবি তুমি কেমন ক'রে আঁকলে? এতো সেই অতীতের বিস্মৃতি-প্রায় রীণা মজুমদার!"

"না। এই হচ্ছে ভবিষ্যতের রীণা মিত্র। রাধাপ্রসাদ অনেক টাকা দিয়ে কিনে নেবে এটা।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ ক'রে রইল রীণা। তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে দেহটাকে ভাল ক'রে ঢাকতে লাগল। মনে হ'ল অসংযত বেশভূষার জন্য লজ্জা পাচ্ছে সে। বিস্মৃত-প্রায় রীণা মজুমদার হিল্লোলিত শাখার মতো কেঁপে উঠল বার কয়েক। তারপর অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, "এই তো আমি। এই তো আমার স্বপ্নের নীড়। আমায় তুমি ছেড়ে দিও না, সনত।"

ওর ঘাড়ে হাত রেখে বললুম, "ঈর্ষায় জলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে প্রসাদ। এই ছবিটা ও দেখুক। পুরো দাম দিয়ে ওকে নিতে হবে।"

পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে রাধাপ্রসাদ।

ঘটনাটা ঘটেছিল বছর তিন আগে। সে দিনের পর ওদের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। রাধাপ্রসাদ নিজেও আসে নি। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই জন্য দায়ী আমি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তুম আমরা। বন্ধু বিচ্ছেদ যে কোনোদিন হ'তে পারে তেমন কথা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। পরিণত বয়সে রাধাপ্রসাদের সঙ্গে বন্ধু বিচ্ছেদই ঘটল। কিন্তু সে কি আমার ভুল বোঝে নি? রীণা তো জানে আমার মনে কোনো ক্লেদ ছিল না। ওদের সংসার ভাঙবার জন্য চেষ্টা করি নি।

ঐ স্কুল স্ট্রীটে আজও আমি স্টুডিওতে ব'সে ছবি আঁকি। বাইরের দরজার আওয়াজ শুনলেই অপেক্ষা ক'রে থাকি পরিচিত পা-এর শব্দ শোনবার জন্য। ভাবি, বোধ হয় রীণা এল, নয়তো প্রসাদ —কিংবা দু'জনেই।

শেষ পর্যন্ত ওরা কেউ এল না। রীণার জন্য অনুতাপ করবার সত্যিই কোনো কারণ নেই। বিয়ের রাত্রে চোখ দুটি ওর শিল্পীর চোখে ভাল লেগেছিল। তারপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে-চুরে শত টুকরো হ'য়ে গিয়েছিল রীণা। সেই দুর্যোগের মধ্যে ওকে আমি নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলেছিলাম। নিজের তাতে এক কাণা কড়িও স্বার্থ ছিল না। শুধু প্রসাদের স্বার্থের কথা ভেবেই ছবি এঁকেছিলাম ওর। রাধাপ্রসাদ ভুল বুঝল আমার।

বোধ হয় এই জন্যই স্টুডিওতে বসে আজ ক দিন থেকে কাহিনীটা লিখছি আমি। প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে ডাকবোগে পাঠিয়ে দেব। তা ছাড়া আরও একটা কথা মনে হয়। রাধাপ্রসাদ আজও আমার ছবিটার দাম দেয় নি।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সেদিন সে শুধু শেষের দু'-একটা কথা শুনতে পেয়েছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে রীণার ছবিটাও দেখেছিল প্রসাদ। তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে এসে ছবিটার ওপর হাত রাখল। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "লুকিয়ে লুকিয়ে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে প্রেম করছিস, না?"

জবাব দিলুম না আমি। কস ক'রে পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বার ক'রে প্রসাদ কি যেন চিন্তা করতে লাগল। ভয় পেল রীণা। প্রসাদের পা জড়িয়ে ধ'রে বলেছিল সে, "না, না—সনতের কোনো দোষ নেই। সর্বনাশ ক'রো না··শাস্তি যা দেওয়ার আমায় দাও। তোমার পা-এ পড়ছি - প্রসাদ।" চিৎকার ক'রে উঠল রীণা। আমি গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলুম। বাইরে দাঁড়িয়ে বেয়ারাটা সেদিন কি ভেবেছিল জানি না।

তিন বছর আগের কথা, তবুও মনে হয় ঘটনাটা যেন গতকাল ঘটে গিয়েছে। ভোলবার চেষ্টা করলেও ভোলা যায় না। বোধ হয় ক্রি স্কুল স্ট্রীটের স্টুডিওটা একদিন আমায় তুলে দিতে হবে। যখনি কোনো ছবি আঁকতে যাই তখুনি সেই চোখ দুটো ভেসে ওঠে ক্যানভাসের ওপর। আমার শিল্পকর্মের মূল প্রেরণাই কি তবে রীণা?

সেদিন প্রসাদের পা জড়িয়ে ধরেছিল সে। মিনতি ক'রে বার বার বলেছিল, "সনতের কোন দোষ নেই। আমায় তুমি ক্ষমা করো—তুমি আমার স্বামী। তোমায় আমি ভালবাসি।"

ঈর্ষার আগুনে পুড়ে মরছিল রাধাপ্রসাদ। রীণাকে ভাল না বাসলে সনত কি ক'রে ঐ ছবিটা আঁকল? শুধু একদিনের চোখের দেখা—অথচ রীণার রূপ ও যৌবন ক্যানভাসের ওপর গড়িয়ে পড়ছে যেন! পুরো দেহটাকে তুলির খোঁচায় প্রস্ফুটিত ক'রে তুলেছে। নৈকট্যের সুযোগ না পেলে সনত কি পারত রক্তমাংসের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে?

এই ধরণের একাধিক প্রশ্নের জবাব খুঁজছিল রাধাপ্রসাদ। ঘড়ির কাঁটার মতো মুহূর্তগুলো পার হ'য়ে যেতে লাগল। নৈঃশব্দ্যের বুকে যেন সূচীভেদ্য অন্ধকার। সময় আর কাটতে চায় না। দৃশ্যটা নাটকীয় তাতে আর সন্দেহ নেই। রাধাপ্রসাদ ছবিটা তখনো হাতে নিয়ে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। বোধ হয় ভাবছে, সনত আর বন্ধুয়ার মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান। বন্ধুপত্নীদের মতো প্রাণহীন মানুষ আমি নই। ওরা ভালবাসতে জানে না, ওদের তাই বিশ্বাস করা চলে।

প্রসাদের উত্তেজনা দেখে আমার কিন্তু সন্দেহ হ'ল রীণার পেছনে পেছনে সে বোধ হয় প্রত্যেক দিনই স্টুডিওর বাইরে এসে অপেক্ষা করেছে। কিংবা প্রসাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করবার জন্য রীণাই হয় তো ডেকে নিয়ে এসেছে ওকে।

নৈঃশব্দ্যের নাটকীয়তা আমার কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠল। বললুম, পুরো দাম দিয়ে আমার একটা ছবি তুই কিনতে চেয়েছিলি, প্রসাদ। বিশ্বাস কর এই ছবিটা আমি তোর জন্যই এঁকেছি। আজ আমি পুরো দাম চাই তোর কাছ থেকে। এটা তুই নে।"

কথা বলল না রাধাপ্রসাদ। দাম তো দিলই না। দৃঢ় পদক্ষেপে রীণার ছবিটার সামনে এগিয়ে গেল সে। ছুরিটা বসিয়ে দিল ক্যানভাসের বুকে। মুহূর্তের মধ্যে রীণার দেহটা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেল। মেঝের ওপর ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রাধাপ্রসাদের স্ত্রী।

এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুলে দিলুম আমি। আমার তো দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। এটা আর শিল্পের জগৎ ব'লে অনুভব করতে পারছিলুম না। প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের দুটি চরিত্র আমার

এই স্টুডিওর মধ্যে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করল। ওদের সমাজে আমি বাস করি না, তবুও জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়লুম আমি। শিল্প সৃষ্টি করা আমার পেশা—হয় তো শুধু সেই কারণেই রীণাকে আমি মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছিলুম। কিন্তু আজ দেখছি কি স্থূল স্ট্রীটের স্টুডিওতে একটা গল্পেরও সৃষ্টি হ'য়ে গেল। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য মাপ চেয়ে বললুম, "অনেক রাত হ'য়ে গেছে···তুই নিজেও খুব পরিশ্রান্ত, প্রসাদ···"

হঠাৎ দেখলুম রীণাকে জড়িয়ে ধরল রাধাপ্রসাদ। আমারই সামনে আদর করতে লাগল—একবার নয়, বার কয়েক। যেন বহু দিনকার একটা হারানো রত্ন আমার স্টুডিওতে এসে হাতের মুঠোতে পেয়ে গেল সে। মনে মনে ভাবলুম, ছবিটার দাম পাই নি ব'লে আর আমার খেদ নেই। ওরা যদি উভয়ে উভয়কে পেয়ে থাকে তা হ'লে পুরো দাম পাওয়ার সন্তুষ্টি আমি অর্জন করলুম। প্রসাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার সারাজীবনের জন্য পাকা হ'য়ে গেল। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু এই ঘটনাটার তাৎপর্য অবশ্যই বুঝতে পারবে সে।

ওরা আর আমার সঙ্গে একটা কথাও বলল না। পাওয়ার গর্বে রীণার মুখটা দেখলুম ঈষৎ সৌরভোজ্জ্বল। তা হ'লে কি স্বামীর কাছে আমাকে অপরাধী করবার জন্য রীণার মনে কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল? কি জানি কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমি দেখলুম আমার দিকে একটা ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে রাধাপ্রসাদ আমার স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে গেল রীণা মিত্র।

ছেঁড়া ক্যানভাসের টুকরোগুলো শুধু প'ড়ে রইল আমার কাছে।

কাহিনীটা লেখা শেষ হ'য়ে গিয়েছে। আগামীকাল ডাকযোগে প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে পাঠিয়ে দেব ভাবছি। এটা পড়লে রাধাপ্রসাদ হয় তো আমাকে বুঝতে পারবে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, রীণা ইচ্ছে ক'রেই ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্যের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। আমার মনোভাবটা প্রসাদের কাছে স্পষ্ট নয়, আবছা। এতো দিনে ওরা নিশ্চয়ই দুর্যোগের রাতটা পার হ'য়ে এসেছে। আমার রাতটাই শুধু শেষ হচ্ছে না। নিজের অন্তরে অশান্তির দংশন আজও আমি অনুভব করি। রীণা যেন আমার চিরদিনের জন্য এই স্টুডিওটার মধ্যে বন্দী ক'রে রেখে গেল।

গতকালই স্টুডিওটা খালি ক'রে দিয়েছি। আজ এসেছি দেখতে প্রয়োজনীয় জিনিস কিছু ফেলে গেলুম কি না। তা ছাড়া ঘরের চাবিটা বাড়িওয়ালার দারওয়ানকে কাল দিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলুম। ওদের তালাচাবি বাড়িওয়ালাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

ঘরখানা বেশ বড়ই ছিল। এই ভাড়ায় আজকাল এই অঞ্চলে আর এতো বড় ঘর পাওয়া যায় না। পেশাদার শিল্পীর পক্ষে বার বার ঠিকানা বদলানো ক্ষতিকর।

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম ঘরখানা। শূন্যতার খোঁচা লাগল না গায়ে। আসবাবপত্র কিছুই নেই। মনে হ'ল স্মৃতির জঞ্জালে ঘরখানা ভর্তি হ'য়ে আছে। ছুরি দিয়ে কাটা ক্যানভাসের টুকরোগুলো ঝরা পাতার মতো প'ড়ে রয়েছে মেঝের ওপর। কাল নতুন ভাড়াটে আসবে। ঝেড়ে পুছে পরিষ্কার করবার দায়িত্ব তাদের, আমার নয়। আমি জানি, টুকরোগুলোকে সারাজীবন ধরে জোড়া দিতে গেলেও রীণাকে আর গড়ে তোলা যাবে না।

বেরিয়ে যাচ্ছিলুম, এমন সময় ঘরে ঢুকল রীণা। কি ব্যাপার, তিন বছর পর হঠাৎ আবার রীণা এসে উপস্থিত হ'ল কেন?

আমায় নেমন্তন্ন করতে এসেছে। আগামীকাল ওর ছেলের মুখে ভাত। রীণা মা হয়েছে। হাসিতে খুশীতে ভরপুর। বাচ্চাটাকে আমার দিকে ঝুলে ধ'রে বলল, "ওকে আশীর্বাদ করো, সনত।"

স্টুডিওটা আজ এতো কাল পরে কেন ছেড়ে দিচ্ছি সে সম্বন্ধে একটাও প্রশ্ন করল না সে। বোধহয় পুনরোজ্জীবিত অতীতটাকে ভয় পায় প্রসাদের স্ত্রী। কিন্তু সেকথা ভেবে সান্ত্বনা পেলুম না আমি। জিজ্ঞাসা করলুম, "বড়ুয়াদের সঙ্গে আজকাল দেখা হয় না?"

হাল্কা হাসির দোলায় দুলতে দুলতে রীণা বলল, "খুব দেখা হয়। টোকিও গিয়েছিল বড়ুয়া মিস মহলানবীশকে বিয়ে ক'রে এনেছে।"

কাহিনীটা প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে আর পাঠানো হয় নি। হয়তো নতুন যোগাযোগের সৃষ্টি হ'তে পারে। রীণাকে যে আমি ভালবাসি না তা কি এই কাহিনীটা প'ড়ে বুঝতে পারত প্রসাদ?

নেমন্তন্ন রক্ষা করতে প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে আমি যাই নি। ঈর্ষার রহস্যময় জগতে ঘুরে বেড়াক রাধাপ্রসাদ। ভালবাসুক রীণাকে। দুর্যোগের রাত্রিটা শুধু আমার জীবনেই চিরস্থায়ী হ'য়ে থাক।

দীপক চৌধুরী

আনুমানিক ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 'সখী সমিতি' নামে এক স্ত্রীসভা স্থাপিত হয়। ঐ সমিতির পক্ষ থেকে একবার 'বসন্ত উৎসব' সীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বসন্ত উৎসবের ব্যাপার। কাজেই বনভূমি থাকবে, এমন কি জ্যোৎস্না থাকবে, রাশি রাশি আলো আর হাসি থাকবে।

অতএব বাঁশের আফরির ফাঁকে ফাঁকে শুকনো ঘাস গুঁজে হোল বনভূমি আর তার মাঝে মাঝে ডিমের খোলায় প্রদীপ জেলে হোল আলোর উৎসব।

কিন্তু আগুন ও ঘাস পরস্পরকে কাছে পেয়ে একটু বেশি আনন্দ করে ফেলল, এখানে ওখানে আগুন জ্বলে উঠল।

তখন হৈ হৈ ছুটোছুটি, মেয়েরা বালতি বালতি জল ঢালতে লাগল। বাস্তবের অনুকরণ অধিকমাত্রায় হয়েই এই বিপদ।

॥ শান্তিনিকেতন ॥

"বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম" এবং "বিশ্বভারতী" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য এবং কল্পনা কী ছিল তা ৺সতীশচন্দ্র রায় লিখিত "গুরুদক্ষিণা" নামক ছোট্ট একটি বই-এর ভূমিকা থেকে জানা যায়। ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত। এই ভূমিকাতেই আছে "বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম" এবং "বিশ্বভারতী" সম্বন্ধে তাঁর উদ্দেশ্য এবং কল্পনার কথা। "গুরুদক্ষিণা" আজকাল দুর্লভ সেইজন্যই তার ভূমিকাও এখন অনেকের দৃষ্টির বাইরে। এই ভূমিকায় "নালন্দা" বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় রবীন্দ্রনাথের উক্তি হতেই সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে পারা যায় বিশ্বভারতী (বিশ্বভারতী সোসাইটি) সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাই বা কী ছিল। শুধু তাই নয় এই ভূমিকায় ৺সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর উক্তি থেকে এটাও বুঝতে পারা যায় একটি ভাল শিক্ষকের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর কল্পনা কিরকমের ছিল। এই ভূমিকাটি পাঠ করলেই পাঠকবর্গ বর্তমান "বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের" পটভূমির পরিচয় পাবেন। ভূমিকাটি উদ্ধৃত করবার আগে ৺সতীশচন্দ্রের পরিচয় অতি সংক্ষেপে দেওয়া সঙ্গত মনে করি। পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ বরিশাল জেলার উজীরপুর গ্রামে জন্মেছিলেন সতীশচন্দ্র বিখ্যাত জমিদার বংশে। তাঁর পিতা ছিলেন ৺উমেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী, মাতা ৺সত্যভামা রায় চৌধুরী। সতীশচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই জমিদার সুলভ মনোবৃত্তি বিবর্জিত ছিলেন এবং ছিলেন সরস্বতীর ভক্ত। সতীশচন্দ্র যখন জন্মেছিলেন সে পরিবার থেকে লক্ষ্মী তার বহুপূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছিলেন—রেখে গিয়েছিলেন ঐশ্বর্যের কঙ্কাল রাজবাড়ী স্বরূপ প্রকাণ্ড প্রাসাদ। যে প্রাসাদে আর্থিক দৈন্য প্রতিদিন নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণিত করত বিবিধ বেদনাদায়ক, দুঃখ দায়ক পরিস্থিতির মধ্যে। সতীশচন্দ্রকে স্পর্শ করেনি এই আর্থিক দৈন্য কারণ অন্তর পরিপূর্ণ ছিল, সরস্বতীর আশীর্বাদ সম্পদে। সতীশচন্দ্র বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়ন কালেই চলে এসে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকরূপে যোগদান করেছিলেন। এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মাত্র একুশ বৎসর বয়সেই বসন্ত রোগে—সতীশচন্দ্রের জীবন প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। বাকী পরিচয় ভূমিকাতেই আছে। "গুরু দক্ষিণা"র ভূমিকার প্রয়োজনীয় অংশ—

"জীবনে যে ভাগ্যবান পুরুষ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। তাহাকে যেমন হারাই, তেমনি লাভও করি। মৃত্যু তাহার চারিদিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার চরিত্র তাহার কীর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব প্রতিমার মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে জীবনে দৈব শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, অথচ অমরতা লাভের পূর্বেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাখিয়া যাইতে পারিল না। যাহারা তাহাকে চিনিয়াছিল, তাহার বর্তমান অসম্পূর্ণ আরম্ভের মধ্যে ভাবী সফল পরিণাম পাঠ করিতে পারিয়াছিল, যাহারা তাহার বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের বিচ্ছেদ বেদনার মধ্যে একটা বেদনা এই যে, আমার শোককে সকলের সামগ্রী করিতে পারিলাম না। মৃত্যু কেবল ক্ষতিই রাখিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে। সে তাহার যে অল্প কয়েকটি লেখা রাখিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভার প্রমাণ এমন নিঃসংশয় হইয়া ওঠে নাই যে, অসঙ্কোচে তাহা পাঠকদের

কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে আত্ম মহিমা প্রকাশ করিতে পারে। কেহ বা তাহার মধ্যে সৌরবের আভাষ দেখিতে পারেন, কেহবা নাও দেখিতে পারেন, তাহা লইয়া জোর করিয়া আজ কিছু বলিবার পথ নাই। কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহ মাত্র করিতে পারে না যে, সতীশ বঙ্গ সাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে মিটিত না।

আপনার দেয় সে দিয়া যাইতে সময় পায় নাই, তাহার প্রাপ্য তাহাকে এখন কে দিবে? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্বের উদ্দেশে সকলের সমক্ষে শোক সন্তপ্ত চিত্তে আমার শ্রদ্ধার সংঘ্য দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার অনুপম হৃদয় মাধুর্য তাহার অকৃত্রিম কল্পনা শক্তির মহার্ঘতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরেই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল। এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না। তাহার চরিত্রের মহত্ব কেবল আমারি স্মৃতির সামগ্রী করিয়া রাখিব সকলকে তাহার ভাগ দিতে পারিব না, ইহা আমার পক্ষে দুঃসহ।

সতীশ যখন প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিল, সে অধিক দিনের কথা নহে। তখন সে কিশোর বয়স্ক কলেজে পড়িতেছে সঙ্কোচে সম্ভ্রমে বিনয় মুখে অল্পই কথা।

কিছুদিন আলাপ করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষ বিস্তার করিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের মধ্যে ব্রাউনিং তখন সতীশকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। খেলাচ্ছলে ব্রাউনিং পড়িবার জো নাই। যে লোক ব্রাউনিংকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সে হয় ফ্যাসানের খাতিরে নয় সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ বশতই একাজ করে। আমাদের দেশে ব্রাউনিংএর ফ্যাসান বা ব্রাউনিংএর দল প্রবর্তিত হয় নাই। সুতরাং ব্রাউনিং পড়িতে যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

যে সময় সতীশের সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ে বোলপুর ষ্টেশনে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত "শান্তিনিকেতন" নামক আশ্রমে আমি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজ বংশীয় বালকগণ যেভাবে যে প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেইভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্তমান প্রচলিত পাঠ্য বিষয়-গুলিকে শিক্ষা দিব এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরু-শিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক শুদ্ধ শুচি সংযত শ্রদ্ধাবান হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবে, এই আমার সংকল্প ছিল।

বলা বাহুল্য, এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওয়াই কঠিন যাঁহারা অধ্যাপনা কার্যকে যথার্থ ধর্মব্রত স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন।

অথচ বিদ্যাকে পণ্যদ্রব্য করিলেই গুরু-শিষ্যের সহজ সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায় ও তাতে এরূপ বিদ্যালয়ের আদর্শ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীত স্বরে কহিল 'আমি বোলপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য ?"

তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই, সে আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না। বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল। ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ হইতে কিরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের হৃদয় অনেক দিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।

কল্পনা ক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে দূরকে সমগ্রকে দেখিতে পায় না—প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে সমস্ত ভাঙা-চোরা জোড়া-তাড়া বিরোধ বিকার অসামঞ্জস্য-অনিবার্য তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্বক ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, যাহার মানসী মূর্তির সহিত কর্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, প্রতিদিনের তুচ্ছাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে—কাজও করিতে হইবে নিজের শক্তিতে, তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।

বিধাতার বরে সতীশ অকৃত্রিম কল্পনা সম্পদ লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে সহজে দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি ভিখারী শিবের কেবল বাঘছাল এবং ভস্মলেপটুকুই দেখিতে পায়, সে দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া যায় —সংসারে শিব তাঁহার ভক্তদিগকে ঐশ্বর্যের শিক্ষা বিতরণ করিয়া আহ্বান করেন না—বাহ্যদৈন্যকে ভেদ করিয়া যে লোক এই ভিক্ষুকের রজত গিরি সন্নিভ নির্মল ঈশ্বর মূর্তি দেখিতে পান তিনি-ই শিবকে লাভ করেন ভূজঙ্গ বেষ্টনকে তিনি বিভীষিকা বলিয়া গণ্য করেন না এবং এই পরম কাঙালের রিক্ত ভিক্ষা পাত্র আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করাকেই চরম লাভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মকে অন্তরালে কর্মচেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিব মূর্তি দেখিতে পাইতেন। তাঁহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল। সেইজন্য এতো অল্প বয়সে এই শিশু অনুষ্ঠানের সমস্ত দুর্বলতা অপূর্ণতা সমস্ত দীনতার মধ্যে তাঁহার উৎসাহ-উদ্যম অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নাই। বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে গুটি কয়েক বালককে প্রত্যহ পড়াইয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনার বিষয় ছিল না, লোক চক্ষুর বাহিরে, সমস্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি ও আত্মনাম ঘোষণার মদ মত্ততা হইতে বহুদূরে একটি নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালীর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে দিয়া আপন তরুণ জীবনতরী যে শক্তিতে সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চলিয়াছিল তাহা খেয়ালের জোর নয়, প্রবৃত্তির বেগ নয়, ক্ষণিক উৎসাহের উদ্দীপনা নয়—তাহা তাহার মহান আত্মার স্বতঃপূর্ণ আত্মপরিতৃপ্ত শক্তি।

বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্বন্ধেই সতীশকে আমি নিকটে পাইয়াছিলাম, তাহার অন্তরাত্মার সহিত আমার যথার্থ পরিচয় ঘটিতেছিল।

এই বিদ্যালয়ের কল্পনা আমার মনের মধ্যে যে ভাবের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া না বলিলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার কোনো বন্ধুকে আমি এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটির রচনা করিয়া পত্নী, বালক-বালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যাত্ম অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকা যুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য অশন বসনের প্রয়োজনকে খর্ব করিয়া করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্মল আসনের উপর তপোনিয়ত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে, যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধন পীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত; আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি; সনাতন ব্রাহ্মণতা এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক; কে আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারী, কে আমাদের ভাইসরয়—কে কোন্ আইন করিল এবং কে সে আইন উল্টাইয়া দিল, আমরা সে খবর রাখি না। আকাশ তাহার গ্রহতারা মেঘ রৌদ্রে এবং প্রান্তর তাহার তৃণ-গুল্মে ও ঋতু পর্যায়ে আমাদের প্রাত্যহিক খবরের কাগজ। আমাদের তপোবনবাসীদের জন্মমৃত্যু বিবাহের অনুষ্ঠান পরম্পরা, এখানকার নিভৃত শান্তি ও সরল সৌন্দর্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা গোধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে, এবং বালিকারা গো-দোহন কার্য সারিয়া কুটীর প্রাঙ্গনে, গৃহকার্যে শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।

'জানি, আলোকের সঙ্গে ছায়া আসে, স্বর্গোদ্যানেও সয়তানের গুপ্তসঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া কি আলোককে রোধ করিয়া রাখিব, এবং স্বর্গের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি সয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শ মাত্রই 'মিলেনিয়ামের' দুরাশা বলিয়া পরিহাসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সঙ্কল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি আমাদের স্বাধীনতা, ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। নহিলে আমরা আশ্রয় লইব কোথায়, আমরা বাঁচিব কি করিয়া, আমাদের মাথা তুলিবার স্থান তো নাই-ই, মাথা রাখিবারও স্থান প্রত্যহ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রবল ইউরোপ বন্যার মত আসিয়া আমাদের সমস্তই পলে পলে তিলে তিলে অধিকার করিয়া লইল। এখন নিরাসক্ত চিত্ত, নিষ্কাম কর্ম, নিঃস্বার্থ জ্ঞান এবং নির্বিকার আধ্যাত্মক্ষেত্রে আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে। সেখানে সৈনিকদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই, বণিকদের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা

নাই, রাজপুরুষদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ নাই—সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাহিরে, সকল অগৌরবের উর্দ্ধে।

আমার এই চিঠি পড়িয়া অনেকের মনে অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে তাহা আমি জানি। তাঁহারা বলিবেন, "বর্ত্তমান কাল যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে অতীত কালের মধ্যে পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিব, ইহা কাপুরুষের কথা।"

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রসঙ্গ ক্রমে এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চলেনা। সংক্ষেপে এইটুকু বলিব, ভারতবর্ষের নিত্য পদার্থটি যে কি, বাহির হইতে প্রবল আঘাত খাইয়া তবে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি। এমন অবস্থায় সেই নিত্য আদর্শের দিকে আমাদের অন্তরের একান্ত যে একটা আকর্ষণ জন্মে, তাহাকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য।

আর একটি মাত্র কথা আছে। আমি যে তপোবনের আদর্শকে অতীত কাল হইতে সকল করিয়া মনের মধ্যে দাঁড় করাইতেছি, সে তপোবনে সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় লইতে পারেনা—ত্রিশকোটী তপস্বী কোন দেশে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ আছে। একথা সত্য বটে। কিন্তু সকল দেশের আদর্শই সে দেশের তপস্বীর দলই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া জানেন, তাহার সাধনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েক জনেই করিয়া থাকেন, বাকি অধিকাংশই আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত। অথচ কয়েক জনের সাধনাই সমস্ত দেশকে সিদ্ধি দান করে। ভারতবর্ষও আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুক্তিতেই মুক্তি লাভ করিবে—কয়েকটি তপোবন সমস্ত দেশের অন্তরের বন্ধু মোচন করিয়া দিবে।

যাহাই হউক, আমার সঙ্কল্পটিকে এতক্ষণ কেবলমাত্র কল্পনার দিক হইতে দেখা গেল। বলাবাহুল্য কাজের দিক হইতে যা প্রকাশ পাইতেছে, এরূপ সুশোভন এবং সুষমা বিশিষ্ট নহে। কোথায় তপস্বীর শিষ্যদল, কোথায় সার্থক ব্রহ্মজ্ঞানের অপরিমেয় শান্তি, কোথায় একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের সৌম্য-নির্ম্মল জ্যোতিঃপ্রবাহ তবু ভারতবর্ষের আহ্বানকে কেবল বাণীরূপে নহে, কর্ম্ম আকারে কোথাও বদ্ধ করিতেই হইবে।

বোলপুরের প্রান্তরের প্রান্তে সেই চেষ্টাকে আমি স্থান দিয়াছি। এখনো ইহা রূপান্তরিত বাক্য মাত্র, ইহা আহ্বান।

সতীশ, অনাঘ্রাত পুষ্পরাশির ন্যায়, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা বহন করিয়া এই নিভৃতে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া জীবনযাত্রার আরম্ভকালেই সে যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল, তাহা লইয়া একদিনের জন্যও অহঙ্কার অনুভব করে নাই—সে প্রতিদিন নম্র মধুর প্রফুল্লভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইত, সে যে কী করিয়াছিল, তাহা সে জানিত না।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে চারিদিকে অবারিত তরঙ্গায়িত মাঠ—মাঠে লাঙলের আঁচড় পড়ে নাই। মাঝে মাঝে এক জায়গায় পর্ব্বতলগ্ন বুনো খেজুর, বুনো আম, দুই একটা কাঁটাগুল্ম, এবং উইয়ের ঢিবিতে মিলিয়া এক একটা ঝোপ বাঁধিয়াছে। অদূরে ছাতিমবনে ভুবনডাঙা গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ বাঁধের জলরেখা দূর হইতে ইস্পাতের ছুরির মত ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ পাড়ের উপর প্রাচীন তাল গাছের সার কোনো ভগ্নদৈত্যপুরীর ভগ্নপ্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের মাঝে মাঝে বর্ষায় জলধারায় বেগে মাটি কয়িয়া গিয়া নুড়ি বিছানো কঙ্কর স্তূপের মধ্যে বহুতর

গহ্বর ও বর্ষা-স্রোতের বালু বিকীর্ণ জলতল রেখা রচনা করিয়াছে। জনশূন্য মাঠের ভিতর দিয়া একটি রক্তবর্ণ পথ দিগন্তবর্তী গ্রামের দিকে চলিয়া গেছে—সেই পথ দিয়া পল্লীর লোকেরা বৃহস্পতি-বারে রবিবারে বোলপুর সহরে হাট করিতে যায়, সাঁওতালনীরা উলুখড়ের আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে চলে এবং ভাড়াময়র গরুর গাড়ী নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আর্তশব্দে ধূলা উড়াইয়া যাতায়াত করে।

এই জনহীন তরুশূন্য মাঠের সর্বোচ্চ ভূখণ্ডে দূর হইতে কয়েকটি দীর্ঘ এক সারি শাল বৃক্ষের পল্লব ভালের অবকাশ পথ দিয়া একটি লৌহ মন্দিরের চূড়া ও একটি দোতলা কোঠার ছাদের অংশ চোখে পড়ে—এইখানেই আমলকী ও আম্রবনের মধ্যে মধুক ও শাল তরুর তলে শান্তিনিকেতন আশ্রম।

এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র কুটীরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শালতরু শ্রেণীতলে যে কঙ্কর খচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্ধ্বদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত গুরু পরশ্লায়ার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবালোকদলনের অভিঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।

এই সময়ে সতীশ ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের বালকদের জন্য উত্তরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া "গুরু-দক্ষিণা" নামক কথাটি রচনা করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কথা গ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার ভক্তি নিবেদিত তরুণ হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত আশা ও আনন্দ রাখিয়া গেছে। ইহা শ্রদ্ধার রসে সুপরিণত ও নবজীবনের উৎসাহে সমুজ্জ্বল—ইহার মধ্যে পূজা পুষ্পের সুকুমার শুভ্রতা অতি কোমলভাবে অম্লান রহিয়াছে। এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মত রচনা করে নাই—এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছায়া ও সতীশের সদ্য উদ্বোধিত প্রফুল্ল নবীন হৃদয়ে মিলিয়া গানের মত করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

সতীশের জীবনও সম্মুখবর্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নব পরিস্ফুট আশা ও পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২১ বৎসর বয়সে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ—সে দরিদ্রের মত রিক্ত হস্তে জীর্ণ শক্তি লইয়া যায় নাই।

রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের এবং সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণ ও চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার সঙ্গে যাতে পাঠকবর্গের সম্পূর্ণ পরিচয় হয় সেই জন্যই ভূমিকাটির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করলুম। যে অংশ উদ্ধৃত করিনি। তাতে আছে সতীশচন্দ্রের কবিচিত্তের এবং সাহিত্যিক সতীশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা সতীশচন্দ্রের দীর্ঘ একটি চিঠি, এবং সেই চিঠি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাময় উক্তি। গুরুদক্ষিণা আজ আর সহজ প্রাপ্য নয়। সেই জন্যই যেটুকু ভূমিকার অংশ পাঠকদের উপহার দিলাম তাও দীর্ঘ, কিন্তু দীর্ঘ হলেও পাঠকবর্গ বুঝতে পারবেন ১৩১১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সন্তানদের শিক্ষা, শিক্ষার আদর্শ, ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা, কল্পনা কী ধরণের ছিল।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

॥ বাঁশি ॥

এ গল্পে আমার নিজের কোন ভূমিকা আছে কি না তা আমার জানা নেই। তবু নিতান্ত উপায়ান্তর হয়ে নিজের কথাও কিছু কিছু বলতে হবে। ঘটনাটা আমার এক ছাত্রকে নিয়ে।

মুরলীধর আমার ছাত্র। বয়স বারো থেকে তেরোর মধ্যে। অত্যন্ত রোগা। ওর চোখে, মুখে, পা ফেলায়, বসার ভঙ্গীতে, চোখের চাহনিতে, এমনকি কণ্ঠস্বরেও সে বোকামীটা মোটা হরফে লেখা আছে। একেবারে নীরেট।

কিন্তু ছেলেটা ভারী সরল। সে সারল্যটা বানানো নয়। তার স্বভাবের সত্য। আমি তা টের পেয়েছি। আর তাই, তাকে আমি স্নেহ করি।

আমার ঘরে যেদিন ও প্রথম এলো সেদিন ঘরের বিবর্ণ দেওয়ালে অতি যত্নে টাঙান একমাত্র ছবিটার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ও কিছু একটা বলতে গিয়ে অনেকবার থেমে শেষবারে কোনমতে জিজ্ঞাসা করল, এটা কার ছবি স্যার?

আমি খুব অবাক হলাম। সবেরই একটা সীমা আছে—বোকামীরও। এতটা আমি আশা করিনি। তবু বললাম, চিনতে পারছিস না কার।

মুরলী ছবিটা মনোযোগের সঙ্গে দেখল। কিন্তু কিছু বলল না।

বললাম, কি—ধ, রবিঠাকুরের ছবি চিনিস না?

বোকাটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ঘাড় নাড়ল।

—না?

আশ্চর্য জানোয়ার জানে না। অথচ তোর পাঠ্য বইএ ছাপা কালিতে ছাপা রবীন্দ্রনাথের একটা ছোট্ট ছবি আছে, আরো পাঁচজন অনামধন্য সার্থক মহাপুরুষের সঙ্গে। ছোটদের অত্যন্ত অযত্নে ও অমনোযোগে ছাপা আর পাঁচটা বইএ যেমন থাকে আর কি।

কিন্তু সে ছবি দেখে থাকলেও মুরলীর মনে নেই। ওর স্মৃতিশক্তির বালাই নেই বোধ হয়।

এতক্ষণে মুরলী একটা কথা বলতে চাইল। বলল, আমি ভেবেছিলাম স্যার—, কথাটা শেষ না করে চুপ করে চেয়ে রইল।

—কি ভেবেছিলি?

—এটা আপনার দাদুর ছবি।

আমি খুব জোরে হেসে উঠলাম। সে প্রাণ খোলা হাসির সামনে কুণ্ঠিত হবার কিছু ছিল না। তাই মুরলীর সারা মুখে একটা নির্মল সারল্যভরা হাসি চিক্ চিক্ করে উঠল।

বললাম, খাসা বলেছিস। আমার, তোর, বাংলা দেশে যারা জন্মাবে, বাংলা তাদের কথা বলবে, লিখবে, গাইবে তাদের সবাইকার দাদু এই বুড়ো রবিঠাকুর।

সন্দেহ নেই যে সে কিছু বুঝল না। কিন্তু খুসী হল। খুসী হলো কেননা আমি অমন প্রাণখুলে হাসলাম, অত কথা বললাম, এইজন্যে।

বলে রাখা ভালো যে মুরলী যখন খুশী হয়, তা সহজে টের পাওয়া যায় না। এই বয়সের এমন অস্বাভাবিক চাপা প্রকৃতির ছেলে আমি আজও দেখিনি। ও যখন যে কোন কারণে আহত হয় তখন ওর দুচোখ যেন ঝাপসা হয়ে যায়। ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে ওর বুকে কোথাও বেজেছে।

ও যখন আনন্দিত তখন ধরা আরও মুস্কিল। কেননা ওর আনন্দের প্রকাশ খুব সূক্ষ্ম।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে আমার কাছে এসে মুরলী আনন্দ পায়। আমার গলা শুনলে ওর চোখ মুখ কেমন যেন চনমনে হয়ে ওঠে।

ও আমার কাছে আসে। স্কুল বাড়ীর কাছে এক বেল বাংলোর আউট হাউসে আমি থাকি। গৃহ-সমস্যা এখানে দারুণ। কেননা বাড়ী নেই বললেই চলে। কিন্তু আমি অবিবাহিত ও যুবক, সুতরাং আউট হাউসের একলা ঘরে আমায় কুলিয়ে যাবে এবং মানিয়ে নিতে পারব, এই ভরসায় স্কুল কর্তৃপক্ষ আমার জন্য এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অবিশ্যি এটা অব্যবস্থা নয়, কেননা এটা নাকি অস্থায়ী। হয়তো বা।

আমার এই ঘরে আসতে মুরলী গোড়ায় সঙ্কোচ বোধ করত। এখন আর করে না। প্রতিদিন যে কোন একবার, কম করে একটি বার ও এ'ঘরে আসেই। আসে। বসে। ইতি উতি চায়। দু'চারটে কথা বলে। আমি গল্প করলে বেশ কথা বলে। না হলে ছোট জানালা দিয়ে বাইরে চায়। চকচকে আকাশের একটা ফালি কিংবা দূর রেল লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে মাল গাড়ীর এঞ্জিনটা যেখানে একঠায় ধোঁয়া ছাড়ছে, তাই দেখে। আমি বলি, এই, কি দেখছিস হাঁ করে?

—কই, কিছু না তো স্যার,—এমন ভাবে বলে যেন লুকিয়ে কিছু করছিল ধরা পড়ে গেছে।

ওর বোকামি আর সারলা, এ দুয়ে মিলে ওর যে অসহায় ভাব এটা আমায় টানত। তাই স্নেহ সম্ভাষণে কাছে ডেকে আমি ওকে নাড়াচাড়া করতাম। কিন্তু তার ফলে এই বালকের অন্তরে যে একটা বিচিত্র মুক্তির হাওয়া লাগছে তা তো টের পাইনি। টের যখন পেলাম তখন মুরলী আমায় রীতিমত ভালোবেসে ফেলেছে।

সত্যি কথা বলতে কি মুরলীকে নিয়ে আমি জ্বালায় পড়লাম। কেননা যে ছাত্রের বুদ্ধির মহলের বন্ধ দরজা জানালাগুলো খোলা আমার কাজ; তার বুদ্ধির মহল যদি যেমনকার তেমনি থাকে; উপরন্তু অন্তর আন্দোলিত হয়, তাহলে আর কোন শিক্ষকের ভালো লাগে? স্নেহ বড় পবিত্র বস্তু। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক লেন দেনের। তার সঙ্গে স্নেহ মিশলে তা দুর্লভ হয়। লেন দেনের ব্যাপারে মুরলী আমায় কিছু দিতে পারলো না। নভেম্বর থেকে যে পর্য্যন্ত একটানা মনোযোগ দিয়ে, ফাঁকে ওর দিকে অতিরিক্ত নজর দিয়েও কিছু করতে পারলাম না। বিরক্তি লাগল।

তখনকার আমার ঘরে আসা মুরলীর নিত্যকার কাজ হয়ে উঠেছে। আসে। বসে। চলে যায়। আড়াল থেকে ওর বসে থাকার ভঙ্গীটি যদি কেউ চেয়ে দেখে তাহলে একটা খুব চেনা কবিতার অনেকগুলো লাইন মনে পড়ে যাবে। কবি আর কবিতার নামটা না হয় থাক। মোট কথা মুরলীর জন্য আমার দুঃখ হয়।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন ইংরাজী উনিশশো পঞ্চাশের শেষ একান্তর গোড়ার দিক। সেই সবে স্নাতক হয়েছি। অপরাধী আমি। সুতরাং চোখের সামনে বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ তৃণহীন প্রান্তরের মতো পড়ে

আছে। কোথা থেকেও কোন আহ্বান নেই। দু'চার ফোঁটা ঘর্ম দিয়ে আত্মার অবমাননা নিয়তই ক্ষণীকৃত হচ্ছে।

বাঁচোয়া এই যে তখনো আমার বয়স ছিল। জোর ছিল মনে। মানুষকে ভালবাসার যে অভ্যাসে মনে শক্তি আসে তা তখনো আমার সহায় ছিল। পশ্চিম বাংলার পশ্চিম প্রান্তে গ্রামে ঘেরা, সহরের ছায়ার মত এই অজানা অঞ্চলে শিক্ষকতা নিয়ে চলে এলাম।

একমাত্র রেল কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত মানচিত্র ছাড়া আর কোথাও এ অঞ্চলকে একটা বিন্দু দিয়েও চিহ্নিত করা হয়নি। দু'একটি এক্সপ্রেস এখানে দাঁড়ায় বটে তবে তা নিতান্তই মায়া করে। দু'মিনিট যেতে না যেতেই আবার চলে।

জায়গাটার কোন জৌলুষ তো নেই-ই, কোন শ্রীও নেই। স্কুলে শিক্ষকের অকুলান, স্থানের অকুলান, আসবাবের তো কথাই নেই। মাসান্তে যথাবিহিত দক্ষিণাও কোনদিনই যথাসময়ে মেলে না। এসব খবর প্রথম দিনেই পণ্ডিত মশাইর কাছে পেয়েছি। তিনিই গলা বাড়িয়ে শুনিয়েছেন।

অথচ ঘুমের সময়টা এখানেটাও নাকি হাঁক ডাকে জেগে উঠেছিল। চার পাশের কোলিয়ারী আর গ্রামগুলোর মাঝে তাঁবু পাতা ছিল, ব্যারাক তৈরী হয়েছিল সৈন্যদের। এ অঞ্চলটা জেগে উঠেছিল হঠাৎ করে। এসব অনেক অনেক আগের কথা। সেই উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত তার পরমায়ু। হাউইর মত জেগে হুৎকারে মিলিয়ে গেছে। তারপর যে কে সেই। টিম্ টিম্ করে জ্বলছে।

এখানে বর্ষার আকাশখানা কত মেঘ এনেছে তার মাপজোপ করতে হয় স্কুলের হেড মাষ্টার মশাইকে। ধানের ওপর স্কুলের অবস্থা। চাষীর ক্ষেতে ধান হলে তবেই না পড়তে আসবে তাদের ছেলেরা। আকাশ যদি মেপে মেঘ তবেই দুবেলা মাপা চালের ভাত উঠবে। শুধু তো চাষীর ঘরে নয়, আমাদেরও। সত্যি।

তবু একেবারে প্রথম দিন যখন চক্ ডাস্টার নিয়ে ক্লাসের দিকে পা বাড়ালাম তখন কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ জাগল দেহমনে। সামান্য।

প্রথম দিন ছিল পঞ্চম শ্রেণীতে। নিতান্ত বাচ্চা ছেলেরা সব, কচি কচি মুখ। তাদের অপরিচ্ছন্ন পোষাকে, বসায়, গোটা ঘরটায় একটা মেঠো গন্ধ ভাসছে।

আমি কথায় কথায় বললাম, আচ্ছা, এই ক্লাশ থেকে উপরে উঠতে পারো নি এমন কেউ আছো কি?

ভেবেছিলাম কেউ উঠবে না। আমায় অবাক করে তিন চারজন কেশ করা ছাত্র উঠে দাঁড়াল। তাদের বসতে বলে বললাম, আচ্ছা দুবার উঠতে পারোনি, এমন কেউ আছো কি? একটিমাত্র ছেলে উঠে দাঁড়াল। ডানদিকের কোণে শেষের বেঞ্চের ছেলেটি। সবাই বসে আছে। ও একা দাঁড়িয়ে। চোখ নামিয়ে রেখেছে। সেই চোখ নামানো মুখটির দিকে ক্লাসের সব কটি মুখ চোখ তুলে আছে। চোখে মুখে তাদের এক নিঃশব্দ কৌতুক। ওর অগৌরব নিয়ে এদের যেন খেলা।

—তুমি দুবার পাশ করতে পারোনি?

মাথা নেড়ে জানাল, না।

—তিন বার পারেনি স্যার, একটি ছেলে বলে উঠল।

আমি মুরলীকে কাছে ডাকলাম। ওর নাম মুরলীধর মণ্ডল। অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় ওর বয়স কিছু বেশী সেটা বোঝা গেল। মাথার চুলগুলো খুব ছোট করে ছাঁটা। নাকটা চাপা। গায়ের রং

কর্মা। চোখ দুটো ঘোলাটে। গায়ের চামড়া একটু পুরু। যেন বট পাতার মত। গায়ে খাকীর ময়লা হাফ সার্ট। তার বোতাম নেই। বুক দেখা যাচ্ছে। পরণে একটা বেঢপ হাফ প্যান্ট। সেটাও ময়লা।

আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, মন দিয়ে পড়ো। তুমি খুব ভাল শিখবে।

তৎক্ষণে তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। আমি যে ওর সঙ্গে প্রথম দিনেই স্নেহভরা আলাপ করলাম, এই আনন্দে ও আহতই হল বুঝি। ও কাঁদল।

॥ দুই ॥

তার পরের কথা আগেই কিছু বলেছি। আমার ঘরে আসা, বসা ওর নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় রোজই আসে ছুটির পর। ওর সাথীরা সব দল বেঁধে বাড়ী চলে চলে যায়। পথে নিশ্চয় খেলাও করে।

মুরলী আমার ঘরটীতে এসে বসে। যখন রোদ পড়ে আসে, বিকেলটা সন্ধ্যার দিকে ফেরে, তখন ও ওঠে।

সন্ধ্যায় পাঁচটি ছাত্র পড়তে আসে আমার কাছে। সব বিষয়ই পড়ে। মাসান্তে কিছু দেয়। সন্ধ্যাটা কেটে যায়। এই ভাবে শীত গেল, বসন্ত গেল। সেই এক চাকার জীবন। সন্ধ্যার নিঝুম অন্ধকারে মাঝে মাঝে এঞ্জিনের সিটির আওয়াজ; পথ চলতি দু'চারজনের বলখলে গলার শব্দ আমার কানে আসে। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় দরিদ্র শিক্ষকের ঘরে পাঁচটি ছাত্র বিড় বিড় করে।

মাত্র কয়েক মাসেই একটা ক্লান্তি জমে উঠেছে বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় নেই। একদিন ছিল যখন শিক্ষকতায় আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাক, একটা সম্মান ছিল। সে মান গিয়েছে। গিয়েছে যে সেটা জেনেই সবাই নিশ্চিন্ত। তাই হওয়া উচিত, এমনি ধরে নিয়ে সোড়া দেশ বসে আছে। আমি শুনেছি, আমার ছাত্রেরা আমার সম্বন্ধে ভালমন্দ যাই বলুক, যখন আমার উল্লেখ করে, তখন বলে, 'নতুন মাষ্টার'।

আমরা মাষ্টার মশাই বলতাম। ওরা সেটাকে ছেঁটে ছোট করে নিয়েছে।

যাক্ সে কথা। গরমের ছুটি এসে গেল।

বৈশাখের শেষ। দিনগুলো অগ্নিগর্ভ। বাড়ী যাওয়া হবে না ছুটিতে। এখানেই ছুটি কাটাব। কাটাতে হবে। বাধ্য। সন্ধ্যায় ছাত্রেরা যে ঠিক পড়তে আসবে। অতএব উপায় নেই।

রোববারের দুপুর। দরজা জানালা ভেজান। আমার পড়াশোনার বাতিক তখনো শেষ হয়নি। নিজের সংগ্রহে দশ বারোটি বই আছে। মাঝে মাঝে খুলে বসি। সেদিনও বসেছিলাম।

দরজায় খুট্ করে শব্দ হলো। তারপরই দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে একটি তীক্ষ্ণ কিশোরের মুখ আর ততোধিক তীক্ষ্ণ ছায়া ঘরের চৌকাঠে একসঙ্গে এসে দাঁড়াল। মুরলী এসেছে।

—এ কি রে, তুই?

—হাঁ, স্যার।

—বাবা, এই রোদে তুই মোহনপুর থেকে হেঁটে এলি?

মুরলীর মুখটা তেতে লাল হয়ে উঠেছে।

—সন্ধীগরমী হয়ে মরবি যে।

ও একটু ঘিরিয়ে নিল। তারপর কথা সুরু করল। আজকাল ও আমায় এটা ওটা নানা কথা জিজ্ঞাসা করে।

—আপনি পড়ছিলেন স্যার?

—হাঁরে।

—বেশী পড়েন?

বোকাটা আমার দিকে মুখ তুলল।

—পড়বো না? এটা কি যে সে বইরে। একবার পড়লে শেষ হয় না। জীবন তোর পড়তে হয়।

—ওটা কি বই স্যার?

—'কালান্তর'।

বইএর নাম শুনে ও আপনার মনে একটু ভাবল। আঙুলের আগায় অকারণে বিছানার চাদরের কোণাটা জড়াল। তারপর বলল, ওর মানে কি স্যার?

বিপদে পড়া গেল দেখছি। আনমনে ভাবলাম। কেননা রবি ঠাকুর লোকটি যে এই জগতের আন্তর্জাতিকতা, একটি দেশের প্রতি আর একটি দেশের, মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে বহুদিন চিন্তা করে, সেই সব কথা এতে লিখে গেছেন, মানুষ কি ভাবে মানুষ হবে তা বলে গেছেন, একথা তো বাংলা দেশেরই শতকরা পঁচানি জন জানে না, ঘুরলীকে কি বোঝাব!

বললাম, এতে যুদ্ধ, শান্তি, স্বাধীনতা, মানুষ, এই সব কথা আছে।

—ওর মানে বুঝি তাই?

—না। ওর মানে আরও অনেক। তুই মন দিয়ে পড়। বড় হয়ে নিজেই বুঝবি।

ক্রমে ক্রমে দুপুর ফুরাল। বিকেলও যায় যায়। সারাটা দুপুর ঘুরলী অনেক কথা বলেছে। উঠেছে বসেছে। আমায় ঘিরে কখনো কথা বলে, না বলে ঘুর ঘুর করেছে। ওর কিছু একটা বলার আছে অথচ বলতে পারছে না, তা টের পাচ্ছি। দুপুরের নিরিবিলিটুকু মাটি করায় বিরক্ত একটু হয়েছিলাম বৈকি। কিন্তু আমল দিইনি। আহা চল্লিশ দিন দেখা হবে না ছেলেটার সঙ্গে!

বললাম, হাঁরে, বাড়ী যাবি না? এরপর যে অন্ধকার হয়ে যাবে।

জানালার দিকে মুখ করে ঘুরলী বলল, হাঁ স্যার বাড়ী যাব।

এই বলে চেয়েই রইল জানালার দিকে। আমি বললাম, শোন এদিকে তাকা—কিরে, তাকালি?

পিছন ফিরল না। আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, ছুটিটায় খুব মন দিয়ে—

ঘুরলী কাঁদছে।

কাল থেকে সন্ধ্যায় আমার আর পাঁচটী ছাত্রের সঙ্গে ঘুরলীও পড়তে আসবে। এই প্রার্থনাটুকু নিয়ে সে এসেছিল। কিছুতেই বলতে পারেনি। এইভাবে জানাল।

তারপর দিন থেকে সেও আসতে থাকল।

॥ তিন ॥

গরমের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এলো। আর চার কি পাঁচটি দিন মাত্র। সারা ছুটিটা প্রতি সন্ধ্যায় ছাত্রেরা এসে পড়াশোনা করে গেছে। এর জন্য মাসান্তে যা মেলে তা নামমাত্র। মাথাপিছু দশ থেকে বারো। কিন্তু তাও সময়ে মেলে না। তাগাদায় যেতে হয়।

এ মাসে প্রাণকুমার এখনও টাকা দেয়নি। এবং সে গত চারদিন আসছে না।

যাবো কি যাবো না এই নিয়ে দোনামোনা করতে করতে কিছু বেলা হয়ে গেল। অবশেষে যাওয়াই স্থির।

যখন বার হলাম তখন সকাল নটা। এখান থেকে মোহনপুর গ্রাম মাইল তিনেক হবে। দূরে দামোদরের বালি চিক্ চিক্ করছে। রোদের তেজে মাথা পাতা যায় না। ছাতা খুলেছি। মনে মনে ভাবছি, শুধু প্রাণকুমার কেন, ওই সঙ্গে মুরলীর বাড়ীতেও একটা চু দেওয়া যাবে। ছেলেটা যখন আমার কাছে পড়েই তখন কি আর ওর বাপ-খুড়ো সামান্য কিছু দেবে না?

চারপাশে মাটি ফেটে ফেটে গেছে। গাছের পাতায়, মাটির ঘাসে শ্যামলতা নেই। মাঝে মাঝে যে সব পুকুর চোখে পড়ল তাতে জল নীচে নেমে গেছে। মাঠে ছেড়ে দেওয়া দু'চারটে গরু ছায়া ছেড়ে নড়ছে না।

গ্রামের সীমানার কাছাকাছি এসে গেছি। এখানে ইটের গাঁথনির একটা পাঁচিল আছে। পাঁচিলটা এতই হঠাৎ, খাপছাড়া, বেমানান, বিশ্রী, যে চোখে পড়তে বাধ্য। পাঁচিলটা আড়াই মানুষ সমান উঁচু। হাত পঁচিশেক হবে। সেই ঊনচল্লিশ চল্লিশে পৃথিবী যখন দ্বিতীয়বার শক্তির জুয়া খেলছিল তখন দামোদর পার থেকে আসা গোরাদের একটা দল এইখানে তাদের রিভলভারের তাক্ অভ্যাস করত। সেই পথে ডানা ঝাপটাতো উড়ন্ত দু'একটা পাখী। পথ চলতি মানুষের বুক ধ্বক করে কেঁপে উঠত। বারুদের গন্ধ ভাসত হাওয়ার স্তরে।

এই যে বিস্তীর্ণ ধানের জমি, যুদ্ধের প্রয়োজনে তখন এতে আবাদ হয়নি। কাঁটা তারের বেড়া পড়েছিল। রাস্তা কাটা হয়েছিল জমির মাঝ দিয়ে। লাঙল ছেড়ে পথ কেটেছিল আসপাশের লোকেরা। কেউ কেউ রুটি খুঁজতে গ্রামের বাইরে গিয়েছিল।

মোহনপুর ছোট গ্রাম। এখান থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি ছেলে পড়তে যায় আমাদের ওখানে। দু'চারজন ছাত্র আমায় নমস্কার করল। সকাল দশটায় গ্রামে যেন দুপুর নেমেছে। বট গাছের তলায় একটা গরুর গাড়ী তার বাঁশের শরীর নিয়ে পড়ে আছে। একটা গরু জাবর কাটছে অদূরে বসে। কাক ডাকছে। যেন ঠোকরাচ্ছে রোদের গায়ে।

দশ পনেরো জন সাত থেকে পনেরো বছরের ছেলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাসছিল, হাততালি দিচ্ছিল আর বারবারই একদিকে আঙুল তুলে পরস্পরকে কিছু দেখাচ্ছিল। আমি তাদের কাছাকাছি এলাম। আমায় দেখেই তারা পরস্পর চোখে চোখে চেয়ে মাথা নামিয়ে পালাল। তাদের মধ্যে প্রাণকুমারও ছিল।

জায়গাটা গ্রামের মধ্যেই। তেরেণ্ডা আর কাঁটা গাছের ছোট ছোট ঝোপ রয়েছে এখানে ওখানে। জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা পুকুরে। পুকুরের জল অনেক নীচে নেমে গেছে। তার ওপর

সূর্যের দীপ্তি তীব্র রোদ ঝক্‌ঝক্ করছে; পাশের তেঁতুল গাছের কয়েকটা শুকনো পাতা ঝরছে ঘুরে। গম্ভীর স্বরে একটা ডাহুক ডাকছে থেকে থেকে।

হাঁটু জলে রোদ মাথায় নিয়ে মুরলী দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে আমি প্রথমটা ঠাওর করতে পারিনি, ভাবতেও পারিনি। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বুঝতে পারলাম। ওর গায়ে কোন বস্ত্র নেই। ছেলেগুলোর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। বটের পাতার মত পুরু, গৌরবর্ণ দেহে রোদের ছটা ফেটে ফেটে পড়ছে। কোমরের কাছে নবীন বয়সের সুন্দর সমারোহ যেন ফুটে উঠেছে। গোটা শরীর ঘিরে যৌবনের প্রথম উন্মেষ এক অনির্বচনীয় কবিতার মত ছন্দোবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এ কি! এ বয়সের একটি ছেলেকে যদি এভাবে যে কোন কারণেই শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে যে দিয়েছে তার জ্ঞান হওয়া উচিৎ।

—মুরলী, আমি খুব কাছে এসে ডাকলাম। ওর গোটা মুখটা রোদে পুড়ে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। চোখও লাল। চাপা নাকের ডগাটা কাঁপছে।

—মুরলী, কি হয়েছে তোর?

ভেবেছিলাম ও দৌড়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠবে।

কিন্তু কিছুই ও করল না। শুধু তাকাল। ওর দু'চোখ দিয়ে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বার হয়ে আসছে। দুই ঠোঁটে এক আক্রোশ সংহত হয়ে আছে।

ওর কাঁধে হাত রেখে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করলাম। অনড়। পায়ের নীচে কাদার মধ্যে নিজেকে প্রোথিত করে দাঁড়িয়ে আছে ও।

কি হয়েছে, কেন ওর এই শাস্তি তা আমায় ও জানাল না। একটি কথাও বলল না ও। নড়লও না।—আচ্ছা কথা বলবি না তো? বলবি না? ঠিক আছে।

সোজা মুরলীদের বাড়ী এলাম। এই প্রথম। খড় ছাওয়া মাটির কুঁড়ে তিনটি। মুরলীর বাপ খুড়োরা থাকে। মুরলীদের বাপ শীতল মণ্ডলের মুখ থেকে সকালেও মদের গন্ধ আসছিল। মাঠের কাজে এ তল্লাটে ওর প্রচুর সুনাম আছে। ঘরে পোষা পাতি হাঁস কটা পায়ের কাছে প্যাক্ প্যাক্ করে উঠল। আমি উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ব্যাপারটা জানা গেল। এর সঙ্গে আমিও যে এমনভাবে জড়িয়ে আছি তা জানতাম না। মুরলীর কাছে আমি তো কোনো টাকা কোনদিন চাইনি। কিছু একটা পাবো এই ধরে নিয়েছিলাম। ঈশ্বর জানেন, না পেলেও কিছু বলতাম না।

কিন্তু মুরলী চেয়েছিল আমার টাকা দিতে। আর পাঁচজন ছাত্র যেমন মাসান্তে কিছু ফেস তেমনি ও-ও দিতে চেয়েছিল। তাই, কদিন ধরেই নাকি টাকা চাইছিল মুরলী।

—একেবারে জলিয়ে মারছিল রে। দিতুম, টেকা আমি ঠিকই দিতুম, সিটো হাতে পাওনা যখন মাইনের, কিন্তুক—

—কিন্তু কি? আমি জানতে চাইলাম।

—মুরলীটো কি এ বয়সের ছেলে বটে, যে উয় মাইনের লেগে মাগতেই টেকা বার করব?

এই অকপটে টানে হাসল শীতল মণ্ডল।

লোকটা বলে কি! মুরলী এই বংশের ছেলে নয়?

শীতল মণ্ডল তখন বলছে, ওর মাতো একচল্লিশেই মলো, উ যে কেন মলো নাই।

আর সেখানে বসলাম না কি জন্যে এসেছিলাম, কি দেখলাম আর কি শুনছি। যুদ্ধের সেই সময়টা যখন ঘরে ভাত ছিল না, ক্ষেতে তারের বেড়া আর তাঁবু ছিল, শীতল মণ্ডল যখন রুটির খোঁজে বাইরে গিয়েছিল, ঠিক তখনই মুরলী এসেছে পৃথিবীতে।

—কেমন রুচি মূলার বরণ দেখো নাই?

বেশ। তাই যদি হয় তবে তার জন্য ও কি করবে? এর ওপর ওর তো কোন হাত নেই। সেই কবে যুদ্ধ হয়েছে, কাগজে কলমে তা মিটে গেছে। পৃথিবী জুড়ে মানুষ হাসছে, খেলছে, গাইছে, ভাবছে, যেমন চলার তেমনি চলছে। সেই যুদ্ধ, যে যুদ্ধ মুরলীকে আনল—যদি এনেই থাকে—এত দিনেও তা তার জীবন থেকে যাবে না?

শীতল মণ্ডল এসব কথা বোঝে না। মুরলীর ওপর তার একটা আক্রোশ আছে। মাষ্টারের টাকা শীতল মণ্ডল নাকি দিত, তবে ওই শাস্তির বিনিময়ে।

মুরলীর তাতেই রাজী হয়েছিল।

ফেরার পথে সেই পুকুরে আবার তাকালাম। নেই। মুরলী সেখানে নেই।

জানতাম পরদিন ও স্কুলে আসবে না। কিন্তু তারপর, পর পর কয়েকদিন, দিনের পর দিন গেল সে স্কুলে এল না। প্রাণকুমার জানাল, ও গাঁ থেকে নিজের মনে পাইলেছে আর।

দিনের মনে দিন গেল। মাসের মনে মাস। পরপর কয়েকটা বছর। নাইনে উঠে প্রাণকুমারের গোঁফ গজাল। ওর বিয়ে হল। স্কুলও ছাড়ল।

মুরলীকে আর কোনদিন দেখলাম না।

তাকে ভুলেও গেলাম।

ইতিমধ্যে গঙ্গা বক্ষে জোয়ার ভাটার নিয়ম রক্ষা করে অনেক জল বয়ে গেল।

॥ চার ॥

ন বছর পরের কথা লিখছি।

এই ন' বছরে অনেক বদলেছি আমি। চোয়াল বসে গেছে। দু'চারটে দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। পঞ্চাশে পাতক হয়েছিলাম। যে স্কুলে ঢুকেছিলাম সেখান থেকে আর নড়িনি। অভিজ্ঞতা যা সঞ্চয় করা গেছে তাতে আর একটু বড় সহরের কোন স্কুলে সরে যাওয়া যায়। কিন্তু কি দরকার? সেখানে জিনিস পত্রের দাম অনেক চড়া। তার চেয়ে এই বেশ আছি।

থাক সে সব ব্যক্তিগত বিবরণ। ঘটনাটা হলো এবারও আষাঢ়ের অকালে বন্যা এলো। গ্রাম ভাসে প্রতিবারই। পঞ্চপলার বেড়া দিয়ে এবারও তাকে আটকানো গেল না।

বাড়ী যাব বলে স্কুল থেকে এতদূর চলে এসেছি। দু'জায়গায় ট্রেন বদল করতে হয়েছে। তারপর এই মাঝারী গোছের ষ্টেশনটায় এসে ঠেকেছি। আর এক পা এগিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এখান থেকে সমস্ত গাড়ীকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ী ওদিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ছোট ছোট দু'চারটি মালবাহী গাড়ীর মাত্র যাওয়ার অনুমতি আছে। ওসব গাড়ীতে নাকি অতি

সাবধানে কিছু খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ এই সব কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওখান থেকে নৌকা করে প্লাবিত অঞ্চলের ভিতরে ভিতরে বিলি করা হবে।

যে ষ্টেসনটায় আটকেছি তার অবস্থা যা হয়েছে বলার নয়। কতকগুলো উড়ো উড়ো মানুষ 'বাড়ী যাব' 'বাড়ী যাব' করে হাঁস ফাঁস করছে। অথচ যাওয়ার কোন সহজ উপায় নেই। ষ্টেসনটা নোংরা হয়েছে। এখানে ওখানে আমের আঁটির ওপর নীল মাছি ভন্ ভন্ করছে।

আর বাড়ী যাওয়া হবে না। হায়। এই ষ্টেসন থেকে বিপরীত দিকে যাবার তিনটি যাত্রীবাহী গাড়ী নিয়মিত তিনবার ছাড়ছে। স্থির করেছি স্কুলে ফিরে যাব। কেননা ইতিমধ্যে তিনদিন কেটে গেছে। এরপর বাড়ী গেলে আরো সাতটা দিন যাবে। কোথায় পাবো অতগুলো দিন?

এ দিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে চার পাঁচ রশির একটা মালবাহী গাড়ী প্লাবিত অঞ্চলের—ওইখানে ওইদিকে আমাদের গ্রাম। বাড়ী! বাড়ী। বাড়ী।—দিকে যাত্রা করবে বলে মনে হচ্ছে। চেয়ে চেয়ে গাড়ীটা দেখছি। মনটা ছট্‌ফট্ করছে। এঞ্জিনটা ধোঁয়া ছাড়ছে। গাড়ীটা প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে। ওই দূরে।

—এঞ্জিন থেকে একটি লোক নামল। লোকটি এ'দিকে এগিয়ে আসছে। পরণে নীল প্যান্ট, হাফ সার্ট, মাথায় টুপি। গায়ে কালি ঝুলি মাখা। লোকটি মাথায় সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু লম্বা। ছ' ফিটের কাছাকাছি বুঝি হবে। পেশী বহুল সমর্থ শরীর।

পায়ে পায়ে আমার কাছে এসে সে আমার পায়ে হাত রেখে প্রণাম করল। একটু হেসে বলল, আমায় চিনতে পারলেন স্যার?

সন্দেহ নেই যে আমারই কোন ছাত্র। কিন্তু আমার ওকে মনে নেই। স্মৃতি ধরে টান দিয়ে ফল মিলল না। এ মুখের আদলে কোন চেনা কটি মুখ আমার মনে পড়ল না। শুধু আন্দাজে বললাম, রেলওয়েতে কাজ কর্ম হচ্ছে বুঝি? তা বেশ।

লোকটি বলল, আপনি ভাল আছেন স্যার?

বললাম, হ্যাঁ। তুমি?

একটু পরেই সে আবার প্রণাম করে বলল, যাই স্যার, গাড়ী ছাড়বে।

এই বলে কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে সে বলল, আমায় আপনি চিনতে পারেন নি স্যার। তা আমি বুঝতে পেরেছি।

—কথাটা বলেই সে যেন দৌড় দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক লাফে এঞ্জিনে উঠে গেল।

আপন মনে একটু অস্বস্তিতে পড়েছি। ছাত্রটিকে চিনতে পারিনি একথা সত্যি। তা সে টের পেয়েছে। এবং আমায় তা জানিয়েছে।

ষ্টেসনটায় যথারীতি নানা কণ্ঠের মৃদু মৃদু ঘটনা চলছিল। কিন্তু আশ্চর্য আমি তা শুনতে পাচ্ছিলাম না। যেন আমার চারপাশে কোথাও কোন শব্দ নেই। সব স্তব্ধ। ঠিক তখনই, আমার চারপাশের সেই শব্দহীনতার ওপর এঞ্জিনটা সিটি দিয়ে উঠল।

এঞ্জিন বাঁশি বাজাল। বাঁশি।

নাম তখন আমার মনে পড়ে গিয়েছে। মনে পড়েছে একটি বালকের মুখ। বৈশাখের যাদব রোদ। মনে পড়ে যাদের জমিতে কাঁটা তারের বেড়া, সৈন্যদের তাঁবু, বারুদের গন্ধ।

মালবাহী গাড়ীটা তখন প্লাবিত অঞ্চলের দিকে চলতে সুরু করেছে।

সুশীল সিংহ

উপন্যাস

॥ ছন্দ পতন ॥

সে যুগের বিখ্যাত হাকিম বিপ্রদাস বাড়ুজ্যে। সারা জীবনটা হাকিমীগিরি করে ভেবেছিলেন জীবনের বাকী দিনগুলিও কাটিয়ে দেবেন বিশ্রাম সুখ উপভোগ করে। তাই অন্যান্য দিনের মত মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আজও দেহটিকে এলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি আরাম কেদারার উপর। চোখ দুটি নিমীলিত, মুখে গুড় গুড়ির নল বাঁ হাত দিয়ে ধরা। নিমীলিত চোখের কোলে হয়ত অতীত দিনের কোন এক জটীল মামলার ছবি ভেসে বেড়াচ্ছিল, তারই নূতন সমাধানে তিনি তন্ময় এমন সময় ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন স্ত্রী যোগমায়া। মাঝারি দীর্ঘ দেহ, সুন্দর স্বাস্থ্য এবং শান্ত মুখশ্রীতে সুগৃহিনীরূপে যোগমায়াকে মানায় ভাল—হাকিমেরই উপযুক্ত গৃহিনী বলে।

ঘরে ঢুকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাড়িয়ে রইলেন যোগমায়া তারপর বললেন, কোর্টে যাওয়া বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সেই যে শিবনেত্র হয়েছ আর কোন কিছুরই ওপর লক্ষ্য নেই তোমার, ভেবেছ এমনি করেই দিনগুলি কাটিয়ে দেবে তুমি? বিপ্রদাস চোখ খোলেন। নলটি মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে বলেন, সবিতা রাণী আর অসীম ব্যানার্জির মামলার কথাটা আবার নতুন করে মনে পড়ে আমায় বড় বিচলিত করে তুলেছে মায়া। কি দোষ তারা করেছিল জানি না। তারা ভালবেসেছিল পরস্পরকে। সুখের নীড় বাঁধতে চেয়েছিল দু জনায়। বেঁধেও ছিল এই সহরেরই যুকের এক প্রান্তে। কিন্তু আইনের চোখ বড় হিংস্র। তার সহ্য হল না এ সুখের নীড়। ছিনিয়ে নিল দুজনাকে পরস্পরের বুক থেকে। উঃ কি নির্মম এই আইন। এর কাছে ভালবাসা অপরাধ। মানবতা দুর্বলতা। গরল নিয়ে এর কাটাকাটি, অমৃতে বিষ। সংসারে যত বিপর্যয় ঘটিয়েছে যত বিশৃঙ্খলতা ডেকে এনেছে এই আইন, এমন আর কেউ নয়।

যোগমায়া বলেন, কিন্তু তোমরাই ত আইনের জন্মদাতা গো?

তা হক। তবুও বলব বড় নির্মম। সবিতার মুখখানি মনে পড়লে আজও বুকটা দমে যায়। কোঁকড়ান চুলের গোছা পদ্মফুলের মত মুখখানিকে ঘিরে ঝামরে পড়েছে চারিদিকে। তারই মাঝে ভয়ার্ত চঞ্চল দুটি চোখের দৃষ্টি বারবার লুটিয়ে পড়ছে অসীমের মুখের ওপর। অসীমকে মুক্ত করবার জন্য সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে সে। কিন্তু আইন বড় নির্মম। মুক্তি দিল না অসীমকে। আর সেই শোকে আদালতের মধ্যেই ভেঙে পড়ল মেয়েটি। সে কি কান্না। বলল, নিরপরাধের শাস্তি যারা আইনের জোরে দেয়, ভগবানের আইন তাদের ক্ষমা করবে না কখনও।

যোগমায়া চমকে ওঠেন। প্রশ্ন করেন, বলেছিল ও কথা?

—বলেছিল। চোখ বুজলে আজও সে আর্তস্বর আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। কিন্তু তোমার হল কি? অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলে কেন?

যোগমায়া বলেন, দেখ হাকিমই হও আর ধর্মাবতারই হও, ভুল সব মানুষেরই হয়। আর ভুল হলে তার মাশুলও দিতে হয়, শাস্তিও পেতে হয়। তোমারও হয়ত ভুল হয়েছে।

বিপ্রদাস মাথা নেড়ে বলেন, মানুষের আইনে আমার ভুল হয় নি মায়া, হয়ত হয়েছে মানবতার আইনে।

যোগমায়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, তবু সেইখানেই। মানুষের আইনে গলদ আছে ফাঁকও আছে। কিন্তু ঈশ্বরের আইনে ফাঁক নেই। সেখানে দোষ করলে শাস্তি পেতেই হবে। হয়ত এ শাস্তি আমাদের মাথার ওপরই উদ্যত হয়েছে।

স্ত্রীর বলবার ভঙ্গিমায় বিপ্রদাস মনে মনে একটু ভীত হয়ে উঠলেন। বললেন, মানে?

যোগমায়া একটু স্থির হয়ে থেকে বললেন, সংসারের কোন খবরই ত রাখ না। রাখলে বুঝতে সবিতার ক্রন্দন একেবারে নিষ্ফলে যায় নি। তোমার ঘরেও তার ঢেউ পৌঁছেছে।

—বল কি? বিপ্রদাস চমকে ওঠেন। স্ত্রীর মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন।

—মিছে বলি নি। শুনে পর্যন্ত মুখে অন্ন রুচছে না আমার। সারাদিন শিবনেত্র না হয়ে থেকে সংসারের দিকে একটুও যদি দৃষ্টিপাত করতে তা হলে এতখানি দুর্ভাবনায় পড়তে হত না আমাকে।

—অর্থাৎ পড়তে হত আমাকে। বিপ্রদাস একটু হাসেন তারপর আবার বলেন, মন্দ কথা বলনি মায়া। দিনান্তের শেষ রোদটুকু যতক্ষণ না রাত্রের অন্ধকার এসে ঢেকে দেয়, ততক্ষণ তার আলোতে একটু বিশ্রাম করে নিতে দাও। দুর্ভাবনার বেড়াপাকে আর আমাকে জড়িও না।

স্বামীর শেষ কথাটায় যোগমায়া একটু অপ্রস্তুতে পড়েন। বলেন, জড়াতে চাই না। কিন্তু তোমরা পুরুষ, তোমরা যদি এড়িয়ে যেতে চাও, আমাদের ক্ষমতা কতটুকু বলত?

বিপ্রদাস এইবার সোজা হয়ে উঠে বসেন। গুড়গুড়ির নলটি একপাশে রাখতে রাখতে বলেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাত বুঝতে পারলুম না এখনও পর্যন্ত। না জেনে তোমার দুর্ভাবনা দূর করি কি করে বলত?

যোগমায়ার মধ্যে একটা ইতস্ততঃর ভাব দেখা যায়। কিছুক্ষণ কোন কথাই মুখ দিয়ে বার হয় না তাঁর। তারপর সঙ্কোচের ভাবটা একটু কাটিয়ে নিয়ে বলেন, কতবার তোমাকে বলেছি, এ ভাল হচ্ছে না। অতোদিন বৌমাকে বাপের বাড়ী রাখা ভাল দেখাচ্ছে না। তখন কানে তুললে না আমার কথা। বললে, বৌমা ছেলে মানুষ শরীর সারাতে যখন গেছে, দুদিন থাকই না বাপের বাড়ীতে।

—হুঁ! বলেছিলুম বটে। কিন্তু তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হল কোনখানে?

—অশুদ্ধ নয়, শুদ্ধই হয়ে গেছে। তবে আমি নালিশ বা অভিযোগ কিছু করতে আসিনি। যা ঘটনা তাই বলতে এসেছি।

—বেশ বল।

কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারেন না যোগমায়া। কেমন একটা সঙ্কোচের ভারে জিভ আড়ষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু স্বামী প্রতীক্ষা করে আছেন বুঝে একটু বিব্রত মুখেই বলেন, বৌমা সোমত্থ মেয়ে। ও বয়সের বদনাম চিরদিনই। কোন খুঁত ধরে লোকে যদি বদনাম দেয়, তাদের মুখ কি দিয়ে চাপা দেব বলত?

একটা অপ্রত্যাশিত অভিযোগ। এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বিপ্রদাস। তাই বিস্ময়ে প্রথমটা হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর কাছে সরে এসে বললেন, কি বলছ তুমি মায়া? পাগল হলে না কি?

—না। তবে তারও বেশী বাকী নেই। আমায় পাগল না করে ছাড়বে না তোমরা। তখনই

বলেছিলুম, নতুন বৌ, তাকে অতোদিন বাপের বাড়ী ফেলে রাখা ঠিক হবে না। কিন্তু শুনলে না আমার কথা। ছেলেই বা অত সইবে কেন?

—কে শুভো? সে কিছু বলেছে তোমায়?

যোগমায়া এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিপ্রদাস আবার প্রশ্ন করলেন, কি চুপ করে রইলে যে? বল, এ কথা শুনলে কোথা থেকে? সতীলক্ষ্মী বৌ আমার, তার বদনাম?

—বদনাম আমিও দিতে চাই না। অথচ ছেলে মুখে বলেছে। বলে, বিয়ে করবে আবার। ও বৌকে নিয়ে ঘর করবে না সে।

—কি। বিয়ে করবে আবার? বৌমার অপরাধ?

যোগমায়া একটু ইতস্ততঃ করেন। কিছুক্ষণ মৌণ হয়ে থাকেন। তারপর বলেন, বৌমার ওপর সব আস্থাই আজ হারিয়ে ফেলেছে ছেলে। এমন ঘটনা সে দেখে এসেছে নিজের চোখ দিয়ে যা—।

বিপ্রদাস সাদাসিধে লোক। রাগেন না সহজে। কিন্তু স্ত্রীর কথায় একেবারে ক্ষেপে পড়লেন। অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠে ডাকলেন, যোগমায়া! তুমি না মা। তুমি না মেয়েমানুষ! এতবড় মিথ্যে, পারলে বিশ্বাস করতে তুমি? আমার লক্ষ্মীর প্রতিমে বৌ, তার দুর্নাম! একথা কানেও শোনা যে পাপ। বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত ভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। যোগমায়া অপ্রতিভ মুখে বললেন, বিশ্বাস ত করিনা। কিন্তু নিজের স্ত্রী, তার বিরুদ্ধে, ছেলে যখন মায়ের কাছে অভিযোগ জানাল, তখন একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারলুম না। একটি মাত্র ছেলে শুভেন্দু। তার বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে। সে যে অপদার্থ, একথা ত বলা চলে না।

—শুধু অপদার্থ নয় মায়া, প্রকাণ্ড একটা গর্দভ। নইলে চিনতে পারল না নিজের স্ত্রীকে। আমি আজই বৌমাকে নিয়ে আসব গিয়ে। তারপর সব সমস্যার সমাধান করে দেব এক মুহূর্তেই। আজকালকার ছেলে, প্রশ্রয় দেবে যত, মাথায় উঠবে তত। এতকাল যে হাকিমীগিরি করে চুল পাকালেম সেকি শুধু শুধু?

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, দোহাই তোমার, আর যাই কর, ও পাগলামি ক'রনা। এখন বৌমাকে আনবার কথা মুখেও এনো না। ছেলে বিগড়েছে যে রকম, তাতে তার মতের বিরুদ্ধে কাজ করলে হয়ত একটা অনর্থ বাধিয়ে বসতে পারে।

বিপ্রদাস হাসলেন। বলেন, তার অনর্থ বাধাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হবে আমাকে? মন্দ কথা বলনি, মায়া।

যোগমায়া অপ্রতিভ মুখে বলেন, না, তা বলি না। তবে তার মতামতকে উপেক্ষা করাও যুক্তি যুক্ত হবে না আমাদের। একে ত ছেলে গোঁ ধরেছে আবার বিয়ে করব বলে, এর পর তাকে যদি আরও ক্ষেপিয়ে তুলি, ফল ভাল হবে না বোধ হয়। যদি সোপনে সত্যি সত্যি বিয়ে ক'রে বসে, তখন মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না আমাদের।

বিপ্রদাস থমকে দাঁড়ালেন। হাকিম মানুষ, চিরকালটা হাকিমীগিরি করে এসেছেন। ছেলের এই সমাজ বিরোধী, বে-আইনী কাজ সইতে পারছিলেন না কোন মতে। তাই স্ত্রীর দিকে

তাকিয়ে কতকটা আত্মস্বতভাবে বললেন, হুঁ, বিয়ে করলেই হ'ল। মেয়ে দেবে কে? এমন ত বেহেড, বে-আক্কেলে বাপ মা দেখিনা, যারা এক স্ত্রী বর্তমান জেনেও মেয়ে সঁপে দেবে ওর হাতে।

যোগমায়া বলেন, আছেন। তারা বে-হেডও নয়, বে-আক্কেলেও নয়। সমাজের গণ্যমান্য লোক তারা। তাদের আপত্তি নেই শুভেন্দুর হাতে মেয়ে দিতে।

বিপ্রদাস বিস্মিত হ'ন। বলেন, আশ্চর্য! এমন বাপ মাও আছে যারা নিজের মেয়ের সঙ্গে এত বড় শত্রুতা করতে পারে? ঐ স্বনামধন্য পুরুষটি কে, তুমি জান মায়া?

জানি। ভদ্রলোক উকীল। নাম রাঘব বাঁড়ুজ্যে। শুনেছি দেশের কাজে জেলও খেটেছে বার কয়েক। তারই মেয়ে কণিকা। বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে এবার অনার্স নিয়ে। মেয়েও খুব স্বদেশী।

বিপ্রদাস আবার পায়চারি করতে থাকেন। চিন্তা ক্লিষ্ট মুখ। পিছন দিকে হাতে হাত বাঁধা। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে বলেন, ভাবিয়ে তুললে মায়া। যত সহজ ভেবে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম, এখন দেখছি তা নয়। আজকালকার স্বাধীন চেতা স্বদেশী ছেলেমেয়েদের আমি বিশ্বাস করি না। দেশ সেবার নামে একদল হয় উচ্ছৃঙ্খল, অপদার্থ। আর একদল হয় বিকৃত মনা, ছেলে তোলানি। ছেলেদের ফাঁদে ফেলাই তাদের কাজ।

স্বামীর কথার প্রতিবাদ করতে পারেন না যোগমায়া। নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ তারপর বলেন, তোমার সব কথা হয় ত আমি বুঝি না, তবে কণাকে ওরকম মনে হয় না। লেখাপড়া জানা মেয়ে, একটু স্বাধীনচেতাই হয়ে থাকে। বিয়ে করব না বলে এতদিন বেঁকে বসেছিল। এখন মত করেছে। তাই এতে বাধা দেবে না কেউ। সে শুভেন্দু ছাড়া বিয়ে করবে না আর কাউকেও।

—বল কি! আমরা মত করি আর না করি। আর শুভেন্দু?

—তারও না কি সেই মত। কণাকে বিয়ে সে করবেই।

—দু'জনার জানা শোনা হল কি করে?

—জানি না।

—হুঁম্। আমি ঘুমিয়ে অন্ধ, আর তুমি জেগে অন্ধ। এখন বুঝেছ, ছেলে কেন তোমার লক্ষ্মীমন্ত বৌমাটির ওপর এতখানি নাচার?

যোগমায়া ঘাড় নাড়েন। সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন স্বামীর মুখের দিকে।

বিপ্রদাস বলেন, পরের মেয়ের চরিত্রের ওপর অযথা কলঙ্ক আরোপ করে সাধু সাজতে চান নিজে। এ আমি হ'তে দেব না মায়া। সবিতার আত্মা হয় ত প্রতিশোধ নিতে চায় আমার ওপর কিন্তু সে জানে না আমি বিচারক। বিচারকের দৃষ্টি অন্ধ। আইনের পথ ছাড়া সে চলতে জানে না। নিজের ছেলে মেয়ের ব্যাপারেও না।

স্বামীর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে যোগমায়া ভীত হ'য়ে পড়েন। পুত্রের অশোভনীয়তায় তিনি যে বিচলিত হয়ে পড়েছেন বড় বেশী, এ বুঝতে বাকী থাকে না তাঁর। স্বামীকে তিনি চেনেন। তাঁর বিচারক-মন-বৃত্তির সহিতও তিনি পরিচিত। এ বৃত্তি তাঁকে যে বিপথে পরিচালিত করবে না, পুত্রের অবিবেকীতাকে যে তিনি ক্ষমা করবেন না, এ কথা ভেবে তিনি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেন। অথচ বলবার মতও কিছু খুঁজে পেলেন না তিনি।

বিপ্রদাস নিরস্ত হলেন না। বলে চললেন, একটা ফুলের মত পবিত্র, নিরপরাধিনী মেয়ে,

তার মুকফাটা দীর্ঘশ্বাস যে আমার সংসারের ওপর দিয়ে অহরহ বয়ে যাবে, তার বিষক্রিয়ার হাত থেকে কি করে আত্মরক্ষা করব বলত? চুপ ক'রে রইলে কেন? বল, উত্তর দাও?

যোগমায়া ধীরে ধীরে মুখ তুলে বলেন, কি উত্তর দেব, দেবার মত কিছু নেই আমার। অথচ ছেলেটারও মুখ দেখলে দুঃখ হয়। ভয় হয়, পাছে বাধা পেলে বিবাগী হয়ে যায় সে।

স্ত্রীর কথায় বিপ্রদাস বিস্মিত হন। ক্ষণকাল অবাক বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, বল কি মায়া, ছেলে বিবাগী হয়ে যাবে এই ভয়ে আমরা চুপ করে থাকব? এত বড় অন্যায়ের প্রশ্রয় দেব?

—আমি তা বলি না। শুধু ছেলের কথাটাই বলছিলাম—।

—বলছিলে তোমার অপরাধী ছেলে বিবাগী হ'বে এই ব্যথাটাই তোমার বুকে বাজছে বড় ক'রে। কিন্তু নিরপরাধিনী বৌমা? তার কথা ভেবে দেখেছ কি একবার? পুত্র স্নেহতুরা মা, বৌমার ব্যথা বোঝবার সামর্থ কোথায়? তোমার ঘরে বধূ হ'য়ে এসেছে সে, এই না তার অপরাধ? সেইজন্যই না তার এই লাঞ্ছনা?

স্বামীর অভিযোগে যোগমায়া অন্তরে একটু আঘাত পান। তাই উত্তর দিতে গিয়েও পারেন না তিনি। কিছুক্ষণ মৌন থেকে ধীরে ধীরে বলেন, তুমি আমাকে অথবা দোষী করতে চাইছ কেন জানি না। তবে আমি ছেলের মা। মায়ের ব্যথাটাই তোমাকে জানাতে এসেছিলাম শুধু।

—তুমি শুধু ছেলের মা নও মায়া, মেয়েরও। মেয়ের ব্যথাটাও তোমার বোঝা উচিত।

যোগমায়া বলেন, বুঝি। মেয়ের ব্যথাও অন্তরকে মোচড় দেয়। রমা আমার মেয়ে, পূর্ণিমা আমার ঘরের বউ। এরা কেউ আমার কাছে ভিন্ন নয়। তবে মায়ের মন ছেলের জন্যে একটু বেশী স্পর্শ কাতরই হ'য়ে থাকে। তুমি সংসারের কর্তা হয়ে যদি চোখ বুজিয়ে না থাকতে, মাঝে মাঝে একবারও যদি তাকিয়ে দেখতে, আজ এত বড় সমস্যা দেখা দিত না।

বিপ্রদাস বিচারক। স্ত্রীর অভিযোগের হেতু তিনি বুঝতে পারেন। তার মর্যাদাও তিনি দেন। সহসা স্ত্রীর অতি সন্নিকটে সরে এসে তিনি বলেন, ঠিক। তুমি ঠিক বলেছ মায়া। এর জন্যে দায়ী আমিও। তাই নিজেকে আমি ক্ষমা করব না। এর যা প্রায়শ্চিত্ত তা করতে হবে আমাকেও।

যোগমায়া বলেন, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে বলি না। তবে একটি মাত্র ছেলে। তার ব্যথা যদি বুঝতে চেষ্টা না করি তাহলে মায়ের কর্তব্য থেকেও ভ্রষ্ট হ'ব। যোগমায়া চুপ করেন। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে না পেরে আবার বলে ওঠেন, ছেলে বারবার বিয়ে করুক, এ কোন মা-ই চায় না। কিন্তু ছেলে সুখী হ'ক, সংসারী হ'ক, এ সব মা-ই কামনা করে।

বিপ্রদাস একটু লজ্জিত হ'ন। স্ত্রীর অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিয়ে বলেন, তোমার অভিযোগ বুঝেছি মায়া। আমার নিশ্চেষ্টতার সুযোগ নিয়ে আজ যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, এবার সচেষ্ট হয়ে দেখি, সে জটিলতার জট খুলতে পারি কি না।

—পারবে। রাঘব বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা কর, এ জট খুলে যাবে।

স্ত্রীর কথায় বিপ্রদাস উৎসাহিত হয়ে বলেন, তুমি ঠিক বলেছ মায়া। তাই করব। এ দিকটা ভেবে দেখি নি আমি শুধু রাঘব বাঁড়ুয্যেই নয়, প্রয়োজন হলে তার স্বাধীন-চেতা মেয়েটির সঙ্গেও দেখা করতে দ্বিধাবোধ করব না। তাকে বুঝিয়ে দেব, এ অশাস্ত্রীয় বিবাহে মঙ্গল হবে না কোন পক্ষেরই।

যোগমায়া একটু দ্বিধা ভরে বলেন, কিন্তু সে যদি না বোঝে।

বিপ্রদাস জোর দিয়ে বলেন, বুঝবে। কারণ সেও ত মেয়ে। আর একান্তই যদি না বোঝে, তাহলে নিজের ছেলের সুখের জন্যে পরের মেয়েকে পথে বসাতে পারব না। পিতৃ হৃদয়ে, পুত্রের স্থানাভাব যদি না হয় কোন দিন, পুত্রবধূও হবে না জেন। তুমি রমাকে খবর দাও। সে এসে তার দাদাকে বুঝিয়ে বলুক যদি তার মতি গতি ফেরাতে পারে।

যোগমায়া মৌন হয়ে রইলেন। বিপ্রদাস ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে এক সময় গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন।

বিপ্রদাসের একছেলে আর এক মেয়ে। বড় শুভেন্দু। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক। বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে স্বাস্থ্য সম্পদে অনেকেরই ঈর্ষাস্থল। বাপের হাকিমীর জোরে অল্প বয়সে চাকরীও পেয়েছে ভাল। বিবাহও করেছে ভাল। এক কথায় বলা যায় লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র।

তবে ভগবান সকলকে সব গুণ যেন না, বঞ্চিতও করেন অনেক কিছু থেকে। শুভেন্দুকেও বঞ্চিত করেছিলেন একটি বড় গুণ থেকে। সেটি তার চিত্তের স্থৈর্যতা। অস্থির মানুষ একটু দুর্বল চিত্তই হয়ে থাকে। শুভেন্দুও একটু বেশী রকম দুর্বলচিত্ত। এই দুর্বল চিত্ততার জন্যই অনেক সময় অনেক কিছু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে তাকে।

মেয়ে রমা। সুন্দরী মেয়ে, বুদ্ধিমতী মেয়ে। বিবাহ হয়েছে ইঞ্জিনীয়ার পাত্রে। প্রবীর ছেলে ভাল। কাজ-পাগল ছেলে। কাজের সুখ্যাতি আছে তার। তাই কাজও জোটে বেশ। স্ত্রীকে আন্তরিক ভাবেই ভালবাসে। বলে তুমিই আমার লক্ষ্মী। শুনে রমা মুচকি হেসে জবাব দেয়, তাই। লক্ষ্মীই ত।

লক্ষ্মীর 'পরে' আয় বাড়ে। ঘরের চারিদিকে প্ল্যান। টেবিলে টবিলে প্ল্যান স্তূপীকৃত। দেওয়ালে দেওয়ালে প্ল্যান টাঙান। এদেরই মাঝে বসে প্রবীর কাজ করে। সেদিনও কাজ করছিল। বড় জরুরী কাজ। তাই সামনের খোলা প্ল্যানখানির উপর তার একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ। এমন সময় পাশের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রমা। স্বামীর পিছনে এসে এক মুহূর্ত নিশ্চল ভাবে দাঁড়ায়। তারপর বলে, খবর শুনেছ সব?

প্রবীর মুখ না তুলেই বলে, শুনেছি। সিমেন্টের দর দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ব্ল্যাকেও লোহা পাওয়া যাচ্ছে না। তা আমি করব কি?

—কিছু না। শুধু আমার বাবার মত চোখ বুজে বসে থাকবে। কথাটা প্রবীরের কানে গেল কি না বোঝা গেল না। সে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, তা আর হচ্ছে কই। কিন্তু মহা সমস্যায় যে পড়ে গেলুম এখন। তের বাই তের দুখানা আর দশ বাই দশ তিন খানা। বাকী থাকে ছ ফুটে একটা বারান্দা। এখন বারান্দার কোলে ঘর হবে, না ঘরের কোলে বারান্দা হবে, সেইটাই ভাবনা।

—বাহাদুর ইঞ্জিনীয়ার! ঘরের কোলে বারান্দা! বলি, বাড়ীখানা হবে কার? তার বৌ আছে ত?

—আছে বলে আছে। অলআ্যাড আছে। বৌয়ের নামেই ত বাড়ী।

—তা হলে রান্নাঘরের কোলে বারান্দা করে দাও। ভদ্র মহিলা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। আমার মত হাড় ভাজা ভাজা হবে না তার।

প্রবীর উৎকণ্ঠিত মুখে প্রশ্ন করে, কি হ'ল আবার?

—কিছু না। হবে আবার কি। এমনিই। তারপর স্বামীর কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে প্ল্যানখানির উপর একটি আঙুল রেখে বলে, বলতে পার এই রেল-গাড়ীর মত আঁকাবাঁকা লাইনগুলি কার মাথায় গজিয়েছিল প্রথম? কি সর্বনেশে লাইনরে বাবা, যেন ফাঁসি কাঠের দড়ি!

—কেন, লাইনগুলো তোমার করল কি?

—জিভ বার ক'রে ছাড়ল। যখনই ঘরে ঢোক, ঐ লাইন। হয় তের বাই তের, না হয় বার বাই বার। আর তাও যদি না হয়, তা হলে সাত বালি এক সিমেন্ট না ছ বালি এক সিমেন্ট। অসহ্য।

স্ত্রীর বলবার ভঙ্গিনায় প্রবীর হেসে ফেলে। বলে, বড় সুসময়ে তুমি এসে পড়েছ রুমি, কিছুতেই হাসি পাচ্ছিলাম না। এইবার যদি কিছু পাই।

—মানে? রমা ভ্রূ কুঞ্চিত করে।

—আচ্ছা বল ত, হিমালয়ান পাহাড়টা তৈরী করেছিলেন কোন ইঞ্জিনীয়ার?

রমা অবাক বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বামীকে সে চেনে। আশুতোষ মানুষ। এক বলতে বসে বলে আর এক। তাই সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, হিমালয়ান পাহাড়? কেন তুমি, তোমার মত পাকা ইঞ্জিনীয়ার ছাড়া হিমালয় পাহাড়কে গেঁথে তোলে সাধ্য করে। ওতে কটা সিমেন্টের সঙ্গে কটা বালি মিশিয়েছিলে প্রভু?

প্রবীর অপ্রস্তুতে পড়ে। অপ্রতিভ মুখে বলে, আঃ রুমি, হিমালয় পাহাড়ের কথা বলিনি, বলছিলুম দার্জিলিং হিমালয়ান রেল লাইনের কথা। দিন দিন তোমার বুদ্ধিটা মোটা হয়ে যাচ্ছে দেখছি।

—সেটা সঙ্গ গুণে।

—সঙ্গ গুণে মানে আমার সঙ্গে থেকে থেকে? আমার বুদ্ধি মোটা!

—শুধু তোমার নয়। ওটা ইঞ্জিনীয়ারদেরই একটা গুণ।

—বটে! ইঞ্জিনীয়রদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা দেখছি অসীম।

—আগে সসীম ছিল। কিন্তু এখন তোমায় যত দেখছি ততই অসীমে গিয়ে ঠেকছে।

প্রবীর কথাটা গায়ে মাখে না। বলে, শ্রদ্ধা জিনিষটা ভাল। এখন সেই ইঞ্জিনীয়ার সাহেবটির নামটা তোমায় বলি, শোন।

—কাজ নেই আমার শুনে।

—আছে। কারণ ইঞ্জিনীয়ার আর তাদের সহধর্মিনীদের সে নাম কণ্ঠস্থ ক'রে রাখা উচিত।

—ইঞ্জিনীয়াররা রাখতে হয় রাখুক কিন্তু তাদের সহধর্মিনীরা কি অপরাধ করল?

—অপরাধ নয় রুমি, এ অপরাধের কথা নয়। এর পেছনে রয়েছে এক বিরাট দাক্ষিণ্য। সহধর্মিনীর দাক্ষিণ্যেই এই পরমাশ্চর্য রেলপথটি প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন ইঞ্জিনীয়ার সাহেব। রেল লাইনের প্ল্যান করতে করতে সাহেবের বুদ্ধিতে সেদিন ভাটা পড়ে গিয়েছিল। সামনে খাড়া পাহাড়। পথ নেই। রেল চলবে কি ক'রে, সাহেব ত হতভম্ব। কিন্তু স্ত্রীই উদ্ধার করলেন তাঁকে এ বিপদ থেকে। কালির আঁচড় টেনে লাইনকে ব্যাক করিয়ে এনে সামনের দিকে ঠেলে দিলেন। ব্যস! ঐ তেই ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের চোখ খুলে গেল। আর জগতের এই আশ্চর্য রেল লাইনটি তৈরী হল।

—তা যেন হল। কিন্তু এ রেল লাইনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

—নিকট সম্বন্ধ। হিমালয়ের গহন অরণ্যে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব পথ হারিয়ে ছিলেন। বিপদ

তখন হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। আমার এই 'সর্বতঃ ভদ্র' প্ল্যানে আমি বারান্দা বিভ্রাটে পড়েছি রমি, বিপদ-ভঞ্জন হও তুমি। কোথায় যে বারান্দা বসাব ঠিক করে উঠতে পাচ্ছিনা। তুমি দেখিয়ে দাও দেবি।

—দেব। কিন্তু তার আগে জানতে চাই এ ভাগ্যবানটি কে, যার প্ল্যান নিয়ে এত বিভ্রাটে পড়েছ তুমি।

—একজন ধনী ব্যবসায়ী। বিয়াট তার কারবার।

রমা প্রশ্ন করে, কালোবাজারী নিশ্চয়ই।

প্রবীর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, নিশ্চয়ই। চোরাকারবারী না হ'লে আজকালকার দিনে অভিজাত শ্রেণীর ব্যবসায়ীই হওয়া যায় না। রাতারাতি ধনী হবার এইটাই ত সহজতম পথ।

—অতএব তার বারান্দা হওয়া উচিত উত্তর মুখো। কালোবাজারী হবে আবার দক্ষিণের ঝুরঝুরে বাতাসও খাবে, এ হতে পারে না।

প্রবীর একটু হাসে। মুখ টিপে বলে, পারে না নয় রমি, জগতের নিয়মই এই। কালোবাজারী যারা, লক্ষ্মীর বরপুত্র তারা। 'সর্বতঃ ভদ্র' অট্টালিকা ভোগও করে তারা।

—সুতরাং উত্তর মুখো বারান্দাও ভোগ করবে তারা। কিন্তু কালোবাজারীদের কথা থাক। এখন যা বলতে এসেছি তাই শোন। মায়ের চিঠি এসেছে।

—এ নতুন কিছু নয়। ছেলে মেয়ে থাকলেই বাপ মায়ের চিঠি আসে। আমি যদি তোমাদের বাড়ীতে থাকতুম আমার বাপ মায়েরও চিঠি যেত, সেখানে।

—উঃ অসহ্য। রমা করতল প্রসারিত করে কপাল টিপে ধরে।

প্রবীর ব্যস্ত হয়ে বলে, কি হল? গরম হচ্ছে রমি! এই জন্যই ত বারান্দাটা দক্ষিণ মুখো করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমিই করতে দিলে না। গরম ত হবেই! অথচ দক্ষিণের দু দুটো জায়গাটা মাঠে মারা গেল।

—জায়গা নয়, আমি। উঃ! কি দেখেই বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন আমার।

—ইঞ্জিনীয়ার দেখে রমি। একেবারে সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। এটা ত ইঞ্জিনীয়ারদেরই যুগ। তাদেই একটুও ভুল করেন নি তিনি।

প্রবীর রমাকে চেনে। তার বুঝি যে মধুবর্ষী নয়, এ সে বোঝে। তাড়াতাড়ি বলে, এবার তুমি বলতে পার তোমার বক্তব্যটা কি?

রমা বলে, মা চিঠি লিখেছেন, দাদা ক্ষেপে উঠেছে আবার বিয়ে করবে বলে।

এবার বিস্ময়ের পালা প্রবীরের। দারুণ বিস্ময়ে তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে। বলে, বল কি। তোমার দাদা, মানে শুক্লেন্দুবাবু?

—আমার দাদা কজন?

—কিন্তু তিনি ক্ষেপে উঠলেন কেন?

রমা রাগ করে বলে, সে কথাটা আমায় কানে কানে বলতে ভুলে গেছেন তিনি। তুমি তার জন্মীপতি, বড় আপনার জন। এ কথা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে এস।

এতক্ষণে বিস্ময়ের পালা কেটে গিয়ে প্রবীরের মুখে চোখে অমমা কৌতূহল ফুটে উঠে। কথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য বলেই সে কৌতুক ভরে বলে, ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ডার্লিং। কিছুটা থ্রিলিংও বটে। পুওর,পার্ল বৌঠান। কিন্তু হল কি দু'জনার, লাঠালাঠি?

রমা রাগ করে বলে, দেখ, রাগিও না বলছি। যা জান না তা নিয়ে মন্তব্য ক'র না।

—মন্তব্য করতে চাই না রুমি। কিন্তু তোমার কথা যদি অর্ধেকটাও সত্য হয়, তাহলে বলব, ভদ্রেশ্বর মহাশয় ব্যক্তি—যিনি নির্বিকার চিত্তে বিয়ের পর বিয়ে করে যেতে পারে আজকের দিনে। আমার অভিনন্দন তাকে জানিয়ে বল, দেখা হ'লে একটা প্রণাম করে আসব চট করে। ইঞ্জিনীয়ার মানুষ আমরা, বুদ্ধিটা মোটা। নইলে—।

—নইলে আর একটা বিয়ে করতে? তোমরা সব পার।

—উঁহু। তোমার দাদার মত অতখানি সাহস আমার নেই রুমি। আমার বরাতে ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু ভাবছি, বৌঠানের অপরাধটা কি? রূপ? গুণ? স্বাস্থ্য? পদ্ম? কিন্তু এ-সব অজুহাতের কোনটাই টিকবে না। শুধু নিরাপত্তার দোহাই। সে ত তুমিও। এ অপরাধে তিনি যদি অপরাধী হ'ন, তা হলে—।

—তা হলে অপরাধী আমিও, এই ত? উঃ, দোহাই তোমাকে। তুমি যাও। কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিতে এস না। এই যু ব্রিফ্‌টগুলোই হয়েছে আমার কাল। ওদের বিদেয় না করলে, শান্তি পাবনা আমি। বলতে বলতে সে দু'হাত দিয়ে যু ব্রিফ্‌টগুলো টানাটানি করতে থাকে।

প্রবীর শশব্যস্তে এগিয়ে আসে। হাত জোড় করে বলে, দেবী প্রসীদ। রাগ সংবরণ কর। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সব। এখন কি আদেশ হয় বল।

—এখুনি মায়ের কাছে আমায় যেতে হবে। তুমিও সঙ্গে যাবে।

প্রবীর মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, তা ত যাব। কিন্তু আমার বারান্দা?

—বারান্দা? তারও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এক্ষুনি। রমা পেনসিল দিয়ে গ্র্যানখানির একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা সরলরেখা টেনে দিল। তারপর বলল, বারান্দার ব্যবস্থা হবে এইখান দিয়ে। প্রবীর চেঁচিয়ে উঠল, এই কর কি? কর কি? যাঃ! ঘরের ভেতর দিয়ে বারান্দা চলে গেল। সব মাটি করে দিলে তুমি।

রমা পেনসিলটা টেবিলের ওপর ঠুস ক'রে ফেলে দিয়ে বলল, কিছু মাটি হয়নি। চোরা কারবারীদের বারান্দা ঘরের ভেতর দিয়েই যায়। এই-ই নিয়ম। আরও যদি দেরী কর দেখবে বারান্দা চলে যাবে সোজা ছাদের ওপর দিয়ে। তারপর কাগজ মুড়ে এ পিঠ থেকে ও পিঠে।

প্রবীর গ্র্যানখানি তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলে। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে বলে দোহাই গিন্নি, দোহাই রুমি! এরপর যা আদেশ করবে বিনা বাক্যব্যয়ে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করব আমি। আমার বারান্দা চুলোয় যাক। শুধু তুমি প্রসন্ন হও। বলতে বলতে সে স্ত্রীর পাশটিতে এসে দাঁড়ায় তারপর নিবিড়ভাবে নিজের দুটি বাহুর মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে ফেলে।

মেয়েরা সাধারণতঃ একটু বেশী ভাব-বিলাসী হয়ে থাকে। রমাও এর ব্যতিক্রম নয়। বাপ মায়ের একটি মাত্র মেয়ে বলে সে যেমন পেয়েছে সুপ্রচুর স্নেহ, তেমনি পেয়েছে স্বামীর একনিষ্ঠ ভালবাসা। সুতরাং তার ভাববিলাসিতাকে দোষ দেওয়া যায় না। রমার আর একটি গুণ ছিল তার অন্তরের সরলতা। সে তার বৌদিদি পূর্ণিমাকে ভালবাসত অত্যন্ত বেশী। সমবয়সী মেয়ে, তাদের মনের মিল যতখানি, তাদের অন্তরঙ্গতাও ততখানি। সেই জন্য দাদার এই অসঙ্গত আচরণে সে মর্মাহত হয়েছিল অত্যন্ত বেশী। বৌদিদি যে নির্দোষ, পুরুষজাতির চিত্ত দৌর্বল্যই যে দাদার এই অধঃপতনের জন্য দায়ী,

এইটাই সে ধরে নিয়েছিল মনে মনেই। তাই সে দাদার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য একেবারে কোমর বেঁধে এসে উপস্থিত হ'ল বাপের বাড়ীতে।

স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে রমা যখন ভবানীপুরে তার পিত্রালয়ে এসে উপস্থিত হ'ল, শুভেন্দু তখন বাইরে যাবার জন্য প্রসাধনে ব্যস্ত। সাতাশ আটাশ বৎসরের প্রিয়দর্শন যুবক, অনেক গুণের অধিকারী হলেও, দুর্বল চিত্তের জন্য প্রসিদ্ধ। বিশ্বাস-প্রবণ মনের উপর অধিকার তার কম। সুতরাং সব কিছুকেই সে বিশ্বাস করে নেয় সহজেই। যাচাই করে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করে না সে। এজন্য বন্ধু মহলে হাস্যাস্পদও হয়েছে বহুবার। কিন্তু স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি তার। অপরিবর্তন-শীল শুভেন্দু আজও রয়ে গেছে অপরিবর্তনশীল।

রমা এসে পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকে তারপর একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে শুভেন্দুর পিছনে এসে ডাকে, দাদা।

শুভেন্দু সচকিত হয়ে উঠে। বলে কেরে, রমা, আয় এমন অসময়ে যে?

—বাপের বাড়ীতে মেয়ে আসবে তার আবার সময় অসময় কি। কিন্তু তবুও আমি বলব আজকের আসাটা আমার একেবারে বিনা কারণে নয়। বোঝাপড়া করতে এসেছি দাদা।

শুভেন্দু স্মিতমুখে বলে, বেশ ত, করনা বোঝাপড়া। কার সঙ্গে করবি আগে বল?

—করি ত তোমার সঙ্গেই করব দাদা।

—বেশ, কি নিয়ে করবি, বল?

—বলছি। রমা বসে। একবার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। সৌখীন লোকের ঘর। সৌখীনতার উপকরণ ঘরের চারিদিকে ছড়ান। ঘরের সামনের দেওয়ালে দুখানি ছবি পাশাপাশি টাঙান। একখানা শুভেন্দুর, আর একখানা ওন্টান। বোঝা যায়না কার। রমার দৃষ্টি সেইখানে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ছবিখানাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলে, এ ছবিখানা ওন্টান কেন দাদা?

শুভেন্দু তাকাল না। যেমন প্রসাধনে রত ছিল তেমনিভাবে থেকেই উত্তর দিল, জানি না। হয়ত ঝড়ে উল্টে গিয়ে থাকবে।

—ঝড়ে? ভারী অদ্ভুত ঝড় ত দাদা। পাশাপাশি দুখানা ছবি, একখানা ওন্টাল, আর একখানা না। এটা কি রকম ঝড় দাদা, প্রাকৃতিক না মানসিক?

শুভেন্দু ভ্রূকুটি করে। বলে, ঝড়ের আবার প্রকার ভেদ আছে না কি? প্রাকৃতিক, মানসিক, আধিভৌতিক?

রমা ঘাড় নেড়ে বলে, আছে দাদা। প্রাকৃতিক ঝড়কে 'পার' আছে, কিন্তু মানসিক ঝড়কে 'পার' নেই। এতে ছবি কেন, সারা পৃথিবীটাই উল্টে যায়। এর ধাক্কা সইতে না পেরে তুমি সরল পথ ছেড়ে অসরল পথ ধরেছ। বৌদিদির ছবিখানি উল্টে দিয়ে দোষ দিচ্ছ ঝড়ের। কিন্তু ছবিখানাকে হাত দিয়ে উল্টে দিলেই সমস্যাটাও কি এত সহজে উল্টে যায় দাদা?

—জানি না।

—জান। এ যায় না। এ তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ, একে ওন্টান সহজ নয়। যত সহজে তুমি উল্টে দিয়েছ, তত সহজেই আমি আবার ঠিক ক'রে দিচ্ছি, দেখ। বলতে বলতে ছবিখানাকে সে সোজা করে দেয়।

একটি অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়ের ছবি। মুখে তার টেপা হাসি। ভঙ্গিমাটি সুন্দর। মেয়েটি রমার বৌদিদি পূর্ণিমার। দিগ্প্রসাদ ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন, মেয়ে যেচে নয়, মেয়ে ডেকে। পূর্ণিমাকে ভারী পছন্দ হয়েছিল তাঁর। তাই বিবাহ হয়ে গেলে এক কথায়। বিবাহ হয়েছে বছর দুয়েক। এরই মধ্যে একটা ছেদ পড়ে গেছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে।

রমা ছবিখানাকে দু'হাতে তুলে ধরে বলে, একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ দিকি দাদা এ মুখখানির দিকে, প্রাণ থাকতে একে অশ্রদ্ধা করতে পারে কেউ, না এর সম্মানের হানি করতে পারে অবিশ্বাসের কালি ছিটিয়ে?

শুভেন্দু চকিতে ছবিখানির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে তারপর একটা উদ্গত নিঃশ্বাস দমন করে। রমা বুঝতে পারে দাদার দুর্বলতা। তাই সুযোগ বুঝে বলে, একটা প্রশ্ন করব দাদা, উত্তর দেবে ঠিক?

—বেঠিক দেব এ কথা ধরে নিলি কেন? কিন্তু কি বলবি তাড়াতাড়ি বল, এক্ষুনি বেরুতে হবে আমায়।

—বলছি। তবে তাড়া দিলে গুলিয়ে ফেলব সব।

শুভেন্দু হাসে। বলে, মুখস্থ করে এসেছিস বুঝি? বেশ, মুখস্থ থাকতে থাকতেই বল। আমি তাড়া দেব না।

রমা এক মুহূর্ত ইতস্তত: করে। একটু ভেবে নেয়। তারপর বলে, রাঘব বাঁড়ুয্যের মেয়ে কণা ব্যানার্জির নামের সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা শুধুই গুজব, না সত্য এর মধ্যে কিছু আছে।

শুভেন্দু চকিত হয়ে উঠে। বোনের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কে বলেছে এ কথা?

রমা বলে, কার নাম করব বল। সারা সহরময় চিটিকার পড়ে গেছে।

—সারা সহরময় চিটিকার পড়ে গেছে অথচ আমি জানলাম না কিছু?

—জান দাদা, সব জান তুমি। আর জান বলেই তোমার কাছে এসেছি সে কথা শুনতে।

শুভেন্দু একটুখানি ভাবে। তারপর বলে, সে কথা শুনলে তুই খুশি হবি না বোন।

—খুশি হব না? বল কি?

—না। আর তোকে খুশি করতে গেলে, সত্য কথা বলা হবে না আমার। তার চেয়ে আজ থাক, আমার তাড়া আছে। আর একদিন ধীরে সুস্থে সব কথা শোনাব তোকে।

রমা বোঝে সে দুর্বল স্থানে আঘাত হেনেছে দাদার। তাই দাদা তাকে পাশ কাটাতে চায়। কণা ব্যানার্জির কাহিনী যে আজগুবি নয়, বা অলীক নয়, এটুকু প্রকাশ পেয়ে যায় শুভেন্দুর আচরণ থেকে। তাই সে দরজার পাশে সরে এসে পথ আগলে বলে, আর একদিনের অপেক্ষা আমার সইবে না দাদা। যা শোনবার আজই শুনতে হবে আমায়। তবে আমায় খুশি করতে গিয়ে যদি মিথ্যের আশ্রয় নাও, তাতে ফল ভাল হবে না কিন্তু।

শুভেন্দু রমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। বোঝে, এ বিদ্রোহী নারীমূর্তি, একে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। তাই সে রমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, তোকে খুশি করতে গিয়ে

আমার ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিতে রাজি নই বৌদি। যা শুনেছিস তা একেবারে মিথ্যে নয়। কণার অন্তরকে আমি স্পর্শ করতে পেরেছি।

—দাদা! রমা আর্তনাদ করে উঠে।

—না, আগে সবটা শোন, তারপর বিচার যদি করতে চাস আমায় করিস। আমার যে প্রাণের স্পন্দন আছে, কণা তা বুঝেছে। আমার যে বাসনা কামনা আছে, গার্হস্থ জীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে, এ জেনেছে কণা আর তাদের রূপ দিতেও স্বীকার পেয়েছে সে।

—স্বীকার পেয়েছে? আশ্চর্য্য! কিন্তু বৌদির কথা সে জানে?

শুভেন্দু বিচলিত হয়ে পড়ে। মনে হয় কে যেন গোপন ক্ষতে হাত দিয়েছে তার। তাই বিবর্ণ মুখে বলে, জানি না। যে আমাদের কুলধর্মের অবমাননা করেছে তার স্মৃতি ভদ্র সমাজে বহে বেড়াবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

রমা মর্মাহত হয়। বুঝতে পারে দাদাটি তার নিজের অপকীর্তিকে গোপন করতে চায় অপরের স্কন্ধে কলঙ্ক চাপিয়ে। সে মেয়ে। একজন নিরীহ মেয়ের উপর এতখানি অপভাষণ সে সইতে পারে না। কণা দাদাকে প্রলুব্ধ করেছে অথবা দাদাটি প্রলুব্ধ হয়েছে এ আজ স্বতঃসিদ্ধ। তাই সে ধীরে ধীরে বলে, বৌদি আমাদের কুলধর্মের অবমাননা করেছে এ কথা তুমি জানলে কি ক'রে দাদা?

শুভেন্দু বলে, আমি জানি। সেই কথাই আমি বলব তোকে। শুভেন্দু থামে। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলে, আজ কণা যদি আমায় ভালবেসে বিয়ে করতে না চাইত, এ পথ আমি বেছে নিতাম না। আমি প্রলুব্ধ, এ কথা হয়ত গোপন করতে পারব না। কিন্তু কেন? আমার তৃষিত আত্মা আজ অমৃত প্রয়াসী, তাই এ দুর্বলতা। সে অমৃত যদি ঠোঁটের কাছে এগিয়ে আসে, তাকে বিমুখ করি কেন?

এতক্ষণে সব রহস্য ফাঁস হয়ে যায় রমার কাছে। দাদার তৃষিত আত্মা আজ অমৃত পিয়াসী, সেই অমৃত কণা তুলে ধরেছে ঠোঁটের কাছে। এ পান না ক'রে থাকতে পারে কজন পুরুষ। প্রবীরকে মনে পড়ে রমার। একনিষ্ঠ স্বামী, স্ত্রী অন্ত প্রাণ। কিন্তু তবুও বিশ্বাস নেই এদের। অমৃত পিয়াসী মন, কার অমৃত পানে উৎসুক, কে জানে?

রমা বলে, একটা কথা বলি দাদা, বৌদির বিরুদ্ধে তোমার যা অভিযোগ, তার চেয়ে গুরুতর অভিযোগ, বড় দুর্নাম মেয়ে মানুষের বিরুদ্ধে আর হয় না। আমিও স্ত্রী, সংসারে বাস করছি আমিও। তাই জানি, এ কলঙ্ক বজ্রাঘাতের চেয়েও নির্মম, আত্মহত্যার চেয়েও নিষ্করুণ; বিশেষ ক'রে স্বামী যদি নিজে স্ত্রীর চরিত্রে এই দুরপনেয় কলঙ্ক লেপে দেয়।

—আমি অপভাষণ করি নি রমা। তুই বিশ্বাস কর। শুভেন্দুর স্বরে অসহায়ত্বের লক্ষণ; একটু যেন কাঁপনও দেখা দেয়।

রমা বলে, আমি সেইটুকুই জানতে চাই দাদা। সত্যের এই রূপটি জানতে পারলে মনকে এই বলে প্রবোধ দেব যে আমার দাদা আর যাই করুক অন্যায় করে নি কিছু। অপরাধী শাস্তি পাক এ আমিও চাই, কিন্তু নিরপরাধীর হত হ'ক, এ কামনা করি না।

প্রত্যুত্তরে শুভেন্দু কি একটা বলতে যায়, কিন্তু পারে না। নিরুত্তরে মৌন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

রমা বলে, বলতে যদি কষ্ট হয় দাদা, তবে থাকে।

শুভেন্দু বলে, কষ্ট নয় বোন, লজ্জা। এমনি জঘন্য ঘটনা যে বলতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার। কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল। ভবিষ্যতে কেউ যেন না ভাবে একটা অপদার্থ নরপশু আমি।

রমা শশব্যস্তে দাদার পদধূলি মাথায় স্পর্শ করে বলে, ওকি দাদা! অপরাধ যদি করে থাকি, ছোট বোন আমি, আমাকে রুক। কিন্তু অমন করে নিজেকে ছোট করতে যাও কেন।

শুভেন্দু রমাকে হাতে ধরে তোলে, তারপর বলে, সব কথাই তোকে খুলে বলব আমি। না বলা পর্যন্ত শান্তি পাব না। ওদের মুখুজ্জে মশাইকে জানিস ত?

—ওমা, জানব না কেন? বৌদির বড় ভগ্নীপতি ত? বড় আমুদে আর ভারী অমায়িক লোক দাদা। অমন লোক দেখা যায় না দুটি।

শুভেন্দু গম্ভীর মুখে বলে, হুঁ। শুনেছি লোকটার পয়সা কড়ি কিছু আছে। তাও ঘর ঘরে একখানা মটরও না কি আছে। কিন্তু নিজের বাড়ী ছেড়ে শ্বশুর বাড়ীর ওপর তার এত টান কেন বলতে পারিস? আর কেনই বা দিন রাত সেখানে পড়ে থাকেন, এ রহস্যের কিছু খবর রাখিস?

—না। কিন্তু এ সব তুমি কি বলছ দাদা?

—ঠিকই বলছি, শোন। যখনি সেখানে গেছি, দেখেছি কেষ্ট ঠাকুর আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন সেখানে। মধুর ওপর মাছি বসলে যে অবস্থা হয়, দেখতাম তারও সেই অবস্থা।

—বাড়ীর বড় জামাই, তিনি যদি আসেন, দোষটা কোথায় দাদা?

শুভেন্দু বলে, দোষ গুণ কিছু জানি না বোন, যা দেখেছি, তাই বলছি। দুরদৃষ্ট আমার, তাই সে দিন গিয়েছিলাম ও বাড়ীতে। তখনও সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে নি, একটা আবছায়ায় ঘরখানি ঢাকা। দেখি দোতালার ঘরখানিতে রয়েছে তোর বৌদি আর মুখুজ্জে মশাই।

রমা অবাক হয়ে যায়। বলে, এইটাই কি তোমার আপত্তির কারণ? আমারও ভগ্নীপতি থাকলে এর ব্যতিক্রম ত আমার দ্বারাও সম্ভবপর হত না দাদা! শুভেন্দু রমার শেষের কথায় কান না দিয়েই বলে, এইটাই একমাত্র কারণ না হলেও এটাকে ত তুচ্ছ করা যায় না রমা। বিশেষতঃ যখন দেখলুম সেই অসময়েও মুখুজ্জে মশাই শুয়ে আছেন ঘরের ভেতর আর তোর বৌদি চুল নিয়ে খেলা করবার অছিলায়, হেসে লুটিয়ে পড়ছে তার গায়ের ওপর।

রমা বলে, শালী ভগ্নিপতির মধ্যে রহস্যালাপ এত চিরাচরিত ব্যাপার। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কি আছে।

শুভেন্দু একটু যেন হকচকিয়ে যায়। বোনের মুখের দিকে চকিতে তাকিয়ে দেখে বলে, অস্বাভাবিকতা এর মধ্যে নেই কিন্তু ছিল তোর বৌদির ব্যবহারে। সেই যে মুখ ফিরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে, আর দেখা পেলুম না তার। কেন জানিনা, সে দিন বাড়ী যখন ফিরে এলুম, তখন মনের সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হ'ল, একটা গলদ যেন রয়ে গেছে এর মধ্যে।

ব্যাপারটাকে যতখানি চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছিল শুভেন্দু, ঠিক ততখানি করতে পারল না সে। কেমন যেন বেসুরা ঠেকল নিজের কানেই। কিন্তু রমা সে দিকে মন দিল না। প্রশ্ন করল, বৌদিকে একথা জানিয়েছিলে দাদা?

—না।

—কেন ?

—প্রবৃত্তি হয় নি। নিজের স্ত্রীকে এতখানি ছোট ভাবতে বিবেকে বাধল।

—অথচ মন চাইছে না সেই বিবেককে মানতে ?

শুভেন্দু নিরুত্তর।

রমা বলে, আশ্চর্য ! অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা, যাকে যাচাই ক'রে দেখবার মত মনোবল হ'ল না তোমার, তাকে অবলম্বন ক'রে সব দোষের ভার একজনের কাঁধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলে তুমি ? কর্তব্য সেইখানে শেষ হ'য়ে গেল তোমার ?

—না, এর পরেও ঘটনা আছে। সেইটা আরও মর্মান্তিক।

রমা এবার প্রশ্ন করে না, তবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দুর মুখের দিকে। শুভেন্দু বলতে চায়, সন্ধি করবার বাসনা নিয়েই সে দিন গিয়েছিল সে আবার। কিন্তু সন্ধি ত হ'লই না বরং ব্যবধান বেড়ে গেল আরও। প্রথম দিনের সন্দেহ দৃঢ়ভূত হ'ল তার মনে।

—প্রথম দিনে ত কোন সন্দেহই ছিল না দাদা। তা হলে দৃঢ়ভূত হ'ল কি ? রমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় শুভেন্দুর মুখের দিকে। এ দৃষ্টি শুভেন্দু সইতে পারে না। কেমন অস্বস্তি বোধ করে। তবুও বলে, ছিল। আমার মন যখন বলছে তখন ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু থাকগে এ সব কথা।

—না, থাকবে কেন, তুমি বল। রমা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ে।

—এর পর আরও তুই শুনতে চাস রমা ?

—চাই। তুমি চোরা বালিতে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছ। সাবধান না হলে, এ বালি গ্রাস করবে তোমায়।

—তার কি কিছু বাকী আছে রে। প্রথম দিন করে ছিল অর্ধগ্রাস, শেষের দিন করল পূর্ণ গ্রাস। শেষের দিনের ঘটনাটা বলি শোন।

শুভেন্দু বলে চলে, দ্বিতীয় দিনও সে আবিষ্কার করেছিল দুজনাকে সেই একই ঘরেতে একেবারে মুখোমুখি। পূর্ণিমা বসেছিল তাঁর মুখুজ্জে মশাইয়ের সামনে এক অপরূপ ভঙ্গিমায়। তাদের দুজনার মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ইঞ্চি কয়েক। পূর্ণিমার ঠোঁটে কাঁপন। শুভেন্দুকে দেখে—।

রমা আর সইতে পারে না। তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠে, এ তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বল দাদা ?

শুভেন্দু তাকায় উদাস দৃষ্টিতে। বলে, সে তোর ইচ্ছে বোন। ইচ্ছে হয় করিস, না হয় না করিস। এ আমার নিজের চোখে দেখা।

রমা প্রতিবাদ করে বলে, ভুল দেখেছ দাদা। আর যদি দেখেই থাকে, চোখ দিয়েই দেখেছ শুধু ; মন দিয়ে নয়। বৌদিকে একবার যদি জিজ্ঞেস করতে, সব বিবাদই ভঞ্জন হয়ে যেত সে দিন।

—সেটাও বাকী রাখিনি রমা।

—কি বললে বৌদি ?

—রণরঙ্গিনী মূর্তি তার। বললে, ভদ্র লোকের বাড়ী এটা। ভদ্র লোকের মন নিয়ে যদি আসতে পার এস, নইলে আমার দেখা আর পাবে না।

রমা একটু চিন্তা করে। তারপর আবার প্রশ্ন করে, মুখুজ্জে মশাইয়ের বয়স কত হবে দাদা ?

একটু ভেবে শুভেন্দু উত্তর দেয়, ষাটের কাছাকাছিই হবে। কেন বল ত ?

—তাই বলছি। বৌদি আমারই সমবয়সী, মুখুজ্জে মশাইয়ের মেয়ের মত। এখানেও সঙ্গে যদি চলাচল করে, সংসারে বাস করাই যে দায় হবে দাদা।

শুভেন্দু উত্তর দেয় না। নিরুত্তর থাকে।

রমা বলে চলে, তোমার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন এক দিনের নয়। মনের পুরোণ বনেদে জোর ছিল না। তাই একটুতেই ভেঙে পড়েছে। এর জন্যে দায়ী কণা ব্যানার্জি। তোমার অবচেতন মনের তলে তলে কণা যে বে-আইনী রাজা-বিস্তার করছিল, তুমি সে বিস্তারে বাধা দাও নি। তাই সে জয় করেছে তোমাকে। এ বিশ্বাসঘাতকতা।

শুভেন্দু চকিত হয়ে উঠে। বলে, আমি বিশ্বাসঘাতক!

রমা বলে, তুমি নও, তোমার আচরণ। এ সমর্থন যোগ্য নয়। বিবাহিত জীবনেই তুমি কণার অনুরক্ত হয়ে উঠেছ। এ শুধু অন্যায় নয়, স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তার একনিষ্ঠতাকে অসম্মান করা।

শুভেন্দু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। রমার ঈষদুত্তেজিত মুখের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

রমা থামে না। বরং আরও কঠোর ভাবে বলতে থাকে, আজ যদি কণা তোমার মনের মধ্যে এতখানি তরঙ্গ না তুলত, পারতে কি বৌদির ওপর এতখানি নির্দয় হতে? পারতে না। তোমার এই নির্দয়তার অন্তরালে রয়েছে তোমার এই ছিদ্রান্বেষী মন। তাই একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এতখানি হৈ চৈ।

শুভেন্দু অবাক হবার চেষ্টা করে বলে, এটা তুচ্ছ হ'ল রমা?

রমা তেমনি দৃঢ়ভাবেই বলে, শুধু তুচ্ছ নয়, অসত্য। আর তাকেই তুমি প্রশ্রয় দিচ্ছ নতুনত্বের মোহে। তারপর একটু থেমে আবার বলে, পুরুষের অধিকার নিয়ে যে নৃশংসতা মেয়েদের ওপর ক'রে থাক তোমরা, মা বসুমতীর জাত বলেই তারা, আজও তোমরা টিকে আছ এই পৃথিবীর ওপর, নইলে ফসিলে পরিণত হয়ে যেতে কোন দিন।

শুভেন্দু একটু অসহায় ভাবে বলে, আজ থাক রমা, অনেক দেরী হয়ে গেল আমার।

—বেশ, তুমি কথা দিয়ে যাও, এত বড় অন্যায় হ'তে দেবে না তুমি।

শুভেন্দু ইতস্তত: করে। তারপর দুর্বল কণ্ঠে বলে,—কিন্তু কণা? তার প্রতি কি অন্যায় করা হবে না?

—না। আর যদি হয়, তার প্রতিকার আছে, কিন্তু ওর নেই।

এই সময় বাইরে যোগমায়ার কণ্ঠ শোনা গেল। শুভেন্দু উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল। পর্দার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বলল, ঐরে মা আসছেন। সঙ্গে প্রবীরকেও দেখছি। আমি এখন আসি বোন। তুই থাক। বলতে বলতে পাশের দরজা খুলে ক্ষিপ্রপদে বারান্দার মধ্য দিয়ে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে যোগমায়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল রমা। বলছিল, এখানে বিচার বুদ্ধি, ন্যায় নীতির কোন ধার ধারেনি দাদা। কণার প্রতি অবিচারটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু বৌদিদির দিকে লক্ষ্য নাই। কণার প্রতি এই যে তার দুর্বলতা এ সৃষ্টি হয়নি একদিনের মধ্যে। এর পেছনে রয়েছে এক পুরাণ ইতিহাস, আর তাই থেকেই এর সূত্রপাত।

যোগমায়া অবাক হয়ে যান। বলেন, সে আবার কি কথা।

রমা বলে, কথাটা নতুন শুনলে বলেই অবাক হচ্ছ মা, নইলে অবাক হবার কিছু নেই এতে। দাদাটি আমার সাধুপুরুষ নয়।

প্রবীর প্রশ্ন করে, সাধুপুরুষ নয় মানে?

রমা স্বামীর দিকে না তাকিয়েই বলে, পুরুষেরা সাধু কোনদিনই নয়। তাই দাদাও নয়।

প্রবীর বলে, এ কথার আমি প্রতিবাদ করি মা। শুভোদা সাধুপুরুষ নয় এ কথা যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ মনগড়া কথা আমি বিশ্বাস করি না।

রমা স্বামীর দিকে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করে বলে, বিশ্বাস করবার জন্যে কাউকে আমি সাধছি না। ঝাঁকের পাখি, সব এক জাতের।

প্রবীর ভাল মানুষের মত বলে, ঝাঁকের পাখীরা সব এক জাতের মানলুম। কিন্তু যারা ঝাঁকের পাখী নয় তারাও ত প্রমাণ দেখাতে পাচ্ছে না কিছু।

রমা স্বামীর দিক থেকে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বলে, প্রমাণের অভাব কিছু নেই, মা। দাদা নিজের মুখেই সব কথা স্বীকার করেছে। বলেছে কণা ব্যানার্জিকে বিবাহ করবেই। তাদের মেলামেশার সূত্রপাত আজ হয়নি, হয়েছে অনেক দিন আগে।

যোগমায়া গালে হাত দিয়ে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বলেন, কি কাণ্ড দেখ।

প্রবীর মাথা নেড়ে বলে, এ অবিশ্বাস্য মা। শুভোদা তেমন ছেলেই নয়। আর তাই যদি হয়, আমি সেটেল্‌ড্‌ ক্যাণ্ডকে আন-সেটেল্‌ড্‌ করে ছাড়ব।

রমা ভ্রূকুটি ক'রে। বলে, তীব্র রোষ গেল তবু—। আচ্ছা মা, বাবা যে রাঘব বাঁড়ুয্যের কাছে গিয়েছিলেন, কি বললেন তিনি?

—তিনিও এ ব্যাপারে আঘাত পেয়েছেন খুব। কথা দিয়েছেন, অন্যায় যাতে না হয়, তার প্রতিকার যথাসাধ্য করবেন। একটু হেসে বলেন, কত উঁচু মাথা ওঁর আজ মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বসেছে।

যোগমায়া চুপ করে যান। রমাও চুপ করে থাকে। ঘরের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা এসে যায়। একটা দুর্ভাবনা যেন সকলকার মধ্যে চেপে বসে। এরই মধ্যে রমা এক সময় বলে, একটা বড় রকমের গলদ কোথাও রয়ে গেছে মা। এ দূর না হ'লে শান্তি পাবে না কেউ। আমি বৌদির সঙ্গে দেখা করতে যাব। তাকে একবার যাচাই ক'রে দেখতে চাই। আমার চোখে সে ধুলো দিতে পারবে না।

চাকর এসে খবর দিয়ে গেল সাহেব ফিরে এসেছেন। যোগমায়া উঠে পড়েন। যেতে যেতে মেয়েকে বলেন, যা ভাল বুঝিস কর মা, আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না কিছু।

যোগমায়া দরজা দিয়ে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীর লাফিয়ে উঠে। বলে, যা ভ্যাবা ভ্যাবা চোখ, ওতে ধুলো দেবে সাধ্য কার?

রমা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে বিঁধে বলে, দেখ, ভাল হচ্ছে না বলছি। তখন থেকে তুমি আমার পেছনে লেগেছ। মায়ের সামনেও আমায় অপমানিত করেছ।

প্রবীর প্রতিবাদ করে, তোমার বাড়ীতে বসে তোমায় অপমানিত করি সাধ্য কি আমার। বরং তুমিই স্বামী ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ আমায় ব্যাং বলে।

রমা অবাক বিস্ময়ে গালে হাত দিয়া বলে, ওমা! কখন বললুম ও কথা।

—প্রত্যক্ষ বলনি বলেছ পরোক্ষে। প্রত্যক্ষ বলেছ হাতী ঘোড়া গেল তল, আর পরোক্ষে বলেছ, ব্যাং বলে কত জল। এখানে পরোক্ষটাই হ'ল মুখ্য।

রমা প্রতিবাদ করতে ভুলে যায়। অপ্রতিভ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রবীর বলে, কিন্তু যাই বল, তোমার দাদাকে সত্যিই হিংসে করতে ইচ্ছে হয় রুমি।

—দাদার অপরাধ?

—অপরাধ নয় গুণ। উঃ, কি বরাত আমার! একটা মেয়ের ভালবাসা জোটে না, কত সাধ্য সাধনা, আরাধনা, তবুও মন পাওয়া যায় না। আর তোমার দাদা! একেবারে জোড়া জোড়া।

– তোমার চাই আর একটা?

—চাইলেই কি পাওয়া যায়। কণা বানার্জির মত মেয়ে, হাজারে একটা মেলে। তার ভালবাসা অমূল্য সমান।

—কী হ্যাংলা তোমরা। ভাল তোমরা বাসতে জান না। তোমাদের দৃষ্টি শুধু মেয়েদের রক্ত মাংস দিয়ে গড়া এই দেহটার ওপর। একটাতে অরুচি হলে আর একটা চাই।

—এটা তোমার অবশ্য দোষারোপ রুমি।

—দোষারোপ; তবে অবশ্য নয়।

—মেয়েরা লুব্ধ করে পুরুষদের তাদের বিচিত্র মেয়েলী বৃত্তির দ্বারা। সৃষ্টি প্রয়াসী পুরুষ তাতেই লুব্ধ হয়।

—অতএব দোষ মেয়েদের।

—সে তুমি বুঝতে পেরেছ তোমার দাদাটিকে দেখে। তোমার বৌদির অতবড় সৌন্দর্য তাকে রাখতে পারল না আগল দিয়ে।

রমা উত্তেজিত হয়ে উঠে। চোখ মুখ লাল ক'রে বলে, বুঝতে পারছি শুধু দাদাটিকে দেখে নয়, তার ভগ্নীপতিটিকেও দেখে। সৃষ্টি প্রয়াসী মন উড়ু উড়ু করছে মেয়েদের পেছনে পেছনে। লজ্জা করে না এই হ্যাংলামি করতে? বলে কিনা সৃষ্টি প্রয়াসী মন। যত অনাসৃষ্টি কথা! এতদিন ঘাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলুম, এবার আটন দিতে হবে দেখছি।

প্রবীর হাত জোড় করে বলে, দোহাই রুমি, ক্ষমা দাও, আর না। ধাপে ধাপে নেমে এসেছ অনেকখানি। বিপদী থেকে একেবারে চতুষ্পদীতে। আর একটু নামলে কোন পদীরই তল পাবে না।

রমা লজ্জিত হয়ে পড়ে। একটু থেমে থেমে বলে, বেশ ঘাট হয়েছে। আর কখনও কোন কথা যদি বলি তোমায়।

প্রবীর স্মিত মুখে বলে, অয়ি কমলাক্ষী! বলবে না কেন, একশো বার বলবে। আর তুমি না বললে এমন মিষ্টি মিষ্টি করে বলবেই বা কে? এখন চল দিকি, তোমার দাদার সেটেল্‌ড্‌ ক্যাক্টকে কি করে আনসেটেল্‌ড্‌ করতে পারি দেখি।

—তুমি করবে? তা হলেই হয়েছে। সৃষ্টি প্রয়াসী মন তোমাদের আর এক অনাসৃষ্টি করে বসবে। এ মাপ জোপের কাজ নয়। এখানে বুদ্ধির দরকার। সে বুদ্ধি তোমার ঘটে নেই। তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ, কি করতে পারি আমরা। দেখি, বাবা কি খবর আনলেন। বলতে বলতে প্রবীরকে পিছনে রেখেই রমা ঘর থেকে বার হয়ে যায়।

শুভেন্দুর বিবাহ দিয়েছিলেন যোগমায়া অনেক বাছ বিচার ক'রে, পাঁজি পুঁথি দেখে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরামর্শ নিয়ে যে লগ্নটি সর্বাপেক্ষা মনমত হয়েছিল তাঁর, সেই লগ্নেই ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন পূর্ণিমার সঙ্গে। কাহিনীটি গর্বভরে শোনাতেন তিনি পূর্ণিমাকে। পূর্ণিমা শুনত আর মনে মনে ভাবত নিজের সৌভাগ্যের কথা। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হ'তে পারে। রূপবান গুণবান স্বামী আর উদার চরিত শ্বশুর শাশুড়ী। পূর্ণিমা স্বামীকে ভালবেসেছিল মন প্রাণ দিয়েই, হয়ত জীবনে প্রথম প্রেম বলে বাড়াবাড়ি করেছিল একটু তাই আজ এই শাস্তি। সে ভাবতে পারে নি উদারচেতা স্বামীর মধ্যে এতখানি অনুদারতা গোপন থাকতে পারে, এতখানি নির্মমতা। স্বামীর ভার নীতিকে ভালবেসেছে সে কিন্তু অন্যায় নীতিকে পারে নি। এইখানে বেধেছে গণ্ডগোল। অভিমানী মেয়ে পূর্ণিমা, জেদী মেয়ে, স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে; সে কথা সঙ্গে জানিয়েও দিয়েছে মুখের উপর। কিন্তু তার প্রতিশোধ স্বামী যে এ ভাবে নিতে পারে এ ছিল তার সব অনুমানের বাইরে। এর চেয়ে বড় অসম্মান মেয়েদের পক্ষে আর কি হতে পারে। এই কথাটাই ভাবছিল সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তারই মাঝে বিদ্যুতের চমক। পূর্ণিমা নির্নিমেষ হারা হয়ে তাকিয়েছিল সেই দিকে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ তার যে সিক্ত হয়ে উঠছে এ খেয়ালটুকু তার নাই। সে দাঁড়িয়ে আছে যেন একখানা নিশ্চল প্রতিমা।

ঘরের ভিতর দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায় রেণুকা—পূর্ণিমার বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠিনী। তন্বী শ্যামাঙ্গী মেয়েটি, যৌবনশ্রীতে চল চল। মনোরম দাঁতগুলি তার মুক্তার মত ঝকঝকে। হাতে বেঁটে ছাতা, কাঁধ থেকে ট্র্যাপে ঝোলান চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ।

রেণুকা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমাকে লক্ষ্য করে। তারপর তার কানের কাছে মুখ এনে মৃদু কণ্ঠে গান ধরে,

কে এল প্রাণের তারে,
কোন অতিথি নূতন সুরে।
ঘুমাঘুম বাজিয়ে দিল
হৃদয় গগন কোন নূপুরে।

পূর্ণিমা চমকে উঠে। তাকিয়ে দেখে হেসে ফেলে বলে, মরণ! তুই! কখন এলি?

রেণুকা তেমনি ভাবেই সুর করে বলে,

কখন এলেম, কখন এলেম, কেমন করে বলি,
তখন তুমি ভাবছ ধ্যানে তোমার বনমালী।

পূর্ণিমা বলে, বেশ ভাই। তোর কথাই মেনে নিলুম। কিন্তু আমার বনমালী তোর প্রাণে এতখানি রসের প্রস্রবণ বহাল কি করে?

রেণুকা সুর থামায় না। আবার বলে,

রস নয়, রস নয়, রসের পাথার,
তাহাতে নামিয়া সই দিব গো সাঁতার।

—কি জ্বালা! হ'ল কি তোর আজ? কথায় কথায় ছড়া। বরবর টরবর কিছু হবি না কি রে?

—হুঁ। শুধু বরই জোটে না তার আবার বরবর। আমাদের পাথর চাপা বরাত তাই। তোদের মত শালপাতা চাপা হ'লে এত দিনে বিয়ে হত নিশ্চয়ই।

গুরু নিশ্বাসে পূর্ণিমার বুক ভারী হ'য়ে আসে। নিশ্বাস চেপে বলে, পাথর চাপাই ভাল ভাই। শালপাতার খড়াট অনেক। হ'লে বুঝতিস। কিন্তু এত দিন পর হঠাৎ মনে পড়ল যে?

—হঠাৎ নয়। মনে রোজই পড়ে। তবে আসতে পারি নি। আজ দূর থেকে দেখলুম, কি দেখলুম জানিস,

মেঘ মেদুর মুখ, মনে নাহি কোন সুখ,
ছল ছল আঁখি পাতে ঘরে জল ঝরণা,
নতো পানে চেয়ে সখি! ভাব কি যে ভাবনা।

ভাবলুম, কালো বরণ মেঘ, হয়ত নতুন ক'রে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে কানুর কথা। বিজলীর চমক হয়ত মনের কোণে জেলে দিয়ে গেছে অভিসার রাতের বাধা। তাই পূর্ণিমে এতখানি আনমনা। মেঘ গলে সারা অঙ্গ যে ভাসিয়ে দিয়ে গেল বৃষ্টির ধারায়, সে হুঁসটুকু পর্যন্ত নেই।

পূর্ণিমা লজ্জিত হয়। বলে, বড় ভাল লাগছিল ভাই। অনেক দিন এমন দৃশ্য চোখে পড়ে নি।

—ভাল লাগবারই কথা পূর্ণিমা। সাদা চোখে এ সব দৃশ্য সকলের চোখে পড়ে না।

—মানে?

—মানে, বিরহের কাজল চোখে না মাখলে এমন রূপ ত দেখা যায় না। কিন্তু ঠাকুরটির খবর কি?

—ঠাকুর? কোন ঠাকুর?

গালে হাত রেখে রেণুকা বলে, অবাক করলি পূর্ণিমে। ক'জন ঠাকুর আছে তোর। সব-ঠাকুরের সেরা যিনি, সেই শুভো ঠাকুর।

পূর্ণিমা ম্লান হেসে বলে, শুভ অশুভ কারোর খবরই রাখিনে ভাই। ঠাকুরেরা আজকাল আর কেউ রক্ষণশীল মন যে একজনেরই খবরদারীতে থাকবেন তাঁরা। আজকাল তাঁরা সব বিশ্বজনীন।

—বিশ্বজনীন? সে আবার কি?

—সার্বজনীনের হিড়িকে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন বিশ্বময়। সুতরাং তাঁদের খবর কারো সর্বস্ব সংরক্ষিত নয়।

মাই গুড্‌নেস! পূর্ণিমে, আমার বুক ধড়ফড় করছে। সার্বজনীন, বিশ্বজনীন, সর্বস্বসংরক্ষিত এরা সব মাথা গুলিয়ে দিয়েছে আমার। ব্যাপার কি?

—কিছু না। আমায় জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পাবি না কিছু।

রেণুকা চুপ ক'রে যায়। ক্ষণকাল পূর্ণিমার মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে। সেখানে কিসের যেন একটা সন্ধান পেয়ে সে চমকে উঠে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, একটা প্রশ্ন করব তোকে আজ। আমার কাছে লুকোবি না কিছু বল? না, না, মুখ ফেরালে চলবে না। আমার দিকে তাকিয়ে বলতে হবে তোকে। যতবারই তোর মুখের দিকে তাকাচ্ছি, ততবারই মনে হচ্ছে, যেন ম্লান, এমন শ্রীহীন মুখচ্ছবি এর আগে দেখিনি কখনও। কারণ কি বল ত?

পূর্ণিমা উত্তর দিতে গেল। কিন্তু অজান্তে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। মাথা নেড়ে বলল, জানি না।

—জানিস। শুধু লুকোচ্ছিস আমার কাছে। তোর মনে শান্তি নেই। সুখের লেশটুকুও চোখে মুখে নেই। এ আমি স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি। এই বয়সে তুই যেন বুড়ি হ'বার সাধনা সুরু করে দিয়েছিস। বিয়ে করে এ কি হ'ল তোর পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা হাসবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল বটে কিন্তু মুখখানা শুধু বিকৃত করাই সার হ'ল। হাসি সেখানে ফুটল না। কোনমতে বলল, তুই ভুল বুঝেছিস রেণু।

রেণুকা অভিমানাহত কণ্ঠে বলে, বেশ তাই। কিন্তু তোমায় আমি এই প্রথম দেখছি না পূর্ণিমা। ইস্কুলে আমাদের সবাই বলত মাণিক জোড়। অতোগুলো মেয়ের মধ্যে আমারই ছিলুম হরিহরাত্মা। তাই তোমার প্রতিটি হাবভাব আমার মনের মধ্যে গাঁথা। সেগুলো ত মুছে দিতে পারবে না। আজ যার কাছ থেকে কথা গোপন করতে চাইছ, জেন, সেই তোমার এক মাত্র সুহৃদ।

—রেণু ভাই—। পূর্ণিমা অশ্রু গোপন করবার চেষ্টা করল। একটা অদম্য উচ্ছ্বাসে সে যেন ভেঙে পড়তে চাইল। সমস্ত শরীরটা তার কেঁপে উঠল। কিন্তু বাধা দিল রেণুকা। তড়িৎপদে সামনের দিকে এগিয়ে এল, পূর্ণিমার হাত ধরে মুখের কাছে মুখ এনে গাঢ়স্বরে ডাকল, পূর্ণিমে।

এর পর আর অশ্রু বাধা মানে না। দু চোখ উপচে পড়ে পূর্ণিমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে দুহাতে মুখ ঢাকে।

রেণুকা সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে, বুঝেছি বোন, তোর এই চোখের জল, এই যোগিনী বেশ, আমায় বুঝিয়ে দিল সব। আজ পরিষ্কার হয়ে গেল সেদিনের সেই ঘটনাটা।

প্রিয়জনের একটু স্পর্শ, একটু সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর আর্তের অন্তরে বিপ্লব বাধিয়ে দেয়। সযত্ন রচিত প্রতিরোধের সকল বাঁধকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। পূর্ণিমারও হল তাই। প্রিয় বন্ধুর সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর তার সকল সংযমের মূলে কুঠারাঘাত করে বসল। অশ্রু তার প্রতিরোধের বাঁধ হারিয়ে তাকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সে দু'হাতে মুখ ঢাকল। রেণুকা বিস্মিত হল। পূর্ণিমার মাথায় হাত রেখে বলল, তোর ঠাকুরের খবর কি ভাই?

—ভাল।

—তবে? হঠাৎ রেণু চঞ্চল হয়ে উঠে। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, হ্যাঁরে, আজকাল ঠাকুর কি তোকে আর তেমন স্নেহ করেন না।

পূর্ণিমা এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তার হাত রেণুকার হাতের মধ্যে থেকেই কেঁপে উঠে। রেণুকা বলে চলে, তোর এই চোখের জল, এই যোগিনী বেশ মনের মধ্যে সোর বাধিয়ে বসেছে ভাই। ঠাকুরেরা যে আজকাল সর্বস্ব সংরক্ষিত নয়, আজকাল তারা বিশ্বজনীন হয়ে পড়েছে তোর এই ছাড়া ছাড়া কথা মনের কোণে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। প্রশ্নটা করবনা ভেবেছিলুম। কিন্তু এরপর না করেও আর পারিনা। যা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি বলবি?

পূর্ণিমা অস্ফুট কণ্ঠে বলে, কি?

—সেদিন দেখলুম গুণ্ডা ঠাকুরকে। ঠাকুর মটর থেকে নামছেন। নিজে নেমে হাতে ধরে নামালেন একটি মেয়েকে। নাম তার কণা। নামটা জেনেছিলুম পরে। দুজনে ব্যস্তসমস্তভাবে ঢুকলেন সিনেমাতে। ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারলুম না ভাই। পূর্ণিমার মুখ ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে আসে। অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তুই দেখেছিস?

—দেখেছি বলেই ত বলছি। আমার পাশ দিয়েই ত দুজনে গেল হাসাহাসি করতে করতে। কে ভাই মেয়েটি, পূর্ণিমা?

পূর্ণিমার মুখ বিবর্ণ। কে যেন অতি নিষ্ঠুরভাবে তার মর্মস্থলে আঘাত হেনেছে। অতি করুণ

দৃষ্টিতে সে রেণুকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠোঁট দুখানি কেঁপে কেঁপে উঠে থর থর করে। রেণুকা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে পূর্ণিমা, কি হল ভাই? এত আঘাত পাবি তুই, এ আমি জানতুম না। আমায় মাপ কর ভাই।

পূর্ণিমা বুকের উপর জোর করে একটুখানি ম্লান হাসি টেনে এনে বলে, না ভাই রেণু, তোর দোষ নেই। অন্যায় তুই কিছু করিসনি। সবই আমার অদৃষ্ট। তারপর একটু থেমে কুণ্ঠিত মুখে প্রশ্ন করে, আচ্ছা, কণার কথা বলছিলি না, কেমন দেখতে তাকে রে?

রেণুকা সবিস্ময়ে পূর্ণিমার মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে বলে, তুই দেখিসনি তাকে? তোদের কেউ হয় না সে?

পূর্ণিমা মাথা নাড়ে। বলে, না। সম্পর্ক এতদিন ছিল না। হয় ত' হতে চলেছে এবার।

রেণুকার বিস্ময় বেড়ে যায়। সে তেমনিভাবে পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, পূর্ণিমা! আমায় অবিশ্বাস করিস না ভাই। আমার দ্বারা কোন অনিষ্ট হবে না তোর। গোপন না করে, সব কথা খুলে বল, ব্যাপারখানা কি?

পূর্ণিমা নতমুখে বলে, মেয়ে হয়ে এর পরও যদি কিছু বুঝে না থাকিস রেণু, আর বোঝাবার সাধ্য আমার নেই।

রেণুকা কেটে পড়ে, কি! অনাচার করবেন গুভো ঠাকুর ঐ কণাকে নিয়ে আর তাই সহে যাবি তুই?

—উপায় কি ভাই। হয় ত অনাচারই একদিন লোকাচারে পরিণত হবে?

—লোকাচার মানে? রেণুকা ভ্রূ কুঞ্চিত করে!

পূর্ণিমা নিরুত্তর থাকে।

রেণুকা প্রশ্ন করে আবার, লোকাচার মানে বিয়ে করবেন কণাকে? তুই বেঁচে থাকতে? জানলি কি করে?

পূর্ণিমা ঘাড় হেঁট করে বলে—শুধু আমি নই। বাড়ীতে জেনেছে সবাই। আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন মা! পাগলের মত ছুটোছুটি করছেন বাবা। বৌদি, ছল ছল চোখে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলেন।

—অপরাধ তোর?

পূর্ণিমা আবার নিরুত্তর। অপরাধীর মত মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। রেণুকা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, পূর্ণিমা, এতবড় অমোঘ শাস্তি মাথায় নিয়ে তুই চুপ করে থাকবি, তবু বলবি না কিছু?

পূর্ণিমা বড় অসহায় বোধ করে। স্খলিত কণ্ঠে বলে, আমিও একেবারে নিরপরাধী নই, রেণু। নিষেধ করেছিলুম তাঁকে এ বাড়ীতে আসতে।

রেণুকা অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়। পূর্ণিমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলে, বলিস কি পূর্ণিমা! তুই নিষেধ করেছিস তাঁকে এ বাড়ীতে আসতে? এত বিশ্বাস হয় না আমার।

পূর্ণিমা আর নিজেকে সামলাতে পারে না। দু-হাতে মুখ ঢেকে একেবারে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে ফেলে। রেণুকা বোঝে, এ সঞ্চিত অশ্রু ধারা। অন্তরের বাষ্প বিগলিত হয়ে নির্গত হয়ে আসছে

এ অন্তর্ধারার সঙ্গে। তাই সে বাধা দেয় না। শুধু পূর্ণিমার মাথাটি নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে থাকে। কিছুক্ষণ পর শোকের বেগ কিছুটা প্রশমিত হলে, রেণুকা বলে, তোদের স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তার মধ্যে নিজেকে জড়ান উচিত হবে না আমার। কিন্তু ব্যাপারটা এতখানি গুরুতর যে অভিমান করে দূরে সরে দাঁড়ালে কর্তব্যচ্যুত হব আমি। তাই সবকিছু না জেনে নড়ব না এখান থেকে। পূর্ণিমা মুখ তোল।

পূর্ণিমা মুখ তোলে। অশ্রুসিক্ত মুখ, তাতে জল পদ্মের শোভা। বলে, আমি বলেছিলাম তাঁকে, ভদ্রলোকের বাড়ী এটা, ভদ্র মন নিয়ে যদি আসতে পার এখানে, এস। নইলে আমার দেখা পাবে না আর। এই আমাদের শেষ। রেণুকা চমকে উঠে বলে, ঠাকুরকে এত বড় রূঢ় কথা বলতে পারলি তাই, তুই ?

—পেরেছিলুম এ শুধু নিজের নারী-ধর্মের, স্ত্রী-ধর্মের সম্মান রক্ষার জন্যে। তীব্র অপমানের জ্বালায় এতখানি রূঢ়, এতখানি নির্দয় সেদিন হতে পেরেছিলুম আমি।

—রেণুকা অবাক হ'য়ে বলে, তোমার স্ত্রী ধর্মকে অসম্মান করবার দুঃসাহস কার হয়েছিল পূর্ণিমা ?

—এ সাহস সকলের হয় না ভাই, হয় একজনেরই। অথচ অতি তুচ্ছ ঘটনা। আমার ভগ্নীপতি মুখুজ্জে মশাইকে জানে সকলেই। ঋষিতুল্য লোক। আমাকে মানুষ করেছেন এক রকম কোলে পিঠে করেই, এতটুকু বয়স থেকে। নিজের দাদার চেয়েও তাঁকে শ্রদ্ধা করি আমি। সেদিন পথ থেকে জ্বর নিয়ে এসে উপস্থিত আমাদের বাড়ী। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। বৌদি বাতাস করছিলেন। আমি মাথায় জলপটি লাগিয়ে একটু হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। দাদা আপিস থেকে ফিরতে বৌদি উঠে গেলেন। এই নিয়ে রসিকতা করছিলেন মুখুজ্জে মশাই। এমন সময় উপস্থিত হ'লেন তোর ঠাকুর।

রেণুকা টিপ্পনি কেটে বলে, ঠাকুর শুভাগমন করবার মত প্রশস্ত সময় পেলেন না আর।

—ভাব দেখে অবাক হয়ে যাই নিজেই। ঝড়ের যেন পূর্ব লক্ষণ এমনি থমথমে মুখের ভাব। কিন্তু প্রশ্ন করবার সময় পেলুম না। সামান্য ছুতো ক'রে রাগ দেখিয়ে চলে গেলেন গটগট ক'রে। মুখুজ্জে মশাই যে তাঁর এ রাগের লক্ষণ এ বুঝিনি সেদিন, বুঝেছিলুম পরে।

—এর পরের ঘটনাও আছে বাকি ? রেণুকা প্রশ্ন করে।

পূর্ণিমা ঘাড় নেড়ে বলে, আছে। দুর্ভাগ্য এমনি ক'রেই আসে। দিদির মেজ ছেলে বৃত্তি পেয়েছে পরীক্ষায়, সেই শুভ খবরটা দিতে এসেছিলেন মুখুজ্জে মশাই। এসে, সে এক কাণ্ড। দমকা বাতাসে চোখে উড়ে এসে পড়ল কতগুলো ধুলো বালি। চোখ নিয়ে অস্থির ভদ্রলোক। আমি হাঁটু গেড়ে বসে ফুঁ দিচ্ছিলাম চোখে। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার আবির্ভাব হ'ল তোর ঠাকুরের। একেবারে দুর্বাসার মূর্তিতে।

—দুর্দৈব। ঠাকুর কি পূর্বাহ্নে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আসেন নাকি ?

—জানি না। তবে সে দিন সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন না। বিচার করে রায় দিয়ে তবে গেলেন। রায়ে প্রকাশ করলেন না, কোন ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে সে কথা শোনা অস্বাস্থ্যকর।

রায় শুনে রেণুকা স্তম্ভিত হয়ে যায়। সামান্য ঘটনা, একে উপলক্ষ্য ক'রে নিজের স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে যে লোক এতখানি সন্দিহান হতে পারে, এতখানি অস্বাস্থ্যকর উক্তি করতে পারে, তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। রেণুকা গালে হাত দিয়ে বলে, প্রতিবাদ করলিনে কেন ?

পূর্ণিমা হাসে। বড় করুণ ম্লান হাসিটুকু তার। বলে, অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি করিনি ভাই। কিন্তু হিতাহিত জ্ঞান বর্জিত যে, তার মনুষ্যত্ব তখন কোথায়? রেণু, মেয়েমানুষ সর্বংসহা। কিন্তু তাই বলে যা নিয়ে তার গর্ব, যাকে অবলম্বন ক'রে সসম্মানে তার বেঁচে থাকা, সেই নারীত্বকে পদদলিত হ'তে দেখে সেদিন সকল সংযম হারিয়ে ফেলেছিলুম আমি। বলতে বলতে পূর্ণিমা অভিভূত হয়ে পড়ে। তার দু'চোখ বেয়ে আবার অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। রেণুকাও কেমন হকচকিয়ে যায়। বলে, এ কি অমানুষোচিত আচরণ, কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্বরের মত। অপরাধ কোথায় যে এত বড় পাহাড় প্রমাণ শাস্তি! বলতে বলতে সে থেমে যায়। তারপর উত্তেজিত হ'য়ে উঠে আবার তীব্র কণ্ঠে বলতে থাকে, পূর্ণিমা, তুই সর্বংসহা হ'তে চাস হ, আমি হব না। তুই সইলেও নারীত্বের প্রতি এই যে অশ্রদ্ধা এ আমি সইব না। এর শোধ আমি নেবই। ওতো ঠাকুর এসে যে দিন দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইবে তোর কাছে সেদিন আমি শান্তি পাব, তার আগে নয়। তুই ভাবিস না। আমার ওপর বিশ্বাস রাখ, দেখ, আমি কি করতে পারি। রেণুকা পূর্ণিমার মাথাটি আবার নিজের বুকে টেনে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে নিজের আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর রেণুকা এসে উপস্থিত হয় উদীয়মান ব্যারিষ্টার সুপ্রিয় সেনের বাড়ীতে। সম্প্রতি বিলাতের গ্রেস্ ইন থেকে ব্যারেষ্টারী পাশ করে কলকাতার 'বার' এ যোগ দিয়েছে সুপ্রিয়। নূতন ব্যারিষ্টার পশার এখনও জমেনি। তবে একদিন যে জমবে, এ আশা করে সকলেই। বচন বাচনের ভঙ্গিমা আছে আর আছে চেহারার জৌলস।

রেণুকার সঙ্গে সুপ্রিয়র পরিচয় আছে। এ পরিচয় পারিবারিক। রেণুকার বৌদিদি সুনন্দা, সুপ্রিয়র ছোট বোন। কিন্তু পারিবারিক এই সম্বন্ধটুকু ছাড়াও আরও একটা সম্বন্ধ দুজনার মধ্যে গড়ে উঠছিল যার মধ্যে সুনন্দার কলা কৌশল ছিল অনেক। এতদিন দুজনে ঘুরে বেড়িয়েছে অনির্দিষ্ট পথে, মাস্তলহীন জাহাজের মত। আজ পথ সুনির্দিষ্ট হয়েছে, কক্ষ পথ খুঁজে পেয়েছে তারা। তাই সুনন্দা মুখ টিপে রেণুকাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, তোমার একটা হিল্লে হ'লে বাঁচি ভাই ঠাকুরঝি। দাদাটি ত বোনের জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির। প্রায় দুঃখ ক'রে বলেন, শেষ পর্যন্ত কার হাতে গিয়ে পড়বে কে জানে?

রেণুকা রাগ ক'রে বৌদিদির চোখে মুখে সাবানের জল ছিটিয়ে দেয়। বলে, থামুন মন্ত্রী মশাই। নিজের দাদাটিকে পরের বোনের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ কেন বলত? যেমন ছ্যাংলা বোন, তেমনি ছ্যাংলা ভাই।

ছ্যাংলা বোনের একটা ইতিহাস আছে। সুনন্দাও একদিন রেণুকার দাদার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছিল দিনের পর দিন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে জয় করে বহাল হয়েছিল এ গৃহের গৃহিনী পদে। সেই কথাটাই রেণুকা রাগের মাথায় যখন তখন শুনিয়ে দেয় সুনন্দাকে।

সুনন্দার ফাই ফরমাস খাটতে ভালবাসে রেণুকা। তাই বার্তাবহ হয়ে এ বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয় যখন তখন। আজও এসেছিল সন্ধ্যার কাছাকাছি, তবে বার্তাবাহী হয়ে নয়, বার্তাগ্রাহী হয়ে।

ঠিক এই সময়টিতে কোর্ট থেকে ফেরে সুপ্রিয়। আজও ফিরে কতগুলি নথিপত্র খুলে বাইরের ঘরে বসে ছিল সে, এমন সময় রেণুকা এসে দাঁড়ায় ঘরের সামনেতে। এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে বলে, ইউনিং ব্যারিষ্টার। আসতে পারি?

সুপ্রিয়র মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে। বলে, ইউরিং কিলজকার। আসতে পার নিশ্চয়ই। তোমার দ্বার অবারিত।

রেণুকার বি. এ তে ফিলজফিতে অনার্স ছিল। সেইজন্য সুপ্রিয় তার নাম দিয়েছিল ফিলজকার।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রেণুকা বলে, ব্যারিষ্টর ত গ্রীকলেস। কিন্তু ভড়ং দেখছি অনেক। সর্বদাই ব্যস্ত বাগীশ।

—প্লীজ রেণু গ্রীক লেস বল না। বলতে পার ফ্ল্যাটলেস্। একটা ফ্ল্যাটও যোগাড় ক'রে উঠতে পারলুম না আজ পর্যন্ত।

—দুর্ভাগ্য তোমার। তবে ফ্ল্যাট যদি চাও ত চুনোগলিতে কিরিঙ্গী পাড়ায় যাও। সেখানে কিরিঙ্গী ফ্ল্যাট পাবে অনেক।

সুপ্রিয় ঘাড় নাড়ে। বলে, নো টাইম। কাজের বন্যার মধ্যে ডুবে গেছি আমি।

রেণুকা বলে, কাজের নয়, কাগজের। স্ক্র্যাপ পেপারের বাণ্ডিল কতকগুলো।

সুপ্রিয় আঁৎকে উঠে। বলে, বল কি! স্ক্র্যাপ পেপার! একখানাও নয়। সব ভ্যালুয়েবল্ ডকুমেন্ট। এদের ইতিহাস বিরাট, কাহিনীও বিরাট। এদের আদিও যেমন নেই, অন্তও তেমনি নেই।

—এই অনাদি অনন্ত ইতিহাসের কাহিনী আর শুনব কতদিন ধরে?

—আর বেশীদিন নয়, মাই ডিয়ার ফিলজকার। জৈনুদ্দিন আর মৈনুদ্দিনের কাহিনী শেষ করে আনলুম বলে। এদের এক ব্যাটা কূলবেই। তবে কোনটি জানিনা। আমারটি কি ব্যারিষ্টর গুপ্তটির সঠিক বলতে পারি না।

রেণুকা মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, মাথায় কিছু থাকলে বলতে পারতে। তোমার জন্যে দুঃখ হয় ব্যারিষ্টর, আর দুঃখ হয় তোমার দুর্ভাগা মক্কেলগুলোর জন্যে।

সুপ্রিয় সে কথায় কান দেয় না। স্মিত মুখে বলে চলে, জৈনুদ্দিন আর মৈনুদ্দিনের কাহিনী ত শুনলে। এবার শোন ভেঙ্কটেশ আর উমটেসের কাহিনী। এ একেবারে অনন্ত। স্মল কোর্ট হয়ে গেছে, হাই কোর্ট চলছে। এর পর চলবে হাইয়ার কোর্ট। সেখানে নিষ্পত্তি হবার আশা নেই। সুতরাং চলবে হাইয়েষ্ট কোর্ট পর্যন্ত। যমরাজের দরবারে গিয়েও ব্যাটারা করবে কামড়া কামড়ি, মারামারি। আর শুনবে? দু কানে আঙুল দিয়ে সজোরে মাথা নেড়ে রেণুকা বলে, না। সুপ্রিয় যেন সম্বিত ফিরে পায়। বলে, ভাল কথা, বাড়ীর মধ্যে গিয়েছিলে?

—না।

ভাল করেছ। সেখানকার টেম্পো ভাল নয়।

—মানে?

—একটু আগেই সেখানে এক পশলা হয়ে গেছে।

—বৃষ্টি?

—বৃষ্টি বটে, তবে আকাশের নয়, চোখের।

রেণুকা বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুপ্রিয়র মুখের দিকে।

সুপ্রিয় বলে, বুঝতে পারলে না? মা আজ আলটিমেটম দিয়ে দিয়েছেন। এক মাসের কড়া নোটিশ। আইবুড়ো ছেলের মুখদর্শন করবেন না তিনি। হয় বাড়ী ছাড়তে হবে তাঁকে, নয় আমাকে।

রেণুকা বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বলে, বুঝেছি। সেই জন্যে ফ্ল্যাটের সন্ধান?

—তা ছাড়া আর কি। কিন্তু সময় ভারী কম। এই একমাসের মধ্যে কোথায় আমি বিনোদিনী যোগাড় করি বলত? তার চাইতে চুপো গলিতেই যাব ফিরিঙ্গী ফ্ল্যাট দেখতে।

রেণুকা মুখ টিপে বলে, হতাশ হও কেন। আমার সন্ধানে একটি বিনোদিনী আছে।

—আছে?

—আছে বলে আছে, জলজ্যান্ত আছে। আহিরীটলার শিমাকপানি কারকর্মারের মেয়ে বগলা কারকর্মার। দশাসই চেহারা। মানাবে ভাল।

—বগলা? শীতলার কে হন তিনি?

—বড় বোন।

—উঃ রেণু, দোহাই তোমার। এ ভাবে ঘরশত্রু বিভীষণের কাজ কর না। আশীর্বাদ করি, তোমার বগলা আর শীতলা চিরসীমন্তনী হক। তবে আমার ঘরে নয়।

রেণুকা আমোদ বোধ করে। ভাল মানুষের মত বলে, বেশ ত, তাদের দু জনাকে মাসীমা একবার দেখেই আসুন না।

—উঁহু। তাহলে নির্ঘাত একটিকে ঝুলিয়ে দেবে আমার গলায়। আমি রাজি নই। উঃ শেষ পর্যন্ত বগলা? হরিবল্ রেন্!

রেণুকা হাসি চেপে বলে, বেশ বগলার খবর দেব না মাসীমাকে। কিন্তু এক সর্তে।

—এক কেন, একশো সর্ত হলেও আমি রাজি রেন্।

—সর্ত না শুনেই?

—না শুনেই। শোনার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু বগলা এর মধ্যে না থাকলেই হল।

—বেশ, বগলাকে বাদ দিয়েই বলব। বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি প্রিয়। আমার বন্ধু পূর্ণিমাকে তুমি ত চেন? অন্ততঃ অনেক গল্প তার শুনেছ আমার মুখ থেকে। বিপদ তার। আর তার বিপদে বিপদ আমারও।

সুপ্রিয় স্মিত মুখে বলে, তা ত বুঝলুম। পূর্ণিমার বিপদে বিপদ তোমার। আর তোমার বিপদে বিপদ আমার। কিন্তু বিপদটা কি, খুলে বল?

—বলছি একটু মন দিয়ে শোন। বলে রেণুকা আনুপূর্বিক শুভেন্দু-পূর্ণিমার সব কাহিনী সুপ্রিয়কে খুলে বলে। উপসংহারে বলে, এখন ঠাকুর বিয়ে করতে চান স্বদেশী মেয়ে কণা ব্যানার্জীকে। বিপদ সেইখানেই।

সুপ্রিয় মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু এতে বিপদ দেখলে কোথায়। ঠাকুরেরা বিশ্বজনীন, বিশ্বপ্রেমিকও বটে। তাদের মনের গতি আছে। তাই তারা বিয়ে করবে। দুটো কেন সাতটা হ'লেও আপত্তির কিছু নেই।

রেণুকা অবাক হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, বল কি তুমি, মনের গতি আছে তাই বিয়ে করবেন তিনি?

—আলবাৎ বলি। ঠাকুরাণীও যদি বিশ্বপ্রেমিক হতে চান, মনের যদি গতি থাকে তার তাহলে ঠাকুরের মহৎ আদর্শ অনুকরণ করবেন তিনিও।

রেণুকা রাগ করে বলে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। কেস, কেস করে গোল্লায় যেতে বসেছ তুমি। এর একমাত্র ওষুধ বদলা। মাসীমাকে খবরটা দিয়ে আসিগে যাই। রেণুকা ভিতরে যাবার জন্য ফেরে। সুপ্রিয় পিছু ডাকে, এই কোথা যাও। শোন, আমার কথাটা শুনে যাও।

রেণুকা যায়ে। ঘাড় ফিরিয়ে একবার সুপ্রিয়কে দেখে। সুপ্রিয় বলে, তুমি রাগ করে সব পণ্ড কর না রেন্। আমার কথাটা মন দিয়ে শোন। দেখ পুরুষই বল আর মেয়েই বল, বিয়ে তাদের করতেই হবে। এই হচ্ছে একমাত্র সুষ্ঠু পথ। আর এই পথেই তাদের গতি। এই গতিই অনুসরণ করতে বলি তোমার বান্ধবীকেও।

—শুধু আমার বান্ধবীকে কেন, দুনিয়ার সকলকেই বলবে তুমি। কিন্তু তোমার মত সকলেরই ত মাথা খারাপ হয় নি।

—বুদ্ধিটা তোমার মোটা।

—তোমার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে কাজ নেই আমার।

সুপ্রিয় একটুখানি হাসে। বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করবে, না আমার কথাটা মন দিয়ে শুনবে। বান্ধবীর মঙ্গল যদি চাও তা'হলে যা বলি শোন। এখানে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। ঈর্ষা দিয়ে মনের মধ্যে ঈর্ষা জাগাতে হবে।

রেণুকা ভ্রূ কুঁচকে বলে, বুঝলাম না তোমার কথাটা।

—না শুনলে বুঝবে কি করে। ব্রীফলেস ব্যারিষ্টারের বুদ্ধিটা একটু অনুধাবন করে দেখ, ফল পাও কি না। তোমার বান্ধবীর কেস সোজা কেস নয়। জৈনুদ্দিন মৈনুদ্দিন বা বেকটেস উদ্ভাটেশের চাইতেও এ কেস শক্ত। এর যা কিছু করণীয় করতে হবে তোমাকে।

—আমাকে? রেণুকা বিস্মিত হয়।

—তোমাকে। ঠাকুরের মহৎ আদর্শ অনুকরণে ব্রতী তোমার বান্ধবীর প্রণয়ী সাজতে হবে তোমাকে আর তার পানি প্রার্থীও হতে হবে তোমাকে। তবেই এ কেসের জয় হবে, বুঝলে!

—না!

—বুদ্ধিতে একটু শান দাও। কিলজফারদের বুদ্ধিটা একটু ভোঁতাই হয়ে থাকে। মনে কর তুমি একজন বিলাত ফেরত যুবক। ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র। একটু সিভালরাস্ স্পিরিট্। পূর্ণিমার ব্যথায় বিচলিত হয়ে বিবাহের চেয়েও বড় একটা অঙ্কার দিয়ে তাকে আর সেই কথাটাই পৌঁছে দিলে ঠাকুরের কানে। দেখ, তখন বিশ্বপ্রেমিক ঠাকুরের অবস্থাটা কি হয়। তখন শিমুল গাছ তেল পানা হয়ে আসে কি না।

রেণুকা মুখ টিপে হেসে বলে, বুঝেছি।

—উঁহু, বোঝনি। তবে চেষ্টা করছ বোঝবার।

—টিপস্‌টা মন্দ বলে মনে হচ্ছে না। তবে গলদও আছে। ধরা যদি পড়ি, কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। আমরা দুজনে কেউ মুখ দেখাতে পারব না তাহলে।

—পারবে। তুমি বিদ্যাসাক্ষী, কমল লোচনে! তোমায় ধরে সাধ্য কার। ও চিত্ত বিমোহন-

কারী রূপ দেখে ঠাকুরটি ঈর্ষায় আলায় বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে পড়বেন। তখন তুল ধরবার মত মনের অবস্থা থাকবে না তার। এই হল হিউম্যান সাইকোলজি, বুঝলে! আর একান্তই ধরা যদি পড়, আমিত আছি।

রেণুকা মুখ মচকে বলে, তুমি! গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেবে এই ত?

সুপ্রিয় জিভ কেটে বলে, ছি ছি। তুমি আমাকে এতখানি অবিশ্বাস কর রেন্! তোমার বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি পড়ব সরে?

রেণুকা কটাক্ষ করে বলে, প্রিয়, তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই। তোমরা সব এক ছাঁচের মানুষ। তুমিও যা, ওতো ঠাকুরও তা। তোমাদের বিশ্বাস করা মানে নিজেকে প্রবঞ্চিত করা।

সুপ্রিয় খেদোক্তি করে বলে, হা ভগবান! উপকারের প্রতিদান এই! আজ বগলা আমাদের শান্তি হরণ ক'রে নিয়ে গেছে রেন্। তবুও বলি, ধরা যদি পড়, কোর্ট কী তোমার এক পয়সাও লাগবে না। সে ভার নিলাম আমি।

—যে আজ্ঞে, এতক্ষণে সব দুর্ভাবনা কেটে গেল আমার।

—আর শোন, সুনন্দার সঙ্গেও একটু পরামর্শ কর। হাজার হ'ক আমারই বোন ত সে। পরামর্শ দেবে ভাল।

—তথাস্তু। আদেশ শিরোধার্য। এখন দেখি, কতদূর কি করতে পারি। তোমার সঙ্গে গল্প করলে আমার চলবে না। মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসি একবার। বলতে বলতে অন্দরের দিকে সে পা বাড়িয়ে দিল।

কয়েক দিন পর।

এ কদিনে সুপ্রিয়র প্ল্যানটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভেবে দেখেছে রেণুকা। সুনন্দার সঙ্গেও পরামর্শ করেছে অনেক। এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর কিছু নাই। উন্মত্ততাকে দমন করতে গেলে উন্মাদই সাজতে হ'বে। বাস্তবীর জন্য এটুকু করতে প্রস্তুত হ'ল রেণুকা। সমস্ত পরিকল্পনাটির রূপ দিল সুনন্দা। বলল, এটুকু তোমায় পারতেই হ'বে ঠাকুর ঝি। বিজয়া, প্রেতে নরেনের ভূমিকায় অভিনয় করে সুনাম কিনেছিলে তুমি। আর বন্ধুর এই বিপদের দিনে ধনী ব্যবসায়ী মাইকা খনির মালিক রায় বাহাদুর সিন্‌হার বিলাত প্রত্যাগত একমাত্র ছেলে মিঃ আর, সিন্‌হার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবে না তুমি? সুনন্দাই বুঝিয়ে দেয়, এতে হারলে লোকসান কিছু নেই। কিন্তু জিতলে লাভ অনেক। দুটো সংসারকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে ঠাকুর ঝি।

তিন দিন তিন রাত যুক্তি পরামর্শের পর যে দিন পরিকল্পনাটি নিখুঁত হয়ে উঠল তার পরদিনই রেণুকা গেল পূর্ণিমার কাছে। তার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, আমি হারব না ভাই পূর্ণিমা। ঠাকুর কত বুদ্ধি ধরে আমি দেখব একবার।

পূর্ণিমা আজ ক্লান্ত। ক্লান্ত সুরেই বলে, তোরা লড়াই কর, আমি এর মধ্যে নেই ভাই।

—তোকে কিছু করতে হবে না পূর্ণিমা। যা করবার করব আমি। শুধু আমার কথার অবাধ্য হস না তুই।

পূর্ণিমা উদাস সুরে বলে, জীবনে আর কোন স্পৃহা নেই আমার। এবার মরণ হলেই বাঁচি। বাপ মায়ের চোখের জল আর সহ্য হয় না। তারপর একটু থেমে ম্লান হেসে বলে, আমি বোধ হয় বেশী দিন বাঁচব না রেণু।

রেণুকা সচকিত হ'য়ে উঠে। পূর্ণিমার মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে। বিশীর্ণ মুখ। চোখ দুটি নিষ্প্রভ, ক্লান্তিতে ভরা। এ কদিন পূর্ণিমা যেন অনেকখানি রোগা হয়ে গেছে। গাল দুটি ব'সে পড়েছে। একটা যেন কঠিন ঔদাসীন্য তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। কথা বলার ভঙ্গীমাটাও কেমন যেন বাপ ছাড়া। রেণুকা শিউরে উঠে। মৃদু ভর্ৎসনা করে বলে, এই ভাবে তিলে তিলে তুমি যদি আত্মহত্যাকে প্রশ্রয় দাও পূর্ণিমা, তাহলে বুঝব, তুমি নিরপরাধ নও।

—রেণু!

—না, না আমি কোন কথাই শুনব না। আজ তোমার এ যোগিনীবেশ কেন? কেন এই তিলে তিলে আত্মহত্যা!

পূর্ণিমা বন্ধুর এ তিরস্কার সইতে পারল না। দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। অতি বিকৃত কণ্ঠে বলল, তবে কি করব ভাই? কি করতে বলিস আমায়?

রেণুকা নিজের অসংযমতায় একটু লজ্জিত হ'ল। আঁচল দিয়ে পূর্ণিমার অশ্রুসিক্ত মুখখানি মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, একটা কথা শোন পূর্ণিমা। মনের গতি হারিয়ে ফেলিস না। গতি হারিয়ে ফেললে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি তুই। পূর্ণিমা বুঝতে পারে না। শুধু অসহায় চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে রেণুকার মুখের দিকে।

রেণুকা পূর্ণিমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। বলে, ঠাকুরের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে তোকেও। যে পথ ঠাকুর দেখিয়েছেন, তোকেও সেই পথে পা বাড়াতে হবে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ যে শাস্তি তোকে দিতে চান ঠাকুর, সেই শাস্তি ফিরিয়ে দিতে হবে তাকেও। জীবনের যে জটিল পথে স্বেচ্ছায় চলতে চান শুভোঠাকুর, কণাকে বিয়ে করে, সেই কুটীল পথে চলতে হবে তোকেও।

পূর্ণিমার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠে। সে কম্পিত কণ্ঠে বলে, রেণুকা, আমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমার নারীত্বের অসম্মান করেছিলেন বলে, স্বামীকেও আমি ক্ষমা করিনি, জানিস?

—জানি। আমাকেও ক্ষমা করিস না তুই। কিন্তু তোকে এ সংস্কার মুক্ত হ'তে হবে। শুভো ঠাকুরের মত তোকেও প্রস্তুত হতে হবে।

পূর্ণিমার সারা মুখখানা লাল হ'য়ে উঠে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম ক'রে কঠোর কণ্ঠে বলে, আমি মুক্তি বিলাসিনী নই, তাই সংস্কার মুক্ত হতে চাই না। পুরুষদের সাথে সমান তালে চলতে সাধ যদি যায় তোর, তুই লেফ্‌ট্ রাইট্ কর। আমাকে রেহাই দে।

রেণুকা বিচলিত হয় না। শুধু বলে, শুভো ঠাকুরকে তুই ভালবাসিস পূর্ণিমা। তাকে ফিরে পেতে চাস জীবনে?

পূর্ণিমা ফিরে দাঁড়ায়। রেণুকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে। তারপর অকস্মাৎ কেঁদে ফেলে বলে, রেণু, আমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে—।

—আমিও। বরঞ্চ তোর চেয়েও বেশী। কারণ বাবা মা দুজনেই গোঁড়া। তাদের মেয়ে হয়ে তোকে অ-হিন্দুর আচরণ করতে বলব, এ কথা ভাবিস কেন? কিন্তু এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে

হলে,এ ছাড়া পথ নেই ভাই। শুভো ঠাকুর যে পথে তোর নারীত্বকে অসম্মানিত করতে চায়, ঠিক সেই পথেই তার পুরুষত্বকে অসম্মানিত করতে হবে তোকে।

—এ আমি পারব না রেণু, এত বড় অধর্ম সইবে না।

—সইবে। আগে আমার কথাটা মন দিয়ে শোন। বলে পরিকল্পনাটি খুলে বলল তাকে।

মিঃ আর, সিনহা, তিন পুরুষের বড়লোকের ছেলে। বিহারে তাদের প্রকাণ্ড অভ্রের খনি। মাইনিং পড়তে বিলাত গিয়েছিলেন। এখন স্বদেশে ফিরে এসেছেন। ফিটফাট প্রিয়দর্শী যুবক। বিলাত ফেরতা তাই একটু সিভালরাস্। পূর্ণিমার দুঃখের কাহিনী শুনে অত্যন্ত বিচলিত, তার রূপ দেখে মুগ্ধ। তাই এগিয়ে এলেন যাতে জীবনটা তার ব্যর্থ হয়ে না যায়। এমন কি তাকে রেজেষ্ট্রি ক'রে বিবাহও করতে প্রস্তুত তিনি। এখন শুধু প্রয়োজন শুভো ঠাকুরের মতামতটা। পূর্ণিমাকেই এগিয়ে যেতে হবে সব কথা তাকে খুলে বলে তার মতামতটা জানতে।

পরিকল্পনার রূপ দেখে পূর্ণিমার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠে। আর্তকণ্ঠে বলে, এ সব কি বলছিস রেণু তুই। এ শোনাও যে পাপ।

রেণুকা এ কথায় কান দেয় না। বলে, শুধু এইটুকু কর। তারপর যা করবার করবে মিঃ আর সিন্‌হা অর্থাৎ রেণুকা সিন্‌হা।

পূর্ণিমা অবাক হয়ে বলে, রেণুকা সিন্‌হা? মানে তুই?

রেণুকা সহাস্যে ঘাড় নাড়ে। বলে, আমিই। পর পুরুষে তোর যখন আপত্তি, তখন চেনা—পুরুষেই তৃপ্ত-হ। সিন্‌হার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে আমাকেই। আমিই হ'ব তোর কাণ্ডারী; ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী। দেখিস অভিনয় আমি ভালই করব।

—তারপর? যখন এ কেলেঙ্কারী প্রকাশ হয়ে পড়বে তখন?

রেণুকা পূর্ণিমার মনোভাবটি বোঝে। বোঝে সেখানে কি ঝড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে। কিন্তু সে দিকে মন না দিয়ে নির্লিপ্তভাবে বলে, তখন দেখবি ঠাকুরটি তোর ঐ আলতা পরা টুকটুকে চরণতলে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

পূর্ণিমা কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে। অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ভাব, যেন রেণুকার পরিকল্পনায় সায় দিতে পারে না। বাঙ্গালীর মেয়ে সে, এতখানি নির্লজ্জতা প্রকাশ করা তার দ্বারা সম্ভবপর হবে না। তাই ইতস্তত: করে বলে, এ আমি ভাল বুঝছি না ভাই। বাবা, মা, ভাই, বৌদি কি মনে করবেন এঁরা, যখন প্রকাশ পাবে সব? লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার। কাজ নেই ভাই এত হাঙ্গামায়।

রেণুকার দুটি চোখে আগুন জ্বলে উঠে। বলে, দুর্ভাগ্যের দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে লজ্জাটাই তোর বড় হল পূর্ণিমা। আমিও মেয়ে, এ যে কি জ্বালা কিছুটা বুঝি! আরও বুঝি, সন্তান বৎসল কোন বাপ-মা এ কাজের নিন্দা করবেন না। বরঞ্চ দু হাত তুলে আশীর্বাদই করবেন। ভয় করিস না, কি করতে হবে না হবে, সব শিখিয়ে দেব তোকে। বলতে বলতে তাকে হাতে ধরে রান্নাঘরের দ্বারে টেনে নিয়ে যায়।

জীবনের স্রোত কত যে বিচিত্র ধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় মানুষ তা কল্পনা করতে পারে না। পূর্ণিমাও কোনদিন ভাবতে পারেনি যে এমনি এক খাতে তার জীবনস্রোত গতি নিতে পারে। স্বামীকে জব্দ করবার জন্য এত বড় যে অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হবে, এ ছিল তার স্বপ্নেরও

অগোচর। অভিমান এসে বারবার তার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছিল, অবহেলিত নারীত্ব বন্যাটানা ঘোড়ার মত কখে দাঁড়াচ্ছিল ঘাড় বেঁকিয়ে, কিন্তু রেণুকা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল প্রতি পদেই। বলছিল, অদৃষ্টকে নিন্দা করিস না পূর্ণিমা, মনে কর এও তোর এক সাধনা। শিবকে পেতে তপস্যা করতে হয়েছিল পার্বতীকে, বেহুলাকে নাচে গানে তুষ্ট করতে হয়েছিল দেবসভাকে। তাঁরা রাজার নন্দিনী হয়ে যে কষ্ট সয়ে ছিলেন তুই তার একাংশও পারবি না? অবশ্য এ রেণুকার নিজস্ব কথা নয়। এর মধ্যে ব্যারিষ্টারী বুদ্ধি ছিল সুপ্রিয়র। রেণুকাকে বলেছিল, ভালবাসার ক্ষেত্রে ঈর্ষা জিনিষটা ভারী অনিষ্টকর রেন্। এ না পারে এমন কিছু নেই। শুধু ঠাকুর কেন, এর দাপটে রক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর সব ঘায়েল হয়ে যায়। এই ঈর্ষার কণামাত্রও যদি উদ্দীপিত করতে পারে শুভ ঠাকুরের অন্তরে, ঠাকুর বাবাজি এক চোটেই ঘায়েল হবেন। রেণুকারও সেই বিশ্বাস। তাই সে এতবড় ঝুঁকি কাঁধে নিতে পেরেছে, পূর্ণিমাকে নিয়ে বেড়িয়েছে ঠাকুরকে জয় করতে।

লালদিঘি পার হয়ে গভর্ণমেণ্ট প্রেসের পশ্চিমদিকে অগ্রসর হচ্ছিল তারা। সুপ্রিয় অটিন গাড়ীখানা চালাচ্ছিল রেণুকা। পরণে মূল্যবান সাহেবী পোষাক, মাথায় বড় কেণ্ট হ্যাট, একটু নীচু করে নামান। চোখে নীল গগলস্। পাশে পূর্ণিমা, সৌখীন পোষাকে সজ্জিতা। পূর্ণিমা আড়ষ্ট, একটা চঞ্চলতা তার চোখে মুখে সুপরিস্ফুট।

গাড়ী চালাতে চালাতে রেণুকা একবার আড়চোখে পূর্ণিমাকে দেখে নিয়ে বলে, আধুনিক মেনকা যে আধুনিক বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করতে পারবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ পূর্ণিমা। এ পরিকল্পনাটুকু বৌদিদির। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়েদের বর্ণ বিন্যাসের ছটা ছেলেদের পূর্বরাগ উদ্দীপনার সাহায্য করে। আমার বাহাটিকে তিনি জয় করেছিলেন এই বিশ্বাসের জোরে। সেই জন্যেই তোকে সাজবার ভার ছেড়ে দিয়েছিলুম তার ওপর। এখন দেখছি বৌদিদির টেষ্ট আছে।

পূর্ণিমা সে কথায় কান দেয় না। বলে, তোকে দেখে সত্যিই হিংসে হয় রেণু। কেমন সুন্দর সাবলীল জীবন, অমর্যাদার কোন বালাই নেই, অহেতুক মুখে কলঙ্কের কালিমাও কেউ মাখিয়ে দেবার স্পর্দ্ধা রাখে না। বা এমন ভাবে পরপুরুষের নাম নিয়ে স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তার শুদ্ধ ভালবাসা উদ্ধারের জন্য সেজেগুজে বেরুবার প্রয়োজন হয় না।

রেণুকা একটুখানি হাসে। সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রেখেই বলে, আমার জীবনের মাধুর্য দিয়ে তোর জীবনের মাধুর্যকে বাচাই করতে বাস না পূর্ণিমা, তাহলে ভুল করবি। কুমারী জীবনের ওপর বিন্দুমাত্র লোভ তোর নেই। স্বামীর প্রতি অগাধ ভালবাসার অন্তর ভরে আছে বলেই না আজ এই দুঃসাহসিক অভিযান। একটু থেমে আবার বলে, কিন্তু আজকের এই অভিযানের সাফল্যের ওপর জীবনের যত কিছু শান্তি, আশা, আনন্দ, সব নির্ভর করছে। এখানে ব্যর্থ হলে চলবে না।

পূর্ণিমার মুখ ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে আসে। কম্পিত কণ্ঠে ডাকে, রেণু! আমি ভারী দুর্বল। সব সাহস হারিয়ে ফেলছি ভাই। যদি পণ্ড ক'রে ফেলি সব।

রেণুকা সাহস দিয়ে বলে, ভয় নেই পূর্ণিমা, নিরপরাধীকে শাস্তি ভগবান দেবেন না কখনও। আমার মন বলছে, আমরা জয়ী হ'বই। তারপর সহসা গাড়ীর গতি বেগ কমিয়ে দিয়ে বলে, আমরা গন্তব্য স্থানে এসে গিয়েছি। ডান দিকে ঐ লাল রংয়ের বড় বাড়ীখানা ওতো ঠাকুরের অফিস। এখন পাঁচটা বাজে। ঠাকুর এখুনি বেরুবেন সামনের বড় ফটকটি দিয়ে।

পূর্ণিমা অবাক হয়ে যায়। অবাক দৃষ্টিতে রেণুকার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, এত খবর তুই জানলি কি ক'রে ভাই?

রেণুকা স্মিত মুখে বলে, আজকাল দোয়েন্দাগিরি ব্যবসা সুরু করেছি তোর জন্যে। জানিস, এর মধ্যে শুধু কিলজকারের মাথা নেই, ব্যারিষ্টারের মাথা আছে আর ব্যারিষ্টারভগীরও মাথা আছে। তোর ভয় পাবার কিছু নেই পূর্ণিমা। দেখবি, ঠাকুরের পরনে আছে তস্‌রেটের স্যুট।

—গত বছর সখ ক'রে করিয়েছিলেন স্যুটটা।

—খাসা মানায় কিন্তু। যেন বিলিতি সাহেব। তুই এইখানে নেমে বাঁ ছুটে অপেক্ষা কর। আমি অপেক্ষা করব ঐ গড়ের মাঠের ধারে। যেমন ক'রে পারিস ঠাকুরকে নিয়ে যাবি ওখানে। ঐখানে আমাদের পরিচয় হবে। তারপর যা করবার করব আমি।

পূর্ণিমা ঘাড় নাড়ে। কিন্তু কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠে। মুখের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। সে যে ভিতরে ভিতরে বিচলিত হ'য়ে পড়েছে এটুকু বুঝতে পারে রেণুকা। তাই সাহস দিয়ে বলে, এই সঙ্কিক্ষণে বুদ্ধিভ্রষ্ট যদি না হ'স পূর্ণিমা, রাশ যদি টেনে রাখতে পারিস, আজ ঠাকুরের পতন অনিবার্য। এ বিশ্ববিজয়িনী রূপ দেখে যে পুরুষ মুগ্ধ না হয়, সে পাগল। রাস্তার লোকগুলোর কাণ্ড দেখ, তোকে আস্ত গিলে খেতে চাইছে যেন। সহসা রেণুকা চকিত হয়ে উঠে। বলে, পূর্ণিমা, ওতো ঠাকুর আসছেন বোধ হয়। আমি মাঠের দিকে এগিয়ে যাই।

পূর্ণিমা কম্পিত পদে মটর থেকে নেমে পড়ে। কলের পুতুলের মত সে এগিয়ে যায় একটা ল্যাম্প পোষ্টের ধারে। অফিসের ছুটির সময়। গাড়ীতে, লোকেতে রাস্তাপরিপূর্ণ। পাঁচজনের সতৃষ্ণ দৃষ্টি যতই পূর্ণিমার মুখের উপর এসে পড়ে, ততই সে বিব্রত বোধ করে, আড়ষ্ট হয়ে উঠে। ঠিক এমনি সময়ে শুভেন্দুকে অদূরে দেখা যায়। রেণুকা বর্ণিত পরিচ্ছদে সে সজ্জিত। হাতে চামড়ার ব্রীফকেস, দৃষ্টি অন্যমনস্ক। হঠাৎ আর পাঁচজন পথচারীর মত তারও দৃষ্টি এসে থমকে পড়ে পূর্ণিমার বিব্রত আরক্তিম মুখের উপর। এক মুহূর্তের জন্য সে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন বিশ্বাস করতে চায় না নিজের চোখ দুটিকে। পর মুহূর্তে ঘোর কেটে যেতেই সে একরকম ছুটে এসেই পূর্ণিমার পাশে উপস্থিত হয় এবং উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, তুমি! পূর্ণিমা! এখানে?

পূর্ণিমা আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত। জিহ্বা এবং মনের বাসনার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ তার ছিন্ন হয়ে যায়। কোন উত্তর সে দিতে পারে না। ঘর্মাক্ত কলেবরে মুখ নত করে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

শুভেন্দু অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করে, বল, তুমি এখানে কেন?

পূর্ণিমা তোতলাতে থাকে, আমি—আমি—এসেছি—।

শুভেন্দু অধৈর্য ভাবে বলে, তুমি এসেছ, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন? কেন, এসেছ এখানে? কি উদ্দেশ্যে?

অসহায় পূর্ণিমা, অসহায় চোখ দুটি তুলে একবার স্বামীর দিকে তাকায়। তারপর দৃষ্টি নামিয়ে নেয়।

শুভেন্দুর জেরা তখনও থামেনি। বলে, বল, আমার কথার উত্তর দাও?

পূর্ণিমা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, একটা কথা বলতে।

শুভেন্দু উত্তেজিত ভাবে বলে, কথা বলতে? আমার সঙ্গে? শুধু একটা কথা বলবার জন্যে ছুটে এসেছ এত দূরে? এ বিশ্বাস হয় না আমার।

শুভেন্দুর হাত দুটো নাড়া খেয়ে পূর্ণিমা ঘাবড়ে যায়। সকল সাহস তার লোপ পাবার উপক্রম করে। অত্যন্ত অসহায় ভাবে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে অদূরে মোটরে উপবিষ্ট রেণুকাকে দেখতে পেয়ে তার লুপ্ত সাহস আবার আসে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চোখ মুখের ভাব যেন যাদুবলে পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্বরে দৃঢ়তা ফুটিয়ে বলে, সে তোমার প্রবৃত্তি।

শুভেন্দু অবাক হয়ে যায়। বলে, আমার প্রবৃত্তি।

পূর্ণিমা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ তোমার। আমার প্রবৃত্তি আমাকে এখানে টেনে এনেছে, শুধু তোমার একটা অনুমতি নেবার জন্যে।

শুভেন্দুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে উঠে। বলে, অনুমতি? আমার?

—হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে জানতে চাই, তোমার সম্বন্ধে যা শুনতে পাই, তা সত্যি কিনা? পূর্ণিমার স্বরে অধিপত্যসূচক সুর।

শুভেন্দু এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু ভড়কে গিয়ে বলে, কি শুনেছ শুনি!

—রাঘব ব্যানার্জির মেয়ে কণা ব্যানার্জিকে নিয়ে লোকে তোমার সম্বন্ধে যে আলোচনা করে তা সত্যি, না সব কল্পনাপ্রসূত?

শুভেন্দু একটু আশ্বস্ত হয়ে বলে, এর জন্যে এতদূর কষ্ট করে ছুটে আসবার কোন প্রয়োজন ছিল না তোমার। লোক পাঠিয়ে খবর নিলে জানতে পারতে সব। আমি এতটুকু গোপন করতাম না।

—জানি, সে সৎসাহস তোমার হয়েছে আজকাল। কিন্তু তাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ত না। আমি তোমার মুখ থেকে নিজের কান দিয়ে শুনতে চাই।

—এর পেছনে উদ্দেশ্যও আছে না কি? কি তোমার উদ্দেশ্য বল?

—বলব। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি এখনও।

—যদি বলি, যা শুনেছ তা সত্যি।

পূর্ণিমা ঘাড় নেড়ে বলে, যদির ওপর নির্ভর ক'রে কোন সমাধান করতে চাই না আমি। আমি এসেছি সোজা, সরল উত্তর শুনতে।

পূর্ণিমার তেজোদীপ্ত ভঙ্গী আর অনবদ্য মুখশ্রী তাকে আরও বেশী মোহনীয় ক'রে তোলে শুভেন্দুর চোখের সামনে। স্ত্রীর এমন অপরূপ মূর্তি সে ইতিপূর্বে আর দেখেনি কখনও। এ মূর্তি তার অন্তরকে দুর্বল করে ফেলে। নিজের এ দুর্বলতাটুকু ঢাকতে গিয়ে পৌরুষ দেখাবার জন্য সে অহেতুক জোর দিয়ে বলে, যা শুনেছ, মিথ্যে নয়। কথার আপত্তি যদি না থাকে, আমি বিয়ে করব তাকে।

স্বামীর আস্ফালনে পূর্ণিমা মনে মনে আহত হয়। স্থির চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, ভাল কথা। কিন্তু পূর্বে বিয়ে করেছ যাকে, তার ব্যবস্থা করবে কি?

—জানি না। ও নিয়ে মাথা ঘামাই না আর। যতদিন করবার ছিল করেছি। এখন সেখানে আমি অবাঞ্ছিত।

—স্বার্থপর মানুষ, নিজের সংকীর্ণ মন নিয়েই পৃথিবীটাকে যাচাই করে। সেখানে বিচার বিবেক কিছুরই স্থান নেই।

শুভেন্দুর মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিল। কম্পিত কণ্ঠে বলল, আমি স্বার্থপর নই পূর্ণিমা, সংকীর্ণ-চেতাও নই। তবে আমারও প্রাণ আছে। প্রাণে আশা, আকাঙ্ক্ষা আছে। তাদের স্পন্দন এখনও

শুনতে পাই ঠিক আগেরই মত। বিশ্বাস কর, সেখানে ভালবাসা দেবার এবং নেবার প্রার্থীটি অকর্ষণা হয়ে পড়েনি আজও। তাদের বাঁচিয়ে রাখার পথা অবলম্বন করে থাকি যদি, অন্যায় করিনি কিছু।

পূর্ণিমা বলে, না। প্রার্থনা করি পূর্ণিমার পরমায়ু নিয়ে কণা তোমার সংসার উজ্জ্বল করে বিরাজ করুক।

—তুমি আমায় ব্যঙ্গ করছ?

—না। এ আমার শুভকামনা জানিয়ে গেলাম। পূর্ণিমা থামে। তারপর আবার বলে, আমার যা জানবার ছিল, জেনেছি। এখন যা বলবার সেইটুকু বলে, অন্ধের মত বিদায় নেব।

—পূর্ণিমা! শুভেন্দুর কণ্ঠস্বরে দুর্বলতার আভাষ সুস্পষ্ট।

পূর্ণিমা শুভেন্দুর আহ্বানে কান দিল না। বলে চলল, তুমি বলেছ, তোমার প্রাণে আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, অন্তরে তারই স্পন্দন আছে। যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ সে মেয়েরও প্রাণে আশা আকাঙ্ক্ষা স্পন্দন সবই আছে। শুধু যাকে একদিন বিয়ে করেছিলে তার প্রাণেই ও সবের কিছু থাকতে নেই। তাই দ্বিতীয়ের স্ত্রী হয়ে আজ আমাকে ছুটে বেরুতে হয়েছে—। পূর্ণিমা কথাটা শেষ করতে পারল না। তার কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ল। চোখে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

সুন্দরী নারীর এক বিন্দু চোখের জল পৃথিবীতে অনেক কিছু অসম্ভব সম্ভব করেছে। পূর্ণিমার চোখের জলও শুভেন্দুর অন্তরে এক নূতন অনুভূতি জাগিয়ে তুলল। স্ত্রীর অনবদ্য সৌন্দর্য, তেজোদীপ্ত মূর্তি মনের বনেদে যেটুকু খাদ্ নামিয়েছিল, চোখের জল তাকে ভূমিসাৎ ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শুভেন্দু ধৈর্য হারাল। হয় ত একবার পূর্ণিমার হাত ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু পূর্ণিমা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, অফিস থেকে ফিরছ তুমি। শরীর ক্লান্ত। সারাদিনের পরিশ্রমের ঝড় বয়ে গেছে দেহের ওপর দিয়ে। তোমায় বেশীক্ষণ আটকে রেখে কষ্ট দেব না। যা বলতে এসেছি, সংক্ষেপে তা বলে নি, শোন।

শুভেন্দু আবেগের সঙ্গে বলে, তোমার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখব না পূর্ণিমা। আমার একদিনের কষ্ট দেখে বিচলিত হচ্ছ তুমি, এ কষ্ট আমার—।

পূর্ণিমা একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর মুখ নত করে বলে, রায় বাহাদুর ডি. পি. সিন্‌হার ছোট ছেলে মিঃ আর সিন্‌হা বিলেত থেকে সম্প্রতি মাইনিং পাশ করে ফিরেছেন। বয়স অল্প, খুব চটপটে যুবক। রায়বাহাদুর বাবার বন্ধু, আমাদের প্রতিবেশী। তাঁর মেয়ে আমার সহপাঠিনী। এ দু পরিবারের মধ্যে গোপনীয়তা কিছু নেই। সুতরাং আমার দুর্ভাগ্যের সব কথাই জানেন তাঁরা।

শুভেন্দু মাঝখানে বলে উঠে, ছিঃ ছিঃ—।

—সত্যিই ছিঃ ছিঃ। লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার। রায় বাহাদুর মস্ত ধনী, বিহারে প্রকাণ্ড অভ্রের খনি, ছোট ছেলে সেইখানেই যাচ্ছেন। বিলাত ফেরত ছেলে একটু সিভালরাসই হয়ে থাকে। সে দিন আমায় ডেকে বললেন—।

—কি! তোমার সঙ্গে আলাপ আছে তার?

—খুব। বললেন,—

—কি বললেন? শুভেন্দুর কণ্ঠে অধীরতা। মুখে চোখে উদ্বেগের ছায়া

—আমার দুঃখে বিগলিত হয়ে দুটি অফার দিয়েছেন আমাকে। এর যে কোন একটি বেছে নিলে খুশি হবেন তিনি।

—ভাল কথা। কিন্তু 'অফার' দুটি কি জানতে পারি একবার?

—একটি তাঁর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী—।

—শুভেন্দুর মুখ কালো হ'য়ে উঠে। ব্যঙ্গ করে বলে, বাঃ খাসা 'অফার' ত। আর একটি? সেটি তার অন্তরের সেক্রেটারী নিশ্চয়?

পূর্ণিমা এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। মুখখানি তার সলজ্জ হাসিতে ভরে উঠে। কিন্তু চোখ দুটি দিয়ে যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যায়, তাইতেই শুভেন্দুর অন্তরকে কুচিকুচি করে দেয়। সে ক্ষিপ্ত হ'য়ে একেবারে ফেটে পড়ে, কি এত বড় কথা সে বলেছে তোমায়? রাস্কেল! স্কাউণ্ড্রেল! পরস্ত্রীকে এত বড় অপমান করতে সাহস পায়?

—অপমান নয়, অসহায়াকে যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন এই তাঁর অভিপ্রায়। তার পর একটু থেমে আবার বলে, হায় রে। নিজের স্বামী যে স্ত্রীর সম্মান রাখে না অপরে তার সম্মানের মূল্য দেবে কেন?

—এ কথা শুনেছেন তোমার বাবা মা?

—তাঁরা মূক হয়ে গেছেন এই কথা ভেবে, না জানি দুর্ভাগা মেয়ের ভাগ্যে আরও কি লাঞ্ছনা আছে এর পর।

—হুঁ! শুভেন্দু চিন্তিত হয়ে পড়ে। দাঁত দিয়ে অধরোষ্ঠ কামড়ে ধরে। ভ্রু দুটি কুঁচকে উঠে। কপালে রেখা পড়ে। পূর্ণিমাকে সঙ্গে নিয়ে এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে চলতে থাকে মাঠের দিকে। এক সময়ে প্রশ্ন করে, এ বিষয়ে তোমার মতটা জানতে পারি কি?

পূর্ণিমা সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে বলে, কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারি নি এখনও। তবে মনে হয়, এর পর যদি বেঁচে থাকতে হয়, একটা অবলম্বন থাকা ভাল। বাপ মা চিরদিনের নয়। স্বামী অন্তাসক্ত। এ অবস্থায় বিনা দোষে জীবনটাকে অনিত্য, অসার ভেবে মরণের দিকে ঠেলে না দিয়ে যদি অতৃপ্ত বাসনা, কামনা, আশা, আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্তি দিতে চাই, যদি জীবন-মাধুর্যের রস আস্বাদন করতে চাই, তা হলে মিঃ সিন্‌হার প্রস্তাবের একটা উত্তর দিতে হবে নিশ্চয়ই। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে তোমার মতামতের ওপর।

শুভেন্দু ব্যঙ্গ করে বলে, আমার মতামত? কি তুমি আশা কর দেবি। তোমার সিন্‌হা সাহেবের প্রস্তাবে মত দেব আমি!

পূর্ণিমা শুভেন্দুর দুর্বলতাকে বুঝতে পারে। তাই মুখ টিপে স্বামীর মুখের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে থেকে বলে, মানুষের আশার অন্ত নেই।

শুভেন্দু ঘাড় নেড়ে বলে, বিশেষ ক'রে মেয়ে মানুষের। তারা আশা করে, স্বামী তার বিবাহিতা স্ত্রীকে অপরের উপভোগের সামগ্রী হতে দেবে। ছিঃ লজ্জা করল না একথা উচ্চারণ করতে তোমার? এরই জন্যে ছুটে এসেছ আমার কাছে মত নিতে? আমি মত দেব না। সেই বিলিতি বাঁদরটাকে বলে দিও—না তার সঙ্গে মেলা করতে পারবে না তুমি। কাণ্ডজ্ঞানহীন জানোয়ার সেটা, আবার কি অপমান করে বসবে তোমায়, কে জানে।

পূর্ণিমা মাথার আঁচলটাকে এক পাশে আরও একটুখানি টেনে দিয়ে মুখখানাকে আড়াল ক'রে হাসি গোপন করল। তারপর ভাল মানুষের মত বলল, ভাল কথা। কিন্তু আমার জীবনটার দিকে তাকিয়ে দেখেছ কি তুমি? সেখানে প্রাণের স্পন্দন কি আদতে নেই?

শুভেন্দু হতাশভাবে বললে, পূর্ণিমা। আমার পাগল করে দিও না তুমি। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর এত বড় দুশ্চিন্তার আঘাতে, হয় আত্মহত্যা করে বসব আমি, না হয় মাথা খুঁড়ে মরব এইখানেই।

পূর্ণিমা সভয়ে দুপা পিছিয়ে যায়। জিভ কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ। ও কাজ কর না। কি ভাববে রাস্তার লোকেরা বলত?

—জানি না। রাস্তার লোকের কথা ভাববার মত মনের অবস্থা নয় আমার। তোমাকে বলে দিচ্ছি পূর্ণিমা, এ ভাবে পথে ঘাটে একা একা বেরুতে পাবে না তুমি। এতে আমার সম্মানের হানি হয়। চল, তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি। তারপর এর বিহিত আমি করব।

পূর্ণিমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করে, কিন্তু কথা ব্যানার্জি?

—তার কথা থাক! উপস্থিত তার সমস্যা আমায় যখন পাগল করছে না, তখন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

পূর্ণিমা শুভেন্দুর পাশে পাশে চলতে চলতে একবার চোখের কোণ দিয়ে তাকে দেখে নেয় তারপর বলে, আজকে হয়ত প্রয়োজন নেই। কিন্তু কাল যখন আজকের সমস্যা থাকবে না, তখন?

—তখন? শুভেন্দু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বিমুগ্ধভাবে বলে, তখন তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সে সমস্যার সমাধান করব দু'জনে।

পূর্ণিমা কটাক্ষ ক'রে বলে, ঠিক?

—ঠিক।

সহসা একটা রক্তোচ্ছ্বাসে পূর্ণিমার সারা মুখখানা আরক্তিম হয়ে উঠে। একটা পুলকোচ্ছ্বাস অন্তরটিকে প্লাবিত করে দেয়। এতদিন পর আজ সে সুখী। স্বামীর এই স্বীকারোক্তিটুকু আনন্দের বান হয়ে তার হৃদয়তন্ত্রীতে বাজতে থাকে। সে গতি মন্থরীভূত করে।

শুভেন্দু চকিত হয়ে উঠে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার?

—কিছু না। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলে, একটা কথা ছিল। তিনি এসেছেন।

শুভেন্দু বিস্মিত হয়। প্রশ্ন করে, কে এসেছেন?

—মিষ্টার সিন্‌হা।

শুভেন্দু থমকে পড়ে। অবাক হয়ে বলে, মিষ্টার সিন্‌হা? এখানে?

পূর্ণিমা ঘাড় নেড়ে ভাল মানুষের মত বলে, ওঁরই সঙ্গে ত আমি এসেছি এখানে। আমার জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করে আছেন ওখানে। বলে তর্জনী তুলে অদূরে বেণুকার মটরখানি দেখিয়ে দেয়।

রাগে শুভেন্দুর ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠে। কিন্তু নিজেকে সামলে রেখে বলে, ছিঃ ছিঃ: আমার মান সম্ভ্রম আর কিছু তুমি রাখলে না পূর্ণিমা। দিনে দুপুরে পর পুরুষের সঙ্গে, ঘুরে বেড়াতে

তোমার লজ্জা ক'রে না? এতদূর অধঃপতন হয়েছে তোমার? তারপর একটু থেমে বলে, বেশ, কোথায় তোমার সিন্‌হা দেখিয়ে দাও। পরস্ত্রীকে ফুসলান তার ধার করাচ্ছি আমি।

পূর্ণিমা যেন ভয় পেয়েছে এ রকম ভাব দেখিয়ে বলে, এই চুপ! পাগল হ'লে না কি? ভদ্রলোক—।

—ভদ্রলোক, না স্কাউণ্ড্রেল? দিনে দুপুরে পরের স্ত্রীকে নিয়ে ফূর্তি ক'রে বেড়ায় যে, সে আবার ভদ্রলোক! আসল শিক্ষা না হ'লে এ রোগ ওদের সারবে না।

—আসল শিক্ষা ওদের আছে। বিলাত ফেরত লোক, শিক্ষা দীক্ষা, কায়দা কানুন সবই ওদের আলাদা।

—বিলিতি শিক্ষওয়ালাদের আমি চিনি। পিঠে লাঠৌষধি না পড়লে শিক্ষা-সৌজন্য ওদের খোলে না। মহাপ্রভুটিকে একবার দেখিয়ে দেব চল, তাকে সায়েস্তা করতে পারি কি না দেখি।

পূর্ণিমা দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, না, আমি যাব না। ওঁকে অপমান করলে তিনি হয়ত আমার খাতিরে অভদ্রের মত চেঁচামেচি করবেন না রাস্তার মাঝখানে কিন্তু আমি মুখ দেখাব কি করে? এরপর আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ থাকবে না আমার।

শুভেন্দু অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে বলে, কি বলছ তুমি পূর্ণিমা! একটা পরপুরুষের জন্যে তুমি আত্মহত্যা করবে আর সেই কথা অম্লান বদনে শোনাচ্ছ তোমার স্বামীকে?

—শোনাবার ইচ্ছা ছিল না আমার কিন্তু সবই আমার দুরদৃষ্ট। উনি আমার অতিথি। আমারই অনুরোধে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এখানে। এখন আমারই সামনে আমার স্বামী যদি ওঁকে অসম্মানিত করেন, ভাববেন এ সবই আমার কারসাজি। তারপর সহসা স্বামীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সরে এসে কণ্ঠে মিনতি ঢেলে বলে, লক্ষ্মীটি রাগ ক'র না। ভেবে দেখ, অপরাধ ওঁর নয়, অপরাধ আমাদের। আমরা সুযোগ দিই বলেই না, এতখানি সাহস করতে পারেন ওঁরা। তুমি কিছু বল না, যা বলবার সব কথা আমিই বুঝিয়ে বলব ওঁকে। তিনি উদার চরিত। স্বামীর ক্ষমা পেয়েছি শুনলে খুশিই হবেন। এতটুকু ক্ষোভ করবেন না।

শুভেন্দু রাজি হয়। বলে, বেশ বুঝলাম, মহাগুণবান পরম পুরুষ তিনি। কিন্তু এহেন পরম পুরুষটিকে তোমার চোখের আড়াল না করতে পারলে শান্তি পাব না আমি। চল, পাপ আগে বিদায় করি, তবে অন্য কাজ।

একটা অব্যক্ত হাহাকারে পূর্ণিমার সারা শরীরটা দুলে দুলে উঠে। কিন্তু সে হাত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে শুভেন্দুর পাশে পাশে চলতে থাকে।

গাড়ীতে বসেছিল রেণুকা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে। মুখের উপর ঘনীভূত উদ্বেগের ছায়া। ভিতরে চাপা উত্তেজনা। সুপ্রিয়ের পরামর্শে একটা বড় রকমের পরীক্ষায় হাত দিয়েছে সে। এর সফলতায় একটি তরুণী জীবনের সার্থকতা, অন্যথায় ব্যর্থতা। রেণুকা স্বস্তি পায় না। মাথায় ঝাঁকানি দেয়। এতবড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ভাল করেনি সে। পূর্ণিমাকে যদি রক্ষা করতে না পারে—। রেণুকা কেঁপে উঠে। ইচ্ছে হয়, ছুটে যায় পূর্ণিমার পাশে। শুভো ঠাকুরের হাত দুটি ধরে মিনতি করে বলে—। কিন্তু কিছুই বলতে হল না। সামনে দেখে পূর্ণিমা আর শুভো ঠাকুর আসছে পাশাপাশি। বুকের ভিতরটা তার ধড়াস করে উঠে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে পূর্ণিমার দিকে তাকায়। দেখে, আলো ঝলমল

মুখ, আলো ঝলমল চোখ। অন্ধকারের চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ঠোঁটের কোল দুটিতে একটা চাপা হাসি যেন আটকে রয়েছে, ছাড়া পেলেই লুটিয়ে পড়বে কুটি কুটি হয়ে। রেণুকা বোঝে এ মুখে পরাজয়ের কালিমা নেই। জয়ের উল্লাস এ মুখের খাঁজে খাঁজে। সে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়। ষ্টিয়ারিং হুইলের উপর হাত রেখে সে প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে বসে থাকে।

গুডেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণিমা মোটরের কাছে এসে উপস্থিত হয়। এক পাশে দাঁড়িয়ে কোমল কণ্ঠে ডাকে, মিষ্টার সিনহা!

রেণুকা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখে লাফ দেবার ভঙ্গিমায় মোটর থেকে নেমে এসে সহাস্য মুখে দাঁড়ায়।

পূর্ণিমা চোখের কোণ দিয়ে রেণুকাকে দেখে। হয় ত একটা ইসারাও খেলে যায় চোখে চোখে। তারপর সলজ্জ ভঙ্গিমায় গুডেন্দুকে বলে, ইনিই মিষ্টার সিন্‌হা। বলে হাত তুলে দেখিয়ে দেয় রেণুকাকে। রেণুকা হাসি মুখে গুডেন্দুর দিকে তাকায়। তারপর পূর্ণিমাকে বলে, মিষ্টার বনারজী, আই প্রিজিউম্?

সলজ্জ হাস্যে পূর্ণিমা ঘাড় নাড়ে।

রেণুকা গুডেন্দুকে 'বাউ' করে স্মিত মুখে বলে হাউ ডু ডু মিট ইউ মিষ্টার বনারজী। তারপর করমর্দনের জন্য ডান হাতখানা সামনের দিকে প্রসারিত করে দেয়।

গুডেন্দু করমর্দন করতে ভুলে যায়। এই প্রাণ প্রাচুর্যে উচ্ছ্বসিত, নিখুঁত ভাবে সুসজ্জিত চটপটে যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে সে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এর পাশে নিজেকে নিতান্তই বেমানান মনে হয়। মনে মনে স্বীকার করে সুপুরুষ বটে! এ চেহারায় পুরুষেরই মতিভ্রম হয়, পূর্ণিমা ত মেয়ে মানুষ।

—মিষ্টার বনারজী! রেণুকা ডাকে।

গুডেন্দু সম্বিত ফিরে পায়। কিন্তু করমর্দন করতে গিয়ে সে আবার চমকে উঠে। এমন ভেলভেটের মত নরম হাত সে পুরুষ মানুষের কখনও দেখেনি। হাতখানা ছেড়ে দিতে ভুল হয়ে যায় তার। সে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে।

রেণুকা অনুযোগ করে বলে, মিষ্টার বনারজী কি বিশেষ ক্লান্ত, তাই কথা বলছেন না আমার সঙ্গে?

পূর্ণিমা স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে তারপর রেণুকাকে বলে, সারাদিনের পরিশ্রমের যে ধকলটা শরীরের ওপর দিয়ে গেছে, তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়াটা বিচিত্র কিছু নয়, মিষ্টার সিন্‌হা।

রেণুকা তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে অনুতাপের ভঙ্গীতে বলে, আই এ্যাম্ সো সরি মিষ্টার বনারজী। আপনি ক্লান্ত বুঝতে পারি নি আমি। এক্সকিউজ মি প্লীজ।

গুডেন্দু ভ্রূকুটি করে। পূর্ণিমাকে বলে, অনর্থক দেরী করে লাভ নেই। চল, আমাদের যেতে হবে এবার।

রেণুকা হাসি মুখে বলে, যাবেন বই কি। ওনাকে পৌঁছে দেব বলেই ত অপেক্ষা করে আছি।

—ধন্যবাদ, তার কোন প্রয়োজন হবে না। আপনি এখন যেতে পারেন। পূর্ণিমা আমার স্ত্রী, আমার সঙ্গেই যাবে।

—সত্যি? পূর্ণিমা? রেণুকা ভ্রূ নাচিয়ে বলে।

গুডেন্দু নিজেকে সামলাতে পারে না। রোষ ভরে বলে, আপনি নির্লজ্জ হন আর নৃশংসই

হন, আমার স্ত্রীকে আমার সামনে অসম্মানিত করতে পারবেন না। পূর্ণিমা সরে এসে একটু ভর্ৎসনার সুরে বলে, আঃ কর কি। ভদ্রলোক—। গুডেন্দুর রাগ থামে না। বলে, ভদ্রলোক জানি।" তুমি চলে এস আমার সঙ্গে।

রেণুকা তেমনি হাসিমুখে বলে, আই এ্যাম রিয়েলি স্যরি মিষ্টার বনারজী, পূর্ণিমাকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন বেশ। কিন্তু অনর্থক কষ্ট করবেন কেন, আসুন না, আমিই পৌঁছে দিয়ে আসছি আপনাদের। কি বল পূর্ণিমা? তুমিই না হয় একবার বলে দেখ না। হয়ত তোমার অনুরোধ রাখতে পারেন উনি।

রেণুকা তাকায় পূর্ণিমার মুখের দিকে। দু জনার চোখে চোখে আর একবার ইসারা হয়ে যায়। পূর্ণিমা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর স্বামীকে অনুরোধ করে বলে, বেশ ত, মিষ্টার সিনহা যখন অতো করে বলছেন, একটা অনুরোধ না হয় রাখই না তাঁর। উনি লোক ভাল। অনেক উপকার করেছেন আমাদের। ওনাকে মনক্ষুণ্ণ করা উচিত হবে না। বিশেষতঃ আমাদের অপেক্ষায় উনি যখন এখানে এতক্ষণ আটক হয়ে গেছেন।

গুডেন্দু রুক্ষস্বরে বলে, আমার জন্যে আটক থাকে নি। থেকেছে নিজের গরজে। অতি বুদ্ধিমান ছোকরা কিনা।

পূর্ণিমা মোলায়েম করে বলে, মানলাম না হয় আমাদের জন্যে থাকেন নি। থেকেছেন নিজের গরজে। কিন্তু ভদ্রতা বলে ত একটা জিনিষ আছে। তার অনুশাসন ত মেনে চলা উচিত।

কল কলে। গুডেন্দু একটু নরম হয়। বলে, বেশ তোমার অনুরোধ আমি রাখব। কিন্তু এইবারের মত। দ্বিতীয়বার অনুরোধ আর আমায় কর না।

রেণুকা আনন্দে চোখ নাচিয়ে বলে উঠে, হাউ, গ্রেসফুল! সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুটিকে কুঁচকে সে শিষ টানার মত শব্দ করে।

গুডেন্দু মুখ শিঁটকে বলে উঠে, অসভ্য, ডেঁপো ছোড়া কোথাকার। তারপর বাতাসকে উদ্দেশ্য করে যেন বলতে থাকে, চলুন, খামোকা দেরী করাবেন না। আর বলতে বলতে নিজেই গিয়ে গটমট উঠে বসে।

পূর্ণিমা ইতস্ততঃ করছিল। কোনখানে বসা উচিত তার সে ঠিক করতে পারছিল না। এমন সময়ে গুডেন্দু ডাক দিল, তুমি এদিকে উঠে এস পূর্ণিমা। রেণুকা আবার শিষ টেনে বলল, ছাট্স্ ওকে। তুমি মিষ্টার বনারজীর পাশেই বস পূর্ণিমা। আমি তোমাদের ঠিক পৌঁছে দিতে পারব, দেখ। বলে পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে একটু হাসল। তারপর বেহ তঙ্গী করে গাড়ীতে উঠে বসে ষ্টার্ট দিল।

গুডেন্দু রাগ করে আবার বলে উঠল, ফাজিল, এঁচড়ে পাকা ডেঁপো ছেলে। এই বয়সেই ধুরন্ধর। এখনও আস্ত বয়স পড়ে রয়েছে।

পূর্ণিমা তর্জনীটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলে চুপ! চুপ। শুনতে পেলে কি মনে করবেন বল ত? বিশেষ কেরত মানুষ ওঁরা। ঐ রকম আর্টসই হয়ে থাকেন।

আর্টস! বাড়ী ফিরে বের করাচ্ছি ওর আর্টসগিরি। নাম ভুলিয়ে ছাড়ব ওর।

পূর্ণিমা যেন আঁৎকে উঠে। বলে, মারামারি করবে না কি। না, না, তার চেয়ে এইখানেই মেনে যাই। ফেলেকারী বাড়িয়ে কাজ নেই আর।

—কেলেঙ্কারী বাড়াচ্ছি আমি। সব দোষ আমার। ওঃ পূর্ণিমা!

—না, তোমার নয় আমার, আমার অদৃষ্টের। কিন্তু লোক জানাজানি হয়ে গেলে কি হবে বলত? আমার কথাটা ভেবে দেখেছ কি একবার?

—না, ভাববার সময় পাচ্ছি কোথায়। একটা ক্রুটের পাল্লায় যে পড়েছি আমরা।

পূর্ণিমা শিউরে উঠে। বলে, ছি-ছি, ভদ্রলোকের ছেলে। তাকে ক্রুট বলা শোভা পায় না। স্ত্রীর বাধা দানে শুভেন্দু আরও উত্তেজিত হয়ে উঠে। জোর দিয়ে বলে, আলবাৎ পায়। এক শো বার পায়। যে পরের স্ত্রীকে ভুলাবার চেষ্টা করে সে ক্রুট নয় ত কি?

—ও কথা বললে অবিচার করা হবে ওর প্রতি। লোভ দেখিয়ে বা লুকোচুরি করে কোন কাজ করেন নি উনি। উদারচেতা মহৎ ব্যক্তি। মহত্বই দেখিয়ে এসেছেন বরাবর।

—মহত্ব? উদারতা? এ সব কি বলছ তুমি।

—একটুও বাড়িয়ে বলিনি। জীবনেরও এই সন্ধিক্ষণে তোমার যে একটা অনুমতির প্রয়োজন, এ কথা বুঝিয়ে বলা মাত্র উনি নিজে থেকেই ছুটে এসেছেন এত দূর আমাকে সঙ্গে করে।

—রসিক লোক, রসিকতা করেছেন। আমার দুরবস্থাটুকু উপভোগ করবার জন্যে আমারই স্ত্রীকে সঙ্গে করে এনেছেন এখানে। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়েছি আমি।

—আঃ! মুখে আগল দাও একটুখানি।

রেণুকা এতক্ষণ সাবধানে ভিড় কাটিয়ে গাড়ী চালাচ্ছিল। এখন একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে বলল, মিস্টার বনারজী আমার পরিচয় হয়ত সুইট্ পূর্ণিমার কাছে পেয়ে থাকবেন আপনি।

শুভেন্দু এ কথার জবাব দেয় না। শুধু একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

রেণুকা বলে, মাইনিং শিখে বিলেত থেকে ফিরে এসেছি শুধু শুধু বসে থাকবার জন্যে নয়। অথচ কেন যে অপেক্ষা করে বসে আছি এ কথা পূর্ণিমা জানেন। হয় ত এরই একটা আভাষ পেয়ে থাকবেন তারই মুখ থেকে।

—হুম্! হলো বেড়ালের মত শুভেন্দু খস্ ক'রে উঠে।

পুলিশে হাত দেখিয়েছে। গাড়ী থেমে গেছে। সেই সুযোগে রেণুকা আর একবার মুখ ফিরিয়ে বলে, কথাটা যতখানি পরিতাপের ততখানি লজ্জারও বটে। কিন্তু না জানিয়েও ত উপায় নেই। এখন সুইট্ পূর্ণিমার ওপর আমার সব কিছুই নির্ভর করছে। আমার ভবিষ্যৎ, আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব।

—হুঁ—ম।

—তার মতামতটা জানতে পারলেই আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলব। আমাদের মত কাজ পাগল ইয়ং ম্যানদের পক্ষে এ ভাবে চুপ চাপ বসে থাকা সাজেও না, শোভাও পায় না। আফ্টার অল, আইড্‌ল্ ব্রেন্ ইজ এ ডেভিল্‌স্ ওয়ার্কশপ্।

গাড়ীর মধ্যেই শুভেন্দুর আস্ফালন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। বলে, ব্রেন! ও ব্রেনের নিকুচি করেছি আমি। বেহায়াটার লজ্জা নেই এ কথা শোনাতে আমায়।

পূর্ণিমা ফিস্ ফিস্ করে বলে, এই চেঁচিও না। দোহাই তোমার। আমার মুখটা একটু রাখ।

—তোমার মুখ ত আগাগোড়া রেখে চলেছি। কিন্তু আমার মুখ যে অলিয়ে পুড়িয়ে খাক্

ক'রে দিল হতভাগাটা। ওকে যদি আজ নক্ আউট্ ব্লো না দি—। শুভেন্দু তার মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা নাকের সামনে তুলে ধরে।

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি তার হাতখানা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে। চাপা গলায় বলে, আঃ! কি পাগলামি কর। তুমি যাও, এর ব্যবস্থা আমি করছি। তার পর সামনের দিকে ঝুঁকে রেণুকার দিকে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলে, মিষ্টার সিন্‌হা, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। তার জন্যে আগে থেকেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

রেণুকা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, নট্ এ্ন দি লিষ্ট বাই ডালিং পূর্ণিমা। কোন কষ্টই তুমি আমায় দাও নি। এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট তোমার জন্যে সহ্য করতে প্রস্তুত আছি আমি।

পূর্ণিমা বলে, আপনাকে বলেছি যে স্বামীর মতামতের ওপরই নির্ভর করছে আমার মতামত। যতক্ষণ না তাঁর মতের পরিচয় পাচ্ছি, ততক্ষণ কোন আশ্বাসই আপনাকে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

রেণুকাকে বলবার কোন সুযোগ না দিয়েই শুভেন্দু রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠে, আমি আগেও তোমায় বলেছি পূর্ণিমা, এখনও বলছি, এত বড় নির্লজ্জতার প্রশ্রয় আমি দেব না। তুমি আমার স্ত্রী, সেই ভাবেই আমি তোমায় চিরদিন পেতে চাই। তারপর রেণুকার দিকে তাকিয়ে বলে, মিষ্টার সিন্‌হা, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুচ্ছ মনোমালিন্যের সুযোগ নিয়ে, এত বড় গর্হিত প্রস্তাব করা শুধু যে অন্যায় তা নয়, বে-আইনীও বটে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে মানি, কিন্তু সে পরিচয় আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হ'ক এ আমি চাই না। এ হতে না দেওয়াই মঙ্গল।

এতক্ষণকার গুমোট আবহাওয়াটা যেন কেটে যায়। রেণুকার মুখে হাসি দেখা দেয়। অনাবিল জয়ের হাসি। শুভেন্দুর অলক্ষ্যে পূর্ণিমাকে কটাক্ষ করে যেন বলে, কেমন, এবার হয়েছে ত? পূর্ণিমাও ঘাড় নেড়ে তেমনি ভাবেই উত্তর দেয়। চোখে মিনতি ভরে যেন বলে, খুব হয়েছে ভাই, আর নয়। এবার ক্ষমা দে।

কিন্তু প্রকাশ্যে রেণুকা শুভেন্দুকে বলে, এ অতি উত্তম প্রস্তাব মিষ্টার বনারজী। আমার দিক দিয়ে এ বিষয়ে আপত্তি করবার কিছুই থাকতে পারে না। এতে আমি যে কতখানি খুশি হলাম, আপনাকে বোঝাতে পারব না।

শুভেন্দু ব্যস্ত হ'য়ে উঠে, সত্যি? আপনার খুশিতে আমি ধন্য হলুম সিংহী সাহেব।

রেণুকা সে কথায় কান না দিয়ে বলে, আপনি আমার সম্মান জানেন সুতরাং আপনার কাছে অসত্য বলব না। আপনারা স্বামী-স্ত্রী। আপনাদের মধ্যে মিলনও থাকবে, বিরহও থাকবে। কিন্তু বিরহটা এতখানি উৎকট হওয়া উচিত নয়, যাতে পাড়া প্রতিবেশীরা সুযোগ নিতে পারে।

শুভেন্দু লজ্জিত হয়। অপ্রতিভ মুখে বলে, আমি দোষ স্বীকার করছি। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের দিক দিয়ে।

—তা হয়েছে। ভবিষ্যতে সাবধান না হলে হয় ত এই উৎকটই বিকটে পরিণত হবে।

শুভেন্দু প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলে, উৎকট বিকট কিছুই হবে না। ভবিষ্যতের প্রহরী এখন থেকেই সজাগ থাকবে।

—শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। একটা গুরু দায়িত্বের ভার কাঁধ থেকে নেমে গেল। এখন আমি তার

মুক্ত বিহঙ্গম। ইচ্ছে করছে আকাশের বুক চিরে পৃথিবীটাকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসি। আজ আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন মিষ্টার বনারজী। মুইট্ পূর্ণিমে তুমিও গ্রহণ কর।

একটা প্রচণ্ড বিস্ময় শুভেন্দুকে মূক করে দিয়ে গেল। মিষ্টার সিন্‌হার ব্যবহার সত্যই দুর্বোধ্য ঠেকছে তার কাছে। নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে কত কটূক্তিই করেছে, কত অপ্রিয় বাক্যই না বলেছে। অসম্মানের চূড়ান্ত করেছে কিন্তু প্রতিবাদে একটি কথাও সে বলেনি, কোন রকম অভদ্রতাও প্রকাশ করে নি। সব কিছুই সহে গেছে হাসি মুখে।

শুভেন্দু অবাক্ বিস্ময়ে রেণুকার আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক এমনি সময় রেণুকাদের বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে দাঁড়াল।

গাড়ী দাঁড়াতেই শুভেন্দুর চমক ভাঙে। একবার মুখ বাড়িয়ে সে বাইরে তাকিয়ে দেখে। অপরিচিত স্থান। এখানে কোন দিন যে সে এসেছে বলে মনে হয় না। তাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, এ আমরা কোথায় এলাম?

রেণুকা উত্তর দেয়, অস্থানে কোথাও নয়। গরীবের কুঁড়ে এটি। আপনি মানী লোক। পদধূলি দিয়ে একে ধন্য করতে হবে।

শুভেন্দু ব্যস্ত হয়ে উঠে। বলে, না, না আজ নয়। আজ—

কিন্তু ততক্ষণে রেণুকা গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। হাসি মুখে বলে, জানি আজ আপনার অনেক কাজ। তা ছাড়া অফিস থেকেও ফিরছেন। কিন্তু তবুও আমার এ অনুরোধটুকু আপনাকে রাখতেই হবে। কোন আপত্তিই আমি শুনব না মিষ্টার বনারজী। পূর্ণিমা, ডার্লিং, তুমিও নেমে এস। বলতে বলতে সে এগিয়ে আসে এবং পূর্ণিমাকে বাহু ধরে যত্নের সঙ্গে নামিয়ে নেয়।

শুভেন্দুর রাগটা হয়ত এতক্ষণে কিছুটা প্রশমিত হয়ে এসেছিল। কিন্তু আবার তা দপ করে জ্বলে উঠে। বলে, এ অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় মিষ্টার সিন্‌হা। সময় নেই, অসময় নেই, মানুষের মন মেজাজের স্থিরতা নেই, জোর জবরদস্তি করলেই হ'ল। এর আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি।

রেণুকা হাসি মুখে বলে, একে তোর জবরদস্তি মনে করবেন না মিষ্টার বনারজী। এ ভালবাসার অত্যাচার।

—উঃ! অসহ্য!

—তা ছাড়া, পূর্ণিমার প্রতি আমারও একটা কর্তব্য আছে। তার কথা তার নিজের মুখ থেকে শুনে, আমার পথ বেছে নিতে চাই। আসুন।

অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই গাড়ী থেকে নেমে আসতে হয় শুভেন্দুকে। রেণুকা তাকে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে চলে। চলতে চলতে রেণুকা বলে, আপনাকে এ ভাবে কষ্ট দিচ্ছি বলে আমি সত্যিই দুঃখিত মিষ্টার বনারজী। কিন্তু যে উদ্বেগ নিয়ে এ কটা দিন আমার কেটেছে, আজ সংকটের চরম মুহূর্তে এসে যে উত্তেজনার তার অন্তরকে নিষ্পেষিত করে তুলেছে, তা যদি আপনাকে বোঝাতে পারতাম, দেখতেন তার তুলনায় আপনার এ কষ্ট কতখানিই না তুচ্ছ। পূর্ণিমার একটি মাত্র কথার ওপর সব কিছুই নির্ভর করছে আমার।

শুভেন্দু দাঁতে দাঁত ঘষে নিম্নকণ্ঠে বলে, করাচ্ছি নির্ভর। হতভাগা—

—আমার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, উত্থান পতন, সবই এর সঙ্গে জড়িত মিষ্টার বনারজী।

শুভেন্দু আর নিজেকে সামলাতে পারে না। উত্তেজিত হয়ে বলে, দোহাই পূর্ণিমা, ঘর ফিরে চল, না হয় তোমার বন্ধুটিকে থামতে বল। কান ঝালা পালা হয়ে গেল ওর কাব্যি শুনতে শুনতে।

রেণুকা অপ্রতিভের ভাব দেখিয়ে বলে, আমি একটু সেন্টিমেন্টাল মিষ্টার বনারজী। বিলাতে থাকতে এই সেন্টিমেন্টালিজম এর ভাবটা আরও বেড়ে গিয়েছে। সব সময় নিজের সুখ দুঃখটাকেই বড় করে দেখি। অপরের সুবিধে অসুবিধের কথাটা ভাবি না। থাক ও সব কথা। এখন এই ঘরে একটু বিশ্রাম করুন আপনি। আমি এলাম বলে। বলে সামনের ঘরখানির পর্দা তুলে শুভেন্দুকে নিয়ে প্রবেশ করল। বড় ঘর। সোফা সেটি আয়না আর কার্পেটে সাজান। শুভেন্দুকে একখানা সোফার উপর বসিয়ে দিয়ে রেণুকা আবার বলে, আর পাঁচ মিনিট আপনাকে কষ্ট দেব মিষ্টার বনারজী। এর মধ্যে একটা জরুরী কাজ শেষ করে আমি ফিরতে পারব আশা করি। তারপর পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এস পূর্ণিমা, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বলতে বলতে পূর্ণিমার হাত ধরে তাকে এক প্রকার টানতে টানতেই ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুভেন্দু হাঁ করে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

পূর্ণিমাকে হাতে ধরে নিয়ে আসে রেণুকা দোতালায় তার ঘরের ভিতর। তাকে একটি ভেলভেটের মোড়ার উপর বসিয়ে দিয়ে নিজে সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর পূর্ণিমাকে লক্ষ্য করে থিয়েটারী গলায় বলে, মাইকা মাইনের ম্যানেজারনী অথবা শুভো ঠাকুরের হেঁসেল ঘর কোনটা তোমার কাম্য, ডার্লিং?

পূর্ণিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এখন মনার ঘড়িই একমাত্র কাম্য, আর কিছু নয়। এই কি সম্মানের জীবন রেণু! পর পুরুষের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে, স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তার মন পাওয়া, কোন স্ত্রীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় তাই? তাই কেবলই মনে হচ্ছে, এ হীনতার চাইতে এখন মরণ হলেই বাঁচি আমি। পূর্ণিমার চোখ দিয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়ে!

রেণুকা অপ্রতিভে পড়ে যায়। বলে, তুই কাঁদছিস পূর্ণিমা। কিন্তু তোর আজকের জয় ত অসম্মানের জয় নয় তাই। পূর্বকালে পুরুষেরা জয় করে আনত মেয়েদের। এ ছিল তাদের শ্লাঘার বিষয়। এ কালে স্ত্রী জয় করে আনল পুরুষকে। এতে স্ত্রীরই শ্লাঘা। কথার গ্রাস থেকে ঠাকুরকে তুই ছিনিয়ে এনেছিস। এতে তোর ভালবাসারই মহত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। এমন সুগভীর ভালবাসা না থাকলে এ কাজে নামতে সাহস পেতিস না তুই।

পূর্ণিমা এ কথার উত্তর দেয় না। নত নেত্রে স্থির হয়ে বসে থাকে। স্বামীকে জয় করেছে সে এতে শ্লাঘার কিছু নাই। এ জয়ের সব কৃতিত্বটুকুও তার নয় বেশীর ভাগই রেণুকার। সে না থাকলে এ জয় সম্ভবপর হত না কোনদিনই।

রেণুকা আবার বলে, কিন্তু যাই বলিস ভাই, ঠাকুরও ভালবাসায় বড় কম যান না। প্রেমের ঠাকুর দর্শন মাত্রেই একেবারে গলে গেলেন। তারপর একটু মুচকি হেসে আবার বলে, কিন্তু ভারী গলকা তোর ঠাকুরটি ভাই। এতটুকু ধাক্কা সইতে পারলেন না। একেবারে মাটীতে লুটিয়ে পড়লেন।

পূর্ণিমা মুখ তুলে বলে, কিন্তু ধাক্কাটিও ত খুব সোজা হয় নি ভাই।

রেণুকা মুখ মুচকে বলে, ইস্, সম্মান দেখাচ্ছিস ঠাকুরকে! দুরন্ত ত দেখলুম ঐ। উনি যান পরের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে। জানলে, এত কাণ্ড কি করতে যেতাম। রেগে, ঝিড়কাপ করে নিয়ে

এলে খাঁচায় পুরতাম আর নাকে খৎ দিয়ে দাসখৎ লিখিয়ে ছেড়ে দিতাম। মেয়ে মানুষেরও বেহদ্দ একেবারে।

পূর্ণিমা আরক্ত হয়ে উঠে। আরক্তিম মুখে বলে, তোর ক্ষমতা আছে রেণু, এ কথা অস্বীকার করি না।

রেণুকা বলে, তখন বলি নি, তোর ঐ আলতা পরা রাঙা পা দুখানি তাকে জড়িয়ে ধরতেই হবে। চরণে নূপুর হয়ে বাজতেই হবে। বলিনি,

ও রাঙা চরণতলে পড়বে লুটি পড়বে লুটি,
চরণে কমল হয়ে উঠবে ফুটি, উঠবে ফুটি।

—আঃ, গান থামা। অস্থির হয়ে পড়েছি তোর গানের জ্বালায়।

—দাঁড়া আগে দাসখৎ লিখিয়ে নি, তবে সুস্থির হবি তুই।

পূর্ণিমা ভয় পেয়ে বলে, না ভাই, আর বাড়াবাড়ি করে কাজ নেই। সবেরই সীমা আছে। এর পর যদি হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

রেণুকা বলে, ভয় নেই পূর্ণিমা, এতকাল একসঙ্গে ঘর করে যাকে চিনতে পারিস নি তাকে আমি এক আঁচড়েই চিনেছি। তোর ঠাকুরটি যে ধাতু দিয়ে গড়া, তাকে সম্মান দেখিয়ে যদি ইস্পাত বলতে চাস, আমি নিরাস করব না তোকে। তবে বলব একেবারে কাঁচা ইস্পাত। এর ধার নেই, ভারটুকু সম্বল যা। তবে ঠাকুরাণীর ধারের অভাব নেই। আর তারই স্পর্শে ঠাকুরের অন্তরটি একেবারে কুচি কুচি হয়ে গেছে।

—তোর সবেতেই ঠাট্টা রেণু। পূর্ণিমা মুখ ফেরায়।

রেণুকা পূর্ণিমার কাছে সরে আসে। তার চিবুকে নাড়া দিয়ে বলে, ঠাট্টা নয় ভাই। একেবারে নির্ভেজাল সত্য এ। আজ কি যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছিস তুই, নিজে তা জানিস না। আমি মেয়ে, কিন্তু আমারই গা শির শিরিয়ে উঠছে তোকে দেখে। মনে হচ্ছে, ঠাকুরটিকে কপার হাতে সঁপে দিয়ে তোকে নিয়ে সরে পড়ি যাইকা যাইনে।

পূর্ণিমা হেসে ফেলে। বলে, কাজিল মেয়ে। বড় বাড়াবাড়ি করছিস আজ। তোর প্রলাপ শোনার চেয়ে একবার চট্ করে মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসি চ।

—তা হলে যেতে হবে দক্ষিণেশ্বরে। তাঁদের একরকম জোর করেই পাঠিয়েছি সেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে। আর সেই সুযোগে যেতে দেছি তোমার এই রাসোৎসবে।

দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে সুনন্দা, রেণুকার বৌদিদি। বয়সে রেণুকা অপেক্ষা বছর দুইয়ের বড় হলেও মুখখানি কচি, কাকড়া চুলে আবৃত। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। ব্যারিষ্টারের বোন বলে নয়, নিজেও বুদ্ধি ধরে বেশ। এক একজন মেয়ে আছে যাদের বৌদিদির পদে মানায় ভাল। সুনন্দা এই ধরনের মেয়ে। রেণুকাকে সে ভালবাসে। তাই রেণুকার সঙ্গে দাদার বিবাহের উদ্যোগ পর্বের সহায়তা করেছে সে। এখন অপেক্ষা করে আছে শুভ লগ্নের।

ঘরে প্রবেশ করে সুনন্দা বলে, তোমার মহোৎসব সব সময়েই লেগে রয়েছে ঠাকুর ঝি। তার কথা ছেড়ে দাও। এখন তোমার অভিসারের খবর কি বল ?

—ভাল না। শুনলে সুখী হবে না তুমি।

—কারণ?

—তোমার কপাল পুড়েছে।

মন্দ কথা নয়। তুমি মেলে অভিসারে, কপাল পুড়ল আমার। কি কপালের অপরাধ?

ভালবাসায়। এমন লোকের ওপর ভালবাসা অর্পণ করেছ, যে অপরের প্রেমে গদ গদ। তোমার দিকে ফিরে তাকাবার সময় পর্যন্ত নেই।

—সে ভাগ্যবানটি কে? তোমার দাদা?

—দূর! সে এই অভাগা। কিন্তু অভাগা আজ ডেউলে। সর্বস্ব বিলিয়ে বসে আছে এই রূপসীর আলতা মাখা চরণে।

সুনন্দা মুখে কাপড় চাপা দেয়। বলে, পোড়ার মুখি! বাপ মা বিয়ে দেবেন না মেয়ের। দাদা বোনটিকে বিদি করে পুষে রেখেছেন ঘরে। ওকে দোষ দেব কি? বয়সেরও ত একটা অভাব অভিযোগ আছে। তাই এই সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন এদিক ওদিক। এখন ঠাকুর দেবতার খবর কি বল?

—ভাল। ঠাকুর এখন হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়ে সৌরভে গৌরবে বিরাজ করছেন। আরতির ব্যবস্থা কর। কিন্তু এদিকে আমার প্রাণ যে যায়।

—প্রাণের অপরাধ? দাদাকে খবর দিচ্ছি এখুনি। কি মেনি মুখো পুরুষ রে বাবা। ব্যাপ্পোরি করে কি ক'রে, প্রেয়সীর ভয়ে একেবারে ঘু ঘু।

—দাদা নয়, ডুয়েল। ডুয়েল সুরু হয়ে গেছে আমাদের। ত্রিলোত্তমাকে নিয়ে শম্ভু বিশ্বপুর যুদ্ধ বেধে গেছে। ঠাকুর এখান পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছেন আমাকে।

সুনন্দা বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে বলে, তাই নাকি? এত বড় সুখবর ত দাও নি এতক্ষণ। একটা অসাধ্য সাধন করে এসেছ ঠাকুর বি। এর জন্যে সব অপরাধ ক্ষমা করলাম তোমার। হাঁ, ভাল কথা। পূর্ণিমার ননদ রমা এসেছে ওদের বাড়ীতে। ওর ছোট ভাই পূর্ণিমাকে খুঁজতে এসেছিল এখানে।

পূর্ণিমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়ে বলে, যাই ভাই রেণু, হঠাৎ রমা এল কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

রেণুকা ধমক দেয়, বস। মেয়ের আধিখ্যেতা দেখে বাঁচি না। ননদের ভয়ে ঘরে গেলেন একেবারে। অথচ তারই ভাইয়ের মুখের ওপর বলে এলেন, চাই না আমি তোমাকে এই চলনায় ঘর করতে যাইকা যাইনের ম্যানেজারের সঙ্গে। যাইরী বলছি বউদি এ সব ছিঁচ কাঁদুনে মেয়ে দেখলে গা জ্বালা করে। দূর দূর। ছ চক্ষের বিষ সব। রেণুকা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। দু একবার ঘর খানিকে পরিক্রম করেই সুনন্দাকে বলে, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই বৌদি। সুনন্দা স্মিত মুখে বলে বল, আমি প্রস্তুত।

—উঁহু হ'ল না। বল, দাসী বহুরে হাজির। করমাইয়ে ফাঁহাপনা।

সুনন্দা কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে বলে' ঘরে গেছে তোমার দাসী হতে। বিদী মেয়ে, আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠে বসেছে একেবারে।

—বৌজ বৌদি, দুইটি আমার। রাগ করে আমার ফিলিংস্ নষ্ট করে দিও না! পূর্ণিমার ননদ রমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। তাকে যেমন ক'রে হক আনতে হবে এখানে। গাড়ী নিয়ে তোমাকে যেতে হবে, এখুনি। তুমি গেলে সে আসবে নিশ্চয়ই। তখন তুমি যা জানতে চাইবে, তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পাবে। দেরী ক'র না, লক্ষীটি।

সুনন্দা রাজি হয়। ঘাড় নেড়ে বলে, বেশ আমি যাব। তোমার অভিসারে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত আমি। দাদারও আদেশ সেই রকম। আশা করি রমাকে নিয়ে আমি ফিরতে পারব শিগগির। সুনন্দা চলে যায়।

পূর্ণিমার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। সে আড়ষ্ট হয়ে উঠে। ভীত কণ্ঠে বলে, তোর দুটি পায়ে পড়ি রেণু। আমাকে যেতে দে। এ কেলেঙ্কারীর মধ্যে তাকে টেনে এনে আমার মুখ আর পোড়াস না।

রেণুকা এক মুহূর্ত পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর দু হাতে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, আমাকে তুই সন্দেহ করছিস পূর্ণিমা? তোকে অসম্মান করবার জন্যই কি আমার সারা দিনের এত আয়োজন? রমা এলে একটা বড় সমস্যার যদি সমাধান হয়ে যায়, সেই জন্যে তাকে আনা।

—রেণু। পূর্ণিমা লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠে বলে, ঘর পোড়া গরু একটুতেই ভয় পায়। আমারও ভয় তাই। তোকে সন্দেহ করে নিজেকে আর ছোট করতে চাই না।

—তাই করিস না। আমি এই বেশেই দেখা করব রমার সঙ্গে। শুভো ঠাকুরের কাছে আমার যে পরিচয় দিয়েছিলি, এখানেও সেই পরিচয় দিবি। ঠাকুর আপিস থেকে ফিরে ঠায় বসে আছেন ওখানে। লক্ষীর মাকে বলে আয় ভাই চা জলখাবার পাঠিয়ে দিক ওখানে। আমি আর যাব না এ বেশে।

রমাকে নিয়ে সুনন্দা যখন ফেরে তখন পূর্ণিমা আর রেণুকা দুটি মোড়ার উপর পাশা পাশি বসে গল্প করছিল। বাইরের জোড়াল আলোর অপেক্ষা ঘরের নীলাভ আলোয় অস্পষ্টতা একটু বেশী। তাই ঘরে ঢুকে প্রথমে পূর্ণিমাকে দেখে রমা বলে উঠে, এই যে বৌদি তুমি এখানে? কিন্তু পর মুহূর্তেই পার্শ্বোপবিষ্ট রেণুকার উপর দৃষ্টি পড়াতে সে সঙ্কুচিত হয়ে উঠে।

পূর্ণিমা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে। বলে, এস ভাই রমা। এখানে অহেতুক সঙ্কুচিত হবার কিছু নেই। তুমি মিষ্টার সিন্‌হাকে চেন না। কিন্তু উনি তোমায় চেনেন। মিষ্টার সিনহা সম্প্রতি বিলাত থেকে ফিরেছেন মাইনিংএ ডিগ্রী নিয়ে। তারপর রেণুকার দিকে ফিরে বলে, মিষ্টার সিনহা, ইনি আমার ননদ রমা দেবী।

রেণুকা হাসি মুখে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে 'বাও' করে বলে, নমস্কার রমা দেবী। মৌখিক পরিচয় আমাদের মধ্যে নেই সত্যি, কিন্তু পূর্ণিমার মুখে আপনাদের কথা এত বেশী শুনেছি যে আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই যেন অনেক কালের আত্মীয়তা জন্মে গিয়েছে।

রমা ভ্রুকুটি করে। রেণুকাকে অগ্রাহ্য করে পূর্ণিমাকে প্রশ্ন করে, এখানে আমাকে ডেকে পাঠাবার কারণ কি বৌদি?

পূর্ণিমার উত্তর দেবার আগেই রেণুকা উত্তর দেয়। বলে, আমি পূর্ণিমার দুঃখটাকে নিজের

দুঃখ বলে জ্ঞান করি বলেই অদৃষ্টের হাতে তাকে ছেড়ে দিতে রাজি নই। তার ওপর এই যে অধিকার এটা তার নারীত্বের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। আমি তাকে বলি, এ চ্যালেঞ্জ তার গ্রহণ করাই উচিত। না করাটাই হবে তার পাপ।

রমা ফেরে। রেণুকার দিকে তাকিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে, আপনার উদ্দেশ্যটা যে কি, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

—শুনুন বলছি। পূর্ণিমা নিরপরাধিনী। তাই এত বড় অপমান সহে যাওয়া উচিত হবে না তার। আমি তাকে বলেছি, যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ বাড়ুজ্যে বাড়ীর সিংহদ্বার তার কাছে রুদ্ধ হয়ে যায় চিরদিনের তরে তাহ'লে এই কুটীরের দ্বার তার জন্য অবারিত হয়ে থাকবে চিরদিনের তরে। এতটুকু ইতস্ততঃ না করে সে এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সর্বময়ী কর্ত্রী হিসাবে।

রমা উত্তেজিত হয়ে উঠে। প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলে, এই সব নোংরা কথা শোনাবার জন্যেই তুমি আমাকে এখানে ডেকে এনেছ বৌদি। এতদূর অধঃপতন তোমার যে হ'তে পারে এ আমি ভাবতে পারি নি। এতদিন তোমায় যা ভেবে এসেছি, তা তুমি নও। দাদা তোমায় চিনতে এতটুকু ভুল করেন নি।

রেণুকা হাসে। বলে, কোন মানুষই একেবারে নির্ভুল নয় রমা দেবী। পূর্ণিমাও নয়, আপনার দাদাটিও নয়। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে পুরুষ যদি অনাসক্ত হয়, তবে নির্যাতিতা স্ত্রীর সামাজিক গণ্ডী লঙ্ঘনে দোষ কোথায়? বলুন রমা দেবী।

রমা একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রেণুকার মুখের উপর কিন্তু কোন জবাব দেয় না।

শুধু পূর্ণিমাকে লক্ষ্য করে বলে, সামাজিক গণ্ডী ডিঙোবার সাধ যদি তোমার হয়ে থাকে বৌদি, আমরা বাধা দেব না। তবে আমাদের বাড়ীর প্রাচীরের মধ্যে থেকে, এ সখ তোমার মিটবে না, এ তোমায় জানিয়ে দিলুম। আচ্ছা, চল্লুম বৌদি।

এতক্ষণ সুনন্দা এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মুখ টিপে টিপে এ দৃশ্যটুকু উপভোগ করছিল। এবার সে এগিয়ে এল। রমার হাত ধরে হাসিমুখে বলল, আমি তোমার বয়সে বড় এবং সম্পর্কেও বড়, তাই ভাবছি লৌকিকতা না ক'রে তোমায় নাম ধরে ডাকব রমা। তুমি বড় ভুল করলে ভাই। প্রথম ভুল, মেয়ে হয়ে মেয়েদের দাবী অন্ততঃ মৌখিকও স্বীকার না ক'রে। দ্বিতীয় ভুল, ছদ্মবেশী এই প্রমদাকে চিনতে না পেরে। ওর মুখোস আমি খুলে দিচ্ছি দেখ। বলতে বলতে সে রেণুকার মাথার টুপি এবং চোখের নীল চশমা খুলে নিল। রমা হক চকিয়ে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরের রূপটাই একেবারে পাল্টে গেল। যেখানে এতক্ষণ একটা থোঁয়াটে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, একটা চাপা তর্জন গর্জন চলেছিল, সেখানে আবহাওয়া এখন পরিষ্কার। রেণুকা এখন আর ছিটার সিনহা নয়, এখন সে পুরোপুরি মিস সিনহা। বিদেশী পোষাক তার দেহ থেকে অপসৃত। তার স্বাভাবিক বেশ-ভূষায় সে সজ্জিতা। সকলেরই চোখে কৌতুক, মুখে তারই ছটা। শুধু মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে রমা পূর্ণিমার পাশটিতে। মিনতি করে বলেছে, আমি বড় দুর্মুখ ভাই বৌদি আমায় ক্ষমা কর তুমি।

সুনন্দা হাসিমুখে বলে, দুর্মুখ তুমি একা নও ভাই, এ অবস্থায় সব মেয়েই হয় দুর্মুখ। অচলায়তন

সামাজিক বিধানের কাছে সবাই তারা দুর্বল। সতী ডিঙোবার সাহস কারও নেই। মনে প্রাণে তারা সদা-রক্ষণশীল।

রমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে, আজ অনেকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে পর পর। বৌদির সঙ্গে যে রূঢ় ব্যবহার করেছি, জানি তার ক্ষমা পাবই। কিন্তু রেণুকা? তার প্রতি যে অসৌজন্যতা প্রকাশ পেয়েছে, সেইটাই সব চাইতে বড় কলঙ্ক হয়ে রইল আমার জীবনে। লোক দেখান ক্ষমা চেয়ে এ অসৌজন্যতার ঋণ কিছুমাত্র কমান যাবে না।

সুনন্দা বলে, ঋণ কমান ঠিক হবে না ভাই। তার কমালেই যায় বেড়ে যাবে, ভুলে যাবে আমাদের। তার চাইতে এ ঋণের ভার তোমার কাঁধে থাকাই ভাল।

—তোমাদের তোলা অত সোজা নয় ভাই বৌদি। চেতন, অচেতন সব মনের সঙ্গেই তোমাদের স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে ওতপ্রোত ভাবে! এ থেকে মনকে ছিনিয়ে নেওয়া কি সোজা কথা ভাই।

রেণুকা দু কানে আঙুল দেবার ভঙ্গিমা ক'রে বলে উঠে, ওরে বাসরে! একেবারে দার্শনিক তত্ত্ব। এবার বৌদি ঠেলা বোঝ।

সুনন্দা তেমনি হাসি মুখে বলে, আমি বুঝব না ভাই, বুঝবে তুমি। তোমাকেই রমা জড়িয়ে ধরবে ওতপ্রোত ভাবে।

ঘরের মধ্যে একটা হাসির স্রোত বয়ে যায়।

রমা বলে, তা ধরব বৌদি। দুটি সংসারকে নিশ্চিত অনিষ্টের হাত থেকেও রক্ষা করেছে। রেণুকা যা করেছে তার তুলনা হয় না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এমনি আনন্দের খনি হয়ে সে যেন সংসারে বিরাজ করে। দুঃখের সন্ধ্যা কোনদিন যেন ওর ওপর ঘনিয়ে না আসে।

সুনন্দা যেন আঁৎকে উঠে। চোখ বড় করে বলে, করেছ কি! অমন কাজ আর কর না। আইবুড়ো মেয়েকে দুটি চক্ষে আমি দেখতে পারি না। তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন, বিকৃতরুচি আর অপদার্থ।

রেণুকা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তোমার দাদার বরাতে বগলা কারকরমার প্রাপ্তিযোগ অনিবার্য।

সুনন্দা সে কথায় কান না দিয়ে বলে চলে, বরং এই প্রার্থনাই কর, ভগবান যেন আনন্দের এই বে-ওয়ারিস খানিটিকে অচিরেই ওয়ারিসের হাতে তুলে দিয়ে সংসারের একটু উপকার করেন। সাংসারিক জীব হয়ে বেসাংসারিক কাজ করাচ সমর্থনযোগ্য নয়।

—আমিও তাই বলি। তবে যে কটা দিন ওয়ারিসন না জোটে সে কটা দিন এই দায়িত্বহীন অপদার্থ জীবটি যেন তার বৌদিদির স্কন্ধে অধিষ্ঠিত হয়ে বেশ একটু মনের সুখে নৃত্য করতে পারে।

রমা সহাস্যে বলে, কিন্তু বেচারী বৌদিদির কাঁধে অতো ভার সইবে কেন ভাই?

—তুমি জান না। বউদিদিটি আমার সরসুন্দর।

সুনন্দা হাসি মুখে বলে, কলিকালে ধর্মের রূপটাই আলাদা ভাই। ঠাকুরঝির নিঃসঙ্গ জীবন। একটা মনের মত সঙ্গী জুটিয়ে দিয়ে একটু উপকার করতে চাই। কিন্তু সেখানেও সন্দেহ। তাই মাঝে মাঝে মুখঝামটা ক'রে নেয় আমার ওপর।

রেণুকা সখেদে বলে, তা আর হয় কই বৌদি। ইচ্ছে যে না হয় তা নয়। কিন্তু তোমায় দেখলেই মায়া করে। তাই পারি না।

—আহা ঠাকুরাণীর আমার ধরার শরীর। কিন্তু আমার শরীরে ধরা মায়া নেই। তাই বলছি,

আমি বাঁধিব বাঁধিব,
রাঙা সুতা তব হাতে বাঁধিব।
যৌবনকুঞ্জে ডাকিয়া অলি,
ফুটাইব প্রণয়ের কুসুমকলি।
দুটি হিয়া দুরাদুর
দুটি মন সুমধুর
এক সাথে এক প্রাণে গাঁথিব।

পূর্ণিমা সহাস্য মুখে বলে, আমি তোমার সঙ্গে এক মত বৌদি। রাঙা সুতোর বেণুর যদি আপত্তি থাকে, সোনার শেকলই না হয় হাতে পায়ে পরিয়ে দেব।

—তা ত দিবিরে। নিজে পরেছিস বলে, আমাকে বাঁধতে চাস শেকল পরিয়ে। কিন্তু টের পেয়েছিস ত মজাটা, কত সুখ এই বেড়ী পরার। কেঁদে ত ভাসিয়ে দিয়েছিলি, আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলি, তবুও সাধ মিটিল না?

সুনন্দা বলে, এ সাধ মেটবার নয় ভাই ঠাকুরঝি। মেয়ে মানুষ সাধ করে বেড়ী পরে, মজাও টের পায়, আবার পরে। তবু এ সাধ তাদের মেটে না কিছুতেই। অনেকে হাঁসুলী করে গলায় পরে। তাতেও তৃপ্তি নেই। এ যুগের নিয়ম। তোমার বেলাও এর ব্যতিক্রম হবে না দেখো, যতই কেন না 'ও রেন্, ও প্রিয়' বলে লাফালাফি কর।

রেণুকা মুখ বেঁকিয়ে বলে, বয়ে গেছে আমার হাঁসুলী গলায় পরতে। এখন চল দেখি ঠাকুরাণীর দল সব, ঠাকুরকে বসিয়ে রেখে এসেছি অনেকক্ষণ। যা পাগলা ঠাকুরটি তোর পূর্ণিমে, হয় ত ভেবে বসে আছেন, সোনার নূপুরটি তার খোয়া গেছে এতক্ষণে। হয় ত আবার নক-আউট ব্লো উঁচিয়ে বসে আছেন আমার নাকটিকে লক্ষ্য করে।

রেণুকার বলবার ভঙ্গিমায় সকলেই হেসে উঠে একসঙ্গে। ঘরের আবহাওয়াটা আবার গম্ গম্ করে উঠে।

রেণুকা রমার দিকে তাকিয়ে বলে, এস ভাই রমা, তুমিও আমাদের সঙ্গে।

রমা সভয়ে পিছিয়ে যায়। বলে, আমায় কেন ভাই। আমায় কেন জড়াতে চাও এর মধ্যে।

রেণুকা বলে, সাধে কি চাই। তুমিই ত তুরুপের তাস আমার। সেই জন্যেই ত তোমায় ধরে আনা।

—মানে? এ কথার অর্থ কি ভাই?

—আমি যে একাধারে দুই, মিষ্টার এবং মিস্ সিন্‌হা, একথা তুমি ছাড়া তোমার দাদাকে বিশ্বাস করাবে কে? চল, এখন যদি তাদের তাদের চার হাত এক ক'রে দিয়ে আসতে পারি, তবেই মঙ্গল। এ গুরু দায়িত্বের হাত থেকে আমিও মুক্তি পাই।

রেণুকা এগিয়ে চলে। তাকে অনুসরণ করে সকলে এসে উপস্থিত হয় নীচের ড্রয়িং রুমে।

অভেন্দু বসেছিল একখানা কোচের উপর। মুখে চোখে একটা সুস্পষ্ট দুশ্চিন্তার ছাপ।

একটা চঞ্চলতাকে সে কিছুতেই গোপন করতে পারছিল না। তাই ঘন ঘন তাকাচ্ছিল হাত ঘড়িটির দিকে। আধ ঘণ্টার পর আরও দশ মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সে চা স্পর্শ করে নি। ধূমায়িত চা এক সময়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে দিকে তার খেয়াল নাই! মনে মনে সে উত্তেজিত। মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভঙ্গিমাটা এমনি যেন এখনই সে কিছু একটা ক'রে ফেলতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দমিয়া হয়ে উঠে আসে সে দরজার কাছে। ডাকে, বেয়ারা! বেয়ারা! এই বয়! কিন্তু বয় আসে না। পাশের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে রেণুকা, সুনন্দা, পূর্ণিমা ও রমা।

রেণুকাই প্রথমে কথা বলে, আপনাকে এ ভাবে একা একা বসিয়ে রাখার জন্যে আমি অত্যন্ত লজ্জিত মিষ্টার ব্যানার্জী! এর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত আপনার কাছে। তবে না চাইলেও তেমন দোষনীয় হবে না। কারণ শাস্ত্রেই আছে, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

সুনন্দা এগিয়ে এসে বলে, আর অশাস্ত্রীয় কাজে আপনাকে প্ররোচিত করা উচিত নয়। সেই জন্যে কষ্ট করবার একটা সুযোগ দিলাম আপনাকে।

রেণুকা মুখ টিপে বলে, যার জন্যে এত কষ্ট আপনার, জ্বালাতিত হয়ে বসে আছেন একান্ত উদগ্রীব হয়ে আর প্রহর গুণে চলেছেন অধৈর্য আবেগে সেই অমূল্য কন্যারীটি এবার আপনার হাতে সঁপে দিয়ে আপনার অন্তরের গুরুভার লাঘব করতে চাই।

শুভেন্দু এতক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল রেণুকার মুখের দিকে। হঠাৎ রমার দিকে দৃষ্টি পড়াতে সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, রমা তুই! তুই এখানে?

রমা কিছুটা কুণ্ঠিত স্বরে পরে। বলে, বৌদির কাছে এসেছিলুম দাদা—।

রেণুকা রমার সাহায্যে অগ্রসর হয়। বলে, তোমার কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই রমা। তোমার বক্তব্য আমিই বুঝিয়ে বলছি মিষ্টার ব্যানার্জীকে। রমা এসেছিল বাপের বাড়ীতে তার বৌদির কাছে বেড়াতে। হয়ত তার দুঃখে কিছুটা সহানুভূতিও জানাতে। খবর পেয়ে আমিই তাকে নিমন্ত্রণ করে আনিয়াছি এখানে আমাকে একটু সাহায্য করতে। সুতরাং কিছু যদি বলবার থাকে, বলতে পারেন আমাকে।

কিন্তু শুভেন্দু কোন কথাই বলতে পারে না। সে যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে। তার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি একবার রেণুকার, একবার পূর্ণিমার আর একবার রমার মুখের উপর ঘুরে বেড়াতে থাকে।

রেণুকা আবার বলে, আমার হার হয়েছে মিষ্টার ব্যানার্জী, পূর্ণিমাকে আমি রাজি করাতে পারলাম না কিছুতেই। বিহারে এক আলো ঝলমল উন্মুক্ত বাংলোয় মিসেস সিন্‌হা হয়ে বিরাজমান থাকা অপেক্ষা, কলকাতার এক অন্ধকার গলিতে, ততোধিক এক অন্ধকার অন্তঃপুরে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে বাস করার ওপর লোভটাই ওর বেশী। জানি, এই অন্ধ সংস্কারের ফল একদিন ওকে ভুগতেই হবে। তবে যতদিন না ভোগে, আমি আন্তরিক ভাবেই আপনাদের শুভ কামনা করি।

শুভেন্দু কেমন যেন তোতলাতে থাকে। বলে, মিষ্টার সিন্‌হা—আ—আপনি—। ঠিক এই মুহূর্তে সুনন্দা রমার কানে কানে কি কথা বলে দেয়। রমা দাদার পাশে এগিয়ে এসে বলে, মিষ্টার সিন্‌হা উনি নন দাদা। উনি এখনও পর্যন্ত মিস্ সিন্‌হা, রেণুকা সিন্‌হা। স্বনামধন্য এন. এন সিন্‌হার ছোট মেয়ে। বৌদির সহপাঠিনী। প্রিয়বান্ধবীকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যেই মিষ্টার সিন্‌হা রূপে রমলকে অবতীর্ণ।

শুভেন্দুর ঠোঁট দুখানি ফাঁক হয়ে যায় এবং সংকীর্ণ মুখ বিবর ক্রমশঃই প্রশস্ত হতে থাকে। মনে হয়, এ যেন স্বপ্ন। সে যেন আশাখোড়া স্বপ্ন দেখে চলেছে।

রেণুকা হাত দুখানি তার বুকের কাছে তুলে ধরে বলে, আপনি মানে আমার বড়। আপনার সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করেছি বলে সত্য সত্যই আমি দুঃখিত মিষ্টার ব্যানার্জী। তবে এইটুকু সান্ত্বনা যে, যা করেছি তা নিজের স্বার্থের জন্যে নয়, করেছি সমাজের কল্যাণের জন্যে। আর তারই জন্যে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের তরে আমার এ বেশ পরিবর্তনে কারও যে কিছু অনিষ্ট হতে পারে সে কথা মনে করি না।

শুভেন্দু ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে বলে, আমিও করি না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেছি আপনার অভিনয় চাতুর্য দেখে। এমন নিখুঁত, এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর 'মেক আপ' আমি দেখিনি এর আগে। আপনার সাবলীল ভঙ্গিমার ভেতর এতটুকু সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি।

রমা হয় ত সুযোগ খুঁজছিল। সুযোগ পেয়ে বলল, তোমার অক্ষমতাকে নিন্দা করা যায় না দাদা। নিজে মেয়ে হয়ে তোমারই মত ভুল করেছি আমিও। ভুলের বশে অনেক কটু কথা শুনিয়েছি বৌদিকে আর একেও। সে লজ্জা সহজে আমার ঘোচবার নয়।

রেণুকা হাসিমুখে বলে, আপনার অক্ষমতাকে দোষ দিই না শুভেন্দু বাবু। ঈর্ষা মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে পঙ্গু করে। প্রেমের ক্ষেত্রে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে ঈর্ষা দৃষ্টি-শক্তি আপনার হরণ করে নিয়েছিল। কিন্তু এ অজুহাত রমার খাটে না। হার যদি হয়ে থাকে, হয়েছে তার।

—এ আমি স্বীকার করছি ভাই রেণুকা।

শুভেন্দু এতক্ষণে নিজেকে অনেকখানি সামলে নেয়। ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। একটি মেয়ের কাছে সে যে আজ সম্পূর্ণ পরাজিত, তার পুরুষত্ব লুণ্ঠিত, এ সে অস্বীকার করতে পারে না। তাই মাথা হেঁট হয়ে আসে আপনা থেকেই। তবুও সে বলে, আপনার জয় মিস্ সিন্‌হা। এ আমি চিরদিন স্বীকার করব।

রেণুকা বলে, আপনারা অন্ধ তাই আমার কৃতিত্বটাকেই বড় করে দেখলেন। কিন্তু এর পেছনে আর একজনের কৃতিত্ব যে কতখানি, একবার রাখলেন না কেউ। স্বামীর প্রতি তার একনিষ্ঠ ভালবাসা, তার দুর্বার আকর্ষণী শক্তি যদি আপনার অন্তরকে দুর্বল করে না ফেলত, কি সাধ্য ছিল আমার এ পতন থেকে আপনাকে টেনে তুলি। তারপর পূর্ণিমাকে লক্ষ্য ক'রে বলে, এরা স্ত্রীকে সম্মান দেখাতে জানে না ভাই। কমণ্ডলুর বারিধারা সিঞ্চন করেই এরা খুশি। কিন্তু উপযুক্ত স্থানে সে বারিধারা বর্ষিত হ'ল কি না এ তারা দেখে না। এদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই ভাল।

শুভেন্দু লজ্জা পায়। লজ্জিত মুখে বলে, পূর্ণিমাকে আমি আগেভাগে জানাচ্ছি মিস্ সিন্‌হা। তার ক্ষমা অপরিশোধ্য। গ্রাম্য বর্বরতার হাত থেকে সে আমাকে রক্ষা করেছে।

—এ শুধু মুখের কথা। এর মধ্যে আন্তরিকতা কিছুমাত্র নেই।

—বিশ্বাস করুন, মুখ এবং অন্তর আজ আমার অকপট। কপটতার লেশমাত্র এর মধ্যে নেই।

রেণুকা তার উজ্জ্বল দৃষ্টি শুভেন্দুর মুখের উপর মেলে ধরে বলে, এ সত্য যদি অন্তর দিয়ে যথার্থই উপলব্ধি করে থাকেন শুভেন্দুবাবু, তা হ'লে এ কথা পূর্ণিমার কাছেও স্বীকার করুন। বলুন আপনি অনুতপ্ত। নিজের স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাঝে লজ্জার কিছু নেই শুভেন্দুবাবু।

• শুভেন্দু এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে। স্ত্রীর দিকে লজ্জিত দৃষ্টি তুলে একবার তাকিয়ে দেখে। তারপর মনের সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তার কাছে সরে এসে বলে, আমার এক সর্বনাশের হাত থেকে তুমি রক্ষা করেছ পূর্ণিমা। পাপের অতলান্ত গহ্বর থেকে টেনে তুলেছ। আমি যথার্থই অনুতপ্ত আজ। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

পূর্ণিমা মাথা নত করে। দু চোখে তার আনন্দাশ্রু দেখা দেয়। সে হেঁট হয়ে স্বামীর পদ স্পর্শ করে মাথায় ঠেকায়।

সুনন্দা তার শেষ কর্তব্য করবার জন্য এতক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। এবার পূর্ণিমাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে, যাতে এখানে আমি সকলের বড়। সুতরাং আশীর্বাদ করবার অধিকার একমাত্র আমারই আছে। তারপর পূর্ণিমার ডান হাতখানি শুভেন্দুর ডান হাতের উপর তুলে দিয়ে বলে, আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি পূর্ণিমা, যে অনুপ্রেরণার জোরে স্বামীর অন্তরের গতি ফিরিয়ে তাকে জয় করেছ, সেই প্রেরণা সংসারের সকল কাজে তোমায় অনুপ্রাণিত করুক, শান্তি তার মঙ্গল বাতি তোমাদের দুজনার মাথার বর্ষণ করুক।

রেণুকা সুর করে মঙ্গলোচ্চারণ করে উঠল, ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ডঃ হরেন্দ্র রায়

গ্রাণ্ড ডচেস্ এদিনর তাঁর যত ছবি বড় বড় শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত করান, কোনটিই তাঁর মনোমত হয় না। কোথায় যেন কি এক খুঁত থেকে যায়।

শেষে ডাক পড়ল তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব্রনজিনোর।

—"পারবেন আপনি আমার এমন মূর্ত্তি আঁকতে, যাতে আমার প্রকৃত মনোভাব ছবির মধ্যে ফুটে ওঠে?"

—"কি মনোভাব আপনার ডচেস্?"—

ব্রনজিনো প্রশ্ন করলেন।

—"তা' আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে এঁদের কোন ছবির মধ্যেই আমি আমাকে খুঁজে পাই না!

ব্রনজিনো হাসলেন। তারপর তিনি লক্ষ্য রাখলেন ডচেসের উপর। হঠাৎ একদিন তিনি পেয়ে গেলেন ডচেসের আসল মূর্ত্তি। সেই ছবি এঁকেই তিনি অমরত্বপ্রাপ্ত হলেন।

ছবিটিতে ডচেসের মুখে মাতৃভাবের বিকাশ, সেখানে আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য কোন ছাপই রাখে নি।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ কৃষ্ণণ স্মরণে

ডাঃ কারিয়ামানিক্কম শ্রীনিবাস কৃষ্ণণ (ডিসেম্বর ৪, ১৮৯৮—জুন ১৪, ১৯৬১) কিছুদিন হল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মাদ্রাজের রামনাদ জেলার এক গ্রামে সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ডাঃ কৃষ্ণণের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কারো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তেমন আকর্ষণের কথা শোনা যায় না। স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবন খুব সাধারণ ভাবেই কেটেছিল। শুধু কোনো কোনো শিক্ষকের মতে ছাত্র কৃষ্ণণ অন্য সব বিষয়ের চাইতে অঙ্কে একটু "ভালো" পরিচয় দিয়েছিলেন—যেমন সব ছাত্রই কোন না কোন বিষয়ে দিয়ে থাকে। স্কুলের পর কলেজের পড়াও যথাসময়ে শেষ করলেন কৃষ্ণণ। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়। তা'হল এই যে পড়াশুনোর ব্যাপারে তাঁর মেধা এবং কৃতিত্বের পরিচয় ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক বছরই শিক্ষকগণ লক্ষ্য করেছেন কৃষ্ণণ গত বছরের চাইতে যেন "নম্বরে পড়ার" মতো এগিয়ে গেছেন। এইভাবে মাদ্রাজের একটা কলেজ থেকে বি. এস. সি. পাশ করলেন কৃষ্ণণ। কিন্তু তারপর আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য, চাকরী নিতে হলো তাঁকে ডিসট্রেক্টারের। কয়েকটা বছর তাঁর এইভাবে নষ্ট হ'লো। তারপর সুযোগ এলো এম. এস. সি. পড়বার। সেই উদ্দেশ্যেই পঁচিশ বছর বয়সে কৃষ্ণণ কলকাতা এসেছিলেন। কিন্তু তা আর হবার নয়। সি. ভি. রমণ তখন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেসন অব সায়েন্স-এ তাঁর নিজস্ব গবেষণায় রত। কিছুদিন ধরেই একজন নির্ভরযোগ্য সহকারীর অভাব বোধ করছিলেন উনি। কৃষ্ণণকে পেয়ে উনি যেন বর্তে গেলেন। আর এদিকে জ্ঞানপিপাসু কৃষ্ণণও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পড়া এবং পরীক্ষার বাইরে সত্যানুসন্ধানী বৈজ্ঞানিকের সহকারীরূপে হাতে কলমে পদার্থবিদ্যার নানাদিক সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পেয়ে যেন আকাশ হাতে পেলেন। নিজেকে উনি সম্পূর্ণরূপে রমণের গবেষণার সহকারী হিসেবে বিলিয়ে দিলেন।

এইখানে একটা বিষয় ভেবে দেখবার আছে। সে হলো কৃষ্ণণের জ্ঞান-পিপাসার তীব্রতা। এম. এস. সি. পরীক্ষা না দিয়ে ভারতবর্ষের মতো একটি দরিদ্র ও পরাধীন দেশের তুলোধিক দরিদ্র একটা প্রতিষ্ঠানের একজন বিজ্ঞানীর অধীনে গবেষণায় সাহায্য করা কম ত্যাগের কথা নয়। এম. এস. সি. পাশ করলে ভবিষ্যতে একটা "ক্যারিয়ার" প্রায় নিশ্চিত। অথচ এদিকে বিজ্ঞানীর গবেষণা যদি কোনো সুফল প্রসব না করে তা' হলে ভবিষ্যৎ জীবন "মাটি" হয়ে যাবে। তা' যাক না। কৃষ্ণণ ভাবলেন ক্যারিয়ার হ'ক আর না হ'ক সৃষ্টির রিয়াট সত্যের হিঁটেফোঁটা কিছুতো জানা যাবে, তার সঙ্গে আর কিসের তুলনা চলে? কিছুরই নয়। ঘটনাচক্রে রমণের ঐ গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হ'লো, যার অনেকখানি কৃতিত্ব কৃষ্ণণের। এই গবেষণার জন্যই রমণ নোবেল পুরস্কার পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ না হলেও পৃথিবীর নানাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞানাগারের সংশ্লিষ্ট মহলও কৃষ্ণণের যোগ্যতার পরিচয় লাভ করলেন। তার পুরস্কার স্বরূপ পরবর্তী আঠারো-উনিশ বছর দেখা যায় কৃষ্ণণ কখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনা করছেন, কখনো বা দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিজ্ঞানাগারে বক্তৃতা দিচ্ছেন বা পুরস্কৃত হচ্ছেন। ভারতের বাইরে কৃষ্ণণের যে প্রতিষ্ঠা তার মূলে দু'জন ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানী। একজন জার্মান বিজ্ঞানী ভন্ লারভেন্ট এবং অন্যজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড।

কৃষ্ণণ ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী—পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত দিকেই ওঁর সমান দখল ছিল। মৃত্যুর সময়ে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ কৃষ্ণণ দিল্লীর ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর তো ছিলেনই, তা'ছাড়া ভারতের এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের অন্যতম সদস্যও ছিলেন। মাত্র ৬১ বছর বয়সে কৃষ্ণণ ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছিলেন ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। তা'ছাড়া বিশ্ববিজ্ঞান সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্বও করেছেন বহুবার।

আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে এ আলোচনা শেষ করবো। সে হ'লো মাতৃভাষার প্রতি কৃষ্ণণের ঐকান্তিক অনুরাগ। কৃষ্ণণের মাতৃভাষা ছিল তামিল। বিশেষভাবে পদার্থবিদ্যা এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে তামিল ভাষায় সহজবোধ্যভাবে প্রবন্ধ রচনার জন্য ডাঃ কৃষ্ণণ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এ কাজটা উনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই করতেন—যেটা সবচাইতে বড় কথা।

সুনীলকুমার নাগ

রাশিয়ার স্পুটনিকে লাইকা নামে যে কুকুরটিকে পাঠানো হয়েছিল তার নামে সারা জগৎ এখনও সমবেদনায় অস্থির হয়ে ওঠে।

রাশিয়ার বড় বড় সহরে অন্তত দু'শ বড় রাস্তার নাম লাইকার নামের সঙ্গে কিছু যোগ করে রাখা হয়েছে আর সমগ্র রাশিয়ার অন্ততঃ একলক্ষ মেয়ের নাম লাইকার নামের উচ্চারণের কাছাকাছি গেছে।

লাইকাকে রাশিয়া কোনদিনই ভুলতে পারবে না। বিজ্ঞানের জন্য মৃত্যু বরণ করে লাইকা আজ অমর।

॥ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, যেমন সাহিত্যের, তেমনি সমালোচনারও নতুন রূপ ফুটে উঠেছিল। তার অনেক রূপের মধ্যে দুটি ধারা ছিল প্রধান—ঐতিহাসিক ধার্মিক এবং কলাকৈবল্যবাদী। শেষেরটির আবার দুটি উপধারা—একদল ফ্রপদী অলংকারশাস্ত্রের তথা রসবাদের, অন্যদল বিদেশের নবতর সমালোচনা, বিশেষভাবে টি. এস. এলিঅটের ভাবনার অনুগামী। শক্তিশালী লেখকের মানস পরিমণ্ডলে এই উপধারা দুটি স্বাভাবিক-ভাবেই সম্মিলিত হয়েছে, কখনও কখনও ঐতিহাসিক-ধার্মিক ধারাও এদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মিশ্র ত্রিস্রোতা সাহিত্যচিন্তার ধারা গভীরভাবে অবগাহন করেছেন, সম্প্রতি পরলোকগত বিমল চন্দ্র সিংহ তাঁদের অন্যতম, বিশিষ্টতমও। অনেকদিন আগে লেখা 'সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থে তাঁর-চিন্তার বিশ্লেষণের প্রকাশের স্বকীয়তা বিদগ্ধমনের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সংকলন বর্তমান গ্রন্থ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'ও অনুরূপ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। প্রথম গ্রন্থটিতে লেখকের ভাবনাগুলি প্রায়শঃই পুনরুক্ত; আলোচ্য সংকলনে তার স্থিতধী, সংযত, পরিণত প্রাজ্ঞ মনের স্বচ্ছ দর্পণ।

'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'র বক্তব্য বিষয়—সমাজ, সাহিত্য, কবি অর্থাৎ সংস্কৃতির কয়েকটি দিকের পর্যবেক্ষণ। সর্বত্রই তাঁর পরিভ্রমণ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তাঁর মৌল দৃষ্টিকোণটি বাঙালীর ইতিহাস তথা সংস্কৃতির বিবর্তনকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হয়েছে এবং প্রতিপদে তিনি তথ্য ও যুক্তির অনুগমন করেছেন। এই পর্যায়ে উল্লেখ্য নিবন্ধ 'সংস্কৃতির রূপান্তর,' 'ক্রান্তি' এবং শিল্পবিষয়ক রচনাটি। সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা 'সাহিত্যের মেজাজ'—নাটক ও গদ্যরচনার পরিবেশ সম্পর্কে নতুন কথা। 'কবিকৃতি ও সমালোচনা' —কাব্য ও সমালোচনা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির যোগ-বিয়োগ সম্বন্ধে নতুনতর বক্তব্য। 'কাব্যের ব্যাকরণ' নিবন্ধে লেখক কাব্যের দোষ নির্ণয় ক'রে ব্যাকরণ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাব তুলেছেন, পুরনো নয়, নতুন সাহিত্যের প্রয়োজনে নতুন ব্যাকরণের কথাই বলেছেন। 'প্রবন্ধবিষয়ক প্রবন্ধ' কেবলমাত্র রচনা নয়, জীবন ও জীবনজিজ্ঞাসার গভীরে তিনি ডুব দিয়েছেন। ঠিক একইভাবে শিল্পীর মনের অন্দরে পৌঁছতে চেয়েছেন 'অবনীন্দ্রনাথের ছবি'তে। বাইরের আঙ্গিককে তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু আলোকসম্পাতী দৃষ্টিকে রেখেছেন রসের ভূমিতে। শেষ নিবন্ধ 'কবিগুরু' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু-একটি অনুচ্চারিত কথার স্ফুলিঙ্গ।

সমস্ত রচনাই লেখকের পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত চিন্তার স্বাক্ষর। নিরস পাণ্ডিত্য নয়, রসাত্মক মননের গভীরতা এগুলির সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে আছে। তাই প্রাজ্ঞতার ভার এখানে অনুপস্থিত। বক্তব্য সহানুভূতিতে বিনম্র। সহজতাই এদের সবচেয়ে বড়ো গুণ। অথচ লেখক আলোচ্য বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, পূর্ববর্তী গ্রন্থের মতো এখানেও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার অবাধে বিচরণ করেছেন। সাহিত্যদর্পণ ও কণ্ডওয়েলকে সমপ্রাণতায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা সর্বদা সর্বত্র একমত নই; তবু তাঁর বক্তব্যের যুক্তিগ্রাহ্যতা এবং চিন্তা—উদ্বোধনী বিশ্লেষণ কান পেতে শোনার মত।

মতভেদের বিস্তৃত পর্যালোচনায় যাব না। শুধু কয়েকটি সাধারণ কথা আপাততঃ বক্তব্য। গ্রন্থে ইংরেজী ও সংস্কৃত উক্তির সংখ্যা নগণ্য নয়; সেগুলির অধিকাংশতঃই লেখকের নাম আছে, বইয়ের নয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা এতে কিছুটা অসুবিধা বোধ করবেন। যে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা গ্রন্থটির মৌল লক্ষণ, তা সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। যুক্তিও সর্বত্র যুক্তিসঙ্গত নয়। লেখক আধুনিক কালের অবক্ষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে

পরিপূর্ণভাবে সচেতন অথচ অবক্ষয় যুগের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতি প্রায়শঃই অনুপস্থিত। কালকে স্বীকার করেও কলাকে তিনি স্বীকৃতি দিতে নারাজ। কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণাই এই বিপরীত ভাবনার মূলে,'সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থেও এগুলি ছিল।

কিন্তু প্রবন্ধগুলির গুণের তুলনায় এসব ত্রুটি সংখ্যালঘু ও অনুল্লেখ্য। বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' একটি বিশিষ্টতম সংযোজন। বইটি প্রকাশ করে 'মিত্রালয়' সুধী পাঠকমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। মুদ্রণ ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রুচি ও উচ্চ মানের পরিচয়।

বইটি পড়তে পড়তে একটি কথা বারেবারেই মনে ঘোরাফেরা করেছে। সেকথা এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিমলচন্দ্র সিংহের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যজগতের অনুযোগ নীরবতা বেদনাদায়ক। মননের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একক, কোন বিশিষ্ট ধারার অনুবর্তী নন। নীরবতার কারণ কি এইখানেই? কিন্তু নিঃসঙ্গ লেখককেও তো বাঙালী সাহিত্যিক যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে কুণ্ঠিত হননি। তাই বেদনা বোধ করেছি মনে মনে। কিন্তু বিস্মিত হইনি। এই অনুযোগতার কারণ অন্যত্র নিহিত। যতদূর মনে পড়ে কথাটা বলে ছিলেন যোগেশ মানবেন্দ্রনাথ রায়, জহরলাল নেহেরুর মধ্যে রাজনীতিকের গুণ অপেক্ষা কবির লক্ষণই অনেক বেশি। বিমল চন্দ্র সিংহ সম্পর্কেও উক্তিটি সমভাবে প্রযোজ্য। বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর স্বগত চিন্তা-চেতনার কয়েকটি মাত্র স্তম্ভছাড়া মূল ভিত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে নি। দক্ষিণ পন্থী হয়েও বামপন্থী কতও এলকে তিনি সমাদরে গ্রহণ করেছেন। তবু মন্ত্রী-বিমলচন্দ্র এবং প্রাবন্ধিক বিমলচন্দ্র পরস্পর বিরোধী সত্তা এবং তাঁর বহিরঙ্গ মন্ত্রী-রূপ তাঁর অন্তরঙ্গ প্রাবন্ধিক স্বরূপের পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাতে আর কারও লাভ-ক্ষতি হয়েছে কিনা জানিনা, বাঙালী পাঠক ও সাহিত্যিক সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবু তাঁর যে-কটি রচনা আমরা পেয়েছি, অনেক অল-নিবন্ধের ভিড়ে সেগুলি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং আমরাও নতুনতর চিন্তার পথে এগিয়ে যেতে পারব।

লেখকের পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুক।*

শুভদাস ভট্টাচার্য

---

* সাহিত্য ও সংস্কৃতি—বিমলচন্দ্র সিংহ।
১৪৮ পৃষ্ঠা—দাম চার টাকা।

॥ একটু হাসুন ॥

সাহিত্যিকদের নিয়েই সুরু করা যাক।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে হলেন জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক। অ্যাডভেঞ্চারে তাঁর দারুণ নেশা। তামাম পাহাড় পর্বত সমুদ্র দাবড়ে বেড়িয়েছেন।

সেবার তিনি গেছেন আফ্রিকার গহন অরণ্যে বুনো জন্তুর পেছনে ছোটাছুটি করতে। কিছুকাল হয়ে গেল কোনো খবর নেই। ওদিকে পাঠকবর্গ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

খবর এল তাঁর এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছে কোন অজানা অরণ্যে, অল্পের জন্যে প্রাণ রক্ষা হয়েছে।

তাঁর এক বন্ধু চিঠি পাঠালেন, খামের ওপর এইভাবে ঠিকানা লিখলেন :

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে,

ঈশ্বর জানেন তিনি কোথায়।

আশ্চর্য ব্যাপার—কয়েক সপ্তাহ পরে এ চিঠির জবাব এল, আর তার আরম্ভটা ছিল এই রকম :

'তুমি ঠিক কথাই লিখেছ।

ঈশ্বর জানতেন।'

• • • •

ইংরেজী ভাষার এই সুপরিচিত বাগ্বিধি 'গড্ নোজ'-এর প্রয়োগ বেশীদূর গড়ালে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখুন।

পরীক্ষায় একটি প্রশ্নের উত্তরে একটি ছাত্র গোটা গোটা করে লিখে এল :

একমাত্র ঈশ্বর জানেন। আমি জানি না।

পরীক্ষক খস্ খস্ করে লিখলেন এর নীচে :

ঈশ্বর পেলেন একশো, আর তুমি পেলে শূন্য।

ঈশ্বর বেশী জানলে কী ঠ্যালা বুঝুন—স্রেফ গোল্লাচুর।

• • • •

আবার সাহিত্যিকদের গল্পে ফিরে আসি।

পথ চলতে চলতে নিশ্চয় আপনারও চোখে পড়েছে কোথাও না কোথাও, আর আপনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, কৌতূহলী চোখ উঁকিঝুঁকি মেরেছে বাড়ীর দরজার ওপর সাঁটা চকচকে পাথরের কালো অক্ষরের ওপর : এইখানে বাস করিতেন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রী অমুক চন্দ্র অমুক। তাঁহার অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দেশবাসিগণ কর্তৃক এই স্মারক প্রস্তর ইত্যাদি ইত্যাদি।

অমনি আপনার মনটায় তোলপাড় পড়ে গেছে।

সেদিন ঠিক তাই হয়েছিল। দুই সাহিত্যিক বন্ধু হাঁটছিলেন ফুটপাথ ধরে। হঠাৎ একজনের চোখ পড়ে গেল অমনি এক স্মৃতিফলকে, গুণগ্রাহীদের বিলাপে তার কালো অক্ষরগুলি যেন শোকাচ্ছন্ন।

তখন তিনি বলে উঠলেন : আমি চলে গেলে কত কী যে লেখা হবে তাই ভাবছি।

—ভাববার কিছু নেই, তৎক্ষণাৎ অপরজন উত্তর করলেন, বেক লেখা হবে—এই বাড়ী ভাড়া দেয়া হইবে।

• • • •

এবার সাগর পারের এক হবু সাহিত্যিকের গল্প।

লেখক মশায় মাসিক পত্রের দপ্তরে ঘন ঘন আসছেন আর যাচ্ছেন, আজ যে লেখা দিয়ে যাচ্ছেন দুদিন বাদে তা ফেরত নিচ্ছেন।

শেষকালে আর থাকতে না পেরে সম্পাদকের কাছে এক সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করলেন লেখকটি। শেষে লিখলেন: অতএব অনুগ্রহপূর্বক আপনি কি বলিয়া দিবেন রচনা প্রকাশের সর্বাপেক্ষা উত্তম চ্যানেল কি?

সম্পাদক মশায় দপ্তর ঝেড়ে মুছে লেখকটির সব লেখা মুড়ে বেশ একটি পরিপুষ্ট বাণ্ডিল তৈরী করলেন এবং তার ওপর এই কথাটি লিখে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন: এই ধরণের লেখার জন্য আমি সুবিবেচনার সহিত একটি মাত্র চ্যানেল নির্দেশ করিতে পারি—ইংলিশ চ্যানেল।

রজসন্ধানী

এক ইংরেজ পিতা তার তোতলা ছেলেটির জন্যে এক তোতলামো সারানো স্কুলে গেছেন। সেখানকার অধ্যক্ষ ছেলেটিকে ছয়মাস রাখবার কথা বললেন।

পিতা রাজী হলেন। দু'মাস পরে যেতেই অধ্যক্ষ বললেন, "আমি ছেলেটিকে নিজের কাছেই রে-রেখেছি। আর সে উ-উন্নতিও কি-কি-কিছু ক-ক-ক-রেছে বৈ কি।

চার মাস পরে অধ্যক্ষ বললেন—আ-আ-আপনার ছে-ছে-ছেলেটি খু-খু-খু-খুব ভা-ভা-ভা-ল ছে-ছে-ছে-ছে-লে।

ছয় মাস পরে অধ্যক্ষ বললেন—আ-আ-আ আ-আ-আ-প-প-প-না-না-না-নার ছে-ছে ছে-ছে-ছে-ছে-ছে—

ভদ্রলোক ত অবাক্।

॥ একজন আর কয়েকজন ॥

কবিতায় দুর্বোধ্যতার তবু কিছু অর্থ হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু গল্প গল্পই। আর সেই গল্প সবচেয়ে ভালো গল্প যা রামায়ণ মহাভারতের মতন সর্বজনগ্রাহ্য, সর্বকালীন। বিগতকাল এবং আধুনিক কালের পূর্ব এবং উত্তরসূরীর সমন্বয়বাদী কথাসাহিত্যের আচার্য উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ কথা বার বার বলতেন। শুধু মুখে বলা নয়, জীবনে এ নিয়ে স্বয়ং পরীক্ষা-নিরীক্ষারও সম্মুখীন হয়েছেন।

তাহলে গল্প কি শুধুই 'আমার কথাটি ফুরালো নটে গাছটি মুড়ালো ?'—গল্পে কি কোনো কেন থাকবে না? আধুনিক কালের কথাকার এবং আধুনিক গল্পপাঠক অনুরাগীদের এ প্রশ্নের উত্তরে উপেন্দ্রনাথ বলেন, 'একটা কেন কেন, সহস্র কেন থাকুক, তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তবে গল্প থাকা চাই, আর সেই গল্পই হচ্ছে মুখ্য, কেনরা গৌণ।

আধুনিক গল্পসাহিত্যের পাঠক হিসেবে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখাতেন তাঁর প্রিয় গল্পলেখকদের গল্প নিয়ে। এ যুগের বনফুল, নারায়ণ গাঙ্গুলি, সুবোধ ঘোষ, নরেন মিত্তির—এঁদের মধ্যে জটিলতার তুলনায় কাহিনীর উৎকর্ষতা কতোখানি হৃদয়গ্রাহ্য—তা নিয়ে অনেক আলোচনা তাঁর বৈঠকে হতো। উপেন্দ্রনাথের মতে জটিলতা শুধু মানসিক তরঙ্গের উদ্বেল, সমুদ্রের গভীর তল তা নয়।

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল'—এটি একটি ঘটনা। কাল্পনিক কিংবা সত্য, তা নিয়ে পূর্বাহ্নে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। গল্পের সত্য, বাস্তব সত্য অপেক্ষা কোনো মতেই কম নয়। হাড় আটকানোর যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট বাঘের মনোবিশ্লেষণ গল্পের উৎকৃষ্ট বিন্যাস; কিন্তু তার উৎকর্ষ হচ্ছে তার পরিণতিতে। সেখানে গল্পই প্রধান।

আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদে এই 'গল্প লেখার গল্প' নিয়ে কয়েকটি মনোরম গল্পবৈঠক বসিয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ। গল্প-তারতীতেও এই পর্যায়ে কয়েকটি রচনায় তাঁর সহজ ও নিপুণ গল্প বিশ্লেষণের অনবদ্য রীতিকে লক্ষ্য করে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম। কবি উপেন্দ্রনাথের পর গায়ক উপেন্দ্রনাথ।

ভাগলপুরে বৃহৎ বনিয়াদি গাঙ্গুলি পরিবার। তখনকার দিনের বিত্তবান মধ্যবিত্ত। শিক্ষায়, কৃষ্টিতে, চারিত্রিক শুচিতায় একান্নবর্তী বৃহৎ গাঙ্গুলি পরিবারটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ছিল। স্বনামধন্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গাঙ্গুলি দৌহিত্র। ভাগলপুরে মাতামহ গৃহে বসবাস করেন। সুরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল। শরৎচন্দ্র বয়সে বড়—রচনায় বড়, আরো অনেক কারণে বড়। সুরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ভাই বন্ধু। তিনজনের কৈশোর-জীবনে অন্তরঙ্গতা। লেখা-পড়ায় খেলা-ধুলায়, মজলিস-আলাপনে, সাহিত্য-সাধনায়, সঙ্গীতে, অভিনয়ে তিনটি কিশোরহৃদয় একাত্ম।

কবি শরৎচন্দ্র কিশোর কল্পনায় ঘুলের বনে যে অগ্নিশিখা দেখেছিলেন—সেই অগ্নিদহনকে শিল্পরূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। জীবনে বহু ঘাতপ্রতিঘাত, বহু এ্যাডভেঞ্চার, বহু চরিত্র, সমাজের বহুদিক, আর সর্বস্তার আগুন নিয়ে সাহিত্যে বিপ্লববাদের প্রতিষ্ঠা করলেন। সুদূর রেঙ্গুনে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অজ্ঞাত সাধনা জীবনবোধের নতুন দিক নির্ণয় করল। সুরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ঘরোয়া রইলেন। ভাগলপুরের একান্নবর্তী সংসারের জীবন দর্পণে দেখা সামাজিক চরিত্র, শিক্ষাদীক্ষাগত বৃত্তি আর জীবনচর্যা উপেন্দ্রনাথের সৃষ্টি-কর্ম। গুরু শরৎচন্দ্র এবং মাতুল উপেন্দ্রনাথ সাহিত্য জীবন-দর্শনে ভিন্নমুখী হলেন বটে; কিন্তু অন্তরযোগ দুজনের বিচ্ছিন্ন হলো না। তাই শরৎচন্দ্রকে দেখবার জন্যে, শরৎচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে উপেন্দ্রনাথের তাগিদ এবং প্রচেষ্টার অন্ত নেই। উপেন্দ্রনাথের গল্প পড়ে তাকে

প্রশস্তিবাদে বিভূষিত করে উৎসাহ দানেও শরৎচন্দ্র বিরত নন। ভবানীপুরে উপেন্দ্রনাথ আর রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র। দুজনের মধ্যে ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনেক দূর : কিন্তু অন্তরের সান্নিধ্য অত্যন্ত নিকটতর।

রেঙ্গুন থেকে শরৎচন্দ্র পত্র লেখেন উপেন্দ্রনাথকে, "তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতেও পারিতাম না। আমি মানুষের হৃদয় বুঝি। তুমি যেমন তোমার অন্তর্যামীর কাছে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে বলিতে পার "আমি শরৎকে সত্যই ভালবাসি।" আমিও ঠিক তেমনি জানি এবং তেমনি বিশ্বাস করি।"

উপেন্দ্রনাথের গল্প সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আগ্রহের অন্ত নেই। তাঁর বিশ্বাস বাঙলা সাহিত্যে উপেন্দ্রনাথের গল্প এক অবিস্মরণীয় অবদান। তাই বার বার সে সম্পর্কে মাতুলকে সজাগ করতে তাঁর উৎসাহ কম নয়।

উপেন্দ্রনাথের তো কথাই নেই। ফণী পালের 'যমুনা', সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য'—শরৎচন্দ্রকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করুক—এর জন্যে এই দুটি কাগজে তিনি বলদ যোগানোর ভার নেন। শরৎচন্দ্রকে তাগিদে তাগিদে অস্থির করে তোলেন। চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি বগলে করে সাহিত্যিক এবং সম্পাদক মহলে ঘুরে বেড়ান। শরৎচন্দ্রের প্রতিশ্রুতিকে উপেন্দ্রনাথ লেখেছিলেন, চিনেছিলেন। তখনকার দিনে আধুনিক কালের মানসকূট শরৎচন্দ্রের মধ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। জীবনজিজ্ঞাসার মুখর ভাবীসমাজের সম্ভাবনার অঙ্কুরকে তাই সযত্নে জলসেচনের ভার উপেন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন শুধু ব্যক্তিগত প্রীতি এবং ভালোবাসার সম্পর্কের জন্যে নয়—উপেন্দ্রনাথের সজাগ পাঠকমন তখন থেকেই প্রস্তুত। একটা বিরাট সমাজক্রান্তি নতুন সমাজ-জীবনের পথে অগ্রসর। সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, পথে কাঁটা অনেক। উপেন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তায় যদিও সে পথ অনেক দূরে ; কিন্তু সংস্কারক উপেন্দ্রনাথ সে পথ গড়ার কাজে শরৎচন্দ্রের দোসর। চরিত্রহীনের মেসের ঝিকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি অগ্রণী। সুরেশ সমাজপতির মতন সংরক্ষণশীল সমাজের ব্যক্তিপ্রধানের কাছেও তাই চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি বগলে করে উপেন্দ্রনাথ চলেছেন শ্যামপুকুর স্ট্রীটে। আর যেদিন সমাজপতি মহাশয় চরিত্রহীনের লেখককে সাদরে স্বীকার করে নিলেন সেদিন লেখক শরৎচন্দ্র অপেক্ষা পাঠক উপেন্দ্রনাথের আনন্দই বেশি।

সমুদ্র সত্য, নদী সত্য, কিন্তু দীঘিও কি সত্য নয়?

সমুদ্রের শত সহস্র তরঙ্গের বিক্ষোভ, ঢেউ আর ঢেউ, তার গভীর তলদেশের অতলতা—বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গতায় বিস্ময়, জিজ্ঞাসা এবং গভীরতা। বহতা নদীর পাশে পাশে শ্যামল উর্বরতা—সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুটিরই বিরাটত্ব-ব্যাপকতা।

আর দীঘি? সেখানেও হাওয়ার ধাক্কায় ছোট ছোট আবর্তন, নিচের পাঁক থেকে পদ্মের প্রস্ফুটিত শতদল। সেই শতদলের রূপ আর গন্ধ—তাতেও তো আমরা বিমোহিত হই। ক্লান্ত শ্রান্ত চিত্তে দুদণ্ড বসে বিশ্রাম লাভ করি। উপেন্দ্রনাথ বলেন, তার দামই বা কম কি?

সাহিত্যের সমুদ্রব্যাপ্তিতে দীঘির ছায়াতল আজ অপসারিত—সংস্কারবিরোধী উপেন্দ্রনাথ তা মানেন না। দীঘি, নদী আর সমুদ্র—এদের প্রত্যেকের স্বকীয়তায় তিনি বিশ্বাসী। তাই উনিশ শতকের শিল্পকর্মকে বিংশ শতাব্দীর সমুদ্রগামী অর্ণবপোতের সহযাত্রার সঙ্গে গ্রথিত করে একটা সমন্বয় সাধনের তীর্থপথিক তিনি। সাধনের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকান।

অমিলকুমার ভট্টাচার্য

ক্রিকেট

বিলাতে এখন ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে ক্রিকেট খেলা নিয়ে বেশ জোর লড়াই চলেছে। ইতিমধ্যে দুটি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে। প্রথম টেষ্ট ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানদের কৃতিত্বের জন্যে খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। দ্বিতীয় টেষ্টে লর্ডস মাঠে অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডকে ৫ উইকেটে পরাজিত করেছে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে অধিনায়ক রিচি বেনড আহত থাকার জন্যে লর্ডস টেষ্টে খেলতে পারেননি এবং তার বদলে নীল হার্ভে দলের নেতৃত্ব করেন। ইংল্যাণ্ড দলে পীটার মে দ্বিতীয় টেষ্টে খেলেছিলেন। খেলার পূর্বে আশা করা গিয়েছিল লর্ডস মাঠ স্পিন বোলারদের সহায়ক হবে, কিন্তু এটা যে কতটা ভুল ধারণা তা ফাষ্টবোলারদের সাফল্যেই বোঝা গেল। অষ্ট্রেলিয়ার নতুন ফাষ্টবোলার মেকেঞ্জি এই টেষ্টে সুন্দর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইংল্যাণ্ড দলের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্যে লর্ডস টেষ্টে অনেকদিন পরে টনি লককে খেলানো হোল, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সকল ধারণাই ভুল প্রমাণ হয়ে গেল।

প্রথম দুটি টেষ্টে কলিন কাউড্রে ইংল্যাণ্ডের নেতৃত্ব করেন। এবার বাকী তিনটি টেষ্টে পীটার মের উপর নেতৃত্বের ভার পড়েছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। তবে এখন ক্রিকেট খেলার ধারা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে খেলার পর থেকে। আমার মনে হয় হাটন পদ্ধতিতে খেললে ইংল্যাণ্ড দলের সাফল্য লাভ করা যথেষ্ট শক্ত। এখন *Bright Cricket* এর যে ঝড় উঠেছে তাকে কি ইংল্যাণ্ড অস্বীকার করতে পারবে?

টেনিস

লণ্ডনের উইম্বলডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় এবারও ভারতের ২৯ বছর বয়স্ক খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। স্মরণ থাকতে পারে গতবার কৃষ্ণান এই প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, কারণ তাঁর পূর্বে কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় এই কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হননি।

বিলাতে আরসেনাল ক্লাবের সঙ্গে নরফোকসায়ারের ফুটবল ম্যাচ আরম্ভ হয়েছে। লোকে লোকারণ্য। দু'দলের সমর্থকেরা খুব উৎসাহ দিচ্ছে, ঝগড়াও হচ্ছে ওদের নিয়ে।

একটি লোককে দেখা গেল, দু'দলেরই ঘোরতর সমর্থক। আরসেনাল গোল দেবার উপক্রম করলে সে টুপি ছুঁড়ে চেঁচিয়ে অস্থির, আবার নরফোকসায়ার গোল দিতে এগিয়ে গেলে সে আহ্লাদে ডিগবাজি খেতে আরম্ভ করে।

আশপাশের দর্শকেরা তার ব্যবহার দেখে আশ্চর্য। জিজ্ঞাসা করতে সে উত্তর দিলে,—ঐ যে আরসেনালের গোলকিপার জ্যাকি জোন্‌স্, ও হোল আমার ছোট ছেলে, আর নরফোকসায়ারের ব্যাক্,—ও হোল আমার বড় ছেলে।

॥ দেশ বিদেশের ব্যঙ্গচিত্র ॥

রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র প্রাথমিক পর্যায়ে ফরাসী দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। ফরাসী জাতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর সমাপ্তি কালে এ ধরণের চিত্রের প্রথম প্রকাশ। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার যে অনুশীলন সে দেশে হইয়াছে সংখ্যায় ও প্রচারে যথেষ্ট না হইলেও তাহা তৎকালীন চিত্রকর ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতি বিষয়ে চিত্রের মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদানের সূত্রপাত করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ দেশে এ ধরণের ব্যঙ্গচিত্রের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সম্ভবতঃ ফরাসী শিক্ষিত জনসাধারণ এ শ্রেণীর চিত্রের প্রয়োজন ও প্রভাব সম্বন্ধে ক্রমশঃ সচেতন হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই সে দেশে তখন ইহার উন্নতির দ্রুতবৃদ্ধি ঘটে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন কার্ডিনাল রিশলু। ব্যঙ্গচিত্র তিনি নিতান্ত অপছন্দ করিতেন। সেজন্য তাঁহার আমলে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র আঁকা কিছু হ্রাস পায়। এই যুগে ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পীদের চিত্রাঙ্কনে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইত। কারণ তাহাদের নিরাপত্তার প্রশ্নও এই সঙ্গে জড়িত ছিল। ব্যঙ্গচিত্র—রাজনৈতিক বা সামাজিক অথবা ধর্ম-সম্বন্ধীয় যাহাই হউক না কেন, কোন প্রভাবশালী দল বা ব্যক্তিবিশেষ ঐ চিত্রের দ্বারা নিন্দিত বা লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইলে শিল্পীর খ্যাতি এবং বিড়ম্বনা উভয়ই লাভ হইত। কোন কোন স্থলে তাহার জীবনও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত। এই কারণে শিল্পীরা অতি সাবধানে, সতর্কতার সঙ্গে ব্যঙ্গচিত্র আঁকিতেন—যাহাতে তাহার আঁকা চিত্রের একাধিক যথার্থ হয় সে দিকে প্রখর দৃষ্টি দিতেন। কোন ঘটনা বা ব্যক্তিকে সহজভাবে ব্যঙ্গচিত্রের বিষয় না করিয়া আকারে ইঙ্গিতে, অর্থবোধক বিষয়বস্তুর সাহায্যে আঁকা হইত। কার্ডিনাল রিশলুর সময় এ ধরণের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়। তাঁহার পরবর্তী ফরাসী প্রধানমন্ত্রী কার্ডিনাল ম্যাজারিন বিশেষ ব্যঙ্গচিত্র-অসহিষ্ণু ছিলেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পীরা সাবধানেই এ সকল চিত্র আঁকিয়া ছাপাইতেন।

কিছুকাল পরে ফ্রান্সে ব্যঙ্গচিত্র নিষিদ্ধ হইয়া যায়। ইহার সুযোগ গ্রহণ করে আশেপাশের অন্যান্য দেশ, বিশেষতঃ হল্যাণ্ড। সেখানে ব্যঙ্গচিত্রের অঙ্কন ও মুদ্রণ দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। ফ্রান্সের কার্ডিনাল ম্যাজারিনের মৃত্যুর পরে সম্রাট চতুর্দশ লুই ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ইউরোপের সর্বকালীন ক্ষমতাশালী সম্রাটদের অন্যতম ছিলেন চতুর্দশ লুই। এ সকল ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ছবি অথবা পত্রিকার মাধ্যমে তাঁহার শাসনের সমালোচনা তিনি পছন্দ করিতেন না। এজন্য মুদ্রাযন্ত্রের উপর তিনি নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া দেন। মুদ্রাযন্ত্রের উপর রাজাজ্ঞা ব্যঙ্গচিত্রের উপরও প্রভাব বিস্তার করে এবং ফ্রান্সে সম্রাট লুইর রাজ্যে ব্যঙ্গচিত্রের অঙ্কন এবং মুদ্রণ বন্ধ হইয়া গেল।

ফ্রান্সে ইহা এইরূপে সাময়িকভাবে বাধা পাওয়ার ফলে হল্যাণ্ডে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিতে থাকে। ইহার মূলেও ছিল রাজনৈতিক কারণ। বেলজিয়াম ও জার্মানীর কতক অংশে এবং হল্যাণ্ডে আপন রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য চতুর্দশ লুই বিশেষ উৎসুক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যমে সর্বদা বাধা দিয়াছে হল্যাণ্ড, জার্মানী এবং পরে ইংলণ্ড। হল্যাণ্ডের রাজবংশ (যাহাদের মধ্য হইতে তৃতীয় উইলিয়ম

১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা হন) এবং জনসাধারণ সম্রাট চতুর্দশ লুইর বিষম শত্রু ছিল। এই কারণে তখন চতুর্দশ লুইকে অবলম্বন করিয়া হল্যাণ্ডে অনেক রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র আঁকা ও মুদ্রিত হইতে থাকে। ইয়োরোপের সকল ছোটবড় রাজা বা ক্ষমতাশালী রাজপুরুষদিগকে সম্রাট লুইর সম্মুখে পুতুলের মত হাস্যকর রূপে কুৎসিতভাবে আঁকা হইত। আর ইংলণ্ডের রাজাকে দেখান হইত সাক্ষীগোপালরূপে। তাঁহার মুখ হইতে লুইর কদর্যতার মাঝিক নানারকম কথার লেবেল বাহির হইত। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেমস লুইর একান্ত বশম্বদ ও সমর্থনকারী ছিলেন। সেজন্য তাঁহাদের এইভাবে চিত্রিত করা হইত।

সম্রাট লুইর আদেশে তাঁহার রাজ্যে ব্যঙ্গচিত্র নিষিদ্ধ হইয়া গেলেও হল্যাণ্ডের এই সকল চিত্র ফ্রান্সে অনেক আমদানী হইত এবং জনসাধারণ উহা বিশেষ উপভোগ করিত। শুধু হল্যাণ্ডে বা ফ্রান্সে নহে, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও এই সকল ব্যঙ্গচিত্রের সমাদর ছিল। চিত্র হিসাবে এ সকল ব্যঙ্গচিত্র অবশ্য উচ্চশ্রেণীর সুন্দর আর্টের পর্য্যায়ে পড়ে না। তথাপি ব্যঙ্গচিত্রের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাসে উহাদের বিশেষ মূল্য আছে।

ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন ও মুদ্রণ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। বর্তমানে সকল ছবিই ব্লক করিয়া পরে ছাপান হয়। এই ব্লক করার ব্যাপারকে ইংরাজীতে ফটো প্রসেস এনগ্রেভিং (Photo process engraving) বলা হয়। ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী কালি কলম বা রং তুলির সাহায্যে অতি অল্প সময়ে যে ছবি আঁকিয়া দিলেন তাহাও খুব অল্প সময়েই ব্লক প্রস্তুতের পর ছাপান যায়—ছবি আঁকা, ব্লক করা এবং ছাপান ব্যাপারে তিন চারি ঘণ্টা বা ইহারও কম সময়ে পুরোপুরি সকল কাজ সম্পন্ন করা যায়। এই ফটো প্রসেস এনগ্রেভিং আবিষ্কৃত হয় বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকে। ইহার পূর্বে শিল্পীরা কাঠের উপরে তাহাদের কল্পিত বিষয় উল্টাভাবে খোদাই করিয়া লইতেন। এ পদ্ধতিকে এচিং বলা হয়। এচিং করিয়া ব্যঙ্গচিত্র প্রস্তুত করিতে সময়ের প্রয়োজন ছিল খুব বেশী—কোন কোন সময় দু'এক মাসও প্রয়োজন হইত। তাহা ব্যতীত শিল্পীর পরিশ্রমের দিকটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। বর্তমানের তুলনায় প্রথম যুগের শিল্পীদের ধৈর্য, নিষ্ঠা ও কষ্টসহিষ্ণুতা এবং বিষয়ের খুঁটিনাটি লইয়াও এই কাজে ব্যাপৃত থাকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতে হয়।

মহাভারত শর্মা।

মেজর রীড Yellow fever-এর গবেষণার জন্যে চাইলেন দু'জন সাহসী যুবককে। তাদের শরীরে এর বীজাণু সংক্রমিত করে ফলাফল লক্ষ্য করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এতে ঐ যুবক দুটীর প্রাণহানিও হতে পারে।

কিন্তু কে দেবে প্রাণ? কে আছে জগতের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গের মন্ত্র নিয়ে?

মেজর রীড রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষে একদিন দেখা গেল দু'জন আমেরিকান্ যুবক তাঁর কাছে এসেছেন তাঁর গবেষণায় আত্মোৎসর্গ করবার জন্য।

মেজর রীড এবার তাদের পূর্ণ স্বীকৃতি নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন।

সেই যুবক দুটীর আত্মোৎসর্গ চিরদিন জগতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, আর মারাত্মক yellow fever থেকে মুক্ত হয়ে সমগ্র বিশ্ব তাদের উদ্দেশে আজও শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

জার্মানীতে আর কোন বিদেশী কবির রবীন্দ্রনাথের মত অতটা ভক্ত অভ্যর্থনা জানানো হয়নি। পশ্চিম জার্মানীর সর্বত্রই রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীর প্রতিটি বড় বড় সহরেই রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে—হয়েছে নাটকাভিনয়, বিচিত্রানুষ্ঠান, প্রদর্শনী ও আরো অনেক কিছুই। এই সমস্ত অনেকগুলি অনুষ্ঠানেরই উদ্যোক্তা ছিলেন ফেডারেল প্রেসিডেন্ট ডঃ হুইবেক্, ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক হেস্ এবং প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীবর্গ। কবিগুরু তিনবার জার্মানী গিয়েছিলেন; সেখানে পেয়েছিলেন অনেক বন্ধুবান্ধব, পাঠক ও ভক্তের দল। অন্য কোন বিদেশী কবি জার্মানীর এতটা বিরাট সম্মান আর কখনও পাননি।

ভারতীয় ও জার্মান অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন—'ডাকঘর' 'রক্ত-করবী' 'চিত্রা' 'বিসর্জন'। এইসব অনুষ্ঠানগুলির সাফল্যের মূলে ছিল পশ্চিম জার্মানীর সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 'ইন্দো-জার্মান সোসাইটি'। দশবছর আগে স্থাপিত এই সোসাইটির সভ্যসংখ্যা প্রায় ১১০০ এবং প্রধান আড্ডা স্টুটগার্টে। অন্য আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্তভাবে এঁরাই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানগুলির পরিচালনা করেছিলেন।

পশ্চিম জার্মানীতে রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর প্রধান অনুষ্ঠান হয়েছিল কলোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই উপলক্ষে জার্মান জাতিকে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপহার পাঠিয়েছিলেন কলকাতা আর্ট সোসাইটি। কবিগুরুর এই ছবিটি পরে পশ্চিম জার্মানীর কোন একটি 'টেগোর মিউজিয়ামে' রাখা হবে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীসেনন তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথই ভারতের প্রথম যুগমানব, বিশেষ করে জার্মানীতে তাঁর বন্ধু সংখ্যা ছিল অনেক।" একজন জার্মান বক্তা বলেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথ এই ভারতীয় দর্শনের অন্তর্লীনী রূপ ও মর্যাদা জার্মানীর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন।"

রেডিওতে, টেলিভিশনে ও ছায়াছবির অনুষ্ঠানেও ছিল মহাকবি স্মরণের অনির্বচনীয় প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের জীবনীচিত্র ও 'কাবুলীওয়ালা'র চিত্ররূপ জার্মান দর্শকদের অন্তর গভীর আবেগে ভরিয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রশংসাসূচক সমালোচনা বেরিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর নানা কাগজে—বেরিয়েছিল কবিগুরুর অনেকগুলি কবিতার অতি সুন্দর জার্মান অনুবাদ—আর তাঁর আঁকা কতকগুলি ছবি।

ভারতীয় কণ্ঠে কবিগুরুর কবিতা ও গানের আবৃত্তি জার্মানবাসীদের অতি অপরূপ মনে হয়েছিল—আর অনবদ্য হয়েছিল স্টুটগার্টে একটি ভারতীয় সম্প্রদায়ের নৃত্য এবং ব্রেমেনে বোম্বাই থেকে আগত তিব্বতীয় পরাণজ্যোতি পরিচালিত গায়ক-সম্প্রদায়ের সংগীত। সকলের উপরে একটি রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর জার্মানবাসীর অন্তরে জাগিয়েছিল মানববন্ধুবোধ ও বিশ্বশান্তির মধুর বাণী।

পিকিংএ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পিকিং-এ ১৫ই মে-র অপরাহ্ণে যে সভা আহূত হইয়াছিল তাহাতে সহরের কলা ও সাহিত্য সংগঠনগুলির এক হাজারেরও অধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। এই মহান ভারতীয় কবির স্মরণার্থে পিকিং-এ যে বিচিত্র কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার অঙ্গ হিসাবেই উক্ত সভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

এই সভার উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন কলা ও সাহিত্য সংগঠনগুলির ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এবং রবীন্দ্র-স্মারক কর্মসূচী সংগঠন সমিতির সভাপতি মাও তুন। শেষোক্ত সমিতির সমস্ত অধ্যাপক চি হ্সিয়েন-লিন তাঁহার বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও কর্মধারার পরিচয় দান করেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মি, পার্থসারথীও এই সভায় বক্তৃতা করেন। ভারতীয় দূতাবাসের সমস্ত ও পিকিং-এ অবস্থানকারী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভাস্থলের সংলগ্ন একটি প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে এই উপলক্ষ্যে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা সভার পূর্বে, পরে ও বিরতির সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিপুল আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছিল। কবি তাঁহার স্বহস্ত-অঙ্কিত যে সমস্ত চিত্র ও অন্যান্য উপহার তাঁহার চীনা বন্ধুবর্গকে প্রদান করিয়াছিলেন সেই অমূল্য সম্পদগুলির সহিত তাঁহা শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চীনা গণ-প্রকাশনালয় কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিকতম পুস্তকগুলি সহিত রবীন্দ্র রচনাবলীর চীনা অনুবাদগুলিও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। অন্যান্য প্রদর্শিত বস্তুগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল পরলোকগত প্রখ্যাত চীনা শিল্পী হুয়ং শেইহঙ-এর চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন (ভারতে) উপলক্ষ্যে লিখিত রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি এবং বিখ্যাত পিকিং অপেরা অভিনেতা মেই লান-ফাঙ-কে কবি কর্তৃক উপহার হিসাবে প্রদত্ত তাঁহার হস্তাক্ষরখচিত একটি চীনা পাখা। কবির চীন ভ্রমণের সময় তাঁহার যে সমস্ত আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল সেগুলিও প্রদর্শনীর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিগত কয়েকদিনে পিকিং বেতারকেন্দ্রগুলি হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি সম্প্রচারিত করা হইয়াছে এবং "কোয়াঙমিন দৈনিক" ও অন্যান্য সাহিত্যিক সাময়িকীগুলিতে তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯১৫ সাল হইতেই চীনা পাঠকমণ্ডলী রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। প্রাক-মুক্তি যুগের মতো ইংরেজী অনুবাদগুলির উপর নির্ভর না করিয়া বর্তমানে চীনা অনুবাদকরা মূল বাংলা হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনা চীনা ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন।

—"মানুষের ধর্ম মহামানবের সাধনা, কোথাও তার সীমা নেই।

অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুর বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক।"

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-যুগ

বিশ্ব-বার্তা

ইংলণ্ডের একটি অভিনয় শিক্ষাদান কেন্দ্র

লণ্ডনের 'রয়্যাল আকাডেমী অফ ড্রামাটিক আর্ট' অভিনয় কলাবিদ্যা শিক্ষাদানের একটি বিশিষ্ট ও ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার লাভ করা খুবই কঠিন; তার চেয়েও কঠিন এখানে অভিনয় কলাবিদ্যা লাভের জন্য বছরের পর বছর সাধনা করা এবং পেশাদারী মঞ্চে সাফল্য অর্জন করা।

লণ্ডনের সুবিখ্যাত রয়্যাল একাডেমী অফ্ ড্রামাটিক আর্টএর প্রবেশ পথ

প্রতি বছর আটশো আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র আশিজনের আবেদনপত্র গৃহীত হয়।

বিশ্বের নানাস্থান থেকে আগামী কালের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আসেন এই রয়্যাল আকাডেমীতে শিক্ষালাভের জন্য। ব্রিটেন ছাড়াও নিউইয়র্ক, কেপটাউন, সিডনি ও অন্টারিও (কানাডা)তে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বিচার করা হয়। তাদের বাচনক্ষমতা, ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী, চেহারা, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব—সবই নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করা হয়।

এই রয়্যাল আকাডেমীর পরিচালক ও প্রধান অধ্যক্ষ জন কার্নাণ্ডের কিছু নবাগতদের প্রথমেই বলেন:

আপনি কি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে চান—না অন্য কিছু? যদি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে তাহলে কখনো অভিনেতা হবার চেষ্টা করবেন না।

যদি ভাবতে পারেন আর কিছুই আপনার দ্বারা হবে না, বছরের পর একটানা হতাশার পরিবেশ সহ্য করার ক্ষমতা আপনার আছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে যদি পান নৈরাশ্যের আঘাত এবং তাতেও বিচলিত না হন তাহলে আপনার লক্ষ্যপথ ধরে এগিয়ে চলুন।

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করবেন। মিঃ কার্নিগি যুক্তরাষ্ট্রে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন।

কার্নিগি এর আগে তিনবার ভারত ভ্রমণ করে গেছেন (১৯৩১-১৯৩৩-১৯৩৫)। প্রথমবার ভারত ভ্রমণের সময় 'কনভারসেশনস্ উইথ মেহরু' নামে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

সাহিত্যিক প্রভাতকিরণ বসু

সাহিত্যিক প্রভাতকিরণ বসুর অকাল প্রয়াণে সাহিত্যরসিক ও পাঠক মাত্রই ব্যথিত হবেন। প্রভাতকিরণ কুশলী লেখক, ভাইবোন পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক—ছোটদের অতিপ্রিয় কাকাবাবু হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখা গল্প-ভারতীতেও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা বই-এর মধ্যে বড়দের পর্দানশীন, শ্রেষ্ঠ গল্প, অন্তর্দুঃতীর (উপন্যাস) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এডমিরাল বার্ডের নির্মীয়মান প্রতিমূর্তি।

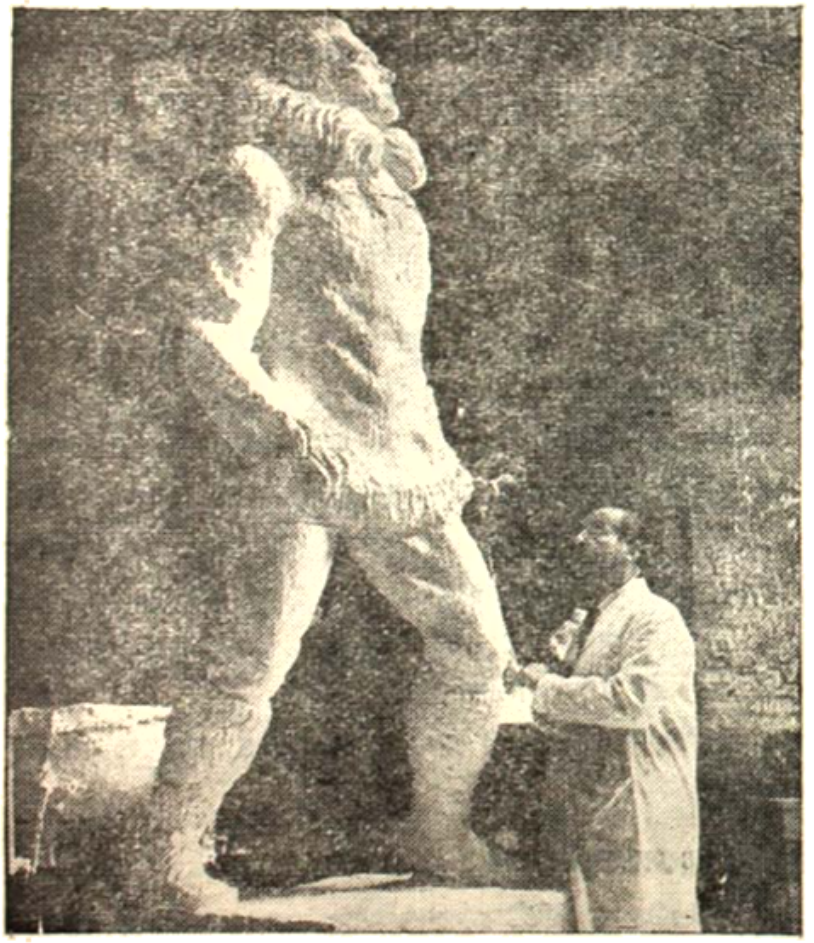

বিখ্যাত ভাস্কর কেলিন্স ভ ওয়েলডন তাঁর ওয়াশিংটনের ষ্টুডিওতে পরলোকগত মেরু অভিযাত্রী এডমিরাল রিচার্ড ই বার্ড-এর মূর্তি তৈরী করছেন। এ যুগের মেরু অভিযানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতারূপে বার্ডের শক্তি, সাহস ও দক্ষতা অবিস্মরণীয়। অন্যদিকে মার্কিন মেরিন কোর মেমোরিয়াল-এর প্রস্তর মূর্তি নির্মাতারূপে ওয়েলডনের স্থান আজ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ শিল্পী-বৃন্দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোর দুর্যোগে কয়েক-জন সৈনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছে এক অনমনীয় দৃঢ়তায়—এই ছিল তাঁর বিষয়বস্তু।

সম্মুখে জ্ঞানের উচ্চ শিখর —কিণ্ডারগার্ডেনে প্রবেশের মুখে পাঁচ বৎসরের বালক ডেভি ডেলণ্ড (নিবাস আমেরিকার মিচিগান ষ্টেটের অ্যান আরবর) পুস্তক স্তূপের দিকে তাকিয়ে আছে। স্নাতক উপাধি লাভের পূর্বে তাকে প্রায় ৪২০ ডলার (১ ডলার=আনুমানিক পাঁচ টাকা) মূল্যের এই ৮৪টি বই আয়ত্ত করতে হবে। এ ছাড়াও আছে শিক্ষার বহুবিধ উপকরণ যার আর্থিক মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। এ যুগের শিক্ষা কতখানি ব্যাপক, গভীর ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে এ তারই নিদর্শন।

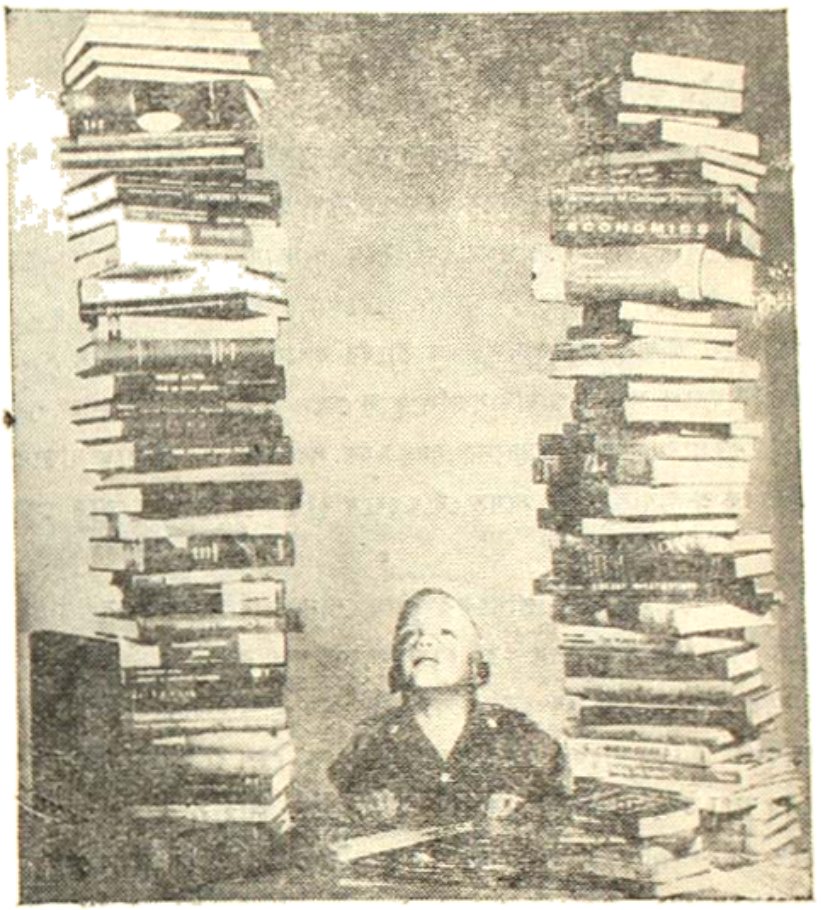

কিণ্ডারগার্ডেনে প্রবেশের মুখে ডেভি ডেলণ্ড

মার্কটোয়াইনের রূপসজ্জায় হোলক্রফ

সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক মার্ক টোয়াইনের রূপসজ্জায় হোলক্রফ। ৩৪ বৎসর বয়সের এই শক্তিমান অভিনেতা সম্প্রতি নিউইয়র্কের নাট্য রসিকবৃন্দের সংপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একক প্রচেষ্টায় রূপায়িত 'মার্ক টোয়াইন টু নাইট'-এ তিনি অবিকল ৭০ বৎসর বয়স্ক লেখক টোয়াইনরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর এই রূপসজ্জা একেবারে নিখুঁত। সাহিত্য রসিকবৃন্দ তাঁদের প্রিয় লেখককে যেন সামনে দেখতে পান। শিল্পী তাঁর বয়সকে কিভাবে ৩৩ বছর এগিয়ে দিচ্ছেন ছবিতে তাই দেখা যাচ্ছে।

ফজল মাহমুদ (অধিনায়ক)

ফজলমাহমুদ—১৯২৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে জন্ম। অবিভক্ত ভারতে অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী (১৯৪৭-৪৮) ভারতীয় দলে নির্বাচিত হন ; কিন্তু সফরের প্রাক্কালে পাঞ্জাব পুলিশে চাকরীর শর্ত নেতে পারেননি। ১৯৫২ সালে দক্ষিণে ভারতকে, ১৯৫৪ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে, ১৯৫৬ সালে করাচীতে অষ্ট্রেলিয়াকে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ঢাকায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করতে সাহায্য করেন। পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশের স্পোর্টস ডাইরেক্টার

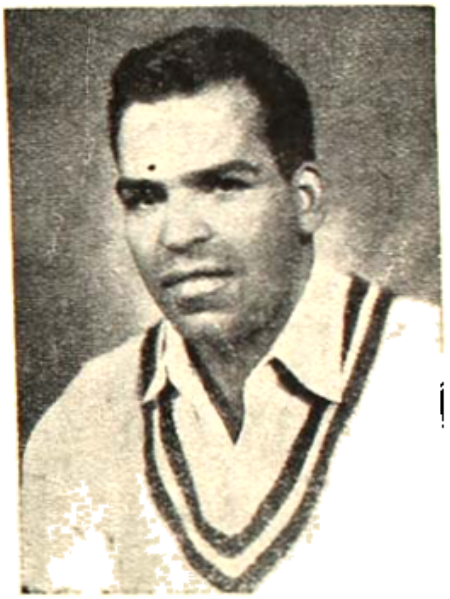

ইমতিয়াজ আহমেদ

(সহঃ অধিনায়ক—পাকিস্তান দল।)

ইমতিয়াজ আহমেদ—১৯২৮ সালের ৫ই জানুয়ারী লাহোরে জন্ম। অবিভক্ত ভারতে পাঞ্জাব দলের খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিলাণ্ডের বিরুদ্ধে লাহোর টেষ্টে বাকার হোসেনের সহযোগিতায় ৭ম উইকেটে ৩০৯ রাণের রেকর্ড স্থাপন করেন। তিনি নিজেই করেছিলেন ২০৯ রান। ১৯৫০-৫১ সালে বোম্বাইতে কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে নট আউট ৩০০ রান করেন। দলের উইকেট রক্ষক।

হানিফ মহম্মদ

(ভূতপূর্ব ভারতীয়—পৌষ '৬৭

হানিফ মহম্মদ—১৯৩৪ সালের ২১শে ডিসেম্বর জুনাগড়ে জন্ম। ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান এবং অসীম ধৈর্যসহকারে খেলেন করাচীর কায়েদে আজম ট্রফিতে ৪৯৯ রান করে হানিফ ব্র্যাডম্যানের প্রথম শ্রেণীর খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৩৩৭ রান করেন, যার ফলে টেষ্টে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের তালিকায় তাঁর স্থান তৃতীয়। এই রান ১৬ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে করেন। আজ পর্যন্ত টেষ্টে পৃথিবীর কোন ব্যাটসম্যান এত দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাট করেননি।

সইদ আমেদ

১৯৩১ সালের ১লা অক্টোবর চলন্তরে জন্ম। ১৯৫১ সালের এম. সি. সি. দলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করেন। ব্যাটিং অফসাইডে এ খুব শক্তিশালী।

ওয়ালিস ম্যাথিয়স

১৯৩৫ সালে ৮ই ফেব্রুয়ারী করাচীতে জন্ম। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ঢাকার টেষ্টমাচে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে উহার ইনিংসে সুন্দর ব্যাট করেন।

ইজাজ-বাট

১৯৩৬ সালের ১০ই মার্চ শিয়ালকোটে জন্ম। এম, সি, সি, দলের বিরুদ্ধে ২৭ রাণ করে পরিচিত হন। উইকেট রক্ষক হিসাবে সুপরিচিত। স্বদেশে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় আত্মপ্রকাশ করেন।

মুস্তাউদ্দিন

১৯৩৭ সালের ২রা এপ্রিল লাহোরে জন্ম। ডান হাতের ব্যাটস্‌ম্যান ও স্লো বোলার হিসাবে খ্যাত। ১৯৫১ সালের এম. সি. সি. দলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করেন।

জাভিদ বারকি

১৯৩৮ সালের ৮ই মে করাচীতে জন্ম। ১৯৫৫ সালের এম, সি, সি, দলের বিরুদ্ধে খেলে নাম করেন। ১৯৫৮ সালে অক্সফোর্ডের "ব্লু" উপাধি পান।

আলিমুদ্দিন

১৯৩০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আজমীঢ়ে জন্ম। ১৯৫৪ সালে ইংলণ্ড সফরে হানিফের সঙ্গে ব্যাট করেন। সুন্দর ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যান ও ফিল্ডার।

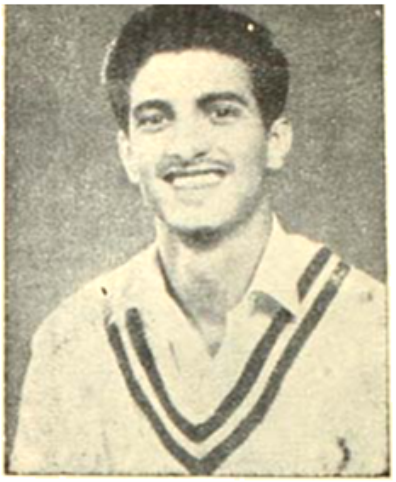

হাসিব আসান

১৯৩৯ সালের ১৫ই জুলাই পেশোয়ারে জন্ম। অফস্পিন বোলার হিসাবে ভারতসফরের আগে পাকিস্তানের পক্ষে ৪টি টেষ্টম্যাচ খেলেন। ডানহাতে বোলিং করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন না করলেও ভবিষ্যতে সুনাম অর্জনের আশা আছে

মহম্মদ ফারুক

১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে জুনাগড়ে জন্ম। ডানহাতে মিডিয়াম ফাষ্ট বোলিং করেন। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্ট-ম্যাচে অবতীর্ণ হন এবং ৪টি মূল্যবান উইকেট দখল করেন। পাকিস্তানের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ফারুক ভবিষ্যতে মহম্মদ নিসারের স্থান ফাষ্ট বোলার হবেন।

মুস্তাক মহম্মদ

১৯৪৩ সালে ১৪ই জানুয়ারী জুনাগড়ে জন্ম। ১৯৫৯ সালে ১৮বছর ৭ দিন বয়সে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে লাহোর টেষ্ট খেলেন এবং বিশ্বের সব কনিষ্ঠ টেষ্ট খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর নাম লেখা হয়ে থাকে।

জাফর আলতাফ

১৯৪০ সালে আগ্রায় জন্ম। ১৯৫৮-৫৯ সালে কায়েদে আজম ট্রফির খেলায় আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেমি-ফাইন্যালে সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে ৯৯ রাণ করে সুনাম অর্জন করেন। লাহোর কলেজের ছাত্র। ফিল্ডার হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি।

নাসিম উল গানি

১৯৪১ সালের ১৪ই মে দিল্লীতে জন্ম। একজন ছোটা অফ্ স্পিন বোলার। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের পূর্বে সে রকম সুনাম ছিল না। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেষ্টে ৮৭ রাণ ৬টি উইকেট দখল করেন। ব্যাটিং ও ফিল্ডিংএ সুনাম আছে।

ইনতিকাব আলম

১৯৪১ সালে ২৮শে ডিসেম্বর মোরিয়ার-পুরে জন্ম। লেগব্রেক ও গুগলি বোলার। পাকিস্তান দলে এই ধরণের বোলারের অভাব ছিল। ব্যাটিং ও ফিল্ডিংএ পারদর্শী। ইনতিকাবকে একজন আদর্শ খেলোয়াড় বলা যায়।

সুরেন্দ্রনাথ (ওয়েস্টার্ন)

দেরাদুনের অলরাউণ্ডার টাস্ক [illegible] ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে উত্তর ইনিংসে অপূর্ব স্ট্রোক-নৈপুণ্য প্রদর্শনের পর থেকেই ভারতীয় দলে তাঁর স্থায়ী আসন করে নিতে [illegible] বরোদা, বোম্বাই ও কানপুর টেষ্টে উপর্যুপরি কোন ইনিংস দেখাতে না পারায় তাকে তাঁকে কোলকাতা টেষ্টে বাদ দেবার প্রশ্ন উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলখা সিংয়ের অসুস্থতার জন্য তাঁকে খেলতে হয় এবং তিনি অপূর্ব ব্যাটিং-বোলিং ও ফিল্ডিং করেন।

সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় দলে [illegible] অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। খুব ইনিংস পরে প্রচুর রানও অর্জন করেন। ইডেন উদ্যানে তিনি ধারাবাহিক বোলিং করে থাকেন [illegible] বাদ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠেনি তিনিও বলের বোলিং করে তাঁর নির্বাচনের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন মাদ্রাজ টেষ্টে তাঁর বোলারদের সুবিধা ভবে মনে করে তাঁকে পুনরায় নির্বাচন করা হয়েছে। আশা করা যায় তিনি তাঁর ভক্তবৃন্দকে হতাশ করবেন না প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তিনি ভাল ব্যাটিংও করে থাকেন।

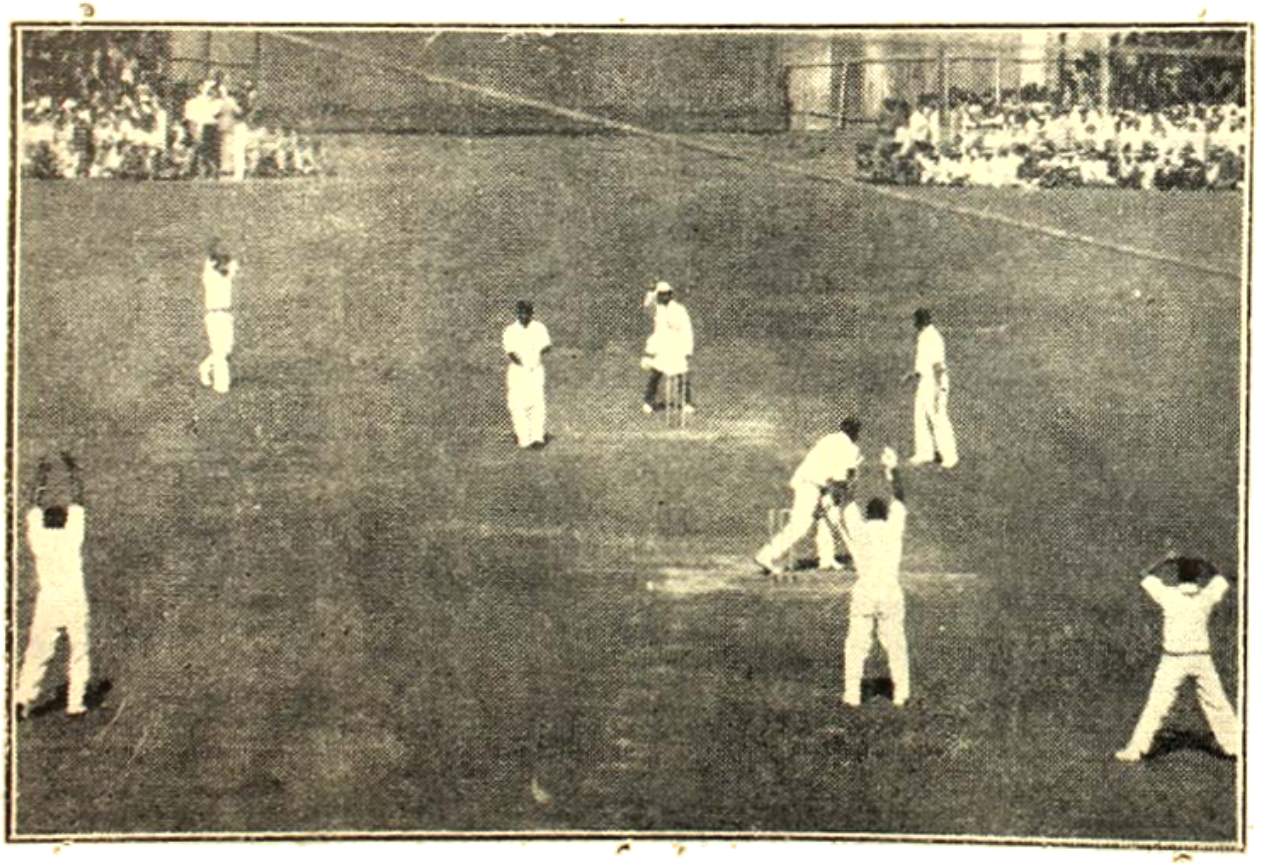

কলকাতার টেষ্টম্যাচে মামুদহোসেনের বলে উইকেটরক্ষক ইমতিয়াজের হাতে উন্নিগড়কে ধরা পড়িতে দেখা যাইতেছে।

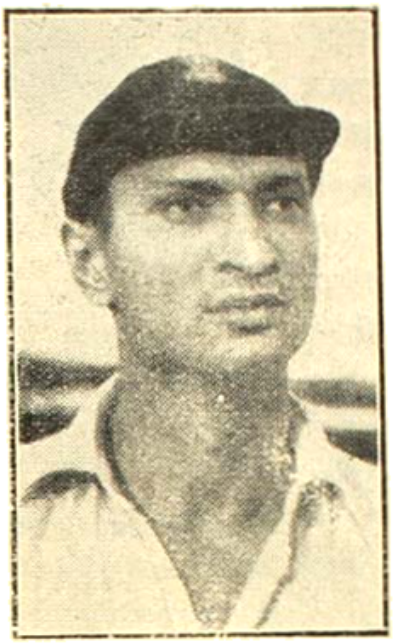

পলি উমরিগর

১৯৪৮ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের নেতৃত্ব করে উনি বিশ্বকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং টেষ্টম্যাচে সেই থেকেই খেলে আসছেন ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ভারও তাঁর উপর কয়েকবার পড়ে এবং তিনি তার যোগ্যতা প্রমাণ করেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কানপুরে সেঞ্চুরী করেছেন

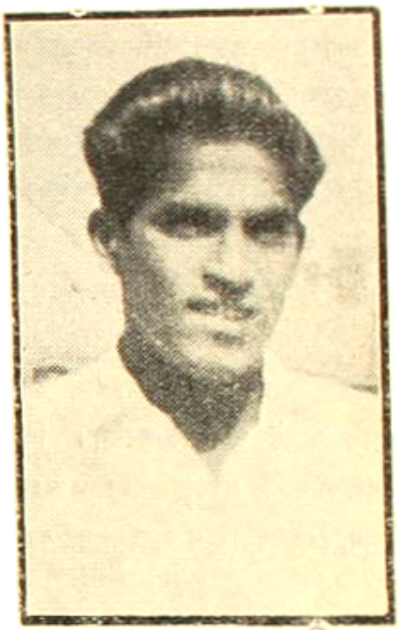

দেশাই

রামকান্ত দেশাই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ভরযোগ্য কাষ্ট বোলার হিসাবে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সুন্দর বোলিং করেছেন ইংলণ্ড সফরে সুরেন্দ্রনাথের ছুটী ছিলাবে ফিরেছিলেন মোহাই টেষ্টে ভাল ব্যাট করেন আজও তার হল সেঞ্চুরী পাকে রক্ষিত হল। বাকীটা দেশ ফেরার পিছনে।

বিজয় মাঞ্জরেকার

টেষ্ট খেলার প্রকৃতগুণ এই খেলোয়াড়টির মধ্যে আছে। স্কুল জীবনে বড় ম্যাচে অংশ গ্রহণ করেন। গত বৎসর হাঁটুর অপারেশানের জন্য খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। এবার পুনরায় খেলছেন এবং এখন, দলের পরম নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। শারীরিক পটুতার অভাবের জন্য ভালো ফিল্ডিং করতে পারছেন না। মাঞ্জরেকারকে "Adventurous Batsman" বলা হয়।

নাদকারনী

হিমুমানকাদের পর ভারতীয় দলে অলরাউণ্ডার হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন নাদকারনী। ইংলণ্ড সফরে তিনি আগাগোড়া সুন্দর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। পাকিস্তান দলের বিরুদ্ধে ভালো বল করেছেন।

জয়সীমা (হায়দ্রাবাদ)

হায়দ্রাবাদের তরুণ অধিনায়ক জয়সীমা গত ক্রিকেট মরশুমে শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ব্যাটিংএ যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তা ক্রিকেটের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকার মত। ইংলণ্ড সফরে প্রথম ভারতীয় দলে নির্ব্বাচিত হন ও ভাল খেলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কানপুর টেষ্টে ৯৯ রান করে আউট হয়ে যান। অসীম ধৈর্য্য সহকারে খেলেন। কোলকাতা টেষ্টে খেলেছেন। ফিল্ডিংও ভাল করেন বর্ত্তমানে বাংলার পঙ্কজ রায়ের পরিবর্ত্তে অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টরের ত্রুটী হিসাবে ভারতীয় দলে তাঁর স্থান। রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতায় অক্সফোর্ড ব্লু আব্বাস আলীবেগের সহযোগিতায় স্বীয় দলকে সাফল্যলাভে যথেষ্ট সহায়তা করেন। বিখ্যাত খেলোয়াড় লালা অমরনাথ যে সময়ে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন জয়সীমা সেই সময়ে ভারতীয় দলে খেলার সুযোগ পান, সেইজন্য তিনি অমরনাথের কাছে কৃতজ্ঞ।

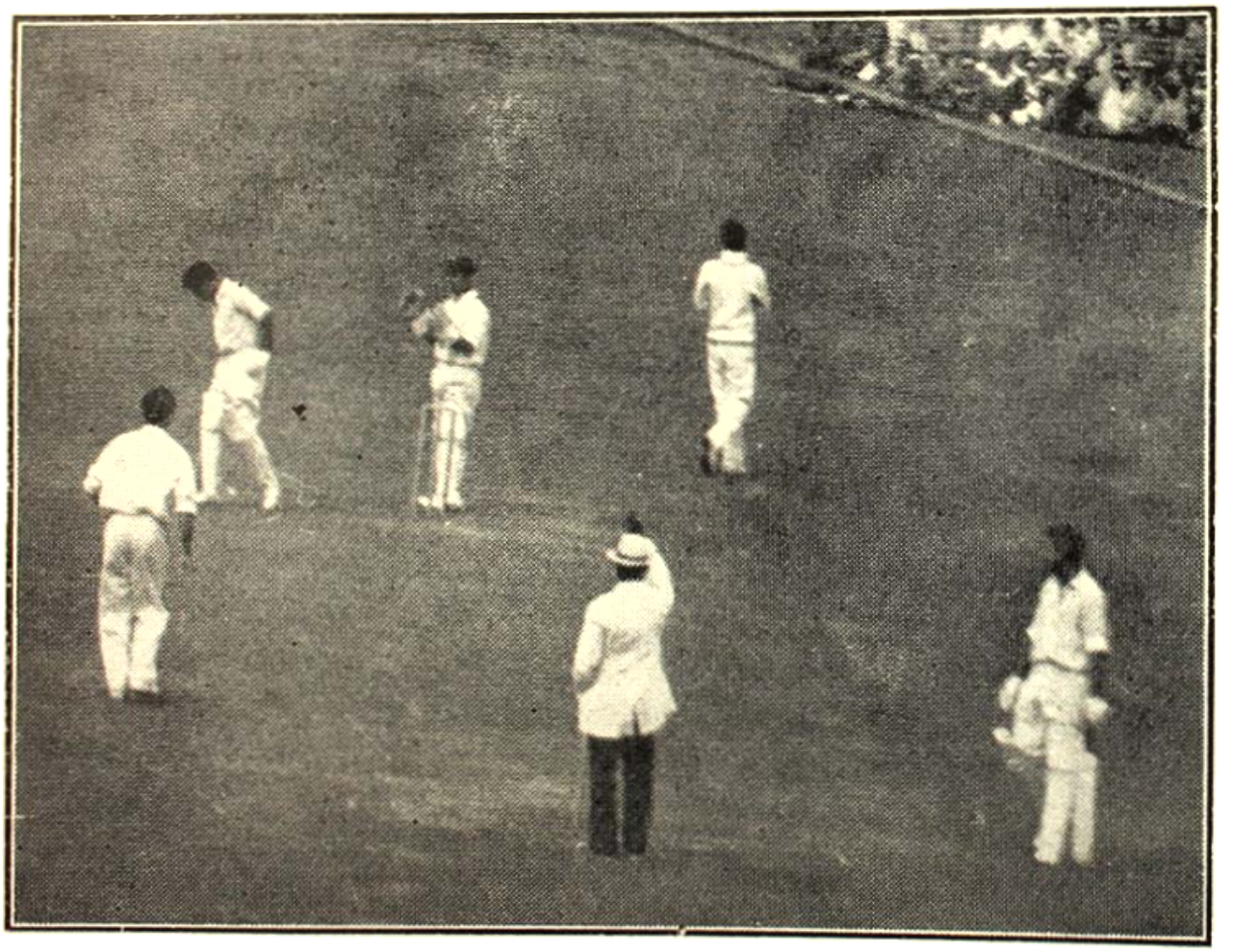

ইডেন উদ্যানের টেষ্টম্যাচে পাকিস্তানী দলের অধিনায়ক ফজল মামুদ বোরদের বলে এল, বি, ডবলিউ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন।

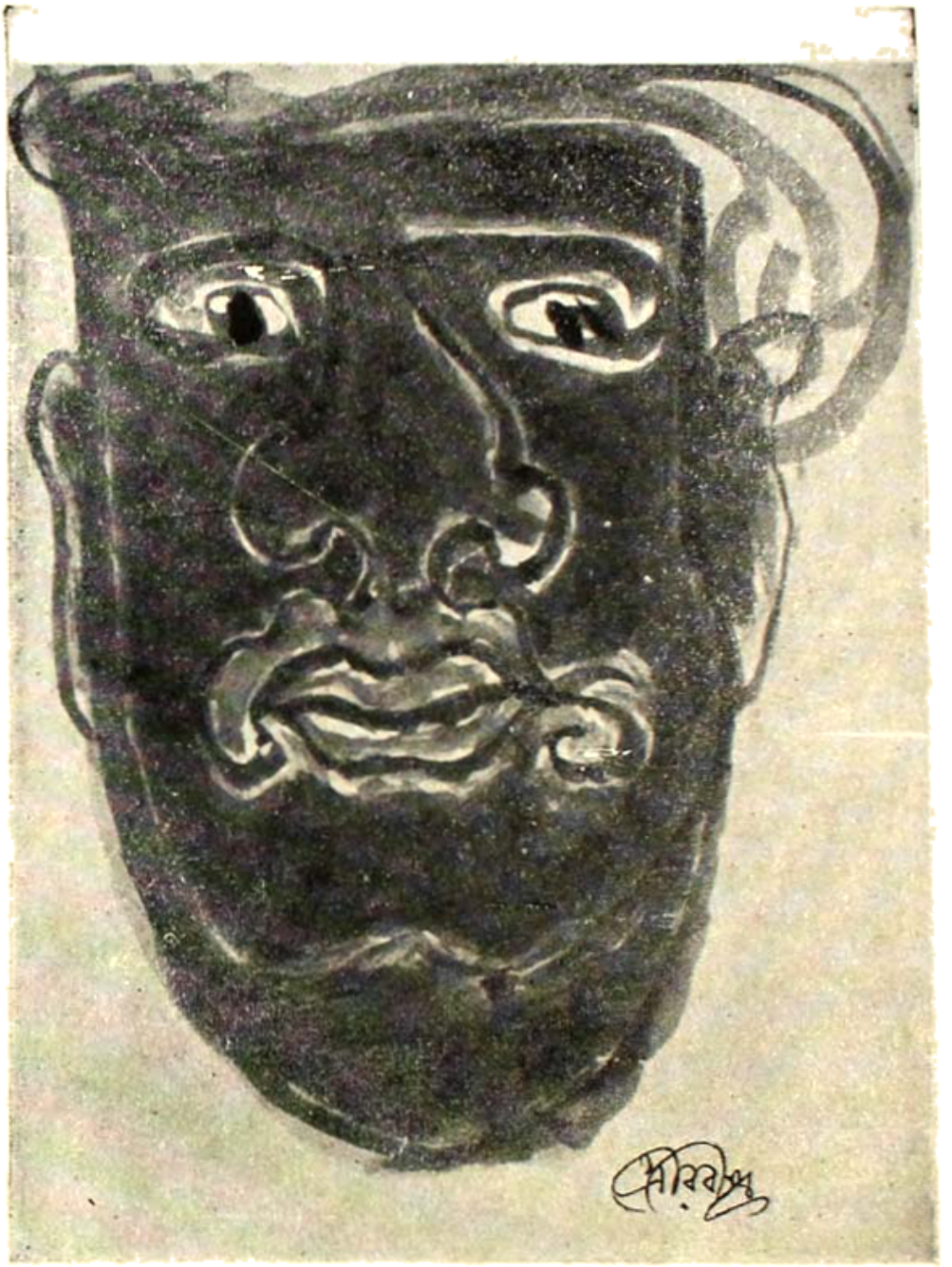

রেখা'র আড়ালে প্রথমে দেখা দেয় রূপরেখা মুখের,
তারপরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা
পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির
বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ

আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকাশের
আশ্চর্য্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ। ছায়া

রবীন্দ্রনাথ

……যখন প্রতিজ্ঞা এবারে ষোলো আনা কুঁড়েমিতে মন দেব· তখন ভেবে' ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এ সম্বন্ধে উন্নতিলাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেনসিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশি রবার চালাতে হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে—অতএব মৃত রাফেল তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরে থাকতে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর যশের কোনো লাঘব হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…… একখানা Sketch Book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরী করচিনে এবং কোন দেশের ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এ রকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই।

—রবীন্দ্রনাথ

পান্নারাম

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে মাদাম কুরীর নাম অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে আছে। কারণ শুধু তিনি এবং তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী এই পুরস্কার লাভ করেন নি, তাঁর কন্যা আইরিন জোলিও কুরী এবং জামাতা ফ্রেডারিক জোলিও কুরীও এই পুরস্কার লাভ করেন। বংশপরম্পরায় নোবেল পুরস্কার লাভের এমন নজীর আজ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর স্থাপিত হয় নি।

এবারের নোবেল পুরস্কার

এবার (১৯৬৭) পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলে শাখার ৩৪ বছর বয়স্ক তরুণ গবেষক ডক্টর ডোনাল্ড এ গ্লাসারকে। পরমাণুর সক্রিয়রূপ পরিলক্ষণের অভিনব যন্ত্র 'বাবল্ চেম্বার' উদ্ভাবনের জন্যে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেছেন।

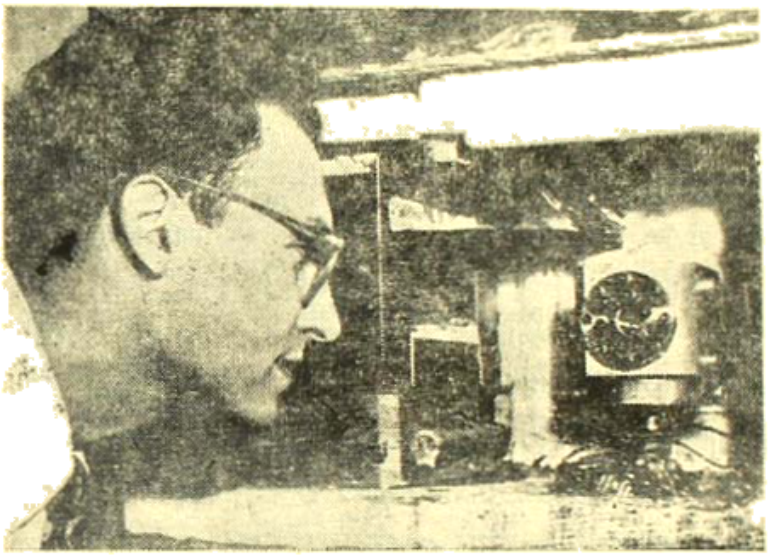

বাবল্ চেম্বার-এর সম্মুখে ডঃ গ্লাসার

বাবল্ চেম্বার সংক্রান্ত এই গবেষণা ডঃ গ্লাসার ১০ বছর আগে ৫ ডলার মূল্যের বন্দুকগাছি আর ৬ বোতল বীয়ার নিয়ে শুরু করেছিলেন। বীয়ার বোতলের ছিপি খোলামাত্রে বোতলের মুখ ফেনায় ভরে যায়। এটা লক্ষ্য করে তাঁর ধারণা হয় আবহাওয়ার কোন পদার্থেরকণাসমূহের সংযোগে অথবা বোতলেই কোন তাপের জন্যে এই ফেনার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এরপর তিনি বীয়ার ও তরল হাইড্রোজেন সহ অন্যান্য বহু তরল পদার্থের পরমাণু ভাঙার কাজে ব্রতী হন। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনিস্ক প্রোজেক্ট থেকে তাঁকে এজন্যে দেড় হাজার ডলার দিয়ে সাহায্য করা হয় এবং তিনি এই অর্থের সাহায্যে বাবল্ চেম্বার গঠন করেন।

এই বাবল্ চেম্বারের সাহায্যে ডঃ গ্লাসার পরমাণুর কেন্দ্রীন 'নিউক্লিয়াস'-এর স্বরূপ এবং পরমাণুর অপরাংশ ইলেকট্রনের সঙ্গে কেন্দ্রীন পদার্থকে যে শক্তি ধরে রাখে তার সন্ধান দেন। তিনি এ সম্পর্কে আলোকচিত্রও গ্রহণ করেন (ইলেকট্রন সাধারণত দৃষ্টিগোচর নয়)। এর ফলে বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের স্বরূপ সম্পর্কেও পর্যালোচনার আর একটি নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নসহ পৃথিবীর প্রধান রাষ্ট্রসমূহে এই বাবল চেম্বার সংক্রান্ত গবেষণায় বছরে তিন কোটি ডলারেরও অধিক ব্যয় করা হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৫টি প্রতিষ্ঠানে বাব্‌ল চেম্বারের সাহায্যে গবেষণা হচ্ছে।

ডোনাল্ড গ্লাসার ১৯২৬ সালে ক্লিভল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মা বাবা দুজনেই জার্মানিতে জন্ম। ১৯৪৬ সালে তিনি ক্লিভল্যাণ্ডের কেস ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে স্নাতক হন এবং ১৯৫০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। প্রায় ১০ বছর তিনি

মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বর্তমান বছরে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের বার্কলে শাখায় যোগদান করেছেন।

এ বছর রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লস এঞ্জেলস্ শাখার অধ্যাপক ডক্টর উইলার্ড এফ লিবীকে। 'অ্যাটমিক টাইম ক্লক' যন্ত্রের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরিমাণ নিরূপণ করে প্রত্নতাত্ত্বিক পদার্থসমূহের বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত অভিনব কার্যের জন্যে ডঃ লিবী এই পুরস্কার অর্জন করেছেন।

ডঃ উইলার্ড লিবী

'অ্যাটমিক টাইম ক্লক' যন্ত্রে কার্বন-১৪ নামে মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সাহায্যে ৩০ হাজার বছরেরও পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের সঠিক সন তারিখ নির্ধারণ করা যায়। জীবন্ত প্রাণী, মানুষ ও উদ্ভিদেরা মহাশূন্য থেকে আগত কার্বন-১৪ কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসাবে গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পর আর সেটা গ্রহণ করতে পারে না। তখন এই কার্বন নষ্ট হয়ে যায়। প্রতি গ্র্যাম কার্বন প্রতি মিনিটে কি হারে নষ্ট হয়ে থাকে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করে ডঃ লিবী কসিল ও অন্যান্য জিনিসের বয়স নির্ধারণ করেছেন।

কার্বন-১৪ কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও ভূগোলের ক্ষেত্রেই বহু নতুন তথ্যের সন্ধান দেয় নি, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বহু নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।

ডঃ লিবী ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ সালে স্নাতক উপাধি এবং ১৯৩৩ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি ওখানেই অধ্যাপনা করেন এবং তারপর পরমাণু শক্তি কমিশনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে ওই পদে ইস্তাফা দিয়ে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ডঃ লিবী পরমাণু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তেজস্ক্রিয় হাইড্রোজেন আইসোটোপ টিটিয়ামের আবিষ্কর্তা তিনি।

শরীর ও ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার এবার যৌথভাবে দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ ভেষজ গবেষণা বিজ্ঞানী অধ্যাপক সিটার ব্রায়ান মেডাওয়ার এবং অষ্ট্রেলিয়ার সার ফ্রাঙ্ক ম্যাকফারলেন বার্নেট-কে। চর্ম ও অন্যান্য টিস্থর গ্রাফটিং সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে সংক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সহনশীলতা সম্পর্কে গবেষণাকার্যের জন্যে তাঁরা এই পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁদের আবিষ্কার পরীক্ষামূলক জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে।

৪৫ বছর বয়স্ক অধ্যাপক মেডাওয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধ বিজ্ঞানে একজন বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রাণিবিদ্যা ও তুলনামূলক শরীরতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক। এই বছর তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এর অধিকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন। ৩৫ বছর বয়সে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন, তিনিই রয়েল সোসাইটির কনিষ্ঠতম ফেলো। মার্লবরো কলেজে ও অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন।

ডঃ বার্নেট বর্তমানে মেলবোর্ন-এর ওয়াল্টার অ্যাণ্ড এলিজা হল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এর অধিকর্তা।

'শান্তির জন্যে পরমাণু' পুরস্কার

বর্তমান বছরের (১৯৬১) 'শান্তির জন্যে পরমাণু' পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে প্রখ্যাত ব্রিটিশ পরমাণু বিজ্ঞানী সার জন কক্‌ক্রফটকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিশ্রুত ব্যবসায়ী হেন্‌রী ফোর্ডের স্মৃতিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণু শক্তি ব্যবহার-করে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার জন্যে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের আবেদনে হেন্‌রী ফোর্ডের পুত্র এডসেল এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

সার জন কক্‌ক্রফট্

পরমাণু শক্তিকে মানুষের শান্তিপূর্ণ কাজে প্রয়োগের প্রথম প্রচেষ্টাকাল থেকেই সার কক্‌ক্রফট্ এই বিষয়ে ব্যাপৃত রয়েছেন এবং মূলত তাঁরই চেষ্টায় ইংলণ্ডে পরমাণু শক্তি থেকে ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবেষণা ও চিকিৎসা কাজে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিতরণে এবং জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠনে সার কক্‌ক্রফট্ অগ্রণী ছিলেন।

সার জন কক্‌ক্রফটকে ১৯৫১ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গৃহনির্মাণে সাহায্যের জন্য আবেদন—

বিজ্ঞান-অনুশীলনের ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করে মানুষ আজ সভ্যতার সু-উন্নত সোপানে আরোহণ করেছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া কোন দেশেরই বৈষয়িক উন্নতি বা জাতীয় অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা তেমন ভাবে প্রসার লাভ করেনি। দেশের জনসাধারণেরএই বিজ্ঞানবিমুখতা দূর করে জনচিত্তে বিজ্ঞানের প্রতি একটা সহজ অনুরাগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গত ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৩ বছর যাবৎ এই উদ্দেশ্য ও আদর্শ সাধনের জন্য পরিষদ নানা কর্মপ্রয়াস করে আসছে। কিন্তু পরিষদের নিজস্ব গৃহ না থাকায় কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ কারণে কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কাছ থেকে গোয়াবাগানে এক খণ্ড জমি কিনে গৃহ নির্মাণের চেষ্টা হচ্ছে। এই জমি ও গৃহ-নির্মাণের জন্যে অবিলম্বে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অধ্যাপক বসু এজন্যে দেশের জনসাধারণ বিদ্যুৎসিগণ ও সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। পরিষদের এই তহবিলে প্রদত্ত দান সরকারী নির্দেশে আয়করমুক্ত বলে গণ্য হবে। যে কোন প্রকার দান নিম্নের ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হবে—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৷১৷১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯।

জানছি। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের বর্তমান অবস্থায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবটাই আমাদের মনের উপর সর্বাধিক বলবৎ দেখতে পাচ্ছি। চারদিকের চালচলন আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিচ্ছে যে, মনের দিক দিয়ে জাতীয় চৈতন্যের জগতে বাস করা চললেও চলতে পারে, কিন্তু বাইরের ব্যবহারে অর্থাৎ পোশাকে-আশাকে ভাষায় ও ভঙ্গীতে পাশ্চাত্ত্য ধরণধারণটাই সমধিক গ্রহণীয়। মনের জগত লোকচক্ষুর অগোচর—সেখানে জাতীয় ভাবের লীলা চলুক, কিন্তু বাইরে আমাদের ব্যবহার ও অভ্যাস আধুনিক কেতাদুরস্ত হওয়া চাই, আধুনিক জীবনযাত্রোপযোগী হওয়া চাই। ভোগসুখের প্রতি আমাদের মনে যে স্বাভাবিক মোহ রয়েছে তা-ই আমাদেরকে বারে বারে পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রার অভিমুখে সবলে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। মনোজীবন ও বহির্জীবনের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব, এই যে ব্যবধান—এই হল আধুনিক মানুষের মনোজীবনের বৈশিষ্ট্য আর এ-ই তার নিয়তি। এ বৈশিষ্ট্য এবং এ নিয়তি মধুসূদনের অন্তর্দ্বন্দ্বসঙ্কুল বিচিত্র ভাবধর্মপ্রণোদিত জীবনভঙ্গীর কথা প্রবলভাবে মনে করিয়ে দেয়।

২

মধুসূদনের যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সৌসাদৃশ্যের কথা কতকটা সবিস্তারে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। এবারে মধুসূদনের জীবন ও কাব্যের মধ্যে প্রবেশ করে তার থেকে যে শিক্ষা ও সংকেত আমরা পাই, এখনকার কালের পক্ষে তার কোন তাৎপর্য রয়েছে কিনা সেটি নিরূপণ করবার চেষ্টা করব। মধুসূদনের জীবন নিয়ে এই পর্যালোচনা শুরু হোক।

মাইকেল মধুসূদন

এ কথা সর্বসাধারণের পরিজ্ঞাত যে, মধুসূদনের সাংসারিক জীবন ব্যর্থ হয়েছিল। নানা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর কাব্যজীবন স্বল্পস্থায়ী কিন্তু প্রতিভার উজ্জ্বল বিভায় দীপ্ত। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যেন আকস্মিক প্রেরণার তাড়নায় উল্কার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে সহসা প্রবেশ করেছিলেন এবং উল্কার মতই কিছুক্ষণ চোখ-ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে তারপরেই ফুৎকারে নিবে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কাব্য-গগনে যা সাময়িক প্রখর আলোক-বিচ্ছুরণ রূপে প্রকাশ পেয়েছিল,তা-ই সাংসারিক ক্ষেত্রে বজ্রাবলেপ অন্ধকারে পরিণত হয়ে প্রচণ্ড দুঃখকষ্টের সৃষ্টি করেছিল। মধুসূদনের কাব্যজীবন যে-পরিমাণে সার্থক ঠিক সেই পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিজীবন ব্যর্থ। ব্যক্তি-জীবন বলতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কেন্দ্রিক পারিবারিক জীবনকেও বোঝাচ্ছে। এই ব্যর্থতার কারণ মধুসূদনের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাঁর সংসারিক বুদ্ধি অকিঞ্চিৎকর ছিল। তিনি সর্বদা স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতেন। প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তিনি

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত

শশিনাথ

নাট্যরূপ : অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(শশিনাথের পড়িবার ঘর। অধ্যয়নরত শশিনাথ। ক্ষণকাল পরে পরদা সরাইয়া উর্মিলার প্রবেশ)

শশী। (মুখ তুলিয়া) কি মনে করে বৌদি ?

উর্মিলা। (হাসিমুখে) একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে। যদি সত্যি কথা বলো তো বলি।

শশী। কি কথা ?

ভাগলপুরের বাড়ীতে শশীনাথ রচনারত উপেন্দ্রনাথ

উর্মিলা। আগে বল সত্যি বলবে।

শশী। (ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া) যদি কোনও কথা না বলি, সে স্বতন্ত্র কথা : কিন্তু যদি বলি তো মিথ্যে বলবো না। অতএব তোমার প্রশ্ন কি বল।

উর্মিলা। লীলাকে তোমার পছন্দ হয় ?

শশী। (হাসিয়া) এই কথার জন্যে এত ভূমিকা করছিলে ? এ তো অতি সহজ কথা। আর এর সত্যি উত্তরই বা দেব না কেন ?

উর্মিলা। পছন্দ হয় ?

শশী। (সকৌতুকে) হয় :

উর্মিলা। তবে তাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি নেই ?

শশী। (সহাস্যে) এবার কঠিন প্রশ্ন করেছো বৌদি। জগতে যতগুলি পছন্দ-সই মেয়ে আছে, সবগুলিকেই দেখে আমার পছন্দ হবে। কিন্তু তাই বলে যদি প্রত্যেকটিকেই বিয়ে করতে আমার আপত্তি না থাকে সে তো বড় ভয়ানক কথা !

উর্মিলা। কিন্তু আমি তো ভয়ানক কথা জিজ্ঞাসা করিনি ভাই। আমি একটিরই কথা জিজ্ঞাসা করছি। তার সম্বন্ধে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো ?

শশী। ক্ষমা কর বৌদি, আমার কথায় যদি নিরাপত্তি-কর কোনও কথা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে তাহার ওপর আমার কিছুমাত্র দখল নেই। কারণ, তুমি যা বুঝতে চাইছ, আমি ঠিক তার উল্টোটাই বরাবর বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

উর্মিলা। (ম্লানমুখে) লীলা বাপ-মা-মরা, তার ওপর তোমাদের ঘাড়ে-পড়া তাই কি তোমার অমত ?

শশী। এ-কথা যদি ঠাট্টা করেও বলে থাক, তাহলেও ভাল করনি বৌদি। আমার ওপর কি তোমার সত্যিই এই ধারণা ?

উর্মিলা। তবে তোমার অমত কেন ?

শশী। অমত কেন, সেকথা শুনলে তুমি এখুনি ইংরেজী শিক্ষার কুফলের বিষয়ে লেকচার দিতে বসবে।

উপেন্দ্রনাথ

স্মরণে

●

কালের স্রোতে একটি বছর পার হয়ে গেল —উপেন্দ্রনাথ আজ পরলোকে। 'স্মৃতিকথা'র উপেন্দ্রনাথ অগণিত সাহিত্যরসিকদের স্মৃতি-লোকে গেছেন। বিগত দিনকে ঘিরে আমরা তাঁর সাহিত্য এবং সান্নিধ্যকে উপলব্ধি করি; আর আমাদের পাঠক-পাঠিকারা 'বিগত দিনের লেখকে'র সঙ্গকে অনুভব করে থাকেন উপেন্দ্রপ্রিয় গল্প-ভারতীর পাতায় পাতায়।

I

তাঁর অন্তর্ধানের দিবসটিকে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসায়, বেদনায় এবং স্মৃতি-চারণায় ধারণ করি। কবি উপেন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ, সবার উপরে মানুষ উপেন্দ্রনাথকে—আজ আমরা অন্তরের গভীরে স্মরণকরি। মৃত্যুঞ্জয়ী—উপেন্দ্রনাথ।

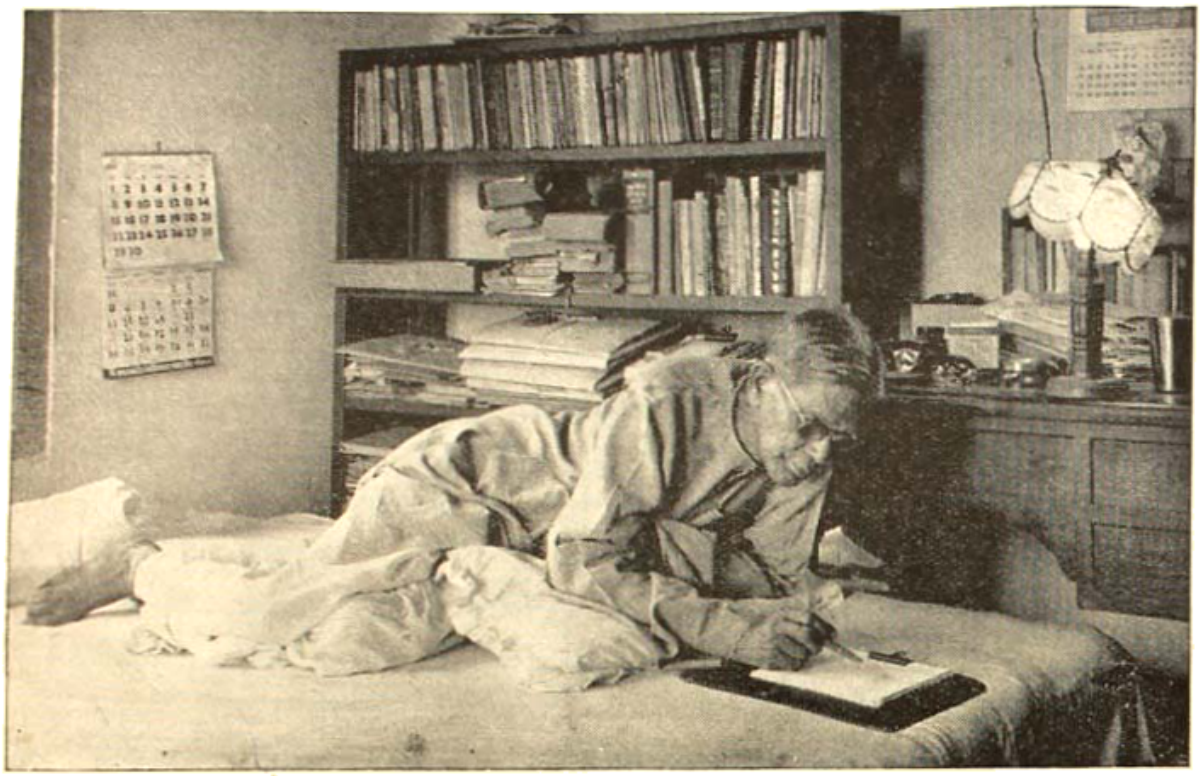

'প্রবাসী' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ 'মাটির পথ' উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত

উপেন্দ্রনাথের উনষষ্টিতম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব। সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও প্রধান অতিথি উপেন্দ্র-জায়া বিভাবতী দেবী।

শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু

শ্রীকালিদাস নাগ

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও ছাত্রীরা মিলে যখন নন্দলাল চিত্রাবলীর এল্‌বাম প্রকাশ করেন তখন তাঁর শিল্প নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম ; কিন্তু তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট ছেচগুলির সন্ধান না হলে তাঁর Style নিয়ে শেষ কথা বলা সম্ভব হবেনা। কলেজে পড়া ছেলে নন্দলাল যখন তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের সাকরেদী শুরু করেন তখন বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতা প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় Tagore School নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করছেন। (১৯০১—১৯০৮) নন্দলালের পটুয়া চিত্রখানি তখনই এমন মুগ্ধ করেছিল যে অবনীন্দ্র-বন্ধু Justice Woodroff তার সার্থক প্রতিলিপি প্রকাশ করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা Kokka-তে। সে প্রতিলিপি আমি দেখেছি।

ইতিমধ্যে Lady Herringham এলেন অজন্তা চিত্রাবলীর রূপি নিতে এবং নিবেদিতা তাঁর সেই কার্য্যোদ্ধারের জন্য শিল্পী নন্দলালকে পাঠালেন। সেই প্রথমবার শিল্প তপস্যা সেরে যখন তিনি ফিরলেন তখন যেন নতুন মানুষ। বুদ্ধ জাতক ও মূর্ত্তি তিনি ত অনেক এঁকেছেন এবার জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে (১৯০৭—১৭) বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ রেখায় ও রঙে জীবন্ত করে তুললেন।

এই সময় গুরুদেব ডাক দিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে কলাভবন গড়ে তোলবার জন্য। সেখানে তাঁর সতীর্থ অজিত চাটুজ্জের আগেই শিল্প চর্চ্চা শুরু করেন। সাঁওতালী গ্রামের ছেলে মেয়ে ও চালাঘরের নিপুণ চিত্র যেন পৌরাণিক যুগের রাজা রাণীদের পিছনে ফেলে স্বকীয় রেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভারতীয় শিল্পে গণতন্ত্রের যুগসন্ধিতে শঙ্খধ্বনি করলেন নন্দলাল বসু। তাঁর উপযুক্ত শিল্প মুকুল দে ও রমেন চক্রবর্ত্তী। ১৯১৫—১৭ থেকে ১৯২৪—২৫ পর্য্যন্ত নন্দলাল শুধু ভারতে নয় আমাদের বিশ্বভারতী নিধনের সার্থক শিল্পীরূপে দেশ-বিদেশের শিল্প-বিকাশ দেখে আধুনিক ভারতীয় শিল্পে এক নব জাগরণের সূচনা করলেন।

কালীঘাটের পট থেকে শুরু করে রাজস্থানী রীতি ও জয়পুরের ভিত্তিচিত্র (Mural's) তিনি আয়ত্ত করলেন। বোলপুরে চীনা-ভবনের দেওয়ালে তিনি আঁকলেন রাজস্থানী রীতি ও জয়পুরের ভিত্তি-চিত্র এই দুই বিরাট শিল্পধারার মিলন সাধন করে।

নন্দলালের উপযুক্ত পুত্র বিশ্বরূপ বসু—এখন কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে বসেছেন দেখে আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি। আশা করি তাঁর সাধনাও সার্থক হবে আর এক নূতন শিল্পশৈলী গঠন করে। বোলপুরের কলাভবন যেন বিশ্বভারতীর উপযুক্ত নব নব শিল্প ধারার প্রবাহ বইয়ে জনচিত্তকে উর্ব্বরা করে—এই আমাদের প্রার্থনা। সেদিন ৭ই পৌষের উৎসবে বন্ধু নন্দলাল বসুকে অভিনন্দন জানিয়ে এ সব কথা বলেছি। শিল্পের আদি গঙ্গা আমাদের এই বাংলা—এই বাংলার চিত্র-শিল্প কোন রূপলোকে ঝাঁপিয়ে পড়ে "অরূপ রতনের সন্ধান" দেয় তারই জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর
চিত্রাবলী

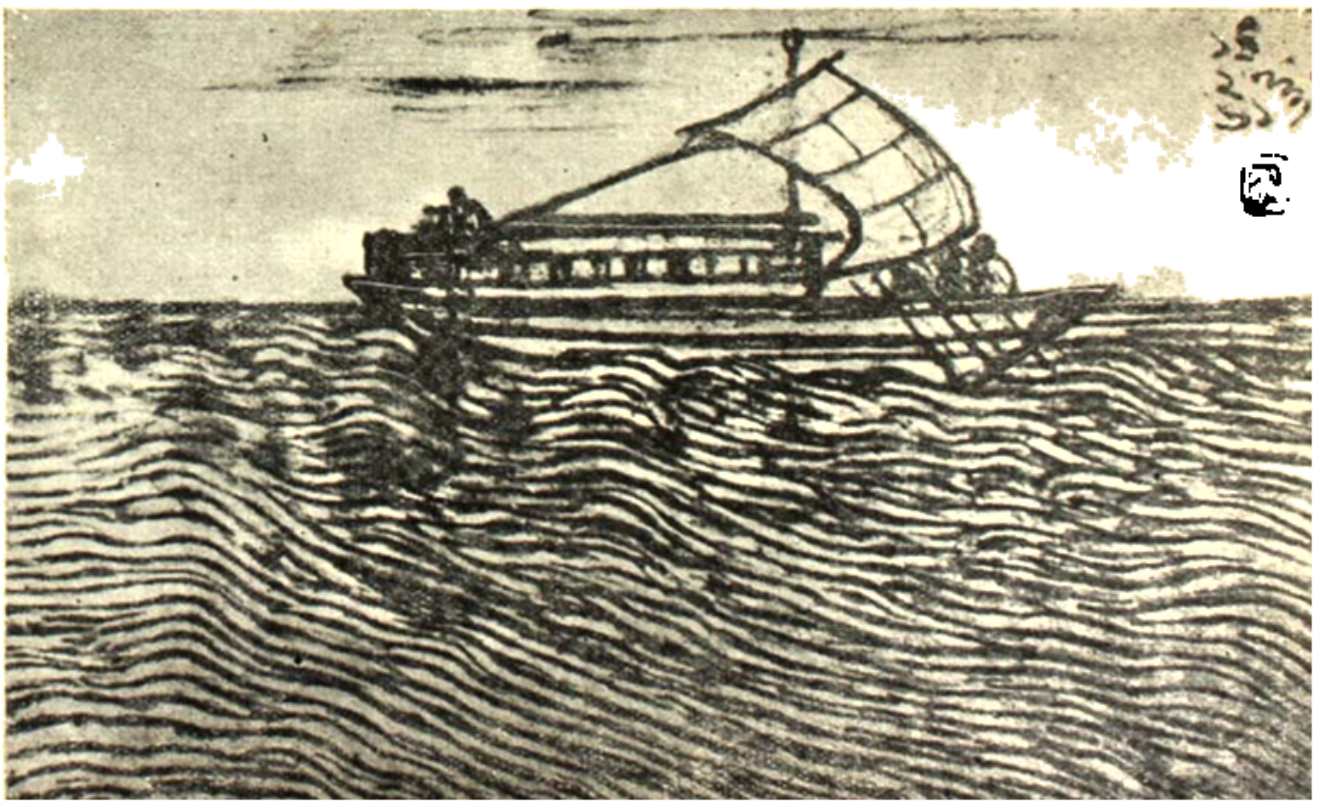

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত পুস্তক 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' হইতে গৃহীত

গল্প-ভারতীর "বাংলার চিত্র-শিল্প সংযোজন" সম্পর্কে আমাদের সহকারী সম্পাদক শ্রীকল্যাণ ঘোষ সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি ও তাঁর পুত্র শ্রীবিশ্বরূপ বসু—বিশ্বভারতীর কলাভবনের বর্তমান অধ্যক্ষ, উভয়েই এতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও শিল্পাচার্য গল্প-ভারতীতে প্রকাশের জন্যে তাঁর কয়েকখানি ছবি নির্বাচন করে একখানি ছবি সাগ্রহে এঁকেও দেন।

গল্প-ভারতীর প্রতি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর এই অনুরাগের জন্যে আমরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি তাঁকে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর চিত্রাবলী

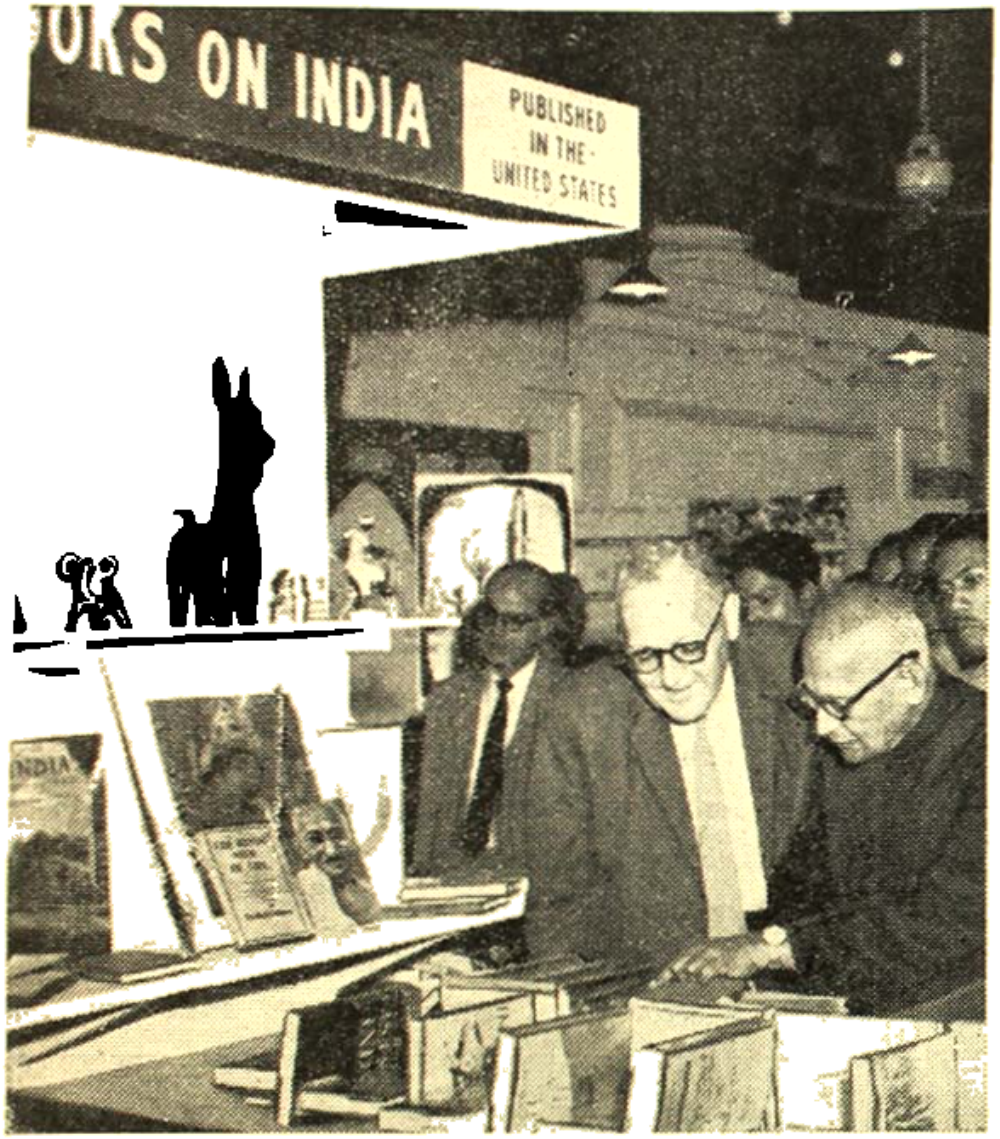

কলকাতায় আমেরিকান পুস্তক প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত আমেরিকান পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ডক্টর কালিদাস নাগ ও ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশান সার্ভিসের আর্থার সি ব্যাটলেটকে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়েই সম্প্রতি কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে 'আমেরিকান গ্রন্থের মেলা' নামে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। ৪ঠা থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন গল্প-ভারতী সম্পাদক ডক্টর কালিদাস নাগ।

প্রদর্শনীতে শিশুপাঠ্য বিষয় থেকে সুরু করে দুরূহ বিষয় পর্য্যন্ত প্রায় ৪ হাজার বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়েছিল। বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চ্চায় আমেরিকান জনসাধারণের সুতীব্র আগ্রহ আমেরিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে প্রদর্শণের ব্যবস্থা করা হয়।

বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকাদি ছাড়াও সাময়িক পত্রিকা, আমেরিকান রঙীন চিত্রের প্রতিলিপি, যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আলোকচিত্র প্রভৃতি ও এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়।

আমেরিকায় ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থাদি নামে বিশেষ একটি বিভাগে প্রায় দুইশত বই প্রদর্শিত হয়।

সবচেয়ে আকর্ষনীয় বিভাগ ছিল "আমেরিকায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।" এই বিভাগে আলোকচিত্র ও রেখাচিত্রের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে আমেরিকার শিল্পী ও ভাস্করদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তা সুন্দরভাবে বোঝানর চেষ্টা করা হয়েছে। এই সব বিষয় ছাড়াও আমেরিকার সাহিত্য, নাটক, লোক-সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সুন্দর ও মনোজ

স্বামীজী ও নেতাজী

চিকাগো ধর্মমহাসভা সমাপ্তির পর ভাবাবিষ্ট স্বামীজী

চিকাগো ধর্মমহাসভায় মঞ্চোপরি উপবিষ্ট স্বামী বিবেকানন্দ

ব্রহ্মদেশের সীমান্তে নেতাজী

ট্যাক্স কালেক্টর : এই নিন্! আজ আপনার ট্যাক্স দেওয়ার শেষ তারিখ।

চিত্রশিল্পী : কিন্তু মুদির দেনাটা যে আজ না দিলেই নয়।
—পঞ্চাশটা টাকা ধার দেবেন?

ডাক্তার—আমার অবস্থা দেখে হয়তো ভাবতে হবে

রোগী—কি ? আমার এপেণ্ডিসা !!

ডাক্তার—না, না, আপনার মস্তিষ্কের অবিমৃ°

"His Master's Voice"

"যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনা কর, এবং বৃথা সন্দেহ দুর্বলতা দাসসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর!"

যে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণ কর বলিয়া যে মহা সমন্বয়বার্তা বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন, তাহারই ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মধ্যেই আমরা দেখিলাম, ভারতের সাধনা, সর্বমানবের মুক্তিরই সাধনা; হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ্ব সন্দেহ ও অবিশ্বাস হইতে মুক্তির পথ নবযুগধর্মের আলোকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যখন আমরা আদর্শকে বিকৃত খণ্ডিত ও আংশিকরূপে গ্রহণ করিয়া, পরস্পরের সহিত নিষ্ফল বাদানুবাদে প্রবৃত্ত ছিলাম, যখন বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, যখন নষ্টবুদ্ধির দ্বারা বিকৃত ভ্রষ্টচরিত্রের দ্বারা কলুষিত হইয়া সমস্ত প্রচেষ্টাই বিপথগামী হইতেছিল, সেই সঙ্কটের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত ভেদবুদ্ধির মীমাংসা করিয়া, বিচিত্র ও বিশিষ্ট সাধনাগুলিকে এক সমন্বয়ের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান দিয়া আদর্শের সুনির্মল পরিপূর্ণরূপ স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিলেন। তাঁহার হিমগিরি-সদৃশ মহোচ্চ জীবনের শিখরমালা হইতে বিনিঃসৃত মহাভাব মন্দাকিনীর সহস্র ধারা, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দুর্গটির ঘট অন্তর পাতিয়া ধারণ করিয়াছিলেন। তারপর সেই প্রবাহকে তিনি জগৎ উৎপ্লাবী এক মহাভাবতরঙ্গরূপে দেশ-বিদেশে বহাইয়া দিয়াছেন। জগতের তথা ভারতের উপর দিয়া কত ধর্মের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন বিচিত্র বিশাল সর্বগ্রাসী সার্বভৌমিক রূপ কোন তরঙ্গই আমাদের দেখায় নাই, এমনভাবে সকল দেশের সকল জাতির আপামর সাধারণকে আহ্বান করা হয় নাই। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সত্যের এই যে বিশ্বজনীন রূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, ইহার উদার বিস্তৃতির মধ্যে আমরা মহাভারতবর্ষকে তাহার যুগ যুগ সঞ্চিত গৌরবের মহা দিয়া নূতন করিয়া অনুভব করিব—ইহাই নবযুগের সাধনা!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

স্বামিজী "ভারতীয় মহাপুরুষগণের" প্রসঙ্গ আলোচনায় ঠাকুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, • • একণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় বিরাজমান থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন—সকল সম্প্রদায় এক আত্মা এক ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতাভ্যন্তর এবং ভারত-বহির্ভূত দরিদ্র দুর্বল পতিত সকলের জন্য কাঁদিবে,

নবীনচন্দ্র ঃ কবি ও মানুষ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী একদিন এই বলিয়া গৌরব ও আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেন যে, 'মধুসূদন বাংলার মিল্টন, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্যার ওয়াল্টার স্কট, নবীনচন্দ্র বাংলার বায়রণ, কালীপ্রসন্ন বাংলার কার্লাইল ও রবীন্দ্রনাথ (মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্র-প্রতিভা বিগত শতকেই বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে কিরণ-সম্পাত করিয়াছিল) বাংলার শেলি। অবশ্য, এই প্রসঙ্গে আমাদের একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার প্রতিভাকে বায়রণের প্রতিভার সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশের মনস্বী লেখক-কুলকে পাশ্চাত্য দেশের স্মরণীয় লেখকদের সহিত তুলনা করার মূলে যে মানসিকতা ছিল উহাকে অবশ্য সম্পূর্ণ সুস্থ বলা চলেনা—এই প্রবৃত্তি মূলতঃ প্রতীচ্য সাহিত্যেরই গৌরব-ঘোষণার প্রবৃত্তি। আর এই প্রবৃত্তির বশেই বাঙালী লেখকদের রচনার যেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য, সেখানে আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই। তবু একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, 'অবকাশরঞ্জিনী', 'পলাশির যুদ্ধ' ও 'রঙ্গমতীর' কবি বায়রণ ও স্কটের ভাব-ধারার বহুলাংশে অনুপ্রাণিত হইলেও কাব্য-ত্রয়ীর কবি পশ্চিমের ভাবাদর্শের উপর যে নবীন মহাভারত রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন, উহার পরিকল্পনা কবির নিজস্ব। এই অভিনব পরিকল্পনার জন্য কবি মহর্ষি

ভারতী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বাঙলার সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অনুশীলনে ভারতী পত্রিকার বিশিষ্ট একটি স্থান আছে। বঙ্গদর্শনের ন্যায় ভারতী-পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল সাংস্কৃতিক আদর্শ নিয়ে। বঙ্গদর্শন এবং ভারতী—এ দুখানি পত্রিকার উদ্দেশ্যের মূলে ব্যবসাদারী প্রবৃত্তি ছিল না; এজন্য ভারতীর ইতিহাস বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ স্বরূপ যদি বলি, তাহলে অত্যুক্তিদোষ ঘটবে না।

ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগেকার কথা বলছি—তখন আমরা স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে, থার্ড ক্লাসে পড়ি—পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া আমাদের অবসর-বিনোদন বা মনোবিকাশের জন্য কোনো গ্রন্থ ছিল না। বাড়ীতে মাসে মাসে আসতো ভারতী পত্রিকা—সেই ভারতী পত্রিকায় পড়তুম রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতা গল্প উপন্যাস এবং বিচিত্র মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। সেইসব রচনা পড়ে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে হয় আমাদের পরিচয় সুরু। কাজেই ভারতী পত্রিকার দৌলতেই আমাদের অনেকের সাহিত্যসাধনা সুরু হয়—আমরা কজন সতীর্থ মুগ্ধ কবিতা ও গল্প লেখার প্রেরণা পেলুম।

কিন্তু এইটিই বড় কথা নয়। ভারতী আমাদের মনের রুদ্ধ কপাট খুলে স্বপ্নরাজ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটালো—ইতিহাস-বিজ্ঞানের বহু তথ্য আমরা জানতে পারলুম ভারতীর বিচিত্র রচনাবলী থেকে।

স্কুলের পাঠ্য ইতিহাস পড়ে সিরাজদ্দৌলাকে জেনেছিলুম নিষ্ঠুর কদাচারী মানুষ বলে—মীরকাশিমকে জেনেছিলুম—নবাবীর প্রত্যাশী বলে; কিন্তু এই ভারতী পত্রিকায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বহু নথিপত্র দলিলদস্তাবেজ থেকে সিরাজ এবং মীরকাশিমের সত্য পরিচয় ধরে দিয়েছিলেন দেশের সামনে। এই ভারতী পত্রিকাতেই ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখে-ছিলেন ত্রিপুরার ইতিহাস। সেই রচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন কিশোর বয়সে তাঁর রাজর্ষি উপন্যাস। পরে এই রাজর্ষিকে তিনি করেন 'বিসর্জন' নাটকে রূপান্তরিত। 'বিসর্জন' বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের শিরোভূষণ বললে অত্যুক্তি হবে না।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর

দেশে তখন তেমন পাঠক সৃষ্টি হয়নি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধ্য-সাধন সত্ত্বেও পাঠকের রুচি তেমন বলিষ্ঠ হয়ে গড়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্র নিরাশ হয়ে বঙ্গদর্শন বন্ধ করেছেন—প্রচার, নবজীবন, বান্ধব এই কখানি পত্রিকা কোনোমতে আত্মপ্রকাশ করছিল। এমন সময় ভারতীর আবির্ভাব।

কি কারণে আবির্ভাব—সে কাহিনী বেশ বিচিত্র। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতীর প্রথম আবির্ভাব।

কি করে আবির্ভাব হলো, সে সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—আমি তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর তেতলায় বাস করতুম। তেতলার ঘরের সংলগ্ন একটা প্রকাণ্ড ছাদ—ছাদে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টবে পোতা ঝাউ, নারিকেল প্রভৃতি উদ্যানজাতীয় খুব বড় বড় গাছ। গাছগুলো কোথাও বা কুঞ্জের মতো পুঞ্জীভূত করে, কোথাও বা সারি-সারি সাজিয়ে, কোথাও বা লতাবিতান তৈরী করে

ছাদটাকে এমনি উদ্যানে পরিণত করেছিলুম। আর কোকিল, শালিখা, দোয়েল, শ্যামা, টীয়রঙ্গ প্রভৃতি নানা-রকম গায়ক বিহঙ্গ আমার ছিল। তাদের কলকূজনে কুহুতানে বন্ধারে ছাদটা অষ্টপ্রহর মুখরিত থাকতো। আর নানাপ্রকার সুরভি ফুলের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হতো। ছাদটা ভারতী-সেবার পক্ষে কেমন অনুকূল, তা বেশ বুঝতেই পারছেন!···দোতলার যে ঘরটিতে আমি থাকি, সে ঘরটিতে একটি গোল টেবিল এবং তার চারিধারে গোলাকার চৌকি আর দেয়ালের গায়ে একটা সিয়ানো ছিল। রবি (বালক-কবি তখন বিশ্ব-কবি হননি) আমার নিত্যসঙ্গী; আর এক কবি আমার বাল্যবন্ধু অক্ষয় (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী বিখ্যাত কবি এবং এটর্ণি; তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণী হলেন 'শুভবিবাহ'-রচয়িতা) মধ্যে মধ্যে এসে জুটতেন। আমরা তিনজনে এই টেবিলের চারিধারে বসতুম—কত গালগল্প হতো, কত কবিতাপাঠ হতো, কত গান- বাজনা হতো, কত গান রচনা হতো, তার ঠিকানা নেই! পাখীর গানে ছাদটা যেমন মুখরিত হতো, এই দুই কবি-বিহঙ্গের গানে ও কবিতা-পাঠে বৈঠকখানাটাও তেমনি প্রতিধ্বনিত হতো।

কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

তিনি লিখেছেন,—একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালোচনা করছি, কি শুভক্ষণ আমার হঠাৎ আমার মনে হলো, এই দুই কবি-বিহঙ্গ কেবল আকাশে-আকাশেই ভেসে বেড়াবে, এদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে—লোকালয়ের কোনো কুঞ্জকুটীরে ওরা যদি আশ্রয় পায়—কিম্বা নীড় বাঁধতে পারে, তাহলে কত লোক ওদের স্বরসুধা পান করে কৃতার্থ হয়। এই কথা মনে হবা মাত্র দোতলায় নেমে গেলাম। দোতলার দক্ষিণদিককার বারান্দায় আর একটি প্রবীণ বিহঙ্গ-রাজের আসন ছিল (ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। তাঁর সুললিত অপূর্ব্ব স্বরলহরীতে আমাদের তিনি মাতিয়ে তুলেছিলেন। ···আমার প্রস্তাব শোনাবামাত্র তিনি রাজি হলেন আর তখনি দেবী 'ভারতী'কে আবাহন করে তাঁরই পুণ্যকুঞ্জে নবীন কবি-বিহঙ্গম-দের জন্য একটি নীড় বেঁধে দিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রিকার নামকরণ করলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ—ভারতী। কেন এ নাম, পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্যই বা কি, প্রথম সংখ্যা ভারতীতে ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ বেশ বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণী বলে স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলনই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাবলে বক্তব্য এই যে বিদ্যার দুই অঙ্গ—জ্ঞান অন্বেষণ এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বক্তব্য এই যে,—জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া

চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় বড়াল, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কবির সঙ্গে পাঠকসমাজের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ভারতী। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ভারতীর কুঞ্জ থেকে আত্ম প্রকাশ করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনার গুণে বহু নবীন লেখকের সৃষ্টি হয়েছে এবং আজ যে বহুপ্রতিভা-শালিনী লেখিকার রচনাসম্ভারে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, এর মূলে স্বর্ণকুমারীর প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ প্রেরণা—সে সম্বন্ধে ভুল নেই। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, এঁরা স্বর্ণকুমারী দেবীর হাতে নিজেদের প্রতিভা-বিকাশের অসাধারণ সহায়তা লাভ করেছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ নিলেন ভারতীর সম্পাদনাভার। তাঁর হাতে ভারতীর শ্রী যে-ভাবে ফুটেছিল, বাঙলার মাসিক সাহিত্যে তার তুলনা নেই। তাঁর হাতে ভারতীর আকার হলো ডবল-ক্রাউন সাইজে। তিনি এক বৎসর মাত্র ভারতীর সম্পাদনা করেন, তারপর সম্পাদনার ভার নিলেন স্বর্ণকুমারীদেবীর সুযোগ্য কন্যা সরলা দেবী। তখন মাসিকপত্র বাঙলা মাসের যে কোনো তারিখে প্রকাশিত হতো—সরলা দেবী প্রথমে ভারতীর প্রকাশ মাসের পয়লা তারিখে সুনির্দিষ্ট করলেন। তাঁর হাতে ভারতী বেরুতে লাগলো—ঘড়ির কাঁটার মতো প্রতি বাঙলা মাসের পয়লা তারিখে এবং তিনি ভারতীতে রাজনীতির আলোচনার প্রবর্তন করলেন। বলা বাহুল্য, তখন থেকেই মাসিক পত্রে দেশের কথার আলোচনা সুরু হলো।

সরলা দেবী ভারতীর সম্পাদনা করেন ১৩০৬ থেকে ১৩১৪ সাল পর্য্যন্ত। ভারতীর মারফৎ দেশে জাতীয়তাবোধ দেশাত্মবোধ এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ যেভাবে তিনি জাগিয়ে তুললেন, শুধু বাঙলার নয়, ভারতের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। সে ইতিহাস বলে ভারতীর প্রবন্ধ শেষ করবো।

দেশে তখন শাসক ইংরেজ-জাতের দম্ভ এবং স্পর্দ্ধা এমন তুঙ্গসীমাসীন যে অনেক ইংরেজ এদেশী মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না! তাদের নিগ্রহে সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণ দেশী মানুষ জনের প্রাণ এবং মান রীতিমত বিপর্য্যস্ত। ট্রেনে-ট্রামে, পথে-ঘাটে দেশী মানুষজনকে তারা অহেতুক পীড়ন করতো। গোরার বুট পদাঘাতে যত্রতত্র বহু নিরীহ দেশী মানুষের 'প্লীহা' বিদীর্ণ হচ্ছে এবং বিচারালয়ে গোরা-হাকিমের বিচারে আসামী-গোরা দু-দশ টাকা জরিমানা দিয়ে রেহাই পাচ্ছে। এ-ব্যাপার নিয়ে দেশী সংবাদপত্রে শুধু কান্নাকাটি চলেছে—তখন সরলা দেবী নারী হয়ে এ নিগ্রহের বিরুদ্ধে সতেজে বেহাদ ঘোষণা করলেন এই ভারতী মারফৎ।

১৯০১ সালের একটি ঘটনা; তখন খিদিরপুর ট্রাম লাইনে চলতো এঞ্জিন ট্রাম অর্থাৎ ছোট এঞ্জিনে আঁটা থাকতো দুখানি ট্রেলার—ফার্ষ্ট ক্লাস, থার্ড ক্লাসের বালাই ছিল না, সব এক ক্লাস! সেদিন অফিস টাইমে এ লাইনের এক ট্রামে দুখানি ট্রেলার যাত্রী ভরতি—ট্রাম ছাড়ে-ছাড়ে, এমন সময় ডকে কাজ করা এক 'কালো সাহেব' তার নাম অগাষ্টিন—এই ট্রামে উঠলো বসবার জায়গা নেই। 'সাহেব' দেখে কোনো 'নেটিভ' যাত্রী উঠে জায়গা দিলেনা—সাহেব তখন এক বেচারী কেরাণীবাবুকে টেনে তুলে তার আসন দখল করতে

বিশ্ব-বার্তা

বিশিষ্ট মার্কিন লোকনৃত্য শিল্পী রিকিহোলডেন

যৌবনের ধর্মই এই যে সে চায় চিত্তবিনোদনের খোরাক, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ,—যে প্রমোদের উপকরণের মধ্যে থাকবে সজীবতা, প্রাণচাঞ্চল্য।

লোকনৃত্য এই চিত্তবিনোদনের উপকরণ যোগায়। এর একটা সার্বজনীন আবেদন আছে। জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির সকল বাধা অতিক্রম করে এ সরাসরি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে।

এইরকম একজন লোকনৃত্যশিল্পী সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছেন ভারতে। ২৯শে মার্চ তিনি কলকাতায় আসছেন, আর ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত এখানে থাকবেন বলে স্থির হয়েছে। এঁর নাম রিকি হোলডেন। শ্রীহোলডেন আমেরিকায় লোকনৃত্যের একজন দিক্‌পাল।

আমেরিকার লোক নৃত্যশিল্পী রিকি হোলডেন

ইণ্টারন্যাশনাল রিক্রিয়েসন অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের শিক্ষা বিনিময় পরিকল্পনা অনুসারে শ্রীহোলডেন বর্তমানে এশিয়ার সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শ্রীহোলডেন একজন পেশাদার লোকনৃত্যশিল্পী ও স্কোয়ার ড্যান্সের ক্ষেত্রে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। শিল্পের এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই মার্কিন শিল্পীটির মত বিশ্বের এত বেশি অংশ পর্যটন করেছেন এরকম আর কাউকে দেখা যায় না।

শিল্প-সংস্কৃতির লোকনৃত্য শাখাটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা এর অন্যান্য শাখায় নেই। মঞ্চে লোকনৃত্যানুষ্ঠান চলবে আর প্রেক্ষাগৃহে বসে লোক তা দেখবে ও দেখে উপভোগ করবে, এরকম শিল্প লোকনৃত্য নয়। এইখানেই লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য যে আর পাঁচটা শিল্পের মত তা ঘরে বসে উপভোগ করবার জিনিষ নয়, দলবদ্ধভাবে এই নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিলে তবেই তা থেকে আনন্দ পাওয়া যায়, তবেই

তার রস উপভোগ করা যায়। লোকনৃত্য প্রদর্শনীর জিনিষ নয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের অংশ এতে অনেক কম। এতে সক্রিয় অংশ নিয়ে তা থেকে আনন্দরস গ্রহণ করতে হয়। এর আনন্দ দর্শকের চোখের আনন্দ নয়, এর আনন্দ নৃত্যে অংশগ্রহণকারীর হৃদয়ানুভূতির আনন্দ।

মার্কিন স্কোয়ার ড্যান্স বা চতুষ্কোণ নৃত্যটি লোকনৃত্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমেরিকানদের মধ্যে চতুষ্কোণ নৃত্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। চারটি যুগল এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি যুগল একটি কাল্পনিক চতুষ্কোণের এক একটি কোণে দণ্ডায়মান হয়। নৃত্য পরিচালনার জন্য একজন নেতা থাকেন। তাঁর নির্দেশমত শিল্পীরা বিভিন্ন ভঙ্গি ও বিচিত্র ছন্দে তালে তালে নাচতে থাকেন।

শ্রীহোলডেন ৮ মাসাধিককাল সফর করার জন্য ভারতে এসেছেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাঁর ভারত সফর শুরু হয়েছে, ২৯শে এপ্রিল শেষ হবে। লোকনৃত্যের দিক থেকে ভারত প্রকৃত সম্পদশালী। শ্রীহোলডেন তাই এই সম্পদের কিছুটা নিজের ভাণ্ডারে তুলতে চান।

১৯৫৮ সালে তিনি আর একবার ভারতে এসেছিলেন। সেবার এসেছিলেন মাদ্রাজে। স্বল্পকালের দর্শনে সেবার তিনি ভাল করে ভারতকে উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই এবার তিনি ভারতকে প্রকৃত জানতে চান, তার লোকনৃত্য থেকে কিছু শিখতে চান।

শ্রীহোলডেন লোকনৃত্য সম্পর্কে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

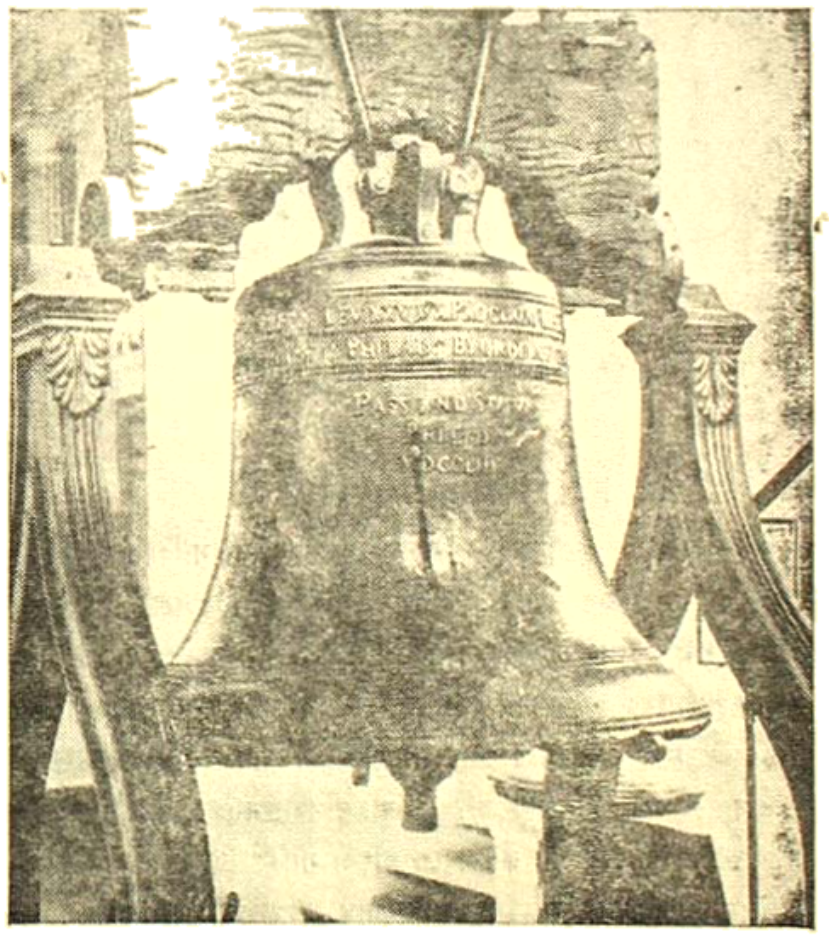

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতীক

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ইতিহাসের প্রতীক

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই ১২৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি জন মার্শালের মৃত্যুর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ইতিহাসের বিখ্যাত প্রতীক "স্বাধীনতার ঘণ্টায়" ফাটল দেখা যায়। এই ঐতিহাসিক ঘণ্টাটির গায়ে সব দেশের জনসাধারণের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করা এই কথা কয়েকটি উৎকীর্ণ করা আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার সময় ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই প্রথমবার

এই ঘণ্টা বাজান হয়। বৃটেন যখন ফিলাডেলফিয়া আক্রমণ করে তখন এই ঐতিহাসিক ঘণ্টাটিকে গোপনে সংরক্ষিত করা হয়। ১৭৫৮ সালে ফিলাডেলফিয়ার "স্বাধীনতা হলে" এই ঘণ্টাটিকে রাখা হয়।" ঘণ্টাটি এখনও পর্য্যন্ত সেইখানেই আছে।

নিউজপ্রিণ্ট মিলের পুকুর

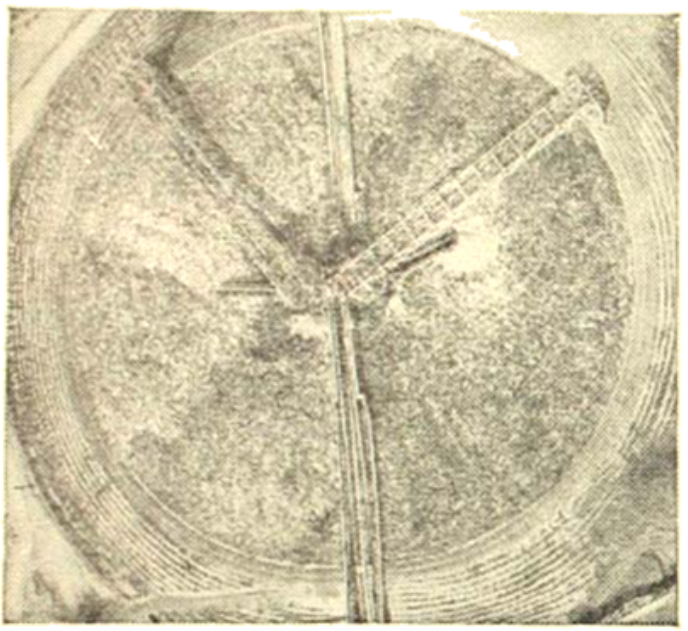

আমেরিকার টেনেসি রাজ্যের কেলহন সহরের বোওয়ার্টা সসাধারণ পেপার কর্পোরেশনের কংক্রীটের জলাধারে ২০ লক্ষের উপর কাঠ ভাসতে পারে। এই জলাধারে যে পরিমাণ জল আছে তাতে দশ হাজার টনের জাহাজ অনায়াসে ভাসতে পারে। আগুন, পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকেএই জলাধার কাঠকে রক্ষা করে। যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিউজপ্রিণ্ট ব্যবহার করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় বৎসরে ৮০ লক্ষ টন নিউজপ্রিণ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এগার হাজারেরও অধিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ৭৩টি বৈদেশিক ভাষার সংবাদপত্রসহ দৈনিক সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ৩০ লক্ষের উপর।

সোভিয়েট রাশিয়ায় বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন—

রুশ পণ্ডিত ও গবেষকরা বহুকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন করে আসছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রখ্যাতনামা রুশ পর্য্যটক হেরাসিম লেবেদেফ ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় যে সমস্ত বাংলা বই ছিল তার মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলীও ছিল। এই বইগুলি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগে এখন সযত্নে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাঁর রচনাবলী রাশিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। শুধু রুশ ভাষাতেই নয়। অন্যান্য রুশীয় ভাষায়ও রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ তখন অনূদিত হয়েছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের পর রুশ দেশে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন সুরু হয়। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সোভিয়েট পণ্ডিতদের অন্যতম লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম, আই, তুবিয়ানস্কি রবীন্দ্র সাহিত্যের সর্ব্বাধীণ আলোচনায় নিযুক্ত হন। অধ্যাপক তুবিয়ানস্কি রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতীয় ছন্দশাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল বলে রুশ সাহিত্যসেবীদের মধ্যে তিনিই প্রথম রবীন্দ্র-কাব্য অনুবাদের একটা নীতিগত পদ্ধতির প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে মূল ছন্দ ও কাঠামো বজায় রাখা সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়। তুবিয়ানস্কি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্"

চমক

মানুষ কি-না পারে!

তখন চলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বনঘটা—

১৯৫০ সালে প্রয়োজন হো'ল আফ্রিকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার নিয়ে যাবার, যাতে বিশেষ জরুরী খবরাখবর চলাচল করতে পারে।

ব্যাপার ত সহজ নয়। এ সেই আফ্রিকা, যার ভয়াবহ বিস্তৃত বনভূমি মরণের সিংহদ্বার। পাহাড়, নদী, হ্রদ, অরণ্য,—কোন্ আদিমযুগের ভীষণতা আর রহস্য বুকে নিয়ে আজও অনাবিষ্কৃত হয়ে পড়ে আছে। সেখানে দুর্দান্ত সিংহ, উন্মত্ত বন্য হস্তী, বিষধর সর্প, ভীষণতম গরিলা দুর্দ্ধার গণ্ডার,—সেই দুর্ভেদ্য

বনভূমিকে তাদের নির্মম হিংস্রতার লীলাক্ষেত্র করে তুলেছে। আর আছে নদীহ্রদে রক্তলোলুপ কুম্ভীরের দল, যারা জলরাজ্যে করেছে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন। সেখানে অন্ধকার অরণ্যে বাস করে নরখাদক বর্ব্বর আদিম মানুষ। মানুষের কাঁচা রক্তমাংসই যাদের প্রধান খাদ্য।

সামনে পড়বে দুস্তর মরুভূমি, নিবিড় অরণ্য, বেগবতী নদী,—পার হয়ে যেতে হবে মানুষকে টেলিগ্রাফের তার খাটিয়ে তারই ওপর দিয়ে জীবনকে তুচ্ছ করে। কারা এ কাজের ভার নেবে? কারা তুলে ধরবে মানব-সভ্যতার জয়কেতন? কারা যাত্রা করবে দুর্গম মৃত্যুসঙ্কুল অজানা অন্ধকারপথে।

এ কাজে সহায়তা করতে এগিয়ে এল ইউনিয়ন অব্ সাউথ্ আফ্রিকা, সাদার্ণ ও নদার্ণ রোডেসিয়া, আর অন্যান্য সভ্যদেশ যারা আফ্রিকাকে নূতনযুগের আলোকে আনতে চায়।

বাড়ী ভাড়া নিতে এসেছেন? আসুন।

.....আমি কিন্তু এখনও ছাড়িনি।

আর একটা কথা.....

এবাড়ীতে বড্ড ভূতের ভয়!

নিজের মর্জিতে যখন চলি···

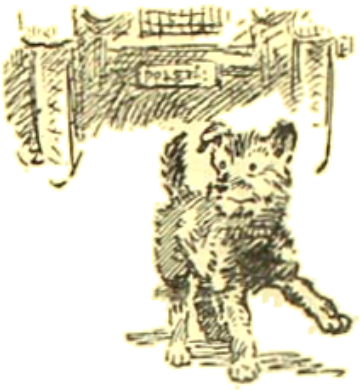

একলা রাস্তা পার হতেও খুব পারি···

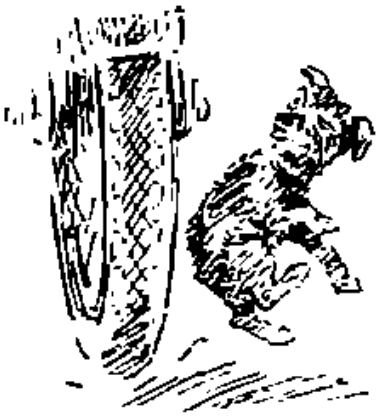

সামনে গাড়ী এলেও ভয় করি না

কিন্তু যখন···

তখন অবস্থা হয় সঙ্গীন···

চরমেও ওঠে···

এবারে নৈতিক প্রাণটা···

বুঝি যায়।

তবুও আমি রাস্তা পার হচ্ছি বলে

চিত্রশিল্পী রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র জগতের প্রতিভাবান শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিবার ও তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, ও নিরহঙ্কার স্বভাব সত্যই অনুকরণীয়। বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত কৃতী চিত্রশিল্পী অথবা কবি হওয়া যায় না। আবার এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট অনুশীলন প্রতিভার বিকাশ ও বহুল প্রচার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করে—আর্থিক সঙ্গতি, সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু রামাপদ বাবুর ক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের সন্তান তিনি, না ছিল তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা, না পাইয়াছিলেন সরকারী সাহায্য। এরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র ঐকান্তিক অধ্যবসায়, অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও মনের একাগ্রতার দ্বারা তিনি চিত্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

অভিজাত সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোকের সহিত অবাধে মেলামেশা করিবার ও স্বভাবজাত সারল্যের দ্বারা তাঁহাদের মন জয় করিবার ক্ষমতা শিল্পী রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লাভ করিয়াছিলেন। মজলিসী ব্যক্তি হিসাবেও খ্যাতি ছিল তাঁহার যথেষ্ট। এমন কি, অমৃতলাল বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, জলধর সেন প্রমুখ স্বনামধন্য মনীষীগণ প্রায়ই তাঁহার বৈঠকখানায় মিলিত হইতেন।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁহার রুচি ছিল স্বতন্ত্র। ৪৯ ইঞ্চি বহরের ধুতি, লংক্লথের সার্ট ও সাদা মার্কিন জীনের লম্বা গলাবন্ধ কোট, এই ছিল তাঁহার সাধারণ পরিচ্ছদ; আর রাজদরবার অথবা বিশেষ কোন সভাসমিতি অথবা লাটসাহেব প্রমুখ ইংরাজদিগের দরবারে যাইতে হইলে শালের পাগড়ী ও চোগা চাপকান ব্যবহার করিতেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, ছাতা তিনি সকল সময়েই ব্যবহার করিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'দেখ, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পারসী সমস্ত জাতিরই মাথা বাঁচাবার একটা শিরস্ত্রাণ আছে; বাঙ্গালীর কিন্তু কিছুই নেই, তাই এই ছাতা দিয়ে মাথাটা রাখি আর কি।'

স্বনামধন্য বিশ্বাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে রামাপদ বাবুর যাতায়াত ছিল।

শিল্পী রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

॥ চিত্রাবলী ॥

শান্তনু ও গঙ্গা

শিল্পী—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সীতা বদোন্মুখ রাবণকে মন্দোদরীর সান্ত্বনা

শিল্পী—রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

Calcutta, 29 July 1890

Babu Bamapada Banerjea has painted a portrait of me which is well executed. My friends who have seen it consider it a very good piece of work, and I am also very well satisfied with it.

Iswarchandra Sharma

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিযান

চিত্রে রাণী এলিজাবেথ

ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং
ডিউক অফ্ এডিনবর্গ।

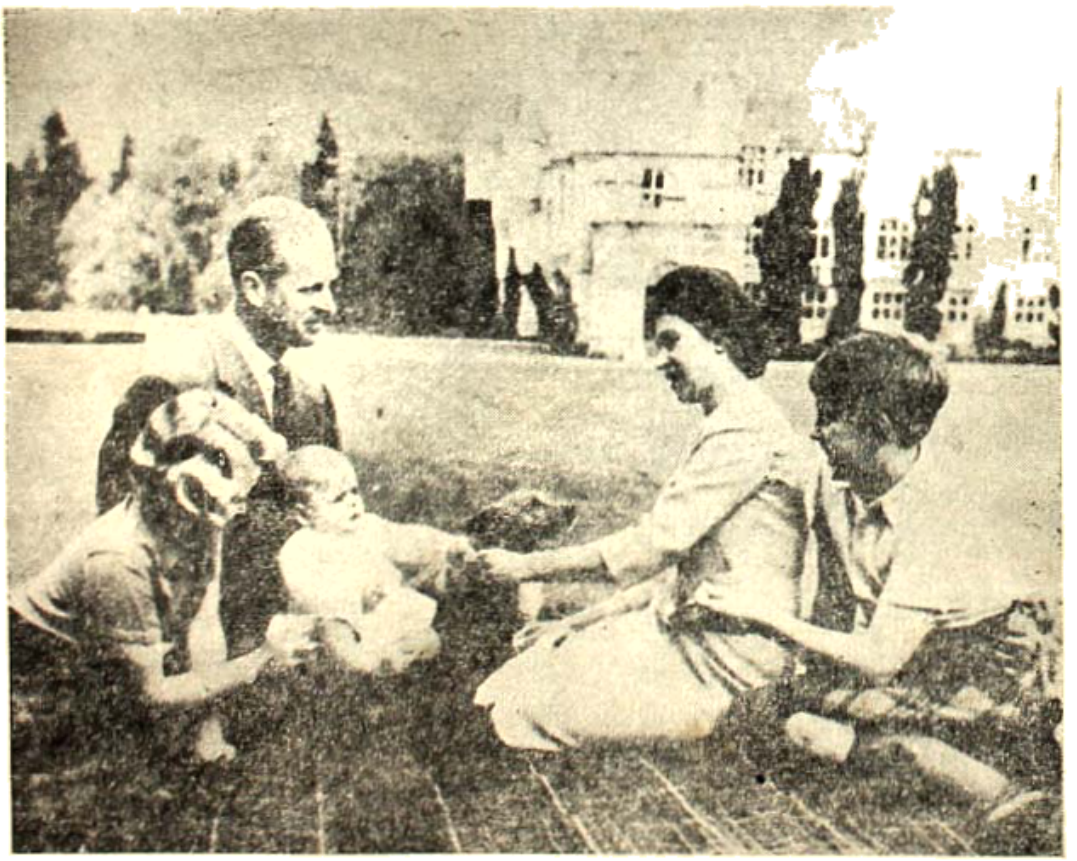

বালমোরাল ক্যাসেলে
পুত্র-কন্যাসহ রাণী
এলিজাবেথ ও
ডিউক

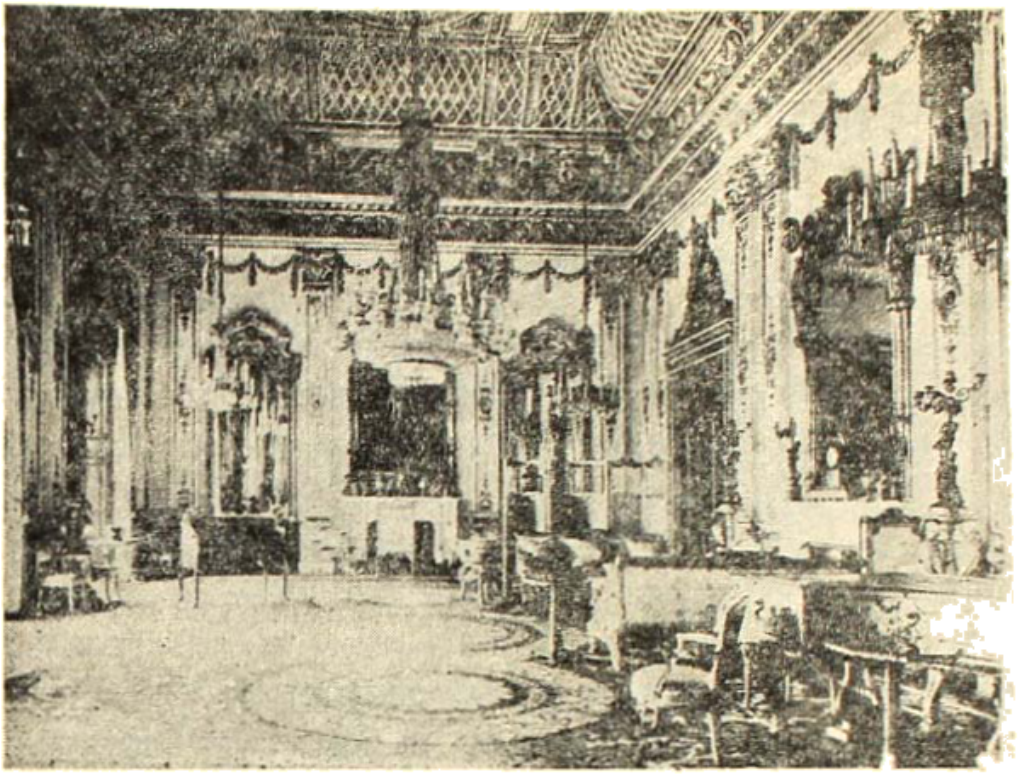

লণ্ডনের সুবিখ্যাত
বাকিংহাম
প্যালেসের ড্রইংরুম

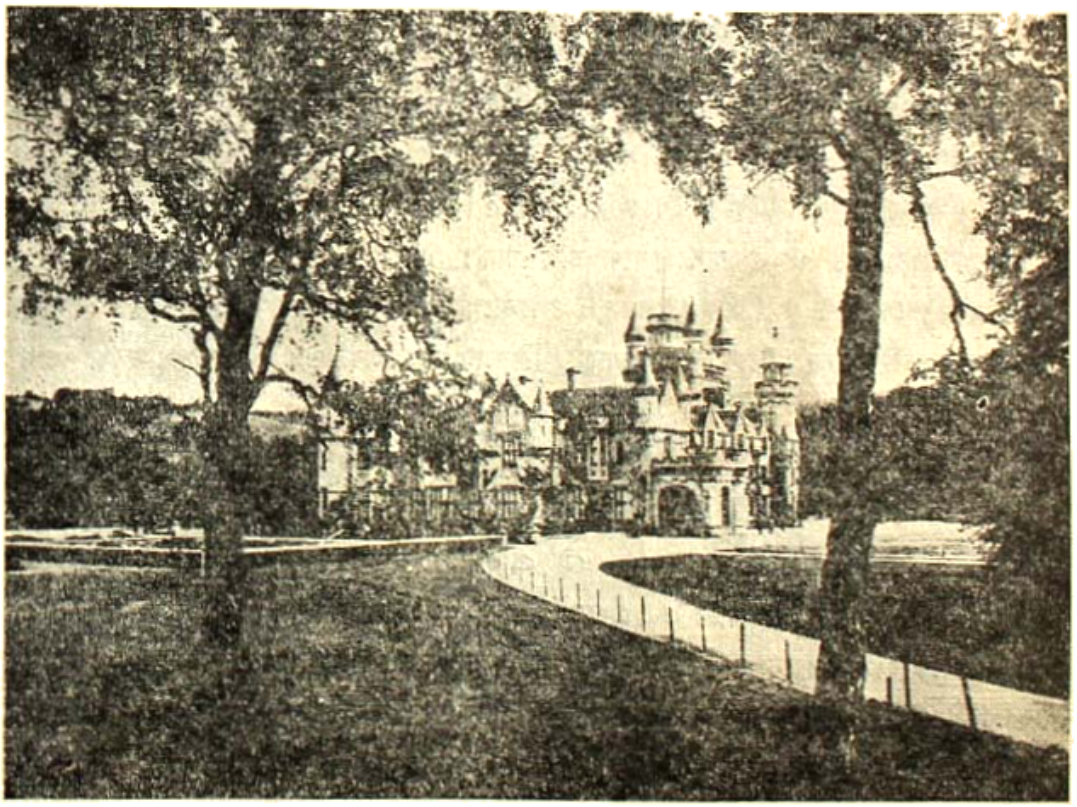

স্কটল্যাণ্ডে রাজ-
পরিবারের
অন্যতম বাসগৃহ
বালমোরাল
ক্যাসল্।

চিকিৎসায় ষাট বছর

আনন্দকিশোর মুনশী

গত ষাট বছরে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যে যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে, রোগ নিরোধ এবং রোগ থেকে আত্মরক্ষার যে সব অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার হয়েছে, এমন আর আগে কখনও দেখা যায়নি এই পৃথিবীতে।

এই পৃথিবীতে মানুষ যেদিন প্রথম রোগে কাবু হয় সেই দিন থেকেই চিকিৎসা বিদ্যার শুরু সেই প্রাগ ঐতিহাসিক যুগে। তারপর যুগের পর যুগ ধরে মানুষের পর মানুষ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের উপায় খুঁজে আসছে। সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে গত ষাট বছরে যে পরিমাণ সাফল্য দেখা গেছে তাতে আশা করা যায় যে সংক্রামক রোগে আর বুঝি মানুষ মরবে না।

সংক্রামক রোগ যে কীটাণু, জীবাণু কিংবা ভাইরাস ঘটিত তা নিয়ে আজ আর কারু মনে কোনো সংশয় নেই। দ্বিধা নেই। কিন্তু গত শতকের শেষের দিকে পর্যন্ত পণ্ডিতরা এ নিয়ে তর্ক করতেন। ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। কেউ কেউ আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এই সব বস্তুকে শুধুই চিলিবিলি বলে উড়িয়ে দিতেন।

জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তাই ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তরকে উনিশ শতকের শেষেরদিকে অনেক অপমান এবং অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে তখনকার দিনের চিকিৎসকদের কাছে। পাস্তরকে তখন

জীবাণুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা লুইপাস্তর

সার্জারীতে জীবাণুধ্বংসী রীতির প্রবর্তক লর্ডলিস্টার

কেউ বোঝেনি, শুধু ইংলণ্ডের লর্ড লিস্টার ছাড়া। তখনও লিস্টার লর্ড হননি। পাস্তরের জীবাণুতত্ত্ব সার্জারিতে প্রয়োগ করে লিস্টার সার্জারিতে জীবাণুধ্বংসী রীতি প্রয়োগ করে শল্যবিদ্যার যুগান্তর এনেছিলেন। পরে হয়েছিলেন লর্ড। ১৮৯৭ সালে।

পাস্তুরের পরে জার্মানীর রবার্ট কক এই জীবাণুতত্ত্ব চারটি শুত্র তুলে চিকিৎসাবিদ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলেন, যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করে। ১৮৮২ সালে।

এই শুত্রের প্রথমটি হল, যক্ষ্মা রোগীর দেহে এই জীবাণু থাকা চাই। দ্বিতীয়, এই জীবাণু রোগীর দেহ থেকে আলাদা করা চাই। তৃতীয়, সেই জীবাণু রোগীর দেহের বাইরে চাষ করে সন্ধান চাই। চতুর্থ, চাষ করে গজানো এই জীবাণু পশু দেহে সংক্রামিত করে এই রোগ ঘটিয়ে তার দেহ থেকে ঐ জীবাণু বার করা চাই।

যক্ষ্মা রোগীর থুতুতে এই জীবাণু থাকে। কাশির সঙ্গে এই জীবাণু বেরিয়ে এসে নিশ্বাসের সঙ্গে সুস্থ দেহে ঢোকে। এই তথ্য প্রমাণের জন্য কক একটা বদ্ধ বাক্সে খরগোশ এবং গিনিপিগ রাখানে রেখে নিজের ল্যাবোরেটরী থেকে সীসের পাইপ লাগিয়ে ল্যাবোরেটরীতে গজানো যক্ষ্মা জীবাণু রোজ আধ ঘণ্টা ধরে পাম্প করে ঐ বাক্সে ঢুকিয়েছেন। তিনদিন পাম্প করে দেখেছেন, দশদিনের দিন খরগোশের এই রোগ হয়েছে আর তিন সপ্তাহে গিনিপিগের।

এই রবার্ট কক একদিন আমাদের এই কলকাতা শহরে এসে কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন

কলেরা ও যক্ষ্মা জীবাণুর আবিষ্কারক রবার্টকক

রোগীর দেহে, তার নোংরা কাপড় চোপড়ে এবং পানীয় জলে। তখন ১৮৮৩ সাল।

তার আট বৎসর পরে ১৮৯১ সালে তিনি প্রমাণ করে দেখান যে পানীয় জল পরিস্রুত অর্থাৎ ফিলটার করলে কলেরা টাইফয়েড ইত্যাদি জলবাহী রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

সেই থেকে পৃথিবীর সর্ব দেশে পানীয় জল পরিস্রুত করবার রীতি চালু হল। জন স্বাস্থ্য এবং হাইজীনের নতুন যুগ শুরু হল।

ফরাসীর আর্মি ডাক্তার ল্যাভেরাঁ আফ্রিকার আলজিরিয়ার ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে ম্যালেরিয়ার পরজীবী কীটাণু (ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট) অবিষ্কার করেন১৮৮০ সালে। তখনওকেউ জানে না কি করে এই কীটাণু মানুষের দেহে ঢোকে এবং জ্বর ঘটায়। সরকারী কাজের ফাঁকে নিজের তাঁবু মাইক্রোসকোপ দিয়ে কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা করে এ রহস্য উদ্ঘাটন করেন, ভারতীয় আর্মি ডাক্তার রোনাল্ড রস, সেকেন্দ্রাবাদ মিলিটারী হাসপাতালে ১৮৯৭ সালে। তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করে দেখান যে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। তাই তিনি সুপারিশ করেন, ম্যালেরিয়া দূর করতে হলে মশা যাতে না জন্মায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তখনকার যুগ জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে শেখেনি। তাই তাঁর কথায় ভারত গভর্ণমেণ্ট তখন কোনো মূল্যই দেয়নি। কাজেই মনের দুঃখে রোনাল্ডস ভারত ছেড়ে চলে গেলেন, ১৮৯৮ সালের শেষে।

কিন্তু গত ষাট বছরে পৃথিবীর সব সভ্য দেশ জনস্বাস্থ্যের মর্ম বুঝেছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা থেকে এখন ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের ভারত গভর্ণমেণ্টও এই ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জন্য লাখ লাখ টাকা বরাদ্দ করছেন।

চিকিৎসা বিদ্যায় বিশ শতকের প্রথম দশকে সব চেয়ে বড় আবিষ্কার কেমোথেরাপি, অর্থাৎ

সে যুগে মানুষ তার
লাঙ্গল ও তাঁত,
তার তীর ও
ধনুক এবং
রথের ব্যবহার
করত তার
জীবনের বিকাশের
উদ্দেশ্যে; ঠিক তেমনি
আজকের দিনেও
আধুনিক যন্ত্রপাতিকে
মানুষের কল্যাণের জন্যই
নিয়োজিত করতে হবে।

কবিগুরুর 'নগর ও গ্রাম' ইংরেজী
প্রবন্ধের আংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ।
বিশ্বভারতী বুলেটিনের ১৯৪৭ সালের
১০৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড, দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড, বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড,
দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়্যাগন কোং লিঃ এবং দি হুগলি ডকিং অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত

"হবে হবে প্রভাত হবে
আঁধার যাবে কেটে,
তোমার বাণী সোনার ধারা
পড়বে আকাশ ফেটে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেন-ব্যালে ইন্‌ডাস্ট্রিজ অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, কলিকাতা, কর্তৃক প্রচারিত

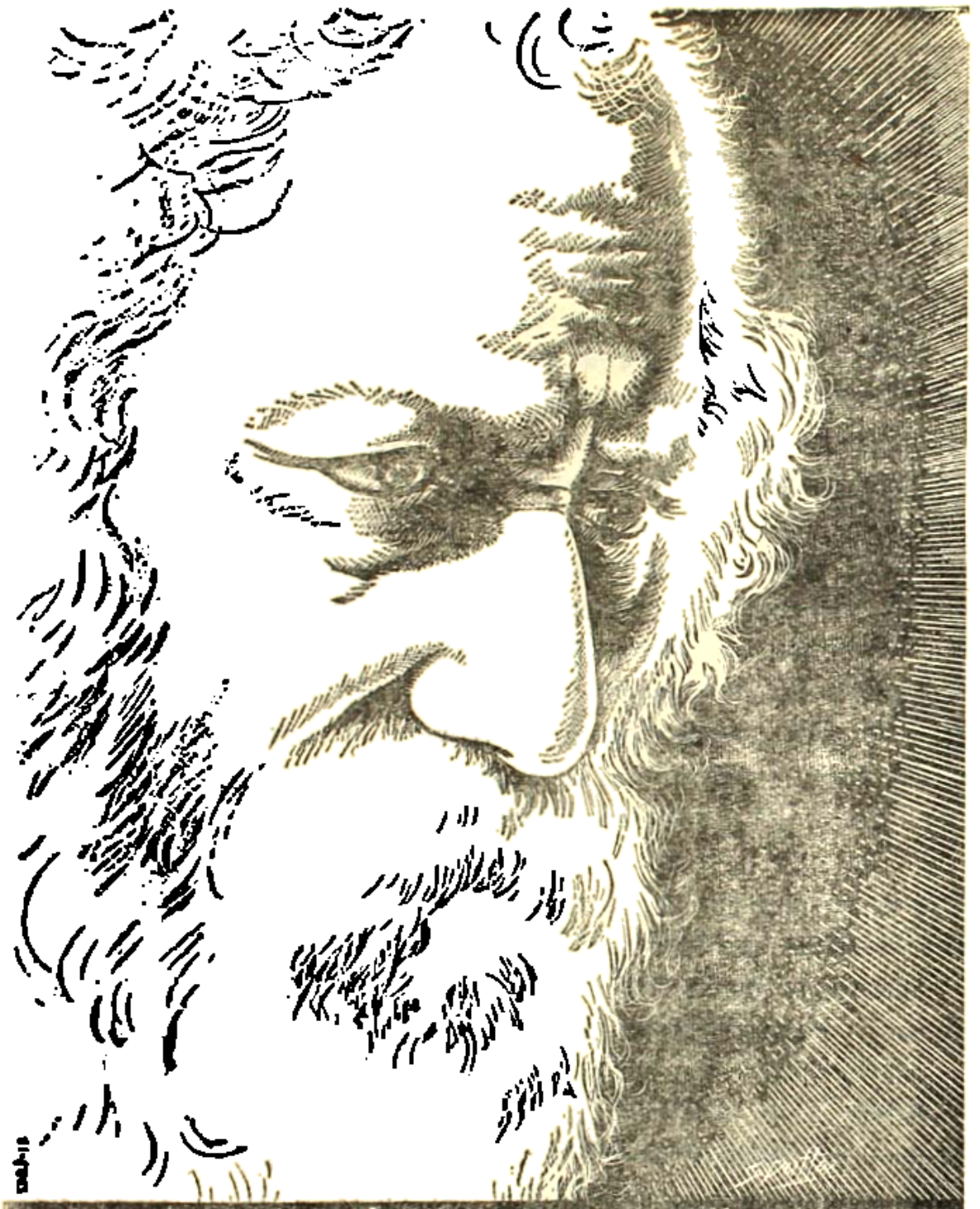

— বাঙলার গৌরব ~ বিশ্বের বিস্ময় —

Glomax

রাঙ্গাজবা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, কলিকাতা।

বা আবেশে তারই ফলে 'কোন্ জন্মে কবে যেন ছিল' যে, 'কোনো লোকে হয়তো হতে পারত' যা, তারই নানা আভাসে ইশারায় মোহিত এবং মুগ্ধ হতে হয়— অরূপের নিরূপণ হয়ে থাকলেও রূপান্তর সব সময় হয় নি—তা, না হোক, যেটুকু হয়েছে তারই ফলে মানবসত্তার দূর দূরান্তর সম্পর্কে আমাদের। বুদ্ধি উন্মীলিত এবং ধারণা প্রসারিত হয়েছে বিশ্বজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলের কোনো অন্ত ছিল না, চিত্ত এবং বুদ্ধি সর্বত্রই প্রবেশ করতে চেয়েছিল। সৃষ্টিপ্রতিভার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছুবেন ব'লে তাঁর পক্ষে চিত্রকলার কোন প্রয়োজনই ছিল না। অথচ জীবনশিল্পীর সে প্রয়োজন ছিল বৈকি। সবই জানতে হবে, সর্বত্র প্রবেশ করতে হবে। সেই সন্ধানে অথবা সাধনায় মনস্তত্ত্ববিদ্ একভাবে সচেষ্ট, যোগী আর এক ভাবে তপস্যারত, কবি বা শিল্পীর কার্যকলাপ ও পদ্ধতি আরও অভিনব। পরিণাম একই অথবা একমুখী বলা যায়, সে হল চিত্রশুদ্ধি, সে হল জড়ে জীবে ও চৈতন্যে জট পাকানো মানবসত্তা ও স্বভাবের গ্রন্থিমোচন ও মুক্তি, সাব্লিমেশন বা অতিক্রান্তি।

* এই প্রবন্ধ লেখকের গ্রন্থ গ্রন্থ 'রবীন্দ্রপ্রতিভা'র অন্যতম অধ্যায়।

কানাই সামন্ত

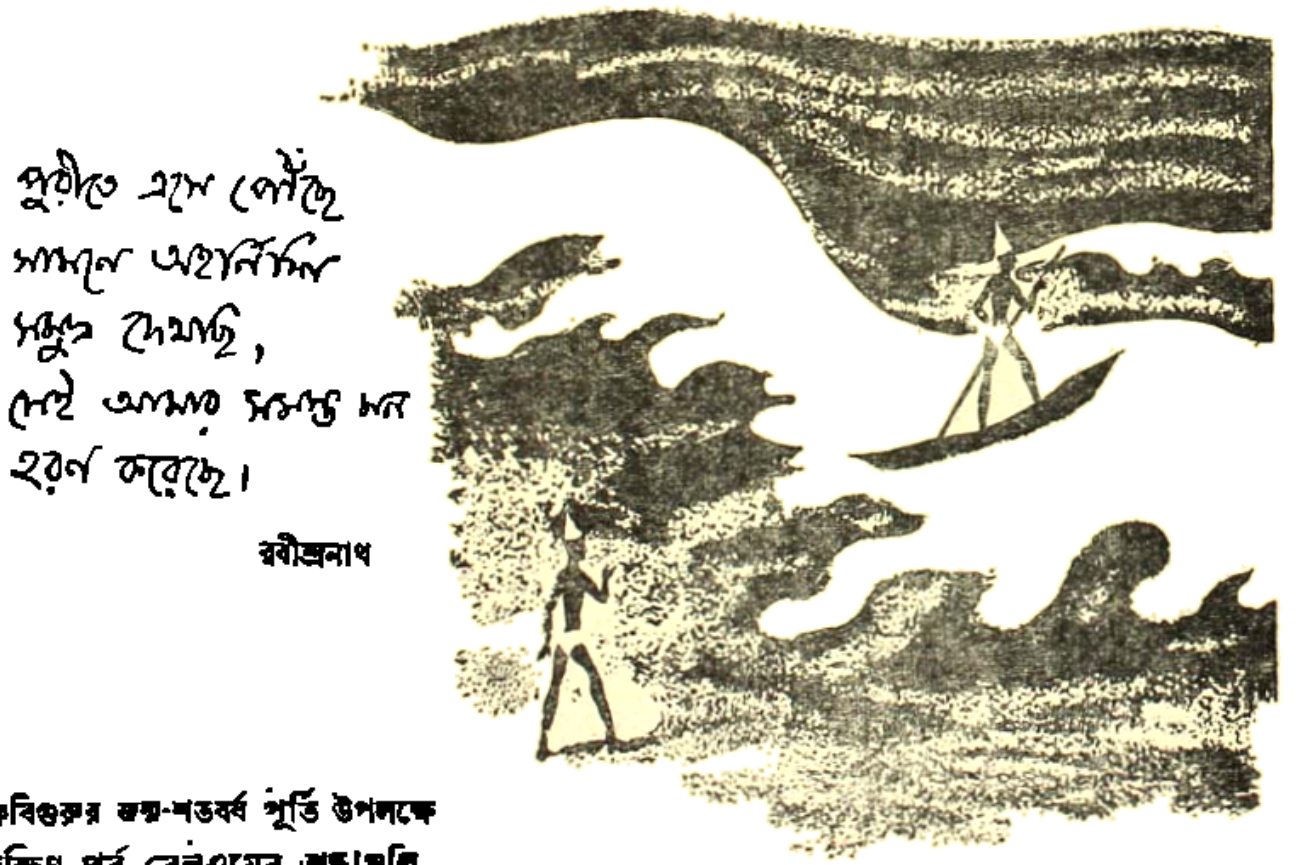

কবিগুরুর জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ADS/SER-RC-1

পাল্‌কি চলে

কোথাও যাযাবর বেদুইন দস্যুদল দিগন্তে বিলীন বিশাল মরু-প্রান্তরের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে···ক্ষুধিত অরণ্যে শিকারের অন্বেষণে বিচরণ করছে হিংস্র শ্বাপদ··· কাজল-কালো অথৈ জলে ভেসে চলেছে 'বহুরূপী নাও' —আবার কোথাও রয়েছে উর্মিমুখর বিস্তীর্ণ নীলাম্বু··· সুদূরের হাতছানি যখন কিশোর রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করে তুলত তখন তিনি ঠাকুমা'র আমলের একটা পুরনো পাল্‌কির ভিতরে চুপি চুপি ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বসে পড়তেন। তারপর চোখ দু'টি বুজে কল্পনা করতেন পাল্‌কিটা যেন বাদুড়ঝোলা ভরা একটা উড়ন্ত গালিচা, তাঁকে নিয়ে শূন্যপথে ভেসে চলেছে ডানায় ঘেরা অচেনা অজানা কোন রাজ্যে। দেশ-দেশান্তরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। উত্তরকালে কবিগুরু সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। 'জগতের আনন্দ-যজ্ঞে' নানা বৈচিত্র্য ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি দু'টি নয়ন মেলে অপরূপকে দেখেছেন—কৈশোরে একটা পাল্‌কির মধ্যে বসে দেখা স্বপ্ন 'সত্য' হয়ে উঠেছে।

আনন্দলোক

কর্তৃক প্রচারিত

'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত

DC-530 BEN

ফিল্টার টিপ
সিমলা সিগারেটে
তামাকের স্বাদ
পুরোপুরি পাবেন

সিমলার
ফিল্টার
স্নিগ্ধ
সিগারেটের
আসল
আমেজ
পাবেন...

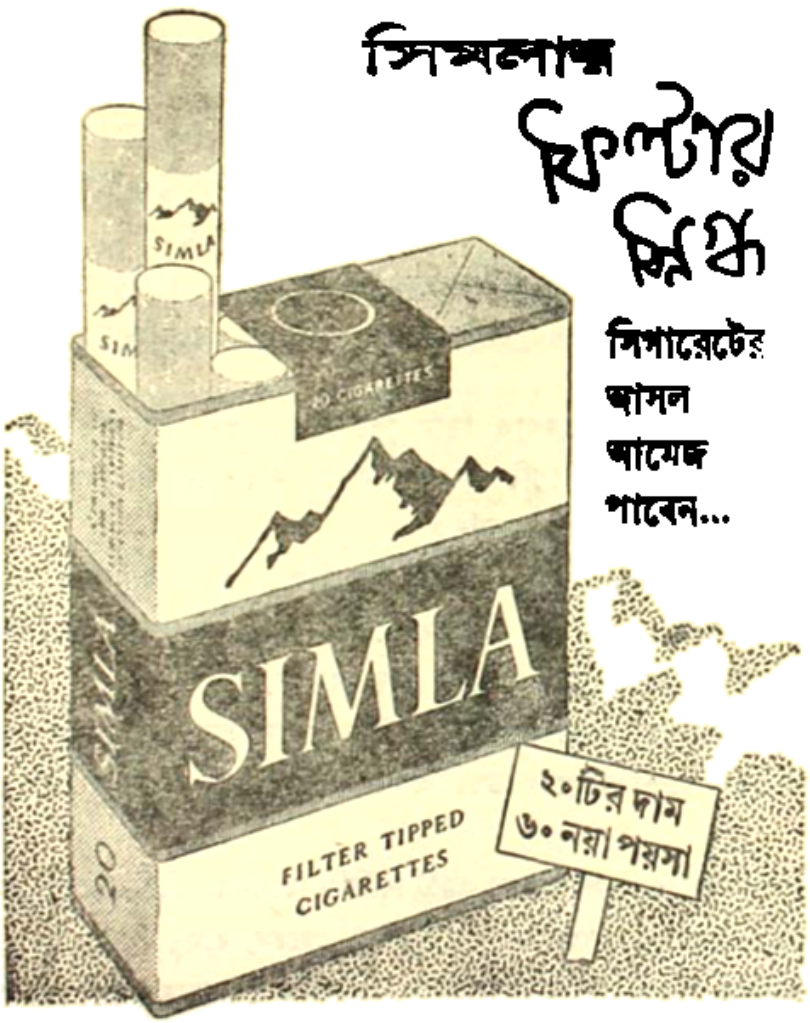

ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানির তৈরী

BC-7 BEN

অর্থ, জাতীয়তা আর আন্তর্জাতিকতার আদর্শের টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে আধুনিক ভারতীয় মনের অস্থিরতা এই চরিত্রটিতে চিত্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাস রচনার আগে ও পরে একাধিক প্রবন্ধে য়ুরোপীয় জাতীয়তার আদর্শের সমালোচনা করছিলেন। তাঁর মতে ভৌগোলিক গণ্ডীর দ্বারা চিহ্নিত ইউরোপের 'নেশান-স্টেট'গুলি পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস আর সন্দেহপরায়ণ হয়ে হিংসাকেই শুধু প্রশ্রয় দিচ্ছে। জাতিতে জাতিতে প্রীতি-প্রেমের বদলে দেখা দিয়েছে বিদ্বেষের মত্ততা আর যুদ্ধের মাতামাতি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ যে কত খাঁটী প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল। আর বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই আমরা দেখলাম উগ্র জাতীয়তার বিরুদ্ধে কবির মনোভাব ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর রূপে প্রতিকূল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ১৯১৭ সনে কবি জাপান সরকারের আমন্ত্রণে জাপানে যান। সেখানে তিনি পরের পর অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। সেই সকল বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য হল জাতীয়তা। 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব সম্পন্ন জাতীয়তাকে, বিশেষতঃ জাপানী জঙ্গীবাদকে, তিনি কঠোরভাবে আক্রমণ করেন এ সকল বক্তৃতায়। জাপান সরকার এতে কবির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু কবি তাঁর মনোভাবে অবিচলিত থাকেন। কবির এই সকল বক্তৃতা পরে 'Nationalism in Japan' এই নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। এ বইয়ে কবি জঙ্গী জাতীয়তার প্রতিকূলে এবং বিশ্বমৈত্রীর অনুকূলে তাঁর মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন।

কবির রচিত একাধিক কবিতার মধ্যেও আমরা তাঁর নূতন প্রত্যয়ের সুর শুনতে পাই। যেমন 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের "প্রবাসী" কবিতায়—

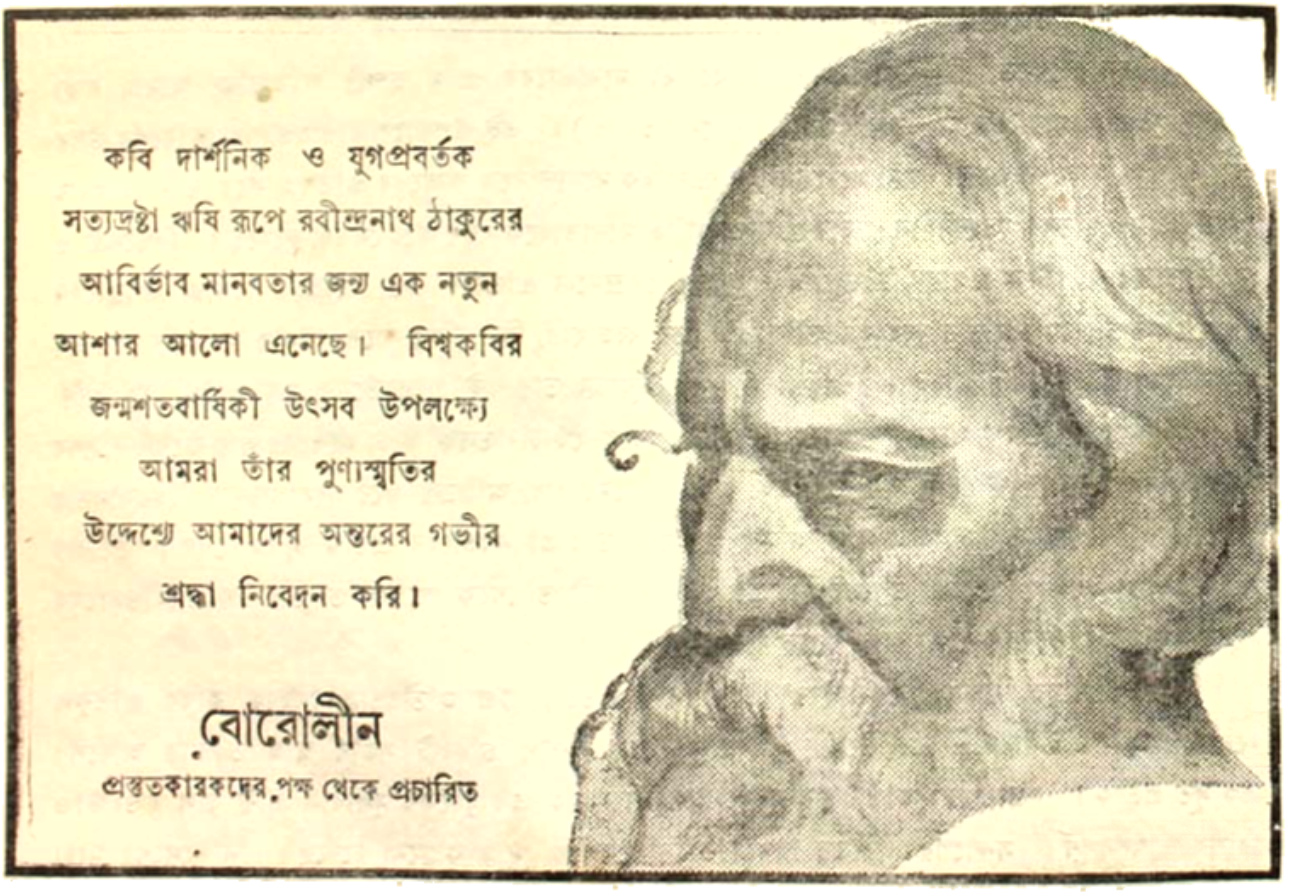

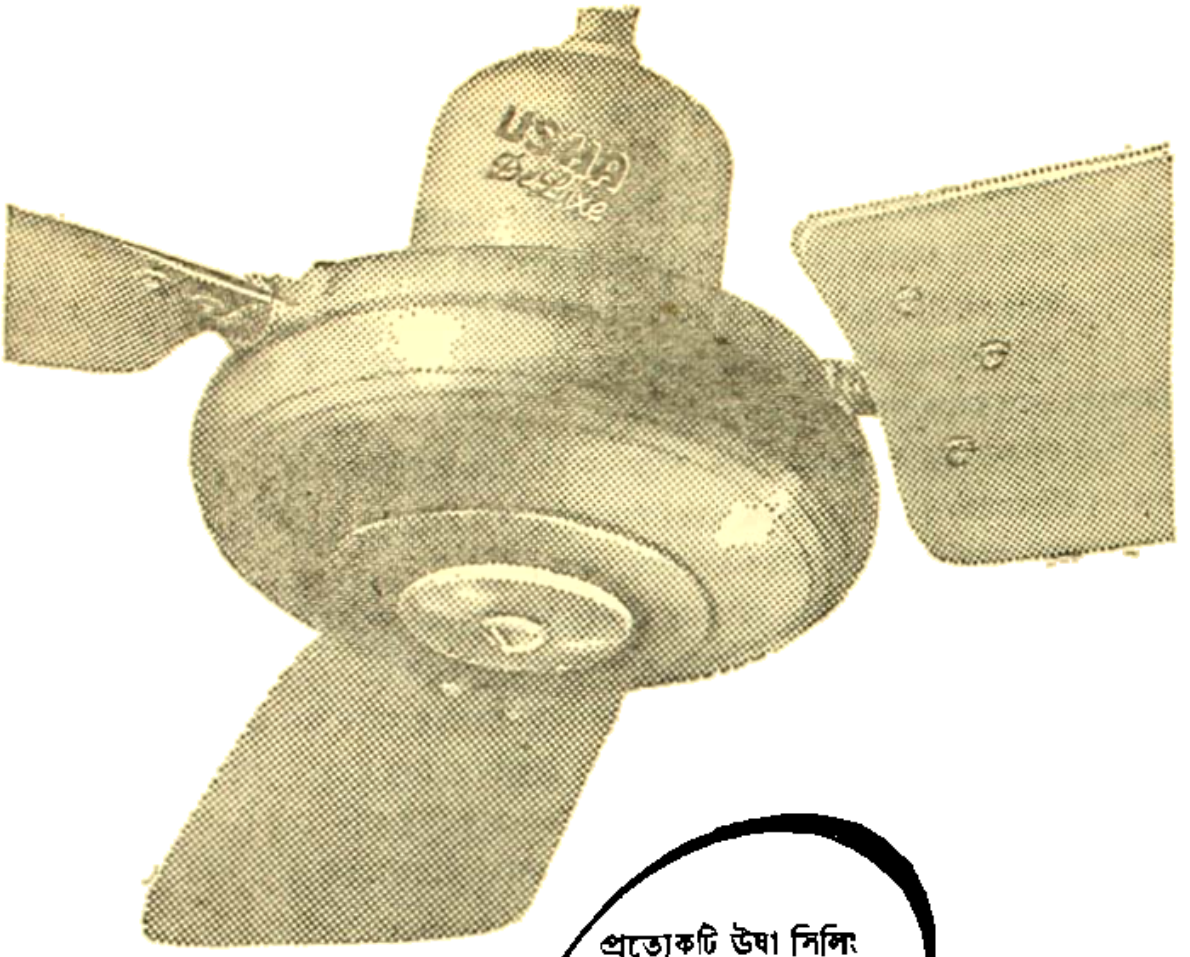

প্রত্যেকটি উষা সিলিং ফ্যান **ডবল বল-বেয়ারিং** যুক্ত সেইজন্য ইহা অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী

কার্য্যকারিতা
গুণ ও
সৌন্দর্য্য

সহজ কিস্তিতেও পাওয়া যায়

উষা সর্ব্বাধিক

বৈশিষ্ট্যের প্রতীক

বিক্রয় হয়

উষা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১

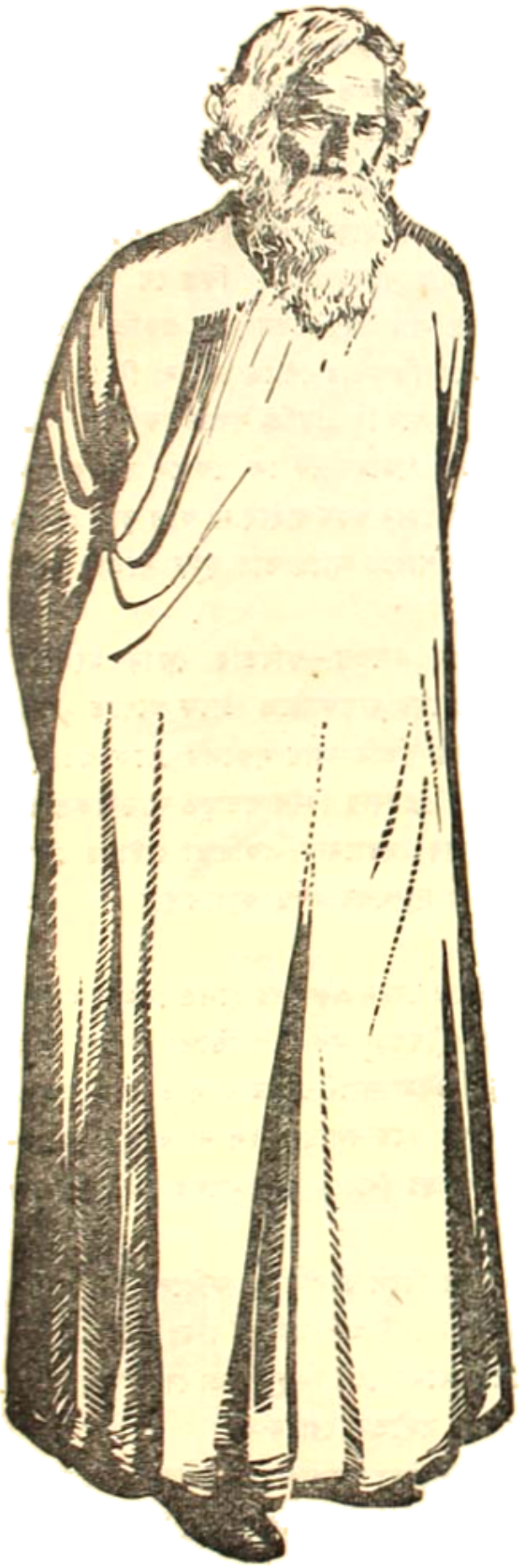

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গন তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্ত আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

রবীন্দ্রনাথ

সাহু জৈন ইণ্ডাস্ট্রীজ

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি—হাসি খুসীর মেলা

সুপ্রসিদ্ধ কোলে বিস্কুটএর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক
আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১০

অবিচার হইবে যদি আমরা আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য বা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কবির উক্তি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি। ইহাকেই বলে citing scripture for the purpose.

আমাদের আর একটি গুরুতর কর্ত্তব্য, রবীন্দ্রনাথের বাণীকে কথকতা, সংগীত প্রভৃতির 'মাধ্যমে' পল্লীবাংলার ঘরে-ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া। উনিশ শতকের বাংলায় যে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন বা রেনেশাঁস ঘটিয়াছিল, উহার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, উহা নগরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ষোড়শ শতকের ভাব-প্লাবনের মত উহা ব্যাপকতা লাভ করে নাই। ইহার কারণ, ইংরেজ-শাসনের ফলে বাংলায় এক নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙালী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল। ইংরেজ-শাসনে পল্লী বাংলার এই দুর্গতি রবীন্দ্রনাথের অন্তরে গভীর বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমাদের দেশে লোক-শিক্ষার যে বিপুল আয়োজন ছিল (কথকতা, কীর্ত্তন, যাত্রা, কবিগান প্রভৃতি), তাহার উৎসমুখ ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও লোকশিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে আমাদের সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু তাই নয়, লোক-সাহিত্যের পুনরুদ্ধারে ও আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি শুধু ভাববিলাসী কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মযোগী। 'শান্তিনিকেতন' ও 'শ্রীনিকেতন' কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। আমরা যদি সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের তথা অপরাপর মহাপুরুষের বাণীকে নিভৃত পল্লীর প্রতিটি গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে পারি, তবেই স্বর্গত রবীন্দ্রনাথের আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে এবং দিব্যধামবাসী কবির আশীর্বাদ আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইবে।

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন।

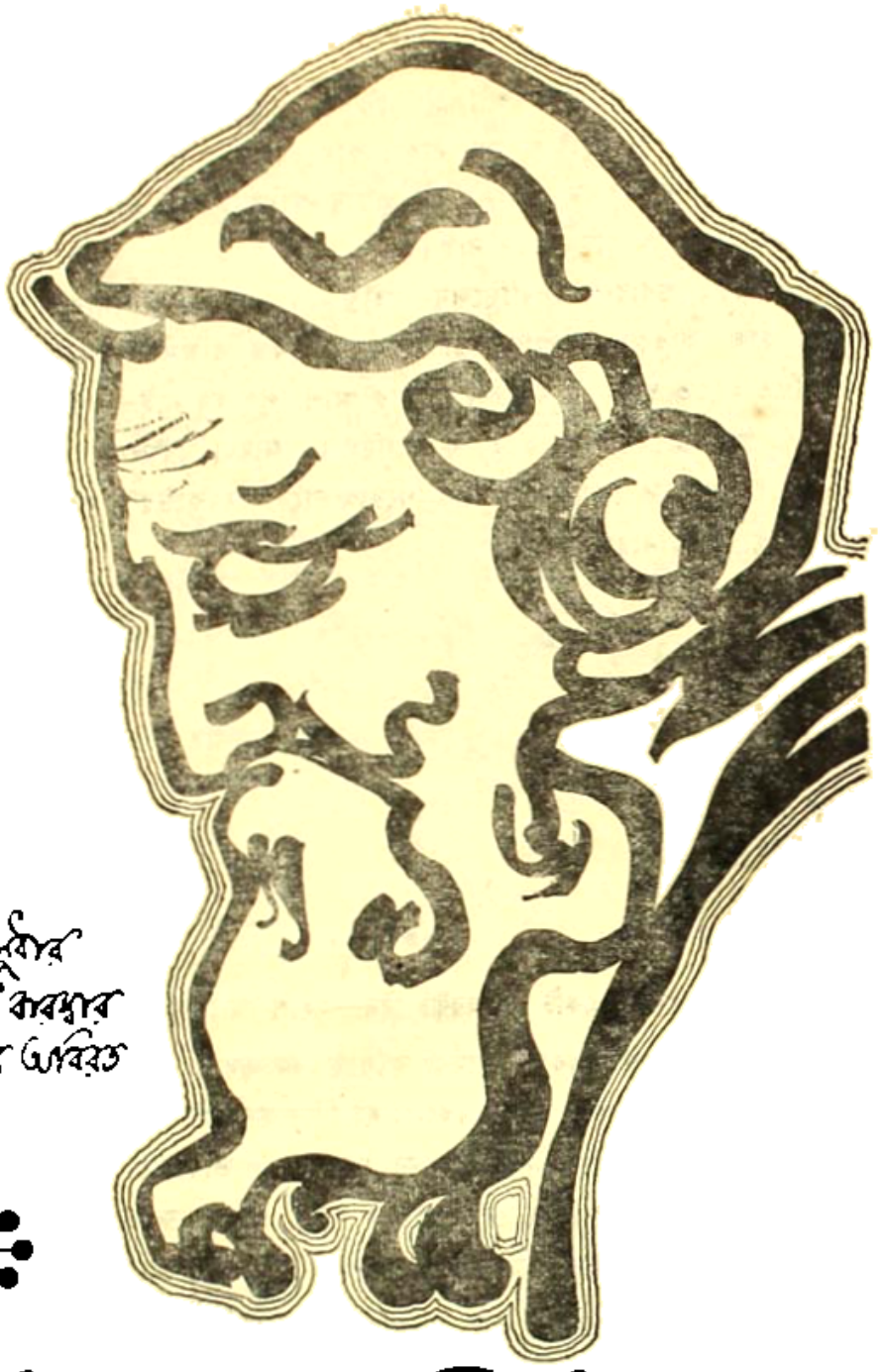

"..... এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়।"

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ১৩৬৮

৭৫৩

৩৩/৫

পূর্ব দিগন্তের সে রবিরশ্মি কবীর দিক্‌দিগন্ত আলো ও আনন্দে
উদ্ভাসিত করেছিল, চিরকালের কবীর সেই
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

GOODYEAR

BVTG 4963

মার্কা

বুলডগ

যন্ত্রপাতি

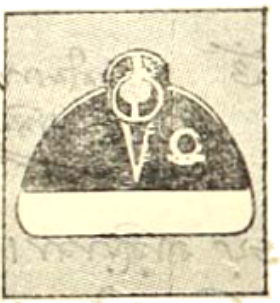

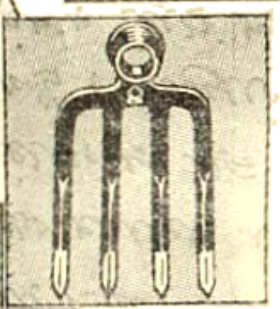

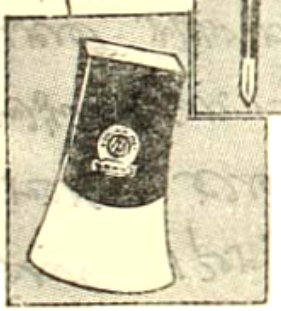

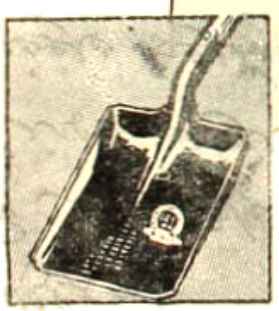

উৎকৃষ্ট ইস্পাত
হইতে প্রস্তুত
মজবুত নির্ভরযোগ্য।

সকল প্রধান প্রধান বিক্রেতার
নিকট পাওয়া যায়।

গোবিন্দ শীট মেটাল ওয়ার্কস্ এণ্ড ফাউণ্ড্রী

২১০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৩-২৮-৩৯

বাঙ্গলার বাউল

তোমায় নতুন করেই পাব ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ
ও মোর ভালবাসার ধন ॥
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন
ও মোর ভালবাসার ধন ॥

... ও মোর ভালবাসার ধন ॥
... ও মোর ভালবাসার ধন ॥

কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
• কলিকাতা - ১ •

"দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের,
অধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোনো বড় কাজের পত্তন
সম্ভব নয়, তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর সেই
কারণেই প্রাণের দায় দুঃসহ হ'য়ে ওঠে।
আমরা অনেক সময় দোষ দেই বাহ্য কারণকে — কিন্তু
রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস
ক'রে গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের ফাটল দিয়ে
পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌঁছায়—"

—রবীন্দ্রনাথ

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

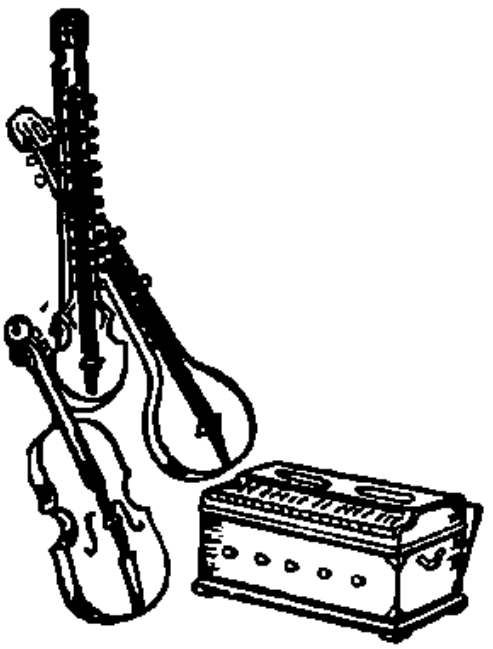

আমাদের বাদ্যযন্ত্রের সুরধ্বনি বিশ্বপূজ্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বচনের মত চিরদিন দেশবাসীর হৃদয়তন্ত্রে ধ্বনিত হউক।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

৮।২, এস্‌প্ল্যানেড্ ইষ্ট, কলিকাতা, ফোন : ২৩-২৯২৯

Poet's Father—Maharshi Debendranath Tagore

Poet's Mother—Sarada Devi

Poet in his boyhood
First Photograph
in Calcutta-1873

Rabindranath in
England at Eighteen.

Rabindranath and his wife Mrinalini Devi with their first born baby—Bela.

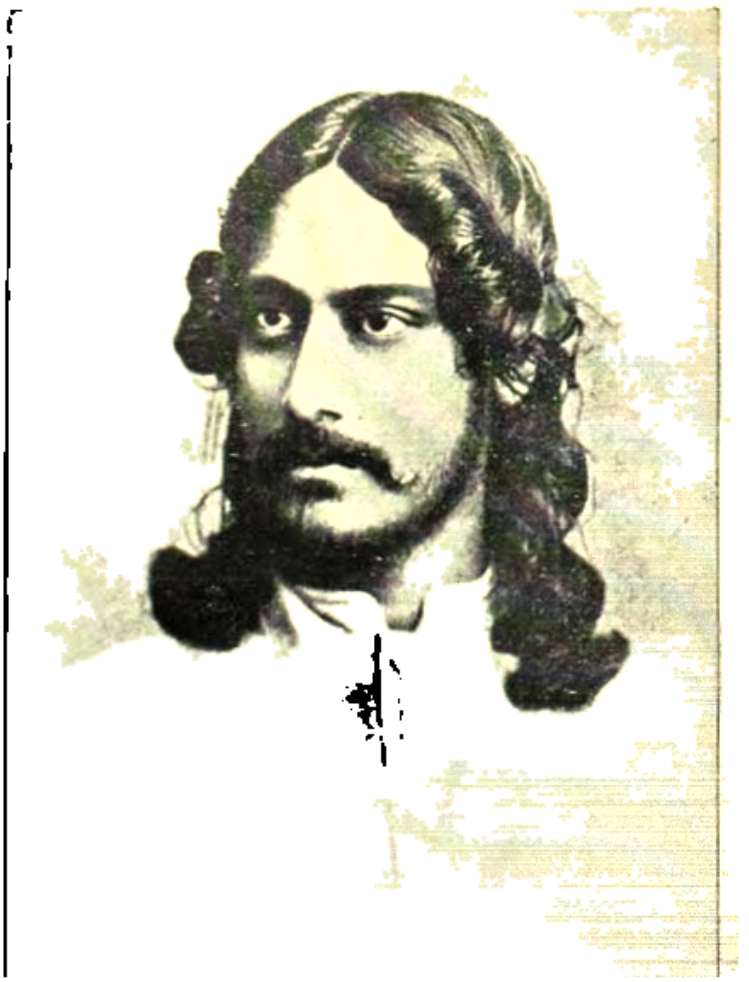

Tagore in 1896 when publishing the first collected edition

Tagore at 73
As President of Rammohan
Centenary-1933

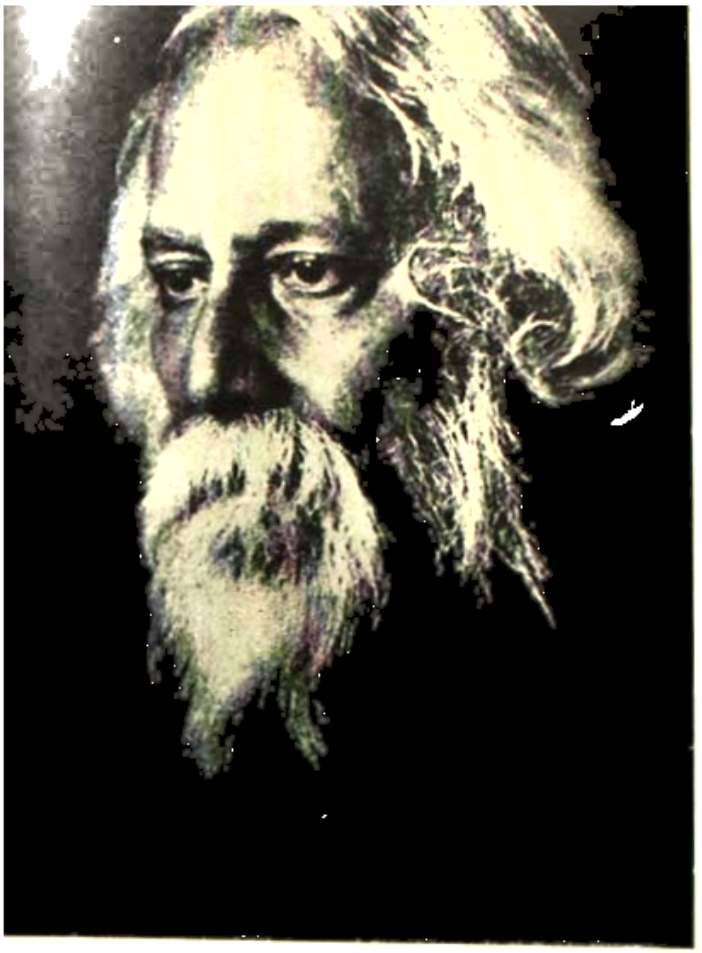

Tagore at 70

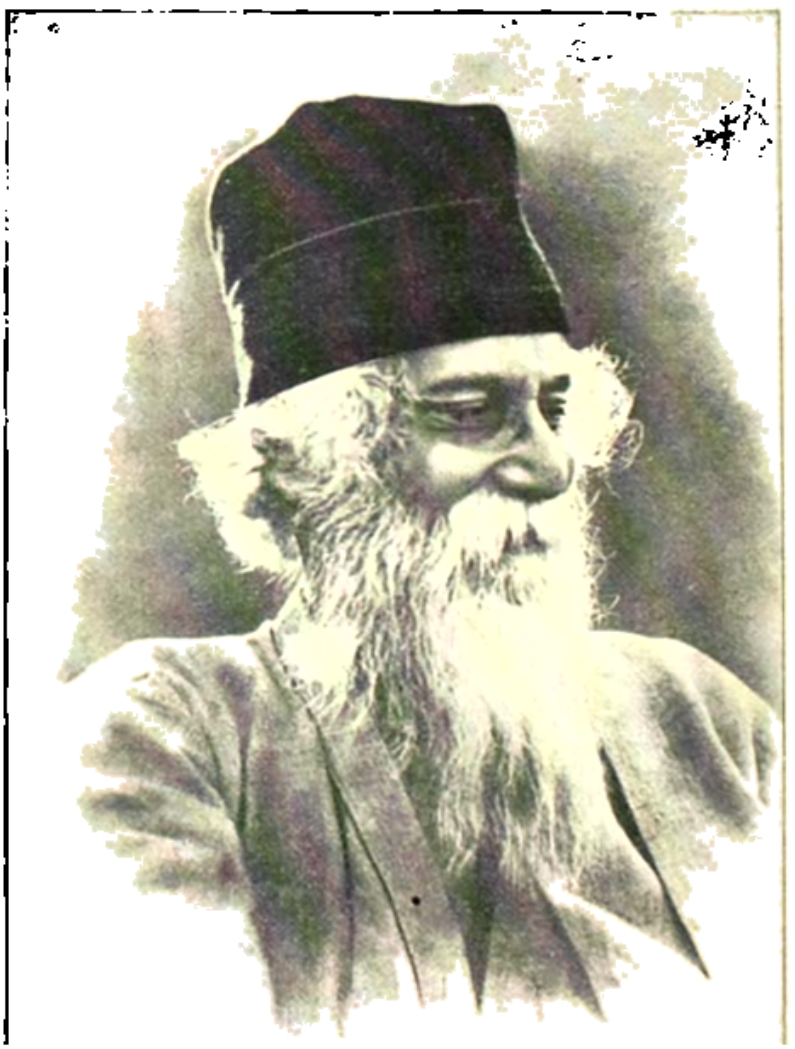

Tagore at 75

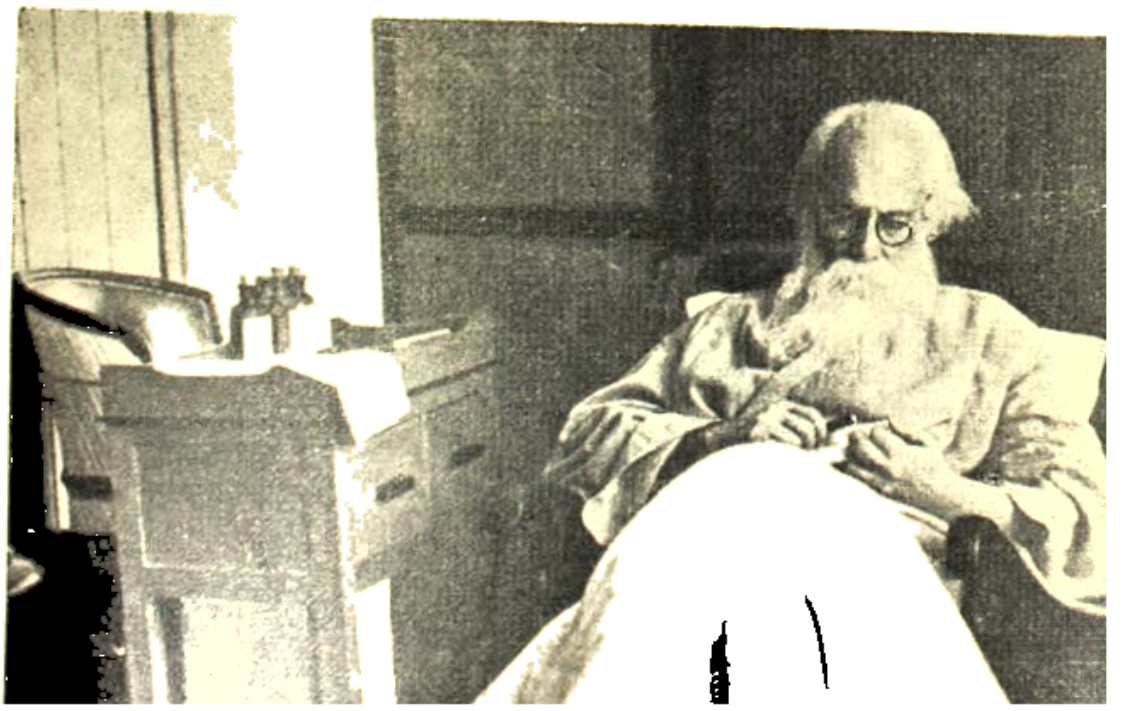

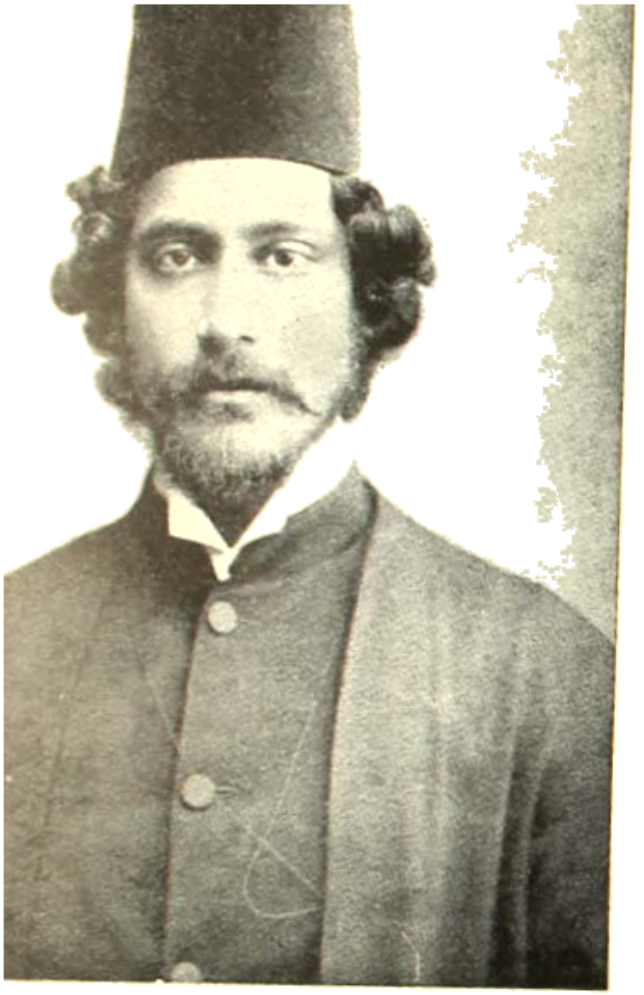

Tagore in London—1890

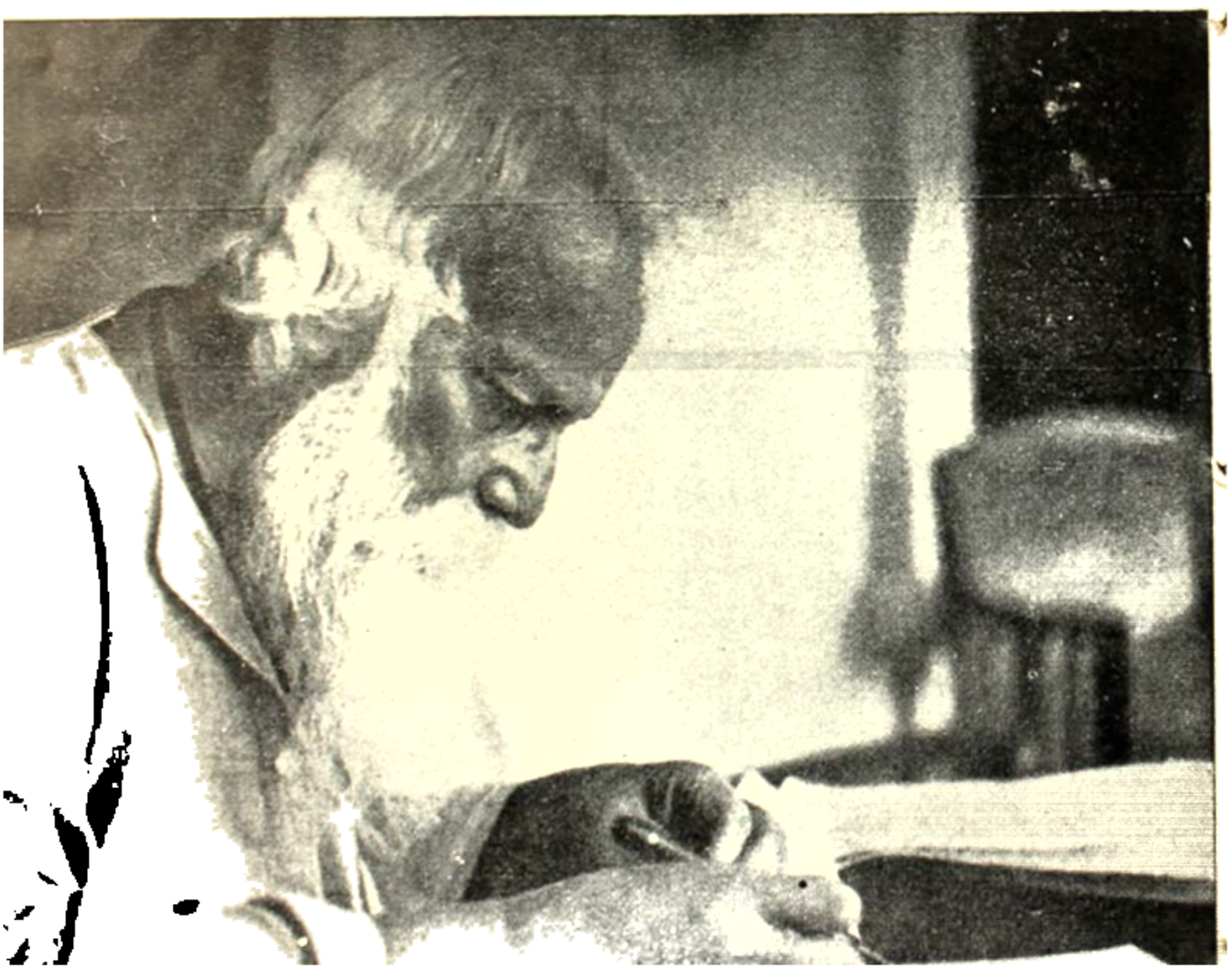

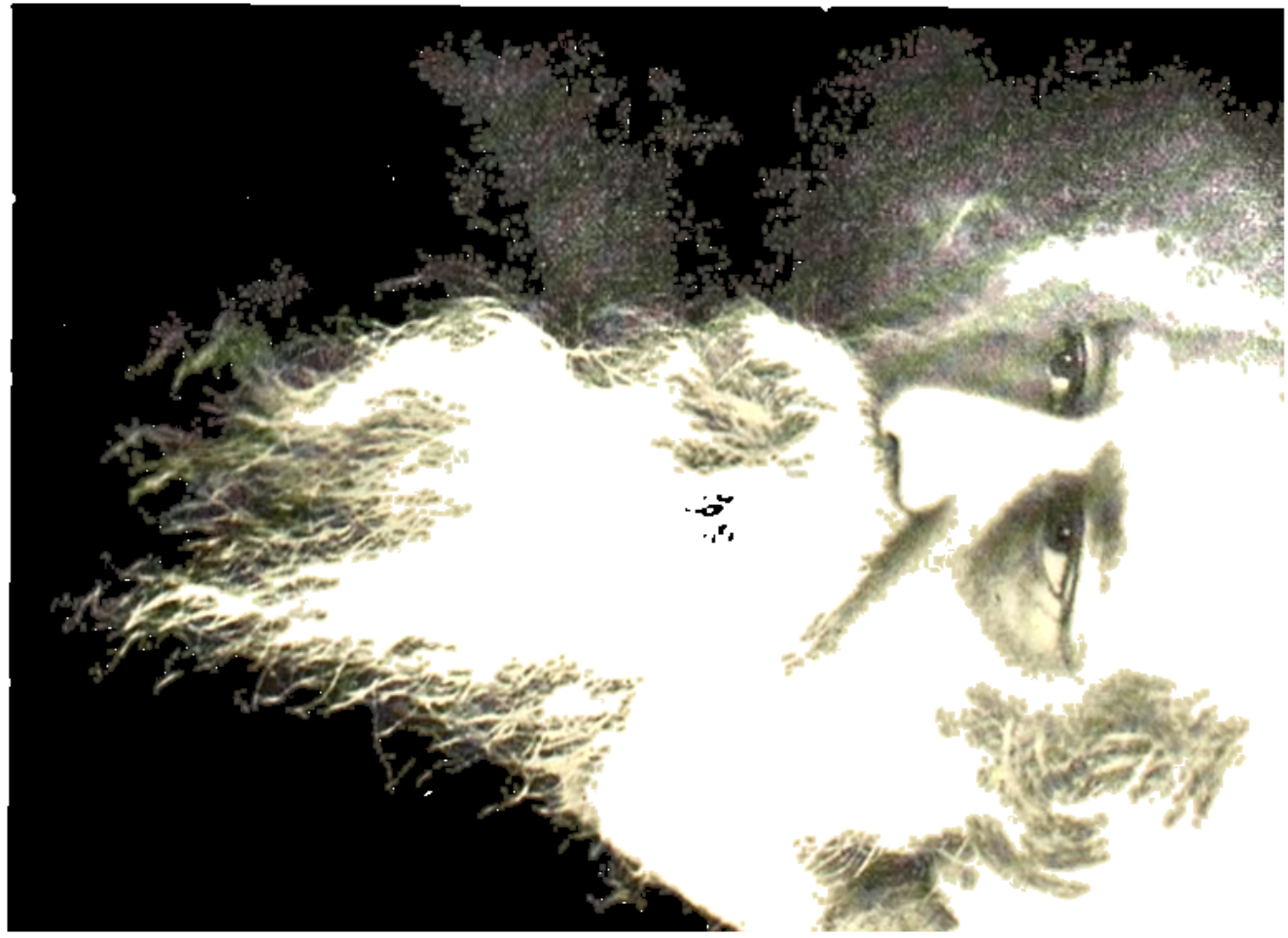

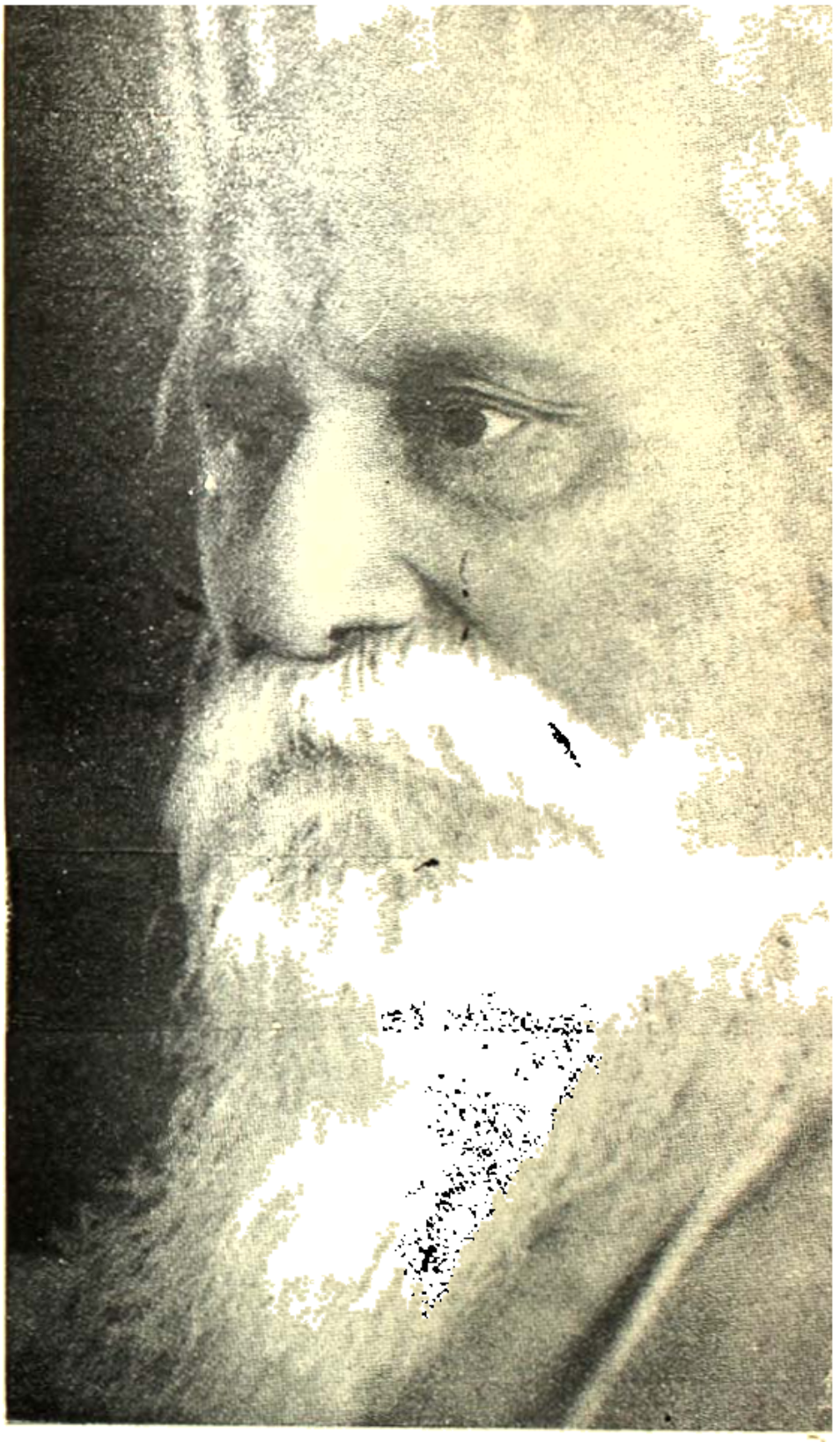

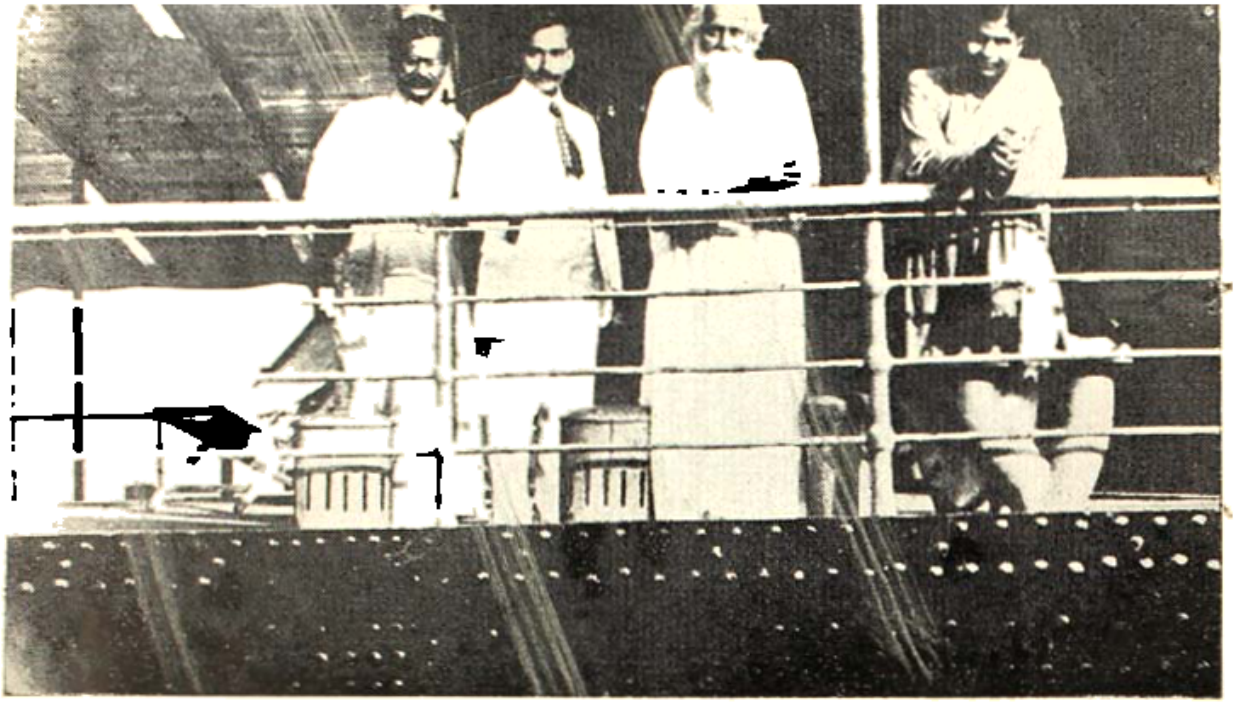

Sailing to the Far East—Tagore, Nandalal Bose, Kshitimohan Sen and Kalidas Nag.

Tagore in the Palace Garden of Peking.

NIKETAN

Rabindra-Sadana

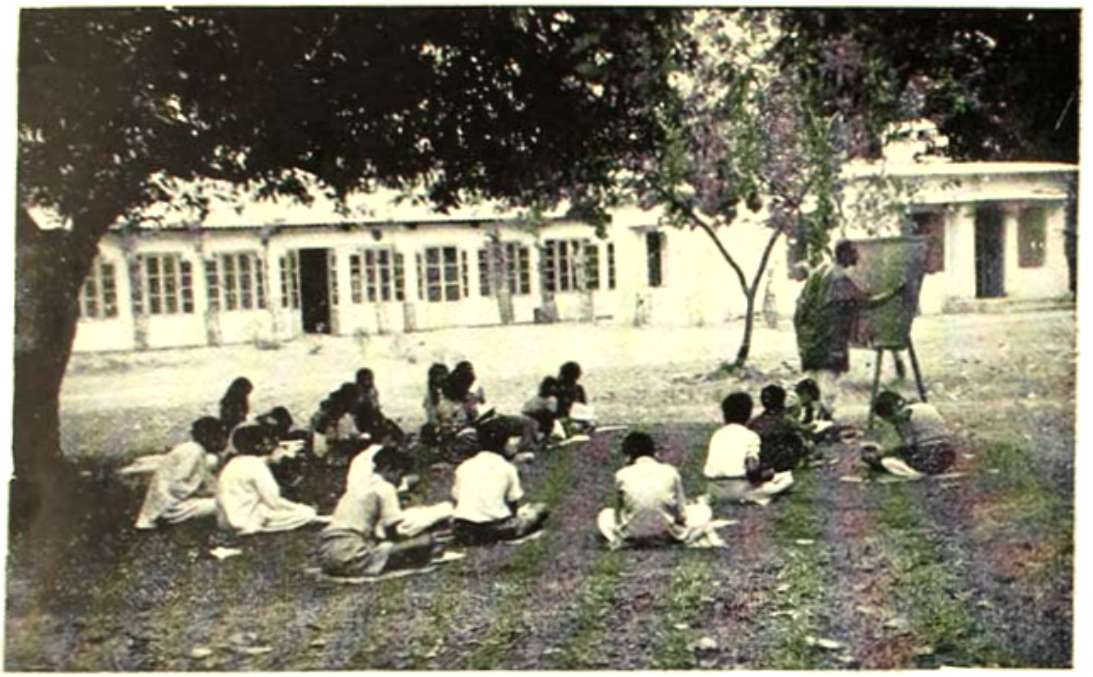

'isva-Bharati
eminar

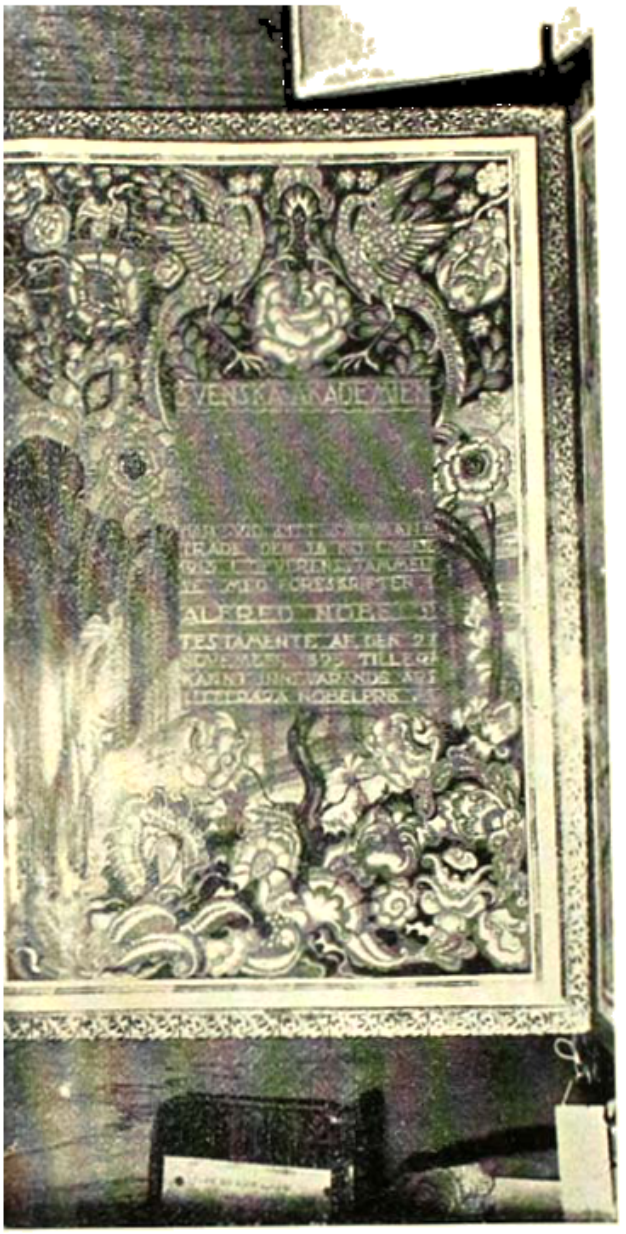
SVENSKA AKADEMIEN
ALFRED NOBEL

ALFR
NOBEL

Sketch by Georgiev

Etching by Mukul Dey

"Dance Drama"—Nandi (at Ease)

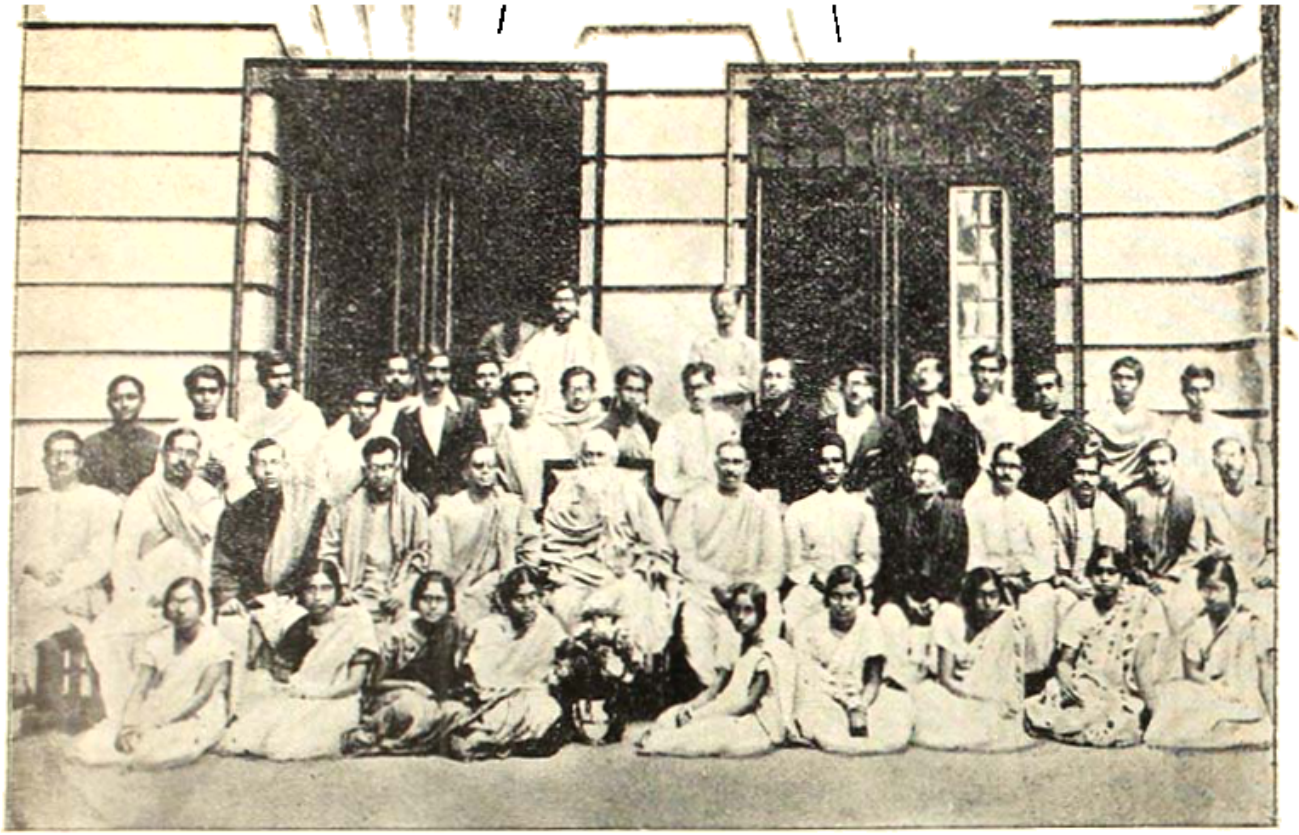

Ramanu Professor Rabindranath at the University of Calcutta.

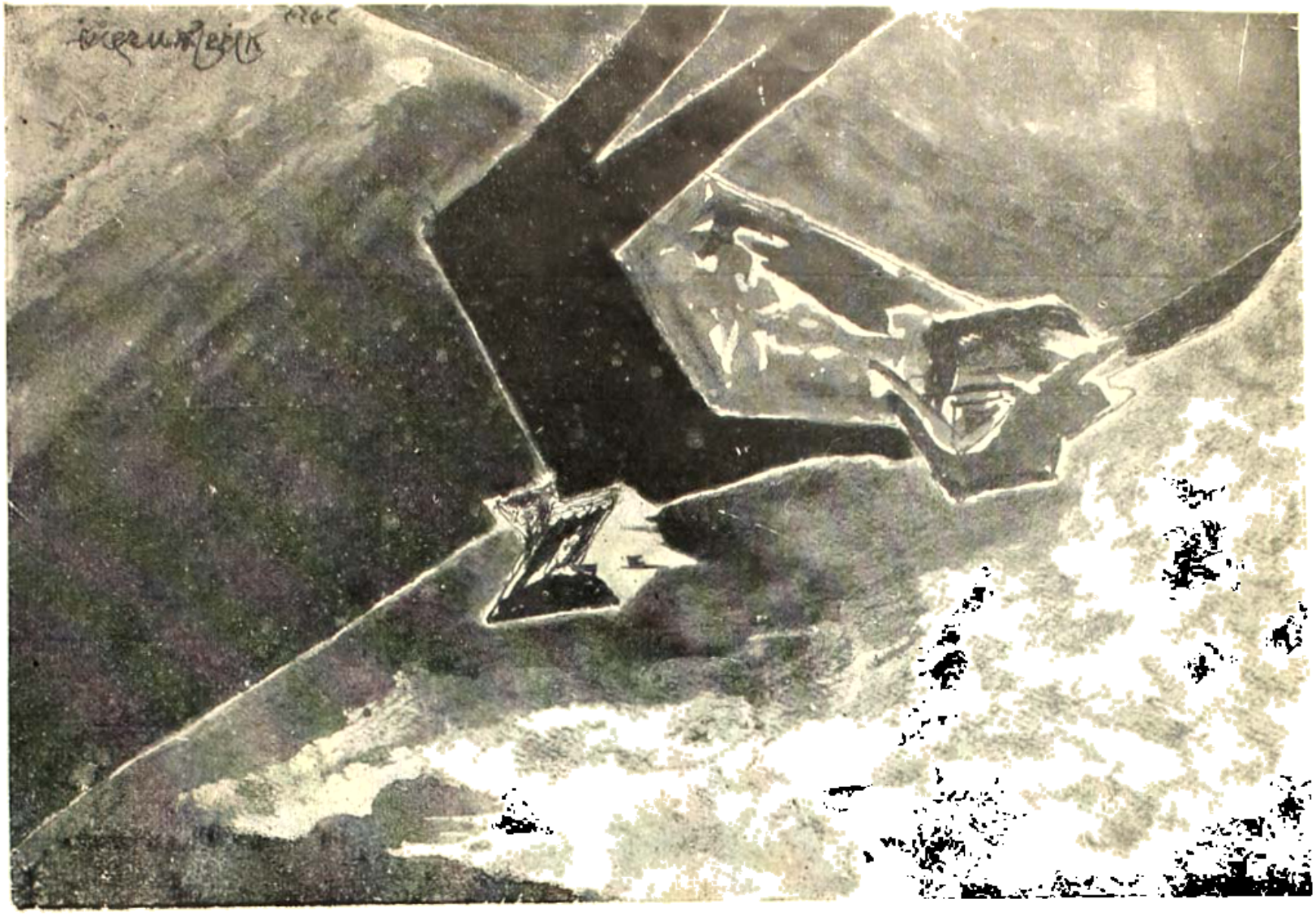

Pioneers in Progress

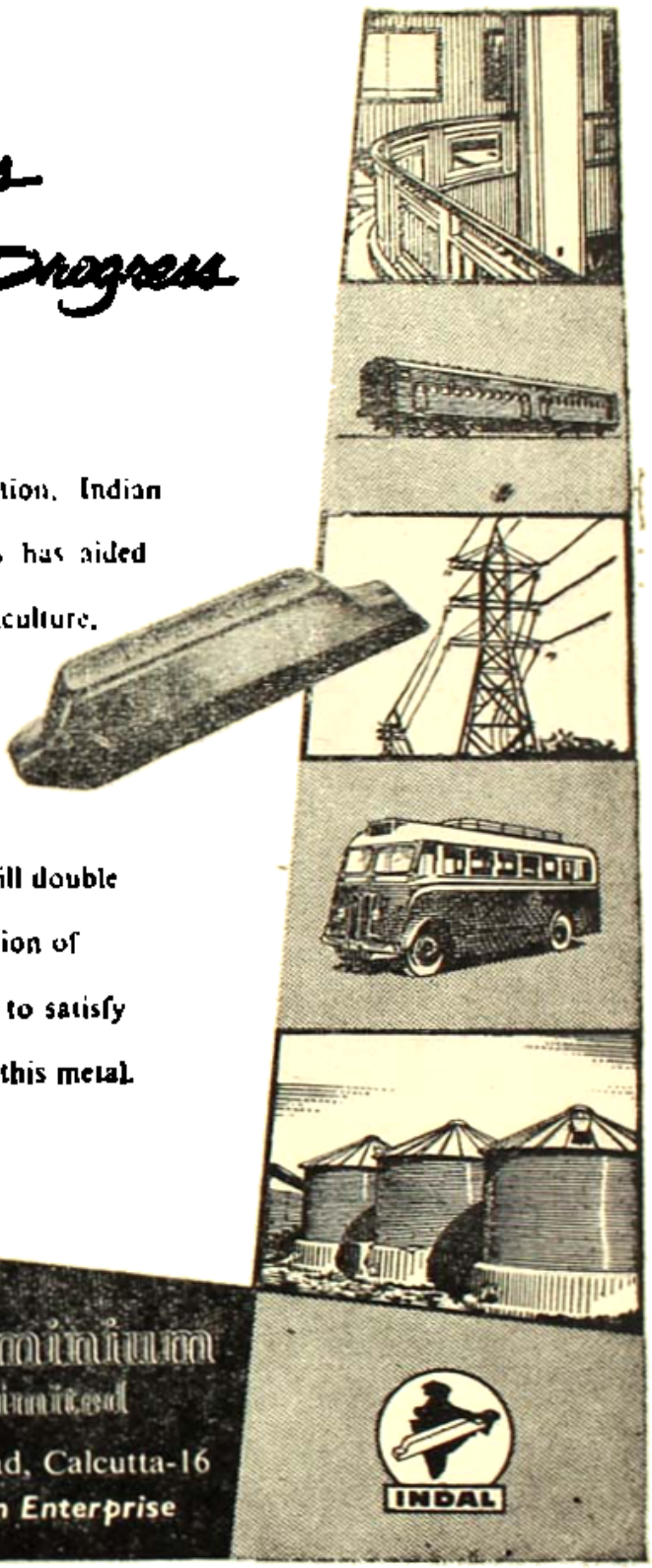

Ever since its inception, Indian Aluminium Company has aided the progress of agriculture, transport, building, power and other industries in India. smelter at Hirakud will double the country's production of Aluminium and help to satisfy the growing need for this metal.

Indian Aluminium Company Limited

31, Chowringhee Road, Calcutta-16

A Canadian-Indian Enterprise

INDAL

National

CYCLE TYRES and TUBES
BELTINGS and HOSES

National's Manufacturing range includes :

ROADFINDER
Cycle Tyres & Tubes

Beltings — Transmission & Conveyor

Hoses

Railway Rubber Fittings

Fan Belts & V-Belts

Rubber Flooring

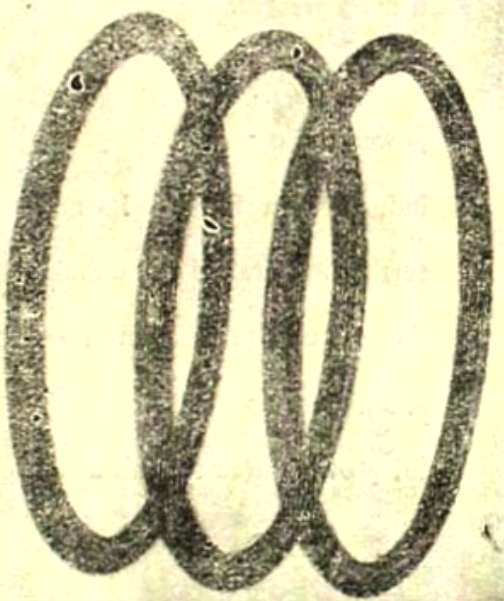

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

BOMBAY • CALCUTTA • DELHI
KANPUR • MADRAS • KOTTAYAM

any time...

any place...

any occasion...

YOU LOOK YOUR BEST IN

Khatau

VOILES

KHATAU MAKANJI SPG. & WVG., CO. LTD.

RETAIL CLOTH SHOP

149, MAHATMA GANDHI ROAD, CALCUTTA—7.

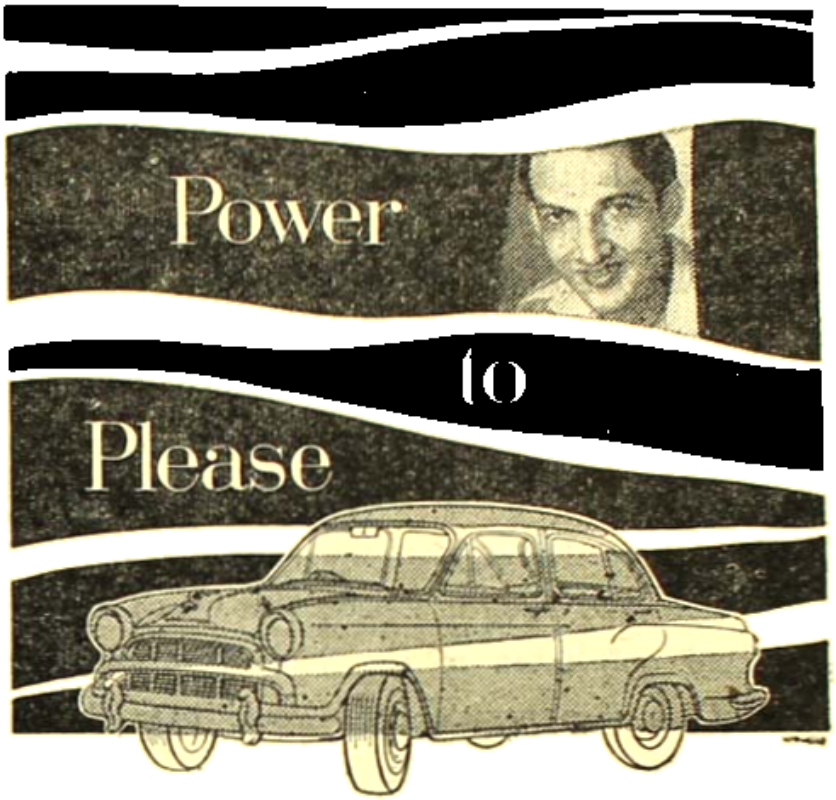

The Ambassador, with the new Over-Head Valve Engine is charged with 25% added power-power for more rapid acceleration, power for safer overtaking, for effortless hill climbing, and for smoother cruising at higher speeds.

Elegantly designed, spacious for its size, excellent in performance, and with 25% more economy, the powerful new Ambassador gives full value for your money.

Ambassador

the car with plenty of drive

HINDUSTAN MOTORS LTD., CALCUTTA-1

Dealers at :

Agra ; Ambalacantt ; Ajmer ; Ahmedabad ; Ahmednagar ; Allahabad ; Baroda ; Bangalore ; Bhilai ; Berhampur ; Bombay ; Bareilly ; Calcutta ; Cuttack ; Coimbatore ; Colombo ; Dibrugarh ; Dumka ; Dhanbad ; Gwaliar ; Gauhati ; Imphal ; Indore ; Jaipur Jabalpur ; Jodhpur ; Jalgaon ; Jorhat ; Jamshedpur ; Jullundur City ; Jammu ; Kanpur ; Kolhapur ; Kurnool ; Lucknow ; Madras ; Madurai ; Mangalore ; Meerut ; Nagpur ; New Delhi ; Nepal ; Patna ; Poona Pondicherry Patiala Palayamcottai . Rajkot Ranchi Sambalpuf ; Shillong ; Secunderabad ; Silchar Srinagar Satna ; Tezpur Thana ; Tiruchirapalli . Trivandrum , Varanasi Cantt . Vijayawada ; Vizianagram.

॥ মার্কিন ঔপন্যাসিক আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে ॥

"পরাজয় বরণের জন্যে মানুষের জন্ম হয় নি। মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু পরাজয় মেনে নিতে পারে না।" "দি ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড দি সী" উপন্যাসটি শেষ হয়েছে এই কথাগুলি দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই কথাগুলিই উপন্যাসটির লেখক মার্কিন সাহিত্যিক আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের জীবনবেদও বটে।

মাত্র ৬২ বৎসরের জীবন, কিন্তু অজস্র রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ। যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েছেন, বলদের শিংএর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, দু'বার মোটরের ধাক্কায় ধরাশায়ী হয়েছেন এবং আফ্রিকার কিলিমানজারো পর্বতের কাছে পর পর দু'বার বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছেন, কিন্তু প্রতিবারই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে হেমিংওয়ে নতুন জীবন শুরু করেছেন। জীবনে চলার পথে যত ব্যাঘাতই আসুক না কেন পরাজয় মেনে নেওয়ার মত লোক হেমিংওয়ে ছিলেন না।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে দুঃসাহসী, দৃঢ়চেতা এই মার্কিন লেখক গত ২রা জুলাই নিজেরই বন্দুকের গুলীতে নিহত হয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, হেমিংওয়ে যখন তাঁর নিজের বন্দুকটি পরিষ্কার করছিলেন তখন সেই বন্দুক নির্গত গুলীতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। অবশ্য পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

"দি ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড দি সী" উপন্যাসটির জন্য ১৯৫৪ সালে হেমিংওয়ে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ইতিপূর্বে ১৯৪০ সালে এই উপন্যাসটিই তাঁকে আর একটি সম্মান এনে দিয়েছিল। তা হল আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার 'পুলিৎসার পুরস্কার'।

দীর্ঘকায়, মজবুত গঠন হেমিংওয়ের গদ্যরচনায় এমন একটা বলিষ্ঠতা ও আকর্ষণী শক্তি আছে যে তা দেশভ্রমণ, দুঃসাহসিক কাজ ও সংঘাতময় জীবনের প্রতি একটা নেশা জাগিয়ে তোলে। তাঁর উপন্যাসের অনেক চরিত্রের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

১৮৯৯ সালের ২১শে জুলাই ইলিনয়ের ওক পার্কে আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের জন্ম হয়। স্কুল জীবনেই মুষ্টিযোদ্ধা ও ফুটবল খেলোয়াড়রূপে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

১৯১৭ সালে স্নাতক হওয়ার অল্প কিছুকাল পরেই তিনি "ক্যানসাস সিটি স্টার" পত্রিকায় রিপোর্টারের চাকরি নেন। কিন্তু বেশি দিন টিঁকে থাকতে পারলেন না। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের কাজ নিয়ে গেলেন ইতালীতে। পরে তিনি ইতালীয় পদাতিক

॥ খেলাধূলা ॥

ফুটবল

কোলকাতার প্রথম বিভাগীয় ফুটবল লীগের খেলায় জনপ্রিয় ইষ্টবেঙ্গল দলের অগ্রগমন অব্যাহত আছে। লীগে ইষ্টবেঙ্গলের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দল হোল অপর জনপ্রিয় ক্লাব মোহনবাগান। ইষ্টবেঙ্গলের এখন মোট অর্জিত পয়েন্ট মোহনবাগান অপেক্ষা বেশী। কিরতি লীগের খেলাও শুরু হয়ে গেছে। এখন থেকে বলা শক্ত কোন দল লীগ বিজয়ী হবে। তবে খেলার বর্তমান অবস্থা দেখে একথা বলা যায় যে ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যেই এক দলের বিজয়ী হবার সম্ভাবনা বেশী।

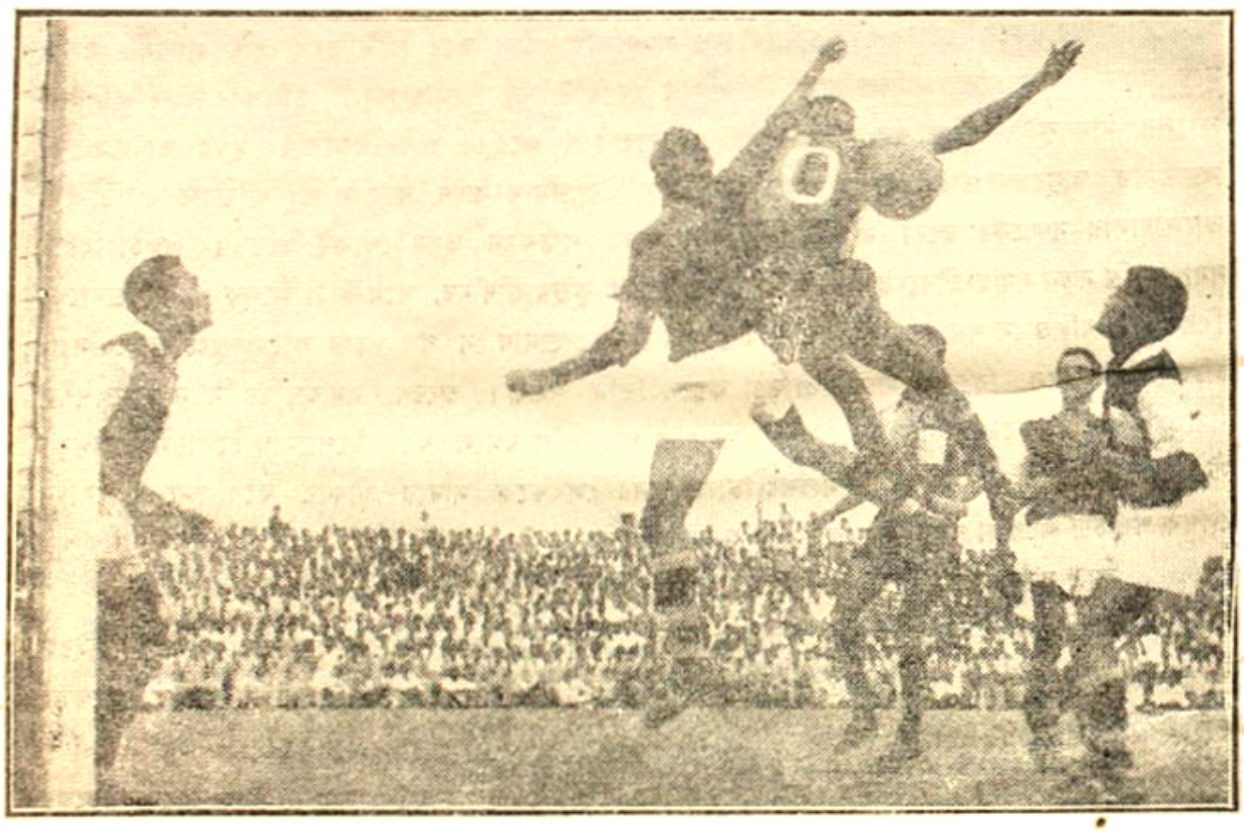

মহামেডান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলায় মহামেডান দলের গোলের নিকটে একটি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য।

এবছর লীগে ইষ্টবেঙ্গল দলে ৮ জন বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়মিত রূপে অংশগ্রহণ করছেন। এই ৮ জন খেলোয়াড়ের বয়সও অল্প এবং সকলেই এঁরা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন খেলোয়াড় বা বিশ্ববিদ্যালয় রু। অনেকদিন পরে বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল দল গঠন করতে দেখা গেল এবং বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যেই তাদের যোগ্যতার পরিচয়ও দিয়েছেন। এবার ইষ্টবেঙ্গল দল যদি চরম সাফল্য অর্জন করতে পারে তাহলে তা বাঙ্গালী খেলোয়াড়দেরই জয় ঘোষণা করবে অর্থাৎ সকলেই বুঝবেন অথবা

অন্ত রাজ্য থেকে খেলোয়াড় আমদানী করার প্রয়োজনীয়তা কত কম। ইষ্টবেঙ্গল যে রকম ক্ষিপ্র বেগ ও সুন্দর বোঝাপড়া নিয়ে খেলছে তাতে কোনওরূপ অঘটন না ঘটলে ওদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনাই বেশী।

অপর জনপ্রিয় দল গতবছরের লীগবিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব মোটেই ভাল খেলতে পারছে না। এখন ভাল খেলতে না পারার অন্যতম কারণ হোল নির্ভরযোগ্য ইপার আর্থেলি সিং ও লেফট ইন চুনী গোস্বামীর পায়ে আঘাত। চুনী গোস্বামীর অবর্তমানে মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডরা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন, যার চরম পরিচয় আমরা পাই ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে চ্যারিটি খেলায়। এই খেলায় চুনী গোস্বামী খেলতে পারেন নি যার ফলে মোহনবাগান ফরোয়ার্ডদের কার কতটা ক্ষমতা বা বাহাদুরী তা ধরা পড়ে যায়। একজন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে এতবড় একটা টীমের ফরোয়ার্ড লাইন গঠন করা উচিত নয়। যাই হোক রক্ষণবিভাগের কৃতিত্বের জন্যে মোহনবাগান দল জোড়াতালি দেওয়া ফরোয়ার্ড লাইন নিয়েই ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে লড়ে চলেছে, তবে শেষ পর্য্যন্ত কি হবে তা বলা শক্ত।

মোহনবাগান গোল রক্ষক এস শেঠকে লাফাইয়া ইষ্টবেঙ্গল দলের
আক্রমণ প্রতিহত করিতে দেখা যাইতেছে।

মহামেডান স্পোর্টিং ইষ্টার্ণ রেল, রাজস্থান প্রমুখ খ্যাতনামা দলগুলি এবার লীগে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। যার ফলে লীগের খেলায় উত্তেজনা-উদ্দীপনা অনেক কম। তবে এবার থেকে ওঠা-নামা প্রথা পুনরায় চালু হওয়ার জন্যে ছোট ছোট দলগুলি আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভাল খেলার। খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রেও রেফারীরা এবার যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

এই মধুযামিনীর স্মৃতি
ধরে রেখে দাও তোমার
ক্যামেরায়, সেই সঙ্গে
আজকের খরচার অঙ্কটাও
যেন বাদ না যায়।

হ্যাঁ গো ওনছো !
'বেবী' আমার দিকে
তাকিয়েই বলে উঠল
"মাম্‌মা"

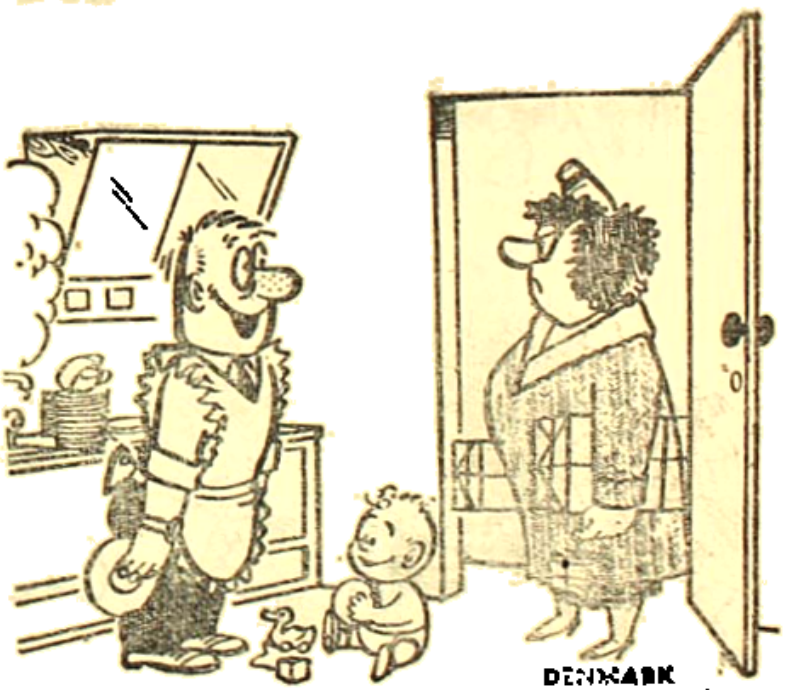

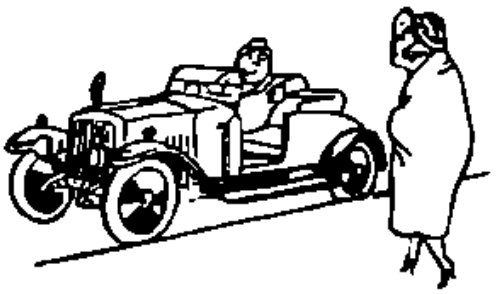

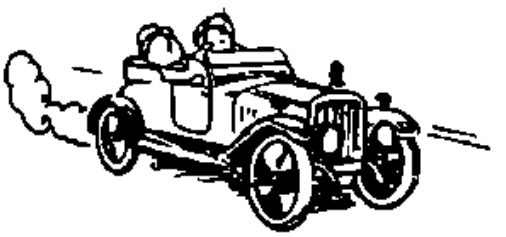

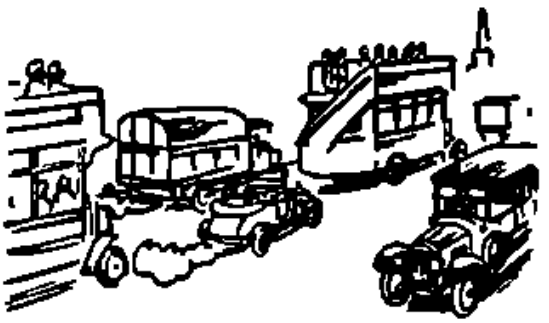

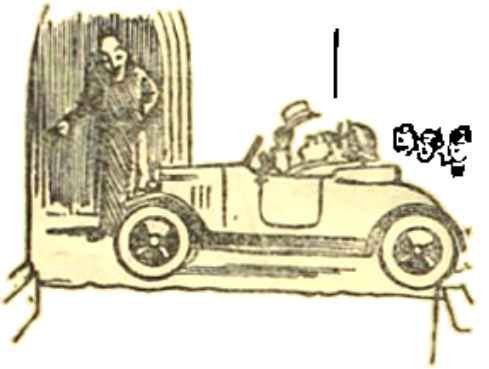

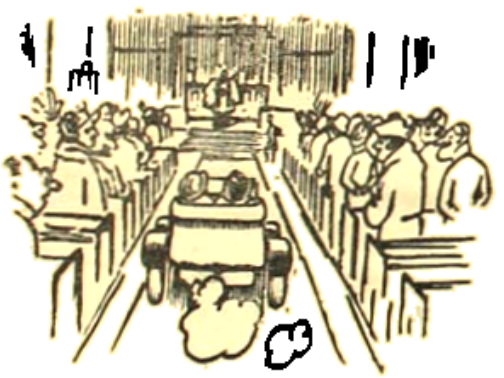

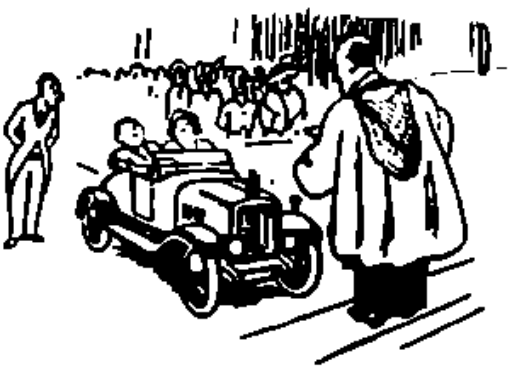

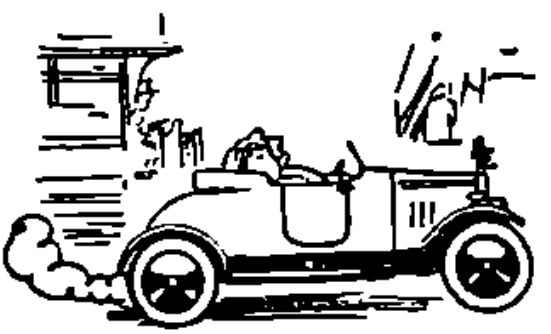

টু-সিটার কার

বিশ্ব-বার্তা

আমেরিকায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব :

সম্প্রতি রবীন্দ্ররচনা পরিচয়-মূলক 'টেগোর রীডার' নামে একটি উৎকৃষ্ট সংকলন পুস্তক যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়েছে। সংকলয়িতা হচ্ছেন কবি রবীন্দ্রনাথের পার্শ্ব-সচিব ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী। ছোট গল্প, চিঠিপত্র, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, আত্মজীবনী, আলাপ-চারী, নাটক, উপাখ্যান, ভারতবর্ষ সম্পর্কিত রচনা, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য-সমালোচনা ও দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কিত রচনা এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য, এই সমস্ত বিষয় থেকে নির্বাচিত অংশ নিয়ে সংকলন পুস্তকটি রচিত হয়েছে। কবির বিরাট ও বহুমুখী সাহিত্য সৃষ্টির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে কিছুই সাধারণ পাঠক-বর্গকে পরিচিত করিয়ে দেবার প্রয়াস ডাঃ চক্রবর্ত্তী করেছেন এই সংকলন পুস্তকের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পৃথিবীর প্রতীচ্য খণ্ডের নরনারীর ধারণা ও জ্ঞান সুসমঞ্জস নয়, এটি ডাঃ চক্রবর্ত্তী লক্ষ্য করে এসেছেন বহুদিন ধরেই। সংকলন পুস্তকটির অন্তর্গত প্রতিটি বিষয়ে তিনি ভূমিকার সাহায্যে পাঠকবর্গকে কবির রচনার সঙ্গে পরিচয়।

নিউইয়র্কে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে টেগোর সোসাইটির অনুষ্ঠানে শিক্ষয়িত্রী ডাঃ পেনী ইস্টাব্রুকস সোসাইটির সভ্য ও সভ্যাগণ।

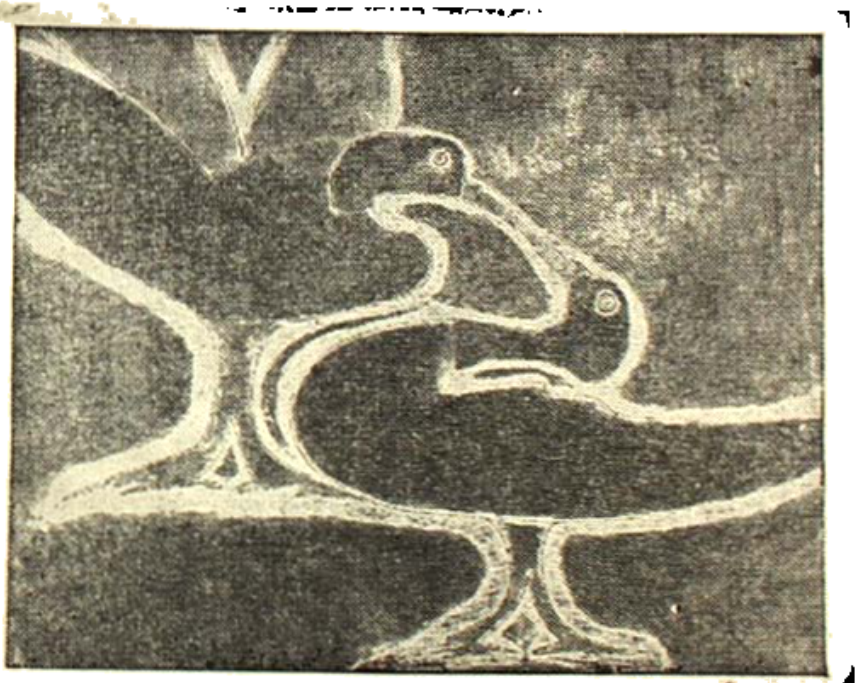

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী। রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রটি ১৯২৮ সালে আমেরিকায় অঙ্কিত। বর্ত্তমানে ফিলাডেলফিয়ার ফ্রি লাইব্রেরীর প্রদর্শনীতে রেখান হইতেছে।

সাধন করিয়েছেন। এই সংকলন পুস্তক পাঠের পর যুক্তরাষ্ট্রবাসী বহু পাঠক-পাঠিকার মধ্যেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তৃততর পরিচয় লাভের ঔৎসুক্য জাগবে আশা করা যায়।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী

বার্কলে, ক্যালিফোর্নিয়া—রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতার ও রবীন্দ্রনাথের জীবনচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে অধ্যাপক ও ছাত্র ছাত্রী মিলে প্রায় সাড়ে তিনশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রছাত্রী সমিতি এবং দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক অনুশীলন কেন্দ্রের সম্মিলিত উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে তিনটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এটি অন্যতম।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাষা বিভাগের অন্যতম সহকারী অধ্যাপক যে যে গ্রামপেঞ্চ, রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য প্রতীচ্যের আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের যে চেষ্টা করে গেছেন সে সম্পর্কে ভাষণ দেন এবং সহযোগিতার নির্দেশনা ও প্রযোজনায় তৈরী রবীন্দ্রনাথের জীবনচিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

পশ্চিম জার্মানীতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব :

পশ্চিম জার্মানীতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে বনোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক বৃহৎ জনসভার দৃশ্য।